মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

চতুর্বিংশ বর্ষ

১৩২০।

কলিকাতা

২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা, ৬৪।১, ৬৪ ২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট

"লক্ষ্মীপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস"

হইতে

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণ

Mohila-Press, Cal

Mohila Press Co.

নববর্ষ।

এই সনাতন সৃষ্টিচাতুর্য্যে নূতন কিছু আছে কি? সবই ত পুরাতন—অনন্ত; অসীম, অপরিমেয়। কালের অনন্ত ধারা, আপন বৈচিত্র্যে আপনি মজিয়া, অহরহ কল্‌কল্ ছল্ ছল্ করিয়া চলিয়াছে। সে বিরাট স্রোতস্বিনীর বক্ষে কত বুদ্‌বুদ্ ফুটিয়া উঠিয়াছে, কত বীচিবল্লরী-বিতান ও ঊর্ম্মিপরম্পরা রবিকরস্পর্শে নানাবর্ণে প্রফুল্ল হইয়া, অনুরাগরক্তিমার শোভা ছড়াইয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। সেই একই ভঙ্গী, একই পরম্পরা সর্ব্বকালে সমভাবে পরিস্ফুট। অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল—অবিনশ্বর ও অব্যভিচারী; ব্যভিচার দেখিতে পাই কেবল গতিতে, কেবল বিকাশে ও বিস্তারে; কেবল উন্মেষে ও উল্লাসে। আমি দেখি—আমার নয়ন দেখে; কিন্তু যাহাতে দেখি, তাহাতে সত্যই এমন ব্যভিচার আছে কি না, তাহা ত ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। এই ব্যভিচার-বোধ হইতেই নবীনতার উদ্ভব। গত কল্য যেমন গিয়াছে, আজও তেমনই যাইতেছে, আগামী কল্যও তেমনই যাইবে। সেই সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত, সেই বিহগকলকূজন, সেই মলয়পবনান্দোলিত-কিশলয় কম্পন—অহোরাত্রের পরিবর্ত্তন-প্রবাহ সেই একই রকমে চলিয়াছে। কিন্তু এই প্রবাহ-বক্ষের উপর আমিও যে ভাসিয়া যাইতেছি! আমার আমিত্বের গতি ও পরিণতি আছে কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু এই একটানা প্লাবন-তরঙ্গে পড়িয়া আমি যে একটু ব্যভিচার না পাইলে তৃপ্তি বোধ করি না। তাই ব্যভিচার খুঁজিয়া বাহির করি, অথবা সৃষ্টি করি। যে কূটা ধরিয়া আমি ভাসিয়া চলিয়াছি, সেই কূটার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, বা কালতরঙ্গে তাহাতে কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, আমি এই একটানার মধ্যে এক একটা নবীনতার পর্ব্ব সৃষ্টি করিয়া রাখি। শোকে—দুঃখে—পরাজয়ে, এবং উল্লাসে—সুখোন্মাদনায়—বিজয়ে এই নবীনতার ভাব পরিস্ফুট হয়। আমার সুখ দুঃখ, শোক অশোক, জয় পরাজয় আমার আমিত্বের ব্যভিচারমাত্র; তাই উহারা নবীনতার দ্যোতক। আমার নববর্ষ আমার আমিত্বের প্রশ্বাস-মুহূর্ত্ত;—একটু জিরাইবার অবসর—নিমেষের তরে পশ্চাদবলোকনের অবকাশমাত্র। আমার নববর্ষ আমার অনন্ত অতীতের স্মারক, জাতির ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত আমিত্বের বিশ্রাম-ক্ষণমাত্র। আমার নববর্ষ আমার আমিত্বের ব্যভিচার-দ্যোতক।

কি জানি, কেন এমন নবীনত্বের পিপাসা! তাই পুরাতন ও সনাতনকেও

নবীন আবরণে ঢাকিতে সাধ যায় ; তাই একটানা দুঃখের স্রোতেও এক একটা শোকের তীর্থ গড়িয়া উহাকে নূতন করিয়া লইতে ইচ্ছা করে। আমি চাই নূতন—নূতন দুঃখ, নূতন সুখ ;—নব সাধ, নবীন মুখ—নূতন সাজ, নব আশা, নবীন সমাজ, নূতন বাসা। তাই মাঝে মাঝে পুরাতনকে নূতন করিয়া লই—সনাতনে নবীনতার অসংখ্য পর্ব্ব গড়িয়া লই। ইহাই নববর্ষ।

কথা এই যে, এবম্প্রকারের নবীনতা নিতুই আমাতে বিদ্যমান, তাই আমি আমার চিরপুরাতনকে রোচক করিবার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে উহাকে নূতন করিয়া লই। আমার এই নবীনতার পিপাসা মিটাইবার জন্য প্রকৃতিও যেন মধ্যে মধ্যে আনুকূল্য করে। জাতির উত্থান-পতন-জনিত মহাসমর ও জয় পরাজয় আমার নবীনতার স্পৃহাকে নানা ভাবে সন্তৃপ্ত করে। ধরাসুন্দরীর বক্ষের অঞ্চলস্বরূপ এই দেশ বিদেশ—এই জল-স্থলের বিস্তার, ভূগর্ভস্থ উত্তাপের সাহায্যে বারে বারে কত নূতন আকার ধারণ করে, এক একটা খণ্ডপ্রলয়ে মেদিনী কেমন মোহিনী ভূষায় বিভূষিত হইয়া বিরাজ করে ; সঙ্গে সঙ্গে আমার নবীনতার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। আমার জন্ম মরণ, যৌবন জরা, ভাব অভাব পর্ব্বে পর্ব্বে আমাকে নূতনতার আস্বাদনে বিভোর করিয়া রাখে। আমি আত্মহারা হইয়া কেবল নূতনত্বের সমুদ্রে হাবুডুবু খাই। প্রেম প্রীতি, স্নেহ ভালবাসা, ঘর সংসার—সবই নবীনতার বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রেম পুরাতন হইবার উপক্রম করিলে, উহা পুত্রবাৎসল্যে নূতন করিয়া ফুটিয়া উঠে। পুত্র কন্যার নবীনতা ক্ষীণ হইয়া পড়িলে উহা পৌত্রে ও দৌহিত্রে প্রবল ভাবে নবীন হইয়া দাঁড়ায়। এই নবীনতার আদান-প্রদানেই মনুষ্য-জীবন—মনুষ্য সংসার। এই নবীনতার জন্যই নববর্ষ।

এস নববর্ষ! অতি পুরাতন, অতি সনাতন আমি,—আমাকে নবীনতার মোহমন্ত্রে সঞ্জীবিত করিবার জন্য তুমি এস। সাধক যেমন একে একে পদ্মবীজমালার এক একটি বীজ ধরিয়া মন্ত্রের আবৃত্তি করে, এবং জপে সিদ্ধ হয়, আমরাও তেমনই কালের এই অনন্ত পদ্মবীজমালার এক একটি বীজ বা এক একটি বর্ষ ধরিয়া জীবন-মন্ত্রের আবৃত্তি করিতেছি, আর অপচয়-উপচয়-ধর্ম্মী জীবনের অবসান ঘটাইতেছি—পুরাতনকে নূতন ভাবিয়া নবীনতার আস্বাদে মুগ্ধ হইতেছি। সাধকের ইষ্টমন্ত্র প্রতি বীজের উপর ন্যস্ত থাকে, আমার জীবনের ইষ্টমন্ত্র—আমার জাগ্রৎ কালের পর্ব্বে পর্ব্বে—বর্ষে বর্ষে ফুটিয়া উঠে ; পরিণামে গণনা শেষ হইলে কাল-চক্রবালের অন্তরালে শুক্রতারার মত ডুবিয়া যায়।

এই উদয় অস্তের লীলাই নবীনতার পরিচায়ক। অস্তই পুরাতন বা সনাতনের সহিত সম্মিলন। এস নববর্ষ! তুমি অভ্যুদয়, তাই তুমি নবীন। আশার অভ্যুদয়, সম্ভাবিত সুখের অভ্যুদয়, হয় ত বা নিরাশ নিরাকাঙ্ক্ষের বেদনার অভ্যুদয়, তাই তুমি আমাদের নববর্ষ। এস তুমি! ধর্ম্মে কর্ম্মে, সাহিত্যে সমাজে আসিয়া সমুদিত হও। আমরা তোমার কৃপায় যেন অরুণোদয়ের মত তোমাকে ও আমাদের জীবনকে অনুরাগরক্তিম নবভাবপ্রফুল্ল দেখিতে পারি।

১৩২০ সাল! অনন্তের একটি পল্লবীজ তুমি, আমার দুঃখসুখদগ্ধ হৃদয়ের এক একটি শান্তির শ্বাস তুমি—এস, এস, আমার চিরপুরাতন হৃদয়কে একটু নবীনতার স্নেহসেচনে স্নিগ্ধ করিয়া দাও। তুমি কতটুকু, তোমার সমবায়ও কতটুকু! আমার দেশ নাই, জাতি নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই,—আমার আছে কাল, কোটীকল্প-পরিমাণের কাল। আমি কাল গণিয়া আমার আমিত্বের ধারা কতকটা বজায় রাখিয়াছি, কল্পকল্পান্তরের কথা মনে রাখিয়া আমিত্বের পুষ্টি করিয়াছি। আমার জীবন মরণের পরিচ্ছেদ নাই, তাই আমার দেবতাকে কেবল আমিই প্রার্থনার স্বরে বলিয়া থাকি,—

পতাম্যহং ভ্রান্তোঽস্মি, ত্রাহি মাং মধুসূদন।

আমি অনবরত যাতায়াত করিতেছি, চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেছি, শ্রান্তি বোধ হইতেছে বটে, তথাপি আমার বিরাম নাই। তাই তোমার শক শকাব্দা, সাল সন প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া এক একবার হাসি পায়। কিন্তু তথাপি বলি, তুমি কাল, তোমার প্রহর, দণ্ড, পল, নিমেষ, ক্ষণ প্রভৃতি আছে বলিয়াই আমার শ্রান্তি দূর করিবার অবসর হয়—একটু হাঁপ ছাড়িবার অবকাশ পাই। জানি বটে, তোমার আসা যাওয়া নাই, সৃষ্টির অপচয়-উপচয়ে তোমার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়। এই অপচয় উপচয় জন্যই ত সংসারে সুখদুঃখ, আর এই সুখদুঃখ লইয়াই জীবন-প্রবাহ। ১৩২০ সাল, তুমি এই সুখদুঃখ-পরম্পরার মধ্যে একটি ছেদ—একটা বিরাম—তোমার আগমনই সেই বিরাম বা ছেদের পরিচায়ক। সেই বিরাম বা ছেদের অবসর পাইয়া জীব একবার অতীত ও অনাগতের ভাবনা ভাবিয়া লয়। যাহা গেল, তাহা কেন গেল, কোথায় গেল? যাহা আসিতেছে, তাহা কেন আসিতেছে, কেমন রূপে আসিতেছে?

আমার সাহিত্য এই গতাগতির অভিব্যক্তিমাত্র। আমার সাহিত্য কেবল রূপ নহে, কেবল গুণ নহে—রূপ-গুণের ভাব-অভাবের সমন্বয়; তাই কালের

দিকে তাকাইয়া বাঙ্গালী সাহিত্যচর্চ্চা করে। বাঙ্গালার সাহিত্য ধর্ম্মে, অধর্ম্মে, ইহ-পর-কালে সমভাবে বিস্তৃত। এই নিরবধি কালপ্রবাহ বর্ষে বর্ষে অগ্রসর হইতেছে, আমাকে জীবন মরণের ভাবনায় ভাবিত করিতেছে,—মরণের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে বটে; কিন্তু চিরকালব্যাপী আমি, আমার মরণ ত হয় না।

মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব—
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাবো।

আজ পর্য্যন্ত দিবার লোক পাইলাম না বলিয়াই আমার মরণ হইল না। জীর্ণ বস্ত্র-ত্যাগের মতন কত দেহ বদলাইয়াছি, কত সাজ সাজিয়াছি, এখনও কত রূপ ধরিতেছি, কত ভাবে বিভোর হইতেছি। কিন্তু ঐ এক ভাবনা—কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব! এই ভাবনাতে মরণ হইতেছে না, এই ভাবনাতে অতীতকে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছি না। জগন্নাথের রথের দড়ির টানের মত কে যেন আমাকে আমার অনন্ত অতীতের যমুনা প্রবাহে ডুবাইয়া দিতেছে। কাল ও কালিন্দী ভাই ও ভগিনী। কালিন্দীর এক একটি বীচি তাহার তরল প্রবাহের এক একটি পরিচ্ছেদস্বরূপ। কালের এক একটি বর্ষ তাহার অজস্র প্রবাহের এক একটি তরঙ্গ। যম সহোদরা যমুনার ঢেউ গণিয়া উঠা যায় না; কেন না ঐ দূরে বংশীবটমূলে কানুর বেণুর রব হইতেছে, মন যে ঠিক থাকে না। স্বয়ং যম—কালের ঢেউ এই বর্ষবিন্যাস গণিয়া শেষ করা যায় না। কি জানি কাহার আহ্বানে মাঝে মাঝে মনে পড়ে,—

কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব,—

তখন আত্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া একটা অঘটন ঘটাইয়া বসি। আর সেই অঘটন-ঘটনা হইতে আবার নূতন করিয়া বর্ষ গণনা করি। ১৩১৯ সংবৎসর একই ভাবে কাটিয়া গিয়াছে, কুড়ি সাল সেই ভস্মস্তূপে আসিয়া মিশিতেছে। গত ১৩১৯ সংবৎসর যে ভাবে দর্প দম্ভ, গর্ব্ব স্পর্দ্ধা, লজ্জা সরম, দুঃখ ক্লেশের ভস্মস্তূপ উচ্চ করিয়া শ্মশানদৃশ্যের ভীষণতা প্রকটিত করিয়াছে, হে নববর্ষ, তুমিও কি তাহাই করিবে? যদি তাহাই হয়, তবে মরণের পথে অগ্রসর হইতেছি, বুঝিতে হইবে। দুঃখের পদ্মবীজমালা গণিতে গণিতে যেথায় অবসাদ ঘটিয়াছে, করাঙ্গুলী জড়তা লাভ করিয়াছে—আর যে পারি না। যখনই পারি না বলিয়া স্থবিরতা আইসে, তখনই মরণের আকাঙ্ক্ষা হয়। মরিতে চাই—মরণের প্রার্থনা করি, কিন্তু—

কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাবো?

আমার শত-চাঁদ-নিঙড়ান সুধামাখান শ্যামসুন্দর, আমার কোটী জন্মের আরাধনার ধন কৃষ্ণ নটবর,—যাঁহার তনুদীপ্তি নীল আকাশে, পত্রপল্লবে, নবীন কিশলয়ে, নবদূর্ব্বাদলে, নীলাম্বুতে, নীলনয়নে সর্ব্বদে ও সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত—সেই কানুকে কারে দিয়ে যাব? আমার কানু ছাড়া গীত নাই; কানু বিনা রস নাই; আমার শ্যামা জন্মভূমি কখনই তুষার-আবরণে শ্বেতাম্বর ধারণ করেন না—জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত আমার সবই কালো—মরিলে তবে আমি শাদা হই—সেই কালোকে আমি কারে দিয়ে যাব? দিবার মতন যোগ্য ব্যক্তি আজও খুঁজিয়া পাইলাম না বলিয়াই এত কাল কেবল ঢেউ গণিয়া কাল কাটাইয়াছি—জানি না, এমনই ভাবে আরও কত কাল কাটিবে।

কাজেই যখন মরণ হচ্চ না—মরিতে পারি না, বিস্মৃতি-সাগরে চিরদিনের জন্য ডুবিয়া থাকিতে পারি না, তখন "আমারে বাঁধিয়ে রেখ তমালেরই ডালে।" ঘনকৃষ্ণ পত্রবিন্যাসে যে নিত্য শ্যাম, সেই তমাল-শাখে আমার আমিত্বকে বাঁধিয়া রাখিও। মৃতদেহ বুঝিয়া কত শকুনি গৃধিনী আসিবে, কত উৎপাত উপদ্রব করিবে, তাহার প্রতি নিমেষের তরেও দৃষ্টিপাত করিও না—আমারে বাঁধিয়া রেখো তমালেরই ডালে। সেই তমাল-ডালেই এতকাল বাঁধা আছি বটে, পরন্তু মাঝে মাঝে দানবগ্রস্ত হইয়া সে বন্ধন ছিঁড়িতে ইচ্ছা করে। সে ব্যর্থ চেষ্টার ফলে যখন যাতনায় অধীর হইয়া উঠি, তখনই অতীতের দিকে তাকাইয়া বর্ষ গণনা করিতে থাকি। তখন একে একে মনে পড়ে ১৩১৯ বর্ষের কথা—মনে পড়ে সুখ-দুঃখ, মনে পড়ে শ্লাঘা-লজ্জা, মনে পড়ে সাজ-সজ্জা। যখন অতীত অরুণোদয়ের নবানুরাগ রঙ্গিন হইয়া মানস-পটে সজীব হইয়া উঠে, তখন আবেগে বলিয়া উঠি,—

> "ননদী, ব'লো গিয়ে নাগরে,
> ডুবেছে রাই, রাজনন্দিনী,
> কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে।"

সত্যই কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে ডুবিয়া আছি। সে কলঙ্ক শ্লাঘার—দর্পের—দম্ভের কলঙ্ক; সে কলঙ্ক সুখের—স্নেহের—প্রেমের কলঙ্ক; আমার—তোমার—সকলের কলঙ্ক; সে কলঙ্ক জন্মজন্মান্তরের, পিতৃপিতামহের, পুরুষ-পরম্পরার কলঙ্ক। তোমরা দশ জনে গৌরবের—মনুষ্যত্বের—বীরত্বের—জগজ্জয়ের শ্লাঘা করিয়া থাক, আমরা ফুকারিয়া কলঙ্কের গৌরব বাখানি। আমার নববর্ষ এই কৃষ্ণ-কলঙ্ক সাগরের একটি তীর্থ; সঙ্কল্প করিয়া এই তীর্থে স্নান কর, কৃষ্ণকলঙ্কলেপ

অনপনেয় লেখায় তোমার সর্ব্বাঙ্গে সংলিপ্ত থাকিবে। সে সুখ কেমন, যে কলঙ্ক-গৌরবে বিভোর, সেই জানে! সে যে মূকাস্বাদনবৎ! কেমন করিয়া বুঝাইব, সে কেমন! বুঝান যায় না বলিয়াই এত কথা কহিতে হয়, বুঝান যায় না বলিয়াই কাঁদিতে হয়; কাঁদিতে কাঁদিতে বুক-ফাটান স্বরে গান করিতে হয়,—

"মনে পড়িল রে—
আমার সেই ব্রজভূমি।"

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

বস্ত্র।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যেরূপ বস্ত্রালঙ্কার-প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে সুবিখ্যাত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটি প্রবন্ধের রচনা করিয়া, তথ্যানুসন্ধানের পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্ব্বরতা অতিক্রম করিয়া সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিবার প্রথম উপক্রম হইতেই বস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল, এবং দেশভেদে ও অবস্থাভেদে বস্ত্রের উপাদান ও ব্যবহারপ্রণালী ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ইহার পরিচয় প্রদান করিবার জন্য ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

বস্ত্রের ব্যবহার মানব-সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। যে সকল আধুনিক সভ্য জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস আছে, তাঁহারা ইতিহাসের প্রমাণেই জানিতে পারেন যে, এক সময়ে তাঁহারা অশাসিত অবস্থায়, নগ্নপদে, অনাবৃতগাত্রে, আমমাংস ভক্ষণ করিয়া, বন্য পশুর মত বিচরণ করিতেন। তাঁহারা আত্ম-তুলনায় পরের উপরেও এই অবস্থার সমারোপ করিয়া, আদিম অবস্থায় মানুষ মাত্রকেই দিগম্বর বিশেষণে ভূষিত করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে সভ্যতার উন্মেষকালেই বস্ত্র-শিল্পের আবির্ভাব হইয়াছিল। সূত্রগ্রন্থসমূহ ভারতবর্ষের আর্য্য সভ্যতার প্রধান সাক্ষী। গোভিল প্রভৃতির গৃহ্যসূত্রে সমাজের যে অবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ সভ্যজাতির কার্য্যকলাপেরই পরিচয় প্রদান করে। তাহা দেখিয়া বোধ হয়, মানুষ যেন সর্ব্বতোভাবে সভ্য-ভূমিকায় সাজিয়াই সংসার-নাটকের অভিনেতৃরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং সূত্রগ্রন্থে নগ্নাবস্থার কোনরূপ নিদর্শনই পাওয়া যায় না। প্রত্যুত সেই সুপ্রাচীন যুগ হইতেই বস্ত্রের ব্যবহার ও শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। গোভিলের

গৃহসূত্রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় চারি প্রকার বস্ত্রব্যবহারের উপদেশ আছে। ঐ সকল বস্ত্রের নাম (১) ক্ষৌম, (২) শাণ, (৩) কার্পাস, এবং (৪) ঔর্ণ। (১)

ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষৌম অথবা শাণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কার্পাস, এবং বৈশ্যের আবিক বা ঔর্ণ। (২) অর্ব্বাচীন সাহিত্যেও চারি শ্রেণীর বস্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন ;—

ক্ষৌম-কার্পাস-কৌশেয়-রাঙ্কবাদিবিভেদতঃ।

তাঁহার মতে,—ত্বক্, ফল, কৃমি ও রোম, এই চারি প্রকার উপাদান হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়াই বস্ত্র চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

ত্বক্-ফল-কৃমি-রোমভ্যঃ সম্ভবত্বাচ্চতুর্ব্বিধম্।

অতসী প্রভৃতি গুল্ম-জাতীয় গাছের ছাল হইতে সূতা সংগ্রহ করিয়া যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহার নাম "ক্ষৌম"। সম্ভবতঃ এই বস্ত্র পূর্ব্বকালে কেবল "ক্ষুমা" বা অতসী হইতেই উৎপন্ন হইত বলিয়া "ক্ষৌম" নাম লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে পাট ও শোণ প্রভৃতি হইতে যে কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহাও এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। এই ক্ষৌম বস্ত্র যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় "অংশুপট্ট" নামে অভিহিত হইয়াছে। (৩) এই "অংশুপট্ট" শব্দের অর্থ কি, তাহা মিতাক্ষরায় কথিত হইয়াছে। (৪) ক্ষৌম বস্ত্রের অপর নাম "দুকূল", বা "দুগূল"। (৫) শণ-সূতার কাপড়ও ত্বক্ হইতে সমুৎপন্ন। কিন্তু গোভিলের সময়ে তাহা স্বতন্ত্র নামেই পরিচিত ছিল ; "অংশুপট্ট" বা "ক্ষৌম" সংজ্ঞা লাভ করে নাই।

মহর্ষি মনুও গোভিলের অনুসরণ করিয়াছেন। যথা,—

শাণ ক্ষৌমাবিকানি চ।—মনু: ১০।৮৭

কৌশেয় বা কৌশিক বস্ত্র, (রেশমের কাপড়) "পট্টবস্ত্র" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন,—

কৌশিকং কোশ-প্রভবং তসরীপট্টাদি।

---

(১) ক্ষৌম-শাণ-কার্পাসৌর্ণান্যেষাং বসনানি।—২ প্র। ১০ খ। ৮ সূ।

(২) ক্ষৌমং শাণং বা বসনং ব্রাহ্মণস্য কার্পাসং ক্ষত্রিয়স্য আবিকং বৈশ্যস্য। ২।১০।১১

(৩) স শ্রীফলৈরংশুপট্টম্। ১।১১১৬

(৪) অংশুপট্টং বল্কল-তন্তুকৃতম্।

(৫) ক্ষৌমং দুকূলং দুগূলম্।—হেমচন্দ্র।

যেবল ঋষির মতে, বস্ত্রের ছয় প্রকার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মতে, যেন পট্ট ও কৌশেয় স্বতন্ত্র পদার্থ। যথা,—

ঔর্ণা-কৌশেয়-কুতপ-পট্ট-ক্ষৌম-দুকূলজাঃ।

মেষের লোম হইতে প্রস্তুত বস্ত্রের নাম "ঔর্ণ" বা "আবিক"। কাপাসের তুলা হইতে প্রস্তুত বস্ত্রের নাম "কার্পাস" বা "বাদর"।

স্যাৎ কার্পাসস্তু বাদরম্।—হেমচন্দ্র।

শণ সূতার বস্ত্রকে ক্ষৌমের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইলে, কার্পাস, ক্ষৌম, কৌশেয়, আবিক ও রাঙ্কব (মৃগরোম-জাত), মোটামুটি এই পাঁচ প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার বস্ত্র "কুতপ" নামে অভিহিত হইত। বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন,—

কুতপঃ পার্ব্বতীয়চ্ছাগ রোম-নির্ম্মিতঃ কম্বলঃ।

রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্ত মহোদয়দিগের মতে, নেপালদেশীয় কম্বলের নামই "কুতপ"। এক সময়ে নেপাল দেশ কম্বলের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল; অন্যান্য প্রদেশের লোক নেপালে গেলেই, দুই একখানা কম্বল লইয়া আসিত; সেই কম্বল দেখিয়া, কম্বল খাঁহাকে নেপাল হইতে নবাগত বলিয়া অনুমান করা হইত। গৌতম-সূত্রের বাৎস্যায়ন ভাষ্যে এই বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। বিতণ্ডা-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে;—

নেপালাদাগতোঽয়ং নবকম্বলবান্।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা প্রভৃতি বিবিধ স্মৃতিগ্রন্থেই "কুতপে"র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

অতি পূর্ব্বকালে ক্ষৌম ও কৌশেয় বস্ত্র অভিজাতসমাজে বিশেষরূপে সমাদৃত হইত। রামায়ণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কৌশল্যা প্রভৃতি রাজ্ঞী ও অন্যান্য রাজমহিলাগণ ক্ষৌম বস্ত্রে সুসজ্জিতা হইয়া, নবোঢ়া সীতা প্রভৃতি বধূবর্গকে মঙ্গলালাপে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। (৬)

রামচন্দ্রের অনুসন্ধানে ভরত ইঙ্গুদী-পাদপ মূলে উপস্থিত হইয়া, তৃণশয্যায় কৌশেয় তন্তু-দর্শনে সীতাদেবীর উত্তরীয় বসনের অনুমান করিয়াছিলেন। (৭)

(৬) কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ সুমধ্যমা।
কুশলসমুহতে জোতে রাজ্যবন্দ্যপরোষিতঃ।
মঙ্গলালাপনৈর্হোমৈঃ শোভিতাঃ ক্ষৌম বাসসঃ।—বালকাণ্ড। ৭৭।১০

(৭) উত্তরীয়মিহাসক্তং সুব্যক্তং সীতয়া তদা।
তথাহ্যেতে প্রকাশন্তে সক্তাঃ কৌশেয়তন্তবঃ।—অযোধ্যা। ৮৮।১৫

ব্যাসদেবের লেখনীও ভদ্রমহিলার ক্ষৌমবস্ত্র-বর্ণনে উদাসীন নহে।

কৃষ্ণা চ ক্ষৌম-সংবীতা কৃতকৌতুকমঙ্গলা।

মধ্যযুগের সাহিত্যেও ক্ষৌম-বসনের অপ্রতিহত গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস তপোবন-লালিতা শকুন্তলার জন্য বৃক্ষ হইতে মহর্ষির তপঃপ্রভাবসম্ভূত মাঙ্গল্য ক্ষৌম-বসনের আমদানী করিয়া গিয়াছেন।

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডুতরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতম্।

অর্কাচীন সাহিত্যে পট্টবস্ত্রের প্রতি সমাদরের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে এই বিষয়ে কয়টি উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে।

(১) পাটের সাড়ী কর্য্যাছ পরিধান চলিতে নূপুর বাজে।

(২) নৈবেদ্য বিবিধরূপ, গন্ধপুষ্প দীপ ধূপ, পট্টবস্ত্র নানা অলঙ্কার।

(৩) পাট নেত বাস পর, গলে রত্নমালা।

ধানের মত কাপড়ে স্বতন্ত্র পাইড় লাগাইয়া "নেতের শাড়ী" প্রস্তুত হইত। এই "নেতের শাড়ী" এক সময়ে বাঙ্গালায় বিশেষরূপে সমাদৃত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি কাব্যই এই বিষয়ে প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য।

পাইয়া ইমামবাড়ী, বুনে নেত পাট শাড়ী।

কি পুরাতন যুগে, কি মধ্য যুগে, সর্ব্বত্রই সাহিত্যে বস্ত্রশিল্পের সূক্ষ্মতার সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুসংহিতায় বর্ণিত পৃথিবীর পরিহিত বসনে "সুসূক্ষ্ম" বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে।

সুসূক্ষ্ম-শুক্লবসনাং রক্তোত্তরবিভূষণাম্।

আর্য্যদিগের পরিধেয় এক প্রকার বস্ত্র "আহত" নামে পরিচিত ও পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। সংস্কারতত্ত্ব-ধৃত মৎস্যপুরাণে এই "আহত" বস্ত্রেও সূক্ষ্ম বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

ঈষদ্ধৌতং নবং শুভ্রং সদশং যন্নধারিতম্।
আহতং তদ্বিজানীয়াৎ সর্ব্বকর্ম্মসু পাবনম্॥

এই স্থলে রঘুনন্দন "ঈষৎ" শব্দের "সূক্ষ্ম" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পাণিনির কাশিকা বৃত্তিতে "কুশাগ্রীয়ং বস্ত্রম্" এইরূপ সূক্ষ্মতাজ্ঞাপক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কাদম্বরীতে রাজার পরিহিত সূক্ষ্মতম বস্ত্রদ্বয় সর্পকঞ্চুকের সহিত তুলিত হইয়াছে। যথা,—

এবক ক্রমেণ নির্ব্বর্ত্তিতাভিষেকো বিষধরনির্ম্মোকপরিলঘুনী ধবলে পরিধায় বাসসী।

শিশুপালবধে বর্ণিত মহিলাবৃন্দের পরিহিত বস্ত্রে সূক্ষ্মতার মাত্রা অতিক্রম

করিয়া, কুরুচির পরিচয়প্রদর্শনপূর্ব্বক, একেবারে আকাশের সাম্য ধারণ করিয়াছে। যথা,—

"হরেষপি স্পষ্টহরেষু যত্র বস্ত্রাণি নারীকুচমণ্ডলেষু।
আকাশ-সাম্যং দধুরম্বরাণি ন নামতঃ কেবলমর্থতোঽপি।

এই মধ্যযুগের সাহিত্যেই "চীনাংশুকে"র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, ঐ সময়ে চীনদেশ বস্ত্র-শিল্পের নৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল; এবং ভারতবর্ষে সেই চীনাংশুক সুপরিচিত ও সমাদৃত হইয়াছিল। (৮)

তন্ত্র-সাহিত্যেও "চীনাংশুকে"র পরিচয় পাওয়া যায়। বীরভাবাপন্ন ও দিব্য-ভাবাপন্ন সাধকগণ যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তুর উপভোগের অধিকারী, পশুগণ তাহাতে সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিত। সুতরাং "চীনাংশুক" পশ্বাচারী সাধকের পক্ষে অপরিধেয়। (৯)

বর্ত্তমান যুগে যেমন পুরুষমহলে শুক্লবস্ত্রের একাধিপত্য, পূর্ব্বকালে তেমন ছিল না। স্ব স্ব রুচি অনুসারে পুরুষগণও নানা রঙ্গের কাপড় পরিধান করিতেন। মহাভারতে এই বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। অর্জ্জুনের সম্মোহনবাণে দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ সংজ্ঞা-বিহীন হইয়া যে সময়ে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিত হইয়াছিলেন, তখন উত্তরার বাক্য স্মরণ করিয়া, অর্জ্জুন দ্রুপদপুত্রকে আদেশ করিয়াছিলেন—"হে নরপ্রবীর! তুমি আচার্য্য ও শারদ্বতের শুক্লবর্ণ, কর্ণের পীতবর্ণ, অশ্বত্থামা ও রাজার নীলবর্ণ বস্ত্র গ্রহণ কর।" (১০)

কাপড়ের এই সমস্ত রঙ্গ বিবিধ পুষ্প ও মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা সম্পাদিত হইত। (১১) উপাদানগত পার্থক্য অনুসারে রং-করা কাপড়ের শুদ্ধিবিধানের তারতম্য দেখা যায়।

দেবলের মতে,—তূলিকা, বালিশ ও "পুষ্পরক্ত" বস্ত্র সূর্য্যাতপে কিঞ্চিৎ

---

(৮) বিমল-চীনাংশুকাবগুণ্ঠিতাঙ্গী।—কাদম্বরী।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

(৯) পট্টবস্ত্রাণি বস্ত্রাণি চীনানি প্রভবেন্তু হ।—কামাখ্যাতন্ত্র; ৫ পটল।

(১০) বিরাট পর্ব্ব। ৬৬।১৩।

(১১) তেন রক্তং রাগাৎ।
কষায়েণ রক্তং বস্ত্রং কাষায়ম্। সিদ্ধান্তকৌমুদী। ৪।২।১।

শুষ্ক করিয়া, হস্তের দ্বারা পুনঃপুনঃ মর্দ্দন করিলেই শুদ্ধ হয়। (১২) বিজ্ঞানেশ্বর "পুষ্পরক্ত" শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—

পুষ্পরক্তানি কুঙ্কুম-কুসুম্ভাদি-রক্তানি।

কেহ কেহ নিয়ত এক রঙ্গের কাপড় পরিধান করিতেন বলিয়া, তত্তৎ রঙ্গের নামানুসারে তাঁহাদিগের নাম প্রসিদ্ধ হইত। ইহার উদাহরণস্থলে নীলাম্বর ও পীতাম্বর নামে সুপরিচিত রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে পরিধানে ও প্রাবরণে শুক্লবস্ত্রই প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। শুক্লবস্ত্রের অভাবে পট্টবস্ত্রের ব্যবস্থা। (১৩) যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মতেও ধৌতবস্ত্রের অভাবে শাণ, ক্ষৌম ও আবিক বস্ত্র পরিধেয়। (১৪) কবিকঙ্কণের সময়ে তসরের আদর বাড়িয়াছিল। গুজরাটের সমৃদ্ধিবর্ণনে তিনি তসর-পরিধান জাঁকজমকের লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

চন্দনে চর্চ্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু,
তসর বসন পরিধান।

বর্ত্তমান যুগেও তসর গরদের পরিধান পবিত্রতা-মিশ্রিত গৌরবের পরিচায়ক বলিয়া সমাজে বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, ধৌত কার্পাস বস্ত্র থাকিতে "তসর"-পরিধান পরিত্যাজ্য; কেবল প্রাবরণে (উড়নী রূপে ব্যবহারে) প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। আশ্বলায়নের সময়ে এই শব্দের ত-কারে র-ফলা ছিল। বোধ হয়, ক্রমে ক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইয়া "তসর" হইয়াছে। এই তসরের-ব্যবহারে বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচার দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই পবিত্র মনে করিয়া তসর পরিয়া আহার করিয়া থাকেন, এবং সেই পরিহিত "তসর" অধৌত অবস্থায় সময়ান্তরেও ব্যবহার করেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধান ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। শাস্ত্রানুসারে "তসর" পরিধান করিয়া ভোজন অথবা মলত্যাগ করিলে, সেই তসর ধৌত করিয়া শুদ্ধ করিতে হয়। (১৫) সাধারণতঃ পরিধেয় বস্ত্র "দশাযুক্ত" অর্থাৎ অগ্রভাগে "ছিলা"-সংযুক্ত

(১২) তুলিকামুপধানঞ্চ পুষ্পরক্তাম্বরাণি চ।
শোষয়িত্বাতপে কিঞ্চিৎ করৈঃ সম্মার্জ্জয়েন্মুহুঃ।—মিতাক্ষরা।

(১৩) পরিধানে সিতং শস্তং বাসঃ প্রাবরণে তথা।
পট্টকূলং তথালাভে ব্রাহ্মণস্ত বিধীয়তে।—লঘ্বাশ্বলায়ন-স্মৃতি। ২৮

(১৪) অভাবে ধৌতবস্ত্রাণাং শাণ-ক্ষৌমাবিকানি চ।

(১৫) আবিকং ত্রসরঞ্চৈব পরিধানে পরিত্যজেৎ।
শস্তং প্রাবরণে প্রোক্তং স্পর্শদোষো ন বিদ্যতে।
ভোজনঞ্চ মলোৎসর্গং কুর্ব্বতে ত্রসরাবৃতাঃ
প্রক্ষাল্য ত্রসরং শুদ্ধং দুকূলঞ্চ সদা শুচি।

হইত; দশা-রহিত অর্থাৎ থান কাপড় আর্য্যদিগের অপরিধেয় বলিয়া গণ্য হইত। দশাযুক্ত বস্ত্রের অভাবে, অগত্যা থানের কাপড় ব্যবহৃত হইত। পুরাণে ও স্মৃতিতে এই বিষয়ের প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। (১৬) বর্ত্তমান সময়ে কাপড়ের পাইড়ে গান বা কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাস বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সুরসুন্দরীদিগের কল্পলতা-প্রসূত বস্ত্রে দুষ্মন্তের চরিত্র গীতাকারে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। (১৭)

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

এপ্রেল-'ফুল'।

১

রামহরি বসু সহধর্ম্মিণীর অকালমৃত্যুশোকে অধীর হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় অনুভব করিতে লাগিলেন। পুত্রকলত্রবিহীন সংসারে সকলেই ঘোর নিরানন্দে পূর্ণ। ঐশ্বর্য্য কণ্টকের ন্যায় বিঁধিল। আহার বিষবৎ বোধ হইল। আত্মীয় স্বজনের আশ্বাসবাণী শেলসম পীড়াদায়ক হইয়া পড়িল।

বিশেষ দুঃখের কথা এই যে, বসুজা প্রণয়-বীজ-বপনের কল্পনামাত্র করিতেছিলেন, এই দুর্ঘটনা। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ হয়। দুই বৎসর স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তখন সে নিতান্ত বালিকা। শেষ তিন বৎসর, বিষয় আশয়ের গোলমালে ও মামলা মোকদ্দমার ঝঞ্ঝাটে প্রণয়-সঞ্চারের সুযোগ হয় নাই। ইহাই ভয়ানক আক্ষেপের বিষয়; কারণ, আশা পরিপূর্ণ হইবার সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত, অথচ সকলই মরীচিকাবৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অনেক পাত্রী বাছিয়া সেই সাধের বিবাহ! অনেক টাকা খরচ করিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া সেই কন্যার অনুসন্ধান! এখন সে ভব-নদীর পার।

জাগ্রতে, স্বপ্নে, রামহরি তাহাই ভাবিতেন। তাহার আর দেখা পাইবার যো নাই। যদি মরিলেও তাহার দেখা পাইতেন, তবে মরিতেন। কিন্তু এ

(১৬) নগ্নাকচ্ছ দশাহীনং বর্জয়েদম্বরং বুধঃ। —নরসিংহ পুরাণ।
দশাহীনেন বস্ত্রেণ কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যকারকঃ।—আচাররত্নে উশনা।

(১৭) বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ সুরসুন্দরীণাং বর্ণৈরমী কল্পলতাংশুকেষু।
সঞ্চিন্ত্য গীতিক্ষমমর্থবন্ধং দিবৌকসস্ত্বচ্চরিতং লিখন্তি। —অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

সম্বন্ধে সঠিক প্রমাণ কেহ দিতে পারিল না। বিনা প্রমাণে রামহরি বসু কোনও কথা বিশ্বাস করিবার লোক নহেন। জগতে তাঁহার স্থায় সন্দিগ্ধচিত্ত লোক অতি বিরল।

কারণ, স্ত্রী-বিয়োগের সময় রামহরি বাবু তিন জন বিজ্ঞ ডাক্তারকে ডাকিয়া নাড়ী পরীক্ষা করাইয়াছিলেন। অবশেষে মৃত্যু নিশ্চিত ধার্য্য হইলে পর, তাঁহার হৃদয়ে শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছিল।

অন্য একটি মহাদুঃখের কথা। স্ত্রীর 'ফটো' ছিল না। সমগ্র মুখমণ্ডল স্মৃতিপটে উদয় হওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িল। সেই অপ্সরার মত সুন্দর মুখশ্রী, যাহা দেখিলে সংসার স্বর্গ বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে মুখশ্রী বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইয়া গেল, ইহা কি সামান্য ক্ষোভের বিষয়?

অতএব উপায়বিহীন্ রামহরি বেরাকুকের স্থায় বৈঠকখানায় বসিয়া গোঁফে তা দিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। কেহ কেহ তাঁহাকে—

'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
(তাহা) অনলে পুড়িয়া গেল'—

গানটি গুন্ গুন্ স্বরে অক্লেশে গাহিতে শুনিয়াছিল। এমন কি, মধ্যে হঠাৎ মৎস্যমাংস ছাড়িয়া গেরুয়া বসন পরিধান করিবেন, এমন প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু পাছে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে আদালতে উপস্থিত হইয়া বাকী খাজনার মামলা প্রভৃতির তদ্বির করিতে অশক্ত হন, সেই সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে প্রস্তাবটি এক বৎসর মুলতুবী রাখিয়াছিলেন।

পাড়ার যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় রামহরির প্রিয়পাত্র। যদুর বয়স প্রায় ত্রিশ, এবং রামহরি অপেক্ষা সে দুই বৎসরের বড়। যদুর বৃহৎ পরিবার, এবং কেরাণী-গিরি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয়; সুতরাং রামহরি বাবুর মন যোগাইয়া সে নানাবিধ উপায়ে দুই পয়সা রোজগার করিত। রামহরির স্ত্রীর জন্য গহনা গড়াইয়া, জ্যাকেট কিনিয়া, খেলনা-সামগ্রী আনিয়া, সস্তা দরের উপন্যাস কিনিয়া, এমন কি, সুযোগ পাইলে ঘটি ও বাটিটা চুরি করিয়া তাহার যাহা লাভ হইত, তাহাতেই সংসার চলিয়া যাইত। হঠাৎ আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়া যাওয়াতে তাহার পরিবারবর্গ মহাদুঃখিতচিত্তে প্রতিবাসী ও আত্মীয়বর্গের সহিত মন্ত্রণার্থ সমবেত হইল।

সকলেরই মত হইল, রামহরির অন্য একটি বিবাহ না দিলে তাহাদিগের দিন চলা সুকঠিন।

(২)

কিন্তু কথা উত্থাপন করে কাহার সাধ্য? সুচতুর যদু চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, 'সে ভার আমার।'

রামহরি প্রভাতবায়ু সেবন করিতেছেন, এমন সময় যদু তাঁহার নিকট উপস্থিত। যদুর চোখে জল আসিল, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। রামহরি ভাবিলেন, 'যা হো'ক একটা লোক আমার দুঃখে দুঃখী।'

রামহরি। যদু, শোক নিষ্ফল। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা হইয়াছে। এখন মরণের অপেক্ষা করিতেছি। তোমার কোনও আশঙ্কা নাই। উইলে তোমার পরিবারবর্গের জন্য যথেষ্ট রাখিয়া যাইব।

যদুর শোক এবার ধ্বনি আশ্রয় করিয়া মুখ দিয়া বাহির হইল। সে রকম কান্না কেহ পুত্রশোকেও কাঁদে না। বিশেষতঃ, গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্মপ্রযুক্ত শরীরের জলভাগ চর্ম্ম দিয়া বাহির হইয়া গেলে চক্ষুর দিকে ভয়ানক অভাব হয়। তাহা সত্বেও যদু কি করিয়া কাঁদিল, তাহা বিজ্ঞানও বলিতে অসমর্থ। এটা যে সহৃদয়তার মস্ত প্রমাণ, তাহা রামহরি বুঝিলেন, এবং লজ্জিত হইয়া বলিলেন, 'থাম, থাম।'

রামহরি। পাড়ার নূতন খবর কি?

যদু। তাহা তোমার শুনিয়া কাজ নাই।

রামহরি নিশ্চয় বুঝিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধেই কথা। কাজেই তাঁহার সন্দেহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। ক্রমে যদুর ঘোর মৌনাবলম্বন আহুতিস্বরূপ সেই সন্দেহাগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল।

'যদু! তুমি ত আমার নিকট কোনও কথা কখনও লুকাও না; কিন্তু এবার এ প্রকার ভাব কেন? কেহ আমার কোনও প্রকার কুৎসা করে নাই ত?'

যদু। দেখ রাম! তোমার কুৎসা করিলে আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম, কিন্তু এ ভয়ানক কুৎসা, বীভৎস হৃদয়বিদারক কুৎসা! সতীর নিন্দা, দেবীর নিন্দা। যে স্বর্গস্থা, যাহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া, যাহার লক্ষ্মীশ্রীর অনুরাগে অবস্থিত হইয়া আমরা সংসার ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সেই রমণীরত্নের কুৎসা।

রামহরি অতিশয় ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বল ত?'

তখন যদু সুযোগ পাইয়া বুঝাইয়া দিল যে, একদিন তাহার স্ত্রী রামহরির স্ত্রীকে নরেনের দিকে তাকাইয়া হাসিতে দেখিয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক সেটা দোষের কথা নয়; কারণ, নরেন কাণা, তাহার এক চক্ষু নাই। তথাপি কেহ

কেহ বলে, অন্ত এক দিন নয়েনও হাসিয়াছিল, এবং তাহা দেখিয়া রামহরির স্ত্রীও হাসিয়াছিল। রামহরির পদতলের নিম্নে বসুন্ধরা চক্রবৎ ঘুরিতে লাগিল। কি লজ্জার কথা, কি ক্ষোভের কথা, কি দুঃখের কথা!

'আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছিলাম,—বৈশ্বাসং নব কর্ত্তব্যম্। বন্ধু! পুরুষদিগের কর্ত্তব্য স্ত্রীদিগের চরিত্র-সংশোধন, এবং তজ্জন্য আজন্ম প্রাণ-পণে চেষ্টা। আমার এই মহাকর্ত্তব্য জীবনে পালন করা হইল না, ইহাই দুঃখ।'

বন্ধু। যখন তোমার ব্রতই এই, তখন আর একটা বিবাহ করিয়া কর্ত্তব্য পালন কর না কেন? তোমার ন্যায় সুপুরুষ, বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক সম্বন্ধে বিরল, এটা বোধ হয় তোমাদের কথা নয়। আমাদের জীবনের বারবেলা উপস্থিত, তোমার প্রভাত এখনও সম্মুখে।

রাম। কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু আমি প্রবন্ধাদি লিখিয়া ও ধর্ম্মগ্রন্থাদির টীকা করিয়া কালযাপন করিব, মনে করিয়াছিলাম। আপাততঃ দর্শন শাস্ত্রগুলি পাঠ করিতেছি।

বন্ধু। উপদেশ, বিশেষতঃ লিখিত উপদেশ, কার্য্যকর হয় না। কর্ম্মস্থলে কর্ম্মই ধর্ম্ম ও নীতিরক্ষার প্রধান উপায়। তোমার বয়ঃক্রম মোটে বিশ পঁচিশ মাত্র। সংসারধর্ম্ম পালন করিবার এই সময়।

বন্ধুর উপদেশ রাম গ্রহণ করিলেন। রামহরি বসু মহাসম্ভ্রান্ত ধনী কায়স্থ। দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারে মনোনিবেশ করিলেন।

৩

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হেমলতা গৃহে স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিতা হইলে পর একদিন রামহরি মনের কথা বলিতে বসিল।

'দেখ, হেমলতা! তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, অনেক ভাল বহি ও মন্দ বহি পড়িয়াছ, প্রণয় কি তাহা জান। সেই প্রণয় আমি এখনও আস্বাদন করিতে পারি নাই, এবং তাহার আকাঙ্ক্ষাও করি না। তবে তুমি সুচরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া গৃহলক্ষ্মীরূপে সংসার আলোকিত করিবে, ইহাই সকলের ইচ্ছা।'

হেমলতা। তুমি দুইবার বিবাহ করিয়া যে প্রেমের আস্বাদ পাও নাই, আমি বহি পড়িয়া তাহার কি বুঝিব? শুনিয়াছি, স্বামী ভালবাসিলেই স্ত্রী ভালবাসিয়া থাকে।

রামহরি। ঠিক তাহার বিপরীত। আমার বোধ হয়, ভালবাসার দায়

স্ত্রীলোকের। প্রথমতঃ স্ত্রী ভালবাসিবে, এবং তাহার সঠিক প্রমাণ পাইলে স্বামী তাহার প্রতিদান করিবে। আইন ইহার সাক্ষী। বাদীকে প্রথমে প্রমাণ দিতে হয়। স্ত্রী বাদিনী, স্বামী প্রতিবাদী। তবে তুমি যে আমাকে ফাঁকি দাও নাই, সে জন্য আমি খুসী। তুমি যদি বলিতে,—নাথ, আমি তোমাকে ভালবাসি, তবে আমি তাহা বিশ্বাস করিতাম না।

হেমলতা। ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েছেলে আজকাল এমন কথা মুখে আনে না। উহা উপন্যাসের কথা। তবে আমিও খুসী; কারণ, তুমি ভালবাসার ভান কর নাই। পৃথিবীর মধ্যে যদি কোনও ঘৃণাজনক ব্যাপার থাকে, তবে ভালবাসার ভান তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। দায়ের সম্বন্ধে আমি ইহা স্বীকার করি না যে, স্ত্রীলোকেরই ভালবাসার সূত্রপাত করা কর্ত্তব্য; কারণ, পুরুষেরাই যত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপারের মূল। কিন্তু এ কথা লইয়া বিবাদ করিবার দরকার নাই। তোমার বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিও। আর একটা কথা, তোমার আত্মীয়বর্গকে বাড়ীতে স্থান দাও না কেন?

রামহরি। তাহারা কলহের মূল। চুরী করে।

হেমলতা। হয় ত তোমার পরমবন্ধুই চুরী করে। অজস্র একটা সৃষ্টিছাড়া নির্জ্জনতা ঘরে ব্যাপ্ত করা বুদ্ধির কাজ নয়। আমি চারি বৎসর ধরিয়া কেবল দিন রাত্রি পুঁথি লইয়া খাটিয়াছি। শরীরে বল নাই। এখন কিঞ্চিৎ বিশ্রাম আবশ্যক। আমি এবার ইণ্টারমিডিয়েট বিজ্ঞান পরীক্ষা দিতাম, কিন্তু শরীর ভাল নহে বলিয়াই বিবাহ করিয়াছি। মরণের ইচ্ছা নহিলে কেহ বিবাহ করে না, তাহা বোধ হয় জান।

রামহরি কিঞ্চিৎ ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, 'ঠিক তাই। এখন কাহাকে লইয়া আসি?'

হেমলতা। আমার ছোট বোন প্রমীলাকে আন। সে থার্ড ক্লাসে পড়ে। আমি তাহার পড়া দেখিব। তোমার কালা মাসীমাকে লইয়া আইস। তিনি প্রবীণা বিধবা। সুন্দর রাঁধিতে পারে না। আমি তাঁহার নিকট রন্ধন শিখিব। আমার জীবনে দুইটিমাত্র সাধ। প্রথমতঃ, বিধবাদিগের একটি মহামণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা, এবং বিলাতী ও স্বদেশী রন্ধনের একটা সামঞ্জস্য-বিধান।

রামহরি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, দুইটি উদ্দেশ্যই মহান্। বাস্তবিক, বিধবাগণের জীবনব্যাপী দুঃখ, এবং স্বদেশী অন্ন ব্যঞ্জনের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অভাব, উভয়ই দারুণ দুশ্চিন্তার বিষয়।

হেমলতা বুঝাইয়া বলিলেন, 'যে প্রকার দুঃসময় উপস্থিত, হতভাগিনী রমণীগণের বৈধব্যের সম্ভাবনাই অধিক ; এবং পুরুষবর্গের মুখরোচক আহার না জুটিলে তাহারা শীঘ্রই জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে। কি উপন্যাসে, কি কবিতায়, কি কথোপকথনে, আমাদের দেশে খানিকটা বিদেশের সঞ্জীবনী শক্তি সকলেই লইতেছে। তুমি গোরা পড়িয়াছ ?'

রামহরি। না।

হেমলতা। পড়িও। অমন বই এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। ভবিষ্যতে আমাদের দেশে কি রকম মানুষ হইবে, তাহার আভাস ঐ পুস্তকে বেশ পাওয়া যায়।

রামহরি। সকলেই বিধবা হইবে ?

হেমলতা। ঈশ্বর তাহা না করুন, কিন্তু যদি হয়, তাহার একটা উপায় এখন হইতে করা উচিত। বিজ্ঞানের মতে, কোনও ব্যাধির প্রতীকার করিতে হইলে তাহার "টীকা" লইতে হয়। যেমন গোবীজ বসন্তের "টীকা"। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া "বৈধব্যের টীকা" আবিষ্কার করিয়াছি।

৪

হেমলতার অসীম বিজ্ঞানব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে রামহরির কোনও সন্দেহ রহিল না। তিনি সাহ্লাদে কহিলেন, 'বন্ধু! এমন স্ত্রী কপালে জুটিয়া উঠা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির উপর নির্ভর করে। সে অন্তরের সহিত আমাকে ভালবাসে, নচেৎ "বৈধব্যের টীকা" লইবার জন্য এত ব্যগ্রতা কেন ?'

বন্ধু। নিশ্চয়। কেবল নরেনকে সাবধান। নরেন এক. জন প্রবঞ্চক, কোনও প্রকারে ভুলাইয়া প্রতিবাসিনী রমণীদের নিকট হইতে পয়সা কড়ি সংগ্রহ করে। তাহার স্ত্রী বিধবা, সুতরাং খুব সম্ভবতঃ এই মহামণ্ডলীতে যোগদান করিবে।

রামহরি। (বিস্মিতভাবে) নরেন বাঁচিয়া থাকিতেও তাহার স্ত্রী বিধবা ?

বন্ধু। অর্থাৎ, নরেনের স্ত্রী পূর্ব্বে বিধবা ছিল, এবং এখন সধবা। তাহার ন্যায় সুন্দরী এ পাড়ায় কেন, কোনও দেশে আছে কি না সন্দেহ। নরেন উপন্যাস লেখে, এবং সে কবিতা লেখে। মাথামুণ্ড লিখিয়া উভয়ে খুব পসার করিয়াছে ; মাসে শত শত টাকা সঞ্চয় করিতেছে।

রামহরি বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া হেমলতার নিকটে গেলেন। 'দেখ, একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। আমাদের পাড়ায় নরেন বলিয়া একটা

লোক আছে, সে কবিতা লেখে। লোকটা বদ্, এবং স্ত্রীলোক দেখিলেই হাসে। সাবধান।'

হেমলতা। তবে তাহার স্ত্রী বোধ হয় পুরুষ দেখিলেই কাঁদে। তোমার উচিত, পূর্ব্বে তাহার তদন্ত করা। কোনও পুরুষ দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়া যদি বিধবা ঘরে আনে, তবে তাহার হাসাই স্বাভাবিক। এবং বিধবা স্ত্রী যদি পুনরায় বিবাহ করে, তবে তাহার কাঁদাই স্বাভাবিক। এটা বিজ্ঞানসম্মত। বোধ হয়, তুমি পূর্ব্বে জানিতে না।

রামহরি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে কথাটা নূতন। তিনি বলিলেন, 'না।'

কোথা হইতে রামহরির মনের মধ্যে একটা ব্যথা লাগিল। নরেনের যদি তাহাই স্বভাব হয়, তবে হয় ত সে-ই হাসি দেখিয়া হাসিয়াছিল। 'সে' কে? পূর্ব্বপক্ষের স্ত্রী। হয় ত নরেনের হাসির অর্থ,—তোমার স্বামী একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার। কিন্তু তাহাও কি একটা চরিত্রগত দোষ নহে, এবং তাহার জন্ম কি উভয়েই দোষী নহে?

সেদিন প্রবীণা (তাঁহার শ্যালিকা) আসিল; রাজা বাসীয়া বৃন্দাবনী নামাবলী ধারণ করিয়া আসিলেন। হেমলতার বশ পাড়ায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। অনেক স্ত্রীলোক আসিল। নরেনের স্ত্রী নলিনী আসিল। নলিনী সুন্দর কট্‌লেট ভাজিতে পারে, পুডিং তৈয়ারী করিতে পারে, এবং পার্শী, মাদ্রাজী, বোম্বাই ও কাশ্মিরী, নানাদেশীয় খাদ্যাদি রন্ধন করিতে পারে। বাসীয়া লাউঘণ্ট, মোচার ডালনা, মোলায়েম কচী লুচী ও বত্রিশপ্রকার ব্যঞ্জনাদি (চাঁদ সওদাগরের ইতিহাসে উক্ত) রাঁধিতে সুপটু। বসুজার গৃহ একটা বিরাট রন্ধনশালায় পরিণত হইল। অগাধ ঐশ্বর্য্যের সম্ভার আরম্ভ হইল। সারি সারি সুন্দর জলখাবার, নানাবিধ সরস ও অদ্ভুত খাদ্য, রাশি রাশি প্রস্তুত হইয়া পুরাতন নির্জ্জন গৃহের শোভাসংবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

বিধবাগণ এক দিকে নিরামিষ, এবং সধবাগণ অন্য দিকে আমিষাদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত। বাদ্যধ্বনি অবিরত নিনাদিত। নরেনের স্ত্রী বস্ত্রাবৃত রেকাবীগুলি নানাবিধ খাদ্যে পরিপূর্ণ করিয়া অগোচরে গৃহের দিকে (খিড়কীর দ্বার পার করিয়া) সরাইতে লাগিল।

হেমলতা গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজিতা। বিধবা সধবাগণের আশীর্ব্বাদে প্রণীতা। এক মাস ধরিয়া বসুজা মহাশয়ের বাড়ীতে পাড়ার লোকের একবেলার আহারের সংস্থান হইতেছিল।

কেবলমাত্র যদু ও তাহার স্ত্রীর নিরানন্দ। কারণ, হেমলতার সহিত তাহাদের চালাকী চলিত না। বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের ভার নরেনের স্ত্রীর উপর। রামহরি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাবপত্রের ফর্দ্দ পরীক্ষা করিয়া এবং বাজার-দর যাচিয়া তাহার কোনও দোষ ধরিতে পারিলেন না।

যদুর স্ত্রী ক্ষেমঙ্করী ইহাতে জ্বলিয়া উঠিল।

'আমার বোধ হয় নরেনের স্ত্রী রামহরিকে গুণ করিয়াছেন'

যদু। কিংবা নরেন আমার উপর টেক্কা দিয়াছে' আচ্ছা, ইহার প্রতিশোধ লইব।

৫

নরেনের স্ত্রী নলিনী এখন হেমলতার 'সই'। 'বিধবা-মহামণ্ডলী' নামক সভার সেক্রেটারী নলিনী, এবং প্রেসিডেণ্ট রাঙ্গা মাসীমা। তাহারই ব্রাঞ্চ (শাখা) 'বৈধব্য-টীকা ইনস্টিটুট্' নামক সমিতির সেক্রেটরী হেমলতা।

এই বিরাট সম্মিলনীর উদ্দেশ্য পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এখন ইহার সম্বন্ধে হেমলতার নোট এই ;—'বিংশশতাব্দীর মৃত্যুসংখ্যার আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পূর্ব্বে অধিকাংশ স্বামীরই জীবদ্দশা শেষ হয়। ইহার কারণ ত্রিবিধ ;—প্রথমতঃ সাংসারিক জঞ্জাল। যথা, আয় ব্যয়ের হিসাব, পুত্রকন্যাদায়, সামাজিক ও রাজনৈতিক মীমাংসায় মস্তিষ্ক-সঞ্চালন ও তজ্জনিত দুর্ভাবনা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগের সূত্রপাত। দ্বিতীয়তঃ, নৈতিক অবনতি। যথা, চরিত্রগত দোষ, স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ, পরস্ত্রীর রূপ লাবণ্য প্রভৃতির আলোচনা, অভিনয়াদি-দর্শন, এবং অশ্লীল কাব্য ও উপন্যাসাদি পাঠ। তৃতীয়তঃ, আধ্যাত্মিক অবনতি। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির হ্রাস, মানবের প্রতি স্নেহশূন্যতা ও স্বার্থপরতা। অতএব, সহধর্ম্মিণীগণের সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রতীকার কর্ত্তব্য। স্বামীর শ্রমলাঘবের চেষ্টা সকলেরই করা উচিত। আয়ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি তাঁহার হস্ত হইতে হস্তান্তরিত করা প্রথম সোপান। প্রাণপণে সেই চেষ্টা কর্ত্তব্য। চরিত্রগত দোষ বিদূরিত করিতে হইলে যে উপায় অবলম্বনীয়, তাহা গুপ্তভাবে আলোচ্য। চরিত্র সংশোধিত হইলে আধ্যাত্মিক পথ নিষ্কণ্টক হইবে। ফলে যাহাতে পুরুষবর্গ স্ব স্ব দোষগুলি বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন, তদনুরূপ অনুষ্ঠান বিশেষ আবশ্যক।

'স্ত্রীলোকের মনের বল নাই। শিক্ষা বিহনে ও প্রাকৃতিক সংগঠনের

ওপে তাহারা আদর্শ স্বামী দেখিতে না পাইয়া হিষ্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহার প্রধান ঔষধ, আহার। লজ্জার বশবর্ত্তিনী হইয়া আহার কমাইয়া দেওয়া জ্ঞানহীনা নারীর কার্য্য। শ্রমবৃদ্ধির সহিত ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে দস্তরমত আট দশবার আহার কর্ত্তব্য। স্বামীকে লুকাইয়া আহার করা অত্যন্ত অযথা প্রথা। সম্মুখে খাইবে; পাত হইতে কাড়িয়া লইবে; ক্রমাগত নূতন নূতন খাদ্যের আবিষ্কার করিবে। ইহাতে স্বামীরও ক্ষুধা বাড়িবে। প্রীতিও বাড়িতে থাকিবে।

'এইরূপে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। সর্ব্বদা সুরুচিমিশ্রিত হাস্যরস ও সুখদুঃখবিমিশ্রিত গাম্ভীর্য্যরসের অবতারণাও আবশ্যক। আমরা যে বৈধব্যের টীকা লইতে বলিয়াছি, তাহা মানসিক টীকা। অর্থাৎ, স্বামীর অভাবে স্বামিহীনা বিধবার যে জীবনব্যাপী সুদীর্ঘ মর্ম্মান্তিক ক্লেশ, তাহা কল্পনা করিয়া নিশাকালে শয্যাশায়িনী হইবে। আমি যাহাকে চাহি, সে থাকিয়াও নাই। আমার হাত ধরিয়া যে পরলোকের গহন অন্ধকারময় পথে লইয়া যাইবে, সে হাত অন্বেষণ করিয়াও পাইতেছি না। বহু 'জনমে'র যে সাধ অপরিপূর্ণ, তাহা সে পুরাইতে চাহে না। জীবনের পদে পদে যে ভুল ও ভ্রম হয়, সে মিটাইতে চাহে না। সে নাই। সে ছিল, কিন্তু নাই। ইহাই দুঃখ। ইহাই নীরব নিশীথিনীর অশ্রুকণা। শিয়রের আলুলায়িত অশ্রুধারাসিক্ত কেশ-গুচ্ছ প্রভাত-সূর্য্যের কিরণে শুষ্ক করিয়া সংসারের নশ্বরতা স্মরণ করিবে। দিবসে কর্ম্মস্থলে সম্পূর্ণভাবে বিচরণ করিবে।

'এই যে বসন্তকাল, যখন চঞ্চল জীবন শিরায় শিরায় ও শোণিতকণায় লুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় (কিংবা বৎসহীনা গাভীর ন্যায়?) জীবন-দেবতাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, বিশ্বের সৌন্দর্য্য মানস-গগন ছাইয়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল জীবকে আত্মহারা করিয়া তুলে, তখন বিশেষরূপ সাবধান। এই সময় তিক্ত ও কটুরস আহার্য্য। নিম্ব বৃক্ষের সুকোমল কিশলয় ঘৃতে ভাজিয়া মধ্যে মধ্যে ভোজন করিবে। যাহার রসকস্ বিরক্তিজনক, এহেন কাব্য ও উপন্যাস, কিংবা অভাবে জীবনরসপূর্ণ রাজস্থান, কিংবা সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসাদি পাঠ করিবে। অত্যন্ত ভয় পাইলে, কিংবা দুঃখে অধীর হইলে, মনে রাখিও,— আমরা অনাথা।

সম্মুখে ১লা এপ্রেল। সে দিন সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সকলের বুদ্ধি-প্রাখর্য্যের পরীক্ষা সেই দিন।'

A

হেমলতার ছোট ভগ্নী প্রমীলা দিদির নোটগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছিল, এবং বৃদ্ধা রাঙ্গা মাসীমা গ্রীবাসঞ্চালনপূর্ব্বক তাহার অনুমোদন করিতেছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ নলিনী দেবীর মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল।

৬

হেমলতা স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, 'আমি মিস্ দাসকে ডাকিয়া আনি। মাসীমা ও প্রমীলা শুশ্রূষা করিতে থাকুন।' ইহা বলিয়াই হেমলতা লেডী ডাক্তারের বাটীতে চলিয়া গেলেন।

রামহরি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিলেন, 'যদুর স্ত্রীকে ডাকিলে ভাল হয়; সে মূর্চ্ছারোগের অনেক ঔষধ জানে।'

সকলের সম্মতিক্রমে যদুর স্ত্রী ক্ষেমঙ্করী আসিয়া নলিনীর শিয়রে বসিল। যদু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি? সাংঘাতিক নয় ত? যদি তাহাই হয়, তবে নরেন বাবুকে ডাকিলে হয় না?'

যদুর স্ত্রী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, 'প্রমীলা, বসুজা মহাশয়কে বল যে, কোনও ভয় নাই। একালে ছোট ছোট মেয়েরা কবিতা লিখিয়া, চা খাইয়া, কট্‌লেট খাইয়া এই সব রোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। নলিনীর বয়স সবে সতের বৎসর, সারাদিন কেবল কাগজ কলম লইয়া বসিয়া থাকে, তাহার উপর এই সৃষ্টিছাড়া সম্মিলনীর পরিশ্রম, এরূপ ক্রমাগত চলিলে প্রাণ লইয়া টানাটানি হইবে।'

রামহরি কিঞ্চিৎ অন্তরাল হইতে বলিলেন, 'নিশ্চয়।'

যদুর স্ত্রী সাহস পাইয়া আরও কহিল, 'এসেন্স্ ও ল্যাভেণ্ডারের ছড়াছড়ি! তেল ও জলের লেশমাত্র ব্যবহার নাই। এই যে অতুল রূপ, তা মাটী হইয়া যাইতেছে। ক্রমে দেহ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইবে। যক্ষ্মাকাশের সূত্রপাত হইবে। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, চারিটি অন্নের সহিত মৎস্যের ঝোল, ইহাই তাহার খাদ্য। কিন্তু কোথাকার 'করি', কটলেট্, চপ্, ডিম, পুডিং,—মা গো! ইহাতে কি জাতিধর্ম্ম থাকে?'

প্রমীলা বাধা দিয়া বলিল, 'আমরা ত মুরগী ছুঁই না; কেবল চিংড়ীমাছ ও হাঁসের ডিম খাই।'

যদুর স্ত্রী। (সক্রোধে) যাই খাও মা, তোমাদের গতিক ভাল নয়। তের বৎসরের মেয়ের তর্ক বিতর্ক কেন?

প্রমীলা বছুর স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। ইহাতে ক্ষেমঙ্করী আরও জলিয়া উঠিল।

মাসীমা উত্তরকে প্রশমিত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, 'নলিনীর চক্ষুর তারা উল্টাইয়া গিয়াছে, দাঁতে দাঁত বসিয়া গিয়াছে। আপনি একটু ভাল করিয়া দেখুন।'

নলিনীর সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ যথাসাধ্য আলুলায়িত করিয়া বছুর স্ত্রী তাহার ললাটে ও মুখে জলধারা সেচন করিতে লাগিল। ক্রমে বায়ুসঞ্চালনে কম্পিত নয়ন-পল্লব উন্মুক্ত হইয়া ভ্রূ-মেঘের কোণে সন্ধ্যাতারকার স্থায় সুনয়নতারকা প্রকাশিত করিল। নলিনী চেতনা লাভ করিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল, এবং লজ্জাভিভূতা হইয়া বলিল, 'আমার মাথার অঞ্চল টানিয়া দাও।'

বছুর স্ত্রী প্রমীলাকে কহিল, 'উঁহাকে একটু সরিয়া যাইতে বল।'

রামহরি প্রমীলাকে ডাকিয়া কহিলেন, 'ওদের বল, আমি সরিয়া গিয়াছি।' কিন্তু ক্রমে দেখিলেন যে, নিজে তখনও সরিয়া যান নাই, এবং ক্রমে সরিতে লাগিলেন।

প্রমীলা বলিল, 'বসুজা মহাশয়, বেলা বারোটা, দিদি এখনও বিস্‌দাসকে লইয়া ফিরিলেন না কেন? নরেন বাবুদের বাড়ীতে যান নাই ত?'

রামহরি। (আশ্চর্য্য হইয়া) তিনি কি নরেন বাবুদের বাড়ীতে যান?

প্রমীলা। আশ্চর্য্য নাই, হয় ত খবর দিতে গিয়াছেন। আহা! নরেন বাবু ও নলিনী দিদি—দুই জনেরই দুঃখের জীবন। সাহিত্যের ব্যবসা বড় কষ্টের ব্যবসা। পেটের জ্বালায় ভাব জুটাইয়া লিখিতে হয়।

রামহরি। শুনিয়াছি, বেশ ত পয়সা হয়।

প্রমীলা। কোথায়? গত মাসে ত্রিশ টাকা হইয়াছিল। এ মাসে এখনও কিছু হয় নাই।

৭

রামহরি আহার করিয়া বহির্ব্বাটীতে বসিলেন। তখনও হেমলতা ফিরিয়া আসে নাই। প্রমীলা একখানা বই লইয়া পড়িতে বসিল।

রামহরি। ওখানা কি উপন্যাস?

প্রমীলা। কৃষ্ণকান্তের উইল। ইহাতে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর কথা আছে। আপনি পড়েছেন কি?

ইতিমধ্যে বছুর স্ত্রী মাসীমার নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া যাব হইতে

নিক্রান্ত হইতেছিল। 'ছি! মেয়েছেলেরা উচ্ছন্ন যাইতেছে। এই বয়সেই ভগ্নীপতির নিকট মোহিনীর কথা!'

কিয়ৎক্ষণ পরেই হেমলতা আসিয়া গম্ভীরভাবে কহিল, 'মিস্ দাস্‌কে পাওয়া গেল না। পিসী! সই এখন কেমন?'

প্রমীলা। এখন বেশ। আমি দেখিয়া আসি।

রামহরি। তুমি নরেনের বাড়ীতে যাও?

হেমলতা। যাওয়া উচিত। আসিবার সময় তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই। নরেন বাবু একটা কিছুতকিমাকার, কাণা ও কালো মানুষ, কিন্তু বেশ কবিতা লেখেন। তাঁহার ত লিখিবারই কথা। ঘরে যাহার সই নলিনীর মত ভুবনমোহিনী স্ত্রী, যাহার কথায় বীণাঝঙ্কার, যাহার হাসিতে সুধা, যাহার প্রত্যেক গতিতে ছন্দ ও প্রত্যেক ভাবে কাব্য ও গান, সে রকমটি থাকিলে কে না কবি হয়?'

রামহরি একটা উত্তর দিবেন, স্থির করিতেছিলেন, কিন্তু হেমলতা অতিশয় দৃঢ়স্বরে বলিল, 'কোন উত্তরও দিও না। এখন একটা দরকারী কথা আছে। আমরা আগামী মঙ্গলবারে একবার রাণাঘাটে যাইব। মাসীমা ও প্রমীলা সঙ্গে যাইবেন। সই যাইবে। সেখানে আমাদের প্রথম সম্মিলনী হইবে। তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, যাইতে পার। সন্ধ্যার পর বনভোজন।'

রামহরি। নরেন বাবু যাইবেন?

হেমলতা। না।

রামহরি। পুরুষদিগের সেখানে যাইবার যখন কোনও দরকার নাই, তখন আমায় গিয়া কি হইবে?

হেমলতা। আচ্ছা, তবে যেও না।

যদুর স্ত্রী অন্তরাল হইতে উভয়ের কথা শুনিতেছিল। সুযোগ পাইয়া অপসৃত হইয়া পড়িল।

রামহরির অভ্যাসগত দিবানিদ্রা সেদিন আসিল না। অনেক প্রকার চিন্তা ও দুশ্চিন্তা নিদ্রার স্থান অধিকার করিল।

যদু উপস্থিত। উভয়ের উদ্যানে গমন ও ভ্রমণ।

রামহরি যদুর নিকট নরেনের স্ত্রী মূর্চ্ছার ইতিহাস ও যদুর স্ত্রীর সাধারণ চিকিৎসা প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া অবশেষে কহিলেন, 'আমার বোধ হয়, উঁহার (হেমলতার) নরেনের বাড়ীর দিকে যাওয়া ভাল হয় নাই।'

বন্ধু মৃদুভাবে বলিল, 'আর কিছু নয়, তোমার স্ত্রীর অনুকম্পার উত্তরে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া লইতেছে। এই যে সম্মিলনী, ওটা একটা হাস্যজনক ব্যাপার। 'বৈধব্যের টীকার' মূলে কোনও অর্থ নাই। এই রাণাঘাটে প্রকাণ্ড সম্মিলন, বনভোজন ও বক্তৃতা, ইহাতে জগতের ও সমাজের কি উপকার? কেবল তোমার পয়সা নষ্ট!'

রাম। আমি পয়সার জন্য ভাবি না; কিন্তু ইহাতে যথার্থ চরিত্র-সংশোধন ও ধর্ম্মে কত দূর মতি হইতেছে, তাহা সন্দেহস্থল।

রাণাঘাটে রামহরির শ্বশুরালয়। অদ্য সন্ধ্যাকালেই হেমলতা, মাসীমা ও প্রমীলার যাইবার কথা। প্রমীলা আসিয়া বলিয়া গেল, 'বসুজা মহাশয়! আমরা ব্যারাকপুর হইয়া রাণাঘাটে যাইব। আপনি সাবধানে থাকিবেন। বাড়ীর চাবি আপনার নিকট রাখিয়া গেলাম।'

৮

বাড়ীতে এখন কেহ নাই, কেবল রামহরি। ডাকঘর হইতে একখানা পত্র আসিল। রামহরি খুলিয়া পাঠ করিলেন।—

'শীঘ্র টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে ৩০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিও; সম্মিলনীতে অনেক লোক আসিবে। অনেক দরিদ্রা বিধবার রেলভাড়া দিতে হইবে। তোমাদিগের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। নরেন।'

[পুনশ্চঃ—সম্মিলনী গিরিজাবাবুর বাটীতে হইবে।—কল্য সন্ধ্যাকাল]

উপরে 'শ্রীমতী হেমলতা দেবী'। পত্রখানি খুলিয়া পড়া রামহরির অভিপ্রেত ছিল না; কারণ, রাণাঘাটের মোহরাঙ্কিত পত্র সে পড়িত না। অদ্য এই অভিনব পত্র দেখিয়া রামহরির সন্দেহানল প্রজ্বলিত হইল। প্রথম সন্দেহ, তাঁহার স্ত্রীর মিথ্যা কথা। নরেন যাইবে না, ইহাই যদি সত্য হয়, তবে নরেন রাণাঘাট হইতে পত্র লিখিল কি করিয়া?

'ইহার একটা তদন্ত যে নিশ্চয় করা উচিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।' প্রথমতঃ, মামলাটি সুপরিপক্ক করিবার জন্য রামহরি তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রবাবুর নামে টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে তিন শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন;

রাত্রিকালে রামহরির নিদ্রা হইল না। গিরিজা বাবু নরেনের আত্মীয়, তাঁহার বাড়ীতে সম্মিলনী কেন? ব্যারাকপুরে যাইবার মতলব কি?

অজানিত তমসাচ্ছন্ন বনে ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় রামহরি নানাবিধ দুর্ভাবনার ঘাতপ্রতিঘাতে ও নানাবিধ সন্দেহ-কণ্টকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও শ্রান্ত হইয়া

গতজীবন, বর্ত্তমান জীবন ও ভবিষ্যৎ জীবনের সমালোচনায় রাত্রি অতিবাহিত করিল।

প্রভাতে যদুনাথ আসিলে রামহরি কহিল, 'আমি রাণাঘাটে যাইব, তুমি বাড়ীর চাবি রাখ।'

যদু কোনও কারণ না জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, 'যদি নিতান্তই যাইতে হয়, তবে দাও।'

সেই মঙ্গলবার ১লা এপ্রেল দ্বিপ্রহরের ট্রেণেই রামহরি রাণাঘাটে রওনা হইয়া গিরিজাবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত। গিরিজাবাবু এক মাস হইল সপরিবারে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছেন!

নিমেষের মধ্যে রামহরি শ্বশুরালয়ে উপস্থিত। সেখানেও জন মনুষ্য কেহই নাই!

অতিশয় চীৎকার করিয়া রামহরি ডাকিলেন, 'এ বাড়ীতে কেহ আছে?'

এক জন বৃদ্ধ চাকর আসিয়া রামহরিকে দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিল। 'জামাইবাবু অদ্য এখানে! কর্ত্তা, মা ও বড় দিদি—সকলেই সকালের গাড়ীতে কলিকাতায় রওনা হইয়াছেন।'

রামহরি। আমার বাড়ীতে?

ভৃত্য। হাঁ। অদ্য সেখানে সম্মিলনী।

রামহরি বিকট গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, 'সম্মিলনী অধঃপাতে যাউক। আমাকে ডাকঘর দেখাইয়া দে।'

শকটারোহণে ভৃত্য সহ ডাকঘরে উপস্থিত হইয়া রামহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কল্য একটা টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডার এখানে আসিয়াছিল?'

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, 'হাঁ।'

রামহরি। কে লইয়াছে?

পোষ্টমাষ্টার খাতা খুলিয়া বলিল 'নরেনবাবু।' 'নরেনবাবুকে জানেন?' পোষ্টমাষ্টার। 'তিনি ডাকঘরেই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে চিনি না, এবং চেহারাও মনে নাই। কোনও সন্দেহের কারণ ছিল না; কারণ, তিনি জানিতেন যে, রামহরিবাবুর নিকট হইতে টাকা আসিবে। এটা তাঁহার স্ত্রীর সম্মিলনীর খরচের জন্য।'

সকলেই সম্মিলনীর কথা জানে, অথচ জুয়াচুরী চলিতেছে! ইহা লইয়া

যদু মৃদুভাবে বলিল, 'আর কিছু নয়, তোমার স্ত্রীর অনুকম্পার উভয়ে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া লইতেছে। এই যে সম্মিলনী, ওটা একটা হাস্যজনক ব্যাপার। 'বৈধব্যের টীকার' মূলে কোনও অর্থ নাই। এই রাণাঘাটে প্রকাণ্ড সম্মিলন, বনভোজন ও বক্তৃতা, ইহাতে জগতের ও সমাজের কি উপকার? কেবল তোমার পয়সা নষ্ট!'

রাম। আমি পয়সার জন্য ভাবি না; কিন্তু ইহাতে যথার্থ চরিত্র-সংশোধন ও ধর্ম্মে কত দূর মতি হইতেছে, তাহা সন্দেহস্থল।

রাণাঘাটে রামহরির শ্বশুরালয়। অদ্য সন্ধ্যাকালেই হেমলতা, বাসীরা ও প্রবীণার যাইবার কথা। প্রবীণা আসিয়া বলিয়া গেল, 'বনুজা মহাশয়! আমরা ব্যারাকপুর হইয়া রাণাঘাটে যাইব। আপনি সাবধানে থাকিবেন। বাড়ীর চাবি আপনার নিকট রাখিয়া গেলাম।'

৮

বাড়ীতে এখন কেহ নাই, কেবল রামহরি। ডাকঘর হইতে একখানা পত্র আসিল। রামহরি খুলিয়া পাঠ করিলেন:—

'শীঘ্র টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে ৩০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিও; সম্মিলনীতে অনেক লোক আসিবে। অনেক দরিদ্রা বিধবার বেলকাড়া দিতে হইবে। তোমাদিগের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। নরেন।'

[পুনশ্চঃ—সম্মিলনী গিরিজাবাবুর বাটীতে হইবে।—কল্য সন্ধ্যাকাল]

উপরে 'শ্রীমতী হেমলতা দেবী'। পত্রখানি খুলিয়া পড়া রামহরির অভিপ্রেত ছিল না; কারণ, রাণাঘাটের মোহরাঙ্কিত পত্র সে পড়িত না। অদ্য এই অভিনব পত্র দেখিয়া রামহরির সন্দেহানল প্রজ্বলিত হইল। প্রথম সন্দেহ, তাঁহার স্ত্রীর মিথ্যা কথা। নরেন যাইবে না, ইহাই যদি সত্য হয়, তবে নরেন রাণাঘাট হইতে পত্র লিখিল কি করিয়া?

'ইহার একটা তদন্ত যে নিশ্চয় করা উচিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।' প্রথমতঃ, মামলাটি সুপরিপক্ব করিবার জন্য রামহরি তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রবাবুর নামে টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে তিন শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

রাত্রিকালে রামহরির নিদ্রা হইল না। গিরিজা বাবু নরেনের আত্মীয়, তাঁহার বাড়ীতে সম্মিলনী কেন? ব্যারাকপুরে যাইবার মতলব কি?

অজানিত তমসাচ্ছন্ন বনে ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় রামহরি নানাবিধ দুর্ভাবনার ঘাতপ্রতিঘাতে ও নানাবিধ সন্দেহ-কণ্টকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও শ্রান্ত হইয়া

গতজীবন, বর্ত্তমান জীবন ও ভবিষ্যৎ জীবনের সমালোচনায় রাত্রি অতিবাহিত করিল।

প্রভাতে যদুনাথ আসিলে রামহরি কহিল, 'আমি রাণাঘাটে যাইব, তুমি বাড়ীর চাবি রাখ।'

যদু কোনও কারণ না জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, 'যদি নিতান্তই যাইতে হয়, তবে যাও।'

সেই মঙ্গলবার ১লা এপ্রেল দ্বিপ্রহরের ট্রেণেই রামহরি রাণাঘাটে রওনা হইয়া গিরিজাবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত। গিরিজাবাবু এক মাস হইল সপরিবারে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছেন!

নিমেষের মধ্যে রামহরি শ্বশুরালয়ে উপস্থিত। সেখানেও জন মনুষ্য কেহই নাই!

অতিশয় চীৎকার করিয়া রামহরি ডাকিলেন, 'এ বাড়ীতে কেহ আছে?'

এক জন বৃদ্ধ চাকর আসিয়া রামহরিকে দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিল। 'জামাইবাবু অদ্য এখানে! কর্ত্তা, মা ও বড় দিদি—সকলেই সকালের গাড়ীতে কলিকাতায় রওনা হইয়াছেন।'

রামহরি। আমার বাড়ীতে?

ভৃত্য। হাঁ। অদ্য সেখানে সম্মিলনী।

রামহরি বিকট গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, 'সম্মিলনী অধঃপাতে যাউক। আমাকে ডাকঘর দেখাইয়া দে।'

শকটারোহণে ভৃত্য সহ ডাকঘরে উপস্থিত হইয়া রামহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কল্য একটা টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডার এখানে আসিয়াছিল?'

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, 'হাঁ।'

রামহরি। কে লইয়াছে?

পোষ্টমাষ্টার খাতা খুলিয়া বলিল 'নরেনবাবু।' 'নরেনবাবুকে জানেন?' পোষ্টমাষ্টার। 'তিনি ডাকঘরেই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে চিনি না, এবং চেহারাও মনে নাই। কোনও সন্দেহের কারণ ছিল না; কারণ, তিনি জানিতেন যে, রামহরিবাবুর নিকট হইতে টাকা আসিবে। এটা তাঁহার স্ত্রীর সম্মিলনীর খরচের জন্য।'

সকলেই সম্মিলনীর কথা জানে, অথচ লুকাচুরী চলিতেছে! ইহা লইয়া

প্রকাশ্যে তোলাপাড়া করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া রামহরি সেই ট্রেণেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৯

তাহা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় ছিল না। হয় টাকা কোনও জুয়াচোরের হস্তগত হইয়াছে, নচেৎ নরেন লইয়াছে। রাত্রি দশটার সময় কলিকাতায় পঁহুছিয়া রামহরি যদুকে ডাকিলেন। যদু তামাকু সেবন করিতেছিল।

রামহরি কহিল, 'যদু! আমি সমস্ত দিন আহার করি নাই। শীঘ্র বাড়ীর চাবি দাও, এবং তোমার স্ত্রীকে রন্ধনের যোগাড় করিতে বল। ইতিমধ্যে তুমি একবার নরেনের বাড়ীতে গিয়া দেখ—সে কোথায়। একটা ভয়ানক জুয়াচুরী ও জাল চলিতেছে। তাহার তদন্ত করা উচিত।'

যদু অতিশয় চিন্তাযুক্ত, তাহার মুখমণ্ডল শুষ্ক।

'নরেন বাবু বাড়ীতেই আছেন। তোমার বাড়ীতে সম্মিলনী চলিতেছে। আমার স্ত্রীও বোধ হয় সেইখানে। প্রচুর খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল, বোধ হয় এখনও কিছু থাকিতে পারে।'

রামহরি বেয়াকুবের ন্যায় যদুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'এ সকলের অর্থ কি?'

যদু অতিকষ্টে বলিল, 'আমিও কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার শ্বশুর শাশুড়ী সকলেই খাওয়া দাওয়া সারিয়া এই ট্রেণে রাণাঘাটে ফিরিয়াছেন। তাঁহারা কোনও প্রকারে খবর পাইয়াছিলেন যে, আপনি তাঁহাদিগের সহিত রাণাঘাটে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। নরেন বাবুর সহিত দেখা করা বৃথা, তিনি সমস্ত দিন বাড়ীতে বসিয়া কবিতা লিখিতেছেন। তাঁহার মাথা খারাপ।'

রামহরি। এ কথা তুমি ত পূর্ব্বে বল নাই?

যদু। বলা আবশ্যক হয় নাই। কবি হইলেই মাথার একটু গোলমাল থাকে। তিনিই টেলিগ্রাফ করিয়া সকলকে বারাকপুর হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, এবং সকাল বৈকাল হইতেই সম্মিলনী আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

রামহরি একটানে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। সেখানে প্রমীলা 'বড়দা মহাশয় এসেছেন!' বলিয়া প্রকাণ্ড চীৎকার পূর্ব্বক তাঁহার হস্তধারণ করিল।

বাটী মহাজনতাপূর্ণ। প্রায় দুই শত সধবা ও ত্রেত্রিশটি বিধবা। সকলেই ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া রামহরি বাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে সাধুবাদ দিতেছে

সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মাসীমা শীঘ্র আসিয়া বলিলেন, 'বাবা রামহরি, তুমি কি খাবে? অনেক প্রকার খাবার প্রস্তুত।'

রামহরি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, কোনও জটিল বিষয়ের মীমাংসার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আহার নিতান্ত আবশ্যক। সুতরাং তিনি সকল প্রকার খাদ্যই বেশ করিয়া খাইলেন। উত্তমরূপ উদরপূর্ত্তি হওয়াতে রামহরির চেহারা প্রসন্ন হইয়া আসিল, মনোমালিন্য দূর হইল। তখন তিনি ধীরভাবে গত দুই দিনের ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় বাড়ীর মধ্যে কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল। প্রমীলা আসিয়া ত্রস্তভাবে কহিল, 'বড়দা মহাশয়! শীঘ্র আসুন, যদু বাবুর স্ত্রী পাগলের ন্যায় বকিতেছে।'

বাস্তবিক তাহাই। আলুলায়িতকেশে, দীনবেশে, সজলনয়নে ক্ষেমঙ্করী কহিতেছে,—'ও গো! তোমরা সকলে আমাকে মুক্ত কর, পরিত্রাণ কর!'

রামহরি ব্যস্তভাবে কহিলেন, 'ব্যাপারখানা কি?'

মাসীমা রামহরিকে অন্তরালে লইয়া গিয়া কহিলেন, 'আমাদের অনুপস্থিত-কালে উনি বাড়ীর চাবি খুলিয়া বৌমার ঘরে গিয়াছিলেন; সেখানে একটা মানুষের কঙ্কাল দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। এই রকম অবস্থায় কতক্ষণ ছিলেন, জানি না; পরে আমরা ফিরিয়া আসিলে সম্বিৎ আরম্ভ হয়। তখন ঘর অন্ধকার ছিল, এখন বৌমা ঘরে গিয়া যদুর স্ত্রীকে এখনকার অবস্থায় পাইয়াছেন।'

রামহরি। নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকেরা চলিয়া যাউন, আমি ইহার বিশেষ তদন্ত করিতে চাহি।

১০

বিশেষ তদন্তপূর্ব্বক রামহরি যাহা জানিলেন, তাহা অদ্ভুত। যদুর স্ত্রীর স্বীকারোক্তি এই যে, তাহার পরামর্শমতে যদু রামহরিকে জাল পত্র লিখিয়া রাণাঘাটে লইয়া যায়, এবং হেমলতার পিতামাতাকে কলিকাতায় লইয়া আসে। এই সুযোগে যদু রামহরি-প্রদত্ত তিন শত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল; অপরন্তু, ক্ষেমঙ্করী হেমলতার ঘর খুলিয়া কিঞ্চিৎ অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। রামহরি সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ইতিমধ্যে নরেন বাবু কোনও প্রকারে আভাস পাইয়া আসন্ন বিপদের কথা বারাকপুরে নলিনীকে লিখিয়া পাঠান, এবং সমিতির স্ত্রীলোকগণ তৎক্ষণাৎ বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন।

প্রমীলার জবানবন্দীতে প্রকাশ পাইল যে, তাহার দিদি হেমলতা ও

নরেনবাবুর স্ত্রী নলিনী বদ্রুর স্ত্রীকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখিয়াছিল। হেমলতা ইণ্টারমিডিয়েট বিজ্ঞান-পরীক্ষার দেহতত্ব (ফিজিয়লজী) বিশদরূপে বুঝিবার জন্য একটি সমুণ্ড নরকঙ্কাল গৃহের বাতায়নের পার্শ্বে অনেক দিন হইতে রাখিয়া দিয়াছিল। বোধ হয়, ক্ষেমঙ্করী তাহাই দেখিয়া ভূত মনে করিয়া অজ্ঞান হইয়া যায়। সন্মিলনী-ভঙ্গের আশঙ্কায় হেমলতা ও নলিনী মূর্চ্ছিতার মুখে জলাদি-সেচনপূর্ব্বক তাহার চেতনাসঞ্চার করিয়া তাহাকে সেই ঘরে (নরকঙ্কাল অপসৃত করিয়া) বন্দী অবস্থায় রাখিয়া যায়। নানাবিধ আশঙ্কায় সে বরাবর চুপ করিয়াছিল, এখন সম্ভবতঃ স্বীয় কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবী বিকাশের সম্ভাবনা দেখিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। রামহরি অনেকটা বুঝিতে পারিলেন।

'যতই দোষী হউক না কেন, স্ত্রীলোকের অবমাননা মহাপাপ। উহাকে ছাড়িয়া দাও।'

কারাগৃহ হইতে মুক্ত হইয়া বদ্রুর স্ত্রী রামহরিকে আশীর্ব্বাদ করিল। 'বসুজা মহাশয়! আপনার মঙ্গল হউক। আমি মহাপাপী। আপনার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর নামে কুৎসা রটাইয়া আমিই এই বিবাহের সূত্রপাত করি। তাহার ফলাফল হাতে হাতে পাইয়াছি। আপনি বিবাহ করিয়া মস্ত ভুল করিয়াছেন। বাড়ীর লক্ষ্মী গিয়াছে—লক্ষ্মীশ্রী গিয়াছে। এখন কেবল ভূতের উপদ্রব।'

বদ্রুর স্ত্রী অন্ধকার ভেদ করিয়া নিজগৃহের দিকে দৌড়িল। সকলে শয়নাগারে প্রবেশ করিল, কিন্তু রামহরি বসু বহির্দ্বারে বসিয়া রহিলেন।

নক্ষত্রখচিত আকাশের তলে অন্ধকারময়ী দ্বিপ্রহরা নিশা। সেই নির্জ্জনতার মধ্যে অতীত জীবনের স্মৃতির সহিত রামহরির বুঝাপড়া! সকলেই নির্দ্দোষ। যে গিয়াছে, সে নির্দ্দোষ। নরেন নির্দ্দোষ। অন্নের অভাবে বদ্রু ও বদ্রুর স্ত্রী যাহা করিয়াছে তাহাও মার্জ্জনীয়। তবে দোষী কে? ভ্রম কাহার?

রামহরি দেখিলেন, ভ্রম তাঁহার নিজের। এক জন্মের ভুল কি জন্মান্তরে মিটানো যায় না?

রামহরি বুঝিতে পারিলেন যে, অভাবনীয় রূপে তিনি প্রকাণ্ড 'এপ্রেল-ফুল' নামক গর্দ্দভজাতীয় জীবে পরিণত হইয়াছেন।

রামহরির চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। উদ্যানে নিশির শিশির পত্রে পত্রে ঝরিতেছিল, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে হেমলতা আসিয়া রামহরির গলদেশ স্পর্শ করিবে। রামহরি বুঝিতে পারিলেন।

'হেমলতা! আমি তোমার সইকে দেখিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়াছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই অনুতাপে দগ্ধ হইয়াছি।'

হেমলতা ভূমির উপর জানু রাখিয়া স্বামীর পদযুগলে মস্তক লুকাইল। 'ছি! ও কথা বলিতে নাই। জীবনে অনেক ভুল হয়। আত্মহারা হইতেই আমরা মর্ত্ত্যে আসি। বোধ হয়, আমাদের জন্মভূমি অন্য কোথাও। যেখানে তোমার সতীলক্ষ্মী প্রথমা স্ত্রী গিয়াছে, আমার ইচ্ছা হয়, সেইখানে শীঘ্র যাই।'

রামহরি বলিলেন, 'আমারও সেই রকম ইচ্ছা করে।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

জাপানের শিক্ষা-প্রণালী।

বর্ত্তমান 'মিকাদো'র (জাপান-সম্রাট্) জনক মুৎসুহিতো সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে প্রায় পাঁচ ছয় শতাব্দী ব্যাপিয়া জাপানে সোগুণগণের প্রাধান্য ছিল। সে সময়ে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক্, যাহাতে কেহ শিক্ষিত না হইতে পারে, সেই দিকেই তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পাছে জাপানীরা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সোগুণদিগকে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করে, এই ভয়ই তাঁহাদের প্রবল ছিল। এই কারণেই সাধারণের শিক্ষার পথ জাপানে একরূপ রুদ্ধ ছিল বলিলেও চলে।

সম্রাট্ মুৎসুহিতো শাসন-ভার প্রাপ্ত হইয়াই জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই শিক্ষার ফলে জাপানে নব-জীবনের উন্মেষ হয়। অতঃপর স্বদেশভক্ত জাপানীদের আন্তরিক চেষ্টায় ও যত্নে জনসাধারণের সুবিধার জন্য দেশের সর্ব্বত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথম গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক নগরে আদর্শ-পাঠশালার প্রতিষ্ঠা এবং রাজবিধান দ্বারা রাজ্যস্থিত সকলকে উক্ত পাঠশালায়* বালকবালিকাদিগকে পাঠাইতে বাধ্য করিলেন। পল্লীবাসীদের পক্ষে বালক-বালিকাদিগকে সহরে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হওয়ায়, ক্রমশঃ তাঁহারা স্ব স্ব গ্রামে পাঠশালা বসাইতে লাগিলেন। এইরূপে অতি অল্পদিনের মধ্যেই জাপানের প্রত্যেক গ্রামে জাতীয় শিক্ষার সুব্যবস্থা হইয়া গেল।

শুধু পাঠশালায় প্রতিষ্ঠা করিয়াই জাপানীরা সন্তুষ্ট হইলেন না। পাঠশালায়

---

* বালকের বয়স ছয় বৎসর এবং বালিকার বয়স সাত বৎসর হইলেই, রাজবিধান অনুসারে তাহাদিগকে পাঠশালায় প্রেরণ করিতে হয়।

কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাহারও আলোচনা হইতে লাগিল। পরে স্থির হইল, Kinder Garten systemই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তখন ঐ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল।

কামোজিমা পার্ক

অনন্তর জাপানীরা পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনে সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক অতি সরল ভাষায় লিখিত। তাহাতে নানারূপ উপদেশপূর্ণ সুন্দর সুন্দর গল্প সন্নিবিষ্ট আছে। গল্পগুলি প্রায়শঃই

সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। পুরাকালের কীর্ত্তিমান্ স্বদেশভক্ত পুরুষদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত বিশদরূপে এই সমস্ত পুস্তকে বর্ণিত আছে। পুস্তকে সমস্ত গল্পের আদ্যোপান্ত না থাকিলে শিশুর মাতা পিতাকে উহা বলিতে হয়।

জাপানী বালক ও বালিকা।

অভিভাবকেরাও সকলেই সুশিক্ষিত। তাঁহারা সন্তানদিগের আগ্রহ বর্দ্ধিত করিবার জন্য গল্পগুলি বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া বলিয়া থাকেন। ইহাতে বালকবালিকাদিগের গল্প শুনিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠে; তাহারা স্বজাতীয়

ইতিহাসবিশ্রুত মহাত্মগণের কীর্ত্তিসমূহও স্মরণ করিতে থাকে। এইরূপে জাপ-শিশুগণ বাল্যকাল হইতে জাতীয় গৌরব শিক্ষা করিয়া থাকে।

বিদ্যালয়সমূহ যাহাতে বালকবালিকাগণের চিত্তাকর্ষক হয়, সে জন্য তথায় নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ ও খেলা ধূলার বন্দোবস্ত আছে। গীত-বাদ্যশিক্ষার ব্যবস্থাও সর্ব্বত্র আছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই জাতীয়-সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত থাকেন। স্কুলের ইউনিফরম্ অর্থাৎ উর্দ্দি (School uniform) পরিয়া ছাত্রগণ ছুটির পর যখন দলে দলে গান করিতে করিতে বিদ্যালয় হইতে বাহির হয়, তখনকার দৃশ্য কি মনোহর! দুই তিন জন ছাত্র একত্র হইলেই গান আরম্ভ করিয়া দেয়। ক্রমশ: পথের বালকবালিকাগণও তাহাদের সহিত যোগদান করিতে থাকে। যে সকল বালক বালিকা বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত হয় নাই, তাহারাও এই সমস্ত দেখিয়া, পাঠশালায় যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। জাপ-শিশু শৈশবেও মাতার নিকট হইতে নানারূপ সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক সপ্তাহে ছাত্রবর্গকে লইয়া শিক্ষকগণকে ভ্রমণে (Excursion) বাহির হইতে হয়। এই সময়ে ছাত্রগণকে নানারূপ কায়িক ক্লেশে অভ্যস্ত হইতে হয়। কোনও দিন ঝড় বৃষ্টিতে তাহাদিগকে কর্দ্দমময় প্রকাণ্ড ময়দান অতিক্রম করিতে হয়; আবার কোনও দিন হয় ত অত্যন্ত রৌদ্রে দুই তিন মাইল পথ পদব্রজে চলিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিতে হয়। বালকবালিকা-দিগকে নদী কিংবা সমুদ্রে পড়িয়া সাঁতার শিক্ষা করিতে প্রায়শ:ই দেখা যায়। অবশ্য, শিক্ষকগণ সর্ব্বদাই তাহাদের সঙ্গে থাকেন। তাঁহাদিগকেও ছাত্রগণের সহিত রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি ভোগ করিতে হয়। আমি একদা এক দল ছাত্রকে পর্ব্বতের পাদদেশে কৃত্রিম যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি। ইহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। শিক্ষক এক পার্শ্বে বসিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের বালকগণের মধ্যে কেহ সৈন্যাধ্যক্ষ, কেহ রণ-বাদ্যকর, এবং অন্যান্য সকলে যোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। আমি তাহাদের রণ-কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। জঙ্গলময় পর্ব্বতে শত্রুগণ কিরূপ ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, এবং তৎকালে কি বিধান আবশ্যক, শিক্ষকগণ তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। বলা আবশ্যক, এই সময়ে বালকগণ প্রকৃত যোদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া থাকে। তাহাদের হাতে ছোট ছোট ধারবিহীন তরবারি ও হাওয়ার বন্দুক (air-gun) দেওয়া হয়।

দুষ্ট বালককে যে প্রণালীতে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহাও আশ্চর্য্যজনক। কোনও বালক অন্যায় কাজ করিলে, তাহাকে প্রহার করা দূরে থাকুক, একটু রূঢ় ভাষাও ব্যবহৃত হয় না। দুই একটি সদুপদেশ দিয়া, পাঠশালায়

সমুদ্রকূলবর্ত্তী মুক্তি-স্নান।

ছুটী হইলে তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য আট্‌কাইয়া রাখা হয়। অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ যখন মহাকোলাহল করিয়া ছুটী ঘোষণা করে, এবং গান ধরিয়া বিদ্যালয়

হইতে বাহির হইতে থাকে, তখন আবদ্ধ বালকের মানসিক অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে!

ছোট ছোট বালকবালিকাকে কিরূপে আত্মসম্মান শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা

সাগরে সূর্য্য

একবার শুনুন। প্রহৃত হইয়া যদি কোনও ছাত্র অপর কোনও ছাত্রের বিরুদ্ধে শিক্ষকের নিকট নালিশ করে, তাহা হইলে, বিচারপ্রার্থীকে তিরস্কৃত হইতে হয়। মার খাইয়া চুপ করিয়া থাকা শুধু যে কাপুরুষের লক্ষণ, তাহা নয়।

জাপানীরা বলে, তাহাতে বংশেরও গৌরবহানি হয়। এই কারণেই উপহাসচ্ছলে গায়ে হাত দিলেও জাপানীরা স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করিয়া থাকেন।

শিশুগণের হস্তাক্ষর-শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। জাপানী ভাষায় অক্ষর অসংখ্য। প্রায় তিন সহস্রেরও উপর। জাপানীরা ঐ অক্ষরসমূহ খাকের কলম বা পেন দিয়া না লিখিয়া তূলি দ্বারা লিখিয়া থাকেন। বাল্যকাল হইতে তূলি দ্বারা অক্ষর লিখিতে হয় বলিয়া, প্রায় সকল জাপানীর হস্তই তূলিকা-ব্যবহারে বেশ অভ্যস্ত। বিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে তূলি দ্বারা কেবলমাত্র যে অক্ষর লিখিতে হয়, তাহা নহে। অনেক সময়ে উহার সাহায্যে তাহারা নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিয়া শিক্ষকের দ্বারা তাহা সংশোধন করাইয়া লয়। ছাত্রগণ চিত্রাঙ্কনে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইবার পর প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকিতে শিক্ষা করে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে 'ফুজি ইয়ামা' (Fuji San) জাপানীদের সর্ব্বাপেক্ষা আদরের বস্তু। বালকবালিকাগণ সর্ব্বপ্রথম এই পর্ব্বতটি আঁকিতে শিক্ষা করে। এই পর্ব্বতটি সাম্রাজ্যের মধ্যে উচ্চতায় দ্বিতীয় হইলেও, জাপানীরা উহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। কবিগণ এই পর্ব্বতপ্রবরের বন্দনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। চিত্রকরগণ উহার আড়ম্বরশূন্য তুষারাবৃত দেহ অঙ্কিত করিয়া তূলিকা সার্থক করিয়াছেন। আবার পাঠশালার ছাত্রেরাও বর্ণপরিচয়ের পূর্ব্বেই উহার সহিত পরিচিত হইয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করে। জাপানীরাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আদর করিতে জানে! ভারতবর্ষের হিমালয় পর্ব্বত জগতের মধ্যে বৃহৎ হইলেও, উহার গৌরব আমরা কয় জন অনুভব করিয়া থাকি?

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন।

[রামগঞ্জ-লিপি।]

প্রশস্তি-পরিচয়।

বাঙ্গালীর ইতিহাসের সহিত সম্পর্ক-সংযুক্ত যে সকল প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সম সাময়িক বিবরণ উল্লিখিত থাকায়, অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিংবদন্তী অপেক্ষা এই সকল প্রমাণ যে

অধিক নির্ভর-যোগ্য, তাহাতে সংশয় নাই। এই শ্রেণীর প্রমাণে জানিতে পারা গিয়াছে,—বাঙ্গালা দেশ যখন পাল-নরপালগণের শাসন-কৌশলে পরিচালিত হইত, তখন বাঙ্গালা দেশের চতুঃসীমার বাহিরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের শাসন-ক্ষমতার প্রবল প্রভাব অনুভূত হইত। তৎকালে পরাক্রমশালী সামন্তগণ আপন আপন সামন্ত-চক্রে স্বাধীন নরপালের ন্যায় শাসন-ক্ষমতা বিস্তৃত করিয়া, সার্ব্বভৌম নরপালের সহচররূপে মর্য্যাদা লাভ করিতেন। সামন্ত-সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। ধর্ম্মপালদেবের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে "মহাসামন্তা-ধিপতি"-উপাধিধারী রাজপুরুষের উল্লেখ আছে; সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" কাব্যে [৪।১৮] "মণ্ডলাধিপতি"-উপাধিধারী এক রাজ-সুহৃদের উল্লেখ আছে; এবং "রামচরিতে"র টীকায় [২।৮] "মহামাণ্ডলিক"-উপাধিধারী কাহ্নুরদেব নামক রামপালদেবের মাতুল-পুত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু "মহামাণ্ডলিকে"র প্রকৃত পদমর্য্যাদা ও শাসন-ক্ষমতা কিরূপ ছিল, এ পর্য্যন্ত সে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উপায় ছিল না।

সৌভাগ্যক্রমে সে কালের এক জন "মহামাণ্ডলিকে"র একখানি তাম্রশাসন বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির হস্তগত হইয়াছে। তাহা "মহামাণ্ডলিক" ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন। এই শাসনখানি বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত [দিনাজপুর জেলার] মালদোয়ার নামে সুপরিচিত রাজষ্টেটের দপ্তরখানায় বহুকাল হইতে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে; ইহার সহিত মালদোয়ার ষ্টেটের ভূসম্পত্তির সম্পর্ক থাকিবার জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে। মালদোয়ার ষ্টেট ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম বার কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের অধীন হইবার সময়ে, এই তাম্রশাসনখানিও তালিকাভুক্ত হইয়াছিল। মালদোয়ার ষ্টেটের বর্ত্তমান অধিকারী কুমার শ্রীযুক্ত ছত্রনাথ ও কুমার শ্রীযুক্ত টঙ্কনাথ চৌধুরী বি. এ. এই পুরাতন লিপির প্রতিকৃতি ও পাঠ পণ্ডিত-সমাজে প্রকাশিত করিবার অনুমতি দান করিয়া, ইতিহাসানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; এবং বহু রহস্যপূর্ণ বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধার-সাধনের সহায়তা করিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতিকে চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছেন।

তাম্রশাসনখানির সকল অংশ এক্ষণে বর্ত্তমান নাই; উর্দ্ধভাগের দক্ষিণাংশের কিয়দংশ এবং নিম্নভাগের দক্ষিণাংশের অল্পাংশ খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে যাহা কোদিত ছিল, তাহা আর দেখিবার উপায় নাই। কিন্তু বহুপূর্ব্বে তৈরভুক্ত পণ্ডিত বাচ্চা ঝা এই তাম্রশাসনের যেরূপ পাঠ মৈথিল-অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও মালদোয়ার রাজষ্টেটের দপ্তরখানায় রক্ষিত

হইতেছে। তাহার সকল শব্দ সকল স্থানে মূলানুগত না হইলেও, অধিকাংশ পাঠই শুদ্ধরূপে উদ্ধৃত। যে অংশের অক্ষর এক্ষণে আর দেখিতে পাইবার উপায় নাই, সেই অংশের পাদ-পূরণ-কামনায় পূর্ব্বোদ্ধৃত পাঠই বন্ধনীমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবে।

তাম্রপট্টের আয়তন ৯১/২ × ৮১/২ ইঞ্চ। সম্মুখ পৃষ্ঠে ২২ পংক্তি, এবং অপর পৃষ্ঠে ২৫ পংক্তি সংস্কৃত-ভাষা-নিবদ্ধ গদ্যপদ্যাত্মক লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাহা "৩৫ সম্বতের ১ মার্গদিনে"র লিপি। মালদোয়ারে ইহা ৩৫ বিক্রম-সম্বতের লিপি বলিয়া পরিচিত। বলা বাহুল্য, এই লিপি সেরূপ পুরাতন হইতে পারে না। প্রতিকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা সুব্যক্ত হইবে।

মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের শীর্ষদেশে "শ্রীপরাক্রমমূলস্ত" এবং তন্নিয়ে "নি" এই কয়েকটি অক্ষর উৎকীর্ণ আছে, এবং একটি ছত্রের চিহ্নও ক্ষোদিত আছে। ইহাই 'মুদ্রা' ছিল বলিয়া প্রতিভাত হয়। "শ্রীপরাক্রমমূলস্ত" শব্দ কাহাকে সূচিত করিতেছে, লিপিমধ্যে তাহা উল্লিখিত নাই। এই শব্দের দক্ষিণ পার্শ্বেই ছত্র চিহ্ন ক্ষোদিত আছে। তাহা [মহামাণ্ডলিকের পরাক্রমের মূল] সার্ব্বভৌম রাজাধিরাজকে সূচিত করিতেছে কি না, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন।

ঈশ্বর ঘোষের জাতি কি ছিল, তাহার উল্লেখ নাই। তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, এরূপ আভাসও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি যে কুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় শ্লোকে [চতুর্থ পংক্তিতে] তাহা "ঘোষকুল" বলিয়া উল্লিখিত আছে। তৎকালে তাহা "পৃথিবীতে প্রথিত" ছিল বলিয়া, জাতির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। পাল-নরপালগণও তাঁহাদিগের শাসন-লিপিতে জাতির উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা প্রথম শ্লোকে তাঁহাদিগের বৌদ্ধমতানুরক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। ঈশ্বর ঘোষ [তাঁহার তাম্রশাসনের ৩২ পংক্তিতে] ভগবান্ শঙ্করকে উদ্দেশ করিয়া দান করিবার উল্লেখ করিয়া, শৈব-মতানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

এই তাম্রশাসন সম্পাদিত করাইয়া, মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ নিব্বোক শর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকে [২৯ পংক্তি] একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। মালদোয়ারে জনশ্রুতি আছে,—নিব্বোক শর্ম্মা ঈশ্বর ঘোষের গুরুদেব ছিলেন। তিনি দান গ্রহণ করিয়া, তাম্রশাসন সহ গ্রামখানি তাঁহার গুরুদেবের চরণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই গুরুবংশই মালদোয়ারের রাজবংশ। এই

জনশ্রুতি মালদোয়ার-রাজবংশে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত আছে। ইহা সত্য কি না, তদ্বিষয়ে কোনও লিখিত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

কোন্ সময়ে এই তাম্রশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল, লিপি-বিচার করিয়াই তাহার মীমাংসা করিতে হইবে;—অন্য উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা এই শ্রেণীর লিপির পুনঃ পুনঃ পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার মীমাংসা করিতে পারিবেন। সকল স্থানে অবগ্রহ-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই; বর্ণ-বিন্যাসের ভ্রম প্রমাদ বিরল; সংস্কৃত-রচনাও ব্যাকরণদুষ্ট নহে;—রেফের চিহ্ন মাত্রার উপর দক্ষিণ দিকে অঙ্কিত; ত-কারের আকার প্রণিধান-যোগ্য, এবং রেফ-সংযোগে বর্ণের দ্বিত্ব যে ভাবে সাধিত হইয়াছে, তাহাও বিচারযোগ্য এই সকল কারণে, ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনকে পাল-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়-যুগের [খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর] লিপি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তৎকালে প্রাচ্যভারত পাল-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং ঈশ্বর ঘোষ যে পাল-সাম্রাজ্যের "মহামাণ্ডলিক" ছিলেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়।

গৌড়েশ্বরগণের তাম্রশাসন যে "জয়স্কন্ধাবার" হইতে প্রদত্ত হইত, তাম্রপট্টে তাহার নাম উৎকীর্ণ থাকিত। ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে "জয়স্কন্ধাবার" শব্দের উল্লেখ নাই; কিন্তু যে স্থান হইতে ইহা প্রদত্ত হইয়াছিল, [১০ পংক্তিতে] তাহার নাম উৎকীর্ণ আছে। সেই স্থানের নাম "ঢেক্করী"। পাল-নরপালগণের শাসনসময়ে "ঢেক্করী" একটি "সামন্ত-চক্র" বলিয়া পরিচিত ছিল। "রামচরিতে"র টীকায় [২।৫] প্রতাপসিংহ নামক এক "ঢেক্করীয়"-রাজের উল্লেখ আছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্. এ. "রামচরিতে"র ভূমিকায় ইংরাজীতে "ঢেক্করীয়" বলিয়া উল্লেখ করিলেও, মূল গ্রন্থের "ঢেক্করীয়" শব্দটি [মুদ্রাকর-প্রমাদে] গ্রন্থমধ্যে "ডেক্করীব" রূপে নাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—কাটোয়ার নিকটবর্তী অজয়নদের অপর তীরে যে "ঢাকুরী" নামক স্থান আছে, তাহাই পুরাকালের "ঢেক্করীয়"। (১) "রামচরিতে"র টীকায় কযঙ্গলের রাজা "কযঙ্গলীয়-রাজ" রূপে লিখিত থাকায়, ঢেক্করীয়-রাজকেও ঢেক্করীর রাজা বলিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য। সুতরাং স্থানের নাম "ঢেক্করীয়" না বলিয়া, "ঢেক্করী" বলাই

(১) Pratapa Sinha, the king of Dhekhariya or Dhekura on the other side of the river Ajaya near Katwa.—Ramacharita, Introduction, p. 14.

সঙ্গত। "ঢেক্করী" ঢেকুরা হইবার পক্ষে যে শব্দ-সাদৃশ্য বর্ত্তমান আছে, কেবল তাহার উপর নির্ভর করিয়া, উভয় স্থানকে এক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। কিন্তু ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোক হয়ত কিয়ৎপরিমাণে শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে পারিবে। (২) এই শ্লোকে ঈশ্বর ঘোষের বৃদ্ধ-প্রপিতামহের উল্লেখ আছে; কিন্তু তাঁহার নাম উল্লিখিত নাই। তিনি এক জন "অধিপ" ছিলেন। অক্ষর এখন কিছু অস্পষ্ট হইলেও, [রাখাল বাবু মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠের সাহায্যে] বুঝিতে পারা যায়,—তিনি "রাঢ়াধিপ" ছিলেন। তাঁহাকে "রাঢ়াধিপ" বলিয়া, তাঁহার পুত্রকে "নৃপবংশকেতু" এবং পৌত্র হইতে অধস্তন পুরুষগণকে "ঘোষকুল"-সম্ভূত, ও ঈশ্বর ঘোষকে "মহামাণ্ডলিক" বলায়, হয় ত প্রসঙ্গক্রমে এইরূপ ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত প্রকাশিত হইয়াছে যে,—ঈশ্বর ঘোষের ঊর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষের ব্যক্তি "রাঢ়াধিপ" ও স্বাধীন নরপতি ছিলেন; তাঁহার পর হইতে তদীয় বংশধরগণ "মহামাণ্ডলিক" হইয়াছিলেন; এবং রাঢ়ারাজ্য কালক্রমে পাল-সাম্রাজ্যের একটি "সামন্ত-চক্রে" পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ইহা অনুমানমাত্র। কিন্তু এই তাম্রশাসনখানি অনেক নিঃসন্দিগ্ধ ঐতিহাসিক তথ্যেরও আধার। ইহার প্রধান কথাই "ঘোষকুলে"র কথা,—সেই কুলের লোক এক সময়ে "রাঢ়াধিপ", এবং উত্তর-কালে "মহামাণ্ডলিক" ছিলেন। এখন তাহার কিংবদন্তীও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। "রাঢ়াধিপ" থাকিবার সময়ে পদমর্য্যাদা কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু "মহামাণ্ডলিক" ঈশ্বর ঘোষের পদমর্য্যাদা বড় অল্প ছিল না। তাঁহার আজ্ঞা অশেষ রাজরাজন্যকগণকে পালন করিতে হইত। তাঁহারও সামন্ত-সহচর ছিল; তাঁহার অধীনেও "বিষয়পতি" ও "ভুক্তিপতি" ছিল;— তাঁহারও কোট্ট [দুর্গ] ছিল; সেনাপতি-কোট্টপতি ছিল;—এক জন রাজাধি-রাজের প্রবলপ্রতাপ-বিজ্ঞাপক যে সকল "রাজপাদোপজীবী" থাকিত, মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষেরও সেই সকল "রাজপাদোপজীবী" ছিল। ঈশ্বর

---

(২) মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ (৩১ পংক্তি) "জটোদামাং রাধা" এই তাম্রশাসনোক্ত ভূমি দান করিয়াছিলেন। "জটোদা"-শব্দটিতে লিপিকরপ্রমাদ না থাকিলে, তাহাই ঢেক্করী নামক স্থানের নিকটবর্ত্তিনী নদী ছিল বলিয়া প্রতিভাত হইবে, এবং তাহার সাহায্যে ঢেক্করীর প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণীত হইতে পারিবে। পক্ষান্তরে, "জটোদা" অজয়ের পুরাতন নাম হইলে, অথবা "জটোদামাং," লিপিকরপ্রমাদে "জটোদয়াতাং" সূচিত করিতে পারিলে, তাঁহাকে গঙ্গার নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করিলে, ঢেক্করীকে অজয়তীরবর্ত্তী ঢাকুরা বলা চলিতে পারে। ঢেক্করী কোথায় ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে না পারিলেও, তাহার সহিত রাঢ়া-মণ্ডলের সম্পর্ক ছিল বলিয়াই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঘোষকে কায়স্থ বলা যায় কি না, এবং আদিশূরের আমন্ত্রণে পঞ্চব্রাহ্মণের সঙ্গে যাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, ঈশ্বর ঘোষকে তাঁহাদিগের বংশধর বলা যায় কি না? বলিতে পারিলে, আদিশূরকে কোন্ শতাব্দীতে স্থান দিতে হইবে? এই সকল কথার বিচার করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইবে। কুলশাস্ত্র-লেখকগণ বাঙ্গালার কায়স্থগণকে "শূদ্রবংশজ" বলিয়া যে "ত্রিবর্ণসেবক"-মর্য্যাদা দান করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃত-পক্ষে বাঙ্গালার পূর্ব্বতন কায়স্থগণের তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আভিজাত্য-মর্য্যাদা বর্ত্তমান ছিল কি না, তাহার রহস্যভেদে সমর্থ হইলে, ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন বাঙ্গালীর ইতিহাসকে এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিবে। যাঁহারা সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং প্রবৃত্ত হইবার যোগ্য পাত্র, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য "মহামাণ্ডলিক" ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের প্রতিকৃতি সংযুক্ত পাঠ ও সটীক বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে।

'মণ্ডল' শব্দ হইতে 'মহামাণ্ডলিক' শব্দ [পারিভাষিক অর্থে] ব্যবহৃত হইয়াছে। "বিষে" মণ্ডল-শব্দের বিবিধার্থ-বিজ্ঞাপনার্থ যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সে কালের 'মণ্ডল' নামক বিভাগের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা 'দ্বাদশ-রাজক' নামে কথিত হইত। যথা,—

সাহুণ্ডলে দ্বাদশরাজকে চ।
দেশে চ বিম্বে চ কদম্বকে চ।

ভরত অমর-টীকায় ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মেদিনী-কোষেও মণ্ডল "দ্বাদশরাজক" বলিয়া উল্লিখিত আছে। মণ্ডলের শাসন-কর্ত্তা "মণ্ডলেশ", "মণ্ডলাধিপতি", "মণ্ডলেশ্বর" প্রভৃতি নামে কথিত হইতেন; অভিধানে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কামন্দকীয় নীতিসারে [৮।১] দেখিতে পাওয়া যায়,—মণ্ডলাধিপের ও কোষ-দণ্ড-অমাত্য মন্ত্রি দুর্গাদি সমূহ ছিল। যথা,—

ঈশেচ: কোষদণ্ডাভ্যাং সামাত্য: সহ মন্ত্রিভি:।
দুর্গস্থ শ্চিন্তয়েৎ সাধু মণ্ডলং মণ্ডলাধিপ:।

ইহাতে মণ্ডলাধিপতি "দুর্গস্থ" থাকিয়া, মণ্ডল শাসন করিতেন বলিয়া পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম খণ্ডে [৮৬ অধ্যায়ে] দেখিতে পাওয়া যায়,—"মণ্ডলেশ্বরে"র পদমর্য্যাদা নৃপ-শব্দ-বাচক সাধারণ রাজ-রাজন্যকের পদমর্য্যাদা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। যথা,—

চতুর্যোজনপর্য্যন্ত মধিকারঃ নৃপস্য চ।
যো রাজা-তদ্দশগুণ: স এব মণ্ডলেশ্বরঃ।

স্বামী বিবেকানন্দ

Mohila Press, Cal.
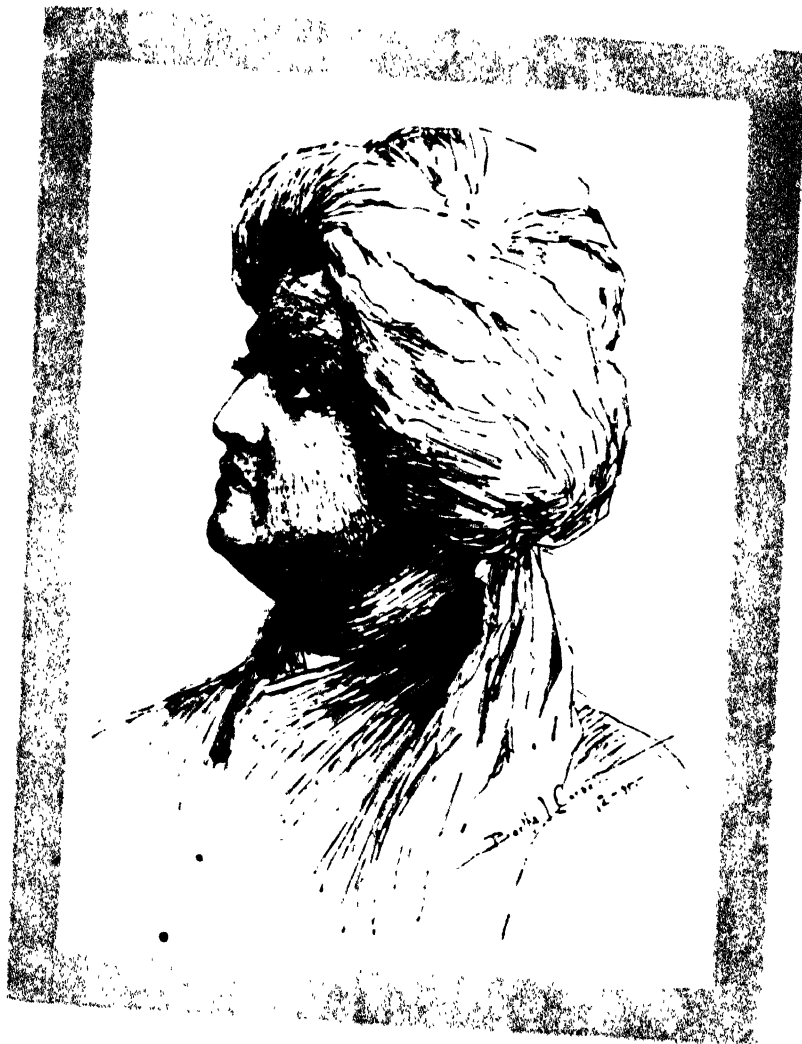
এই বচনের প্রমাণে, মণ্ডলেশ্বরও "রাজ" পদবাচ্য ছিলেন বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তাঁহার অধিকার সাধারণ "রাজ"-পদবাচ্য ব্যক্তির অধিকার অপেক্ষা শতগুণ অধিক ছিল। "মণ্ডলাধিপতিগণ" পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-রাজাধিরাজের "সামন্ত"-মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। সে কালের শাসনব্যবস্থায় রাজাধিরাজ "পরম ভট্টারক" ছিলেন; তাঁহার পরেই মণ্ডলাধিপতির স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

মাণ্ডলিক-শব্দ এই মণ্ডলাধিপতি শব্দেরই রূপান্তরমাত্র। মধ্যযুগের গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে "মাণ্ডলিক" ও "মহামাণ্ডলিক" শব্দ যে সত্য সত্যই প্রচলিত ছিল, "রামচরিত" কাব্যের যে অংশের টীকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "কয়ঙ্গলীয় মণ্ডলাধিপতি" প্রভৃতি রাজ-পুরুষগণ [টীকায়] "সামন্তাঃ" বলিয়া স্পষ্ট উল্লিখিত থাকায়, বুঝিতে পারা যায়,—তৎকালে "মণ্ডলাধিপতিগণ" বা "মাণ্ডলিকগণ" রাজাধিরাজের "সামন্ত"-মধ্যেই পরিগণিত হইতেন। "মহামাণ্ডলিক" ঈশ্বর ঘোষও এইরূপ এক জন "সামন্ত" ছিলেন; কাহার "সামন্ত" ছিলেন, তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ নাই। সামন্তগণের স্বাধিকারে, [স্বামিধর্ম্মের প্রচলিত নিয়মানুসারে] রাজাধিরাজের "রাজ্যসম্বৎ" প্রচলিত ছিল; কিংবা সামন্তগণের নিজের "রাজ্যসম্বৎ" প্রচলিত ছিল, তাহার মীমাংসা করিবার উপায় নাই।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে "মাৎস্যন্যায়" প্রচলিত হইয়াছিল। তারানাথ লিখিয়া গিয়াছেন,—সমগ্র দেশের একচ্ছত্র অধিপতি না থাকায়, সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া, অরাজকতার প্রশ্রয় দান করিতেছিল। ইহাতে বাহুবলই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সবলের কবলে দুর্ব্বল-দল নিপীড়িত হইতেছিল। (৩) ধর্ম্মপালের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে এবং তারানাথের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—সেই "মাৎস্যন্যায়" দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রকৃতি-পুঞ্জ গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। (৪) এইরূপে পাল-রাজগণের গৌড়ীয় সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল ঐতিহাসিক বিবরণ স্মরণ করিলে মনে হয়, যিনি "মাৎস্যন্যায়ে"র বিপ্লবযুগে "রাঢ়াধিপ" ছিলেন, তিনি বা তাঁহার "নৃপবংশকেতু" পুত্র, গোপালদেবের নির্ব্বাচন-সময়ে, [দেশের কল্যাণকামনায়] স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া, "মহামাণ্ডলিক"

(৩) গৌড়রাজমালা।

(৪) গৌড়লেখমালা।

হইয়া, "সামন্ত"-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। এরূপ অনুমানের অনুকূল স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলেও, নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়,—এই তাম্রশাসনে ঘোষ-কুলের সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের যেরূপ সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা উল্লেখযোগ্য গৌরবের সম্পর্ক ;—একালের ঘোষকুল এ পর্য্যন্ত যত গৌরব লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহার তুলনায়, অধিক বলিয়াই কথিত হইবার যোগ্য। গৌড়ীয় সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল প্রাচ্য ভারতে প্রাধান্ত রক্ষা করিয়াছিল। তৎকালে গৌড়জন সাহিত্যে, শিল্পে, বাণিজ্যে ও রাজ্যশাসনে, সর্ব্বত্র মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। কেবল এক বর্ণের উন্নতিতে সমগ্র দেশের এরূপ উন্নতি সাধিত হইতে পারিত না। ইতিহাসের অভাবে সে কথা জনশ্রুতি হইতেও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য জ্ঞানোজ্জ্বল বিংশ শতাব্দীর অভ্যুদয়েও, সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সময়ে সময়ে কিরূপ সিদ্ধান্ত প্রচারিত করিতেছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইতিহাসের অভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অভাব বলিয়া অনুভূত হয়। অশেষশ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম. এ. মহোদয় ["ঈষ্ট এবং ওয়েষ্ট" পত্রিকার প্রথম ভাগের ৪৬৮ পৃষ্ঠায়] লিখিয়াছেন :—

"We are already turning for inspiration and guidance not to the hereditary priests of the people or their descendants, but to our Pauls and Sarkars, our Dasses and Ghoses, our Boses and Mitras, men sprung from the lower castes, whose ancestors did not occupy an enviable position in ancient Hindu Society."

সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্য ও ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন, আধুনিক শিক্ষিত সমাজের এইরূপ ধারণা কিয়ৎপরিমাণে দূর করিতে পারিলে, বাঙ্গালীর পুরাতত্ত্ব বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে। ইংরেজী শিক্ষার স্পর্শমণি-সংস্পর্শে আমাদের পাল-সরকার-দাস-ঘোষ-বসু-মিত্র মহোদয়গণ হঠাৎ সুবর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিলে, রচনালালিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর পুরাতত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। গুণগ্রাহী প্রাচীন সমাজ গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে "কলিকাল-বাল্মীকি" উপাধি প্রদান করিয়াছিল ; সন্ধ্যাকরের পিতা প্রজাপতি নন্দীকে "সান্ধিবিগ্রহিকে"র উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিল, এবং ঘোষকুলোদ্ভব "মহামাণ্ডলিক" ঈশ্বর ঘোষকে রাজাধিরাজের দক্ষিণ বাহুর স্থায় রাজ্যশাসনের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিল ; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ "ভার্গব-সগোত্র-যমদগ্নি-ঔর্ব্ব-চ্যবন-আপ্নুবান্" প্রবর যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী ভট্টশ্রীনিবোকশর্ম্মা ঈশ্বর ঘোষের মাতাপিতার ও নিজের পুণ্যযশোভিবৃদ্ধি-

কামনায় উৎসর্গীকৃত ভূমিদান গ্রহণ করিয়া, সমসাময়িক হিন্দুসমাজের সম্মুখে "ঘোষকুলে"র সামাজিক আভিজাত্যের সাক্ষ্যদান করিয়াছিলেন। এ সকল বিবরণ সেকালের সামাজিক পদমর্য্যাদা-সম্ভোগের সংশয়শূন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ। তাহার তুলনায় একালের পদগৌরব আধুনিক শিক্ষাসম্ভূত অজ্ঞাতপূর্ব্ব অভিনব গৌরব বলিয়া কথিত হইতে পারে কি না, পাল-সরকার-দাস-ঘোষ বসু-মিত্র-মহোদয়গণ তাহা ব্যক্ত করিতে পারিবেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন অবস্থা সম্বন্ধে আধুনিক রচনায় যে সকল কথা অবলীলাক্রমে উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন অপবাদ,—সমগ্র হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ। ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন তাহার কথঞ্চিৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিবে; এবং গৌড়-গৌরবযুগের যে সকল লিপি-প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারিবে। রামগঞ্জে প্রাপ্ত বলিয়া ইহা "রামগঞ্জ-লিপি" নামে অভিহিত হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

পুনর্ম্মিলন।

[গার্হস্থ্য চিত্র।]

নলিনীকান্ত গোবিন্দপুরের রাধাকান্ত প্রামাণিকের জ্যেষ্ঠপুত্র। রাধাকান্ত তাঁত বুনিয়া কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিত। দুই পুত্র ও পত্নী ভিন্ন সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না; কিন্তু চারি জনের পেট ভরাইতে পারে, তাহার তাঁতের সেরূপ শক্তি ছিল না; কাজেই তাহাকে কোনদিন উপবাসে, কোনও দিন অর্দ্ধোপবাসে কাটাইতে হইত। নিজের উপবাসের কষ্ট সে সহিতে পারিত, কিন্তু যখন তাহার শিশুপুত্র শ্রীকান্ত তাহার সম্মুখে আসিয়া ছলছলনেত্রে বলিত, "খিদে 'নেগেচে' বাবা, একটা পয়সা দাও, মুড়কী কিনে খাবো," তখন দারিদ্র্য-যন্ত্রণা ক্রূর কেউটের ন্যায় ফণা তুলিয়া তাহার বক্ষঃপঞ্জরে দংশন করিত। সে মনে করিত, তাঁত ফেলিয়া দিয়া কৌপীন পরিয়া ভিক্ষায় বাহির হইবে, এবং ঝুলি লইয়া গৃহস্থের দ্বারে 'রাধাকৃষ্ণ' বলিয়া দাঁড়াইবে।

কিন্তু সে ভেক লইতে পারিল না; অনাহারে, থাকিয়া অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে নলিনী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় 'পাশ'

হইয়া গ্রাম্য উচ্চপ্রাথমিক পাঠশালায় 'পণ্ডিতি' লাভ করিল। রাধাকান্ত ভাবিল, মা অন্নপূর্ণা এইবার যদি দু বেলা দু মুঠো মাপান!

পণ্ডিতি লাভ করিয়াই নলিনী কন্যাদায়গ্রস্ত ভুঁই, বসাক, প্রামাণিক মহাশয়দিগের 'চারে' ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যাদব ভুঁই কৈথালী গ্রামের সম্রান্ত তন্তুবায়। তাহার তিনখানি তাঁত, এবং চারিখানি লাঙ্গল। বাড়ীতে পাঁচটি প্রকাণ্ড গোলা, সোনার বর্ণ আমনধানে পূর্ণ; ঘরে প্রতিদিন সাত আট সের দুধ হয়। নলিনী ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া তাঁহাকেই কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিল।—সমান ঘরে পুত্রের বিবাহ হয়, রাধাকান্তের ইহাই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু কৃতবিদ্য পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কোনও কথা বলে নাই। বিবাহের পর সে একদিন বলিয়াছিল, "ভাগ্যিমন্ত লোকের মেয়ে বিয়ে করলি, তোর বাপের একখানা তাঁতে তার ভার সইবে ত? পণ্ডিতি করে তুই আর কত টাকা আনবি?"

নলিনী অভিমান করিয়া বলিল, "আমাদের ভার আর তোমাকে সইতে হবে না বাবা, তুমি ভেবো না।"

রাধাকান্ত অন্যমনস্কভাবে হুঁকা টানিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, "এতটা কাল যার ভার বয়ে এলাম, আজ সে আমাকে অক্ষম মনে ক'রলে! বুড়ো বয়সে আর বেঁচে সুখ নেই।"

২

নলিনী পণ্ডিতি আরম্ভ করিয়া ভদ্রলোক হইয়া গেল। পূর্ব্বে সে এক আধ বার তাঁতের কাছে বসিত; পণ্ডিত হইয়া সে সে দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত। সে ভাবিত, তাঁতে পয়সা থাকিলে সে এতদিন বি. এ. পাশ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারিত। তাহার প্রতিবেশী গদেক ওস্তাগরের পুত্র কলিকাতায় শুদু ওস্তাগরের লেনে তাহার 'নানা' (মাতার পিতৃব্য) কাবিল খলিফার দোকানে থাকিয়া বি. এ. পাশ করিয়াছিল; এখন পূর্ব্ববঙ্গে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী করিতেছে। ন্যায়বান ইংরাজ গবর্মেণ্টের এই সাম্যজ্ঞানের দিনে নলিনী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটীর লোভ করিলে আমাদের গ্রাম্য জমীদার দাশরথী মুস্তুফার মহাশয়ের আভিজাত্য-গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্দাহ ভিন্ন ইহাতে অন্য কোনও লাভ হয় না।

নলিনী পণ্ডিতি করিয়া যে কয়েকটি টাকা পাইত, তাহাতে তাহার ধুতি, জামা, জুতা ও নববধূর সেমিজ, জ্যাকেট, এসেন্স, চিরুণী, সাবান প্রভৃতির সংস্থান

করিতেই ফুরাইয়া যাইত। অগত্যা অবশেষে সে জমীদার-বাড়ীতে 'টিউশনি' লইল। সে মনে করিয়াছিল, টাকা কয়টি তাহার পিতাকে দিয়া সাংসারিক ভার-বহনে সাহায্য করিবে, কিন্তু একদিন তাহার শাশুড়ী নূতন উপার্জ্জনের কথা শুনিয়া তাহাকে বলিল, "গতর খাটিয়ে দু পয়সা আন্‌চো, উহা আমার শিবরাণীর কাছে জমাও। এখন থেকে দু টাকা জমাতে না পারলে চল্‌বে কেন?"

শিবরাণী নলিনীর স্ত্রী। শাশুড়ীর উপদেশ তাহার অমৃতময় মনে হইল। তাহার পর যে দিন তাহার পিতা বলিল, "নলিন, ঘরে 'চাল' 'বাড়ন্ত'; কাল সকালে আধমোন চাল কিন্‌তে হবে। টাকা আছে?" সেদিন নলিনী রাগ করিয়া বলিল, 'আমার খরচ তো দেখ্‌তো পাও না? দুবেলা দু' পেট খেতে দাও, সে জন্যে যখন তখন খরচ চাইতে তোমার লজ্জা হয় না।"

নিজের নির্লজ্জতায় বৃদ্ধ অত্যন্ত দুঃখিত হইল। সে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "শ্রীকান্ত আমাকে এমন কথা কখনও বল্‌তে পারবে না। তোকে লেখাপড়া না শিখিয়ে তাঁতে বসানো ভাল ছিল।"

৩

স্বদেশী আন্দোলনের সময় রাধাকান্ত তাঁত বুনিয়া বেশ দু' পয়সা পাইয়াছিল। কাপড় বুনিয়া বাজারে লইয়া যাইলেই বস্ত্রব্যবসায়ীরা তাহা নগদ টাকা দিয়া কিনিয়া লইত। সকলেরই স্বদেশী কাপড়ের জন্য আগ্রহ, 'তাঁতের ধুতি' অধিক দাম দিয়াও লোকে কিনিত; দোকানদার যথেষ্ট লাভ পাইত বলিয়া বস্ত্রনির্ম্মাতাকে দু' পয়সা 'ধরিয়া' দিতে কাতর হইত না।

কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গের অবসানে, খণ্ড বঙ্গের পুনর্মিলনের পর হইতে স্বদেশী ভাগীরথীতে ভাঁটা দেখা দিয়াছে। গ্রাম্য নেতার দল বলিতেছেন, "বঙ্গ-ভঙ্গের আদেশ রহিত হইয়াছে, বয়কট উঠিয়া গিয়াছে, 'পরিষ্কার' পরিচ্ছন্ন বিলাতী ছাড়িয়া তাঁতের ধুতি কেন পরিব?" পল্লীগ্রাম হইতে স্বদেশী প্রায় উঠিয়া গেল। বস্ত্র-বিক্রেতৃগণ মিলের কাপড় প্রায়ই আমদানী করে না। আমদানী করিলে তাহা বাজারে বিকায় না। 'পুঁজি'র টাকা এমন ভাবে 'আবদ্ধ' রাখিতে তাহারা সম্মত নহে। গ্রাম্য তন্তুবায়গণের বস্ত্র ত অচল হইয়া উঠিল,—এক জোড়া কাপড় বুনিয়া লইয়া রাধাকান্ত বাজারে গিয়া দেখিল, সকলে যে দাম বলে, তাহাতে সূতার খরচ উঠে না!—সেই জন্য সে রাজী হইলেও কেহ নগদ টাকা দিতে রাজী হয় না; বলে, "মাল রাখিয়া যাও, বিক্রয় হইলে টাকা নিও।"—অবস্থা বাঙ্গালী

গ্রন্থকারগণের অবস্থা অপেক্ষা আশাপ্রদ নহে। পুস্তকবিক্রেতা পুস্তক বিক্রয় করিয়া কমিশনের টাকা কাটিয়া লইয়া তাঁহাদের প্রাপ্য প্রদান করেন; আবার অনেক পুস্তকবিক্রেতা অল্প কমিশনে পুস্তক রাখেন। শেষে গ্রন্থকার না পান টাকা, না পান পুস্তক!—ইহা অপেক্ষা রাধাকান্ত তন্তুবায়ের অবস্থা ভাল।

স্বদেশীর দুর্দ্দশা দেখিয়া রাধাকান্ত ক্ষুণ্ণমনে ধুতি চাদর ছাড়িয়া গামছা-বয়নে মনসংযোগ করিল। ম্যাঞ্চেষ্টার এখনও গ্রাম্য গামছাকে 'বয়কট' করিতে পারে নাই।

গামছা বুনিয়া যেটুকু অবকাশ পাইত, সে সময়টুকু রাধাকান্ত গাভী-পরিচর্য্যায় যাপন করিত। তাহার 'মঙ্গলা গাই', তাহার শ্বশুরের প্রদত্ত। সুতরাং মঙ্গলার সহিত তাহার জীবনের সুখদুঃখের অনেক স্মৃতি বিজড়িত।—মঙ্গলা এক সের দুধ দেয়, কিন্তু তাহাকে প্রতিপালন করা রাধাকান্তের সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বে বারো আনায় এক গাড়ী বিচিলি মিলিত, এখন তিন টাকাতেও পাওয়া যায় না। মসীনার খৈল পাইবার উপায় নাই। রাধাকান্ত একখানি 'খুরপো' ও একটি ডালা লইয়া প্রত্যহ অপরাহ্নে মাঠে তৃণসংগ্রহে যাইত।

মঙ্গলা এক সের করিয়া দুধ দিত। নলিনীর মা তাহাতে আধসের জল মিশাইয়া জ্বাল দিত, জলটুকু মরিয়া এক সেরই থাকিত। নলিনীর মা সেই দুধের বড় গৌরব করিত; বলিত, "আমার দুধ গয়লার দুধের চেয়ে ভাল।" সে কথা সত্য!

রাধাকান্ত বৃদ্ধ বয়সে একটু আফিং খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। গৃহিণী তাহাকে আধ সের দুধ দিত, অবশিষ্ট আধসেরে সে ছেলে দুটির ও বৌমার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিত।

শিবরাণী বাপের বাড়ী গিয়া মাকে এ কথা বলিয়া দিল। আধসের দুধ চারি জন পান করে, শুনিয়া শিবরাণীর মা হাসিয়াই অস্থির; তাহার ঘরে দশ সের দুধ, আর তার মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়া আধ পোয়া দুধও পায় না, এ কথা মনে হইবামাত্র তাহার হাসি বন্ধ হইল, এবং নয়নদ্বয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। নলিনী স্ত্রীকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য শ্বশুরবাড়ী আসিলে সে বলিল, "শিবরাণীর জন্য দুধের যোগাড় করে দিতে পার ত তাকে নিয়ে যাও, আমার দুধের মেয়ে, আধ পোয়া দুধ খেয়ে সে বাঁচবে না।"

নলিনী বাড়ী আসিয়া অগত্যা এক সের দুধের যোগাড় করিল। রাধাকান্ত

ক্ষুণ্ণমনে বলিল, "দুধের রোজ আর দরকার কি? মঙ্গলার যে এক সের দুধ হয়—তার তিন পোয়া বৌমাকে দিও, এক পোয়া নলিনী খাবে।"

গিন্নী বলিল, "আর তুমি? তোমার যে আফিংএর ধাত!"

রাধাকান্ত সাশ্রুনেত্রে বলিল, "আমি নবীন ময়রার দোকান থেকে ছানার জল এনে খাব। কি করি, আফিং ত আর ছাড়তে পারিনে।"

রাধাকান্তের সাধ্বী পত্নীর নয়নে অশ্রুর সঞ্চার হইল; সে বলিল, "সার্থক ছেলে পেটে ধরেছিলাম।"

রাধাকান্ত বলিল, "ও কথা বলো না গিন্নী, নলিনী আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। শুনচি, এবার বাবুরা তাকে মিউনিসিপালের কমিশনার করবেন। কালেক্টর সাহেব বলে গিয়েছেন, 'তোমরা ঘরে ঘরে মিউনিসিপালিটীটা দখল করে' রেখেছ; শুনেছি, চোর পুষে মিউনিসিপালিটীর টাকাগুলির শ্রাদ্ধ করছে। বাইরের লোক থেকে কমিশনার নাও।'—তাই চেয়ারম্যান বাবু নলিনীকে কমিশনার করবেন।"

গিন্নী বলিল, "না না, নলিনীকে ও চাকরী নিতে বারণ কর; কখন কার টেকস্ বাড়িয়ে দেবে, আর সে 'নির্ব্বংশ হ' বলে অভিসম্পাত করবে; আমরা দুটো কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে সংসার, খেতে পাই না পাই, বাছারা বেঁচে থাক।"

নলিনী সে কথা শুনিল। চেয়ারম্যান গোপীকৃষ্ণ মজুমদার জমীদার মহাশয়ের চেষ্টায় নূতন ইলেক্‌সনে সে গোবিন্দপুর মিউনিসিপালিটীর ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার হইল।—সেই বৎসরই বানরের হাতে খন্তা পড়িল; অর্থাৎ, নলিনী ও তাহার ন্যায় অপোগণ্ড আর একটি কমিশনর, এবং আবদুল মহম্মদ নামক একটি ডাক্তার কমিশনরের উপর নূতন 'এসেস্‌মেণ্টে'র ভার পড়িল। তাহার ফলে যাহার আট টাকা ট্যাক্স ছিল, তাহার বিশ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য হইল। শুনিতে পাওয়া গেল, ডাক্তার কমিশনার 'এসেস্‌মেণ্ট' আরম্ভে পূর্ব্বেই স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। অপোগণ্ডদ্বয় গ্রামবাসীদের দ্বিগুণ আড়াই গুণ ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়াছিল। গ্রামবাসীরা নলিনী ও তাহার সহযোগীর জন্য অপূর্ব্ব খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করিতে লাগিল। চেয়ারম্যান বিব্রত হইয়া বলিলেন, "ছোকরারা কি করেছে, জানি না; তোমরা এক একটা দরখাস্ত কর।"

নলিনীর মা সকল কথা শুনিয়া স্বামীকে বলিল, "আমি ত তখনই বলেছিলাম। গাঁয়ের লোকে বাপ বড়-বাপের মুণ্ডে কি দিচ্ছে, শুন্‌ছো!"

রাধাকান্ত গরুর 'সানি' মাখিতে মাখিতে বলিল, "আমি ত কতদিন আগে বলিছি, নলিন আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।"

৪

রাধাকান্ত আফিং ও ছানার জল খাইয়া গামছা বুনিতে লাগিল। নলিনী পণ্ডিতি ও মিউনিসিপালিটীর কমিশনরী করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে রাধাকান্তর সংসারে এক আগন্তুকের আবির্ভাব হইল। নলিনীর একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।—স্ত্রীকে বাড়ী আনিবার পর হইতে নলিনী পিতাকে মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে সাহায্য করিত।—তাহার নিজের ও শিবরাণীর খোরাকও এই পাঁচ টাকার মধ্যে!

নলিনীর মা আক্ষেপ করিয়া প্রতিবেশিনীদের কাছে বলিত, "মাসে পাঁচ টাকা দেয়। ওদের দু জনেরই ত পাঁচ টাকার বেশী খোরাক লাগে। নলিনী মাসে পনর টাকা উপায় করে; আর তিনটে টাকা দিতেও ত পারে, তা দেয় না। নিত্যি বৌমার নূতন জামা কাপড় আনছে।"

কথাটা নলিনীর কানে গেল।

পরদিন শিবরাণী শাশুড়ীকে বলিল, "মা, তুমি ছোট ছেলেকে নিয়ে ভিন্ন হয়ে রেঁধে খাও; কর্ত্তা আমাদের দিকে থাকুন। তিনি যা রোজকার করেন, আমরা তার ভাগ চাইনে।"

নলিনীর মা স্বামীকে সকল কথা বলিল। শুনিয়া বৃদ্ধ রাধাকান্তের নয়নে আনন্দাশ্রুর সঞ্চার হইল। সে বলিল, "জানি আমি, নলিন আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। সে 'লায়েক ছেলে', তার হুকুম অমান্ত করা যায় না। তা, তোমরা পৃথক হও, আমি নলিনের দিকেই থাকি। আমি তোমাদের দু' জনের পেটের ভাতের যোগাড় করে' দিতে পারবো।"

তর্ক উঠিল, গরুটা কোন ভাগে পড়িবে।—নলিনীর বাবা বলিল, "গরু যদি নাও, তবে তার ঘাসও তোমাকে কাটতে হবে।"

নলিনী বলিল, "তুমি যখন আমার ভাগে, তখন ঘাসও তোমাকে কাটতে হবে, দুধও আমরা নেব।"

রাধাকান্ত বলিল, "গরুটা তোর আজা মশায়ের, তোর মার সম্পত্তি। তার স্ত্রীধন আমার দান করবার অধিকার কি?"

শেষে স্থির হইল, শ্রীকান্ত ঘাস কাটিবে। দুধ আধ সের নলিনীর মা পাইবে, আধ সের নলিনীর স্ত্রী পাইবে।

মানব-মিত্র বিবেকানন্দ

[১৯০০ খৃষ্টাব্দ]

Mohila Press, Cal

প্রেমের স্বপ্ন

চিত্রকর - বুশের

রতির প্রসাধন

চিত্রকর— বুশের।

Mobile Press, Cal

নলিনীর মা বলিল, "বুকের রক্ত দিয়ে তোকে মানুষ করেছি, সব দুখ তুই-ই রাখিস্।"

কিন্তু গরুটা ভাগে পড়িলেও রাধাকান্তের 'ছানার জল খাওয়া' বন্ধ হইল না। ক্ষীরো ঘোষাণী আধসের দুধে আধসের জল মিশাইয়া নলিনীর ছেলের জন্য 'উঠনা' দিতে লাগিল।

তিন দিন ভাত রাঁধিয়া, বাসন মাজিয়া ও ঘর নিকাইয়া শিবরাণীর জ্বর হইল। শাশুড়ী প্রাণপণে তাহার সেবা করিতে লাগিল। নলিনীর মা নলিনীর ভাঁড়ার হইতে চাল ডাল লইয়া স্বামীকে ও নলিনীকে রাঁধিয়া দিত, নিজে সে অন্ন স্পর্শ করিত না। পুত্রের সংসারের কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় নলিনীর মা নিজের 'উনন' জ্বালিয়া দুটি ভাত রাঁধিত, শ্রীকান্তকে খাওয়াইয়া নিজে আহার করিত। এই ভাবে কিছুদিন চলিল।

শিবরাণী রোগশয্যা হইতে উঠিয়া বুঝিতে পারিল, একটি ঝি ভিন্ন তাহার চলিবার উপায় নাই। কিন্তু পল্লীগ্রামেও এখনও ঝি রাখা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে; সে ঘরে খাইবে না; 'শুখা' বেতন চারি টাকা, তাহার উপর কাপড়, গামছা, তেল, জলখাবার আছে। যদি বা স্বজাতীয়া কোনও অনাথা ঘরে খাইয়া পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলেও তাহাতে খোরাক পোষাক চারি পাঁচ টাকার কম পড়ে না। নলিনীর আর্থিক অবস্থা এমন সচ্ছল নহে যে, সে ঝি রাখে। অগত্যা একদিন শিবরাণী শাশুড়ীকে বলিল, "তোমার আর 'আলাদা' হইয়া রান্না বান্না করিতে হইবে না, তুমি সংসারের ভার লও, আমার পৃথক হইবার সাধ মিটিয়াছে।"

নলিনীর মা পূর্ব্ববৎ সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিল; দাসীর ন্যায় পুত্রবধূর সেবা করিতে লাগিল। শিবরাণী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। আর তাহাকে 'হেঁসেলে' যাইতে হয় না, নদী হইতে জল আনা, রাঁধা, ঘর নিকানো, বাসন মাজা,—সংসারের সকল কাজই শাশুড়ী করে। আর সে সাবান মাখে, আয়নায় মুখ দেখে, মধ্যাহ্নে আহারান্তে নিদ্রা যায়; তাহার পর অপরাহ্নে উঠিয়া, ছেলে কোলে লইয়া প্রতিবেশীদের বাড়ীতে গল্প করিতে যায়।

নলিনীর মা সমস্ত দিন সংসারের কাজ করিয়া সন্ধ্যার সময় গ্রাম্য পুষ্করিণীতে গা ধুইয়া এক কলসী জল লইয়া আসে; তাহার পর তুলসীতলায় আলো দিয়া, হরিনামের মালাগাছটি লইয়া কৃষ্ণ ভগবানের নাম করিতে বসে,

মনে মনে বলে, "হে গোবিন্দ নারায়ণ মধুসূদন, আমার 'দুরন্ত' থাকিতে থাকিতে তোমার শ্রীচরণে স্থান দাও।"

বেয়ান আবার পুত্রবধূর ঘরে ভর করিয়াছে শুনিয়া নলিনীর শাশুড়ী বড় অসন্তুষ্ট হইল। কিছুদিন পরে নলিনী শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিলে তাহার শাশুড়ী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আলাদা হয়ে থাচ্ছিলে, আবার মাকে এনে জুটুলে কেন? পয়সা কি খুব সস্তা!"

নলিনী বলিল, "সস্তা নয় বলেই মাকে দুবেলা দুমুঠো খেতে দিতে হচ্ছে। মাসে পাঁচ টাকার কম একটা ঝি মেলে না। মাকে প্রতিপালন কর্‌তে পাঁচ টাকার চেয়ে অনেক কম খরচ হয়। বিনা পয়সায় এমন ঝি মিলবে না।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বংশানুক্রম।

১

দেহ ও মন তুল্যরূপেই বংশানুক্রমের অধীন। * বংশানুক্রমের প্রভাব বহুক্ষেত্রে পরীক্ষিত হইয়াছে; তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে, দেহ ও মন সমভাবেই বংশানুগত হয়; বরং দেহ অপেক্ষা মন কিঞ্চিৎ অধিকমাত্রায় হইয়া থাকে। যাহা হউক, বংশানুক্রমের নিয়ম অনুসরণ করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, অপর সাধারণের বংশ অপেক্ষা, যোগ্য ব্যক্তির বংশেই অধিকসংখ্যক যোগ্য ব্যক্তি জাত হওয়া সম্ভব, অযোগ্য ব্যক্তির বংশে অধিকসংখ্যক যোগ্য ব্যক্তি উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। মৃত মহাত্মা গ্যাল্টন দেখাইয়াছেন যে, অতি নিম্নশ্রেণীর প্রায় আড়াই হাজার ব্যক্তি হইতে তিনটি সুযোগ্য অপত্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উত্তম শ্রেণীর ৩৫ জন ব্যক্তি হইতেই তাহার দ্বিগুণ সুযোগ্য অপত্যলাভ হইয়া থাকে। † এই সকল সংখ্যা দেশভেদে বিভিন্ন হইতে পারে;

দৃষ্টান্ত।

---

* To sum up, there appears no doubt that good or bad physique, * * * the moral characters the mental temperament are INHERITED in man, and with much the same intensity.

Pearson's "On the scope and importance to the state of the science of national Eugenics". P. 33.

† 35 V. class parents suffice to give 6 sons of the V. Class; it takes 2500 R-class fathers to produce 3 of them. Galtons Essays in Eugenics p 17.

কিন্তু তিনি যে মীমাংসা করিতেছেন, তাহা অসত্য নহে। তিনি বহুসংখ্যক যোগ্য এবং অযোগ্য ব্যক্তির বংশ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, সমাজ-মধ্যে যোগ্য ব্যক্তির আধিক্য দেখিতে ইচ্ছা করিলে, যোগ্যবংশীয় নরনারী-দিগকে পরিণীত করিবার চেষ্টা করাই সহজ পন্থা; অযোগ্য-বংশীয়গণকে কোনও উপায়ে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়া তাহাদিগের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিলে তাদৃশ ফললাভ করিবার আশা করা যায় না।

অধ্যাপক পিয়ার্সনের সংগ্রহ হইতে নিম্নের বংশাবলী উদ্ধৃত করা গেল।* এফ্. আর. এস্. উপাধিধারিগণ অনেকেই অসাধারণ প্রতিভাশালী। এই তালিকাতে এফ্. আর. এস. শব্দের পরিবর্ত্তে † চিহ্ন ব্যবহার করা গেল। দেখা যাইতেছে যে তিন পুরুষের মধ্যে ৭ জন ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ ঐ উপাধিধারীর পুত্র এবং ঐ উপাধিধারীর কন্যা পরিণীত হইবার ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষে ৫ জন এফ্. আর. এস্. উৎপন্ন হইয়াছে। আমার সংগ্রহ হইতে একটি দৃষ্টান্তের † উল্লেখ করিতে পারি, কিন্তু নাম প্রকাশ করিবার অনুমতি না পাওয়ায় প্রচ্ছন্ন রহিল। মূল ব্যক্তি অসাধারণ প্রতিভাশালী ডাক্তার ছিলেন; তাঁহার পুত্রও অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন দেশবিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক। ইঁহার একটিমাত্র শিশু পুত্র; বয়স ২।৩ বৎসর। এই বয়সেই তাহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমার পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দৌহিত্র ছিলেন। তিনি পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের বিশেষ বিখ্যাত পণ্ডিত। পিতৃদেব অতিশয় বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পৌত্রও ছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে, তাঁহাকে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, ধর্ম্মপ্রাণ এবং বিষয়বুদ্ধিশালী দেখিতে পাইয়াছি। যাহা হউক, দৃষ্টান্ত আর বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। মোটের উপর, প্রতিভা বংশানুগত, ইহা গ্যাল্টন্ বহু পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন। তবে কখনও কখনও পিতৃপ্রতিভা পুত্রে সংক্রামিত হয় না। তদ্রূপ স্থলে "সাধারণ

সন্নিকর্বে"র নিয়ম প্রবল হয়। এই নিয়ম পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। কিন্তু পিতা মাতা উভয়েই অধিক প্রতিভাশালী কিংবা অল্পবুদ্ধি হইলে নিয়ম খাটে না। তখন প্রথম ক্ষেত্রে পুত্র আরও প্রতিভাসম্পন্ন হয়; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আরও অল্প বুদ্ধি হইয়া থাকে।

বংশানুক্রমের আলোচনা কালে একটা কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত। কথাটি এই যে, কর্ম্ম স্বভাবতঃ বংশানুগত নহে। তবে, পিতা পুত্রকে স্বীয় অভ্যস্ত কর্ম্ম শিক্ষা দিলেন, পুত্র ঐ শিক্ষা-গ্রহণের উপযোগী হইলে সে ঐ কর্ম্মই অবলম্বন করিল;—এ কথা পৃথক। স্বভাবতঃ দেহ, সুতরাং মনও বংশানুগত, কর্ম্ম নহে। দেহ, এবং মন পিতা হইতে পুত্রে, পুত্র হইতে পৌত্রে চলিয়া আসে। ঐ দেহ এবং মন দ্বারা পিতা এক কর্ম্ম, পুত্র অন্য কর্ম্ম, পৌত্র পৃথক আর এক কর্ম্ম করিতে পারে; সকলই এক কর্ম্ম করিবে, এমন কোনও কথা নাই। অথবা এক ব্যক্তিই তাহার দেহ ও মন দ্বারা যত প্রকার কর্ম্ম সম্ভব, সমস্তই করিতে পারে। এক জন বাঙ্গালী সার্কাসে হিংস্র জন্তুর সহিত ক্রীড়া করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বিবেচনা করুন, ইঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি, বিশেষতঃ স্নায়ু-সংস্থান কিরূপ ছিল।* নিশ্চয়ই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সাহস, তিতিক্ষা, অনন্যমনস্কতা, ধীরতা ইত্যাদি উপকরণ তাঁহার অধিক ছিল। ঠিক এই সকল গুণ সন্ন্যাসীরও আবশ্যক; নচেৎ তিনি সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবৎ-ধ্যানে মগ্ন হইতে পারেন না।† তাঁহার দেহ ও মন দুদিনেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ সকলের সহিত উভয় ক্ষেত্রেই একটু ঝোঁকও থাকা আবশ্যক। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, ঐ সার্কাসপ্রিয় পশু-ক্রীড়ক মুহূর্ত্তমধ্যে সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার দেহ ও মন দ্বারা কত বিভিন্ন কর্ম্ম সিদ্ধ হইল। ঐ পশু-ক্রীড়কের পুত্র যদি যোগীর ন্যায় ভগবদ্ভক্ত হইত, আমরা আশ্চর্য্য বোধ করিতাম। কিন্তু আশ্চর্য্যান্বিত হইবার বিশেষ কিছু নাই।

আবার বিবেচনা করুন, এক জনের হস্তের অঙ্গুলিগুলি সরু এবং লম্বা, কিন্তু বল-যুক্ত, এবং কিঞ্চিৎ পৃথকভাবে অবস্থিত। তিনি তদ্রূপ অঙ্গুলি দ্বারা গর্ভস্থ ভ্রূণ প্রসব করাইতে অন্যের অপেক্ষা অধিক সমর্থ হইতে পারেন।

কর্ম্ম বংশানুগত নহে।

---

* অঙ্গ বলীষ্ঠ ও প্রায় রোম যুক্ত ছিল।

† তাঁহাকে জীবনের মায়াও সর্ব্বদাই ত্যাগ করিতে হইত।

এইরূপ অঙ্গুলি হার্মোনিয়ম বাজাইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক; শেলাই কার্য্যেও উত্তম। সুতরাং [অন্যান্য কারণ বিবেচনা না করিয়া শুধু অঙ্গুলিমাত্রই বিবেচনা করিলে] বুঝা যাইবে যে, তিনি স্বয়ং ধাত্রীবিদ্যার অন্তর্গত প্রসব করান কার্য্যে দক্ষ হইতে পারেন, তাঁহার পুত্র ঐরূপ অঙ্গুলি পাইয়া থাকিলে, উত্তম হার্মোনিয়ম-বাদক হইতে পারেন, এবং পৌত্র ঐরূপ স্থলে শেলাই কার্য্যে যশস্বী হইতে পারেন। অর্থাৎ, ঐ অঙ্গ দ্বারা যত প্রকার কর্ম্ম হওয়া সম্ভব, সমস্তই হইতে পারে। পিতা প্রসবকারক, পুত্র বাদ্যযন্ত্র-বাদক, পৌত্র-শেলাই পটু বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। এরূপ ক্ষেত্রে বংশানুক্রমের নিয়ম প্রতিপালিত হইল। খণ্ডিত হইল না। কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে ভ্রম ক্রমে বংশানুক্রমের ব্যতিক্রম, মনে করিতে পারেন। বস্তুতঃ ইহা তাহা নহে।

এতদ্দেশে ধাতুকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়। যথা, বায়ু, পিত্ত, কফ। ইহাদিগের প্রত্যেক শ্রেণীকেও তিন ভাবে বিভক্ত করাই প্রথা; যথা সত্ব, রজঃ, তমঃ। বায়ুপ্রধান ব্যক্তিও সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক হইতে পারে; পিত্তপ্রধান ব্যক্তিও তাহাই, এবং কফপ্রধান ব্যক্তিও তদ্রূপই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। এই সকল শব্দ উচ্চারণ করা কিংবা লেখা যত সহজ, বুঝা তত সহজ নহে। যাহা হউক, এই সকল শব্দ বিবেচনা করিলে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হয়, যে বায়ু প্রধান, পিত্ত প্রধান, ও কফ-প্রধান ব্যক্তিগণ সাত্বিক হইলেও, বিভিন্ন প্রকারের কর্ম্মী হইবে; রাজসিক হইলেও তাহাই; তামসিক হইলেও তাহাই। এই কথাই অন্য ভাবে বলিলে প্রতীয়মান হইবে যে, সাত্বিক ব্যক্তি বায়ুপ্রধান হইলে এক প্রকার কর্ম্ম করিবে, রজঃপ্রধান হইলে অন্য প্রকার, এবং তমঃপ্রধান হইলে পৃথক আর এক প্রকার কর্ম্ম করিবে।* এইরূপ রাজসিক, তামসিক, সকল প্রকার ব্যক্তি সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, জগতে যেমন দেহে ও মনে বংশ-পরম্পরায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই, তেমনই কর্ম্মেও নাই। বরং দেহে ও মনে যে পরিমাণে সাদৃশ্য বংশানুক্রমে লক্ষিত হয়, কর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাও হইতে পারে না। সমদেহ এবং সমভাবাপন্ন ব্যক্তিগণেরও কর্ম্ম অত্যন্ত পৃথক। তুল্যাকৃতি যমজ ভ্রাতৃরাও কেমন বিভিন্ন কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহা প্রায়

* কেহই কেবলমাত্র একটি গুণের আধার নহে। গুণত্রয় মিলিয়াই ব্যক্তি। তবে, মাত্রার প্রভেদ আছে।

সকলেই জানেন। সুতরাং কর্ম্ম বংশানুগত নহে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পিতা ধার্ম্মিক, পুত্র লম্পট; এরূপ স্থলে অনেকেই চমৎকৃত হন। তাঁহারা বংশানুক্রমের নিয়ম সকল এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে অসম্মত হন। কিন্তু যে পিতা একাগ্রচিত্তে ভগবানকে চিন্তা করিয়া আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া, গৃহত্যাগ করিয়া, ধ্যানমগ্ন হইয়া গেলেন; এবং যে পুত্র একাগ্রচিত্তে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা আশ্রয় করিয়া আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া, ধন, ঐশ্বর্য্য, গৃহাদি ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া, কেবল লাম্পট্যেই মগ্ন হইয়া গেল;—এতদুভয়ে ধাতুগত বিশেষ প্রভেদ কিছু দেখা যায় না। কেবল আশ্রয়ভূত পদার্থের পার্থক্য। অর্থাৎ, একের আশ্রয় ভগবান; তিনি তাঁহাকে ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। অন্যের আশ্রয় ইন্দ্রিয়সেবা; সে উহা ভিন্ন আর কিছুই গ্রাহ্য করে না। সুতরাং ধার্ম্মিকের পুত্র লম্পট হইলে ধাতুগত কিংবা বীজগত সাদৃশ্যই রক্ষিত হইল, কেবল কর্ম্মগত পার্থক্য। এক জন ডাকাত প্রকাশ্যভাবে দিনে ডাকাতী করিয়া গৃহস্থের ধন লুণ্ঠন করিত। তাহার পুত্র শিক্ষালাভ করিয়া বিচারপতি হইয়াছিল। তখন সে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া উৎকোচদাতাকে মকদ্দমায় জয়ী করিয়া দিত। ইহাও কি লুণ্ঠন নহে? পরে যখন সে অন্য কার্য্য গ্রহণ করিল, তখনও স্বীয় প্রভুর অনিষ্ট করিয়া অসদুপায়ে অবৈধ উপার্জ্জন করিয়াছিল। ইহাও কি লুণ্ঠন নহে? এ সকল স্থলে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছু নাই। ধাতুগত সাদৃশ্য থাকিলেও, কর্ম্মগত বিভিন্নতা থাকিতে পারে। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যেও মূলে সমতা, (অর্থাৎ উদ্দেশ্যের সমতা) আছে, ইহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই প্রতীয়মান হইবে। বংশানুক্রমের প্রভাব সত্ত্বেও কর্ম্মের আকৃতিগত পার্থক্যমাত্রই লক্ষিত হইয়া থাকে; তাহাতে মূল ভাবের একতা নষ্ট হয় না।

বেষ্টনী।

কর্ম্মের প্ররোচক ভাব প্রকৃতপক্ষে বংশানুক্রমিক বীজ-বস্তুরই ফল, তবে উহা কখন কোন মূর্ত্তিতে ব্যক্ত হইবে, তাহা সাময়িক বেষ্টনীর উত্তেজনাসম্ভূত। বহু স্থলে এই কথা সত্য, কিন্তু এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। যে উত্তম হার্ম্মোনিয়ম-বাদক হইতে পারিত, তাহার পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীতে ঐ যন্ত্র কখনই না থাকায় সে উহার উত্তেজনা কখনও প্রাপ্ত হইল না, সুতরাং সে হার্ম্মোনিয়ম-বাদকও হইল না। দূরেরও কর্ম্ম তাহার বেষ্টনীমধ্যে থাকায় ঐ উত্তেজনাবশতঃ সে ভাল এক জন

সেলাইপটু হইল। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও বহু স্থলে দেখা যায় যে, চতুষ্পার্শ্বস্থ বেষ্টনীমধ্যে সূচের কার্য্যের বিশেষ উত্তেজনা থাকিলেও, কোথাও এক ব্যক্তি সে উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইল না, তাহার উপর ঐ উত্তেজনা ক্রিয়া করিল না; সুতরাং তাহার সেলাই শিক্ষা হইল না।' তাহার বীজগত ধাতু ঐ উত্তেজনার প্রতিকূল। ধাতু এবং বেষ্টনী-সম্ভূত উত্তেজনা,—এতদুভয়ে পার্থক্য হইলে ধাতুই প্রবল হইয়া থাকে; বেষ্টনী পরাভূত হইয়া কর্ম্মে বিকাশ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ধাতুই মূল ও প্রধান কথা; পারিপার্শ্বিক বেষ্টনী তাহারই অনুগত। যাহা বীজ-বস্তুতে আছে, তাহাই ব্যক্তিতে বিকাশ প্রাপ্ত হয়; যাহা নাই, তাহা বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু বিকাশকার্য্যে বেষ্টনীর শক্তি অধিক নহে। * কিন্তু কেহ কেহ বেষ্টনীকেই সর্ব্বশক্তির আধার বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভ্রান্ত।

শ্রীশশধর রায়।

যাত্রা।

[আলো ও ছায়া রচয়িত্রী রচিত।]

১

দূরে ছিনু, প্রাণপণ সাধনার বলে
আনিলে নিকটে মোরে। কোন ইন্দ্রজালে
দেখেছিলে দেবপ্রভা মানবীর ভালে?
ঢেলে দিলে, অযাচিত, এ চরণতলে
তোমার সর্ব্বস্ব? শীত উন্নত অচলে
কঠিন তুষার ছিনু, ধরার নাগালে
গলাইয়া বিন্দু বিন্দু; দেখি শেষকালে
শক্ত নহি, শুভ্র নহি, পরিণত জলে।

---

* What is present in the germ-cell will be present in the individual; * * external conditions as a rule play but a small part in determining its appearance. Doncaster's "Heredity in the light of recent research."

এ জনে তোমার কৃপা কর পরিহার,
সমূলে সংহার কর মোর লাজ ভয়;
অচেনা এ দেশ, আমি লুকাইতে চাই
তোমার হৃদয়-গেহে। কি কহিব আর—
ছুটিলে এ ইন্দ্রজাল, টুটিলে প্রণয়,
মোর তরে নাহি আর দাঁড়াবার স্থান।

২

দূর হ'তে যবে মোরে ভালবাসা দিতে,
বলেছি সহস্র বার, "করি না প্রত্যয়
প্রেমের স্থায়িত্বে আমি; কভু নাহি সয়
নর-ভাগ্যে এত সুধা।" কাতরে মাগিতে
নিত্য তুমি প্রেম মম, আমি শান্ত-চিত্তে
ফিরায়ে দিতাম তোমা। কিসে যে কি হয়—
কে বলিতে পারে কিন্তু! কালে পায় লয়
কঠিন পর্ব্বত-দেহ শিশিরে বৃষ্টিতে।
তোমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করেছে আমার
বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা। একদা প্রভাতে,
দুঃস্বপ্নপীড়িত চিত্ত, কি বেদনাভরে
উঠিলাম, বাহিরিতে খুলি গৃহদ্বার
সম্মুখে দেখিনু তোমা; হাত রাখি হাতে
সুধা'নু,—"এসেছ পুনঃ এ জনেরি তরে?"

৩

কহিলে, "তোমারি তরে এসেছি আবার,
যত ফিরাইয়া দাও, হয় দৃঢ়তর
তত আকর্ষণ তব। নিরাশার পর
আবার জেগেছে আশা; নাশি' অন্ধকার
জাগে যথা ঊষা নিত্য। দেখ চারি ধার
কি আলোক, কি সঙ্গীত; দেখ, কি সুন্দর
জীবন-তরঙ্গ-রঙ্গ! দুঃস্বপ্ন-কাতর
কে রহে দিবসে, ঢাকি' আঁখি আপনার?

এই শুভ্র দিবালোকে চল দু জনায়
খুঁজি জীবনের সিদ্ধি। বিশাল জগৎ,
প্রেমের আনন্দ-গীতি, কর্ম্ম-কোলাহল,
সুখের দুঃখের স্রোত কত বহি যায়
পাশাপাশি। চল যাই ধরি প্রেম-পথ
দু জনে লভিয়া প্রাণে দু জনের বল।"

৪

আমি স্বপনের রাজ্যে ভ্রমি নিশিদিন,
ঘন অন্ধকার, কিবা রৌদ্র অতিশয়,
সমান দুঃসহ মম। আমার হৃদয়
অস্ফুট-কামনা-ভরা; গোধূলি-বিলীন
ক্ষুদ্র তারকার মত শত আশা ক্ষীণ
জ্বলিতেছে খুঁজি এক অটল আশ্রয়।
তোমার আমার পথ হয় কি না হয়
এক দিকে, বিচারিয়া দেখ হে প্রবীণ।
পিপাসিত তুমি যার তরে, সে প্রণয়
আমি কি পারিব দিতে, মিটায়ে পিয়াস?
পারিব কি চিরদিন ধরি এক পথ
চলিবারে এক সাথ, সদা নিঃসহায়?
জাগিবে না চিতে তব নব অভিলাষ,
পূর্ণ হলে আজিকার এই মনোরথ?

৫

কহিলে—"প্রণয়ে মোর কর গো প্রত্যয়;
বারবার প্রত্যাখ্যাত আসি বারবার;
সকল আশায় মম, সর্ব্ব কামনায়
সিদ্ধি তব প্রেমলাভ, জানিও নিশ্চয়।
তোমার হৃদয়ে প্রেম নাও যদি রয়,
আমার এ প্রেম গিয়া করিবে সঞ্চার
তোমাতে কনকশিখা; সুন্দর সংসার
হেরিবে সুন্দরতর, গীতিপ্রীতিময়।

জান না প্রেমের ধর্ম্ম ? যথা দাবানল
কাননের কোন প্রান্তে শুষ্ক তরু-শাখে
জ্বলিয়া, বর্দ্ধিত-তনু, সর্ব্বদিক ধায়,
সরস নীরস তরু, লতা-গুল্ম-দল
অনল করিয়া লয়, কিছু নাহি রাখে,
এ প্রেম লইবে তথা তোমার হৃদয়।"

৬

কহিনু,—সার্থক হোক তোমার প্রণয়।
তুমি আপনারে দিয়া যদি সুখ পাও,
আমাতে যা আছে, যদি শুধু তাই চাও,
তোমার অতৃপ্তি, মোর অপূর্ণ না হয়,
তবে আমি ত্যজিলাম ভবিষ্যের ভয়।
বিশাল হৃদয় তব, যদি পার, তা'ও
কর গো বিশালতর, তাহে স্থান দাও
সব দোষে গুণে মোরে,—হোক তব জয়।
বহু ভার বহে নারী, বহু ভার সহে,
কেবল নিজের ভার দুর্ব্বহ তাহার,
এ বোঝা নামায়ে লও। চল মোর আগে
দেখাইয়া পথ মোরে। যদি অন্ধ রহে,
ঢাকে আঁখি, কর-স্পর্শে করিও সঞ্চার
নব দৃষ্টি, দীপস্পর্শে দীপ যথা জাগে।

বিদেশী গল্প।

প্রতিদ্বন্দ্বী।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। জর্ম্মনেরা ফরাসী রাজ্য অধিকার করিয়াছে। সমগ্র দেশটা যেন আজ বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর পদতলে শায়িত, অবসন্নদেহে মনের ভাবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

দীর্ঘকাল অনশনে পীড়িত, যন্ত্রণা ও নৈরাশ্যে অবসন্ন নগরবাসী আজ প্রথম ট্রেনযোগে প্যারী নগরী হইতে সীমান্ত প্রদেশে গমন করিতেছিল। রেল-গাড়ী বনপঙ্‌ক্তিতে পল্লী ও নগরের মধ্য দিয়া চলিতেছে। আরোহীরা বাতায়নপথে দেখিতেছিলেন, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র শত্রুসৈন্যের

পদতলে বিদলিত, পল্লীকুটীর ভস্মীভূত হইয়াছে। যে সকল কুটীর ভাগ্যক্রমে অগ্নিদেবের লেলিহান রসনা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, তাহাদের বহির্দ্বারে চেয়ার পাতিয়া কোনও কোনও প্রুসীয় সৈনিক ধূমপান করিতেছে; কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে কুটীর-সম্মুখে বিচরণ করিতেছে। কোনও কোনও সৈনিক, যেন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আত্মীয়ের ন্যায় গৃহকর্ম্মে রত, কিংবা হাস্য পরিহাস ও গল্প করিয়া বেড়াইতেছে।

মঁসিয়ে ডুবিয়ে, নগরের অবরোধকালে, প্যারী নগরীতে "জাতীয় রক্ষী সৈন্যে"র দলভুক্ত ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমানের মত শত্রুর অভিযানের পূর্ব্বেই স্ত্রী ও কন্যাকে সুইজারলণ্ডে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে আজ তিনি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য রেলযোগে গমন করিতেছিলেন।

দুর্ভিক্ষ, অনশন ও নানারূপ কষ্টেও, ঐশ্বর্য্যশালী শান্তিপ্রিয় বণিকের বিশেষত্বসূচক মঁসিয়ে ডুবিয়ের বিপুল উদরটির আয়তনের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। বিগত বর্ষের ভীষণ ঘটনাবলী তাঁহার চক্ষুর উপর অভিনীত হইয়াছে। তিনি মানুষের প্রতি মানুষের পশুর ন্যায় নিষ্ঠুর ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। করুণায় অনুকম্পায় হৃদয় দ্রবীভূত হইলেও ডুবিয়ে নির্ব্বাকভাবে সব সহ্য করিয়াছেন। কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। সুইসদেশে সীমান্ত প্রদেশে গমনকালে এই প্রথম তিনি প্রুসীয় সৈন্য দেখিলেন। দুর্গ-প্রাকারে থাকিয়া ফরাসী সৈন্য যখন নগর রক্ষা করিতেছিল, ডুবিয়ে তখন সেখানে ছিলেন বটে, কিন্তু কোনও প্রুসীয় সৈনিক কখনও তাঁহার নয়নপথে পতিত হয় নাই।

সশস্ত্র, শস্ত্রপাণি শত্রু-সৈন্যের দিকে চাহিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ আতঙ্ক ও ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাহারা সমগ্র ফরাসী রাজ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এ দেশ যেন তাহাদেরই স্বদেশ! এ কথা মনে করিয়া মঁসিয়ে ডুবিয়ের হৃদয়ে বন্য স্বদেশানুরাগ জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার আত্মরক্ষার সংকল্প ও হিতাহিতজ্ঞানও প্রবল হইয়া উঠিল। সেই কামরায় দুইটি ইংরাজ আরোহীও ছিলেন। তাঁহারা তামাসা দেখিবার অভিপ্রায়ে ফ্রান্সে আসিয়াছিলেন। আরোহিদ্বয় বলিষ্ঠ ও স্থূলকায়। তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষায় আলাপ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে 'রেলওয়ে-গাইড্' বই লইয়া ষ্টেশনের নামগুলি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিলেন।

সহসা ট্রেন একটি পল্লী-ষ্টেশনে থামিল। জনৈক প্রুসীয় সামরিক কর্ম্মচারী লম্ফ দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন; তাঁহার কটিবিলম্বিত তরবারী ঝন্‌ঝন্ শব্দ করিয়া উঠিল। লোকটি দীর্ঘাকার, অঙ্গে সামরিক পরিচ্ছদ; তাঁহার মুখমণ্ডল অত্যন্ত শ্মশ্রুল। সৈনিক পুরুষের কেশরাজি রক্তবর্ণ, যেন সর্ব্বদাই উহাতে আগুণ লাগিয়া রহিয়াছে!

ইংরাজ আরোহীরা ঈষৎহাস্যস্ফুরিতাধরে নবাগতের প্রতি সকৌতূহল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মঁসিয়ে ডুবিয়ে সংবাদপত্র-পাঠের ভাণ করিলেন। পুলিস-কর্ম্মচারীকে দেখিয়া তস্কর যেমন শঙ্কিত হয়, তিনিও সেই ভাবে গাড়ীর এক কোণে বসিয়া রহিলেন।

গাড়ী ছাড়িল। ইংরাজেরা ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধস্থল দেখিয়া তৎসম্বন্ধে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আলোচনাকালে এক জন যখন দিক্‌চক্রবালে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক

একটি গ্রামের উল্লেখ করিলেন, তখন প্রবীণ সামরিক কর্মচারী পদযুগল বিস্তৃত করিয়া ফরাসী ভাষায় বলিলেন, "ঐ গ্রামে আমরা বার জন ফরাসীকে মারিয়া ফেলিয়াছি, এবং শতাধিক লোককে বন্দী করিয়াছি।"

এক জন ইংরাজ যাত্রী কৌতূহলী হইয়া তখনই জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রামটির নাম কি?"

প্রবীণ সৈনিক পুরুষ বলিলেন, "ফারস্বার্গ।" তার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমরা এই সব ইতর ফরাসীর কান ধরিয়া ঘুরাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি অবজ্ঞা ও উপহাসসূচক হাস্যসহকারে মঁসিয়ে ডুবিয়ের প্রতি চাহিলেন।

বিজয়ী সেনাদলের অধিকৃত গ্রাম ও পল্লীর মধ্য দিয়া ট্রেন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল। রাজপথে, শস্যক্ষেত্রে, গৃহদ্বারে, সর্ব্বত্রই জর্ম্মন সৈনিক! পঙ্গপালের ন্যায় তাহারা ফরাসীদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সামরিক কর্মচারী হাত নাড়িয়া বলিলেন, "যদি আমি প্রধান সেনাপতি হইতাম, তাহা হইলে প্যারী নগরী লুঠ করিয়া বাড়ী ঘরে আগুন দিয়া সব পুড়াইয়া দিতাম। একটা ফরাসীকেও জীবিত রাখিতাম না। ফরাসীর নাম পৃথিবী হইতে লুপ্ত করিতাম।"

ইংরাজ আরোহী শিষ্টতার অনুরোধে বলিলেন, "বটেই ত।"

প্রবীণ কর্মচারী বলিয়া চলিলেন, "আর বিশ বৎসর পরে সমগ্র ইউরোপ আমাদের অধিকারে আসিবে। প্রুসিয়া সমবেত শক্তিপুঞ্জকে পরাজিত করিতে সমর্থ।"

ইংরাজ আরোহীরা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু এ কথায় কোনও উত্তর করিলেন না। প্রবীণ সামরিক কর্মচারী হাসিতে লাগিলেন। ফরাসীর পরাজয়ে তিনি বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন, ধূলিশায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপমানিত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্য সংপ্রতি অধিকৃত হইয়াছে বলিয়া, তাহার প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। সর্ব্ববিষয়ে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন যে, মন্ত্রী বিস্মার্ক অধিকৃত কামান-পুঞ্জ লইয়া একটি লৌহময় নগর স্থাপন করিবেন। বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তিনি তাঁহার স-বুট পদযুগল মঁসিয়ে ডুবিয়ের উরুদেশে প্রসৃত করিয়া দিলেন। ডুবিয়ের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি একবার ফিরিয়া চাহিলেন।

ইংরাজ আরোহীরা ঘটনাটা যেন লক্ষ্যই করিলেন না; তাঁহারা তখন যেন জগতের কোলাহল হইতে বহু দূরে —আপনাদের দ্বীপে বসিয়া আছেন।

সামরিক কর্মচারী পকেট হইতে ধূমপানের নল বাহির করিলেন। ফরাসী আরোহীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কাছে তামাক আছে?"

মঁসিয়ে ডুবিয়ে বলিলেন, "না, মহাশয়!"

জর্ম্মন বলিলেন, "এবার গাড়ী থামিলে, নামিয়া গিয়া আমার জন্য কিছু তামাক কিনিয়া আনিবে।"

তার পর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি তোমাকে মদ্যপানের জন্য কিছু দিব।"

বাঁশী বাজিয়া উঠিল, ট্রেনের গতি কমিয়া আসিল। এখন যেখানে ট্রেন থামিল, সে ষ্টেশনটি অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

জর্ম্মণ সামরিক কর্ম্মচারী গাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিলেন, মঁসিয়ে ডুবিয়ের হাত ধরিয়া বলিলেন, "যাও, যা বলেছি কর—শীঘ্র যাও!"

এক দল প্রুসীয় সৈন্য সেই ষ্টেশনে অবস্থান করিতেছিল। এঞ্জিন হইতে ধূম নির্গত হইতেছিল, এখনই গাড়ী ছাড়িবে। মঁসিয়ে ডুবিয়ে তাড়াতাড়ি প্লাটফরমে নামিয়া পড়িলেন, এবং ষ্টেশন-মাষ্টারের নিষেধ সত্ত্বেও পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে উঠিয়া পড়িলেন।

* * * * *

সে কক্ষে আর কেহ ছিল না! ক্ষিপ্রহস্তে তিনি ওয়েষ্ট-কোটটি খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বক্ষ দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতেছিল, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তিনি ললাট হইতে স্বেদ-ধারা মুছিয়া ফেলিলেন।

আর একটি ষ্টেশনে ট্রেন থামিল। অকস্মাৎ সেই জর্ম্মন সামরিক কর্ম্মচারী ডুবিয়ের কামরার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এক লম্ফে তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইংরাজ আরোহীরাও কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহার পশ্চাতে সেই কামরায় উঠিলেন। ফরাসীর সম্মুখস্থ আসনে বসিয়া জর্ম্মণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি তোমাকে যা করিতে বলিলাম, তাহা তুমি করিতে সম্মত নও?"

মঁসিয়ে ডুবিয়ে বলিলেন, "না, মহাশয়।"

তখন ট্রেন ছাড়িয়া দিয়াছিল।

সৈনিক পুরুষ বলিলেন, "আমি তোমার গোঁফ জোড়া ছিঁড়িয়া লইয়া আমার নলে ভরিব।"

তিনি ফরাসীর মুখের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন।

ইংরাজ যাত্রীরা নির্ব্বিকারচিত্তে তাঁহাদের পানে চাহিয়া রহিলেন।

জর্ম্মণটি ইতিমধ্যে মঁসিয়ে ডুবিয়ের গুম্ফ ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিলেন। ডুবিয়ে ঠেলা দিয়া সামরিক কর্ম্মচারীর হাত সরাইয়া দিলেন। তার পর জর্ম্মণ সৈনিকপুরুষের টুঁটী চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে আসনের উপর ফেলিয়া দিলেন। ক্রুদ্ধ ফরাসীর মুখমণ্ডলের শিরাসমূহ উত্তেজনায় স্ফীত হইয়া উঠিল; নয়নযুগলে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। এক হস্তে তিনি সামরিক কর্ম্মচারীর গলা চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, এবং মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্তের দ্বারা শত্রুর মুখমণ্ডলে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিলেন। প্রুসীয় বীর আততায়ীর কবল হইতে মুক্তি-লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তরবারী কোষোমুক্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। মঁসিয়ে ডুবিয়ে প্রকাণ্ড ভুঁড়ীর চাপে তাহাকে যেন পিষ্ট করিতেছিলেন। অবিশ্রান্ত বারিধারার ন্যায় সামরিক কর্ম্মচারীর উপর মুষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছিল। জর্ম্মণের মুখমণ্ডল রক্তধারায় আপ্লুত হইয়া গেল। ভগ্নদন্ত, পরিশ্রান্ত জর্ম্মণ ফরাসীর কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না।

ইংরাজেরা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ব্যাপারটি ভাল করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে নিকটে সরিয়া আসিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বি-যুগলকে বাধা দিলেন না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন।

মঁসিয়ে ডুবিয়ে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি অকস্মাৎ শত্রুকে ত্যাগ করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে আপনার আসনে উপবেশন করিলেন।

প্রুসীয় কর্ম্মচারী আর তাঁহাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলেন না। ফরাসীর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে রক্তাক্তদেহ জর্ম্মণ বিলক্ষণ ভীত হইয়াছিলেন। যখন তিনি একটু সুস্থভাবে নিঃশ্বাসত্যাগে সমর্থ হইলেন, তখন সৈনিকপুরুষ বলিলেন, "পিস্তল-যুদ্ধে আপনি সম্মত না হইলে আমি আপনাকে খুন করিব।"

ডুবিয়ে বলিলেন, "যখন ইচ্ছা, আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।"

জর্ম্মণ বলিলেন, "এই ত ষ্ট্রাস্‌বার্গ নগর। আমি দুই জন সামরিক কর্ম্মচারীকে আমার সহকারী নিযুক্ত করিব। গাড়ী এই ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে।"

মঁসিয়ে ডুবিয়ের তখনও ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছিল। তিনি ইংরাজ যাত্রীদিগকে বলিলেন, "আপনারা আমার সহায়তা করিবেন?"

উভয়েই সমস্বরে বলিলেন, "নিশ্চয়।"

গাড়ি থামিল। এক মিনিটের মধ্যে প্রুসীয় বীর দুই জন জর্ম্মণ সৈনিক পুরুষকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তাঁহাদের কাছে এক যোড়া পিস্তল ছিল। তখন সকলে প্রাকারের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইংরাজেরা পুনঃ পুনঃ ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিতেছিলেন। তাঁহারা তাড়াতাড়ি সব কাজ সারিয়া লইলেন। পাছে ট্রেন ফেল হইতে হয় বলিয়া তাঁহারা অত্যন্ত চঞ্চলভাবে উপস্থিত কার্য্যগুলি ক্ষিপ্রহস্তে সম্পন্ন করিলেন।

মঁসিয়ে ডুবিয়ে জীবনে কখনও পিস্তল ব্যবহার করেন নাই।

প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট হইতে তাঁহাকে বিশ গজ দূরে দাঁড়াইতে হইল।

তাঁহাকে যখন প্রশ্ন করা হইল, "আপনি প্রস্তুত?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, মহাশয়।" সেই সময় তিনি দেখিলেন, একজন ইংরাজ ছাতা খুলিয়া রৌদ্র নিবারণ করিতেছেন।

এক জন বলিয়া উঠিলেন, "এইবার গুলি কর।"

মঁসিয়ে ডুবিয়ে কি করিতেছেন, কোন দিকে গুলি করিতেছেন, এ সব বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে গুলিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সবিস্ময়ে তিনি দেখিলেন, প্রুসীয় সৈনিকপুরুষ আহত হইয়াছেন, তিনি দুই হাত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সম্মুখে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। ডুবোর গুলিতে জর্ম্মণ বীর নিহত হইয়াছেন।

এক জন ইংরাজ আবেগে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেশ।" দ্বিতীয় ইংরাজ যাত্রী তখনও ঘড়ি দেখিতেছিলেন। তিনি মঁসিয়ে ডুবিয়ের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন, এবং দ্রুতবেগেই ষ্টেশনের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তিন জন পাশাপাশি চলিতে চলিতে সংবাদপত্রের পঞ্চরঙের ছবির ন্যায়, লম্ফগতিতে ষ্টেশনে পঁহুছিলেন।

তখন ট্রেণ ছাড়িতেছিল। লম্ফ দিয়া তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করিলেন।

ইংরাজ যাত্রীরা টুপী খুলিয়া তিনবার মাথার উপর ঘুরাইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হিপ্ হিপ্ হুররে!"

তার পর গম্ভীরভাবে উভয়ে একে একে তাঁহাদের হস্ত মঁসিয়ে ডুবিয়ের দিকে বাড়াইয়া দিলেন। করকম্পন শেষ হইলে যে যার নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন। *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

দাশরথী রায়।

আলোচনা।

পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল, দাশরথী রায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। পাঁচালী-কার ও গীত-রচয়িতা বলিয়া আজিও তাঁহার নাম দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা না হইয়াছে, এমন নহে। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" দাশরথীর উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ইহাতে দাশরথীর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ও তাঁহার রচনার সমালোচনা আছে। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত দাশরথীর পাঁচালীর সংস্করণের প্রস্তাবনায় শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় দাশরথীর রচনা সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যত্রও দাশরথী সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে "অবসর" নামক মাসিক পত্রে "দাশরথী রায়" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, দেখিয়াছি।

মতভেদ।

দাশরথী রায় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাতে বড়ই মতভেদ আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে, দাশরথীর রচনায় গুণের ভাগ অতি অল্প, দোষ অত্যন্ত অধিক। বঙ্গবাসী, অবসর প্রভৃতির মত ইহার বিপরীত। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র প্রণয়নে দীনেশচন্দ্র যে অতুল অধ্যবসায়, বিপুল পরিশ্রম ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসী চিরদিন তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে। তিনি অসংখ্য গ্রন্থকার ও কবি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাহার সকল অভিমত সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে, এমন আশা করা যায় না। আমাদের মনে হয়, দীনেশ বাবু দাশরথী সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,

---

* গীদে মোপাঁসার গল্পের ইংরেজী হইতে অনূদিত।

তাহা সঙ্গত হয় নাই, এবং ইহাতে দাশরথীর প্রতি একান্ত অবিচার করা হইয়াছে। এইরূপ মনে হইয়াছে বলিয়াই এই প্রবন্ধ লিখিতেছি।

দাশরথীর রচিত পাঁচালী ও গীতের সঙ্গেই কেবল আমাদের পরিচয়; কেন না, আমাদের জন্মের পূর্ব্বেই তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন। কিন্তু দাশরথীকে দেখিয়াছেন, এবং তাঁহার দলের পাঁচালী ও গান শুনিয়াছেন, দেশে এখনও স্থানে স্থানে এমন কেহ কেহ জীবিত আছেন। আমরা যত দূর সন্ধান করিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছি যে, এই শ্রেণীর সকল লোকই একবাক্যে দাশরথীর প্রশংসা করেন, এবং কহেন যে, দেশে তাঁহার স্থায় কবি অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

অনুকূল মত।

"বঙ্গবাসী"র শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় কাশীবাসী বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যে পত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেই প্রকাশ যে, বঙ্গের তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী দাশরথীর পাঁচালী শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেন, এবং আসরে দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত কোলাকুলি করিতেন।

রাখালদাসের বয়সের বাঙ্গালী পণ্ডিত এখন আর কেহই জীবিত নাই। দাশরথী সম্বন্ধে কিছু লিখিব বলিয়া আমি বঙ্গের বহু অধ্যাপকের সহিত আলাপ করিয়াছি। পরলোকগত পণ্ডিতদিগের কথা বলিব না। যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে মূলাযোড় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ভট্টপল্লীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, নবদ্বীপের কবিভূষণ অসাধারণ কবি ও বৈয়াকরণ শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ও কাব্যনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা, আলঙ্কারিক, শান্তিপুরবাসী শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়দিগের নাম করিতে পারি। ইঁহারা সকলেই বাল্যকালে আসরে বসিয়া দাশরথীর গান শুনিয়াছেন। দাশরথীর প্রশংসার্থ ইঁহাদের প্রত্যেকে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লিখিতে গেলেই এক একটি প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস দাশরথীর যেরূপ সুখ্যাতি করিয়াছেন, ইঁহাদের প্রদত্ত প্রশংসা তদপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যূন নহে। ইঁহারা সকলেই বলেন, রচনা-মাধুর্য্যে ও শব্দ-যোজনা-চাতুর্য্যে দাশরথীর সমকক্ষ কবি বঙ্গে কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। দেশে দাশরথীর রচনার ন্যায় সরস জিনিস আর হইবে না।

গত ১৩১৭ সালের মাঘ মাসে আমি কাশীধামে শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ

Mohila Press, Cal

মহাশয়ের দর্শন লাভ করি। দাশরথীর সম্বন্ধে দুটি কথা তাঁহার নিজের মুখে শুনিব, ইহাই ইচ্ছা ছিল। দাশরথীর নাম করিতেই এই ঋষিপ্রতিম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইল, এবং আমি দাশরথীর অনুকূলে দুই একটি কথা বলিতেই তিনি যে ভাবে আমার মস্তকে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তুমি দাশরথীকে কবি বল! আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও।" ইহার অর্থ এই যে, আমাদের শ্রেণীর লোক দাশরথীকে কবি বলিতে সম্মত নহেন। পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয় পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন যে, আমি এক জন সামান্য রাজকর্ম্মচারী এবং কিঞ্চিৎ ইংরাজী জানি। তাঁহার যেন মনে হইল যে, আমি দাশরথীর প্রশংসার্থ দুটি কথা কহিয়া তাঁহার শ্রেণীর পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মানবর্দ্ধন করিলাম! বৃদ্ধ যুবকের উৎসাহ ও আনন্দের সহিত দাশরথীর দুই তিনটি গান উদ্ধৃত করিয়া আমাকে তাহার সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দিলেন।

বঙ্গে এই শ্রেণীর লোক অবশ্যই বিরল হইয়া আসিতেছেন। আমাদের শিক্ষা অন্যরূপ। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা কাব্যের দোষগুণ-বিচারে অক্ষম, ইহা বলা যায় কি? ইহাদের সকলেরই মতে, দাশরথীর পাঁচালী উচ্চ অঙ্গের কাব্য। শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় সংস্কৃত কলেজের এক জন প্রাচীন ছাত্র। ইহার সহিত আমার যখন দাশরথী সম্বন্ধে কথোপকথন হয়, তখন তিনি তাঁহার স্বরচিত কাব্যনির্ণয় খুলিয়া কবির দুইটি গান আমাকে দেখাইয়া দেন, এবং বলেন, গুণের উদাহরণ বলিয়াই আমি উহা উদ্ধৃত করিয়াছি। *

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কথা বলিলাম। এইবার ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত দুই এক জন সুধীর নাম করি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন, "যিনি বাঙ্গালা ভাষায় সম্যক্‌রূপ বুৎপন্ন হইতে বাসনা করেন, তিনি যত্নপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দাশুরায়ের পাঁচালী পাঠ করুন।" সেদিন "আর্য্যাবর্ত্তে" দেখিলাম, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিষ্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়কে ঠিক এই ভাবের কথা বলিয়াছেন,—দাশরথীর পাঁচালীই খাঁটী বাঙ্গালার শেষ রচনা। বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ উপাসক ও বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে কহিয়াছেন,—যাঁহারা

* আমি আছি গো তারিণী ঋণী তব পায় ইত্যাদি—কাব্যনির্ণয়; অষ্টম সংস্করণ—৩২৯ পৃঃ। ধনী আমি কেবল নিদানে ইত্যাদি—৩৩০ পৃঃ।

দাশরথীকে কবি বলিতে চাহেন না, তাঁহারা হয় কাব্যের রসাস্বাদনে অক্ষম, নচেৎ দাশরথীর রচনা বিষয়ে অজ্ঞ। আর মত উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন আছে কি?

শিক্ষিতসমাজের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা।

এইরূপ মত সত্ত্বেও দাশরথী আধুনিক শিক্ষিতসমাজে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত। বঙ্গবাসীর শ্রীযুক্ত হরিমোহন শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রতি যেরূপ তীব্র শ্লেষ ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা করিতে চাহি না। তবে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, বঙ্গসাহিত্যে দাশরথী রায়ের যে স্থান পাওয়া উচিত, তাহা তিনি পান নাই। শিক্ষিত বাঙ্গালী তাঁহার রচনার উপযুক্ত সমাদর করেন নাই। ইঁহাদের অনেকের মতে দাশরথী রায়ের রচনা অপাঠ্য।

এই উপেক্ষা ও অবজ্ঞার জন্য দীনেশচন্দ্রই অনেকপরিমাণে দায়ী। দাশরথী সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য অত্যন্ত প্রতিকূল জানিয়া অনেকে হয় ত দাশরথীর রচনা পড়েন নাই। ফল এই দাঁড়াইয়াছে, যদিও দীনেশচন্দ্র স্বয়ং দাশরথীকে কবি ও প্রতিভাশালী কবি বলিতে প্রস্তুত, শিক্ষিতসমাজের অনেকেই দাশু রায়কে কবি বলিলে শিহরিয়া উঠেন। অল্পদিন হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী এক জন যুবক আমাকে কহিয়াছিলেন, "আপনি কি দাশু রায়কে কবি বলেন? তিনি এক জন পাঁচালীর ছড়াদার মাত্র।" আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্"; অথবা "কথ্যতে কাব্য মিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী"; অর্থাৎ, রসাত্মক বাক্য অথবা চমৎকার-অর্থযুক্ত পদাবলীই যদি কাব্যের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে, দাশু রায়ের পাঁচালী কাব্য, এবং স্থানে স্থানে উহা অতি উৎকৃষ্ট কাব্য। দুই একটি উদাহরণ শুনিয়া তিনি কহিলেন, "দাশরথীর রচনাতেও যে পড়িবার জিনিস আছে, তাহা আপনার মুখে আজ প্রথম শুনিলাম।"

ফলতঃ অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিয়া বুঝিয়াছি যে, দাশরথীর রচনা অশ্লীলতা-দোষে দূষিত, এবং কদর্য্য অনুপ্রাসে পূর্ণ; উহাতে শব্দের ঝঙ্কার ভিন্ন অর্থের চমৎকারিত্ব কিছুই নাই, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। এই সকল কারণে অনেকেই দাশরথীর রচনা অপাঠ্য মনে করিয়া উহা পাঠ করেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের পরম অনুরাগী সুলেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বিদ্যারত্ন এম্. এ. মহাশয়ের লিখিত বানান-সমস্যায় দেখিলাম—

"দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

দাশরথীর এই গানটির যথায় শব্দের টীকা করিতে যাইয়া তিনি ইহাকে "প্রসাদ-সঙ্গীত" * বলিয়াছেন! সত্য সত্যই বলিতেছি, "সাহিত্যে" যেদিন এইটি পড়িলাম, সেই দিনই মনে হইল, দাশরথীর দোষক্ষালনার্থ দুটি কথা লিখিব। অধ্যাপক ললিতকুমার দাশরথীর গানকে রামপ্রসাদের গান বলিবেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

সম্প্রতি একখানি গানের বহি দেখিলাম, নাম গীতিমালিকা। সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক বি. এ.। দাশরথীর একটি অতিপ্রসিদ্ধ গান—

"ননদিনী গো বলো নগরে, সবারে,
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।" ইত্যাদি।

উদ্ধৃত করিয়া, তলায় রচয়িতার নাম লিখিয়াছেন,—"মধুসূদন কিন্নর।" ইহা দাশরথীর দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলিব! "বঙ্গবাসীর" হরিমোহন অনায়াসেই বলিতে পারেন যে, আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় মনে করেন যে, তাঁহারা রামপ্রসাদ, দাশরথী, মধু কান প্রভৃতির নাম জানেন, ইহাই যথেষ্ট। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় দাশরথীর প্রতি শিক্ষিতসমাজের অবজ্ঞার কথা তুলিয়া যে সরস বিদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমি উহা পত্রস্থ করিব না। উহার অর্থ এই যে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, দাশরথীকে না জানাই সুশিক্ষার পরিচয়।

কিন্তু শিক্ষিতসমাজ যতই অবজ্ঞা করুন না কেন, দাশরথীর রচনা দেশে অনাদরের বস্তু নহে। বঙ্গদেশে এমন স্থান অতি অল্পই আছে, যেখানে দাশরথীর রচনার প্রচার নাই।

প্রচার।

বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত দেশের কত স্থানে, কত ভাবে দাশরথীর ছড়া ও গান শুনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। অতি অল্প বয়সে ফরিদপুর জেলায় এক পরমাত্মীয়ের আলয়ে যাত্রা শুনিতে বসিয়াছি; গৌরচন্দ্রিকার পরে অধিকারী মহাশয় সাধা গলায় সীতার বনবাস পালা আরম্ভ করিলেন:— "শুনিলে পবিত্র চিত, বাল্মীকির সুরচিত, রামতত্ত্ব সুধার সোসর।" তখন জানিতাম না, এখন জানিয়াছি, ইহা দাশু রায়ের ছড়া। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে নলডাঙ্গার বিখ্যাত ভূস্বামী শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ দেব রায় বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর রাজবাটীতে সঙ্গীতের আয়োজন হইল।

---

* সাহিত্য, ১৩১৮, ভাদ্র, ৩৮০ পৃষ্ঠা।

রাজা বাহাদুরের সুযোগ্য দেওয়ান বরদা বাবু স্বয়ং গান ধরিলেন, "কে নাম দিলে ত্রিগুণধারিণী, কে নাম রেখেছে নিস্তারিণী" ইত্যাদি। ইহার তিন বৎসর পরে বাঁকুড়ায় গিয়াছিলাম, সেখানেও পল্লীগ্রামের এক ব্রাহ্মণের মুখে প্রথমেই গান শুনিলাম—

"মন রে বিপদে ত্রাণ আর কলিনে,
বলিতে হরি তোর আর বলিনে,
তুই এ জনমে হরিপদ-নলিনে স্থান নিলি নে" ইত্যাদি।

বার চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জেলার বকর্ষুড়ি গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমীদার মুনশী বাবুদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব দেখিতে গিয়াছি। বাহিরে দেবীমণ্ডপের সম্মুখে বামা-কণ্ঠে গান হইতেছে—

"জামাই নাই মা আর তোর ভিখারী,
শিব কাশীতে রাজরাজেশ্বর, তোর মেয়ে রাজরাজেশ্বরী।" ইত্যাদি।

শুনিলাম, গৃহস্বামী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন সেন বি. এল. মহাশয় এই গানটি বড়ই ভালবাসেন।

ইহার কিছুদিন পরেই ঢাকা জেলার এক প্রান্তে পদ্মাবক্ষে জীর্ণ নৌকায় বসিয়া আছি, সকালবেলা এক ভিক্ষুক বৈষ্ণব নৌকায় আসিয়া গান ধরিল—

"কানাই, এ কি ভাই, বলি প্রভাতে অচৈতন্ত।
উঠরে ভাই, ও নীলতনু, খায় না ধেনু, বেণু বিনা।" ইত্যাদি। *

বলা বাহুল্য, এ সকলই দাশরথি রায়ের গান।

আর কত বলিব? এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার চৌদ্দ পনেরটি জেলা ঘুরিয়াছি; যেখানে গিয়াছি, সেইখানেই দাশরথির গান শুনিয়াছি। এক দিকে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, অন্য দিকে রাজসাহী, দিনাজপুর, অথবা ঢাকা, মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, ইহার কোনও স্থানেই দাশরথী অপরিচিত নহেন। হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া, যশোহর, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সাময়িক সাহিত্যেও দাশরথীর সম্মান একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। "বঙ্গবাসী" সম্পাদক সুকবি বৃদ্ধ বিহারীলাল এখনও সময়ে সময়ে দাশরথীর গান কিংবা পদ উদ্ধৃত করিয়া থাকে। যত দূর মনে হয়, গত শারদ-উৎসবের পূর্ব্বে সমাজপতি মহাশয়ের সম্পাদকতা-কালে বসুমতীর স্তম্ভে "আগমনী" প্রবন্ধের আরম্ভেই তান শুনিয়াছিলাম—

* এই গানটি পিতাপুত্র পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

"গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল, ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী ;
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে, মা কৈ মা কৈ ব'লে,
ডাকছে মা তোর শশধরবদনী।"

ইত্যাদি। আগমনীর গান ইহা অপেক্ষা সুন্দর, ইহা অপেক্ষা মধুর বাঙ্গালায় কিছু আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

দেশের ভিক্ষুক হইতে ভূস্বামী পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এমন প্রচার অন্য কাহারও কবিতার আছে কি? এমন কি, রামপ্রসাদের গানেরও নাই। প্রসাদের গানগুলি প্রায় একই সুরের, এবং একই ভাবের; দাশরথীর গানগুলি নানা সুরের, এবং নানা ভাবের। কাজেই অক্ষয়চন্দ্রের কথায় বলিতে হয়, যাঁহারা "দাশরথীর পাঁচালী অপাঠ্য" বলেন, তাঁহারা উহা পড়েন নাই।

এইবার দীনেশচন্দ্রের মন্তব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। তাঁহার মতে, দাশরথীর প্রধান দোষ, অশ্লীলতা। দাশরথীর রচনায় যে অশ্লীলতা আছে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? তবে এ কথা ঠিক যে, তাঁহার পৌরাণিক-আখ্যান-মূলক পাঁচালী-গুলিতে অশ্লীলতার অংশ অতি অল্প। অনেক পালায় অশ্লীলতা একবারেই নাই। নলিনী-ভ্রমরোক্তি, বিরহ, বা নবীন সোনামণির দ্বন্দ্ব প্রভৃতি দাশরথীর মূল গ্রন্থ নহে, প্রহসনমাত্র। এ কথা ত অবশ্যস্বীকার্য্য যে, দাশরথী যে কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কালে দেশে অশ্লীলতার আদর না থাকিলেও, প্রসার ছিল। তিনি প্রথম বয়সে কবির দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। তখন ইতর শ্রেণীর শ্রোতা অনেকেই কেবল "মোটা" শুনিবার জন্য কবির গান শুনিতে যাইত। দাশরথী সময়ের ও কবির দলের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি সুশিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার সময়ে সাহিত্যে নৈতিক চাবুকেরও ব্যবস্থা ছিল না। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় দাশরথীর সময়ের কবি। তিনিও অশ্লীলতা বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। দাশরথীর রচনা সম্পূর্ণরূপে অশ্লীলতা-বর্জ্জিত হইবে, ইহা কখনই আশা করা যায় না। দীনেশ বাবু নিজেই বলিয়াছেন যে, ভারতচন্দ্র, বায়রণ প্রভৃতি এ দোষ হইতে মুক্ত নহেন। স্বয়ং মহাকবি সেকস্‌পীয়ার ভিনস ও অ্যাডোনিস লিখিয়াছেন।

অশ্লীলতা।

সাধক কবি রামপ্রসাদ প্রথম বয়সে বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছেন, উহা অশ্লীলতায়

পরিপূর্ণ। তাই বলিয়া উঁহার রচিত ভাষায় শ্রেষ্ঠতর শাক্তসাধক গীতগুলি কি বর্জ্জন করিতে হইবে ?*

বস্তুতঃ অশ্লীলতার দোহাই দিয়া দাশরথীর রচনা বর্জ্জন করা যায় না। তবে দেশের রুচি অনুসারে সময়ের পরিবর্তনে ধর্ম্মমূলক সাহিত্যের আদর নাই, ইহা ঠিক ; সেদিন—গত মাঘ মাসের "সাহিত্যে" পাঁচকড়ি বাবুর প্রবন্ধে দেখিতেছিলাম, ইংলণ্ডের এক ধর্ম্মযাজক দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্য ধর্ম্মহীন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশেও তাহাই ঘটিয়াছে। বঙ্কিমের কৃষ্ণ-চরিত্র অপেক্ষা মৃণালিনীর পাঠক অধিক! নবীনের রৈবতক বা কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা ভানুমতীর বা অবকাশরঞ্জিনীর পাঠক অধিক। দাশরথীর মৃণালিনী, ভানুমতী নাই ; কৃষ্ণচরিত্র, কুরুক্ষেত্র আছে। সুতরাং দাশরথীকে অনায়াসে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। নাট্যশালায় আমরা যে পৌরাণিক নাটক দেখিতে যাই, তাহার বোধ হয় অন্ত কারণ আছে। ইহাই যদি কথা হয়, তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু এ হিসাবে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দাশরথীর বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই ; কেন না, তিনি নিজে পৌরাণিক কথায় একান্ত শ্রদ্ধাবান্। তাঁহার রচিত 'সতী', 'বেহুলা', 'জড়ভরত' প্রভৃতি পড়িলেই ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ পৌরাণিক কথা লুপ্ত হইবার এখনও বিলম্ব আছে। অধ্যাপক ললিতকুমার "ছড়া ও গল্পে" কচি মাছের মুখে দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইয়া থাকিবার তুলনা তুলিয়াছেন, দেখিয়াছি।

দীনেশ বাবুর কথা,—"দাশুর রচনা ভ্রমরের মত ; মুখে মধু, কিন্তু হুলে বিষ বহন করে ; উহা শিশুর নবোদগত দন্তের ন্যায় দর্শনে সুন্দর, কিন্তু দংশনে তীব্র! দাশু যেখানে গালি দিবেন, সেখানে তাঁহার লেখনীসংযম অভ্যাস নাই। শত্রুর গালে চুন কালি দিয়া তিনি তামাসা দেখিবেন, বৈষ্ণবনিন্দাটি শুনুন।"

আমাদের মতে, এ সমালোচনাতেও দাশুর প্রতি অবিচার করা হইয়াছে।

দাশরথীর পরনিন্দা।

দাশু কাহাকেও শত্রু মনে করিতেন, তাঁহার লেখা পড়িলে এ ধারণা হয় না। তিনি বৈষ্ণবকে গালি দেন নাই, কিন্তু শাক্তদ্বেষী ভাক্ত বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াছেন। ভক্ত বৈষ্ণবের

* দুঃখের বিষয় এই যে, রামপ্রসাদের এই গানগুলির যেমন পৃথক সংস্করণ হইয়াছে, দাশরথীর অশ্লীল-অংশ-বর্জ্জিত পৌরাণিক পাঁচালীগুলির তেমন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গবাসী, বসুমতী প্রভৃতি কেহই এরূপ চেষ্টা করেন নাই।

প্রতি তাঁহার ভক্তি ছিল। ভাক্ত বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াই দাশরথী দেখাইয়াছেন যে, নারদ প্রভৃতি এরূপ বৈষ্ণব নহেন। তাঁহার রচনা সকল পড়িলে প্রতীতি হয় যে, তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব ও শাক্তের পূজা করিতেন। শাক্ত-বৈষ্ণব-দ্বন্দ্বে যিনি লিখিয়াছেন,—

"শক্তি-উপাসক হয়ে কৃষ্ণ ভাবে অন্য,
শক্তির কি শক্তি আছে তার মুক্তিজন্য?
কৃষ্ণপদ ভাবিয়ে দুর্গাকে ভাবে ভিন্ন,
তাহাকে নিদয় কৃষ্ণ হন চিরদিন।"

তিনি কি প্রকৃত বৈষ্ণবের নিন্দা করিতে পারেন? দাশরথী ভেদজ্ঞানীকে তিরস্কার করিয়াছেন। তাঁহার কৃষ্ণ ও কালীর প্রতি প্রযুক্ত এক একটি গান,—

অপরূপ রূপ কেশবে + (কে শবে)

শুনিয়া শাক্ত বৈষ্ণব উভয়ে একত্র আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন।

দাশরথীর গালিও শত্রুর গালে চুণ কালি দেওয়া নহে। তিনি যাহার দোষ দেখিয়াছেন, তাহাকে সম্মুখে পাইলেই মুখের উপর দু' কথা শুনাইয়া দিয়াছেন, ইহা বলিলেই ঠিক হয়! দাশরথী স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন। বিদ্বেষবশে কাহাকেও গালি দিয়াছেন, ইহা তাঁহার পাঁচালীর কোনও অংশ পড়িয়াই মনে হয় না।

উপমা।

দাশরথীর উপমা সম্বন্ধে দীনেশ বাবু বিদ্রূপের ভাষায় বলিয়াছেন যে—"দাশরথীর গুণের সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না।" তিনি বলিতেছেন,—"দাশরথী এক স্থানে রাশি রাশি উপমা আনিয়া পাঠকের ধৈর্য্য লোপ করেন; থাম থাম বলিয়া পরিত্রাহি চীৎকার না করিলে বিরাম নাই।" এইরূপ উপমা এখনকার কালের পাঠকের বিরক্তিকর হইতে পারে, কিন্তু দাশরথীর সময়ের বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ এই উপমারই ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা দুই একটি পাঠককে শুনাই—

"যেমন তীর্থের শেরা কাশীধাম, কর্ম্মের শেরা নিষ্কাম,
নামের শেরা রামনাম তারকব্রহ্ম জানি;

+ "অপরূপ রূপ কেশবে (কে শবে?
দেখ রে ভায়া এমন ধারা কাল রূপ কি আছে ভবে?)" ইত্যাদি

খাদ্যের শেরা ঘৃত ক্ষীর, দেশের শেরা গঙ্গাতীর,
বেশের শেরা শ্রীপতির গোষ্ঠ-বেশখানি ;
বলের শেরা যোগবল, ফলের শেরা মোক্ষফল,
জলের শেরা গঙ্গাজল, খলের শেরা ফণী ;
পুরাণের শেরা ভারত, রথের শেরা পুষ্পক রথ,
পুত্রের শেরা ভগীরথ—বংশচূড়ামণি।"

এরূপ উপমা কি সত্য সত্যই কেবল উপহাস করিবার সামগ্রী? ইহাতে কি রচনা-নৈপুণ্য কিছুই নাই? একটি বড় ছড়া উদ্ধৃত করি। কলঙ্ক-ভঞ্জন পালায় শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকে বুঝাইতেছেন যে,—জগদারাধ্য তোমাকে ভজন করিয়া আমার নাম হইল কলঙ্কিনী, ইহা কেমন বিপরীত, যেমন—

"অমৃত খাইয়া রোগ, ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণবিয়োগ,
ভেবে কিছু করতে নারি ধার্য্য।
সখা যার গরুড়ের সঙ্গে, তার বক্ষঃ খায় ভুজঙ্গে,
ওহে মোক্ষদাতা কিমাশ্চর্য্য!
গ্রহ-যাগের এই কি গুণ, দ্বিগুণ হয় গ্রহ বিগুণ,
জেলে আগুন দ্বিগুণ কম্প শীতে।
বাসকে বাড়িল কাশ, দয়া করে দণ্ডনাশ,
গয়া ক'রে কি নরকে যায় পিতে?
ভক্তি ক'রে ভাব চটে, দান ক'রে দুর্গতি ঘটে,
মিছরী-পানা পান ক'রে ক্ষিপ্ত।
কোন শাস্ত্রে শুনি নাই! কাশীতে ম'রে স্বর্গবাস,
আর কাশীতে ম'রে ভূতযোনি প্রাপ্ত।
জগন্নাথ দেখে রথে নর কি যায় নরকেতে,
গণেশ ডাকিয়ে কর্মে বাধা—
মাণিক রাখিয়ে ঘরে দৃষ্টি হয় না অন্ধকারে,
(তেমনই) কৃষ্ণ ভ'জে কলঙ্কিনী রাধা॥

এই সকল উপমার আখ্যানবস্তু অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিক কথা, অথবা দেশের প্রাচীনবিশ্বাসমূলক, ইহা বলিয়া দোষ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উপমা কদর্য্য, ইহা বলা যায় না।

ধ্যানী বিবেকানন্দ

[১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ]

Mohila Press, Cal.

স্বামী বিবেকানন্দ

দীনেশ বাবু দাশরথীর যমক ও অনুপ্রাসের কথা বিশেষভাবে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তবে এ কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে, "শব্দের বাঁধুনীর জন্ত" কিছু প্রশংসা দাশুর প্রাপ্য হইতে পারে। তাঁহার মত এই যে, দাশুর লেখায় শব্দের বাঁধুনী আছে, উহা "শ্রুতিসুখকর", কিন্তু উহাতে অর্থের গৌরব নাই। যমক অনুপ্রাসের নিমিত্ত দাশরথী অন্ত স্থানেও নিন্দিত হইয়াছেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে দু'টি কথা না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

যমক ও অনুপ্রাস—শব্দের বাঁধুনী।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, স্বর্গীয় মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় দাশরথীর শব্দের বাঁধুনীর দুই একটি দোষ দেখাইতেন; যথা, বৃন্দার প্রতি বৈদ্যবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

ভজন কর কৃষ্ণজীরে, ভোজন করো কৃষ্ণ জিরে।

আমরাও বলি, এইরূপ যমক, অথবা "কৃষ্ণ ডাকেন কুজায়, কুজাকে তা কু বুঝায়—" ইহা হয় ত সুন্দর নহে, কিন্তু দাশরথীর অধিকাংশ যমক ও অনুপ্রাসই যে অতি সুন্দর, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যমক ও অনুপ্রাসের রাজা, বাঙ্গালা সাহিত্যে এত যমক অনুপ্রাস কেহই ব্যবহার করেন নাই। যিনি সহস্র সহস্র অনুপ্রাস রচনা করিয়াছেন, তাঁহার দুই একটি সৌন্দর্য্যহীন হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

ফলতঃ অনুপ্রাস ও যমকই দাশরথীর কাব্যের প্রধান অলঙ্কার। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় দাশরথীর শব্দের বাঁধুনী দেখাইবার জন্ত যমক ও অনুপ্রাসে পূর্ণ কয়েকটি গীত যে ভাবে আমার সমক্ষে আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বলা বাহুল্য, এগুলি তাঁহার মতে অতি সুন্দর। সমস্ত উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। এ স্থানে একটিমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

কার সাধ্য ওমা সীতে, তব মহিমা ঘোষিতে ?
তুমি সীতে, তুমি অসীতে, তুমি অন্নদা কাশীতে।
অসিতে রূপে অসি ধরা, দনুজকুল নাশ করা,
সীতে রূপে এসেছ ধরা, রাবণকুল নাশিতে।
দেহি অন্ন দাসে দেহি, বিশ্বমাতা বৈদেহী,
ভব-ক্ষুধা নিবৃত্তি কর, আর দিও না আসিতে।
যদি না তোষিবে দীনে, অন্নাদি ভূষণ দানে,
দাশরথীরে হবে নিদানে, চরণ-দানে তোষিতে।

গীতিমালিকায় উদ্ধৃত গানটি এই—

ননদিনী গো ব'লো নগরে, সবারে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে।
কার কি বাসে, কার কি বাসে, কার কেবল সেই পীতবাসে,
সে থাকে যার হৃদয়-বাসে, সে কি বাসে বাস করে?
কার কি গোকুল, কার কি গো কুল, গোকুলবাসী হ'ক প্রতিকূল,
আমি ত স'পেছি গো কুল, অকূল-কাণ্ডারীর করে।

নব্য পাঠকেরা কি বলিবেন, জানি না, কিন্তু এক সময়ে এই গানটি নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে পাগল করিয়াছিল। স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি যাঁহাদিগের সঙ্গতি ছিল, তাঁহারা দাশরথীকে মূল্যবান উপঢৌকন দিয়াছিলেন। ব্যাদ্‌ড়াপাড়ার বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য নামক এক দরিদ্র পণ্ডিত তাঁহার ব্রাহ্মণীর একমাত্র স্বর্ণ-অলঙ্কার কাণের চেঁড়ী দুইটী খুলিয়া আনিয়া তাহাই আসরে ফেলিয়া দেন। দাশরথী ইহা জানিতে পারিয়া চেঁড়ী দুইখানির সহিত ৫৲ পাঁচটি টাকা লইয়া বিষ্ণুচরণকে প্রণাম করিতে যান। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহা লইতে অসম্মত হইলে দাশরথী বলেন, আপনি ন'দের পণ্ডিত; আমার গান শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। ভট্টাচার্য্য উত্তর করেন, তোমার গান শুনিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, তাহাতে তোমাকে আমার ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়া পুরস্কার দিলেও যথেষ্ট হয় না। কেবল কি শব্দের ঝঙ্কারে মানুষ এমন ভাবে মুগ্ধ হয়?

এ না হয় প্রাচীন ব্যক্তিদিগের মত। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় দাশরথী সম্বন্ধে আমি কিছু লিখিব জানিয়া আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,— "আপনি দাশরথীর ভাষা ও কবিত্ব, দুইই লিখিবেন। কেন না, উহা পৃথক করা চলে না—

সিংহ প্রতি বলেন বধরে বধরে,
আদরেতে হাসি না ধরে অধরে।

এখানে ভাষা কবিত্ব টানিয়া আনিয়াছে, বা কবিত্ব ভাষাকে টানিয়া আনিয়াছে, তাহা বলা যায় না।"

বস্তুতঃ ভাল ভাবে দেখিলে দাশরথীর শব্দের বাঁধুনীর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আর ইহা যে কেবল শব্দের ঝঙ্কার নহে, ইহাতে অর্থেরও গৌরব আছে, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। অর্থের সঙ্গতি রাখিয়া অনুপ্রাস

লিখিবার চেষ্টা সকল কালেই আছে, আমরা এ কালেও দেখিতে পাই,—বইএর নাম "বিষবৃক্ষ", "কড়ি ও কোমল", অথবা "পরপারে"। প্রহসনের নাম,—"বিবাহ-বিভ্রাট", "সম্মতি সঙ্কট, সাবাস আটাশ", বা প্রবন্ধের শিরোনাম "বাঙ্গালা ভাষায় মামলা"। গানের গোড়া, "তব মঙ্গল করে নির্ম্মল কর মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।" কিন্তু দোষী দাশরথী। কেন না, শব্দের রাঁধুনীতে বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। ফলতঃ দাশরথীর যমক অনুপ্রাসে শব্দের মালা অনেক স্থলেই এত সুন্দর, এমন মনোহর যে, সেগুলি মাতৃভাষার গলে মুক্তার মালার ন্যায় মূল্যবান অলঙ্কার বলিয়াই বোধ হয়।

দাশরথীর উপাখ্যানভাগে অপটুতা আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

উপাখ্যানভাগে অপটুতা।

দীনেশ বাবু প্রভাস-মিলনে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা দেখাইয়া দিয়াছেন। এরূপ অপটুতা অন্য পালাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরাধিকার দর্পচূর্ণ পালায় হরগৌরীর কন্দল এই ভাবেরই জিনিস। কিন্তু তাই বলিয়া কি দাশরথীর গুণ উপেক্ষা করিতে হইবে? অ্যাডিসন মিল্টনের কাব্য-সমালোচনায় সমালোচকের কর্ত্তব্য বুঝাইবার জন্য এক জন প্রাচীন পণ্ডিতের দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পাশ্চাত্য পণ্ডিত কাব্যকে জলধির সহিত তুলিত করিয়া বলিতেছেন :—

Errors like straws on the surface flow,
He who would search for pearls must dive below.

অর্থাৎ,—তৃণসম ভাসে ভ্রম—উপরেই রহে।
তলে না ডুবিলে, মুক্তা মিলিবার নহে॥

ফলতঃ ভ্রম সকলেরই চোখে পড়ে, কিন্তু কাব্যের সৌন্দর্য্য, যাহা সকলের অধিগম্য নহে,—তাহা দেখাইয়া দেওয়াই সমালোকের কর্ত্তব্য। দুঃখের সহিত বলিতে হয়, দীনেশ বাবু দাশরথী সম্বন্ধে এ রীতি অবলম্বন করেন নাই। দাশরথীর পাঁচালীতে উপাখ্যানভাগে পটুতার যে প্রমাণ আছে, তাহা তিনি দেখান নাই। আমরা একটিমাত্র গান উদ্ধৃত করিব। শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমনে কৈকেয়ীর উক্তি :—

তুই কি ঘরে এলি রে রামধন।
আমার অন্তরে যে ব্যথা, তুই বই জানে কে তা,
আমি রে তোর কৈকেয়ী অভাগিনী মাতা,
কই কই রাম, তুই কোথা, কই কই দুঃখের কথা, আয় দেখি রে চাঁদবদন।

ভুবন-জীবন রাম তোর বনে দেই নাই আমি,
অন্তরেরি ব্যথা জান অন্তর্যামী,
রাবণে বধিতে বনে গেলে তুমি, আমার ক'রে বিড়ম্বন।
বিধির চক্রে বাছা বনে গমন তোমার,
বনের পশু কাঁদে আমার দুঃখে কুমার,
পাপিনী মা ব'লে মুখ দেখে না আমার পুত্র ভরত শত্রুঘন॥

ইহা দাশরথীর নিজস্ব। কবিপ্রতিম শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় এই গানটি বড়ই ভালবাসেন। ইহার মাধুর্য্য কি বুঝাইয়া দিতে হইবে?

দীনেশ বাবু অন্ত কবির বেলায় (যথা কৃষ্ণকমল গোস্বামী) যেরূপ রচনার বড়ই প্রশংসা করিয়াছেন, দাশরথীর পাঁচালীতে সেরূপ রচনা অনেক থাকিলেও, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। কলঙ্ক-ভঞ্জনের পালায় নন্দালয়ে কৃষ্ণ মূর্চ্ছাগত, গোষ্ঠে বলরামের নিকট এই সংবাদ পাইয়া বাড়ী আসিতে আসিতে গোপরাজ কহিতেছেন,—

সম্ভ করি নন্দ গোপ, যশোদা প্রতি করি কোপ
বলরামকে কহিছেন বাণী,—
অদ্য বুঝিলাম অন্তরে নীলমণিরে নিতান্ত যে
আঘাত ক'রেছে দুর্ভাগিনী।
নব লক্ষ ধেনু পাল, সবেমাত্র এক গোপাল,
সাগর সোসর ক্ষীর সর।
পাপিনী আমার নামোদরে খেতে দেয় না সমাদরে,
নির্দ্দয়া দেখি'ছ নিরন্তর;
যত বাছা করে সর সর, পাপিনী বলে সর্ সর্,
অবসর হয় না সর দিতে।
সর সর ক'রে ত্রিভঙ্গ, হয় বাছার স্বরভঙ্গ,
বাক্য-সর হানে আপার তাতে।

এ রচনার গুণ কি আছে, পাঠক স্বয়ং বিচার করুন। সাহিত্যে স্থান থাকিলে এমন ছড়া কতই উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।

দীনেশ বাবুর লিখিত দাশরথীর জীবনকথায় উাঁহার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবিচার করা হইয়াছে। দীনেশ বাবু যে কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে সকলেই

জীবন-কথা।

মনে হয় যে, দাশরথী অতিশয় ঘৃণিতচরিত্র লোক ছিলেন। আমরা একাধিকবার পীলায় গিয়াছি এবং সন্ধানে যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, দাশরথীর চরিত্র প্রথম বয়সে কলুষিত থাকিলেও, কবির দলের সংস্রব-পরিত্যাগের পর হইতেই উহার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, এবং ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির ভাব আসিয়াছিল। দীনেশ বাবু দাশরথীর সমালোচনার শেষে যে দুইটি সুন্দর গান উদ্ধৃত করিয়াছেন (হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি ইত্যাদি, এবং দুর্গে কর মা এ দীনের উপায়, যেন পায়ে স্থান পায়, ইত্যাদি) এবং যে গানের প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে পারিয়াছেন, জীবনে পরিবর্ত্তন না হইলে কি দাশরথীর মুখে তেমন গান আসিত ? শেষের গানটির বেলায় দীনেশ বাবুই "ভক্তের মৃত্যুচিন্তা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ দাশরথীর জীবনকথায় তাঁহার কি কলঙ্কিত চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন !

কেবল পীলায় নহে, নিকটবর্ত্তী গ্রাম পাটুলী, নারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানের ভদ্রসমাজ এখনও দাশরথীর নাম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন। পীলার ব্রাহ্মণেরা দাশরথী তাঁহাদের গ্রামে বাস করিয়া গিয়াছেন বলিয়া সত্য সত্যই গর্ব্বিত। ইঁহাদের মতে, দাশরথী দৈবশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা বলেন, অকাবাই-এর কবির দলে গালি খাইয়া দাশরথী মাতুল কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন। মাতা কর্ত্তৃক নহে। ঘৃণায়, লজ্জায়, ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া দাশরথী তাঁহার মাতুলের জ্ঞাতি পীলার জমীদার স্বর্গীয় ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া একখানি পাল্কীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার দরজা বন্ধ করিয়া দেন, এবং অনাহারে ক্লান্তদেহে ঐ পাল্কীর মধ্যে ঘুমাইয়া পড়েন। এইখানেই তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, তুই পাঁচালী লেখ্, তোর যশঃ দিগ্‌দিগন্তব্যাপী হইবে।

রীতিমত লেখাপড়া না শিখিয়াও দাশরথী যেরূপ কবিত্ব ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে গ্রামবাসী ভদ্রলোকদিগকে এইরূপ জনশ্রুতিতে বিশ্বাসের জন্য বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

যাহা হউক, দীনেশ বাবু দাশরথীর জীবনকথা যে ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। কবির কাব্য-পরীক্ষাই কর্ত্তব্য, তাঁহার চরিত্রের দোষোদ্ঘাটন কর্ত্তব্য নহে। দাশরথীর অদৃষ্টদোষে দীনেশ বাবু তাঁহার জীবনের মন্দ অংশই অধিকতর মন্দ করিয়া লিখিয়াছেন। ভাল অংশ বাদ পড়িয়াছে।

দীনেশ বাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, দাশরথীকে "অর্দ্ধচন্দ্র দক্ষিণা-প্রদানাসন্তর ভদ্রলোকের সভা হইতে দূর করিয়া দিতে ইচ্ছা হয়।" এই কথাটি পড়িয়া আমরা বড়ই

অর্দ্ধচন্দ্র-প্রদান।

দুঃখিত হইয়াছি। এক দিকে ইহা দাশরথীর প্রতি প্রযোজ্য নহে; অন্য দিকে ইহা দীনেশ বাবুর ন্যায় সমালোচকেরও উপযুক্ত হয় নাই। দীনেশ বাবু অশ্লীলতার জন্য দাশরথীর জন্য অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অশ্লীলতার কথা পূর্ব্বেই কিছু বলিয়াছি। দাশরথীর অশ্লীলতা খোলা, উহা ঢাকা অশ্লীলতা নহে। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর কহিয়াছেন, খোলা অশ্লীলতা অপেক্ষা ঢাকা অশ্লীলতায় সমাজের অধিক অনিষ্ট হয়। দাশরথীর সময়ের রুচি ও শিক্ষার অভাবের প্রতি দৃষ্টি করিলে যে তাঁহার অশ্লীলতা কিয়দংশে মার্জ্জনীয় বলিয়া মনে হয়, দীনেশ বাবু ইহাও বলেন নাই। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙ্গালায় যে পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট ছিল, উহাতে দেখিয়াছি, স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরাতন লেখায় এমন দু' একটি শব্দ আছে, যাহা এখনকার দিনে অশ্লীল ও অব্যবহার্য্য।

দাশরথী তাঁহার জীবনে ভদ্রলোকের সভায় কখনও অর্দ্ধচন্দ্র দক্ষিণা পান নাই। পরন্তু তাঁহার যেরূপ আদর ছিল, অন্য কোনও গ্রাম্য কবির ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। ভট্টপল্লীর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় বলেন, আমি যখন ১০।১২ বৎসরের বালক, তখন আমাদের গ্রামে (ভাটপাড়ায়) দেখিয়াছি, ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাশরথীর গান শুনিতেছেন। আমি গান আরম্ভ হইবার কিছু পরে গিয়াছিলাম। বালক বলিয়া যুবক ও বৃদ্ধেরা আমাকে সম্মুখে যাইতে দিলেন; কেহ হাত সরাইলেন; কেহ পা সরাইলেন; কেহ বা সরিয়া বসিলেন; কিন্তু কাহারও মুখে একটি শব্দমাত্র শুনিলাম না।

শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি বলিলেন, আমার জ্যাঠা মহাশয় এ কালের সর্ব্বপ্রধান কবি কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়* উলায় তাঁহার ভগ্নীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন, এবং কমলাপতি চিন্তু চাটুয্যে মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন। দাশরথী দল লইয়া ঐ পথে অন্যত্র যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমাকে গান শুনাইয়া যাও।" দাশরথীকে উপযুক্ত পরিশ্রমিক দিতে পারিবেন না বলিয়া পূর্ব্বে বাধুনী করিলেন, "এসেছি পাগলের

* ইনি অক্ষয়কুমার দত্তপ্রভৃতির শিক্ষক।

গ্রামে; *শ্রীপতি তিতু চাটুয্যে কুলীন ব্রাহ্মণ, কাজেই নিঃস্ব।" ইহার পরে গান শুনিয়া তিনি নিজের গায়ের কাপড়—একখানি বনাত ও সঙ্গের সম্বল দুইটি টাকাই দাশুকে দিয়াছিলেন। দাশু টাকা লইতে অস্বীকার করিলে কহিয়াছিলেন, "ইহা তোমাকে দেওয়া নহে; তোমার গানের মূল্য টাকায় হয় না। দলের লোকদের দু'খানি ক'রে বাতাসা জল খেতে দিও।" ইহা কি অর্দ্ধচন্দ্র-প্রদান?

যেখানে অর্দ্ধচন্দ্র পাইবার কথা, দাশরথী সেখানেও তাহা পান নাই। একবার তিনি মানকরে গান করিবার বায়না লইয়াছিলেন। পথে বর্দ্ধমানে ধরা পড়েন। সেখানকার ভদ্রলোকেরা না ছাড়ায় তাঁহাকে গান করিতে হয়, এবং মানকরে পঁহুছিবার নির্দ্দিষ্ট দিন উত্তীর্ণ হইয়া যায়। মানকর-বাসীরা দাশরথীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। দাশু আদৃত না হইয়াও আসরে যাইয়া গান আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে গ্রামের দুই একটি লোক আসিতে থাকেন। দাশরথী ছড়া ধরিলেন, "শুনি লোকে মান করে, মেয়ে মানুষেই ত মান করে, এ যে দেখি মানকরে পুরুষেও মান করে।" ইত্যাদি শব্দের এই সামান্য বাঁধুনীতেই মানকর-বাসীর ক্রোধ আনন্দে পরিণত হইল। দাশরথীকে যাহা দিবার কথা ছিল, তাঁহারা তদপেক্ষা অধিক দিলেন। অন্য গায়ক হইলে হয় ত তাঁহারা তাড়াইয়া দিতেন, এবং তাঁহার নামে নালিশ করিতেন।

শুনিয়াছি, দাশরথী জীবনে একবারমাত্র অর্দ্ধচন্দ্র দক্ষিণা পাইয়াছিলেন; কিন্তু সে ভদ্রলোকের সভায় নহে। পীলার নিকটে হুড়কোডাঙ্গা নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে কতকগুলি নিরক্ষর কৃষকের বাস। তাহারা একবার বারোয়ারী পূজা করে, এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া গান শুনিবার নিমিত্ত দাশরথীকে তাহাদের গ্রামে লইয়া যায়। যেরূপ আসর প্রস্তুত হইয়াছিল, দাশরথী পূর্ব্বে কখনই তেমন আসরে গান করেন নাই। আলোক অতি সামান্য, এবং আসন অতি কদর্য্য ছিল। তিনি দেখিলেন, আসরও যেমন, শ্রোতাও তেমনই। দাশরথী অন্য ভাবের গান গাহিতে চাহিলেও হুড়কোডাঙ্গার সকলেই বলিল, একটা ভাল পাঁচালী হউক। দাশরথী গান আরম্ভ করিলেন, কিন্তু উহা শ্রোতৃবর্গের ভাল লাগিল না। কিছুকাল পরে গ্রামের মোড়ল এক জনকে কহিল, "দে রে দে, দক্ষিণার টাকা ক'টা এনে দে, গান যা শুনলাম, তা বেশ। এইতে এত নাম।" দাশরথীর প্রাণে

* উঁহার সম্বন্ধে এ প্রবাদ পুরাতন।

বড়ই লাগিল। আর কিছু না বলিয়া এবং টাকা না লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, এবং মনের দুঃখে সকাল বেলায় গ্রামের লোককে শ্লোক শুনাইলেন :—

যার বিয়েতে এয়ো হলেন স্বয়ং লক্ষ্মী আসি,
তার বিয়েতে কুলো ধরলে না আকালে হাড়ির মাসী।
নদে শান্তিপুরে যার জয় জয় রব,
হড়কোডাঙ্গায় হাব হ'ল তার, হরির ইচ্ছা সব।

ইহাতে দাশরথীর একটু আত্মপ্রশংসার ভাব আছে, কিন্তু তাহা মার্জ্জনীয়।

বিনয় ও বাক্‌চাতুরী।

বঙ্গদেশ তখন বেশ তাঁহার যশে পরিপূর্ণ ছিল, এবং "নদে শান্তিপুরে" তাঁর জয় জয় রব। দাশরথী স্বভাবতঃ অতিশয় বিনীত ছিলেন, এবং দেবতা ব্রাহ্মণে তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল। নিজে পাঁচালীর দল করিয়া ব্রাহ্মণের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন, এবং এই জন্য আপনাকে আত্মহীন বলিয়া মনে করিতেন। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা আছে। দাশরথীর সময়ে (পাটুলী) নারায়ণপুর গ্রামে শতঞ্জীব বিদ্যারত্ন নামে এক অধ্যাপক বাস করিতেন। এই গ্রাম পীলের অতি সন্নিকটে। দাশরথী ইঁহার রচিত পাঁচালী শতঞ্জীবের কাছে লইয়া যাইতেন, এবং বলিতেন, আপনি ইহার অশুদ্ধি-সংশোধন করিয়া দিন।" এই স্থানে একটু বিশেষভাবে বলি, দাশরথী "চলনসই লেখাপড়া" শিখিয়াছিলেন; বিদ্যালয়ে কখনও রীতিমত লেখাপড়া শেখেন নাই। বঙ্গবাসীর শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, দাশরথি রীতিমত লেখাপড়া ও সংস্কৃত জানিতেন বলিয়া, ভুল করিয়াছেন। দাশরথী নিজে সর্ব্বদাই স্বীকার করিতেন যে, তিনি লেখাপড়া কিছুই শেখেন নাই। তিনি স্থানে স্থানে দুই একটি শব্দেরও অপব্যবহার করিয়াছেন। "দোষ কারও নয় গো মা" ইত্যাদি এই গানটিতে কোবাণীর পরিবর্ত্তে কোদণ্ড শব্দের প্রয়োগই ইহার প্রমাণ। ইহা ছাড়া দুই এক স্থানে দাশরথী ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন। যাহা হউক, শতঞ্জীব বিদ্যারত্ন মহাশয় দাশরথীর রচিত দুই একখানি পাঁচালী পড়িয়াই বুঝিলেন যে, ইনি এক জন অসাধারণ কবি। দাশরথী পুনরায় তাঁহার নিকট নূতন একখানি পাঁচালীর পাণ্ডুলিপি লইয়া গেলে তিনি কহিলেন, "বাপু, তুমি সিদ্ধ পুরুষ। তুমি যাহা লিখিয়াছ, উহাই শুদ্ধ; আমি আর উহাতে কলম চালাইব না।" দাশরথী বিনীতভাবে কহিলেন,

"আজ্ঞে আমি ত সিদ্ধ বটেই। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যখন পাঁচালীর দল করিয়াছি, তখন সিদ্ধ বই আর কি? আপনারা আতপ, আমি আর এ জন্মে আতপ হইতে পারিলাম না।" ইহাতে দাশরথীর বাক্‌চাতুর্য্য ও নিজের হীনতা-প্রকাশ, দুইই আছে। সিদ্ধ ও আতপ চাউলে যে প্রভেদ, তাঁহাতে ও প্রকৃত ব্রাহ্মণে সেই প্রভেদ, ইহা কি সুন্দর ভাবেই বলিলেন।

দাশরথী ছন্দ সর্ব্বত্র নিয়মানুবর্ত্তী নহে। তিনি উচ্চারণের মাত্রানুসারে শ্লোক লিখিয়া যাইতেন; অক্ষরের সংখ্যা দেখিতেন না। তাঁহার দীর্ঘ ত্রিপদীতে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে আট অক্ষরের পরিবর্ত্তে নয় অক্ষর, দশ অক্ষর, কখনও বা সাত অক্ষর, এবং তৃতীয় চরণে দশ অক্ষরের স্থলে কখনও এগার অক্ষর, বার অক্ষর, অথবা কোনও স্থানে নয় অক্ষর বা আট অক্ষরও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পয়ারও এইরূপ। উপরি-উদ্ধৃত হড়্‌কোডাঙ্গার ব্যাপার-ঘটিত চারি পংক্তিতেই তাহা প্রকাশ। আবার অনেক স্থলে তিনি ত্রিপদীর মধ্যে চৌপদী আনিয়াছেন। কোথায়ও বা পয়ারের মধ্যে ভঙ্গপয়ার আছে; ইহা ছাড়া কোনও কোনও স্থলে মিলও সঙ্গত নহে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই বিদ্যার অভাবেই তাঁহার কৃতিত্ব অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হয়। দাশরথী কোনও গ্রন্থ না পড়িয়া স্থানে স্থানে যেরূপ ভাবে শাস্ত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার প্রতিভার পরিচয়ে বিস্মিত হইতে হয়।

ফলতঃ যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, দাশরথীকে কোনও প্রকারেই উপেক্ষা অথবা অবজ্ঞা করা যায় না। আমরা স্বীকার না করিলেও, দেশের অনেক কবি ও গীত-রচয়িতা দাশরথীর নিকট ঋণী। শুনিয়াছি, দাশরথীর মৃত্যুর অনেক দিন পরে স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ অধিকারী পীলার নিকটবর্ত্তী অগ্র-দ্বীপ গ্রামে মল্লিক বাবুদের বাড়ীতে গান করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি শুনিলেন, দাশরথীর বিধবা ব্রাহ্মণী তখনও জীবিত আছেন। তাঁহাকে এক পালা গান শুনাইবেন বলিয়া নীলকণ্ঠ পীলায় যান, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর অনুমতি লইয়া নিজ ব্যয়ে দাশরথীর বাড়ীর সম্মুখে আসর প্রস্তুত করেন এবং সেখানে নিজের রচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পালা গান করেন। পীলা, পাটুলী প্রভৃতি গ্রামের ভদ্রলোকেরা গান শুনিতে আসিয়া কিছু কিছু "প্যালা" দিতে চাহিলে নীলকণ্ঠ বলেন, "পয়সা অন্যত্র অনেক উপার্জ্জন করিয়া থাকি; আজ এখানে আমি কিছুই লইব না। দাশরথীর বাসস্থানকে আমি পীঠস্থান বলিয়া মনে করি। মা ঠাকুরাণীকে এক পালা গান শুনাইতে পারিলাম, ইহাতে আমার জীবন

মত হইল।" যাত্রার দলের অধিকারী, হইলেও উৎকৃষ্ট গীত-রচয়িতা বলিয়া দেশে নীলকণ্ঠের খ্যাতি আছে। দাশরথীর প্রতি তাঁহার ন্যায় লোকের এমন আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধার মূল্য আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

উপসংহার।

বস্তুতঃ দাশরথী অসাধারণ প্রতিভা ও কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে তিনি গ্রাম্য কবি ছিলেন। বিদ্যার অভাবে ও সময়ের প্রভাবে তাঁহার সমস্ত কবিতা মার্জ্জিত অথবা মার্জ্জিত রুচির অনুমোদিত না হইতে পারে, কিন্তু উহা যে সর্ব্বত্রই রসে পরিপূর্ণ, এবং বহু স্থলেই যে উহাতে শব্দের মাধুর্য্য ও অর্থের চমৎকারিত্ব, উভয়ই আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। শব্দচয়ন-নৈপুণ্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বঙ্গ-সাহিত্যে নাই। তিনি কবিতায় কথা কহিতেন। স্থানে স্থানে গান করিতে যাইয়া তিনি সেই সকল স্থানের লোক অথবা বস্তু সম্বন্ধে যে সকল কবিতা রচনা করিতেন, তাহার অনেক কবিতা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। পালার শেষে এইরূপ দুই একটি কবিতার আবৃত্তি করিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গকে হাস্যরসে ভাসাইয়া দিতেন। আমরা এই শ্রেণীর একটিমাত্র কবিতা পাঠককে শুনাইব। দাশরথী নদীয়া জেলার ধর্ম্মদা গ্রামে গান করিতে আসিয়াছেন। দেখিলেন, পূজার পুরোহিত উপযুক্ত লোক নহেন, গ্রামের নাপিত ভাল কামাইতে পারে না, আর ময়রা যে মুড়কী মাখে, তাহার সহিত গুড়ের সম্পর্ক অতি অল্প, উহা কাপাসের ন্যায় সাদা। দাশরথীর কবিতা হইল—

> দীনু পুরুৎ মন্ত্র পড়ান্, অর্দ্ধেক তার ভুল্;
> গুয়ো নাপিত দাড়ি কামায়, অর্দ্ধেক তার চুল্।
> রতন ময়রা মুড়কী মাখে, কাবাস্ কাবাস্।
> ঠাকুররা সব খেয়ে বলেন, সাবাস্ সাবাস্।

ইহা তরল রচনার সুন্দর উদাহরণ। আর সে সময়ের শ্রোতা ইহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন।

আর কিছুই বলিবার নাই। দাশরথীর সকল প্রকার রচনারই নমুনা প্রদর্শিত হইল। এই কবিতাটি ধরিয়াই বলি, দাশরথীর রচনা উত্তম ধানের টাট্‌কা মুড়কী। উহার সর্ব্বাঙ্গ খাঁটী গুড়রূপ রসে মাখা। কিন্তু উহা লুচী নহে। অধুনা সমাজে লুচীর প্রচলনই অধিক। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, লুচী অনেক স্থলেই ভেজাল ঘৃতে ভাজা। দেশে পুনরায় খাঁটী জিনিসের আদর বাড়িতেছে। শুনিতে পাই, পল্লীগ্রামে ভেজাল ঘৃতের অত্যাচারে অনেক স্থলে

দৃষ্টান্ত পরিবর্ত্তে যুক্তবীই ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতেই আশা হয় যে, দাশরথীর কবিতারও আবার কিঞ্চিৎ আদর বাড়িতে পারে।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

বিবেকানন্দ।*

যে মহাপুরুষ শ্রীভগবানের প্রত্যাদেশ পাইয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তিনি অঘটন ঘটাইয়া শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত করিয়া স্বীয় পরিচয় প্রকট করিয়া থাকেন। বিধি-নিষেধের বাহিরে একটা কিছু উৎকট রকমের ঘটাইতে পারিলে, তবেই সাধারণ লোকে ভাগবৎ-বিভূতির বিকাশে আস্থাবান হয়। শ্রীভগবান যুগে যুগে যত অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, ততবার তাঁহাকে এই প্রকারের অগ্নিপরীক্ষা দিতে হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে অলোক-সামান্য মহাপুরুষ ছিলেন, সে পক্ষের প্রতিপোষক অসংখ্য প্রমাণ থাকিলেও এক বিশিষ্ট প্রমাণ, স্বামী বিবেকানন্দ। পূর্ণব্রহ্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের যেমন পূর্ণত্ব-বিকাশ হইয়াছে, গীতার অর্জ্জুনে তেমনই রামকৃষ্ণের বিভূতির আংশিক বিকাশ হইয়াছে শিষ্য বিবেকানন্দের মনীষায়। শাস্ত্রোক্ত গুরু-শিষ্যের তত্ত্ব যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা আমাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিবেন।

আবার স্বামী বিবেকানন্দের মাধুরী ফুটিয়াছে শিষ্যা নিবেদিতায়। সেই নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দকে কি ভাবে কেমন দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহার পরিচয় এই ইংরেজী পুস্তিকাখানিতে পাওয়া যায়। ইহাতে দ্বাদশটি অধ্যায় আছে; এই দ্বাদশটি অধ্যায়ে যেন দ্বাদশ ভাবের কথা, দ্বাদশ অবস্থা-বিশেষে প্রকট করা হইয়াছে। বলিলে বোধ হয় তেমন অতিমাত্রায় শ্লাঘা করা হইবে না যে, আমরা ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের একটু আধটু খবর রাখি। আমাদের ধারণা ছিল যে, হিন্দুর ভাবের কথার অভিব্যঞ্জনার পক্ষে ইংরাজি ভাষা তেমন পর্য্যাপ্ত নহে। থিওসফিক্যাল সভার মনীষী লেখকবর্গের চেষ্টায় একটা নূতন রকমের ইংরেজী গদ্যের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু সে ভাষা একটু বেশী কটমট। কুমারী নিবেদিতার এই পুস্তকের ভাষা কটমট ত নহেই, পরন্তু ভাব ও রসে ভরপুর। কিন্তু মনে হয় যে, হিন্দু ভাব ও মাধুর্য্য এত অধিক-

---

* Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda by sister Nivedita of Ramakrishna Vivekananda. Published by the Brahmachari Gonendranath ; Udbodhan office, Bagh bazar, Calcutta.

মাত্রায় আছে বলিয়া, "ইংলিশম্যানে"র তুল্য উচ্চাদের সংবাদপত্রের লেখককেও অকারণে কতকটা বিহ্বল হইতে হইয়াছে। এমন অনেক ভাব আছে, যাহা খাঁটী হিন্দু না হইলে বুঝা যায় না, প্রাঞ্জল ইংরেজী ভাষায় লেখা থাকিলেও, তাহা সাধারণ খৃষ্টানের বোধগম্য হয় না। এই পুস্তকে তেমন অনেক কথা আছে। তাহার একটা কথা ধরিয়া "ইংলিশম্যান"কে কবুল-জবাব দিতে হইয়াছে যে, তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সে কথাটা এই:—স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন, "Who can say that God does not manifest himself as Evil as well as Good? But only the Hindu dares to worship him in the Evil." অর্থাৎ, কে বলিতে পারে যে, ভগবান পাপরূপে বা মন্দ-ভাবে প্রকট না হন? তিনি কল্যাণময় বটে, পরন্তু অমঙ্গলও ত তাঁহাতে থাকিতে পারে! একমাত্র হিন্দুই ভগবানের অকল্যাণকর বিকাশকে পূজা করিতে সাহসী হয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ব্রহ্মস্তোত্রেই আছে—

"ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্।"

এই সিদ্ধান্তটা হিন্দুকে বুঝাইতে কষ্ট নাই, কেন না, হিন্দুর ভাবুক কবিগণ গানে ও ছড়ায় কথাটাকে এত সোজা করিয়া দিয়াছেন যে, উহা বাঙ্গালীর পক্ষে কতকটা স্বতঃসিদ্ধবৎ গ্রাহ্য হইয়াছে। তাই একদিন স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,—"But we worship neither pain nor pleasure. We seek through either to come at that which transcends their both." অর্থাৎ, আমরা আনন্দ বা নিরানন্দ, কোনও কিছুরই উপাসনা করি না; তবে উভয়ের ভিতর দিয়া যিনি সুখ দুঃখের অতীত, তাঁহারই আরাধনা করি। ভক্ত রামপ্রসাদ গান করিয়া গিয়াছেন—

"শুচি আর অশুচিরে লয়ে, দিব্য ঘাটে যবে শুবি,—
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি।"

প্রেমের অধিকার উপাসনায় কতটুকু, তাহা বুঝাইতে যাইয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন,—"No other has such tremendous idealising power. The beloved actually becomes what he is imagined to be. This love transforms its object." অর্থাৎ, প্রেম আরাধনাকে ভাবময় করিয়া তোলে, ভালবাসার পাত্রকে যে সাজে ইচ্ছা সেই সাজেই সাজান যায়। ভাবের ঠাকুর প্রেমের আকর্ষণে ভাবানুরূপ হইয়া থাকেন।

এমনই ভাবে শাস্ত্রের, সাধনার, উপাসনার অনেক সিদ্ধান্ত অতি সুন্দর ইংরে-

জীতে এই পুস্তকে নিহিত আছে। ভক্তিমতী কুমারী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের সহিত পাঞ্জাব, আলমোরা, কাশ্মীর প্রভৃতি নানা প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া, যে সকল ভাবের কথা, সিদ্ধান্তের কথা আহরণ করিতে পারিয়াছিলেন, সে সকল কথা তিনি লিখিয়া রাখেন। সেই লেখা আজ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। শুনিয়াছিলাম, কাচপোকা ধরিলে তেলাপোকাও কাচপোকা হইয়া যায়; এই পুস্তক পাঠ করিয়া এই কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিলাম। কুমারী নোবল্ বিলাতী নারী; ভারতের কোনও ভাব, কোনও সিদ্ধান্তের কোনও খবরই রাখেন নাই। তাঁহাকে কোন পদ্ধতিক্রমে ভারতীয় ভাবে মজাইয়া মাতাইয়া তোলা যায়, তাহা এই পুস্তক পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের মনীবীর্য্য ঔজ্জ্বল্য, প্রতিভার সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তির পরিচয় এই পুস্তকেই আছে। কিন্তু এ পুস্তক পড়িতে জানিতে হয়, ভক্তিমতী শিষ্যা কেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ ধরিয়া ভাবের লহরী গাঁথিতেছেন, তাহা যে ভাবুক বুঝিতে পারেন, তিনিই এই পুস্তক মাথায় করিয়া লইবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ কেমন স্পর্শমণি ছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে, কুমারী নিবেদিতার ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ এই পুস্তকখানি, ভক্তিভারাবনতচিত্তে পাঠ করিতে হইবে। শ্রদ্ধার পরিপ্রেক্ষণেই (Perespective) শ্রদ্ধার পাত্রের প্রতিমা অঙ্কিত করিতে হয়। যে পাঠক বা দর্শক এই পরিপ্রেক্ষণার বিন্যাস সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন, তিনি চিত্রের মহিমা বুঝিতেই পারিবেন না। "ইংলিশম্যানে"র লেখক পারেন নাই। পাছে আমাদের দেশবাসী কেহ বুঝিতে না পারেন, তাই সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে বার বার একটা কথাই বলিতে হইয়াছে। সন্ন্যাসীকে বুঝা বড় শক্ত কথা। সন্ন্যাসীর কোনও কিছুরই সঙ্গতি নাই। তিনি যে কখন কোন ভাবে থাকেন, কখন কোন খেয়ালে মশ্‌গুল্ হন, তাহা বলা যায় না, ধরা যায় না। তাই আজকাল আমরা সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই জুয়াচোর বলিয়া ধরিয়া লই। জুয়াচোর—মেকী সাধু যে নাই, এমন কথা বলি না; কিন্তু তুমি আমি যতটা মনে করি, ততটা নহে। প্রত্যেক সাধু সাক্ষাৎ শুকদেব গোস্বামী না হইলেও, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে যে একটু সাধুতার বিশিষ্টতা আছে, সে পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং সিদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন, এবং ভারতের সাধু-সন্ত সম্প্রদায়ের ভাবুকতা তিনি গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে অমরনাথ দর্শন করিয়াছিলেন, সেই ভাবটাই তাঁহার বিশিষ্টতার দ্যোতক।

কুমারী নিবেদিতা স্বামীজীর অমরনাথ-দর্শনের কথাটা যোগ্য শিষ্যার মতনই লিখিতে পারিয়াছেন। শ্রীনগর-বাস, ঝিলম নদীর তীরে শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি বিষয়ও সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত। ঐ যে দলে থাকিয়া শাস্ত্রালোচন করিতে করিতে এক একবার প্রচ্ছন্ন হইবার চেষ্টা, এক একবার সব ছাড়িয়া একান্তে যাইবার চেষ্টা, এবং মাঝে মাঝে সত্যই পলায়ন—ইহার বিবরণ লিখিতে যাইয়া নিবেদিতা বেশ মাধুর্য্যের সহিত গুরুর পরিচয় দিয়াছেন। এই কারিগরীর জন্য আমরা এই পুস্তকের আদর করিয়াছি। যে সকল সিদ্ধান্তকথা লেখা আছে বাহুল্যভয়ে এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিলাম না—করিবার প্রয়োজন নাই। পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে সেই বিবেকানন্দকে মনে পড়ে—সেই দীপ্তচক্ষু, তীব্রদৃষ্টি, কষিত-কাঞ্চন-কান্তি, আজানু সংলগ্ন মন্ত্রমাতঙ্গের ন্যায় সদা চঞ্চলগতি বিবেকানন্দকেই মনে পড়ে—সেই গোমুখীধারার ন্যায় ভাষা ও ভাবের বিস্তার, সদা-প্রফুল্ল হাস্যমুখ, কদাচিৎ বা গম্ভীরভাবে যুক্তি তর্কের অবতারণা, তারগম্ভীরকণ্ঠে অনুযোগের মাধুর্য্যবিস্তার—বিবেকানন্দের বিশিষ্টতার সব কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে বলিয়াই পাঠকগণকে শ্রদ্ধার সহিত এই পুস্তক পাঠ করিতে বলিতেছি; পাঠ করিলে বুঝি বা তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারিবে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। চৈত্র।—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'আমাদিগের দারিদ্র্য ও অর্থবিজ্ঞানের সার্থকতা' চিন্তাশীলের অনুশীলনযোগ্য। লেখক বলিয়াছেন,—ইউরোপ আজ আদর্শের অনুবর্ত্তী। 'এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক বোধের দ্বারা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত।' মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে এই উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন। এখন ইহা ভ্রম বলিয়াই মনে হয়। এ পথ দুর্গম, সঙ্কট-কণ্টকে কণ্টকিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই আমাদের মুক্তির পথ,—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' লেখকের ভাষায় জড়তা আছে। তাঁহার বক্তব্য আরও সহজে ও সরলভাবে ব্যক্ত হইলে এই উপাদেয় ও উপকারী প্রবন্ধ অধিকতর প্রচার ও প্রসার লাভ করিত। শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'বাঙ্গালার তক্ষণ-শিল্পের নমুনা' উল্লেখযোগ্য। শ্রীরাধালাল সরকারের 'চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব' এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। 'পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম নাট্যকার' প্রবন্ধে শ্রীশরৎকুমার সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন,—'অভিমন্যুবধই পূর্ব্ববঙ্গে বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম নাট্যগ্রন্থ এবং ইহার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাস-মহাশয়ই পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম নাট্যকার।' লেখক সংক্ষেপে শ্রীযুক্ত দাস মহাশয়ের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী 'মশা, মাছি এবং ম্যালেরিয়া' প্রবন্ধে ভাবিবার মত কতকগুলি অবশ্যজ্ঞাতব্য কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গলা অভিধানে'

দেখিতেছি,—ছোটনাগপুর, সিংভূম ও মানভূমের কোল অধিবাসীরা বীরসা নামক এক জন মুণ্ডাকে 'ভগবানের অংশ-স্বরূপ জ্ঞান করিত।' বীরসা অবতারের কাহিনী কৌতুকাবহ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র' পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। ছন্দে যতি খুন হইয়াছে।—

'নরের জগতে যত গ্রন্থ যে রেখেছে গেঁথে গেঁথে,

পড়া যায় না। 'বায়বী কল্পনা ছবি' এখনকার কবিদের একচেটে। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় বায়ুর সম্পর্ক নাই, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিব। যাহারই গানে থাকুক, এটুকু আমরা পরিপাক করিতে পারিব না। দেবীমূর্ত্তির 'অরূপ' বিশেষণ দেখিয়া সুরেশ সর্ব্বাধিকারীর প্রেতাত্মাও চমকিয়া উঠিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! এমন অম্ল-রক্ত-গর্ভ বিষম বিশেষণ ত কখনও দেখি নাই! 'পুষ্পরাধা' শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। 'প্রবাসী'তে কেবল কালীর স্তূপ দেখিতেছি। ঘোর অন্ধকারে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের যে আভাস দেখিতেছি, তাহা পুরুষোত্তমের ভূত হইতে পারে, পুরুষোত্তম নহে।

ভারতী। চৈত্র।—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষের 'বিমানচারিণী'র আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না।—'বিমান' আকাশ বা ব্যোমপথ নহে। চিত্রকর গতি ও প্রবল বায়ুপ্রবাহের আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। বিমানচারিণী ত্রিভঙ্গ মুরারির মত 'পায়ের উপর পা রাখিয়া চলিয়াছেন। দেবলোকে এই ভাবে পদক্ষেপ করিতে হয় কি না, মেদিনীচারী আমাদের তাহা জানা নাই। সুতরাং বিমানচারিণীর পদভঙ্গী অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। চিত্রিতার চরণে 'স্থির ও সমীরসঞ্চালিত পরিধানে ও মালিকায় গতির ব্যঞ্জনা করিয়া শিল্পী 'দু নৌকায় পা' দিয়াছেন। শ্রীজগদীশ তরফদার 'চিত্রগুপ্ত' নামক পদ্যে লিখিয়াছেন,—'চিত্রগুপ্ত নহে রে গুপ্ত!' আমরা সকলেই এ তথ্যটুকু জানি, তবু ভুলিয়া থাকি। নতুবা তরফদারও কবি হইতেন না, আমিও এই পুরাতন সংবাদটি পাঠকবর্গের গোচর করিতাম না। চিত্রগুপ্ত আবার 'মেলিয়ে রেখেছে খাতা।' মর্ত্ত্যের মুহুরী, খাজাঞ্চী প্রভৃতি সকলে খাতা খুলিয়া রাখে, কিন্তু চিত্রগুপ্ত খাতা 'মেলিয়া' রাখেন। মেলাতে 'পাখা'রও একটু আমেজ আসে। চিত্রগুপ্তকে পৌরাণিক গরুত্মানের জ্ঞাতিকুটুম্ব বলিয়া মনে হয়। ইহাই 'মেলিয়া'র সার্থক ব্যঞ্জনা। খাতাখানি খেরুয়ায় বাঁধা, কি গোধূলির আলোয় মোড়া, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহার একটি পাতা দেখিয়াই হতভম্ব হইয়াছি।—'অন্তবিহীন নগ্ন আকাশ সবখানি তার পাতা।' আকাশের 'এক-ফর্দ্দিত' আকারের খাতা! আট-পেজী, বারো-পেজী হইলে বিরাট ভাবের শোভনা হইত না,—হয় ত অনন্ত বিশেষণটি নিরর্থক—অন্ততঃ খর্ব্ব হইয়া পড়িত! তার পর 'নগ্ন' আকাশ! আকাশকে আমরা কেহ কখনও আলখাল্লা, ধুতি-চাদর, পাতলুন-কোট, ইজের-চাপকান, আবা-কাবা, কিমোনা, পঞ্জাবী, ফতুয়া, গেঞ্জী,—এমন কি, কৌপীন-টুকুও পরিতে দেখি নাই! আকাশ চিরকাল উলঙ্গ—কিন্তু তাহা এত দিন পৃথিবীর গোচর হয় নাই। প্রতিভাই নব নব আবিষ্কার করিতে পারে। এত বড় সত্যটা কাহারও চোখে পড়ে নাই, কিন্তু কবির উর্দ্ধনিবদ্ধ চক্ষু যোড়াটিকে ঘোর আকাশও ফাঁকি দিতে পারে না। কবির মিলও পরম রমণীয়; নমুনা—'ক্রন্দন রোল মঙ্গল বোল।' বাস্তবিক, আমের বোলের ও শঙ্খ রোলের মিলও এত সুখাহ

স্নানান্তে।

শ্রীভবানীচরণ লাহা চিত্রিত।

Morna Press, Calc.

আমরা আপ্যায়িত হইয়াছি। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষের 'অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজাচার্য্যের আপত্তিখণ্ডন' বিশেষজ্ঞের আলোচ্য। শ্রীমতী—র 'কাশীতে শঙ্কর' সুখপাঠ্য রচনা।—'ভারতের সাধনা' নামক সুচিন্তিত, সুলিখিত প্রবন্ধাবলী এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল।

সাহিত্য-সম্মিলন।

যখন অপূর্ব্ব ভাবরাজ্যের প্রজা ছিলাম, তখন ঘরে বসিয়া জাতি-কুল-মান বজায় রাখিতে পারিতাম, তখন হাসিয়া বলিতাম—

"কাজ কি আমার কাশী,
শ্যামাপদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।"

সে ভাব ছাড়িয়া যখন ইউরোপের ভাবে মুগ্ধ হইলাম, তখন মদান্ধ মৃগের ন্যায় আত্মহারা হইয়া চারি দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। সে ছুটাছুটির ফলে, বিষম জাতিবৈর-ভাব লাভ করিলাম; গড়া-জিনিস পাইয়াও, বালকের ন্যায় ভাঙ্গা ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া আর একটা কি গড়িতে উদ্যত হইলাম। তাই আজ বাজারে বাজারে কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, জাতি,-বি-জাতি, উপ-জাতি, সকলের সমন্বয়চেষ্টার নানাবিধ অভিনয় চলিতেছে। বারোইয়ারী পূজা উঠিয়াছে, পরন্তু বারোইয়ারী উৎসব উঠে নাই। পরে সে উৎসবের মুখে একটু চাপ পড়িতেই, বিহ্বল হইয়া আত্মান্বেষণ আরম্ভ করিতে হইল। তখন কাঁদিয়া বলিতে হইল—

"তুই কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকাইলি,
ছিঃ ছিঃ মন তোর কপাল পোড়া;—
কাজ হারালি কাজের গোড়া।"

সে রোদনের ফলে আত্মদর্শন হইল, পুরাতনের ছায়া দেখিতে পাইলাম তাই আকাশগঙ্গা ভারততরঙ্গিণী ভাষা-মন্দাকিনীর প্রবাহে অবগাহন স্নান করিবার সাধ হইল। যে ভাষার অন্তরে ভাবের ঠাকুর লুকান আছেন, যে ভাষার কূলবিস্তারিণী বেলাভূমির স্তরে স্তরে যুগযুগান্তরের ভাব ও গৌরব-গাথা লুকান আছে, যে ভাষার স্নেহশীকরসম্পৃক্ত শীতল চেলাঞ্চলের আবরণে বঙ্গীয় মানবতার নিদর্শন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যে ভাষা ও সাহিত্য ভাগীরথীর ন্যায় আমার সর্ব্বস্ব—মূর্চ্ছাবলম্বন—ইহপরকাল; পবিত্রতা, স্নিগ্ধতা, কোমলতা যাহাতে নিত্য বিদ্যমান,—জনমে-মরণে, জরায় যৌবনে যাহার তীরে যাইয়া আমি শান্ত ও মুগ্ধ হই, আমার অনন্ত পিতৃগণের তর্পণ করিয়া আমি সুখী হই—

বাঙ্গালীর সেই 'সাত রাজার ধন এক মাণিক' তারা-তটিনীর তরল-তরঙ্গে ডুব দিবার অর্দ্ধোদয়-যোগ-কাল উপস্থিত হইল। তখন হাসিয়া বলিলাম—

"ডুব দে মন কালী বলে,
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।"

ইহাই সাহিত্য-সম্মিলন। উহাকে এই ভাবে বুঝি বলিয়া, নিজ নিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রথম উদ্যমতুল্য বুঝি বলিয়াই, তোমাদের ব্যক্তিগত দলাদলি ও রেষারিষীর দিকে দৃষ্টিপাত করি না; তীর্থগুরুগণের দণ্ডে দৃক্‌পাত করি না; নিজের ভাবে বিভোর হইয়া শান্তি-প্রীতি-ত্রিবেণীসঙ্গমে শুভক্ষণে যাইয়া ডুব দিই। একবার ডুব দাও—"শ্যামা জননী!" বলিয়া একবার ডুব দাও—সতী-অঙ্গ-লাঞ্ছিত বাহান্ন পীঠে বিভূষিতা সুজলা, শ্যামলা গিরিমেখলা, জন্মভূমিকে স্মরণ করিয়া একবার ডুব দাও। দেখিবে, ফল ফলিবেই। ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়া গিয়াছেন যে, হৃদিরত্নাকর—ভাবাপূর্ণ নহে শূন্য কখনও, যদি কদাচিৎ দুই চার ডুবে ফল নাও পাও, তবুও ভয় নাই। এই ভাবে ডুব দিবার উদ্দেশ্যেই এবার চট্টগ্রামের সাহিত্য-সম্মিলনে গিয়াছিলাম।

বাড়বাকুণ্ডে সলিল, অনল ও অনিলের ত্রিবেণীসঙ্গম। সে সঙ্গম পর্ব্বত মালার বত্রিশ পাহাড়ের আবরণে সংগুপ্ত,—ঠিক যেন [illegible],— [illegible], [illegible] এবং [illegible]। সেখানে অনলে, অনিলে, সলিলে নিত্য খেলা চলিতেছে; অনল ও অনিল দুই বন্ধু সলিলের ভয়ে আত্মগোপন করে না, তাহারা সলিলের তরল বক্ষোবিস্তারের উপর অনবরত খেলা করিতেছে; শীতলহৃদয় সলিল অনিলের সম্মুখে উত্তাপ ধারণ করিয়াছেন বটে, পরন্তু অনলও নিভে নাই, সলিলও শুকায় নাই। তাই আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই ভক্তিকুল হৃদয়ে সেই কুণ্ডে ডুব দিতেছে। আমিও ডুব দিলাম; উঠিয়া ভাবিলাম, সাহিত্য-সম্মিলনও ত ঠিক এই রকমের। চট্টগ্রামের সম্মিলনে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, সবাই ত ডুব দিয়াছে; সেখানেও ত অনল ও সলিল এক সঙ্গে ছিল—চট্টগ্রামবাসীদিগের নিরাবিল স্নেহ-সলিলের উপর ত এমনই ভাবে অনল ও অনিলের খেলা হইয়াছে! কিন্তু তাদের গুণে অনলও নির্ব্বাপিত হয় নাই; সলিলও শুকায় নাই। বাবে বাবে এমনই অঘটন ঘটাইতে পার! এমনই পর্ব্বত-পাষাণ ভেদ করিয়া শীতল স্নেহ-সলিল-কুণ্ডের উপর সোহাগের অনলশিখা অনুরাগ-অনিলের সাহায্যে ছুটাইতে ছুটাইতে খেলাইতে পার, তবে ত বুঝি সাহিত্য-সম্মিলন! চট্টগ্রামের বাড়বাকুণ্ড সাহিত্য-সম্মিলনের অভিব্যঞ্জনাধার,

ভাবের তীর্থবিকাশমাত্র। একবার স্থূলে সূক্ষ্মে মিলাইয়া, দেহতত্ত্ব ও দেশতত্ত্ব এক করিয়া মিলিতে মিশিতে পার?

ইংরাজী আমলের প্রথম হইতে যে সাহিত্যের নবীন ধারা ছুটিয়াছে, তাহার পারম্পর্য্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, ভূদেবের ভাবমুগ্ধ আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রকে সভাপতির আসনে দেখিবার সাধে এবার চট্টগ্রামে গিয়াছিলাম। তাহা ত দেখিয়াছি; উপরন্তু নূতন কিছু দেখিয়াছি, নূতন তত্ত্ব বুঝিয়াছি। বুঝিলাম, বাঙ্গালার সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান এক হইয়া গিয়াছে; মুসলমানের মহাভারত ও পদ্মাবতীর উপাখ্যান হিন্দুর হিন্দুত্বের পরিচায়ক—সাহিত্যের এই মহাতীর্থে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়াইয়া স্নান করিয়াছে। মায়ের ভাষায় দুই ছেলেই সমান ও সমভাবে অধিকারী। মনে হয়, তাই ভাবুক হিন্দু এয়াক্‌ খাঁর রচিত গঙ্গাস্তোত্র অম্লানবদনে অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেন না, গঙ্গায় যেমন সকল জাতির সমান অধিকার, ভাষা-মন্দাকিনীতেও তেমনই হিন্দু-মুসলমানের সমান অধিকার। এই অধিকারের দাবী এবার চট্টগ্রামের সাহিত্য-সম্মিলনে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম; সে দাবী-রক্ষার পক্ষে সঙ্কল্প-নির্দ্ধারণও হইয়াছে। চট্টগ্রামের নিত্যশ্যামল পর্ব্বতমালা দেখিয়া, গিরিগাত্রে ব্রততী-বিতানে নানাবিধ কুঞ্জবনের সৃষ্টি দেখিয়া বলিয়াছিলাম যে—ঐ শ্যামকুঞ্জের শীতল ছায়ায় প্রথম বালারুণচ্ছটা দেখিয়া আমার বিদ্যা-সাধকগণ সুন্দর ভাবের প্লাবনে ভারতকে দীর্ঘকাল ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন; ঐ দেশ হইতে মায়ের কথা শতমুখী হইয়া ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া বাঁধিয়াছিল,—এই দেশেই চিন্ময়ী মা মৃণ্ময়ী রূপশালিনী হইয়াছিলেন। ইহাই—

সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং মলয়জশীতলাং মাতরম্

মন্ত্রে ফুটিয়াছে। আর এই মায়ের আমরা সবাই সন্তান, এই মাকে মা বলিতে যাইয়া যে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই আমাদের মাতৃভাষা—মায়ের ভাষা। বাঙ্গালী মায়ের কথা যেমন করিয়া কহিয়াছে, তেমন মধুর মধুর ভাবে মায়ের গাথা পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষায় গীত হয় নাই—বুঝি বা হইবার নহে। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইহাই বিশিষ্টতা। বাঙ্গালীই একা সোহাগভরে বলিতে পারিয়াছে—

"আদর ক'রে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে;
তুমি দেখ আর আমি দেখি মন,—আর যেন কেউ না দেখে॥"

তোমার আমার মত দেখা আর ত কেহই দেখিতে পারে না। আমার জননী

জগজ্জননীর অংশরূপিণী, আমার শ্যামা মা দেশরূপা, জ্ঞানরূপা, অনাদ্যা এবং আদ্যা। আমাদের মা শিবানী, অথচ শিবপ্রসূতি। ভাষা এই মাতৃতত্ত্বকে কত রকমে, কত ছলে, কত ছন্দোবন্ধে বুঝাইয়াছেন। আমি এক দিকে দেখি—স্তনভারাবনমিতাঙ্গী মা আমার তাঁহার স্তনযুগলবিনির্গত ক্ষীরনীরধারায় আমাকে পুষ্ট করিতেছেন ; মা আমার গণেশ-জননী হইয়া ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন ! অন্য দিকে আবার দেখি, সেই মায়ের দেহ বাহান্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ধরাবক্ষকে বাহান্ন পীঠে খচিত করিয়া রাখিয়াছেন—দেশমাতৃকা জগন্মাতৃকা হইয়াছেন ; সতী-অঙ্গ-বিভূষণী, বালার্করুচিশোভনা উমা হইয়াছেন। আমরা মায়ের সন্তান মায়ের ক্রোড়ে বসিয়া সুখ দুঃখের খেলা করিতেছি। আমার ভাষা, আমার সাহিত্য—আমাকে এই কথাই শিখাইয়াছে, এখনও শিখাইতেছে। এই শিক্ষার প্রতিমা-দর্শন কামনায় চট্টগ্রামে গিয়াছিলাম। সে কামনা পূর্ণ হইয়াছে—

"তুমি দেখ আর আমি দেখি মন, আর যেন কেউ না দেখে।"

এই উক্তির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি। বটেই ত। আমরা দুই ভাই আমাদের মাকে যে নয়নে, যে ভাবে দেখিব, সে নয়নে আর সেই ভাবে আর ত কেহ দেখিতে পারিবে না। এই দর্শন-সিদ্ধিই সাহিত্য-সম্মিলন। দেখ দেখ, বাঙ্গালী, মায়ের অঙ্গনে দাঁড়াইয়া, ভাই ভাই এক ঠাঁই হইয়া দেখ, আর বল,—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী, বাণী বিদ্যাদায়িনী!

আমার সাহিত্যে আমার সমাজ ও ধর্ম্ম উভয়ই নিহিত। রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ হইতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত সকল গদ্যপদ্য গীত-গাথা আমার ধর্ম্ম ও সমাজের কথায় পূর্ণ। আমার সাহিত্যের চর্চ্চা হইলেই আমার সকল চর্চ্চা হইবে। ইহাই আমার বিশিষ্টতার পরিচায়ক।

ইহাই আমার স্মৃতি, আমার শ্রুতি, আমার দর্শন, আমার কর্ম্ম,—আমার সমাজ ও সাহিত্য। এমন সাহিত্য জগতে আর নাই, এমন দর্শনও জগতে আর হইল না। আমার বিদ্যাপতি—চণ্ডীদাস, আমার মুকুন্দরাম—রামপ্রসাদ, আমার ঘনরাম—ভারতচন্দ্র আমার ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য জুড়িয়া বসিয়া আছেন। যাহারা বাঙ্গালার সাহিত্য বুঝে ও জানে, সে অনল-সলিলের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ বাড়বাকুণ্ডে ডুব দিয়াছে, তাহাদের কি ভাবনা আছে? তাহারা বাঁচিয়া থাকিয়া সাহিত্য-সাগরে ডুব দিতে পারিলেই তাহাদের জন্ম সার্থক হইবে। তাই আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কথা তুলিয়া বাঁচিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। সে আহ্বান একবার শুন—সম্মিলনের সাধনা পূর্ণ হইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

PRINTED BY B. B. CHAKRAVARTI, LAKSHMIBILAS PRESS.
12, MARKELBAGAN LANE, CALCUTTA.
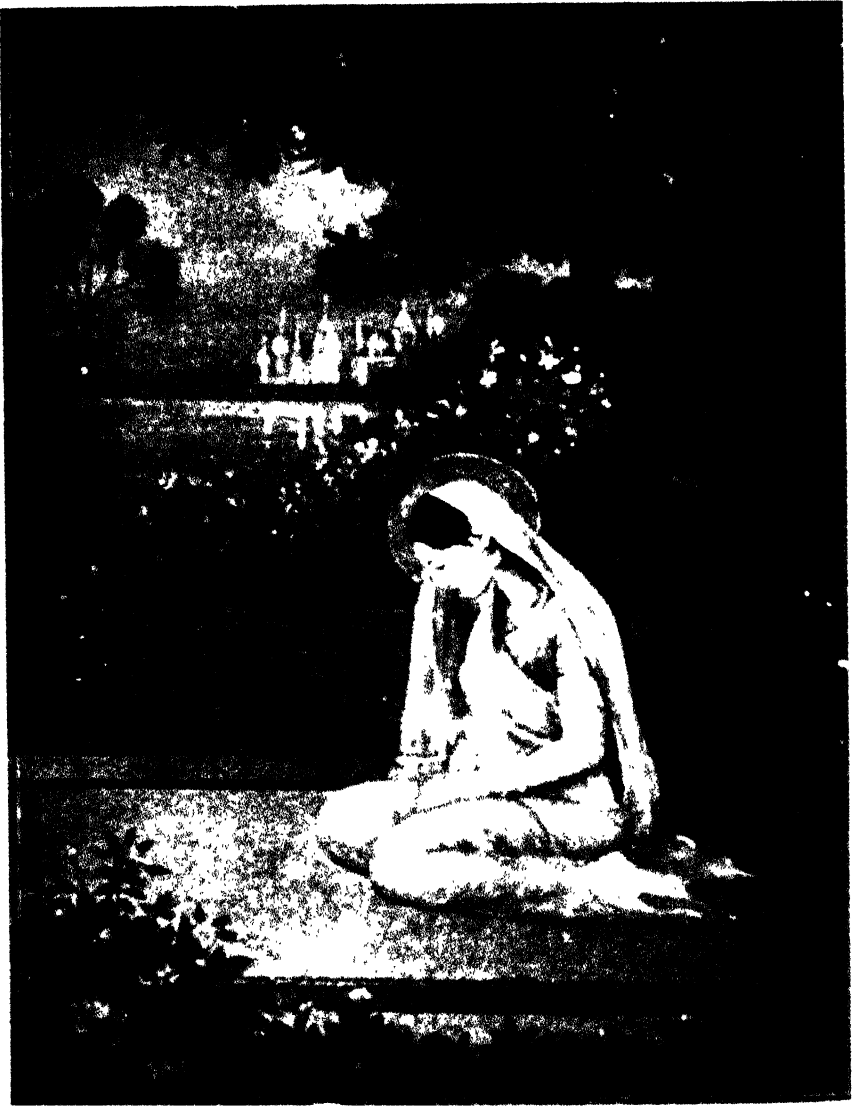
বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য। *

[স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত।]

বাঙ্গালার জনসাধারণের পাঠ্য ও সেব্য সাহিত্য বলিতে হইলে খাঁটী বাঙ্গালা সাহিত্যকেই বুঝাইবে। এখনও বহুকাল বাঙ্গালীর সাহিত্য বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য হইয়া থাকিবে। যতদিন এ দেশে উচ্চশিক্ষা ইংরেজী ভাষার সাহায্যে প্রচারিত হইবে, যতদিন ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান উহাদের উচ্চ আদর্শ ও পদবী রক্ষা করিতে পারিবে, ততদিন উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ ইংরেজী ভাষার সাহায্যে মনীষার উৎকর্ষসাধন করিবেন; বঙ্গ-সাহিত্য ততদিন বঙ্গদেশের লোকসাধারণের পাঠ্য ও সেব্য সাহিত্য হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য যে, পুরাতন ও আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্য এই নিম্নস্তরে ব্যাপ্ত থাকিলেও লোকশিক্ষার কার্য্যে তেমন পর্য্যাপ্ত নহে।

অনেকের বিশ্বাস যে, বাঙ্গালা সাহিত্য অতি অল্প লোকেই পড়িয়া থাকে; এ দেশের শিক্ষিতমাত্রেই বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করেন না; তাঁহারা ইংরেজী পুস্তকই পাঠ করিয়া থাকেন। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য নিহিত রহিয়াছে; তবে উহা যে সম্পূর্ণ প্রকৃত কথা, তাহা বলিতে পারি না। হইতে পারে যে, অতি অল্প লোকেই রীতিমত বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন; কেন না, বাঙ্গালায় অতি অল্প পুস্তকই আছে, যাহা আগাগোড়া পড়া চলে। তবে এই ধারণা ঠিক নহে যে, বঙ্গদেশে বাঙ্গালা পুস্তক-পাঠকের সংখ্যা এতই অল্প যে, তাহাকে নগণ্য বলিলেও চলে। দেশের শিল্পী, দোকানদার, যাহারা নিজ নিজ ব্যবসায়ের হিসাব রাখিতে পারে, এবং রাখিয়া থাকে, গ্রাম্য জমীদার ও মফস্বলের ব্যবহারাজীব, সরকারী কাছারীর নিম্নস্তরের কর্ম্মচারী, যাহাদের ইংরেজী বিদ্যা আফিসের কার্য্যের সীমায় নিবদ্ধ, এবং গ্রাম্য তালুকদার, যাহারা ইংরেজীও জানে না, কাছারীর কাজও বুঝে না—এবংবিধ সকল শ্রেণীর লোকেই বাঙ্গালা পুস্তকই পাঠ করে; ইহারাই বঙ্গ-সাহিত্যের চর্চ্চা করে। অর্থাৎ, নিরক্ষর কৃষক ও উচ্চশিক্ষিত ইংরেজীনবীশের মধ্যে যাহারা আছে, তাহারা সকলেই বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিয়া থাকে।

---

* ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, 'বেঙ্গল সোশ্যাল্ সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনে' পঠিত ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।

ইহা ছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাবে ও বিস্তারে যাহারা লেখাপড়া শিখিবে, তাহারাও এই বঙ্গসাহিত্যেরই পঠন-পাঠনে রত থাকিবে। অবশ্য, এই দেশীয় শিক্ষাকে সর্ব্ববিষয়ে, দেশের ও সমাজের উপযোগী করিয়া, উহার দ্বারা জ্ঞানসাধন করিতে হইবে। এই সকল লোকের জন্যই বঙ্গসাহিত্যের প্রয়োজন। এই সাহিত্য বাঙ্গালার লোকসাধারণের সাহিত্যই হইবে; কারণ, এই সকল শ্রেণীর লোকেই জাতির পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে; ইহারাই জনসাধারণ।

আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালী, আমাদের অদ্ভুত বিস্মৃতির প্রভাব। আমরা ভুলিয়া যাই যে, কেবল এই বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যেই বাঙ্গালী জাতিকে আমরা কোনও একটা ভাবে বিচলিত বা উত্তেজিত করিতে পারি। অথচ আমরা ইংরেজী ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করি, ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করি, ইংরেজী গদ্যে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকি। তখন আমাদের মনে থাকে না যে, দেশের জনসাধারণ ইংরেজী ভাষা-বোধে একেবারেই বধির; তাহারা আমাদের ব্যবহৃত একটি ইংরেজী শব্দেরও অর্থবোধ করিতে পারে না। অথচ সামাজিক বিষয়ে, ধর্ম্ম বিষয়ে কোনও একটা নূতন ভাবের প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে; নহিলে কোনও ফলোদয়ই হইবে না। আমার মনে হয়, একটা বড় ভাবের কথা বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীদিগকে বুঝাইতে পারিলে, সে ভাব তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে; হৃদয়ে নূতন তরঙ্গের উদ্ভব হইবে, সে তরঙ্গ জনে জনে আঘাত করিয়া দেশব্যাপী একটা বিরাট ভাবের ঢেউ তুলিতে পারিবে। এই নবভাবে জাতি উদ্বুদ্ধ হইবে, জাতির হৃদয়ে সজীবতা আনয়ন করিবে, সমাজের কল্যাণ আপনিই সাধিত হইবে। অন্য পক্ষে, কেবল ইংরেজী ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করিলে, ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলে, জাতিব্যাপী বিরাট ব্যাপার ঘটনা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। এই হেতু সামাজিক হিসাবে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তৃতি অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সে সাহিত্য জাতির সাহিত্য,— জনসাধারণের সাহিত্য হইবে।

বাঙ্গালায় জনসাধারণের সেবা এক অভিনব সাহিত্য যেন প্রমাদের পথে উদ্ভূত হইতেছে। অর্থাৎ, যে পদ্ধতি অনুসারে উহা উৎপন্ন হইতেছে, সে পদ্ধতি হয় ত প্রমাদসঙ্কুল। যাহা হউক, এই অভিনব সাহিত্য-উদ্ভবের চেষ্টা আমাদের সকলের লক্ষ্যের বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য; কেবল লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে না; স্থির ও ধীরভাবে, বিচক্ষণতার সহিত উহাকে উন্নিত করিতে হইবে। কারণ, জাতির সাহিত্য যে ভঙ্গী অবলম্বন করিবে, সেই ভঙ্গী অনুসারে জাতির বিশিষ্টতার উপর উহার

প্রভাব বিস্তীর্ণ হইবে। জনসাধারণের সাহিত্য এবং জাতির বিশিষ্টতা, উভয়েই উভয়ের উপর আপন-আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অর্থাৎ, সাহিত্য অনুসারে জাতির বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, বিশিষ্টতা অনুসারে জাতির সাহিত্যেরও বিস্তৃতি ও পুষ্টিসাধন হয়। অন্ততঃ বঙ্গদেশে জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাল হইতে এই উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পরিস্ফুট রহিয়াছে। জয়দেব তাঁহার যুগের কবি, সে কালের লোকসাধারণের কবি ছিলেন। পরবর্ত্তী কালেও জয়দেব বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালীর কবি ছিলেন। সে যুগে যাহারা লেখাপড়া করিত, তাহারা সংস্কৃত ভাষাতেই লেখাপড়া করিত। বিশেষতঃ, জয়দেবের কবিতা, এখনও যেমন হয়, তখনও তেমনই সভায় বা আসরে গীত হইত। সুতরাং উহার প্রচার ছিল, জন-সাধারণ উহা আদরের সহিত শুনিত। কাজেই জয়দেবকে বাঙ্গালার লোকসাধারণের কবি বলা চলে।

জয়দেবের গীত-গোবিন্দ তাৎকালিক বাঙ্গালী চরিত্রের দর্পণস্বরূপ। একটা জাতির বিশিষ্টতাজ্ঞাপক এমন কাব্য অন্য কোনও সাহিত্যে আছে কি না, বলা যায় না। মুসলমান বিজেতার লৌহময়, অতিকঠোর পাদুকার চাপে যখন বাঙ্গালীর মনুষ্যত্বের অপচয় ঘটিতে আরম্ভ করে, তখনই গীতগোবিন্দের প্রচার হয়। গীতগোবিন্দের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, আগাগোড়া কোনখানেই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক উন্নত ভাবের বিকাশমাত্র নাই; আছে কেবল রমণী-সুলভ কোমল মধুর ভাব। কবি কোনখানেই একটা নূতন সত্যের—একটা অপূর্ব্ব কথার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ কবিই,—তা তিনি ধর্ম্মবিষয়ক কবি হউন, বা বিষয়ি-বিনোদক কবি হউন,—এমন একটা ভাবের কথা মানুষকে শিখাইয়া যান, যাহার প্রভাবে মনুষ্যজীবন ধন্য হয়, মনুষ্য জাতি উন্নত হয়। কিন্তু জয়দেব এই প্রকারের কবি নহেন; তাঁহার ধরণ স্বতন্ত্র। তিনি যে কবিগুণোপেত নহেন, এমন কথা আমি বলি না। তিনি নিশ্চয়ই এক জন উচ্চাঙ্গের কবি। তাঁহার শব্দচয়ন ও শব্দযোজনার সামর্থ্য অসাধারণ; শব্দগুলি যেন বীণার ঝঙ্কারের মতন সুরের লহর তুলিয়া শ্রবণপথে ভাসিয়া যায়। শব্দযোজনার প্রভাবে তিনি যে এক একটা ভাবের আলেখ্য মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেন, তাহা অতি উজ্জ্বল, অতি সুন্দর, অতি মনোহর। কিন্তু তাঁহার অনুপম ভাষা ও চমৎকার ভাব-আলেখ্য কেবল কামের সন্ধুক্ষণ ঘটায়, মানুষকে কেবল রক্ত-মাংসের উপদ্রবের প্রতি যেন জোর করিয়া টানিয়া ধরে। দুর্ব্বল, স্থবির, কর্ম্মহীন জাতি যেমন কামকলাবিতানে সুখ বোধ করে, তেমনই সে জাতির

কবিও সে সুখলিপ্সার মুখে অপূর্ব্ব ভাষায় অপূর্ব্ব কাম-কাব্যের ইন্ধন যোগাইয়াছে। এই জয়দেবই পরবর্ত্তী সকল বাঙ্গালী কবির আদর্শস্বরূপ হইয়া আছেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ জয়দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন বটে, পরন্তু অনেকেই তাঁহার পদ-লালিত্য, কবিজনোচিত ভাবমাধুর্য্য প্রাপ্ত হন নাই। ইঁহাদের পরে নবদ্বীপের রাজসভার কবিগণ, বৈষ্ণব কবিদের মত, কামের পন্থা অবলম্বন করিয়া, কামের কবিতাই লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এখনও বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর প্রধান কাব্য গ্রন্থ। শেষে কবি, পাঁচালী, যাত্রায় ঐ এক রীতিতে টপ্পা ও অন্যান্য প্রেমসঙ্গীতের পুষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতি এই ভাবে, জয়দেবের কাল হইতে ভারতচন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত, এই দীর্ঘকাল কেবল কাম-কবিতায় বুদ্ধি ও চিত্তের তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন। স্থবির, দুর্ব্বল, কর্ম্মহীন, কোমল জাতির পক্ষে এই সাহিত্যই উপযোগী; উহার দ্বারাই বাঙ্গালীর মনীষার পুষ্টি-সাধন হইয়াছে। তাই মনুষ্যত্বের পরিপোষক উচ্চভাব, উন্নত আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালীর সাহিত্যে স্থান পায় নাই।

এই কোমল কামপ্রধান কাব্য-সাহিত্যের পার্শ্বে বঙ্গদেশে আর এক অপূর্ব্ব সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ন্যায়-শাস্ত্র ও স্মৃতি-শাস্ত্র অবলম্বনে এক কচ্‌কচীর সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্যত্বের উন্নত সকল ভাব হারাইলেও, বাঙ্গালী মেধার তীক্ষ্ণতা হারায় নাই। তাই কুল্লুক ভট্ট ও জীমূতবাহনের কাল হইতে জগন্নাথের কাল পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল বাঙ্গালী নব্যন্যায়ের ও নব্যস্মৃতির কত গ্রন্থই রচনা করিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা হয় না। টীকার উপর টীকা, ব্যাখ্যার উপর ব্যাখ্যা বাহির হইয়া স্মৃতি-শাস্ত্রকে একরূপ দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিয়াছে। এই দুর্ব্বোধ ও দুরবগাহ স্মৃতিশাস্ত্রের বিধিনিষেধের তাড়নায় ব্যক্তিমাত্রকেই কতকটা অধীন হইতে হইয়াছে। এই স্মৃতিশাস্ত্র গোতমের সময় হইতে ভারতবর্ষের পূর্ব্বগামী ঋষি মুনির দ্বারায় অনেকটা কঠোর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর শূলপাণি জীমূতবাহন হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ব্যাখ্যাতাদিগের বক্তৃতা যেন লৌহ শৃঙ্খলে বাঙ্গালীকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। বাঙ্গালীর আমোদ-প্রমোদ, আনন্দ উল্লাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিত্বের সকল বৃত্তিই স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি-নিষেধের নিগড়ে যেন আবদ্ধ—পিষ্টীকৃত হইয়া রহিয়াছে। জীবনের সকল ব্যাপারে—সুখে দুঃখে বাঙ্গালীর গুরু-পুরোহিত বাঙ্গালীকে যেন আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

অপর পক্ষে, বাঙ্গালার নব্য ন্যায় মনীষার চমৎকার বিকাশে অপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয় হইলেও, উহা কখনই দেশের লোকসাধারণকে স্পর্শ করিতে পারে

নাই। সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচায়ক, মনীষার অতুল্য বিকাশের দ্যোতক এই নব্য ন্যায় বাঙ্গালার জনসাধারণের পক্ষে পূর্ণ অবোধ্য হইয়া রহিয়াছে। ন্যায়ের কচ্‌কচি বলিয়া ও দিকে সাধারণ বিষয়ী লোকে কখনই দৃষ্টিপাত করেন নাই। অথচ এই নব্যন্যায়ের কচ্‌কচির অন্তরালে যে অপূর্ব্ব বাস্তবতা (Rationalism) নিহিত, সত্য-অনুসন্ধিৎসার যে প্রশস্ত পন্থা উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাহা জন কয়েক মেধাবী অধ্যাপকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকাতে, উহার দ্বারা জাতির চিত্তবৃত্তির পুষ্টিসাধন হয় নাই। বাঙ্গালীর এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির প্রভাবে বাঙ্গালী জাতির কোনও উপকারই হয় নাই। পরন্তু এই নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম তর্কজাল স্মৃতিশাস্ত্রের বিতণ্ডায় অপব্যবহৃত হইয়াছে। এই সামগ্রীটা যদি জাতির বিশিষ্টতা-রক্ষার ও পুষ্টির পক্ষে প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে না জানি বাঙ্গালী জাতির কি প্রভূত উপকার সাধিত হইত! এই নব্য ন্যায় বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্বোধ থাকাতে, উহার দ্বারা বাঙ্গালীর অনিষ্টসাধনই হইয়াছে।

এইরূপে বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্টতা এবং বাঙ্গালীর মনীষাজাত আর একটি বিষয়—অর্থাৎ নব্য-ন্যায় লইয়া, এক অপরের প্রতিঘাত করিয়া, জাতির চরিত্রের উন্মেষসাধন করিয়াছিল। কর্ম্মশূন্যতা, চিত্তের ও চরিত্রের জড়তা, এবং সঙ্কল্পসাধক পদ্ধতির অভাব, এই কয়টি মিলিয়া মিশিয়া বাঙ্গালীর কামকলা-গন্ধপরিব্যাপ্ত কোমল কামিনীসুলভ পদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালী এই সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া স্বীয় পুরুষকারের অপচয় ঘটাইয়াছে, এবং দুর্ব্বল মনীষার তৃপ্তিসাধন করিয়াছে। পক্ষান্তরে, ভাবসৃষ্টি বিষয়ে স্থবির, জাড্যজড়িত, অথচ অতিতীক্ষ্ণ ধীশক্তি লইয়া বাঙ্গালী নব্যন্যায়ের উদ্ভাবন করিয়াছে, এবং উহারই সাহায্যে স্মৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া জীবনযাত্রার পদ্ধতির বন্ধনী অতি কঠোর ও লৌহ-নিগড়ের ন্যায় দুশ্ছেদ্য করিয়া তুলিয়াছে! এই ভাবে বাঙ্গালী এতকাল সজীব ছিল—নিজের ভাবে নিজে স্থবির, স্বীয় কল্পনাজাত সাহিত্যের চর্চ্চায় নিজে দুর্ব্বল, কোমল, কামসম্ভুক্ষণে সদারত, সুতরাং নিশ্চল ও নিজের দুঃখ কষ্টের অনুভূতিশূন্য হইয়া সজীব ছিল। ঠিক এই সময়ে বাঙ্গালায় নবজীবনের অরুণোদয় হইল। (উহা ইংরেজ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় এবং বঙ্গে ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতির বিস্তার।) অবশ্য, এমন স্থবির, গতিশূন্য জাতির পক্ষে নবজীবন ও নবভাবোদয় সম্ভবপর কি না, তাহা বিচার্য্য। যাহা হউক, এই নব জীবনের—নবভাবোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার এক প্রবল অস্ত্র

বাঙ্গালীর হস্তগত হইল। উহা মুদ্রাযন্ত্র। এই নবভাবসম্পাতে, নবজীবনের প্রণোদনায় ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। লোকে গীতগোবিন্দ শ্রেণীর সাহিত্য ছাড়িয়া, একটা নূতন ও স্বতন্ত্র সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। বাঙ্গালী জাতির মনীষার ইতিহাস-কথার অধিক আবৃত্তি আমি করিব না; কেন না, সে কথা সকলেই জানে, এবং বুঝে। তবে যাহারা এই বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, নিম্নলিখিত গোটাকয়েক ব্যাপারের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চাহি।

(১) বাঙ্গালীর মধ্যে অভিনব সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। এই সাহিত্য লোকসাধারণের সাহিত্য হইবে, এবং আকাঙ্ক্ষার মুখে যোগান দিতে হইবে।

(২) শীঘ্রই এবম্ভাবের সাহিত্যের টান বাঙ্গালায় অতিমাত্রায় বাড়িবে। এই টানের মুখে যোগান দিতে হইলে, পরিমাণ ও গুণ, উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অর্থাৎ, গুণশূন্যমন্ন পুস্তক সকলের কেবল সংখ্যা হিসাব করিলেই চলিবে না, উহাদের গুণের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৩) এখন পরিমাণ যাহাই হউক, গুণের হিসাবে যে ভাল বৃদ্ধি হইতেছে না, তাহা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে।

সরকারী দপ্তর হইতে যে পুস্তক প্রচারের একখানি ত্রৈমাসিক বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালীর মনীষা এখনও উদ্ভাবনাশক্তিসম্পন্ন হয় নাই। সংখ্যা ও পরিমাণের বিষয়ে শ্লাঘা করিলেও, গুণের পক্ষে উহা যে অবহু, তাহা বলিতে হইবে। এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে এই সাহিত্য অনিষ্টজনক ও ক্ষতিকারক। দুই চারিখানি উপাদেয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সকলগুলিই হীন অনুকরণমাত্র, অথবা সংস্কৃত সাহিত্যের গালগল্পে পূর্ণ, অথবা বাজে কথায় পূর্ণ। এমন কেন ঘটিতেছে, তাহার দুইটি কারণ আমি নির্দ্দেশ করিতে পারি।

১। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করিতে অভিলাষী নহেন। চাটুকার খোসামোদ পণ্ডিত (fawning) ও অল্পবয়স্ক ব্যক্তিরা আমাদের দেশে গ্রন্থকার হইয়া থাকেন। অথবা স্কুলের ছেলেরা গ্রন্থকার হয়। কিংবা কর্ম্মহীন, ব্যবসায়হীন বাজে লোকই গ্রন্থকার সাজিয়া বসে। কেন না, এমন লেখকের পক্ষে যে আর কিছু হইবার উপায় নাই, সে যে আর কিছু হইতে পারে না। যাহারা দেশের লোককে নূতন ভাবে শিক্ষিত করিতে পারেন, দেশের মন জনকে নূতন কথা শুনাইতে পারেন, তাঁহারা

এ কার্য্যকে তাঁহাদের পদমর্য্যাদার যোগ্য বলিয়া মনে করেন না। যে তীব্র-বুদ্ধি, তেজস্বী বাঙ্গালী যুবক ঠিক ইংরেজের মতন ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতে ও লিখিতে পারে, সে মনে করে, বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচনা করা হীনবুদ্ধি-মাত্র, তাহার পদের ও শিক্ষার যোগ্য নহে। যদি কচিৎ কদাচিৎ কেহ লুকাইয়া কোনও বহি লেখেন ত সে পুস্তকে তাঁহার নাম থাকে না; উহা বিনামা বাহির হয়—চুপি চুপি প্রকাশিত হয়। এই হেতু যে কয়খানি ভাল বহি বাহির হইয়াছে, তাহাদের শিরোনামায় গ্রন্থকারের নাম নাই। এমন কথা বলি না যে, সবাই এই ভাবে গ্রন্থরচনা করিয়া থাকেন। জন কয়েক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থরচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলি অতি উপাদেয় হইয়াছে। কিন্তু ইঁহারা কয় জন? এবং কয়খানিই বা পুস্তক রচনা করিতে পারিয়াছেন? ক্ষোভের কথাই ত এই।

(২) ভাল সমালোচনার অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে। গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুস্তকগত ভালমন্দের কথা নির্ব্বিকার ও নিরপেক্ষ ভাবে বলিবার ক্ষমতা আমাদের অনেকেরই নাই বলিলেও হয়! দেশীয় সংবাদপত্র সকলে বুদ্ধিমত্তার সহিত পুস্তক-সমালোচনার অত্যন্তাভাব। বাঙ্গালী চিত্তের ইহা বড়ই দোষের কথা যে, বাঙ্গালী জাঁকজমকের—ডাকের সাজের সৌন্দর্য্য হইতে খাঁটী মনোহর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যটুকুকে পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারে না। বরং বাঙ্গালীর পক্ষে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি অনায়াসসাধ্য, পরন্তু সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ যেন বাঙ্গালীর পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার। চিত্তগত এই দোষের জন্য বাঙ্গালার সাহিত্যও একটু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যে সমালোচকের মতামতের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা আছে, তিনি প্রমাদবশতঃ মন্দ বহিকে ভাল বলিলে, এবং ভাল বহিকে মন্দ বলিলে, উন্নত সাহিত্যেরই ক্ষতি হয়। যাঁহারা বাঙ্গালীর থিয়েটারের শ্রোতৃমণ্ডলীর ভঙ্গী দেখিয়াছেন, (যেমন আমি দেখিয়াছি) তাঁহারা অনেকটা বাঙ্গালীর প্রশংসার মূল্য অবধারণ করিতে পারিবেন। থিয়েটারে সেই উৎকট উদ্ভট ভাষা, সেই বিকট কটকটে ভাববিন্যাস, সেই বাজে ইয়ারকী, বাজে রসিকতার স্রোত চলিতেছে, আর স্থির ধীর ভাবে লোকে তাহা শুনিতেছে, এবং অম্লানবদনে প্রশংসা করিতেছে, সেই পুস্তককে ভাল নাটক বলিয়া আদর করিতেছে। এই অবিচারিত প্রশংসার প্রভাবে বাঙ্গালায় নাট্যসাহিত্যের উন্নতি ঘটিতেছে না; এবং এই হেতু বাঙ্গালার সংসাহিত্যের অন্য সকল শাখাই যেন শুকাইয়া যাইতেছে।

এই সঙ্গে আমি আর একটি কথা বলিতে চাহি। অনেকেই আমাদের দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তিকে বড়ই ছোট—বেজায় সামান্য বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। এই ভ্রান্ত ধারণা হেতু বাঙ্গালার সংসাহিত্যের পুষ্টি হইতেছে না। অনেকেই মনে করিয়া বসিয়া আছেন যে, বাঙ্গালার জনসাধারণের জন্য যে পুস্তক রচিত হইবে, তাহাতে কেবল ছেলে-ভুলান গল্প থাকিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। যদি বিজ্ঞান বা ইতিহাসঘটিত কোনও পুস্তকের রচনা করিতে হয়, তাহা হইলে সে সব পুস্তকও বালকোপযোগী করিয়া লেখা হয়। শব্দচাতুর্য্যের ও মাধুর্য্যের বিকাশ, উন্নত ভাবের ব্যাখ্যান, মনুষ্য-চরিত্রের অথবা মানবত্তার উদ্বোধক সিদ্ধান্তের বিন্যাস যেন এই সকল পুস্তকে করিতে নাই। আধুনিক ইউরোপীয় পদার্থবিজ্ঞানের অভিনব সিদ্ধান্ত সকল যেন বাঙ্গালী পাঠকের পড়িতে নাই। যদি বা এই অদ্ভুত সমাচার শুনাইতে হয়, তবে তাহাকে শুষ্ক নীরস করিয়া, কঠোর কঠিন করিয়া শুনাইতে হইবে। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা বাঙ্গালী পাঠকগণকে বোকা সাজাইয়া পুস্তক রচনা করেন, তাঁহাদের পুস্তক সাধারণ বাঙ্গালীতে পড়ে না। যে সকল পুস্তকে পড়িবার কিছু থাকিবে, বাঙ্গালী কেবল তেমনই পুস্তক পড়িবে। সে শুষ্ক, নীরস ছেলেভুলান পুস্তক পড়িবে না, পড়িতে চাহিবে না। এখন যাঁহাদের পুস্তক সকল বাঙ্গালী প্রায়শঃ পাঠ করে, তাঁহারা এই অপসিদ্ধান্ত মাথায় লইয়া পুস্তক রচনা করেন নাই। মনে হয়, এই হেতু Vernacular Literature Society বা বাঙ্গালা সাহিত্য-প্রচার-সমিতি সহজবোধ্য সরল পুস্তকগুলির প্রচার করিয়া বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ কোনও উপকার করেন নাই। তবে এই সমিতি-প্রচারিত সাময়িক পত্রখানির দ্বারা অনেক উপকার হইতেছে, সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হইতেছে।

এইবার সাহিত্য-প্রচারের কথা একটু বলিব। ইহা সত্য বটে, যে বহি বিকাইবে, তাহা লইয়া ফেরীওয়ালা গ্রামে গ্রামে ঘুরিবে। কিন্তু সে অবস্থা হইতে এখনও বিলম্ব আছে। টানের মুখে যোগান দিতে হয় বটে, পরন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যোগানের মুখে টানের সৃষ্টি করিতে হইবে। ফেরীওয়ালারা বহুগ্রামে বহি বেচিতে যায়; কিন্তু তাহারা ভাল বহি বেচে না। তাহাদের পুঁজি বড়ই কম্তি। বিশেষতঃ, তাহারা নিয়মিত ফেরী করে না, কচিৎ কদাচিৎ গ্রামে যায়। এমন ভাবে পুস্তক-প্রচার করিলে চলিবে না। আমি মফস্বলের বহু স্থান হইতে অভিযোগ শুনিয়াছি যে, লোকে ভাল পুস্তক পায় না বলিয়াই খরিদ করে না। দেশীয় সাহিত্য-প্রচার-সমিতির (Vernacular Literature Society) অনেক স্থানে

শাখা-দোকান আছে। সমিতির প্রচারিত পুস্তক সকল এই সকল দোকানে পাওয়া যায়। সমিতির এই সকল দোকানে যদি অন্য ভাল পুস্তকের বিক্রয় হয়, তাহা হইলে, তাহাদের প্রচার বাড়ে, সৎসাহিত্যের পুষ্টিও হয়। এ পক্ষে সুব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়।

আপাততঃ পল্লীগ্রামে পাঠাগার বা লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। গোটাকয়েক পল্লীগ্রামে এই ভাবে সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, পরন্তু প্রত্যেক গ্রামে এক একটি পাঠাগার না থাকিলে কাজ হইবে না। অন্ততঃ যে সকল গ্রামে পাঠশালা বা স্কুল আছে, সেই সকল গ্রামে স্কুল বা পাঠশালার পণ্ডিত বা মাষ্টারের উপর ভার দিয়া এক একটি পাঠাগার খোলা চলে। শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক কর্ম্মচারী সকল গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক গ্রামেই একটি করিয়া পাঠাগার খুলিতে পারেন। বিশেষতঃ, শাসন ও বিচার বিভাগের কর্ম্মচারিগণের প্রসার প্রতিপত্তি অত্যধিক; তাঁহারা অল্প চেষ্টাতেই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। পাঠাগারের সংখ্যা বাড়িলেই সৎসাহিত্যের চর্চ্চারও প্রসার বাড়িবেই; লোকের একটা রুচিও সৃষ্ট হইবে। এ কাজটা তেমন কঠিন বলিয়া আমার বোধ হয় না।

প্রবন্ধপাঠের পর বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন যে, তিনি বহুকাল বঙ্গসাহিত্যের কল্যাণকামনায় রত রহিয়াছেন। তিনি মৌলিক-গ্রন্থ-প্রণয়নের পক্ষপাতী, অনুবাদের পক্ষপাতী নহেন। অবশ্য স্বীকার করি যে, সাহিত্যের সকল বিভাগেই নানা পুস্তকের রচনা হইয়াছে; বিজ্ঞান, বিশেষতঃ ধর্ম্মতত্ত্বে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে বটে। পরন্তু এখন বিচার্য্য এই যে, লোকে কি ইহাই চাহে? লোকের এই আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে হইলে, কলিকাতায় একটি এজেন্সী খুলিতে হইবে। এই এজেন্সীর সাহায্যে পুস্তকপ্রচার করিতে হইবে। প্রচার ও কাটতির মুখে অনেকটা বুঝা যাইবে যে, লোকে কি পড়িতে চাহে। এই ভাবে পুস্তকের প্রচার না হইলে পাঠের প্রবৃত্তি বাড়ান যাইবে না। লোকের পড়িবার প্রবৃত্তি বাড়িলে, এবং পুস্তক সকলের কাটতি হইলে বুঝা যাইবে, কোন্ প্রকারের পুস্তক এখন রচনা করিতে হইবে, এবং কি ভাবেই তাহা লিখিতে হইবে। আমার মনে হয় যে, এই এজেন্সীর অভাব শীঘ্র দূর হইবে।

ডাক্তার চক্রবর্ত্তী বলেন যে, পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে আমাদের ধারণায় গোলযোগ ঘটিয়াছে, তাই এত কথা উঠিতেছে। পাঠ্যপুস্তক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে; এক বিষয়বিশেষের উপর পাঠ্যপুস্তক; অর্থাৎ যাহার সাহায্যে বিষয়-

বিশেষের অধ্যাপনা চলিবে; আর চিত্তবিনোদক পাঠ্যপুস্তক; যথা, উপন্যাস, গল্প, নাটক, কাব্যগ্রন্থাদি। প্রথম শ্রেণীতে বিজ্ঞান, পদার্থতত্ত্ব, ইতিহাস ও চিকিৎসা-ঘটিত পুস্তক সকল সন্নিবিষ্ট হইতে পারে। এই সকল পুস্তক অতি সাবধানে ও আধুনিক সকল তথ্যে পূর্ণ করিয়া লিখিতে হইবে। এই শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক মৌলিক গ্রন্থ সকলের রচনা হইলে ভাল হয় বটে; কিন্তু এখনও সে সময় আইসে নাই। বিষয়বিশেষের পঠন পাঠন না হইলে, সে বিষয়ের মৌলিক-গ্রন্থ-রচনা সম্ভবপর নহে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানগ্রন্থ সকলের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিবার সময়ে অনেক নূতন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নূতন শব্দ গড়িতে হইতেছে। এই সকল বিশেষ শব্দের পারিভাষিক অর্থ এখনও সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, সে অর্থ অনেকেই গ্রাহ্য করে নাই। সুতরাং এই সকল পারিভাষিক শব্দের তদ্রূপ অনুরূপ ইংরেজী শব্দ বাছিয়া উহাদের অর্থনির্দ্ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে। কারণ, ইংরেজী বহি সকল বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতে লিখিয়া থাকেন, তাঁহারা যে ভাবে দেখিয়া শুনিয়া শব্দচয়ন করিয়া তাহাদের ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে ব্যবহৃত সকল শব্দের অর্থদ্যোতনার পক্ষে কোনও গোলমাল ঘটে না। এখন এই সকল ইংরেজী শব্দের অনুকূল বাঙ্গালা শব্দের রচনা করিলে অর্থসঙ্গতি বিষয়ে কোনও গোল ঘটিবে না। এই হেতু এখন ইংরেজী ভাষায় লিখিত বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক সকল বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিলে ভাষার পুষ্টি হইবে। সকল সভ্য দেশেই প্রথমে এই পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়, শেষে বিজ্ঞান বিষয়ের সাধারণতঃ আলোচনা আরব্ধ হইলে, মৌলিক গ্রন্থ লেখা আরব্ধ হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের বিষয়বিশেষের অধ্যয়ন অধ্যাপনা আরব্ধ না হইলে, তৎতৎ বিষয়ের গ্রন্থ সকলের আদর হয় না। চিকিৎসা শাস্ত্রের যদি পঠনপাঠন না হয়, চিকিৎসা শাস্ত্র পড়াইবার কলেজ ও স্কুল সকল যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে দেশে চিকিৎসাশাস্ত্রের বাঙ্গালা বহির আদর হয় না। কলিকাতা, আগ্রা, মান্দ্রাজ, হায়দরাবাদ, নাগপুর, বোম্বাই প্রভৃতি নগরে চিকিৎসা শাস্ত্রের স্কুলকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই, সে সকল স্কুলে ছাত্র হইতেছে বলিয়াই দেশীয় ভাষায় লিখিত চিকিৎসা শাস্ত্রের পুস্তক সকল অল্পবিস্তর বিকাইতেছে। বিজ্ঞানের অন্য শাখায় পাঠ্য পুস্তক লিখিতে হইলে এই ভাবে কার্য্য করিতে হইবে। বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন স্কুলকলেজে না হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তক সকলের প্রচলন এই সকল পাঠশালায় না হইলে, পাঠ্য পুস্তক লেখা বৃথা হইবে। এই হেতু ডাক্তার চক্রবর্ত্তী মনে করেন যে, সর্ব্বাগ্রে বিজ্ঞান বিষয়ের

প্রচার হওয়া প্রয়োজন, তৎপরে ইংরেজী পুস্তক সকলের অনুবাদ করিয়া অভাব-মোচন করা আবশ্যক। শেষে মৌলিক গ্রন্থ সকল আপনা-আপনিই রচিত হইবে। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য পুস্তকের অভাব পূর্ণ হইয়া যাইবে।

পরন্তু গল্প, উপন্যাস, কাব্য গ্রন্থাদির রচনা বিষয়ে এ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে চলিবে না। ইংরেজী উপন্যাস বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিলে তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে চিত্তবিনোদক হইবে না। গৃহস্থলীর কথা, সমাজের কথা, দেশের ইতিহাসের কথা লইয়া উপন্যাস লিখিতে হইবে, তবে তাহা বাঙ্গালীর চিত্তবিনোদন করিতে পারিবে। ইংরেজের উপন্যাসে ইংরেজের সমাজ, ধর্ম্ম ও ইতিহাসের কথা আছে; সে সকল উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলে তাহা বাঙ্গালীর রুচিকর হইবে না। কাব্যের পক্ষেও ঐ একই কথা খাটে। অতএব এ ক্ষেত্রে মৌলিক পুস্তক লিখিতে না পারিলে বাঙ্গালী পাঠকের তৃপ্তি হইবে না, বাঙ্গালা ভাষারও পুষ্টি হইবে না। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাস লিখিয়া এই সিদ্ধান্তটা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। "আলালের ঘরের দুলালে"র ভাষা যেমন সহজসাধ্য, উহাতে লিখিত বিষয়গুলিও তেমনই সদুপদেশপূর্ণ। এই ভাবে উপন্যাস রচিত হইলে লোকেও পড়িবে, নবীন বঙ্গসাহিত্যেরও আদর বাড়িবে। অনেকে বলেন যে, ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গালা পড়িতে চাহেন না। কথাটা সত্য হইতে পারে, কিন্তু কয় জন ইংরেজী শিখে ও জানে? যাহারা এখন কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, বিদ্যাসুন্দর ও পাঁচালী পড়িয়া কাল কাটায়, তাহারা ত নব্য বঙ্গসাহিত্যের পুস্তক সকল পড়িতে পারে। এই সকল গ্রন্থের পঠন-পাঠন অধিক থাকিলে, লোকের অন্ধ বিশ্বাসের বৃদ্ধি পাইবে, কামবৃত্তির পোষণ করা হইবে। এই সকল পুস্তকের পরিবর্ত্তে ভাল ভাল উপন্যাস রচনা করিয়া দিলে, পাঠকের মন প্রশস্ত হইবে, মনুষ্যত্বের উন্মেষ হইবে, ধীরে ধীরে দেশের ও সমাজের রুচি বদলাইবে। এখন এই ভাবে চালাইলে আগামিগণ বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিবেন, পারিভাষিক শব্দের নির্দ্ধারণ করিবেন, পরে বিজ্ঞানবিষয়ক ভাল ভাল মৌলিক পুস্তকও রচনা করিতে পারিবেন। এখন ভাষার পত্তনের সময়; এখন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিলে পরে সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইতে পারিবে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

গৌড়কবি মনোরথ।

গৌড়কবি মনোরথ যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের একটি স্মরণীয় যুগ। তখনও বাঙ্গালা দেশে পাল-নরপালগণের শাসন-ক্ষমতা বর্ত্তমান ছিল। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের স্বর্গারোহণের পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরোহন করিয়া, "অনীতিপরায়ণ" হইলে, একটি মহাবিপ্লবে পরাভূত ও নিহত হইয়াছিলেন। পাল-রাজগণের জনকভূমি বরেন্দ্র-মণ্ডল কৈবর্ত্ত-নায়ক দিব্য নামক রাজপুরুষের করতলগত হইয়াছিল; দ্বিতীয় মহীপালদেবের ভ্রাতা শূরপাল ও রামপাল বরেন্দ্র হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, দিব্যোর ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম বরেন্দ্রমণ্ডলে রাজা হইয়াছিলেন: শূরপালদেব অল্পকালে পরলোক গমন করিলে, সামন্তগণের সহায়তায়, রামপালদেব বরেন্দ্রীর উদ্ধার সাধন করিয়া, দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কুমারপাল অতঃপর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রামপালদেব বরেন্দ্রীর উদ্ধার সাধন করিয়া, কামরূপে ও পূর্ব্ববঙ্গে পুনরায় শাসনপ্রভাব বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইলেও, তাঁহার তিরোভাবে ঐ সকল প্রদেশে পুনরায় বিদ্রোহবহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছিল। তজ্জন্য কুমারপাল তদীয় প্রিয়তম মন্ত্রী বৈদ্যদেবকে বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বৈদ্যদেব "অনুত্তর বঙ্গে"র জলযুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া, কামরূপের বিদ্রোহী নরপালের নিধনসাধন করেন; এবং স্বয়ং কামরূপের সিংহাসনে আরোহন করিয়া, "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রশস্তি রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া এই যুগের বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করিতে গিয়া, গৌড়কবি মনোরথ সে কালের বাঙ্গালীর বাহুবলের ও শাসন-কৌশলের অনেক পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যদি কখনও বাঙ্গালীর ইতিহাস যথাযোগ্যভাবে সঙ্কলিত হয়, তাহাতে মনোরথের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বরেন্দ্রমণ্ডলের সুশাসনসম্পন্ন ভাব গ্রামে কৌশিক-গোত্রসম্ভূত ভরত নামক এক পুণ্যশ্লোক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি এরূপ পুণ্যশীল ছিলেন যে, সমসাময়িক লোক মনে করিত,—তাঁহার নামমাত্র উচ্চারণ করিলেই পাপ-প্রপঞ্চ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভরতের পুত্র যুধিষ্ঠির সুধীসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীধর তীর্থভ্রমণে, বেদাধ্যয়নে, দানাধ্যাপনায়, যজ্ঞানুষ্ঠানে, ব্রতাচরণে ও বিবিধ কৃচ্ছ্র সাধনে জ্ঞানকাণ্ড-কর্ম্মকাণ্ডবিৎ পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

কামরূপাধিপতি মহারাজাধিরাজ বৈদ্যদেব তদীয় বিজয়রাজ্যের চতুর্থ সংবৎসরে বৈশাখ বিষুবৎ-সংক্রান্তিতে সেই শ্রীধরকে ভূমিদান করিয়া, এক তাম্রশাসন সম্পাদিত করাইয়াছিলেন। তাহা কর্ণভদ্র নামক শিল্পী কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাহাতে যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা রাজগুরু মুরারির পুত্র পদ্মাগর্ব্ভোৎপন্ন মনোরথ কর্ত্তৃক বিরচিত। বারাণসীধামের গঙ্গা-বরুণা-সঙ্গম স্থলের নিকটবর্ত্তী কমৌলি গ্রামে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ভূমিখননোপলক্ষে সেই তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হইবার পর, গৌড়কবি মনোরথের নাম ও পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মনোরথের কবিপ্রতিভার অন্য কোনও নিদর্শন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু এই একখানিমাত্র প্রশস্তি হইতেই মনোরথের রচনা-কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১)

রামপালদেব "জনকভূমি"র উদ্ধারসাধন করিয়া সে কালের বাঙ্গালীর নিকট শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় "যথাবৎ" যশস্বী হইয়াছিলেন। সেই ঐতিহাসিক ব্যাপারের পরিচয়-প্রদানের জন্য মনোরথ একটিমাত্র শ্লোকে এক মহাবিপ্লবের ইতিহাস ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। শ্লোকটি এই,—

> "তস্যোজ্জ্বল-পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ
> পুত্রঃ পালকুলাব্ধি-শীতকিরণঃ সাম্রাজ্য-বিখ্যাতিভাক্।
> তেনে যেন জগত্ত্রয়ে জনকভূ-লাভাৎ যথাবৎ যশঃ
> ক্ষৌণীনায়ক-ভীম-রাবণ-বধাৎ দুষ্কার্ণবোল্লঙ্ঘনাৎ॥"

স্বনাম-সাদৃশ্যে ও স্বকর্ম্মসাদৃশ্যে রামপালদেব কিরূপে দ্বিতীয় রামচন্দ্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সন্ধ্যাকর-নন্দি-বিরচিত "রামচরিতম্" কাব্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (২) গৌড়কবি মনোরথের এই শ্লোকটি স্বল্পাক্ষরে সুকৌশলে সেই কাব্যের পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়াছে। রাম-পক্ষে ও রামপাল-পক্ষে তুল্যরূপে প্রয়োজ্য "জনকভূ-লাভাৎ", "ভীম-রাবণ-বধাৎ" ও "দুষ্কার্ণ-বোল্লঙ্ঘনাৎ", এই তিনটি শ্লিষ্টপদের ব্যবহারে, মনোরথ রচনা-কৌশলের পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। পাল-নরপালগণ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন; সে কথা মনোরথের রচনাতেই জানিতে পারা গিয়াছে। বরেন্দ্রী তাঁহাদিগের জনকভূমি ছিল, তাহাও মনোরথের রচনাতেই প্রথমে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সন্ধ্যাকর

(১) এই প্রশস্তি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত গৌড়-লেখমালা গ্রন্থের প্রথম স্তবকে সটীক বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

(২) এই গ্রন্থ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

নন্দীও "রামচরিতম্" কাব্যে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এক অর্থে "বরেন্দ্রী" ও অন্য অর্থে "সীতাদেবী" বলিয়া "জনকভূ" শব্দের ব্যবহার করিয়া, মনোরথ যে রচনা-কৌশলের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতম্" কাব্যে তাহাই অনুসৃত হইয়াছে। "জনকভূ" শব্দের এইরূপ ব্যবহারের প্রথম পথ-প্রদর্শক মহাকবি সুবন্ধু। তিনি "বাসবদত্তা"য় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"রাঘবঃ পরিত্যজ্যাপি জনকভুবং জনকভুবা সহ বনং বিবেশ।" "বিরোধা-ভাসে"র আভাস-প্রদানের জন্য, সুবন্ধু এইরূপে "পিতৃভূমি" ও জনকনন্দিনী, এই উভয় অর্থের সূচনা করিয়া, যে রচনা-কৌশলের অবতারণা করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাহাতেই বরেন্দ্রীর ইতিহাস কাব্যাকারে গ্রথিত হইয়াছিল।

বৈদ্যদেবের প্রশস্তি-রচনা করিতে গিয়া, গৌড়কবি মনোরথ সেকালের "গৌড়জনে"র অনেক চিত্র চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। যে দেশের ইতিহাস নাই, সে দেশের পক্ষে এরূপ চিত্র বহুমূল্য। কবিকল্পনা চিত্রগুলিকে নানা মনোরম অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছে; সেগুলি পরিত্যাগ করিলেও, মূল ঐতিহাসিক তথ্য মনোজ্ঞ বলিয়াই স্বীকৃত হইবে।

বৈদ্যদেব রামপালদেবের পুত্র কুমারপাল দেবের মন্ত্রী ছিলেন। কুমার-পালের কীর্ত্তিকলাপের বিস্তৃত বর্ণনা না করিয়া, মনোরথ সুকৌশলে তাঁহার প্রাসাদ-বর্ণনায় তদীয় বীরকীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"যস্যাবাপ্তি কিরীট হাটক কৃত প্রাসাদ কণ্ঠীরব
প্রাসত্রাসবশাৎ শশোঽপি বিধুবিম্বান্তরূপী মৃগঃ।"

পরাজিত ভূপালবৃন্দের রাজমুকুট হইতে স্বর্ণ আহরণ করিয়া, তদ্দ্বারা সিংহমূর্ত্তি নির্ম্মিত করিয়া, প্রাসাদশীর্ষে সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া, বিজয়গৌরব বিজ্ঞাপিত করিবার কৌশলের মধ্যে শিল্পরুচিরও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন,—সমুচ্চ প্রাসাদ-শিখরে সংস্থাপিত সিংহমূর্ত্তির "প্রাসত্রাসে" চন্দ্রমণ্ডলস্থ "বিম্বান্তরূপী" মৃগ পলায়নপর হইবে। ইহা কবিকল্পনা হইলেও, এই কল্পনার মধ্যে সেকালের কবি-জনয়ের কল্পনা-সামর্থ্য প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে।

মনোরথ ব্রাহ্মণ কবি। তিনি যাঁহার গুণগাথা গান করিয়াছিলেন, তিনিও ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। কিন্তু সেকালের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী কেবল মন্ত্রণাগৃহেই সকল কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারিতেন না;—প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাচালনাও করিতে হইত। বৈদ্যদেবের প্রশস্তিতে একটি জল-

যুদ্ধের ও একটি স্থলযুদ্ধের বর্ণনা করিয়া, গৌড়কবি মনোরথ এই ঐতিহাসিক তথ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

জলযুদ্ধটি প্রথমে সংঘটিত হইয়াছিল; তাহার পর স্থলযুদ্ধ। জলযুদ্ধের স্থান "অনুত্তরবঙ্গ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নদীবহুল দক্ষিণবঙ্গে জলযুদ্ধ সংঘটিত হইবার সময়ে, যে সকল রণতরণী ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা ক্ষেপণী-বিক্ষেপে পরিচালিত হইত। বহুসংখ্যক ক্ষেপণী এক সঙ্গে জলমধ্যে নিপতিত হইত, এক সঙ্গে ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলিত হইত।—এই ক্ষেপণীবিক্ষেপ ব্যাপারে জলকণাসমূহ বহু ঊর্দ্ধে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। ইহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে মনোরথ বলিয়াছেন,—"সেই জলকণা যদি আকাশে স্থিরতা লাভ করিতে পারিত, তবে চন্দ্রমণ্ডলের কলঙ্ককালিমা ধৌত হইয়া যাইত!" চন্দ্রমণ্ডলের কলঙ্ককালিমা ধৌত হয় নাই; কিন্তু মনোরথের রচনাকৌশলে অভিব্যক্ত এই ঐতিহাসিক তথ্যে বাঙ্গালীর কলঙ্ক-কালিমা ধৌত হইতে পারে। অনুশীলনের অভাবে যে শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সে শক্তি যখন পূর্ণগৌরবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন বাহুতে বল ছিল; হৃদয়ে সাহস ছিল; বিজয়োল্লাসে উৎসাহ ছিল; জলযুদ্ধের বিজয়-বিজ্ঞাপক হীহীরবে দিগ্‌গজগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কেবল অন্যত্র গমন করিবার উপায় নাই বলিয়াই, দিগ্‌গজগণ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতে পারে নাই! মনোরথের এই কবিজনোচিত বর্ণনা সবল কবি-কল্পনার পরিচয় দান করিতেছে। যথা,—

> "যস্যানুত্তরবঙ্গ-সঙ্গরজয়ে নৌবাট-হীহীরব-
> ত্রস্তৈর্দিক্‌করিভিশ্চ যন্নচলিতং চেন্নাস্তি তৎপদ্যভূঃ।
> কিঞ্চোৎপাতুক-কেনিপাত-পতন-প্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈ-
> রাকাশে স্থিরতাং কৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী।"

কাহার সহিত এই জলযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, মনোরথ তাহার উল্লেখ করেন নাই। কেবল ইহাকে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর বিজয়-গৌরবের একটি দৃষ্টান্তরূপেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত অন্য কোনও প্রাচীন লিপিতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সমসাময়িক লোকসমাজে ইহার কথা অবশ্যই সুপরিচিত ছিল। সুতরাং ইহাকে মনোরথের কপোল-কল্পিত কবি-কাহিনী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না। ইহাকে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। মহাকবি কালিদাস "নৌসাধনোদ্যত" বাঙ্গালীর একটু গুণগান করিয়া গিয়াছিলেন; গৌড়কবি

মনোরথ তাহার একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এ সকল কথা নবাবঙ্গের কবি-কল্পনার অতীত হইয়া রহিয়াছে। আধুনিক বঙ্গ-কবিকুল বঙ্গীয় নৌবাহিনীর বিজয়গৌরব বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন।

মনোরথ একটিমাত্র শ্লোকে জলযুদ্ধের পরিচয় দান করিয়া, স্থলযুদ্ধ-বর্ণনায় চারিটি শ্লোকের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা-কৌশল ব্রাহ্মণ বীরের ও ব্রাহ্মণ কবির পদমর্য্যাদার উপযুক্ত বলিয়াই স্বীকৃত হইবে। বৈদ্যদেব তাঁহার প্রভুর আজ্ঞায়, কতিপয় দিবসের রণযাত্রায়, কামরূপে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি প্রভুর আজ্ঞা মাল্যদামের ন্যায় মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, এই বর্ণনায় সুকৌশলে মন্ত্রিবরের রাজানুগত্যের মর্য্যাদা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। রণযাত্রার বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য। যথা,—"ব্যোমতল ধূলিপটলে সমাকীর্ণ হইয়া, বালুকাকীর্ণ 'স্থলে'র আকার ধারণ করিয়াছিল ; তাহার উপর দিয়া সূর্য্যরথ টানিয়া লইতে সপ্তাশ্বের বড় পদবিক্ষেপভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। এ দিকে ইন্দ্রদেবেরও বড় বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল। তিনি দুই হস্তে দুইটি চক্ষু আবৃত করিয়া, হস্ত দ্বারা অন্য ক্রিয়া করিতে অশক্ত হইয়া, তদীয় 'অনিমীলনকর' [illegible] স্পন্দনশূন্য [illegible] দেবনায়নলাভের কণ্ডূয়নের নিন্দা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রণযাত্রার বর্ণনায় এই শ্রেণীর কবিকল্পনার অন্যান্য নিদর্শনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সমর বর্ণনায় সমরে গৌড়কবি মনোরথ যে কবিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। যথা—

> "লোকত্রাসকরে রণবিকৃতি [illegible] বেদিকে
> সংগ্রামাধ্বর-পূরিতে রিপুশিরঃশ্রেণীসমৎ [illegible] :
> কৃত্বা হোমবিধিং পরাক্রমভুজা সমাপ্য পূর্ণাহুতিং
> লভোগ্রযশো-মহৎ ফলমসৌ শ্রীবৈদ্যদেবো ব্রতী।"

বৈদ্যদেব ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার সমর-ব্যাপারও যজ্ঞকার্য্যরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। সে রণযজ্ঞের 'অরণি' হইয়াছিল,—বাহুদণ্ড-সংঘর্ষণ ; তদুৎপন্ন অগ্নির 'ইন্ধন' হইয়াছিল,—সেনামণ্ডল ; রিপুশিরঃসমূহ তাহাতে শ্রীফলের ন্যায় হোমবিধির কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল ; শত্রুনরপালের নিধনসাধনে সে রণযজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইয়াছিল। এই বর্ণনায় শব্দবিন্যাস যেমন বিষয়োপযোগী, কল্পনাটিও সেইরূপ ব্রাহ্মণোপযোগিনী। এই রণযজ্ঞের অবসানে, তাহার মহৎ ফল লাভ করিয়া, বৈদ্যদেব কামরূপের রাজা হইয়াছিলেন।

মনোরথের রচনায় অভিব্যক্ত এই ঐতিহাসিক তথ্য অন্য কোনও প্রাচীন

লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছিল কি না, এ পর্য্যন্ত তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। গৌড়কবি মনোরথ এই প্রশস্তির মধ্যে প্রয়োজনানুরোধে সকল রসেরই অবতারণা করিয়া, ইহাকে একখানি কাব্যের মর্য্যাদা দান করিয়া গিয়াছেন। তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, বৃহৎ ব্যাপারের বর্ণনায় গৌরবান্বিত; রচনা-কৌশলে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বিদেশী গল্প।

সমাপ্তি।

কাউণ্ট লোমেরি প্রসাধনশেষে একবার প্রাচীর-বিলম্বিত দর্পণের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিলেন।

মস্তকের কেশরাজি শুভ্র হইলেও, এখনও তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হয় নাই। সত্যই তিনি সুপুরুষ। দেহ দীর্ঘ, সবল ও একহারা। ক্ষীণ মুখমণ্ডলে গুম্ফরাজি সুশোভিত। তাহাতে এখনও শুভ্রতার রেখা ভাল করিয়া পড়ে নাই।

দর্পণে আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া তিনি মৃদুগুঞ্জনে বলিলেন, "লোমেরি এখনও বাঁচিয়া আছে।"

প্রসাধন-কক্ষ হইতে উঠিয়া প্রভাতের চিঠিপত্র পড়িবার অভিপ্রায়ে কাউণ্ট বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। টেবিলের উপর দশ বারোখানি চিঠি ও বিভিন্ন রুচির তিনখানি সংবাদপত্র রক্ষিত ছিল। এক জোড়া তাসের মধ্য হইতে জুয়াড়ী যেমন মনোনীত তাসখানি তুলিয়া লয়, চিঠিগুলি তেমনই অঙ্গুলি-স্পর্শে ছড়াইয়া ফেলিয়া একদৃষ্টিপাতে তিনি পত্রগুলির শিরোনামার হস্তাক্ষর দেখিয়া লইলেন। প্রতিদিন খাম ছিঁড়িয়া চিঠিগুলি পড়িবার পূর্ব্বেই তিনি প্রত্যেক পত্রের হস্তাক্ষর এই ভাবে দেখিয়া থাকেন।

প্রত্যহ চিঠি পড়িবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একটা অনির্দ্দিষ্ট উৎকণ্ঠা, আশা ও আনন্দ যুগপৎ তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইত। মোহরাঙ্কিত রহস্যপূর্ণ পত্রগুলি তাঁহার নিকট কোন্ সংবাদ বহন করিয়া আনিত? তাহাতে কিরূপ আনন্দ, সুখ, অথবা দুঃখ তিনি অনুভব করিতেন? একবার দৃষ্টিপাতেই তিনি বুঝিতে

পারিতেন, কোন্ পত্র কোথা হইতে আসিয়াছে। যে যে পত্রের মধ্যে যেরূপ বিষয়ের সংবাদ থাকিতে পারে বলিয়া তিনি অনুমান করিতেন, তদনুসারে তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাড়া বাঁধিয়া রাখিতেন। এইগুলি বন্ধু বান্ধবের নিকট হইতে আসিয়াছে। ঐগুলি বাজে লোক লিখিয়াছে। বাকীগুলির লেখক তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই শেষোক্ত শ্রেণীর পত্রগুলিই তাঁহাকে বিব্রত ও বিচলিত করিয়া তুলিত। লেখকেরা তাঁহার নিকট কি চাহে? কে এইরূপ বিচিত্র বর্ণমালায় তাঁহার নিকট পত্র লিখিল? পত্রমধ্যে ভাব ও কল্পনার উচ্ছ্বাস, আশার সংবাদ, অথবা ভীতি-প্রদর্শনের চেষ্টা প্রচ্ছন্ন? পত্র-পাঠের পূর্ব্বে এইরূপ নানা চিন্তায় তিনি অভিভূত হইতেন।

আজ একখানি পত্র বিশেষভাবে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। শিরো-নাম-পাঠে পত্রমধ্যে যে কিছু বিশেষত্ব আছে, এরূপ অনুমিত হয় না। কিন্তু তথাপি তিনি অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন, অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলেন।

তিনি ভাবিলেন:—"কে এ পত্র লিখিল? হাতের লেখা পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে বটে; কিন্তু লোকটা কে বুঝিতে পারিতেছি না ত।"

দুইটি আঙ্গুলে চিঠিখানি তুলিয়া ধরিয়া খামের মধ্য দিয়া ভিতরের লেখা পড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু খামখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চিঠি পড়িবার ইচ্ছা হইল না।

একবার ঘ্রাণ লইয়া দেখিলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তার পর টেবিলের উপর হইতে একখানি আতশী কাচ তুলিয়া লইলেন। হস্তাক্ষরের সৌন্দর্য্য-অনুশীলনের জন্য তিনি এই কাচখানি ব্যবহার করিতেন। অকস্মাৎ তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।—"কে এ পত্র লিখিল? হাতের লেখা বিশেষ পরিচিত বলিয়া বুঝিতেছি। এ ভাষা যেন আমি অনেকবার পড়িয়াছি। বোধ হয়, সে অনেকদিন আগে। কে লিখ্‌লে হে? ও, লোকটা বুঝি কিছু টাকা চায়।" খাম ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তিনি চিঠি পড়িলেন:

"প্রিয় বন্ধু,—নিঃসন্দেহ তুমি আমায় ভুলিয়া গিয়াছ। কারণ, প্রায় পঁচিশ বৎসর আমাদের দেখা শুনা হয় নাই। তখন আমার পূর্ণ যৌবন ছিল; এখন বুড়া হইয়াছি। তোমার কাছে বিদায় হইয়া আমি প্যারী ত্যাগ করি; তার পর আমার বৃদ্ধ স্বামীর সহিত দেশে চলিয়া যাই। তাঁর কথা কি তোমার মনে আছে? আজ পাঁচ বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমার কন্যার

বিবাহ দিব বলিয়া এখন আমি প্যারী নগরীতে ফিরিয়া যাইতেছি। আমার মেয়ের বয়স আঠারো বৎসর, সে খুব সুন্দরী। তাহাকে তুমি কখনও দেখ নাই। আমি তাহার বিবাহ সম্বন্ধে তোমাকে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু এ তুচ্ছ বিষয়ে তুমি আদৌ কান দাও নাই।

"আমি শুনিয়াছি, তুমি এখনও তেমনই সুন্দর আছ। ছোট লিজি, যাকে তুমি লিসোঁ বলিয়া ডাকিতে, যদি এখনও তার কথা তোমার মনে থাকে, তা হ'লে আজ বিকালে আসিয়া তাহার বাড়ীতে আহারাদি করিও। এখন সে বৃদ্ধা,—ব্যারনেস ভান্‌স্ নামে পরিচিতা। এখনও সে তোমার প্রতি তেমনই শ্রদ্ধাশালিনী। তাহার অদৃষ্টকে সে কখনও নিন্দা করে নাই। তেমনই শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত সে তোমার সহিত করকম্পন করিতে সমুৎসুক। কিন্তু বন্ধু, সে হস্ত-চুম্বনের আকাঙ্ক্ষা রাখিও না। ইতি—

লিজি ভান্‌স্।"

লোমেরিঁর হৃদয় দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। আরাম-কেদারায় তিনি একই ভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন; পত্রখানি জানুর উপর রাখিয়া তিনি শূন্যপানে চাহিয়া রহিলেন। স্মৃতির অঙ্কুশ-তাড়নায়, ভাবের আতিশয্যে তাঁহার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল।

জীবনে এই লিজি ছাড়া তিনি আর কোনও রমণীকে ভালবাসেন নাই। লিজি কি সুন্দরী—কি মনোমোহিনীই ছিল! তাহার স্বামী ব্যারণ ভানস্ বাতরোগগ্রস্ত ছিলেন। পাছে তাঁহার সুন্দরী পত্নী সুপুরুষ লোমেরিঁর প্রতি আকৃষ্ট হন, এই আশঙ্কায়, তিনি পত্নীকে নিজের জমীদারীতে লইয়া যান। সেই-খানেই তাঁহাকে এতকাল নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সত্যই লোমেরিঁ এই নারীকে ভালবাসিতেন। লিজিও তাঁহাকে সত্যই ভালবাসেন, এ বিশ্বাসও তাঁহার ছিল।

মানসপট হইতে যে স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছিল, বহুদিন পরে আজ যৌবনের সুখদুঃখমিশ্রিত সহস্র কথা তাঁহার মনে পড়িল। একদিন সায়াহ্নে 'বল' নৃত্যের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার পর সুন্দরী লিজি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। উভয়ে তখন বয়দে বোলোঁতে বেড়াইতে গেলেন। যুবতীর অঙ্গে সাদা পরিচ্ছদ। তখন বসন্তকাল। প্রকৃতি মনোহারিণী। সুন্দরীর বর অঙ্গ ও সুরভিচর্চ্চিত বসনের সৌরভে ঈষদুষ্ণ পবন মাতিয়া উঠিল। কি মধুর রাত্রি! পত্রান্তরালচ্যুত চন্দ্ররশ্মি হ্রদের জলে পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল।

হ্রদতটে উপনীত হইলে লিজি অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সবিস্ময়ে লোমেরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে ?"

যুবতী বলিলেন, "জানি না ; চাঁদের আলো ও হ্রদের জল আমার হৃদয় অভিভূত করিয়াছে। কোনও সুন্দর, কাব্যময় দৃশ্য দেখিলেই আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখনই আমার কান্না পায়।"

তিনি হাসিলেন। নারীজনোচিত এই ভাবাসক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া তিনি গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "লিজি, তুমি কি সুন্দর !"

এই ক্ষণস্থায়ী মধুর প্রেম-লীলার কি মোহিনী আকর্ষণশক্তি ! কিন্তু দু দিনেই সব শেষ হইয়া গেল ! প্রেম সবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে বৃদ্ধ ব্যারণ আসিয়া লিজিকে—তাঁহার প্রণয়িনীকে কাড়িয়া লইয়া গেল ! তার পর আর কেহ লিজিকে দেখে নাই !

লোমেরি দুই তিন মাসের মধ্যে সমস্ত বিস্মৃত হইলেন। প্যারী নগরীর হাওয়া এমনই বিচিত্র যে, অবিবাহিত যুবকের চিত্ত হইতে এক নারীর স্মৃতি অন্য নারী অতি সহজেই বিলুপ্ত করিয়া দেয় ! কিন্তু লোমেরি তাঁহার হৃদয়-মন্দিরের এক প্রান্তে লিজিকে স্থান দিয়াছিলেন। এই নারী ব্যতীত তিনি আর কাহাকেও ভালবাসেন নাই। অন্ততঃ এখন তিনি মনকে এই বলিয়াই আশ্বস্ত করিলেন।

আসন হইতে উঠিয়া তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই আজ বিকালে গিয়া তাহার সহিত একত্র ভোজন করিব !"

তিনি সঙ্গে সঙ্গে দর্পণের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। আপাদমস্তক নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া লইলেন। ভাবিলেন,—"আমার অপেক্ষাও বোধ হয় সে বেশী বুড়া হইয়াছে !" তিনি যে এখনও লিজি অপেক্ষা সুন্দর, এ চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্র তিনি যেন আত্মতৃপ্তি অনুভব করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্যারনেসের অন্তরে অতীত সুখ-স্মৃতির জন্য অনুশোচনা জন্মিবে, এবং ভাবাবেগে তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, এ চিন্তাও লোমেরি'র হৃদয়ে সমুদিত হইল।

কাউণ্ট তখন অন্যান্য পত্র-পাঠে মনঃসংযোগ করিলেন। সেগুলি তেমন প্রয়োজনীয় নহে।

সমস্ত দিন তিনি এই চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন। সে এখন দেখিতে কেমন ? পঁচিশ বৎসর পরে এই ভাবে পরস্পরের সাক্ষাৎ কি কৌতুককর ! তিনি কি তাহাকে চিনিতে পারিবেন ?

বিলাসিনী নারীর ন্যায় তিনি প্রসাধনে রত হইলেন। বেশের পারিপাট্য

বিদায়।

চিত্রকর—লর্ড লৈটন।

Mohila Press, Cal.

শেষ করিয়া তিনি কেশ-সংস্কারককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিয়া তাঁহার দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাজির প্রসাধান করিয়া দিল। তার পর বেলা থাকিতেই তিনি যাত্রা করিলেন।

সুসজ্জিত উপবেশনাগারে প্রবেশ করিয়াই তিনি দেখিলেন, প্রাচীরগাত্রে রেশমী ফ্রেমে বাঁধা তাঁহার প্রতিকৃতি শোভা পাইতেছে। ছায়াচিত্রখানি বহু কালের পুরাতন ও মলিন।

আসন গ্রহণ করিয়া তিনি গৃহস্বামিনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাতের দ্বার খুলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন; দেখিলেন, এক শুভ্রকেশা বৃদ্ধা নারী বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

তিনি তাঁহার করযুগল গ্রহণ করিয়া একে একে চুম্বন করিলেন। তার পর মস্তক উন্নত করিয়া একদৃষ্টে ভূতপূর্ব্বা প্রণয়িনীর পানে চাহিলেন।

সত্যই রমণী বৃদ্ধা। তাঁহাকে লোমেরি চিনিতে পারিলেন না। বৃদ্ধা হাসিতেছিলেন বটে; কিন্তু অশ্রু যেন তাঁহার নয়নে উছলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল।

কাউন্ট অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "তুমিই কি লিজি?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "হাঁ। তুমি আমায় চিনিতে পার নাই, কেমন, না? আমার শরীর ও মনের উপর দিয়া দুঃখ ও শোকের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। শোকের আগুনে আমার জীবন দগ্ধ হইয়াছে। এখন আমার দিকে চাহিয়া দেখ! না থাক্, চাহিয়া কাজ নাই! কিন্তু তুমি এখনও কত সুন্দর—যৌবনের লালিত্য এখনও তোমার শরীরে বিদ্যমান। যদি দৈবাৎ পথিমধ্যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইত, যৌবনের সেই প্রিয় নামে হয় ত তোমায় ডাকিয়া ফেলিতাম! যাক্, এখন ব'স, গল্প করা যাক্। তার পর তোমাকে আমার মেয়েটি দেখাইব। দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, তাহার সহিত আমার কি বিচিত্র সাদৃশ্য! যৌবনে আমি যা ছিলাম, এখন সে ঠিক সেইরূপ! দেখিলেই বুঝিতে পারিবে! তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে আমার গোটাকয়েক কথা আছে। আমার আশঙ্কা ছিল, প্রথম দর্শনে হয় ত আমি খুব অভিভূত হইয়া পড়িব। কিন্তু যাক্ সে সব কথা। সে ভাব আর নাই। বন্ধু, ব'স।"

লোমেরি ব্যারনেসের পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। এই নারীকে তিনি ত চিনেন না। তাঁহার মনে হইল,

ইহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। এ বাড়ীতে তিনি আসিবেন কেন? কি কথা তিনি বলিবেন? পূর্ব্বজীবনের কথা? উভয়ের মধ্যে কোনও বিষয়ের সামঞ্জস্য ত নাই! পিতামহীর তুল্য এই নারীর মুখের প্রতি চাহিলে পূর্ব্বের কোনও কথাই ত তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয় না? সুন্দরী, নববিকশিত কুসুমের মত মনোহারিণী লিজিকে মনে করিয়া যে সব কোমল, মধুর ও করুণ ভাবের প্রবাহ তাঁহার হৃদয় প্লাবিত করিত, ইহাকে দেখিয়া তাহার কোনও ভাবেরই অনুভূতি হয় না। যাহাকে তিনি ভালবাসিতেন, তাঁহার তবে কি হইল? বহুদিনবিস্মৃত স্বপ্নের স্মৃতির মত সুন্দরী নারী আজ কোথায়?

উভয়ে নিঃশব্দভাবে পাশাপাশি বসিয়া ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিলেন। উভয়েই অত্যন্ত অশান্তি অনুভব করিতেছিলেন।

অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় সংক্ষিপ্ত ভাবে তাঁহারা পরস্পরের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন। অকস্মাৎ বৃদ্ধা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলেন।

"আমি বেনীকে ডাকিতেছি।"

দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল; বস্ত্রের খস্ খস্ ধ্বনিও শোনা গেল।

"মা, আমি এসেছি।"

প্রেতাত্মা দেখিলে মানুষ যেমন স্তম্ভিত হইয়া থাকে, লোমেরির দশা সেইরূপ হইল।

ভগ্নস্বরে তিনি বলিলেন, "নমস্কার মাডমোসেল।"

যুবতীর জননীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া তিনি বলিলেন, "ও! ... তুমি!"

বাস্তবিক এ সেই! সুদূর অতীতে তিনি যে নারীকে জানিতেন, এই যুবতী সেই! যে লিজি অন্তর্হিত হইয়াছিল, সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে! পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যে নারীকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, এ সেই! আজ যাহাকে দেখিতেছেন, সে তাহার অপেক্ষাও অল্পবয়স্কা, প্রফুল্লতাময়ী ও শিশুবৎ সরলা।

* * * * * তিনি যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার কানে কানে "লিজি!" বলিয়া ডাকিবার প্রবল প্রলোভন তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল।

জনৈক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "আহার্য্য প্রস্তুত।"

তিন জনে ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন।

আহারকালে কি কথোপকথন হইল? তাঁহারা তাঁহাকে কি কথা বলিলেন, উত্তরে তিনিই বা কি বলিলেন? তিনি তখন যেন এক বিচিত্র স্বপ্ন

দেখিতেছিলেন। তাঁহার তখন উন্মত্ততার অবস্থা। নারীযুগলের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ মনে মনে প্রশ্ন করিতেছিলেন,—"উভয়ের মধ্যে কোনটি প্রকৃত ?"

জননী সহাস্যবদনে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "তোমার মনে আছে ?" যুবতীর উজ্জ্বল নয়নযুগলে কাউণ্ট অতীতের স্মৃতি যেন মূর্ত্তিমতী দেখিতেছিলেন। অন্যূন বিংশতিবার তিনি যুবতীকে বলিবার চেষ্টা করিলেন, "লির্সো ! তোমার মনে পড়ে—" ; কিন্তু শুভ্রকেশা নারী যে সস্নেহনয়নে তাঁহাকে দেখিতেছিলেন, সে দিকে কাউণ্ট একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না।

এক একবার তাঁহার মনে সন্দেহের সঞ্চার হইতেছিল। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, বর্ত্তমানের নারী অতীত কালের সেই নারীর প্রকৃত স্বরূপ নহে। অতীতের নারীর কণ্ঠস্বরে, দৃষ্টিতে, এমন কি, সমগ্র শরীরে যাহা ছিল, বর্ত্তমানের নারী-মূর্ত্তিতে তাহা নাই। তিনি ভূতপূর্ব্ব প্রণয়িনীর স্মৃতি ভাল করিয়া মানসপটে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন।

ব্যারনেস বলিলেন, "বন্ধু, তোমার পূর্ব্বের প্রসন্নতা, সজীবতা তুমি হারাইয়াছ।"

তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "অনেক বিষয়ই আমি হারাইয়াছি !"

কিন্তু ভাবাতিশয্যে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্ব-প্রেম যেন সজীব হইয়া উঠিতেছিল। এই প্রেম সুপ্তোত্থিত উন্মত্ত পশুর ন্যায় তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল।

যুবতী আপন মনে গল্প করিতেছিল। তাহার জননী যে সকল চিরপরিচিত শব্দ ব্যবহার করিতেন, সেও মাঝে মাঝে সেইরূপ দুই একটি শব্দ প্রয়োগ করিতেছিল। মাতার চিন্তার ধারাও সে অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিল। আলাপকালে সেই প্রণালীতে সে যখন কথা কহিতেছিল, তখন লোমেরিঁর সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। সাহচর্য্য হেতু লোকে এইরূপে পরস্পরের চিন্তার ধারা আয়ত্ত করিয়া লয়, পরস্পরের ভাষাও প্রয়োগ করে। কিন্তু এই সকল ব্যাপারে কাউণ্টের হৃদয় ব্যথিত হইতেছিল। তাঁহার হৃদয়ের শুষ্ক ক্ষত হইতে পুনরায় রক্তধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই তিনি বিদায় লইলেন। তিনি সমীপবর্ত্তী উদ্যানে কিয়ৎক্ষণ বিচরণ করিয়া চিত্তকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই যুবতীর মূর্ত্তি প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইতেছিল। কিছুতেই তাহার স্মৃতি মুছিয়া ফেলা যায় না। তাঁহার হৃদয় ক্রমশঃ দ্রুততরবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল,

উষ্ণ রক্তধারা ধমনীতে চঞ্চল হইয়া উঠিল। দুইটি নারীর পরিবর্ত্তে তখন তিনি শুধু একটির মূর্ত্তিই মানস নেত্রে দেখিতেছিলেন। সে মূর্ত্তি যুবতীর; অতীত জীবনে যে নারীকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, ইহা সেই নারীর প্রতিমূর্ত্তি। অতীত যুগে তিনি তাহাকে যেমন ভালবাসিতেন, আজ তেমনই ভালবাসায় তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পঁচিশ বৎসরের সুপ্তপ্রেম জাগ্রত হইয়া আজ প্রবলতর আবেগের সহিত প্রণয়িনীর পানে ধাবিত হইল।

এই বিচিত্র ও তীষণ ভাবাবেশ সহ তিনি গৃহে ফিরিয়া গেলেন। ভবিষ্যতে কোন পথ অবলম্বনীয়, নির্জ্জনে বসিয়া তিনি একবার তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

প্রজ্বলিত-দীপাধার-হস্তে গৃহান্তরে গমনকালে সম্মুখবর্ত্তী দর্পণে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, উহাতে একটি শুক্লকেশ বর্ষীয়ান বৃদ্ধের ছায়া পড়িয়াছে। এই দর্পণে বহুবার তিনি আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া আপনার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। সহসা পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ব্বের স্মৃতি মানসপটে জাগিয়া উঠিল—লিজি তখন পূর্ণ যুবতী. সেই সময়ে তাঁহার নিজের আকৃতি কিরূপ ছিল, একবার চিন্তা করিয়া দেখিলেন। তখন তাঁহার পরিপূর্ণ যৌবন; লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যদীপ্তিতে দেহ সমুজ্জ্বল। আলোকাধার দর্পণের সন্নিকটে ধরিয়া তিনি আত্মপ্রতিবিম্ব বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন, ললাট রেখাঙ্কিত, অঙ্গে বার্দ্ধক্যের আক্রমণচিহ্ন পরিস্ফুট। এতদিন তিনি এ সব লক্ষ্য করেন নাই ত?

দেহের শোচনীয় পরিণাম প্রতিবিম্বে দর্শন করিয়া কাউণ্টের হৃদয় অবসন্ন হইয়া গেল। হতাশভাবে তিনি আসনে বসিয়া পড়িয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "লোরেরি! আজ তুমি মৃত! আজ সব শেষ!" *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

---

* গীয়ে মোপাঁসার রচিত কোনও গল্পের ইংরেজী হইতে অনূদিত।

দান্তে। *

জীবনকথা।

ইতালীর মহাকবি দান্তে ১২৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ফ্লোরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রাচীন সদ্বংশের বংশধর ছিলেন; তেমন অর্থস্বচ্ছলতা না থাকাতে, ব্যবসায়ি-প্রধান ফ্লোরেন্স নগরে দান্তের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশেষ প্রাধান্যলাভ করিতে পারেন নাই। তবে দান্তের পূর্ব্বপুরুষগণ অর্থাভাব হেতু বংশমর্য্যাদায় কখনও হীন হন নাই। দান্তে (Dante) পুরাতন ইতালীয় দুরান্তে (Durante) শব্দের অপভ্রংশ। দুরান্তেগণ পুরাতন টস্কান (Tuscan) জাতির একটি প্রসিদ্ধ বংশের নাম। কাজেই বলিতে হয় যে, দান্তের দেহে টস্কান-শোণিত প্রবাহিত হইত। দান্তের পিতা আলিঘিয়েরী (Alighieri) এক জন সামান্য Notary বা ব্যবহার শাস্ত্রের লেখক ছিলেন। তাঁহার জননীর নাম বেলা (Bella)। ইঁহাদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না; তবে নিতান্ত 'হা-ঘরে হা-ভাতে' ছিলেন না। ফ্লোরেন্স নগরে তাঁহাদের নিজের বসতবাটী ছিল, নগরের বাহিরে সামান্য একটু ভূমিসম্পত্তি বা তালুক ছিল।

১২৭৪ খৃঃ অব্দে যখন দান্তের কেবল নয় বৎসর বয়স, তখন তিনি বিয়াট্রিস্ (Beatrice) নাম্নী এক বালিকার দর্শনলাভ করেন। বালিকার বয়সও নয় বৎসর। নয় বৎসরের বালক-বালিকার মধ্যে প্রেমসঞ্চার হইয়াছিল। এ প্রেম-কাহিনী ইতালীয় সাহিত্যে অপূর্ব্ব হইয়া রহিয়াছে। বালিকা বিয়াট্রিস্ এ প্রেমের প্রতিদান করিয়াছিলেন কি না, জানি না; উভয়ের মধ্যে যে বিবাহ হয় নাই, ইহা ঠিক। কিন্তু দান্তের যখন আঠারো বৎসর বয়স, তখন তিনি এই প্রেম অবলম্বনে যে অদ্ভুত গীতিকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতালীয় ভাষায় অপূর্ব্ব ও অনুপম হইয়া আছে। এই কাব্যগ্রন্থের নাম ভাইটা নুয়োভা, (Vita Nuova) অথবা নব-জীবন। নবম বর্ষে তিনি নবমবর্ষীয়া বালিকার অপরূপ-রূপ-দর্শনে মুগ্ধ হন। সে মোহ হইতে তাঁহার নবজীবনের সঞ্চার হয়। সে নব-জীবনের পরিচয় ভাইটা নুয়োভা কাব্য গ্রন্থে পরিস্ফুট। এই প্রেম-সঞ্জাত নব-জীবন সম্বন্ধেও বলা যায়, 'কাম-গন্ধ নাহি তায়'।

"For him Love and Beatrice are one thing only, he feels her approach as that of a Deity. In her bearing there is ever something divine—she is no human creature, but yet in the poet's heart ever a woman".

* Alighieri Dante.

দান্তের দৃষ্টিতে প্রেম ও বিয়াট্রিস্ একই ছিল। বিয়াট্রিস্ প্রেমময়ী, প্রেমের প্রতিমাস্বরূপা ছিলেন। তিনি দান্তের কাছে আসিলে মনে হইত, কোনও স্বর্গের দেবী বুঝি আসিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তিখানি যেন দৈব ভাব মাখান—তিনি যেন পার্থিব জীব নহেন। পরন্তু স্বর্গীয়া হইলেও, ঐশীভাবমণ্ডিতা হইলেও, কবির হৃদয়ে বিয়াট্রিস্ নারী বলিয়াই পরিচিতা ছিলেন। নারী বটে, পরন্তু দেবী; অপার্থিব-ভাবমণ্ডিতা, কেবল সুখ-দুঃখের অতীতা দেবী। সে দেবীর দর্শনে সুখ, স্মরণে সুখ, বিরহে সুখ, মিলনে সুখ;—সে স্বপ্নে দেখা মূর্ত্তিখানি কেবল হৃদয়পটে লুকাইয়া রাখিতে হয়। হৃদয়ে তেমন প্রতিমা লুকান থাকিলে আত্মার বিকাশ হয়, পবিত্রতার সঞ্চার হয়, স্বার্থের ধ্বংস হয়। তাইটা দুয়োতা গীতিকাব্যে প্রেমের এই চিত্রই উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত আছে। অনেকের ধারণা ছিল যে, বিয়াট্রিস একটা কল্পনার প্রতিমামাত্র; সত্য সত্য বিয়াট্রিস্ নামে কোনও রমণী ছিল না, নবম বর্ষে বালক-বালিকার দেখাও হয় নাই। কিন্তু বোকাশিও (Boccaccio) বলিয়াছেন যে, বিয়াট্রিস্ সত্যই এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী ছিলেন; সাইমন-ডি-বার্ডি (Simone-dei-Bardi) নামক এক সম্ভ্রান্ত যুবকের সহিত বিয়াট্রিসের বিবাহ হয়, এবং ১২৯০ খৃঃ অব্দে চব্বিশ বৎসর বয়সে বিয়াট্রিসের মৃত্যু হয়।

দান্তে যে বাল্যকালে সুশিক্ষা পাইয়াছিলেন, এমন কোনও প্রমাণ তাঁহার চরিতকথা হইতে পাওয়া যায় না। সে সময়ে সুশিক্ষিত বলিলে লাটিন ও গ্রীক ভাষায় সুশিক্ষিতকেই বুঝাইত। দান্তে কখনই লাটিন ও গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত হইতে পারেন নাই। তবে তিনি প্রৌঢ়বয়সে মোটামুটি ভাবে লাটিন ভাষায় অভিভাষণাদি লিখিতে পারিতেন। দান্তে দেশীয় ইতালীয় ভাষায় সুকবি ও সুলেখক হইবার জন্য আবাল্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ইতালীয় ভাষাকে কাব্যের ও সাহিত্যের ভাষায় উন্নত করিবার চেষ্টায় একরূপ প্রাণপাত করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইতালীয় ভাষায় তিনিই প্রধান ও প্রথম মহাকবি। তাঁহার তুল্য মহাকবি ইউরোপেও বিরল। হোমর ও ভার্জ্জিলের পরই দান্তের নাম করিতে হয়; দান্তের পর মিল্টন। দান্তে সঙ্গীতবিদ্যায় পটু না হইলেও, সঙ্গীতের মাধুরী বুঝিতেন, এবং নিজেও গান করিতে পারিতেন। পটুয়ার বিদ্যাও তিনি সামান্য একটু শিখিয়াছিলেন; প্রিয়জনের মুখাকৃতি পত্রে অঙ্কিত করিয়া তিনি অনেকের প্রতিমাকে স্মৃতিপটে সজীব রাখিয়া গিয়াছেন। বিয়াট্রিসের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দান্তে কেবল প্রেমের কবিতাই লিখিতেন, ধর্ম্মতত্ত্বের ও দর্শন শাস্ত্রের কোনও চর্চ্চাই করেন

নাই। বিয়াট্রিসের মৃত্যু হইলে তিনি শোকে মুহ্যমান হইয়াছিলেন; এক বৎসর কাল সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল শোকগাথাই রচনা করিতেন। এ সময়ে তাঁহার চরিত্রগত অবনতিও কতকটা ঘটিয়াছিল। তিনি নিজেই এ কথা তাঁহার মহাকাব্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

"The things of the present with their false pleasure turned my steps aside as soon as your face was hidden"
—Purgatory, XXXI, 34.

অর্থাৎ, যখন তোমার মুখখানি মৃত্যুর আবরণে আবৃত হইল, তখন হইতে কিছুকাল আমি সংসারের বর্ত্তমান সুখে মজিয়া তোমা হইতে কতকটা দূরে যাইয়া পড়িয়াছিলাম।

দান্তে কেবল কাব্যরসেই মুগ্ধ থাকিতেন না। তিনি ১২৮৯ খৃঃ অব্দে কম্পোর্ণডিনোর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে ফ্লোরেন্স-নগরবাসীরা আরেট্জোর বিশপকে (Bishop of Arezzo) পরাজিত করেন। তিনি পরে কাপোনার (Capona) দুর্গের অবরোধ ব্যাপারেও লিপ্ত ছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, দান্তে সমরবিদ্যায় যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। দান্তে এক জন বীর ও তেজস্বী যোদ্ধা ছিলেন। ১২৯৮ খৃঃ অব্দে দান্তে বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম জেম্মা (Gemma); ইনি মানেত্তো দোনাতির (Manetto Donate) কন্যা ছিলেন। দোনাতি বংশ ফ্লোরেন্সের অভিজাতবর্গের মধ্যে এক প্রবল, সম্মানিত ও অশেষপদমর্য্যাদাসম্পন্ন বংশ ছিল। এই বিবাহের ফলে সামাজিক হিসাবে দান্তের পদোন্নতি ঘটিয়াছিল: তিনি ফ্লোরেন্সের শাসকসম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছিলেন; রাজনীতির কুটিল আবর্ত্তে এই হেতু তাঁহাকে পড়িতে হইয়াছিল। এই বিবাহের ফলে দান্তের পিয়েত্রো ও জাকোপো (Pietro and Jacopo) নামে দুই পুত্র, এবং বিয়াট্রিস্ ও এন্টোনিয়া (Antonia) নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বিয়াট্রিস্ পরে সন্ন্যাসিনী বা Nun হইয়া রাভেনার কন্‌ভেন্টে বাস করিয়াছিলেন। এন্টোনিয়ার অন্য কোনও পরিচয় কেহ জানে না।

এইবার দান্তের রাজনীতিক জীবনের একটু পরিচয় দিব। যদিও বিবাহ করিয়া দান্তে ফ্লোরেন্সের অভিজাতবর্গ-ভুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি সে সময়ে ফ্লোরেন্সে পুরাতন বনীয়াদী ঘরের প্রাধান্য ছিল না। ব্যবসায়ী ও শিল্পি-সঙ্ঘ সকলের প্রতিনিধিগণ নগরশাসন করিতেন। ছয় জন প্রতিনিধি বা Prior নগর-শাসনের ভার লইয়াছিলেন। দান্তে চিকিৎসক-সঙ্ঘের সভ্য হইয়াছিলেন।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দান্তে চিকিৎসা-শাস্ত্র জানিতেন। ১৩০০ খৃঃ অব্দে দান্তে এক জন প্রতিনিধি বা প্রায়ার হইয়াছিলেন। পরে তিনি বিচারকের পদও প্রাপ্ত হন।

প্রজাতন্ত্রমূলক শাসনে দলাদলি থাকিবেই। দান্তে ফ্লোরেন্সের শাসক-সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার পর এই দলাদলির আবর্ত্তে পড়িয়াছিলেন। ফ্লোরেন্স-রাজনীতির দুই দল ছিল,—the Whites and the Blacks, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের দল। দান্তে শ্বেতাঙ্গ-দল-ভুক্ত ছিলেন। ১৩০১ খৃঃ অব্দে শ্বেতাঙ্গ-দল পরাজিত হন; কৃষ্ণাঙ্গের দল নগরের শাসন-ভার প্রাপ্ত হন। ইহার ফলে ১৩০২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দান্তে ফ্লোরেন্স নগর হইতে নির্ব্বাসিত হন। অভিযোগ এই ছিল যে, দান্তের দল সাধারণের অর্থের অপব্যবহার করিয়াছিলেন। এই জন্য দান্তে ও চারি জন শ্বেতাঙ্গ দলের প্রধানের নির্ব্বাসনদণ্ড হয়; তাঁহাদের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়; ইহা ছাড়া ইঁহাদিগকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হয়। ঐ বৎসরের ১০ই মার্চ্চ তারিখে দান্তের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হয়। এই আজ্ঞা অনুসারে দান্তে ও আরও চৌদ্দ জনকে জীবন দণ্ডে দণ্ডিত করিবার ভয় প্রদর্শিত হয়। ইঁহারা যদি ফ্লোরেন্সে ফিরিয়া আসেন ত ইঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জীয়ন্তে পোড়াইবার আদেশ হয়। কেন না, ইঁহারা এক হিসাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন। অতএব দান্তেকে এই সময়ে ফ্লোরেন্স হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইল। ইহাই তাঁহার চিরনির্ব্বাসন। তিনি ইহার পরে আর নিজ জন্মভূমি দর্শন করিতে যান নাই। খৃষ্টাব্দ ১৩০২—১৩১০ পর্য্যন্ত দান্তে ইতালীর নানা নগরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি একবার ফরাসী দেশে প্যারিস্ নগরী দেখিতে গিয়াছিলেন। এই নির্ব্বাসন জন্য দান্তের রাজনৈতিক জীবনে একটা পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া গেল। তিনি রাজনীতি ছাড়িয়া সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন—কাব্য-রচনায় আত্মহারা হইয়াছিলেন। তবে জর্ম্মন সম্রাট্ সপ্তম হেনেরী যখন ইতালী-পরিদর্শনে আসেন, তখন একবার দান্তে রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের পক্ষসমর্থন করিয়া কয়েকখানি পত্র ফ্লোরেন্সবাসীদের লিখিয়া পাঠান। ইহা লাটিন ভাষায় লিখিত হয়। এই পত্র লেখার জন্য ১৩১১ খৃষ্টাব্দে যখন নির্ব্বাসিতগণের দণ্ডাদেশ রহিত হয়, তখন দান্তে সে ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই। ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে দান্তেকে ফ্লোরেন্সে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা হয়। দান্তে

ত্রুটীস্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, এ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। বরং উল্টা ফল ফলিয়াছিল! ঐ বৎসরের ৬ই নবেম্বর তারিখে ফ্লোরেন্সের শাসক-সম্প্রদায় আদেশপ্রচার করেন যে, দান্তে ও তাঁহার পুত্রগণকে রাণিয়ারীর (Ranieri) দল ধরিতে পারিলে, পিতা ও পুত্রদের শিরশ্ছেদ করিতে পারিবে। ১৩২১ খৃষ্টাব্দে ভিনিস্ ও রাভেনা নগরের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। দান্তে রাভেনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া দূত-রূপে ভিনিসে গমন করেন। এই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা। পথে তাঁহার জ্বর হয়; সেই জ্বরেই তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। তবে আশ্রয়স্থল রাভেনায় তিনি জীবিতাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিয়াছিলেন। ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে (১৩২১) তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহাই দান্তের জীবন-কথা। সেই বিপ্লব-বিরোধের কালে দান্তে একাধারে গীতি-কবি, প্রেমিক, বীর, যোদ্ধা, রাজনীতিক, শাসক, বিচারক, মহাকাব্য-রচয়িতা, ভাবুক ও ধার্ম্মিক ছিলেন। দেখিতে তিনি মধ্যাকৃতি, বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন; চুল কাল, রং পাল্‌চে—ফুট শ্বেতাঙ্গ নহে, মুখখানি গম্ভীর, নয়নে স্থিরদীপ্তি। প্রৌঢ়ে নির্ব্বাসনের নানা কষ্ট সহিয়া তিনি একটু ন্যুব্জভাব ধারণ করিয়াছিলেন।

গীতিকাব্য ও ভাষা।

দান্তে প্রথম জীবনে গীতিকাব্য-রচয়িতা হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, লাটিন ভাষায় প্রাণ নাই; দেশের লোকসাধারণ লাটিনের পঠন-পাঠন ভুলিয়া গিয়াছে; অনেকেই লাটিন বুঝে না। যাহারা বুঝে, তাহারা কেবল শব্দের মার-প্যাঁচ লইয়া বিব্রত। কাজেই তিনি লাটিনে কাব্যরচনার অভিলাষ ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ইতালীর জন কয়েক কবি ফরাসী ত্রুবাদুর (Troubadours) বা গায়কদিগের অনুকরণে প্রভেন্সাল-ফরাসী (Provencal) ভাষায় কবিতা রচনা করিতেছিলেন। রাজপুতানার চারণ কবিগণ যে ভাবে গাথা রচনা করিয়া গান করিতেন, ত্রুবাদুরগণও কতকটা সেই ভাবে গান রচনা করিতেন। প্রথমে উঁহারা প্রেম ও সমরবিজয়বিষয়িনী গাথা রচনা করিতেন, এবং গান করিয়া বেড়াইতেন; শেষে কেবল প্রেমের কবি হইয়া পড়িলেন। ইঁহাদেরই অনুকরণে গীডো গিনি চেলি (Guido Guinicelli) এবং সর্দ্দেলো (Sordello) প্রভৃতি ইতালীয় কবিগণ গীতিকবিতা রচনা করিতেন। দান্তে এ পথও অবলম্বন করিলেন না। তিনি স্বীয় মাতৃভাষাকে কাব্যের ভাষায় উন্নীত করিবার চেষ্টা করিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। সিসিলির ও টস্কানীর প্রাদেশিক

ইতালীর ভাষাকে মিলাইয়া মিশাইয়া তিনি এক অভিনব ইতালীয় ভাষা রচনা করিয়াছিলেন। এই ভাষা-সৃষ্টির কাণ্ডটা De Vulgari Eloquentia নামক পুস্তকে তিনি সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি the Science of the vernacular—প্রাদেশিক ভাষার তত্ত্বকথার আলোচনা করিয়াছেন। কবি নিজের ভাষা নিজে ছানিয়া বাছিয়া লইলেন; সে ভাষা ইতালীবাসিমাত্রেরই বোধগম্য হইয়াছিল। পরে সেই ভাষা মহাকাব্যের উপযোগী হইয়াছিল, এবং ইতালীকে ইউরোপ-ধন্য করিয়াছিল।

অথচ গোড়ায় তাঁহার কবিতার বিষয় প্রেমই ছিল। কেন না, তিনি ক্রুবাদুরদের অনুকরণে গীতিকাব্যরচনা আরম্ভ করেন। দান্তে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"Song can scarce be of any worth unless the song proceed from the heart, nor can song proceed from the heart unless pure and sincere love be there." প্রাণের কথা না হইলে গান হয় না, সে প্রাণ প্রেমে সঞ্জীবিত না হইলে গানও প্রাণ হইতে বাহির হয় না। এ প্রেম কেমন? অশরীরী, বা নিরবয়ব প্রেম; সে প্রেম নারীর প্রতি প্রযোজ্য, এবং ভগবানের প্রতিও প্রয়োগ করা যায়, ইহা সেই প্রেম। এই প্রেমের গাথা সর্ব্বাগ্রে ভাইটা নুয়োভা বা নবজীবন নামক পদ্য গ্রন্থে ফুটিয়া উঠে। নয় বৎসরের বালিকা বিয়াট্রিসকে দেখিয়া এই প্রেমের প্রথম স্ফুরণ। ইহাতে আকাঙ্ক্ষা আছে, পরন্তু তৃপ্তির লালসা নাই। নূতন ভাষা, নবীন ছন্দ, নূতন ভাব—তাই দান্তের গীতি-কবিতা New style বা নবপদ্ধতির কবিতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

ভাইটা নুয়োভা বা নবজীবন গীতিকাব্যের পরই দান্তে Odes বা গীতাঞ্জলি নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-কবিতার মঞ্জুষা রচনা করেন। এই গীতাঞ্জলির প্রেম ঠিক অশরীরী নহে। ইহাতে দেহ আছে, দেহের রূপ আছে, অতৃপ্ত বাসনা আছে, বাসনা পূর্ণ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু এই গীতাঞ্জলিরও একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়াছিল! যাহা হউক, দান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া ভাষাকে নিজের মনের মতন করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার ছন্দেরও একটু বিশিষ্টতা ছিল। সে ছন্দ দেশপ্রচলিত ছন্দ নহে, কতকটা তাঁহার মনগড়া ছন্দ। এই ছন্দ তাঁহার ভাষার সহিত বেশ খাপ্ খাইয়াছিল। লোকে বুঝিয়াছিল যে, দান্তের কবিতা দেশের লোকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবে, সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত নূতন ভাবে আলোড়িত করিয়া দিবে।

দান্তের রাজনীতি।

দান্তের মহাকাব্যের প্রকৃত পরিচয় পাইবার পূর্ব্বে তাঁহার রাজনীতিবিষয়ক মতামতের একটু আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইবে। কেন না, তাঁহার রাজনীতি ও সমাজনীতিবিষয়ক সিদ্ধান্ত সকল তাঁহার মহাকাব্যে স্থান পাইয়াছে; অনেক ক্ষেত্রে ছন্দের আকারে তিনি এই সকল সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা তাঁহার মহাকাব্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

দান্তে এরিষ্টটলের (Aristotle) মতের পোষকতা করিতেন। এরিষ্টটল বলেন,—মানুষ যখন পারিবারিক জীব, একাকী স্বতন্ত্র ও নির্দ্বন্দ্বভাবে বাচিয়া থাকিতে পারে না, তখন কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি, যে কোনও বিষয়ের চর্চ্চা করিতে হইলে, মানুষকে সমাজ-সমষ্টির ব্যষ্টিরূপেই গ্রাহ্য করিতে হইবে। দান্তে বলিয়াছেন—"No man is able to attain felicity by himself without the aid of many, inasmuch as he needs many things which no one is able to provide alone" অর্থাৎ, কোনও মনুষ্যই একাকী অন্যের সহায়তা ব্যতিরেকে সুখলাভ করিতে পারে না; কেন না, তাহার সুখের উপাদান ও অনুপান বহু; সে বহু উপাদান ও অনুপান একটা লোকে সরবরাহ করিতে পারে না। ডি মোনার্কিয়া (De Monarchia) বা রাজ-সম্বন্ধীয় পুস্তকে দান্তে স্বীয় রাজনৈতিক মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যে ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের রাজনীতির পুস্তক। ইহাতে দান্তের প্রথম জিজ্ঞাসা এই—সমবায়ে মানব-সভ্যতার ইপ্সিত কি? অর্থাৎ, এই যে নানা দেশের নানা জাতি সভ্য হইতেছে, বিদ্যার চর্চ্চা করিতেছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্মেষ-সাধন করিতেছে;—এমন কেন করিতেছে? কোন আশায় মুগ্ধ হইয়া সভ্যতার জন্য মানুষ পাগল হইয়াছে? উত্তরে দান্তে বলিতেছেন—

"It is the realising or actualising of the whole potentiality of the human intellect i. e. of the intellect of humani ty as a whole, or in other words, the bringing about of that condition of things in which the intellect of all the individuals in the world would be working together in the most effective manner possible."

অর্থাৎ, মানব-মনীষার কূটস্থশক্তির উদ্বোধন বা বিকাশসাধনই হইল মানব-সভ্যতার উদ্দেশ্য। মানুষের মনীষা কূটস্থ থাকে; কখন যে কোন ভাবে কোন

জাতির মনীষা বিকাশ পায়, তাহা বলা যায় না। আজ যে অসভ্য, কাল সে সভ্য; আজ যে মূর্খ, কাল সে পণ্ডিত। দান্তে বলেন যে, জাতির হিসাবে, বিরোধী ভাবে বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকারে মানব-মনীষার কূটস্থ শক্তির (Potentiality) বিকাশ হইলে চলিবে না। সর্ব্বসাকল্যে ও সর্ব্বসামঞ্জস্যে মানব জাতির মনীষার সম্যক্ বিকাশ ঘটাইতে হইবে। অর্থাৎ, মেদিনীমণ্ডলের সামাজিক বা প্রাকৃতিক অবস্থা এমন ঘটাইতে হইবে, যাহার প্রভাবে প্রত্যেক নরনারীর মনীষার বিকাশ সমভাবে ও সম্যক্‌ভাবে হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যের সিদ্ধি-পক্ষে সার্ব্বজাতিক শান্তির (Universal Peace) প্রয়োজন। পৃথিবীর কোনও স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলেই বুঝিতে হইবে, মানব-মনীষা কূটস্থ হইয়াছে, এবং মানব-হৃদয়ে রিপুর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। রিপুর ও আসক্তির অতি-বৃদ্ধি মনীষার সঙ্কোচ ঘটায়। মনীষার বিকাশেই সামঞ্জস্য ঘটে; সামঞ্জস্যই মনুষ্য-সভ্যতা। এই সার্ব্বজাতিক শান্তিলাভের জন্য দান্তে এক জন পৃথ্বীনাথের কল্পনা করিয়াছেন। তিনি সমগ্র পৃথিবীর মহারাজ-চক্রবর্ত্তী হইবেন; তাঁহার আর জিগীষা থাকিবে না। তিনি শান্ত, দান্ত, সমাহিত পুরুষ হইবেন; তিনি ভগবানের অনুরূপ হইবেন—'মহতী দেবতা হোষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।' ইনি সকলকে নিরপেক্ষদৃষ্টিতে দেখিবেন, সমদর্শী ও সাম্যবাদী হইবেন। এই যে সম্রাজ্‌শক্তির বিকাশ হইবে, ইহা কেমন হইবে? দান্তের—"Imperialism does not mean the supremacy of one nation over others, but the existence of a supreme law that can hold all national passions in check" সম্রাজ্‌শক্তির বিকাশের অর্থ তাহা নহে, যাহার প্রভাবে এক জাতি অন্য জাতির উপর প্রাধান্য করিতে পারে; পরন্তু উহা এমন একটা জগদ্ব্যাপী বিধির প্রাবল্য, যাহার প্রভাবে জাতিগত রিপু ও আসক্তির তীব্র তাড়নাকে সংযত ও সংহত করিয়া রাখিতে পারা যায়। এই বিধির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জগৎ-সম্রাট্‌কে প্রেমময় হইতে হইবে। কেন না, প্রেমই স্বাধীনতার আধার; রিপু ও আসক্তি পরাধীনতার শৃঙ্খলমাত্র। স্বাধীনতা কাহাকে বলি? দান্তে বলিতেছেন—"A man is free when his will is in absolute equilibrium, not in the slightest degree weighed down by passion or desire, but free to act in accordance with the judgment of his reason." অর্থাৎ, সেই মনুষ্যই স্বাধীন, যাহার ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে; যাহার ইচ্ছাশক্তি রিপু

বা আসক্তি দ্বারা অবনমিত নহে ; পরন্তু মনীষার দ্বারা সুবিচারিত পন্থায় স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারে। যাহার ইচ্ছাশক্তি মনীষার দ্বারা শাসিত, সাধুপথে পরিচালিত, সেই পুরুষই স্বাধীন। এখন জিজ্ঞাসা—বিচার কাহাকে বলিব? Judgment কি ও কেমন? উত্তরে দান্তে বলেন,—

"Judgment is the link between apprehension and appetite."

অর্থাৎ, বিচার, আকাঙ্ক্ষা ও বোধের মধ্যগত শৃঙ্খল—বা বন্ধনীমাত্র। বোধ বা জ্ঞান সংযমের নামান্তরমাত্র; আকাঙ্ক্ষা উদ্দামপ্রকৃতিক। আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না; জ্ঞান বা বোধ আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দাম হইতে দেয় না। যে পদ্ধতিতে বোধ আসক্তিকে সংযত রাখে, সেই পদ্ধতির নাম বিচার। মানুষের সুবিচারিত চেষ্টাই স্বাধীনতা। এই চেষ্টা যখন ভাগবতী ইচ্ছার অনুগত হয়, তখনই মানুষ পূর্ণ স্বাধীন হয়। শাসনেই স্বাধীনতার বিকাশ হয়, উচ্ছৃঙ্খলতা স্বাধীনতা নহে—অতি ভীষণ পরাধীনতা। মানুষ ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ এক সার্ব্বভৌম সম্রাটের শাসনাধীন থাকিলে, মানব-মনীষার সম্যক উন্মেষ হয়, মানুষ স্বাধীন হইতে পারে।

ইহার পরই দান্তে এই সূত্রের বিন্যাস করিয়াছেন :—"Every thing which is good is so in virtue of consisting unity, and consequently that the human race is best disposed when it is most one, that is when it is concordant."

অর্থাৎ, যাহা সৎ পদার্থ, তাহা স্বীয় মজ্জাগত সমতা ও একতার জন্যই সৎ। অর্থাৎ, যাহা অব্যভিচারী ও অবিরোধী ভাবে প্রকট, তাহাই সৎ। সুতরাং মনুষ্যজাতি তখনই সুখে অবস্থান করে, যখন সকল জাতির মধ্যে অব্যভিচারী ভাব—সামঞ্জস্যের ভাব প্রকট হয়। এইখানেই দান্তে সাম্যবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দান্তের সাম্যবাদ আর কিছুই নহে, কেবল এক ও অদ্বিতীয় ইচ্ছাশক্তির অধীনে মানবজাতির ইচ্ছার সমন্বয়-ভাব। যেমন আপ্তবাক্যে বা অপৌরুষেয় শাস্ত্র-বচনে ভগবানের ইচ্ছার অভিব্যঞ্জনা ঘটে, এবং সেই আপ্তবাক্য জাতিবিশেষের ইচ্ছাশক্তিকে সংযত ও শাসনে রাখে, তেমনই সাংসারিক ব্যাপারে এক সম্রাটের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সমগ্র জগতের অধিবাসিবৃন্দের ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তি যখন প্রণালীবদ্ধ বা সংযত হইবে, তখনই সাম্য ফুটিয়া উঠিবে। আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য ঘটিলেই বৈষম্য উৎপন্ন হয়; যে ক্ষেত্রে এই

আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা বিধিশক্তির দ্বারা শাসিত, সেইখানেই বৈষম্য দূর হয়; সাম্যের বিকাশ হয়। ধর্ম্মে ও বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দান্তে সার্ব্বভৌম সম্রাটের পার্শ্বে এক জন সার্ব্বভৌম পুরোহিত বা পোপের কল্পনা করিয়াছেন।

ডি মোনার্কিয়া পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য মানবজাতির মধ্যে সমন্বয়-সাধন, নির্ব্বিরোধিতার প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানের প্রভাব-বিস্তার। জগতের এই সম্ভাবিত অথচ কাল্পনিক চিত্রটি অঙ্কিত করিয়া, স্বীয় সিদ্ধান্ত সকল বিশদভাবে লিখিয়া দিয়া, তবে দান্তে মহাকাব্য-রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

মহাকাব্য—The Divine Comedy.

এইবার যাহার জন্য দান্তে ইউরোপের অতুল্য কবি বলিয়া পরিচিত, যাহার রচনা করিয়া তিনি ইতালীয় ভাষাকে গ্রীক লাটিনের সমাদর দিয়াছিলেন, সেই মহাকাব্যের আলোচনা করিব। এই মহাকাব্য তিন অংশে বিভক্ত, তিন পর্য্যায়ে খণ্ডিত। প্রথম পর্য্যায়ের নাম—The Inferno, অথবা নরকের বার্ত্তা; দ্বিতীয় পর্য্যায়ের নাম The Purgatorio, বা পাপক্ষয়ভূমির বার্ত্তা; তৃতীয় পর্য্যায়ের নাম—The Paradiso অর্থাৎ স্বর্গলোকের বার্ত্তা। এক হিসাবে প্রত্যেক পর্য্যায়ই মহাকাব্যের গুণোপেত। ভাষায়, ভাবে; বিষয়বিন্যাসে উহারা প্রত্যেকেই অপরাজেয় ও অতুল্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে ইন্‌ফর্ণো ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। পর্গেটেরিও ১৩১৯ খৃঃ অব্দে এবং প্যারাডিসো ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। প্রথম খণ্ড ও শেষ খণ্ড লেখা শেষ করিয়া তবে তিনি মধ্য খণ্ড লেখেন। লেখার কারিগরীর হিসাবে পর্গেটেরিও শ্রেষ্ঠ। দান্তে তাঁহার মহাকাব্যকে কমেডী (comedy) বলিলেন কেন? কমেডী শব্দটা দুইটা লাটিন শব্দের সমাসে ঘটিয়াছে। Comus অর্থে গ্রাম, oda অর্থে গীত; গ্রাম্যগীতকে কমেডী বলিত। দান্তের মহাকাব্য গ্রাম্যভাষায়, সাধারণ ইতালীয় ভাষায় লিখিত; তাই উহা কমেডী। যদি উহাকে মিলনাত্মক ভাবে ধর, তাহা হইলে উহা মিলনাত্মক কাব্য বটেই ত। প্রথমে নরক, পরে পাপভোগ ও পাপক্ষয়, শেষে স্বর্গে দেব-মানবের মিলন। মিলনাত্মক নহে কি? দান্তের বিশ্বাস যে, মানুষ যত বড় পাপী হউক না কেন, তাহার উদ্ধার আছেই; সে কালে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিবেই। এই কথাটা ইউরোপকে বুঝাইবার জন্যই তিনি তাঁহার মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

Providence has set two ends before man to be aimed at by him ; the blessedness of this life, which consists in the exercise of his proper power and is represented by the Earthly Paradise ; and the blessedness of eternal life which consists in the fruition of the sight of God, to which his proper power cannot ascend unless assisted by the divine light.

অর্থাৎ, বিধাতা মানুষের সম্মুখে দুইটি উদ্দেশ্য বা সাধ্য বিষয় স্থির রাখিয়াছেন ; প্রথম—এই জীবনের ভোগ্য আনন্দ ও সুখ, যে আনন্দ বা সুখের জন্য মানুষ স্বীয় ক্ষমতার বিধি অনুগত ভাবে প্রয়োগ করিয়া একটা পার্থিব স্বর্গের বা আনন্দধামের সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা মানুষের সাধ্য, পুরুষকার-প্রয়োগে প্রাপ্য। দ্বিতীয়—অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখ ; যাহা ভগবদ্দর্শন ব্যতীত লভ্য নহে ; যাহা লাভ করিতে হইলে কেবল মানুষের পুরুষকারে কুলায় না, ভগবানের অশেষ কৃপায় ভাগবতী জ্যোতির প্রভাবে মানুষ এই দুর্লভ অবস্থা লাভ করিতে পারে। এই তত্ত্বটুকু বুঝাইবার জন্যই দান্তের মহাকাব্য-রচনা। দান্তে খৃষ্টান ; তিনি জন্মান্তরবাদ মানিতেন না ; কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফল-ভোগ তিনি বুঝিতেন না ; তাই তাঁহাকে প্রথমে নরকের বর্ণনা দিতে হইয়াছে। এ নরকের অধিবাসীদিগের মধ্যে পাপবোধ নাই ; সুতরাং পশ্চাত্তাপ নাই, অনুশোচনা নাই। আছে কেবল একটা উৎকট-যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় জীব-আত্মার অবস্থান। নরকে থাকিয়াও জীবাত্মা অহঙ্কারশূন্য নহেন। এই নরকভোগের পর যাহাদের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে. তাহারা পর্গেটরী (Purgatory) বা পাপক্ষয় করিবার স্থানে উপস্থিত হয়। পর্গেটরী প্রায়শ্চিত্তের স্থান, পশ্চাত্তাপ ও অনুশোচনার স্থান। এইখানে পাপক্ষয় হয়, জীবাত্মার কর্ম্মজন্য মালিন্য বিধৌত হইয়া যায়। শেষে স্বর্গারোহণ ; এই স্বর্গে জীবাত্মা ভগবানের সালোক্য সামীপ্য লাভ করিয়া মুক্ত হয়। খৃষ্টান শাস্ত্রে সাযুজ্য ও সারূপ্য মুক্তি নাই। জীবাত্মা যখন দেহী বা অবয়ববিশিষ্ট, তখনও দেহের ভিতরে থাকিয়া তাহাকে এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। দেহেই নরকভোগ হয়, প্রায়শ্চিত্ত হয়, স্বর্গবাসও হয়। আবার বিদেহ আত্মাকেও এই ভাবে তিন অবস্থার মধ্য দিয়া মুক্তিলাভ করিতে হয়। স্বয়ং কবি এই মহাকাব্যের নায়ক। তিনি নরকভোগ করিতেছেন ; নরকে কত আত্মার সহিত কথোপকথন চালাইতেছেন ; তিনিই আবার প্রায়শ্চিত্তের আগারে যাইয়া পাপক্ষয় করিতেছেন ; সে স্থানের আত্মাদের সহিত পাপ-পুণ্যের আলোচনা করিতেছেন ; শেষে তিনিই শতধৌত

তণ্ডুলকণার মত অমল-ধবল-রূপে স্বর্গারোহণ করিতেছেন। তাঁহার কাব্যে তাঁহাকে দুই রূপে আমরা দেখিতে পাই—

Sometimes he signifies the ideal Christian rescuing himself from the shipwreck that sin has made of his life and toiling in Gods' appointed way to the two goals of temporal and eternal felicity, sometimes he is the actual Dante, the Florentine of the fourteenth century, the man who in his own person has been through the experience he is describing.

অর্থাৎ, কখনও বা তিনি আদর্শ খৃষ্টান; নিয়তির বিধান অনুসারে, বিষয়ী জীবনের এবং আধ্যাত্মিক জীবনের দুই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ব্যস্ত, এবং যেরূপ লোভে ও পাপে যে তাঁহার জীবনকে নির্দ্দিষ্ট পন্থা হইতে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে, তাহা সামলাইতে ব্যস্ত; আবার কখনও বা তিনি সেই দান্তের মতন—চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ফ্লোরেন্সবাসী দান্তের মতন—নিজের ভুক্তভোগবশতঃ সকল অভিজ্ঞতার বর্ণনা করিতেছেন। এই মহাকাব্যের মধ্যে দান্তে এমন ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ভগবানের দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই তিনি যেন কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। লেখা আছে, যেন তিনি "as the consecrated Herald of His will to man" যেন ভগবানের কাছে উৎসর্গীকৃত দূত স্বরূপ ভাগবতী ইচ্ছা মানুষকে জ্ঞাপন করিতেছেন।

গল্পের ভঙ্গীটা এই। দান্তে যেন তাঁহার জীবনের পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে আবার একটা ভীষণ পথহীন বনমধ্যে পথ হারাইলেন। এই বনই সেই সময়কার (১৩০০ খৃঃ অঃ) ইউরোপ। তখন অষ্ট্রিয়ার এলবার্ট সম্রাট্; তিনি সম্রাটের কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন, অযোগ্য, লোভী, বিলাসী সম্রাট্। আর অষ্টম বনিফেস্ (Boniface VIII) পোপ, বা ধর্ম্মকার্য্যের পুরোহিত। ইনিও অযোগ্য, বিলাসী ও লম্পট ছিলেন। যাঁহারা দুই জন জীবকে সৎপথ দেখাইবেন, তাঁহারাই অযোগ্য; তাই সংসার মহাবন—পথভ্রষ্ট, গহন, ভীষণ, বিজন অরণ্য। সেই অরণ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে দান্তে সম্মুখে এক সুন্দর পর্ব্বত দেখিলেন। এই পর্ব্বতের শিখরদেশ অরুণোদয়ে সমুজ্জ্বল। সাধুতার সূর্য্যের প্রথম রশ্মিমালায় গিরিশৃঙ্গ কনককান্তি ধারণ করিয়াছিল। দান্তে এই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিলেন। এই পর্ব্বতই তাঁহার কাল্পনিক পার্থিব স্বর্গ। দান্তে পর্ব্বতের মূলদেশে উপস্থিত হইয়া আরোহণের চেষ্টা করিতে-

ছেন, এমন সময়ে তিনটি ভীষণ হিংস্রক জন্তু তাঁহাকে আক্রমণ করিল। প্রথমটি চিতাবাঘ (Leopard) অর্থাৎ মোহজ কাম; দ্বিতীয়টি হিংসা, শার্দ্দূলরূপে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তৃতীয়টি এক ভীমকায় সিংহ—অহঙ্কারের মূর্ত্তির স্বরূপ হইয়া অপর পার্শ্ব হইতে আক্রমণ করিল। তিনি ইহাদের আক্রমণ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছেন এমন সময়ে এক দুরন্ত নেকড়ে বাঘ (wolf) তাঁহাকে কামড়াইয়া ধরিল। লোভই এই নেকড়ে বাঘ। উহার দংশন সহ্য করিতে না পারিয়া দান্তে গিরিগাত্র হইতে গড়াইয়া পড়িলেন। অর্থাৎ, কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিন প্রধান রিপুই স্বর্গারোহণের প্রধান অন্তরায়। লোভের দংশনজ্বালায় দান্তে যখন অধীর হইয়াছেন, তখন মহাকবি ভর্জ্জিলের (Virgil) প্রেতাত্মা আসিয়া দেখা দিলেন। ইনিই দান্তেকে জ্ঞানোপদেশ দিলেন, দান্তের দিব্যচক্ষু হইল; তিনি স্বচেষ্টায় উদ্ধারের নূতন পথ খুঁজিতে লাগিলেন। এই অন্বেষণে তাঁহার নরকদর্শন হয়; পরে প্রায়শ্চিত্ত-আগার (Purgatory) দেখেন; ইহারই শেষ দ্বারে দান্তে বিয়াট্রিস্‌কে দেখিতে পান। তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেম, তাঁহার স্বার্থহীন জীবন, তাঁহার পবিত্রতা ও স্নিগ্ধতা দান্তেকে যেন ভেলায় স্বর্গরাজ্যে লইয়া গেল। অর্থাৎ, দান্তে এই মহাকাব্যে এই সিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা করিলেন যে, পুরুষকারের সাহায্যে মনুষ্য নরকযন্ত্রণা ও প্রায়শ্চিত্তের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। পরন্তু অহেতুক প্রেম না হইলে স্বর্গারোহণ সম্ভবপর নহে। তাই বালিকারূপে বিয়াট্রিস্ আসিয়া তাঁহাকে অক্ষয় স্বর্গে লইয়া গেল। এই ভাবগত বর্ণনাতেই মহাকাব্যখানি পূর্ণ। উহার যেমন অতুলনীয়া ভাষা, তেমনই অনুপম ভাব। বাইবেলের স্বর্গ-নরক-তত্ত্ব অপূর্ব্ব পদ্ধতি অনুসারে ব্যাখ্যাত।

দান্তের নরক—is the representation of the state of impenitence—অনুশোচনাশূন্য পাপোদ্ধত অবস্থাকে বুঝায়। যতক্ষণ অনুশোচনা নাই, ততক্ষণ পাপের প্রাবল্য সমভাবেই থাকিবে; ততক্ষণ আত্মার প্রায়শ্চিত্ত নাই; ততক্ষণ পাপের গতি অবিরামভাবে চলিবে। নরকে পাপ নিত্য বিদ্যমান; যখন পাপজ কর্ম্মের জন্য অনুশোচনা হয়, তখনই প্রায়শ্চিত্ত আরব্ধ হয়। এই প্রায়শ্চিত্ত Purgatory. The object of the purgatorial discipline is to restore to the penitent the freedom of his will, which has been enslaved by sin. প্রায়শ্চিত্তগত কঠোর শাসনপদ্ধতির উদ্দেশ্যই এই যে, উহার প্রভাবে পশ্চাত্তাপদগ্ধ পাপান্ধ মানব-আত্মা পুনর্ব্বার ইচ্ছাশক্তির

বা চিত্ত ও বুদ্ধির স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে। পাপে চিত্তের স্বচ্ছন্দতা নষ্ট হয়; এই স্বচ্ছন্দতা না থাকিলে পুণ্যার্জ্জন সম্ভবপর হয় না; সুতরাং স্বর্গাকাঙ্ক্ষার স্ফূর্ত্তিও হয় না। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সে পথ পরিষ্কৃত হয়। এই প্রায়শ্চিত্ত পর্ব্বতের সাতটি স্তর আছে; প্রতি স্তরে এক একটা পাপের ক্ষালন হইয়া থাকে। সে সাতটি প্রধান পাপ—Pride, Envy, Anger, Sloth, Greed, Gluttony and Lust স্পর্দ্ধা বা দর্প, ঈর্ষা, ক্রোধ, জাড্য বা স্ফূর্ত্তিরতা বা আলস্য, অতিলোভ, অতিভোজন, লাম্পট্য। কর্ম্মফলভোগ, দণ্ডভোগ, অনুশোচনাজাত প্রার্থনা, কাতর বন্দনা, এই কয় উপায়ে প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে তবে স্বর্গারোহণ।

দান্তের Paradiso নামক শেষ পর্য্যায়ে দুইটি বিষয়ের আলোচনা আছে—Eternity and fruition—অনন্ত ও কর্ম্মসাফল্য। অনন্ত কাহাকে বলি? সমস্তাং ভূতভবিষ্যং বর্ত্তমানের বিদ্যমানতাকে অনন্ত বলে। Eternity is all at once.—নিত্যবিদ্যমানতাকেই অনন্ত বলে। যেখানে গতি নাই, অপচয় উপচয় নাই, নিত্যসিদ্ধ অবিনাশী যাহা, তাহাই অনন্ত। দান্তেকে অনন্ত বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বিয়াট্রিসের আত্মা আসিয়া দেখা দিল; সে দান্তের হাত ধরিয়া এমন দেশে লইয়া গেল, যে দেশে রজনী নাই—অহর্নিশের পরিবর্ত্তন নাই। অর্থাৎ, fixed star বা ধ্রুবমণ্ডলে লইয়া গেল। সেইখান হইতে বিয়াট্রিস দেখাইল—ঐ দেখ, গ্রহনক্ষত্রতারাগণ ঘুরিতেছে, ঐখানে ত্রিকালের সম্যক্ বিকাশ। আর তুমি যেখানে আছ, সেখানে কালের পরিমাণ নাই—অখণ্ড দণ্ডায়মান নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ স্বভাব কাল। কালের অতীত যাহা, তাহাই অনন্ত।

Fruition—ফলপ্রাপ্তি বা তৃপ্তি ও ভক্তি কাহাকে বলে? The perfect conformity of our will with the will of God, মানুষের ইচ্ছা বা মানসবৃত্তি যখন ভগবানের ইচ্ছার সহিত পূর্ণভাবে সম্মিলিত হইবে, তখনই জীবনের ঈপ্সিত লাভ হইবে।

"To see God is to see as God sees." ভগবানকে এমন দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, যে দৃষ্টিতে ভগবান বিশ্বচরাচর দেখিয়া থাকেন। আর স্বর্গ কেমন?—that is unbodied light,' 'Light intellectual, replete with joy,' 'Joy that transcends all sweetness of delight.' অশরীরী জ্যোতিঃ যেখানে নিত্য বিরাজ করে; যে জ্যোতিঃ মনীষার স্ফূর্ত্তির ন্যায় প্রেমসৌদামিনীমাত্র; যে প্রেম নিত্য আনন্দঘন, চিদানন্দবিকাশ; আর সে

চিদানন্দ সংসারের সকল সুখের অতীত—এমন আনন্দময় স্থানই স্বর্গ। এই স্বর্গে থাকে কাহারা? নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাব চিদ্ঘন আনন্দময় পুরুষ সকল, তাহাদের—

"নাই ভেদাভেদ, আনন্দ খেদ, তৃষ্ণা কি রূপের জ্বালা।"

শেষ কথা।

দান্তের Divine Comedy বা মহাকাব্য পাঠ করিতে করিতে আমাদের পুরাণ সকল মনে পড়ে। পুরাণে যেমন আখ্যায়িকা, উপাখ্যান আছে, যেমন অর্থবাদ ও রোচক আছে, দান্তের মহাকাব্যেও তেমনই ভাবে বিষয় সকল বিন্যস্ত আছে। আবার পুরাণে যেমন অধ্যাত্ম-তত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে, দান্তের মহাকাব্যেও তেমনই অধ্যাত্ম-তত্ত্বের ও সাধন-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা আছে। যে পদ্ধতিতে পুরাণ লিখিত, সেই পদ্ধতি অনুসারে দান্তের মহাকাব্য লিখিত। পুরাণ বেদের ও উপনিষদের ব্যাখ্যা-পুস্তক—দান্তের মহাকাব্য বাইবেলের ব্যাখ্যাপুস্তক, gospel বা আপ্তবাক্য পুরাণের আকারে পরিবর্ত্তিত। পুরাণের নরক বর্ণনা ও দান্তের নরক বর্ণনা প্রায় একই রকমের। তবে হিন্দুর পুরাণে জন্মান্তরবাদ আছে, দান্তের মহাকাব্যে তাহা নাই। হিন্দু পাপী জন্মে জন্মে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কর্ম্মসূত্রের পাক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। দান্তের নরকভোগ অনন্ত; প্রায়শ্চিত্তকাল সান্ত হইলেও, জন্ম-জন্ম জন্মান্তরে উহার জের টানা হয় না। দান্তের স্বর্গও অনন্ত। হিন্দুর স্বর্গ-নরক-ভোগ—দুইই সান্ত। হিন্দুর পক্ষে নরকভোগও অনন্ত নহে, স্বর্গভোগও অনন্ত নহে; কর্ম্মানুসারে উভয়েই সীমাবদ্ধ ও সান্ত। এই মতগত পার্থক্য ছাড়া হিন্দুর পুরাণে ও দান্তের মহাকাব্যে অন্য কোনও বিরোধ বা বিভিন্নতা নাই। দান্তের মহাকাব্য মিল্টনের Paradise Lost স্বর্গচ্যুতি মহাকাব্যের আদর্শ-স্বরূপ। আমাদের হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারে নরকবর্ণনা ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সাধনা দান্তের মহাকাব্যের অনুবাদমাত্র। হিন্দুর পুরাণ ছাড়িয়া দিলে, ধর্ম্ম-সিদ্ধান্তপূর্ণ এমন মহাকাব্য জগতের আর কোনও সভ্যজাতির সাহিত্যে নাই, পূর্ব্বেও ছিল না—ভবিষ্যতে আর হইবে না; কেন না, অদ্যাপি দান্তের মহা-কাব্যের সমকক্ষ আর একখানি মহাকাব্য রচিত হইল না। অনেকে কাব্য-রচনা বিষয়ে দান্তেকে নেপোলিয়নের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। নিজের প্রয়োজনমত ভাষা গড়িয়া, ছন্দ গড়িয়া তিনি মহাকাব্যের রচনা করিয়াছিলেন। সেই মহাকাব্যের ফলে ইউরোপের সাহিত্য-জগতে তিনি অতুল্য হইয়া আছেন।

নেপোলিয়ন দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই; দান্তের সাম্রাজ্য অক্ষয় ও অবিনশ্বর। বরং দান্তেকে ইতালীর বাল্মীকি বলা চলে। দান্তের আদর্শ লাটিন কবি ভর্জিল হইলেও, কাব্যাংশে ঈনীড (Æneid) অপেক্ষা দান্তের মহাকাব্য শ্রেষ্ঠ,—ভাষার সজীবতার হিসাবে শ্রেষ্ঠ, ভাবের প্রকৃষ্টতা হিসাবে শ্রেষ্ঠ।

বাঙ্গালীর সহিত দান্তের তেমন পরিচয় নাই জানিয়া, অতিসংক্ষেপে দান্তের মতের ও ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া লেখনী সার্থক করিলাম।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

বস্ত্র।

আর্য্যশাস্ত্রে (অবস্থা-বিশেষে) ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র ব্যবহার করিবার বিধি দৃষ্ট হয়।

বিধি-নিষেধ।

সধবা রমণী (রক্তবস্ত্র) রঙ্গীন কাপড় পরিধান করিবেন; বিধবার পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ। কুমারীগণ শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবেন। (১) এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম স্থলবিশেষে পাপজনক বলিয়াও অভিহিত হইয়াছে। মহর্ষি আপস্তম্ব বলিয়া গিয়াছেন, (২) (নীলীবস্ত্র) নীলরঙ্গের কাপড় পরিধান করিলে স্নান, দান, তপস্যা, হোম, বেদপাঠ, তর্পণ ও পঞ্চযজ্ঞ নিষ্ফল হয়। কেবল তাহাই নহে; ইহাতে যে পাপ হয়, তাহার ক্ষালনার্থ অহোরাত্র উপবাস ও পঞ্চগব্য-পান-রূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ভবিষ্যপুরাণের এ বচন শূলপাণির "প্রায়শ্চিত্তবিবেকে" উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু আপস্তম্বই আবার বলিয়া গিয়াছেন, (৩)

---

(১) ধারয়েৎ বস্ত্র রক্তানি নারী চেৎ পতিসংযুতা।
বিধবা চ ন রক্তানি কুমারী শুক্লবাসসী।—মৎস্যপুরাণ।

(২) স্নানং দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
পঞ্চযজ্ঞা বৃথা তস্য নীলীবস্ত্রস্য ধারণাৎ।
নীলীরক্তং যদা বস্ত্রং ব্রাহ্মণোঽঙ্গেষু ধারয়েৎ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।—ষষ্ঠ অধ্যায়।

(৩) স্ত্রীণাং ক্রীড়ার্থসংযোগে শয়নীয়ে ন দুষ্যতি।

"রমণীদিগের 'ক্রীড়ার্থসংযোগে' অর্থাৎ উৎসবাদিসময়ে নীলবস্ত্রের ব্যবহারে দোষ নাই; তাহা শয্যাতেও ব্যবহৃত হইতে পারে।" অন্যান্য স্মৃতি পুরাণেও নীলের এইরূপ নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। ঋষিদিগের এই নীল-বিদ্বেষের কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। রসায়ন বিজ্ঞানে কৃতবিদ্যগণ ইহার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিয়া, আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারিবেন কি? নীলের ন্যায় গাঢ়রক্তবর্ণ বস্ত্রও নরসিংহপুরাণে (৪) নিষিদ্ধ হইয়াছে। বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানসময়ে শেলাই করা কাপড়, দগ্ধবস্ত্র, পরকীয় বস্ত্র, মূষিকোৎকীর্ণ জীর্ণবস্ত্রের ব্যবহার বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। (৫)

শাস্ত্রে পুরুষের পক্ষে সাধারণতঃ একাধিক বস্ত্র ব্যবহার করিবার বিধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (৬) পরিণীতা রমণীর পক্ষে বহু বস্ত্র, এবং কুমারীর পক্ষে দুইখানি বস্ত্র ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। পুরুষের অধোবস্ত্র ও উত্তরীয়, মহিলাদিগের এই উত্তর ও অবগুণ্ঠন, স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। সুতরাং পুরুষের বস্ত্রে (বাসসী) দ্বিবচন, এবং মহিলার বস্ত্রের বিশেষণে (রক্তানি) বহুবচন দেখিতে পাওয়া যায়।

অবগুণ্ঠন।

আজকাল আমাদিগের গৃহলক্ষ্মীগণ যেমন একখানা কাপড়ের দ্বারা আগুল্‌ফ মস্তক ঢাকিয়া আমাদিগের ব্যয়ভারের লাঘব করিতেছেন, পূর্ব্বকালে তেমন ছিল না। "অবগুণ্ঠন-প্রথা" আর্য্যাবর্ত্তের চিরন্তন প্রথা। এই প্রথা দাক্ষিণাত্যে পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও প্রচলিত নাই। সুতরাং মুসলমানের অত্যাচার ঘোমটার উদ্ভাবক বলিয়া কল্পিত হইতে পারে না। কারণ, প্রাচীন স্মৃতিতে (৭) শ্বশুর প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিদিগের সম্মুখে মহিলাবৃন্দের শিরঃপ্রচ্ছাদনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আদিকবি বাল্মীকির রচনাতেও ইহার উল্লেখ আছে। (৮) বীরকেশরী

---

(৪) ন রক্তমুল্বণং বাসো ন নীলঞ্চ প্রশস্যতে।

(৫) ন স্যূতেন ন দগ্ধেন পারক্যেণ বিশেষতঃ।
মূষিকোৎকীর্ণ-জীর্ণেন কর্ম্ম কুর্য্যাৎ বিচক্ষণঃ।—আহ্নিকতত্ত্বে ভারত।

(৬) জলতীরং সমাসাদ্য তত্র শুক্লে চ বাসসী।
পরিধায়োত্তরীয়ঞ্চ কুর্য্যাৎ কেশান্ ধূনয়েৎ।—গোভিলভাষ্যস্মৃতি।
নার্দ্রং পরিদধীত, নৈকং পরিদধীত।—গোভিলগৃহ্য। ৩ প্র। ৫।২৪।২৫

(৭) শ্বশুরস্যাগ্রতো যস্মাৎ শিরঃপ্রচ্ছাদনক্রিয়া।
পুত্রৈর্নর্ত্তেন সা কার্য্যা মাতুরভ্যুদয়ার্থিভিঃ।—গর্গ।

(৮) দীনাং বিলপতীং দৃষ্ট্বা কিং চ মাং নাভিভাষসে।
দৃষ্ট্বা ন খল্বভিক্রুদ্ধো মামিহানবগুণ্ঠিতাম্।—যুদ্ধকাণ্ড।

রাক্ষসনেতা দশানন দাশরথির বাণে গতাসু হইয়া সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইলে, শোকাতুরা মন্দোদরী বিলাপকালে বলিয়াছিলেন,—"মহারাজ! তুমি আজ এই যুদ্ধভূমিতে আমাকে অবগুণ্ঠনশূন্যা দেখিয়া ক্রোধ করিতেছ না কেন?" মহাকবি মাঘের বর্ণনায় মহিলাগণের উত্তমাঙ্গে অবগুণ্ঠন দেখিতে পাওয়া যায়। (৯) বাণভট্টের পাউন্-পরা) চাণ্ডালকন্যকা দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়া, মস্তকে রক্তাংশুকের অবগুণ্ঠন ধারণ করিয়া রাজদরবারে উপস্থিত হইয়াছিল। (১০) কালিদাসের তপোবন-লালিতা শকুন্তলার মস্তকেও অবগুণ্ঠন দেখিতে পাই।

দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্য-বাসের ফলে যাহারা আর্য্যাবর্ত্তের ভাষা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের মহিলাবৃন্দের মস্তকেও চিরন্তন প্রথার অনুযায়ী অবগুণ্ঠন দেখিতে পাওয়া যায়।

কাটা কাপড়।

অনেকে মনে করেন, প্রাচীনকালে ঋষিযুগের ভারতবর্ষে 'কাটা কাপড়ে'র ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। এই অপসিদ্ধান্তের ফলে, কঞ্চুকাবৃত প্রস্তরমূর্ত্তি গ্রীক-শিল্পের নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রে কঞ্চুক-ব্যবহারের নিদর্শনের অভাব নাই। আহ্নিক-তত্ত্বে একটি স্মৃতিবচনে [বৈদিককর্ম্মের অনুষ্ঠানসময়ে কঞ্চুক-পরিত্যাগের উপদেশ আছে। (১১) তন্ত্র শাস্ত্রের বিশিষ্ট গ্রন্থ "শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণি" গ্রন্থে জপ-কালে কঞ্চুক-ধারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। (১২) ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় "মহাভারত" হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, (১৩) তাহাও এই বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রদর্শিত প্রভৃত প্রমাণ বিদ্যমান থাকিতেও, আধুনিক অভিধান-কার "কঞ্চুক" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—"মেয়েদের কাঁচলী"। মেয়ে-মহলে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ বা আপত্তি নাই। কিন্তু সীমন্ত-সিন্দূরের মত ইহাতে মেয়েদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মধ্যযুগের

---

(৯) প্রভাবগুণ্ঠনপটাঃ স্তনজঘনাবক্ত্রশিরঃ সকলকৌতুকদীক্ষিতে স্ম।—৫।১৭

(১০) আগুল্ফাবলম্বিনা নীলকঞ্চুকেনাবচ্ছন্নশরীরাম্, উপরি রক্তাংশুকরচিতাবগুণ্ঠনাম্ কাদম্বরী।

(১১) ন স্যাৎ কর্ম্মণি কঞ্চুকী।

(১২) উষ্ণীষী কঞ্চুকী নগ্নো মুক্তকেশো গলাবৃতঃ।
অপবিত্রকরোঽশুদ্ধঃ প্রলপন্ ন জপেৎ ক্বচিৎ।

(১৩)—বিবিশুস্তে সভাং দিব্যাং সোষ্ণীষা যুক্তকঞ্চুকাঃ।—ইন্দো-এরিয়ান্।

অভিধানে কঞ্চুক অর্থে—"চোল, কঞ্চুলিকা, (১৪) কূর্পাসক, অঙ্গিকা, কঞ্চুক, এই কয়টি শব্দ গৃহীত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের এতদ্বিষয়িনী কারিকাটি এইরূপ—

"চণ্ডাতকং চলনকং চলনী স্বিতরস্ত্রিয়াঃ।
চোলঃ কঞ্চুলিকা কূর্পাসকোঽঙ্গিকা চ কঞ্চুকে।

"চণ্ডাতক" শব্দের অর্থ,—দিব্যস্ত্রীদিগের [বলনা নামে] খ্যাত অর্দ্ধোরু পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত বস্ত্রবিশেষ। সাধারণ স্ত্রীলোকের এই বস্ত্রের নাম চলনী। "তু"-কারের দ্বারা ইতরস্ত্রীকে অন্য হইতে "ব্যাবৃত্ত" করা হইয়াছে। ঐ কারিকার অপরার্দ্ধে পঠিত চোল হইতে অঙ্গিকা পর্য্যন্ত শব্দগুলি সাধারণ স্ত্রীলোকের "কঞ্চুক" অর্থে অভিহিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা "কঞ্চুক" যে কেবল স্ত্রীমাত্রেরই ব্যবহার্য্য, এমন বুঝায় না।

যেমন "পশ্চান্নিতম্বঃ স্ত্রীকট্যাঃ", এই উক্তিতে স্ত্রীলোকেরই: কটীর পশ্চাদ্ভাগের নাম "নিতম্ব", এইরূপ বুঝায়, কিন্তু "কটী" স্ত্রীশরীরেরই অবয়ব, পুরুষের নহে, এমন বুঝায় না; এই স্থলেও ঠিক সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এই শ্রেণীর জামা-নির্ম্মাতা "কঞ্চুক-কার" নামে অভিহিত হইত। উদ্ভটে তাহার প্রমাণ দেখা যায়। (১৫) আজকাল যাঁহারা বিবিধ কোষ গ্রন্থের সঙ্কলন-কার্য্যে ব্যাপৃত, তাঁহারাই এ সকল বিষয়ে অনেক গোলযোগ ঘটাইতেছেন।

প্রাচীনকালে "নীশার" নামে একটি পদার্থের ব্যবহার ছিল। এই

নীশার।

নীশার শব্দটিকে সাধু করিবার অভিপ্রায়ে, কাত্যায়ন পাণিনির "ইউশ্চ" [৩।৩।২১] এই সূত্রে একটি বার্ত্তিক সূত্রের [শৃবায়ুবর্ণনিবৃতেষু] যোগ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে কালে

(১৪) কঞ্চুলিকা-ধারণে কামিনীদিগের সুষমা বর্দ্ধিত হইত, "কাব্যপ্রকাশে"র কবিতায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। নায়ক নায়িকাকে বলিতেছেন,—"হে মনোহরনেত্রে! কঞ্চুলিকা ব্যতীতই তুমি পরম শোভা ধারণ কর। যথা :—

ত্বং মুগ্ধাক্ষি! বিনৈব কঞ্চুলিকয়া ধৎসে মনোহারিণীম্
লক্ষ্মীমিত্যভিধায়িনি প্রিয়তমে তদ্বীটিকাসংস্পৃশি।
শয্যোপান্তনিবিষ্টসস্মিতমুখো নেত্রোৎসবানন্দিতো
নির্যাতঃ শনকৈরলীকবচনোপন্যাসমালীজনঃ॥

(১৫) বিমলবিরাজিতযোগ্যো শাস্ত্রে জড়ঃ খিদ্যতি ন মৌর্খ্যে যে।
নিষ্পত্তি-কঞ্চুককারঃ প্রায়ঃ শুকবলী নারী॥

"চোলঃ কূর্পাসকোঽস্ত্রিয়াং। নীশারঃ স্যাৎ প্রাবরণে হিমানিলনিবারণে। অর্দ্ধোরুকং বরস্ত্রীণাম্"।

"নীশার" কত দূর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহা মনীষিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। হেমচন্দ্র [পূর্ব্বোক্ত কারিকার পরেই] লিখিয়াছেন,—"শাটী চোটাথ নীশারো হিমবাতাপহাংশুকে"। কঞ্চুকের পরেই "শাটী", তৎপরেই "নীশার" উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে "নীশার" একটি শরীর-ধার্য্য পদার্থ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। অমরসিংহ ইহার পূর্ব্বে "কূর্পাসে"র, এবং পরে রমণী-ভোগ্য "অভোরুকে"র পাঠ করিয়াছেন। তাঁহার এই পাঠের ক্রমানুসারে রমণীদিগের ভোগ্য বস্ত্রই যেন অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়।

মহাভাষ্যকার "নীশার" শব্দের প্রয়োগ দেখাইবার অভিপ্রায়ে উদাহরণ দিয়াছেন,—"গৌরিবাকৃতনীশারঃ প্রায়েণ শিশিরে কৃশঃ"; অর্থাৎ, শীতকালে গরু যেমন কৃশ হইয়া যায়, "অকৃতনীশার" ব্যক্তিও সেইরূপ কৃশ হয়। ইহাতে শীতের সময়ে "নীশারে"র বিশেষরূপ উপযোগিতা প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল বিষয়ের বিচার না করিয়া, অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন,—"কানাৎ বা মশারীতি খ্যাতে শীতে শীতমনেন হতম্ ভবত ইতি।" এইব্যাখ্যানুসারে কানাৎ বা মশারী "নীশার" নামে কল্পিত হইবার পর, "শব্দকল্পদ্রুমে" ও "বিশ্বকোষে"ও তাহাই বিনা বিচারে গৃহীত হইয়াছে। "নীশার" শব্দের এরূপ অর্থবিজ্ঞাপক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও অমরসিংহ ও হেমচন্দ্র, উভয়েই "নীশার"কে স্ত্রীভোগ্য বস্ত্রের প্রকরণে পাঠ করিয়াছেন, তথাপি [মহাভাষ্যের উদাহরণানুসারে] ইহা সাধারণের উপভোগ্য বস্ত্র বলিয়াই বোধ হয়। প্রস্তরমূর্ত্তিতেও এই শ্রেণীর শিল্প পুরুষ-প্রতিকৃতির গাত্রে দেখা যায়। (১৭) হয় ত অমরসিংহ প্রভৃতির সময়ে স্ত্রীশরীরেই ইহার ব্যবহার হইত।

"নিচোল" নামে মহিলাদিগের ব্যবহার্য্য আর এক প্রকার কাপড়ের নাম অভিধানে ও সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। "বিশ্বকোষ" ইহার অর্থ করিয়াছেন,—"আচ্ছাদন বস্ত্র"—"স্ত্রীলোকদিগের পরিধানবস্ত্র"—চলিত "পাছুড়ী"—"ঘোমটা", এবং প্রমাণস্থলে হেমচন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের কারিকাটি এইরূপ,—"নিচোলঃ প্রচ্ছদপটো নিচোল শ্চোত্তরচ্ছদে।" অমর-কারিকা—"নিচোলঃ প্রচ্ছদপটঃ"। টীকাকার রঘুনাথ বলিয়াছেন,—"চন্দ্রাকারে পরিহিতবস্ত্রে"

নিচোল।

(১৭) বঙ্গাচার্যের তাম্রপাল-মূর্ত্তিতে "নীশার"-ব্যবহারের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"পাচুড়ীতিখ্যাতে ;" এবং সমর্থনার্থ ব্যাড়ির "কারিকা" ["নিচোলঃ প্রচ্ছদপটো নিচুলঃ প্রচ্ছদশ্চ সঃ"] উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সমস্তের পর্য্যালোচনায় দেখা যায়,—"নিচোল, নিচুল, প্রচ্ছদপট, উত্তরচ্ছদ ও প্রচ্ছদ" শব্দ একার্থ। "পাচুড়ী" কি, বুঝিতে পারিলাম না ; আরও বুঝিলাম না—"স্ত্রীলোকদিগের পরিধানবস্ত্র পাচুড়ী।" স্ত্রীলোকের পরিহিত বস্ত্রমাত্রই কি পাচুড়ী ? আর ঘোমটা অর্থ ই বা কোথা হইতে আসিল ?

টীকাকার ভানুজী দীক্ষিত বলেন,—"নিচোল" পাল্‌কী প্রভৃতির আবরণ। তিনি আরও বলেন,—ইহা (কাহারও মতে) স্ত্রী পিধানপট, "বুরকা" নামে প্রসিদ্ধ। সাহিত্যের প্রয়োগ দেখিয়া "বুরকা" অর্থ ই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। মহিলাদিগের অভিসারসময়ে "নিচোল"-ব্যবহারের বিশেষ উপযোগিতা উপলব্ধ হইয়াছিল। "সাহিত্যদর্পণে" উক্ত হইয়াছে,—"যান্তি নীলনিচোলিন্যো রজনীষভিসারিকাঃ"। অর্থাৎ, "অন্ধকার রাত্রিতে অভিসারিকাগণ নীল নীচোল ধারণ করিয়া গমন করিতেছে।" "গীতগোবিন্দে" সখীর উপদেশেও এই অর্থেরই সমর্থন হইয়াছে। যথা,—"শ্রীলয় নীলনিচোলম্"। "রাজতরঙ্গিণী"র বর্ণনাও উক্ত অর্থেরই অনুকূল। (১৬) যথা,—"দিক্ সকল তীব্র শীতে আক্রান্ত (অতএব) গাঢ় অন্ধকারচ্ছলে, যেন নীল-নিচোলাচ্ছিত হইয়াই শোভা পাইতেছিল।" ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—শীতকালে অন্ধকার রাত্রিতে তুষারাবৃত দিঙ্মণ্ডলে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। তাহাতেই কবি "নীলনিচোলাবরণে"র উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন। কারণ, "নীচোলাবৃতশরীরে"ও নীচোলের বর্ণাদি ব্যতীত অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না।

দেশকালের বৈচিত্র্যানুসারে মানব-রুচির পরিবর্ত্তন স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং এক সময়ে যাহা সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, সময়ান্তরে তাহাই আবার নিতান্ত হেয়রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। "শিশুপালবধে" দেখা যায়, সভ্য সমাজের মহিলাবৃন্দের গাত্রে "কূর্পাসক" স্থান পাইয়াছিল। (১৭) এমন কি, ঋষিযুগে রমণীদিগের কঞ্চুকধারণ

জামার ব্যবহার।

(১৬) সন্ততাক্রান্তদিবত তীব্রশীতবশীকৃতা।
আশাস্তকাসিরে নীলনীচোলাচ্ছাদিতা ইব।

(১৭) প্রস্বেদবারিসবিশেষবিষক্তসক্তে কূর্পাসকং ক্ষতনখক্ষতমুৎক্ষিপন্তী।
আবির্ভবদ্ঘনপয়োধরবাহুমূলা শাতোদরীযুবদৃশাং ক্ষণমুৎসবোঽভূৎ।

(১৮) সিতাস্ত্রবাসসা যুক্তা মুক্তকেশা বিকঞ্চুকী।
শিরোঽস্নাতা ব্যাধিতা স্ত্রী পাকং কুর্য্যান্ন পৈতৃকম্।

ধর্মকার্য্যের অঙ্গ বলিয়াও বিবেচিত হইয়াছিল। ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা প্রজাপতি কঞ্চুকশূন্যা মহিলাকে শ্রাদ্ধীয় অন্নপাকে অনধিকারিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১৯) কিন্তু আধুনিক পল্লীসমাজে মহিলার কঞ্চুক-ধারণ যেন মহাপাতকের ন্যায় বিবেচিত ও সমালোচিত হইয়া থাকে।

কুলকামিনীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে আবরণীয়। সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে কঞ্চুক-ধারণ যে কত আবশ্যক, তাহা "পাংশুলপাদ হালিক"ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। বাঙ্গালী পণ্ডিতের গাত্রে জামা দেখিলে, কেহ কেহ তীব্র মন্তব্যপ্রকাশেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে জামা-ব্যবহারের পাপজনকতা কিছুই সমর্থিত হয় না। প্রত্যুত বৈধ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানসময়ে "কঞ্চুক"-ধারণ নিষিদ্ধ হওয়ায়, সময়ান্তরে ব্যবহারেরই "অভ্যনুজ্ঞা" বুঝা যায়।

"আত্মানং সততং গোপায়ীত"—এই শ্রুতিবাক্যেও সতত আত্মরক্ষার উপদেশ আছে। লৌকিক ও অলৌকিক উপায়ের দ্বারা দেহরক্ষাই এই বাক্যের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। কঞ্চুকের দ্বারা দেহ আবৃত থাকিলে, শীতবাতাদির আক্রমণ ও তন্নিবন্ধন ব্যাধির উৎপত্তি হয় না, ইহা প্রমাণসিদ্ধ। তবে যাঁহারা পণ্ডিতের দেহ 'অপার্থিব', অথবা 'তপোময়', কিংবা 'রক্ষার অযোগ্য' বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার নাই।

প্রাচীনকালে ঋতুভেদে বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্র ব্যবহার করিবার রীতি ছিল।

ঋতুভেদে বস্ত্রভেদ।

সুশ্রুতে (২০) শরৎকালে "অমল লঘু" (পাতলা) বস্ত্র, এবং গ্রীষ্মকালে অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা দেখা যায়। বর্ষাকালের জন্য এক প্রকার বস্ত্র ছিল; তাহা "বার্ষিক" (২১) নামে অভিহিত হইত। হেমন্ত ঋতুতে ব্যবহার্য্য বস্ত্র "হৈমন" নামে পরিচিত ছিল। ইহাদের পার্থক্য কিরূপ ছিল, তাহা বর্ত্তমান সময়ে বুঝিবার উপায় নাই। তবে "বার্ষিক" বস্ত্র বর্ত্তমান "ওয়াটার-প্রুফ" শ্রেণীর ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। কারণ, বর্ষাতে 'সাধু=উপযোগী',—এই অর্থে তদ্ধিত হইয়াছে; বর্ষার জল-নিবারণই মুখ্য উপযোগ।

---

(১৯) সচন্দনং বা কর্পূরং বা বস্ত্রমলিনং লঘু।—উত্তর তন্ত্র ৬৩ অ। ১৮।
ধর্মকালে বিবেকেন বাসাংসি শুক্লশুভ্রাণি। ৩০।

(২০) বর্ষাভ্যষ্ঠক্। পাঃ ৪।৩।১৮। বার্ষিকং বাসঃ। কাশিকা।

(২১) সর্বত্রাণ্ চ তলোপশ্চ। পাঃ ৪।৩।২২ হৈমনং বাসঃ। কাশিকা।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এক প্রকার "বহ্নি-শৌচ" (২২) বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়।

বহ্নি-শৌচ বস্ত্র।

এই "বহ্নিশৌচ" বা অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্র কি? গুপ্তবতী টীকায় মতে, "সর্ব্বদা অগ্নির মত নির্ম্মল", অথবা অগ্নি-প্রক্ষেপের দ্বারা যাহার মল দূর করা হয়। চতুর্ধুরী বলেন—"অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া যাহা নির্ম্মল হয়।" অথবা, অগ্নিই যাহার শৌচ অর্থাৎ নির্ম্মলকারী। নাগোজী ভট্টের মত চতুর্ধুরীর অনুরূপ। শংশোদ্ধারের মতও প্রায় ইঁহাদেরই তুল্য। "অগ্নির দ্বারা শৌচ" [বোধ হয়] "ইস্তিরী" করা, তদ্ব্যতীত আর কি শৌচ হইতে পারে? সুতরাং "ইস্তিরী" করিবার প্রথাও অতি প্রাচীন কালেই উদ্ভূত হইয়াছিল।

কাপড়ের উপরে সোনালী কাজের নৈপুণ্যও পুরাকালে উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

কাপড়ে সোনালী কাজ।

রাবণের (২৩) বিচিত্র সভার উত্তরচ্ছদে অর্থাৎ আবরণ-বস্ত্রে "রুক্মপট্ট" এই বিশেষণ দেখিয়া, উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। রুক্মপট্ট = স্বর্ণের কাজ করা কাপড়; তাহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

নিষাদ।

ঋগ্বেদে আর্য্যগণের প্রতিযোগী জনগণ ["অদেব" ও "অব্রত"] দস্যু বা দাস নামে অভিহিত। কিন্তু ঋগ্বেদে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অবলম্বন করিয়া, দস্যু বা দাসগণ যে মানবজাতির কোন্ শাখাভুক্ত ছিল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। বৈদিক দস্যুদিগের বর্ত্তমান বংশধরগণের আকৃতির হিসাবে তাহাদের উৎপত্তি বিচার করা যাইতে পারে। কিন্তু ঋগ্বেদোক্ত দস্যু বা দাসগণের বর্ত্তমান বংশধর যে কাহারা, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন, বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠিত হইলে, দস্যু বা দাসগণ শূদ্র বর্ণে পরিণত হইয়াছিল। "আর্য্য" নামক প্রথম প্রস্তাবে দেখাইয়াছি, "আদৌ 'শূদ্র' শব্দে কোনও স্বতন্ত্র জাতি বুঝাইত না; দাস [slave] বুঝাইত।"

---

(২২) বহ্নিরপি দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী।

(২৩) বিরাজমানো বপুষা রুক্মপট্টোত্তরচ্ছদম্। রামায়ণ; যুদ্ধকাণ্ড ১১সং। ১৫।

(১) শূদ্র বর্ণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও, যখন দস্যু বা দাসগণ স্বতন্ত্র ছিল, তখনও আর্য্যসমাজে বহুসংখ্যক "দাস" বিদ্যমান ছিল। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে ঋষিরা আপনাদিগকে ["নৃবৎ"] দাস-সম্পন্ন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং "নৃবৎ" হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। (২) একটি ঋকে (৩) ঋষি গৌতম ["দাস-প্রবর্গম্"] বহু-দাস-বিশিষ্ট ধন প্রার্থনা করিয়াছেন; আর একটি ঋকে (৪) এক জন ঋষি দাস সহিত ["সদাসাঃ"] একখানি রথ চাহিয়াছেন। এক স্থানে (৫) ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি দাসের ন্যায় ["দাসো ন"] বরুণের সেবা করিতে চাহেন। আর এক জন ঋষি অগ্নির নিকট শত দাস ভিক্ষা করিয়াছেন। (৬) ঋগ্বেদীয় আর্য্যসমাজের এই দাসগণের সকলেই দস্যুবংশীয় ছিলেন, এরূপ মনে করা যায় না। তখনকার সমাজে দস্যুবংশীয় দাস থাকার সম্ভাবনা যত, আর্য্যবংশীয় দাস থাকারও সম্ভাবনা তত। আর্য্য ও দস্যুর মধ্যে যেরূপ বিরোধ ছিল, বিভিন্ন শ্রেণীর আর্য্যগণের মধ্যেও তেমনই বিরোধ ছিল; এবং বিজিত ও সমরক্ষেত্রে ধৃত শত্রুকে দাসে পরিণত করার প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। সুতরাং আদিম শূদ্রগণকে ঋগ্বেদোক্ত দস্যুগণের বিশুদ্ধশোণিতসম্পন্ন বংশধর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

ঋগ্বেদোক্ত দস্যুগণ তবে কোন বর্ণ বা জাতি-রূপে পরবর্ত্তী বৈদিক সমাজে স্থান লাভ করিয়াছিল? ঋগ্বেদে "পঞ্চজনাঃ" উল্লিখিত হইয়াছে। যাস্ক "পঞ্চজনে"র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (৩৮)—

"গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসীত্যেকে, চত্বারো বর্ণা নিষাদঃ পঞ্চম ইত্যৌপমন্যবঃ।"

কেহ কেহ বলেন, "পঞ্চজন" শব্দের অর্থ,—গন্ধর্ব্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ, এবং রাক্ষসগণ। ঔপমন্যব বলেন,—"পঞ্চজন" শব্দের অর্থ,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণ, এবং পঞ্চম নিষাদ জাতি।

শৌনকের "বৃহদ্দেবতা"র (৭।৬৮—৭২) "পঞ্চজনে"র অর্থ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি মত উদ্ধৃত হইয়াছে। শৌনক বলেন,—যাস্ক ও ঔপমন্যবের মতে, "পঞ্চজনাঃ"র অর্থ—মনুষ্যগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সর্প ও রাক্ষসগণ, এবং

"নিষাদপঞ্চমান্ বর্ণান্ মন্যন্তে শাকটায়নঃ।"

---

(১) "সাহিত্য" ২৩শ ভাগ (১৩১৯), ৫৭৮ পৃঃ।
(২) ১।৯২।৭; ৫।১৮।৫; ৮।১৯।১০ ইত্যাদি। (৩) ১।৯২।৮ (৪) ৩।৫৩।৯ (৫) ৭।৮৬।৭
(৬) ৮।৫৬।৩।

এবং "শাকটায়ন" মনে করেন,—"পঞ্চজনাঃ"র: অর্থ, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ, এবং পঞ্চম "নিষাদ জাতি"। যাস্ক (১০।৩৫,৭) ঋক্ দুই টি ঋকের ব্যাখ্যায় "পঞ্চকৃষ্টী"র অর্থ লিখিয়াছেন,—"পঞ্চ মনুষ্যজাতানি"। তাহার ব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য্য "পঞ্চ মনুষ্যজাতানি"র অর্থ লিখিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণপ্রমুখান্ নিষাদপঞ্চমান্ বর্ণান্।" সুতরাং ঋষিগণ "পঞ্চজনাঃ" বা "পঞ্চকৃষ্টী" যে অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকুন, প্রাচীন বেদব্যাখ্যাতৃগণ নিষাদকেই বৈদিক যুগের পঞ্চম বর্ণ বা পঞ্চম জাতি বলিয়া মনে করিতেন। যজুর্বেদের "রুদ্রাধ্যায়ে" (তৈ, সং, ৪।৫।৪) নিষাদ জাতির প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারীকে তিন রাত্রি ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে, তিন রাত্রি বৈশ্যগণের মধ্যে, এবং তিন রাত্রি নিষাদগণের মধ্যে বাস করিতে হইত। (৭)কাত্যায়ন (২২।৩০) নিষাদের লক্ষণ লিখিয়াছেন.—

"গ্রাম্যভোজনং নিষাদানাং মৃন্ময়পানং চ।"

"নিষাদগণ অসভ্যের খাদ্য খায়, এবং মাটীর ভাণ্ডে জল পান করে।"

অধিকারিনিরূপণ প্রসঙ্গে কাত্যায়ন (১।১২) লিখিয়াছেন—

"নিষাদস্থপতির্গাবেধুকেঽধিকৃতঃ।"

নিষাদজাতীয় অধিপতির (স্থপতির) বন্য গোধূমের চরুর দ্বারা যজ্ঞ করিবার অধিকার আছে।

এই সূত্রের ভাষ্যে কর্ক এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"যস্য রুদ্রঃ পশূন্ শময়েৎ স বাস্তমধ্যে রৌদ্রং গাবেধুকং চরুং নির্বপেদিতি। ......এতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েদিতি।"

রুদ্র যাহার পশু সকল নাশ করেন, সে বসতবাড়ীতে বন্য গোধূমের চরুপাক করিয়া, রুদ্রের উদ্দেশ্যে যাগ করিবে। ......নিষাদজাতীয় স্থপতি এই যজ্ঞ করিবে।

মূলের "নিষাদ-স্থপতি" সম্বন্ধে তর্ক উঠিয়াছে,—এই পদের অর্থ "নিষাদগণের স্থপতি (অধিপতি)" না "নিষাদজাতীয় স্থপতি"? শেষোক্ত ব্যাখ্যার অনুকূলে কর্ক লিখিয়াছেন,—"নিষাদদ্রব্যং হি দক্ষিণা শ্রূয়তে। কূটং দক্ষিণা কাণো বা গর্দ্দভ ইতি।" অর্থাৎ, নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতির বচনে নিষাদের দ্রব্যই দক্ষিণাস্বরূপ বিহিত হইয়াছে৷ "(এই ইষ্টির) দক্ষিণা, পশুবন্ধনের জাল বা ফাঁদ (কূট) (৮) অথবা কাণা গাধা।" মীমাংসাসূত্রের ভাষ্যে (৬।১।৫২) শবর "কূটং দক্ষিণা" এই

(৭) তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, ১৬।৬।৭; কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র, ২২।২৩—২৯।

(৮) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বিদ্যারত্নের উপদেশানুসারে অনূদিত হইল।

শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—"ইতি নিষাদস্য দ্রব্যং দর্শয়তি। কূটং হি নিষাদানামেবোপকারকং ন আর্য্যানাম্।" অর্থাৎ, 'কূট দক্ষিণা' এই বাক্যে নিষাদের দ্রব্যই উল্লিখিত হইয়াছে। কূট বা পশুবন্ধনের জাল নিষাদগণের উপকারক বা প্রয়োজনীয়, আর্য্যগণের নহে।

এই সকল বচন-প্রমাণ হইতে দেখা যাইবে, বৈদিক যুগে নিষাদগণ আর্য্য-নিবাসের নিকটে স্বতন্ত্র ভাবে স্বজাতীয় অধিপতিগণের অধীনে বাস করিত। ফাঁদ পাতিয়া পশুবন্ধন ইহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। ব্রাহ্মণেরা নিষাদ-জাতীয় অধিপতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত রৌদ্রযাগে ঋত্বিকের কার্য্য করিতেন, এবং ফাঁদ বা কাণা গাধা দক্ষিণাস্বরূপ লাভ করিয়াই তৃপ্ত হইতেন। যখন সুসভ্য আর্য্য ও অসভ্য নিষাদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল, তখন নিষাদজাতীয় সর্দ্দারগণকে সহজে বশীভূত করিবার জন্য এইরূপ যজ্ঞ ও এইরূপ দক্ষিণা বিহিত হইয়া থাকিতে পারে।

পুরাণোক্ত বেণরাজার উপাখ্যানে নিষাদগণের আকৃতিপ্রকৃতির উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বেণরাজা বৈদিক যাগযজ্ঞের একান্ত বিরোধী ছিলেন। এই নিমিত্ত ঋষিগণ তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। তখন পৃথিবীতে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।

"ততঃ সংমন্ত্র্য তে সর্ব্বে মুনয়স্তস্য ভূভৃতঃ।
মমন্থুরূরুং পুত্রার্থম্ অনপত্যস্য যত্নতঃ॥
মথ্যতশ্চ সমুত্তস্থৌ তস্যোরোঃ পুরুষঃ কিল।
দগ্ধস্থূণাপ্রতীকাশঃ খর্ব্বটাস্যোঽতিহ্রস্বকঃ॥
কিং করোমীতি তান্ সর্ব্বান্ বিপ্রান্ প্রাহ ত্বরান্বিতঃ।
নিষীদেতি তমূচুস্তে নিষাদস্তেন সোঽভবৎ॥
ততস্তৎসম্ভবা জাতা বিন্ধ্যশৈলনিবাসিনঃ।
নিষাদা মুনিশার্দ্দূল পাপকর্ম্মোপলক্ষণাঃ॥ (১)

তার পর মুনিগণ মন্ত্রণা করিয়া পুত্র-উৎপাদনের জন্য সেই অপুত্রক রাজার উরু মর্দ্দন করিয়াছিলেন। তাহার মথিত উরু হইতে দগ্ধ স্তম্ভের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, চিপিট-নাসিকা ও বদনবিশিষ্ট খর্ব্বকায় এক জন পুরুষ উত্থিত হইলেন; সেই পুরুষ জত বিপ্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি করিব?" তাঁহারা বলিলেন, উপবেশন কর। [নিষীদ]; এই জন্য সে 'নিষাদ' হইল। হে

(১) বিষ্ণুপুরাণ ১।১৩।৩৩—৩৬

মুনিশার্দ্দূল! বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী পাপকর্ম্মের চিহ্নে চিহ্নিত নিষাদগণ তাহার বংশধর।"

ভাগবতপুরাণোক্ত বেণোপাখ্যানে নিষাদের এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় (৪।১৪।৪৪)—

"কাককৃষ্ণোঽতিহ্রস্বাঙ্গো হ্রস্ববাহুর্ম্মহাহনুঃ।
হ্রস্বপান্নিম্ননাসাগ্রো রক্তাক্ষস্তাম্রমূর্দ্ধজঃ॥"

পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে (২৭।৪২—৪৩) নিষাদের বংশধরগণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে —

"পর্ব্বতেষু বনেষেব তস্য বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
নিষাদাশ্চ কিরাতাশ্চ ভিল্লানাহলকাস্তথা।
ভ্রমরাশ্চ পুলিন্দাশ্চ যে চান্যে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥"

বায়ুপুরাণে—উক্ত হইয়াছে (৬২।১২৩—১২৪)—

"নিষাদবংশকর্ত্তাঽসৌ বভূবানন্তবিক্রমঃ।
ধীবরানসৃজৎ সোঽপি বেণকল্মষসংভবান্॥
যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়াঃ বর্ব্বরা স্তুবরাঃ খসাঃ।
অধর্ম্মরুচয়শ্চাপি সংভূতা বেণকল্মষাৎ॥"

বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী বর্ব্বর জাতিনিচয়কে কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি ও চিপিট-নাসিকা-মুখসম্পন্ন নিষাদের বংশধর বলিয়া গণনা করিয়া, পুরাণকারগণ সুন্দর নৃতত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মধ্য-ভারতের পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী ভিল, গোন্দ, ওরাঁও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, শবর, জুয়াং, খন্দ প্রভৃতি জাতি আকারে এখনও অনেকটা পৌরাণিক নিষাদের সদৃশ। সুতরাং আকৃতির হিসাবে, এই সকল জাতিকে একবংশোদ্ভব মনে করা বিজ্ঞানসম্মত। বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে নিষাদ জাতির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা একত্র পাঠ করিলে অনুমান হয়, নিষাদাকৃতি মনুষ্যগণই আর্য্যাবর্ত্তের আদিম অধিবাসী ছিল। আর্য্য ঔপনিবেশিকগণ ইহাদিগকে হয় বশীভূত ও অন্ত্যজ জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন, না হয় সন্নিহিত আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাপথের দ্রাবিড়ভাষাভাষী পনিয়ান, কাদির, কুরুম্বা, সোলাগা, মলবেদর, ইরুলা, কণিকর প্রভৃতি জাতিও আকারে বিন্ধ্যবাসী ভিল, গোন্দ প্রভৃতির অনুরূপ। সুতরাং ইহাদিগকেও নিষাদবংশীয় মনে করা যাইতে পারে। সার হার্বার্ট রিস্লি মধ্যভারতের ও দাক্ষিণাপথের পার্ব্বত্য প্রদেশের এই সকল বর্ব্বর অধিবাসিগণকে সুসভ্য তামিল, তেলুগু, কর্ণাড় ও মলয়ালম্-ভাষাভাষী জনগণের সঙ্গে একই আকৃতিক জাতির (physical type) সামিল বলিয়া গণনা করিয়াছেন, এবং এই আকৃতিক জাতির নাম দিয়াছেন,—

"দ্রাবিড়-আকৃতি" (Dravidian Type)। রিস্‌লি তাঁহার "The People of India" গ্রন্থের চতুর্থ পরিশিষ্টে (Appendix IV, p. cxiii) এই দ্রাবিড় শাখার বিভিন্ন জাতির লোকের নাসিকার ও দেহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণফলের যে সারাংশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এরূপ শ্রেণীবিভাগ যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। এই তালিকার পেরিয়া ও ইরুলার মধ্যে একটি রেখা টানিয়া, রেখার উপরে উল্লিখিত সুসভ্য দ্রবিড়ভাষাভাষী জাতিনিচয়কে এক শ্রেণীতে, এবং নীচে উল্লিখিত বর্ব্বর আরণ্যক জাতিনিচয়কে স্বতন্ত্র এক শ্রেণীতে গণনা করিতে প্রবৃত্তি হয়। তুলনার জন্য নাসিকার উচ্চতা ও প্রশস্ততার অনুপাত (১০) বা নাসিকার অনুপাত ও দেহের দৈর্ঘ্য এ স্থলে বিবেচ্য। রেখার উপরিভাগে উল্লিখিত জাতিনিচয়ের নাসিকার গড় অনুপাত ৬৯.১ হইতে ৮০র মধ্যে ; এবং নীচে উল্লিখিত জাতিনিচয়ের নাসিকার গড় অনুপাত ৮০.৯ হইতে ৯৫.১এর মধ্যে। ইহার তাৎপর্য্য, উপরের শ্রেণীতে যেরূপ নাসিকা সর্ব্বাপেক্ষা চিপিট বা স্থূল বলিয়া গণ্য, নীচের শ্রেণীতে সেইরূপ নাসিকাই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। সুতরাং নাসিকার হিসাবে এ স্থলে শ্রেণীবিভাগ আবশ্যক। এরূপ শ্রেণীভেদ সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে, নাসিকার এই আকারভেদ জাতি বা বংশভেদজনিত নহে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেদজনিত। উত্তরে বক্তব্য এই যে, (১১) নীলগিরি পর্ব্বতে একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ইরুলা, কুরুম্বা, টোডা,

(১০) *Nasal height*—anatomical landmarks : (i) above, the *nasia* ; (ii) below, the nasal septum, at its union with the upper lip (deep pressure is not to be exerted in making the measurement). *Nasal width*—the outer surface of the ala of the nose on each side The maximum width to be measured without pressure on the nose Nasal index (নাসিকার অনুপাত) $\frac{\text{width} \times 100}{\text{height}}$ Instrument—Flowers, callipers.

(১১) Thurston is *Castes and Tribes of Southern India*, Vol. I. p. xxxiii.

কোটা ও বদগা জাতি বাস করিয়া আসিতেছে। অথচ ইরুলা ও কুরুম্বাগণের নাসিকা একান্ত স্থূল, কিন্তু টোডা, কোটা ও বদগাগণের নাসিকা সভ্য দ্রাবিড়গণের নাসিকার ন্যায় মধ্যমাকার। (১১) আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে পাসি, চামার, মুসাহার ও অন্যান্য জাতি একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছে। কিন্তু পাসি, চামার ও মুসাহারগণের নাসিকা স্থূল, অথচ অন্যান্য জাতির নাসিকা মোটের উপর সূক্ষ্ম বা মধ্যমাকার। সুতরাং এ স্থলে আকৃতিভেদ পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদ-জনিত, মনে করা যায় না। ইরুলা,

কুরুখা, সাঁওতাল, ভিল প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বাকার, চিপিটনাসিক পার্ব্বত্য জাতিনিচয়কে সুসভ্য তামিল তেলুগুগণ হইতে স্বতন্ত্রবংশোদ্ভব বলিয়া গণনা করাই সঙ্গত। রিস্‌লি ব্যতীত অন্যান্য পাশ্চাত্য নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাই করিয়া থাকেন, এবং ইরুলা, ভিল প্রভৃতি জাতিনিচয়কে প্রাক্-দ্রাবিড় (Pre-Dravidian) নামক স্বতন্ত্র-আকৃতিক জাতির মধ্যে গণনা করেন। প্রাক্‌দ্রাবিড় অপেক্ষা বৈদিক ও পৌরাণিক "নিষাদ" সংজ্ঞাই আমার সমীচীনতর বোধ হয়। সুতরাং

"কাককৃষ্ণোঽতিহ্রস্বাঙ্গো হ্রস্ববাহুর্মহাহনুঃ
হ্রস্বপাদ্রিম্ননাসাগ্রো"

ভারতবর্ষীয় অধিবাসিগণকে "নিষাদ জাতি" (Nisada Race) বলিয়া অভিহিত করিব।

ভারতবর্ষের বাহিরে সিংহলের বেদ্দাগণ এবং মলয় উপদ্বীপের সকাই ও সেমাঙ প্রভৃতি জাতি নিষাদাকৃতি। (১২) ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে নিষাদ জাতির আরও দূরবর্ত্তী জ্ঞাতিগণের ও ইহাদের আদিমবাসভূমিরও কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালের নিষাদগণ তিনটি পৃথক্ শ্রেণীর ভাষা ব্যবহার করে। সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর প্রভৃতি "মুণ্ডা"-শ্রেণীভুক্ত ভাষা ব্যবহার করে; ভিলেরা আর্য্য ভাষা ব্যবহার করে; এবং গোন্দ, খণ্ড, ইরুলা প্রভৃতি জাতি "দ্রাবিড়" শ্রেণীর ভাষানিচয় ব্যবহার করে। মুণ্ডা শ্রেণীর ভাষাই নিষাদ শ্রেণীর আদিম ভাষা, এবং আর্য্য ও দ্রাবিড় ভাষা এই শ্রেণীর কোনও কোনও জাতি সভ্যতর প্রতিবেশিগণের নিকট হইতে ধার করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আসামের খাসিয়া পাহাড়ের খাসিয়াগণের ভাষার সহিত মুণ্ডা ভাষার সম্পর্ক লক্ষিত হয়, এবং ডাক্তার স্টেন কনো দেখাইয়াছেন,—পঞ্জাবের অন্তর্গত কুনাওয়ার হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত বিস্তৃত হিমালয় প্রদেশে কথিত অনেক তিব্বতী-ব্রহ্ম শ্রেণীর ভাষায় মুণ্ডা শ্রেণীর কোনও প্রাচীন ভাষার চিহ্ন অদ্যাপি লক্ষিত হয়। সুতরাং এক সময় হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত এবং পঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত ভূভাগ যে মুণ্ডাভাষাভাষী নিষাদগণ কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। মুণ্ডা ভাষার সহিত নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণের ভাষার, মলয় উপদ্বীপে কথিত মন্‌খমের শ্রেণীর ভাষার, এবং পলং, ওয়া, রিয়াং, লকাই, সেমাং প্রভৃতি জাতির কথিত ভাষানিচয়ের সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। স্মিথ নামক এক জন পণ্ডিত এই সুবৃহৎ ভাষা-

(১২) *Man*, vol. VII, No. 107; J. R. A. S., 1907, pp. 187—191.

গোষ্ঠীকে "অষ্ট্রো-এসিয়াটিক্" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন, এবং যাহারা এই সকল ভাষা ব্যবহার করে, তাহাদিগকে "অষ্ট্রো-এসিয়াটিক জাতি" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্মিথ অনুমান করেন, ভারতবর্ষই এই জাতির আদি-নিবাস-ভূমি।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

সিন্ধু-সঙ্গীত।

১

আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে ?
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে ?
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন,
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন ?
সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করিছে আকুল।
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী
তব গীতে ওগো সিন্ধু ! দিবস যামিনী !

২

তোমায় আমায় যোগ ওগো পারাবার !
কোন্ দেশে কোন কালে কোন পরপার
উদারা মুদারা তারা বল কোন গ্রামে ?
কোন মহাশব্দের কোন নিত্যধামে ?
কোন সঙ্গীতের কোন্ রাগিণীর প্রাণে ?
কোন সুরে, কোন তালে, কোন মহাগানে ?
অনাদি অনন্ত নিত্য মহাপ্রাণ হ'তে
দু'জনে এসেছি যেন দুটি প্রাণ-স্রোতে !
তার পর কতবার জনমে জনমে
আমরা মিলেছি দোঁহে মরমে মরমে,
কতবার ছাড়াছাড়ি, মিলেছি আবার
তুমি আর আমি আজ ওগো পারাবার !

তুমি ভেসে যাও সখা! অনন্তের পানে,
আমি যে ভেসেছি শুধু তোমারি এ গানে!

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্যের উপাদান।

আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক পত্রে সাহিত্যের উপাদান (The Elements of literature) শীর্ষক একটি সুন্দর সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সন্দর্ভ অবলম্বনে মার্কিণের অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক-পত্রে আলোচনা চলিতেছে। লেখক অধ্যাপক হর্টন (Proff. Horton) বলেন যে, নিম্নলিখিত কারণেই সাহিত্যের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়া থাকে :—

(১) ধর্ম্ম না থাকিলে সাহিত্য হয় না। পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির সাহিত্যের বনীয়াদ ধর্ম্ম। সকল দেশের সকল সাহিত্যের মূলে ধর্ম্ম আছেই।

(২) সাহিত্যের পুষ্টি ও বিবৃতি ঘটে Mysticism and Transcendentalism অর্থাৎ অজ্ঞেয়তাবাদে ও পরাতত্ত্ববাদে। এমন কি, প্রণয়ের কথাতেও তখন অজ্ঞেয়তবাদ ও পরাতত্ত্ববাদ যেন জড়ান মাখান থাকে।

(৩) বিলাস ও দেহাত্মবাদ (Materialism) প্রবল হইলে সাহিত্যের অবনতি ঘটে। দেহাত্মবাদ প্রবল হইলে সে জাতির মধ্যে উচ্চাঙ্গের কাব্য-সৃষ্টি হয় না। ইংলণ্ডের শেষ কবি টেনিসন্; তাহার পর কেবল খুচরা কবির সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল কবি কেবল গীতিকাব্য রচনা করিয়া শ্রান্ত হইতেছেন।

(৪) সাহিত্যে সংরক্ষণের (Conservation) চেষ্টা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে। যখন নূতন সৃষ্টি হয়, তখন ঘর গোছাইবার অবসর থাকে না। মিল্টন বেকনের সময়ে কয়খানা Encyclopædia বা বিশ্বকোষের সৃষ্টি হইয়াছিল? আর এখনই বা এত কেন? এখন সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে একটা করিয়া বিশ্বকোষের সৃষ্টি হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই, এখন আর নূতন সৃষ্টি হইতেছে না, যাহা পুরাতন আছে, তাহা সাম্লাইবার কাল আসিয়াছে।

(৫) সাহিত্যে বিভীষিকা সাহিত্যের অবনতির একটি প্রধান কারণ।

আশা ও আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয় না। যতদিন মানুষ ভবিষ্যতের অজ্ঞেয় যবনিকা ভেদ করিতে চেষ্টা করিবে, ততদিন কাব্যের সৃষ্টি ও সাহিত্যের পুষ্টি হইবে। কিন্তু যে দিন হইতে মানুষ ইহকাল লইয়া ব্যস্ত থাকিবে, পরকালের ভাবনা ভাবিতে গেলেই ভয়ে শিহরিয়া উঠিবে, সেই দিন হইতে জাতির সাহিত্যের অবনতির সূত্রপাত হইবে। ইউরোপের তথা মার্কিণের সাহিত্যে এই বিভীষিকার ভাব প্রবেশ করিয়াছে ; সাহিত্যেও অপচয় ঘটিতেছে। জীবনের প্রধান বিভীষিকা, মৃত্যু। মরণ আছে বলিয়াই আমরা ভয় পাই। মরিতে না হইলে আমরা কিছুতেই ভীত হইতাম না। মরণ-ভয়ই সকল ভয়ের মূল। ধর্ম্ম ও সাহিত্য এই মরণ-ভয়কে ছোট করিয়া দেয় ; মরণের পরপারে একটা ভাব-জগতের সৃষ্টি করিয়া, মরণকে নব-জীবনের দ্বারস্বরূপ করিয়া, মৃত্যুর বিভীষিকাকে অতি ক্ষুদ্র করিয়া দেয়। কিন্তু মানুষ যখন দেহ-সুখী হয়, ভোগায়তন দেহের তুষ্টি পুষ্টিতে বিব্রত থাকিয়া মানুষ যখন অতীত ও অনাগতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে, তখনই এই বিভীষিকা নানা আকারে তাহাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সাহিত্যে এই বিভীষিকা একবার প্রবেশ করিলে পরে আর কখনই প্রতিভার বিকাশ হয় না। প্রতিভার দামিনী-দীপ্তি না থাকিলে সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি আর হয় না। নূতন সৃষ্টি না হইলে সাহিত্য শুষ্ক হইয়া যায়।

এই পাঁচটি সিদ্ধান্ত ছাড়া লেখক আর একটা নূতন কথা কহিয়াছেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি জাপানী, চীনে, ভারতবাসী ও তুর্কী ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। তিনি তাঁহাদের মনীষার উন্মেষভঙ্গী দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,—আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা do not co-ordinate with the genius of the East—প্রাচী-সংস্কারের সমবায়ী নহে। অর্থাৎ, প্রাচ্য প্রকৃতির অনুকূল নহে। এ শিক্ষা ও সভ্যতা অবলম্বনে প্রাচ্যজাতি সকল কেবল অনুচিকীর্ষু হইয়া পড়িবে—কেবল পাশ্চাত্যগণের নকলনবীশ হইবে। ফলে, উহাদের National individualism বা জাতিগত বিশিষ্টতা নষ্ট হইবে। জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতা অবলম্বন করিয়া প্রবল হইয়াছে বটে ; পরন্তু জাপানের যাহা নিজস্ব ছিল—যে সৌন্দর্য্যলিপ্সা ও মাধুর্য্য-উপভোগসামর্থ্য, যে কোমলতা ও স্বজনপরায়ণতা নিজস্ব ছিল—তাহা হারাইতেছে। নিজস্ব সর্ব্বস্ব হারাইতেছে বলিয়াই, জাপান রণবিজয়ী হইলেও, জাতির পুরাতন সাহিত্যের পুষ্টি করিতে পারিতেছে না। সুতরাং বলিতে হয় যে, জাপানের জাতিগত বিশিষ্টতা দীর্ঘকাল

স্থায়ী হইবে না। যদি এই পাশ্চাত্য সভ্যতার সজ্মাতে জাপানে পুরাতন ও সনাতন সাহিত্যের পারম্পর্য্য বজায় রাখিয়া এক নূতন ও প্রবল সাহিত্যের ও ধর্ম্মের উদ্ভব হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, জাতির মেদমজ্জার সহিত এই পাশ্চাত্য সভ্যতা মিশিয়া গিয়াছে। তাহা যখন ঘটে নাই, ঘটিবার কোনও উপক্রম দেখিতেছি না, তখন হয় বলিতে হইবে যে জাপানের অঙ্গে এই পাশ্চাত্য সভ্যতা পাত্‌লা এক পোঁছ পালিশ্‌ মাত্র; নহে ত বলিতে হইবে, জাপান 'কাচমূল্যে কাঞ্চন বেচিয়াছে'। উহার জাতিগত বিশিষ্টতা চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়াছে। চীনের ভাগ্যও যে জাপান অপেক্ষা ভাল হইবে, এমনও বলা যায় না। ইহারা সবাই পাশ্চাত্য সভ্যতা অবলম্বন করে বিলাসের খাতিরে, সর্ব্বশক্তিমান ডলার বা অর্থের অন্বেষণে, কদাচিৎ বা ইংরেজের সহিত সমকক্ষতা করিবার চেষ্টায়। এমন হীন উদ্দেশ্যে (culture for such serdid ends) শিক্ষা ও সাধনা কখনই সার্থক হয় না। উহার ফল বিষম হইবেই। এই হেতু অধ্যাপক বলেন যে, প্রাচ্যগণকে পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়া ঠিক নহে।

এডিসনের মত।

ম্যাকিণের বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্‌ ও তড়িদ্বিদ্যাবিশারদ এডিসন সাহেবকে এই সম্পর্ক অবলম্বনে একটা মত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি বলেন যে, "মিল্‌টন, বেকন, দান্তে, সেক্সপীয়রের সাহিত্য যাহা করিবার, তাহা করিয়াছে। যে মানবতার উন্মেষ ঘটাইলে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্ভবপর হয়, তাহা মিল্টন বেকন প্রমুখ প্রতিভাশালী কবিগণ করিয়া গিয়াছেন। এখন সে প্রয়োজন নাই, তাই তেমন কবি ও লেখক জন্মগ্রহণ করিতেছে না। ইহা ভাবের যুগ নহে, খেয়াল-কল্পনার যুগ নহে; ইহা কর্ম্মযুগ, আবিষ্কারের যুগ—প্রকৃতি-দেবীর অবগুণ্ঠন-মোচনের যুগ। এখনকার সাহিত্য পদার্থতত্ত্ব লইয়া পূর্ণ থাকিবে। এখনকার কবিতা কল্পনা নহে; যাহা দেখিতেছি, বুঝিতেছি, শুনিতেছি, তাহারই বর্ণনা। এখনকার সাহিত্য স্পষ্ট জগতের চাতুরী-বিকাশে প্রমত্ত থাকিবে। মিল্টন, চসারের মাপকাঠিতে এখনকার সাহিত্য মাপিলে চলিবে না। সাহিত্য জাতির প্রকৃতির পরিচায়ক; জাতির যেমন প্রকৃতি হইবে, সাহিত্যও সেই আকার ধারণ করিবে। সে জন্য চিন্তা করিতে নাই, বিহ্বল হইতে নাই। তবে জাতির উত্থান পতন যে বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সে বিধি মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। সুতরাং তাহার জন্যও চিন্তিত হইতে নাই। তবে ইহা আমি স্বীকার করি যে, সাহিত্যে বিভীষিকা জাতির অধঃপতনের লক্ষণ বটে।

চীন জাপানের কথা তুলিয়া অধ্যাপক যাহা বলিয়াছেন, তাহার উত্তরে আমি এই বলিতে পারি যে, খৃষ্টান ইউরোপ খৃষ্টানী সভ্যতা এসিয়া মহাদেশ হইতে পাইয়াছিল; মানব সারাসেন ও আরব সভ্যতার কাছে সভ্যতার বর্ণপরিচয় করিয়াছিল; অথচ ইউরোপ এই পাঁচ শত বৎসরে একটা নিজস্ব সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। চীন ও জাপান সেই পন্থা অবলম্বন করিবে না, বা করিতে পারিবে না, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। পাশ্চাত্যগণ অপেক্ষা প্রাচ্য জাতি সকলের অধিকতর উপযোগিতা শক্তি-(adaptability) আছে। আমার মনে হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মাতে একটা অভিনব সভ্যতা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে। সে পক্ষে যিনি অন্তরায় হইবেন, তিনি মনুষ্যসাধারণের শত্রুতা করিবেন।"

এই Interview বা পরিচয়-বিবৃতি বোম্বাইয়ের কোনও একখানা দৈনিক কাগজে ছাপা হয়। আমি তাহারই সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের জ্যোতিষ।

ভারতবর্ষ, মিশর ও বাবিলোন প্রভৃতি দেশে যখন অতি প্রাচীন কালে মানব-সভ্যতা বিকশিত হইতেছিল, তখন দেশনিষ্ঠ প্রাকৃতিক অবস্থার ফলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করিতেছিল। বৈদিক যুগের গ্রন্থ পড়িয়া এইরূপ অনুমান হয় যে, যজ্ঞক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবার নিমিত্ত কতকগুলি নক্ষত্রের গণনা ব্যতিরিক্ত অন্য কোনরূপ জ্যোতিষী গণনার খুব অধিক ব্যাবহারিক প্রয়োজন ছিল না। অনেক বিষয়ের জ্ঞানেই ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তাড়নার অভাবে জ্যোতিষ সম্বন্ধে হয় ত বা এ দেশে মিশর কিংবা বাবিলোনের মত উন্নতি হয় নাই। যাহারা এ কালের জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং প্রাচীন সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের বিশেষ পরিচয় আছে, তাঁহারা এ বিষয়ের বিশেষ তথ্য নিরূপণ করিয়া আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন। স্বদেশ-প্রীতির প্রেরণায় অনেক সুযোগ্য ব্যক্তি এই ইতিহাসের কথা শুনাইতে গিয়া এত কাল্পনিক কথা বলিয়া থাকেন যে, আমরা যথার্থ ইতিহাসটুকু ধরিয়া উঠিতে পারি না।

সম্ভবতঃ যে যুগে রাশিচক্র প্রভৃতি বিষয়ে এ দেশে কাহারও কোনও প্রকার

জ্ঞান ছিল না, অনেকে সেই যুগের সাহিত্যের এমন রূপক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, যাহাতে সেই সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাদিগকেই রাশিচক্র হইয়া দাঁড়াইতে হয়! মহাভারত সম্বন্ধে এইরূপ হাস্যকর ব্যাখ্যা পড়িয়াছি। যাহাতে জ্যোতিষ-বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানের কথা লিখিত হইবার কথা, সেই জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থে যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলে, পুরাণের কিংবা গল্প-গ্রন্থের নিগূঢ় ব্যাখ্যা করিয়া সেই জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া চলে না। যদি জ্যোতিষের জ্ঞানের ধারাবাহিক উন্নতির ইতিহাস থাকিত, তাহা হইলে সাহিত্য এত অধিকপরিমাণে বুদ্ধির খেয়ালে রচিত জালে জড়িত হইত না। যে শ্রেণীর লোক ক্রমাগতই বুদ্ধি খাটাইয়া পুষ্পক রথের নাম অবলম্বনে প্রাচীন কালের ব্যোমযানের কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কেহ থামাইতে পারিবে না; তবে বিতণ্ডাবুদ্ধিবিরহিত পাঠকেরা অনেক শিখিতে পারিবেন, এবং অনেক ভ্রম হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন।

এ দেশে প্রাচীনকালে জ্যোতিষের কত উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে গোটাকতক গোড়ার কথা স্থির করিয়া লইতে হয়। কথাগুলি এই—সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই সেকালে ও একালে সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দেখিয়া কতকগুলি গণনা সহজেই হইতে পারিয়াছে। জ্ঞানের সূক্ষ্মতা ও উন্নতির বিচার করিতে হইলে দেখিতে হয় যে, সে সহজলভ্য তত্ত্ব-সংগ্রহের পর কি কারণে কোন্ জাতি কত অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের সহজদৃষ্টিতে যেগুলি ধরিতে পারা যায়, এমন গোটাকতক কথা বলিতেছি।

(১) জ্যোতিষ্কেরা অত্রির নয়নসম্ভূত কি না, অথবা ঐ কথাটার মধ্যে কোনও একটা নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতত্ত্ব লুকাইয়া আছে কি না, সে সকল কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া, এটুকু সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোনও মানবসমাজের বিবরণ পাওয়া যায় নাই, যাহাদের মধ্যে সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের সহিত পরিচয়ের অভাব জানিতে পারা গিয়াছে। অতি বর্ব্বরের নিকটেও জ্যোতিষ্কপুঞ্জ বিস্ময় ও ধ্যানের বিষয়। সূর্য্যের উদয় অস্ত হইতে দিবারাত্রির গণনা হয়; ঋতুভেদে উত্তাপের ন্যূনাধিক্য ঘটে, এবং ঋতুর গণনা হইতে বৎসর-গণনা আরব্ধ হয়। কাজেই সূর্য্যের পথ ও উত্তরায়ন, দক্ষিণায়ন প্রভৃতি অতি সহজে সকল জাতির মধ্যেই গণিত হইতে পারে, এবং হইয়াছে।

(২) অতি বর্ব্বরের নিকটেও চন্দ্রের গতি ও ক্ষয়-বৃদ্ধি সুস্পষ্ট হয়। পক্ষ ও মাসগণনাও অতি সহজ কথা। এই মাসগুলি লইয়া ঋতুর সহিত

ও সূর্য্যের অয়নের সহিত মিলাইতে গেলে ৩৬০ দিনের বৎসরে কুলায় না। ৩৬০ দিনের বৎসর-গণনায় অয়নের সহিত মিলাইতে গেলে, ৩৬০ দিনের বৎসর গণনার বিদ্যাকে জ্যোতিষ বলিয়া গৌরব করিতে গেলে, গদ্য না শিখিয়া গদ্যে কথা কহিবার ক্ষমতার গৌরবের মতই হয়। বৈদিক ও পৌরাণিক গণনায় আমরা অধিমাস ধরিয়া লইয়া ৩৬৫ দিনের হিসাব বজায় রাখিয়া আসিতেছি। এই ৩৬৫ দিনে বৎসর-গণনা অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে মিশরে প্রচলিত হইয়াছিল, এবং মিশরের জ্ঞান নিরপেক্ষভাবেই বাবিলোনেও প্রচলিত হইয়াছিল। বৈদিক গণনায়ও এই ৩৬৫ দিনের বিচার আছে; কিন্তু বৈদিক যুগের বয়স এখনও নির্ণীত হয় নাই।

(৩) যাহারা নিতান্ত অসভ্য অবস্থা হইতে একটু উন্নতিলাভ করিয়াছিল, এবং বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জ্যোতিষ্কপুঞ্জ দেখিতে দেখিতে উহাদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহারাই নক্ষত্রে নক্ষত্রে একটা প্রভেদ বুঝিতে পারিয়াছিল। নক্ষত্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, ওগুলি যেন ঠিক্ যথাস্থানে অবস্থিত থাকিয়া,অর্থাৎ relative position বজায় রাখিয়া চলিতেছে। অনুসন্ধানটা কিঞ্চিৎমাত্র সূক্ষ্ম হইবার পর ইহাও সহজে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল যে, গোটাকতক ক্ষেত্রের গতি সাধারণ রীতির অন্তর্ভুক্ত নহে। পাঁচটি তারার আপেক্ষিক অবস্থিতি সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। এই পাঁচটি মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি নামে অভিহিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর গণনা এখন সহজ মনে হইলেও, এক সময়ে উহা খুব সূক্ষ্ম গণনাই ছিল। প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র না পড়িলেও সাধারণ সাহিত্য হইতেই উহা সুস্পষ্ট হয়। ইতিহাসে পড়িয়া থাকি যে, মিশর ও বাবিলোনে এ জ্ঞান বহু পূর্ব্ব কাল হইতেই ছিল।

(৪) অন্যান্য নক্ষত্রগুলি স্থির থাকিলেও সাধারণ ভাবে তাহাদের গতি ও উদয় অস্ত লক্ষিত হয়। কোনও একটি বিশেষ নক্ষত্রের প্রতি যদি দৃষ্টি রাখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক মাস পূর্ব্বে যে নক্ষত্রটি যে সময়ে যেখানে উঠিয়াছিল, এক মাস পরে তাহার উদয়ে দুই ঘণ্টা প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দুটি ঘণ্টার প্রভেদ সহজেই লক্ষিত হয়। এই সময়টি ভাগ করিয়া ঠিক দৈনিক চারি মিনিটের প্রভেদ সুস্পষ্ট লক্ষিত না হইলেও, প্রভেদ ও পরিবর্ত্তনটুকু বুঝিতে গোল থাকে না। সকল প্রাচীন সভ্যজাতির মধ্যেই এই জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৫) এই গণনার একটু সূক্ষ্মতা হইতে এবং সূর্য্যের গতিপথের সহিত ঐ

নক্ষত্রগতি মিলাইতে গিয়া রাশিচক্রের গণনা হইয়াছে। এই রাশিগুলি গোলক চক্রপথে সমদূরবর্ত্তিরূপে স্থিত নহে; অর্থাৎ উহাদিগের দ্বারা আকাশপথটিকে সমান বারো ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায় না। এই রাশিচক্রের গণনা আমরা বিদেশ হইতে পাইয়াছি বলিয়া অনেক পণ্ডিতই বলিয়া থাকেন। সাহিত্যের মোটা বিচারে এ বিষয়ের যতটুকু সিদ্ধান্ত হইতে পারে তাহা এই প্রবন্ধেই করিব। চন্দ্রের অয়নপথ ধরিয়া যে ২৭টি নক্ষত্রের গণনা হইয়াছে, উহা এ দেশে খুব প্রাচীন। কিন্তু রাশিচক্রের নাম বহু প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, এ কথার বিচার পরে করিতেছি।

(৬) কলাক্ষয় ও কলাবৃদ্ধি দেখিয়া চন্দ্রকে জ্যোতিঃহীন ও সূর্য্যের আলোকে প্রদীপ্ত বলিয়া অতি প্রাচীন কালের সকল জাতিই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। কেহ কাহারও নিকট হইতে তত্ত্বটা ধার করিয়া লয় নাই। যে পক্ষে যেদিক হইতে সূর্য্যের আলোক পাইবার কথা, চন্দ্রের আলোকিত কলা সেই দিকে মুখ করিয়া থাকে; এটা সকলে সর্ব্বদা দেখিতে পাইত। কবি কালিদাসের মেঘদূতে আছে—প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।

(৭) চন্দ্রটিকে যদি কোনও এক সময়ে একটি নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রের কাছে দেখিবার পর উহার আপেক্ষিক অবস্থিতির বিচার করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রতিবারেই চন্দ্র সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। তাহার পর আবার ২৭ দিনের পর (২৭ দিন ৮ ঘণ্টা) চন্দ্রটি নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে প্রথম-পরিদৃষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্য্যবেক্ষণও খুব সাদা। মনে করুন, এই গণনাটা পূর্ণিমায় আরম্ভ করা গিয়াছিল; তাহা হইলে চন্দ্র যখন পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিল, তখনও উহার কলা পূর্ণ হয় নাই। সূর্য্য এই সময় যতটা পথ চলিয়া গিয়াছে, ততটা অগ্রসর হইতে, এবং পূর্ণ কলা পাইতে চন্দ্রের আরও দুই দিন লাগিবে। নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে চন্দ্রের এই স্থিতি-গণনাও বহু প্রাচীন কাল হইতে সকল সভ্য দেশেই হইয়া গিয়াছিল। সকল সভ্যদেশেই হইয়াছিল বলিলে এ কথা বুঝায় না যে, এ গণনায় সূক্ষ্মতা নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক গণনা অপেক্ষা এ গণনায় পরিদর্শন-ক্ষমতা বেশী লক্ষ্য করা যায়।

(৮) গ্রহণ-গণনার সহিত সপ্তম তত্ত্বটির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে চন্দ্রের প্রত্যাগমনে ২৭⅓ দিন লাগে; কিন্তু সূর্য্যের প্রায় ৩৪৭ দিন লাগে; অর্থাৎ, চন্দ্রের ২৪২ বার প্রত্যাগমনের সময়ে সূর্য্যের প্রত্যাগমন ১৯ বার মাত্র হয়। কেবলমাত্র গ্রহণ দর্শন করিয়া এই গণনার সহিত মিলাইয়া

লইয়াই প্রাচীন কালে ভবিষ্যৎ গ্রহণ-গণনা সুসাধ্য হইয়াছিল। কেবলমাত্র গ্রহণ দেখিয়া গ্রহণ-গণনার কথা অপেক্ষাকৃত সহজ। গ্রহণের কারণ বুঝিতে না পারিলেও গ্রহণ দেখা অসভ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। চন্দ্রগ্রহণ অপেক্ষা সূর্য্যগ্রহণ অবশ্য সহজে উপলব্ধ হয়। সময়ে সময়ে গ্রহণ দর্শন করিয়া লোকে যে ভীত ও বিস্মিত হইত, এ কালেও সে কথা এ দেশে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। কয়েকবার গ্রহণ দেখিবার পরই যে দিন গ্রহণ হয়, লোকে সে দিন বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিত। একটি মনুষ্যের পক্ষে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত এই গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ অত্যন্ত সম্ভব হইলেও, পরিদর্শন-ক্ষমতা ও কৌতূহল বেশী জাগিয়া না উঠিলে কেহই গণনা করিতে পারেন না। আজিকার দিনে যে প্রকার গ্রহণ দেখা গেল, আঠার বৎসর দশ দিন পরে প্রায় ঠিক সেই প্রকার গ্রহণ দৃষ্ট হয়। একবার এটা ধরিয়া ফেলিয়া গণনা করিলে, গণনাটা প্রায়শঃ নির্ভুল হওয়া সম্ভব।

(৯) এই মোটামুটি গ্রহণ-গণনার বিস্তার সহিত চন্দ্র সূর্য্যের প্রত্যাগমনের যে কালের কথা বলিয়াছি, তাহা মিলাইয়া লইলে, গণনা সহজ হইয়া পড়ে। তাহার উপর আবার চন্দ্র-গ্রহণ পূর্ণিমায় ও সূর্য্য-গ্রহণ অমাবস্যায় দেখিয়া নূতন কথারও আবিষ্কার হইতে পারে। ভূ-ভ্রমণবাদ জানা না থাকিলেও সাধারণ গণনাগুলিতে কোনও বাধা উপস্থিত হয় না। চন্দ্র ও সূর্য্য পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। উহাদের যখন গতিবৈষম্য আছে, তখন দুইটি সমদূরবর্ত্তী হইলে পরস্পর সংঘর্ষণ হইত; কাজেই একটা অপেক্ষা অন্যটা অবশ্যই কিছু দূরবর্ত্তী। গ্রহণটা যখন অমাবস্যা পূর্ণিমায় হয়, এবং একটা যখন ঘুরিতে ঘুরিতে অবশ্যই অন্যটার দৃষ্টিরোধ করিয়া দিতে পারে, তখন একটু সূক্ষ্ম গণনায় ধীরে ধীরে ছায়াপাতের কথাও জানা যায়। কালিদাসের রঘুবংশের ১৪শ সর্গে এই ছায়া-পাতের কথায় লিখিত হইয়াছে—

ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বে-
নারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ।

চন্দ্রের উপরকার যে দাগটা কলঙ্ক বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহা ছায়াপাতের তত্ত্ব-আবিষ্কারের পর হইতে ভূমির ছায়া বলিয়াই এ যুগে বিচারিত হইয়াছিল। জ্যোতিষীদিগের বিশুদ্ধতর তত্ত্বের আবিষ্কার কালিদাসের সময়ের পরবর্ত্তী সময়ে হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে হয়।

টলেমির (Ptolemy) "অল্মাগেষ্ট" খ্রীষ্টাব্দের ২য় শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত। এই গ্রন্থখানির যে সর্ব্বলোকসুবোধ্য বিবৃতি পাওয়া যায়, তাহাতে দেখিতে পাই

যে, উল্লিখিত সমস্ত গণনার কথা ছাড়াও উহাতে আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বেরও ব্যাখ্যা আছে।' কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত ভূ-ভ্রমণবাদ আবিষ্কৃত হয় নাই, বিদেশ-বাণিজ্য, সমুদ্র-গমন প্রভৃতি সামাজিক সভ্যতার ফলে ঐ গ্রন্থের সহজ তত্ত্বগুলির মধ্যেও অনেক প্রশংসনীয় সূক্ষ্মতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেশীয়দিগের জ্যোতিষের জ্ঞানের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে বসি নাই। কিন্তু এই গ্রন্থের একটি গণনার কথা উল্লেখ করিতে হইবে। রাশিচক্রের গণনা টলেমির গ্রন্থ হইতে ২য় শতাব্দীর পরে ভারতে আগত বলিয়া যে কথা আছে, তাহার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। টলেমির গণনায় যে গ্রহ পৃথিবী হইতে যত অধিক দূরে অবস্থিত, তাহার তালিকা দিতেছি। চন্দ্র পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিহিত, এবং শনি সর্ব্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত। দূরত্বের হিসাবে নামগুলি পরে পরে এইরূপ, যথা—

১। চন্দ্র (সোম)	২। বুধ	৩। শুক্র
৪। রবি (সূর্য্য)	৫ মঙ্গল	৬। বৃহস্পতি
৭। শনি।		
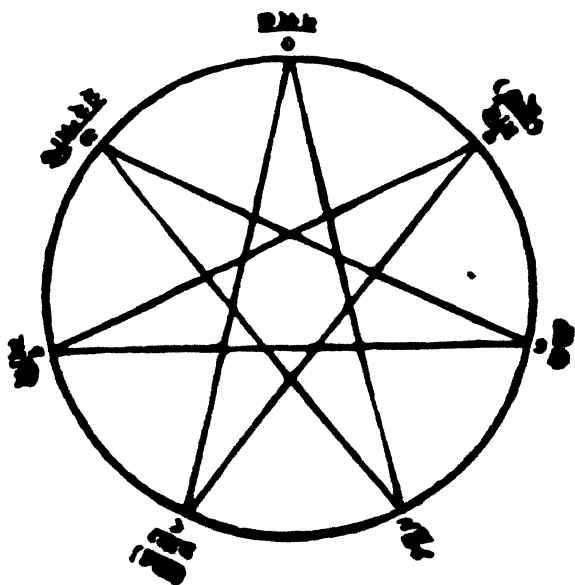
এই গ্রহগুলি লইয়া *বারের গণনা ও সপ্তাহগণনা কি প্রকারে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। বিদেশীয়দিগের মধ্যে যাহারা ফলিত জ্যোতিষ মানিত, তাহারা গ্রহশান্তির জন্য ও অন্যান্য যাদুবিদ্যার জন্য একটি চক্রে ঐ গ্রহগুলিকে

সাজাইয়া, একটা উল্টাপাল্টা শৃঙ্খলায় ওগুলির গণনা করিত। যাদুবিদ্যার জন্ত টেড়াবাঁকা গণনাই সর্ব্বত্র প্রশস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে গ্রহের দূরত্বের হিসাবে একটি চক্রে গ্রহগুলি সাজাইয়া দিতেছি। এখন দেখুন যে, টলেমির গণনার হিসাবে সোম হইতে আরম্ভ করিয়া শনি পর্য্যন্ত গ্রহগুলি পরে পরে চক্রের উপর সাজান হইয়াছে। এখন রবি হইতে আরম্ভ করিয়া বৃত্তের মধ্যস্থ রেখাগুলির পথ দেখিয়া লউন। রবি হইতে সোম পর্য্যন্ত আসিয়া, তাহার পর সহজ ভাবে সোম হইতে মঙ্গল, মঙ্গল হইতে বুধ, বুধ হইতে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে শনিতে আসিলে, যাদুকরের ক্ষেত্রটি অঙ্কিত হইয়া যাইবে। বিদেশের বার-গণনার এই ইতিহাস।

এখানে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। (১) আমাদের দেশের কোনও জ্যোতিষী পণ্ডিতই বলেন না যে, টলেমির গণনায় পৃথিবী হইতে যে গ্রহ যত দূরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত, তাহা এ দেশের কোনও জ্যোতিষ শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। (২) টলেমির দেশের লোক যে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যে যাদুবিদ্যার ক্ষেত্র আঁকিয়া উল্টাপাল্টা পদ্ধতিতে গ্রহগুলির নাম করিয়াছে, সেই কুসংস্কার ও সেই যাদুবিদ্যা এ দেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। (৩) তবুও মজা এই যে, ভারতবর্ষে টলেমির গণনায় উল্টাপাল্টা পদ্ধতি প্রভৃতি স্বীকৃত না হইয়াও, সেই কারণগুলির ফলস্বরূপে যে ভাবে রবি সোম প্রভৃতি হইতে শনিবারের পর্য্যন্ত গণনা প্রচলিত হইয়াছিল, সেই গণনাই আমাদের দেশে লক্ষ্য করিতেছি। ইহা হইতে সন্দেহটা গভীর হইয়া উঠে যে, রবি সোম প্রভৃতি ক্রমে গ্রহ লইয়া বার গণনাটা আমরা বিদেশ হইতেই পাইয়াছি। ঐ গণনার উৎপত্তির কারণ গুলির সহিত আমাদের সম্পর্ক না থাকিলেও, আমরা সাধারণ ব্যবহারে গণনায় ঐ ক্রমটি লইয়াছি, এই সন্দেহটি দৃঢ়ীভূত হইবার আরও অনেক কারণ আছে। সেগুলিরও উল্লেখ করিতেছি।

বৈদিক সাহিত্যে গ্রহের নাম নাই, এবং গ্রহ লইয়া বার-গণনা নাই। ঐ গণনা প্রাচীন বৌদ্ধযুগের সাহিত্যে নাই, পাণিনিতে নাই, খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীর মহাভাষ্যেও নাই। মহাভারতের কোনও স্থানেই যে বারগণনা নাই, এ কথাও সকলের জানিয়া রাখা উচিত। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ নিশ্চয়ই খৃষ্ট পূর্ব্ব কোনও অব্দে, কিংবা খ্রীষ্টাব্দের ১ম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অন্য কারণে প্রমাণিত হয়, তাহার কোনও স্থলেই গ্রহগণনা কিংবা বারগণনা পাওয়া যায় না। সর্ব্বত্রই কেবল নক্ষত্র ও তিথি লইয়া গণনা, এবং তিথি যাব

দিবসগণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সন্দেহের কথাটা কি সত্য বলিয়াই মনে হয় না?

রাশিচক্রের গণনাও বিদেশ হইতে এ দেশে আসিয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। যে ঋতুর যে প্রকার অবস্থা হইতে দ্বাদশ রাশির নাম করণ হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের ঋতু ও অবস্থার সহিত মেলে না। মেষ বৃষাদির বসন্তে সন্তানপ্রসব হইতে যদি ঐ নামের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে মেষপালক ভবঘুরে জাতির মধ্যেই ঐ নামের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়। সে দেশের ঋতুগুলির সঙ্গেও রাশিগুলির মিল আছে বলিয়া পণ্ডিতদিগের মুখে শুনিতে পাই। রাশি ও রাশিচক্রের কথা আমাদের বৈদিক কিংবা তৎপরবর্ত্তী বৌদ্ধযুগের কোনও সাহিত্যে নাই।

বারের নাম সম্বন্ধে আমার আর একটা খট্‌কা আছে। আমার এ খট্‌কার কথা চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কয়েক জন ইউরোপীয় পণ্ডিতকে বলিয়াছিলাম। প্রায় খৃষ্টোত্তর পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থে রবিবারের নাম পাই "ভট্টারক বাসর"। কুত্রাপি কোনও শাস্ত্রে সূর্য্যকে "ভট্টারক" বলা হয় নাই। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর অনেক লিপিতে প্রভুত্ব সম্পন্ন রাজাকে "ভট্টারক" বলা হইয়াছে। প্রভুর বার অর্থাৎ lords day শব্দের অনুবাদ হইতে ত উহার উৎপত্তি নয়? খৃষ্টোত্তর প্রথম শতাব্দীর কথা যাহাই হউক, ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত গান্ধার প্রভৃতি দেশের অদূরে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল, তাহার অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। রবিবার বলিয়া উপবাস করিবার কথা কোনও প্রাচীন স্মৃতিতে দেখি নাই। এরূপ হইতে পারে না কি যে, ঐ যুগে গান্ধারের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে যাহারা খৃষ্টান হইয়া সে কালের নিয়মে রবিবার পালন করিত, এবং সে দিন মাছ মাংস খাইত না, ধূর্ত্তের সহিত তাহাদিগের তুলনা করিয়া পঞ্চতন্ত্র-কার পরিহাসচ্ছলেই লিখিয়াছিলেন যে, "আজ ভট্টারক-বাসরে এই অস্ত্রগুলি কেমন করিয়া দন্তে স্পর্শ করিব?" এই সময়কার অল্প খ্রীষ্টানদের কথায় বিচার যদি নাই করা যায়, তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে, এ যুগে রোমবাসীর সহিত ভারতবর্ষীয়দিগের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। ইটালীয় ভাষায় রবিবারের নাম কিন্তু ঠিক্ ভট্টারকবার, বা Domenica। আমাদের দেশে বারের নাম নূতন বলিয়া এ সন্দেহও হইয়াছে যে, বৃহস্পতিবারের ইটালীয় নাম Giovdiর সহিত সুরে মিলাইয়া ঐ বারের "জীববাসর" নামের সৃষ্টি হইয়াছিল।

যাহাই হউক, যুগের পর যুগে যে ভাবে এ দেশে জ্যোতিষের জ্ঞান বিকশিত হইয়াছিল, আমরা তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস চাই। কয়েক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, জানি। কিন্তু এ দেশ হইতে এই তথ্য-সংগ্রহের জন্য কেহ কি অগ্রসর হইবেন না? অধ্যাপক রায়সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের জ্যোতিষশাস্ত্রের যে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু খাঁটী স্বদেশের উন্নতি ও বিদেশীয় প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কথাই তাঁহার গ্রন্থে অস্পষ্ট রহিয়াছে। জানি না, ঐ অস্পষ্টতা স্বদেশপ্রীতির প্রেরণায় উৎপন্ন কি না। যোগেশ বাবু যদি তাঁহার এখনকার অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে পূর্ব্বের গ্রন্থখানির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেন, তাহা হইলে, প্রাচীনকালের জ্ঞানের একটি দিকের ইতিহাস জানিতে পারিয়া আমরা কৃতার্থ হইতে পারি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মায়ার খেলা।

বৈশাখের শুক্ল পক্ষের শুভ রজনীতে প্রসন্নকুমার বেদান্তবাগীশ সংসারের একমাত্র স্নেহবন্ধন চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যা মনোরমাকে সহায়সম্পদশূন্য পিতৃহীন তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। বহু সম্রান্ত-বংশীয়, বিদ্বান ও ধনবান পাত্রও মিলিয়াছিল; কিন্তু আজীবন স্নেহ ও আদরে প্রতিপালিতা মনোরমাকে তিনি নয়নের অন্তরাল করিতে সম্মত ছিলেন না। কোনও সদ্বংশজ দরিদ্র সচ্চরিত্র যুবককে জামাতৃপদে বরণ করিয়া নিজভবনের অনতিদূরে কন্যা-জামাতার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, বেদান্তবাগীশের এইরূপই সংকল্প ছিল। তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তির তাহারাই ত একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু এতদিন তাঁহার মনের আশা মিটে নাই; বহু চেষ্টা সত্বেও অনুরূপ পাত্রের কোনও সন্ধানই তিনি পান নাই।

তাই যখন কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিঃস্ব তারাপদ বেদান্ত-পাঠের জন্য কমলাপুরে আসিল, তখন হইতেই এই প্রিয়দর্শন মেধাবী

ছাত্রটির প্রতি বেদান্তবাগীশের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তারাপদর জননী ব্যতীত সংসারে আর কেহ ছিল না। আশ্রয়হীন যুবক মাতাকে সঙ্গে করিয়াই কমলাপুরে আসিয়াছিল। অন্যত্র তাহার স্থান ছিল না। জ্ঞাতিদিগের দৌরাত্ম্যে ও অত্যাচারে অন্নাসনটুকু পর্য্যন্ত সে হারাইয়াছিল। গবর্মেণ্টের প্রদত্ত মাসিক বৃত্তিমাত্র তাহার ভরসা। কমলাপুরের কোনও ভদ্র ব্রাহ্মণের বহির্বাটীর একটি ঘর ভাড়া লইয়া সে মাতাকে তথায় রাখিয়াছিল।

কুলে শীলে সর্ব্বাংশেই তারাপদ শ্রেষ্ঠ। বেদান্তবাগীশ এইরূপ পাত্রেরই অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কয়েক মাস পরে তিনি স্বয়ং তারাপদর জননীর কাছে কথাটা পাড়িলেন। বিধবা অত্যন্ত আগ্রহে সম্মতি দিলেন। এমন সম্বন্ধ কোথায় পাইবেন? দেশে দশে প্রসন্নকুমার বেদান্তবাগীশকে কে না চিনিত? এত বড় বৈদান্তিক সে অঞ্চলে আর কেহ ছিলেন না। দেবী ভারতীর ন্যায় জননী কমলার প্রসন্ন দৃষ্টিও ব্রাহ্মণের উপর অজস্রধারে বর্ষিত হইয়াছিল। এরূপ ঐশ্বর্য্যশালী দেশপূজ্য পণ্ডিতের একমাত্র সুন্দরী কন্যার সহিত, ভিখারী তারাপদর বিবাহ হইবে, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে?

নিজবাসগৃহের অনতিদূরে ভাবী জামাতার জন্য গৃহ নির্ম্মিত হইল। বেদান্তবাগীশ তারাপদর নামে উহা রেজেষ্ট্রি করিয়া দিলেন। তার পর শুভ দিনে শুভ লগ্নে বেদান্তবাগীশ নয়নপুত্তলী মনোরমাকে তারাপদর হস্তে সমর্পণ করিলেন। শুভ শঙ্খরোল, উলুধ্বনি ও প্রচণ্ড বাদ্যোদ্যমে সে রাত্রি কমলাপুর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন উৎসব সে গ্রামের লোক আর কখনও দেখে নাই।

সম্প্রদানের শেষে বেদান্তবাগীশ যখন সর্ব্বসমক্ষে তারাপদর হাত ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার অন্ধের নড়িকে তোমার হাতে দিয়া আজ নিশ্চিন্ত হইলাম", তখন উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর অনেকেরই নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল।

২

বিবাহ হইল বটে; কিন্তু মনোরমা এখনও পূর্ব্বের ন্যায় অধিকাংশ কালই পিতার পরিচর্য্যা করিত। বৈবাহিকের পাছে কোনরূপ অসুবিধা হয়, এ জন্য তারাপদর জননী পুত্রবধূকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "মা, আমার জন্য তোমার কিছু ভাবিতে হইবে না; কিন্তু দেখো, তোমার বাবার সেবার যেন কোনরূপ ত্রুটী না হয়! তুমি ছাড়া তাঁর আর কেহ নাই।"

মনোরমা শাশুড়ীর আদেশ পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে পিতার পরিচর্য্যা করিত।

সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যত ক্ষণ বেদান্তবাগীশ মহাশয় শয়ন না করিতেন, সে পিতার সকল কার্য্যে সহায়তা করিত। যতক্ষণ তিনি আহারাদির জন্য অন্তঃপুরে থাকিতেন, সে ছায়ার ন্যায় তাঁহার পাশে পাশে বেড়াইত।

এমন স্নেহময় পিতা আর কার আছে? শৈশবেই সে মাতৃহীন; কিন্তু বেদান্তবাগীশ এক দিন মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে সে অভাব বুঝিতে দেন নাই। পিতার স্নেহ মাতার আদর মনোরমা একাধারেই পাইয়াছিল। দাস দাসী সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ কন্যার পরিচর্য্যার ভার স্বয়ংই লইয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে তাহাকে স্নান করাইতেন, খাওয়াইতেন; কোনও দিন সামান্য অসুখ হইলে বুকে করিয়া রাখিতেন। কাহারও উপর নির্ভর করিতেন না। সে যত দিন ছোট ছিল, বেদান্তবাগীশ বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইলেও, বহুদূরবর্ত্তী স্থানে কোনও বিশিষ্ট ক্রিয়া কর্ম্মে যোগদান করিতেন না। শুধু মায়ার মোহে অন্ধ হইয়াই যে তিনি এমন করিতেন, তাহা নয়। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত দৃঢ় ছিল; গ্রামের কেহ কখনও বেদান্তবাগীশকে কোনও বিষয়ে বিচলিত হইতে অথবা অশ্রুপাত করিতে দেখে নাই। মাতৃহীনা কন্যার প্রতি কর্ত্তব্যবোধই অনেক সময় তাঁহাকে তুচ্ছ অর্থ, সম্ভ্রম ও সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত রাখিত।

বিবাহের পর পাছে পিতৃপরিচর্য্যায় বঞ্চিত হইতে হয়, মনোরমার হৃদয়ে এইরূপ একটা আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সে যখন শাশুড়ীর আদেশ ও স্বামীর অনুমোদন পাইল, তখন সরলা ব্রাহ্মণকন্যার আনন্দ রাখিবার আর স্থান রহিল না। উভয় বাটীর ব্যবধান অতি সামান্য; সুতরাং সে শাশুড়ী ও স্বামীর সেবা করিয়াও পিতার পরিচর্য্যার যথেষ্ট অবকাশ পাইত। অধিকাংশ সময়ই সে পিতৃগৃহে থাকিত।

স্বয়ং অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও মনোরমাকে বেদান্তবাগীশ মহাশয় বেশী লেখাপড়া শিখান নাই। সে মোটামুটী বাঙ্গালা জানিত, এবং কয়েকখানি সরল সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়াছিল। প্রসন্নকুমার সেবা-ধর্ম্মটাই কন্যাকে ভাল করিয়া শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু বিদুষী না হইলেও মনোরমা দর্শনশাস্ত্রের ছোট বড় অনেকগুলি তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াছিল। বেদান্তবাগীশ যখন ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেন, গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া অনেক সময় মনোরমা তাহা শ্রবণ করিত। তীক্ষ্ণমেধাবলে বালিকা বয়সেই সে সমুদয় বিষয় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। অনেক সময় কোনও কোনও বিষয়ে সে এমন দুই চারিটি কথা বলিত যে, বৈদান্তিক প্রসন্নকুমার কন্যার বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতেন।

৩

শশুর মহাশয়ের পদধূলি লইয়া তারাপদ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, মা নৌকায় উঠিয়াছেন।"

বেদান্তবাগীশ প্রশান্তস্বরে বলিলেন, "খুব সাবধানে থাকিও। সর্ব্বদা পত্র লিখিও। কোনও বিষয়ের অভাব হইলে তখনই আমায় জানাইতে কুণ্ঠিত হইও না। শুনিয়াছি, পুরুষোত্তমে নানাপ্রকার জুয়াচোরের প্রাদুর্ভাব। অজ্ঞাত-কুলশীলের সহিত সতর্কভাবে চলিবে। রাম সর্দ্দার ছাড়া আরও দুই এক জন লোক সঙ্গে লইবে কি?"

সস্মিতমুখে তারাপদ বলিল, "আজ্ঞা, বেশী লোকের প্রয়োজন নাই। আমি ও রামসর্দ্দার মাকে অনায়াসে তীর্থ করাইয়া আনিতে পারিব।"

"ভাল, ভাল, আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা নিরাপদে শীঘ্র ফিরিয়া আইস।"

তারাপদর মাতার বহুদিন হইতে পুরুষোত্তম-দর্শনের সাধ ছিল। পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহার স্থিতি করিবার পর পুরী যাইবার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বেদান্তবাগীশ বৈবাহিকার তীর্থযাত্রার আয়োজন করিয়া দিলেন। তখনও পুরী রেলপথ খুলে নাই। পদব্রজে অথবা কলিকাতা হইতে ষ্টীমারযোগে পুরুষোত্তমে যাইতে হইত। পথে নানারূপ অসুবিধা ও বিপদের সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু তা বলিয়া কি তীর্থদর্শনে বাধা দেওয়া যায়? বেদান্তবাগীশ তারাপদকেই মাতার সহিত পুরী যাইবার জন্য উপদেশ দিলেন।

গ্রামের গদাই মাঝি নৌকা করিয়া তাঁহাদিগকে গোয়ালন্দ পঁহুছিয়া দিবে। তথা হইতে রেলযোগে তাঁহারা কলিকাতায় যাইবেন; তার পর ষ্টীমারে পুরী যাত্রা করিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

তারাপদ অন্তঃপুরে মনোরমার নিকট বিদায় লইতে গেল। বিবাহের পর এই তাহাদের প্রথম বিচ্ছেদ। এক বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও বিরহের যন্ত্রণা কেহ অনুভব করে নাই। অবিচ্ছিন্ন মিলনসুখে দীর্ঘ বৎসর চলিয়া গিয়াছে; সুতরাং আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় উভয়েরই হৃদয় ম্রিয়মাণ!

স্বামীর জন্য এক ডিবা পান সাজিয়া রাখিয়া মনোরমা তখন দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। আজ হাসিমুখে বিদায় দিতে হইবে, কিন্তু হৃদয় কি ভাঙ্গিয়া যাইবে না? কর্ত্তব্য কি কঠোর! আজীবন সংযমে ও মনোবৃত্তিদমনে শিক্ষালাভ করিলেও, আজ মনোরমা কিছুতেই হৃদয়বেগ সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। মুখে বাহ্য হাসির মৃদু রেখা ফুটিয়া উঠিলেও, তাহার আয়ত নয়নযুগল বিষাদে

সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যত ক্ষণ বেদান্তবাগীশ মহাশয় শয়ন না করিতেন, সে পিতার সকল কার্য্যে সহায়তা করিত। যতক্ষণ তিনি আহারাদির জন্য অন্তঃপুরে থাকিতেন, সে ছায়ার ন্যায় তাঁহার পাশে পাশে বেড়াইত।

এমন স্নেহময় পিতা আর কার আছে? শৈশবেই সে মাতৃহীন; কিন্তু বেদান্তবাগীশ এক দিন মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে সে অভাব বুঝিতে দেন নাই। পিতার স্নেহ মাতার আদর মনোরমা একাধারেই পাইয়াছিল। দাস দাসী সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ কন্যার পরিচর্য্যার ভার স্বয়ংই লইয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে তাহাকে স্নান করাইতেন, খাওয়াইতেন; কোনও দিন সামান্য অসুখ হইলে বুকে করিয়া রাখিতেন। কাহারও উপর নির্ভর করিতেন না। সে যত দিন ছোট ছিল, বেদান্তবাগীশ বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইলেও, বহুদূরবর্ত্তী স্থানে কোনও বিশিষ্ট ক্রিয়া কর্ম্মে যোগদান করিতেন না। শুধু মায়ার মোহে অন্ধ হইয়াই যে তিনি এমন করিতেন, তাহা নয়। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত দৃঢ় ছিল; গ্রামের কেহ কখনও বেদান্তবাগীশকে কোনও বিষয়ে বিচলিত হইতে অথবা অশ্রুপাত করিতে দেখে নাই। মাতৃহীনা কন্যার প্রতি কর্ত্তব্যবোধই অনেক সময় তাঁহাকে তুচ্ছ অর্থ, সম্ভ্রম ও সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত রাখিত।

বিবাহের পর পাছে পিতৃপরিচর্য্যায় বঞ্চিত হইতে হয়, মনোরমার হৃদয়ে এইরূপ একটা আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সে যখন শাশুড়ীর আদেশ ও স্বামীর অনুমোদন পাইল, তখন সরলা ব্রাহ্মণকন্যার আনন্দ রাখিবার আর স্থান রহিল না। উভয় বাটীর ব্যবধান অতি সামান্য; সুতরাং সে শাশুড়ী ও স্বামীর সেবা করিয়াও পিতার পরিচর্য্যার যথেষ্ট অবকাশ পাইত। অধিকাংশ সময়ই সে পিতৃগৃহে থাকিত।

স্বয়ং অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও মনোরমাকে বেদান্তবাগীশ মহাশয় বেশী লেখাপড়া শিখান নাই। সে মোটামুটী বাঙ্গালা জানিত, এবং কয়েকখানি সরল সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়াছিল। প্রসন্নকুমার সেবা-ধর্ম্মটাই কন্যাকে ভাল করিয়া শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু বিদুষী না হইলেও মনোরমা দর্শনশাস্ত্রের ছোট বড় অনেকগুলি তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াছিল। বেদান্তবাগীশ যখন ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেন, গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া অনেক সময় মনোরমা তাহা শ্রবণ করিত। তীক্ষ্ণ-মেধাবলে বালিকা বয়সেই সে সমুদয় বিষয় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। অনেক সময় কোনও কোনও বিষয়ে সে এমন দুই চারিটি কথা বলিত যে, বৈদান্তিক প্রসন্নকুমার কন্যার বুদ্ধি ও বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতেন।

৩

শ্বশুর মহাশয়ের পদধূলি লইয়া তারাপদ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, মা নৌকায় উঠিয়াছেন।"

বেদান্তবাগীশ প্রশান্তস্বরে বলিলেন, "খুব সাবধানে থাকিও। সর্ব্বদা পত্র লিখিও। কোনও বিষয়ের অভাব হইলে তখনই আমায় জানাইতে কুণ্ঠিত হইও না। শুনিয়াছি, পুরুষোত্তমে নানাপ্রকার জুয়াচোরের প্রাদুর্ভাব। অজ্ঞাত-কুলশীলের সহিত সতর্কভাবে চলিবে। রাম সর্দ্দার ছাড়া আরও দুই এক জন লোক সঙ্গে লইবে কি?"

সস্মিতমুখে তারাপদ বলিল, "আজ্ঞা, বেশী লোকের প্রয়োজন নাই। আমি ও রামসর্দ্দার মাকে অনায়াসে তীর্থ করাইয়া আনিতে পারিব।"

"ভাল, ভাল, আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা নিরাপদে শীঘ্র ফিরিয়া আইস।"

তারাপদর মাতার বহুদিন হইতে পুরুষোত্তম-দর্শনের সাধ ছিল। পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহার স্থিতি করিবার পর পুরী যাইবার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বেদান্তবাগীশ বৈবাহিকার তীর্থযাত্রার আয়োজন করিয়া দিলেন। তখনও পুরী রেলপথ খুলে নাই। পদব্রজে অথবা কলিকাতা হইতে ষ্টীমারযোগে পুরুষোত্তমে যাইতে হইত। পথে নানারূপ অসুবিধা ও বিপদের সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু তা বলিয়া কি তীর্থদর্শনে বাধা দেওয়া যায়? বেদান্তবাগীশ তারাপদকেই মাতার সহিত পুরী যাইবার জন্য উপদেশ দিলেন।

গ্রামের গদাই মাঝি নৌকা করিয়া তাঁহাদিগকে গোয়ালন্দ পঁহুছিয়া দিবে। তথা হইতে রেলযোগে তাঁহারা কলিকাতায় যাইবেন; তার পর ষ্টীমারে পুরী যাত্রা করিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

তারাপদ অন্তঃপুরে মনোরমার নিকট বিদায় লইতে গেল। বিবাহের পর এই তাহাদের প্রথম বিচ্ছেদ। এক বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও বিরহের যন্ত্রণা কেহ অনুভব করে নাই। অবিচ্ছিন্ন মিলনসুখে দীর্ঘ বৎসর চলিয়া গিয়াছে; সুতরাং আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় উভয়েরই হৃদয় ম্রিয়মাণ!

স্বামীর জন্য এক ডিবা পান সাজিয়া রাখিয়া মনোরমা তখন দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। আজ হাসিমুখে বিদায় দিতে হইবে, কিন্তু হৃদয় কি ভাঙ্গিয়া যাইবে না? কর্ত্তব্য কি কঠোর! আজীবন সংযমে ও মনোবৃত্তিদমনে শিক্ষালাভ করিলেও, আজ মনোরমা কিছুতেই হৃদয়বেগ সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। মুখে যাহা হাসির মৃদু রেখা ফুটিয়া উঠিলেও, তাহার আয়ত নয়নযুগল বিষাদে

ছল্‌ছল করিতেছিল। স্বামীকে আসিতে দেখিয়া যুবতী তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে নয়নমার্জ্জনা করিল। শুভযাত্রার সময় কি চোখের জল ফেলিতে আছে?

পত্নীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তারাপদ গাঢ়স্বরে বলিল, "ভয় কি মনু? শীঘ্রই নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আস্‌বো। বড় জোর্ দু' মাস দেরী হবে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এই দু' মাস দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলে যাবে। তুমি ভেবো না।"

মনোরমার হৃদয়ে বান ডাকিতেছিল; কিন্তু অভ্যাসবশে সে আত্মসংবরণ করিল। ধীরে ধীরে নীরবে সে স্বামীর চরণধূলি মাথায় তুলিয়া লইল।

আর দেরী করা চলে না। শুভ সময় অতীত হইয়া যায়; মাঝি বাহির হইতে ডাকিতেছে। মনোরমার প্রতি চাহিতে চাহিতে তারাপদ বাহিরে চলিয়া গেল। যুবতী জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বেদান্তবাগীশ গদাই মাঝিকে বিশেষ সাবধানে নৌকা চালাইবার আদেশ দিয়া প্রণত তারাপদকে আবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। গদাই ঠাকুর মহাশয়কে বুঝাইয়া দিল যে, এখন ভয়ের কোনও কারণই নাই। শীতকালে জলপথে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প।

তারাপদ রাজপথে উঠিয়া আর একবার বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, তখনও মনোরমা নির্নিমেষভাবে তাহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে।

৪

তখনও অদূরবর্ত্তী শস্যশ্যামল ক্ষেত্রের উপর কুহেলিকার ধূম্র যবনিকা দুলিতেছিল। প্রাচীদিক্‌চক্রবালে তরুণ তপনের মুকুট-জ্যোতিঃ বিকশিত হইলেও, দিগন্তবিস্তৃত নভোরেণুজাল সম্পূর্ণ অপসৃত হয় নাই।

প্রাতঃকৃত্যশেষে বেদান্তবাগীশ মহাশয় চণ্ডীমণ্ডপের রকের উপর বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। ছাত্রগণ ভিতরে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতেছিল।

এমন সময় এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে আসিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বেদান্তবাগীশ তাহাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কে—গদাই? এর মধ্যে ফিরে এলি? ব্যাপার কি?"

গদাই মাঝি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, পরিধেয় বসন বহু স্থলে ছিন্ন। তাহারই এক প্রান্ত গায়ে জড়াইয়া সে শীতে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ব্রাহ্মণের হৃদয় অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় কম্পিত হইল; তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কাঁদিস্ কেন, কি হয়েছে?"

মাঝি সংক্ষেপে জানাইল, সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আড়িয়াল নদীর সীমা ছাড়াইয়া নৌকা যখন পদ্মার মধ্যে পড়িয়াছিল, সেই সময় একখানি ষ্টীমারের ঢেউ লাগিয়া নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। কুয়াসায় দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া সে যথাসময়ে ষ্টীমারের পথ হইতে নৌকা সরাইয়া লইতে পারে নাই। জামাই বাবু তাঁহার মাকে বাঁচাইবার জন্ত অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তার পর দু' জনেই ডুবিয়া গিয়াছেন। রাম সর্দ্দার ও আর তিন জন দাঁড়ির কেহই রক্ষা পায় নাই। শুধু কোনও রকমে সে বাঁচিয়া গিয়াছে।

পাথরের মূর্ত্তির ন্তায় বেদান্তবাগীশ বসিয়া রহিলেন।

কথাটা মনোরমার কানে যাইতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না। বজ্রাহতার ন্তায় যুবতী প্রথমে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। সত্যই কি এত শীঘ্র তাহার সাধের বাসর-বাতি নিবিয়া গেল? বসন্তের ফুল না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়িল? না, না! এমন অসম্ভব কথা সে বিশ্বাস করিতে পারে না! তাহার এয়োতির চিহ্ন মুছিয়া যাইবার কোনও সম্ভাবনাই ত ছিল না! তবে এ কি হইল মা ভবানী!

মুহূর্ত্তমধ্যে এই নিদারুণ সংবাদ গ্রামমধ্যে প্রচারিত হইল। পল্লীকামিনীরা দ্রুতপদে বেদান্তবাগীশের গৃহপ্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন: মনোরমা নীরবে পল্লীবৃদ্ধাদিগের সান্ত্বনাবাক্য শুনিতে লাগিল।

কিছুকাল নানারূপ আলোচনার পর স্থির হইল, যাহা হইবার, তাহা ত হইয়াছে। এখন অভাগিনী মনোরমার বেশ-পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কয়েকটি পল্লীবিধবা এই অপ্রীতিকর অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের ভার লইলেন। মনোরমাকে সকলেই স্নেহ করিতেন; তাহার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারাদি উন্মোচন করা কি সহজ ব্যাপার?

বৃদ্ধারা অশ্রুসিক্তলোচনে বলিলেন, "কি করিবে বল মা, উপায় ত নাই। এ বেশ তোমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে।"

মনোরমা এতক্ষণ উদাসনয়নে শূন্তপানে চাহিয়াছিল। তাহার হৃদয়ে যে শোকের মহাসমুদ্র আলোড়িত হইতেছিল, বাহিরে অবশ্য তাহার বিশেষ কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। মনোরমা কিছুতেই মনকে বুঝাইতে পারিতেছিল না যে, সত্যই সে আজ অভাগিনী, স্বামিহীনা! বৃদ্ধারা যখন তাহার অঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিতে গেলেন, তখন সে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার নয়নে সতীগর্ব্বের উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠিল; দৃঢ়কণ্ঠে সে ডাকিল, "বাবা!"

বেদান্তবাগীশ চমকিয়া উঠিলেন।

মনোরমা বলিল, "বাবা, আমি বিধবা হই নাই!"

ব্রাহ্মণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রমণীদিগের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আজ থাক, কোনও দোষ হইবে না।"

সে অঞ্চলের ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতাগ্রগণ্য বেদান্তবাগীশ যখন বলিতেছেন, তখন প্রতিবাদ করিবে কে? লোকাচারের বিরুদ্ধ হইলেও সে যাত্রা মনোরমার বৈধব্য-বেশ ঘটিল না।

৫

মৃদুকণ্ঠে পিতা বলিলেন, "মা, আজ তোমাকে এ বেশ ত্যাগ করিতে হইবে। এ কয় দিন রাখিয়াছ; কিন্তু আজ হইতে আর চলিবে না। তোমার স্বামীর আদ্যকৃত্য আজ ত করিতে হইবে। এখন—"

মনোরমা পিতার আদেশ শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখমণ্ডলে পাণ্ডুরচ্ছায়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সহসা দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের দিব্যজ্যোতিঃ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমি বিধবা হই নাই বাবা; তিনি বলিয়া গিয়াছেন, শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহার কথা কখনই মিথ্যা হইবে না।"

কন্যার দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া বেদান্তবাগীশ মুহূর্ত্তমাত্র বিচলিত হইলেন। ম্লান-হাস্যে বলিলেন, "পাগলী, এমন অসম্ভবে বিশ্বাস করিয়া কেন প্রতারিত হইবি? সে যদি বাঁচিয়া থাকিত, এত দিন নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিত; নয় ত তাহার সংবাদ পাওয়া যাইত। আমি লোক দ্বারা বহু সন্ধান লইয়াছি—সে বাঁচিয়া নাই। বৃথা আশ্বাসে মুগ্ধ হইলে কেবল কষ্ট পাইবি, মা।"

মনোরমা পূর্ব্ববৎ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তিনি ফিরিয়া আসিবেন বলিয়াছেন।"

বেদান্তবাগীশ সে কথায় কান না দিয়া বলিলেন, "সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। পাড়ার অনেকেই আসিতেছেন। আজ আর হাতের লোহা, শাঁখা খুলিতে আপত্তি করিও না; তাহা হইলে সমাজে নিন্দা হইবে। আমি মুখ দেখাইতে পারিব না। আজ শ্রাদ্ধের দিন; হিন্দুশাস্ত্র মতে তোমার স্বামীর পরলোকগত আত্মার মঙ্গলের জন্য সকলই সহ্য করিতে হইবে।"

"কিসের শ্রাদ্ধ, বাবা? আমার স্বামী কখনই মরেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁহার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না। তিনি নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবেন। আমি বিধবা হই নাই, বাবা!"

কিন্তু বেদান্তবাগীশ সে কথা শুনিলেন না। ভাবিলেন, স্বামিবিয়োগশোকে কন্যার মস্তিষ্কের বিকার ঘটিয়াছে।

পল্লীবিধবারা গৃহপ্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন। শ্রাদ্ধের সমুদয় আয়োজন হইয়াছিল। পুরোহিত আসনে উপবেশন করিলেন। বেদান্তবাগীশ প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

বিধবারা মনোরমাকে বুঝাইয়া শঙ্খ-বস্ত্রাদি ত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু সে যেমন নীরবে বসিয়াছিল, পাষাণমূর্ত্তির মত তেমনই স্থির হইয়া রহিল। কোনও ক্রমেই সধবার বেশ ত্যাগ করিল না। তখন সকলে বলপূর্ব্বক তাহাকে নিরাভরণা করিবার চেষ্টা করিলেন। মনোরমা আর্ত্তস্বরে বলিল, "ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার এয়োতির চিহ্ন কাড়িয়া লইও না! তিনি বলে' গেছেন,—নিশ্চয় ফিরে আস্‌বেন। ব্রাহ্মণের কথা কখনও মিথ্যা হয় না, কেন জোর ক'রে তোমরা আমায় বিধবা সাজাচ্ছ? আমার সর্ব্বনাশ ক'রো না!"

কিন্তু তাহার ক্রন্দন, অনুনয়, বিনয় ও আপত্তি সত্বেও সকলে বলপূর্ব্বক তাহার হাতের লোহা খুলিয়া লইলেন, শাঁখা ভাঙ্গিয়া দিলেন। কোনও রকমে স্নান করাইয়া শুভ্র বস্ত্রে মনোরমার দেহ আবৃত করিলেন। যখন বিধবারা ধরাধরি করিয়া নিরাভরণা শ্বেতবসনা যুবতীকে কুশাসনের সম্মুখে লইয়া আসিলেন, তখন হৃদয়ভেদী চীৎকার করিয়া হতভাগিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। বেদান্তবাগীশ কন্যার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার চৈতন্যসম্পাদনের বহু চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনও ফল হইল না।

তখন মনোরমার সংজ্ঞাশূন্য দেহ শয্যার উপর শায়িত হইল। কবিরাজকে ডাকিবার জন্য লোক চলিয়া গেল। বেদান্তবাগীশ প্রশান্তভাবে কন্যার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে তখন কি গভীর পরিতাপের বেদনা বাজিতেছিল, লোকে তাহা অনুমান করিতে পারিল না।

কবিরাজ আসিয়া মনোরমার নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। ললাটের উত্তাপ লইয়া তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। বেদান্তবাগীশ তাঁহাকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবস্থা কেমন দেখিতেছেন? আমার কাছে কিছু গোপন করিবেন না।"

কবিরাজ বলিলেন, "অবস্থা ভাল নয়। অকস্মাৎ মানসিক উত্তেজনায় রক্ত মাথায় উঠিয়াছে, জ্বর অত্যন্ত প্রবল, ঘোর বিকারের অবস্থা।"

বিচারকের মুখনিঃসৃত মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা-শ্রবণে অপরাধীর যেরূপ অবস্থা হয়,

বেদান্তবাগীশের সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। কিন্তু মুহূর্ত্তে তিনি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দমন করিলেন। জীব কর্ম্মবশে ফলভোগ করে। সুখ দুঃখ সবই অনিত্য। মানব মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কেবলই কষ্ট পায়। বৈদান্তিক দৃঢ়পদে পুনরায় কন্যার শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া গেলেন।

বিকারঘোরে মনোরমা বলিয়া উঠিল, "ব্রাহ্মণের কথা কখনও কি মিথ্যা হয়? বাবা, তিনি ঠিক আস্‌বেন।"

চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার কোনও ত্রুটী হইল না। কিন্তু ঔষধ পান করিবে কে? জ্বরের উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া আসিল। জীবন ও মৃত্যুর প্রবল সংঘর্ষে মৃত্যুর বিজয়-ভেরী ভীষণ-রবে বাজিয়া উঠিল। রাত্রিশেষে সকল চেষ্টার অবসান হইল।

৬

সোনার কুসুম শ্মশানচুল্লীতে ভস্মীভূত করিয়া দাহকারীরা সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সমগ্র কমলাপুর যেন শোকে ম্রিয়মাণ। বাড়ীর পোষা বাঘা কুকুরটিও মধ্যে মধ্যে কাঁদিয়া উঠিতেছিল। মনোরমা স্বহস্তে যে প্রত্যহ তাহাকে আহার দিত!

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া বামার মা কাঁদিতেছিল। মনোরমাকে যে সে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছিল! নির্ব্বিকারভাবে বেদান্তবাগীশ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রোরুদ্যমানা বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বলিলেন, "তুই যদি অমন ক'রে কাঁদিস্, তা হ'লে আমার সাম্‌নে থেকে চলে যা।"

নদীর তীরে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনা সারিয়া আসিয়াছিলেন; আজ আর তাহার প্রয়োজন নাই। স্বহস্তে তিনি ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া দিলেন। এ কার্য্য ত প্রত্যহ মনোরমাই করিত। অন্যমনস্কভাবে ব্রাহ্মণ এ ঘর ও ঘর ঘুরিয়া আসিলেন। হাস্যময়ী স্নেহপ্রতিমা অন্যদিন এতক্ষণ শতবার তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিত। তাঁহার কি প্রয়োজন, কিসের অভাব হইতেছে, জিজ্ঞাসা না করিয়াই সব গুছাইয়া রাখিত। আজ হইতে সে স্নেহের সেবা একান্তই দুর্লভ হইল।

একবার কন্যার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। আজ দর্শনের একটা জটিল বিষয় ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিবার কথা ছিল; অকস্মাৎ সে কথাটা বেদান্তবাগীশের স্মরণ হইল।

ছাত্রেরা নীরবে মুখোমুখী করিয়া অন্ধকারে বসিয়া ছিল। বেদান্তবাগীশ বলিলেন, "চুপ করিয়া বসিয়া কেন? আলো আল, আজ মায়া ও দুঃখ সম্বন্ধে তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিব।"

বিস্ময়ে ছাত্রগণ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। এত ধৈর্য্য, এমন সংযম তাহারা কোনও মানুষে ত দেখে নাই! ব্রাহ্মণের কি হৃদয় নাই?

আধ ঘণ্টা পরে ধূমপান করিতে করিতে বেদান্তবাগীশ চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। ছাত্রেরা আজ তেমন মনঃসংযোগপূর্ব্বক তাঁহার কথা শুনিতেছিল না। অগত্যা তিনি ব্যাখ্যা বন্ধ করিয়া দিলেন।

বাহিরে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছিল। বেদান্তবাগীশ ধূমপান করিতে করিতে কিছুক্ষণ ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া রহিলেন, সহসা তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কে যেন বাড়ীর ভিতর হইতে তাঁহার কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—

"মনো, মনু, ও মনোরমা।"

এ স্বর যে পরিচিত! ব্রাহ্মণ দ্রুতবেগে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। আজ কি তাঁহারও মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে?

চন্দ্রালোকে তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, মুণ্ডিতশীর্ষ, নগ্নপদ, উত্তরীয়ধারী এক ব্যক্তি দ্রুতপদে প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিল। বেদান্তবাগীশের সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

আগন্তুক ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিল। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে তাহার মুখ দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

"তুমি, তুমি?—সত্যই তুমি তারাপদ? না স্বপ্ন দেখ্‌ছি!"

তারাপদ শোকরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "হঠাৎ এ অবস্থায় আমায় দেখে বিস্মিত হইবারই কথা। পদ্মায় মাকে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি। আমি ছাড়া আর কেহ বাঁচে নাই, শুনিয়াছি। আমি হতভাগা, তাই মাকে তীর্থ দেখাইতে গিয়া জন্মের মত তাঁহাকে হারাইয়াছি! কয়েক জন জেলে আমার ও মার দেহ অতিকষ্টে তাহাদের নৌকায় তুলিয়াছিল। মার আর জ্ঞান হয় নাই। পাঁচ দিন আমি এক ব্রাহ্মণের বাড়ী শয্যাশায়ী ছিলাম। পরে শুনিয়াছি, তাঁহারাই আমার মার সংকার করিয়াছিলেন। আজ দুই দিন শরীরে বল পাইয়াছি। কাল ক্ষৌরকার্য্য করিয়া বালির পিণ্ড দিয়া আসিয়াছি। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল; এখানে সস্ত্রীক মার শ্রাদ্ধ করিব। কিন্তু আপনার কন্যা কোথায়? ও বাড়ীতে কেহ নাই; এখানেও তাহাকে দেখিতেছি না।"

বেদান্তবাগীশ এতক্ষণ অতিকষ্টে জামাতার কথা শুনিতেছিলেন; কিন্তু সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। বেদান্তের কোনও সূত্র আজ প্রকৃতির প্লাবনের গতিরোধ করিতে পারিল না! জামাতাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অত বড় বৈদান্তিক বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, আমায় ক্ষমা কর! আমি তাহাকে নিজের হাতে মারিয়া ফেলিয়াছি! পাণ্ডিত্যের অভিমানে সাধ্বীর বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিতে গিয়াছিলাম, তাই মা আমার ফাঁকি দিয়া পলাইয়াছে।"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

উদ্যানের রঙ্গ।

উদ্ভিদ-শাস্ত্রের অন্তর্গত উদ্যান কলার মধ্যে উদ্ভিদ-পরিচর্য্যা প্রকরণে দুইটি বিশেষ ইংরেজী শব্দের ব্যবহার আছে। উক্ত শব্দ দুইটি যথাক্রমে—Forcing ও Retarding। প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা সাদা কথায় জবরদস্তি বা পীড়ন ও শেষোক্ত শব্দ দ্বারা পিছাইয়া দেওয়া বুঝিতে হয়। উক্ত শব্দদ্বয় বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার জ্ঞাপক। এক্ষণে উহাদিগের প্রত্যেকের প্রয়োগ-কার্য্য ও ফলাফল কি, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

উদ্যানপাল যত ঘন ঘন উক্ত দুটি শব্দের ব্যবহার করেন, কৃষককে তত ব্যবহার করিতে হয় না। কৃষক অনেক কার্য্যের জন্ম স্বভাবের উপর নির্ভর করে। কারণ, কৃষক যে কোনও ফসলের আবাদ করুক, তাহাকে সর্ব্বদা খরচের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। কৃষিজাত প্রায় সমস্ত দ্রব্যই লোকসমাজের অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলিয়া সকল জিনিসই সম্ভবমত স্বল্পব্যয়ে উৎপন্ন করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। উদ্যানপাল যে সকল জিনিস—তরিতরকারী ফলপাকুড়—উৎপন্ন করে, তৎসমুদয় আমাদিগের প্রয়োজনীয় হইলেও, কতকটা ভোজনের উপাদেয়তা-সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ধান্য, গোধূম, মাড়ুয়া, মকাই প্রভৃতি প্রধান আহার্য্য ফসল সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। ধান্য গোধূমাদি অবশ্যই চাই। তবে যে যেরূপ অবস্থার লোক, তাহার জন্য সেইরূপ ফসল আছে। যাহা হউক, এগুলি সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, তার পরে তরিতরকারী বা ফল পাকুড়, এবং তাহারও পরে ফুল। তরিতরকারী না হইলে চলিতে পারে। অনেক দেশে গরীব দুঃখীরা অর্থাভাববশতঃ তরকারী খাইতে পায় না; আর যদি বা খায়, প্রায় তাহা স্বভাবজাত

শাক পাতা মূল কন্দ। আবার অনেক সময় অন্ন, রুটী, বা বিদগ্ধ মকাই, বা মাড়ুয়া-চূর্ণ কেবলমাত্র লবণ ও লঙ্কাসহযোগে উদরস্থ করিয়া থাকে। মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই যে, ঔদ্যানিক ফসল অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য; সুতরাং সে সকল সামগ্রী তুলনায় কিছু মহার্ঘ, এবং উৎপন্ন করিতেও ব্যয় কিছু অধিক হয়, কিছু অধিক পরিশ্রমও করিতে হয়। এই সকল ও তদানুষঙ্গিক আরও কতকগুলি কারণে ঔদ্যানিক ফসল যাহাতে উৎকৃষ্ট হয়, সেই বিষয়েই উদ্যানপালের লক্ষ্য থাকে, খরচের দিকে তত থাকে না। উদ্যানপাল যত উৎকৃষ্ট প্রণালীতে আবাদ করে, কৃষক তাহা করে না। এই জন্য কৃষকগণকে forcing বা retardingএর ধার ধারিতে হয় না।

উদ্যানপালকে উদ্ভিদের সহিত প্রকৃত পক্ষে লড়াই করিতে হয়, এবং সে যুদ্ধে উদ্যানপালকে জিতিতেই হইবে। Forcing ও Retarding সেই যুদ্ধের একটি বিশেষ উপকরণ। উদ্ভিদের বৃদ্ধি, ফলশীলতা প্রভৃতি অনেকগুলি কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য উদ্ভিদের উপর কখনও জুলুম করিতে হয়; আবার কখনও দাবাইয়া দিতে হয়। গাছে সার প্রদান করা, গাছ ছাঁটিয়া দেওয়া, জুলুম ক্রিয়ার অন্তর্গত। আবার কখনও বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য গাছের বৃদ্ধি রুদ্ধ করিতে হয়, ফলনকালের 'আগুপিছু' করিবার জন্য গাছের স্বাভাবিকগতিকে অল্পাধিক কালের জন্য স্থগিত করিতে হয়। এ সকলকে স্থগিতক্রিয়া বা retardation বলা যায়।

প্রকৃতির মধ্যে স্বভাবতঃ যাহা প্রসারিত আছে, তদ্দ্বারাই উদ্ভিদ জীবিত থাকিতে পারে। ভূগর্ভে উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী প্রচুর পদার্থ বিদ্যমান,পানের জন্য রসও বর্ত্তমান, শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য আকাশভরা বাষ্পীয় পদার্থও ভাসমান। মাটীতে বীজ পড়িবার পর কোনরূপ প্রতিকূল অবস্থার বাধা না পাইলে মানুষের বিনা চেষ্টায় বা যত্নে উহা আপনিই উদ্ভিন্ন হইবে, এবং স্ব স্ব বংশগত পরমায়ু অনুসারে স্বল্পকাল বা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে, বর্দ্ধিত হইবে, ফলফুলও প্রদান করিবে। মাঠে বাটে অসংখ্য বৃক্ষলতা গুল্মাদি কত জন্মিতেছে, কত মরিতেছে, কে তাহার গণনা করে? স্বাভাবিকতার মধ্যে অনেক প্রতিকূল অবস্থা ও কারণ আছে; তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য, কিংবা পালকের মনোগত অভীষ্ট সুসিদ্ধ করিবার জন্য কখনও আমরা উদ্ভিদে জলসেচন করি, বা পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করি; কখনও বা নিজের মনোগত আকারে পরিণত করিবার জন্য উদ্ভিদকে ছাঁটিয়া দিই, শাখাপ্রশাখার সংখ্যার হ্রাস করিয়া দিই।

স্বভাবজাত উদ্ভিদগণ প্রকৃতির নিয়মাধীন থাকিয়া জীবিত থাকে; ফলমূলাদি প্রদান করে; কিন্তু তাহাদিগকে কৃত্রিম শক্তি প্রদান করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক-বৃদ্ধিশীল করিতে হইলে, কিংবা নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে ফলপুষ্পে সুশোভিত করিতে হইলে, আমরা উদ্ভিদে শক্তির প্রয়োগ করি। এই জন্য গাছে সার প্রদান করা সাধারণ নিয়ম। সার-প্রদানের ফলে উদ্ভিদ উত্তেজিত হয়, এবং সেই উত্তেজনাকে বর্জ্জন করিবার জনাই যেন নূতন নূতন শাখা প্রশাখার উদ্গম হয়। অধিক বা তেজস্কর সার হইলে সেই সকল শাখা প্রশাখার বৃদ্ধি ফলন-ফুলনে নিযুক্ত হয়—গাছে ফুল ফোটে, ফল হয়। অনতিকালমধ্যে ফলফুলের উৎপাদন করিতে হইলে উদ্ভিদের অবয়বকে সমধিক বর্দ্ধিত হইতে দিতে নাই; বরং তাহাতে সমধিক তেজস্কর সার দেওয়াই বিধি। স্থূলসার প্রদানে গাছের বৃদ্ধি তত ত্বরিত হয় না, সুতরাং ফলফুলও বিলম্বিত হয়। কিন্তু সেই সারে জল মিশ্রিত করিয়া তরল সারে পরিণত করিয়া উদ্ভিদের পাদদেশে প্রদান করিলে, উদ্ভিদের সমগ্র শক্তি উদ্দীপিত হইয়া উঠে, অথচ উদ্ভিদ বৃদ্ধি পাইবার অবসর না পাইয়া, সেই সমাবিষ্ট শক্তির প্রাবল্য হেতু পুষ্পোৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়। সচরাচর আমরা কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে গোলাপ গাছ ছাঁটিয়া দিই, তাহার গোড়ায় সার দিই, অন্যান্য পাট করি। এ স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বসন্ত কালই গোলাপের পুষ্পিত হইবার স্বাভাবিক সময়। কিন্তু আমরা তাহাদিগকে শীতকালেই পুষ্পিত হইবার জন্য বাধ্য করি। ইহাই হইল জুলুম। ঋতুজীবী উদ্ভিদগণ (annuals কয়েক মাসের মধ্যে উদ্ভিদলীলা সাঙ্গ করে। কিন্তু একাধিকবর্ষজীবী প্রায় সকল উদ্ভিদই বর্ষাকাল উত্তীর্ণ হইবার পর হইতে, শীত যত বেশী হইতে থাকে, ততই সঙ্কোচভাব ধারণ করে; তখন কিছু দিনের জন্য তাহাদের বৃদ্ধিও স্থগিত হয়, শরীরস্থ রস ঘন হয়, রসের সঞ্চালন-ক্রিয়া অত্যধিক ধীরতা প্রাপ্ত হয়। এ সময়ে গোলাপগাছে ফুল আসিতে পারে না। ক্রমে শীতাবসান হইলে গাছের অসাড়তা ভাঙ্গিয়া যায়, গাছ জাগিয়া উঠে, রস-প্রবাহ ত্বরিত ভাব ধারণ করে, রসও তরল হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ইহাই হইল গোলাপের ফুলের মরসুম। স্বাভাবিক মরসুমের অপেক্ষা না করিয়া কয়েক মাস পূর্ব্বেই আমরা কেন গোলাপ গাছে ফুল ফোটাই, তাহা এ স্থলে আমাদের আলোচ্য নহে। গোলাপদিগকে অসময়ে পুষ্পিত করিবার জন্য আমরা যে যে উপায় অবলম্বন করি, তৎসমুদায় উদ্দীপনার অঙ্গ। এই জন্য আমরা প্রত্যেক গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিই, অনেক শিকড় কাটিয়া দিই, অনেক শিকড় ছিঁড়িয়া যায়, ১০।১৫ বা ২০।২৫ দিন গাছের মূলদেশে রৌদ্র ও শিশির লাগিতে

দিই, এবং শাখা প্রশাখা কাটিয়া ছোট করিয়া দিই। এই সকল উপায়ে গাছের সাময়িক নির্জীবতা নষ্ট করি। ইতিপূর্ব্বে যে শক্তি সমগ্র গাছে প্রসারিত ছিল, যে শক্তি সমগ্র গাছটিকে নিয়মিত করিতেছিল, এক্ষণে সে শক্তি সংক্ষিপ্তাকার-প্রাপ্ত গাছে সম্যক্‌ভাবে নিয়োজিত হয়। ফলে উদ্ভিদ শীঘ্র তেজাল হইয়া উঠে, এবং নির্দ্দিষ্ট কালের বহুপূর্ব্বেই পুষ্পধারণ করে।

আর এক প্রকার বলপ্রয়োগের কথা বলি। অনেক পেঁয়াজ-মূলক উদ্ভিদ, রজনীগন্ধা, উদ্বাহ-কমল (Eucharis বা Bridal lily) প্রভৃতি উদ্ভিদকে ইচ্ছামত নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে পুষ্পিত করিবার জন্য গাছগুলিকে মৃত্তিকা হইতে উৎপাটিত ও মূলগুলিকে ছেদন করিবার পর মৃন্ময় আধারে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিয়া, গরম যায়গায় বা কাচ-নির্ম্মিত বাক্সে (Wardian case) বা কাচের ঘরে রাখিয়া দিলে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি বা পুষ্পিত হইবার কাল পিছাইয়া দিবার জন্য উদ্যানপালকে কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধিহীনতা যেরূপ অবাঞ্ছনীয়, অতিবৃদ্ধিও সেইরূপ। যে সকল গাছ অতিশয় 'বাড়ন্ত' বা বৃদ্ধিশীল, তাহাদিগকে 'ষাঁড়া' গাছ কহে। ষাঁড়া গাছে প্রায় ফলফুল হয় না। লাউ কুমড়া গাছ অনেক সময় ষাঁড়াইয়া যায়; কদলীবৃক্ষ 'ফুলিয়া' যায়। এ সকল গাছে ফল হয় না। অবস্থাবিশেষে প্রায় সকল গাছেরই এ দশা ঘটিতে পারে। কোনও গাছে ষাঁড়াইবার উপক্রম দেখা গেলে, প্রতীকারার্থ তাহাকে হীনতেজ করিয়া দিতে হয়। অনেক ফলকর বৃক্ষের ফল গাছে থাকিতেই আপনা হইতে ফাটিয়া যায়। কয়েকজাতীয় গোলাপ গাছ স্বভাবতঃ পুষ্প প্রদান করিতে নারাজ, অথচ গাছগুলি খুব শাখা-প্রশাখাসম্পন্ন বিশাল ঝাড়াল হইয়া থাকে। ইহাদিগকে তেজোহীন করিয়া দিতে হয়। ইহাকে 'দাবাইয়া দেওয়া' কহে। দাবাইয়া দিতে হইলে কোনও স্থলে গাছের শিকড় অল্পাধিক কমাইয়া বা ছাঁটিয়া দিতে হয়। কোনও কোনও গাছের শাখা-সংখ্যার হ্রাস করিয়া দিতে হয়। শাখা ও কাণ্ডের কোনও কোনও স্থানে কাটারি বা কুঠার দ্বারা কোপ দিলে কতক রস নির্গত হইয়া যায়। ফলে গাছ কিছু তেজমরা হইয়া যায়। এই উপায়ে অনেক গাছ সুধরাইয়া গিয়াছে। গাছে ফুল বা ফল আসিবার পূর্ব্বে গাছকে ছায়ায় রাখিলে, ফল ফুল হওয়া স্থগিত হয়। গামলায় পালিত উদ্ভিদগণকে এই সকল উপায়ে সুবিধামত নিয়ন্ত্রিত করা যায়। আবার যদি উদ্ভিদের জন্য উদ্যানে উদ্ভিদশালা বা (conservatory) থাকে, তাহা হইলে,

এ সকল কাজে বড় সাফল্যলাভ করা যায়। সে সাফল্যে উত্তানপালের বড় আনন্দ! কোনও উদ্ভিদে হয় ত ফাল্গুন মাসে ফুলের সমাগম হয়। পালক ইচ্ছা করিলে তাহাকে মাঘ মাসে কিংবা চৈত্র মাসে ফুটাইতে পারেন। ইহার জন্য গরম ও ঠাণ্ডা, উভয়বিধ ঘর থাকা আবশ্যক। সে সকল ঘরে বায়ুমণ্ডলকে কৃত্রিম উপায়ে গরম বা ঠাণ্ডা করিতে পারা যায়। কখনও উত্তাপ, কখনও বা শৈত্য বাড়াইতে বা কমাইতে পারা যায়। পুষ্পিত হইবার কালকে অগ্রে অর্থাৎ ফাল্গুনের স্থলে মাঘে আনিতে হইলে, গরম গৃহে রাখিয়া ক্রমে গৃহের উত্তাপ বর্দ্ধিত করিতে হয়। কিন্তু পুষ্পিত হইবার দিনকে পিছাইয়া দিতে হইলে, অর্থাৎ ফাল্গুনের স্থলে চৈত্র বা বৈশাখে আনিতে হইলে, পুষ্পোন্মুখ গাছকে ঠাণ্ডা গৃহে রাখিতে হয়; প্রয়োজন বোধ করিলে গৃহাভ্যন্তরের শৈত্যও বর্দ্ধিত করিতে হয়।

মানুষ মনে করিলে গাছে অধিক বা অল্প ফুল ফল আনিতে পারে; ইচ্ছা করিলে বড় বা ছোট ফুল ফলও উৎপন্ন করিতে পারে। ইহাকে গাছে মানুষে খেলা ভিন্ন আর কি বলিব?

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন।

। প্রশস্তি-পাঠ। ।

শ্রীপরাক্রমমৃলস্য।

নি

১। ওঁ * স্বস্তি॥

বভূব রাঢ়াধিপ-লব্ধজন্মা

তি [শ্যাংশু-চণ্ডো নৃপবংশ-]

২। কেতুঃ।

শ্রীধূর্ত্তঘোষো নিশিতাসিধারা-

নির্ব্বা [পিতারিব্রজ-গর্ব্ব-]

*৩। লেশঃ॥ (১)

---

* ওঁকার-বিজ্ঞাপক চিহ্নমাত্রই উৎকীর্ণ আছে।

(১—৪) ইন্দ্রবজ্রা। দ্বিতীয় শ্লোকের শেষে "পৃথিব্যাম্" স্থলে "পৃথিব্যাঃ" উৎকীর্ণ আছে। "জাত" শব্দটি সপ্তম্যর্থে সংযুক্ত হইয়াছে।

মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন [সম্মুখের পৃষ্ঠা

Mohila Press, Cal
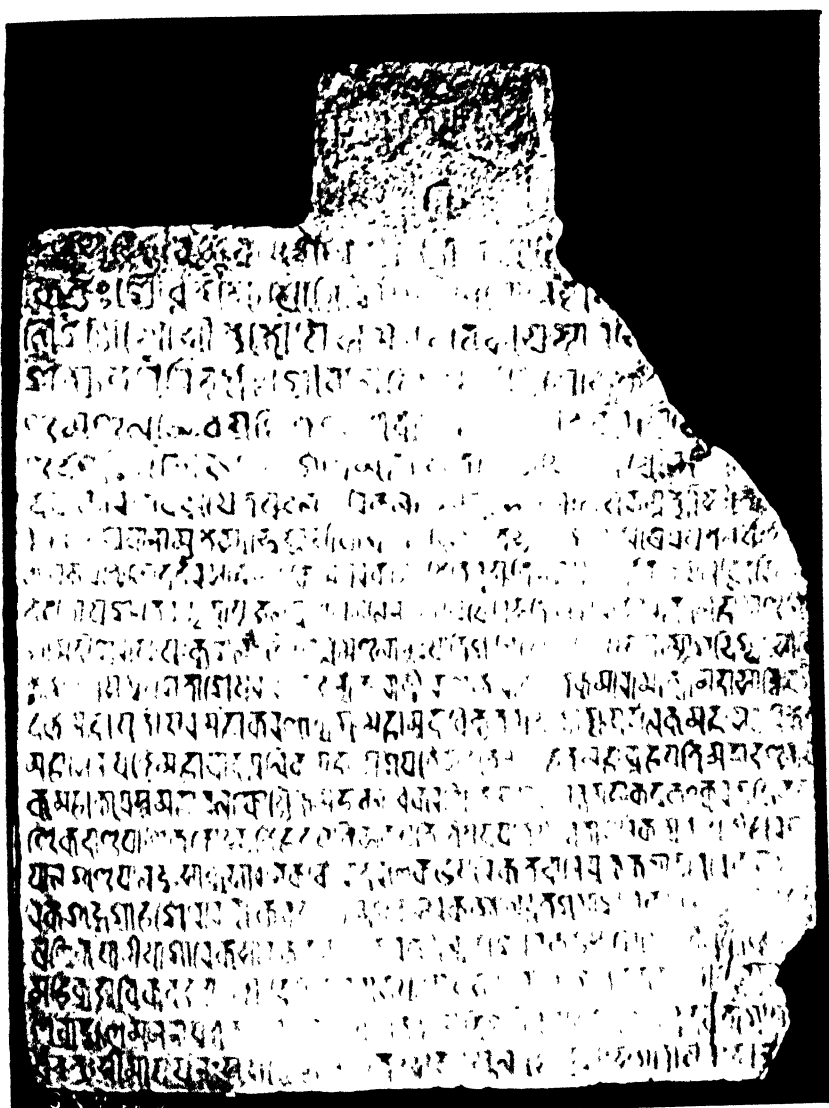
আসীত্ততোপি সমর-ব্যবসায়সার-
বি [স্ফূর্জ্জিতাসি-কুলি-]

৪। শ-ক্ষত-বৈরিবর্গঃ।
শ্রীবালঘোষ ইতি ঘোষ-কু [লাম্ভজাত-
মার্ত্ত-]

৫। গু-মণ্ডলমিব প্রথিতঃ পৃথিব্যাং ॥ (২)
তস্যাভবদ্ধবলঘোষ [ইতি প্রচ-]

৬। ণ্ড-
দণ্ডঃ সুতো জগতি গীত-মহাপ্রতাপঃ।
যেনেহ যোধ-তি [মিরৈক-]

৭। দিবাকরেণ
বজ্রায়িতং প্রবল-বৈরি কুলাচলেষু ॥ (৩)
ভবানীবাপরা মূর্ত্ত্যা সীতে [ব চ পতি-]

৮। ব্রতা।
সদ্ভাবা নাম তস্যাভূদ্ ভার্য্যা পদ্মেব শার্ঙ্গিণঃ ॥ (৪)
তস্যা ঈশ্বরঘোষ এষ তনয়ঃ [সপ্তাংশু-]

৯। ধামা জয়-
ত্যোকো দুর্দ্ধর-সাহসঃ কিমপরং কান্ত্যা জিতেন্দ্রদ্যুতিঃ।
যস্য প্রোর্জ্জিত-শৌর্য্যনির্জ্জিত-রিপোঃ [প্রৌ-]

১০। ঢ়-প্রতাপশ্রুতে-
রাস্য বাষ্পজল-প্রণালমলিনং শত্রুস্ত্রিয়ো বিভ্রতি ॥ (৫)
স খলু ঢেক্করীতঃ। মহামাণ্ডলিকঃ

(৩) বসন্ততিলক। বাচস্পতি "দণ্ড"কে "চণ্ড" বলিয়া এবং "যোধ"কে "যৌধ" বলিয়া পাঠ করিয়া গিয়াছেন।

(৪) অনুষ্টুভ।

(৫) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

১১। শ্রীমদীশ্বরঘোষঃ কুশলী (৬) পিপোল্ল-মণ্ডলান্তঃপাতি- (৭) গাল্লিটিপ্যাক-
বিষয়-সম্ভোগ-দিগ্ঘা সোদি-

১২। কা গ্রামে সমুপগতাশেষ-রাজ। রাজণ্যক। রাজ্ঞী। রাণক।
রাজপুত্র-কুমারামাত্য। মহাসান্ধিবিগ্র-

১৩। হিক মহাপ্রতীহার-মহাকরণাধ্যক্ষ-মহামুদ্রাধিকৃত-
মহা আক্ষপটলিক- (৮)-মহাসর্ব্বাধিকৃত-

১৪। মহাসেনাপতি-মহাপাদমূলিক-মহাভোগপতি-
মহাতন্ত্রাধিকৃত-মহাব্যূহপতি-মহাদণ্ডনায়-

১৫। ক মহাকায়স্থ-মহাবলাকোষ্ঠিক (৯)-মহাবলাধিকরণিক-
মহাসামন্ত-মহাঠক্কুর- (১০)-অঙ্গিকর-

১৬। ণিক-দাণ্ডপাণিক- (১১)-কোট্টপতি হট্টপতি-
ভুক্তিপতি-বিষয়পতি-ঐন্ধিতাসনিক- (১২)-অন্তঃ-
প্রতীহার-দ [ণ্ড]

১৭। পাল-খণ্ডপাল-দুঃসাধ্যসাধনিক-চৌরোদ্ধরণিক-
উপরিক-তদানিযুক্তক-আভ্যন্তরিক-বাসাগা- (১৩)

১৮। রিক-খড়গগ্রাহ-শিরোরক্ষিক-বৃদ্ধধানুষ্ক-একসরক-
খোলদূত-গমাগমিক-লেখ ০০০০০০ (১৪)

---

(৬) ২১ পংক্তিতে [মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি] ক্রিয়াপদ উল্লিখিত আছে।

(৭) মণ্ডলের নাম বাচ্চা বা কর্তৃক উদ্ধৃত হইবার সময়ে পকার যকার রূপে, এবং "সোদিকা" শব্দ "সাচিকা" রূপে পঠিত হইয়াছিল।

(৮) 'মহাক্ষপটলিক' পাঠ করিতে হইবে।

(৯) এরূপ রাজপাদোপজীবীর নাম পালরাজগণের তাম্রশাসনে অপরিচিত।

(১০) বাচ্চা বা ঠকার পাঠ করিতে পারেন নাই।

(১১) "দাণ্ডপাশিক" শব্দের স্থলে "দাণ্ডপাণিক" আছে।

(১২) বাচ্চা বা "ঔদ্ধিতাসনিক" পাঠ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। ৩০ পংক্তিতে দুইবার ঔকার যে ভাবে উৎকীর্ণ আছে, তাহার সহিত এই শব্দের ঔকারের আকৃতিগত পার্থক্য আছে।

(১৩) "বাসাগারিক শব্দ" পালরাজগণের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় না।

(১৪) এই স্থানের কয়েকটি অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

১৯। বণিক-পানীয়াগারিক-শান্তকিকর্ম্মকর-গৌল্মিক-
গৌল্মিক-
হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবলব্যাপৃতক-গো-

২০। মহিষ্যজাবিকবড়বাধ্যক্ষাদি-সকলরাজপাদোপজীবি-
নোঽন্যাংশ্চ চাটভটজাতীয়ান্ স [কর-]

২১। ণ-ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকং (১৫) মানয়তি বোধয়তি
সমাদিশতি চ
বিদিতমস্তু ভবতাং গ্রামো-

২২। য়ং চতুঃসীমাপর্য্যন্তঃ স্বসম্ভোগসমেতঃ সজলস্থলঃ
সোদ্দেশঃ সগর্ত্তোষরঃ সাম্র [মধু-]

২৩। কঃ সগোকুলঃ স [শাদ্ব] ল·

২৪। বিটপলতান্বিতঃ সহট্ট-প-

২৫। ট্টঃ

২৬। সমস্তক্ষিতি-

২৭। ঃ পরিহৃতসর্ব্বপীড়ঃ আচটভটপ্রবেশঃ
অকিঞ্চিৎকরপ্রগ্রা-

২৮। [হ্য আচন্দ্রার্কতারকক্ষিতি-সমকালং যাবৎ।
······বিন (নি) র্গতায়

২৯। ভট্ট। শ্রীবাসুদেবপুত্রায় ভট্টশ্রীনিব্বোকশর্ম্মণে
ভার্গবসগোত্রায়

৩০। য-] মদগ্নি ঔর্ব্ব্য-আপ্নুবান্-প্রবরায় আপ্নুবান্-
ঔর্ব্ব্য-যামদগ্ন-চ্যবন-ভা-······

(১৫) বাচ্চা বা "সচরণ-ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকং" পাঠ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। ২০ পংক্তিতে স অক্ষরের পর ক-অক্ষরের ছিন্নাংশমাত্র বর্ত্তমান আছে; ২১ পংক্তির প্রথমেই মূর্দ্ধণ্য ণকার; ব্রাহ্মণ-শব্দের সহিত সমাস-নিবদ্ধ এই শব্দটি "সকরণ" বলিয়াই প্রতিভাত হয়। ধর্ম্মপালের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে "ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বক" আছে; পরবর্ত্তী পাল-নরপালগণের শাসনে তাহা নাই। "সকরণব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকং" পাঠ যুক্তিযুক্ত হইলে, ঈশ্বর ঘোষ জাতিতে "করণ" ছিলেন বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

৩১। যজুর্ব্বেদা আধ্যায়িনে (১৬) মার্গসংক্রান্তৌ
জটোদায়াং (জটোদয়ায়াং ?) স্নাত্বা তিলদর্ভপবিত্র-

৩২। পূর্ব্বকং ভগবন্তং শঙ্করভট্টারকমুদ্দিশ্য
মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে

৩৩। [তাম্র-] শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। অতঃ প্রতিপালনে
মহাফলদর্শনাৎ অপহরণে ম-

৩৪। [হা-নর] কপতন-ভয়াৎ সর্ব্বৈরেব দানমিদমনুমন্তব্যং
প্রতিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরৈশ্চাজ্ঞাশ্রবণবিধে-

৩৫। [য়ৈ] ভূয় যথাদীয়মান-করাদি-সমস্ত-প্রত্যায়োপনয়ঃ
কার্য্য ইতি।

ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুসং (শং) সি-

৩৬। নঃ শ্লোকাঃ।

বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।

যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা

৩৭। ফলং [॥]

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।

উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥

৩৮। সর্ব্বেষামেব দানানাং একজন্মানুগং ফলং [।]
হাটক-ক্ষিতি-গৌরীণাং সপ্তজন্মানুগং ফলং ॥
ষষ্টিং (১৭)-

৩৯। বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ [।]
আক্ষেপ্তা চানুমন্তাচ তান্যেব নরকং বসেৎ [॥]
গা-

৪০। মেকাং স্বুবর্ণমেকং ভূমেরপ্যেকমঙ্গলং [।]

---

(১৬) "যজুর্ব্বেদাধ্যায়িনে" পাঠ করিতে হইবে।

(১৭) এই একটিমাত্র স্থলে অনুস্বার-চিহ্ন প্রচলিত বাঙ্গালা চিহ্নের ন্যায় উৎকীর্ণ রহিয়াছে অন্যান্য স্থলে মাত্রার উপরে বিন্দু খোদিত আছে।
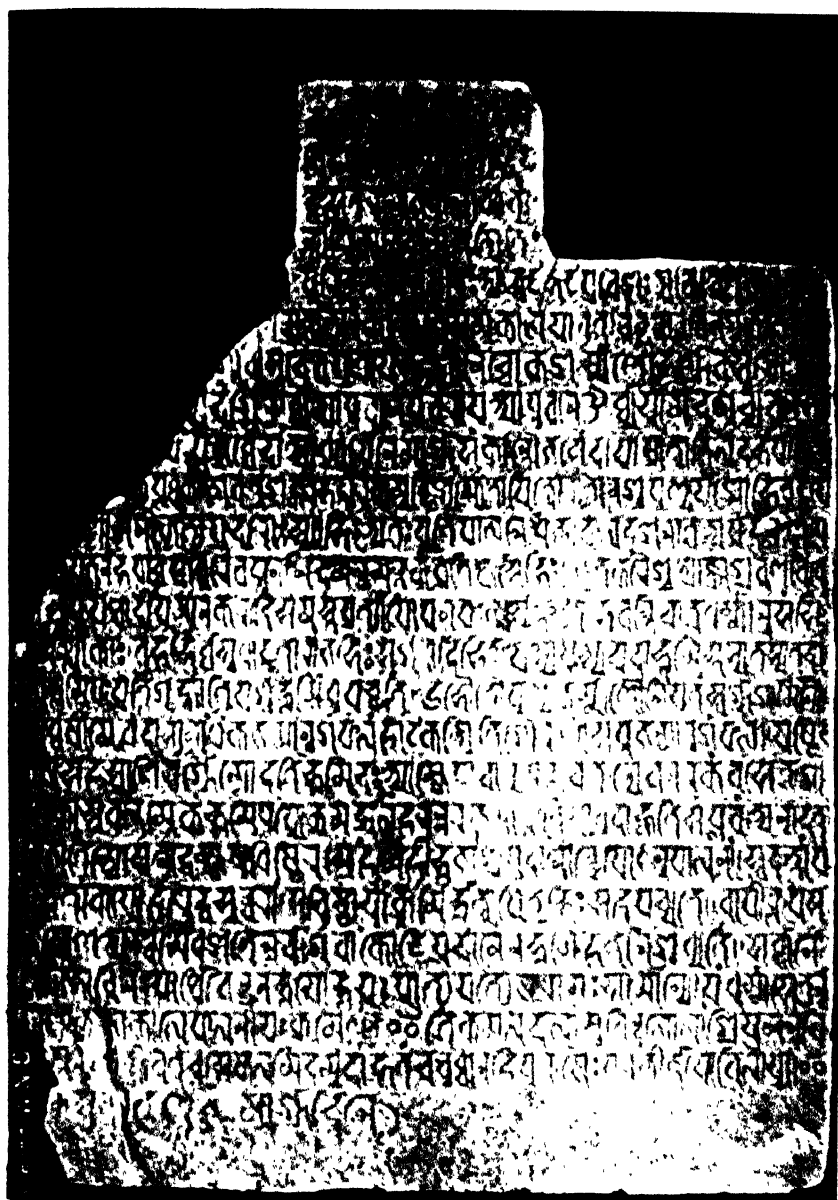
মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন, পশ্চাতের পৃষ্ঠা।

Mohila Press, Cal.

হরন্নরক মায়াতি যাবদাহূতি-সংপ্লবং [॥] (১৮)

অন্যদত্তাং

৪১। দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির।

মহামহীভুজাং শ্রেষ্ঠ দা চ্ছ্রেয়োঽনুপালনং ॥

স্বদত্তাং প-

৪২। রদত্তাং বা যো হরে বসুন্ধরাং (১৯)।

স বিষ্ঠায়াং কৃমি র্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥

বাপীকূপ-স

৪৩। হস্রেণ অশ্বমেধ-শতেন চ।

গবাং কোটিপ্রদানেন ভূমিহর্ত্তা ন শুধ্যতি ॥

সর্ব্বানে-

৪৪। তান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্র (ন্দ্রা) ন্।

ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থয়ত্যেষ রামঃ [।]

সামান্যোয়ং ধর্ম্মসেতু র্নৃ-

৪৫। পানাং

কালে কালে পালনীয়ঃ ক্রমেণ ॥

ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং

শ্রিয় মনুচি-

৪৬। [ন্ত্য ম] নুধা-জীবিতঞ্চ।

সকলমিদ মুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা

ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যা ॥

ই-

৪৮। [তি] সম্বৎ ৩৫ মার্গ দিনে [১]

(১৮) এই শ্লোক ধর্ম্মপালের এবং দেবপালের তাম্রশাসনে উদ্ধৃত হয় নাই। প্রথম মহীপালদেবের [বাণগড়ে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় : তাহাতে "ধর্ম্মসেতুক" এবং "সুমেরুপার্শ্বমতুলং" পাঠ উদ্ধৃত আছে।

(১৯) "যো হরেত বসুন্ধরাং" এই পাঠ পরিত্যক্ত হওয়ায়, ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়াছে। ইহা লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই বোধ হয়।

[বঙ্গানুবাদ]

(১)

রাঢ়াদেশের অধিপতির পুত্র নৃপবংশকেতু ধূর্ত্ত ঘোষ [তিগ্মাংশুচণ্ডঃ]। সূর্য্যের ন্যায় প্রচণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন ; তাঁহার শাণিত অসিধারায় অরিকুলের গর্ব্বলেশ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল।

(২)

তাঁহা হইতে শ্রীবালঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সমরব্যবসায়-সার-বিস্ফূর্জ্জিত তরবারিরূপ বজ্রের আঘাতে বৈরিবর্গ ক্ষতবিক্ষত হইত। তিনি ঘোষ-কুল-কমল-সমূহের পক্ষে আনন্দদায়ক মার্ত্তণ্ডমণ্ডল বলিয়া পৃথিবীতে প্রথিত হইয়াছিলেন।

(৩)

তাঁহার ধবলঘোষ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রচণ্ডদণ্ড ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতাপ পৃথিবীতে গীত হইয়াছিল। তিনি [শত্রু] সেনা-তিমির বিনাশী দিবাকরতুল্য ছিলেন ; বৈরিকুল পর্ব্বতের পক্ষে বজ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেন।

(৪)

ভবানীর অপর মূর্ত্তির ন্যায়, সীতার ন্যায় পতিব্রতা, এবং (শার্ঙ্গীর) বিষ্ণু দয়িতা লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার সদ্ভাবা নাম্নী ভার্য্যা ছিলেন।

(৫)

সেই ভার্য্যার গর্ভে এই পুত্র ঈশ্বরঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সূর্য্যের ন্যায় বীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত সাহস ছিল, অধিক কি বলিব, কান্তিপ্রভায় তিনি ইন্দ্রের কান্তিচ্ছটাকে পরাকৃত করিয়াছিলেন। সেই শৌর্য্যনির্জ্জিতরিপু সুবিখ্যাত প্রতাপশালী বীরবরের প্রতাপে শত্রুরমণীগণ বাষ্পজলমলিন বদনমণ্ডল ধারণ করিতেন।

[অন্যাংশ সরল বলিয়া অনূদিত হইল না।]

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। বৈশাখ।—শ্রীঅজিতকুমার হালদারের 'কল্যাণী' নামক পটের প্রতিপাদ্য কি, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারিলাম না। চিত্রিতা নারীর এক হস্তে কমল বা কুমুদ, আর এক হস্ত বীণায় নিবিষ্ট। কমলে কি কল্যাণ সূচিত হইতেছে? 'ভারতীয় চিত্রকলা'র বহু মুদ্রাদোষে পটখানি ধন্য হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে অন্য কোনও বিশেষত্ব নাই। অবনীন্দ্রনাথের পাঠশালে যাঁহাদের হাতে খড়ি হয় নাই, তাঁহারা 'কল্যাণী'র বর্ণলেপে কোনও সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করিতে পারিবেন না। 'নব বর্ষ' নামক পদ্যে কবি লিখিয়াছেন,—

> 'বিদায়-আসরে ওই থেমে গেল গাজনের ঢাক,
> সন্ন্যাসীর উন্মাদ চীৎকার।'

এটুক অত্যন্ত মিষ্ট, সে বিষয়ে মতভেদ হইবার কারণ নাই। কেন না, 'ঢাকের বাদ্যি' থামিলেই মিষ্ট লাগে। 'উন্মাদ-চীৎকারে'র অবসানও সর্ব্বথা প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের অরাজক সাহিত্যে এক উন্মাদ-চীৎকার শব্দ-ব্রহ্মে বিলীন হইবার পূর্ব্বেই নূতন চীৎকারের উদ্ভব হয়। সুতরাং বধির না হইলে আর নিস্তার নাই।

কবিতা—নববর্ষের কবিতাও আবশ্যকমত লেখা যায় না। বিধাতা সকলকে কবিতা লিখিবার শক্তি দিয়াও দুনিয়ায় পাঠান না। বিধাতা শক্তি না দিন, দুরাকাঙ্ক্ষাটুকু মুক্তহস্তে দান করিয়া থাকেন। তাহার ফলে অনেকেই প্রাংশু-লভ্য ফলের লোভে উদ্বাহু বামনের দশা লাভ করেন। কিন্তু 'গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্'—এ চিন্তা কখনও তাঁহাদের মনে উদিত হয় না! কালিদাসের হইয়াছিল বটে; কিন্তু এই শ্রেণীর কবি-যশঃপ্রার্থীরা কালিদাস-বিজয়ী! শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ধ্রুবতারা' সুখপাঠ্য আখ্যায়িকা। উর্দ্দু শব্দগুলির টীকা দিলে বর্ণনার সৌন্দর্য্য সাধারণের উপভোগ্য হইত! শ্রীসুরেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাপানে নববর্ষ' উল্লেখযোগ্য। লেখক ভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বর্ণনীয় বস্তু কৌতূহলের সৃষ্টি করে। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ নাগের 'চা-প্রসঙ্গ' নানা তথ্যে পূর্ণ। উপসংহারে লেখক লিখিয়াছেন,—

'আসাম ও বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এখনও চা-র উপযোগী জমী রহিয়াছে। ধনশালী ব্যক্তিগণের উচিত সেই সমস্ত স্থানে চা বাগান খুলিয়া ধনাগমের উপায় করা। বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জলপাইগুড়ীই চা-আবাদের উপযুক্ত স্থান; কিন্তু জলপাইগুড়ীর জমী প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। আসামে কিন্তু এখনও লক্ষ লক্ষ একর জমী পড়িয়া রহিয়াছে। অর্থের অভাবে সে স্থানের অধিবাসিগণ কাজ করিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গালীগণ কোম্পানী করিয়া আসামবাসীদের সঙ্গে কার্য্য করিলে ভাল হয়।'

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী 'দুপুরে ও নিশীথে' বৈরাগ্যের—দেহতত্ত্বের—'ও পারে'র গান ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 'তাঁহার' সন্ধানে মানসীকে নিযুক্ত করিবার পর, বাঙ্গালা সাহিত্যের কবিতাকুঞ্জে—টপ্পার আসরে বৈরাগ্যের সুর জমিয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের মানসীর ব্রজ-লাভের বয়স হইয়াছে। নবীন কবিরাও যদি সঙ্গে সঙ্গে গেরুয়ার আলখেল্লা পরিয়া বাউলের সুরে

দেহ-তত্ত্বের গান ধরেন, তাহা হইলে আমাদিগকেও সুরদাসের ভাষায় বলিতে হয়,—'দেখো এক বালা যোগী' ইত্যাদি! টপ্পায়, খেয়ালে, ধ্রুপদে, মেঠো সুরে, সঙ্কীর্ত্তনে 'তাঁহাকে' পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালার কবিতা কি 'যৌবনে যোগিনী' সাজিবে? এই যে নব-নারীকুঞ্জর দেখিতেছিলাম! নিমেষ না পড়িতে এ কি পরিবর্ত্তন! এই অকালপক্কের দেশে কবির অনুভূতিও কি শুকদেব গোস্বামীর মত ভূমিষ্ঠ হইয়াই তপোবনে—ওঁ বিষ্ণু—' 'মারো' যাত্রা করিবে? মুণ্ড-মস্তক অক্লান্ত করিবে? কবিদের কণ্ঠে কণ্ঠে কেবল নাগত্রক গর্জ্জিতে থাকিবে? জটাজুট-শালিনী, রুদ্রাক্ষমালিনী, গেরুয়া-ধারিণী, তরুণী কবিতার কচিমুখে করুণ সুরে 'শেষের সে দিন' শুনিলে সহজ মানুষের ধমনী স্তব্ধ হইয়া যায়, গলায় ঘড়্ ঘড়্ শব্দ উপস্থিত হয়, আশা করি, নবীন কবিরাও তাহা অস্বীকার করিবেন না। অতএব, ভোঃ ভোঃ কিশোর কবিগণ! ফ্যাশনের অনুবর্ত্তী হইয়া অকালে 'ও পারে' পাড়ী জমাইবার চেষ্টা করিও না। তাহা এক দিকে যেমন হাস্যরসের উদ্দীপক, অন্য দিকে তেমনই সাংঘাতিক।—এই নবজাগরণের যুগে গতানুগতিক হইয়া বেঘো নায়কের বীণাতন্ত্রীর ঝঙ্কারের অনুকরণে সফল হইলেও, কোনও লাভ নাই। যদি কিছু বলিবার থাকে, নিজস্ব থাকে, বলিয়া যাও। জীবনের সন্ধ্যায় পূরবী-ইমন ভাঁজিও, এখন—অরুণরঞ্জিত প্রভাতে ললিত ভৈরবী আলাপ কর; তাহাই স্বাভাবিক। শ্রীপঞ্চানন নিয়োগীর 'বৈজ্ঞানিক-জীবনী (৭)—সুশ্রুত' নামক নিবন্ধে নানা তথ্যের সমাবেশ আছে। বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার 'জর্ণ্যাল্ অব্ মেডিসিনে' সুশ্রুতের ও তাঁহার শস্ত্রোপচারপদ্ধতির পরিচয় দিয়াছিলেন। সে পরিচয়ে ইউরোপ স্তম্ভিত হইয়াছিল। সম্প্রতি দত্তাদের ঠাকুর, প্রত্নতত্ত্ববিৎ হরণলী প্রভৃতিও ভারতের প্রাচীন বৈদ্যক-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। নিয়োগী মহাশয় সংক্ষেপে সুশ্রুতের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছেন; প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রতীচ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে বৃৎপন্ন সুধীগণের মন্তব্য উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধটি আরও উৎকর্ষ লাভ করিত। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' মামুলী 'সেণ্টিমেণ্টে' পূর্ণ বাস্তুভিটায় এত আবর্জ্জনা দেখিলে দুঃখ হয় না? আগে ঠাকুরমা ও দিদিমারা গল্প শেষ করিয়া বলিতেন,—'আমার কথাটি ফুরুলো, নটে গাছটি মুড়ুলো' ইত্যাদি। এখনকার অধিকাংশ গল্পে অবশ্য 'কথা'ও থাকে না, যদি বা কচিৎ এক বিন্দু থাকে, সে কথা কিছুতেই শেষ হইতে চায় না। অগত্যা বাঙ্গালার স্বনামসিদ্ধ গোপালী ও যেমিনীরা হয় কাহারও ঘাড় ভাঙ্গিয়া গল্প শেষ করেন, নয় কোনও নিপুণ লেখকের ব্যর্থ অনুকরণে ভিখারীর অবতারণা করিয়া তাহার মুখে কোনও পুরাতন গানের একটি কলি তুলিয়া দিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া দেন। নিতান্ত পক্ষে নিকটবর্ত্তী বনে একটা শেয়াল 'হুক্কা-হুয়া-হুয়া' রবে ডাকিতে থাকে,—কিংবা সন্নিহিত কোনও গাছের ডালে পাখী ডাকিয়া উঠে। অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির চীৎকারে, না কূজনে চরিতার্থ হইয়া নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করে। আবার গাছের ডালের ও পাখীর নামের নির্ব্বাচনেও কবিত্ব থাকে। গাছটি যদি শিরীষ, চাঁপা, বা কদম হয়, তাহা হইলে তাহার ডালে দাঁড়াইয়ে, বা কাঠঠোকরা 'বিরাজ' করে আর যদি বৌ-কথা-কও, পাপিয়া, বা ঐরূপ কোনও সৌখীন পাখীকে ডাকাইতে হয়, তাহা হইলে, বাঙ্গালার গল্প-কল্পদ্রুম সজিনা, শ্যাওড়া, বা আমড়ার রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ, উৎকট শাখায় নিকৃষ্ট পাখী,—এক 'ঠিক তাহার উল্টো'। সৌরীন্দ্রমোহনের গল্পেও 'সজিনা গাছের ডাল

হইতে একটা পাখী লুকাইয়া গাহিয়া' উঠিয়াছে—'চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল!" বিস্ময়ের চিহ্নটি আমাদের নহে, লেখক কর্ত্তৃক বিন্যস্ত! গল্পে যে দৃশ্য দেখিয়া লেখকের চোখ টন্ টন্ করিতেছে, মজিয়া গাছে বসিয়া পাপিয়া বেচারাও অগত্যা তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে, 'চোখ গেল!' আশ্চর্য্য নহে কি? কোনও কোনও গল্পে কোনও কোনও সিদ্ধহস্ত লেখক বহিঃপ্রকৃতির চিত্রে ও অন্তঃপ্রকৃতির ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অপূর্ব্ব রসোদ্গারে সফল হইয়াছেন, তাহা সত্য। কিন্তু সকলেই যদি 'ঢেলে ধরিবার পূর্ব্বেই কেউটে ও গোখ্রো ধরিবার' চেষ্টা করে, তাহা হইলে, নবোদ্গত-পক্ষ কল্পনা-চটকীর সর্পাঘাত যে অনিবার্য্য হইয়া উঠে! কলা-কুশল নিপুণ কবির রচনায় যাহা সৌন্দর্য্য, তাহার অক্ষম অনুকরণ সর্ব্বত্র হাস্যরসের ও 'ন্যাকামী'র সৃষ্টি করে। নূতন লেখকেরা যদি নকল-নবীশীর ক্রীত-দাস না হইয়া, কল্পনাকে একটু সংযত করিয়া, সহজ-বুদ্ধিকে একটু লাগাম ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে, সুকুমার সাহিত্যে ন্যাকামীর এত বাহুল্য দেখিয়া ব্যথিত হইতে হয় না। শ্রীমতী সরলা দেবীর 'হিন্দোলা' পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। লাহোরের ও পঞ্চনদের সমাজের এক অংশের সুন্দর নক্স-চিত্র। শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষের 'সীতা ও সরমা' নামক চিত্রখানির অঙ্কন নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। চিত্রখানি ইতিপূর্ব্বে পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল!—একটা বরের পোষাকে অনেক বরের বিবাহ হইয়া যায়। স্ত্রী-সমাজেও গহনা চাহিয়া পরিবার প্রথা আছে মাসুকী পথের পথিক হইলে হানি কি?

প্রবাসী। বৈশাখ।—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'প্রিয়ের উদ্দেশে' নামক ছবিখানিতে নানা বর্ণের সমাবেশ আছে। বর্ণবিন্যাসের দ্যোতনা কি, তাহা আমরা 'গবেষণা' করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না। এই বর্ণ-বিভ্রাটের অন্তর্গত কোন বস্তু যে 'প্রিয়ের উদ্দেশে' কল্পিত, তাহাও সাধারণ অনুমানশক্তির বহির্ভূত! শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিনামূল্যে' নামক রূপকটি উপভোগ্য। প্রথম স্তবকটি না থাকিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। ছোটনাগপুরের 'ওঁরাও জাতি' উল্লেখযোগ্য। বৈশাখের 'প্রবাসী'র বিপুল কলেবর অনুবাদেই পূর্ণ হইয়াছে। 'বিজলী চমকে' নামক ছবিখানির ভাবাভিব্যঞ্জনা প্রশংসাযোগ্য। রাফেলের মাতৃমূর্ত্তির ছবি-খানি সুন্দর ছাপা হইয়াছে। এই চিত্রখানি ইতিপূর্ব্বে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত হইয়া-ছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইটি কাগজ, সুতরাং এক মুরগী দুইবার জবাই করিবার সুবিধা আছে।

অর্চ্চনা। বৈশাখ।—এই সংখ্যায় শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় 'ভারতে প্রথম রেলওয়ে প্রবন্ধের সূত্রপাত করিয়াছেন। আরম্ভ কৌতূহলোদ্দীপক। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থের 'শ্রুতির ইতিহাস' চলিতেছে। শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়ের 'মুঙ্গেরের রামলীলা'র উৎসবের চিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে। 'উপন্যাস-প্রসঙ্গে' বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-বিষয়ক অভিমতগুলি একত্র সংকলিত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র কোন অভিমত কোথায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নির্দ্দেশ না করি-বার কারণ কি? সম্পাদকের 'সৃষ্টি-বৈচিত্র্য' পড়িয়া আমরা এক সঙ্গে আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিয়াছি। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষালের 'বজ্রমন্দির' উল্লেখযোগ্য। সম্পাদকের 'যক্ষের ধন' নামক গল্পটি সুখপাঠ্য। 'অর্চ্চনা'র পূর্ব্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

বিজয়া। বৈশাখ।—শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাজ-শক্তি ও পাতিত্য' প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। বাঙ্গলা দেশে এ সকল কথা এমন করিয়া গুছাইয়া লিখিবার শক্তি দ্বিতীয় কাহারও নাই, তাহা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যায়। শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও থিয়েটারে' তথ্যের বাহুল্য নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কথা যতটুকু শুনি, যাহা শুনি, তাহাই মিষ্ট লাগে। বঙ্কিমচন্দ্র একটি অপেরা-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। সেই দল গঠিত হইতে না হইতেই 'জলবুদ্‌বুদের ন্যায় অকালে অনন্তগর্ভে মিলাইয়া গিয়াছিল' শুনিয়া, কমলাকান্তের এক টিপ্‌ নস্য চাহিবার কাহিনী মনে পড়ে! শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলালের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' গৃহস্থের উপাদেয় পথ্য। রামকৃষ্ণচরিত নানা ভাবে আলোচিত ও প্রচারিত হউক, দেশবাসী কল্যাণ লাভ করিবে। শ্রীনিবারণচন্দ্র দাসগুপ্তের প্রাচীন 'উড়িয়া পথিক'কে 'ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার লীলা' দেখিতে পাইবেন। শ্রীবিপিনচন্দ্র পালের 'চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন' ও 'সাহিত্যাচার্য্য পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস' উল্লেখযোগ্য।

সাগরিকা।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

কলিঙ্গ।

কলিঙ্গদেশ সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। তাহা অনির্ব্বচনীয় নৈসর্গিক শোভার আধার। বীচিবিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগর তাহার অতলস্পর্শ পরিখা;—বিন্ধ্য-মহেন্দ্র-কুলাচল-কলেবর তাহার দুরতিক্রম শৈলপ্রাকার;—কলিঙ্গের সশৈল-বনকাননা বসুন্ধরা যেন অসংখ্য দৃঢ় দুর্গে সুসজ্জিত।

যাহারা এক সময়ে এ দেশে নানা কীর্ত্তিকলাপের পরিচয়-প্রদানে মানব-সভ্যতার গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিল, তাহারা অতীতের ঘনান্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে;—কেহ স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত;—কাহারও স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত! তথাপি তাহাদের কীর্ত্তিকলাপের পরিচয়-গ্রহণের জন্য আধুনিক সভ্যসমাজে কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তজ্জন্য তথ্যানুসন্ধানেরও সূত্রপাত হইয়াছে। তাহার ফলে কালক্রমে ইতিহাস যথাযোগ্যভাবে সঙ্কলিত হইতে পারিবে।

তথ্যানুসন্ধানের সাহায্যে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখনও তাহা "পূর্ব্ববৃত্ত কথা"র কঙ্কালমাত্র,—প্রাণহীন, লাবণ্যহীন, হাবভাববিহীন, অযত্নবিক্ষিপ্ত অস্থিপঞ্জর! তাহাতে শৃঙ্খলার অভাব, পৌর্ব্বাপর্য্যের অভাব, অনেক প্রয়োজনীয় গ্রন্থির অভাব। তজ্জন্য তাহা বৈজ্ঞানিক-সমাজে সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হইলেও, জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তথ্যানুসন্ধানের জন্য যে যৎসামান্য আয়োজনের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাকে এখনও যথেষ্ট বলিয়া অভ্যর্থনা করা যায় না। বরং বর্ত্তমান অবস্থায়, প্রয়োজনের হিসাবে, তাহা উল্লেখ করিতেই সঙ্কুচিত হইতে হয়। সুতরাং জনসাধারণের পক্ষে এখনও আখ্যায়িকার যুগ চলিতেছে;—কল্পনা এখনও আখ্যায়িকাকে পুষ্টতর করিয়া তুলিতেছে;—জনশ্রুতি তাহাকে নানা কাহিনীর সহিত জড়িত করিয়া ফেলিতেছে; তীর্থমাহাত্ম্য তাহারই উপর আধ্যাত্মিকতার এক অলৌকিক মোহাবরণ বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে! জনসাধারণের বিশ্বাস,—কলিঙ্গ কলিঙ্গ। তাহার সহিত কখনও অন্য কোনও প্রদেশের কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল কি না,—এখন যাহা কলিঙ্গ নামে

কথিত, তাহা কখন অন্য কোনও নামে কথিত হইত কি না,—এখন যাহা অন্য নাম ধারণ করিয়াছে, তাহা কখনও কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল কি না,—এতকাল এ সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই; তাহার মীমাংসার জন্য তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজনও অনুভূত হইতে পারে নাই।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের নাম সকলের নিকটই সুপরিচিত। অঙ্গ বঙ্গের সঙ্গে কলিঙ্গের কখনও কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল কি না? থাকিলে, কলিঙ্গে অঙ্গ বঙ্গের কীর্ত্তিকলাপের পরিচয়-লাভের উপায় আছে কি না? এ সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কেহ কখনও বাঙ্গালার বাহিরে তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলে সমালোচকের নিকট উৎসাহের পরিবর্ত্তে উপহাস লাভ করিতে হয়,—কখনও কখনও বাঙ্গালীর প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্রেও এই আত্মচেষ্টার নবোন্মেষ অভিনন্দন লাভ না করিয়া, গঞ্জনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। অথচ কলিঙ্গের কথা কেবল কলিঙ্গের কথা নয়,—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের কথা,—একটি যুক্ত রাজ্যের শৌর্য্য-বীর্য্য-জ্ঞান-গাম্ভীর্য্যের কথা। তাহার সহিত "সাগরিকা"র সম্পর্ক আছে। সুতরাং তাহার আলোচনা অপরিহার্য্য।

কলিঙ্গ বহু পুরাতন মানব-নিবাস। আর্য্য-সমাজে অতি পুরাকাল হইতেই তাহার নাম সুপরিচিত ছিল। কিন্তু তাহা তৎকালে আর্য্যগণের পক্ষে অগম্য দেশ বলিয়া নিন্দিত হইত। সে কোন্ পুরাতন যুগের কথা, তাহার সন্ধানলাভের সম্ভাবনা নাই। বৌধায়ন-স্মৃতিতে [১।১।৩৩] তাহার একটি জনশ্রুতিমাত্রই উল্লিখিত আছে। যথা,—

> "পদ্ভ্যাং স কুরুতে পাপং যঃ কলিঙ্গান্ প্রপদ্যতে।
> ঋষয়ো নিষ্কৃতিং তস্য প্রাহুর্বৈশ্বানরং হবিঃ।"

তখন কলিঙ্গ-গমনে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইত। কেবল কলিঙ্গে কেন, [তখন ভারতবর্ষের অল্প স্থানই আর্য্যাধিকারভুক্ত ছিল,] অধিকাংশ স্থানে গমনাগমনের পক্ষেই আর্য্য-সমাজে এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বৌধায়ন স্মৃতিতে [১।১।৩২] তাহারও উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা;—

> "অবন্তয়োঽঙ্গমগধাঃ সুরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
> উপাবৃৎ সিন্ধুসৌবীরা এতে সঙ্কীর্ণযোনয়ঃ॥"
>
> "আরট্টান্ কারস্করান্ পুণ্ড্রান্ সৌবীরান্ বঙ্গকলিঙ্গান্ প্রানূনান্ ইতি
> চ গত্বা পুনঃস্তোমেন যজেত সর্ব্বপৃষ্ঠয়া বা॥"

এই প্রমাণে বুঝিতে পারা যায়,—এক সময়ে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের কোনও

স্থানেই আর্য্যগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। যখন এই সকল প্রদেশে আর্য্যগণের গমনাগমনের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল, তখনও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে হইত। তাহার পর, অঙ্গ বঙ্গের ন্যায় কলিঙ্গও আর্য্য-নিবাসযোগ্য তীর্থপূর্ণ পুণ্যভূমি বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছিল। যাহা নিন্দিত ছিল, বর্জ্জনীয় ছিল, তাহা অভিনন্দনীয় হইয়াছিল। তখন আর বাধা ছিল না; নিষেধ ছিল না, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল না। বরং আত্ম-শুদ্ধিকামী তীর্থগামী ব্যক্তির পক্ষে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের তীর্থগুলি দর্শন করিবারও উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। কোন্ যুগে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান-লাভের সম্ভাবনা নাই। মহাভারতের রচনাকালের পূর্ব্বেই যে এরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু আভাস "অর্জ্জুন-তীর্থযাত্রা"-প্রসঙ্গে মহাভারতে [আদি ; ২১৫।৪—৯] প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা;—

"অবতীর্য্য নরশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভারত।
প্রাচীং দিশমভিপ্রেপ্সুর্জগাম ভরতর্ষভ।
আনুপূর্ব্ব্যেণ তীর্থানি দৃষ্টবান্ কুরুসত্তমঃ।
নদীঞ্চোৎপলিনীং রম্যামরণ্যং নৈমিষং প্রতি।
নন্দামপরনন্দাঞ্চ কৌশিকীঞ্চ যশস্বিনীম্।
মহানদীং গয়াঞ্চৈব গঙ্গামপি চ ভারত।
এবং তীর্থানি সর্ব্বাণি পশ্যমানস্তথাশ্রমান্।
আত্মনঃ পাবনং কুর্ব্বন্ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ চ গাঃ।
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু যানি তীর্থানি কানিচিৎ
জগাম তানি সর্ব্বাণি পুণ্যান্যায়তনানি চ।"

সংস্কৃত-সাহিত্য-নিহিত এই দুইটি নিন্দা-প্রশংসাত্মক প্রমাণ ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়াই স্বীকৃত হইবার যোগ্য। ইহার মধ্যে আর্য্যাভিযানের বিলুপ্ত পুরাতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়,—অতি পুরা-কাল হইতে আর্য্যসমাজে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের নাম অপরিচিত না থাকিলেও, এই সকল স্থান প্রথমে আর্য্যনিবাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। তখন তাহা অনার্য্য-নিবাস বলিয়া পরিচিত ছিল, আর্য্যগণের পক্ষে অগম্য স্থান বলিয়াই নিন্দিত হইত। উত্তরকালে [অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে আর্য্যাধিকার বিস্তৃত হইবার পর] এই নিন্দা ধীরে ধীরে প্রশংসায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল,—এক যুগের ম্লেচ্ছভূমি আর এক যুগে যজ্ঞীয় ভূমি বলিয়া অভ্যর্থনা লাভ

করিয়াছিল। সেই সময় হইতে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে আর্য্যসভ্যতাও প্রবেশলাভ করিয়াছিল।

যাঁহারা কলিঙ্গ-ভূমিকে সভ্যতায় সমুন্নত করিয়াছিলেন, শিল্পে সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন, প্রাসাদে মন্দিরে সুসজ্জিত করিয়া নৈসর্গিক শোভা উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছিলেন, পুণ্যপ্রভাবে আর্য্যসমাজের অগম্য দেশকেও পবিত্র তীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবশ্যই কলিঙ্গের আদিম অধিবাসী ছিলেন না। তাঁহাদের বিজয়-প্রবাহ অঙ্গ বঙ্গের ভিতর দিয়াই কলিঙ্গাভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকিবে। উত্তরকালে মহাকবি কালিদাসের কল্পনা-প্রবাহ যে পথে দিগ্বিজয়ী রঘুবীরকে কলিঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, তাহাই হয় ত প্রাচ্যভারতে আর্য্যোপনিবেশ-সংস্থাপনার ঐতিহাসিক পুণ্য পথ। অঙ্গ বঙ্গ তাহার প্রবেশদ্বার। প্রথম হইতে অঙ্গ বঙ্গের সঙ্গে কলিঙ্গের এই সম্বন্ধ ;—পুরাণ-কাহিনীতেও অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের নাম একসূত্রে গ্রথিত।

ইতিহাস থাকিলে, এই পূর্ব্ব সম্পর্কের ধারাবাহিক পরিচয়-লাভের সম্ভাবনা থাকিত। আধুনিক তথ্যানুসন্ধানে যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট না হইলেও, পূর্ব্ব সম্পর্কের আভাস দিবার পক্ষে যথেষ্ট। তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে,—অঙ্গ বঙ্গের কথা না জানিলে, কলিঙ্গের সকল কথা জানা যাইবে না,—কলিঙ্গের কথা না জানিলেও, অঙ্গ বঙ্গের অনেক কথা অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। সুতরাং বাঙ্গালীর পুরাকীর্ত্তির তথ্যানুসন্ধানকারিগণকে "অঙ্গ বঙ্গ উল্লঙ্ঘন (?) করিয়া", কলিঙ্গ-ভ্রমণেও ব্যাপৃত হইতে হইবে, কলিঙ্গের পুরাকীর্ত্তির তথ্যানুসন্ধানকারিগণকেও অঙ্গ বঙ্গে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতে হইবে।

আর্য্যবিজয়-যুগের ইতিহাস—উত্তরোত্তর পূর্ব্বাভিমুখে রাজ্য-বিস্তারের ইতিহাস। যে মহাশক্তি পঞ্চনদ প্রদেশে আত্মবিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা চিরকাল পঞ্চনদের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে কোটরাবদ্ধ ছিল না। গঙ্গা যমুনার প্রবল প্রবাহের অনুগামী হইয়া, সে মহাশক্তি দেশের পর দেশ জয় করিতে করিতে, ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বসাগরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। নদ-নদী-গিরি-কানন তাহার গতিরোধ করিতে পারে নাই ; সাগর-সৈকতে উপনীত হইবার পর, অনন্ত বিস্তৃত লবণাম্বুরাশিও তাহার গতিরোধ করিতে পারে নাই। তাহা এক নূতন উচ্চাভিলাষে উৎফুল্ল হইয়া, দ্বীপ-দ্বীপান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; তথা হইতে আবার দেশদেশান্তরে আর্য্য-শিক্ষা বিস্তৃত করিয়া

দিয়া, [ভারতবর্ষের চতুঃসীমার বাহিরে,] এক দিগন্তবিস্তৃত ভারতীয় জ্ঞান-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাসাধন করিয়াছিল। তাহার কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে কত দেবালয় এখনও উচ্চশিরে এসিয়া মহাদেশের প্রাচ্য খণ্ডের জলে স্থলে আর্য্য-বিজয়-গৌরব বিঘোষিত করিতেছে ; কত জাতির কত নতজানু নরনারী ভারতবর্ষের দিকে মুখ ফিরাইয়া করযোড়ে প্রভাতে সন্ধ্যায় ধ্যান-ধারণা-বন্দনা-নমস্কারে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া মানব-জন্ম ধন্য জ্ঞান করিতেছে। যে পথে আর্য্য-প্রভাব এইরূপে ভারতমহাসাগরবক্ষে বিচরণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ তাহার প্রবেশ-দ্বার ;—তাহার সহিত অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সম্বন্ধ সমানভাবে বর্ত্তমান।

কেহ কেহ মনে করেন,—তাহা নয়। আর্য্যাভিযানের বহু পূর্ব্বে, স্মরণাতীত পুরাকালে, মানব-সভ্যতার উন্মেষ-সময়ে, কলিঙ্গের অনার্য্যগণই সমুদ্রপথে দ্বীপদ্বীপান্তরে যাতায়াতের কৌশল উদ্ভাসিত করিয়াছিল ;—তাহারাই "নৌসাধনোদ্যত" প্রথম নাবিক ;—ভারত-দ্বীপপুঞ্জের প্রথম উপনিবেশ-সংস্থাপক। ইহাকে ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। অধিক কারণের উল্লেখ না করিয়া, দুইটিমাত্র কারণের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

আজ কাল ভারত-দ্বীপপুঞ্জে কলিঙ্গের অধিবাসীর অসদ্ভাব নাই। তাহারা কিন্তু আধুনিক যুগের জীবিকালোলুপ যাযাবরমাত্র। কলিঙ্গের অনার্য্য অধিবাসিগণের চেষ্টায় ভারত-দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া থাকিলে, তদ্দেশে তাহাদের বংশধরগণের সন্ধান-লাভের সম্ভাবনা থাকিত, ভাষার মধ্যেও কলিঙ্গের অনার্য্য-ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতে পারিত। তাহার অভাব বিশিষ্ট প্রমাণ বলিয়াই উল্লিখিত হইবার যোগ্য।

এই প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি কারণ উল্লিখিত হইতে পারে। তন্মধ্যে কলিঙ্গের আদিম অধিবাসিগণের স্বাভাবিক সমুদ্রভীতি সর্ব্বজন-পরিচিত। যাহারা উৎকলের সমুদ্রোপকূলে কুটীর বাঁধিয়া, কাষ্ঠখণ্ডমাত্র অবলম্বন করিয়া ধীবর-বৃত্তিতে জীবিকার্জ্জন করিতেছে, তাহারা মান্দ্রাজ প্রদেশের অধিবাসী,—কলিঙ্গের দক্ষিণ সীমার দক্ষিণ হইতে আগত। একটি নৈসর্গিক ব্যাপারও উল্লেখযোগ্য। বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমোপকূল নিয়ত তরঙ্গসঙ্কুল,—সুবৃহৎ অর্ণবপোতের পক্ষে বিষম বিভীষিকার আধার,—সে উপকূলে পোতারোহণযোগ্য অধিক আশ্রয়স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে, বঙ্গোপসাগরকূলের বিশ্ববিখ্যাত প্রধান বন্দর [তাম্রলিপ্তি বঙ্গদেশে ;—"নৌসাধনোদ্যত" বাঙ্গালীর নৌচালনকৌশল চিরপরিচিত ;—তাহার জনশ্রুতি এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। এখনও বাঙ্গালী "লস্কর" সমুদ্রপথে পৃথিবীর সকল দেশেই যাতায়াত করিতেছে। এখন আর তাহাদের নিজের অর্ণবপোত নাই। কিন্তু তাহারা অভিজ্ঞ পোতচালক ছিল বলিয়াই, পাশ্চাত্য বণিগ্বর্গ [এ দেশে আসিয়া] তাহাদিগকে চিরাভ্যস্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাহসে, অকুতোভয়তায়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠায়, আত্মত্যাগে, পরিমিতাচারে, প্রভুভক্তিতে তাহারা সভ্যসমাজের পোতচালকগণের মধ্যে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

বাঙ্গালায় কবিতার প্রভাব প্রবল। আজ বলিয়া নয়, চিরদিনই প্রবল বলিয়া সুপরিচিত। যে দিন তান-লয়-সংযোগে "ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন কোমল-মলয়-সমীরে" জয়দেব "গীতগোবিন্দে"র সঙ্গীত-সুধার প্রবল প্লাবনে বাঙ্গালীর চিত্তক্ষেত্র রসসিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত রস-সাহিত্যই বাঙ্গালীর প্রধান সাহিত্য,—তাহার স্তাবকের সংখ্যাই অসংখ্য,—তাহার প্রভাব এত প্রবল যে, তাহা বৈজ্ঞানিক বিচার-প্রণালীর সুসংযত পণ্ডিতগণেরও হাতে পায়ে নৃত্যকলাকৌশলে কমনীয় সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত না করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। যে দেশ এইরূপ চির পরিচিত কবির দেশ, এই অধঃপতনের যুগেও যে দেশের কবিতার মাধুর্য্যে সভ্যসমাজ মুগ্ধ, সে দেশের কবিকুল সেদেশের নাবিককুলের কীর্ত্তিকাহিনী যথেষ্টভাবে গান করেন নাই কেন,—তাহা প্রথমে একটি বিস্ময়ের ব্যাপার বলিয়াই প্রতিভাত হইতে পারে, এবং তাহা একটি প্রতিকূল প্রমাণরূপেও উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা ইতিহাসবিস্মৃত বাঙ্গালীর আত্মরূপ সরল স্বভাবের পরিচায়কমাত্র। এখনও সেই স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এখনও "সমুদ্রমন্থনে" কত কবির কল্পসিন্ধু উর্দ্ধে উঠিয়া, কত অমূল্য রত্নরাজিতে বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছে, কিন্তু যাহারা রত্নাকরের চিরপরিচিত বন্ধু "লস্কর," তাহাদের কীর্ত্তিকাহিনী বাঙ্গালীর গীতিকাব্যে কীর্ত্তিত হইতেছে না কেন? যাহারা নক্ষত্রমাত্র সম্বল করিয়া, অকূল পাথারে তরণী ভাসাইয়া, নিরুদ্দেশযাত্রায় বহির্গত হইত, পুরাতন বঙ্গসাহিত্যে তাহাদের কথা একেবারে অপরিচিত ছিল না। তাহাদের কথা বাঙ্গালীর জনশ্রুতিতে মিশ্রিত হইয়া, বংশানুক্রমে সঞ্চারিত

হইত; উপকথায় প্রাণসঞ্চার করিয়া, বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বণিক-পুত্রের অসীম সাহসের অসামান্য কাহিনী প্রচারিত করিয়া জনসমাজকে বিস্মিত করিয়া দিত; তদীয় বিরহবিধুরা প্রাণপ্রিয়তমার "বারমাসিয়া" করুণগীতি বাঙ্গালীর নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত করিয়া রাখিত! এখন যাহা কলিঙ্গ নামে পরিচিত, সে দেশের জনসমাজের সাহিত্য বা জনশ্রুতিতে এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিদেশের গ্রন্থকারগণের গ্রন্থেও বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়,—কলিঙ্গের অধিবাসিগণের সেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বন্দরের স্মৃতি বঙ্গদেশে,—সমুদ্রযাত্রার জনশ্রুতি বঙ্গদেশে,—লস্করগণের চরিত্রবলের পরিচয় বঙ্গদেশে,—বঙ্গদেশের দক্ষিণে এ সকল বিষয়ের এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভারত-দ্বীপপুঞ্জের ভাষায়, সাহিত্যে, আচার-ব্যবহারে, শিল্পে, সৌভাগ্যে বাঙ্গালীর বিবিধ প্রভাব অভিব্যক্ত,—বঙ্গদেশের দক্ষিণে অবস্থিত আধুনিক কলিঙ্গদেশের এই শ্রেণীর প্রভাব দ্বীপপুঞ্জে অপরিচিত। তদ্রূপ দ্বীপপুঞ্জের জনশ্রুতিতে কলিঙ্গের নামই উল্লিখিত,—অঙ্গ বঙ্গের নাম অপরিজ্ঞাত। ইহাতে বিষয়টি প্রহেলিকাপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ইহাতেই তথ্যানুসন্ধানকারিগণের দৃষ্টি এতকাল অঙ্গ বঙ্গের প্রতি নিপতিত হইতে পারে নাই। এখন ধীরে ধীরে তথ্যানুসন্ধানের পুরাতন রীতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে,—ধীরে ধীরে নিকট হইতে দূরেরও দৃষ্টিসঞ্চালনের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে,—কোনও কোনও পাশ্চাত্য লেখক ভারত-দ্বীপপুঞ্জের সহিত বাঙ্গালীর সম্পর্ক থাকিবার সম্ভাবনায় আস্থাস্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ঋষিকুল্যার দক্ষিণে এবং গোদাবরীর উত্তরে—বঙ্গোপসাগরতীরে,—যে সংকীর্ণ ভূমিখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই এখন কলিঙ্গ নামে পরিচিত,—তাহা মান্দ্রাজ-প্রদেশের অন্তর্গত। তাহার উত্তরে উৎকল বা উড়িষ্যা, তাহার উত্তরে বঙ্গভূমি। পুরাকালেও ঠিক এইরূপ তিনটি বিভাগ ও পৃথক নাম প্রচলিত ছিল কি না, তাহার তথ্যানুসন্ধান আবশ্যক। তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে জানিতে পারা যায়,—পুরাকালে সকল সময়ে এরূপ পৃথক ভৌগোলিক বিভাগ ও পৃথক্ নাম প্রচলিত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, বঙ্গভূমির কিয়দংশও যে কলিঙ্গ নামে কথিত হইত, তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়,—একদা বঙ্গভূমির কিয়দংশ যে কলিঙ্গের

সহিত যুক্তরাজ্যরূপে শাসিত হইত, তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা কলিঙ্গের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য কথা।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ইতিহাসই বিবিধ যুগে বিভক্ত হইবার যোগ্য। এক স্থানের এক যুগের বিবরণের সঙ্গে অন্য যুগের বিবরণের অসামঞ্জস্য দেখিলে, উভয় যুগের মধ্যে ব্যবধানের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারতে [বিবিধ কথা-প্রসঙ্গে] এইরূপ ব্যবধানসূচক বিবিধ যুগের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারত এক ; কিন্তু মহাভারতোক্ত সকল স্থানের সকল বিবরণ এক নয়। অন্ততঃ কলিঙ্গের বিবরণের এক পর্ব্বের সহিত অন্য পর্ব্বের সকল সময়ে সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কর্ণ-পর্ব্বে [৪৪।৪২] দেখিতে পাওয়া যায়,—যে সকল দেশের অধিবাসিগণের সঙ্গ বর্জ্জনীয় বলিয়া কথিত হইত, কলিঙ্গ তন্মধ্যে উল্লিখিত। যথা,—

"কারস্করান্ মাহিষকান্ কালিঙ্গান্ কেরলাংস্তথা
কর্কোটকান্ বীরকাংশ্চ দুর্ধর্মাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।"

যে যুগে কলিঙ্গ আর্য্যনিবাসের অযোগ্য ও আর্য্যগণের অগম্য বলিয়া কথিত হইত, ইহা সেই যুগের কথা। ইহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ অর্জ্জুন-তীর্থযাত্রার কাহিনীর সহিত অসামঞ্জস্য উপস্থিত হইবে। কলিঙ্গ যখন আর্য্যনিবাসের যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, তখন কোন স্থান কলিঙ্গ বলিয়া কথিত হইত, মহাভারতে প্রসঙ্গক্রমে তাহারও একটি আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বনপর্ব্বে [১১৪।২—৪] যে বর্ণনা আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—গঙ্গাসাগরসঙ্গমের পরে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী পথে, কলিঙ্গে গমন করিতে হইত,—যেখানে বৈতরণী নদী, তাহাই কলিঙ্গ। যথা,—

"এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।"

তখন বৈতরণীর উত্তর তীর "দ্বিজসেবিত" ছিল। তখন কলিঙ্গ বলিলে উৎকলকেই বুঝাইত। তাহার দক্ষিণের ভূভাগ মহেন্দ্র নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা কলিঙ্গের অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত থাকিলে, পৃথক নামে উল্লিখিত হইত না। ইহাতে যেন মনে হয়,—আর্য্যোপনিবেশ যেমন ধীরে ধীরে দক্ষিণাভিমুখে অধিকার বিস্তার করিতেছিল, কলিঙ্গের অনার্য্য অধিবাসিগণ সেইরূপ উত্তর হইতে দক্ষিণে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছিল, এবং তজ্জন্য দক্ষিণের অনেক স্থানই ক্রমে ক্রমে কলিঙ্গ নামে অভিহিত হইতেছিল। এই কারণে, কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন,—
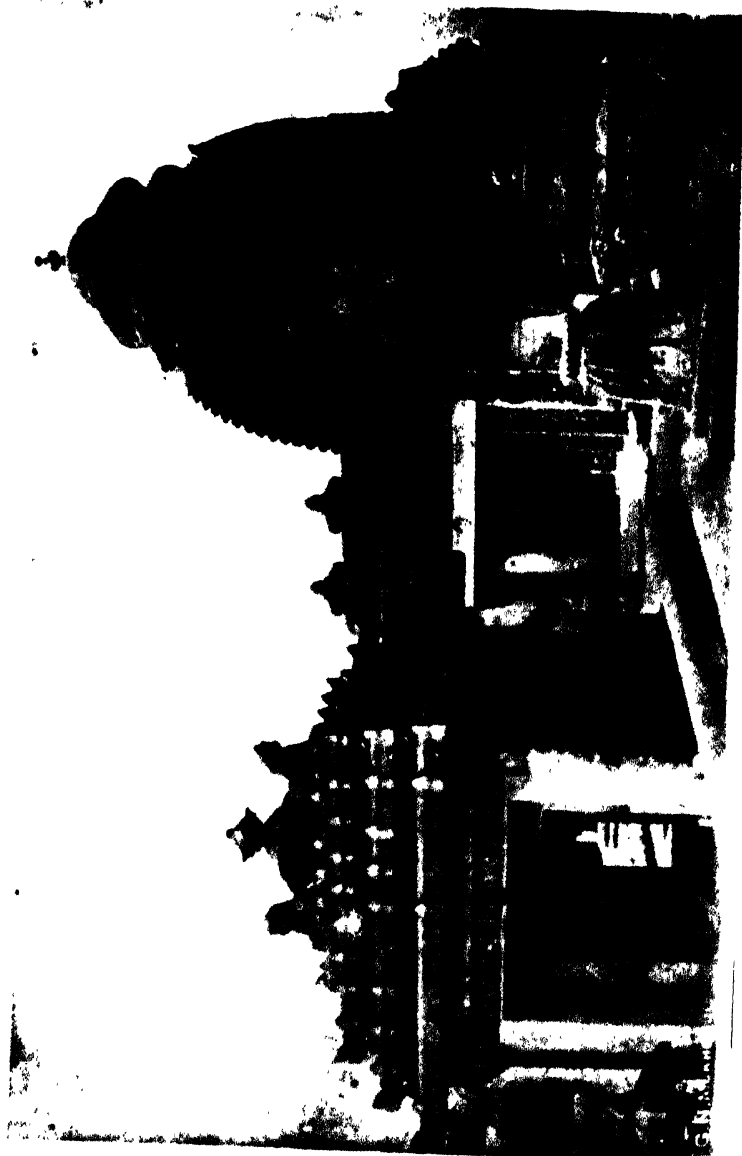
বর্ত্তমান কালের কলিঙ্গের আদিম অধিবাসিগণ পুরাকালে আরও উত্তরে বাস করিত; এবং তজ্জন্যই পুরাকালের কলিঙ্গ অনেক উত্তরে অবস্থিত ছিল।

প্রথম অবস্থায় প্রবল নদীস্রোত, দুরারোহ পর্ব্বতমালা, দুরতিক্রম্য মহাসাগরাদি নৈসর্গিক বাধা রাজ্যসীমারূপে ব্যবহৃত হইত। তদনুসারে বৈতরণীর উত্তরে এক রাজ্য, তাহার দক্ষিণে [ঋষিকুল্যার উত্তর তীর পর্য্যন্ত] আর এক রাজ্য, এবং তাহারও দক্ষিণে [গোদাবরীর উত্তর তীর পর্য্যন্ত] আর একটি রাজ্য নির্দ্দিষ্ট হইত। এই তিনটি রাজ্যই পর্য্যায়ক্রমে কলিঙ্গ নামে কথিত হইয়াছিল। সর্ব্ব দক্ষিণাংশ এখনও কলিঙ্গ নামে পরিচিত; মধ্যাংশের নাম এখনও উৎকল বা ওড়িষা; উত্তরাংশ [ওড়িষার অন্তর্গত হইলেও,] বঙ্গভূমির সীমাসংলগ্ন, এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে বঙ্গভূমির একাংশ বলিয়াই কথিত হইবার যোগ্য।

পুরাতন গ্রন্থে একটিমাত্র কলিঙ্গের নামই উল্লিখিত, কিন্তু রাজশাসন-লিপিতে ত্রিকলিঙ্গ নাম অপরিচিত নহে। পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিভাগই যে সেই ত্রি-কলিঙ্গ, তাহাই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। মহেন্দ্র নামক পুরাতন প্রদেশের অন্তর্গত, মহেন্দ্রাচল হইতে চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, মহেন্দ্রগিরির বহুবিস্তৃত উপত্যকাভূমির একাংশে,—বংশধারা নদীতীরে, মুখলিঙ্গম্ নামক একটি প্রাচীন স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী নগরকটকম্ নামক স্থান এক সময়ে কলিঙ্গনগর নামে কলিঙ্গের রাজধানীরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। মুখলিঙ্গম্ সেই রাজনগরের উপকণ্ঠমাত্র,—বহুসংখ্যক দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ, তথাকার প্রধান মন্দিরের নাম মুখলিঙ্গেশ্বর। তাহা এখনও উপাসকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। তাহার স্তম্ভে ও ভিত্তিগাত্রে অনেকগুলি ক্ষোদিত লিপি বর্ত্তমান আছে। একটি লিপি এইরূপ:—

১। স্বস্তি সমরমুখানেক-রিপুদর্প-ম-
২। র্দ্দন-ভুজবলপরাক্রম-পরমমা-
৩। হেশ্বর-পরমভট্টারক-নবনবতি-স-
৪। হস্র-কুঞ্জরাধীশ্বর-মহারাজা-
৫। ধিরাজ-ত্রিকলিঙ্গাধিপতি-শ্রীশ্রীমদ-
৬। নন্তবর্ম্মদেব-রাইনা চোড়গঙ্গদে-
৭। বস্য প্রবর্দ্ধমান-বিজয়রাজ্য-
৮। সম্বৎসর গ্রাহি শকবর্ষাব্দুল্ ১০০৩ চৈত্র

৯। মাসমোনা একাদশীয়ো আদিত্যবারমোনা

ইত্যাদি।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর এই তেলুগু-লিপিতে যে ভাবে "ত্রিকলিঙ্গ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, অন্যান্য রাজশাসনলিপিতেও সেই ভাবে ব্যবহৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্থলে একটিমাত্র লিপিই উদ্ধৃত হইল। ইহাতে যে তিনটি কলিঙ্গের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ত্রি-কলিঙ্গের এক রাজশাসনের অধীন থাকিবারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত আধুনিক কলিঙ্গই সকল সময়ে একমাত্র কলিঙ্গ ছিল না,—উৎকলও কলিঙ্গ নামে কথিত হইত; তাহার উত্তরের রাজ্যও কখনও কখনও কলিঙ্গ নামে কথিত হইত। ভারত-দ্বীপপুঞ্জে যে কলিঙ্গের ক্ষীণ স্মৃতি বর্ত্তমান আছে, তাহা কোন্ কলিঙ্গ? ভাষা, সাহিত্য, আচার ব্যবহার, উপাসনাপদ্ধতি, শিল্পকলা ইত্যাদির যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াই তাহার তথ্যাবিষ্কার করিতে হইবে। বঙ্গভূমির সহিত যে তাহার কখনও কিছু-মাত্র সম্পর্ক বর্ত্তমান ছিল না, সে কথায় আর নিঃসংশয়ে আস্থাস্থাপন করিবার উপায় নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

কাঙ্গালের স্মৃতিচর্চ্চা।

পঞ্জিকাকার লিখিয়াছেন, বৈশাখ মাসে অক্ষয়-তৃতীয়ায় সত্যযুগের উৎপত্তি। হিন্দুর সন্তান হইয়া পঞ্জিকার দৈববাণী অবিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

কিন্তু যাঁহারা বিনা প্রমাণে এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারাও বোধ হয় কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিবেন—এইরূপ এক বৈশাখে অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে আমরা সত্যই এক জন সত্যযুগের মানুষ হারাইয়াছি, এবং তাঁহারই স্মৃতিচর্চ্চার জন্য আজ এখানে সমবেত হইয়াছি।

কাঙ্গাল হরিনাথ সত্যযুগের মানুষ ছিলেন, এ কথা বলিলে সেই স্মরণীয় আদিযুগের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই। হরিনাথ কাঙ্গাল হইয়াও প্রবলের দম্ভে অবজ্ঞাপ্রকাশ করিয়াছেন; অর্থের বিপুল প্রভাবে উপেক্ষা-প্রদর্শন করিয়াছেন; অত্যাচারের উদ্যত খড়্গ অনায়াসে অগ্রাহ্য করিয়াছেন,

---

* স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদারের স্মৃতিসভায় প্রপঠিত।

দুর্নীতির কণ্টকপূর্ণ অরণ্যানী সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া সমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রভাব-বিস্তারের জন্য মানব-প্রীতির পবিত্র যজ্ঞে আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিয়াছেন। হরিনাথকে সত্যযুগের মানুষ না বলিব কেন? সত্যযুগের দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে সুধাময় হরিগুণগান করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিয়াছিলেন,; অরণ্যের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত ভাবে বিভোর হইয়া সেই মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিত। আর বাঙ্গালার বাঙ্গালীর কাঙ্গাল হরিনাথ সেই মহাভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বাউল-সঙ্গীতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ প্লাবিত করিয়াছিলেন; সেই অমৃতময় সঙ্গীতধারা সগরকুলপাবন ভগীরথের অনুসরণকারিণী সুখ-মোক্ষ-দায়িনী জাহ্নবীর স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া সহস্র সহস্র পতিতের উদ্ধার-সাধন করিয়াছিল; কত অবিশ্বাসী নাস্তিক ও ধর্ম্মজ্ঞানহীন মূঢ়ের হৃদয়নিহিত ভস্মস্তূপে প্রেম ভক্তির প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত করিয়াছিল; কত দাম্ভিক ঐরাবত সেই বিপুল প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছিল; পরমার্থসঙ্গীতে, দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গানে, প্রেম ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে তিনি অনেক নর-পশুর প্রাণে মনুষ্যত্বের সঞ্চার করিয়াছিলেন; তাঁহার হৃদয়নিহিত অমূল্য স্পর্শমণির সংস্পর্শে অনেক লোহা সোনা হইয়াছিল। হরিনাথকে যদি সত্যযুগের মানুষ না বলি, তবে আর কাহাকে বলিব?

সত্য বটে, হরিনাথের দেহ সত্যযুগের মনুষ্যের দেহের মত একবিংশ হস্ত দীর্ঘ ছিল না; কিংবা তিনি লক্ষ বৎসর পরমায়ু লইয়া স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিতেন না; কিন্তু তাঁহার সেই সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত দেহে যে হৃদয় ছিল—তাহা একুশ হাত লম্বা মানুষের হৃদয়ের মতই 'দরাজ' ছিল; তাঁহার এই প্রকার পরদুঃখকাতর, ভগবৎপ্রেমে সদা বিভোর, সংসারে থাকিয়াও সদা নির্লিপ্ত, রোগে শোকে চিরনির্ব্বিকার, মানব প্রেমের সুনির্ম্মল উৎসস্বরূপ দেবোপম হৃদয় ছিল বলিয়াই কাঙ্গাল হইয়াও তিনি আমাদের মত অযোগ্য ভক্তের হৃদয়সিংহাসনে অমর-মহিমায় নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন।

কুমারখালির সহিত আমার বহুদিনের সম্বন্ধ। কুমারখালির সহিত আমার হৃদয়ের যোগ আছে বলিয়াই এখানে আমি বহুবার আসিয়াছি, তাই আজ মনে পড়িতেছে,—সেই অতীত জীবনের কথা, যখন বঙ্গজননীর ক্রোড়-সংশ্রিতা এই সুজলা সুফলা গৌরী-শীকর-সিক্ত-সমীর-শীতলা নগরীর 'পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা' জনবিরল পল্লীবাটে আসিয়া ইহার অনুপম দৃশ্য-বৈচিত্র্যে ও আত্মীয় বন্ধুগণের অকৃত্রিম স্নেহে বাৎসল্যে, আদরে ও আপ্যায়নে হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত।

এতদিন পরেও জীবনের এই জ্বালাময় মধ্যাহ্নেও কুমারখালিতে আসিয়া কাঙ্গালের সুপ্রসন্ন সৌম্যমূর্ত্তি, তাঁহার মধুর বচন, তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আমার মনে পড়িতেছে; মনে হইতেছে, দেবতা মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, শুধু ভক্তের অর্ঘ্য তাঁহার পবিত্র স্মৃতি সুরভি করিয়া রাখিয়াছে। মনে হইতেছে, এমন মানুষকে আমরা কোন পাপে হারাইয়াছি! যখন সময় ছিল, তখন তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনি নাই; তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। ক্ষুদ্র কূপমণ্ডুক বিশাল মানস সরোবরের বিরাট ভাবের কিরূপে ধারণা করিবে?

বেণুরববিমুগ্ধ মৃগশিশুর ন্যায় কাঙ্গালের প্রাণস্পর্শী আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া কিশোর বয়সে কতবার তাঁহার নিকটে গিয়াছি। তাঁহার মনুষ্যত্ব অনুভব করিয়া নিজের ক্ষুদ্রতা বুঝিতে পারিয়াছি। যাঁহাদের সহবাসে মানুষ আপনাকে চিনিতে পারে, ক্ষুদ্রতা পরিহারপূর্ব্বক উদারতা ও মহত্ত্বে ভূষিত হইবার জন্য মানবের হৃদয়ে আগ্রহের সঞ্চার হয়, তাঁহারা ধন্য! বিধাতার কোনও নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই তাঁহারা ধরাতলে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহারা যাবজ্জীবন অক্লান্তপরিশ্রমে অনন্যমনে সেই মহাব্রতের উদ্যাপন করেন। হরিনাথ এই প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন। সংসারে থাকিয়াও যদি ঋষিত্বলাভ সম্ভব হয়, তবে তিনি 'ঋষি'-আখ্যা-লাভের সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। তিনি ধনবান ছিলেন না; সেই জন্যই সম্ভবতঃ তিনি 'ঋষি' খেতাব লাভ করিতে পারেন নাই! কিন্তু গৌরবপূর্ণ 'কাঙ্গাল' খেতাবে কেহ তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারে নাই।

হরিনাথের এই কাঙ্গাল অভিধা সাধারণের নিকট 'মহর্ষি' বা 'রাজর্ষি' খেতাবের অপেক্ষা অল্প গৌরবের, অল্প আদরের পরিচয় নহে। কাঙ্গাল খেতাব আমাদের এই কাঙ্গাল দেশে অগৌরবের খেতাব নহে। কাঙ্গাল আমাদের শ্মশানেশ্বর পশুপতি! বিশ্বের অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত, তথাপি ভিখারী শঙ্করের শিঙ্গা ডমরু, জটা বাঘছাল, ভস্মবিভূতি ভিন্ন অন্য সম্বল কিছুই নাই। ভিখারী শিব কাঙ্গালের কাঙ্গাল! কিন্তু তিনি আমাদের হৃদয়সিংহাসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত, ভক্তির অম্লান মন্দারমাল্যে নিত্য বিভূষিত। মহর্ষি হইলে কাঙ্গাল জনসমাজে যেরূপ সম্মানিত হইতেন, 'কাঙ্গাল' হইয়াও তিনি ঠিক সেইরূপই সম্মানিত হইয়াছেন। একদিন বাঙ্গালার লক্ষ কণ্ঠে কাঙ্গালের সুযশঃ কীর্ত্তিত হইয়াছিল—এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

কিন্তু সে দিন আর নাই। আজ বাঙ্গালার লোক কাঙ্গালের কথা ভুলিতে বসিয়াছে! ইহা তাঁহার দুর্ভাগ্য নহে, আমাদের দুর্ভাগ্য; আমাদের স্বদেশের দুর্ভাগ্য! কাঙ্গাল কোনও দিন নিজের ঢাক নিজে বাজাইয়া দেশ বিদেশে আত্মপ্রশংসা বিঘোষিত করেন নাই। তিনি আজীবন নীরবে কাজ করিয়া গিয়াছেন; তিনি নীরবে দেশের সেবা করিয়াছেন, নীরবে আর্ত্তের অশ্রু মুছাইয়া দিয়াছেন; বিপন্নের রক্ষার জন্য নীরবে অত্যাচারী বকধার্ম্মিকের নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন। অথচ যখন তিনি ভক্তিবিহ্বলচিত্তে ভগবানের মহিমার প্রচার করিয়াছেন, তখন তাঁহার সুমধুর উদাত্ত স্বরে আকৃষ্ট হয় নাই, এমন কঠিন প্রাণ কাহার ছিল?

সেই কাঙ্গাল আর ইহলোকে নাই, সুতরাং তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছি। আমরা মৃতবৎ স্পন্দনহীন জাতি; উৎসাহহীন, অসাড়, অবসাদগ্রস্ত; আমরা সমাজের বন্ধু, দেশের নায়ক, মানবের মিত্রগণকে বক্তৃতার সময় ভিন্ন অন্য সময় নিতান্তই লঘু মনে করি, এবং তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে নিদারুণ অনশনক্লেশ সহ্য করিয়া, পরার্থে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া বিধাতার বিধানে যখন ভবপারে যাত্রা করেন, তখন তাঁহাদিগকে ভুলিবার সুযোগ পাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি! দুর্লভ বাঙ্গালী-জন্ম লাভ করিয়া এ পর্য্যন্ত সকলেরই স্মৃতির সম্মান রাখিলাম, কেবল হরিনাথই বাদ রহিয়া গিয়াছেন!

আজ কাঙ্গালের স্বর্গারোহণ-তিথিতে আমরা কতিপয় বন্ধু এখানে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছি, তাঁহার আত্মার প্রীত্যর্থ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য অর্পণ করিতেছি। কিন্তু বিশাল বাঙ্গালার আর কোথাও কেহ কি তাঁহার কথা স্মরণ করিতেছে? তাঁহার কথা স্মরণ না থাকিলেও,—

"রবেনা দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে;
এই যে আমার আমার, সব ফক্কিকার; কেবল তোমার নামটি রবে।"

তাঁহার এই স্মরণীয় সঙ্গীত আমাদের সকলকেই একদিন না একদিন স্মরণ করিতে হইবে। কাঙ্গাল তাঁহার গীতে, কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে—তাঁহার বিরাট স্মৃতি-সৌধ সুবিশাল 'ব্রহ্মাণ্ড বেদে' স্ব-মহিমায় চিরদিন বিরাজিত থাকিবেন; পৃথিবীর সাহিত্য হইতে বঙ্গভাষা বিলুপ্ত না হইলে কেহ তাঁহাকে ভাবরাজ্যের সমুজ্জ্বল রত্নবেদী হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। বিপন্নের বন্ধু, আর্ত্তের ত্রাতা, পতিতের সুহৃদ, অনাথের আশ্রয় কাঙ্গাল হরি-

নাথের গুণকীর্ত্তন করিতে আসিয়া আমরা তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে বসি নাই, আপনারাই ধন্য হইতে আসিয়াছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে ফরাসীর 'সাহিত্য-সম্রাট' ভিক্টর হুগোর বর্ষ-স্মৃতির উৎসব হইয়াছিল। তদুপলক্ষে ফরাসী রাজ্যে যেন নূতন জীবনের হিল্লোল প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই উৎসবকাহিনী-পাঠে বুঝিতে পারা যায়, সে উৎসব প্রকৃতই রাষ্ট্রীয় উৎসব। ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতি পর্য্যন্ত নত জানু হইয়া তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন, ফরাসী দেশের যত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, সমাজমিত্র, সাহিত্য-সেবক, সকলেই মহোৎসাহে এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া প্রতিভা ও মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। সাহিত্যাচার্য্যের স্মৃতির প্রতি ফরাসী জাতির এই বিপুল শ্রদ্ধা ও সম্মানের কথা মনে করিলে, আমাদের অপদার্থতায় হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। মনে হয়,—হরিনাথ যদি এ দেশে জন্মগ্রহণ না করিয়া পাশ্চাত্য জগতে আবির্ভূত হইতেন, তাহা হইলে এতদিন তাঁহার স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা হইত, এবং সে চেষ্টা সফলও হইত।

বঙ্গসাহিত্যে হরিনাথের কৃতিত্ব অসাধারণ। সুলদর্শী পল্লবগ্রাহীরা বঙ্গসাহিত্যে হরিনাথের বিশেষত্ব দেখিতে পান না, কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত, হরিনাথ অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা রামমোহন রায় ও দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুসরণে কোদালী ধরিয়া জঙ্গল কাটিয়া বহুপরিশ্রমে যে প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন—আজ তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে সেই পথে চলিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার কোদালীর সমালোচনা করিতেছেন! বঙ্গের লেখকশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয়গণের নিকট যদি আমাদের মাতৃভাষা ঋণী থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার—হরিনাথের ঋণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হরিনাথের রচনা-সমালোচনার স্থান নাই; আমার সে শক্তিও নাই; তবে এইটুকু বুঝিতে পারি,—হরিনাথের রচনায় যে বিশ্বজনীন ভাব আছে, তাহা চিরন্তন, তাহা সত্য, তাহা বিশ্বসাহিত্যে স্থানলাভের যোগ্য। ভাবরাজ্যের এই বিপুল সম্পদ ভাষার ভাণ্ডারে অক্ষয় রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়াই সাহিত্য-সাম্রাজ্যে প্রাচীনযুগের বাল্মীকি, হোমার, দান্তে হইতে আধুনিক যুগের ভিক্টর হুগো,

এমারসন, কার্লাইল, ইব্‌সেন ও ঋষিপ্রতিম স্লাভ্‌ কবি টলষ্টয় পর্য্যন্ত সকলেই সম্রাটের ন্যায় পূজিত হইতেছেন। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন কোন্‌ স্মরণাতীত যুগের—তমসাচ্ছন্ন অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে—কিন্তু বাণীর বরপুত্র কালিদাসের প্রতিভা সাহিত্য-জগতে অবিনশ্বর হইয়া আছে। সাহিত্য-সাধনায় হরিনাথ সর্ব্বাংশে আমাদের পূজার পাত্র ছিলেন।

সমাজে বাস করিয়াও হরিনাথ নিঃসঙ্গ ছিলেন; চতুঃপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র এরণ্ড-সমূহের মধ্যে তিনি সুবিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় সমুন্নত ছিলেন, মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্য তাঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে নাই, শোকদুঃখ অভাব নির্য্যাতনের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা তাঁহার শাখা প্রশাখা ভাঙ্গিতে পারে নাই। তিনি স্বতন্ত্র, উন্নত; তাঁহার দৃষ্টি ঊর্দ্ধে ভগবানের চরণে নিত্য প্রসারিত ছিল; কিন্তু যখনই তিনি সেই ভাববিমুগ্ধ ভগবৎপ্রসঙ্গলিপ্সু তন্ময় দৃষ্টি অবনত করিতেন, তখনই ব্যথিতের, বিপন্নের, শোকার্ত্তের দুঃখকষ্টে তাঁহার নয়নপল্লব করুণায় সিক্ত হইত।

প্রেমভক্তি ও পরমার্থবিষয়ক সঙ্গীতের রচনায় হরিনাথের সাফল্য অসাধারণ। রামপ্রসাদ হইতে দাশরথি পর্য্যন্ত অনেক সাধক, অনেক ভক্ত প্রাচীন যুগে ভক্তিসঙ্গীত রচনা করিয়া বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছেন; তাঁহাদের সহযোগিগণের মধ্যে কাঙ্গাল হরিনাথের দান উপেক্ষার যোগ্য নহে। তাঁহার দেহতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীত, ভক্তিসঙ্গীত, বাৎসল্যরসস্নিগ্ধ সকরুণ পৌরাণিক সঙ্গীতগুলি জনসমাজে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল, তাহা অভিজ্ঞগণের অবিদিত নহে। তাঁহার সঙ্গীতশ্রবণে ভাবে বিভোর হইয়া যাহারা অশ্রুত্যাগ করিত, তাহাদের ভাবাভিব্যক্তি আমাদের এই বৈজ্ঞানিকযুগে উপহাসের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ভক্তের নিকট চিরদিনই তাহা অমূল্য।

হরিনাথ সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পদ আজকাল এতই সুলভ হইয়াছে যে, এই অকৃতী নগণ্য লেখকের মত সামান্য ব্যক্তির উপরও এক সময় কলিকাতার একখানি প্রধান বাঙ্গালা সাপ্তাহিকের সম্পাদন-ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের সম্পাদকতায় ও হরিনাথের সম্পাদকতায় পার্থক্য বিস্তর; আমাদের সম্পাদকতা ছিল চাকুরী, চাকুরীটা কোনও রকমে বজায় রাখিবার জন্য—আমরা সংবাদপত্র লিখিতাম। একটা বিবাদের উপলক্ষ্য পাইলেই আমরা শব্দকল্পদ্রুমের শাখায় উঠিয়া

শাখামৃগের ন্যায় নৃত্য করিতাম; এবং বাক্‌যুদ্ধে অপর পক্ষকে নির্ব্বাক করিতে না পারিলে, খবরের কাগজে ছড়া কাটিয়া ছবি আঁকিয়া তাহাকে গাধা সাজাইতাম! আমাদের 'পঞ্চাশ' হাজার গ্রাহক দুই পয়সা মূল্যে তাহা কিনিয়া পড়িত, এবং লক্ষপাটী দন্ত বিকশিত করিয়া মজা উপভোগ করিত, এবং পেট ভরিয়া হাসিয়া লইত। হাসিতে যিনি অপমান বোধ করিতেন,—এই সৃষ্টিছাড়া বেহায়াপণায় যিনি বিরক্তি অনুভব করিতেন, আমরা তাঁহাকে অরসিক ও 'বেকুব' মনে করিয়া আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইতাম। আমাদের সম্পাদকতা এইরূপ বিড়ম্বনাপূর্ণ ছিল। কিন্তু হরিনাথ উদরান্নের সংস্থানের আশায় সম্পাদকের বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই, স্বত্বাধিকারীর মনোরঞ্জনের জন্য ভাড়াটে সম্পাদকের মত তাঁহাকে আত্মসম্মান বিক্রয় করিতে হয় নাই; তাঁহার সম্পাদিত ক্ষুদ্র বার্ত্তাবহ পঞ্চাশ হাজার গ্রাহকের দ্বারেও বিশ্বের বিচিত্র বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাইত না। তাঁহার পত্রিকার পাঠক-সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার যুক্তিতর্ক, তাঁহার নির্ভীকতা, তাঁহার জনহিতৈষণা সেই সঙ্কীর্ণ পাঠকসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত; কোনও জটিল সমস্যা উপস্থিত হইলে তৎসম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত জানিবার জন্য সকলেই আগ্রহপ্রকাশ করিত।—হরিনাথ বহু অত্যাচারে জর্জ্জরিত, নানা অভাবে পীড়িত পল্লী-অঞ্চলের অভাব অভিযোগ বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে লেখনীধারণ করিয়াছিলেন; কাহারও ধমকে তিনি এই কঠোর কর্ত্তব্যব্রত পরিত্যাগ করেন নাই, কাহারও লাঠীর ভয়ে তিনি তাঁহার স্বাধীন মন্তব্য প্রত্যাহার করেন নাই; আর্ত্তের পরিত্রাণের জন্য, উৎপীড়কের দমনের নিমিত্ত তিনি লেখনীর ব্যবহার করিয়াছিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণদাস যে জাতির অলঙ্কার, কাঙ্গাল হরিনাথও সেই জাতির গৌরববর্দ্ধন করিয়া, সংবাদপত্র-পরিচালনে দেশের ও সমাজের হিতসাধন করিয়াছিলেন। হরিনাথ সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের আদর্শ ছিলেন; মুদ্রাযন্ত্রের এই অতি-প্রসারের দিনে, এখনও মফস্বল হইতে কত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু হরিনাথের গ্রামবার্ত্তার মত বার্ত্তাবহ একালে সর্ব্বদা দেখিতে পাই না। হয় ত বাঙ্গালা দেশের অনেক লেখক ও সংবাদ-পত্র-সম্পাদক হরিনাথের নামও জানেন না! অনেকে জানেন, হরিনাথ কতকগুলা ছাড়া বাউলের গান বাঁধিয়া গিয়াছেন মাত্র! সেই সকল শিক্ষিত ভদ্র জনের নিকট হরিনাথ নিতান্ত উপেক্ষার পাত্র; কারণ, তিনি বাঙ্গালার মিল্টন, স্কট, বাঙ্গালার শেলী, বায়রণ, বা মেকলে ছিলেন না; কিন্তু তিনি

বাঙ্গালার হরিনাথ—বাঙ্গালীর হরিনাথ। তাঁহার সনেট বনেট পরিয়া কখনও জননী বাণীর কাব্যকুঞ্জে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তাঁহার মানসী প্রতিমা সীমন্তে সিন্দুরবিন্দুশোভিতা, চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গী, অলক্তকরাগরঞ্জিতচরণা, কস্তাপেড়ে শাড়ী পরিহিতা, করুণার মূর্ত্তি, কোমলপ্রাণা বঙ্গগৃহলক্ষ্মী। ইহাতেই হরিনাথের মৌলিকতা, ইহাতেই তাঁহার রচনার গৌরব। তাঁহার কবিতায় আমরা বিদেশীয় ভায়োলেট, হাস্‌-না-হানা; ম্যাগ্‌নোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা, ডেফোডিল্‌, বা লিলির সৌরভ পাই না বটে, কিন্তু প্রস্ফুটিত কদম্ব, কেতকী, শেফালিকা, চম্পক, রজনীগন্ধার দেশী সুগন্ধে তাঁহার কবিতা ভরপুর। ইংরেজী শিক্ষায় আমা-আমাদের রুচি কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন আমরা কারি-কটলেট-সমন্বিত, ভ্যাজাল ঘৃতে ভাজা ফুল্‌কো লুচির অত্যন্ত পক্ষপাতী, কিন্তু হরিনাথের খাটী দেশীভাবপূর্ণ কবিতাগুলি আমাদের পল্লীগ্রামের সনাতন চিঁড়ার 'ফলার'! ভ্যাজালের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, তাহার উপভোগে আমাদের শোণিতকণায় উগ্র বিষ সংমিশ্রিত হইতে পারে না। তথাপি কালধর্ম্মে সেই চিপীটক, ইক্ষুগুড়, গুপ্ত দই ও সুপক্ক রম্ভার সংযোগে অমৃতোপম করিয়া হঠাৎ সহর অঞ্চলের 'ডিসপেপ্সিয়া-গ্রস্ত বাবু লোকের পাতে দিতে সাহস হয় না। হরিনাথ কেবল কুমারখালীর নহেন, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব। হয় ত বাঙ্গালী এক দিন তাঁহাকে চিনিতে পারিবে; তাঁহার রচনার আদর করিতে শিখিবে; কিন্তু কতদিনে? একমাত্র মহাকালই তাহার উত্তর দিতে পারেন।

আমাদের এই নদীয়া জেলায় এখন সাহিত্য-চর্চ্চা উপেক্ষিত বলিয়া কোনও শ্রদ্ধাভাজন লেখক সংপ্রতি কোনও একখানি নবপ্রকাশিত বাঙ্গালা মাসিকে আক্ষেপ করিয়াছেন, শুনিয়াছি। কিন্তু নদীয়ায় সাহিত্যচর্চ্চা সত্যই কি উপেক্ষিত? নদীয়ার বর্ত্তমান সাহিত্য-সেবকগণের সংখ্যা অন্য কোনও জেলার সাহিত্যিকগণের অপেক্ষা অল্প নহে বলিয়াই আমার ধারণা। তবে তাঁহারা সকলে স্ব স্ব বাসস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সাহিত্যচর্চ্চা করেন না বটে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও হাস্যরসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'সাহিত্যে'র সুযোগ্য সম্পাদক, আমার শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সুকবি যতীন্দ্রমোহন ও গিরিজানাথ, নদীয়া-কাহিনীর লেখক কুমুদনাথ, আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃদ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত

জলধর সেন, সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণ বঙ্গ সাহিত্যে যে সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা সম্বল করিয়া নদীয়াকে সাহিত্যের দরবারে কোনও দিন অন্য সকলের পশ্চাতে কুণ্ঠিতভাবে দণ্ডায়মান হইতে হইবে না, ইহা নিশ্চিত। এই সকল স্বনামধন্য সাহিত্য-সেবকগণের মধ্যে শেষোক্ত তিন জন হরিনাথের প্রতিভায় প্রভাবান্বিত। তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক প্রবীণ লেখকগণের অগ্রণী হইলেও মাতৃভাষার রচনায় হরিনাথের নিকটেই তাঁহাদের হাতে-খড়ি। শুনিয়াছি, আমাদের অন্যতর সহযোগী লেখক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর—যিনি উপন্যাসে কল্পনাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিতে পারেন, যাঁহার রচিত বিবিধ প্রবন্ধে আমরা খাঁটী বাঙ্গলার আদর্শ চিত্র পরিস্ফুট দেখিয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করি, শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা ও রুচির এই উৎকট পরিবর্ত্তনের দিনে বাঙ্গালীকে যিনি খাঁটী বাঙ্গালী করিয়া রাখিবার জন্য জননী বাণীর উপাসনায় নিরত আছেন—তাঁহার উপরেও হরিনাথের মহৎ চরিত্র ও মোহকর সাহিত্যানুরাগের প্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল।

হরিনাথ খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার ধাত বুঝিতেন। বাঙ্গালীর মর্ম্মস্থলের তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন; তিনি সহজ বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন। বঙ্গের পল্লীসমাজের অন্তরে কি আশা আকাঙ্ক্ষা, কি সুখ দুঃখ বেদনা, কি আনন্দ উল্লাস হিল্লোলিত হইতেছে, হরিনাথ তাহা বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার বহুমুখ সঙ্গীতে সহানুভূতি ও করুণার বর্ণসম্পাতে তাহা মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিতেন। সেই অমৃত-মধুর সঙ্গীত উৎপীড়িতের—রোগার্ত্তের—শোকাতুরের কর্ণে, এমন কি, ভোগ-লালসাবিহ্বল বিলাসসর্ব্বস্ব ধনীর শ্রবণবিবরেও সুরসঙ্গীতের ন্যায় ধ্বনিত হইত।

জীবনের সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে! অমানিশীথিনীর নিবিড় অন্ধকারে চরাচর আবৃত; নৈশাকাশে নক্ষত্র-নিকর নির্ব্বাপিত; নিম্নে ধরাবক্ষে লতাগুল্মের পত্রান্তরালে খদ্যোতপুঞ্জের স্তিমিত দীপ্তি অদৃশ্য। গগনমণ্ডল দিগন্তব্যাপিনী কাদম্বিনীর নিকষকৃষ্ণ মুক্ত কুন্তলজালে সমাচ্ছন্ন; উদ্দাম প্রভঞ্জন সন্ সন্ শব্দে অশ্রান্তবেগে প্রবাহিত হইতেছে, আর অবিরাম জলকল্লোল ছল্ ছল্ শব্দে শ্রবণে প্রবেশ করিতেছে;—গগনে পবনে আঁধারে পাথারে প্রকৃতির কি প্রলয়ঙ্করী রুদ্র-মূর্ত্তি! এই দুঃসময়ে উদ্বেলিত উচ্ছলিত তরঙ্গভঙ্গময়ী ভব-

নদীতে আলোকহীন, শিথিলবন্ধন, শ্রান্ত জীবন-তরণী নিমগ্নপ্রায়। ভবের কূলে এবার আর বুঝি পাড়ি জমাইতে পারিলাম না, তরণী কূল হইতে এখনও বহু দূরে! মত্ত ঝটিকা শৃঙ্খলমুক্ত লক্ষ দানবের হুঙ্কারধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলিতেছে; সংসারের সকল সুখ—সকল আশার অবসান হইয়াছে; যাহারা আপনার ছিল, তাহারা পর হইয়া গিয়াছে; যাহাদিগকে শৈশবে বুকে রাখিয়া মানুষ করিয়াছিলাম, অনাহারে থাকিয়া নিজের মুখের গ্রাস যাহাদের মুখে তুলিয়া দিয়াছিলাম, তাহাদেরই নিকট এখন অনাবশ্যক উপসর্গে পরিণত হইয়াছি। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় সকল আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া অতীত জীবনের মর্ম্মান্তিক নিষ্ফল স্মৃতির আলোচনা করিতে বসিতে অকূলের কাণ্ডারীকে স্মরণ হয়, তখন অবসন্ন কাতর ব্যথিত হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া স্বতঃই উৎসারিত হয়,—

> ওহে দিন ত গেল; সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে;
> তুমি পারের কর্ত্তা শুনে বার্ত্তা, ডাকছি হে তোমারে।
> আমি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে

তখন বুঝিতে পারি, নবীন যখন প্রবীণ হইবে, বালক যখন প্রৌঢ় হইবে, তখন তাহারা হরিনাথকে চিনিতে পারিবে। আমরাও প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিয়াছি বলিয়াই হরিনাথকে কতকটা চিনিতে পারিয়াছি। তাই তাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার অর্ঘ্যপ্রদানের জন্য তাঁহার চিরজীবনের সুপবিত্র সাধনক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছি। ভগবানের নিকট অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি, হরিনাথের কঠোর সাধনা সফল হউক, কাঙ্গালী বাঙ্গালীর নিজস্ব বাঙ্গালী-হৃদয় যেন উৎকট বিজাতীয় স্বভাব হইতে মুক্তিলাভ করে। যাঁহারা আমাদের পরে আসিতেছেন, তাঁহারা হরিনাথকে চিনিতে থাকুন, এবং আমাদের এই জড় দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইবার পরও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সাধকশ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর হরিনাথের এই সুপবিত্র পীঠতল অনাগত ভবিষ্যতের বঙ্গীয় সাহিত্যসেবকমণ্ডলীর সাহিত্যতীর্থে পরিণত হউক। *

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

---

* ৬শে বৈশাখ অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে কুমারখালীর হরিনাথ-উৎসবে পঠিত।

বংশানুক্রম।

(*)

মনোবৃত্তি সম্বন্ধে দেখাইয়াছি যে, বংশানুক্রমের নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়াও পিতার একরূপ, এবং পুত্র পৌত্রের অন্যরূপ ভাব, [সুতরাং কর্ম] হইতে পারে। ভাব বিভিন্ন হইলেই কর্মও বিভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। একণে দেহের ও দৈহিক ক্রিয়ার বংশানুক্রম বিবেচনা করিলেও, মানসিক বংশানুক্রমের অনুরূপই বিবেচিত হইবে। দেহ ও মন তুল্যরূপেই বংশানুগত হয়। (১) দেহ অথবা কোনও বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পিতা পুত্রের এক প্রকার নহে; যদিও সাদৃশ্য থাকুক, কিন্তু ঐক্য দেখা যায় না। বংশানুগত পরিবর্ত্তন একটি মৌলিক সত্য। কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াই বংশানুক্রমে ঠিক এক প্রকার হয় না। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, যকৃতের রসস্রাব, পাকস্থলীর পরিপাক-ক্রিয়া, মলপ্রণালীর উর্দ্ধাধঃ-সংকোচ, চক্ষু কর্ণ ইত্যাদির শক্তি, স্নায়ু ও পেশী সকলের গঠন, সংস্থান ও সংখ্যা, কঙ্কালের পরিমাপ, গঠন ও অবস্থিতি—এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষগত ক্রিয়া বংশানুক্রমে ঠিক এক প্রকার থাকে না। যেমন এই সকল সুস্থাবস্থার ক্রিয়া পুরুষানুক্রমে পরিবর্ত্তনশীল, তেমনই বিকৃত ক্রিয়া, অর্থাৎ অসুস্থ অবস্থার ক্রিয়াও পরিবর্ত্তনশীল। পিতার শিরোঘূর্ণন পীড়া ছিল, পুত্রের মৃগী রোগ হইল। পিতার ক্ষণ-ক্রোধ ছিল, পুত্রের উন্মত্ততা হইল। পিতার স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ছিল, (২) পুত্রের হস্ত-পদাদি-কম্পন-পীড়া হইল। পিতার উপদংশ পীড়া ছিল, পুত্রের স্নায়বিক অবশতা ও জড়তা হইল,—এ সকল অনেক স্থলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এ সকল স্থলে যদিও পিতৃ-অবস্থা ঠিক পুত্রপৌত্রে সংক্রামিত হইল না, তথাপি ইহা বংশানুক্রমের উদাহরণ। কারণ, পিতার দৈহিক অবস্থাই পুত্রে আগত হইয়াছিল; কিন্তু আগত হইতেই [সাধারণ পরিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে] কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল, আর তাহাতেই পিতৃলক্ষণ পুত্রে ঐ সকল ভেদ প্রাপ্ত হইল। এ সকল আপাততঃ বংশানুক্রমের ব্যভিচার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত

(১) Pearson's The scope and imprtance to the state of the science of Natural Eugenics.

(২) st. Vitus' Dauce.

পক্ষে ইহা বংশানুক্রমের নিয়ম অনুবর্ত্তন করিয়াই চলিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বংশানুক্রমের পরীক্ষায় মোটের উপর বুঝা যায় যে, আয়ুঃ, দৈর্ঘ্য, দন্তোদ্গম ও দন্তপতনের ফল,—এ সকল বংশানুক্রমে প্রায় ঠিক থাকে। পিতা বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেও পুত্র-পৌত্রগণ বাল্যে অথবা যৌবনে মৃত হইতে পারে। সে অন্য কথা। কিন্তু যাহারা প্রৌঢ় বয়স পার হইল, তাহারা প্রায় পিতা মাতার অনুরূপ বয়স প্রাপ্ত হয়। পুত্রকে পিতামাতার দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হইতেও অনেক স্থলেই দেখা যায়; তবে কখনও কখনও পুত্র উভয়ের মধ্যবর্ত্তী দৈর্ঘ্যও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দন্তোদ্গম অপেক্ষা দন্তপতন অধিকমাত্রায় বংশানুগত হয়, ইহা আমি অনেক স্থলে দেখিয়াছি। পিতার ৭০।৮০।৯০ বৎসর বয়সেও দন্ত পড়ে নাই, পুত্রের ও পৌত্রেরও তাহাই হইল;—পক্ষান্তরে, পিতা মাতার ৩৫।৪০ বৎসর বয়সেই দন্ত পড়িয়া গিয়াছিল, পুত্রেরও তাহাই হইল;—এরূপও অনেক সময় দেখা যায়। কিন্তু পিতা অথবা মাতার মধ্যে অপত্য যাহার লক্ষণ অধিক প্রাপ্ত হয়, এ সকল বিষয়ও অনেক স্থলে তাহারই অনুরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ হইবে, তাহা মিশ্র, অমিশ্র ও উর্ভচিহ্নিত বংশানুক্রমের গতি পূর্ব্বপুরুষ হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিবার আশা করা যায়। জাতকের কোন্ লক্ষণ পিতার কি মাতার অনুসরণ করিবে, তাহা তাহার দেহ ও মন, মাতাপিতার দেহ-মনের সহিত তুলনা করিয়া বুঝিতে হয়। তৎপর বংশানুক্রমের গতি পুরুষানুক্রমে কিরূপে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাও বিবেচনা করিতে হয়। এইরূপে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে বংশানুক্রম বুঝিবার আশা করা যায়; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে বুঝিতে পারা যাইবে, তাহা বলা যায় না।

আয়ুঃ; দৈর্ঘ্য; দন্তোদ্গম ও দন্তপতন; পীড়াপ্রবণতা; চাঞ্চল্য ও গাম্ভীর্য্য।

লিঙ্গ-ভেদ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, উহা এক্ষণে মেণ্ডেলের বিধান অবলম্বনে বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে। বোধ হয়, এই ভাবেই ইহার প্রকৃত মীমাংসা হইবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত-বাহ্য লক্ষণ সকল উপরে উপরে দেখিতে গিয়া যে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে বলা যাইতে পারে যে, লিঙ্গভেদও কিয়ৎপরিমাণে বংশগত। কোন নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে পুত্র অথবা কন্যা জাত হইবে,

লিঙ্গ-ভেদ।

তাহা কি বলা যায়? আনুষঙ্গিক লক্ষণ দেখিয়া আমার মাতা ঠাকুরাণী ও শ্বশ্রূঠাকুরাণী সর্ব্বদাই ঠিক্ ঠিক্ বলিতে পারিতেন। ৫।৬ মাসের গর্ভবতী নারীকে ইঁহারা অনেক সময় ঠিক্ ঠিক্ বলিয়াছেন যে, গর্ভে পুত্র কি কন্যা জন্মিবে। ৭।৮।৯ মাসে ত আমার মাতৃদেবী নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেন। আমি নিজেও চারিটি স্থলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা ঠিক বলিয়াছিলাম। পুত্র কন্যা জন্মিবার যে বংশানুক্রম, তাহা নানা উপায়েই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করা বোধ হয় মানুষের অসাধ্য নহে। বিজ্ঞান এই বিষয়ে এখনও ভাল করিয়া কিছু বলিতে সমর্থ নহে। কিন্তু পণ্ডিতগণ ও সাধারণে কতিপয় মীমাংসা এ স্থলে স্থির করিয়া লইয়াছেন। তাহারই দুই একটির সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

পিতা মাতার অত্যল্পসংখ্যক অপত্য জন্মিলে, পুত্র কন্যার তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা; অথবা, অপত্য একটিও না হইতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় শাস্ত্রে বলে, যে কন্যার ভাই জন্মে নাই, তাহাকে বিবাহ করা দোষ; কারণ, সে বন্ধ্যা হইবার আশঙ্কা আছে। পক্ষান্তরে, পিতা মাতার বহুসংখ্যক অপত্য জন্মিলে, অপত্যও কতক পরিমাণে তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা।

পিতা মাতার পুত্রসন্তান অধিক জন্মিলে পুত্রের সেই প্রকার হইবার সম্ভাবনা অধিক; তাঁহাদিগের কন্যাসন্তান অধিক জন্মিলে, পুত্রেরও সেইরূপ হইতে পারে। কিন্তু কোনও কোনও স্থলে এই বিধানের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়। আমার সংগৃহীত তালিকা-মধ্যে দুই ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে, পিতার পুত্রসন্তান অধিক হইয়াছিল, কন্যাসন্তান অত্যল্প। এমন অবস্থায় এক জনের পুত্রের পুত্রসন্তান অধিক হইল, আর এক জনের কন্যার কন্যাসন্তানই অধিক হইল। যেন এক পুরুষের পুত্রাধিক্য পরবংশের কন্যাধিক্য দ্বারা পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু পুত্রে পুত্রাধিক্য ও কন্যায় কন্যাধিক্য দেখিয়া বিবেচনা করিতে হয় যে, এরূপ ক্ষেত্রে সমলিঙ্গতা বংশানুগত হইতে পারে।

অনেক স্থলে সমতল ভূমি অপেক্ষা উচ্চ দেশে বংশানুক্রমে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের সংখ্যা অধিক হইতে দেখা যায়। সভ্যাবস্থা অপেক্ষা অসভ্যাবস্থাতেও তাহাই দেখা গিয়াছে।

দুর্ব্বল, রুগ্ন, বৃদ্ধের পুত্রসন্তান অধিক হয়।

যাহা হউক, এই সকল স্থলে পারিপার্শ্বিক অবস্থাবশতঃ জননযন্ত্রের অথবা শুক্রশোণিতের পরিবর্ত্তন হয়, এমন বলা যায় না, বরং শুক্রশোণিতের

পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত কারণে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহার অনুকূল হইয়া ফল আরও সুস্পষ্ট হইল, এইরূপ বলাই সঙ্গত। কারণ, আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, অন্তর্নিহিত শক্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় দ্বন্দ্ব হইলে, অন্তর্নিহিত শক্তিই প্রবল হইয়া থাকে।

আমরা বংশানুক্রমের আলোচনায় যে সকল তত্ত্ব অবগত হইলাম, তাহার সামাজিক ফল কিরূপ? মানবসমাজের বহুবিধ সমস্যা আমাদিগের মীমাংসার জন্য সর্ব্বদাই উপস্থিত। জীববিজ্ঞান, বিশেষতঃ বংশানুক্রমশাস্ত্র সে সকলের কি উত্তর দেয়? এই বিষয় নিতান্ত জটিল। তথাপি পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ জেদ করিয়া কোনও পক্ষের সমর্থন করা উচিত নহে। নিরপেক্ষ বিচার যে দিকে লইয়া যায়, তাহাই স্বীকার্য্য। বারান্তরে এই বিষয়ের আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীশশধর রায়।

৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সামান্য একটু জোর বাতাসে যেমন কাঁচা আমটি বোঁটা ছিঁড়িয়া পড়িয়া যায়, তেমনই যেন কালের একটু জোর নিশ্বাসের তাড়না সহিতে না পারিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল গাছপাকা ফলটির মতন সংসার-কল্পবৃক্ষ হইতে টুপ করিয়া পড়িয়া গেলেন। জল-ঝড় নাই, কাল-বৈশাখীর ঝঞ্ঝাবাত নাই, শুক্লপক্ষের কৌমুদীস্নাত ত্রয়োদশীর নিশান্তে আকাশের কোণে কাকচক্ষু জ্যোৎস্নার খেলা দেখিতে দেখিতে, জ্যৈষ্ঠের প্রথম বর্ষণের পর মেঘমালার শীকরস্নিগ্ধ সমীর-সন্তাড়নে যেন অম্লমধুর নিশার প্রথম যামের মাধুরী উপভোগ করিতে করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল নীরবে ভক্তসাধকের ন্যায় মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। কবির জীবন কাব্যময় মৃত্যুর আলিঙ্গনে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। কবির মহাপ্রাণ, যেন বিধাতার নির্দ্দেশে, জীবনের ক্রোড় হইতে উঠিয়া মরণের ক্রোড়ে যাইয়া বসিল। এই আসন-পরিবর্ত্তন হেতু দ্বিজেন্দ্রলালকে কাহারও নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হয় নাই, কাহাকেও কাঁদাইতে হয় নাই, কাহারও জন্য কাঁদিতে হয় নাই। মহাযাত্রার পূর্ব্বে তিনি সখাসহচরগণের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়াছেন, বাদবিতণ্ডা করিয়াছেন—কাহাকেও জানিতে দেন নাই যে, তাঁহার গণা দিন ফুরাইয়াছে; তিনি বুঝেন নাই যে, তাঁহার জীবনের সন্ধ্যা মধ্যাহ্ন শেষ হইতে

না হইতেই আরম্ভ হইবে।—যাই সন্ধ্যার শঙ্খ বাজিল, মাতৃমন্দিরে প্রদীপ জ্বলিল, অমনই মায়ের আহ্বানে মায়ের ছেলে সব ভুলিয়া, সব ছাড়িয়া, মায়ের কোলে গিয়া উঠিলেন। মায়ামুগ্ধ জীব আমরা তাঁহার শবদেহ দেখিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইলাম। এমনই ভাবে তাঁহার চির-অভ্যস্ত রঙ্গের সহিত দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সংসার রঙ্গালয়ের যবনিকানিক্ষেপ করিলেন।

মৃত্যুকালে দ্বিজেন্দ্রলালের পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হয় নাই। আগামী ৪ঠা শ্রাবণ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে তিনি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ করিতে পারিতেন। নদীয়ার মহারাজের প্রসিদ্ধ দেওয়ান মনস্বী কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের জনক ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মাতা শান্তি-পুরের গোস্বামী অদ্বৈতাচার্য্যের বংশের কন্যা ছিলেন। পিতৃমাতৃ উভয় পক্ষেই দ্বিজেন্দ্রলাল সিদ্ধ ব্রাহ্মণবংশের বংশধর ছিলেন। তাঁহারা সাত ভাই, এক ভগিনী, ভগিনী মালতী দেবী সর্ব্বাগ্রে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, পরে সর্ব্বাগ্রজ রাজেন্দ্রলাল দেহত্যাগ করেন। এইবার দ্বিজেন্দ্রলাল চলিয়া গেলেন। এখন দ্বিজেন্দ্রলালের পাঁচ সহোদর বর্ত্তমান রহিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এক পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন, পুত্রের নাম শ্রীমান দিলীপকুমার; কন্যা শ্রীমতী মায়া দেবী। মায়া দেবী এখনও বালিকা এবং অনূঢ়া। বালক দিলীপকুমার যোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

প্রথম যৌবনে প্রশংসার সহিত এম্ এ. পাশ করিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল গবর্মেণ্টের বৃত্তিলাভ করিয়া সিসেষ্টার (Cirencester) কলেজে কৃষি-বিদ্যা শিখিবার জন্য বিলাতে গমন করেন। তখন দ্বিজেন্দ্রলালের তৃতীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ মনস্বী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় তখন বিলাতে ছিলেন; সিসেষ্টার-কলেজে কৃষিবিদ্যার চর্চ্চা করিতেছিলেন। ছোট ভাইটি বিলাত যাইতেছে দেখিয়া শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় বিলাতে গিরিশ বাবুকে এক-খানি পত্র লেখেন। সেই পত্র পাইয়া গিরিশ বাবু সিসেষ্টার হইতে লণ্ডনে আসেন, এবং যে জাহাজে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন, সেই জাহাজ বন্দরে আসিলে গিরিশ বাবু স্বয়ং জাহাজে উঠিয়া দ্বিজেন্দ্রলালকে খুঁজিয়া বাহির করেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাসায় লইয়া যান। দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত

৺নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় বিলাতে গিয়াছিলেন। বিলাতে থাকিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল স্বীয় কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। Lyrics of Ind বা ভারতগাথা নাম দিয়া তিনি ইংরেজী ভাষায় একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক রচনা করেন। ইংরেজ কবি ও মনীষী সার এডুইন আর্নল্ড দ্বিজেন্দ্রলালকে স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহার কবিত্বের আদর করিতেন। ভারতগাথা পুস্তকখানি তিনি আর্নল্ডের নামেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে দ্বিজেন্দ্র প্রায় এক বৎসর কাল রীতিমত ইউরোপীয় সঙ্গীতবিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছিলেন। এই চর্চ্চার ফলে, পরে তিনি বহু বিলাতী সুর ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা গানে যোজনা করিতে পারিয়াছিলেন। বিলাতের লেখাপড়া শেষ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দ্বিজেন্দ্রলাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের চাকরী লাভ করেন। এই চাকরীতেই তিনি জীবনের অবশিষ্ট অংশ যাপন করেন। বিহার প্রদেশ স্বতন্ত্র হইলে, তাঁহাকে বিহারে বদলী করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সে দেশে যাইয়া তাঁহাকে আর চাকরী করিতে হয় নাই। বাঁকুড়া হইতে ছুটী লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিলেন; আসিয়াই শুনিলেন যে, তাঁহাকে মুঙ্গেরে বদলী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহারই অল্পদিন পরেই সন্ন্যাস রোগের সূচনা হইল; প্রায় এক বৎসর পরে ঐ রোগেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।

ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনকথা। তিনি সাধ্বী সহধর্ম্মিণী পাইয়াছিলেন; সংসার-সুখে সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার দৃষ্টিতে বাঙ্গালীর এত সুখ ত সহে না। আজ প্রায় আট বৎসর হইল, সে সতী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনের শেষটুকু বিপত্নীক অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন,—পুত্রকন্যার মুখ দেখিয়া, তাহাদিগকে জীবনের সম্বল করিয়া গণা দিন শেষ করিয়াছিলেন। এই ভাবের ছোট খাট সুখ দুঃখ জড়াইয়া বাঙ্গালীর জীবন। দেহসুখ বা দৈহিক কষ্ট, অর্থস্বাচ্ছল্য বা অর্থকৃচ্ছ্রতা, শোকের তপ্ত শ্বাস বা সম্মিলনের স্মেরানন, মানমর্য্যাদা বা উপেক্ষা—সংসারের এই কয়টি সামান্য উপাদানের আধিক্য বা রাহিত্য লইয়াই বাঙ্গালীর জীবন। বিধাতার বিধানে অল্প বাঙ্গালীর জীবনকথা ঘটনাময়ী হইতে পারে, অথবা হইয়াছে। সাধারণতঃ বাঙ্গালীমাত্রই প্রণালীসংবদ্ধা গিরিতটিনীর মত কেহ বা স্বচ্ছ সলিলসম্ভার লইয়া কুল্ কুল্ রবে বহিয়া যাইতেছে; কেহ বা দুঃখের ও দারিদ্র্যের ক্লেশ-কর্দ্দমের উপর দিয়া গৈরিকবসনে গলিয়া গড়াইয়া যাইতেছে। কাহারও জীবনে ঘটনার উত্তাল তরঙ্গ নাই, বাধাজনিত ফেনিল ঊর্ম্মিমালার উৎক্ষেপ নাই।

পরন্তু বালুকাবিস্তারপ্রচ্ছন্না, গুপ্তসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় ভাবুক বাঙ্গালীর জীবন সংসারের বাহ্য উষরতাকে অবহেলা করিয়া ভিতরের ভাবপঞ্জরকে যেন চূর্ণ করিয়া, অনেক সময়ে নূতন পথ ধরিয়া বহিয়া যায়। এই হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনকথা ঘটনাময়ী; এই হিসাবে তিনি বাঙ্গালীর শুভস্মৃতির বেলাভূমির উপরে স্বনাম ঘন-গভীর অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; এই হিসাবে তিনি বাঙ্গালাকে ও বাঙ্গালীজাতিকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। এই ভাবের দিক্ দিয়াই দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনকথা আমাদের আলোচ্য, বিবেচ্য ও বিশ্লেষণযোগ্য।

যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে এ দেশে ফিরিয়া আসেন, তখন বাঙ্গালার ভাবস্থবিরতা ঘটিয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষার ও সভ্যতার সঙ্গীতে বঙ্গদেশে জাতিবৈরের প্রাধান্য যে নূতন ভাবের প্লাবন-তরঙ্গ আনিয়াছিল, যাহার প্রেরণায় এক দিকে ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব, অন্য দিকে ভাষার ও সাহিত্যের অপূর্ব্ব উন্নতি ঘটিয়াছিল, সেই প্লাবনপ্রবাহ অতিবিস্তৃতি হেতু স্থির-স্থবির-ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাহার বেগ ছিল না, তরঙ্গভঙ্গমহিমা ছিল না, বিরোধ বা বাধা জন্য জলোচ্ছ্বাস—ভাবোচ্ছ্বাসও ছিল না। ব্রাহ্মসমাজ শ্রান্ত, ক্লান্ত, ত্রিধা বিভক্ত; বঙ্কিমচন্দ্র মুমূর্ষু, তাঁহার সাহিত্যচেষ্টা ধর্ম্মের প্রণালীতে পড়িয়া একটু জড়ভাবাপন্ন হইয়াছিল, নবীনচন্দ্রের জলপ্রপাতবিলাসের বালুকায় পড়িয়া আত্মগোপন করিয়াছিল,—বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মনীষা যেন নিশ্চল-অসাড়বৎ হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কেবল বচনের আস্ফালন ছিল, নবচন্দ্র কেবল আস্ফালনের আস্ফালন করিতেছিলেন, উন্নতিশীল শিক্ষিত-সম্প্রদায় সমাজ-সংস্কারের দোহাই দিয়া কেবল স্বেচ্ছাচারের আস্ফালন করিতেছিলেন; এবং রাজনীতিক-সম্প্রদায়, কংগ্রেসের বিশালতায় আগ্রীব-নিমজ্জিত হইয়া কেবল একতার আস্ফালন করিতেছিলেন। 'ন্যাকামী'র প্রভাব চারি দিকে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতের Humour বা ব্যঙ্গের এ দেশে আমদানী করিয়া, দেশীয় শ্লেষের একটু মাদকতা উহাতে মিশাইয়া, বিলাতী ঢঙ্গের সুরে হাসির গানের প্রচার করিলেন। সে গান বাঙ্গালা ভাষায় যেমন অপূর্ব্ব, সে গানের সুর ও গীতপদ্ধতিও তেমনই বাঙ্গালীর পক্ষে নূতন। হাসির গানের রচনায় তিনি যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন, হাসির গান গাহিতে তিনি স্বয়ং তেমনই অতুল্য ছিলেন। ময়মনসিংহ হইতে মালদহ পর্য্যন্ত, দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে ডায়মণ্ডহার্ব্বার পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সকল জেলায়, সকল সমাজে,

তিনি স্বয়ং তাঁহার হাসির গান গাহিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই নূতন, উপাদেয়, অম্লমধুর সামগ্রী শিক্ষিত বাঙ্গালী হাসিমুখেই গ্রহণ করিয়াছিল। কথায় আছে—"হাসিতে হাসিতে বালা কাঁদিয়া আকুল"—দ্বিজেন্দ্রলালের এই হাসির গান শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বহু ভাবুক বাঙ্গালী কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। কেন না, এই হাসির অন্তরালে, ব্যঙ্গশ্লেষের অবগুণ্ঠনের ভিতরে আত্মদৃষ্টির সকরুণ অনুরোধ ছিল—সে কারুণ্যপূর্ণ আহ্বানের ক্ষীণ ধ্বনি যাহার হৃদয়তন্ত্রীতে গিয়া আঘাত করিয়াছে, তাঁহাকেই কাঁদিতে হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার রচিত হাসির গানের সাহায্যে বাঙ্গালীকে হাসাইয়া মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। নব্য হিন্দু তাঁহার ব্যঙ্গে নিজের দিকে তাকাইয়াছিল। বিলাত-ফের্ত্তা বাঙ্গালী সাহেব তাঁহার শ্লেষের কশাঘাতে দেশের মুকুরে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিল; রাজনৈতিক দেশহিতৈষী তাঁহার বিদ্রূপবাণে অধীর হইয়া বিদেশের আদর্শ প্রচ্ছন্ন রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল, স্বদেশের আদর্শের অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এক হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে একটা ভাব-বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন—'ন্যাকামী'র সঙ্কোচ করিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ঠিক ফরাসী satire বা বিদ্রূপ নহে; উহা খাঁটী British humour বা বিলাতী ব্যঙ্গ; বাঙ্গালীর পোষাকে বাঙ্গালায় আমদানী করা হইয়াছে। ইন্দ্রনাথ শ্লেষবিদ্রূপের রাজা ছিলেন, তিনি ন্যাকামীর বিকটতাটুকুকে ফুটাইয়া তুলিয়া পথের মাঝে ন্যাকাকে অপ্রস্তুত করিতেন—লজ্জা দিতেন। তাঁহার শ্লেষবিদ্রূপে যেমন তীব্রতা ছিল, তেমনই গাঢ়তা ছিল; যেন শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক, যেখানে লাগে, সেখানকার হাড় পর্য্যন্ত কাটিয়া বসে,—মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথা লাগে, জ্বালায় অধীর হইতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান নির্ভেজ রঙ্গভঙ্গ। সেকালের বিদূষক যেমন মমত্বভাবমুগ্ধ হইয়া প্রতিপালক রাজার অর্থ ও প্রাধান্যজনিত ন্যাকামীটুকু মধুর মোলায়েমভাবে সভার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়া রাজাকে সংযত করিত; দ্বিজেন্দ্রলালও তেমনই বিদূষকের মাধুরী লইয়া, জাতি ও সমাজের প্রতি প্রগাঢ় মমত্বভাবে বিভোর হইয়া, সখা সহচরের দুষ্টামীর সম্ভার দিয়া, যেন সে ব্যঙ্গে নিজেকেও ডুবাইয়া, হাসির গান রচনা করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যাহাদিগকে গালাগালি করিতেন, তাহাদিগকে কখনই পর করিয়া রাখেন নাই। হাসিতে হাসিতে জড়াইয়া ধরিয়া

চিম্‌টি-টি কাটিয়া ছাড়িয়া দিতেন। তাই তাঁহার হাসির গানে বিছুটীর জ্বালা ছিল না; আল্‌কুশীর বিস্ফোটক উদ্ভূত হইত না। পরন্তু যাহারা এই হাসির গানের চাপা করুণার অশ্রুকণার লবণস্বাদ পাইত, তাহারাই মরমে মরিয়া যাইত; ক্ষোভে, নৈরাশ্যে, অনুশোচনায় তাহাদের এক একটি করিয়া পঞ্জর ভাঙ্গিয়া পড়িত। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সেকালের যাত্রার সঙ্গের গান নহে, ভাঁড়ের ভাঁড়ামী নহে, কথকের নকল নহে, ঠাকুরদাদার ব্যঙ্গ নহে; পরন্তু এই সকলের সমবায়ে বিলাতী 'হিউমরে'র চাটনীমাত্র। হাসির গানে তিনি ব্যঙ্গ করেন নাই কাহাকে লইয়া? ব্রাহ্ম, থিওসফিষ্ট, নব্যহিন্দু, বিলাতফের্ত্তা বাঙ্গালী সাহেব, ভণ্ড দেশহিতৈষী, রাজনৈতিক আন্দোলনকারী, বাবু, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, হাকিম—বাঙ্গালার সকল শ্রেণীর সকল রকমের ক্ষ্যাকা ধরিয়া তিনি ব্যঙ্গ করিয়াছেন। অথচ কেহই তাঁহার প্রতি রুষ্ট নহে, কেহই তাঁহাকে পর ভাবিয়া দূরে থাকে না। এই হেতু বলিতেছিলাম যে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে একটা ভাব-বিপ্লব ঘটাইয়াছিল, সুধীর বাঙ্গালীকে কল্পপ্রণোদনায় উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালার পক্ষে উহা নূতন সামগ্রী, পূর্ব্বে উহা বাঙ্গালায় ছিল না।

এই হাসির গান রচনা করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালী ইংরেজীনবীশকে একটা নূতন তত্ত্ব ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বিদেশের সামগ্রী কেমন করিয়া স্বদেশে আমদানী করিতে হয়, তাহা এই হাসির গানেই বাঙ্গালীকে তিনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার রচিত "বিরহ" ও "প্রায়শ্চিত্ত" প্রভৃতি প্রহসন হাসির গানের মঞ্জুষা নহে, পরস্বকে নিজস্ব করিবার রকমারিবিশেষ। বাঙ্গালী সাহেবের স্ত্রী রেবেকা পতি-অন্বেষণে ভারতবর্ষে আসিয়াও রেবেকা রহিয়া গেল, বাঙ্গালিনী হইল না, পরন্তু বাঙ্গালী সাহেব বিলাতী 'পলিশ' চাঁচিয়া ফেলিয়া অল্পায়াসেই খাঁটি বাঙ্গালী হইতে পারে, ফরাসে বসিয়া তামাকু সেবন করিতে পারে। সাহেব সাজা সহজ, পরন্তু গোরা সাজা সহজ নহে, গোরার গুণ গ্রহণ করিতে পারিলে তাহা রহে ও সহে, কিন্তু সাহেবের কোটকোট পুরাতন হইলেই জীর্ণবস্ত্রের মতন ছিঁড়িয়া পড়ে। "বিরহে" এই বাঙ্গালীদের পরিস্ফুরণ অতি সুন্দর ভাবে দেখান আছে। তাঁহার হাসির গান এক একটি তত্ত্ব, তাঁহার প্রহসনগুলি এই তত্ত্বরচিত বাগুরাবিশেষ। এই জালে

পড়িয়াছেন অনেক পাখী—অনেক হরবোলা, অনেক কাকাতুয়া, অনেক পাহাড়ী ময়না।

কিন্তু যে বিধাতা দ্বিজেন্দ্রলালকে অশেষ মনীষায় অধিকারী ও প্রতিভাশালী করিয়াছিলেন, সেই বিধাতা তাঁহাকে কেবল হাসিয়া ও হাসাইয়া জীবনযাপন করিতে দিলেন না। "এত সুখ সহে না"—এ কথাটা দ্বিজেন্দ্র সর্ব্বদা বলিতেন, নাটকে লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনেও খাটিয়া গিয়াছিল। নিজে সুরূপ, বিদ্বান, সুরসিক ও বহুবল্লভ; পত্নী অনিন্দ্যসুন্দরী, অশেষগুণসম্পন্না, গৃহের গৃহিণী, সংসারের সচিব, জীবনের সঙ্গিনী। এমন মণিকাঞ্চনের সংযোগ কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? দ্বিজেন্দ্রলাল ভাগ্যধর ছিলেন; তাই যৌবনকালটা সংসার-সরোবর-বক্ষে অনুরাগের কহ্লার-সদৃশ হইয়া ভাসিয়া বেড়াইয়াছিলেন। কিন্তু এত সুখ বহুদিন সহিল না, প্রৌঢ়তার শীর্ষে আরোহণ করিতে না করিতে তিনি সতীর সাধ্বী পত্নীর সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইলেন। যে অফুরন্ত হাসির লহর তাঁহার অধরমধ্য হইতে অজস্র জলপ্রপাতের মতন বাহির হইত, সহসা তাহা নিয়তির এক বজ্রাঘাতে বিশুষ্ক হইয়া গেল। হাস্যময় ভাবময় হইলেন, ব্যঙ্গময় করুণার ধারায় আপ্লুত হইলেন; সুখময় সোহাগের শিরীষকেশর ছাড়িয়া দুঃখের প্রস্তরপঞ্জর ভেদ করিতে উদ্যত হইলেন। জীবন-নাট্যের হাসির অঙ্ক ফুরাইল; ভাবের অঙ্ক আরব্ধ হইল।

পত্নীবিয়োগের পূর্ব্ব হইতে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির লহরের সহিত যে ভাবের লহর আইসে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। "সীতা", "পাষাণী" প্রভৃতি নাটক ভাবসূচনার প্রথম যুগের লেখা। এ লেখায় ভাব আছে; সে ভাবাভিব্যঞ্জনায় যথেষ্ট কারিকরীও আছে। তাই "সীতা" সখের সামগ্রী, চেষ্টা-সাধ্য ভাবকুসুমমাত্র। "পাষাণী"তেও কারিকরীর অভাব নাই;—আয়োজনের চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত। পরন্তু পত্নীবিয়োগের পর সে ভাব উদ্দাম প্রবাহতরঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যকে যেন ডুবাইয়া পরিস্নাত করিয়া তুলিয়াছিল। এ তরঙ্গে দেশহিতৈষণার সোনার কমল, বিশ্বমানবতার পারিজাতমালা, জাতি-প্রীতির নন্দনকুসুমপরম্পরা নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। ইহাদের স্নিগ্ধ, শান্ত, শীতল সৌরভে বাঙ্গালা সাহিত্য, বঙ্গীয়-মনীষা বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। এই সৌরভে মাদকতা আছে, কিন্তু উন্মাদনা নাই; সুখে কাঁদিতে হয় বটে; কিন্তু আত্মহারা হইবার উপায় নাই।

"দুর্গাদাস", "রাণা প্রতাপ", "নূরজাহান", "সাজাহান", "চন্দ্রগুপ্ত" প্রভৃতি নাটকে যে ভাবের একটানা স্রোত বহিয়াছে,—তাহা গঙ্গাতরঙ্গের ন্যায়। যেমন সকল নদনদী গঙ্গায় আসিয়া পড়িলে গঙ্গা হইয়া যায়, তেমনই ইউরোপের নানা ভাব, নানা আদর্শ, নানা স্ফুটোক্তি কবির মনীষা-খাত, প্রতিভাসমুজ্জ্বল ভাবগঙ্গার গর্ভে আসিয়া পড়িয়া আমাদের পেয়, ব্যবহার্য্য, পবিত্রীকরণের অবলম্বনস্বরূপ ভাগীরথীসলিল হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল পরস্বকে নিজস্ব করিয়াছেন; পরের সামগ্রী নিজের অঙ্গনে আনিয়া এক পার্শ্বে বোঝা বাঁধিয়া তিনি ফেলিয়া রাখেন নাই। আমাদের গৃহস্থলীর প্রত্যেক কার্য্যে সে সকল প্রযুক্ত করিবার জন্ত তিনি যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন; তাঁহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয় নাই। বরং বলিব, এ পক্ষে তিনি যেমন সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন, ইদানীং অতটা সফলতা-লাভ আর কোনও বাঙ্গালী কবি ও লেখকের ভাগ্যে ঘটে নাই। কথাটা এই, দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজী সাহিত্যের ও ইংরেজী সমাজধর্ম্মের গুণ-প্রধান অংশটা ধরিতে পারিয়াছিলেন—বুঝিতে পারিয়াছিলেন; পক্ষান্তরে, তিনি বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব অনেকটা বুঝিতে ও চিনিতে শিখিয়াছিলেন। উভয়-পক্ষের এই পরিচয়ের ফলে, তিনি ইংরেজী সাহিত্যের সৌন্দর্য্যটুকু, আধুনিক Humanitarianism বা মানবপ্রীতির মাধুর্য্যটুকু বাঙ্গালার সাহিত্যে আমদানী করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার গম্ভীর গানে, নাটকের ভূমিকাবিন্যাসে, ঘটনাপারম্পর্য্যের উন্মেষচেষ্টায় তিনি মানবপ্রীতির পরিচয় অনেকটা দিয়াছেন। হাসির গানে বাঙ্গালী জাতির প্রতি মমত্ববোধের প্রথম বিকাশ হইয়াছে, সে মমত্ববোধ "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" এই দুইটি গানে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই মমত্ববোধের স্ফুরণ হইয়াছে দেশাত্মবোধে; "দুর্গাদাসে" ও "রাণাপ্রতাপে" এই দেশাত্মবোধ ষোলকলায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি মমত্ববোধটুকু প্রগাঢ়তালাভ করিলে, উহা বিশ্বমানবতার প্রতি পরমাপ্রীতিরূপে প্রকাশিত হইবেই; কেন না, ভারতবর্ষ যে বিশ্বের সংক্ষিপ্তসার। জগতের সকল জাতি, সকল ধর্ম্ম, সর্ব্বপ্রকারের ও সর্ব্বস্তরের সভ্যতা ভারতবর্ষে নিত্য বিদ্যমান। এই ভূমির প্রতি মমত্ববোধ ঘটিলেই উহা বিশ্বব্যাপী হইবেই। "নূরজাহান", "সাজাহান' প্রভৃতি নাটকে জগদ্ব্যাপিনী প্রীতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। বিলাতী Humanitarianismটুকু স্থানে স্থানে, ঠিক বিলাতী ঢঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। প্রীতির এই জগন্ময়তাকে আত্মময়রূপে প্রকাশ করিয়া বুঝাইবার অবসর দ্বিজেন্দ্রলালের

হয় নাই। ভাবের এই উচ্চতম স্তরে পহুঁছিবার পূর্ব্বেই বিধাতা তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া গেলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান লিখনপদ্ধতির উপর প্রতিভার দৌরাত্ম্য ঘটান নাই। তিনি বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের পরবর্ত্তিরূপে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে, বাঙ্গালা গদ্যপদ্যে যাহা অতি অল্পমাত্রায় ছিল, তিনি তাহাই অধিকমাত্রায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। প্রথম Directness, ভাবসরলতা, বা শব্দের নারাচ-গতি তাঁহাতে পর্য্যাপ্তপরিমাণে ছিল। যেমন "মানুষ আমরা, নহি ত মেষ", "এই দেশেতে জন্ম আমার, এই দেশেতে মরি" প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষা অভিলাষের কথাগুলি যেন তীর-গতিতে সোজাসুজি ভাবে হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে আসিয়া আঘাত করে। তিনি শব্দ-সারল্যের প্রভাবে তাঁহার মনোগত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে এমন ভাবে মুখর করিতে পারিতেন যে, তাহাদের প্রতিধ্বনি শ্রোতৃবর্গের প্রত্যেকের হৃৎতন্ত্রীতে যাইয়া সমান স্বরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। লেখকের সঙ্গে পাঠকগণও সমান আশা-আকাঙ্ক্ষায় প্রমত্ত হইয়া উঠে—তদ্ভাবভাবুক, সমরসরসিক হইতে পারে। লেখার এমন কৌশলকে একটা বড় কৌশল বলিয়া আলঙ্কারিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শব্দের ও ভাবের এই 'নারাচ-গতি'র অন্তরালে একটু পরুষ ভাব থাকেই। দ্বিজেন্দ্রলাল এই পারুষ্যকে অনুরাগের ভাবমদিরায় এতটাই মধুর করিয়াছিলেন যে, তাঁহার Masculinism বা verbe বা পারুষ্য কখনও কাহারও কর্ণে বাজে নাই, সে পারুষ্য শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কাহাকেও দূরে ঠেলিয়া ফেলে নাই,—সকলকেই আপন করিয়া যেন কোলের দিকে টানিয়া লইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের লেখার আর একটি অপূর্ব্ব গুণ আছে—তিনি স্ফুটোক্তির সাহায্যে বিরোধালঙ্কারের অভিব্যঞ্জনা ঘটাইয়া এমন একটি অভিনব রসের অবতারণা করিতেন যে, শ্রবণমাত্রই পাঠকগণ ও শ্রোতৃমণ্ডলী অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া যাইত। ইহা ইংরেজী Climax ও Antithesis, এই দুইয়ের সমবায়ে প্রায়ই ফুটান হইত; অনেক ক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষা ও মালোপমার সম্মিলনে রসের সঞ্চার করা হইত। একটা উদাহরণ দিব :—

"নারীর রূপ—যা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠদান; নারীর রূপ—যা ইন্দ্রধনুর মত সেই অনাদি শুভ্ররূপকে রঞ্জিত করে; নারীর রূপ—যাহার মহিমায় পৃথিবী মদভরে

মাথা উঁচু করে' স্বর্গকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কর্চ্ছে, যেন বল্‌ছে—দেখাও দেখি,এর মত তোমার কি আছে; নারীর রূপ —যার পদতলে সমস্ত বিশ্বসৌন্দর্য্য এসে লুটিয়ে পড়ে; যার দিকে চেয়ে শব্দ সঙ্গীতে বেজে উঠে, ভাষা ছন্দে গেয়ে উঠে, জ্ঞান উন্মাদ হয়, ভক্তি নতজানু হয়ে নুয়ে পড়ে, যে সৌন্দর্য্যের কোমল করস্পর্শে পশুও বশ হয়—সেই নারীর রূপ।"

এই ভঙ্গীর লেখা তাঁহার নাটক সকলে অনেক আছে। এই ভঙ্গীর সাহায্যে তিনি ভাষায় একটা নূতন জোর, নবীন তেজ, একটা স্পর্দ্ধার শ্লাঘা ফুটাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই ভঙ্গী আমাদের বাঙ্গালার গদ্যে পূর্ব্বে এতটা ছিল না। ইহা দ্বিজেন্দ্রলালের আমদানী, ইহার সদ্ব্যবহার করিতে জানিলে ও পারিলে বাঙ্গালা ভাষা একটা নূতন তেজ লাভ করিবে। দ্বিজেন্দ্রলাল ধ্বনির অনুপ্রাসে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, ধ্বনির অনুপ্রাসের রাজা হইলেও, দ্বিজেন্দ্রলাল বড় ছোট ছিলেন না। তাঁহার—

"এ কি সরিৎরঙ্গ, শত তরঙ্গ, নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।"

যে কোনও কবিকে শ্লাঘাযুক্ত করিতে পারে। এই শব্দের ঝঙ্কার দিতে, সেই ঝঙ্কারের ভিতর দিয়া মধুর ভাবের মীড় ও গমক ফুটাইতে দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন পারিতেন, তেমন বুঝি বাঙ্গালার খুব অল্প কবিই পারিয়াছেন। নিজের ও পরের, সকলের মাধুরী তিনি তাঁহার প্রতিভার বীণায় এমন পটুতার সহিত ফুটাইতেন যে, শুনিলেই মনে হইত, বুঝি কোথায়—কোন অজানা দেশে, কেমন এক অজানা মুহূর্ত্তে শুনিয়াছি, এতদিন বিস্মৃতির মোহে ঢাকা ছিল, আজ কবির প্রতিভায় তাহা উদ্বুদ্ধ হইল। শ্রোতৃবর্গের মনে এই অনুকম্পার ভাব জাগাইয়া তুলিতে যে কবি যে লেখক পারেন, তিনিই ত প্রকৃত প্রতিভাশালী, তিনিই ত মনীষী। হাসির গান বলুন, কাব্যগাথা বলুন, নাটক-প্রহসন বলুন, সর্ব্বত্র সর্ব্বদিকেই দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্টতা—individualism ফুটিয়া আছে। সাক্ষের মতন তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্বকে কবিত্বের প্লাবনে ডুবাইতে পারেন নাই। তাঁহার বিশিষ্টতা সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট, তাঁহার কাব্যনাটকের দোষ গুণ তাঁহার ব্যক্তিত্বের দোষ গুণ হইতেই নিঃসৃত,—পটুতার অভাবজন্য নহে, আরাধনার ত্রুটীজন্য নহে, মনীষা ও প্রতিভার ন্যূনতা জন্য নহে। যদি কখনও তাঁহার নাটক, কাব্যগাথা ও হাসির গানের বিস্তৃত সমালোচনা হয়, যদি তাঁহার সৃষ্টির বিশ্লেষণ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, তখন তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের, মতামতের, ভাব অভাবের বিশ্লেষণও আবশ্যক হইবে, কেন না,

তাঁহাকে বুঝিতে না পারিলে, তাঁহার কাব্যগত ত্রুটী বিচ্যুতির, উৎকর্ষাপকর্ষের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না। তিনি তাঁহার বিশিষ্টতার ছাপ তাঁহার লেখায় খুব চাপিয়া আঁতিয়া দিয়া গিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল মেঘচরিত্রের পুরুষ ছিলেন না। কখনও ঘনঘোর গর্জ্জন, কখনও আসারধারাসম্পাত, কখনও ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণানুরঞ্জন, কখনও উষার ঘোর লোহিতাভা, কখনও বা সূর্য্যাস্তের বর্ণের খেলা তিনি দেখাইতে পারেন নাই! তিনি নাটক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু নট ছিলেন না। "এ সংসার রঙ্গ-শালা"—এ কথাটা তিনি জানিতেন বটে, বুঝিতেনও বটে, পরন্তু জীবনটাকে লইয়া তিনি কখনই অভিনয়ের চাতুরী দেখাইতে পারেন নাই। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,—

"শুধু দু' দিনেরই খেলা।
ঘুম না ভাঙ্গিতে, আঁখি না মেলিতে,
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা।
আশার ছলনে কত উঠি পড়ি,
কত কাঁদি হাসি, কত ভাঙ্গি গড়ি,
না বাঁধিতে ঘর হাটের ভিতর—
ভেঙ্গে যায় এই সাধের মেলা।
আমাদেরও এই দেহ-প্রাণ-মন,
সুখ দুঃখ এই জীবন-মরণ,
—এও বিধাতার-পুতুল খেলা
—শুধু গড়া আর ভাঙ্গিয়া ফেলা।"

ইহা বিধাতার পুতুল খেলা, তোমার আমার নহে। আমরাও পুত্তলিকামাত্র। দ্বিজেন্দ্রলাল আস্তিক ছিলেন, ভগবানের লীলায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাই নিজে কখনও জীবনটাকে লইয়া অভিনয় করেন নাই। তিনি সদাই ভাবিতেন,-সখা সহচরের সহিত আমোদে প্রমোদে, হাসির তরঙ্গে, রঙ্গভঙ্গে, শোকের বজ্র-সূচী-বেধকালে সর্ব্বদাই ভাবিতেন,—"কি-জানি কখন সন্ধ্যা হয়,"—"ঘুম না ভাঙ্গিতে, আঁখি না মেলিতে, দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা,"—এই বেলা মনের সাধবাসনা যতটুকু পারো, যতটুকু সামর্থ্য কুলায়, মিটাইয়া লও। তাই তিনি সংসারযাত্রায় সরল সোজা পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাই তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া সর্ব্বদাই বলিতেন—"জুয়াচোর,

অহঙ্কারী, হুযাগ্‌ কখনও কি বুদ্ধিমান হইতে পারে ? তাহারা জীবনসংগ্রামে জিতিলে ভগবানের সৃষ্টি থাকিবে না। তাহারা ধরা পড়িবেই।" এই কথাটা তিনি সর্ব্বদাই মনে রাখিতেন বলিয়া তিনি কখনই ন্যাকামীর প্রশ্রয় দেন নাই, পাপের সহিত আপোষ করেন নাই। পরন্তু দুর্ব্বলতার ক্ষমা তিনি সর্ব্বদাই করিতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল মিত্র সঙ্গে, সখা সহচরের দলে খোলা প্রাণে সরল উদারভাবে মিশিতেন, নিজে কখনই পীর বা ওস্তাদ্‌ সাজিয়া উচ্চমঞ্চে বসিতেন না। যে রসিক (Humourist) হয়, ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতে পারে ও জানে, সে জীবনের কৌতুকটুকু বুঝে, সে ব্যবহার-বিশেষের Ludicrousness বা উৎকটতাটুকু ধরিতে জানে ও পারে, সে ত এমন বাক্যে বুজরুকী করিয়া মিত্রসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে পারে না। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল সরল, উদার, খোলা প্রাণের বন্ধু ছিলেন। তবে প্রতিভার Assertiveness বা স্বপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা তাঁহারও অতিমাত্রায় ছিল। দ্বিজেন্দ্র যাহা ধরিতেন, তাহা শেষ করিতেন, যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহা শতবাধাবিঘ্নসত্বেও করিতেন। এই assertiveness বা একগুঁয়ে ভাবটা তাঁহার নাটক সকলের স্থানে স্থানে বেশ ফুটিয়া আছে। হিন্দুর সমাজতত্ব যে তিনি ভাল করিয়া বুঝিতেন, শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্ম যে তিনি ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, এমন কথা বলিতে পারি না। এই অনভিজ্ঞতা হেতু সমাজের পদ্ধতির ধারার উপর, সমাজের ভাব-পারম্পর্য্যের উপর দুই একটা অভিমানের উপদ্রব তিনি করিয়াছেন বটে, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া তিনি হিন্দু সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অবহেলা করেন নাই। আবাল্য ইংরেজী-শিক্ষা, বিলাতে যাইয়া বিলাতী ভাবে অবগাহন-স্নান, তাহার পর দেশে আসিয়া সেই বিলাতী মোহমাধুর্য্যের বিন্যাস-প্রয়াস—এতটা হইলেও দ্বিজেন্দ্রলাল স্বজাতিকে চিনিয়াছিলেন, স্বদেশকে মাথায় করিয়া লইয়াছিলেন।

"জীবনে মরণে আমি তোমারি, তোমারি কাছে
জনমে জনমে ফিরে আসিব।"

এই সাধ, এই বাসনা, এই ব্রত, এই উপাসনা দ্বিজেন্দ্রের লেখার সকল ভঙ্গীতেই আছে। প্রেমের গানে এই সাধ, দেশহিতৈষণার গানে এই বাসনা, ধর্ম্মের সঙ্গীতে এই উপাসনা, সংসারযাত্রায়ও এই ধারণার অনুসরণ! গোটা-কয়েক Fixed ideas বা স্থির ধারণার সমবায়ে তাঁহার নাটকগুলি সৃষ্ট। তাঁহার জীবনটাও ঐ গোটাকয়েক স্থির ধারণার ব্যঞ্জনামাত্র, তাঁহার ধারণার

মূলে কদাচিৎ কেহ আঘাত করিলে, সহোদর হইলেও, তাহাকে তিনি অব্যাহতি দিতেন না—দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে তিনি তাহাকে বর্জ্জন করিতেন। তিনি সংযমী পুরুষ ছিলেন, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তিনি অনেকটা, অনেক বিষয়ে, অনেক ভাবে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মত সখা দেখি নাই, তাঁহার মত বন্ধুও পাই নাই। তিনি সত্যবাদী, মিত্র-বৎসল, লোকপ্রিয় ও পরদুঃখকাতর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কথা মনে করিলে তাঁহার রচিত একটি গান মনে পড়ে—

"আর কেন মা ডাকছ আমায়, এই যে এইছি তোমার কাছে,
নাও মা কোলে, দাও মা চুমা, এখন তোমার যত আছে।
সাঙ্গ হলো ধূলা-খেলা, হয়ে এলো সন্ধ্যাবেলা,
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা, এখন তোমায় হারাই পাছে।
আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে,
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি—মা তোমার ঐ বুকের মাঝে।
এবার যদি পেইছি তোমা, আর ত তোমায় ছাড়ব না মা
ও মা—ঘরের ছেলে, পরের কাছে, মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে।"

যেন এই গানের সার্থকতা বুঝাইবার জন্য, উহার যথার্থতা দেখাইবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল দেহত্যাগ করিলেন। মরণেও সেই Naiveness, সেই ঝোঁক, সেই জবরদস্তি, সেই আদুরে-আব্দার-ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল মায়ের আদরের আস্বাদন ত ইহজীবনে ভুলিতে পারেন নাই, তাই তিনি সে আব্দারের ভাবটা তাঁহার সকল কার্য্যেই—কাব্য গাথায়, নাটকে, প্রহসনে—কোনও স্থানেই চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। ইহাই দ্বিজেন্দ্রের বিশিষ্টতা—এই হেতুতেই, দ্বিজেন্দ্র এত বড় কবি, এত বড় লোক, এমন বন্ধু—এমন সখা।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যসৃষ্টির দোষগুণের বিচার করিবার এখনও সময় হয় নাই। তাঁহার কাব্যগাথা নাটক-প্রহসন সমাজে কতকটা না থিতা-ইলে,—সমাজের সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া না পড়িলে, তাঁহার কীর্ত্তির সুবিচার ঠিকমত হইবে না। এখনও তাঁহার ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার মোহ সমাজে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; এখনও আমরা সকলেই বন্ধুবিচ্ছেদে বিহ্বল—ভ্রাতৃশোকে উন্মত্তপ্রায়;—এখনও বাঙ্গালীসমাজ এমন কবির জীবনের মধ্যাহ্নে তাঁহাকে হারাইয়া প্রবঞ্চিতের ন্যায় বিভ্রান্ত। এখন তেমন চুলচেরা

বিচারের সময় আইসে নাই। এখন কাঁদিতে হয়—কাঁদাইতে হয়। সখার বিহনে কাঁদিতে হয়;—সে সখা কেবল আমাদেরই নহে—জাতির, সমাজের, ভাষার সখা, তাহা বুঝাইয়া, তাহার ঘোষণা করিয়া কাঁদাইতে হয়। কাঁদিতে পারি—কাঁদিতেছিও; পরন্তু কাঁদাইব কেমন করিয়া? যদি বুঝাইতে পারিতাম যে, সর্ব্বনাশের সূচনা হইলে, নিকুম্ভিলা যজ্ঞের পূর্ণাহুতির পূর্ব্বে ইন্দ্রজিৎতুল্য স্বস্তিদর পুরুষগণ স্বধামে চলিয়া যান—বাঙ্গালার তেমন ইন্দ্রজিৎগুলিই এমনই ভাবে যজ্ঞ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন—তাহা হইলে, কাঁদাইতে পারিতাম। শিবরাত্রের শলিতা এক একটি শিবমন্দিরের স্বর্ণপ্রদীপে জীবন-ঘৃতাভাবে নিবিবার পূর্ব্বেই জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে, চারি প্রহরের কোনও পূজাই শেষ হইতেছে না,—এইটুকু বুঝাইতে পারিলে কাঁদাইতে পারিতাম। আর কাঁদাইবই বা কাহাকে? সবাই ত স্ত্রীরোদন করিবে। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পরে আর্য্যাবর্ত্তে যে নারীমণ্ডলীর রোদনধ্বনি উত্থিত হইয়াছে, তাহার প্রতিধ্বনি আজ পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইল না। যুগে যুগে সমবায়ে সে ক্রন্দনরোল আকাশ ভেদ করিয়া উঠে উঠে, গৃহে গৃহে বাটীতে সে ক্রন্দনরোল একতারার শব্দের মত থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের বিয়োগজনিত শোকধ্বনি এই একতারার করুণধ্বনি। যে শুনে, সে বুঝে, সেই কাঁদিবে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

গৌড়-কবি চতুর্ভুজ।

পুরাকালে যে সকল গৌড়-কবি সংস্কৃত ভাষায় কাব্যাদির অবতারণা করিয়া রচনা-প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চতুর্ভুজ একজন উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁহার নাম ও তাঁহার কাব্য কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর যত্নে, নেপাল-দরবার-পুস্তকালয়ের সযত্ন-সংগৃহীত পুরাতন পুস্তকাবলীর পরীক্ষাকার্য্য প্রবর্ত্তিত হইবার পর, চতুর্ভুজের নাম ও তাঁহার কাব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সুধীসমাজে পরিচিত হইয়াছে (১)।

---

(১) A Catalogue of palmleaf and selected paper Mss belonging to the Durbar-Library, Nepal, 1905.

চতুর্ভুজের গ্রন্থের নাম—"হরিচরিতকাব্যম্"। তাহার বর্ণনীয় বিষয় "কৃষ্ণলীলা"। তাহা ত্রয়োদশ সর্গে, ১২৫০ শ্লোকে সমাপ্ত। ভানুকর নামক জনৈক লেখকের লিখিত মিথিল-অক্ষরের একখানিমাত্র গ্রন্থই এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার আরম্ভ এইরূপ :—

"সুরসমূহ-সমীহিত-সিদ্ধয়ে ধরণিধারণ-পোষিত-বৃদ্ধয়ে।
যদুকুলেঽবতার য এব নঃ সততমস্তু মুদে মধুসূদনঃ॥"

কাব্যের কথা চিরপুরাতন; তাহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কাব্যমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে কবির বংশপরিচয় যেরূপভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নূতন এবং অপরিজ্ঞাত। সুতরাং কাব্যাংশের আলোচনা অপেক্ষা, কবির বংশপরিচয়ের আলোচনা অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিভাত হইবে। তাহার সহিত বাঙ্গালীর ইতিহাসের সম্পর্ক আছে।

এই কাব্যের পুষ্পিকায় রচনা-কাল উল্লিখিত আছে। তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের একটি স্মরণীয় কাল বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য। তৎকালে গৌড়ের ইতিহাসবিখ্যাত সুলতানগণের সিংহাসনে তাঁহাদের হাব্সী ক্রীতদাসগণ উপবিষ্ট,—বঙ্গভূমি নিত্য বিপ্লবে বিপর্যস্ত। সেই বিপ্লবকালে, গৌড়-নগরেই, চতুর্ভুজের কাব্য রচিত হইয়াছিল। কবি রচনাকাল-বিজ্ঞাপনার্থ লিখিয়া গিয়াছেন,—

"শর-বিধু-মনুভিঃ শকসঃ বর্ষে পরিগণিতেঽথ নভস্তুরূপাক্ষে।
প্রতিপদি শশি-বাসরে সম্পূর্ণং হরিচরিতাহ্বয়-নবকাব্যমেতৎ॥"

এই নির্দ্দেশ-অনুসারে ১৪১৫ শকাব্দ [১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ] কাব্য-সমাপ্তির কাল বলিয়া জানিতে পারা যায়। ইহার পর বৎসরেই স্বনামখ্যাত আলাউদ্দীন হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং তাঁহার শাসনসময়ে স্মরণযোগ্য অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়। কবি লিখিয়া গিয়াছেন,—তিনি বাস করিতেন,—"ভাগীরথী-পরিসরে",—"বহুশিষ্টজুষ্টে",—"শ্রীরামকেলি-নগরে।" তাহা গৌড়-নগরের একাংশমাত্র। তৎকালে তাহা বিদ্যাচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বৈষ্ণব-সাহিত্যেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামকেলির নাম বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এই নগরে দিবস-ত্রয় বাস করিয়া, হরিনামামৃত বিতরণ করিয়াছিলেন;—হোসেন শাহের বিশ্বস্ত মন্ত্রী রূপ-সনাতন এই নগর হইতেই সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখনও বর্ষে বর্ষে এখানে জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তি হইতে দিবসত্রয় ভক্তগণের

উৎসব সম্পাদিত হয় ;—এখনও "রামকেলির-মেলা" গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে সুপরিচিত।

চতুর্ভুজ বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজের কাশ্যপগোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন। তাঁহার জন্মকালে, তাঁহার পিতা স্বর্ণ লেখনীতে মধুসংযুক্ত করিয়া, নবজাত শিশুর জিহ্বায় "ত্রৈপুর-মন্ত্র" লিখিয়া দিয়াছিলেন। চতুর্ভুজ ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেরূপ বংশাবলীর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই,—
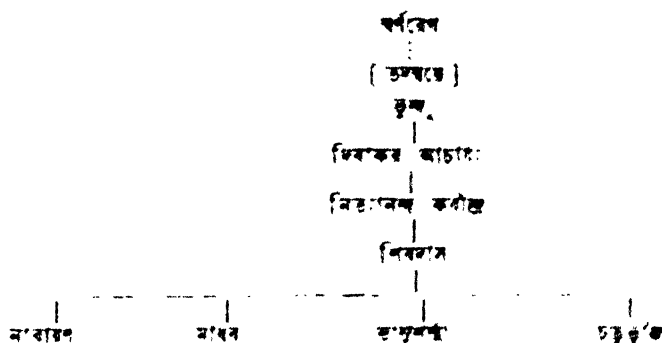
ভুম্ন, এক জন সাধু পুরুষ ছিলেন। সমসাময়িক আর্য্যগণ তাঁহাকে "আচার্য্য-বরে"র পদে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দিবাকরও "আচার্য্যবর" বলিয়া উল্লিখিত। তিনি "কাশ্যপগোত্র-ভাস্কর" ছিলেন। তাঁহার "বংশাবতংস" নিত্যানন্দের উপাধি ছিল "কবীন্দ্র"। তিনি "স্মৃতি-কৌমুদী" গ্রন্থের রচয়িতা। কাশীধামে "ভগবদ্ভবপাদপদ্মে"র আরাধনা করিয়া, পুত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, কবীন্দ্র পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন শিবদাস। শিবদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণ মহামন্ত্রী ছিলেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন গৌড়কবি চতুর্ভুজ।

ভুম্ন, কাহার পুত্র ছিলেন, চতুর্ভুজ তাহার উল্লেখ করেন নাই। তিনি স্বর্ণরেখের "অন্বয়-ক্ষীরসমুদ্র-চন্দ্র" বলিয়াই উল্লিখিত। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজে কাশ্যপগোত্র-সম্ভূত স্বর্ণরেখের নাম অদ্যাপি সুপরিচিত। বারেন্দ্র কুলজ্ঞগণ বলেন, "স্বর্ণরেখ" এবং ভবদেব দুই সহোদর ছিলেন। বরেন্দ্র দেশে বাস করিয়া স্বর্ণরেখ "বারেন্দ্র", এবং রাঢ়দেশে বাস করিয়া ভবদেব "রাঢ়ীয়" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

বারেন্দ্র কুলজ্ঞগণের গ্রন্থে মৈত্র-কুলের বংশাবলী যেরূপভাবে লিখিত আছে, তদনুসারে আদিশূরের আমন্ত্রণে যিনি গৌড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন,

তাঁহার নাম সুষেন মুনি। তাঁহার বর্ত্তমান বংশধরগণ কেহ মৈত্র এবং কেহ ভাদুড়া উপাধিতে পরিচিত। তাঁহার বংশাবলী এইরূপ,—
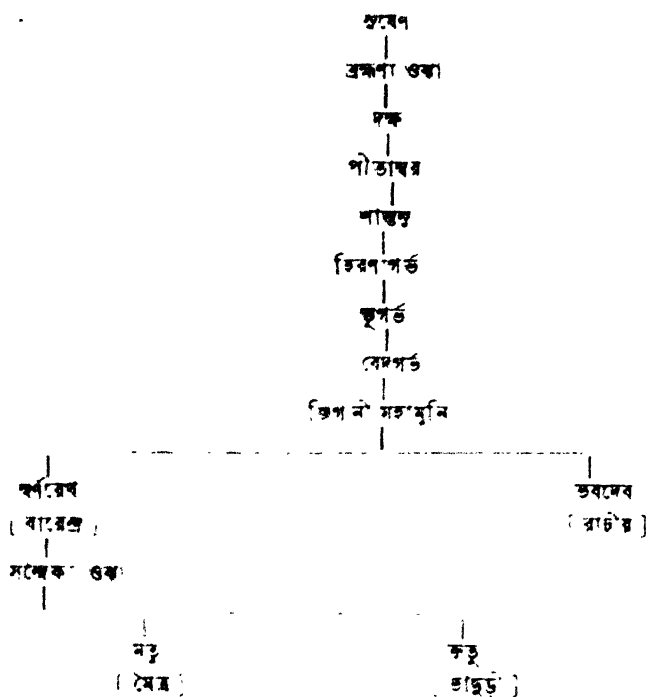
কুলজ্ঞগণের মতে, স্বর্ণরেখ সুষেণের অধস্তন নবম পুরুষের ব্যক্তি; এবং তাঁহারই পৌত্রগণ বল্লালসেনদেবের সভায় "কৌলীন্য-মর্য্যাদা" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং স্বর্ণরেখ বল্লালসেনের পিতামহের [হেমন্ত সেনের] সমসাময়িক ব্যক্তি। তাঁহার পূর্ব্বে, সপ্তদশ পাল-নরপাল গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সুতরাং কুলজ্ঞগণের মতানুসারে গণনা করিলে, পালরাজগণের শাসনকালকেই সুষেণ মুনির গৌড়াগমনকাল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বারেন্দ্র-কুলশাস্ত্রগ্রন্থে পালরাজগণের শাসনকালের অবসানেই ব্রাহ্মণাগমনের আখ্যায়িকা উল্লিখিত আছে। যথা,—

> "ততোদিশূরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধান্ নৃপপালবংশান্।
> শশাস গৌড়ং দিতিজান্ বিজিত্য যথা সুরেন্দ্রস্ত্রিদিবং শশাস॥"

কুলজ্ঞগণের গ্রন্থে স্বর্ণরেখের নাম আছে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের কাশ্যপগোত্রের ব্যক্তিগণকে বল্লালসেন কর্ত্তৃক করঞ্জ নামক গ্রাম প্রদত্ত হইবারও কথা

আছে। চতুর্ভুজের গ্রন্থেও এতদ্বিষয়ক কিছু কিছু বিবরণ উল্লিখিত আছে। কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র। চতুর্ভুজ লিখিয়া গিয়াছেন,—

"গ্রামোত্তমোঽস্ত্যমলমঙ্গলগুণৈকপুঞ্জঃ
শ্রীমান্ করঞ্জ ইতি বন্দ্যতমো বরেন্দ্র্যাম্ ।
যত্র শ্রুতিস্মৃতিপুরাণপদ-প্রবীণাঃ
সচ্ছাস্ত্রকাব্যনিপুণাঃ স্ম বসন্তি বিপ্রাঃ ॥
কার্ণঃ প্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণকায়ঃ
শ্রীস্বর্ণরেখ ইতি বিপ্রবরোঽথবর্তী
তং গ্রামমগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং
জগ্রাহ শাসনবরং নৃপধর্মপালাৎ ॥"

এই বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়,—পুরাকালে বরেন্দ্রীমণ্ডলে, করঞ্জ নামে সুপরিচিত গ্রামে, শ্রুতিস্মৃতিপুরাণকাব্যনিপুণ বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; স্বর্ণরেখ সেই সমগ্র গ্রামখানি ধর্মপাল নামক নৃপতির নিকট হইতে "শাসন"-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং স্বর্ণরেখ ধর্মপালদেবের সমসাময়িক ছিলেন। ইহার সহিত কুলজ্ঞগণের গ্রন্থের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত করিবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা কুলশাস্ত্রের আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা ইহার মীমাংসা করিতে পারিবেন। না পারিলে, ইতিহাস চতুর্ভুজের কাব্যোক্ত বিবরণেরই অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িবে। কুলশাস্ত্রের বিবরণ জনশ্রুতিমূলক, চতুর্ভুজের কাব্যোক্ত বিবরণও জনশ্রুতিমূলক। কোনও বিবরণই সমসাময়িক প্রমাণ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। তথাপি চতুর্ভুজের কাব্যোক্ত বিবরণ যখন প্রচলিত জনশ্রুতিমূলক, কুলশাস্ত্রের বিবরণের সেরূপ মর্যাদা দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌড়কবি চতুর্ভুজের সময়ে [পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে] বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের কাহ্নগোষ্ঠে কিরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল, "হরিচরিত"-কাব্যে তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার সহিত কুলজ্ঞগণের গ্রন্থের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না কেন, ইহাও অবশ্যই অনুসন্ধানের বিষয়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

'দ্বিজু।'

বাণীর অমূল্যনিধি, সাহিত্য-সম্রাট,
অকস্মাৎ তোমা তরে স্বর্গের কপাট
খুলি গেল ; অসময়ে গেলে তাড়াতাড়ি
সাধের "জনমভূমি"—মাতৃবক্ষ ছাড়ি।
"আর্য্যগাথা" দিয়া পূজা করিলে হরষে
জননীর পাদপদ্ম ; বালকণ্ঠ-গীতে
ঢালিলে অপূর্ব্ব সুধা মধুর-ললিতে।
যৌবন-বসন্ত সনে মানস তোমার
স্বদেশের প্রেমরাগে রাঙ্গিল আবার
ব্যঙ্গহাস্যে, উচ্ছ্বসিয়া উঠিল হৃদয়,
হাসি-স্রোত বহাইল বঙ্গদেশময়।
তার পরে দেহ মন মাতার চরণে
সঁপি দিয়া, কি গাহিলে অমর-নিক্কণে
"জন্মভূমি", "ধন ধান্য পুষ্পে ভরা" গান,
তারি মাঝে নিমজ্জিত তোমারি পরাণ।
"আমার দেশে"র কথা কার মুখে আর
শুনিবে ভারতবাসী অনন্ত ঝঙ্কার!
অশ্রান্ত অমৃতধারা পান করিবার
কা'র মুখ পানে চাহি ভুলিবে সংসারে—
দুঃখ দৈন্য রোগ শোক বাঙ্গালী-জীবন?
সঞ্জীবনী-সুধা-দানে আবার নূতন
গড়িবে দেশের হিয়া, প্রীতি অনুরাগে
ভায়ে ভায়ে আলিঙ্গন কেবা দিবে আগে?
এ দুর্দ্দিনে তুমি "দ্বিজু"! ছেড়ে গেলে সবে—
কার গীতে বঙ্গমাতা জীবন লভিবে?
কবীন্দ্র দ্বিজেন্দ্র তুমি, মধ্যাহ্ন-জীবনে
শিখাইলে মাতৃপূজা বিবিধ বিধানে।
শিক্ষক বলিয়া আজি করিব সম্মান,
সারদার বরপুত্র চিরমতিমান্।

সভাপতির অভিভাষণ। *

প্রাচীন ঋষিরা সভা ও সমিতিকে প্রজাপতিদুহিতা বলিয়া আখ্যান করিয়াছেন। এই সভা তাঁহাদিগের স্তুতিছন্দের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, যদিচ আমি তাহা উচ্চারণ করিবার যোগ্য নহি। তবে আজ পরিষদের অনুগ্রহে সভাপতি পদে বৃত হইয়াছি বলিয়া সেই দ্যুতিমতী ভাষায় আপনাদিগের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে।

সভা চ সমিতিশ্চ অবতাম্ প্রজাপতেদু হিতরৌ সম্বিদানে
যেনা সংগচ্ছা উপ মা স শিক্ষাৎ চারু বদানি পিতরঃ সঙ্গতেষু।
বিদ্মতে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা অসি
যে তে কে চ সভাসদস্তে তে মে সন্তু সবাচসঃ।
এষামহং সমাসীনানাং বর্চো বিজ্ঞানমাদদে
অস্যাঃ সর্বস্যাঃ সংসদো মামিন্দ্র ভগিনং কৃণু।
যদ্বো মনঃ পরাগতং যদ্বদ্ধমিহ বেহ বা
তদ্ব আবর্ত্তয়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ।

এই সভা আমার উপর সুপ্রসন্ন হউন।

আমি যেন উপস্থিত পিতৃদিগের আশীর্ব্বাদে উপস্থিত সভাস্থলে চারুবাক্ হইতে পারি।

এই সভার অর্থ, আমি জানি, ইহার অন্যতর নাম অক্ষুণ্ণা। (নরিষ্টা)।

সভাসদেরা যেন আমার সহবাচী হয়েন।

আমি যেন তাঁহাদিগের তেজ ও জ্ঞানের গৌরব প্রাপ্ত হই।

এই সংসদের সৌভাগ্য আমি যেন লাভ করিতে পারি।

যদি এই সভায় কাহারও মন পরাগত হইয়া থাকে, কিংবা অন্যত্র আবদ্ধ থাকে, যেন এই স্থানে আবর্ত্তিত হইয়া আমার মনেতে অনুরক্ত হয়।

যে দেবভাষায় আপনাদিগকে অভিভাষণ করিলাম, তাহাতে আমার অধিকার নাই, স্বীকার করি। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ভাষা, আমি কবিদিগের হৃদয়ের ভাষা, সকলের তাহাতে অধিকার নাই। অধিকার সত্ত্বেও আমরা অধিকারভ্রষ্ট। পূর্ব্বের অধিকার কিসে যে রক্ষা করিয়াছি,

* উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনীর দিনাজপুর-অধিবেশনে পঠিত।

তাহা জানি না। নিজের ভিটা ছাড়িয়া, আবর্জ্জনাস্তূপের উপর স্থান গ্রহণ করিয়াছি। উচ্ছৃঙ্খল জীবন অবলম্বন করিয়াছি। ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি, সমাজের বন্ধন অবজ্ঞা করি, প্রাণের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। হৃদয়ে অনার্য্য ভাব, জিহ্বাগ্রে অনার্য্য ভাষা। গ্রামে গৃহস্থ নাই, দেবমন্দিরে জাগ্রত দেবতা নাই; নিজের ঘর ছাড়িয়া, পরের দ্বারে উপযাচক আমরা! আমাদের কিসে অধিকার আছে? নিশ্চয় হৃদয় নির্ব্বাক, অথচ আমরা বহুবাচী, অতএব সত্যের প্রতি লক্ষ্যশূন্য। নির্ভীক আত্মা হিরণ্যবর্ত্তিনী, পঙ্কিলপদে সে পথে চলা যায় না। গৃহে আলোক নাই, অথচ "মুস্কিল-আশান" সাজিয়া, পরের কল্যাণ কামনা করিয়া বেড়াইতেছি। যদি তাহাতেই কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। শূন্যহস্তে আশীর্ব্বাদ করিতে শিখিয়াছি। ভিক্ষার ধন লইয়া দান করিতে বসিয়াছি। সূর্য্যোদয় হয় পূর্ব্বে, আর আমরা পরাঙ্মুখ হইয়া আছি।

হে ইন্দ্র, আমাদিগকে জ্ঞান দাও, পিতা যেমন পুত্রকে জ্ঞান দান করে। এমন পথে শিক্ষা দাও, জীবনে যেন সূর্য্যকে দেখিতে পাই। হে পুরুহূত, আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হই।

> ইন্দ্র ক্রতুং ন আভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা
>
> শিক্ষা ণো অস্মিন্ পুরুহূত যামনি, জীবা জ্যোতিরশীমহি।

যদি আমরা এই প্রার্থনা করিতে পারিতাম, ঈশ্বরও আমাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দিতেন।

সচন্দ্র জ্যোতিঃপ্রকাশিতা নেত্রী উষা আকাশের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দীপ্তিমতী, আলোক-বিকাশিতাঙ্গী দেবী উষা প্রত্যহ সেই দ্বারে দণ্ডায়মানা, আমরা নিদ্রাতুর, কখনও তাঁহাকে দেখি না। এই বিচিত্রা বিস্তীর্ণা দেবীকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্তুতি দেবলোকে গ্রাহ্য হইত। আমরাও বিনীতভাবে আজ স্তুতি করিতেছি। আমাদের আঁধার হৃদয়ে আলোক আনিয়া দাও, প্রাণে বল আনিয়া দাও। অনাবৃত আকাশের নীচে, স্বাধীনচেতা কবি, গুরু ছিলেন। নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতা আমরা, তাঁহাদিগের মত মনের সাহস আমাদিগের হইবে কিসে?

তাঁহাদিগের এক একটি শব্দ, এক একখানি আলেখ্য।

উষা জলন্ত বলিয়া "ভাস্বতী"।

আলোকের উৎস বলিয়া "নেত্রী"।

অন্ধকে আলোকিত করেন বলিয়া "জ্যোতিঃ"।

রক্তিম বলিয়া "অরুণী"।

শ্রেষ্ঠ বলিয়া "মঘোনী"।

শুভ্র বলিয়া "বিভাবরী"।

জাজ্বল্যমান বলিয়া "বিভাবরী", যাহা আমাদের ভাষায় আজকাল রাত্রি।

সঞ্চারিণী বলিয়া "সূনৃতা"।

দেবতা কি, না বুঝিলে, তাঁহার উপযুক্ত নাম ধরিয়া ডাকিতে পারা না। বৈদিক কবি উষাকে অনাবৃতবক্ষা নর্ত্তকীর সহিত তুলনা করিতে সঙ্কোচ করেন নাই। যে কণ্ঠে তাঁহাকে মঘোনী বিভাবরী সম্বোধন করিয়াছেন সেই কণ্ঠে, দেবি তুমি কন্যার ন্যায় শরীর বিকাশ করিয়া, দীপ্তিমান সূর্য্যের নিকট গমন কর, যুবতীর ন্যায় উজ্জ্বল-দীপ্তি-বিশিষ্টা হইয়া, হাস্যমুখে তাঁহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর, বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন।

মনে যেরূপ দেখিয়াছেন, সেরূপ অবতারণা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই। তাঁহাকে কখনও বালিকা, কখনও জরায়ুতা, কখনও সূর্য্য-পত্নী, কখনও বা সূর্য্য-জননীরূপে বর্ণনা অভিহিত করিয়াছেন। নির্ভীক কবি সহস্র ভিন্ন ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছেন। দ্বিধাশূন্য সংশয়শূন্য, অপরের অবলম্বন রহিত। বাঙ্গালী মহাপুরুষের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, তোমার আমার সে চেষ্টায় পাপ স্পর্শে। সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহারা কি বলিতেছেন, শুন :—

> নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ
> কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্।
> ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
> আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস।

R. V. 10. 120.

Nor aught no naught existed :

Yon bright sky was not; no heaven's broad roof out-

streched above, what covered all? what sheltered? what concealed?

Was it the water's fathomless abyss?

There was not death—There was naught immortal.

Maxmuller, p. 290.

দাম্ভিক কবি গর্ব্বের সহিত বলিয়াছেন—

"আমরা সত্যবাদী—মিথ্যা কহি না।

নূনমৃতা বদন্তো অনৃতং রপেম।

R. V. 10. 10. 4.

এই সত্যের তেজোবলেই তাঁহাদিগের কাব্য তেজোময়। আমাদিগের কবিতাও ওজস্বিনী হইবে। সাহিত্যের মূলে সত্য ও সাহস চাই। এ বল আসিবে কিসে? ধর্ম্মের পথ অবলম্বন না করিলে, সামাজিক গ্রন্থি দৃঢ় না করিলে, অসত্য-উপেক্ষী না হইলে, এ শক্তির কখনও সঞ্চার হইবে না। আপনার পরিচ্ছেদে আপনাহারা হইয়া চিরদিন রহিতে হইবে। একদিন ঘরের দিকে চোখ পড়িয়াছিল, অবসন্ন আত্মা গৃহ-দেবতাকে জাগ্রত দেখিতে পাইয়াছিল, নূতন ভাব মনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, নূতন আলোক আপনার হৃদয়ে দেখিতে পাইয়াছিলাম, বহু দিনের কথা নহে, কিন্তু আলোক স্তিমিতপ্রায়, সে অঙ্কুর বিকাশের পূর্ব্বেই যেন শুকাইয়া গেল, দেবতা শিলাখণ্ডে পরিণত হইল, দৃষ্টি আবার বাহিরের জঞ্জালের উপর নিক্ষিপ্ত হইল—ভাগ্যের দোষ দেই না, বালকত্ব না ঘুচিতেই আমরা পিতা, শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিতেই আমরা শিক্ষক, মাত্রা শুদ্ধ না হইতেই আমরা লেখক। সাধ্যাতীতের সাধনা বলের অপচয়মাত্র, তাহাতে অকল্যাণ ভিন্ন কল্যাণ হইতে পারে না। যাহা আয়ত্তাধীন, তাহাতেই বলের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকার যতই আমরা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিব, আমরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়িব। জাতীয়তার অবতারণা রাজসূয় যজ্ঞ, সহজে সে যজ্ঞের অধিকারী হওয়া যায় না। শুদ্ধ, সংযমী, প্রশান্তচেতা হওয়া চাই। আমার হৃদয় আমার রাজ্য, অনুভব করা চাই, • আমি আছি না বুঝিলে, আপনার কি অপরেব চিনিয়া লইবে কি প্রকারে? আদর্শভ্রষ্ট আমরা, স্বেচ্ছাচারিণীর অঞ্চল ধরিয়া মার অনুসন্ধানে চলিয়াছিলাম। প্রথমে আপনার ঘরের ভিতর আপনার স্থান

সহিত কর, পরে পৃথিবীর কোন খণ্ডে বাসা বাঁধিয়াছ তাহা বুঝিতে পারিবে, বিশ্বের সহিত কি সম্বন্ধ, তখন উপলব্ধি হইবে। ঋত্বিকেরাই আহুতি দিতে সক্ষম, আহুতি-ভেদে দেব কি দানব, যজ্ঞক্ষেত্র অধিকার করে।

আদি কবিই আর্য্যাবর্ত্তে আদি পুরোহিত, গুরু, শিক্ষক ছিলেন, সে স্থান আজ কে অধিকার করিতে পারে? আমরা নিজের খেয়ালে আপন আপন ধর্ম্ম গড়িয়া লইতে শিখিয়াছি; কখনও বা ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি, কিংবা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমরা বিজ্ঞানের দোহাই দিতে শিখিয়াছি; ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মাপ জোক করিতে পারি, জগৎ-কারণ অপরিমেয় বলিয়া, তাহার ধ্যান করা নিষ্ফল মনে করি। আমরা দেবতার ধার ধারি না, দেবালয়ের পাশ দিয়া চলি না—আমরা কি বলের উপর নির্ভর করিয়া অপরকে বলদান করিতে পারি? তুমি আপনি অবলম্বন-রহিত, কি ভরসায় তোমায় অবলম্বন করিব? তাই বলি, চিত্ত শুদ্ধ করিতে শিক্ষা কর, নিজের গৃহ পরিষ্কার করিয়া লও। ঘরের আঁধার কোণে বসিয়া জগতের আঁধার অনুভব করা সহজ, কিন্তু অবারিত দ্বারে না দাঁড়াইলে জগতের বিস্তীর্ণ আলোক দেখা যায় না। তাই বলি, হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত কর। বিশ্বের প্রাণের ভিতর স্থান না পাইলে বায়ুবিতাড়িত বাষ্পের ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। সমাজে প্রাণ নাই, বিশ্বের প্রাণ অনুসন্ধান নিষ্ফল।

স্বাধীনচেতারই হস্তে লেখনী জ্বালামুখী হয়। দেবীত্তম সরস্বতী সূর্য্যালোকাবৃতা। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ভিন্ন স্থূল দৃষ্টির গোচর নহেন। ঐ দৃষ্টি সাধনায় মেলে। যখন বলিতে পারিবে, My mind to me a Kingdom is, তখন সে রাজ্যে দেবীত্তমার পূর্ণোপচারে পূজা সম্ভব। মিথ্যার বোঝা ঘাড়ে লইয়া সমাজ গড়া যায় না। দেবীর পূজা সোনার কুল দিয়া হয় না। সত্যই জীবনের ভিত্তি, মানব-হৃদয়ের সাহস। ধর্ম্ম বল, কাব্য বল, সবই সত্যের উপর নির্ভর করে। সমাজে লুকাচুরী করিতে করিতে মন জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুখে যাহা কাজে তাহা যে জাতি করিতে অশক্ত, কোন্ আশা তাহার ফলবতী হইবে? বক্তা বাঙ্গালী বাহিরে বীর, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই মার্জ্জার হইয়া পড়েন। ধর্ম্মাচার্য্য বাঙ্গালী আপনার গৃহমধ্যে অত্যাচার

করিতে কুণ্ঠিত হ'ন না, পরের কোষ্ঠী কাটিতে অণুমাত্র সঙ্কোচ করেন না। কাণাকাণি করিয়া গালাগালি দিতে ছাড়ি না, সকলেই প্রায় অনাচারী, কিন্তু সকলেই আচারের গণ্ডীর ভিতর আছি বলিয়া বুঝাইতে চাই। মিথ্যার হাটে মূর্ত্তি কেনা চলিতে পারে, দেবী পাওয়া যায় না।

প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি Beranger নেপোলিয়নের সমসাময়িক ছিলেন। নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছিল। Beranger সাহিত্য-সমাজের কাছে এই বলিয়া বিদায় লইয়াছিলেন,—আর লিখিব না, বলিতে পারি না; কিন্তু লেখা প্রকাশ করিব না, ইহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি। দেখিবার শক্তি আছে, কিন্তু আর দেখিতে চাহি না। জীবনের শেষ সন্ধ্যাতে চক্ষু মুদিয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়া পড়িতে ইচ্ছা নাই। সময় আসিয়াছে মনে হইলে, অকাতরে ধরাশায়ী হইয়া চিরনিদ্রা লাভ করিব। প্রাণের কথা লইয়া হাটের মধ্যে দাঁড়াইতে পারি না; সে কথা যদি বেচা কেনা চলে চলুক—ঘরে ক্ষুদ কুঁড়া আছে, তাহাতেই আমার চলিবে। আতুরের পায়ের ধূলি চক্ষুতে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা নাই—আমি বিদায় লইলাম, সহজেই সে স্থান আপনারা পূরাইয়া লইতে পারিবেন। অনেকেই এ কথার সত্যতা বোধ হয় অনুভব করেন. আমিও করিলাম বলিয়া যদি আমাকে মাপ করা প্রয়োজন মনে করেন, মাপ করিবেন। কারণ, আপনাদিকে বিশ্বাস করিতে বলি, আমি সত্য যাহা ভাবি, তাহাই বলিতেছি। হাটের মধ্যে বাস করিবার অনিচ্ছা সত্বেও অবস্থাক্রমে অনেকেই বাস করিতে বাধ্য। হাটে বারওয়ারী হইতে পারে, উহা পূজার স্থান নহে।

কথা সত্য, তাহার অন্যতর প্রমাণ আছে। বাঙ্গালা নাটক সাধারণতঃ বলিতে গেলে নাট্যজগতে উচ্চ স্থান পায় নাই। আমাদিগের সামাজিক অবস্থায় পাইতে পারে না। পৃথিবীর কোনও স্থানে পারে নাই। নাটক সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। জাতীয় ধীশক্তির প্রধান পরিচয় নাটকেই পাওয়া যায়। অন্য কবিতা কবির মানসজাত, গাথা নিজের প্রাণের গান, মহাকাব্য পৌরাণিক ইতিহাসের অবতারণা—যাহারা আর জগতে নাই, কল্পনার সাহায্যে তাহা সাজাইয়া ল'ন, কঙ্কালে পুন জীবন দেন। তাঁহারা রচনা-মধ্যে দেব দেবী মানব যেখানে উপযুক্ত মনে করেন, সেইখানে বসাইয়া ল'ন। কিন্তু যথার্থ নাটকে, সামাজিক

চিত্র যাহা আছে, কবি তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তোলেন। যাহা প্রত্যহ দেখি, তাহার ভিতরের প্রাণ কোথায় প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। একের মনোভাব নহে, সামাজিক প্রাণী সকল কি সূত্রে গ্রথিত আছে, যদি বিচ্ছিন্ন থাকে, কোথায় তাহাদের ছেদ হইয়াছে, তাহাই আবিষ্কার করা—তাহাই সেই সমাজের লোকের যাহাতে উপলব্ধি হয়, সে শিক্ষা নাটক হইতে হয়।

যোগ বিয়োগ শুদ্ধমাত্র গণিতের ভাষা নহে, মানবহৃদয়ের ভাষা। এক এক জনের আশা মনোভাব লইয়া সমাজ গঠিত নহে—অথচ মানুষের নিজত্ব যতদিন আছে, আমার হৃদয়ের আশা আমারই, আমার স্নেহ মমতা আমারই, কিন্তু সমাজের শৃঙ্খল কোথায় তাহা অবরোধ করিয়াছে —কোথায় তাহার বিস্তৃতিসাধন করিতেছে, কোথায় তাহা বিশ্বজগতের প্রাণের ভিতর আমাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাই যথার্থ নাটকে প্রতিভাত। সুন্দর কুৎসিত, সত্য মিথ্যা, অনুরাগ বিরাগ— সকলেরই স্থান আছে। নাটক মানব-সমাজের প্রতিরূপ, মনুষ্য-হৃদয় জগৎ, ঈশ্বর আখ্যান—পয়ারে তাহাকে আবদ্ধ করা কঠিন, গদ্যে যাহা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় না, তাহার ভাষা, তাহার ছন্দ কবিকে আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়; তাহা নিয়মবদ্ধ করা যায় না। বহির্জগৎ কিংবা অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করা কাব্যের উদ্দেশ্য নয়। সম্ভাবিতের বিস্তৃতি আর সুন্দর আশাকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা, অর্থাৎ অসম্ভাবিতকে সম্ভবপর করার সাধনা, বিরাগ হইতে নূতন রাগের সৃষ্টি অবতারণ করা, অকল্পিতকে কল্পনার আয়ত্ত মধ্যে আনা, সকল প্রকার কাব্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই আশা, সেই রাগ, সে আদর্শ সমাজের হৃদয়ে জাগ্রত করা নাটকের শিক্ষা। নাটকেই কবি শিক্ষক।

ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাস দেখ, এই কথার সত্যতা সপ্রমাণ হইবে। এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডে নাটক চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করে। সে সময় ইংলণ্ডে নূতন প্রাণ আসিয়াছিল, নূতন আশা নূতন শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী জগতের রাজ্য-অধিকার-প্রয়াসী হইয়াছিল। সেই সময়ে ইংরাজী ভাষাতেও নূতন তেজের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন এক সময় আমাদের দেশে বাঙ্গালা লেখাপড়ার অনাদর ছিল, ইংলণ্ডেও এই সময়ের

পূর্ব্বে ঠিক তাহাই হয়। লাটিন এবং গ্রীকের চর্চ্চা ভিন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা লজ্জাকর মনে করিতেন। আমাদিগের পণ্ডিতেরাও সংস্কৃত ভাষা ছাড়া, বাঙ্গালা ভাষার অনাদর বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন; আর আমাদের ইংরাজী-ভাষামুগ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করা, অনেক দিন ধরিয়া হেয় জ্ঞান করিতেন। Roger Ascham ইংরাজী ভাষায় বই লিখিবার সময় এইরূপ ভূমিকা করিয়াছিলেন—"...although to have written this book either in Latin or Greek had been more easier and fit for my trade in study, yet I have written this English matter English tongue for English-men." তাহার পর কিছুকাল ধরিয়া লেখকেরা লাটিন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এক অদ্ভুত রচনা-রীতির সৃষ্টি করেন, যথন I trust the learned poets will give me leave and vouchsafe my book passage as being for the rudeness thereof no prejudice to their noble studies but even (as my intent is) an instax cotes to stir up some other of meet ability to bestow travail in this matter. আমাদের দেশেও তাহা ঘটিয়াছিল, নবজলধর-পটলসংযোগে প্রভৃতি সমাসের ও অনুপ্রাসের বেড়ায় বাঙ্গালা ভাষা সোনার হাতকড়ি ও বেড়ী পরিয়াছিল। পুস্তকের নাম Hecatompathia ও প্রস্তুকব্রতত্বনন্দিনী প্রায় একজাতীয়। তখন ইংরাজী ব্যাকরণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার প্রয়োজনজ্ঞান জন্মায় নাই, more easier প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যাইত। আমরাও তাই করিয়াছি, বাঙ্গালায় ব্যাকরণ নাই বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা বলা হইয়াছে। রাজা সতী অসতী, শনি ভাস্বতমুক্তা প্রভৃতি অনেক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ করিতে করিতে সহজ সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা জন্মিতে থাকে। লাটিন দেবদেবী ছাড়িয়া, সাদাসিধা মানুষের জীবনের উপর ক্রমে দৃষ্টি পড়ে। Morality plays, Interludes, Senecan tragediea, Chronical plays একে একে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শূন্য-পুরাণ, মাণিকচাঁদের গান, রামযাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি রচনা আমাদের মধ্যে আজকাল নাই। নিজের ঘরের ছেলে মেয়ের উপর যখন চোখ পড়ে, তখন নিজের শক্তির তেজও অনুভূত হয়। সেই সময় ইংলণ্ডে জাতীয় জীবন উদ্ভাসিত হয়। এই সময়ের কাব্য নাটক

অদ্ভুত বীর্য্যশালী, তাহার প্রত্যেক ছত্রে নবজাত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার প্রতিভা নূতন ছন্দে আবিষ্কৃত হয়। Sackville ও Shrileyর মধ্যবিৎ সময়ে এই বলের উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ হয়। দেখিতে দেখিতে সেক্সপীয়র সাহিত্য-জগতে সূর্য্যের মত উদিত হইলেন। এই নাটকগুলি পড়িয়া দেখিলে অনেক কুৎসিত কথা, কুশ্রী ভাব দেখিতে পাইবেন। কিন্তু কুৎসিত কথা মানুষের মুখে আছে, কুৎসিত ভাব মানবের মনে আছে। পাপ অপ্রচ্ছন্ন ভাবে সমাজে আছে, পুণ্যই অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থাকে। পাপপুণ্যে মানুষের হৃদয়, পাপপুণ্যে আমাদের জগৎ; অপাপবিদ্ধ জগৎ মানুষের নহে, দেবতার। এ জগতে ঈশ্বরের স্বরূপ রাহুগ্রস্ত, তাহার সম্যক উপলব্ধি এ জগতে সম্ভবপর নহে।

সত্য যদিচ বলের কারণ, তাহাতে অহং-এর অধিকার নাই, তাহা সার্ব্বজনীন। সত্য যেমন মানব-আত্মার ভাষা, মিথ্যা তেমনই মানব-হৃদয়ের দরদ দিয়া মাখা—এই সত্য-মিথ্যা-জড়িত মানবসমাজের চিত্র নাটকে প্রতিফলিত। সব সময়ে জীবনে মিথ্যা পরাজিত হয় না; Renan এক স্থানে বলিয়াছেন,—জগদীশ্বর! তোমার রহস্য বুঝিতে পারি না, তুমি যে আমাদের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন থাক, সেটা আমাদের উপর তোমার আশীর্ব্বাদ। সত্য যদি সর্ব্বত্র বিকশিত হইত, তাহা হইলে মানব-হৃদয়ের স্বাধীনতা থাকিত না।

যথা ইচ্ছা মন যায়, পৃথিবীতে মানব যথা ইচ্ছা বিচরণ করে। নাটক এই যথেচ্ছাচারী মানবসমাজের অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। সেক্সপীয়রের পূর্ব্বে যেমন অনেকগুলি ইংরাজ কবি তাঁহার জন্য স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহার পরেও অনেকগুলি কবি সে স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। যত দিন ইংলণ্ডে সেই নবজীবনের স্রোত বহিয়াছিল, ততদিন ধরিয়া ইংরাজী নাটকের প্রতিপত্তি ছিল। যে সময় হইতে সে আলো মন্দীভূত হইল, সেই সময় হইতে ইংরাজী নাটকের গৌরব-হ্রাস হইয়াছে। বড় গাছে যেমন পরগাছা আশ্রয় করে, সেইরূপ তাঁহাদিগের আধুনিক নাটক পরগাছা-স্বরূপ। নাট্যশালায় তাঁহারা ফরাসী নাটক অনুবাদ করিয়া চালাইতেছেন। বিলাতের জীবনের বৈচিত্র্য গিয়াছে, উৎসাহ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আজকাল বহুদেশের সংসর্গে তাহাদের সহিত মিলিয়া চলিতে হইতেছে। যাহা আছে, তাহা বজায় রাখিতে যত্ন-

বান হইতে হইয়াছে। সমাজের প্রাণী আর এক ছাঁচে ঢালা, মানসিক তেজ বহু ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত হইয়া কেন্দ্রীভূত হইতে পারিতেছে না। তাহা ছাড়া ঘরে কোঁদল বাধিয়াছে। গৃহের ভিতর কচকচিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত—নাটক লিখিবার অবসর কোথায়? যেমন ইংরেজী সাহিত্যে নাটকের উদ্ভাসের কথা বলিলাম, ফরাসী দেশেও ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল। ফ্রান্সের চারি দিকে অন্য অন্য দেশ। কাজেই তাহাকে নিজের বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া চলিতে হইয়াছে। যখন রোমান সভ্যতা চূর্ণ হইয়া যায়, ফরাসী ভাষার তখন জন্ম—ল্যাটিন ভাষা হইতেই তাহার উৎপত্তি। রোমানদিগের পূর্ব্বে কেল্‌টদিগের প্রভাবের ছায়া তাহাতে পড়ে নাই। conquering Frank সেই ভাষার মধ্যে নূতন ভাষা চালাইতে পারে নাই। ক্রমে এই ভাষার তেজ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, কিন্তু চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে Civil War গৃহবিচ্ছেদের দরুণ ফ্রান্সের সাহিত্য চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময়ের শেষভাগে বিশৃঙ্খল ফরাসী সমাজে নূতন ভাবের আভাষ পাওয়া যায়। সেই বিশৃঙ্খল সমাজে এক মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই কবি দস্যু ছিলেন; বহুদিন ধরিয়া কারাবদ্ধ ছিলেন। একবার তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তিনি কোনরূপে পরিত্রাণ পান। কিন্তু এই অসাধারণ পুরুষ, অসাধারণ কাব্যশক্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম Villon; সেই সময় হইতে Ronsard পর্য্যন্ত দিন দিন ফরাসী সাহিত্যের উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই Byzantine রাজত্ব ধ্বংস হয়, এবং নূতন তেজ ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, ইংলণ্ডে উদ্ভূত হয়। ফ্রান্সে এই সময় Ronsard বলিয়া একজন মহাকবির অভ্যুত্থান হয়, এবং নাট্য-জগতে Corneille, Racine, পরে Moliere, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে Voltaire এক এক যুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। ফ্রান্সের ইতিহাস এক মহাকাব্য—ফ্রান্সের সাহিত্য তাহারই পরবর্ত্তী, ফ্রান্সে কবি, শিক্ষক, চিরদিন সমাদৃত। Plieadsদিগের সময় হইতেই ফরাসী দেশে সাহিত্যের একটি বিশেষ সমাজ সৃষ্টি হয়। সে সমাজে রাজা প্রজা ছিল না, গুরু শিষ্য ছিল, ধনী নির্ধন ছিল না। সকলেরই সেই সমাজে সমান অধিকার। ফ্রান্স যেমন দিন দিন প্রতাপান্বিত হইয়া উঠে, তাহার সাহিত্য সমাজে দিন দিন নূতন বলে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। French Revolutionএর সময় দেখ, জাতীয় তেজের

কি আশ্চর্য্য বিকাশ দেখিতে পাইবে। এই সময়ের একটি চিত্র আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চাই।

ফরাসী সমাজে যেমন এক সময়ে অভিজাতবর্গ এবং জনসাধারণের মধ্যে একটি ঘোর বিচ্ছেদ হইয়া পড়িয়াছিল, ফরাসী সাহিত্য, বিশেষ কাব্যের ভাষাতেও সেইরূপ Noble এবং Bas, মহৎ ও নীচ জাতীয় কথার ভাগ হইয়াছিল। যাহা সাধারণের ভাষা, তাহা নীচ বলিয়া অভিহিত ও কাব্যে অব্যবহার্য্য ছিল। নীচের ভাষা নীচ ভাবে কলুষিত মনে করা হইত। গাছ বলা অসঙ্গত, বিটপী কিংবা পাদপ না বলিলে ভাগবত অশুদ্ধ হইত। Racine তাঁহার একখানি নাটকে Chien কুকুর কথাটি ব্যবহার করেন। তাহা লইয়া কতই না আন্দোলন চলিয়াছিল। Mouchoir রুমাল কথা এক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া, নাট্যশালায় খুনাখুনি হইয়া গিয়াছিল। আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত কেহ কেহ চলিত কথা ব্যবহার করিতে কাতর হ'ন। কথার মধ্যেও আমরা ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ন্যায় জাতিভেদ দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যে জাতি বড় ছোটর মধ্যে ভেদ অবহেলে উঠাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই জাতির কবিও কতদিন ধরিয়া কথার জাতিভেদ সহ্য করিতে পারে? এই বিষয় লইয়া সাহিত্য-জগৎ Victor Hugoর কিছু পূর্ব্ব হইতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক দল লেখক Romantic School নামে পরিজ্ঞাত, সাধারণ কথাগুলি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের Classic Schoolএর সহিত ঘোর দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। যাহারা আধুনিক, তাঁহাদের বয়স কম, সাহস অধিক, তাহারা উন্মত্তের মত এই বিবাদে যোগ দিলেন। এমন কি, অনেকে নিজের পারিবারিক নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া দিলেন। তাঁহার স্থানে Dick, Tom, Harry যাহা মনে আসিল, তাহাই ডাকনাম করিয়া লইলেন। পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাহাই হইল। তাহারা শুদ্ধমাত্র পূর্ব্ববর্তী ভদ্রসমাজের কালো Hat Coat ছাড়িয়া—বিবিধ বর্ণের বিবিধ রকমের কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ লম্বা চুল রাখিলেন, কেহ মাথা মুড়াইয়া লইলেন, পারিসের রাস্তায় যেখানে সেখানে এই অদ্ভুতবেশধারী অভিনবের দল দেখা যাইতে লাগিল। ইঁহারা প্রায় সকলেই সাহিত্যসেবক। অপর দলের মধ্যে কতিপয় যুবক, Jupiter, Neptune,

Mars প্রভৃতি দেবতাদিগের সাজে সজ্জিত হইয়া পথে চলিতে লাগিলেন। দুই দলে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইলে লাঠালাঠিতে পরিণত হইত। এই সময় Victor Hugoর কাব্যের অভ্যুদয় হয়। সময় থাকিলে তাঁহার প্রথম নাটক Cromwellএর উপক্রমণিকা পড়িয়া শুনাইতাম। Theophile Gautier এই উপক্রমণিকা সাহিত্যে Mount Sinaiএর Ten Commandments বলিয়া গিয়াছেন।

Cromwell লইয়া অনেক বাদ-বিসংবাদ চলিল। তাহার পরেই তিনি Hernani বলিয়া নাটকখানি লেখেন। ফরাসী সাহিত্য-সমাজে, 22th Feb. 1830, যে দিন Harnani অভিনীত হয়, 14th Julyএর মত পূজার দিন বলিয়া গণ্য। Hernani পৌরাণিক শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফ্রান্সের কাব্য-জগৎকে নূতন আলোকে আলোকিত করিল। হুগো পুরাতন ছন্দের নিয়ম অনায়াসে ওলট-পালট করিয়া নূতন ছন্দের সৃষ্টি করেন। প্রথম অভিনয়ের দিন বেলা দ্বিপ্রহর হইতে সহস্রাধিক সেবকের দল রঙ্গালয় দখল করিয়া লইলেন। পৌরাণিক দলও বলপূর্ব্বক স্থান অধিকার করিতে ছাড়িলেন না। অদ্ভুত অদ্ভুত বেশধারী শত শত যুবক-বৃন্দ সারাদিনের খাদ্যদ্রব্য লইয়া রঙ্গালয়ে সারাদিন যাপন করিবার যোগাড় করিয়া লইয়া গিয়াছিল। দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, ভিতরে পুলিস, বাহিরে সৈনিকের দল রঙ্গালয়-রক্ষার্থ নিয়োজিত হইয়াছিল। অভিনয়ের সময় উপস্থিত হইল। পটোত্তলনমাত্র অভিনবের দলের হুঙ্কারে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। পৌরাণিকেরাও গর্জ্জন করিতে ছাড়িলেন না। একটু অবসর পাইবামাত্র অভিনয় আরম্ভ হইল। সূত্রপাতেই Escalier, তাহার পর derobe (বিবস্ত্র সোপানাবলি) উচ্চারিত হইবামাত্র বিষম হলস্থূল পড়িয়া গেল— derode নূতন রকমের বিশেষণ, আবার তাহার উপর এক ছত্রের শেষ ভাগে বিশেষ্য Escalier, তার পর ছত্রে তাহার বিশেষণ derobe তাহার উপর এ কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার বলিয়া পৌরাণিকেরা গালাগালি আরম্ভ করিলেন। অভিনবেরা তাহাদিগকে বাপান্ত করিতে ছাড়িলেন না। তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। গোলমাল কিছু কমিয়া গেলে আবার অভিনয় আরম্ভ হইল। সাপেও বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হয়। এই অসাধারণ কবির ভাষা ও ছন্দে মন্ত্রমুগ্ধবৎ ক্রমে সকলে ধীরভাবে কতকটা শুনিলেন। মধ্যে মধ্যে তর্জ্জন গর্জ্জন চলিতে লাগিল। এক জন প্রকাশক চতুর্থ অঙ্ক

অভিনয়ের পূর্ব্বেই Victor Hugoর নিকট গিয়া নাটকখানি প্রকাশের সত্বের জন্ম ছয় হাজার ফ্র্যাঙ্ক দিবেন বলিয়া হাতে পায়ে ধরিতে লাগিলেন, বলিলেন, প্রথম অঙ্ক শেষ হইতেই দুই হাজার ফ্র্যাঙ্ক দিবেন—ঠিক করেন, ২য় অঙ্কের শেষে ৪০০০, তৃতীয় অঙ্কের পর ৬০০০ দিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন, অভিনয় স্থগিত থাকুক, কথাবার্ত্তা শেষ কর, না হইলে পঞ্চম পর্য্যন্ত শুনিলে ১০০০০ ফ্র্যাঙ্ক দিতে ইচ্ছা হইবে, কিন্তু দিবার সাধ্য নাই। Hugoর তখন দুই পাউণ্ড পর্য্যন্ত ঘরে সম্বল ছিল না, তিনি ছয় হাজার ফ্র্যাঙ্ক আনন্দসহকারে গ্রহণ করিলেন। অভিনবেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, সজোরে গান ধরিলেন। অন্য পক্ষ ছড়া কাটিতে ছাড়িলেন না। এইরূপে অভিনয় শেষ হইল। কোনরূপে পুলিস ও সৈনিক শান্তিরক্ষা করিল। কিছুদিন ধরিয়া এইরূপ ঝগড়াঝাটী চলিয়াছিল—পরে সকলেই নতমস্তকে কবির শিক্ষা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাই, স্বীকার করিয়া লইলেন। Harnani নাটক-কাব্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত নহে; কিন্তু ফরাসী সাহিত্যে ইহা নূতন পন্থাপ্রদ বলিয়া এখনও পূজিত। আমি তাই বলি, মাতৃভাষার আদর না জানিলে, নিজ সমাজের সমাদর করিতে না শিখিলে, মিথ্যার মধ্যে সত্যের রূপ না দেখিতে পাইলে, সাহিত্যসেবা বৃথা। আমাদের ভাষার আদর করা কি এতই কঠিন? যে ভাষায় মাকে আহ্বান করিতে শিখিয়াছি, তাহার যদি সম্মান করিতে না জানি, নরকেও আমাদের স্থান হইবে না। আজকাল, মনে হয়, এ কথাটি আমরা বুঝিয়াছি। তবে দুটি কথা বলিতে পারি কি? নিজের মা থাকিতে, পরের গৃহিণীকে মা বলিও না। আর নিজের মাকে বিদেশী জামাজোড়া পরাইও না। প্রথমটি স্বতঃসিদ্ধ, দ্বিতীয়টির অর্থ বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে কি?

এক স্থানে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালার পায়ে এক সময় সোনার শৃঙ্খল পরাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আজকাল আমরা দেব দেবীর প্রতিমা জর্ম্মান ডাকের সাজে সাজাই, দেবীর পূজায় হোটেলের খানা দিয়া দেবের ভোগ দেই। আর্য্যসঙ্গীত হার্ম্মোনিয়মের সাহায্য ভিন্ন চলে না। তেমনই ঘরের কথাগুলিকে বিদেশী রূপ না দিলে, আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালা ভাষায় তেজ হয় না। তাই আজকাল দেখি বর্ণসঙ্কর ও জারজ কথার ছড়াছড়ি। জিজ্ঞাসা, বাঙ্গলা লিখিয়া যদি তাহার পার্শ্বে ইংরাজী

phraseএ কি sentenceএ তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে হয়, সেটা কি উচিত? বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গালা লিখিয়া বুঝাইতে পারিলাম না, ইহা লজ্জার কথা। যে ইংরেজী ভাবটি (চৌর্য্যবৃত্তিলব্ধ) বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হয়, করুন, কিন্তু এমন কথা প্রয়োগ করিয়া অনুবাদ করিবেন না, যাহার পাশাপাশি ইংরাজী কথাগুলি না বসাইয়া দিলে বোধগম্য হয় না। আজকাল দেখিতে পাই, ইংরাজী এক আধটি কথামাত্র নহে, সমগ্র পদ এবং sentence পর্য্যন্ত না বসাইয়া দিলে অর্থবোধ সঙ্কট। সংস্কৃত যে ভাষার মাতা, তাহার অভাব কি? তবে সংস্কৃত সাহিত্য পড়ি না, জোর করিয়া শব্দ গড়াইতে বসি। ইংরাজী ভাব, সংস্কৃত ধাতু অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করা সহজ নহে, কিন্তু আমরা এ কথাটি যেন ভুলিয়া না যাই যে, শব্দমাত্রেরই জীবনের ইতিহাস আছে। পৃথিবীতে যেমন Geological periods আছে, শব্দেরও সেইরূপ। মানুষের যেমন উন্নতি অবনতি আছে, শব্দেরও সেইরূপ। সুব্যবহারেই শব্দ গৌরবান্বিত, অসাধু প্রয়োগে তাহার অগৌরব। শব্দের প্রাণ পিঞ্জরাবদ্ধ করা কঠিন। সে একের নহে, কোটী প্রাণের ধন, অগণ্য কণ্ঠে উচ্চারিত। তবে যিনি মৃত কথায় জীবন দান করিতে পারেন, কিংবা নূতন কথার সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি সঞ্জীবনী-মন্ত্রজ্ঞ ঋষি পুরুষ, তিনি দেবতুল্য। তবে আমরা নাকি সকলেই গঙ্গা-মৃত্তিকা লইয়া শিব গড়িতে বসিয়াছি, তাহাতেই মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়, কি গড়িয়া ভুলিতে গিয়া কি গড়িয়া বসি! ভাস্কর-হস্তে দেবমূর্ত্তি বিকশিত হয়। হাতুড়ী পেটা কথা সহজে চলে না।

বাঙ্গালা সাহিত্য জটিল হইয়া পড়িতেছে। ইংরাজী না জানিলে অনেক সময় লেখকের মনের ভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরাজী ভাষা জারজ। Froude বলেন,—mongrel। তাহার শব্দার্থে অনেক বৈচিত্র্য আছে। পরের ঘর হইতে মেয়ে আনিয়া নিজের ঘরের করিয়া লইতে সময় লাগে। অনেক সময় একবারেই নিজের ঘরের হয় না। হৃদয়ে অনুরাগ না জন্মাইলে একপ্রাণ হইতে পারে না। ক্ষেত্র-তত্ব না বলিয়া জ্যামিতি বলা, রসায়ন শাস্ত্রকে কিমিতিনির্ণীতি বলাতে পাগলামী আছে। জোর করিয়া Geometry ও Chemistryর জাতিত্ব-স্থাপন করা বিধেয় মনে করি না। কুল ভাঙ্গায় গৌরব নাই। এক সময়

শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায় নিজের নামেও বিদেশীর রূপ দিয়াছিলেন। তাহা মনে করিলে হাসি পায়। হিন্দু দেবীর "কালী" নামের পরিবর্ত্তে collie হুচ কুকুরের নাম আনন্দে বহন করিতে দেখা গিয়াছে। সেইরূপ নিজের দেশের কথাকেও বিলাতী চেহারা দেওয়া হেয় জ্ঞান করি। যাহারা নিজের হাট বাজারে পরের জিনিস লইয়া বেচা কেনা করে, তাহাদের পক্ষে ভাঁড়ানই প্রয়োজন। তবে সাহিত্য, পণ্য জগতের নহে, সাহিত্যের গৌরব যদি রক্ষা করিতে চাও, বিলাতী সজ্জা দূর করিবার চেষ্টা কর। বুঝি, কথার অভাব পড়ে, ভাষাতে নূতন ভাব-বিকাশের সহিত নূতন কথার প্রয়োজন। Franceএর Academy যেমন নূতন কথার উপর, কথার নূতন ব্যবহারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, আমাদিগের পরিষদেরও সেইরূপ কর্ত্তব্য। একবার বসিয়া বাঙ্গালার অভিধান ঝাড়িয়া বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আর সহ্য করিতে পারি না। আধ আধ ভাষা, সে ভাষা অপোগণ্ড শিশুর মুখে ভাল লাগিতে পারে, মানুষের মুখে নহে। আজকাল কবিতাতে এইরূপ কথার ছড়া ছড়ি দেখিতে পাই—মৃণালি, আলো, জোছনা, মিঠি, ইত্যাদি। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। চিরদিন কি আমরা সৌখীন কবিতা লিখিয়া সময় কাটাইব, তরুলতা, জাতিযূথী, সোনার আলো, সাঁজের বেলা, জোছনা-রাতি, সবই অতি সুন্দর; কিন্তু এই সৌন্দর্য্য-উপভোগে ক্লান্তি কি কখনও হয় না? স্বীকার করি, বাঙ্গালী কবি এই সৌখীন কাব্য-জগতে অদ্বিতীয়। বাঙ্গালা ভাষার মত মধুর ভাষা কাব্য-জগতে নাই। বাঙ্গালীর মুক্তার হার গাঁথা সহজ। তবে "জোছনা" দেখিতে দেখিতে মনে হয়—বলি, আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে? রাহুর পায়ে ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, যদি চন্দ্র গ্রাস করিলেন, তবে অত সহজে তাহাকে ছাড়িবেন না। আমরা এই অবসরে গঙ্গা-স্নান করিয়া লই—আঁধারের মাহাত্ম্য একটু বুঝিয়া লই। মনে হয় না কি—মনে হয় না কি, কি কারণে "মহাকাব্য" লিখিতে বসিয়া বাঙ্গালী কবি লিখিতে পারিলেন না? তোড় জোড়ের অভাব হয় নাই, তবে বাঙ্গালী তলওয়ার লইয়া বেতাত হইয়া পড়েন। মাতৃদুগ্ধপিপাসু বালিকার, জননের দুলাল, চুণে আলতা দেওয়া সরস ভাষার পক্ষপাতী। আমাদের দেশেই রাইরাজ। আমাদের কবি শৈশব যৌবনের মিলনের সৌন্দর্য্য বিমুগ্ধ, সন্ধিস্থলে মোহ

মুগ্ধ হইয়া কতদিন যাপন করিবে? তোমাকে মদন-মনোহর বেশ ত্যাগ করিতে বলি না, এই বেশে তুমি অতি সুন্দর, স্বীকার করি; আমার বিশ্বাস যে, তুমি অন্য বেশেও সুন্দর। তোমার মত ধীশক্তি জগতে বিরল; তোমাতে অসাধারণ কল্পনার প্রতিভা আছে; তুমি সরস্বতীর বরপুত্র। তবে রতি-মন্দিরে দিনযাপন করিও না। সহস্রনির্ঝরপ্রসূত মন্দাকিনীবারি-বিধৌত সাহিত্যের প্রাণ মহাসাগরে লীন হইয়া আছে। এই সাগর মন্থন করিবার শক্তি সাধনায় মেলে।

আমি এক স্থানে বলিয়াছি, সত্য-জগতে "অহং"এর স্থান নাই। ইহাতে প্রকৃত আমার যাহা বলিবার ইচ্ছা, তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। সত্য কাহারও বিশেষ সম্পত্তি নহে। এক জনের মনে সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু সত্য আবিষ্কার হইবামাত্র সমগ্র জগতের ধন হইয়া যায়। সত্যে কোনও ব্যক্তি কিংবা কোন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অধিকার নাই। সাহিত্য ও ধর্ম্ম, বহির্জ্জগতের সহিত অন্তর্জ্জগতের যে সম্বন্ধ আছে, ভিন্ন পথে তাহারই আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া থাকে। সেই জন্য কবি ও ঋষি সময়ে একই ছিলেন। Prophet, Poet, Vates and Seer অনেক ভাষাতেই একই নাম। সাহিত্য সেই জন্য "সাধনা"। সত্যের অবতারণাতেই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও সাহিত্যের শক্তি।

জাতীয় জীবনের ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস একই। এই জীবন পরিস্ফুট না হইলে সাহিত্যেও তেজ ও বল দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে বড় বড় লেখক জন্মাইতে পারে, কিন্তু সাহিত্য যথার্থ যাহাকে বলে, তাহার জন্মগ্রহণ হয় না। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ইতিহাসে এই কথার সত্যতা সপ্রমাণ হয়, এবং এই দুই দেশের সাহিত্য দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, জাতীয় ইতিহাস কতটা সাহিত্যের সহায়।

সুকুমার সাহিত্যে বাঙ্গালীর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তবে সুকুমার সাহিত্য, যে "সাধনা"র কথা আমি বলিলাম, তাহার উপযোগী নয়। যেমন চন্দ্রালোক সুন্দর, প্রচণ্ড সূর্য্যালোকও সুন্দর। চন্দ্রালোকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে, কিন্তু জীবনের উল্লাসের জন্য রৌদ্রতেজের প্রয়োজন।

আমি পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি যে, জাতীয় ভাষার সাহায্য ভিন্ন

জাতি কখনও গঠিত হয় না। নিজের হৃদয়ে নিজের দেশের ভাষা ভিন্ন অন্য যে কোনও ভাষারই স্থান সংকীর্ণ। সাহিত্য বিদেশী সাজে সাজাইলে কখনই সুন্দর হইতে পারে না। যেমন ভাষা জারজ হয়, সেইরকম বিভিন্ন ভাব-মিশ্রণে ভাবেও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। Burns, আপনারা সকলেই জানেন, Scotlandএর মহাকবি, তিনি ইংরাজীতেও অল্প স্বল্প কিছু কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার সবগুলিই প্রায় অপাঠ্য। French কবি Musset Italianএ কবিতা লিখিয়াছেন, Heine Frenchএ, সেগুলিও প্রায়ই অপাঠ্য। এ কথাটি বিশেষ করিয়া বলার আমার একটু উদ্দেশ্য আছে। বাঙ্গালায় বিদেশী ভাষার ছাপ আমার কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত মনে হয়। ইংরাজী-নবীশ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে "আমার উপর ডাকিয়াছিলেন", অর্থাৎ, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন (called on me)র অনুবাদ করিয়া বলেন। এ ভাষা কি নিতান্ত ঘৃণাজনক নয়? তাঁহারা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন না বলিয়া, আমাদের ডাকিয়াছেন, বলিতে শুনিয়াছি, অর্থাৎ, (They have asked me), এইরূপ ভাষা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ভাষা ব্যবহার করেন, তাঁহাদেরই বা দোষ দিই কি করিয়া? মাতৃদুগ্ধপালিত শিশু ও Mellin's food প্রভৃতি পাই শিশুতে প্রভেদ আছে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যদি বাঙ্গালা না শিখিয়া অন্য ভাষা শিখিবার জন্য আমরা সকলেই প্রাণপণে প্রয়াসী হই, তাহা হইলে শিখিবার শক্তির কত অপচয় হয়। আমাদের শিক্ষার এইটি মৌলিক দোষ। এই দোষ যতদিন পর্যন্ত রহিবে, ততদিন বাঙ্গালীর জাতীয়তা লাভ করিবার আশা স্বপ্নমাত্র। নিজের দেশের ভাষায় অর্থ যতখানি বোঝায়, পরের ভাষাতে তাহা বুঝাইতে পারে না। বিমাতা মাতা হইয়াও মাতা নহে। সৌভাগ্যের ফলে আমরা এখনও পর্যন্ত বিপিতা প্রাপ্ত হই নাই। তবে কপালে কি আছে, বলিতে পারি না। কথার রূপ আছে। সেই রূপ সম্যক্ উপলব্ধি না হইলে, তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করা কঠিন ও তাহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়াও কঠিন। ইংরাজী শিক্ষার গুণে আমাদের মানসিক অনেক উপকার হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের সাহিত্যও তাহার বলে বলীয়ান হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তবে

ইউরোপীয় সাহিত্য ইহুদীয় আদর্শ ও গ্রীক মনোবিজ্ঞানের আদর্শের উপর সংগঠিত। এই ইহুদীয় প্রভাবটুকু আমরা প্রাচ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সেইখানেই যাহা কিছু সামঞ্জস্য আছে। বাইবেলের ভাষায় ও ভাবে অনেক স্থলে আমাদের আর্য্যঋষিদের ভাষা ও ভাবের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের বৈচিত্র্যের কারণ বহুতর। তাহাদিগের সমাজ একেবারে স্বতন্ত্র। তবে মানুষের হৃদয়-মাত্রই এক, এবং সেই নিমিত্ত গীতিকাব্য প্রায় সব দেশেরই সমান এক জন ফ্রেঞ্চ মহাকবি বলিয়াছেন,—মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া থাকে, কিন্তু অমর জগতের ভাষা একই। এ বিষয় উল্লেখ করিবার এই উদ্দেশ্য যে, এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ এক পক্ষে উন্নতির কারণ হইতে পারে; তেমনই অপর পক্ষে সাহিত্যের প্রাণ যাহা তাহা ক্রমশঃ লোপ পায়, অর্থাৎ জাতীয় বিশেষত্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সেই জন্য আমি সাহিত্যে অনুবাদের বিশেষ পক্ষপাতী নহি। যতদিন হইতে ইংল্যাণ্ডে, Russian কিংবা Danish উপন্যাসের অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে, ততদিন হইতে ইংল্যাণ্ডে কোনও বিশেষ বড় নভেল প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহাদিগের জীবনের বৈচিত্র্য এবং সকলে নিয়ত বিবিধ ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকার দরুণ, আজকাল ইংল্যাণ্ডে চিন্তার সময় কম হইয়া পড়িয়াছে। দেশ বিদেশের কথা এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন সমাজের প্রয়োজনোদ্ভূত নূতন উত্তেজনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ সাদাসিধা কথায় ও দৈনিক সামাজিক চিত্রে মন উত্তেজনা পায় না বলিয়া বাহিরের উত্তেজনার জন্য মন ব্যস্ত হইয়া থাকে। তাহার জন্য আজকালকার ইংরাজী সাহিত্যে ইংরাজ জাতির বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। ফরাসী দেশের সাহিত্যের প্রথম উল্লাসের সময় Lesp Chausons de geste এবং পরে chante fableএর দরুণ অর্থাৎ জাতীয় গীতিকবিতার বলে সাধারণের মধ্যে সাহিত্য প্রচারিত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশের সাহিত্যের প্রথম অবস্থায়ও মাণিকচাঁদের গীত প্রভৃতির ও গম্ভীরা চণ্ডী ইত্যাদির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল কিসের বলে সাহিত্য গড়িয়া তুলিবেন? বাঙ্গালার ইতিহাসের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই ইতিহাসের যদি উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগের সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, আমার বিশ্বাস। সেই জন্য আনন্দ এবং উৎসাহের

সহিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্য এখানে উল্লেখ করিতেছি। যাঁহাদের যত্ন এবং চেষ্টায় এই সমিতি সংগঠিত হইয়াছে ও সংরক্ষিত হইতেছে, তাহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

উপসংহারে বাল্যবন্ধু দ্বিজেন্দ্রলালের কথা দু একটি বলিতে চাই! তাঁহার বিয়োগে আমার মনে অত্যন্তই আঘাত লাগিয়াছে। অনেক বৎসর ধরিয়া আমরা একত্র ছিলাম, চিরকাল তাঁহাকে আমি নিজের ভায়ের মত দেখিয়া আসিয়াছি, এবং তিনিও আমাকে বড় ভায়ের মত শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। অতি বাল্যকালে তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়াছি; তাহাও অদ্য মনে পড়িতেছে। তিনি যদি "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" এই দুইটি গান মাত্র রচনা করিয়া রাখিয়া যাইতেন, তাঁহার কীর্ত্তি চিরদিনের মত অক্ষয় রহিত। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখানে অনেকের স্থান কখনও হইবে না। তাঁহার পাশে বসিবার আমাদের মধ্যে অনেকেই যোগ্য নই। কিন্তু তোমার স্মৃতি চিরদিনই হৃদয়ে আদরের সহিত রক্ষা করিব। এই প্রার্থনা করি, আমাদের ছেলে মেয়েরা, তুমি যে চক্ষে নিজের দেশকে সুন্দর দেখিয়াছিলে, তাহারাও যেন সেইরূপ সুন্দর দেখে, এবং সেই দেশের ছেলে মেয়ে বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। স্বর্গ হইতে তুমিও তাহাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিও।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

দ্বিজেন্দ্র-বিয়োগে।

১

এই ত সংসার! এ যে সত্য, ফাঁকি, আলো, অন্ধকার,
করুণার তালে তালে নৃত্য করে ভাগ্যের ধিক্কার।
ধোঁয়া-ধোঁয়া, আবছায়া, যেন এটা বাষ্পের ভুবন,
মুঠায় কি ধরা পড়ে দেবতার স্বপ্নের লিখন!
কত দেশ, কত জাতি, কত যুগ প্রাণ দিল ঢালি,
কালের গহ্বর তবু চিরদিন খালি—শুধু খালি!
এই ছিল! এই নাই! কোথা গেল?—শূন্যে এ জিজ্ঞাসা,
এ পারের কাণ নাই, ও পারের নাই বুঝি ভাষা!

হে সর্ব্বমঙ্গলা, পদে কাঁদে বিশ্ব—শিশু নিরাশ্রয়,
তুমি তা'রে বর দাও, তুমি তা'রে শুনাও অভয়।

২

বড় ভাগ্যে জন্ম নিলে, এই ভূমে ; এ যে তীর্থ ভাই,
বড় পুণ্যে ধন্য হয়ে, হ'লে তার শ্মশানেই ছাই !
নাই থাক্ মাতা, পিতা, জায়া, —কাছে করিতে রোদন,
তব তরে ঘরে ঘরে কাঁদে আজ অগণ্য স্বজন।
এই ত মায়ের বর, এই ত মায়ের দুর্ব্বা-ধান,
এক জন চলে' গেলে নিখিলের শূন্য হয় প্রাণ।
পুত্র-ঋণ শোধে মাতা, করি আজ অশ্রুর তর্পণ,
হে দ্বিজেন্দ্র, হে কবীন্দ্র, অমরতা রচিল মরণ।

৩

যাও, কবি, স্বপ্ন-লোকে, মনোগামী পুষ্পকের রথে,
সুরবালা সনে বাণী বসিছেন সাজাঞ্জলি পথে :
ওই শোন মেঘে মেঘে দ্রিম্ দ্রিম্ বাজিছে মৃদঙ্গ,
সপ্ত-স্বর-সরোবরে দল্-মল্ ফুটিছে সরোজ।
মত্ত করী সম তুমি পশ গিয়া কমল-কাননে,
মুক্তি-স্নান কর নীরে, জ্ঞানাঞ্জন মাখ দু'নয়নে।
তীরে হ'বে প্রতিভাত, ছিল যাহা ঢাকা অন্ধকারে,
খুঁজেছ যা' আতি-পাতি, এই পার হ'তে 'পর-পারে'।
দেখিবে নিকটে এক রঙ্গ-ভরা মহানাট্য-শালা,
মহাকাল অভিনেতা, বিশ্বেশ্বর রচিছেন পালা।
আবার আসিবে তুমি ;—যুগে যুগে, জন্মে জন্মে যারে
মা বলেছ, সেই কোলে চির-স্নেহে টানিবে তোমারে।
এ যে উৎসর্গের তরে সুধা-কুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন,
অসমাপ্ত আছে যাহা, হ'বে, বন্ধু, হ'বে তা' পূরণ।
হারায় না কিছু বিশ্বে, প্রকৃতির শুদ্ধান-স্বভাব,
দ্বিজেন্দ্র পুরাবে এসে, দ্বিজেন্দ্রের অকাল-অভাব।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির নিবেদন।

মা বাগ্বাদিনী বীণাপাণি! আজ অকৃতী সন্তানের হৃদয়-সরোজে উদিত হও মা। তোমার করুণাকণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তোমারই ভক্ত, তোমারই সেবক, তোমারই বরপুত্রগণের আবাহন করিতে যেন সমর্থ হই। আজ আমি ধন্য, আজ দিনাজপুরবাসিগণ ধন্য, আজ বীণাপাণির বরপুত্রগণের সমাগমে দিনাজপুর সারস্বত-তীর্থ বলিয়া গণ্য। হে সমাগত সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী সজ্জনবৃন্দ! এই গ্রীষ্মের নিদারুণ আতপতাপে সন্তপ্ত, তদুপরি অসাময়িক বর্ষায় উৎপীড়িত ও প্রবাসের নানা অসুবিধা অভাবে ক্লিষ্ট হইয়াও আপনারা যে এখানে পদার্পণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা কৃতার্থ বোধ করিতেছি। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্য-সেবার উপচারে অনভ্যস্ত আমাদের ন্যায় অসাহিত্যিকের নিকট আপনাদের কতই অনাদর, কতই অসুবিধা ও কতই কষ্ট হইতে পারে, আশা করি, আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্যগুণে আমাদের সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। এত অসুবিধা, এত অযোগ্যতার মধ্যেও আমরা আজ আপনাদিগকে কেন আহ্বান করিতে সমর্থ হইয়াছি, কেন আমরা এই দুঃসাহসের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহার কারণ, আমরা জানি, আপনাদের সেবা করিলে—আপনাদের পরিচর্য্যা করিলে বীণাপাণি সরস্বতীরই পূজা করা হয়। যাঁহারা উন্নত-চিন্তায় ও উদার-আকাঙ্ক্ষায় মানস-আকাশে বিশ্বপ্রেম অনুভব করিতে পারেন, কল্পনার রাজ্যে যাঁহারা বাস্তবতা আনিতে উপযুক্ত, জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গমে যাঁহারা দেশভক্তি ও মাতৃভাষার বিকাশ করিতে সমর্থ, সংসারের কল্লোল-কোলাহল-মধ্যে অশান্তিকর বিষয়লিপ্সার পার্শ্ব দিয়াও যাঁহারা ভাবরাজ্যে, জ্ঞানরাজ্যে ও প্রেমরাজ্যে বিচরণ করিতে অধিকারী, গভীর জ্ঞানজ্যোতির মধ্যেও যাঁহাদের হৃদয়-সরসী প্রেমের শান্তিময় কুসুমসৌরভে আমোদিত,—তাঁহারা যে ভগবান্ পঞ্চাননের আশুপ্রসাদের ন্যায় আমাদের পূজার উপযুক্ত সম্ভার না থাকিলেও সামান্য বিল্বদলে প্রীত ও তুষ্ট হইবেন, এই বিশ্বাসে আজ দিনাজপুরবাসী তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অতিথি নারায়ণ। বিদুরের খুদেও নারায়ণ সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা আমরা ভক্তির সহিত ও আনন্দের সহিত বলিতে পারি।

আপনাদের শুভাগমনে আমাদের কতই স্মৃতি, কতই অতীত কীর্ত্তি,

কতই আর্য্যগীতি স্মরণ হইতেছে। করতোয়া ও মহানন্দের মধ্যবর্ত্তী এই দিনাজপুর-ভূভাগ একদিন আর্য্য ও প্রাচ্যের মিলন-রঙ্গস্থলী বলিয়া ধন্য হইয়াছিল। এখানকার সদানীরা যদিও এখন বর্ষা ব্যতীত স্রোতস্বতী বলিয়া গণ্য নহে। কিন্তু স্মরণাতীত বৈদিক যুগে ইহাই নিত্যজলসিক্তা পবিত্রসলিলা 'সদানীরা' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ইহারই তীরে প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্য আর্য্য-সমাজের প্রথম মিলন হইয়াছিল। প্রাচীন কালে এই স্থানই জ্যোতিষিক ও কোটিবর্ষ বলিয়া পরিচিত ছিল। এই স্থানেই পৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দে জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোটিবর্ষীয় নামক শাখার উদ্ভব হইয়াছিল। এই কোটি-বর্ষই বাণরাজাদিগের এক সময়ের লীলাস্থলী ছিল। বাণরাজবংশের যত্নে এখানকার শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহাদের যত্নে এখানে নানা স্থানে কতই দেব-কীর্ত্তি —কতই দেবসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহাদের সেই কীর্ত্তিসৌধ কালের করালকবলে নিপতিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সেই বিরাট ধ্বংসের মধ্যে অতীত শিল্পের যে উজ্জ্বল নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা সভ্যজগতের নিকট গৌড়-শিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। সেই বাণবংশের ও গৌড়ের পালবংশের বহুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এই দিনাজপুর জেলার নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই বিরাট্ ধ্বংসাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুরাতত্ত্ব-উদ্ধারের এতদিন উপযুক্ত আয়োজন হয় নাই। সম্প্রতি "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" সেই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কেবল গৌড়-বঙ্গ-বাসী বলিয়া নহে, প্রত্নতাত্ত্বিক ও সমস্ত শিল্পকলাবিদের ধন্যবাদের পাত্র ও আমাদের পরম কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এখানে যেমন অতিপূর্ব্বকালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন হইয়াছে, সেইরূপ এখানে তৎপরবর্ত্তী কালেও ভারতের বাহিরে পূর্ব্ব-উপদ্বীপের প্রান্তে সুদূর চীনসমুদ্রতটবর্ত্তী অধুনা কাম্বোডিয়া নামে পরিচিত সুপ্রাচীন কম্বোজের রাজবংশেরও সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। অদ্যাপি দিনাজপুর-রাজবাটিতে রক্ষিত সেই কাম্বোজান্বয়ের শিলালেখ হইতে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাইতেছি। চীন-সমুদ্রকূলবর্ত্তী কম্বোজ হইতে বর্ম্মনৃপতিগণের শত শত শৈবকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই শৈব-রাজ-বংশেরই সম্ভবতঃ কেহ কেহ এই দিনাজপুর অঞ্চলে আসিয়া শিবমন্দির-প্রতিষ্ঠার সহিত কাম্বোজীয় শৈবকীর্ত্তি-স্থাপনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই কাম্বোজবংশই পরবর্ত্তী জনপ্রবাদে পরম শৈব বাণরাজবংশ বলিয়া গণ্য

হইয়াছে কি না, তাহা ঐতিহাসিক ও পুরাবিদ্‌গণের বিশেষ ভাবে চিন্তনীয় সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই আধিপত্যকালে ভারত-বহির্ভূত প্রাচ্যভূভাগের বহুজাতি এই জেলায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। এখনও তাহারা এই জেলার নানা স্থানে বাস করিতেছে। এই সকল জাতির প্রকৃত তত্ত্বোদ্ধারও আপনাদের একটি কর্ত্তব্য। উক্ত কাম্বোজবংশের সমকালে বৌদ্ধপালরাজবংশেরও এখানে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহাদের কীর্ত্তির নিদর্শন এই জেলার নানা স্থানে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানকার বুদালস্তম্ভে উৎকীর্ণ দর্ভপাণির প্রশস্তি ও বিশাল মহীপাল দীঘী, আমাদিগকে পালবংশের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এক সময়ে এখানে সর্ব্বত্রই মহীপালের গান গীত হইত। চেষ্টা করিলে এখনও সেই অতীত বৌদ্ধগাথা বাহির হইতে পারে। এখানকার দেবকোটেই প্রথম মুসলমানরাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং সেই সময় হইতে এখানকার অতীত কীর্ত্তি ধ্বংসমুখে পতিত হইতে থাকে। বৌদ্ধ, জৈন ও শৈব প্রভাবের ন্যায় এখানেও মহাতান্ত্রিক শাক্তসম্প্রদায়ের প্রতিপত্তিও প্রসারিত হইয়াছিল। এই জেলার প্রায় প্রতি গ্রামেই শাক্ত-প্রভাবের নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। আপনারা গোপীচাঁদের গানে হাড়িপা বা হাড়িসিদ্ধার নাম শুনিয়াছেন; এখনও এই দিনাজপুরের নানা স্থানে মহাশাক্ত হাড়িগণের সন্ধান পাইতেছি, তাহারাই স্বয়ং মহাকালীর পূজা করিয়া থাকে, স্বহস্তে বলি দিয়া থাকে; এমন কি, কোনও কোনও গ্রামে তাহারা অগ্রে পূজা না করিলে অপর কেহ শক্তিপূজা করিতে পারে না। এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রভাবের ও অপূর্ব্ব শাক্তপ্রভাবের ইতিহাস অবশ্যই আপনাদের অনুসন্ধেয়। মুসলমান প্রভাবের সঙ্গে এখানে বহু মুসলমান সাধু আগমন করেন, এবং তাঁহাদের পদার্পণে এই জেলার নানা স্থানে দরগা, মসজিদ ও তক্ত নির্ম্মিত হইয়াছে, এখনও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যেখানে মুসলমান পীরের আস্তানা, তাহারই নিকট প্রায় সুপ্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে একটি প্রসিদ্ধ আস্তানার সংবাদ দিতেছি;—পাঁচবিবি থানার উত্তরপূর্ব্বে পাহাড়পুর হইতে প্রায় ৫।০ ক্রোশ উত্তরে তুলসীগঙ্গার ধারে নিমাই সা নামক এক পীরের আস্তানা, এবং তাহারই নিকট বৃহৎ বৌদ্ধস্তূপ রহিয়াছে। উক্ত বৌদ্ধস্তূপের অর্দ্ধক্রোশ দূরে বৌদ্ধরাজ মহীপালের স্থাপিত মহীপুর গ্রাম। উক্ত পাহাড়পুরেও বৌদ্ধস্তূপ

আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড়পুরের ২॥০ ক্রোশ পশ্চিমে যোগিগুহা নামে একটি বিখ্যাত স্থান রহিয়াছে। ইহার চারি দিকেই বিস্তর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে, ঐ স্থানে দেবপাল, দেবপালের মাতা ভীমাদেবী এবং চন্দ্রপাল, মহীপাল প্রভৃতির প্রাসাদ ছিল। এই স্থানের তিন ক্রোশ দূরে বুদলস্তম্ভে নারায়ণপালের সময়কার শিলালিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। পালরাজ দেবপালের নাম হইতেই দেবকোট নাম হইয়াছে কি না, তাহাও আপনারা অনুসন্ধান করিতে পারেন। এইরূপে এই জেলার নানা স্থানে বিভিন্নধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন সময়ের বহু কীর্ত্তিনিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেই সমস্ত উল্লেখ করিয়া আপনাদের মহামূল্য সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না।

দিনাজপুরের রাজা গণেশের নাম আপনারা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে দিনাজপুর হইতেই রাজা গণেশের অভ্যুদয়। তিনি আমাদের উত্তরবাঢ়ীয় কুলকারিকায় দত্তবংশীয় বলিয়া পরিচিত আছেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে তিনি "দত্তখান" বলিয়া পরিচিত। সেই মহাত্মা মুসলমানপ্রভাব খর্ব্ব করিয়া সমস্ত গৌড়মণ্ডলে কেবল যে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার যত্নে গৌড়ীয় হিন্দু-সমাজে বহু সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। শিল্প ও সাহিত্য উভয়েরই তিনি উৎসাহ-দাতা ছিলেন। বঙ্গের বাল্মীকি কৃত্তিবাস তাঁহারই নিকট পুষ্প পাইয়া, আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সুতরাং আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, এই দিনাজপুরের সহিত সমস্ত বঙ্গের ইতিহাসের এবং সমস্ত বাঙ্গালী জাতির বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই অতীতের মহাশ্মশানে আপনাদের দেখিবার, ভাবিবার ও আলোচনা করিবার অনেক জিনিস আছে বুঝিয়াই আপনাদিগকে আহ্বান করিতে আমরা সাহসী হইয়াছি।

আমি ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক নহি, অথবা সাহিত্যিকগণের মধ্যেও এক জন সামান্য সেবক বলিয়া গণ্য হইবার অধিকার রাখি না। আপনাদের সমাগমে উৎসাহিত হইয়া যাহা যতদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এবং আপনাদের আলোচনার ফলে যে সকল চিন্তা আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে, কর্ত্তব্যবোধে সেই সকল কথাই আপনাদের নিকট আবেদন করিলাম। আশা করি, আমার এই ধৃষ্টতা

আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। যে জিনিসটি যাহার ভাল লাগে, সে সেই জিনিসটি তাহার পরমাত্মীয়ের নিকট উপস্থিত করিতে চায়, তাই আজ কর্ত্তব্যবোধে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। ইহাতে যদি কিছু আমার ধৃষ্টতা হইয়া থাকে, আপনারা দোষ বর্জ্জন করিয়া গুণটুকু গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

আজ অভ্যর্থনা-সমিতি আপনাদের নিকট আমার মনের কথা প্রকাশ করিবার অবসর দিয়া বাস্তবিক আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, সকল স্থানের বঙ্গজননীর কৃতী সন্তানগণ আজ উত্তরবঙ্গের এই সাহিত্য-সম্মিলনে সম্মিলিত হইয়া আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করায় আমরা কৃতার্থ বোধ করিতেছি। এই শুভ-সম্মিলনে সাহিত্যিকগণের মিলন-বন্ধন দৃঢ় হউক, আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হউক, উত্তরবঙ্গের গৌরববৃদ্ধি হউক, বঙ্গবাণীর কল্যাণে আমাদের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হউক, ইহাই পরমমঙ্গলময় ভগবানের নিকট ও আপনাদের নিকট একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীগিরিজানাথ রায়

দাদা।

পল্লীগ্রাম। আষাঢ়ের সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আকাশমণ্ডল ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন; সমস্ত দিন সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই, কেবল সূর্য্যাস্তকালে পশ্চিমগগন-বিলম্বী ধূসর মেঘস্তর লোহিতাভ হইয়া চরাচরে দিবাবসানবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছিল। কিন্তু আচম্বিতে একখানি কালো মেঘ উদ্দাম-ঝটিকা-প্রবাহে কোথা হইতে ভাসিয়া আসিয়া, বিদ্যুদ্বহ্নিবিকাশ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, নদীতীরবর্ত্তী দীঘনীর ঝাউর শাখাগুলি সোঁ সোঁ শব্দ করিতে লাগিল। তাহার পর ঝম ঝম্ শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে বৃষ্টির বিরাম নাই। গৃহস্থের খড়ের চালে, গৃহপ্রান্তস্থিত কলাগাছে, বাঁশ-ঝাড়ের ঘন বাঁশের পাতায় ও তাহার পাশে শশার চালে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। ক্ষুদ্র মাঠির পরের গ্রাম্য পথ কদমে পূর্ণ, পথের ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবা, তাহা বৃষ্টির জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, এবং ভেকের দল সকল যোটা নানা সুরে মহানন্দে

বর্ষার বন্দনাগান আরম্ভ করিয়াছে। পথে লোক চলিতেছে না, সকলে স্ব স্ব গৃহে আশ্রয় লইয়াছে; কেহ মৃৎপ্রদীপের অদূরে বসিয়া 'ঢেরা'য় পাট কাটিতেছে; কেহ পুঁথি পড়িতেছে; কেহ বালি দিয়া 'হেঁসো'য় সান দিতেছে; কোনও নিষ্কর্ম্মা বসিয়া বসিয়া ভাবা হুঁকায় তামাক টানিতেছে। শিশু মায়ের কোলে শুইয়া নিমীলিতনেত্রে স্তন্যপান করিতেছে। ছেলে মেয়েরা ঘরের মেঝেতে সারি দিয়া বসিয়া 'আগাডুম্ বাগাডুম্ ঘোড়াডুম্ সাজে'— কোমল স্বরে ছড়া আবৃত্তি করিতেছে; দোকানে দোকানী ঝাঁপ বাঁধিয়া একাগ্রমনে জমা খরচ লিখিতেছে। বহিঃপ্রকৃতির এই বর্ষাসুলভ দুর্য্যোগে তাহার লক্ষ্য নাই, যেন তাহার খরিদ বিক্রয়ের হিসাবটাই পৃথিবীতে একমাত্র সত্য—আর সকলই মিথ্যা, মায়াময়!

মাণিকনগরের একখানি ক্ষুদ্র গৃহস্থ-গৃহের অভ্যন্তরে সে সময় বহিঃপ্রকৃতির এই দুর্য্যোগের ও অন্ধকারের ছায়া পড়িয়াছিল। এই গৃহে বৃদ্ধ নীলমাধব মুখোপাধ্যায় মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া অন্তিমের সম্বল জননী ব্রহ্মময়ীর চরণযুগল চিন্তা করিতেছিলেন, এবং দুশ্ছেদ্য মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া কোটরগত মুদ্রিত নেত্র হইতে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। পুত্র লালমাধব তাঁহার শিয়রে উপবেশন করিয়া পিতার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতেছিলেন, আর একাগ্র মনে প্রার্থনা করিতেছিলেন, মা মঙ্গলচণ্ডী! এ যাত্রা বাবাকে বাঁচাও। বাবার অভাবে আমি কি করিয়া এ সংসার চালাইব?"

কিন্তু লালমাধবের চিন্তাস্রোত সহসা অবরুদ্ধ হইল। বৃদ্ধ নীলমাধব চক্ষু খুলিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "বাবা লালু, আমার আর অধিক বিলম্ব নাই,—জীবনটা বৃথা কাজে কাটাইয়াছি, তোমাদের জন্য কোনও সম্বল রাখিয়া যাইতে পারিলাম না, পথের সম্বলও কিছু নাই। জানি না, ব্রহ্মময়ী চরণে স্থান দিবেন কি না, কিন্তু এ সময়েও তোমাদের কথা ভাবিয়া বড় কাতর হইয়াছি। নবীনের মা নাই, তাহাকে তোমার ও বৌমার হাতে ত সঁপিয়া দিলাম, ছোঁড়াটা যাহাতে মানুষ হইতে পারে—সে চেষ্টা করিও।—দুধের ছেলে নবীন, আমার কাছেই তাহার যত আবদার। দেখো, সে যেন কখনও মনে ব্যথা না পায়। একবার তাকে ডাক, আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন করছে।"

পিতৃভক্ত লালমাধব অশ্রুপূর্ণনেত্রে পিতার আদেশ পালন করিতে

চলিলেন। তখন নবীনমাধব রান্নাঘরে একখানি কাঁথায় শুইয়া ঘুমাইতেছিল, আর লালমাধবের স্ত্রী গিরিবালা উনানে পাচন সিদ্ধ করিতেছিলেন।

লালমাধব ব্যগ্রভাবে রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আর পাচন তৈয়ারী করে কি করবে? বাবা কেমন যেন করচেন। সন্ধ্যা থেকে তিনবার ডেকে ত কবিরাজ মশায়কে আনতে পারলাম না!—এই দুর্যোগের রাত্রি, কি যে হবে, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিনে। নবনে, নবনে, ওঠ, জন্মের মত বাবাকে দেখে নিবি আয়।"

নবীন উঠিয়া বসিল। আট বৎসরের বালক, মৃত্যুসম্বন্ধে তাহার কোনও ধারণা নাই। সমস্ত দিন পিতার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া থাকিয়া সন্ধ্যার পর সে বৌদিদির কাছে আসিয়া শ্রান্তিভরে সেখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

লালমাধব সুপ্তোত্থিত নবীনকে কোলে লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। গিরিবালাও ব্যস্তভাবে শ্বশুরকে দেখিতে আসিলেন। তখন বৃদ্ধের নাভিশ্বাস উপস্থিত। লালমাধব নবীনকে পিতার কোলের কাছে বসাইয়া তাঁহার মস্তক কোলে তুলিয়া লইলেন, কাতরস্বরে বলিলেন, "বাবা, নবীনকে এনেছি। তাকে কি বলচেন, বলুন।" নীলমাধব বলিলেন, "মায়ের নাম শুনাও বাবা, আমার ছুটী।" লালমাধব পিতার কর্ণমূলে তারকব্রহ্ম নাম শুনাইতে লাগিলেন। নীলমাধবের প্রাণ অনিত্য দেহ ত্যাগ করিল। লালমাধব শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। গিরিবালা শ্বশুরের পদ-দ্বয়ে মস্তক রক্ষা করিয়া অশ্রুধারায় তাহা সিক্ত করিতে লাগিলেন। নবীন-মাধব উচ্চৈঃস্বরে পিতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া "বাবা গো! বাবা!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাহিরে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিল।

১

লালমাধব কথকতা করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ভাল কথক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল, কথকতার জন্য অনেক বড়লোকের বাড়ী তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। কোনও কোনও স্থলে তিন মাস পর্য্যন্ত "কথা" চলিত, তাহাতে তিনি যে সিধা ও দক্ষিণা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার সংবৎসর সংসার চলিত। কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ন্যায় তিনিও অমিতব্যয়ী ও পরদুঃখকাতর ছিলেন; এ জন্য তিনি কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। বার্দ্ধক্যে শরীর অপটু হওয়ায় তিনি কথকতা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পৈত্রিক কিছু ব্রহ্মোত্তর জমী ছিল, তাহা হইতেই

কোনও রকমে সংসার চলিত। গৃহবিগ্রহের সেবার ত্রুটী হইত না; অতিথিরাও তাঁহার দ্বার হইতে ফিরিত না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুখদুঃখের সঙ্গিনী প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যু হওয়ায় কথক মহাশয় হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছিলেন, সে ব্যথা তিনি সামলাইতে পারেন নাই; তিনি হরিনাম করিতেন, আর পত্নীবিরহে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিত। মহাপ্রস্থানের জন্ত তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, কিন্তু নবীন-মাধবকে 'মানুষ' করিয়া তুলিবার পূর্ব্বে তাঁহার ইহলোক-ত্যাগে মন করিতেছিল না। যম মানুষের সুবিধা অসুবিধা দেখে না, হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে তাঁহাকে সংসার-পারাবারের পরপ্রান্তে এক অজ্ঞাত রাজ্যে লইয়া গেল।

কাহারও অভাবে সংসার অচল থাকে না। পিতার অভাবেও লাল-মাধবের সংসার চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে সুখে ও নিরুদ্বেগে সংসার চলিত; এখন দুঃখে ও নানা দুশ্চিন্তায় সংসার চলিতে লাগিল! শাশুড়ী গিরিবালাকে পাকা গৃহিণী করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। সংসারের অভাব ও দারিদ্র্যের অশান্তি গিরিবালা প্রাণপণে গোপন করিতেন, স্বামীকে তাহা জানিতে দিতেন না বস্তুতঃ পিতার মৃত্যুর পর গিরিবালাই লালমাধবের অভিভাবিকা হইলেন। গিরিবালা এ কালের শিক্ষিতা বধূ হইলে লালমাধবকে পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসার ছাড়িয়া পলাইতে হইত।

গিরিবালার প্রধান কার্য্য ছিল, দেবর নবীনমাধবের লালনপালন। নবীনমাধবের বয়স যখন তিন বৎসর, সেই সময় তাহার মাতার মৃত্যু হয়।—সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। সেই সময় হইতে গিরিবালা নবীনকে পুত্রাধিক স্নেহে যত্নে লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। নবীন এখন গিরিবালাকেই মা বলিয়া জানে। গিরিবালার সন্তান ছিল না, নবীনই তাঁহার সকল স্নেহ অধিকার করিয়াছিল।—পিতার নিকট তাড়া খাইয়া সে বৌদিদির কোলে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিত।

লালমাধব পল্লীগ্রামের গৃহস্থ, তাঁহার অভাব সামান্ত ছিল। কারণ, বিলাসিতার সহিত কখনও তাঁহার পরিচয় হয় নাই। বাড়ীতে যে দুই তিনটি পয়স্বিনী গাভী ছিল, তাহারা মাঠে চরিয়া আসিয়া যথেষ্ট দুধ দিত; সুতরাং গয়লার জল তাঁহাকে দুধ বলিয়া কিনিতে হইত না।

বাড়ীর আঙ্গিনায় কয়েক কাঠা জমীতে একটি বাগান ছিল, তাহাতে নিত্য ব্যবহার্য্য তরিতরকারী ও কলা, পেঁপে, আতা, ডালিম প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হইত। মাঠে ধানের জমীতে যে ধান হইত, তাহাতে সংসারের খরচ চলিত; তবে কয়েক বৎসর অজন্মা হওয়ায় লালমাধব কিছু কষ্টে পড়িয়াছিলেন। তথাপি তিনি দুঃস্থ গ্রামবাসিগণের দুঃখ দেখিলে সাধ্যানুসারে তাহাদের সাহায্য করিতেন। দরিদ্র পল্লীরমণীগণ গিরিবালাকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা মনে করিত।

সাংসারিক অস্বচ্ছলতা নিবন্ধন লালমাধব দাস দাসী রাখিতে পারিতেন না। এ জন্য গিরিবালাকে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে হইত; লালমাধব ইহাতে বড় কষ্ট বোধ করিতেন, একদিন তিনি গিরিবালাকে বলিলেন, "তোমার কষ্ট আর দেখিতে পারি না। এত পরিশ্রম কি সহ্য হয়? সস্তায় একটা ঝি পাইলে রাখিতাম, কিন্তু যে কঠিন কাল পড়িয়াছে, মাসে পাঁচ টাকা খরচ না করিলে আর একটা চাকরাণী রাখা যায় না।"

গিরিবালা সলজ্জভাবে বলিল, "চাকরাণীতে আমার দরকার কি? গোবিন্দ করুন, খাটিতে খাটিতে তোমার পায়ে মাথা রাখিয়াই যেন চক্ষু বুজিতে পারি। দুঃখকে দুঃখ মনে করিলেই দুঃখ।"

লালমাধব বলিলেন, "নবনে যদি কখনও মানুষ হতে পারে, তা' হলেই আমাদের দুঃখ ঘুচবে।"

গিরিবালা বলিল, "আমরা খেয়ে না খেয়ে ওকে মানুষ করে তুলতে পারি ত ঠাকুর স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন।—ঠাকুরপো মনে করে,—আমিই ওর মা, মায়ের কথা ওর মনে নেই। আহা, একশ' বছরের হয়ে বেঁচে থাক, ওর যেমন পড়া শুনায় ঝোঁক, তাতে বাপ দাদার নাম রাখবে।"

কয়েক বৎসর পরে নবীনমাধব গ্রামের এণ্ট্রেন্স স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিল। কয়েক মাসের বেতন ও পরীক্ষার ফি দাখিল করিতে লালমাধবকে দশ দিক অন্ধকার দেখিতে হইল, অবশেষে তিনি দুই বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী বিক্রয় করিয়া এই দায় হইতে উদ্ধারলাভ করিলেন।—সেবার শীতকালে আর তাঁহার চালে খড় উঠিল না, বর্ষাকালে জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; 'চালি'র উপর লেপ, কাঁথা,

বালিশ ছিল, আষাঢ়ের অবিশ্রান্ত বর্ষণে তাহা ভিজিয়া গেল। লাল-মাধব দুঃখিতভাবে স্ত্রীকে বলিলেন, "শীত কালে ঘর ছাইতে পারিনি, জানি, এবার বর্ষায় ভিজতে হবে। আমার 'নুন আন্‌তে পান্‌তো ফুরোয়, পান্‌তো আন্‌তে নুন,'—কি দিয়ে কি করি, ভেবে পাইনে! টাকায় বিশ আঁটি খড়, বারো আনা কেশে, আর শিকি উলু। উইয়ের দৌরাত্ম্যে বছর অন্তর চালে খড় না দিলেও চলে না। নবনের পরীক্ষার খরচ যোগাইতেই এবার সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। পাশটা যদি করতে পারে, তবে অর্থব্যয় সার্থক হয়।"

গিরিবালা বলিল, 'কষ্টেস্রেষ্টে ও ঠাকুরপোকে মানুষ করে তোল, এমন দিন থাক্‌বে না। ঠাকুরপো ও পয়সা আন্‌তে পারলে একটা ছোটখাট পাকা কুঠুরী করে, যে 'আগুণ পাণি'র ভয়!"

লালমাধব হাসিয়া বলিলেন, "কাঙ্গালের কর্কট রাশ! আমি আবার পাকা ইমারত করবো! তুমিও যেমন!"—তাঁহার হাসি নৈরাশ্য-মিশ্রিত।

৩

নবীনমাধব সে বৎসর এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পনের টাকা বৃত্তি লাভ করিল।—এ দিকে গিরিবালার ত্রিশ বৎসর বয়সে একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।—গ্রামের লোকেরা বলিতে লাগিল, "এতদিনে লালমাধব মুখুয্যের 'অদেষ্ট' ফিরেছে।" ছত্রিশ বৎসর বয়সে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া লালমাধব স্বর্গ হাতে পাইলেন, পুত্রের নাম রাখিলেন,—ইন্দুমাধব।

নবীনমাধব তাহার বাসগ্রামের আঠার ক্রোশ দূরবর্ত্তী বহরমপুর কলেজে এল্‌ এ পড়িতে গেল। নবীন দাদাকে পাঠ্যপুস্তকের ফর্দ্দ পাঠাইল। পুস্তকের দাম দেখিয়াই লালমাধব মাথায় হাত দিয়া বসিলেন! তাঁহার দুশ্চিন্তার কারণ শুনিয়া গিরিবালা বলিল, "টাকার জন্য তুমি ভেবো না, আমি একটা উপায় করিব।"—সে তাহার পিতৃদত্ত পাঁচ ভরির সোনার বালা দত্ত-বাড়ীতে বন্ধক দিয়া সত্তর টাকা আনিয়া স্বামীর হস্তে দিল।—লালমাধব বিপদ-সমুদ্রে কূল পাইলেন; গিরি-বালাকে বলিলেন, "আমি গরীব বটে, কিন্তু হতভাগা নই; তোমার মত যার স্ত্রী সংসারে, তার দুঃখ কি? কেবল আক্ষেপ এই যে, তোমাকে

ত কখনও ছু তোলা সোনা রূপা দিতে পারিলাম না,' উপরন্তু তোমার বাবা তোমাকে যে ছু ভরি দিয়েছিলেন, তাও তোমাকে খোয়াতে হচ্ছে।"

গিরিবালা হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরপোর বিদ্যা হোক; আমি না হয় হাতে লাল সুতো জড়িয়ে 'এয়োতি' রক্ষা করবো।"

লালমাধব আহ্লাদে গদগদ হইয়া পত্নীকে আলিঙ্গন-দানে উদ্যত হইলেন! গিরিবালা লজ্জায় অভিভূত হইয়া দুই হাত সরিয়া গিয়া বলিল, "ও আবার কি রঙ!—আমি কচি খুকী কি না, তাই আদর করতে এলে।

নবীনমাধবের ঐ পনের টাকা বৃত্তিমাত্র সম্বল, সে তাহার অবস্থার কথা জানাইয়া রাজবাড়ীতে কিছু মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু সে পল্লীগ্রামবাসী দরিদ্রের পুত্র, কোনও হাকিম বা ক্ষমতাশালী পদস্থ ব্যক্তির নিকট সুপারিস চিঠি সংগ্রহ করিতে পারিল না, কাজেই তাহার প্রার্থনা নামঞ্জুর হইল সাধকশ্রেষ্ঠ পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "যাহার চাপরাস নাই, তাহার কথা কেহ শোনে না।"—যে চাপরাসে রাজ মহারাজার মন আকৃষ্ট হয়, এবং লোহার সিন্দুক খুলিয়া যায়, বালক নবীন সে চাপরাস কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে?—তাহার দুঃখ ঘুচিল না, সে একটি 'টিউসনী' জুটাইয়া ভরণপোষণ ও পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। কিন্তু এল্. এ পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে, পাঠের ক্ষতি হয় দেখিয়া সে 'টিউসনী' ছাড়িয়া দিয়া তাহার অর্থাভাবের কথা দাদাকে জানাইল। লালমাধব আবার পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন, গিরিবালা তাহার শেষ সম্বল সোনার তাগা জোড়াটা বিক্রয় করিয়া দেবরের এল্ এ পরীক্ষার খরচ চালাইলেন।

এইবার যখন নবীনমাধব কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়া বহরমপুর কলেজ হইতে এল্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তখন অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত চট্টোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। নানা স্থান হইতে ঘটকের দল আসিয়া লালমাধবকে বিব্রত করিয়া তুলিল। যাহারা তাঁহাকে একটি রাজকন্যা ও অর্দ্ধরাজ্য প্রদানের লোভ দেখাইল, তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন, তিনি দরিদ্র বটে, কিন্তু ভ্রাতার বিবাহ দিয়া একটা বড় রকম দাঁও মরিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই, মেয়েটি

সুন্দরী হয়, বংশ ভাল হয়, এবং কন্যার পিতা নবীনের উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভারবহনে সম্মত হন, তাহাহইলেই তিনি যথেষ্ট মনে করিবেন।

লালমাধবকে এত অল্পে রাজী হইতে দেখিয়া গ্রামের বুদ্ধিমানেরা তাঁহার বুদ্ধির নিন্দা করিতে লাগিল। প্রতিবেশী চাটুয্যে মহাশয় তিনটি ছেলেকে বিবাহের বাজারে নিলামে বিক্রয় করিয়া হাজার দশেক টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন. তিনি একদিন লালমাধবকে ডাকিয়া মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন, বলিলেন, "বাবাজী, আজকাল যেমন কাল পড়িয়াছে, সেই ভাবেই চলা উচিত. রাঢ়ী ব্রাহ্মণের ঘরের এল্ এ. পাশ ছেলে, মাসে বিশ টাকা জলপানি পাইতেছে. একটু যদি 'আঁট' ধর, তা হলে উহার বিবাহ দিয়া অনায়াসে পাঁচটি হাজার টাকা ঘরে তুলিতে পার। তা না করিয়া তুমি এমন সুপাত্রকে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিতে চাও? পরিবারের গহনা বিক্রয় করিয়া, জোত জমা বন্ধক রাখিয়া ভাইটিকে মানুষ করিলে, তাহাতে তোমার লাভ কি? এমন বোকামী করিও না; একটু বুঝিয়া চল।"

লালমাধব বলিলেন, "খুড়ো মশায়, আপনি একজন প্রবীণ ব্যক্তি, আপনি এমন আদেশ করিবেন না। আমি ত পাঁঠা বিক্রয় করিতে বসি নাই; গরীব মানুষ আমি, আমার কি এত লোভ শোভা পায়? যাহার সহিত কুটুম্বিতা করিব তাঁহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া কিছু আদায় করিলেই কি আমি বড়মানুষ হইব? বাবা আজ বাঁচিয়া থাকিলে আপনার কথা শুনিয়া কানে হাত দিতেন। আমার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয় বলিয়াই ভায়ার বিবাহ দিয়া তাহার লেখাপড়ার খরচটা লইতে চাহিয়াছি; এই হীনতা-স্বীকারের জন্য আমার মনে যে কষ্ট হইতেছে, তা অন্তর্যামীই জানেন; ইহার উপর আবার টাকার চাপ দিব? তা আমি পারিব না। আমার যদি দুই একটি মেয়ে থাকিত, আর বেয়াই মশায় যদি লম্বা ফর্দ্দ বাহির করিতেন, তাহা হইলে আমার কি গতি হইত?"

খুড়ো চাটুয্যে মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তাহাদের বিবাহের খরচও নবীনের শ্বশুরের ঘাড়ে চাপাইতে। তুমি আমার নিতান্ত আপনার জন, তাই তোমাকে সৎপরামর্শ দিলাম, তা না শোনো, শেষে পস্তাইবে।"

লালমাধব চাটুয্যে মশায়ের পরামর্শ কানে না তুলিয়া সবজজ

কৈলাস বাবুর কন্যা সুকুমারীর সহিত ভ্রাতার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কৈলাসবাবু লালমাধবের সাংসারিক অবস্থার কথা জানিতেন; কিন্তু নবীনমাধবের মত ছেলে সচরাচর মেলে না। তিনি নবীনকে এম্ এ. পর্য্যন্ত নিজের খরচে পড়াইতে রাজী হইলেন। মেয়েটিও পরমা সুন্দরী। লালমাধব দেনা পাওনা সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলেন না। কৈলাসবাবু মনে করিলেন, "আমি উহার ঘরে মেয়ে দিতেছি, ইহাই উহার বাপের ভাগ্য, আবার টাকার দাবী করিবে? মেয়েটিকে খুব সস্তায় পার করিলাম।" মাঘ মাসের শেষে কৈলাসবাবুর কলিকাতাস্থ ভবনে সুকুমারীর সহিত নবীনের বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল।

বিবাহের পর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে সঙ্গে লইয়া লালমাধব মাণিক-নগরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। জজবাবুর আদুরিণী সুন্দরী কন্যা গরীবের ঘরে পড়িয়াছে, গ্রামের রমণীসমাজ সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌ দেখিতে আসিল। সুকুমারীর যেমন রূপ, তেমনই গা-ভরা গহনা। পল্লীরমণীগণের মুখে প্রশংসার বান ডাকিল।

আজ গিরিবালার আনন্দের সীমা নাই। সে নববধূকে কোথায় রাখিবে, কি খাওয়াইবে, কেমন করিয়া আদর যত্ন করিবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।—নববধূকে বরণ করিয়া লইবার সময় তাহার মনে পড়িল, তাহার শাশুড়ী অকালে সংসার ত্যাগ করিলে সে প্রাণপণ যত্নে শিশু দেবরটিকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল; নিজের মুখের গ্রাস তাহার মুখে তুলিয়া দিয়াছে; নিজে ছিন্ন বস্ত্রে থাকিয়া তাহার বস্ত্র যোগাইয়াছে, দেবরের রোগের সময় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছে, পিতৃদত্ত অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া তাহার শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছে, তাহাকে কোনও দিন মায়ের অভাব জানিতে দেয় নাই।—সেই দেবর আজ বিদ্বান হইয়া বংশ উজ্জ্বল করিয়াছে! মস্ত হাকিমের মেয়ে সে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে। ভগবান তাহাদের ভাগ্যে এত সুখ লিখিয়াছিলেন! হায়, আজ যদি শ্বশুর শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিতেন!—তাঁহারা এই সুখ ভোগ করিতে পাইলেন না, ভাবিয়া গিরিবালার চক্ষু হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

নববধূর সঙ্গে ঝি, চাকর, দ্বারবান আসিয়াছিল; গরীব লালমাধব

তাহাদিগকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি তাহাদের সহিত এমন ব্যবহার করিতে লাগিলেন, যেন গুরুঠাকুর শিষ্য-বাড়ী আসিয়াছেন!—পাকস্পর্শের ভোজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি নববধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে পারিলেন না।

বাড়ীতে ছুইখানিমাত্র বাসের ঘর; আর একখানি ছোট পাটের চণ্ডীমণ্ডপ। গিরিবালা যে ঘরখানিতে থাকিতেন, তাহার মেটে দেওয়াল, দেওয়ালে কয়েকখানি ঠাকুর দেবতার চিত্র, তক্তা দিয়া ঘরে মাচা-কোঠা পাতা। ঘরের মধ্যে চৌকি, তাহার অন্ত দিকে কাঠের সিন্দুক, সিন্দুকের পাশে একটি প্রকাণ্ড বেতের ঝাঁপি, একটি বাঁশের আড়ায় লেপ তোষক স্তরে স্তরে সজ্জিত, তাহার উপর 'ধোপদস্ত' কাপড়ের আভরণ পরিচ্ছন্ন মেঝেতে ধূলা নাই। ঘরের যে কয়েকটি দ্বার জানালা ছিল, তাহা প্রশস্ত নহে।—গিরিবালা নববধূর বাসের জন্ত এই ঘর ছাড়িয়া দিল।

ঘর দেখিয়া সুকুমারীর ভয় হইল—এই গরুর গোয়ালে তাহাকে থাকিতে হইবে?—সরকারবাবুর গোয়ালঘরও ইহা অপেক্ষা শতগুণে ভাল। শার্সি খড়খড়ি, বৈদ্যুতিক পাখা ও বিদ্যুতের আলো দূরে থাক, দ্বার জানালাগুলি এত ছোট যে, ঘরে প্রবেশ করিয়া সুকুমারী পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হাঁপাইয়া উঠিল।—তাহার পর যে দিন অরণ্যবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ বনপথ দিয়া বিরলসলিলা অপ্রশস্ত নদীর পঙ্কিল জলে সে স্নান করিয়া আসিল, সে দিন পিতৃভবনের অঙ্গিনাস্থিত জলের কল ও চৌবাচ্চাপূর্ণ কলের জলের জন্ত তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল! সে পল্লীজীবনকে নিদারুণ অভিশাপ ও পল্লীবাসকে বনবাস মনে করিতে লাগিল।—আবার তাহার বড় জাটিই বা কেমন?—গায়ে একটা সেমিজ বা জামা নাই, কস্তাপেড়ে ময়লা শাড়ী পরা, হাতে শাঁখা, সাদাসিধে গড়ন-বিশিষ্ট মোটা সোটা একটা স্ত্রীলোক; হাতে না আছে চুগাছি বালা, গলায় না আছে বিনোদবেণী 'নেকলেস্'!—সুকুমারী ভাবিল, তাহার মায়ের দাসী মুক্তকেশী ইহা অপেক্ষা অনেক সুন্দরী।—এই জায়ের সঙ্গে একত্র বাস করিতে হইবে ভাবিয়া সুকুমারী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।—সুকুমারীর সঙ্গে যে ঝি আসিয়াছিল তাহার নাম ভবতারিণী। ভবতারিণী অনেক কালের ঝি, সুকুমারীকে সে কোলে

পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল; ভবতারিণীর হাতে তাগা, গলায় সোনার দানা, পরিধানে তসর।—দেখিয়া মনে হয়, গুরুঠাকুরাণী শ্রীপাঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক শিষ্যকে কৃতার্থ করিবার জন্য তাহার গৃহে পদরজ দান করিয়াছেন।—সুকুমারী ভবতারিণীর কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ভবতারিণী তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিল, "তোর বাপের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে, এমন সোনার সীতেকেও এমন বনে পাঠায়! কোথায় সোনার 'অট্টালিকে', আর কোথায় এই কুঁড়ে ঘর!"

কথাটা তখনই শাখাপল্লবসমন্বিত হইয়া পাড়ায় পাড়ায় পল্লীবধূগণের মুখে মুখে ঘুরিতে লাগিল।—গিরিবালা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "রাজা বৌর কি এ কথা কখনও বলেনি!" গৌরীর মা বলিল, "কেন? বিয়ে বৌয়ে যখন কথা হয়, তখন দাঁড়িয়ে বসে আমাদের নয়নতারা তা শুনে এসেছে। তাকে কেন?"

এ সকল প্রসঙ্গ স্নানের ঘাটে হইতেছিল। কালাচাঁদের মা গামছার ভিতর হাত রাখিয়া আহ্নিক করিতে করিতে বলিলেন, "দুঃখ করে কি হবে বৌমা! কাজটা কিন্তু তোমাদের ভাল হয় নি। তোমরা হ'লে 'গেরস্ত' মানুষ; জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ে ঘরে আনা কি তোমাদের মত লোকের সাজে? এই দেখ আমার 'ভগ্নিপোত' ডেপুটী হাকিম, সে যদি আমাদের কর্ত্তার ভগিনীপুত্র বিয়ে কোনও সদরালার মেয়ের সঙ্গে দেয় ত সাজে ভাল। কেউ কোনও কথা বল্‌তে পারে না। কিন্তু তোমাদের হয়েছে হাত চেয়ে আম মোটা। এখন কত কথা শুন্‌তে হবে।"

দত্ত-গিন্নী গামছায় মুখমার্জ্জনা করিতে করিতে বলিলেন, "পেটের ছেলের মত দেওরটিকে মানুষ করেছ।—হাকিমের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে, শেষটা সামলাতে পারবেত? এ বৌ যদি তোমার সঙ্গে ঘর করে ত আমি কায়েতের মেয়ে নই। তোমার আমও যাবে ছালাও যাবে। পরের মেয়ের সুখের জন্যই কি দেওরকে এত বড়টা করেছিলে?" গিরিবালা অস্ফুটস্বরে বলিল, "ঠাকুরপোর ত ভাল হবে। নিজের সুখের 'পিত্যাশায়' এ কাজ করিনি ঠাকরুণ!"

গিরিবালা এ কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে কি এক অব্যক্ত

বেদনা অনুভব করিল। তাহার নয়নকোণে অশ্রুর সঞ্চার হইল। রমণী-হৃদয়ের রহস্য দুর্বোধ্য! গিরিবালা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া জলপূর্ণ কলস কক্ষে বাড়ী ফিরিল।—তখন ঘাটে খুব উৎসাহের সহিত সমালোচনা আরম্ভ হইল। দত্তগিন্নী ঘড়ায় জল পুরিতে পুরিতে বলিলেন, "ঢের ঢের দাসী বাঁদী দেখেছি বাবু! কিন্তু কলিকাতার এই ঝি যেন খড়দার মা ঠাকরুণ, চোখে মুখে কথা!"

কালাচাঁদের মা আহ্নিক মুলতবী রাখিয়া বলিলেন, "আবার মাগীর গলায় সোনার দানা! বুড়ো বয়সে চুড়ো কর্ম্ম!"

ঠিক সেই সময়ে বকুলতলায় দাঁড়াইয়া তামাক টানিতে টানিতে লালমাধবের গ্রাম সম্পর্কের খুড়ো সেই বুড়ো চাটুয্যে মশায় লালমাধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, "বাপু হে, তখনই বলেছিলাম, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেয়ো না; গরীবের ঘর থেকে খাসা টুকটুকে বৌ আনবে; মন দিয়ে ঘরকন্না করবে, দু কথা জোর করে বল্‌লে ঘাড় হেঁট করে শুনবে। তা নয়, ভায়ের বিয়ে দিলে এক সদর-ওয়ালার মেয়ের সঙ্গে! পেলে ত কচু, মধ্যে থেকে ভাইটি হাতছাড়া হলো, "লাভঃ পরম গোবধঃ।"

লালমাধব বলিলেন, "লাভের জন্য এ কাজ করিনি; ছোঁড়ার ত একটা 'হিল্লে' হলো।"

গ্রামের পুরুষ ও রমণীসমাজ একমত হইয়া রায় প্রকাশ করিলেন,—লালমাধব বুঝিতে না পারিয়া বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছে।—লালমাধবের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় তাঁহারা অস্থির হইলেন।

পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ লালমাধব সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া গ্রামের 'ভদ্রভদ্র' সকলকে পাকস্পর্শের ভোজ দিলেন।—গিরিবালা অনুগত দাসীর ন্যায় পরম যত্নে নববধূর সেবা করিতে লাগিল।

৪

সুকুমারী পিতৃগৃহে ফিরিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, যেন সে একটা বিকট দুঃস্বপ্নের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিল। বিশেষতঃ দাসী ভবতারিণী যখন লালমাধবের গৃহস্থালীর কথা সালঙ্কারে সদরালা-গৃহিণীর গোচর করিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, জীবনে তিনি কন্যাকে এমন কুস্থলে পাঠাইবেন না; নবীন চাকরী করিয়া দু পয়সা

সঞ্চয় করিলে কলিকাতার কাঁশারীপাড়ায় নিজের বাড়ীর কাছে একটি বাড়ী করিয়া দিবেন। নবীনকে দেখিয়াই তিনি তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন, পাড়াগেঁয়ে লালমাধবের সহিত তাঁহার মেয়ের সম্বন্ধ কি?

শ্বশুরের কাঁশারীপাড়ার বাড়ীতে থাকিয়া নবীনমাধব প্রেসিডেন্সী কলেজে বি এ. পড়িতে লাগিল। বি. এ পাশ করিয়াই সে মুরুব্বী শ্বশুরের চেষ্টায় ও মুরুব্বীর মুরুব্বীর অনুগ্রহে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী লাভ করিল, এবং বর্দ্ধমানে শিক্ষানবীশ ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইল।

সদরালার কন্যাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বেই নবীনের মেজাজ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ডেপুটীগিরি লাভ করিয়া তাহার মাথা অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। সে সদরালা কৈলাস বাবুর জামাতা, এবং বর্দ্ধমানের 'প্রবেশ-নারী' ডেপুটী কালেক্টর, ইহাই এখন তাহার পরিচয়।—কিন্তু স্মৃতি সহজে মানুষের মস্তিষ্ক-কোটর ত্যাগ করে না। নবীনমাধবের সর্ব্বদাই মনে হইত, সে পল্লীগ্রামের এক নিঃস্ব ব্রাহ্মণের পুত্র, অভাব ও দৈন্যে তাহার শৈশব-জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, এমন লজ্জা ও ক্ষোভে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইত। সে সর্ব্বদা তাহার শৈশবস্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত। বন্ধুসমাজে পল্লীগ্রামের প্রসঙ্গ উঠিলে, নবীন অধিক উৎসাহে আমাদের অনেক স্নেহের আধার স্নেহময়ী পল্লীজননীর নিন্দা করিত।

নবীন ডেপুটী হইয়াছে শুনিয়া লালমাধব ও গিরিবালা আনন্দে অভিভূত হইলেন, এবং মঙ্গলচণ্ডীর পূজা পাঠাইয়া দিলেন।—খুড়ো চাটুয্যে মহাশয় এই সুসংবাদে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বেল পাকলে কাকের কি?"

অতঃপর ডেপুটী ভাইটিকে একবার বাড়ীতে আসিবার জন্য লালমাধব তাহাকে দুই তিনখানি পত্র লিখিলেন। নবীন অনেক দিন হইতেই দাদাকে পত্র লেখা এক রকম ছাড়িয়া দিয়াছিল, ক্রমাগত তিনখানি পত্র পাইয়া সে উত্তর না দেওয়া তেমন সঙ্গত মনে করিল না, সংক্ষেপে দাদাকে জানাইল, এখন বাড়ী যাইবার তাহার অবকাশ নাই; পল্লীগ্রামের সহিত সম্বন্ধ রাখাও সে গৌরবজনক মনে করে না। বিশেষতঃ

ম্যালেরিয়ার বাস্তুভিটা পল্লীগ্রামে যাইতে তাহার সাহসও হয় না।

লালমাধব ভ্রাতার পত্র পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন; গিরিবালার মর্ম্মবেদনার সীমা রহিল না।—সে কাঁদিয়া স্বামীকে বলিল, "ঠাকুর-পোকে ছেলেবেলা থেকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি, নিজে না খাইয়া খাওয়াইয়াছি, মায়ের অভাব কোন দিন তাহাকে জানিতে দিই নাই!—বড়লোকের ঘরে ঠাকুরপোর বিয়ে না দিলে আজ হয়ত সে আমাদের পর মনে করতো না।"

লালমাধব বলিলেন, "নবীন যা-ই মনে করুক, সে আমার ভাই, আমার ত পর নয়। সে যাতে সুখী হয়, তাই ভাল। তার সুখেই আমাদের সুখ। আহা, ছেলেবেলায় সে কত কষ্ট পেয়েছে; সে কথা মনে করিয়া যদি তার দুঃখ হইয়া থাকে, তবে সে জন্য আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও যেন তাকে অকৃতজ্ঞ মনে না করি।"

কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল না। এদিকে নবীনমাধব অল্পদিনেই চাকরীতে উন্নতি লাভ করিলেন, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে মহকুমার শাসনভার পাইলেন। মহকুমাও পল্লীগ্রাম, বাধ্য হইয়া সেখানে তাঁহাদের যাইতে হইল। কিন্তু জন্মভিটায় গিয়া একবার দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিবার তিনি অবসর পাইলেন না।—কয়েক বৎসর পরে তিন মাসের "প্রিভিলেজ্ লিভ" লইয়া নবীন কলিকাতায় গিয়াছেন শুনিয়া লালমাধব আবার তাঁহাকে বাড়ী আসার জন্য পত্র লিখিলেন, কিন্তু নবীনের সেই একই উত্তর, পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার দারুণ উপদ্রব, সেখানে সুপেয় জল নাই, বাস করিবার উপযুক্ত ঘর নাই; সেখানে তিনি কিরূপে বাস করিবেন?

কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহের নিকট কোনরকম কুণ্ঠা বা বাচবিচার নাই। প্রাণাধিক ভাইটিকে বহুকাল না দেখিয়া লালমাধব অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিলেন; এবং কলিকাতায় একবার ভাইকে দেখিতে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া পত্নীর নিকট তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিলেন।—লালমাধবের পুত্র ইন্দুমাধব তখন একটু বড় হইয়াছিল, সে বলিল, 'বাবা! আমি তোমার সঙ্গে কাকাকে দেখ্‌তে যাব।' গিরিবালা একবার

আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহার আপত্তি টিকিল না! পুত্রকে সঙ্গে লইয়া লালমাধব কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

গিরিবালা দেবরের জন্য এক হাঁড়ি সোনা মুগের ডাল, বাগানের আমের কয়েকখানি আমসত্ব, বাগানের নারিকেলের একহাঁড়ি নাড়ু ও ঘরের দুধের সর বাটিয়া এক ভাঁড় ঘি প্রস্তুত করিয়া স্বামীর সঙ্গে দিলেন।

লালমাধব বলিলেন, "কলিকাতা যায়গা, সেখানে কতরকম মেঠাই মণ্ডা, ছানাবড়া, পান্‌তুয়া, খাজা, গজা পাওয়া যায়—সেখানে তোমার এ নারকেলের নাড়ু লইয়া গিয়া কি করিব? লোকে দেখিয়া হাসিবে যে?"

গিরিবালা বলিল, "আমি নারিকেলের নাড়ুগুলি চিনির রসে পাক করিয়া মশলা দিয়া তৈয়ারী করেছি। ঠাকুরপো ছেলেবেলায় এই নাড়ু বড় ভালবাসতো কতদিন তাকে নিজের হাতে খেতে দিইনি, দুটো নাড়ুও যদি ঠাকুরপো মুখে দেয়, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। তুমি নিয়ে যাও।"

এই সকল উপহার-দ্রব্য সঙ্গে লইয়া শিশু পুত্র ইন্দুমাধব সহ লালমাধব গরুর গাড়ীতে দীর্ঘ সাত ক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক আলমডাঙ্গা ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিলেন, এবং সন্ধ্যার পর শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিলেন।

লালমাধব কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্বে অনেকবার কলিকাতায় গিয়াছিলেন, সুতরাং কলিকাতার পথ ঘাট তাঁহার নিতান্ত অপরিচিত ছিল না।—আষাঢ় মাস, বর্ষার মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কাদায় কলিকাতার পথে চলা দুঃসাধ্য। ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া লালমাধব একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিবার চেষ্টা করিলেন; গাড়োয়ান সময় বুঝিয়া হাঁকিল, কাঁসারী-পাড়ায় যাইতে দেড় টাকা ভাড়া লাগিবে।

লালমাধব পল্লীগ্রামের লোক, তাহার উপর সেকেলে লোক; দেড় টাকা গাড়ীভাড়া দিয়া এক ক্রোশ পথ যাওয়া তিনি বাহুল্য মনে করিলেন।—ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে ইন্দু, এক ক্রোশ পথ হেঁটে যেতে পারবি?"—কাকাকে দেখিবার জন্য ইন্দু-মাধবের ভারি উৎসাহ হইয়াছিল, সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "খুব পারবো বাবা, চল, হেঁটেই যাই, গাড়ীতে কাজ নেই।"

তখন মুটের মাথায় মোট তুলিয়া দিয়া পুত্রের হাত ধরিয়া লালমাধব 'শ্রীদুর্গা' স্মরণ করিয়া রাজপথে নামিয়া পড়িলেন। মুটে হাঁড়িগুলি ঝাঁকায় সাজাইয়া লইয়া তুল্‌কীচালে আগে আগে চলিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় আটটার সময় লালমাধব সদরালা বাবুর দেউড়ীতে আসিয়া মোট নামাইলেন।—এক জন দ্বারবান তখন সিদ্ধির নেশায় ভরপুর হইয়া দেউড়ীর পাশের একটা কুঠুরীতে চার-পাইর উপর শয়ন করিয়া মিহি সুরে একটা ভজন গায়িতেছিল। দেউড়ীতে কলরব শুনিয়া সে উঠিয়া আসিল; লালমাধবের পরিচয় লইয়া সে জানিতে পারিল, আগন্তুক জামাইবাবুর দাদা, ভাইকে দেখিবার জন্য দেশ হইতে আসিয়াছেন।

ডেপুটীবাবু তখন সুসজ্জিত আলোকিত বৈঠকখানায় বসিয়া বন্ধুগণের সহিত পাশা খেলিতেছিলেন। গড়গড়ার মাথায় প্রকাণ্ড কলিকাতে সুগন্ধি তামাকুর মিষ্টগন্ধ গৃহের বায়ুস্তর সুরভিত করিতেছিল, এবং নবীনমাধবের 'টেরিয়ার' কুকুরটি পাপোশের উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল। এমন সময় পুরাতন ঠনঠনের চটীপায়ে এক পা কাদা ও মাথায় দোদুল্যমান টিকি লইয়া লালমাধব পুত্রের হাত ধরিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

লালমাধবকে দেখিয়া নবীনের বন্ধুগণ সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহাদের মনে হইল, লোকটা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ; বোধ হয়, কিছু ভিক্ষার আশায় অসময়ে এখানে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছে।—কিন্তু নবীনমাধবের কথায় তাহাদের বিস্ময় কৌতূহলে পরিণত হইল। নবীনমাধব দীর্ঘকাল পরে দাদাকে দেখিলেও, তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন; তিনি মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিতভাবে চাহিয়া বলিলেন, "কি রকম? আপনি হঠাৎ এখানে!" —উঠিয়া দাদাকে প্রণাম করিতেও তাঁহার ভুল হইয়া গেল।

দাদা বলিলেন, "অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, তাই একবার তোমাকে দেখিতে আসিলাম।"

নবীন বলিলেন, "বিলক্ষণ, আগে একটা সংবাদ দিতে হয়।—সঙ্গে এ ছেলেটি—?"

লালমাধব তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ওকে চিন্‌তে পারছো না? চিন্‌বেই বা কি করে, বহুদিন দেখনি, ও ইন্দুমাধব, তোমার ভাইপো।—আমি তোমাকে সংবাদ না দিয়েই এসেছি; ইন্দু, তোর কাকাকে প্রণাম কর।"

ইন্দুমাধব এত বড় বাড়ীতে কখনও প্রবেশ করে নাই, গৃহসজ্জা দেখিয়া তাহার তাক্ লাগিয়া গেল। সে তাহার ছেঁড়া জুতা খুলিয়া গালিচার উপর গেল, এবং কাকাকে প্রণাম করিল। লালমাধব দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া ভৃত্য একখানি চেয়ার সরাইয়া দিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল।

এক জন বন্ধু সকৌতুকে নবীনকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে হন তিনি ?"

নবীন কিছু অপ্রস্তুত হইয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "দাদা।"

খেলা ভাঙ্গিয়া গেল। বন্ধুগণ উঠিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। লালমাধব উপহারের জিনিসগুলি আনাইয়া, কোন হাঁড়িতে কি আছে, তাহা নবীনকে বলিলেন। নবীন হাসিয়া অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "এ সকল জিনিস কি জন্ম এখানে বয়ে এনেছেন ? আমার কি আর নারকেলের নাড়ু খাবার বয়স আছে ? আর এখানে দ্বারভাঙ্গার আমের উৎকৃষ্ট আমসত্ব, মাখন-গলানো ঘি যথেষ্ট পাওয়া যায়। কষ্ট করে এ সকল জিনিস বাড়ী থেকে বয়ে আনবার কোনও দরকার ছিল না।"

লালমাধব কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "তোমার বৌদি দিয়েছেন, আমার কোনও দোষ নাই।"

নবীন বলিলেন, "বৌদি বোধ হয় আমাকে এখনও তেমনই ছেলে-মানুষ মনে করেন। তিনি আমাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন, আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ আছি। তিনি ভাল আছেন ত ?"

লালমাধব বলিলেন, হাঁ, আছে, একবার তোমাকে দেখবার জন্য তারা বড় আগ্রহ।"

নবীন বলিলেন, "সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু কি করে তাঁর আগ্রহ মিটাই ? —আমার ভয়ানক 'ডিস্‌পেপ্‌সিয়া', পাড়াগাঁয়ে গিয়ে তাঁকে দেখ্‌বার মত আমার অবস্থা নয়।"

ইন্দুমাধব তাঁহার পিতার কানে কানে বলিল, "কাকীমাকে একবার দেখ্‌বো।"

নবীন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও বলে কি ?"

লালমাধব বলিলেন, "ও বল্‌ছে—কাকীমাকে একবার দেখ্‌বে।"

নবীন বলিলেন, "তা কাল দেখা হবে; তাঁর শরীর ভাল নয়, বোধ হয় শুয়ে পড়েছে, রাত্রে আর দেখা করবার সুবিধা হবে না।"

কাকার কথা শুনিয়া বালক ক্ষুণ্ণ হইল।—উভয় ভ্রাতায় আর অধিক কথা হইল না। নবীনমাধবের মাথা ধরিয়াছিল, তিনি দাদার নিকট বিদায় লইয়া শয়ন করিতে চলিলেন।—অধিক রাত্রে পাচক বাহিরের একটা কুঠরীতে দু জনের ভাত দিয়া গেল। লালমাধব সপুত্র আহার করিয়া বহির্ব্বাটীতেই শয়ন করিলেন। বালক পথশ্রমে কাতর হইয়াছিল, সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল; কিন্তু লালমাধব অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিলেন না. তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কেন আসিলাম? এ ত সে নবীন নহে।—তবু ত আমি তাহার দাদা!"

অন্তঃপুরে সুকুমারী পূর্ব্বেই ভাসুর ও ভাসুরপুত্রের আগমন-সংবাদ পাইয়াছিল। স্বামীকে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দেশ থেকে কারা নাকি এসেছে শুনচি?"

নবীন বলিলেন, "হাঁ, দাদা ছেলে নিয়ে এখানে এসেছেন। বুড়ো হলে মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়।"

সুকুমারী বলিল, "কেন? চাকরী বাকরীর উমেদারীতে এলেন নাকি?"

নবীন বলিলেন, "না, অনেক দিন আমাকে দেখেন নি, তাই শুনলুম, দেখতে এসেছেন।"

সুকুমারী বলিল, "তবু ভাল, আমি ভাবছিলুম—কিছু মতলব আছে। এসেছেন, আজ থাকুন; কাল খাইয়ে দাইয়ে ওদের বিদেয় করে দিও। তোমার দাদার পরিচয় পেলে তোমার উপর লোকের ভক্তি চটে যেতে পারে। 'অজ' পাড়া-গেঁয়েদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?—আমি ভাবছি, ছোঁড়াটাকে ঘাড়ে চাপিয়ে না যান।"

ঠিক সেই সময় লালমাধব করতলে মস্তক রাখিয়া ভাবিতেছিলেন, "এই কি আমার সেই ভাই! এতকাল পরে উপযাচক হইয়া দেখা করিতে আসিলাম, একটা কুশলবার্ত্তাও জিজ্ঞাসা করলে না? আমি গরীব, আমি পল্লীবাসী মূর্খ, কিন্তু আমি যে তার দাদা!"

হঠাৎ বহুকাল পূর্ব্বের এমনই এক ঘনঘোর বাদলের রাত্রি তাহার মনে পড়িল—যে রাত্রে তাহার পিতা শিশু নবীনকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। সঙ্গে সঙ্গে স্নেহময়ী জননীর কথা মনে পড়িল, স্বামীস্ত্রীতে কত কষ্টে নবীনকে মানুষ করিয়াছেন—তাহাও মনে পড়িল। অশ্রুধারায় তাঁহার শীর্ণ গণ্ড সিক্ত হইল, এবং তাঁহার

সহিত সহানুভূতি-প্রকাশের জন্যই বোধ হয়, আষাঢ়ের দিগন্তব্যাপী মেঘ চরাচর অন্ধকার করিয়া মুষলধারে অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ করিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

শিক্ষা-তত্ত্ব

আমাদের ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা বা University Educationএর বিস্তার লইয়া বিশেষ উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। এই সময়ে বিলাতে তথা ইউরোপে শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলনের একটু পরিচয় দিলে বুঝা যাইবে, সভ্য ইউরোপ কেমন দৃষ্টিতে শিক্ষা ব্যাপারটা দেখিয়া থাকেন, এ পক্ষে ইউরোপের আদর্শ কেমন। এই সঙ্গে ভারতের পুরাতন আর্য্য শিক্ষার আদর্শ জানিতে পারিলে, তুলনায় সমালোচনা অনেকাংশ সহজ হইবে। লণ্ডন ইউনিভার্সিটীর শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা করিবার জন্য, উহার রীতির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ঘটাইবার জন্য, মৃত রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড একটি কমিশন বসাইয়া যান। লর্ড হ্যাল্ডেন এ কমিশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। এই কমিশনের মন্তব্য এতদিনে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, জাপান, জর্ম্মনী এবং হল্যাণ্ডের শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ-সম্বলিত একখানি পুস্তক ইংলণ্ডে প্রচারিত হইয়াছে। শেষে, ডাক্তার পল মনরোর (Paul Monroe) A Cyclopaedia of Education বা শিক্ষা বিষয়ক বিশ্বকোষ নামক বিরাট গ্রন্থ প্রায় পরিসমাপ্ত হইয়া আসিল। উহাতেও শিক্ষা বিষয়ক অনেক তত্ত্বের সবিস্তার আলোচনা আছে। এই সকল গ্রন্থ ও রিপোর্ট অবলম্বনে The Times (Educational Supplement) নামক সাময়িক পত্রে কয়েকটা চিন্তা-পূর্ণ সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই সকল সন্দর্ভ অবলম্বনে আমাদের বক্তব্য ব্যক্ত করিব।

আমরা 'শিক্ষা' বলিলে বুঝি কেবল লেখা আর পড়া;—যাহার সাহায্যে ভারতীয় ছাত্রগণ ইংরেজী ভাষা লিখিতে, পড়িতে এবং বলিতে পারে। এই লেখাপড়ায় পটুতা লাভের পরিচায়কস্বরূপ গোটাকয়েক পরীক্ষা পাশ করিতে পারে—উপাধিধারী হইতে পারে—তাহাই আমাদের দেশে 'শিক্ষা' বলিয়া পরিচিত। ইংলণ্ডে তথা ইউরোপের অন্য সকল সভ্য দেশে এবম্বিধ শিক্ষার প্রচলন নাই। উহারা লেখাপড়াকে শিক্ষা বলে না। যাহার প্রভাবে দেহের পুষ্টি, মনের স্ফূর্ত্তি সাধিত হয়, যাহা শিখিলে শিক্ষার্থী

জীবন-যাত্রায় একটা-না-একটা প্রশস্ত পন্থা অবলম্বন করিতে পারে, এবং এই জীবিকা-অর্জ্জনের প্রতিযোগিতায় স্বীয় জাতির ও সমাজের পুষ্টিসাধন করিতে পারে, ইউরোপে তাহাকেই শিক্ষা বলে। এই শিক্ষা ধর্ম্মশূন্য নহে; এই শিক্ষার অন্তর্গত সঙ্গীত, ব্যায়াম, নৌচালন, সন্তরণ, নানাবিধ ক্রীড়া, সমর-কৌশল প্রভৃতি বহু বিষয় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সোজা কথা এই—ইউরোপ বলিতেছেন, "তুমি সমাজের ব্যষ্টি বা ব্যক্তি, তোমাকে যে সমাজ বা গবর্মেণ্ট যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষা দিতেছেন; সে ঋণ পরিশোধ করিতে তুমি কোন ভাবে প্রস্তুত আছ? তুমি কি ধর্ম্ম-যাজক হইয়া সমাজকে ধর্ম্মের পথে রক্ষা করিতে চাও? তুমি কি সমর বা নৌবিভাগে প্রবেশ করিয়া দেশরক্ষা ও সমাজরক্ষার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত আছ? তুমি শাসন বা বিচার বিভাগে থাকিয়া সমাজের দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকার্য্যে সহায়তা করিতে উদ্যোগী?" বিদ্যার্থীর প্রতি ইহাই সভ্য ইউরোপের জিজ্ঞাসা; এই জিজ্ঞাসার যেমন উত্তর হইবে, তদনুসারে বিদ্যার্থীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। ইউরোপ বলিতেছেন যে, অর্থোপার্জ্জনের জন্য একাধিক বহু পথ আমি খুলিয়া রাখিয়াছি। তোমার যেমন যোগ্যতা হইবে, তুমি তদনুসারে সেই পথ অবলম্বন করিবে; পরন্তু তোমার যোগ্যতা কেবল তোমারই ব্যক্তিগত তুষ্টি-পুষ্টির জন্য বিনিযুক্ত হইবে না, সে যোগ্যতার সাহায্যে সমাজকে, জাতিকে ধন্য করিতেই হইবে। যে শিক্ষা এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে সহায়তা বা আনুকূল্য করে, তাহাই ইউরোপের আধুনিক শিক্ষা।

জর্ম্মণী এবং ফ্রান্স সর্ব্বাগ্রে দেখে, বালক সবল কিংবা দুর্ব্বল। দুর্ব্বল হইলে বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহাকে সর্ব্বাংশে সবল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। জর্ম্মণীতে দুর্ব্বল শিশুদের পাঠশালা গৃহের মধ্যে অবস্থিত নহে; বিপিনে, কান্তারে, বা পর্ব্বত-সানুদেশে এমন সকল পাঠশালা প্রতিষ্ঠাপিত থাকে; এইখানে ছেলেরা ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, যখন ইচ্ছা তখন লেখা-পড়া করে, যখন ইচ্ছা তখন খেলা করে। ফ্রান্সে Body-culture বা শরীর-উন্মেষ নামক এক প্রকারের চিকিৎসা এবং শিক্ষা-পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতির সাহায্যে বালকের দেহগঠনের ত্রুটী সকলের সংস্কার করা হয়; যাহার বুক সরু, ভাবী যক্ষ্মা-সম্ভাবনার দ্যোতক, তাহার বুক ও পিঠ চওড়া করিয়া দেওয়া হয়; যাহার কোমর মোটা, সে মেদবাহুল্যের পরিচায়ক, তাহার কোমর সরু করিয়া দেওয়া হয়। এই Body-culture বা শরীর-উন্মেষরীতি ইউরোপের সকল দেশেই অবলম্বিত হইয়াছে। সুইডেন এবং জর্ম্মণীতে আমাদের প্রাণায়াম-পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাকে ইংরেজী ভাষায় Intensive method একাগ্রপদ্ধতি বলা হয়। মানস-ক্রিয়ার দ্বারা শরীরের উন্নতিসাধন এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য; ইহা ব্যয়সাধ্য নহে; তাই জর্ম্মণী, সুইডেন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশে এই পদ্ধতির আদর অতিমাত্রায় বাড়িয়াছে। তবে ফ্রান্সের নৌবিভাগের লেফটেনাণ্ট হেবার্ট (M. Hebert) ভারতে আসিয়া ভারতের ডন-কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়াম-পদ্ধতি দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, এ পক্ষে ভারতবাসীর পদ্ধতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ, তিনি বিজ্ঞানের

সাহায্যে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, দেহরক্ষার জন্য air-bath and ablutions অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে বায়ুসেবন বা শরীর-অবগাহ এবং স্নান অতি প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন, সর্ব্বাঙ্গের পূর্ণ-স্ফূর্ত্তি ঘটাইতে হইলে, যতদূর সম্ভব নগ্ন হইয়া ব্যায়াম করিতে হইবে; তবে সে ব্যায়াম ফলপ্রদ হয়। ভারতবর্ষের ডন-কুস্তি এই হেতু দেহপুষ্টির পক্ষে, সর্ব্ব শরীরের উন্মেষসাধন পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইঁহারই চেষ্টায় জর্ম্মাণির বহু পাঠশালায় ভারতবর্ষের রীত্যনুসারে ডন-কুস্তি অবলম্বিত হইয়াছে। দেহপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতে হয়; কণ্ঠসঙ্গীতচর্চ্চার ফলে ছাত্রের ফুসফুস ও ক্লোমের সকল দোষ দূর হয়। তাই জর্ম্মাণীর প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সঙ্গীতচর্চ্চার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

একটা কথা এই স্থানে বলিয়া রাখিতে হইবে। আমাদের এ দেশে সবই Day School বা দিনের পাঠশালা; আফিস কাছারীর মতন ছাত্রেরা দশটা পাঁচটা লেখা-পড়া শিখিয়া আইসে। ইউরোপের কোনও দেশেই এই day school পদ্ধতি সাধারণ ভাবে প্রচলিত নাই। যাহারা অতি দরিদ্র, তাহাদের বালকগণই ডে-স্কুল বা 'নাইট-স্কুলে' লেখাপড়া শিখিয়া থাকে। অভিভাবক একটু অবস্থাপন্ন হইলে ছাত্রদের খোর-পোষের খরচ দিতে পারিলে তাহাদিগকে ছাত্রাবাসসমন্বিত বিদ্যালয়ে পাঠান হয়। সেখানে ছেলেদের ছাত্রাবাসে থাকিতে হয়, এবং চব্বিশ ঘণ্টা কাল শিক্ষক বা অধ্যাপকের দৃষ্টির অধীন থাকিতে হয়। ফ্রান্সে এবং জর্ম্মণীতে দরিদ্রের ছেলেদেরও এই ভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষাকল্পে সকল ব্যয়ভার বহন করেন। ইহাদিগকে পরে সমর ও নৌবিভাগে উপর্য্যুপরি তিন বৎসরের জন্য কাজ করিতে হয়। মোট কথা এই, আমাদের দেশে পুরাতন ও সনাতন গুরু-গৃহে বাসের পদ্ধতি প্রকারান্তরে এখনও ইউরোপে প্রচলিত আছে; সৎশিক্ষায় উহাই প্রশস্ত পদ্ধতি বলিয়া এখনও মান্য।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের সকল দেশে শিক্ষা ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ গ্রাহ্য ছিল। বড় বড় ধর্ম্মযাজক শিক্ষকতা করিতেন। ধর্ম্মশূন্য শিক্ষা ইউরোপে ছিল না, এখনও নাই। তবে ফ্রান্সে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম বাধ্যতা বলিয়া আর গ্রাহ্য হয় না, ইংলণ্ডে Non-Conformist খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মাত্রা বাড়িয়াছে, তাই এই দুই দেশে ধর্ম্মশিক্ষা এখন তেমন প্রবলভাবে প্রচলিত নহে। লর্ড হ্যালডেন কিন্তু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মশূন্য লেখাপড়া হইতে পারে; পরন্তু Culture বা শিক্ষা ধর্ম্মহীন হইলে হয় না। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, সমাজের অঙ্গই যখন ধর্ম্ম, ধর্ম্ম আছে বলিয়া সমাজ আছে, সমাজ আছে বলিয়া ধর্ম্ম আছে, তখন ধর্ম্মকে বাদ দিয়া সামাজিক শিক্ষা সম্ভবপর নহে। যে সমাজের যে ধর্ম্ম, সেই সমাজের সামাজিকগণকে সেই ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে; নতুবা সমাজের সংহতিশক্তি (Cohesiveness) শিথিল হইয়া যাইবে। লর্ড হ্যালডেনের এই অভিমত শুনিয়া বিলাতের Nonconformist দলের নেতৃগণ একটু বিচলিত হইয়াছেন। পরন্তু সমাজধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিলে, এ মতের বিরোধ ন্যায়ানুসারে করা যায় না। ফলে, এই কথাটা লইয়া

বিলাতে বেশ একটু আন্দোলন চলিতেছে। Church Quarterly Review নামক সাময়িক পত্রে এই সিদ্ধান্ত ধরিয়া বেশ আলোচনা হইতেছে। বিলাতের ধর্ম্ম-যাজকগণের মত এই যে, অধুনা বিলাতে ধর্ম্মশিক্ষা বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, ঘন ঘন পরীক্ষার উৎপাতে এই দোষ ঘটিয়াছে।

এইবার "ইউনিভারসিটী শিক্ষা"র বিষয় বলিব। এই উচ্চশিক্ষার অর্থ কি? "টাইম্‌স্‌" বলিতেছেন—

"When we say that a man has received a university education, do we mean that he has set the seal upon his studies by taking a degree conferred by a University, on the results of an examination, or do we mean some thing more indefinite, but much wider in its scope—that he has acquired by association with fellow students and teaches that spirit and love of learning which is an end in itself and enables the student to apply his knowledge throughout his life in an ever-widening circle?"

অর্থাৎ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বলিলে আমরা কি বুঝিব এমন কেহ যে, কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও একটি উচ্চপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধিধারী হইয়াছে, এবং বীয় বিদ্যাবত্তার পদক লইয়া সমাজে পরিচিত হইয়াছে; অথবা এমন কেহ যে, সহতীর্থগণের সহিত বিদ্যা আরাধনা করিয়া, অধ্যাপক ও আচার্য্যের নিকট এই সাধনার উপদেশ লাভ করিয়া বিদ্যার সাধক হইয়াছে—বাণীর সেবক হইয়াছে; এবং এই আরাধনা ও সাধন-শিক্ষা সংসারের বিস্তীর্ণক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানভাণ্ডারকে পূর্ণ করিতেছে? যদি প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, উপাধিধারী হইয়াছে, তাহাকেই 'শিক্ষিত'-শব্দবাচ্য করিতে হইবে; তাহা হইলে পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলকে গ্রাহ্য করিতে হইবে। পরন্তু দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত যদি গ্রাহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে "পাশের মহিমা" থাকে না, পরীক্ষার আবশ্যকতা অনুভূত হয় না। প্রথম সিদ্ধান্ত অনুসারে যে "পাশকরা" লেখা-পড়ার প্রচলন আছে, তাহাকে ইংরেজীতে "external education" বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে যে বিদ্যাচর্চ্চা করিতে হয়, তাহাকে ইংরেজীতে "Internal education" বলা হয়। উহা বাহ্য, ইহা আন্তরিক; উহা দেখাইবার, ইহা অনুভব করিবার শিক্ষা। লর্ড হ্যাল্‌ডেনের কমিটী এই অনুভবী শিক্ষা-পদ্ধতির পক্ষপাতী। পরন্তু পরীক্ষারও একটা উপযোগিতা আছে, যথা—

"The first and main function of examination is to test the extent to which the efforts of educator have been successfull."

"It is a test of absolute and of relative merit respectively."

"Examination brings home to both educator and educated

alike, their failures or imperfections, and so becomes a constant and indispensable ally of teaching."

প্রতিযোগী পরীক্ষার পক্ষে এই তিনটা কথা বলা চলে। প্রথম, ছাত্রদের পরীক্ষার ফল হইতে অধ্যাপকের পরিশ্রমের এবং যোগ্যতার পরিমাণ করা যায়; দ্বিতীয়, পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও আপেক্ষিক পটুতার পরিচয় পাওয়া যায়; তৃতীয়, পরীক্ষার ফলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই ত্রুটীবিচ্যুতি বুঝা যায়। অনেকে বলেন যে, প্রতিযোগী পরীক্ষা কেবল মেধার পরিমাণ-চেষ্টা মাত্র। কিন্তু মেধা ব্যতীত লেখাপড়াই হয় না; কণ্ঠস্থ করিতে না পারিলে কিছুই শেখা যায় না। শিশু যাহা দেখে, তাহারই পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, এবং সেই সকল পরিচয়কথা মেধার সাহায্যে স্মৃতির কোটরে সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই সঞ্চয় প্রকরণটা শিশুর পক্ষে যতই সুখকর ও আমোদজনক করিয়া তুলিতে পারিবে, ততই অনায়াসে বালক অনেক বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিবে। চরিত্রের ও ভাবের উদ্ভব দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে আপনিই হয়। কেমন করিয়া কোনটা দেখাইলে বা শুনাইলে ছাত্রের মনের মধ্যে—চিত্তের ক্ষেত্রে ভাবের উন্মেষ ঘটিবে, এই গূঢ়তত্ত্ব যে শিক্ষক জানেন, তিনিই শিশু-আচার্য। জ্ঞানাঞ্জনশলাকার সাহায্যে তিনি চক্ষু বা মানসচক্ষু যে ফুটাইয়া দিতে পারেন, তিনিই সার্থক গুরু। এমন গুরুর সংখ্যা ইউরোপেও বড় কমিয়া পড়িয়াছে, তাই ইউরোপের সকল দেশের শাসকসম্প্রদায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। উচ্চশিক্ষক সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা জলের মতন অর্থব্যয় করিতেছেন; কেন না, যে দেশে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের অত্যল্পতার ঘটে, সেই দেশের সামাজিক অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

একদিন নানা কথায় লর্ড হাল্‌ডেনের রিপোর্ট পূর্ব্বে এই প্রসঙ্গে ডাক্তার স্যাডলার বলিয়াছেন যে, শিক্ষাব্যাপারে ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা (free will) নাই; সমাজের কল্যাণকর পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যাহা সামাজিকগণকে শিখান আবশ্যক, তাহাই শিখাইতে হইবে। শিক্ষা লাভ করিলে ছাত্রগণ অর্জ্জন করিবে, তখন ইচ্ছাশক্তির কথা যদি কেহ কল্পনা করিতে পারে; শিক্ষানবীশীর কালে সকলকেই নির্দ্দিষ্ট পথা অবলম্বন করিতে হইবে। কথাটা আমাদেরও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্মত। যখন হিন্দুসমাজ সজীব ছিল, তখন শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। তাই এখনকার ইউরোপের সজীব সমাজের শিক্ষাপদ্ধতি ও সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনেকটা এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। সেই গুরুগৃহ, সেই সতীর্থ-সাহচর্য্যে পাঠালাপ, সেই গুরুর উপদেশে বাস, ইউরোপে বিশেষতঃ জর্ম্মণ দেশে দেশকালপাত্র অনুসারে আকারান্তরিত হইয়া প্রচলিত রহিয়াছে। সজীব মনুষ্য-সমাজ অনেক ব্যাপারে, বিশেষতঃ শিক্ষাবিষয়ে সমধর্ম্মা; কেন না, উদ্দেশ্য যে সকল পক্ষেই সমান—সমাজ, ধর্ম্ম, জাতি, বংশ, বংশের ধারার রক্ষা সকল সমাজেরই ঈপ্সিত। লর্ড হাল্‌ডেনের রিপোর্টে এই তত্ত্বটাই যেন চারি দিক দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির দোষ দেখিয়াছেন। তিনি

স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কেবল 'পাশকরা' পণ্ডিত লইয়া জাতির পুষ্টিসাধন হয় না, সে শিক্ষা শিক্ষা (culture) নহে, হরবোলা কাকাতুয়ার বোল কপ্‌চান মাত্র। Internal বা আন্তরিক শিক্ষা না হইলে, বিদ্যার্থীর মনো-বুদ্ধি-চিত্তের "স্বাস্থ্য" সাধন করিতে না পারিলে তেমন বিদ্যার্থীর দলের দ্বারা জাতিরক্ষা সম্ভবপর নহে। গবর্মেণ্ট যে বহে বহে এত অর্থব্যয় করিয়া উচ্চশিক্ষার বিস্তার করিতেছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য,—সৎ ও সাধু সামাজিকগণের সৃষ্টি ; উদ্দেশ্য,—ব্যক্তিকে মানবতার—মনুষ্যত্বের উচ্চতম স্তরে উন্নীত করিয়া রাখা। এই উদ্দেশ্য-সাধন করিতে পারিলে, জাতি উন্নত হয়, সমাজ উচ্চাদর্শযুক্ত হয়। অতএব নতুন-বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবল পরীক্ষাগ্রাহী বিদ্যামন্দির করিয়া না রাখিয়া, ছাত্রবাসসমন্বিত, সদ্ভাবপ্রচারক, সৎশিক্ষার আকরস্বরূপ করিতে হইবে। এই হেতু তিনি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তন ও পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য নানাবিধ পরামর্শ দিয়াছেন।

লর্ড স্যাডলারের কমিটীর এই রিপোর্ট লইয়া বিলাতে বিদ্বজ্জনসমাজে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমরা "টাইমস্" পত্রের শিক্ষা-বিষয়ক অতিরিক্ত কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত আন্দোলন আলোচনা অবলম্বনে এই সন্দর্ভ পত্রস্থ করিলাম। রিপোর্টে এমন অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে, যাহার সহিত বঙ্গীয় পাঠকগণের সাক্ষাতে বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই, যেমন ধর্মশিক্ষা, খৃষ্টান ধর্মের প্রচার প্রভৃতি। পরন্তু মূলতঃ শিক্ষা-সম্বন্ধীয় যে সকল সমাজ-সাধারণ সিদ্ধান্তের আলোচনা আছে, তাহার সহিত বঙ্গীয় পাঠকবর্গের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া আবশ্যক। আমাদের মধ্যে এখনও অনেকে ইংরেজী culture শব্দের দ্যোতনা ও অভিব্যঞ্জনা ভাল করিয়া বুঝেন নাই। বঙ্গদেশে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। লর্ড স্যাডলারের রিপোর্ট এ দেশে প্রচারিত হইলে, শিক্ষার মূল সূত্র ধরিয়া culture বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে। আপাততঃ বাহিরের গোটা-কয়েক মোটা কথা বলিয়া রাখিলাম ; কেন না, অনুমানে বোধ হয় যে, লর্ড স্যাডলারের সিদ্ধান্ত অবলম্বনে ভারতের শিক্ষা-পদ্ধতির আংশিক পরিবর্তন ঘটান হইবে। কাজেই এই বিষয়টা এখন হইতে সাধারণের বোধগম্য করিয়া রাখিতে পারিলে, ভবিষ্যতে সুফল ফলিতে পারে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

স্বাস্থ্য-সমাচার। জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীযতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'শারীরিক পরিশ্রম ও স্বাস্থ্য' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলে বাঙ্গালী উপকৃত হইবেন। লেখক এই প্রবন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'—এই অমূল্য সত্য আমরা যেন কখনও বিস্মৃত না হই। জীর্ণ শীর্ণ আধারে আত্মার স্ফূর্তি হয় না। বর্তমান

কালের ভীষণ জীবন-যুদ্ধে 'বলহীন' কখনও বিজয় লাভ করিতে পারিবে না। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আত্মবলে বলী হইতে না পারিলে, কোনও জাতি মুক্তি লাভ করিতে পারে না। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—ইহা সকল ক্ষেত্রেই সত্য। অতএব শারীর-চর্চা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সমীচীন; প্রত্যেক বাঙ্গালীর পালনীয়। 'মক্ষিকা মানবের শত্রু' উল্লেখযোগ্য। 'স্বাস্থ্য-সমাচারে'র ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

দেবালয়। জ্যৈষ্ঠ।—প্রথমে জেনারল বুথের হাফটোন ছবি আছে। ছবিখানি মন্দ নহে। 'কাহার উপাসনা, ঈশ্বর না সোনা' তিন পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। লেখক বলেন,—'ধনের উপাসনা যদি করিতে হয়, তবে সরল ভাবে তাহাই কর।' উপসংহারে বলিয়াছেন,—'মাটির পুতুল অনেকে ভঙ্গ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার স্থানে সোনা রূপার পুতুল স্থাপন করিয়াছেন।' কাঞ্চন-পন্থী প্রাচীন ভারতে ছিল না। এই কুৎসিত আদর্শ প্রতীচী হইতে প্রাচ্যে আসিতেছে। ধর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও মনুষ্যত্ব হারাইয়া আমাদের সমাজ কাঞ্চনের ক্রীতদাস হইতেছে। বঙ্গের সাহিত্যও এখন কাঞ্চনের উপাসক। যাহারা কাঞ্চনই যাহাদের পরমার্থ, কাঞ্চনই যাহাদের ইষ্টদেবতা, দেশমাতৃকার উপাসনা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। স্বার্থসর্ব্বস্ব ভাক্তের মুখে মাতৃভক্তির খই ফুটিতে পারে, কিন্তু মা তাহাদের মৌখিক পূজা গ্রহণ করেন না; আন্তরিকতাই মাতৃপূজার প্রধান উপাদান। যে দেশে স্বর্ণ সন্তানকে ক্রয় করিতে পারে, সে দেশের ভবিষ্যৎ অতীব অন্ধকার।

> 'স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
> অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥'

যে দেশের আদর্শ ছিল, সে দেশের এ কি ভীষণ অধঃপাত! মা! আবার এই পুণ্যভূমির অধিবাসীদিগকে নিষ্কাম-ধর্ম্মের পথ—মুক্তির পথ দেখাইয়া দাও। ভারতবাসী আবার কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া জীবনের ব্রত পালন করিতে শিখুক,—মানব-জন্মের ফল-পরিশোধে সমর্থ হউক। শ্রীকালীচন্দ্র ঘোষালের 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অতীব সংক্ষিপ্ত।—'দেবালয়ে' ভাষার দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখ হয়। সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে একটু অবহিত হইলে ভাল হয়। 'কবিতা-গুচ্ছে'র পদগুলি কেন ছাপা হইল? এমনতর আবর্জ্জনা কি দেবালয়ে ছড়াইতে আছে?

সুপ্রভাত। জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীবিজয়ানন্দ রায় 'ভারতবর্ষের পথের দাবী' রচিয়াছেন। পথ বলিতেছে,—'আমারই বুকেতে দেখেছে কত যুগ, কত যুগ।'—তাহার পর বুদ্ধ হইতে মাইকেল পর্য্যন্ত যাঁহারা ভারতের বুকে চলিয়াছেন, তাহার একটি অসম্পূর্ণ ফর্দ্দ দিয়া ভারতবর্ষের পথ বলিতেছে,—'তবু আমি ওরে পথই আছি—আছি—আমি সেই পথ।' বাস্তবিক, দুঃখ হয় না কি? এত মহাজনের পদধূলি পড়িল, তবু পথ পবিত্র হইল না! কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভারতের বহু পথ কান্তারে, কৃষিক্ষেত্রে, তীর্থস্থানে,—সর্ব্বোপরি কলির বিরাট রাজার গোশালায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। তাহা কাহারও পায়ের ধূলায় ফল, বল

তুচ্ছ। মহাকালের স্পর্শে এইরূপ বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। অতএব পথের বিলাপ অহেতুক হইয়া উঠিয়াছে!—কবি-যশঃ-প্রার্থী ত্রিগুণানন্দ বাবু বিষয়-নির্ব্বাচনে পটুতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু রচনায় বিফল হইয়াছেন। এমন কি, ঐতিহাসিক ঘটনার নির্দ্দেশে পর্য্যায়ের ক্রমও তিনি রাখিতে পারেন নাই। কাঁচা হাতে তালিকা ও ফর্দ্দ যত্ন করা যায়; কবিতার প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা তত সহজ নহে। প্রতিভার অধিকারে চেষ্টার প্রবেশাধিকার নাই। স্বভাবসিদ্ধ শক্তির সাধ্য ত্রত আয়াস কখনও উৎপাদন করিতে পারে না। এ দেশের নবীন কবিযশঃপ্রার্থীরা এই সহজ সত্যটুকু ভুলিয়া যাইতেছেন। শ্রীমতী যামিনী সেন 'মহিলা-পরিষদে' যে পরামর্শ দিয়াছেন, আশা করি, তাহাতে সুফল ফলিবে। লেখিকা রূপক ও গল্পের সাহায্যে আপনার বক্তব্য বিশদ করিয়াছেন। ফলে শুষ্ক তথ্যগুলিও সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তিনি মহিলাদের লক্ষ্য করিয়া যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা এ দেশের পুরুষগণের পক্ষেও উপাদেয় ও চিন্তনীয় বলিয়া মনে করি। শ্রীমতী বিনোদিনী দেবীর 'ডেরাডুন-ভ্রমণ' সুখপাঠ্য।

বিজ্ঞান। ফেব্রুয়ারী—ঢাকার শ্রীঅমৃতলাল সরকার কর্তৃক সম্পাদিত। 'বিজ্ঞানে' নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হয়। আলোচ্য সংখ্যায় 'ভারতীয় কাগজ', '[illegible]-অধিকার-চ্যুত চীনবাসে', 'ডিমের ব্যবসা', 'কারবাইড', 'প্রাচীন সিংহলের লৌহ ও ইস্পাত', 'আফ্রিকাদেশের পিপীলিক' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। 'চানা' প্রবন্ধে কাজের কথা আছে। এ দেশের যুবক-সম্প্রদায় চাকরীর জন্য লালায়িত না হইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে চানা, মাখন প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়া জীবিকার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেশের দারিদ্র্য কমিতে পারে; উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ খাদ্য সুলভ ও সুপ্রাপ্য হইলে বাঙ্গালীর জীবনী-শক্তিও উপচিত হইতে পারে।—'বিজ্ঞানে'র ভাষা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হইলে আমরা আনন্দিত হইব। কাজের কথায় ভাষার আড়ম্বর সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়, তাহা সত্য। শব্দ-সমৃদ্ধি না থাকিলেও সহজ সরল শব্দের সাহায্যে ব্যক্ত হইলে বৈজ্ঞানিক সত্য অনায়াসে সুপ্রকাশ হয়, তাহাও আমরা স্বীকার করি। বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের রচনায় পারিভাষিক ও ভাব-প্রকাশের উপযোগী শব্দসম্ভারের অত্যন্ত অভাব, তাহাও আমরা জানি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় ভাব ও তথ্য সহজে ব্যক্ত হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে অপভাষার প্রয়োগ করিয়া কোনও লাভ নাই। বৈজ্ঞানিক রচনায় বাঙ্গালার পাঠক এখনও অনভ্যস্ত। ভাষার কদর্য্যতায় তাঁহারা বিমুখ না হন, তাহাও দ্রষ্টব্য। আমরা বৈজ্ঞানিক লেখকগণকে 'খোসা' লইয়াই ব্যস্ত হইতে বলি না। তাঁহারা 'শাঁসা'রই সন্ধান করুন।—আমাদের সবিনয় নিবেদন এই, যাঁহাদের জন্য লিখিতেছেন, প্রবন্ধগুলি যেন তাঁহাদের উপযোগী ও উপভোগ্য হয়।

অর্ঘ্য। জ্যৈষ্ঠ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসুর 'ভারত ও মিশর' এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য 'সাহিত্যে' ধারাবাহিক প্রবন্ধে মিশর ও ভারতের সমাজ, রাজতন্ত্র প্রভৃতির তুলনা করিয়াছিলেন। মিশর ও ভারতের প্রত্নতত্ত্ব এখন অনেক

তাহার সন্ধান করিতে হয়। লেখক ক্রমে ক্রমে রঙ্গমঞ্চ-সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিব। ইউরোপে রঙ্গালয় হেয় কি শ্রেয়, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমাদের রঙ্গমঞ্চ যাহাতে আমাদের শ্রেয় হইতে পারে, লেখক তুলনায় সমালোচনা করিয়া আমাদিগকে তাহার পথ নির্দ্দেশ করুন। কেবল শুচিতাই কোনও জাতিকে পবিত্র করিতে পারে না। শুচিতাই জাতীয় পবিত্রতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে; শুচিতাই তাহার প্রাণরক্ষা করে। সেই মাতৃ-ও-ধাত্রী-শক্তির স্বরূপ যদি নির্ণীত হয়, আমরা লেখকের নিকট কৃতজ্ঞ হইব।

মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ।

মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন প্রকাশিত হইবার পর আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। "জনৈক কায়স্থ" আপন নাম অপ্রকাশিত রাখিয়া, "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় একটি আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে,—শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের ইছাই গোয়াল এবং তাম্রশাসনের ঈশ্বর ঘোষ অভিন্ন ব্যক্তি হইবার পক্ষে বাধা কি? শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত পাঁচালী গ্রন্থ। যদিও কেহ কেহ তাহাকে ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তথাপি তাহার আদৌ ঐতিহাসিক মূল্য আছে কি না, জানি না। তাহাতে যে ইছাই গোয়ালার আখ্যায়িকা আছে, সেই ইছাই ঘোষের পিতা সোমঘোষ। পদোন্নতিলাভের পূর্ব্বে রাজকর-পরিশোধে অসমর্থ হইয়া, রাজপুরুষগণের নিকট লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। তাম্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষ রাজবংশ-প্রসূত,—ধবল ঘোষের পুত্র, এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ এক সময়ে 'রাঢ়াধিপ' ছিলেন। সুতরাং ইছাই ঘোষকে এবং ঈশ্বর ঘোষকে এক ব্যক্তি বলিতে হইলে, এই সকল অসামঞ্জস্যের কথা বিস্মৃত হইতে হইবে, অথবা সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহারা শ্রীধর্ম্মমঙ্গলকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সহিত তর্ক চলিতে পারে না। বিশ্বাসে 'কৃষ্ণ' মিলে; ইতিহাসের সহিত তাহার কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না, জানি না। যাহা হউক, ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের পাঠমুদ্রাঙ্কনসময়ে, প্রুফ হারাইয়া, মুদ্রাকর অনেকগুলি ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন। নিম্নে

কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। সহৃদয় পাঠক তজ্জন্য ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না; ইহাই প্রার্থনা।

পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	বৈরিবর্গঃ	বৈরিবর্গ্গঃ
৯	শৌর্য্যা	শৌর্য্য
১২	রাজণ্যক	রাজন্যক
১৫	মহাঠকুর	মহাকটকঠকুর
১৯	শাস্তকিক	সান্ধিক
"	গৌল্মিক গৌল্মিক	গৌল্মিক শৌল্কিক
২৫	ট্টঃ	ট্টঃ সতক × অকলাভাবা
২৬	সমবুর্ধিত	বারিকাদি সমবুর্ধিত
৩৭	স্বর্গগামিনৌ	স্বর্গ্গগামিনৌ
৩৯	স্বর্গে	স্বর্গ্গে
৪১	মহামহীভুজাং	মহীং মহীভুজাং
"	দা ভ্রু্যোস্তপালনং	দানচ্ছে্যোস্তপালনং
৪৪	ধর্ম্মসেতু নৃপানা'	ধর্ম্মসেতুনৃপানাং

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

গ্রন্থ-পরিচয়।

ঢাকার ইতিহাস।

ঢাকার ইতিহাস শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত। আমরা এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি; এই খণ্ড ৫৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে ঢাকা জেলার (১) উচ্চ-উৎস নদ নদী, (২) নদনদীর গতি-পরিবর্ত্তনে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ও তাহার কারণনির্দ্দেশ, (৩) খাল, বিল ও ঝিল, প্রসিদ্ধ বন্দর ও বন, (৪) কৃষি, ফসল, উদ্ভিজ্জ, (৫) মৎস্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি (৬) বিবিধ শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, (৭) বাণিজ্য, বন্দর, মেলা, (৮) সাধারণ স্বাস্থ্য ও জলবায়ু, (৯) প্রাকৃতিক বিপ্লব, (১০) তীর্থস্থান, প্রাচীনকীর্ত্তি, প্রাচীন দেবমন্দির ও বিগ্রহাদিযুক্ত পল্লী, ঐতিহাসিক স্থান, প্রশস্তিপত্রিকা, প্রাচীন দীঘীসমূহের বিবরণ প্রভৃতি বহুবিধ প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হইয়াছে; এই পুস্তকে তিনখানি জেলার মানচিত্রের প্রতিলিপি ও ৪১ খানি সুন্দর হাফটোন ছবি আছে। ছবিগুলির মধ্যে আমরপুরের

চেতা, ধামরাই এর যশোমাধব, ঢাকেশ্বরীর মন্দির, রমনার মাঠ, রাজবাড়ীর মঠ, তালতলার পুল, রাজবল্লভের একুশ-রত্ন, ঢাকার জন্মাষ্টমীর চৌকী প্রভৃতি কয়েকখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই ইতিহাসখানির আস্তত বিবিধ মূল্যবান্ উপকরণে পূর্ণ। গ্রন্থকার সকল-ত্রই যে মৌলিক তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু তিনি আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, ঢাকা সম্বন্ধে আর কোনও বঙ্গীয় ঐতিহাসিক এ পর্যন্ত তাহা দিতে পারেন নাই। তবে দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা তাঁহার গুণপণার পরিচয় পাইব, এইরূপ আশা করিতেছি। এই উপকরণরাশি অনেকটা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে। উদাহরণ-স্থলে বলা যাইতে পারে, অনেক মেলা, প্রাচীন উৎসব ও বিগ্রহাদির কথা আমরা পাইতেছি, অনেক শিল্প, ভাস্কর্য ও ঐতিহাসিক প্রবাদ উল্লিখিত হইয়াছে। লতা যেরূপ কোনও পাদপের আশ্রয় লাভ করিয়া ফলফুলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ প্রাচীন কীর্ত্তিগুলিও বিশেষ বিশেষ নৃপতির সাহায্য অবলম্বন করিয়া শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। রাজ-অন্তঃপুরের অবরোধ-ক্লান্ত মহিলাগণের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া, কোন্ কোন্ রাজা কার্ত্তিকবারুণী ও লাঙ্গলবন্ধ প্রভৃতি বঙ্গবিখ্যাত মেলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং কোন্ নৃপতির প্রিয় মহিষীর কোমলকরদ্বয় সুশোভিত করিবার জন্য ঢাকার শাঁখারীরা এইরূপ শাঁখ গড়িতে শিখিয়াছিল, এবং সেই কমকণ্ঠ ও ভুজবল্লী বিভূষিত করিবার সঙ্কল্পে তথাকার সেকরা ঐরূপ বিচিত্র ভূষণরাশি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিকের আলোচ্য বিষয়। এই সমস্ত উৎকৃষ্ট শিল্প, ভাস্কর্য, মন্দির ও বিগ্রহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় রাজশক্তির সহায়তা নিশ্চয়ই কার্য্য করিয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগে আমরা শুধু উপকরণে পরিতৃপ্ত হইব না। এই সমস্ত খড়, কুটা, মাল মশলা দিয়া বঙ্গলক্ষ্মীর প্রতিমা গড়িতে হইবে। এই কার্য্য অতিগুরুতর, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভক্ত ও প্রেমিকের নীরব সাধনায় দেবী হয়ত তাঁহার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া সেবকের নিকট স্বীয় তথ্য প্রকাশিত করিবেন। ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ঢাকার শঙ্খবণিকগণ জানেন, তাঁহারা রাম-পাল হইতে আসিয়াছিলেন। সেনবংশীয় রাজলক্ষ্মী মোগলদের বাহু আশ্রয় করিয়া জাহাঙ্গীর-নগরকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য্যের অস্তোন্মুখ কিরণ নবোদিত ঢাকার ললাটে আসিয়া পড়িয়াছিল। যতীন বাবু লিখেন নাই, কিন্তু আমরা জানি, তাঁহার উল্লিখিত পংক্তিখানি নদীর পূর্ব্ব-নাম 'কানাই' ছিল। কানাই ও বলাই, ধলেশ্বরীর এই দুই পুত্রের প্রথমটি কোন্ অভিসম্পাতে বুড়ীগঙ্গা নামে পরিচিত হইল, তাহার অনুমান করিতে হইবে। মুসলমানী নাম পরিগ্রহ করিয়া অনেক প্রাচীন হিন্দুপল্লী বাঙ্গালী উপ-দ্রবে উপবীত-বিচ্যুত বৈষ্ণবের ন্যায় ছদ্মবেশে আত্মরক্ষা করিয়া রহিয়াছে। ইহাদের ধারাবাহিক বিবরণ-সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিত। এখনকার রাজনৈতিক সুবিধা অনুসারে যেরূপ প্রদেশ-বিভাগ হইয়াছে, তাহাতে ঢাকার যথাযথ তথ্যের নিরূপণ করা সহজ নহে। ফরিদপুরের অনেকাংশ জুড়িয়া বিক্রমপুরে যে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত ছিল, তাহার একাংশের কথা বিচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থকার কিরূপে কহিবেন? পুস্তকের নাম 'পূর্ব্ববঙ্গ' লিখিয়া

সাগরিকা।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

কলিঙ্গ-কাহিনী।

কলিঙ্গের ইতিহাস যথাযোগ্যভাবে সঙ্কলিত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু জানিতে পারা গিয়াছে, তাহার সাহায্যে ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। তাহা কলিঙ্গ-কাহিনীর উপাদান-মাত্র। অশোক-শাসন-সময় হইতে তাহার আরম্ভ। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলীর সমসাময়িক প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

বিন্দুসারের পুত্র রাজাধিরাজ অশোক বিশ্ববিখ্যাত। তিনি অভিষিক্ত হইবার আট বৎসর পরে, কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। তোষালী নামক স্থানে কলিঙ্গের এক প্রাদেশিক রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় কলিঙ্গ প্রদেশেও অশোকের উদার শাসন-নীতি প্রচারিত হইয়াছিল। গিরিলিপিতে এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১)

অশোক কোন পথে কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা অপরিজ্ঞাত। কোন্ কোন্ স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও অপরিজ্ঞাত। যুদ্ধের ফল কি হইয়াছিল, তাহাই কেবল গিরিলিপিতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল; এবং তাহাই চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাহা এক লোমহর্ষণ ব্যাপার।

কলিঙ্গ সহজে বা সহসা পরাজয় স্বীকার করে নাই। বসুন্ধরা নর-শোণিতে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল;—হতাহতের সংখ্যা গণনার অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল;—অশোক অসাধারণ অধ্যবসায়ে এক মহাশ্মশানের উপর বিজয়-পতাকা সংস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কলিঙ্গ যে ভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল, সে পরাজয়-কাহিনী বহু বিজয়-কাহিনীর

---

(১) ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লেফ্টেনাণ্ট কিট্টো কর্ত্তৃক ধৌলির গিরিলিপি আবিষ্কৃত হয়। ডাক্তার বুলর যে পাঠ Reports of the Archæological Survey of Southern India, Vol. I (1887) গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাই বিশুদ্ধ পাঠ বলিয়া পরিচিত।

তুলনায় অধিক গৌরবের সঙ্গে ইতিহাসে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য কলিঙ্গের অধিবাসিগণ, অশোকের ন্যায় প্রবল প্রতাপশালী ভারত-সম্রাটের গতিরোধ করিতে গিয়া, যেরূপ অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল, (২) তাহাতে [অন্যের কথা দূরে থাকুক] বিজেতার শরীরও শিহরিয়া উঠিয়াছিল,—হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল,—বিজয়োল্লাস গভীর অনুশোচনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

অশোক ইহার যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে এক অনন্যসাধারণ সাধু দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া, তিনি চিরজীবনের জন্য শোণিতাক্ত শাণিত খরসান কোষবদ্ধ করিয়াছিলেন,—সুশাসন-বিতরণের জন্য প্রেমের দিগ্বিজয় বিঘোষিত করিয়াছিলেন। তাহার সুসমাচার গিরিলিপিতে উৎকীর্ণ করাইয়া, রণবীর ধর্ম্মবীর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন;—ভারতবর্ষে এক ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে গিরিলিপি রাজলিপি হইলেও দেবলিপি,—দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার প্রাণস্পর্শী ধর্ম্মলিপি। রণতৃষ্ণ মানব-হৃদয় তাহার প্রকৃত মর্য্যাদার উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু মানব-সমাজ যখনই হিংসাদ্বেষে জর্জ্জরিত হইবে, এবং শোণিতপাতে শিহরিয়া উঠিবে,—মানব-সভ্যতার মানব-পরিণামে রণকাণ্ডের জন্যও অনুশোচনায় মর্ম্মাহত হইবে,—তখনই অক্ষরে অক্ষরে তাহার মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারিবে।

অশোকের কলিঙ্গ-বিজয় মানব-সমাজে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। প্রেমের শাসন, পুণ্যের শাসন, করুণার শাসন, সমবেদনার শাসন, ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া, দিগ্দিগন্তে প্রচারিত হইয়াছিল; প্রত্যন্ত নরপালগণের সুদূর সাম্রাজ্য-সীমা পর্য্যন্ত সমগ্র জীবজগতে শান্তির সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহার সহিত কলিঙ্গ-বিজয়ের সম্পর্ক থাকায়, কলিঙ্গের নামও প্রসঙ্গক্রমে জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

অশোক-বিজিত কলিঙ্গ দেশ কোথায় ছিল, তাহা কিন্তু অতীতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তোষালী নগরী কোথায় সংস্থাপিত

---

(২) 15,0000 persons were carried away captive, 100,000 were slain, and Many times that number perished.—Rock Edict XIII.

হইয়াছিল, তাহারও স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কখনও কখনও তাহার তথ্যানুসন্ধানের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া থাকে; কিন্তু এখনও তাহার আবিষ্কার-সাধনের জন্য খনন-কার্য্যের সূত্রপাত হয় নাই। আধুনিক ওড়িষার অন্তর্গত ভুবনেশ্বর তীর্থক্ষেত্রের চারি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে,—বর্ত্তমান দয়া নদীর দক্ষিণতীরে,—ধৌলি নামে পরিচিত ক্ষুদ্র পল্লীর পার্শ্ব-দেশে, ধবল গিরির মসৃণীকৃত শৈলকলেবরে, অশোকের কলিঙ্গ-শাসন-লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তোষালী তাহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া থাকিবে বলিয়া, অনেকে অনুমান করিয়া আসিতেছেন। (৩)

উৎকল যে অশোক-বিজিত কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহাতে সংশয়-প্রকাশের উপায় নাই। দক্ষিণে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহার অধিকার বিস্তৃত ছিল। চিল্কা-হ্রদের দক্ষিণে, মান্দ্রাজ প্রদেশের গঞ্জাম জেলায়, যৌগাডা-পর্ব্বতগাত্রের অশোক-লিপি তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু উত্তরে কলিঙ্গ-রাজ্যের সীমা কোন্ স্থানে বর্ত্তমান ছিল, তাহার কোনরূপ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না।

কতকগুলি কারণে মনে হয়, তৎকালে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ হয় ত একটি যুক্ত-রাজ্যরূপে পরিচিত ছিল। তজ্জন্য অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের কথাই উল্লিখিত আছে, প্রয়োজনাভাবে অঙ্গ বঙ্গ-বিজয়ের কথা উল্লিখিত নাই। "গৌড়রাজমালা"র লেখক এইরূপ একটি সিদ্ধান্তেরই অবতারণা করিয়াছেন। (৪) অশোক-শাসনের অধীন হইয়া, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ এক অখণ্ড শাসন-শৃঙ্খলার অন্তর্গত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বাবস্থা কিরূপ ছিল? সে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত অধিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই।

অশোকের পিতৃ-পিতামহের শাসন-সময়ে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের অবস্থা কিরূপ ছিল, গ্রীক সাহিত্যে তাহার যৎসামান্য আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যৎসামান্য হইলেও, বর্ত্তমান অবস্থায়, তাহা একেবারে উপেক্ষিত হইতে পারে না। কারণ, তাহা পরবর্ত্তী বিদেশীয় লেখকগণের গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে। মেগাস্থিনিসের বর্ণনার অনুসরণ করিয়া, প্লিনি লিখিয়া

(৩) Bengal District Gazetteers. PURI. PP. 249-250.

(৪) গৌড়রাজমালা; ২-৩ পৃষ্ঠা

গিয়াছেন,—"গঙ্গা নদীর শেষভাগ গঙ্গারিডি-কলিঙ্গি রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত।" (৫) ইহাতে আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, তৎকালে গঙ্গা সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত [বঙ্গভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ] কলিঙ্গ-নামে, এবং "গঙ্গারিডি-কলিঙ্গি" একটি যুক্তরাজ্যরূপে পরিচিত না থাকিলে, এরূপ জনশ্রুতি বিদেশীয় লেখকগণের গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হইত না। ত্রি-কলিঙ্গের জনশ্রুতির সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য থাকায়, ইহাকে অমূলক কল্পনামাত্র বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

অশোকের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিশ্ব-বিখ্যাত বিপুল সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইবার পর, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ হয় ত আবার স্বাতন্ত্র্য-লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কারণ, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবার এক প্রবল নরপালের কীর্ত্তিকলাপ উৎকলের পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই নরপতির নাম মহামেঘবাহন খারবেল। তাঁহার গিরি-লিপি খণ্ডগিরির হস্তিগুম্ফা নামক সুপরিচিত গহ্বরদ্বারশীর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। (৬)

খারবেলের অন্য কোনও পরিচয় এ পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। এই গিরিলিপি তাঁহার অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ হইলেও, ইহাতে তাঁহার অনেক বিবরণ উৎকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তিনি জৈনধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। অশোকের ন্যায় তিনিও ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গিরিলিপিতে তিনি "ক্ষেমরাজ" বলিয়া উল্লিখিত।

খারবেল কৌমার-দশায় [পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে] যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, নয় বৎসর পরে [চতুর্বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমে] সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে রাজবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা কলিঙ্গ-রাজবংশ। তিনি তাহার তৃতীয় রাজা বলিয়া উল্লিখিত। তাঁহার রাজধানী কলিঙ্গনগরী নামে পরিচিত ছিল। খারবেলের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে তাহা ধ্বংসদশায় নিপতিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বিজয়রাজ্যের

(৫) গৌড়রাজমালা; ২ পৃষ্ঠা টীকা।

(৬) ডাক্তার লুডার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত এই গিরিলিপির পাঠ Epigraphia Indica Vol x. pp. 160-161 দ্রষ্টব্য। ডাক্তার ভগবানলাল ইন্দ্রজী ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন।
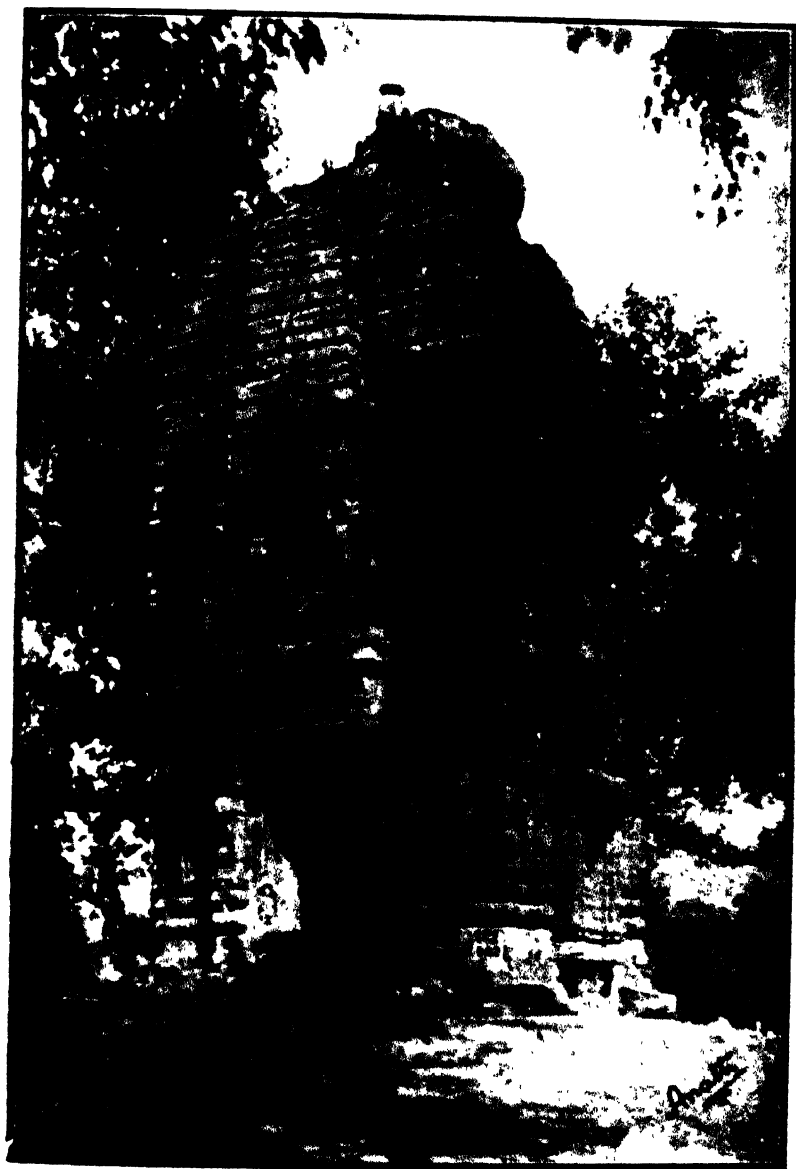
মুর্শিদাবাদের গোপেশ্বর মন্দির

প্রথম বৎসরেই রাজধানীর জীর্ণসংস্কার করিয়াছিলেন। সে কলিঙ্গনগরী কোথায় ছিল, এখনও তাহার তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত হয় নাই। খণ্ডাচল ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে জৈন প্রভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তজ্জন্য, কেহ কেহ অনুমানমূলে ভুবনেশ্বরকেই খারবেলের কলিঙ্গনগরী বলিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন।

খারবেল কলিঙ্গ লইয়াই পরিতৃপ্ত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। গিরিলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—তদীয় বিজয়রাজ্যের দ্বিতীয় বৎসরে, তিনি পশ্চিমাভিমুখে বিজয়যাত্রা করিয়াছিলেন; চতুর্থ বৎসরে "রাষ্ট্রীকগণে"র আনুগত্য লাভ করিয়া, তিনি উত্তরকালে মগধ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই দিগ্বিজয়ী নরপাল কি কলিঙ্গ-সীমা-সংলগ্ন বঙ্গভূমির প্রতি উদাসীন ছিলেন? তৎকালে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ যুক্তরাজ্যরূপে বর্ত্তমান থাকিলে, "রাষ্ট্রীকগণে"র আনুগত্যে অঙ্গ-বঙ্গেও তাঁহার প্রভাব স্বীকৃত হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু অঙ্গ-বঙ্গে ইঁহার জনশ্রুতি বর্ত্তমান নাই। পক্ষান্তরে, কলিঙ্গে যে জৈনপ্রভাবের কীর্ত্তিচিহ্নের অপ্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, অঙ্গ-বঙ্গে তাহার নানা নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে। খারবেলের শাসন-সময় অশোকের পরবর্ত্তী কি না, তদ্বিষয়ে কেহ কেহ সংশয়প্রকাশ করিলেও, অধিকাংশ পণ্ডিত খারবেলকে অশোকের পরবর্ত্তী বলিয়াই অনুমান করিয়া আসিতেছেন।

খারবেলের বিজয়রাজ্যের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহার সন্ধানলাভের উপায় নাই। তাঁহার শাসন-সময়ের কলিঙ্গ শৌর্য্যে ও বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে ও কলানৈপুণ্যে সমুন্নত ছিল; গুহাবলীর মধ্যে এখনও তাহার স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার কলিঙ্গরাজ্য হয় ত কালক্রমে আবার স্বাতন্ত্র্যবিচ্যুত হইয়া, অন্য কোনও প্রবল সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে, অন্ধ্রু রাজগণের আশ্রয়ে, নাগার্জ্জুন মহাযান-বৌদ্ধমতের প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ওড়িষায় বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল। তিব্বতীয় বৌদ্ধ-সাহিত্য-নিহিত এইরূপ একটি জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, কেহ কেহ মনে করেন, তৎকালের কলিঙ্গরাজ্য অন্ধ্রু সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং অঙ্গ-বঙ্গেও তাহার প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই সাম্রাজ্যের পরিণামই বা কি হইয়াছিল, তাহাও অন্ধকারে বিলীন হইয়া রহিয়াছে!

অন্ধকারের মধ্যে একখানিমাত্র শিলালিপির আকস্মিক আলোকপাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কলিঙ্গ কিয়ৎকালের জন্য গৌড়াধিপ শশাঙ্কের করতলগত হইয়াছিল। তখনও ইতিহাস-বিখ্যাত পালরাজগণের গৌড়ীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হয় নাই। তখনও প্রাচ্য-ভারতের ইতিহাসের মধ্যযুগের উষাকাল;—উষার অরুণ-কিরণের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল আশার অমৃতকিরণে প্রাচ্যভারত নবজাগরণের আয়োজন করিতে ব্যাপৃত হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের ছত্রভঙ্গ অবস্থায় কান্যকুব্জে ও বঙ্গদেশে এক উচ্চাভিলাষ যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাহা আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের প্রশংসনীয় উচ্চাভিলাষ, কিন্তু পরিণামের পরিচয় অনুসারে তাহা এখন স্বপ্ন বলিয়াই অভিহিত। শশাঙ্কের স্বপ্ন সফল হয় নাই; কেবল অল্পকালের জন্য হর্ষবর্দ্ধনের স্বপ্ন সফল হইয়াছিল,—শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণের নাম ডুবিয়া গিয়াছিল, হর্ষবর্দ্ধনের কান্যকুব্জের নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছিল। এই সময়ে চীন দেশের সুবিখ্যাত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ইয়ন্-চুয়ঙ্ ভারত-ভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার জীবন-কাহিনী ও ভ্রমণকাহিনী এই সময়ের একখানি চিত্রপট অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে,—বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুরাগের তুলিকাপাতে তাহাতে বৌদ্ধগৌরব কিছু উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইলেও, সমসাময়িক বিবিধ ব্যাপারও তাহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। প্রাচ্যভারত যে তৎকালে জ্ঞানে ধর্ম্মে শিল্পে বাণিজ্যে একটি সমুন্নত প্রদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়,—অর্জ্জুনের তীর্থযাত্রাকালে কলিঙ্গে দেবায়তনের অভাব ছিল না। অশোকের শাসন সময়েও অশোক-সাম্রাজ্যের সকল স্থানেই অসংখ্য "ধর্ম্মরাজিকা" নির্ম্মিত হইয়াছিল। খারবেল তাঁহার বিজয়-রাজ্যের চতুর্থ সংবৎসরে পূর্ব্বতন কলিঙ্গাধিপতিগণের আরাধ্য দেবায়তনের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইয়ন্-চুয়ঙ্ অনেক বৌদ্ধমন্দির ও দেবমন্দির দর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি এখন আর কলিঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করে না। এখন পর্ব্বতাচলের গিরিগুহাবলীই কলিঙ্গের প্রাচীন যুগের প্রধান কীর্ত্তিচিহ্ন। তদ্ভিন্ন যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই মধ্যযুগের রচনারীতির পরিচয় প্রদান করে। যাহা কলিঙ্গে উদ্ভাবিত প্রাদেশিক শিল্পরীতি বলিয়া কথিত হইতে পারে, এমন নিদর্শন কোনও স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

এরূপ একটি প্রাদেশিক শিল্পরীতি উদ্ভাবিত হইতে পারিত, সেরূপ সম্ভাবনাও কলিঙ্গের ইতিহাসে অপরিচিত। যাহা উৎকল-শিল্পরীতি নামে কথিত হইতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে কোন্ শিল্পরীতি, ইতিহাসকেই তাহার একমাত্র মীমাংসক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা মধ্যযুগের কীর্ত্তিচিহ্ন। সুতরাং কলিঙ্গের মধ্যযুগের ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধান আবশ্যক।

হর্ষবর্দ্ধনের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাম্রাজ্য-স্বপ্নও তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল! আর্য্যাবর্ত্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ আবার স্ব স্ব স্বয়ং হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে প্রাচ্য ভারতে "মাৎস্যন্যায়" পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত হইয়াছিল; কেহ কাহাকেও মানিত না;—কেহ কাহাকেও ছাড়িত না,—বাহুবলই সকল তর্কের মীমাংসাসাধন করিত! অশোকের ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন-চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছিল;—পরম্পরাগত শিক্ষা দীক্ষা বিফল হইয়া গিয়াছিল;—জনসমাজের নিকট পরলোক অপরিজ্ঞাত দূরবর্ত্তী সংশয়পূর্ণ প্রহেলিকারূপে প্রতিভাত হইয়াছিল;—ইহলোকের করতলগত সুখসৌভাগ্যসম্ভোগই সকল নরনারীর লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল! ইহার প্রভাবে আর্য্যাবর্ত্ত অবসন্ন, পূর্ব্বকীর্ত্তিকলাপ জরাজীর্ণ, এবং প্রাচ্যভারত এক প্রচণ্ড তাণ্ডবে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু প্রাচ্যভারত হইতেই এক নবশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার প্রভাবে, আবার এক সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের সূত্রপাত হইয়াছিল। তাহার বিস্তৃত বিবরণ "গৌড়রাজমালা"য় দ্রষ্টব্য। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—প্রাচ্যভারতে যে স্বাতন্ত্র্যলিপ্সা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা শিল্পে, সাহিত্যে, লোকাচারে, ধর্ম্মাচরণেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাহার প্রভাব প্রাচ্যভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে অভিব্যক্ত! তাহার সহিত বাঙ্গালীর ইতিহাস এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে।

প্রাচ্যভারতের এই প্রবল সাম্রাজ্যের নাম গৌড়ীয় সাম্রাজ্য। তাহার প্রথম সম্রাট্ ইতিহাসে প্রথম গোপালদেব নামে পরিচিত। প্রকৃতিপুঞ্জ "মাৎস্যন্যায়" দূরীভূত করিবার জন্য তাঁহাকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছিল। তিনিও করুণারসোদ্ভাসিতবক্ষে প্রজাবর্গের মিত্রতা ধারণ করিয়া, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ স্বেচ্ছাচারিগণের পরাক্রমসঞ্জাত মাৎস্য-ন্যায়ের প্রভাব পরাভূত করিয়া, শান্তি-সংস্থাপনে

কৃতকার্য্য হইয়া, উত্তরকালে চিরকৃতজ্ঞ জনসমাজের নিকট বোধিসত্ত্ব লোকনাথের অবতাররূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী ধর্ম্মপালদেবের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—পূর্ণিমারজনীর দিঙ্‌মণ্ডলপ্রধাবিত জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই গোপালদেবের স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত।

এই রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব দিগ্বিজয় সাধন করিয়া, সকল উত্তরাপথে সার্ব্বভৌমশ্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন। যাহা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আবার এক অখণ্ড শাসনশৃঙ্খলার অধীনে আনীত হইয়াছিল,—প্রাচ্য ভারত আবার শৌর্য্যে, বীর্য্যে, জ্ঞানগাম্ভীর্য্যে, শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

ধর্ম্মপালদেবের পুত্র দেবপালদেবের [মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনের সপ্তম শ্লোকে (৭) দেখিতে পাওয়া যায়,—ধর্ম্মপালদেবের বিজয়-বাহিনী কেদারে, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে এবং গোকর্ণাদি তীর্থে, [দুষ্ট দমন উপলক্ষে] ধর্ম্মাকর্ম্মের অনুষ্ঠানের অবসরলাভ করিয়া, ইহলৌকিক সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারলৌকিক সিদ্ধিও করগত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যথা,—

> কেদারে বিধিনোপযুক্তপয়সাং গঙ্গাসমেতাম্বুধৌ
> গোকর্ণাদিষু চাপ্যনুষ্ঠিতবতাং তীর্থেষু ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ
> ভৃত্যানাং সুখমেব যস্য সকলানুদ্ধৃত্য দুষ্টানিমান্
> লোকান্ সাধয়তোহনুষঙ্গজনিতা সিদ্ধিঃ পরত্রাপ্যভূৎ।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায়, পরলোকগত সুপণ্ডিত অধ্যাপক কিলহর্ণ গোকর্ণকে বোম্বাই-প্রদেশের সুপরিচিত তীর্থক্ষেত্র বলিয়া সূচিত করিয়া গিয়াছেন। (৮) বোম্বাই-প্রদেশে গৌড়ীয় বিজয়-বাহিনীর দিগ্বিজয় কাহিনী অপরিচিত; এ দেশে তাহার স্মৃতিচিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি, অধ্যাপক কিলহর্ণের ব্যাখ্যা-প্রভাবে, "গৌড়লেখমালা"-সম্পাদন-সময়ে, গোকর্ণ-সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভূত হয়

(৭) গৌড়লেখমালা ; ৩৬ পৃষ্ঠা।

(৮) Indian Antiquary. Vol XXI. P.P. 254-257.

নাই। "গৌড়লেখমালা" প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই, তাহার তথ্যানুসন্ধানের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সুযোগে, [কলিঙ্গ-ভ্রমণে ব্যাপৃত হইয়া] জানিতে পারা গিয়াছে,—ধর্ম্মপালদেবের বিজয়-বাহিনী যে গোকর্ণতীর্থে উপনীত হইয়াছিল, তাহা বোম্বাই-প্রদেশের অন্তর্গত নহে,—কলিঙ্গের অন্তর্গত,—মহেন্দ্রাচলের শিখরদেশে অবস্থিত! সুতরাং ধর্ম্মপালদেব উৎকল অতিক্রম করিয়া, আধুনিক কলিঙ্গের শেষ-সীমা পর্য্যন্ত "দুষ্টদমন" করিয়াছেন বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

তৎকালে উৎকলে বা কলিঙ্গে কোন্ কোন্ নরপতি বিদ্যমান ছিলেন, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহারা ছিলেন, তাঁহারা হয় ত প্রজাপালক নামে কথিত হইবার যোগ্য ছিলেন না বলিয়াই, অবজ্ঞাসূচক "দুষ্টান্" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। ইহাতে মনে হয়,—তৎকালে অঙ্গ-বঙ্গের ন্যায় কলিঙ্গেও "মাৎস্যন্যায়" প্রচলিত ছিল। তারানাথের গ্রন্থেও (৯) সেইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম্মপালদেব তাহা দূরীভূত করিয়া সকল কলিঙ্গেই সুশাসন সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

এইরূপে অঙ্গ-বঙ্গের সঙ্গে কলিঙ্গের যে সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত, নানা বিপ্লবের মধ্যেও, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের উন্নতিসাধন করিয়াছিল। ধর্ম্মপালের তিরোভাবের পর, উৎকল একবার স্বাতন্ত্র্য-অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছিল, সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ধর্ম্মপালদেবের পুত্র দেবপালদেবও দিগ্বিজয়ী ছিলেন; তাঁহার বীর ভ্রাতা বিজয়ী জয়পাল বসুন্ধরাকে "একাতপত্রা" করিয়াছিলেন। নারায়ণপাল-দেবের ভাগলপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনের ষষ্ঠ শ্লোকে (১০) দেখিতে পাওয়া যায়,—জয়পালের নামমাত্র শ্রবণ করিয়াই, উৎকলাধীশ অবসন্ন হইয়া রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া, পলায়নপর হইয়াছিলেন। যথা,—

> যস্মিন্ ভ্রাতুর্নিদেশাদ্বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ
> সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাদুৎকলানামধীশঃ।

---

(৯) Cunninghams' Archæological Survey Reports; Vol. XV. P. 148.

(১০) গৌড়লেখমালা; ৫৮ পৃষ্ঠা।

ভট্ট গুরবের গরুড়স্তম্ভ-লিপিতেও ইহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে,—দেবপালদেব "উৎকল-কুলকে উৎকিলিত করিয়াছিলেন।" ধর্ম্মপালদেবের ও দেবপালদেবের প্রায় শতবর্ষব্যাপী শাসনকাল গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গৌরবের কাল। তৎকালেই প্রাচ্য ভারতে শিক্ষা দীক্ষা কলাকৌশল নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই দুই নরপালের সুদীর্ঘ শাসনকালে উৎকলে বা কলিঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বর্ত্তমান থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না;—স্বাতন্ত্র্যের সামান্য সূচনাও দণ্ডনীতি-প্রভাবে দূরীকৃত হইত। তজ্জন্য এই সময়ে কোনও উৎকলাধীশের বা কলিঙ্গাধিপতির নামের বা কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

এই যুগের কলিঙ্গের কথা অঙ্গ-বঙ্গ-কথার সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। গুর্জ্জর-কথার সঙ্গেও তাহার কিছু সম্বন্ধ ছিল। বৎসরাজপুত্র দ্বিতীয় নাগভটের কৌমারকালের প্রতাপাগ্নিতে কলিঙ্গাধিপতির পতঙ্গবৎ পতিত হইবার এক কাহিনী নাগভটের পৌত্র মিহির ভোজের গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত আছে। (১১) কিন্তু বরেন্দ্রভূমির গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—গৌড়েশ্বর [দেবপালদেব] "দুর্ব্বিড়-গুর্জ্জর নাথ-দর্প খর্ব্বীকৃত" করিয়া, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রমেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবপালদেবের তাম্রশাসনেও (১২) দেখিতে পাওয়া যায়,—এক দিকে হিমালয়, অপর দিকে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিচিহ্ন সেতুবন্ধ;—এক দিকে বরুণ-নিকেতন, অপর দিকে লক্ষ্মীর জন্ম-নিকেতন,—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল সেই রাজা নিঃসপত্নভাবে উপভোগ করিয়াছিলেন। যথা,—

> "আগঙ্গা-গম-মহিতাৎ সপত্নশূন্যা
> মাসেতোঃ প্রথিত-দশাস্য-কেতু-কীর্ত্তেঃ
> উর্ব্বী মাবরুণ-নিকেতনাচ্চ সিন্ধো
> রালক্ষ্মীকুলভবনাচ্চ যো বুভোজ।"

এরূপ অবস্থায় নাগভটের কৌমারকালের প্রতাপবহ্নি যে অধিক দিন প্রজ্বলিত থাকিতে পারিয়াছিল, তাহার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়

(১১) গৌড়রাজমালা; ২৫ পৃষ্ঠা।

(১২) গৌড়লেখমালা; ৩৮ পৃষ্ঠা।

না। কলিঙ্গ অঙ্গ-বঙ্গেরই কণ্ঠলগ্ন ছিল; গৌড়েশ্বরগণের প্রবলপ্রতাপ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে তুল্যভাবেই বর্ত্তমান ছিল; এবং অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ তুল্যভাবেই এই গৌরবযুগের শিক্ষাদীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ভাষায়, সাহিত্যে, শিল্পে তাহার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; কলিঙ্গের শেষ সীমা পর্য্যন্ত এখনও বাণিজ্যকুশল গৌড়ীয় বৈশ্যগণের বংশধরগণ পূর্ব্বস্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিতেছে।

বাঙ্গালীর কলিঙ্গ-বিজয়ের জনশ্রুতি বঙ্গদেশে একেবারে অপরিচিত ছিল না। তাহা এক সময়ে পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত। ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের লাউসেনের আখ্যায়িকায় তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের রাজ্যসীমা চিরদিন এক স্থানে সংস্থাপিত ছিল না। কালক্রমে পশ্চিমাঞ্চলে সে সীমা অনেক দূর সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। বরেন্দ্রভূমিও কখনও কখনও কিয়ৎকালের জন্য পালরাজগণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে পালরাজগণের অধিকারে দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণাবস্থায় বর্ত্তমান ছিল, কলিঙ্গের সঙ্গেও পুরাতন সম্পর্ক সহসা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই।

গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের শাসন-শক্তি কিছু শিথিল হইলে, ওড়িষায় কেশরী রাজগণের কীর্ত্তিকলাপ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মতে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষপাদ হইতে ইহার আরম্ভ। কিন্তু কোনও কোনও মনীষী কেশরী রাজবংশের অস্তিত্বমাত্রেও সংশয় প্রকাশিত করেন।

ওড়িষার গঙ্গাবংশীয় নরপালগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, কেশরী রাজগণ বর্ত্তমান ছিলেন, অনেক দিন হইতে এইরূপ একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। "মাদলা-পাঞ্জী"তে এবং [খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত] "ভক্তিভাগবতমহাকাব্যম্" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই জনশ্রুতি উল্লিখিত আছে। তাহা পরবর্ত্তীকালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, উপেক্ষিত হইলেও, অন্য প্রমাণের অসদ্ভাব নাই।

ভুবনেশ্বর-তীর্থক্ষেত্রের ব্রহ্মেশ্বর-মন্দিরে যে প্রস্তরফলক সংযুক্ত ছিল, তাহাতে কেশরী রাজগণের কথা উল্লিখিত ছিল। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল তাহার শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। এখন আর সে প্রস্তর-ফলকের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থোদ্ধৃত

শ্লোকাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়,—উদ্যোতকেশরী নামক রাজার মাতা (কোলাবতী) ব্রহ্মেশ্বর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। (১৩) নির্ম্মাণকাল এইরূপে উল্লিখিত ;—

"পরমমাহেশ্বর-মহারাজাধিরাজ-সোমকুলোদ্ভবভূপতি-
কলিঙ্গাধিপতি-শ্রীমদুদ্যোতকেশরীরাজদেবস্য বিজয়রাজ্যে
সংবৎ ১৮। ফাল্গুন শুদি ৩।"

এই প্রশস্তি বর্ত্তমান থাকিলে, অনেক তর্কবিতর্ক নিরস্ত করিতে পারিত। কিন্তু প্রস্তর-ফলক বর্ত্তমান না থাকিলেও তাহার শ্লোকাবলী যে ভাবে ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থে উদ্ধৃত রহিয়াছে, তৎপ্রতি সংশয় প্রকাশের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রশস্তি কবিবর পুরুষোত্তম-বিরচিত। যথা,—

"[illegible]কেবলশব্দশাস্ত্রকবিতাতর্কাদিবিদ্যাধরো
ব্রাহ্মণাদিগুণ-প্রসঙ্গবিনয়ো[illegible] বিচক্ষণঃ
[illegible]
বক্তা শ্রীপুরুষোত্তমঃ কবিবরো [illegible] ।"

ইহাতে কেশরী রাজবংশ "চন্দ্রবংশ"-সম্ভূত বলিয়া উল্লিখিত। সেই বংশের জনমেজয় নামক কলিঙ্গাধিপতি "যুদ্ধে ওড্রপতিকে নিহত করিয়া, তদীয় রাজলক্ষ্মী আকর্ষণ করিয়াছিলেন।" এই বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়,—কলিঙ্গ ওড্র হইতে স্বতন্ত্র ছিল, কলিঙ্গরাজবংশ ওড্রদেশও অধিকার করিয়াছিল। এই কলিঙ্গ কোন্ কলিঙ্গ? মুখলিঙ্গমের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও "সোমেশ্বর-মন্দির" নামে একটি জীর্ণমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার সহিত এই কেশরী রাজগণের সম্পর্ক থাকিলে, মুখলিঙ্গমের পার্শ্ববর্ত্তী কলিঙ্গনগরকেই তাঁহাদিগের আদিরাজধানী বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু তথায় সোমবংশীয় রাজাদিগের জনশ্রুতি আছে,—কেশরী বংশের জনশ্রুতি নাই। পুরুষোত্তম প্রশস্তিরচনাকালে উদ্যোতকেশরীর পরিচয় দিয়াছেন,—

"[illegible]
[illegible]
[illegible]
রাজা [illegible] ।"

(১৩) Rajendralalas' Orissa and J. A. S. B. Vol. VII. P. [illegible]

যে বৎসরে এই প্রস্তর-লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, ঠিক সেই বৎসরেই খণ্ডাচলের নবমুনিগুহায় আচার্য্য শুভ্রচন্দ্র এক লিপিতে উদ্যোতকেশরীর নাম ও তদীয় বিজয়রাজ্যের ১৮ সম্বৎ উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। এই লিপি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সুতরাং উদ্যোতকেশরীর অস্তিত্বমাত্রে সংশয় প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কেশরী রাজগণের এইরূপ প্রমাণ ইতিহাসের পক্ষে প্রচুর না হইলেও, তাঁহাদিগের অস্তিত্ব-প্রতিপাদনের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। উদ্যোতকেশরীর সঙ্গে গৌড়ের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল ;—পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা অপরিজ্ঞাত।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে প্রাচ্যভারত বহু বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। সে বিপ্লবে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের পুরাতন সম্পর্ক সকল সময়ে পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণাবস্থায় বর্ত্তমান ছিল না। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-গিরিলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি প্রবলযুদ্ধে দুর্গম ওড্রবিষয় পদানত করিয়া, কোশলনাড়ু, তন্দবুত্তি, তক্কণ-লাড়ম্ ও বঙ্গালদেশ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল প্রদেশে চোল-রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইবার উল্লেখ নাই, তাহার জনশ্রুতিও অপরিচিত। এই অভিযান তৎকালসুলভ দেশলুণ্ঠন বলিয়াই কথিত হইবার যোগ্য।

ইহার পর (খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে) কলিঙ্গে যে রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাই ইতিহাসবিখ্যাত গঙ্গাবংশ। কলিঙ্গনগর এই রাজবংশের আদি রাজধানী বলিয়াই পরিচিত। মুখলিঙ্গমে ইহাদিগের অনেক প্রস্তরলিপি বর্ত্তমান আছে। (১৪) ইঁহারা দীর্ঘকাল কলিঙ্গের সঙ্গে উৎকল,—কখনও কখনও বঙ্গভূমির দক্ষিণপশ্চিমাংশ অধিকারভুক্ত করিয়া, প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ইহাদিগের স্মৃতি শিল্পগৌরবে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

ভারতদ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে যে সকল ভারতীয় কীর্ত্তিচিহ্নের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমস্তই মধ্যযুগের কীর্ত্তিচিহ্ন; তাহার সর্ব্বাঙ্গে ভারতীয় প্রভাব দৃঢ়মুদ্রিত। সে প্রভাব ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের প্রভাব, তাহার মূল প্রস্রবণ কোথায়, তাহাই সাগরিকার প্রধান কথা। তাহার

(১৪) মুখলিঙ্গমের বিস্তৃত বিবরণ "কলিঙ্গ-ভ্রমণ" নামক পৃথক প্রবন্ধে বিবৃত হইবে।

অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে, মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্মরণ রাখা আবশ্যক বলিয়া, তাহা উল্লিখিত হইল।

এই ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্যযুগে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের চেষ্টা প্রচলিত হইয়াছিল। তাহা কেবল প্রাচ্যভারতেই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকালের জন্য সফল হইতে পারিয়াছিল। সে সাম্রাজ্য পাল-রাজগণের গৌড়ীয় সাম্রাজ্য। তাহার প্রভাবই মধ্যযুগের ভারতীয় প্রভাব। মধ্যযুগের ভারতীয় শিক্ষা দীক্ষা, ভারতীয় সাহিত্য-শিল্প, সেই প্রভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। সেই প্রভাব, ভারতবর্ষের বাহিরেও, জলে স্থলে তুল্যভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। স্থলপথে প্রভাব ব্যাপ্ত হইবার প্রস্রবণ বরেন্দ্রভূমিতে, এবং জলপথে প্রভাব ব্যাপ্ত হইবার প্রস্রবণ কলিঙ্গে অনুসন্ধান করিতে হইবে; এবং জলে স্থলে, [সকল পথেই] ভারতবর্ষের বাহিরে যে প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, পালরাজগণের গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলেই তাহার মূল প্রস্রবণের অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই সকল স্থানে এখনও এ ভাবে তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত হয় নাই। সুতরাং সাগরিকার প্রধান কথা নূতন কথা বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। নূতন হইলেও ভিত্তিহীন নহে। তাহা অধুনা-অধঃপতিত বাঙ্গালী সমাজের পুরাতন দিগ্বিজয়ের কথা। সে কথা [উপযুক্ত অনুসন্ধানপ্রণালীর অভাবে] তর্ক বিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভারত দ্বীপপুঞ্জের ভারতীয় উপনিবেশে ভারতবর্ষের প্রভাব সর্ব্বত্র সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত পুরাতন কথা। সে প্রভাব ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের, কোন্ যুগের, কোন্ সমাজের প্রভাব, তাহা এখনও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই। কোনও কোনও পাশ্চাত্য মনীষী একালে এতদ্বিষয়ক পূর্ব্বসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন,—এ বিষয়ে এখনও অনুসন্ধানের প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে, সুতরাং এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কে কি লিখিয়াছেন, তাহাতে পথভ্রান্ত না হইয়া, স্বাধীনভাবে তথ্যানুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য। সাগরিকা তৎপ্রতি বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে, সকল শ্রম সফল হইবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

শ্রীচন্দ্র-দেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন।

[রামপাল-লিপি।]

প্রশস্তি-পরিচয়।

বঙ্গের বর্ম্মরাজবংশের ও সেনরাজবংশের রাজধানী বিক্রমপুর-অঞ্চলে মধ্যযুগের বঙ্গেতিহাস-সঙ্কলনোপযোগী তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি আমাকে [বর্ত্তমান সালের গ্রীষ্মাবকাশে] পূর্ব্ববঙ্গে পরিভ্রমণ করিতে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সেই উপদেশ-ক্রমে আমি রাজসাহী হইতে জন্মভূমি ঢাকা নগরীতে আসিয়া, বিগত ২৯শে এপ্রেল [১৬ই বৈশাখ] তারিখে, কতিপয় বন্ধু সহ তথ্যানুসন্ধানে বহির্গত হই। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পঞ্চসার-গ্রামনিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তদীয় অনুজ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের নিকট শুনিতে পাই যে, [illegible] গ্রামনিবাসী "যদুনাথ বণিকের বাড়ীতে বহুবৎসর যাবৎ একখণ্ড তাম্রশাসন যত্ন-সহকারে রক্ষিত হইতেছে,—এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই।" এই সন্ধান লাভ করিয়া, আমরা বণিকা-বাড়ীতে গিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে তাম্র-ফলকখানি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। যদুনাথের নিকট শুনিয়াছি যে, প্রায় ৭৫।৭৬ বৎসর পূর্ব্বে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রামপাল-নামক স্থানে কোনও এক মোসলমান মৃত্তিকা খনন করিবার সময় এই তাম্রপট্ট প্রাপ্ত হইয়া, যদুনাথের পিতা স্বর্গীয় জগবন্ধু বণিকাকে প্রদান করিয়াছিল। জগবন্ধু প্রায় ৪৫।৪৬ বৎসর ইহা নিজ-গৃহে সযত্নে রক্ষা করিয়া, পরলোক-প্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র যদুনাথ বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ পিতৃদেবের উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত এই তাম্রশাসনখানি ভক্তি-সহকারে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। ইহা এখন বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

আবিষ্কার-কাহিনী

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি আমার উপর এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারের ভার ন্যস্ত করায়, মূল শাসন হইতে যেরূপ ভাবে পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই প্রতিকৃতি সহ বিদ্বৎ-সমাজের গোচরার্থ প্রকাশিত হইল।

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

কাল-প্রভাবে তাম্রফলকের কোনও অনিষ্ট না হইয়া থাকিলেও, স্থানে স্থানে পাঠোদ্ধারে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, [প্রায় ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে অক্ষর-পাঠের সুবিধা হইবে মনে করিয়া,] যদুনাথ তাম্র-দ্রাব অর্থাৎ (Nitric acid) প্রয়োগপূর্ব্বক তাম্রফলকের উভয় পার্শ্ব সংঘর্ষণ করিয়া কোনও কোনও স্থানের অক্ষর-বিলোপের সহায়তা করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

পাঠোদ্ধারসাধন করিয়া, আমাকে ব্যাখ্যা-কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। এই শাসনে রাজ-বংশ-বিবৃতি-বিজ্ঞাপক আটটি শ্লোক আছে। ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী ইদিলপুর-নিবাসী কোনও জমীদারের গৃহে অদ্যাপি একখানি তাম্রশাসন অপঠিত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর এম. এ. তাহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা "ঢাকা-রিভিউ" পত্রিকায় [১৯১১ সালের অক্টোবর সংখ্যায়] শ্রীযুক্ত জে. টি. র‍্যাঙ্কিন্ মহোদয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। লস্কর মহাশয়ের কৃত টীকাকার প্রবন্ধ-পাঠে জানা গিয়াছে যে, তিনি ইদিলপুরের তাম্রশাসনখানির ছাপ-মাত্রই আনিতে পারিয়াছিলেন; মূল ফলকখণ্ড সত্ত্বাধিকারীর নিকট হইতে কোনও প্রকারেই হস্তগত করিতে পারেন নাই। ইদিলপুর-শাসনের প্রতিগ্রহীতা ও উৎসৃষ্ট ভূমি পৃথক্। এই উভয় শাসনের লিপি-পংক্তিও সম-সংখ্যক নহে। শ্লোকাবলী যদি উভয়ত্র একরূপ হয়, তাহা হইলে, স্বর্গীয় গঙ্গামোহন ইদিলপুর-শাসনের শ্লোক-সমূহ নিজ প্রবন্ধে যে ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাংশে শুদ্ধ হয় নাই। শাসনোক্ত রাজার নামোদ্ধারেও তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে। তিনি "শ্রীচন্দ্রদেব"কে "চন্দ্রদেব" বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান তাম্রশাসনে রাজার নাম "শ্রীচন্দ্র" বলিয়া তিনবার উল্লিখিত আছে,—এবং রাজার পিতা "ত্রৈলোক্যচন্দ্র," পিতামহ "সুবর্ণচন্দ্র" ও প্রপিতামহ "পূর্ণচন্দ্রে"র নামকরণ-প্রণালীর আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়,—রাজার নাম "চন্দ্রদেব" না হইয়া, অন্য কোনও শব্দ উপপদরূপে লইয়াই গঠিত হইয়া থাকিবে। এই তাম্রশাসনে যে সকল রাজপাদোপজীবীর নামোল্লেখ আছে, তাহাদের অধিকাংশের নিয়োগ "লক্ষ্মণসেনের বেলাব-লিপি" * ও "বল্লালসেন-

* সাহিত্য, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

দেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন"* শীর্ষক প্রবন্ধ-দ্বয়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বঙ্গ-রাজগণের প্রদত্ত তাম্রশাসনে উল্লিখিত অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণের নামের সহিত তিনটি নূতন নামও পাওয়া গিয়াছে,—তন্মধ্যে "মণ্ডল-পতি" ও "সর্ব্বাধিকৃত" ‡ শব্দদ্বয় "মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষে"র ‡ এবং "হরিবর্ম্ম-দেবের তাম্রশাসনে"ও ‡ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এবং "শৌল্কিক" শব্দটিও পাল-পৃথ্বীপালগণের তাম্রশাসনে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। যে স্থানে ভূমি উৎসৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে, সেই স্থানটির কোনও সন্ধান লাভ করিতে পারি নাই; এবং প্রতিগৃহীতার কোনও বংশধর অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন কি না, তাহাও অবগত হইতে পারি নাই। ব্যাখ্যা-কার্য্যে যেখানে অন্যান্য শাসনাদির সাহায্য লইয়াছি, তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই তাম্রশাসনের আয়তন ৯।×৮ ইঞ্চ। ইহার শীর্ষদেশে [মধ্যস্থলে] একটি রাজ-মুদ্রা সংযুক্ত আছে। তন্মধ্যে "শ্রী-শ্রীচন্দ্রদেবঃ" এই নামটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। রাজার নামের উপর বৌদ্ধ-মত-বিজ্ঞাপক "ধর্ম্ম-চক্র-মুদ্রা"; ধর্ম্মচক্রের উভয় পার্শ্বে সমাসীন দুইটি মৃগ-মূর্ত্তি। রাজার নামের নিম্নভাগে, [মধ্যস্থলে] অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্ন,—তাহার উভয়-পার্শ্বে ও নিম্নভাগে ফুল পাতার সাজ। এই রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় ছিল বলিয়াই, রাজকীয় মুদ্রায় অর্দ্ধচন্দ্রমূর্ত্তির লাঞ্ছন সংযুক্ত হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য, পাল-রাজগণের তাম্রশাসনেও উভয় পার্শ্বে মৃগ-মূর্ত্তি-লাঞ্ছিত এই প্রকার "ধর্ম্ম-চক্র-মুদ্রা" সংযুক্ত আছে। এই তাম্র-শাসনে প্রথম পৃষ্ঠায়

লিপি-পরিচয়

১৮ পংক্তিতে এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তিতে পদ্য-গদ্য-ময় সংস্কৃত-ভাষা-রচিত দান-লিপি উৎকীর্ণ আছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ১৩ পংক্তি পর্য্যন্ত আটটি শ্লোকে রাজ-কবি নিজ প্রভুর বংশ-বর্ণনা করিয়াছেন;—তৎপর ৩৪ পংক্তি পর্য্যন্ত লিপির গদ্যাংশ, এবং সর্ব্বশেষে ধর্ম্মানুশংসী শ্লোক-পঞ্চক। তাম্রশাসন-সম্পাদন সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লিখিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে,—রাজা ["স্ব-হস্ত-কাল-সম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্"] তাম্রশাসনে নিজ-স্বাক্ষর ও সন-তারিখ সংযুক্ত করিবেন;—কিন্তু তাম্রশাসনে সন তারিখ

* সাহিত্য, অগ্রহায়ণ সংখ্যা। ১৩১৮ সন।

† সাহিত্য, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

‡ "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", দ্বিতীয় ভাগ, ২১৫ পৃষ্ঠা।

সন্নিবিষ্ট হয় নাই, এবং রাজার কিংবা তাঁহার কোনও প্রধান কর্ম্মচারীর স্বাক্ষরও ইহাতে সংযুক্ত দেখা যায় না। লিপিকরের ও শিল্পীর নামোল্লেখের অভাবও পরিদৃষ্ট হইতেছে। যে অক্ষরে এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা দ্বাদশ-শতাব্দীর প্রথম ভাগের বঙ্গাক্ষর বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুকৌশলে উৎকীর্ণ হইলেও, স্থানে স্থানে লিপিকরের বা শিল্পীর অনবধানতায় কিছু কিছু ভ্রম-প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে। সেইগুলি যথাস্থানে প্রশস্তি-পাঠের পাদ-টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহ-চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, [৪র্থ, ২১, ৩১, পংক্তি] কোনও কোনও স্থানে হয় নাই [১ম, ৭ম, ৩০শ পংক্তি] রেফ-সংযোগে দ, ধ প্রভৃতি কতিপয় বর্ণ ভিন্ন প্রায় অনেক ব্যঞ্জন-বর্ণেরই দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন রামপাল নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া, ইহা "রামপাল-লিপি" নামে অভিহিত হইল।

বিক্রমপুর-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে, ধর্ম্মচক্র-মুদ্রা-সংযুক্ত এই তাম্রশাসন সম্পাদিত করাইয়া, চন্দ্রবংশীয় পরম-সৌগত, মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎত্রৈলোক্যচন্দ্র দেব-পাদানুধ্যাত, পরমেশ্বর, পরম-ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেব [১৫—১৬ পংক্তি] মকর ভট্টের প্রপৌত্র, বরাহ ভট্টের পৌত্র, সুমঙ্গল ভট্টের পুত্র, শান্তি-বারিক পীতবাস শর্ম্মাকে, ভগবান্ বুদ্ধ-ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া মাতা-পিতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত [২৮—৩১ পংক্তি] সমস্ত রাজ-পাদোপজীবী ও অন্যান্য প্রজাবর্গকে বিজ্ঞাপিত করিয়া, যাবচ্চন্দ্রার্ক-ক্ষিতি-সমকাল পর্য্যন্ত, যথাবিধি উদক-স্পর্শ-পূর্ব্বক পৌণ্ড্র-ভুক্তির অন্তঃপাতী নান্য-মণ্ডল-স্থিত নেহকাষ্ঠি গ্রামে পাটক-পরিমিত ভূমি দান করিয়াছিলেন।

লিপি বিবরণ

এই নবাবিষ্কৃত তাম্র-শাসন হইতে আমরা কি কি ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহার কিঞ্চিৎ বিচার আবশ্যক। লিপি-প্রারম্ভে [প্রথম শ্লোকে] রাজ-কবি, বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ—এই "ত্রিরত্ন"-কে—উল্লেখ করিয়া, রাজবংশের সৌভাগ্যোৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কুল-বিভূতি-বিজ্ঞাপক দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, চন্দ্রবংশে পূর্ণচন্দ্র নামক কোনও রাজপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্র-বংশে জন্ম বলিয়া, এই অভিনব রাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় ছিলেন,—এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। পূর্ণচন্দ্র কোনও স্থানের রাজা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ নাই।

তিনি এক জন বীর-মাত্র ছিলেন; ইহাই দ্বিতীয় শ্লোকের আভাস। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্রের উৎপত্তি ও নামকরণ-কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র অশেষ-গুণ-বিভূষিত বলিয়া ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে বিদিত হইয়াছিলেন। তিনি 'হরিকেল'-রাজলক্ষ্মীর আধার-রূপে চন্দ্রদ্বীপে 'নৃপতি' হইয়াছিলেন। এই 'হরিকেল' শব্দটি বঙ্গ দেশেরই নামান্তর। "বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়াঃ"—হেমচন্দ্রের এই বাক্যই ইহার প্রমাণ। বর্ত্তমান খুলনা, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের অংশ-বিশেষ লইয়াই সেকালের 'চন্দ্রদ্বীপ' দক্ষিণে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই স্থানই আবার পরবর্ত্তী কালে [মোগল-সাম্রাজ্যে] বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ নামেও কথিত হইয়াছিল। "দিগ্বিজয়-প্রকাশ-বিবৃতি" নামক গ্রন্থে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের ভৌগোলিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চন্দ্রদ্বীপের কুলীন কায়স্থ বলিয়া এক শ্রেণীর কায়স্থ এখনও কৌলীন্য-মর্য্যাদা লাভ করিতেছেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শ্রীকাঞ্চনা-নাম্নী পত্নীর গর্ভে রাজ-যোগ-মুহূর্ত্তে শ্রীচন্দ্রের জন্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ভার্য্যাকে রাজকবি 'প্রিয়া' মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, 'মহিষী' বলেন নাই। এই কারণে এবং ত্রৈলোক্যচন্দ্রের 'নৃপতি'-মাত্র উপাধি-দর্শনে, মনে হয়,—তিনি কোনও প্রবল-পরাক্রম-শালী রাজাধিরাজের সামন্ত-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া, 'নৃপতি' উপাধী লইয়াই চন্দ্রদ্বীপ শাসন করিতেছিলেন; তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র ভবিষ্যতে 'রাজা' হইবেন, ইহাই জ্যোতিষিক-গণ তাঁহার জন্ম-সময়ে সূচিত করিয়াছিলেন। অষ্টম শ্লোকেও আমরা কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারি। এই শ্রীচন্দ্র সতত বিবুধ-মণ্ডল পরিবেষ্টিত থাকিয়া, এবং দেশকে একচ্ছত্রাধিপত্যে বিভূষিত করিয়া, অরাতি-কুলকে কারা-নিবদ্ধ করিয়া, আত্মযশে দিঙ্মণ্ডল সৌরভযুক্ত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরস্থিত রাজধানী হইতে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। সর্ব্ব-বর্ণের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি,—সে কালের রাজগণ ইহা বুঝিতেন, নচেৎ বৌদ্ধ-নরপতি শ্রীচন্দ্র ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবেন কেন? বিক্রমপুরেই শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহাতে তিনি বঙ্গপতি ছিলেন, এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রই মধ্যযুগের বৌদ্ধ-নরপতি বলিয়া প্রতিভাত। শ্রীচন্দ্রের পর তাহার বংশ-ধর অন্য কেহ বঙ্গ-রাজ ছিলেন

কি না, তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় [অন্য কোনও প্রমাণ না থাকায়] নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

এখন জিজ্ঞাস্য—কোন্ সময়ে, কিরূপ ঘটনা-চক্রে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপে 'নৃপতি' হইয়াছিলেন,—কোন্ সময়ে, কিরূপ ঘটনাচক্রে, তৎপুত্র শ্রীচন্দ্র বঙ্গে রাজ্যস্থাপন করিয়া বিক্রমপুর হইতে শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন,—এবং কোন্ সময়ে, কিরূপ ঘটনাচক্রেই বা এই অভিনব চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ-নরপতির [বা নরপতিগণের ?] রাজ্যপতন সংঘটিত হইয়াছিল ? এই সকল প্রশ্ন ঐতিহাসিক সমস্যার আধার। লিপিকাল-বিচার ও সমসাময়িক অন্যান্য ঘটনার সমালোচনা করিয়া এই সমস্যার যথাযোগ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। অক্ষর-হিসাবে এই লিপির স্থান দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে। এই শাসনের 'ত', 'ন' ও 'ম' বর্ম্মবংশীয় ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব-লিপি ও হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট-ভবদেবের প্রশস্তির 'ত', 'ন' ও 'ম',এর অনুরূপ। কিন্তু আলোচ্য শাসনে 'প' এবং 'ধ' কিছু বেশী আধুনিক। 'ধ' বিজয় সেনদেবের দেবপাড়া-লিপির অনুরূপ। বেলাবলিপিতে ও ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তিতে অবগ্রহ-চিহ্ন আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু শ্রীচন্দ্রের শাসনে কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহচিহ্ ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনও কোনও স্থানে হয় নাই। এই সমস্ত কারণে, এই লিপির কাল যেন বর্ম্মরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পরে, এবং সেনরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ, সেনরাজ বিজয়সেনদেবের বিক্রম-পুর-অধিকারের পূর্ব্বে এবং বর্ম্মরাজ হরিবর্ম্মদেবের পুত্রের রাজ্যনাশের পরেই কোনও সুযোগে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন-পূর্ব্বক কিছুকালের জন্য এক অভিনব বৌদ্ধ-রাজ্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিক্রমপুরে যে সমস্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা মধ্য-যুগের এই কালেরই পরিচয় প্রদান করে। গত বৎসর বেলাব-লিপির সাহায্যে আমরা বিক্রমপুরে বর্ম্মরাজগণের অভ্যুত্থানের কথাও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, ভোজবর্ম্মদেব এবং তৎপরবর্ত্তী বর্ম্মরাজগণ শেষ-পাল-রাজগণের সময়েই বিক্রমপুর হইতে বঙ্গে রাজ্য-শাসন করিতেন। এ দিকে দ্বাদশ-শতাব্দীর প্রথম-ভাগে রামপাল-দেবের তনুত্যাগের পর, তৎপুত্র * কুমারপাল-দেব বরেন্দ্র-ভূমিতে [রামাবতী-নগর হইতে] রাজ্য

* গৌড়-রাজমালা—৫২-৫৩ পৃষ্ঠা।

শাসন করিতেছিলেন। কুমার-পালদেবের সময় হইতেই পাল-সাম্রাজ্যের বন্ধন বিঘটিত হইয়া আসিতেছিল। কুমারপালদেবের প্রধান সহায় ছিলেন তাঁহার সচিব ও সেনাপতি বৈদ্যদেব। এই সময়ে রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, বৈদ্যদেবই "অনুত্তর-বঙ্গে" অর্থাৎ দক্ষিণ-বঙ্গে, নৌ-বল লইয়া বিদ্রোহ-দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক তথ্য আমরা তদীয় [কমৌলিতে প্রাপ্ত] * তাম্রশাসনে উল্লিখিত দেখিতে পাই। বৈদ্যদেব কর্ত্তৃক এই দক্ষিণ-বঙ্গের বিদ্রোহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইলেই হয় ত পাল-রাজ সর্ব্ব-গুণ-বিমণ্ডিত বৌদ্ধ ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, চন্দ্র-দ্বীপের সামন্ত-রূপে নিযুক্ত করিয়া, 'নৃপতি' উপাধিতে বিভূষিত করিয়া থাকিবেন। এই বিদ্রোহসময়েই হয় ত চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গ-রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; এবং এই সময় হইতেই হয় ত বর্ম্মরাজগণের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজকবি ত্রৈলোক্য-চন্দ্রকে হরিকেল-(বঙ্গ)-রাজলক্ষ্মীর আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়েই ভট্ট-ভবদেব-মন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত হরিবর্ম্মা বা তদাত্মজ [অজ্ঞাত-নামা রাজার] অধিকার হইতে বঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ হস্তচ্যুত হইয়াছে। তৎপর বৈদ্যদেব যেমন † কামরূপে তিঙ্গদেবকে সিংহাসন-ভ্রষ্ট করিয়া স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইরূপ, বোধ হয়, পালরাজগণের ও বর্ম্মরাজগণের দুর্ব্বলাবস্থা অবলোকন করিয়া, ত্রৈলোক্যচন্দ্র-পুত্র শ্রীচন্দ্র ও বর্ম্মবংশীয় শেষ নরপতিকে কোনও কারণে সিংহাসন-ভ্রষ্ট করিয়া, স্বয়ং 'পরমেশ্বর-পরমভট্টারক মহারাজা-ধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গে সার্ব্বভৌম নরপতি সাজিয়া বসিয়াছিলেন অথবা, বর্ম্মরাজ্য অন্য কোনও কারণে উন্মূলিত হইলে, শ্রীচন্দ্রই বঙ্গে একচ্ছত্রা-ধিপত্য বিস্তৃত করিয়া, শত্রুকুলকে কারানিবদ্ধ করিয়া, বিক্রমপুর হইতে শাসন-পরিচালন করিয়াছিলেন। আলোচ্য শাসনের অষ্টম-শ্লোকে এইরূপ ঐতিহাসিক তথ্য ইঙ্গিতে সূচিত হইয়া থাকিবে। অপর দিকে এই সময়েই বিজয়সেন পাল-সাম্রাজ্যের দুরবস্থা ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া, বরেন্দ্রীতে রাজ্য পাতিবার উপক্রম করিতেছিলেন; এবং পরে এই বিজয়সেন কর্ত্তৃকই হয় ত বৌদ্ধ-শ্রীচন্দ্রের সংস্থাপিত রাজ্যের বিনাশ সাধিত হইয়া থাকিবে। বিজয়সেন যে বিক্রমপুরের রাজধানী হইতে দানাদেশ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ বিশ্ব-

* গৌড়-লেখমালা—১৩০ পৃষ্ঠা। গৌড়-লেখমালা, ১৩১ পৃষ্ঠা।

† প্রবাসী, শ্রাবণ-সংখ্যা ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয় এক প্রবন্ধে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। লিপিখানি বিজয়সেনদেবের একত্রিংশ বর্ষীয় লিপি বলিয়া শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যখন বরেন্দ্রীতে কুমার-পালদেব এবং বঙ্গে হরিবর্ম্মদেব ও তদীয় পুত্র সিংহাসনারূঢ় ছিলেন এবং বিজয়সেন গৌড়ে রাজ্যস্থাপনের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, এবং কুমার-পালদেবের দক্ষিণ-বাহু-রূপী প্রধান সচিব বৈদ্যদেব তিম্মদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কামরূপে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখনই চন্দ্রদ্বীপ-নৃপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বর্ম্মরাজকে বিতাড়িত করিয়া, অথবা অন্য কারণে বর্ম্মরাজের নাশ ঘটিলে পর, বঙ্গে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিক্রমপুর-রাজধানী হইতে দেশ-শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বাংশে সমর্থিত হইবে কি না, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে না। যতদিন অনুকূল ও প্রবল প্রমাণ প্রাপ্ত না হওয়া যাইবে, ততদিন এই ভাবে অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত প্রচারিত না করিয়া উপায় নাই। পরবর্তী প্রমাণবলে পূর্ব্ববর্ত্তী এইরূপ সিদ্ধান্তনিচয় পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও হইবেও।

ক্রমশঃ।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক

উদ্ভিদের রহস্য।

'উদ্যানের বন্ধু' প্রস্তাবে দেখাইয়াছি,—মানুষের কৌশলে ও চেষ্টায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলন-ফলন কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখিব, উদ্ভিদগণ আপনা হইতে কি উপায়ে নূতন জাতির সৃষ্টি করে। বিশিষ্ট জাতীয় উদ্ভিদের বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মানুষ কৌশলক্রমে গাছের কলম বাহির করিয়া লয়। এতদ্দ্বারা গাছের স্বভাব পৈতৃকতা সংরক্ষিত হয়। আঁটি বা বীজ পুতিয়া চারা উৎপন্ন করিলে অনেক স্থলে সেই সকল চারা পৈতৃকত্ব হারাইয়া ফেলে। তাহার কারণ পরে বলিব। সচরাচর দেশবিশেষের আবহাওয়া ও মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বা উপকরণের ভেদে, কিংবা পাট-পরিচর্য্যার তারতম্যে বীজের চারার প্রকৃতির মধ্যে বৈষম্যের সংঘটন অত্যন্ত স্বাভাবিক

সেই বৈষম্য হেতু উদ্ভিদের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে কোষাণুরাশি (cells) থাকে, তাহাদিগের আকার ও কার্য্যপ্রণালীতে একটা বিপ্লব সংঘটিত হয়, ইহা আমরা সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারি। যে সকল কারণে উদ্ভিদের শরীরে এইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, সেই সকল কারণেই নবজাত উদ্ভিদ নূতন দেশে ও নূতন মৃত্তিকায় নিজের উপযোগী, প্রয়োজন ও পরিমাণ মত সমস্ত আহার্য্য হয় ত পায় না, অথবা কোনও কোনও জিনিস অধিক, কোনও কোনও জিনিস অল্প পায়। আবার হয় ত কোনও কোনও জিনিস আদৌ পায় না, পক্ষান্তরে হয় ত কোনও অপূর্ব্ব জিনিসও পাইয়া থাকে। এই জন্য উদ্ভিদান্তর্গত কোষাণুগণ স্ফীত বা আকুঞ্চিত হইতে পারে, ভূমি বা আকাশ হইতে কোনও পদার্থ অধিক বা অল্প-পরিমাণেও পাইতে পারে, আবার হয় ত কোনও আবশ্যক পদার্থের আহরণে অক্ষমও হইতে পারে। এই সকল ও আনুষঙ্গিক কারণে ফলপুষ্পেও যে বৈষম্য ঘটিবে, সে বিষয়ে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। যদি, এইরূপে বিভিন্ন অবস্থাপন্ন চারা পৈতৃক ধর্ম্ম হইতে দূরে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে উদ্ভিদের পুষ্পমধ্যবর্ত্তী জননেন্দ্রিয়ে একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা সুতরাং তাহা হইতে জাত বীজ স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে না পারিয়া পৈতৃক ধর্ম্ম হইতে অল্পাধিক ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। আর যে চারার কথা বলিয়াছি, তাহাতেও বিভিন্ন প্রকারের ফল জন্মিবে,—ইহা অনেকটা নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারা যায়। কিন্তু ইহাতে বীজের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব নষ্ট না হইতে পারে। আর একটি কথা বলিয়া রাখি যে, কলম নানা প্রকারের আছে। কলমের দ্বারা সংখ্যা-বৃদ্ধি—কৃত্রিম প্রণালী। বীজ হইতে চারার উৎপাদনই স্বাভাবিক প্রণালী। কলম বাঁধিয়া যে সকল চারা উৎপন্ন করা যায়, প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে চারা না বলিয়া 'বিভক্ত-উদ্ভিদ' বা 'খণ্ডিত-উদ্ভিদ' বলিলেই সঙ্গত হয়। বাস্তবিক কলমের গাছ তাহা ভিন্ন আর কি? খণ্ডিত বলিয়াই ইহারা আসল গাছ (mother plant) হইতে নিজ নিজ বয়সের জের টানিয়া অল্প কালের মধ্যে ফল-ফুল প্রদান করিতে পারে। কিন্তু বীজ-জাত চারা তাহা পারে না। কারণ, বীজের অঙ্কুরোদ্গমের কাল হইতেই তাহার জন্মতিথি বা বয়সের নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই জন্য আমরা কলমের চারায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই ফল-ফুল দেখিতে পাই; উহাদিগকে রোপণ করিবার পর বৎসর, অথবা তৎপর বৎসর হইতেই তাহাদিগের অঙ্গে ফল-ফুলের শোভা দেখিয়া আনন্দে বিভোর হই। একটা দৃষ্টান্ত দিই। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন,—আম, লিচু বা লেবুর সদ্যোবদ্ধ বা

টাট্‌কা কলমে মুকুল বা ফল থাকে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় আদৌ নাই। ইহারা খণ্ডিত শাখামাত্র, এবং আসল গাছের বয়স ও শক্তির প্রভাবে ফলবান হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও হইবে। কিন্তু ইহারা বীজ-জাত চারার ন্যায় দীর্ঘজীবী হয় না। সুতরাং ইহাদিগের নিকট হইতে বীজ-জাত গাছের মত অধিক দিন ফল ফুলের আশা করা যায় না। কেবল তাহাই নহে, বীজ-জাত গাছ যেরূপ সতেজ ও শাখাপল্লবী হয়, কলমের চারা তাহা হয় না। তবুও বীজের চারার একটা বিশেষত্ব আছে। সে কথাটা প্রসঙ্গক্রমে পরে আসিয়া পড়িবে। জীব হউক, বা উদ্ভিদ হউক, সকলেই স্ব স্ব বংশ বৃদ্ধি করিবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। মানুষ হইতে মানুষই জন্মে, শৃগাল, কুকুর, বা বনমানুষ জন্মে না, এ সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। তবে যে কোনও কোনও স্থলে বিকৃত সন্তান জন্মে, তাহাকে Freaks of nature অর্থাৎ প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খলতা বা প্রকৃতির খেয়াল ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।

অনেক স্থলে মানবসন্তানে পিতামাতার আকার বর্ণ গুণাগুণ উপেক্ষা করিয়া তদূর্দ্ধ পিতৃপুরুষদিগের সমগ্র বা কতকগুলি গুণাগুণ প্রকাশ পায়। ইহাকে বংশগত বিবর্ত্তন বলিতে পারা যায়।

এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে গেলে ডারউইন প্রমুখ প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদিগের মতের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাহা অপ্রাসঙ্গিক মাত্র হউক, সহজভাবে ইহা আমরা বলিতে পারি যে, পিতৃপক্ষ ও মাতৃপক্ষ শারীরিক ও প্রাকৃতিক উভয় বিষয়ে সমতুল্য হইলে, অপত্যে প্রায় কোনও ব্যত্যয় দেখা যায় না, আর যদি কিছু দেখা যায়, তাহা পিতৃমাতৃ পক্ষের উচ্চতর স্থান হইতে নিম্নতর বংশীয়গণ মধ্যে অকস্মাৎ বিকাশের ফলমাত্র। এই জন্যই ত আমরা উদ্বাহের জন্য উচ্চ বা ঘরোয়ানা বংশের অন্বেষণ করি। এক পুরুষের উচ্চতায় বা নিম্নতায় কোনও বংশ মহান্ বা হীন হয় না। আবার, এক-পুরুষ-সম্পর্কীয় ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। সেই জন্য যাহাতে পুরুষানুক্রমে বংশে উচ্চবংশের শোণিত সংক্রান্ত হয়, সে বিষয়ে হিন্দু সমাজ আবহমানকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছে। এই কারণেই আমরা বহু বাধা, বিঘ্ন ও বিপ্লব অতিক্রম করিয়া ব্যক্তিগত, বংশগত

৩, সমাজগত 'নিজত্ব' অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছি,—রাশির মধ্যে মিশিয়া যাই নাই। পারিপার্শ্বিক কারণে চৈতন্যরূপী জীবাত্মা কখনও বিকাশ পায়, আবার কখনও তমসাচ্ছাদিতভাবে অবস্থান করে। পশুপালক ও উদ্যানিকগণ এ তত্ত্ব বিশেষ বুঝেন। তাঁহারা ইহাও জানেন যে, কোনও রূপে একটি সঙ্কর-বংস উৎপন্ন হইলে তাহা স্থায়ী হয় না; তবে সেই সঙ্করতাকে বজায় রাখিবার জন্য, সেই সঙ্করবংসে পুনরায় বিভিন্ন শোণিতের সমাবেশ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপে দুই তিন পুরুষ অতিক্রান্ত হইলে, তবে তাহাকে একটা স্বতন্ত্র জাতি-পর্য্যায়ে পরিণত করা যায়। এরূপ দেখিয়াছি—কতকগুলি বীজ বপন করা গেল, যথাসময়ে চারা জন্মিল; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে হয় ত একটি অপরাপর চারা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইল। বিচক্ষণ উদ্যানক সেই বিশিষ্ট চারাটিকে স্বতন্ত্র করিয়া স্বতন্ত্রভাবে তাহার লালনপালন করেন, এবং যত শীঘ্র সম্ভব, তাহা হইতে দুই চারিটি কলম বাহির করিয়া লয়েন। কলম বাহির করিয়া লইবার পর ভেদপ্রাপ্ত আসল চারাটির দশা যাহাই হউক, এই কলমটির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইবার বড় অধিক আশঙ্কা থাকে না; কিন্তু যতদিন সেই চারা বা কলমের বীজ হইতে অন্য চারা উৎপন্ন না হয়, ততদিন তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় না।

এক্ষণে আমরা দেখিব যে, একই উদ্ভিদ-জাত বহু বীজের মধ্যে কোনও কোনটি হইতে বিভিন্ন গাছ জন্মে কেন, কিংবা কোনও গাছের ফল বা ফুলের গড়ন, বর্ণ, আকার, স্বাদ প্রভৃতিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় কেন? গৃহপালিত পশুপক্ষীর জীবোৎপাদনচেষ্টা মানব পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে। সুতরাং আমরা জানিতে পারি, কোন্ গাভী কোন্ বৃষের সহিত, অথবা কোন্ কপোত কোন্ কপোতীর সহিত সম্মিলিত হইল, এবং সেই সম্মিলনের ফলে, কিরূপ অপত্য উৎপন্ন হইবে, তাহাও আমরা পূর্ব্বেই কতকটা নির্দ্দেশ করিতে পারি। কিন্তু উদ্ভিদের গর্ভসঞ্চার সম্বন্ধে আমরা আজি পর্য্যন্ত বুঝিবার কোনও উপায় পাই নাই। উদ্ভিদ-জগতে কোন্ পুষ্পের সহিত কোন্ পুষ্পের, অথবা কোন্ উদ্ভিদের পুষ্পের সহিত কোন্ উদ্ভিদের পুষ্পের যৌন-সংঘটন হয়, তাহা আমরা জানি না। তবে ইহা আমরা জ্ঞাত আছি যে, পুংপুষ্পের রেণু বা পরাগ স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভাশয়ে সঞ্চারিত হইলে স্ত্রী-পুষ্প গর্ভধারণ করে। এটুকু জানা থাকিলেও, ইহার অন্তর্গত গুহ্য রহস্যটুকু জানা

হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দি। একটি বাগানে দুই দশটি বা বিশ-পঞ্চাশটি আম্র বৃক্ষ আছে। বসন্তকাল,—বৃক্ষরাজি মুকুলিত হইয়াছে। পুষ্পের সৌরভে চারিদিক আমোদিত। রাশি রাশি মক্ষিকা দলে দলে আসিয়া পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিতেছে; আবার এক বৃক্ষ হইতে উড়িয়া অপর বৃক্ষের পুষ্পে পূর্ব্ববৎ চুম্বক দিতেছে; সেই সঙ্গে তাহার ষট্‌পদ পরাগে রঞ্জিত হইতেছে, এবং সেই পরাগ আবার বিভিন্ন পুষ্পে নীত হইতেছে। প্রবল বাতাসেও অগণিত পরাগরাশি স্থানীয় বায়ুমণ্ডলে ভাসিতে ভাসিতে যথা তথা পতিত হইতেছে। পরাগ-সঞ্চালন ব্যাপারে মক্ষিকা বা সমীরণের ইচ্ছাপ্রসূত কোনও ক্রিয়া নাই। সুতরাং পরাগগুলির কে কোথায় গিয়া পড়িতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? হয় ত কতক ভূপৃষ্ঠে বা নিকটস্থ ডোবায় কিংবা পুষ্করিণীতে বা নদী-নালায়, হয় ত বা কতক গাছপালার শাখায় পাতায়, গিয়া স্থান পাইতেছে; সেই সঙ্গে কতক স্ত্রীপুষ্পেও পড়িতেছে। চিরদিন ইহাই হইয়া আসিতেছে, এবং তাহাতেই মনে হয় যে, এই অনিশ্চয়তার মধ্যে নিশ্চিতই কিছু নিশ্চয়তা আছে। সমীরণ-বিতাড়িত বা মক্ষিকা বাহিত যে রেণুকণা দ্বারা স্ত্রীপুষ্পের গর্ভসঞ্চার হয়, সে রেণুকণা কোন্ গাছের, তাহা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। অথচ পুষ্পের গর্ভসঞ্চার হইল, ক্রমে বীজ জন্মিল। এই বীজ হইতে যে উদ্ভিদ জন্মিবে, তাহার মাতৃগুণ (maternal attributes) সম্পন্ন হইবার যেরূপ সম্ভাবনা, না হইবারও সেইরূপ সম্ভাবনা। ফজ্‌লীর বীজজাত বৃক্ষ হইতে ঠিক ফজ্‌লী আম্র জন্মিবে কি না, এই জন্য তাহাতে সন্দেহ থাকে। ফজ্‌লীর গর্ভে খোঁড়া বা কুড়ো-বোম্বাই গাছের পরাগ আসিয়া পড়িবার পর ফজ্‌লীর ফলে কোনও বৈষম্য ঘটে না বটে, কিন্তু তাহার আঁটির মধ্যে যে ভ্রূণ থাকে, তাহার প্রকৃতি যে উভপ্রকৃতিক হইবে, এবং তজ্জাত বৃক্ষ ও ফল তদনুরূপ উভ-প্রকৃতির হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। এইরূপে এক একটি জাতি (Species) হইতে অনেক অনেক 'রকম' (Variety) উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা অনেক রকমের আম্র দেখিতে পাই। সেই সকল 'রকম' যে প্রথম সৃষ্টিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা নহে। বিভিন্ন রকমের আম গাছের পরস্পর সম্মিলনের ফলই এই বৈচিত্র্যের মূল কারণ। আমাদিগের দেশে কৃষি বা উদ্যানবিষয়ে লোকের যত্ন বা উৎসাহ না থাকাতেই ফলফুল তরি-তরকারী প্রভৃতির এক এক 'জাতি'র বহু 'প্রকার' বড় একটা দেখা যায়

না। একটু চেষ্টা করিলে আমরা অনায়াসে এক এক জাতি হইতে বহু রকমের ফলফুল বা তরিতরকারী বা মেঠো ফসল উৎপন্ন করিতে পারি। ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে হইলে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন ; (১) সূক্ষ্মদৃষ্টি, (২) তিতিক্ষা।

জাতি হইতে 'রকমে'র সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার অন্যতম উপায়—বীজ-নির্ব্বাচন। ইহা এত সহজ, তথাপি আমাদিগের উদাসীনতা হেতু কত নূতন জিনিস আমরা প্রতি বৎসর হারাইয়া ফেলিতেছি। একই গাছের সকল ফলই যে সমপ্রকারের হয়, তাহা নহে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিসহকারে দেখিলে, তাহাদিগের মধ্যে অল্পাধিক বৈষম্য বুঝিতে পারি। অতঃপর ইহাও দেখিতে পাই, একই ক্ষেতে ২০।২৫টী—মনে করা যাউক—বেগুন গাছ আছে। যথানিয়মে তাহাদিগের পরিচর্য্যা করা যাইতেছে। অথচ কতকগুলি গাছ-আকার বা বৃদ্ধিতে অপরাপর গাছ হইতে অল্পাধিক স্বতন্ত্র, আবার কোনও কোনও গাছের ফলের আকার বা গড়ন স্বতন্ত্র হইয়াছে। সাধারণ বৃক্ষসমূহ হইতে এইরূপ স্বতন্ত্রতা-প্রাপ্ত গাছগুলিকে, অন্য গাছের স্বতন্ত্রতাপ্রাপ্ত ফলগুলিকে চিহ্নিত করিয়া, বিশেষ যত্নসহকারে পাট-পরিচর্য্যা করিলে, যথাসময়ে ফলগুলি পাকিয়া উঠিবে। তখন ফলগুলিকে সংগ্রহ করিয়া বীজ বাহির করিয়া লইতে হয়। পরে বীজগুলিকে স্বতন্ত্র রাখিয়া পরবর্ত্তী ঋতুতে সেই নির্ব্বাচিত বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিলে, সেই বীজজাত বৃক্ষসমূহে যে ফল ফলিবে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী গাছের ফলের সদৃশ হইবে, ইহাই বিশেষ সম্ভব। এই ত গেল বাহ্যআকৃতি অনুসারে নির্ব্বাচন। স্বতন্ত্রীকৃত ফলগুলির গুণাগুণ পরীক্ষা করাও আবশ্যক। কারণ, কেবল আকৃতিতে সকল আশা মিটে না। এক্ষণে ফল হইতে বীজ পৃথক করিবার কালে ফলগুলিকে কাটিতে হয়। এই সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও ফল সমধিক শাঁসাল, অপেক্ষাকৃত অল্প-বীজ, ছাল-পাতলা ইত্যাদি। অতঃপর কর্ত্তিত ফল হইতে ছাল-পাত্‌লা, অল্পবীজ ও শাঁসাল ফলের বীজগুলিকে যত্নসহকারে পৃথক করিয়া শুকাইয়া স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করিতে হয়। পরবর্ত্তী আবাদকালে সেই বীজ হইতে গাছ উৎপন্ন করিলে অপেক্ষাকৃত উত্তম ফল জন্মিবে, ইহা নিশ্চিত।

ইউরোপ ও যুক্তরাজ্যের অনেক বীজের ব্যাপারী ও উদ্ভিদের ব্যবসায়ী প্রতিনিয়ত এই চর্চ্চায় নিযুক্ত। এই জন্য তাঁহারা প্রতিবৎসর শত শত প্রকার

ফলফুলাদির নূতন নূতন 'রকম' উৎপন্ন করিয়া রাশি রাশি অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। ব্যবসায় হিসাবে ইহাকে ব্যক্তিগত লাভ বলিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা ব্যতীত তাঁহারা প্রতি বৎসর নূতন নূতন জিনিসের প্রবর্ত্তন করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণবিধান করিতেছেন, এবং এই জন্য সমগ্র মানব জাতি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বীজ-বপন ও কলম দ্বারা উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এতদুভয়বিধ গাছে অনেক বিষয়ে প্রভেদ ঘটে। বীজজাত চারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়তন হয়, অপেক্ষাকৃত বিলম্বে ফলফুল প্রদান করে, কিন্তু অধিক ফল দেয়, এবং দীর্ঘকাল ফল দেয়। এ সকল সত্ত্বেও বীজের গাছে একটা ভয় বা সন্দেহ থাকে যে, যে গাছের ফল, সে গাছের মতন ফলফুল প্রদান করিবে কি না? কতকগুলি ফলফুলের গাছে,—আম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি কতকগুলি ফলবৃক্ষের ও গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের—বীজের চারায় সে সন্দেহ বড়ই থাকে। এই জন্য এ সকল ফলের ও ফুলের গাছের কলমই লোকে রোপণ করে। কলমের চারায় সে আশঙ্কা থাকে না। কলমের চারায় শীঘ্র ফল দেখা দেয়। কেন এরূপ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহারা পরিপুষ্ট-উদ্ভিদ বলিয়া দৈর্ঘ্যে বেশী উচ্চ হয় না, কারণ, ইহারা নিজেই উদ্ভিদের এক একটি অবয়ব। উক্ত পরিপুষ্ট অংশ হইতে শাখা প্রশাখা উৎপন্ন হয়, মূলকাণ্ড তাদৃশ স্থূল, সরল ও দীর্ঘ হয় না। বীজের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল, তদ্ব্যতীত বীজের চারা মৃত্তিকা ও আবহাওয়ার ইতরবিশেষে [illegible] হইতে বাধ্য হইয়া পড়ে, সময়ে সময়ে নিকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত হয়। কলমের গাছ মূল চারার অঙ্গে দণ্ডায়মান থাকে, মাটীর বা আবহাওয়ার সহিত তাহার কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে

উলা বা বীরনগর।

১

১৮৪৬ সালের ২৭ শে অগ্রহায়ণ চুঁচুড়ার বাটীতে আমার জন্ম হয়। সেই সালের ২৬ শে মে হইতে পিতৃদেব কৃষ্ণনগরে কর্ম্ম করিতেছিলেন। ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুন হইতে, তিনি উলার মুনসেফ হন। তখন উলায় মুনসেফি আদালত ছিল। এখন সেই মুনসেফিটি রাণাঘাটে আছে। ১৮৫০ সালের মাঘ মাসেই আমরা উলায় যাই; অর্থাৎ পিতৃদেব উলায় পরিবার লইয়া যান। তাহার পর প্রতি বৎসরই আমরা চারি মাস চুঁচুড়ায় এবং আট মাস উলায় থাকিতাম। ১৮৫৬ সালে উলায় মহামারী পড়িল, ঠিক পূজার পূর্ব্বেই; সেইবার হইতে আর আমরা উলা বা রাণাঘাট যাই নাই। আমার বাল্যকালের ৭ বৎসর ঐ ভাবে উলায় কাটে অর্থাৎ প্রতিবৎসর ৭।৮ মাস করিয়া থাকিতাম। বাল্য অনুরাগবশতঃ উলার উপর খানিকটা মমতা ছিল বা আছে।

পূরা দশ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই উলা ছাড়িয়া আসি, আর এই গত বৈশাখী পূর্ণিমার দিন ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ৫৬ বৎসর পরে উলায় গিয়াছিলাম, বুঝুন আমার মমতার টান!! রাণাঘাটের শ্রীমান্ কুমুদনাথ মল্লিকের সহিত আজ কয় বৎসর দেখা এবং আলাপ না হইলে, আর এবৎসর তিনি ঐ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ না দেখাইলে, বোধ হয় তাহাও হইত না! এই ৫৬ বৎসরের মাঝামাঝি অর্থাৎ ২৭।২৮ বৎসর পূর্ব্বে পিতৃদেব বৈশাখী পূর্ণিমায় একবার উলায় গিয়াছিলেন, আমি তখন যাইতে পারি নাই—উলার অবস্থা শুনিয়াছিলাম—এখন তাহা হইতেও হীনাবস্থা।

এই ৫৬ বৎসর উলায় একবারও যাই নাই, তা বলিয়া উলা দেখিবার ইচ্ছা ছিল না, এমন কথা বলি না। তবে এতকাল "অজরামরবৎ" মনে করিয়াই চলিয়াছিলাম, এখন বয়সের দোষে বা গুণে "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা" ভাবিয়া ধর্ম্মমাচরেৎ মত করিতে হইল।

এই দীর্ঘকাল উলার অধিবাসিগণের সহিত আমরা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়াছিলাম। গুটিকতক ভদ্রলোকের সহিত বেশ আত্মীয়তাই ছিল। উলার দুর্দ্দশার কথা প্রায়ই শুনিতাম। মহামারীতে উলা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, এটা ইতিহাসের কথা হইয়াছে। ইতিহাসের সহিত কিশোর বয়সে আমি কাব্য মিশাইয়াছিলাম। কাব্য আবার ইংরাজি কাব্য!

বিধির বিধানে ক্রমাগত তিন বৎসর ১৮৬০, ১৮৬১, ১৮৬২ সাল কবি গোল্ড্‌স্মিথের 'পরিত্যক্ত পল্লী' আমাদের পাঠ্য ছিল। কাজেই সমুদায় কাব্য আমার মুখস্থ হইয়াছিল। উলার কথা পড়িলেই—

Seats of my youth, when every sport could please,

* * *

These were thy charms —but all these charms are fled.

* * *

Near yonder copse, where once the garden smiled,
And still where many a garden flower grows wild.

—এই সকল পদ্য আওড়াইতাম। আর কত কি মাথামুণ্ড ভাবিতাম, তাহা এখন মনেও আনিতে পারি না।—একবার রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর যাইবার হাঁটা পথে কামগাছীর মাঠে, আর একবার রেলপথে উলা ষ্টেশন হইয়া দেবগ্রাম যাইতে মনে বিষাদ বা প্রসাদ প্রবল হইয়াছিল তাহা ঠিক বলিতে পারি না—বিধ্বস্ত গ্রামের কথা ভাবিতে গেলে বিষাদ ত আসিতেই পারে, কিন্তু 'ওই গো আমার সেই উলা ছুঁইয়া যাইতেছি',—এ কথাতে একটু প্রসাদও যে আসে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না।

মহামারীর পূর্ব্বে অর্থাৎ ষাট বৎসর পূর্ব্বে উলা অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন বড় জনপদ ছিল। তেমন সমৃদ্ধিসম্পন্ন পল্লীগ্রাম আমি আর কোথাও দেখি নাই। সমৃদ্ধি বলিতে যে খুব গাড়ী-ঘোড়ার আড়ম্বর, তাহা নহে; কিন্তু কথা, গান বাজনা, আনন্দ উৎসবে ভোরপুর ছিল। আর লোকসংখ্যা বিপুল—বাঙ্গলার একটি পল্লীগ্রামে পঞ্চাশ হাজার লোক—সে কি কম কথা! আর সেই লোকই বা কিরূপ! কুলি-মজুর নহে—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী

"উলার বামনদাস (মুখোপাধ্যায়) বাবুর তখন প্রবল প্রতাপ। প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। তিনি স্বয়ং অতিশয় ক্রিয়াবান্ পুরুষ ছিলেন। তেমন ক্রিয়াবান্ লোক এখন আর নাই। বার-মাসে তের পার্ব্বণ এবং নিত্য নিয়মিত অতিথিশালাও ছিল। স্নানযাত্রা, রথ ও জগদ্ধাত্রী পূজায় মহা ধুমধাম হইত। রথের আট দিন দিবারাত্র এক দিকে নাচ গান যাত্রা কবি হইত, অন্য দিকে সেইরূপ মধ্যাহ্ন হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত দীয়তাং ভুজ্যতাম্ শব্দে কুবি ভোজন চলিত। স্নানযাত্রার সময় সভা সভাই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় হইতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সমাগম হইত। তখন রেল হয় নাই, দীঘার চলাচল

ছিল না; সেই সময়ে দূরদেশাগত এক এক জন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের জন্য কত যে পাথেয় ব্যয় হইত, তাহা অনুমান করাও দুঃসাধ্য।”

শান্তিপুরের মতিবাবু নাকি উত্তরসাধক হইয়া বামনদাস বাবুর বিরুদ্ধে একটি ঘরোয়া মোকদ্দামা বাধান; প্রিবিকৌন্‌সিল পর্য্যন্ত গড়ায়। সেই মোকদ্দামা ‘জিত’ হইবার যেদিন সংবাদ আসিল, সেই দিন উলাবাসীর উল্লাস দেখে কে? সমস্ত গ্রাম হলহলায় পূর্ণ; সকল বাড়ীতেই সিধা আসিল, আর রাত্রিতে বোমফাটার শব্দে উলা কম্পিত এবং ধধূপের আলোয় সমস্ত গ্রাম উজ্জ্বলীকৃত।

বহুপূর্ব্ব হইতেই উলায় সংস্কৃতচর্চ্চা, স্মৃতি-দর্শনের চর্চ্চা ছিল; আর অনেকগুলি পাঠশালা ছিল। বাঙ্গলায় আবার সমাস-কারক শিখাইতে হয়, তখন লোকের সে জ্ঞান সবেমাত্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পিতৃদেব গ্রামমধ্যে বিশেষ চেষ্টা করিয়া এবং কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্য লইয়া, তিনটি পাড়ায় তিনটি বাঙ্গালা স্কুল ও মাঝের পাড়ায় উপরন্তু একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠাপিত করেন। প্রায় ৬ শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত। হরিসঙ্কীর্ত্তন, সাধারণ সঙ্গীত এবং কালোয়াতি গানের চর্চ্চাও বিশেষ ছিল। আমি যখন ছিলাম, তখন প্রসিদ্ধ গানবিলাস মহাশয়ের পুত্র হরচন্দ্র বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। দুই জন ব্রজ মুখোপাধ্যায় পাখোয়াজি ছিলেন। ভাল ঢুলী ছিল, ভাল সানাইদার ছিল, বোধ হয়, তাহাদের নাম দীনে ও তিনকড়ি হইবে। ভাল চিত্রকর ছিল, তাহাদের হাতের চিত্র এখনও আমাদের বাড়ীতে আছে। তাহারা উত্তম পুত্তলিকাও তৈয়ার করিত। উলার আচার্য্যদের ডাকের সাজ প্রসিদ্ধ। ঠাকুর-গড়া কুমার খুব উত্তমই ছিল—বার-ইয়ারির ঠাকুরগুলি কলা-বিদ্যার চূড়ান্ত নিদর্শন। কাঁসারীরা বাসন তৈয়ার করিত, তাহারা দক্ষিণপাড়ায় থাকিত বলিয়া ভালরূপেই জানিতাম। উত্তম ময়রা ছিল; ভাল সন্দেশ হইত। সন্দেশের ঠোঙ্গায় ঘি গড়াইত। তরিতরকারী সমস্তই সুলভ; উত্তম ঘৃত সুলভে মিলিত।

পূর্ব্বে গঙ্গার খাদ উলার নীচেই ছিল, বর্ষায় সেই খাদে জল আসিয়া উলার তিন দিক প্লাবিত করিত। বৈকালে রাস্তার ধারে তিন চারি শত লোক ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিত; সেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! যে মুহূর্ত্তে যাইবে, তখনই দেখিবে, দশটা পাঁচটা ছিপে মাছ গাঁথিয়াছে।

আক্রমণের ফলে। উভয় ঘটনাই মওলানা মিনহাজুদ্দিন বিরচিত "তাবাকাত-ই-নাসিরী" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। "তাবাকাত-ই-নাসিরী" শেষোক্ত ঘটনার তিন বৎসর পরে, ১২৬০ খৃষ্টাব্দে, রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার তখন দিল্লীর প্রধান কাজির পদে অধিরূঢ় ছিলেন। মুতমদ্দৌলা নামক মহম্মদ বখতিয়ারের এক জন অনুচরের মুখে শুনিয়া মিনহাজ প্রথমোক্ত ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মিনহাজের প্রদত্ত বিবরণ বিশেষ নির্ভরযোগ্য। অবশ্যই মিনহাজ যথাসাধ্য মুসলমানের দিক টানিয়া লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু পক্ষপাতশূন্য ঐতিহাসিক আধুনিক কালেই বা কয় জন দেখা যায়। এড মেকলের প্রসিদ্ধ ইতিহাস আগাগোড়া হুইগ (whig) পক্ষ টানিয়া লেখা। সুতরাং একআধটুকু পক্ষপাতিতার জন্য কাজি মিনহাজকে দোষ দেওয়া যায় না। পক্ষপাতিতার ক্ষীণ আবরণ উন্মোচন করিয়া মিনহাজের বিবরণ হইতে সারসত্যের উদ্ধার কঠিন নহে।

মহম্মদ বখতিয়ার স্বয়ং বরেন্দ্র দেশের কতক অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। ১২০৫ কি ১২০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মহম্মদ সেরান ও তাঁহার ভ্রাতাকে এক দল সেনা সহ রাঢ়ের প্রধান নগর লখনোরের ও যাজনগরের (উড়িষ্যার) দিকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং দশ হাজার অশ্বারোহী লইয়া তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন। মহম্মদ বখতিয়ার কর্ত্তৃক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত আলি নামক মেচ সর্দ্দার তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। যে পথ অবলম্বন করিয়া মহম্মদ বখতিয়ার তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন, মিনহাজ তাহার যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক ভৌগোলিক তথ্য নিহিত আছে। মহম্মদ বখতিয়ার হয় লক্ষ্মণাবতী (বর্ত্তমান গৌড়) আর না হয় দেবকোট (বাণনগরের নিকটবর্ত্তী দমদম) হইতে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন। আলি প্রথমতঃ তাঁহাকে বর্দ্ধন[কোট] নামক নগরের সন্নিধানে লইয়া গিয়াছিল। এই নগরের সম্মুখভাগ দিয়া [in front of that place] বেগবতী নামক আয়তনে গঙ্গার তিনগুণ একটি বৃহৎ নদী প্রবাহিত হইত। ব্লকম্যান মিনহাজের বর্দ্ধনকোটকে রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত গোবিন্দগঞ্জ থানার নিকটবর্ত্তী "বর্দ্ধনকুটী" গ্রাম ও "বেগবতী"কে করতোয়া নদী বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।* মিনহাজের "বেগবতী" যে করতোয়া, এ বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না। কেন না, মিনহাজ "বেগবতী" নদীকে বরেন্দ্র

* Raverty's Tabakat-i Nasiri pp 560—573 pp 761—700

নদী অবশ্যই তিস্তা (ত্রিস্রোতা)। করতোয়ার উৎপত্তিস্থান বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল। তৎকালে (১৭৮৭ সালের বন্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) তিস্তার জলরাশি করতোয়ার খাত দিয়া প্রবাহিত হইত। এই জন্যই করতোয়া আয়তনে এত বড় ছিল। মহম্মদ বখ্তিয়ার তিস্তার উপর পাষাণে নির্ম্মিত একটি প্রাচীন সেতু দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই সেতুর বিংশতির অধিক খিলান ছিল [a bridge of hewn stone and consisting of upwards of twenty arches] ব্লকমান লিখিয়াছেন, এই পাষাণের সেতু নিশ্চয়ই দার্জ্জিলিংএর নিকটে (neighbourhood) অবস্থিত ছিল। * কিন্তু দার্জ্জিলিং হইতে তিস্তা অনেক (১৭ মাইল) ব্যবধানে,† এবং তিস্তার যে অংশ দার্জ্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী, সেই অংশ হিমালয়ের পাদদেশ হইতে ২০ মাইল ব্যবধানে। আলি মেচ যে মহম্মদ বখ্তিয়ারের সহিত পার্ব্বত্য প্রদেশে এত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, মিনহাজের গ্রন্থ-পাঠে এরূপ মনে হয় না। যদিও মহম্মদ বখ্তিয়ারের তিব্বত-অভিমুখে গমনের বিবরণে মিনহাজ লিখিয়াছেন, আলি তাঁহাকে পার্ব্বত্য প্রদেশে এমন স্থানে লইয়া গেলেন, যেখানে পাষাণের সেতু ছিল, কিন্তু মহম্মদ বখ্তিয়ারের তিব্বত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের বিবরণে লিখিয়াছেন, মুসলমান সৈন্য তিব্বত হইতে যাত্রা করিয়া পার্ব্বত্য পথে ১৫ দিন চলিয়া—

"until they issued from the mountains into the country of Kamrup, and reached the head of that bridge."

"অবশেষে পর্ব্বত্য প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া, কামরূপ দেশে, সেতুর নিকটে উপস্থিত হইলেন।"

এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, যে স্থানে তিস্তা নদী হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া, কামরূপের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পতিত হইয়াছে, সেই স্থানে সেতু ছিল। যে স্থানে তিস্তা আসিয়া সমতল ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, সেই স্থান

* "The bridge must have been in the neighbourhood of Dorzhiling, or as we spell it, Darjeeling.

† "For a period of ten days, he [Ali the Mej] took the army up the river [Begmati] among the mountains, until he brought it to a place where, from remote times, they had built a bridge of hewn stone and consisting of upwards of twenty arches"

Reverty's Tabakat-i-Nasiri, p.561.

এখন শিবক নামে পরিচিত। অনুমান হয়, শিবকেই মিনহাজ-বর্ণিত পাষাণের সেতু অবস্থিত ছিল, এবং মহম্মদ বখ্তিয়ার এই সেতু পার হইয়া নিকটবর্ত্তী কোনও "দুয়ার" বা গিরিপথ দিয়া (হয় ত ডালিংকোট দুয়ার দিয়া) তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিস্তার স্রোত অত্যন্ত প্রবল, এবং জলও খুব গভীর। এই স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড গাঁথিয়া সেতুর নির্ম্মাণ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়। শিবকের নিকটেই তিস্তার মধ্যে সুবৃহৎ একখণ্ড প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। শিবকের উত্তরে, ৮।৯ মাইল ব্যবধানে, কালিঝোরা নামক স্থানে তিস্তার মধ্যে এইরূপ আর একখণ্ড প্রস্তর দেখিয়াছি। শিবকের দক্ষিণেও এরূপ অনেক প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমান হয়, এইরূপ অনেকগুলি প্রস্তরখণ্ড পরস্পর সমসূত্রে স্থাপন করিয়া এবং তদুপরি শালকাষ্ঠ ফেলিয়া মিনহাজ-বর্ণিত সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। অন্যপ্রকারের পাষাণের সেতুর অস্তিত্ব এখানে অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়। *

এই সেতু কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কামরূপের অধিপতি যখন শুনিতে পাইলেন, মুসলমান সেনা সেতু পার হইয়াছে, তখন দূত দ্বারা মহম্মদ বখ্তিয়ারকে বলিয়া পাঠাইলেন, "এ সময় তিব্বতে যাত্রা করা উচিত নয়, ফিরিয়া যাওয়া এবং যথোপযুক্ত আয়োজন করা আবশ্যক। কামরূপের রাজা আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আগামী বৎসর আমার সেনাবল সংগ্রহ করিয়া, মুসলমান সেনার অগ্রে যাত্রা করিব, এবং তিব্বত অধিকার করিয়া দিব।" মহম্মদ বখ্তিয়ার কামরূপাধিপের সদুপদেশে কর্ণপাত না করিয়া তিব্বতে যাত্রা করিলেন। ১৫ দিন ক্রমাগত চলিয়া ষোল দিনের দিন তিব্বতের উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন, এবং একটি দুর্গ অবরোধ করিলেন,

* গত ১লা বৈশাখ শ্রীযুক্ত কুমার [illegible] দেব রায়কোট ও জলপাইগুড়ির উকীল শ্রীযুক্ত শশিভূষণ [illegible] ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ [illegible] সহিত শিলিগুড়ি হইতে শিবক [illegible] শিলিগুড়ির উকীল শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় ও [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] আমাদের যান-বাহনাদির সকল সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কুমার [illegible] রায়কোট মিনহাজ-উদ্দীনের বর্ণনা [illegible] শিবক [illegible] দেখিয়াছিলেন। [illegible] দুই মাইল দক্ষিণে তিস্তার [illegible] স্থানে জলপাইগুড়ির উকীল শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তীর [illegible] আছে। এই [illegible] পাথর দৃষ্ট হয়।

কিন্তু পরদিনই পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হইলেন। পর্ব্বতের অধিবাসীরা পথের পার্শ্বের শুকনা কাঠ ও ঘাস আগুনে পোড়াইয়া দিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ফিরিবার সময় মুসলমান সেনা আহারাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিল, এবং ঘোড়ার মাংস খাইতে বাধ্য হইয়াছিল। পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া সেতুর নিকট আসিয়া মহম্মদ বখ্‌তিয়ার দেখিতে পাইলেন, তিনি যে দুই জন আমীরকে সেতু-রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা পরস্পরের সহিত কলহ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এবং কামরূপের হিন্দুগণ আসিয়া সেতুর দুইটি খিলান (দুইখণ্ড পাথর) সরাইয়া দিয়া সেতুর ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং মহম্মদ বখ্‌তিয়ার নদী পার হইবার কোনও উপায় করিতে পারিলেন না, এবং নৌকাও জুটিল না। তখন নিকটবর্ত্তী একটি দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করা পরামর্শসিদ্ধ হইল। মিনহাজ লিখিয়াছেন, এই মন্দিরটি অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত দৃঢ়, এবং অত্যন্ত সুন্দর ছিল, এবং উহার অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক সোনার ও রূপার দেবমূর্ত্তি ছিল। মধ্যে একটি সোনার মূর্ত্তি নাকি ওজনে দুই তিন হাজার মনেরও অধিক বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। মহম্মদ বখ্‌তিয়ার এই মন্দিরে আশ্রয় লইলেন, এবং নদী পার হইবার উপায়-উদ্ভাবনে সচেষ্ট রহিলেন। কামরূপের রাজা এই সংবাদ পাইয়া বহুসৈন্য সহ আসিয়া মন্দির অবরোধ করিলেন, এবং মন্দিরের চারি দিকে বাঁশের বেড়া দেওয়াইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার সমুদয় সেনা লইয়া বেড়ার এক দিক ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া নদীর তীরের দিকে ছুটিলেন, কামরূপ-সেনা তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া মুসলমানগণ নদী পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জন কয়েক ঘোড়া লইয়া জলে নামিয়া পড়িল, এবং কিছু দূর পর্য্যন্ত (about an arrow flight) ঘোড়া হাঁটিয়া যাইতে সমর্থ হইল। নদী হাঁটিয়া পার হওয়া যাইতে পারে, এরূপ স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মুসলমান সেনার মধ্যে কোলাহল উঠিল। তখন সকলেই জলে নামিয়া পড়িল, এবং হিন্দুরা আসিয়া নদীর পার দখল করিল। নদীর মধ্যভাগে অগাধ জল ছিল, সেইখানে উপস্থিত হইবামাত্র সমগ্র মুসলমান সেনা ডুবিয়া গেল। কেবল মহম্মদ বখ্‌তিয়ার ন্যূনাধিক শত অশ্বারোহী লইয়া অপর পারে পঁহুছিতে সমর্থ হইলেন।

মিনহাজের বিবরণে কামরূপী সৈন্যগণকে বেড়া দেওয়া, পশ্চাৎধাবন ও নদীর পার অধিকার ভিন্ন আর কোনও কার্য্যে লিপ্ত হইতে দেখা যায় না। তাঁহারা যদি এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, হাতিয়ার নাড়া চাড়া না করিতেন, তবে আর মুসলমানগণ সদলবলে জলে নামিয়া পড়িতেন না, যোগাড়যন্ত্র করিবার অবসর পাইতেন। সুতরাং মুসলমানসেনার ধ্বংস কার্য্যে কামরূপী সেনার বাহুবল তিস্তার প্রবল স্রোতের সহায় হইয়াছিল, এরূপ মনে করিতে হইবে। তবে মিনহাজের বর্ণনা-পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায়, কামরূপ-রাজ সেনাচালনে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং অযথা সেনাক্ষয় না করিয়া সুযোগমত কৌশলে শত্রুনাশ করিতে জানিতেন। মিনহাজ এই কামরূপ-রাজের নাম করেন নাই। আসামে প্রাপ্ত ১১০৭ শক সংবতের (১১৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দের) একখানি তাম্রশাসনে কামরূপের ভাস্কর বংশীয় নৃপতিগণের পরিচয় পাওয়া যায়।* মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের অভিযানের সময়ে এই ভাস্কর-বংশীয় কোনও নৃপতিই হয় ত পশ্চিম কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আসাম-বুরঞ্জির মতে, উত্তর কামরূপ তখন চুটিয়া জাতীয় নৃপতিগণের অধিকৃত।

মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের প্রথম দুই জন উত্তরাধিকারী, সেরানের ও আলিমর্দ্দনের সময় লক্ষণাবতী মুলুকে গোলমাল ছিল, সুতরাং তাঁহারা কামরূপ আক্রমণের অবসর পান নাই। কিন্তু হুসামুদ্দীন আইবজ (গিয়াসুদ্দীন), যিনি দেবকোট হইতে লাখনোর পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করিয়া বরেন্দ্রে ও রাঢ়ে মুসলমান শাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি কামরূপে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তৃত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। মিনহাজ লিখিয়াছেন—

"The parts around about the state of Lakhanawati such as Jaj-nagar, countries of Bang Kamrup, and Tirhut all sent tribute to him and the whole of that territory named Gaur passed under his control."

"উড়িষ্যা (জাজনগর), বঙ্গ, কামরূপ ও ত্রিহুত, লক্ষণাবতী রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ এই সকল প্রদেশ তাঁহাকে কর প্রেরণ করিয়াছিল, এবং গৌড় নামক সমস্ত ভূভাগ তাঁহার অধীন হইয়াছিল।"

---

* গৌড়রাজমালা; (১৩১৯), ৬৭ পৃ।

এখানে কর-প্রদানের অর্থ, বোধ হয়, উপহার-দ্রব্যের বিনিময়। কামরূপ ও বঙ্গ যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে গেয়াসুদ্দীনকে রীতিমত কর প্রদান করিত, তাহা হইলে তিনি আর কামরূপ ও বঙ্গ আক্রমণ করিতে গিয়া নিজের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিতেন না। মিনহাজ লিখিয়াছেন, হিজরী ৬২৪ সালে (১২২৭ খৃষ্টাব্দে) গেয়াসুদ্দীন লক্ষ্মণাবতী প্রহরিহীন করিয়া সসৈন্যে কামরূপের ও বঙ্গের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। এমন সময় সুলতান ইয়াল্তিমিসের পুত্র নাসিরুদ্দীন মামুদ সাহ আসিয়া লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিলেন। সংবাদ পাইয়া গেয়াসুদ্দীন ফিরিয়া আসিলেন, এবং মামুদ সাহের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া ধৃত ও নিহত হইয়াছিলেন।

ইহার পর ৩০ বৎসর কাল লক্ষ্মণাবতীর আর কোনও শাসনকর্ত্তা কামরূপ আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই, বা অবসর পান নাই। ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে মালিক ইখ্তিয়ারুদ্দীন ইউজবক বিশাল বেগবতী (করতোয়া) পার হইয়া কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন।† পশ্চিম কামরূপের অধীশ্বর পরাক্রান্ত রাঢ়-বরেন্দ্র-মগধাধীশের সুবিশাল সেনাবলের সম্মুখীন হওয়া সঙ্গত বোধ করিলেন না, রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। সুতরাং রাজধানী নির্ব্বিবাদে ইউজবকের হস্তগত হইল, এবং তিনি কামরূপ-রাজকোষের অপরিমেয় ধনরাশি লাভ করিলেন। ইউজবক নিজ নামে খোৎবা পড়াইয়া কামরূপেশ্বর বলিয়া আত্মঘোষণা করিলেন। এ দিকে কামরূপের অধিপতি পুনঃপুনঃ দূতমুখে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, "আপনি এখন স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাউন। আমি প্রতিবৎসর আপনার নিকট কর-স্বরূপ নির্দ্দিষ্টসংখ্যক স্বর্ণ ও হস্তী পাঠাইব, এবং আপনার নামে খোৎবা ও আপনার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত রাখিব।" ইউজবক এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন কামরূপপতি তাঁহার অনুচরগণকে ইউজবকের অনুমতি লইয়া রাজধানীর ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের সঞ্চিত ধান্যাদি ক্রয় করিতে আদেশ দিলেন। ইউজবক কিছুমাত্র ধান চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখেন নাই। যখন চৈতালী (ফসল) সংগ্রহ করিবার সময় উপস্থিত হইল, তখন কামরূপ-রাজ সেনাদল লইয়া আসিয়া রাজধানী অবরোধ করিলেন, চারি দিকের বাঁধ কাটিয়া দিয়া জলপ্লাবন ঘটাইলেন।

† Raverty's Tabakat-i-Nasiri, pp. 764—766.

আহার-অভাবে মুসলমান-সেনা মৃতকল্প হইল; তখন পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়াই স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু সমতল ক্ষেত্রের পথ জলময়, এবং কামরূপের সেনার অধিকৃত ছিল। তখন ইউজবক এক জন পথপ্রদর্শকের সাহায্যে পর্ব্বতের পাদদেশে পঁহুছিবার জন্য যত্নবান হইলেন। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই পার্ব্বত্য সঙ্কীর্ণপথে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক হিন্দুসেনা ঘিরিয়া ফেলিল। উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইউজবক হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন। একটি তীর আসিয়া সহসা তাঁহার বুকে বিঁধিল। তিনি ভূপতিত ও ধৃত হইলেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্রগণ ও অনুচরগণ সকলেই ধৃত হইল। আহত ইউজবক বিজয়ী কামরূপাধিপের নিকট নীত হইলে, স্বীয় পুত্রকে দেখিবার প্রার্থনা করিলেন, এবং পুত্র নিকটে আসিলে তাহার মুখে মুখ রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এ ক্ষেত্রেও মিনহাজ কামরূপাধিপতির নাম, এমন কি, পশ্চিম কামরূপের রাজধানীর নাম পর্য্যন্ত করেন নাই। এই কামরূপাধিপের নাম যাহাই হউক, ইনি যে এক জন অসাধারণ রণপণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না। যখন ইউজবক আসিয়া রাজধানীর দ্বারে উপনীত হইলেন, নগররক্ষিগণ রাজপুত হইলে তখন তাঁহারা হয় ত "জোহার" ব্রতে আত্মনাশ করিতেন। কিন্তু কামরূপাধিপ ও কামরূপী সেনা যেমনই সাহসী, তেমনই কৌশলী ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রুষ সম্রাট যে সমরনীতি অবলম্বন করিয়া প্রথম নেপোলিয়নের হস্ত হইতে ইউরোপ রক্ষা করিয়াছিলেন, কামরূপরাজও সেই নীতি অবলম্বন করিয়া ইউজবককে সদলবলে নাশ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে, বোধ হয়, পশ্চিম কামরূপ প্রায় সার্দ্ধ দুই শতাব্দ কাল মুসলমানের আক্রমণ হইতে মুক্ত ছিল। কেন না, ইউজবকের পরে ও হুসেন শাহ কর্ত্তৃক ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কমতাপুর অধিকারের পূর্ব্বে আর কখনও মুসলমান সেনা পশ্চিমকামরূপ আক্রমণ করিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না।

মিনহাজ ইউজবক-অধিকৃত কামরূপের রাজধানীর নাম না করিয়া থাকিলেও, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। পশ্চিম কামরূপের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষনিচয়ের মধ্যে কুচবিহারের অন্তর্গত কমতাপুরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রাচীন সমৃদ্ধির চিহ্নরাশিতে পরিপূর্ণ। ইহারই উপকণ্ঠে নরকাসুর-তনয় ভগদত্তের তথাকথিত কবচ বা গোসানীমারীর মন্দির। এই নিমিত্ত

যাহারা পশ্চিম কামরূপে বাস করেন, তাঁহারা মনে করেন, কামরূপের প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নস্তূপের উপর খেনরাজ নীলধ্বজ কমতাপুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। *

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ। †

ইহা একখানি বিরাট গ্রন্থ; চারি শত একানব্বই পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ পুস্তক, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজাচার্য্য, ভারতের মধ্যযুগের এই দুই আচার্য্যের জীবনকথা এই পুস্তকে অতি সাবধানে লিখিত হইয়াছে। এই দুই আচার্য্যের ধর্ম্ম-প্রচার ও উপনিষদের ভাষ্য-প্রচার কার্য্যের তুলনায় সমালোচনাও, ইউরোপের criticism-এর পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া, ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের তুলনা,—শঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজাচার্য্যের জীবনের তুলনা,—অনেক পণ্ডিতে [illegible] এই সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, লিখিবার কথাও বটে। এই লিখকদের [illegible] বুঝাইয়া তবে আমরা এই পুস্তকের গুণাগুণের বিচার করিব।

প্রবাদ এই যে, কলিকালে অবতার প্রকট হন না। ইঁহাদের কাছে আচার্য্যগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সম্প্রদায় করিয়া থাকেন। [illegible]-মুক্তার যিনি, তিনিই আচার্য্য; সাধন-পথের প্রবর্ত্তক যিনি, তিনিও আচার্য্য। কলিকাল—সমাজের পাতিত্যের কাল, সমাজধর্ম্মের অপচয়ের কাল। কলিকালে ধর্ম্ম ব্যষ্টিগত,—সমষ্টিগত নহে। সমষ্টিগত ধর্ম্ম বা সমাজধর্ম্ম-প্রবল যুগে কালে জাতির ও সমাজের পাতিত্য ঘটে না। যখন সমাজ পতিত, তখন বুঝিতে হইবে সমাজধর্ম্ম [illegible] ও পাতিত্য [illegible]সাধীন; ব্যষ্টির পুরুষ-কারের আয়ত্ত নহে। অতএব এই কলিকালে ব্যষ্টির বা ব্যক্তির ধর্ম্মরক্ষা বা ধর্ম্ম-

---

* শ্রীযুত কুমার গিরীন্দ্র দেব রায়কোট এইরূপ মনে করেন। তাঁহারা জলপাইগুড়ি মিউনিসিপালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র ঘোষের ও ভিতরগড়ের জোত-দার শ্রীযুত মন্মথনাথ গাঙ্গুলীর সহিত ১১ই জৈষ্ঠ ভিতরগড় দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রবাদানু-সারে ভিতরগড় পৃথু নামীয় জনৈক রাজার বাড়ী ছিল। ভিতরগড়ের অভ্যন্তর মহলগড়ে বিশেষ কোনও সমৃদ্ধির চিহ্ন নাই। সুতরাং ভিতরগড় কোনও কালে পশ্চিম কামরূপের রাজধানী ছিল বলিয়া মনে হয় না, সামান্তের একটি সুবিশাল সেনানিবাসমাত্র ছিল।

† শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। ১২, ১৩ গোপাল নিয়োগীর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

ঢের ভাল তার চেয়ে চলে' যাওয়া গান গেয়ে
আপনার মনে।
পলে পলে যাহা ফুটে', দলে দলে যায় টুটে',
হৃদয়ের বনে।

৫

মানুষেরে কিবা চায়, কেন করে হায় হায়,
কি তার অভাব?
কেবা জানে, কেবা বলে, —একমাত্র বলা চলে,
এ তার স্বভাব।
রমণী ধরিলে ক্রোড়ে, সব দুখ নাহি জোড়ে,
ফাঁক থেকে যায়।
শুধু মনে বুঝাইতে, দুখ দিয়া ঘুচাইতে,
আনে দেবতায়।
সে শুধু অবশ ধোঁয়া, নাহি দেয় ধরা ছোঁয়া,
নাহি যায় পরি।
সেই ভয়, সেই আশ নাহি কোন ভাব-ভাষা
যাতে রাখি ধরি।
অদ্ভুত রূপ কাঁদে, পড়িতে প্রেমের ফাঁদে,
ফিরে দ্বারে দ্বার
একবার আমি জানি, একবার আমি মানি
জগতের সার।
"জানি মোরা খাঁটি সত্য, ছোট বড় গূঢ় তত্ত্ব,
সকল গভীর।"
বলে' যারা করে শোর, জানে তারা কত জোর
কথার ফকির।
আমি চাহি শুধু আলো, ভাল নাহি বাসি কালো,
অন্ধকার ঘরে।
আর জানি এক খাঁটি, পায়ের নীচেতে মাটি
আছে পড়ে ধরে'।
মাটি আর আলো নিয়ে, ফিরে চাই ঘুরে ফিরে,
সসীমে অসীম।
যত কিছু লেখা পড়া, তার অর্থ শুধু গড়া
মাটির পিদীম।

আর নাহি জোটে মিল, হাতে লেগে আসে পিল,
চলে না কলম;
মস্তিষ্ক কাতরে চায়, এড়াতে চিন্তার দায়,
ঘুমের মলম।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষায় যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। শেষ বয়সেও তাঁহার এ আগ্রহ দেখিয়াছিলাম। একদা তিনি কিছু শিখিবার জন্য আচার্য্য ৺সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন; সঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেববাবু ছিলেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যের নাম অনেকেই হয় ত শুনিয়া থাকিবেন। এ দেশের লোক তাঁহাকে যতটা না চিনিত, বিদ্যার লীলাভূমি য়ুরোপ তাঁহাকে তদধিক চিনিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্বে আলাপ পরিচয় ছিল না। পরে উভয়ের মধ্যে একটু কুটুম্বিতা সংস্থাপিত হয়। সেই সূত্র ধরিয়া পরস্পর যাতায়াত আরম্ভ করেন। যে দিনের ঘটনা বলিতেছি, সেদিনের পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র বা ভূদেব বাবু কেহই আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে আসেন নাই।

বাড়ীটি ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ—কলিকাতার একটি গলির মধ্যে অবস্থিত। দুই জনে—বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেবচন্দ্র—দ্বারে দাঁড়াইয়া দ্বিতলের সিঁড়ির পানে চাহিয়া দেখিয়া আচার্য্য মহাশয়ের সহিত আলাপ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। সিঁড়িটি কাঠের—একটা মই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্মানিত অতিথিদ্বয় দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন শুনিয়া পূজনীয় আচার্য্য মহাশয় সিঁড়ির মাথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন; এবং উভয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ভূদেববাবু ও বঙ্কিমবাবু উভয়েই বিষণ্ণবদনে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আচার্য্য তখন নামিয়া আসিয়া উভয়কে উপরে উঠিতে অনুরোধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেববাবুর পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ভয় সংক্রামক। ভূদেববাবুর যে-টুকু সাহস ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। তিনি কাতরভাবে বলিলেন, "আচার্য্য মহাশয়, এ টোঙ্গায় ত উঠিতে পারিব না।" পূজ্যপাদ আচার্য্য মহাশয়

সিঁড়িতে কিরূপে উঠিতে নামিতে হয়, তাহার একটু মহলা দিলেন; কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোনও ফল হইল না।

আর একদিন বঙ্কিমচন্দ্র, মহারথী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া, আচার্য্য-দর্শনে আসিয়াছিলেন। সে দিন বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ়সংকল্প—বুকের ভিতর কি হইতেছিল, জানি না; কিন্তু গাড়ী ছাড়িয়া গলির ভিতর আসিতে না আসিতে তিনি রমেশবাবুর হাত জড়াইয়া ধরিলেন। বুঝিলাম, সাহসটুকু লোপ পাইয়াছে। অতঃপর সিঁড়ির নীচে যখন উভয়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বদনে ভয়ের চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছে। তিনি কেঁচো, কেন্নো, আর্শুলা প্রভৃতিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন, জানিতাম। কিন্তু যিনি উত্তালতরঙ্গমধ্যে, দস্যুসম্মুখে নির্ভীকচিত্ত, তিনি যে একটা সিঁড়িতে উঠিতে এতটা ভীত হইবেন, তাহা কখনও ভাবি নাই। অবশেষে নির্ভীকহৃদয় বলিষ্ঠদেহ রমেশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার তখনকার কাতর মুখ আমার কিছুদিন মনে ছিল। রমেশবাবু কোনও গতিকে বঙ্কিমচন্দ্রকে টানিয়া উপরে তুলিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিরাপদ স্থানে পঁহুছিয়া চক্ষু খুলিলেন, এবং বলিলেন, "ভাই রমেশ, উপরে তুল্‌বার সময় এই রকম করে আমায় তুলো।"

বঙ্কিমচন্দ্র আরও কয়েকবার সামশ্রমী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তখন তিনি "ধর্ম্মতত্ত্ব" লিখিতেছিলেন। শেষ আসিয়াছিলেন, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। সেবার শিক্ষার জন্ম নয়—আচার্য্য মহাশয়ের চতুষ্পাঠী পরিদর্শন করিবার জন্ম।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আনন্দ-মিলন।

'রথ দেখা ও কলাবেচা'—এই উভয় উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া বিগত অক্ষয়-তৃতীয়ার পূর্ব্ব দিন কুমারখালী গিয়াছিলাম। বঙ্গ-সাহিত্যে আজকাল, 'চীন-ভ্রমণ' 'জাপান-ভ্রমণ' প্রভৃতি প্রকাশিত হইতেছে; আমার কুমারখালী-ভ্রমণ কি এ বাজারে বিকাইবে?

অক্ষয়তৃতীয়ায় কুমারখালীতে কাঙ্গালের বন্ধু সাধকপ্রবর স্বর্গীয়

হরিনাথ মজুমদার মহাশয় নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সে আজ সতের বৎসরের কথা। এবার এই সপ্তদশ বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিবার জন্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। নিমন্ত্রণকর্ত্তা আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জলধর সেন ও কাঙ্গালের পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার। সাহিত্য-সেবায় জলধর বাবু কাঙ্গালের শিষ্য; কাঙ্গালের সুপবিত্র স্মৃতির প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্ত তিনি প্রতিবৎসর এই সময় কুমারখালীতে গমন করিয়া থাকেন; আমিও ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, কিন্তু "বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি"—ইহাই এখন আমার মূল মন্ত্র; এ পর্য্যন্ত গৃহ-বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কাঙ্গালের উৎসবে যোগদান করিতে পারি নাই। কিন্তু এবার যখন শুনিলাম—এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে কয়েক জন সাহিত্যিক বন্ধু কুমারখালীতে পদার্পণ করিবেন,—তখন তাঁহাদের সহিত মিলনের জন্ত হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সমাজপতি মহাশয়কে লিখিলাম, আমি কুমারখালী যাইতেছি, তিনি যেন পদবেদনায় উপেক্ষা করিয়া খোঁড়া পা লইয়াই কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন: ইহাতে তাঁহার পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই,—কুমারখালী ষ্টেশনে অনেক পাল্কী পাওয়া যায়। তবে সেই সকল 'ডিকৃস্' এডিসনের পাল্কী তিন চারিখানি যোড়া না দিলে সমাজপতি মহাশয়ের বর বপুর স্থান সঙ্কুলান হইবার সম্ভাবনা নাই! সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের সহিতও অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই। এই উপলক্ষে তাঁহারও দর্শনলাভ ঘটিতে পারে—জলধর বাবুর পত্রে এ আশা পাইয়াও যথেষ্ট উৎফুল্ল হইয়াছিলাম। বঙ্গ-সাহিত্যের অন্ততম রথী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের সুপবিত্র সম্মার্জ্জনীর আক্রমণ হইতে কবিশ্রেষ্ঠ দাশরথী রায়কে উদ্ধার করিয়া চন্দ্রশেখর বাবু আমাদের ন্তায় অকৃতী সাহিত্য-সেবকগণের যেরূপ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, সেই কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের জন্তও তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আগ্রহ প্রবল হইয়াছিল।

আমাদের বাসগ্রাম মেহেরপুর হইতে কুমারখালী যাইতে হইলে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে ট্রেণে চড়িতে হয়। মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনের নয় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত; এই দীর্ঘ পথ সাধারণতঃ সনাতন গরুর গাড়ীতেই 'পাড়ী' দিতে হয়; ঘোড়ার গাড়ীও দুই এক-

খানা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু 'ঢাকের কড়িতে মনসা বিকায়!'—তবে যাঁহারা এই নয় ক্রোশ পথ যাতায়াতে দশ টাকা খরচ করিতে কষ্ট বোধ না করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

গরুর গাড়ীতে নয় ক্রোশ যাইতে হয়, শুনিয়া সহর অঞ্চলের পল্লী-ভ্রমণবিমুখ যান-বিলাসী পাঠকসমাজের হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে; কিন্তু আমরা পল্লীগ্রামের লোক, গো-যান আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে বেশ খাপ খায়। গরুর গাড়ীর 'ছৈ' দেখিতে মন্দ নয়। বাখারীর সাজের উপর ফরাসী ছিট্ বা শালু বিস্তৃত; তাহার উপর দু পুরু চাটাই; তাহার উপর চট, আলকাতরায় অনুরঞ্জিত;—'ছৈ'-এর মধ্যে বসিয়া রৌদ্রে পুড়িবার বা বৃষ্টিতে ভিজিবার আশঙ্কা নাই। তাহার পর ছৈএর মধ্যে পুরু করিয়া বিচালী বিছাইয়া, তুষক পাতিয়া, বালিশে মাথা রাখিয়া, লম্বা হইয়া শয়ন করিলে, এই নয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে কোনও কষ্ট হয় না! শয়নের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাকর্ষণ হয়; চুয়াডাঙ্গার প্রান্ত-বাহিনী পূর্ণা নদীর তীরে আসিয়া গাড়ী থামিবার পূর্ব্বে নিদ্রাভঙ্গের সম্ভাবনা অল্প। তবে রাত্রিকালে যাত্রা করিয়া কখনও কখনও ট্রেণ ধরা কঠিন হয় বটে; কারণ, গাড়ীতে উঠিয়া শয়ন করিবার পরই আরোহীর নাসিকাগর্জ্জন আরম্ভ হয়, তাহার পর দুই এক ক্রোশ যাইতে না যাইতে 'ছৈ'-এর সম্মুখে উপবিষ্ট গাড়োয়ান মহাশয়ের তৈলচর্চ্চিত মস্তক বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে, শিথিল মুষ্টি হইতে 'পাচন' খসিয়া পড়ে; তখন বলদ দুটিও 'জোঁয়াল' ঘাড়ে লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘুমায়! কিন্তু বাষ্পীয় শকটের চক্ষুতে ঘুম নাই, সে বায়ুবেগে যথাসময়ে ষ্টেশনে আসে, এবং পাঁচ মিনিট থামিয়া বাঁশী বাজাইয়া গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলে। নিদ্রাভঙ্গে গাড়োয়ান বলদদ্বয়ের লেজ মলিয়া 'উড়ে চ, বাবা-ধন ডা!' বলিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিয়াও ট্রেণ ধরিতে পারে না! অগত্যা নিদ্রোত্থিত ক্রুদ্ধ আরোহী গাড়োয়ান বেচারাকে মনের সুখে গালি দিয়া শান্তিলাভ করে।

নদীয়ার পোষ্টাল সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট সহৃদয় শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ মহাশয়ের অনুগ্রহে এই অসুবিধা কতকটা দূর হইয়াছে। তিনি মেহেরপুর হইতে চুয়াডাঙ্গা পর্য্যন্ত ডাকগাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া স্থানীয় জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ডাকগাড়ী প্রত্যহ রাত্রে

চুয়াডাঙ্গা পর্য্যন্ত একখানা ডাক লইয়া যাতায়াত করে। গাড়ীর ছাদে ডাকের ব্যাগ, কোচবক্সে' বিউগিল-ধারী কোচম্যান, তাহার এক হস্তে পক্ষিরাজের রজ্জু-নির্ম্মিত লাগাম, অন্য হস্তে বিউগিল। গাড়ীর ভিতর চারি জন আরোহীর স্থান। প্রত্যেক আরোহীর টিকিটের মূল্য এক টাকা চারি আনা। আরোহিগণকে লট্‌বহর লইয়া স্থানীয় ডাক-ঘরের বারান্দায় ছারপোকা-কণ্টকিত আমকাঠের বেঞ্চিতে বসিয়া ঝিমাইতে হয়, এবং কদাচিৎ ডাকমুন্সী মহাশয়ের গড়গড়ার শীর্ষস্থিত অম্বুরী তামাকের মিষ্টগন্ধ তাহাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে। যে দিন চারি জন আরোহী না জোটে, সে দিন কোচম্যান ঘন ঘন বিউগিল ধ্বনি করে; অভিপ্রায় এই যে, 'চুয়াডাঙ্গায় যানেওয়ালা কেহ থাকো তো ছুটিয়া এস, ডাক-গাড়ী ছাড়িবার আর বড় দেরী নাই।'—পথের ধারে যাহাদের বাড়ী, তাহাদের ডাকঘর পর্য্যন্ত গিয়া ধরণা দিবার প্রয়োজন হয় না; তাহারা পথ হইতেই গাড়ীতে উঠে।

আমার বাড়ী পথের ধারে হইলেও সন্ধ্যার পর আহারাদি শেষ করিয়া ডাকঘরে উপস্থিত হইলাম। ডাক বাঁধিবার অধিক বিলম্ব ছিল না; গাড়ীতে উঠিয়া দেখিলাম—আমিই একমেবাদ্বিতীয়ম্; সেদিন অন্য আরোহী জোটে নাই।—রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় বিউগিল বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।—বাড়ীর কাছে আসিয়া আমি একবার সতৃষ্ণনয়নে আমার ঘরের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, আমার তিন বৎসরের ছেলেটি তাহার দিদির হাত ধরিয়া পৈঠায় দাঁড়াইয়া আছে; আমি গাড়ীতে আছি বুঝিয়া সে দুই হাত তুলিয়া করুণস্বরে 'বাবা বাবা' বলিয়া ডাকিল। বাবা যে তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারে, ইহা তাহার কল্পনাতীত। অন্যদিন এতক্ষণ সে শয়ন করে—আজ অন্ধকার রাত্রে গাড়ীখানি দেখি-বার জন্য সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাত্রার পূর্ব্বে সে কতবার বলিয়াছিল, "তোমাকে যেতে দেবনা বাবা!"—কিন্তু "তবু যেতে দিতে হয়।"

আকাশে মেঘ করিয়াছিল; অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে সেই বৃষ্টি বড় তৃপ্তিকর বোধ হইল। গাড়ী ক্রমে গ্রাম্য-পথ অতিক্রম করিয়া মাঠে পড়িল। কোচম্যানের সঘন তূর্য্যনাদ ব্যর্থ হইল, আর কোনও যাত্রী জুটিল না।—চুয়াডাঙ্গা পর্য্যন্ত পথ ইষ্টক-বদ্ধ, পথের কোনও স্থানে গর্ত্ত, কোনও স্থানে ইষ্টকের পঞ্জর বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

অসমান পথে গাড়ী ভয়ানক দুলিতে লাগিল; আমি নির্ব্বিকারচিত্তে গাড়ীর ভিতর বসিয়া পল্লী-প্রকৃতির নৈশ শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। মাঠের পর মাঠ, লোকালয়ের চিহ্ন নাই, চষা মাঠের মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা কুল, বাবলা বা খেজুর গাছ দাঁড়াইয়া আছে; পথের দুই পাশে সেগুণ, কাঁঠাল ও জাম গাছের সারি; তাহাদের পত্রান্তরালে লক্ষ লক্ষ জোনাকী মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে; গর্ত্তের মধ্যে ঝিঁঝিঁর দল অবিশ্রান্ত ঝঙ্কার করিতেছে। একটি মাঠে এক জন রাখাল গরু চরাইতেছিল; দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্রে গরু চরাইতে পারে নাই; রাত্রে মাঠের মধ্যে গরুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া পথের প্রান্তবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র সাঁকোর পিল্‌পার উপর বসিয়া সে মেঠো সুরে গায়িতেছিল,—

"আর ত 'ব্রজে' যাবো না ভাই, যেতে মন নাহি চায়,
ব্রজের খেলা ফুরিয়েছে রে, তাই এসেছি মথুরায়।"

এমন মথুরায় সে প্রত্যহ আসে, এবং গরু চরাইয়া 'ব্রজে' ফিরিয়া যায়। কিন্তু তাহার শামলী ধবলী তখন কাহার ক্ষেতে পড়িয়া ফসল খাইতেছিল, সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না।

গাড়ী ক্রমে কাজলা নদীর ক্ষুদ্র পুল অতিক্রম করিয়া আমঝুপির ডাকঘরের কাছে থামিল। পথের দুই ধারে কয়েকখানি দোকান। কোনও দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, ভিতরে কেরোসিনের ডিবা হইতে অল্প আলো ও প্রচুর ধূম নির্গত হইতেছিল। দোকানী দোকানে বসিয়া নিম্নস্বরে কাহার সহিত গল্প করিতেছিল। কোনও দোকানে তখনও ক্রয় বিক্রয় চলিতেছিল। আবার কোনও দোকানে 'টাটে'র পাশে একখানি জলচৌকীর উপর বসিয়া এক জন লোক সুর করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করিতেছিল; আর এক দল শ্রোতা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া সেই সুধাময় পুণ্যগাথা শুনিতেছিল, এবং দোকানী অদূরে টুলের উপর বসিয়া গম্ভীরভাবে হুঁকা টানিতেছিল।

ডাকগাড়ীর বিউগিল শুনিয়া এক জন হরকরা একটা ব্যাগ আনিয়া কোচম্যানের হাতে দিল। কোচম্যান তাহা যথাস্থানে রাখিয়া ঘোড়ার পিঠে চাবুক দিল; পক্ষিরাজদ্বয় আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল।

মিনিট পনেরো পরে আমরা দীনদত্তের ঘাটে আসিয়া 'ইঞ্জিকেল ব্রিজ' দিয়া নদী পার হইলাম। জেলাবোর্ডের ঘাট, পারাণী না দিলে

সাঁকো পার হইবার উপায় নাই! সাধারণে এই সাঁকো-নির্ম্মাণের জন্ত কতক টাকা চাঁদা দিয়াছিল; জেলাবোর্ড কতক টাকা দিয়াছিলেন। কথা ছিল—ঘাটের ডাক যদি নিলামে হাজার টাকার উর্দ্ধে না উঠে, তাহা হইলে পারপণ্য না লইয়া লোক জনকে সাঁকো পার হইতে দেওয়া হইবে। কিন্তু কয়েক জন 'ফড়ে' জিদ্ করিয়া ডাক চড়াইতে লাগিল, বার'শ টাকায় ঘাট ডাক হইল। কাজেই যাত্রীদের পারাণী লাগিতেছে! স্থানীয় জনসাধারণ ভূতপূর্ব্ব কালেক্টরকে ধরিয়া বসিলেন, "আমরা চাঁদা দিয়াছি; এখন আবার পারাণী দিব কেন?—ঘাট যখন নিলাম করা হইয়াছে, তখন আমাদের চাঁদার টাকা ফেরত দেওয়া হউক।"—কালেক্টর বলিলেন, "তোমরা খেয়ার কড়ি দিয়া ভাঙ্গা নৌকায় ডুবিয়া পার হইতেছিলে, সাঁকো করিয়া দিলাম, এখন চাঁদা ফেরত চাও!" সুতরাং আমরা এখন গরুর গাড়ীর যাতায়াতে নয় পয়সা ও ঘোড়ার গাড়ীর যাতায়াতে পাঁচ সিকা পারাণী দিতেছি। গরুর গাড়ীর পারাণী নয় পয়সা হইলে যে ঘোড়ার গাড়ীর পারাণী পাঁচ সিকা হয়, জেলাবোর্ডের কোন্ শুভঙ্করের মস্তকে এই ত্রৈরাশিকের উদ্ভব হইয়াছিল? সুখের বিষয়, ডাকগাড়ীর পারাণী নাই, ডাকগাড়ীর আরোহিগণের পারাণী নগদ এক পয়সা।

পাছে কেহ চুরী করিয়া সাঁকো পার হয়, এই ভয়ে ঘাটের (বা পুলের) 'ইজারদার' পুলের মধ্যস্থলে একটি বাঁশের বেড়া দিয়া তালাবন্দী করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দর লৌহসেতুর উপর বাঁশের বেড়া—যেন সুদৃশ্ত তেতালার ছাদে গোলপাতার 'টাটি'!—পুল পার হইয়া গাড়ী খন্-খন্ ঝন্-ঝন্ শব্দে চুয়াডাঙ্গার দিকে ছুটিল। নিকটে কোনও গ্রাম নাই, মাঠের পর মাঠ, কর্ষিত কৃষিক্ষেত্র। নিশীথিনীর কৃষ্ণ অন্ধকার অবগুণ্ঠনে সমস্ত প্রকৃতি সমাচ্ছন্ন। নিকটে কোনও দিকে মনুষ্যের সাড়াশব্দ নাই; মধ্যে মধ্যে বহু-দূরবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসিগণের হরিনাম-সংকীর্ত্তন ও মৃদঙ্গধ্বনি অব্যাহত সমীরণ-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল। পথের দুই ধারে ডোবা, গর্ত্ত, নয়ানজুলি। পূর্ব্বদিন প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছিল; সেই সকল ডোবা ও গর্ত্তে যথেষ্টপরিমাণ জল সঞ্চিত হইয়াছে; আর ভেকের দল নানাস্বরে সঙ্গীতালাপ করিতেছে। একটা গর্ত্তের উপর বাঁশবনের মধ্যে বসিয়া একটা ডাহুক বিদীর্ণকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে। এই মেঘমণ্ডিত অন্ধকার রাত্রি, লক্ষ লক্ষ ভেকের মকধ্বনি, ডাহুকের হতাশ আর্ত্তনাদ, আর্দ্র বায়ুর

তীব্রপ্রবাহ, আর ফিস্ ফিস্ বৃষ্টি—সকলে মিলিয়া আমার চারি দিকে ঘনঘোরা শ্রাবণনিশার স্বরূপ ঘনাইয়া তুলিল। আমি মুগ্ধনেত্রে নৈশ-প্রকৃতির উন্মাদিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময় একটা আমবাগানের ভিতরে দলবদ্ধ হইয়া কতকগুলি শৃগাল 'হুয়া হুয়া' করিয়া উঠিল। বোধ হয় ঘোষণা করিল, একপ্রহর রাত্রি হয়া!

একপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত ডাকগাড়ীর বাতি জ্বলিবে, ইহা আশা করা বাতুলতামাত্র। ডাকগাড়ীর এক দিকে একটি লণ্ঠন, তিনখানা কাচের দেড়খানা নাই, মধ্বভাবে গুড়ের মত কাগজের পটী দিয়া কাচের অভাব দূর করা হইয়াছে!—এই এক লণ্ঠন জ্বালাইয়া একচক্ষু ভূতের মত গাড়ীখানি এতক্ষণ ঘণ্টায় ছয় মাইল বেগে ছুটিতেছিল। এখন বাতিটি নিবিয়া গিয়াছে। 'ফুলপালা'র অরণ্যের কাছে আসিয়া ভয় হইল, যদি এক দল ডাকাত হঠাৎ গাড়ী ঘেরাও করিয়া আমার ঘড়ী-চেন ও পাথেয় তিন টাকা সাড়ে তের আনা কাড়িয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আনন্দ-মিলন বিষম ব্যসনে পরিণত হইবে। কিন্তু ইংরাজের ডাকগাড়ীর উপর চড়াও করে, এত সাহস এ অঞ্চলের দস্যুদের নাই। ধন্য বৃটীশ-মহিমা, একটিমাত্র কোচ্‌ম্যান হাজার হাজার টাকার নোট-বোঝাই ডাকের ব্যাগ লইয়া এই অরণ্যসমাচ্ছন্ন নির্জ্জন পথে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিতেছে—অস্ত্রের মধ্যে তাহার হাতে এক বিউগিল, আর আমার হাতে এক ছড়ি!

রাত্রি দশটার সময় গাড়ী গোকুলখালী গ্রামের ডাকঘরের সম্মুখে আসিয়া 'বিউগিল্' দিল। ডাকঘরটি জেলাবোর্ডের রাস্তা হইতে পঁচিশ ত্রিশ হাত দূরে, খড়ের ঘর। ডাকঘরের বাবুর তখন মধ্যরাত্রি। পাঁচ সাত বার বিউগিল-ধ্বনির পর এক জন পিয়ন ডাকের ব্যাগ আনিয়া কোচ্‌ম্যানের হাতে দিল। পিয়নের চক্ষু নিদ্রাভারাবনত, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া সে ব্যাগটা গাড়ীতে দিতে আসিয়াছিল; পাছে ঘুমের নেশা ছুটিয়া যায়, এই ভয়ে সে চক্ষু মেলিতে সাহস করিতেছিল না। কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া কোচ্‌ম্যানের দয়া হইল না, সে বলিল, "একটু তামাক খাওয়াতে পারিস্ ভাই, ঠাণ্ডাতে হা পা 'কালিয়ে' দিলে!" পিয়ন হাঁই তুলিয়া তুড়ি দিয়া বলিল, "আঁধারে কল্‌কে খুঁজে পাব না।" কোচ্‌ম্যান বলিল, "কোল্‌কে আমার কাছেই আছে, দেশলাইও আছে।" পিয়ন বলিল, "তবে তামাক সেজে খাও।" কোচ্‌ম্যান বলিল, "তামাকই যে

নেই।" পিয়ন বলিল, "তবেই হয়েছে! আমাদের যে তামাকটুকু ছিল, তা মথুর হালদার সাঁজের বেলা 'সাবাড়' করে গিয়েছে।" কোচ্‌ম্যান বিরক্ত হইয়া বলিল, "দূর মিন্‌সে! তামাক রাখে না, ডাকঘরে চাকরী করে!" পিয়ন হাসিল। ডাকঘরে চাকরী করিয়া টেবিলের দেরাজে তামাক না রাখা গুরুতর অপরাধ! সে অপরাধীর মত অবনতমস্তকে সরিয়া পড়িল। কিন্তু কোচ্‌ম্যান নিরুৎসাহ হইবার পাত্র নহে, নতুবা সাত টাকা বেতনে সে কি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ডাকের গাড়ী চালায়? সে কলিকা লইয়া তাম্রকূট নামক মহাদ্রব্যের সন্ধানে মুদীর দোকানের দিকে চলিল। ঘোড়া দুটি বল্‌গার লৌহদণ্ড চর্ব্বণ করিয়া ক্ষুন্নিবারণ করিতে লাগিল। আমি পথপ্রান্তবর্ত্তী দোকানগুলির দিকে চাহিয়া রহিলাম।

আমার সম্মুখেই একটা ময়রার দোকান। দোকানী উনানের কাছে বসিয়া তখনও খোলায় 'তাড়ু' নাড়িতেছিল। বোধ হয়, বাঙ্গালী-চিত্তহারী রসগোল্লার ভিয়েন করিতেছিল। আহা রসগোল্লা! তোমার রসে যাহারা বঞ্চিত, তাহাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই। তুমি এই শ্রীভ্রষ্ট বাঙ্গলায় অতিথির মান রাখিয়াছ। তোমার কৃপায় শ্যালক-সম্প্রদায় ভগিনী-পতির গৃহে এখনও সসম্মানে বিরাজ করিতেছে। তোমার কত গুণ হে অখগুনগুলাকার!

এই প্রকার রসগোল্লার ধ্যানে নিমগ্ন আছি, এমন সময় অন্য দিকে একটি স্বর্ণকারের দোকানে হাতুড়ীর শব্দ হইল, আমারও ধ্যানভঙ্গ হইল; চাহিয়া দেখি—স্বর্ণকার মৃৎপ্রদীপের আলোকে হাতুড়ীর সাহায্যে স্বর্ণ বা রৌপ্যের ঘাতসহত্ব পরীক্ষা করিতেছে। তাহার অদূরে কয়েক জন লোক বসিয়া জটলা করিতেছে; তাহারা গল্প করিতেছিল, গল্পে রাজা বাদশা মারিতেছিল, আর এক জন একটা 'খেলো' হুঁকায় তামাক টানিতেছিল। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সে পুরুষ নহে, স্ত্রীলোক; বর্ষীয়সীর কথায় বুঝিলাম, সে অনেক পুরুষের অভিভাবক হইবার যোগ্য। সে এখানকার হোটেলওয়ালী। সে চাল ডাল তেল নুন কাঠ দেয়, পথিকেরা তাহার ঘরে ভাত রাঁধিয়া খায়, ঘরভাড়া দিয়া যায়, তাহাতেই তাহার চলে। কথায় বোধ হইল, সে পুরুষজাতিকে ভেড়ার সমান মনে করে!—হোটেলওয়ালী হুঁকাটা একটি যুবকের হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, "উম্‌লো, তুই যে ভারি 'মগরা' হয়ে গেলি, বয়স ত দু' কুড়ি তিন কুড়ি হলো, বিয়ে থাওয়া করবি নে নাকি?"

এই উমেশ জমীদারের গোমস্তা মহাশয়ের পত্নীর ভগিনীপতির ভ্রাতুষ্পুত্র। সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট; সে গোমস্তা মহাশয়ের গোরুবাছুর রাখে ও তামাক সাজে।—এমন যোগ্য ব্যক্তিকে এত বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে না দেখিয়া হোটেলওয়ালী দুঃখিতা।—উমেশ তামাকে দম্ দিয়া হতাশভাবে বলিল, "হুঁ, নিজের পেটের ভাত জোটে না, তা আবার বিয়ে!" হোটেলওয়ালী বলিল, "বাপঠাকুরবাবা জলগণ্ডূষের 'পিত্তেশ' রাখে তো। বিয়ে করবি নে কি 'নিব্বংশ' হবি?"

উমেশ বলিল, "বিয়ে করব যে, খেতে দেব কি?"

হোটেলওয়ালী হাত নাড়িয়া বলিল, "যে খেতে দিতে পারে, সে ত বিয়ে করবেই; যে খেতে দিতে না পারে, তারই ত বিয়ে করা সার্থক। তা, তোর এ কথা বল্‌তে লজ্জা হচ্ছে না? আমি এই বুড়ো মাগী, এখনও মাস্ গেলে দশ টাকা রোজগার করি।—আর তুই জোয়ান মরদ মিন্‌সে, দুবেলা দেড় সের চালের ভাত মারিস্, তুই কাজ দেখে ডরাস্!"

উমেশ বলিল, "তোমার যদি এত সখ হয়ে থাকে, তবে তুমিই একটা বিয়ে করে ফেল; আমি খেতেও দিতে পারব না, বিয়েও করবো না।—খাট্‌তে যে বল্‌ছো,—এখানে কাজ কোথায়?"

হোটেলওয়ালী বলিল, "কাজের অভাব কি? এখানে কাজ না মেলে, কল্‌কাতায় যা।"

উমেশ কাতরস্বরে বলিল, "দিদি বলেছে, আমি কলকাতায় গেলে হারিয়ে যাব।"

"মরণ আর কি!" হোটেলওয়ালীর এই ধিক্কারবাণী শুনিয়া উমেশ উৎসাহের সহিত তামাক টানিতে লাগিল। কোচ্‌ম্যানও গাড়ী ছাড়িয়া দিল।—আর আড়াই ক্রোশ দূরে চুয়াডাঙ্গার ঘাট।

মেঘ কাটিয়া গেল। আকাশে নক্ষত্র দেখা দিল। নক্ষত্রের অস্ফুট আলোকে পথের দুই ধারের বটগাছ, বাঁশ-ঝাড়, ভ্যাণ্ডার জঙ্গল নিস্তব্ধ ভূতের মত দেখাইতে লাগিল। পথের ধারে 'সমুদ্দিয়া' গ্রাম। গ্রাম্যপথের ধারে কৃষকের কুটীর, কলুদের ঘানিঘর। ঘানিঘরে বলদ পঞ্চানন চোখে 'ঠুলি' আঁটিয়া ঘানিগাছের চারি দিকে ঘুরিতেছে, অবিশ্রান্ত কাঁ-কোঁ শব্দ হইতেছে, আর কলু ঘানিগাছের 'পিঁড়ে'র উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে গাহিতেছে—"মা আমার ঘুরোবি কত,—চোকঢাকা বলদের মত,

সংসার-ঘানিতে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত!" বেচারার অবস্থা অতি সঙ্কটজনক। আসল ঘানিতে উঠিয়া ঘুরপাক খাইতে তাহার কষ্ট নাই, সংসার-ঘানির পাকটাই তাহার দুঃসহ বোধ হইতেছে।

দুই ধারের কুটীরগুলি অন্ধকারে গাছের ছায়ায় ঘুমাইতেছে। অশ্বত্থ গাছের ডালে বাদুড় ঝট্‌পট্‌ করিয়া উঠিল। একটা কুকুর পথের পাশে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়াছিল, সে গাড়ী দেখিয়া উঠিয়া সোরগোল আরম্ভ করিল; সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অনেক কুকুর গৃহস্থের বাড়ীর ভিতর হইতে তাহার সঙ্গীতে 'কোরাস' দিতে লাগিল। ঘোড়া দুটি ঘর্ম্মাপ্লুতদেহে ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। একটা ঘোড়া কিছু দুষ্ট ছিল, সে ক্ষেপিয়া গাড়ীখানি নয়নজুলির দিকে টানিয়া লইয়া গেল। কোচ্‌ম্যান বেগতিক দেখিয়া 'বাবু নামুন' বলিয়াই ঝুপ করিয়া নামিয়া পড়িল, এবং ঘোড়ার মুখরজ্জু ধরিয়া নয়নজুলির দিক হইতে গাড়ী টানিয়া আনিল; তাহার পর ঘোড়াটাকে ধরিয়া রীতিমত চাব্‌কাইয়া দিল।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় গাড়ী চুয়াডাঙ্গার নীচে চূর্ণী নদীর ঘাটের ধারে আসিয়া থামিল। মাঝি নৌকায় পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। নৌকার এক পাশে গরুর গাড়ীর ছাউনীর মত একটু 'ছই', তাহার ভিতর একখানা ছেঁড়া কাঁথা; সেই কাঁথায় শয়ন করিয়া পাটনী লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিতেছিল। বিউগিলের শব্দে তাহার স্বপ্ন ছুটিয়া গেল, ডাক আসিয়াছে বুঝিয়া সে তীরে নৌকা বাঁধিল। কোচ্‌ম্যান ডাকের বোঝা দুই তিন বারে নৌকায় আনিয়া ফেলিল। আমি নৌকায় উঠিয়া কয়েক মিনিটেই নদী পার হইলাম।

অপর পারে আর একখানি গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল; কোচ্‌ম্যান তাহার ছাদে ডাক তুলিল, আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম।—ডাক-গাড়ীর মালিক আমার টিকিট লইয়া গেল; যাইবার সময় গাড়ীর ভিতরের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ মোটে এক জন সোয়ার!—বেশী বিগল্‌ দিস্‌নি বুঝি?" কোচম্যান রাগ করিয়া বলিল, "তোমার সুবিধে বুঝে ত আর সোয়ার আস্‌বে না।"

ষ্টেশনে আসিয়াই দেখি—প্লাটফর্ম্মে ট্রেণ!—কি সর্ব্বনাশ! স'এগারটা বাজিয়াছে। তাড়াতাড়ি টিকিট লইয়া প্লাটফর্ম্মে পা দিয়াছি, এমন সময় বংশীধ্বনি করিয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।—সম্মুখে যে গাড়ী পাইলাম, তাহাতেই উঠিয়া পড়িলাম

—দেখিলাম, একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়াছি।—উপরে দুই ধারে দুটি আলো জলিতেছে, আর বাট জনের স্থানে জন কুড়ি যাত্রী বেঞ্চিগুলি দখল করিয়া কেহ নিদ্রা যাইতেছে; কেহ বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে; কেহ তামাক টানিতেছে, কেহ বা শ্যামা-বিষয়ক গান করিতেছে। এক জন গাড়ীর জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সিগারেট, এ ষ্টেশনে সিগারেট পাওয়া যায় না?"—এক জন খালাসী চলন্ত গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া বলিল,—"যায়, আগে।"

ধূলিধূসরিত ময়লা বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িলাম। ট্রেণ মাঠের উপর দিয়া ছুটিল।—যে লোকটা হুঁকা টানিতেছিল, সে এক মুখ ধূম উদ্গিরণ করিয়া কলকেটা হাত হইতে নামাইয়া আমার দিকে প্রসারিত করিল, বলিল, "আজ্ঞে তামাক ইচ্ছে করবেন কি?" আমি "তামাক ইচ্ছে" করিলাম না। দেখিয়া সে পুনর্ব্বার তাহা হুঁকায় চড়াইয়া নিরুদ্বেগে টানিতে লাগিল। তামাক খাওয়া শেষ হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে, কত দূর যাবেন?" আমি বলিলাম, "কুমারখালী; তুমি?" তামাক-ইচ্ছু বলিল, "আজ্ঞে আমি কুষ্টে যাব, সেখানে আমার জামাইবাড়ী,—আমার জামাই"—সে এক প্রকাণ্ড গল্প ফাঁদিল। কিন্তু গল্প শেষ হইল না, কারণ, পাশের বেঞ্চিতে এক জন শুইয়া, আর এক জন বসিয়া ছিল, যে শুইয়াছিল, সে নিদ্রাঘোরে তাহার ধূলিধূসরিত শ্রীচরণকমল প্রসারিত করিল, যে বসিয়াছিল, তাহার অঙ্গে শ্রীপদস্পর্শ হইল। আর কোথায় যাবে!—সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "বাহারে মজা! তুমি হাত গিলতে গিলতে যে বাত গিলে ফেল্লে? ছিলে বসে, তার পর কাত হ'লে, এখন একেবারে লম্বা? আমার গায়ে পা? ওঠ্, বেটা বৈরাগী!" যে শয়ন করিয়াছিল, সে যে এক জন পরম বৈরাগী—তাহা জানিতাম না। বৈরাগী প্রভু গালি খাইয়া উঠিলে তাঁহার স্থূল চৈতন্য দর্শন করিয়া চক্ষু সফল করিলাম। শাক্ত ও চৈতন্যে তখন মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইতিমধ্যে ট্রেণ মুড়াগাছে থামিল। বাবাজীও তাঁহার ঝুলি ও লাঠী লইয়া নামিয়া পড়িলেন। নামিবার সময় বলিলেন, "বেটার চৌদ্দ পুরুষের গাড়ী! শুতে দেবেন না, ভাড়া দিয়ে গাড়ীতে উঠে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে।"

পোড়াদহে আসিয়া দেখি, এক ভদ্রলোক সজীব নির্জ্জীব অনেকগুলি

পুঁটুলি লইয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন। দুইটি অবগুণ্ঠনবতীর পশ্চাতে চারি পাঁচটি ছেলে মেয়ে, তিন চারিটি ট্রঙ্ক, দুইটি বিছানার মোট। গাড়ী বোঝাই হইয়া গেল। আমি কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! পা দুখানি কোথায় রাখি!" ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আমার এই বিছানার বাণ্ডিলের উপর রাখুন। মেয়েদের কম্পার্টমেণ্ট অনেক দূরে—আর এই রাত্রিকাল, সকলকে নিয়ে এই গাড়ীতেই উঠ্‌ছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত দূর যাবেন?" ভদ্রলোকটি একটি তিন বৎসরের ছেলেকে বেঞ্চির উপর শয়ন করাইয়া বলিলেন, "যাব গোয়ালন্দ।"

আগন্তুকের সঙ্গে এক আঁটী আখ্ ছিল। এক একখানি ইক্ষু যেন নিরেট বাঁশ! এত মোটা আখ কখনও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। আমি ভদ্রলোককে বলিলাম, "এতগুলি মারাত্মক অস্ত্র (Deadly weapons) লইয়া যাইতেছেন, পাশ লইয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "আমি রেলের কর্ম্মচারী, আমার পাশ আছে।" আমি বলিলাম, "সে পাশ নয়, অস্ত্রের পাশ লইয়াছেন?" ভদ্রলোক সবিস্ময়ে বলিলেন, "অস্ত্র কোথায়?" আমি বলিলাম, "ঐ আখ্, এক একখানি আখ যে বংশলোচন! পাকা বাঁশের লাঠী উহার কাছে হারি মানে। মারাত্মক অস্ত্র নয় কি?" ভদ্রলোকটি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তাহার পর তিনি এক অদ্ভুত কার্য্য আরম্ভ করিলেন; সেই রাত্রি একটার সময় গোটাকত কমলা লেবু ভাঙ্গিয়া খাইতে লাগিলেন। ছেলে মেয়ের হাতেও দুই একখানা দিলেন। লেবু-ভক্ষণের পর একখানি ছুরি বাহির করিয়া ইক্ষুদণ্ড-কর্ত্তনে মনঃসংযোগ করিলেন। কিন্তু সে আখ কাটিতে কুঠার আবশ্যক, ছুরিতে তাহা কাটিল না; কিন্তু ভদ্রলোকটির উৎসাহ বালকের অপেক্ষাও অধিক; তিনি একটি মোট খুলিয়া পানের বাটার ভিতর হইতে একখানি অর্দ্ধহস্ত দীর্ঘ জাঁতি বাহির করিলেন, এবং তাহার সাহায্যে ইক্ষুদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া কতক স্বয়ং চর্ব্বণ করিলেন, কতক বিতরণ করিলেন; আমাকেও কয়েক খণ্ড দিতে আসিলেন, আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিলাম। তখন তিনি রুলের মত লম্বা একখানি আখ আমাকে দিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে ত মোটা লাঠী নাই, কাছে রাখুন, রাত্রে লাঠীর কাজ করিবে।"

রাত্রি প্রায় দুইটার সময় ট্রেণ কুমারখালী ষ্টেশনে থামিলে আমি

সেই ইক্ষুদণ্ড লইয়া প্ল্যাটফর্মে নামিলাম। কথা ছিল, আমার আত্মীয় আলো পাঠাইবেন, কিন্তু "কা কস্য পরিবেদনা!"

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া একাকী অন্ধকারপূর্ণ পথ দিয়া বাজার অতিক্রম করিলাম। তত রাত্রেও এক জন লোক একটা দোকানের খোলা বারান্দায় শুইয়া উচ্চকণ্ঠে একটা দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গান গাহিতেছিল। ইহা ভিন্ন কোনও দিকে অন্য কোনও শব্দ ছিল না।—প্রায় এক মাইল দূরে গৌরী নদীর চরের উপর আমার আত্মীয়ের বাড়ী।—আমি কোনও রকমে সেখানে উপস্থিত হইয়া মশারীর ভিতর আশ্রয় লইলাম।

পর দিন বেলা নয়টার সময় কলিকাতার বন্ধুগণ কুমারখালী ষ্টেশনে নামিলেন। আমি জলধর বাবুর সঙ্গে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলাম। ভগ্নপদ সমাজপতি মহাশয়ের জন্য একখানি পাল্কী-সংগ্রহের চেষ্টা হইল। কিন্তু সে বিরাট দেহ বালখিল্যগণের উপযোগী পাল্কীতে ধরিবে কেন?—অগত্যা তাঁহাকে পদব্রজেই জলধর-ভবনাভিমুখে যাত্রা করিতে হইল। জলধর বাবু তৎপূর্ব্বে সাড়ে পাঁচ টাকা মূল্যের এক বিরাট রোহিত মৎস্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে আহারের আয়োজন কিরূপ গুরুতর, তাহা তখনই বুঝিতে পারিলাম।

মধ্যাহ্নে স্নানান্তে বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইলাম। জলধরবাবু জলযোগের বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। এমন আয়োজনে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় যোগদান করিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এ যাত্রা তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। অগত্যা ঘোলের সরবতে আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম। আধখানা ইটের মত চতুষ্কোণ একটি মিষ্ট পদার্থ ভক্ষণ করিয়া কলিকাতার বন্ধুগণ বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন; এই মিষ্টান্নের নাম 'চমচম্ বরফী'। একখানির পর আর একখানি, অগত্যা আমাদের সকলকে রণেভঙ্গ দিতে হইল, কিন্তু গল্প-লেখক শ্রীযুক্ত ফকীরবাবু আর 'না' বলেন না! আমরা বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম; সমাজপতি মহাশয় বলিলেন, "ফকীরে কখনও না বলে না।" একটি রসিক বন্ধু ফকীরবাবুর চাদরে কিছু মিষ্টান্ন বাঁধিয়া দিলেন। শুনিলাম, কলিকাতার বন্ধুগণ পোড়াদহ ষ্টেশনে বালিসের মত স্থূল লম্বা পাউরুটী ও জালা-প্রমাণ মাখন দ্বারা প্রাতরাশ শেষ করিয়াছিলেন। তাহার পর

এই রকম ক্ষুধা! কলিকাতার লোক, বিশেষতঃ সাহিত্যসেবীরা অল্পভোজী, এ দুর্নামের কারণ কি?

সাড়ে পাঁচ টাকা মূল্যের রোহিত মৎস্য পাকে তিনটা বাজিয়া গেল। গানে, খোসগল্পে সময় কাটিতে লাগিল। স্বর্গীয় বাবু পূর্ণানন্দ সাহার প্রকাণ্ড দ্বিতল বৈঠকখানায় অতিথিগণের বাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সুবিস্তৃত ফরাসে আমরা গড়াইতে লাগিলাম। জলযোগের পর মাননীয় কবিবর শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের অবস্থা নিতান্ত সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। রাত্রে ট্রেণে ভাল নিদ্রা হয় নাই। তাহার উপর এই জলযোগ। তিনি উপাধানে মাথা রাখিয়া নাসিকাগর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। সুরসিক এটর্ণী জ্ঞানপ্রিয়বাবু সমাজপতি মহাশয়ের নস্যদানী হইতে খানিক নস্য একটি কাগজের ঠোঙ্গায় রাখিয়া ঠোঙ্গাটি বাগচী কবির নাসারন্ধ্রের কাছে ধরিলেন, ঠোঙ্গার নস্য একটানে কবিবরের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল! তাঁহাকে সুনিদ্রার আশা পরিত্যাগ করিতে হইল।

বেলা চারিটার পর আমাদের আহারাদি শেষ হইল। জ্ঞানপ্রিয়বাবু তখন লাউর ঘণ্টের তৃতীয় সংস্করণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমরা বাগচী কবিকে মাথায় তুলিয়া বৈঠকখানায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম, কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না। এই গুরুতর ভোজনের পর তিনি আর লজ্জার মাথা খাইতে পারিলেন না, অগত্যা অতিকষ্টে লাঠীতে ভর দিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন।

পাঁচটার সময় কাঙ্গাল হরিনাথের গৃহপ্রাঙ্গণে সভা বসিল। জ্ঞানপ্রিয় বাবুর সঙ্গীতে ও সভাপতি মহাশয়ের হৃদয়স্পর্শিনী বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সাড়ে পাঁচটার সময় বৃষ্টি আসিয়া সভার কার্য্যে একটু বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছিল। অগত্যা আমরা এক জন ভদ্রলোকের খড়ের ঘরে আশ্রয় লইলাম। অদূরে একটি ডাব গাছ দেখিয়া বাগচী কবির পিপাসার উদ্রেক হইল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে হাঁকিলেন, 'ডাব আনো'। তৎক্ষণাৎ দুটি ডাব আসিল, কিন্তু তাহার জল গরম, কবিবর তাহা স্পর্শ করিতে পারিলেন না। অল্পক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিলে আবার সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। শ্রীযুত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় কাঙ্গালের গুণকীর্ত্তন করিলেন; তাঁহার মুখে কাঙ্গালের কথা সকলেরই প্রীতিকর হইয়াছিল।

গোধূলির সময় কলিকাতার ফটোগ্রাফার হপলিং কোম্পানীর অধ্যক্ষ

মহাশয় সভাস্থলে ক্যামেরা খাটাইয়া সভার ফটো তুলিলেন। কাঙ্গালের অয়েলপেণ্টিং-এরও একখানি ফটো লওয়া হইল। সন্ধ্যার পর দলে দলে সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইল। সঙ্কীর্ত্তনকারীরা কাঙ্গালের ছবি স্কন্ধে লইয়া নাচিতে নাচিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। পল্লীবধূরা গৃহবাতায়ন হইতে সেই মধুর দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। গ্রামের পথ উৎসবমুখর হইয়া উঠিল। আমরা বৈঠকখানায় ফিরিলাম। সেখানে আবার গান গল্প আরম্ভ হইল। দেখিলাম, সুকণ্ঠ জ্ঞানপ্রিয় বাবুর নিকট সঙ্গীতে তাঁহার ওস্তাদকেও হারি মানিতে হয়!—রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গীত চলিল। দেখিতে দেখিতে ট্রেণের সময় হইয়া আসিল।

জলধরবাবু অতিথিসৎকারের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। রাত্রে আবার গুরুতর ভোজন! এবার 'অখণ্ডমণ্ডলাকার' লুচি, তাহার উপর নানা উপকরণ! বন্ধুগণ প্রমাদ গণিলেন। মেলট্রেণে ঢাকাই আরোহিগণের ভিড়ে স্থানাভাবের আশঙ্কায় বন্ধুগণ মিক্সড্‌ট্রেণে কলিকাতা-যাত্রাই সঙ্গত মনে করিলেন। আশা করিলেন, তাঁহারা হাত পা মেলিয়া শুইয়া যাইতে পারিবেন।

আমার আর সে রাত্রে যাওয়া হইল না। মধ্যপথে বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া ক্ষুন্নমনে আত্মীয়ের গৃহে ফিরিলাম। এই কয়েক ঘণ্টার আনন্দ-মিলন বহুকাল স্মরণ থাকিবে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সনেট-পঞ্চাশৎ। *

আজ আমরা এক জন নূতন কবির পরিচয় পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরীর নাম বাঙ্গালা সাহিত্যে একেবারে অপরিচিত না হইলেও, তিনি যে প্রকৃত কবি, তাহা আজ আমরা তাঁহার এই অভিনব "সনেট-পঞ্চাশৎ" পুস্তিকা-পাঠে জানিলাম। প্রকৃত কাব্যানুরাগীর পক্ষে আর একটি আনন্দের বিষয় এই যে, প্রমথবাবুর কবি-প্রতিভা যে শ্রেণীরই হউক না কেন, তাঁহার এই প্রথম পুস্তকেই তিনি নিজের বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য প্র

* শ্রীপ্রমথ চৌধুরী বিরচিত।

মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। ইহার কণ্ঠ নূতন, ভঙ্গীও নূতন। পূর্ব্বপরিচিত কোনও কবির কণ্ঠ ও ভঙ্গীর প্রতিধ্বনি বা ছায়া তাঁহার কবিতার মধ্যে দেখিলাম না। সাহিত্যে এই স্বাতন্ত্র্য অমূল্য—বৈচিত্র্যের কারণ এবং ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তির মূল। প্রকৃত কবির স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা থাকিবেই। তাঁহার শক্তি যেরূপই হউক না কেন, তাঁহার নিজের বলিবার কথাও আছে, বলিবার ভঙ্গীও আছে। ইহা অনিবার্য্য। এই অনন্যসাধারণতাতেই তাঁহার মর্য্যাদা—এমন কি, তাঁহার অমরত্ব। তুমি তাঁহার কবিতায় যে রস—যে মাধুর্য্য বা সৌন্দর্য্য অনুভব করিবে, অপর কোনও কবির কাব্যে ঠিক তাহা পাইবে না। এবং সে রস মনে পড়িলেই সেই কবিকেও মনে পড়িবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটি বুঝাইতে হইলে ইংরেজী সাহিত্য হইতে প্রকৃত উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। "আমরা বড়লোক" হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরেজী সাহিত্যে যেরূপ পুঞ্জ পুঞ্জ প্রকৃত কবি আছে, সংস্কৃত বা আধুনিক ভারতীয় কোনও সাহিত্যে তেমন নাই। ইংরেজী কবিদিগের মধ্যে Mathew Proiorকে কেহ কোন দিন প্রথম শ্রেণীর কবি বলে নাই। কিন্তু তাঁহার বিশেষত্ব সকলেই স্বীকার করিয়াছে। তাঁহার কবিতার মধ্যে এমন একটি অনন্যসাধারণ অমায়িক সরল হাস্য পরিহাসের মধুর বিকাশ আছে, যাহা Praiorএর অপেক্ষা উচ্চ বা নিম্ন শ্রেণীর কোনও কবির রচনায় দেখিতে পাইবে না। ভাষা এবং ভাবে কোনও অভাবও উপলক্ষিত হইবে না। পাঠে তোমার রসানুভববৃত্তি চরিতার্থ হইবে। এবং যখনই সেই রসের কথা মনে পড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে Priorকেও মনে পড়িবে। ছোট কবি হইলেও Priorএর নিজের মর্য্যাদা আছে। Prior অমর। আমার বিবেচনায় আমাদের সমালোচ্য কবি প্রমথ চৌধুরীরও নিজের মর্য্যাদা আছে, এবং এই প্রবন্ধে সেই মর্য্যাদা যে কি, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রমথবাবু তাঁহার কবি-কল্পনা ও চিন্তা সনেট্-আকারে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং "স্বদেশী"র ভয় না রাখিয়া পুস্তকের নাম "সনেট্-পঞ্চাশৎ" দিয়াছেন। এই কবির একটি বিশেষ ও প্রধান গুণ - স্বাধীনতা ও নির্ভীকতা। গ্রন্থের নামকরণেই তাহার পরিচয়। সনেট্ জিনিসটাই যখন বিদেশী, তখন তাহার বিদেশী নাম বাঙ্গালায় চালাইলে ক্ষতি কি?

ইউরোপীয় সাহিত্যে সনেট্ কবির ভাবপ্রকাশের একটি সুপরিচিত এবং

বিশেষ মর্য্যাদাপ্রাপ্ত প্রণালী। সম্ভবতঃ ইতালী ইহার জন্মস্থান। অন্ততঃ ইতালীয় কবিদিগের হস্তেই সনেট্ যে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকল সাহিত্যেই ভাবপ্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে ঢালা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আছে। ইউরোপীয় সাহিত্য সনেট্ ছাড়া Ode, Ballad প্রভৃতি; পারসীক সাহিত্যে "রুবাই", "গজল" ইত্যাদি। কেহ যেন মনে না করেন, এই গঠন-প্রণালীর ভিত্তি রচয়িতার খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাবপ্রকাশের কোনও প্রণালী যখন বিশেষ একটি আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, সেই আকার তৎপক্ষে বিশেষ উপযোগী। সনেটের ইতিহাস-পাঠে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ইহার আয়তন, আকার ও মিলনপদ্ধতি শ্রেণীবিশেষের ভাবপ্রকাশে বিশেষ উপযোগী বলিয়াই সাহিত্যে ইহার প্রতিষ্ঠা।

এখন দেখা যাক্, কোন শ্রেণীর ভাবপ্রকাশে সনেটের পটুতা। আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে প্রসিদ্ধ কবি Dante Gabriel Rossetti সনেট-রচনায় সিদ্ধহস্ত, এমন কি, কোনও হিসাবে তাঁহার সমকক্ষ নাই। তিনি সনেট্ সম্বন্ধে যে অতুলনীয় সনেট্ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সনেটের ভাবগত প্রকৃতি, তাহার প্রাণ যে কি—তাহা বিশদ ও মনোজ্ঞ ভাষায় বুঝাইয়াছেন। সেই সুন্দর কবিতাটি একাধারে সনেটের বিজ্ঞান ও আদর্শ। অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে অনুপম ভাব ও ভাষার মন্ত্রশক্তিতে, কবি যেন সনেটের অধিষ্ঠাত্রী বাণীকে তাঁহার রচিত এই কবিতাটির ছন্দোময় মন্দির-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পাঠককে আমরা এই সুন্দর কবিতাটির পরিচয় লইতে অনুরোধ করি—

> A sonnet is a moment's monument
> Memorial from the soul's eternity
> To one deathless hour

যখন কোনও মুহূর্ত্তে প্রবল ভাবের আবেশে সমাচ্ছন্ন কবিহৃদয় সৌন্দর্য্যের দৈব আবির্ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে, সনেট্ ভাষায় ও ছন্দে সেই চুম্বিত মুহূর্ত্তের চিত্র। ইহা হইতে বুঝা যায়, সনেটের রচনায় মূলে প্রবল ভাবের প্রণোদনা চাই। সেই ভাব যেন আবার বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত বিস্তারিত হইয়া তাহার ঘনীভূত আবেগ না হারায়। কোনও কোনও সনেট আবার গভীর চিন্তাশক্তি-প্রসূত—Shakespeare যাহাকে "deep-brained"

সনেট বলিয়াছেন। সুতরাং ভাব ও রসের একাগ্রতা ও সমগ্রতাই সনেটের জীবন। তৎপক্ষে ভাষা ও ছন্দের যুগপৎ সংযম ও স্ফূর্ত্তি আবশ্যক। বাহুল্যহীন পরিমিত কথায় ভাবকে পরিপূর্ণ, পরিণত অবয়ব দিবার জন্য, ভাষার প্রকাশ-শক্তির উপর নিরবচ্ছিন্ন জোরজবরদস্তি হুকুম তামিল করিতে হইবে, অথচ ভাষা-শিল্পের সূক্ষ্মতম সৌন্দর্য্য-বিকাশেও দৃষ্টি থাকিবে। ইহাতে গীতিকবিতার উন্মাদনা থাকিবে, অথচ মিত্রাক্ষর-প্রাচুর্য্য জন্য যে ঝঙ্কার-বাহুল্য ও আড়ম্বর গীতিকবিতার গৌরব, তাহা হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। এক দিকে দেখিতে হইবে, ইহা যেন চতুষ্পদী, ষট্‌পদী, বা অষ্টপদীর ন্যায় চুট্‌কি ভাষার বলে নিতান্ত স্বল্পায়তন হইয়া না পড়ে—অপর দিকে গীতিকবিতার ভাবপ্রবাহের উচ্ছ্বাসে অনির্দ্ধারিত সীমায় বিস্তারিত না হয়। খুব সম্ভব, কলাপ্রবীণ ইতালীয় ও অপরদেশীয় কবিরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, পূর্ণরসাভিব্যক্তির পক্ষে চতুর্দ্দশ-পদই সমীচীন, এবং তাহাই সাহিত্য-সংসারে চলিয়া আসিয়াছে।

এ দিকে আবার এই চতুর্দ্দশপদ আদৌ, অন্ততঃ ইতালীয় সনেটে, দুই পৃথক ভাগে বিভক্ত ;—প্রথম, আট পদ—Octavo—অষ্টক; অবশিষ্ট ছয় পদ —Sestet—ষষ্ঠক। এই বিভাগও রচয়িতার খেয়াল-প্রসূত নহে। জীবিত ইংরেজ সমালোচকদিগের অগ্রগণ্য, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ সনেট-রচয়িতা Watts-Duntan এই সনেট্-বিভাগের নিগূঢ় রহস্যের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইনি বলেন—সমুদ্রতরঙ্গের উচ্ছ্বাস ও পতন যেমন তাললয়ব্যবচ্ছিন্ন, সনেটের ভাবতরঙ্গের উচ্ছ্বাস ও পতনও সেইরূপ তাললয়-ব্যবচ্ছিন্ন। ফেনিলোচ্ছল সাগর-তরঙ্গ যেমন ক্রমশঃ স্ফীত ও বর্দ্ধিতকায় হইয়া বেলাভূমির উপর উৎপতিত হয়, এবং নিমেষমাত্র স্থির থাকিয়া আবার উজান-বেগে সাগর-গর্ভে অপসারিত হয়, সেইরূপ ভাবের তরঙ্গ ছন্দোময়ী শব্দধারায় অষ্টকে উচ্ছলিত হইয়া বিপরীত আবর্ত্তনে ষষ্ঠকে অবসান প্রাপ্ত হয়। যে সুন্দর সনেটে কবি, দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল এবং চন্দ্রালোকের ন্যায় মধুর ভাষায়, এই কথাটি বুঝাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পাঠক যে কেবল উল্লিখিত সনেট-বিভাগের বিজ্ঞান বুঝিতে পারিবেন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যজগতের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা-পাঠের আনন্দ উপভোগ করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই চতুর্দ্দশপদমাত্রাত্মক রচনায় গীতিকবিতার শব্দ-

বাহুল্য ও ঝঙ্কার-প্রাচুর্য্য পরিহর্ত্তব্য—তাহাতে ভাব ও ভাষায় শিথিলতা আসিতে পারে। সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মধ্যে রুদ্ধ-স্রোতস্বিনীর ন্যায় ভাবপ্রবাহ যাহাতে গভীর ও প্রখর-গতি হয়, তজ্জন্য ইহার আয়তন চৌদ্দটিমাত্র পদে পরিমিত। ইহার মিত্রাক্ষর-বিধানও—সংখ্যায় ও স্থাপনায়—সেইরূপ দৃঢ় নিয়মে আবদ্ধ। অষ্টকের আটটি পদে দুইটিমাত্র বিভিন্ন স্বরাত্মক মিল নিম্নলিখিতরূপে বিন্যস্ত হইবে :—প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম পদের মিল একস্বরাত্মক। দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম পদের মিল আর এক স্বরাত্মক। যথা :—ক—খ—খ—ক—ক খ—খ—ক।

ষট্‌কে মিলের একটু স্বাধীনতা আছে।—তিনটি বিভিন্ন স্বরাত্মক মিলও ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাই হইতেছে আদিম ইতালীয় সনেটের নিয়ম, এবং আধুনিক কালের অধিকাংশ ইংরেজী সনেট-লেখকেরা এই নিয়মেই লিখিয়া থাকেন। কিন্তু Shakespeare-এর সময় এবং তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন ইতালীয় সাহিত্য হইতে ইংরেজী সাহিত্যে সনেট প্রথম আনীত হয়, তখন Wyatt, Surrey এবং Spenser প্রভৃতি কবিগণ কি আকারে ইংরেজী ভাষায় ইহা বেশ খাপ খাইতে পারে, তদ্বিষয়ে নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের হাতে এবং পরবর্ত্তী কালে Shakespeare প্রমুখ কবিদিগের হাতে সনেট যে আকৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহাই সাহিত্যে সেক্সপীরীয়-সনেট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা পেত্রার্কীয় সনেটের ন্যায় বাঁধাবাঁধি নিয়মে অষ্টক এবং ষট্‌কে বিভক্ত নয়—যদিও অষ্টম চরণে প্রায়ই ভাবের বিরাম দেখা যায়। ইহার প্রথম দ্বাদশ চরণে তিনটি চতুষ্পদী গঠিত। উহাদের মিল বা মিত্রাক্ষর-সংস্থান একছত্রান্তর-পর্য্যায়ে বিন্যস্ত, এবং প্রত্যেক চতুষ্পদীতে দুইটি বিভিন্ন স্বরাত্মক মিল থাকে—শেষ দুটি চরণ মিত্রাক্ষর পয়ার, এবং এই শেষ দুই চরণেই সেক্সপীরীয় সনেটের বিশেষত্ব। হয় এ দুটি পদে পূর্ব্বগত তিনটি চতুষ্পদীর সমুদয় ভাব ও রস সমষ্টি-আকারে চরমমাত্রা লাভ করিবে—না হয় বিপরীত ভাবের সমাবেশ-সংঘর্ষণে পদ দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে।

Milton সেক্সপীরীয় সনেটের মিত্রাক্ষর-সংস্থাপন-বিধির পরিবর্ত্তে পেত্রার্কার বিধির পুনঃপ্রচলন এবং অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পেত্রার্কার অষ্টক ও ষট্‌ক বিধান রক্ষা করেন নাই। কোনও কোনও সমালোচকের মতে Milton এ বিষয়ে পেত্রার্কীয় পদ্ধতির অর্থ ও উদ্দেশ্য

আদৌ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই তাহা অবলম্বন করেন নাই, এবং তজ্জন্য তাঁহার সনেটগুলিও চরমোৎকর্ষ লাভ করে নাই।

সনেট সম্বন্ধে আরও অবশ্য-জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে। তাহাদের উল্লেখ বা আলোচনা এ প্রবন্ধে অনাবশ্যক। যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রমথবাবুর পুস্তকের সমালোচনার প্রয়োজনীয় উপক্রমণিকা-স্বরূপ।

এখন আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া উপক্রমণিকার শেষ করিব। আমরা দেখাইয়াছি, সনেট-রচনা কঠিন নিয়মে আবদ্ধ। অনেকেই বলিতে পারেন যে, এমন একটি ক্ষুদ্র রচনায় এত কঠোর নিয়ম কেন? তাঁহারা বিস্মিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করেন, যখন ভাব লইয়াই আমাদের কার্য্য, তখন ভাব-প্রকাশে পারিভাষিক কোনও নিয়মের ব্যতিক্রমে কি আসিয়া যায়? যখন কবিতা-পাঠে কবির ভাব স্পষ্ট জানা গেল, তখন ভাষা বা ভঙ্গীতে, ছন্দ বা মিত্রাক্ষর-বিন্যাসে, আকার বা আয়তনে যদি কোনও ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়; "তাহা ধর্ত্তব্য নহে"। তাঁহারা বুঝেন না যে, সাহিত্যে —এবং কেবলমাত্র সাহিত্যেই বা কেন?—ললিত কলার সমস্ত বিভাগেই— ভাব ও ভাবপ্রকাশের উপকরণ দুটি পৃথক বা পরস্পর স্বাধীন বস্তু নয়, পরন্তু এক—অন্ততঃ একাঙ্গ। চিত্রকলায় দেখ না—বর্ণ-বিকাশ, রেখাপাত, বস্তু-সংস্থান প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে চিত্রকরের প্রধান উপকরণ—এবং যে পরিমাণে এই উপকরণে দোষ বা অভাব থাকিবে, সেই পরিমাণেই ভাবেও দোষ ও অভাব পরিলক্ষিত হইবে। ভাষা ও ভঙ্গী ছাড়িয়া ভাবের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। ভাব ও ভঙ্গী, বাক্য ও অর্থ, হর-পার্ব্বতী মূর্ত্তির ন্যায় পরস্পর "সম্পৃক্ত"।

সাহিত্য-কলায় আবার গঠনের স্থান (যাহাকে ইংরেজীতে Form বলে) মৌলিক। গঠন ভিন্ন ভাবগৌরব প্রকাশিত হয় না। ইহা বাহির হইতে আমদানী করা পদার্থ নয়, ভাবের নিজেরই অঙ্গ। গঠনের অভাবে কত কবিতা ও কাব্য সাহিত্যে স্থান পায় নাই। উচ্চশ্রেণীর কবিদিগের রচনায় কিন্তু গঠন ও উপকরণের উৎকর্ষ জাজ্বল্যমান। তাহাদের ভাব ও ভঙ্গী, কল্পনা ও গঠন-রচনা এক সূত্রে গ্রথিত, এবং সমান উৎকর্ষ-প্রাপ্ত। নিয়মের কাঠিন্য নিপুণ শিল্পীর পক্ষে বন্ধন বা বিঘ্ন নয়, বরং উৎকর্ষ-প্রকাশের সহায়। সমালোচ্য পুস্তকে প্রমথবাবু নিজেই লিখিয়াছেন,—

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।

যেখানে প্রতিভার বল ও তেজ আছে, নিয়মের শৃঙ্খল যতই তাহাকে বাঁধিতে যাইবে, ততই তাহার বল ও তেজ স্ফূর্ত্তি পাইবে। চালন-নিপুণ উপযুক্ত আরোহী বিক্রমশালী দুর্দ্দমনীয় অশ্বই চায়।

সনেট-রচনায় সিদ্ধহস্ত বিখ্যাত ফরাসী কবি Soulare সনেট সম্বন্ধে যে একটি অপূর্ব্ব সনেট লিখিয়াছেন, তাহাতে সনেটের স্বরূপ ও কঠিন বিধিবাহুল্য সত্ত্বেও, সনেটের ভাবপ্রকাশ-পটুতা কবিসুলভ-কল্পনা-কৌশলে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। ফরাসী-অনভিজ্ঞ পাঠকদিগের জন্য আমাকে তাহার একটি নিতান্ত অনুপযুক্ত অনুবাদ করিয়া দিবার ধৃষ্টতা স্বীকার করিতে হইল,—

"ঢুকিবে না কভু" বলে যুদ্ধ হাসি-মুখ
ছিঁড়িবে যে ছোট জাল চতুর্দ্দশময়
পাকাইয়া কটিতটে—ফুলাইয়া বুক,
বাড়াইল প্রতিকূল পথে যুদ্ধ-কর
বীর যদি, ভালবাসি এ মিষ্ট সংগ্রাম—
সুকবির সাহসিক তেজই তার
কোথাও বাঁধন দিল—কোথাও বিরাম—
শির-স্কন্ধ-বক্ষ পরে ক'রে দিল পার
উড়িয়ে শেষ বাসে—কলায় কৌশলে
উজ্জ্বল যেমনটা—প্রতি অঙ্গ-রেখা
চারিদিকে নম্রটি বাহু সামান্য সবলে,
ঠিক বসিয়াছে বাস। দেখো তারে দেখ
কোথায় অভাব নাই—বাহুল্য শরীরে,
এমনি শরীরে চাই, এমনি বাঁধুনে।

বাঙ্গালা ভাষায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্ব্বপ্রথমে সনেট রচনা করেন, এবং তাঁহার "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-স্বরূপে যে উপক্রম লিখিয়াছেন, তাহাতে পেত্রার্কার যশোগান গাহিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁহার পুস্তকের মুখবন্ধে পেত্রার্কাকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পেত্রার্কার আদর্শে সনেট রচনা করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন।—

"পেত্রার্কা-চরণে ধরি করি মন্ত্রোচ্চার,
যাঁহার প্রতিভা সর্ব্বো সনেটে সাকার।

একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার,
গুরুশিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।"

সুতরাং তাঁহার রচিত সনেটগুলি আদর্শের অনুরূপ হইয়াছে কি না, ইহার পরীক্ষা লইবার অধিকার তিনি তাঁহার পাঠকবর্গকে নিজেই দিয়াছেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি ও রচনা-শিল্পের বহুবিধ উচ্চতর গুণে মুগ্ধ হইলেও আমাকে বলিতে হইবে যে, এক বিষয়ে তিনি তাঁহার গুরুর শাসন আদৌ মানিয়া চলেন নাই। তাঁহার অনেকগুলি সনেটে পেত্রার্কার অষ্টক ও ষষ্ঠক বিভাগ রক্ষিত হয় নাই। একাধিক সনেটের দশম চরণে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার ভাবতরঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বিরাম লাভ করিয়াছে। প্রায়ই তাঁহার প্রত্যেক সনেটে নবম ও দশম চরণ একটি সম্পূর্ণ মিত্রাক্ষর পয়ারের আকার-প্রাপ্ত, এবং অনেক স্থলে সেক্সপীরীয় সনেটের অন্তিম পয়ারেরই অনুরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ "পত্রলেখা" নামক অপরপক্ষে সুন্দর সনেটটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদিও কোনও কোনও ফরাসী কবির রচিত সনেটে নবম দশম চরণ মিত্রাক্ষর পয়ারের আকার-প্রাপ্ত, কিন্তু দশম চরণে ভাবের ছেদ কোথাও দেখি নাই। ইহার তুলনা বা ইহার অপেক্ষা আরও গুরুতর বিশৃঙ্খলা আমরা Milton-রচিত একটি ইংরেজী সনেটে দেখিতে পাই। 'Nightingale' নামক সুন্দর সনেটে Milton সপ্তম চরণের মধ্যাংশেই ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও যতি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু Milton অপরাপর বিষয়ে পেত্রার্কার অনুযাত্রী হইলেও, যে কারণেই হউক, সনেটের ভাবপ্রবাহের বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার রচিত অপর সকল সনেটেই আমরা দেখিতে পাই, ভাবস্রোত কোনও স্থানে বিভক্ত না হইয়া নিরবচ্ছিন্ন গতিতে পূর্ণ গোলকের আকার ও পরিণতি লাভ করিয়াছে।

Verlaine নামক এক জন আধুনিক প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি অনিয়ন্ত্রিততার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহার রচিত দু একটি সনেটে ষষ্ঠকাষ্টক বিভাগ একেবারে বিপরীত। ষষ্ঠক আরম্ভে—অষ্টক শেষে।

প্রমথবাবুর এই "পত্রলেখা" সনেটে আরও গুরুতর দোষ দেখা যায়। ইহার অষ্টকের শেষ চরণে ভাবের বৈধ বিরাম হইলেও, নবম চরণে নবপ্রবর্তিত ভাবতরঙ্গ সনেটের অবশিষ্ট অংশে ব্যাপ্ত না হইয়া দশম চরণেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া শেষ হইয়াছে। একাদশ চরণে আবার ভাবের নূতন

আবর্ত্তন। ইহাতে ভাবস্রোত ত্রিধা বিভক্ত হইয়া প্রখরতা ও গভীরতা হারাইয়াছে। সনেটটিও তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া না মিলটনীয় সনেটের পূর্ণ নিটোল গোলকত্ব লাভ করিয়াছে—না পেত্রার্কীয় সনেটের তাললয়-ব্যবচ্ছিন্ন উত্থান-পতনের বিচিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া মিত্রাক্ষর-বিন্যাসে কতকগুলি দোষ দেখা যায়। কোনও কোনও সনেটে একই কথা একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন চরণের অন্তে স্থাপিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও শব্দের মিল, সমধ্বনি দুটি ভিন্ন শব্দের সহিত নিষ্পন্ন না হইয়া, সেই শব্দেরই পুনরুক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ দোষ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পরিবর্জ্জব্য—বিশেষতঃ সনেটে। 'রজনীগন্ধা' নামক সনেটে রজনীগন্ধা কথার পুনঃপুনঃ আবৃত্তি সনেটের ভাব ও রচনা-গৌরবের উপযুক্ত নয়—গীতিকবিতাতেই ইহা শোভা পায়। বস্তুতঃ না ভাবের সমাবেশে, না গঠন-ভঙ্গীতে, এই কবিতাটিকে সনেট বলা যাইতে পারে।

এখানে একটি কথা উঠিতে পারে—কবিতার উৎকর্ষই সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য, নিয়মপরতন্ত্রতা পরে। রচনার নিয়ম ত আর আগে হইতে উদ্ভূত হয় না। কবিতা-বিশেষের সুন্দর গঠন-প্রণালী, ও শিল্প-সৌষ্ঠবের আলোচনা হইতেই রচনার নিয়মাবলী নিরূপিত ও নির্দ্দিষ্ট হয়। এবং নির্দ্দিষ্ট কোনও একটি নিয়মের ব্যতিক্রম সত্ত্বেও যদি কোনও কবিতা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমরা সে নিয়মের মর্য্যাদা রাখিতে বাধ্য নই; বরং সে নিয়মের ব্যতিক্রমই নূতন নিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। প্রমথ বাবুর 'কন্তু এ কথা বলিবার অধিকার নাই। কারণ, তিনি গোড়া হইতেই পেত্রার্কার আদর্শ ও নিয়মের অনুসরণ করিবার প্রকাশ্য সঙ্কল্পে সনেট্ লিখিতে বসিয়াছেন। এবং যেখানেই তিনি তাঁহার আদর্শ ও নিয়ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন—সেইখানেই তাঁহার সঙ্কল্প নষ্ট হইয়াছে, এবং রচনায় ও নানা দোষ দেখা দিয়াছে।

এইখানেই সমালোচ্য পুস্তকের ত্রুটীর তালিকা শেষ হইল। এখন আমরা পাঠকের সহিত প্রমথবাবুর কবিতা-পাঠের আনন্দ উপভোগ করিব।

প্রবন্ধের গোড়াতেই আমরা প্রমথবাবুর স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াছি। প্রধানতঃ এই বিশেষত্ব তাঁহার মানসিক বৃত্তিতে। তিনি যে কোনও বিষয়ের আলোচনা করেন, তাহার বর্ণনায় বা রহস্য-উদ্ভাবনে যতই কেন চিন্তার গভীরতা বা প্রগাঢ়তা থাক্, তাহার ভিতর হাসির একটু আভাস,

পরিহাসের একটু আলা দেখা যায়।—তিনি জীবনের কোনও বিষয়কেই এত বড় মনে করেন না—এত প্রাধান্য দেন না যে, তাহার খাতিরে জীবনের অপর সকল বিষয়কে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। সমাজ-সংসার, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, সকলই জীবনের অংশমাত্র, কোনটাই সমগ্র জীবন নয়। একের জন্য অপর কোনটিকে তুমি উড়াইয়া দিতে পার না। তুমি যাহাকে এত বড় করিয়া দেখিতেছ, তাহার ভিতরেও ক্ষুদ্রত্বের উপাদান আছে। তাই তাঁহার অনেক সনেটেই তিনি গুরু বিষয় সকলকে লঘুভাবে এবং লঘু বিষয় সকলকে গুরুভাবে দেখিয়াছেন, এবং তাঁহার লেখনীর স্পর্শ এমনই লঘু—তাঁহার ভাব ও ভাষার এমন একটি স্পর্শাতীত অনির্দ্দেশ-ভঙ্গী আছে যে, তুমি ঠিক বুঝিতে পারিবে না, কোন কথাটি তিনি প্রশংসাকল্পে এবং কোন কথাটিই বা অপ্রশংসাকল্পে বলিতেছেন। বিখ্যাত সমসাময়িক ফরাসী-লেখক Anatole Franceএর মনের প্রকৃতি অনেকটা এই ধরণের।

এই ভাব ও মনোভঙ্গীর উপযুক্ত সহায় তদুপযোগিনী ভাষা। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমরা প্রমথবাবুর স্বাধীনতা এবং নির্ভীকতার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছি। উপরের কথিত মনোবৃত্তি ইহার স্পষ্ট এবং যথেষ্ট প্রমাণ। সমাজ ও ধর্ম্মমন্দিরের "আপনি-মোড়ল" প্রহরীদিগের ভয় তাঁহার হৃদয়ে কিছুমাত্র থাকিলেও তিনি তাহাদের অন্ততঃ মুখে স্বীকৃত, অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিষয় সকল সম্বন্ধে তীব্র বিদ্রূপের সহিত লঘুভাবে লিখিতে সাহস করিতেন না। এবং সাহিত্যের ঐ শ্রেণীরই অনুরূপ রথীদিগের "দরকারী ভাব আর সরকারী ভাষা"র উপর তাঁহার সামান্যমাত্র শ্রদ্ধা থাকিলে, তাঁহার অভিধান ও শব্দভাণ্ডার এত উদার ও বিস্তৃত হইত না। তিনি কোনও শ্রেণীর শব্দকেই নির্ব্বাসিত করেন নাই। অভঙ্গকুলীন "সাধু" শব্দের সঙ্গে তিনি জাতিহীন "ইতর" শব্দকেও এক পংক্তিতে বসাইয়াছেন। তাহাতে যে ভাষার শক্তি বাড়িয়াছে, কে তাহা অস্বীকার করিবে?—ভাষার জীবন শব্দে। যখন দেখিবে, শব্দ-সংখ্যায় গণ্ডী পড়িয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে, ভাষার জীবনীশক্তিরও হ্রাস হইতেছে।

কবির যে মনোধর্ম্মের কথা আমি উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা তাঁহার "বিশ্বরূপ", "বিশ্বকোষ", "বিশ্বব্যাকরণ" ও "আত্মপ্রকাশ" নামক কয়েকটি সনেটে বেশ সুপ্রকাশ। বিশ্বরহস্য লইয়া এক শ্রেণীর লোক এত উন্মত্ত যে, তাহারা জীবনকে জীবন বলিয়া উপভোগ করিতে পারে না—তাহারা

অনুক্ষণ তর্ক বিতর্কে মত্ত। কবি কিন্তু বিজ্ঞের ন্যায় কল্পনা-সুখে তাঁহার গুম্ফপ্রান্তে লঘু আকর্ষণ দিয়া ঈষৎ হাস্য-রঞ্জিত-অপাঙ্গে বলিতেছেন,—

"বিশ্ব সনে দিনরাত শুধু বোঝা পড়া,
সে ত নয় ঘর করা, করা সে ঝগড়া।"

"তার চেয়ে" এস এই বিপুল বিশ্বে ছড়ান প্রক্ষিপ্ত সকল টানিয়া লইয়া,

"প্রতীক রচনা করি চিত্রিত সংক্ষিপ্ত,
চতুর্দ্দশ পদে বদ্ধ চতুর্দ্দশ লোক।"

কিন্তু মানব-প্রকৃতি এমন নয় যে, গোলকধাঁধার ভিতর মানুষ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে। "অন্বেষণ" নামক সুন্দর সনেটে কবি বলিতেছেন :—

আজিও জানিনে আমি হেথায় কি চাই।
কখনো রূপেতে খুঁজি নয়ন-উৎসব,
পিপাসা মিটাতে চাই ফুলের আসব,
কভু বসি যোগাসনে, অঙ্গে মাখি ছাই।
কখনো বিজ্ঞানে করি প্রকৃতি যাচাই,
খুঁজি তারে যার গর্ভে জগৎপ্রসব,
পূজা করি নির্বিচারে শিব কি কেশব—
আজিও জানিনে আমি তারে কিবা পাই।
রূপের মাঝারে চাহি অরূপ দর্শন
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গস্পর্শন।
খোঁজা জানি মিছে করা সময় বৃথায়,
দূর ভাবে কাছে আসে, কাছে সরে দূর,
বিদ্যায় পায় না মন পরের কথায়,
অবিদ্যায় খুঁজি তাই অনাহত-সুর।

নবম দশম চরণে সহজ অথচ অর্থপূর্ণ বাক্যকথায় ভাবপ্রকাশে কবির অসাধারণ ক্ষমতা পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন। "অনাহত-সুর" Keats-এর "unheard melodies" অপেক্ষা সুন্দর।

নিম্নে উদ্ধৃত "শিব" নামক সনেটে দেখিবেন, কবির "অন্বেষণ" ব্যর্থ হয় নাই :—

রজতগিরিতে হেরি তব শুভ্রকায়া,
চন্দ্র তব ললাটের চারু আভরণ,
তব কণ্ঠে ফণাবৃত সিন্ধুর গরল,—
বিশ্বরূপ জানি আমি তব রূপমায়া।

যার স্ফূর্ত্তি চরাচর, সে ত তব জায়া ;
নিজদেহে করিয়াছ বিশ্ব আহরণ,
তাই হেরি কৃত্তি তব চিত্র-আবরণ,—
জীবনের আলোশ্লিষ্ট মরণের ছায়া।
তোমার দর্শন পাই মূর্ত্তিমান মন্ত্রে,
সপ্তস্বরে বাঁধা যাহা হৃদয়ের তন্ত্রে ॥
সেইরূপ রেখো দেব ভরিয়া নয়নে,—
শিবমূর্ত্তি হেরি বিশ্বে, দেহ এ ক্ষমতা
ধরিতে পারি না আমি দেবে কি'বা মনে,
আকারবিহীন কোন বিশ্বের দেবতা ॥

যে দেশের শাস্ত্র-শিক্ষা হইতেছে—

"যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয় সমশ্নুতে
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈ রিদং ধর্ম্মং সনাতনম্, "

সে দেশের কবি যে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি-বিশাল বিরাট শিবমূর্ত্তি বিশ্বময় দেখি-বেন, তাহা আশ্চর্য্য নয়—না দেখাই আশ্চর্য্য।

"মুস্কিল-আসান" সনেটে কবি দেখাইয়াছেন, শিবদর্শন সার্থক হইয়াছে :—

আজিও নিরাশা বুকে চাপালে পাষাণ
কাণেতে না পশে মোর দুনিয়ার হাল:
জপিতে ফকির রূপে "লা-আল্লা-ইলাল্লা",
আকাশেতে শুনি বাণী "মুস্কিল-আসান"।

কিন্তু লক্ষ্য হারাইলে ভক্তিও জন্মিবে না, এবং দেবদর্শনের ফল-লাভও হইবে না।

"কতদিন, কত দেশে, কত শত ভোরে,
অসংখ্য ফুলেতে ভরা কত ফুলবনে
ফিরেছি কুসুমভারে—একা আনমনে,—
তুলিনি পূজার লাগি কিন্তু সাজি ভ'রে'।
কতদিন, কত দেশে—সারা নিশি ধরে'
থেকেছি বসিয়া আমি মন্দিরের কোণে,
স্নিগ্ধ দৃষ্টি কত শত দেবতার সনে,—
করিনি প্রণাম কিন্তু জুড়ি' দুই করে ॥
আগে শুধু ক'রে গেছি এই সব ভুল।
এখন দেবতা কোথা, কোথা সেই ফুল ?

নিম্নলিখিত সনেটে মানব-জীবনের একটি পরিচিত নিষ্ঠুর বিড়ম্বনার মর্ম্মস্পর্শী করুণ চিত্র :—

> "প্রতিমা গড়েছি আমি প্রাণপণ করি।
> আঁধারে আবৃত কত খুঁজে গুহা খনি,
> এনেছি তাহার মত জ্যোতির্ম্ময় মণি ;—
> রত্ন দিয়ে দেবীমূর্ত্তি গড়িবার তরে ;
> স্ফটিকে গড়েছি অঙ্গ নিশিদিন ধরে,
> পরায়েছি কায়ে শাটী মরকতে বুনি,
> রক্তবিন্দু পারা দুটি সুলোহিত চুনি
> বিন্যস্ত করেছি আমি দেবীর অধরে।
> প্রজ্বলিত হীরকেতে গঠিত নয়ন,
> প্রাণে মম প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ,
> মুক্তা-নির্ম্মিত শুভ্র দন্ত-শীর্ষ-মূল,
> শুক্তীন পদ্মরাগে গঠিত চরণ
> অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি কিন্তু অচেতন,—
> না পারি পূজিতে কিংবা দিতে বিসর্জ্জন।

আমরা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব দিয়া, দেহপাত প্রাণপাত করিয়া, কত যত্ন ও আদরে আমাদের সাধ ও আশাকে গড়িয়া তুলি—কিন্তু হায়! যখন চেষ্টার শেষ অঙ্কে উপস্থিত হই, তখন যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা কোথায়? যে জন বা যে বস্তু পাইবার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াসে—জীবনসর্ব্বস্বদান, তাহাকে ত পাইলাম না।—অথচ যাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছি, তাহার চিন্তাই বা কি করিয়া ত্যাগ করি।

প্রায় সমস্ত সনেটগুলি এমন সুন্দর যে, উদ্ধৃত করিতে গেলে সমস্ত পুস্তক উদ্ধৃত করিতে হয়। ইহাতে কেবল একমাত্র আপত্তি, স্থানাভাব। সনেট্‌গুলি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। আমরা তাহাদের শ্রেণী-নির্দ্দেশ করিয়া এবং অল্পবিস্তর পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হইব।

গ্রন্থের প্রারম্ভে চারিটি সনেট্ সংস্কৃত সাহিত্যের চারি জন খ্যাতনামা কবির উপর লিখিত। যদিও তাহাদের অর্থসংগ্রহ এবং সৌন্দর্য্য-উপভোগের জন্য সেই সকল কবিদের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে পাঠকের পূর্ব্বপরিচয় কিয়ৎ-পরিমাণে আবশ্যক, কিন্তু তাহারা এমন সরল সাধারণভাবে লিখিত যে, পাঠে সকলেই তাহাতে মুগ্ধ হইবেন। "ভাস" ও "জয়দেবে"র উপর দুটি সনেটে

পরস্পরের কাব্য-প্রকৃতির বিভিন্নতা দেখান হইয়াছে। এতদিন আমরা ভাসের নামমাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম, সম্প্রতি তাঁহার কাব্যাবলী আবিষ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভাস সম্বন্ধে কবি বলেন :—

তব সুরে গেয়েছিলে প্রসন্ন বিভাস,
পরিষদ ছিল তব মহাপ্রাণ আর্য্য;
সে যুগের কবিমুখে ছিল না উচ্ছ্বাস
বৃন্দাবনী প্রণয়ের গদগদ ভাব।
সাধনায়-পবিত্র তব সুর-মুখ-বাণী;
সরাগিণী অরোগিণী তব বীণাপাণি।

"চোর কবি" নামক সনেট্‌টি সমুদয় না তুলিলে গ্রন্থকারের উপর অন্যায় করা হয়। কিন্তু স্থানাভাবে ষটকটিমাত্র উদ্ধৃত হইল :—

সেই রক্তপুষ্পে করি শক্তি-আরাধনা,
করেছিলে শ্মশানেতে নায়িকা-সাধনা;
দিয়েছিল দেখা বিশ্ব বিদ্যা-রূপ ধরি :
কনকচম্পকদামে সর্বাঙ্গ আবরি,
সুপ্তোত্থিতা, শিথিলাঙ্গী, বিলোলকবরী,
প্রমাদের রাশি সম অবিদ্যা-সুন্দরী।

কোনও চিত্রকরের তূলিকায় এমন সুন্দর লেখা কি সম্ভবপর? তুমি সুপ্তোত্থিতা, শিথিলাঙ্গী, বিলোলকবরীর ছবি ফলাইতে পার। কিন্তু কোন বর্ণের অজ্ঞানিত মহিমা দ্বারা—কোন দেহভঙ্গী এবং দৃষ্টিভঙ্গীর নাট্য-কৌশলময় রেখাপাতে "প্রমাদের রাশি সম অবিদ্যা-সুন্দরী"কে আঁকিবে? মিল্টনের "Darkness Visible" মনশ্চক্ষে যে ছবি আঁকিয়া দেয়, কোন্ বর্ণে তাহা প্রতিফলিত করিবে?—বর্ণ ও রেখার অপেক্ষা শব্দের ব্যঞ্জনা-শক্তি অশেষ গুণে অধিক। শব্দের শক্তি অসীম। "শব্দ ব্রহ্ম"। "বসন্ত-সেনা" ও "পত্রলেখা"র পূর্ণ রসাস্বাদনের পক্ষে, পূর্ব্বে "মৃচ্ছকটিক" এবং "কাদম্বরী"র পরিচয় আবশ্যক। এই দুই সনেটে উক্ত দুইটি সুন্দর কাব্যের মধুময়ী দুটি পাত্রী, কবির স্মৃতিময়ী কল্পনাস্পর্শে মধুরতররূপে প্রতিভাত। "বসন্তসেনা"য় কিন্তু সনেটের কোনও নিয়মই রক্ষিত হয় নাই। "পত্র-লেখা" আরম্ভেই চিত্ত আকর্ষণ করে।

"অষ্টাদশ বর্ষদেশে আছো পত্রলেখা"—

আমরা যখন তাহাকে প্রথম দেখি, তখন তাহার অষ্টাদশবর্ষপরিমিত

যৌবন। তার পর আর কোনও সংবাদই পাই না। সুতরাং যখনই তাহাকে মনে পড়ে, তখনই তাহার সেই অষ্টাদশ বর্ষের উজ্জ্বল যৌবন-মাধুরী হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। যে ভূভাগে অষ্টাদশবর্ষ নিত্য বিরাজিত—"যৌবনান্তং বয়ো যস্মিন্"—"পত্রলেখা" সেই দেশের নিত্য অধিবাসিনী।

"রজনী-গন্ধা" ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ফুলের উপর লিখিত সনেট্‌গুলি বিচিত্র কল্পনার বর্ণগৌরবে এবং অভিনব ভাবের অকৃত্রিম সৌরভে ফুলেরই মত সুন্দর। সকলগুলিই কবির সূক্ষ্ম রসানুভবশক্তির পরিচায়ক—তা "ফুলের নবাব" এবং "নবাবের ফুল" গোলাপেরই উপর, বা "রতিভর তনু" কাঠ-মল্লিকারই উপর লিখিত হউক! তন্মধ্যে "ধুতুরার ফুল" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমন অনেক বস্তু বা বিষয় আছে, যাহাদের ভিতর আমরা সাধারণতঃ উপভোগ্য কিছুই দেখিতে পাই না, কেবল বিশেষ মনোধর্ম-বিশিষ্ট কবিগণ—Poe বা Baudelaire অসাধারণ কল্পনাবলে এবং সূক্ষ্ম অনুভবশক্তির প্রভাবে তাহাদের প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, এবং সেই সকল বস্তু বা বিষয়কে আমাদের পরিচিত উপভোগ্য বস্তু বা বিষয়ের সহিত অচিন্ত্যপূর্ব্ব ভাবসূত্রে গাঁথিয়া দিয়া সাধারণ মানবচক্ষে এই লুকান সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করিয়া দেন, এবং একটি অভিনব আনন্দের সৃষ্টি করেন। ধুতুরার ফুলের "গন্ধ হলাহল" নূতন উপভোগের বিষয়।

রাগরাগিণীর উপর লিখিত সনেট্‌গুলিও ফুলের সনেট্‌সমূহের ন্যায় সমান উৎকর্ষপ্রাপ্ত। তন্মধ্যে "পূরবী", বিশেষতঃ "ধুতুরার ফুলে"র তুল্য-প্রকৃতি।

"পরিচয়ে" প্রকৃত প্রেমের একটি বিশেষ দশা বর্ণিত হইয়াছে: প্রেমের গভীর এবং প্রগাঢ় অনুভব হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে পূর্ব্বস্মৃতি আহরণ করিয়া প্রেমপাত্রকে পূর্ব্বজন্মের সহিত গাঁথিয়া দেয়। প্রেমিক কোনও মতেই বিশ্বাস করিতে পারে না যে, প্রেমের পাত্রের সহিত এই জন্মেই তাহার প্রথম পরিচয়। যে প্রেম এখন সমস্ত জীবন—সমস্ত অস্তিত্বকে ব্যাপ্ত এবং পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে পূর্ব্বে একেবারে ছিল না, তাহার কল্পনাই অসম্ভব। প্রেমিক হৃদয় তাই গভীর এবং প্রগাঢ় অনুভবের উন্মাদনায় গাহিয়া উঠিয়াছে—

তোমা সনে ছিল জানি পূর্ব্বপরিচয়—
মন কিন্তু দৃশ্যস্মৃতি করে না সঞ্চয়।

রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

> তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
> জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

এবং পূর্ব্বজন্মে অবিশ্বাসী খ্রীষ্টান কবিও গাহিয়াছেন :—

> Has this been thus before?
> And shall not thus time's eddying flight
> Still with our lives and love restore
> In deaths' despite,
> And day and night yield one delight once more.

"উপদেশ" নামক সনেটে প্রমথবাবু "প্রিয়কবি" এবং "বড়কবি" হইবার দুরাশায় "উদ্বাহু-বামন"দিগকে তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাতে চিহ্নিত-পৃষ্ঠ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন :—

> কবিতার জন্মস্থান কল্পনার দেশ,
> সে দেশ জানে না কিন্তু মোদের ভূগোল,—
> সত্যের সেখানে নেই কোন গণ্ডগোল,—
> দেহ নেই সেই দেশে, শুধু আছে বেশ।

পরবর্ত্তী সনেটের বর্ণিত "স্বর্ণলঙ্কা" সেইরূপ একটি কল্পনার দেশ। সেইখানে,

> লীন হ'য়ে প্রিয়া-অঙ্কে, সুবর্ণ পালঙ্কে,
> কলঙ্কের মত রই জড়ায়ে শশাঙ্কে।

"ব্যর্থজীবন" নামক বিদ্রূপাত্মক সনেট্‌টি সাধারণ বাঙ্গালীবাবুর সুন্দর ছায়া-চিত্র, Silhouette.

আমরা "রজনীগন্ধা" সনেটের অপ্রশংসা করিয়াছি। অনেকটা সেইরূপ ভঙ্গী এবং ধরণে লিখিত হইলেও "ভুল" নামক সনেটটি ভাব ও রসের মহিমা ও মোহিনীতে অতুলনীয় :—

> ভাল তোমা বেসেছিনু, মিছে কথা নয়।
> যে দিন একেলা তুমি ছিলে মোর সাথী,
> বকুলের তলে বসি, মনে মন গাঁথি।—
> বকুলের গন্ধ বল কতদিন রয়?
> সে দিন পৃথিবী ছিল অন্ধকারময়,
> ঘন মেঘে ঢেকেছিল নক্ষত্রের বাতি,
> সে তিমির চিরেছিল বিদ্যুৎ-করাতি।—
> বিদ্যুতের আলো কিন্তু কতক্ষণ রয়?

যথা মোরা ভুলে যাই নিদ্রা গেলে টুটে,
সাদা চোখে সব দেখি নেশা গেলে ছুটে।
নিভানো আগুন আমি জ্বলিবে না আর,
মনে কিন্তু থেকে যায় স্মৃতিরেখা তার,—
ছবিলির আবরণ পারিজাত-হার।
হৃদয়ের ফুল শুধু জীবনের সার।

প্রবন্ধ নিতান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। এখন মোটের উপর প্রমথবাবুর কবিতা ও রচনা-শক্তির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া সমালোচনার উপসংহার করিব। তৎপূর্ব্বে আমাদের একটি নিবেদন আছে। এই প্রবন্ধে অনেক সনেটের বিশেষ উল্লেখ হইল না, তাহাতে পাঠকগণ এমন ভাবিবেন না, তাহারা কোনও অংশে উদ্ধৃতগুলির অপেক্ষা হীনগৌরব।

কবিতার যে তিনটি লক্ষণ মহাকবি Milton চিরকালের জন্য অভ্রান্ত রূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন—Simple (সরল)—Sensuous (বস্তুতন্ত্র) এবং impassioned (আবেগময়), এই তিনটি লক্ষণই প্রমথ বাবুর সনেটগুলির মধ্যে দেখিতে পাই। তাঁহার ভাষা এবং ভঙ্গী যারপরনাই সরল এবং সহজ। তাঁহার ভাব যেমন অকৃত্রিম, পূর্ণ এবং পরিণত, তাঁহার ভাষাও সেইরূপ সরল, প্রাঞ্জল, এবং বাহুল্যহীন। তাঁহার সনেটগুলির ভিতর অস্পষ্ট বা জটিল কিছুই নাই। দিবালোকের ন্যায় সকলই স্পষ্ট—প্রত্যক্ষ। তাঁহার কবিতা Sensuous অর্থাৎ শরীরী, রূপ-রস-বিশিষ্ট, ধরিবার এবং ছুঁইবার—কেবল অপরিণত ভাবের কুজ্ঝটিকা নয়। এবং impassioned—সমস্তই প্রবল ভাবের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত। পাঠক দেখিবেন, প্রমথবাবুর এমন কোনও কবিতা নাই—তিনি এমন কোনও শব্দই ব্যবহার করেন নাই, যাহা রূপ রস-হীন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন:—

জগতে জাগিছে মোর ভাবের বধূর
ইচ্ছা না তাহার রূপ পুষ্পেতে ভূষিতে।"
'আমি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন।"
"বাণী যার রক্তমাংস না ধরে আকার
তাহার কবিতা শুধু মনের বিকার।
এ কথা পণ্ডিতে বুঝে, মূর্খে লাগে ধন্দ।"

শুধু পণ্ডিতে নয়—উল্লেখযোগ্য সকল-কবিই—Homer হইতে Swinburn পর্য্যন্ত এবং বাল্মীকি হইতে অক্ষয়কুমার পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ তাঁহাদের কাব্যে

এ কথার সমর্থন করিয়াছেন। এই "অশরীরী মনঃস্পন্দনে"র আতিশয্য হেতুই রূপ-রস অর্থাৎ Sensuousnessএর অভাবে Emersonএর কবিতা সাহিত্যে আদর পায় নাই। রহস্যের বিষয় এই যে, সম্প্রতি আমাদের দেশে এমন এক সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা এতই নিরাকার-পরায়ণ এবং অরূপের পক্ষপাতী যে, তাঁহারা সাহিত্যে sensusousness কেন, senseএর গন্ধ পাইলেই ক্ষেপিয়া উঠেন। বোধ হয়, এই সাধু-সম্প্রদায় sensuous এবং Sensual, এই দুই কথার অর্থ-বিভিন্নতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কবির কার্য্য শব্দ এবং বাক্য লইয়া। এখন দেখা যাক, প্রমথবাবুর এ বিষয়ে সৌভাগ্য কিরূপ। অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন কবি এবং মনীষী Coleridge বলেন,—"Good Prose is proper words in their proper places; good verse is—the most proper words in their proper places—উপযোগী শব্দের যথাস্থানে সংস্থানই ভাল গদ্য— সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী শব্দের যথাস্থানে সংস্থানই ভাল পদ্য। এখন শব্দ এবং শব্দ-সমষ্টি, বাক্যের উপযোগিতা কিসে?—ব্যঞ্জনায়। অর্থাৎ, শব্দ এবং বাক্যের আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত আভাসে। গদ্যের পক্ষে ইহা অতিমাত্র। গদ্যে আমরা চাই প্রাঞ্জল বিবৃতি। তৎপক্ষে পরিমিতার্থ শব্দ এবং বাক্য আবশ্যক। আমি এমন বলিতেছি না যে, গদ্যে ব্যঞ্জনা-শক্তিবিশিষ্ট শব্দ এবং বাক্যের প্রবেশ-নিষেধ। ইহার বাহুল্যই গদ্যের হীনতা-জনক। তাহাতে গদ্যের প্রাঞ্জলতা নষ্ট হইতে পারে। তবে যে গদ্য প্রবল ভাবের আবেগে উদ্দীপ্ত—অর্থাৎ যে গদ্য নিজের সীমানা অতিক্রম করিয়া পদ্যের সীমানা আক্রমণ করে, সে গদ্যে ব্যঞ্জনা-শক্তি-বিশিষ্ট শব্দ এবং বাক্য আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে। শব্দের আর একটি শক্তি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে যে অব্যক্ত ইন্দ্রজাল বা মোহিনী আছে, তাহাকে প্রতিফলিত করা। এই অব্যক্ত ইন্দ্রজালকে ভাষায় আয়ত্ত এবং ব্যক্ত করাই কবির কার্য্য। একটি ভাবের জন্য—একটি বিষয়ের অঙ্কন-উপযোগী—একটিমাত্র অদ্বিতীয় কথাই আছে—যাহার সংস্পর্শে প্রণয়িনীর চুম্বনের ন্যায় (the very kiss of the beloved) ভাব জাগিয়া উঠে। এইরূপ কথা-নির্ব্বাচনে অদ্ভুত ক্ষমতা আমরা দেখিতে পাই—বিদ্যাপতি এবং অপর দুই একটি বৈষ্ণব কবিতে—ভারতচন্দ্রে এবং রবীন্দ্রনাথে। প্রমথবাবুর অনেকগুলি সনেটেও এই শব্দসম্পদের নিদর্শন পাই।

আবার শব্দ অপেক্ষা সুরের ব্যঞ্জনা-শক্তি অনেকগুণে অধিক। ভাব বা অনুভবের আবেগ ও গভীরতা, যাহা ভাষায় অপ্রাপ্য—সুরের অপৌরুষেয় মহিমায় তাহা অনায়াসলভ্য। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের সুর-সম্পদ আশ্চর্য্য। বিদ্যাপতির "সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়"—এই কয়টি সামান্য কথার প্রকাশ-শক্তি সামান্য,—কিন্তু ইহাদের ভিতর যে সুরের অসামান্য আবেগ আছে—তাহাতে অনুভবের আবেগ পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। কয়টি কথার আকুল স্বরে আমরা প্রেমবিহ্বল-হৃদয়ের অশ্রুময়ী আকুলতা আমাদের নিজ হৃদয়ে অনুভব করি। যে প্রেম জীবন মরণকে আত্মসাৎ করিয়া রহিয়াছে—যাহার উল্লেখমাত্র হৃদয় বিবশ—নয়নপত্র আর্দ্র হয়,—সেই প্রেমের করুণ-চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠে। পাঁচটিমাত্র কথা। কিন্তু এমন অশ্রুসিক্ত পদ আর দ্বিতীয় কোথায়?

প্রমথবাবুর রচনার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার কবিতায় এমন অনেক কথা পাওয়া যায়, যাহা প্রবাদ-বচনের ন্যায় শাণিত—সংক্ষিপ্ত এবং জীবনের অনেক বিষয়ে লাগাইবার উপযোগী—যাহাকে Mathew Arnold—Criticism of life—জীবন-ঘটিত ব্যাপারের আলোচনা বলেন, এবং প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে সেক্ষপীয়ার এবং কালিদাসের অসাধারণ সৌভাগ্য। তাঁহাদের নীচেই পোপের নাম করা যাইতে পারে। প্রমথবাবু নিজেই বলিয়াছেন, ভাষার এই চুটকি সম্পত্তির দিকে তাঁহার আন্তরিক টান:

> তাই ছাড়ি যত ফুলপ বাহার,
> চুটকিতে রাখি যত আশ ভালবাসা।

প্রমথবাবুর পুস্তকে আমরা উচ্চ প্রতিভার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ এবং বিস্তারিত সাহিত্যানুশীলনের পরিচয় পাই। প্রতিভার প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার এবং ললিতকলাচর্চ্চার প্রণোদনা দেখি। তিনি স্বভাব-কবি—তাঁহার নিজের খাঁটী বাঙ্গালায় "জাতকবি"—হইলেও কেবলমাত্র বাগ্‌দেবীর "ভর" লইয়া না থাকিয়া নিজের স্বাভাবিক শক্তিসমূহকে বিপুল অনুশীলনে কর্ষিত করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার সুন্দর কলাসৌষ্ঠব এই অনুশীলনের ফল। তিনি কবি এবং—Artist—কলানিপুণ। এবং উহারই বলে "সনেট্-পঞ্চাশৎ" তাঁহার প্রথম পুস্তক হইলেও, তাহাতে আমরা শিক্ষানবীশের অপচিকীর্ষা, অসম্পূর্ণতা, বা অক্ষমতা কোথাও দেখিলাম না।

সমস্তই পাকা হাতের লেখা। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের রচনার সঙ্গে বহু এবং বহুকালব্যাপী পরিচয় থাকার দরুণ ললিতকলার সকল অঙ্গই তাঁহার সুপরিচিত। লিখিতে বসিয়া তাঁহাকে আদর্শহীন হইতে বা আদর্শের জন্য হাতড়াইতে হয় নাই। বিস্তারিত সাহিত্যচর্চ্চার ফলে যে কলাসৌন্দর্য্য অতর্কিতভাবে তাঁহার হৃদয়ে গভীর অঙ্কপাত করিয়াছে, তাহাকে তাঁহার সাহিত্যিক "সংস্কার" বলা যাইতে পারে। এই সংস্কারপুষ্ট প্রতিভাবলে তাঁহার সনেট্‌গুলি, কল্পনাসম্পদে—ভাবপ্রকাশে—ভাষা ও ভঙ্গীগৌরবে এবং শ্রুতিমাধুর্য্যে এক রবিবাবু ছাড়া সমসময়িক কোনও কবির রচনা অপেক্ষা হীনশ্রী নহে।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

সহযোগী সাহিত্য।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

আর্থার এভালন্ (Arthur Avalon) নাম দিয়া কলিকাতার এক জন বিচারপতি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। তন্ত্র-তত্ত্ব নাম দিয়া ইনি আরও একখানি উপাদেয় গ্রন্থ বাহির করিতেছেন। গ্রন্থকার যখন স্ব-পরিচয় প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক, তখন আমরাও তাঁহার বি-নামার অবগুণ্ঠন মোচন করিব না। তবে তিনি যে এক জন মনস্বী ও মনীষী ইংরেজ, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিবই। তাঁহার অনূদিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ইংরেজী ভাষায় রচিত হইয়াছে, বিলাতের এক জন প্রসিদ্ধ প্রকাশকের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, অতঃপর তাঁহার এই দুইখানি পুস্তক বিলাতের বিজ্ঞজনসমাজে একটা ভাব-বিপ্লব ঘটাইবে। ইউরোপের বিবুধগণ তন্ত্রের আদর করিতে আরম্ভ করিলে, হয় ত পরে তন্ত্রের সাধন-স্থান এই বঙ্গদেশেও উহার আবার আদর বাড়িতে পারে।

লেখক মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের যে ভূমিকাটি লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া সত্যই আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। আমরা পূর্ব্বে কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, আধুনিক খ্রীষ্টান ইংরেজ তন্ত্রের সাধন-তত্ত্ব, মন্ত্র-মহিমা, ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি ব্যাপার সকল এতটা বুঝিয়া আয়ত্ত করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ তন্ত্রের সাধনতত্ত্ব বুঝা বড়ই কঠোর তপস্যা-সাধ্য। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে আমরা তন্ত্রতত্ত্বের যতটুকু ধারণা করিতে পারিয়াছি, তাহারই বলে ইহা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, মাস্তবর আর্থার এভালন্ তন্ত্রের অনেক গোপ্য ও গুহ্য তত্ত্ব অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ভূমিকায় যে সকল কথা তিনি পরিষ্কার করিয়া বলিতে

পারেন নাই, তাহার জন্য তন্ত্রতত্ত্বের দোহাই দিয়াছেন; কাজেই মনে করিতে হয় যে, তাঁহার রচিত, এখনও অপ্রকাশিত, তন্ত্রতত্ত্বে তন্ত্রের সকল খাপখাব-খোলা বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা থাকিবে; সুতরাং আমরা লেখকের নিকট তন্ত্রের পূর্ণব্যাখ্যার প্রত্যাশা করিতে পারি। যাহা হউক, তিনি যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ইংরেজী সংস্করণ বাহির করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে শত ধন্যবাদ করিতেছি।

এক সময়ে বাঙ্গালা দেশে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের একটু প্রচলন হইয়াছিল। কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজ ছাপাখানা হইতে, পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সম্পাদনে, মহানির্ব্বাণতন্ত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। রাজা রামমোহন স্বয়ং তান্ত্রিক ছিলেন, নিজে শৈব বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং তন্ত্র-উপাসনা করিতেন। তাঁহার গুরু স্বামী হরিহরানন্দ এক জন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রকে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মগ্রন্থরূপে প্রচলিত করিতে তিনি চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের মন্ত্র ও পদ্ধতি এই তন্ত্রের ব্রহ্ম-দীক্ষা হইতে গৃহীত। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অনুচিকীর্ষা-বশে কতকটা আত্মহারা হইয়া রাজা রামমোহন প্রদর্শিত পন্থা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তবে মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্মস্তোত্র তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখনও আবৃত্তি করিয়া থাকেন। ইংরেজী সভ্যতা এবং শিক্ষার অতিবিস্তারের প্রথম যুগে তন্ত্রের নিন্দায় বাঙ্গালা দেশ পূর্ণ হইয়াছিল। বাঙ্গালার সুধী-সমাজে তন্ত্রের সুখ্যাতি কেহ করিতে পারিত না। এমন কি, যাহারা হিন্দু বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন, তাঁহারাও প্রকাশ্যতঃ তন্ত্র-সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে পারিতেন না। তখনও বাঙ্গালায় বড় বড় তান্ত্রিক সাধক ও পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে তন্ত্র-তত্ত্ব সাধারণে ব্যাখ্যাত হইতে পারিত। কিন্তু তখন শিক্ষিত বাঙ্গালী খ্রীষ্টানী সভ্যতায় বিমূঢ়, নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তির কি আছে, কি নাই, সে অনুসন্ধান করিবার অবসর কাহারও ছিল না; বিশেষতঃ তন্ত্রের আলোচনা করিতে হইলে তখন বিজ্ঞজনসমাজে নিন্দার ভাগী হইতে হইত। কেবল পুণ্যশ্লোক মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর বৃদ্ধ পণ্ডিত জগন্মোহনের সাহায্যে দুই তিনখানি তন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃনামে প্রকাশিত হর-তত্ত্ব-দীধিতি বঙ্গীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে আজও অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বলিয়া এখনও পরিচিত। বৃদ্ধ পণ্ডিত জগন্মোহন মহানির্ব্বাণতন্ত্রের একখানি ব্যাখ্যা-পুস্তক বাহির করিয়াছিলেন। তন্ত্রের এরূপ আলোচনা তখনও বাঙ্গালার বিজ্ঞজনসমাজের অন্তর্বিরোধের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। রামা কেণা, কয়েকজন ভাট বাবা, স্বামী সদানন্দ প্রভৃতি পণ্ডিত এবং মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ বিশেষ শাক্ত, কিন্তু চাকুরীজীবী প্রমুখ সাধকগণের প্রতি উপেক্ষা এবং অবজ্ঞাই প্রদর্শন করিতেন। বাঙ্গালা এখনও তন্ত্রশাসিত; এখনও বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও শিবচন্দ্রের আমলে তন্ত্রের যে জাঁক ছিল, যে মহিমা প্রকট ছিল, এখন আর তাহা নাই। তাই অধুনা বঙ্গদেশে তন্ত্রসাধকগণ তেমন প্রকট নহেন। বোধ হয়, জগদম্বার আবার ইচ্ছা হইয়াছে—আবার ঐশ্বর্য্য-বিকাশের বাসনা হইয়াছে, তাই

আর্থার এভেলন্ তন্ত্রের চর্চা করিতেছেন, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এমন সুন্দর একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। এইবার বোধ হয় ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী তন্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিবেন।

তন্ত্রের বিশিষ্টতা উহার সাধন-পদ্ধতিতে। উহা উপাসনা বা প্রার্থনা নহে; উহা দেবতার নিকট রোদন, অনুতাপ, বা অনুশোচনা নহে। উহা পুরুষ প্রকৃতির সম্মিলন-সাধনা, দেহস্থ পুংত্ব ও মাতৃত্বের যোগ-সাধনা মাত্র—সোপাধিককে নিরুপাধিক করিবার আয়াস-মাত্র। আমার দেহে যিনি আছেন, যাঁহার জন্য আমি আছি—এই বোধ আমাতে নিত্য বিদ্যমান; তিনি দুগ্ধে নবনীতবৎ সৃষ্টির চরাচরে, স্থূলে সূক্ষ্মে, জড়ে চিতে—সর্ব্বাংশে পরিব্যাপ্ত। সেই ধরাটিকে বিরাটে মিশানই তন্ত্রের সাধনা। দেহস্থ শক্তির উন্মেষ দ্বারা এই সাধনা করিতে হয়; কুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া ষট্চক্রভেদ করিতে পারিলেই এই সাধনার সিদ্ধ হওয়া যায়। উহা কেবল ফিলসফি নহে, বচনের ভুষ চূর্ণ করিবার চেষ্টা নহে, "হাতে কেতেরে" করিয়া কর্ম্মিয়া দেখিবার বিষয়। তন্ত্র বলিতেছেন, সদ্গুরুর আশ্রয় লইয়া সাধনা কর, যদি হাতে হাতে ফল না পাও, তাহা হইলে উহাকে পরিহার করিতে পার। এমন স্পর্দ্ধার কথা পৃথিবীর আর কোনও ধর্ম্ম-পদ্ধতিতে কেহ বলিতে পারে নাই। মনে হয়, মুসলমানদের সাধন, রোমান-ক্যাথলিক ও গ্রীকচর্চ্চের খ্রীষ্টানদিগের Esoteric Relition বা গুপ্ত ধর্ম্ম-সাধনা ইহা তন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে সাধনা আছে, সেইখানেই তন্ত্র-পদ্ধতি আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পূর্ব্বে একবার "সাহিত্যে" তন্ত্রের আলোচনা করিতে যাইয়া আমি এই সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। লেখক আর্থার এভেলন যে ইহার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, আমি এমন কথা বলিতে পারি না। রোমান-ক্যাথলিকদিগের সাধন-পদ্ধতির সহিত তন্ত্র-সাধন-পদ্ধতির সামঞ্জস্য আছে দেখিয়া তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তন্ত্র পতঞ্জলির যোগপদ্ধতিকে কতকটা আয়াসসাধ্য করিয়া তান্ত্রিক কর্ম্মকাণ্ডের সহিত উহাকে সমস্বত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। তাই তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতি ভারতের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অবলম্বন করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের এই অনুমান যদি ঠিক হয় যে, তন্ত্র চালডিয়া বা শাকদ্বীপ হইতে এই ভারতবর্ষে আমদানী করা হইয়াছে, তাহ হইলে ইহাও ত অনুমান করা যাইতে পারে যে, চালডিয়া (Chaldea) হইতে তন্ত্র ইউরোপেও রপ্তানী করা হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্তরে স্তরে তন্ত্র, কনফুস্ ধর্ম্ম তন্ত্র-সাধন প্রকট, সিন্টো ধর্ম্ম তন্ত্র ধর্ম্মের নামান্তরমাত্র। মিশর দেশে পুরাকাল হইতে যে শক্তি-আরাধনা প্রচলিত ছিল, সে শক্তি-পূজা বা তন্ত্র-সাধনা ফিনিক ও গ্রীসে প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা বহু ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। কাজেই অনুমান করিতে হয় যে, প্রাথমিক খৃষ্টান ধর্ম্মেও তন্ত্রের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল।

খৃষ্টান পাদ্রীদের মুখের কথা ধরিয়া আমরা অধুনা যে উপাসনাকে প্রতিমা-পূজা বা Idolatory বলিয়া থাকি, তন্ত্রে তেমন প্রতিমা-পূজা বা পুতুল-পূজা নাই। এই সত্য কথাটা লেখক আর্থার এভেলন তাঁহার লিখিত ভূমিকায় অনেকটা পরিষ্কার

করিয়া গিয়াছেন। তন্ত্র বার বার বলিতেছেন যে, দেবতা হইয়া দেবতার পূজা করিতে হয়; ইষ্টদেবতা আত্মস্বরূপ; তিনি স্বতন্ত্র নহেন; তিনি সর্ব্বাধার, নিরাধার, সাক্ষীভূত, সনাতন পুরুষ: তন্ত্রের আসল পূজা—মানস পূজা, উহার মোটা পূজা যন্ত্রের পূজা। সেই যন্ত্র হইতেই রূপের উদ্ভব; রূপে রূপের বিকাশ, মন্ত্রশক্তি দ্বারা রূপের উদ্বোধ। সিদ্ধ পুরুষের হৃদয়াকাশে মায়ের কোটিরূপ কোটিভাবে ফুটিয়া উঠে, নিম্নাধিকারিগণ গুরুর উপদেশ অনুসারে ধ্যানময় নানা রূপের একটা রূপ প্রকট করিয়া মহামায়ার পূজা করিয়া থাকে। উহা প্রতিমার পূজা নহে। প্রতিমার পূজা হইলে উহার বিসর্জ্জন হইত না; উহার ঘাড়ে চাপিয়া মৃন্ময়ীকে জলে ডুবাইত না। ভাবে, ধ্যানে, জপে ও ষট্‌চক্রভেদের দ্বারা আত্মা শক্তির উদ্বোধন করিতে হয়। ইচ্ছাময়ী তিনি, কখন কোন সাধককে কেমনভাবে দেখা দেন, তাহা ত বলা যায় না। জানি কেবল যে, তিনি আছেন, আর তাঁহার নাম ও রূপ আছে। সে রূপ অপরূপ—বাক্যমনের অগোচর। তাই বাঙ্গালী ভক্ত খেদের গান করিয়া গিয়াছেন—

"রূপ সাগরে যাওয়া পাওয়া কঠিন হ'ল।
এবার মা আশা হয় বিফল।"

তন্ত্রের আর একটা বিশিষ্টতা আছে; তাহা মন্ত্র-শক্তি। লেখক আর্থার এভেলন মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ভূমিকায় মন্ত্র-শক্তির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তেমন বিশদ ব্যাখ্যা আমরা কোনও বাঙ্গালী পণ্ডিতের মুখে শুনি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমরা জানিতাম, মন্ত্র-শক্তি উপলব্ধি করিতে হয়, উহা বুঝাইবার বিষয় নহে। কিন্তু লেখক নিজ মনীষা-প্রভাবে, উপলব্ধি তাঁহার যতটুকু সম্ভবপর, ততটুকু ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল বচনপরম্পরায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, দেহস্থ আত্মা বর্ণাত্মিকা—বর্ণরূপা এই পঞ্চাশৎবর্ণরূপিণী মা, চক্রে চক্রে নানা বর্ণে বিরাজমান। বীণার তারে আঘাত করিলে যেমন ধ্বনি হয়, ষট্‌চক্রবিহারিণী বর্ণরূপিণী মায়ের বর্ণচক্রে যথাপদ্ধতি আঘাত করিতে পারিলে তিনি সাড়া দিয়া জাগিয়া উঠেন। তিনি জাগিলেই সিদ্ধি করায়ত্ত এবং সাধকের লভ্য হয়। তাই সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ "জননী জাগৃহি" বলিয়া মাকে জাগাইতেছিলেন। তাই ভক্ত গান করিয়াছিলেন,—

"আর কত ঘুমাবি মা গো কুলকুণ্ডলিনি মূলাধারে।"

পূজার বোধন আর কিছুই নহে—মা'কুণ্ডলিনীর জাগরণ, কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন-প্রসঙ্গ। এই উদ্বোধন মন্ত্র-শক্তি দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। মন্ত্র যেমন বীণার ঝঙ্কার; ঝঙ্কার শুরু করিলেই রূপময়ী জাগিয়া উঠিয়া বসেন। তিনি জাগিলে শিব-শক্তির সমরস-সাধনে আর বিলম্ব ঘটে না; একবার জপ করিয়া দেখ না, অনন্যমন করিয়া যথাপদ্ধতি জপ করিয়া দেখ না—তন্ত্রে যে জপের ফলশ্রুতি আছে, তাহা পদে পদে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। তখন বুঝিবে, তন্ত্র বুজরুকী নহে, বিশ্বাসঘাতক-বিলাস নহে। চাই সদ্‌গুরু, সিদ্ধ মন্ত্র ও সাধনা। এই তত্ত্বকথা মন্ত্র-তন্ত্র আর্থার এভেলন বুঝিতে পারিয়াছেন [illegible] বলিব, তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারবশতঃ তিনি এমন কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

তন্ত্র জন্মান্তরবাদ গ্রাহ্য করে। কেবল যুক্তির হিসাবে গ্রাহ্য করে না, ভূগোলের মানচিত্র দেখানর মত সাধকের অনন্ত অতীত জীবন সকলকে ফুটাইয়া দেখাইয়া দেয়। তন্ত্রের দুই শাখা—সমাজ-ধর্ম এবং সাধন ধর্ম। সমাজ ধর্মের অনুশাসন অনুসারে জাতি ও বর্ণের বিচার আছে। সাধন-ধর্মে জাতিবিচার নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, স্ত্রীপুরুষ নাই, কেবল সাধন ও সিদ্ধির অনুপাত অনুসারে উচ্চ নীচের বিচার করিতে হয়। তন্ত্রে আছে কেবল অধিকার-তত্ত্ব। জন্মজন্মান্তরের সংস্কার লইয়া অধিকার নির্ণীত হইয়া থাকে; তাই চণ্ডাল পূর্ণানন্দ ব্রাহ্মণ ও কৃপাসিন্ধু সাধক সর্ব্বানন্দের সমকক্ষ। তাই বৈদ্য রামপ্রসাদ ব্রাহ্মণেরও নমস্য। গুরুমুখ করিয়া তন্ত্র পড়িতে হয়; তাই তন্ত্রের ভাষা অপূর্ব্ব, উহার ব্যাখ্যা সাধারণ ধাতুপ্রত্যয়াদির সাহায্যে হয় না। তন্ত্র শক্তি-সাধনার পদ্ধতিমাত্র. সৃষ্ট সকল পদার্থ হইতে শক্তি-সংহরণের ব্যবস্থা উহাতে আছে। উহাতে হেয় ও প্রেয় নাই; যাহা সাধনার উপযোগী, তাহাই উহার প্রেয়। এই সাধনা অধিকারি-অনুসারে নির্ণীত হইয়া থাকে। যাহার যাহাতে অধিকার, সে তাহাই অবলম্বন করিবে। শক্তি সর্ব্বব্যাপিনী, স্থাবর জঙ্গম, পশু পক্ষী, নর নারী—সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বত্রে পরিব্যাপ্তা। জীবদেহ তথা নরদেহে নিবদ্ধ শক্তির বিকাশ দেহগত আসক্তিনিচয়ের সহায়তায় হইয়া থাকে; এই আসক্তি অবলম্বনে সাধন-পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয়। সাধনা মানেই শক্তির উন্মেষ—উদ্বোধন—জাগরণ। তাই শাক্ত জগতের সকল ব্যাপার হইতে শক্তি আহরণ করিয়া থাকেন। তোমার আমার সামাজিক ভালমন্দের মাপকাঠি দিয়া তন্ত্রের সাধনা মাপিতে নাই। উহা "তুমি বুঝ আর আমি বুঝি মন,—আর যেন কেউ না বুঝে।" লেখক আর্থার এভেলন ইহা বেশ বুঝিয়াছেন, তথাপি তিনি আজ কালকার যুক্তিবাদী সভ্য সমাজের বুদ্ধির অনুকূল করিয়া প্রায় সকল কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই চেষ্টা জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

তন্ত্রে বাহিরের দেবতার কল্পনা নাই. জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর স্বর্গে বসিয়া বিশ্ব শাসন করিতেছেন, এমন কথা তন্ত্রে নাই। তন্ত্রের দৃষ্টিতে সাধকের দেহই ব্রহ্মাণ্ড, সেই দেহগত আত্ম-শক্তিই সাধকের ইষ্ট ও সাধ্য দেবতা। সাধনার সাহায্যে এই আত্মশক্তির বিকাশ ঘটাইতে হয়—আত্মদর্শন করিতে হয়। যাহার আত্মদর্শন ঘটে, সেই মুক্তি লাভ করে। লেখক আর্থার এভেলন তাঁহার রচিত তন্ত্র-তত্ত্ব পুস্তকে এই সকল সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছেন। বহিখানি ভাল করিয়া পাঠ না করিলে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনেক কথা হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। তন্ত্র-তত্ত্ব নূতন করিয়া আবার বাঙ্গালীকে শুনাইতে হইবে। আর্থার এভেলন মহোদয়ের অনূদিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের প্রচার বাড়িলে, বাঙ্গালী আবার শুশ্রূষু হইলে সে চেষ্টা করা যাইতে পারে।

আমাদের বাঙ্গালা দেশ সারদাতিলক, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, প্রাণতোষিণী, তন্ত্রসার প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থের দ্বারা শাসিত ছিল। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের প্রভাব পূর্ব্বে এ দেশে তেমন ছিল না। এখন ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে বাঙ্গালীর মন ও বুদ্ধি যে আকারে আকারিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, মহানির্ব্বাণতন্ত্র এখনকার উপযোগী তন্ত্র। রাজা রামমোহন রায় এইটুকু

বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মহানির্ব্বাণের আদর বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর্থার এভেলনের সম্পাদিত ইংরেজী ভাষান্তরিত মহানির্ব্বাণতন্ত্রখানি যদি বাঙ্গালার সুধীসমাজে আদর লাভ করে, তাহা হইলে ধীরে ধীরে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের পঠন পাঠন পরে চলিতে পারে। এইটুকু আশা আমরা করিতে পারি। বাস্তবিক, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজ এখন ধর্ম্ম-কর্ম্ম-শূন্য; জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-বিচার-রহিত; এখন মহানির্ব্বাণ তন্ত্রই দেশের ও জাতির উপযোগী। মনে হয়, তেমনই একটা অঘটন ঘটিবে বলিয়াই, আর্থার এভেলনের মত বিদ্বান, সম্ভ্রান্ত, রাজসরকারে সম্মানিত, ধনী ইংরেজ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন। তাঁহার তন্ত্র-তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে আমরা তখন আরও অনেক কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিব। আপাততঃ বাঙ্গালার শিক্ষিত জনসমাজকে এই অপূর্ব্ব মহানির্ব্বাণতন্ত্রখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উহার মূল্য আট টাকা, একটু বিলাস; কিন্তু যাহারা বিলাসে এত অপব্যয় করিতে পারে, তাহারা এমন একখানি গ্রন্থ আট টাকা খরচ করিয়া কিনিতে পারে না কি? ইচ্ছা থাকিলে অবশ্যই পারে। এতটা অনুরোধ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, আর্থার এভেলন একটিও মনগড়া কথা—বোলচালের ব্যাখ্যা করেন নাই। শাস্ত্র যুক্তি অনুসারে যাহা সর্ব্বসিদ্ধান্ত, তিনি কেবল তাহারই অবতারণা করিয়াছেন। ইংরেজীনবীশের পক্ষে তন্ত্র বুঝিবার খুব সুযোগ উপস্থিত। এই তন্ত্রেরই উপদেশ আছে যে, যাহা কিছু পরিহার করিতে চাও, তাহার পূর্ণ পরিচয় লইয়া পরিহার করিবে; যাহা কিছু নূতন অবলম্বন করিতে চাও, তাহারও পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করিয়া তবে অবলম্বন করিবে। তন্ত্র বাঙ্গালার পুরাতন ধর্ম্ম; উহাকে যদি চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন করিতে হয়, তবে উহার পরিচয় লইয়া বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। অথবা আবার যদি উহার শীতল আশ্রয়ে আসিতে হয়, তাহা হইলেও উহার পরিচয়-গ্রহণ আবশ্যক। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এক জন পণ্ডিত ধনী, সম্ভ্রান্ত ইংরেজ সে পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, এই পরিচয়-প্রদানে বাঙ্গালার [illegible] ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেন নাই,—কখন-প্রচ্ছন্ন বাগাড়ম্বরের দ্বারা শাস্ত্রসিদ্ধান্তের অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন নাই। ভাল হউক, মন্দ হউক, যাহা আছে, তাহাই তিনি পাঠকগণের বুদ্ধিগোচর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিদেশীর ভক্তের এমন পূর্ণার্ঘ্য বাঙ্গালী কি সাদরে গ্রহণ করিবে না?

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরাজয়।

১

"যোগেন! বাবা! তোমাকে এ কাজটি করতেই হবে—" এই বলিয়া বৃদ্ধা যোগেন্দ্রের মস্তকে ধীরে ধীরে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বৈশাখ মাস। নবপল্লবকিশলয়ে, নবীন শ্যামলতায় প্রকৃতিদেবীর নীলাঙ্গ অরুণ-আলোকে ঝলমল করিতেছে। পল্লীপথে বটের ছায়ায় বসিয়া সুখো

থরকর হইতে রাখালবালকেরা আত্মরক্ষা করিতেছে। কচিৎ দুই একটা কাক বা ফিঙের চীৎকারে মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল। পথের ধূলা তাতিয়া আগুন হইয়াছে। তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বৃদ্ধা শঙ্করী যোগেন্দ্রের গৃহে আসিয়াছেন। সে সময়ে যোগেন্দ্র পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে বসিয়াছিল। বৃদ্ধা তাহাকে ধরিয়া বসিলেন, "তোমাকে বাবা! কমলকে তার শ্বশুরবাড়ীতে রেখে আসতে হবে।"

কমল বৃদ্ধার একমাত্র কন্যা—পূর্ণযৌবনা। সে পিতৃগৃহে অবস্থান করে, ইহা কোনও ক্রমেই আর সঙ্গত বোধ হইতেছিল না; তাই বৃদ্ধা যোগেন্দ্রকে অনুনয় করিতেছিলেন।

যোগেন্দ্র বলিল, "মাসীমা, তুমি কেন তাহাকে আপনা হইতে পাঠাইয়া দিতেছ?" বৃদ্ধা যোগেন্দ্রের কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে অঞ্চলে চোখের জল মুছিলেন। তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যেমন অদৃষ্ট করে এসেছি, তেমনই ভোগ ত করতে হবে বাবা।"

শৈশবে কমলের সহিত যোগেন খেলা করিয়াছে। কতদিন খেলাঘরে তার বর সাজিয়াছে। কমলও কতদিন গৃহিণীর অভিনয় করিতে গিয়া বহুমূল্য অলঙ্কার চাহিয়া যোগেনকে বিপন্ন করিয়া অভিমান করিতে ছাড়ে নাই। সেই কমলাকে আজ তার শ্বশুরালয়ে উপযাচক হইয়া রাখিয়া আসিবার ভার পড়িল কি না যোগেনের উপর! সে অন্যমনস্ক হইয়া অনেকক্ষণ কত কি চিন্তা করিল। কমলের জননী গ্রাম-সম্পর্কে যোগেন্দ্রের মাসী হন। যোগেন্দ্র এখন বড় হইয়াছে—সংসারের ভালমন্দ অনেকটা বুঝিতে শিখিয়াছে। এরূপ ভাবে কমলকে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে দিয়া আসিবার কোনও বিশেষ কারণ সে দেখিতে পাইল না; সে এই প্রস্তাবে একটা অমর্য্যাদার ভাব অনুভব করিল। সে দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, "না মাসীমা, তা কিছুতেই হতে পারে না। আমরা আপনা হ'তে কখনই কমলকে তার শ্বশুরবাড়ী রেখে আসতে যাব না।" বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, "না বাবা, তুমি বুঝ না। আমি বাকী দিন কটা কাশী গিয়া বাবা বিশ্বনাথের চরণসেবা করে কাটিয়ে দেব। কমলের শাশুড়ী যখন তাঁহার বৌয়ের কোনও সংবাদই নিলেন না, আর কমল কিছু ছেলেমানুষটি নেই, তখন তাকে না পাঠাইয়া কি করি, বল? যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "মাসীমা, না হয় তুমি আর

দিন কতক থাকিয়া যাও না। কমলকে ছ' মাস ছ' মাস, পরে ত তাঁহারা আপনারাই লইয়া যাইবেন।"

বৃদ্ধা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সে আশা বৃথা; আজ সাত বৎসর বিবাহ হয়েছে, এর মধ্যে সেই বিবাহের পর যা দুইবার অভাগীর ভাগ্যে শ্বশুর-ঘর ঘটিয়াছে।"

"তারা কমলকে নিয়ে যেতে চায় না কেন?"

"তাঁরা বলেন, জামাই যখন বাড়ী এসে থাকবে, তখন বউ লইয়া যাইবেন।"

"জামাই কি বাড়ী আসে না?"

"কি জানি বাবা? অনেকবার চিঠি দিয়েছি, কিন্তু একখানিরও উত্তর পাই নাই। এক বৎসর পূর্ব্বে একবার লিখেছিল, এবার বাড়ী যাইবার সময় আমাদের এখান হইতে কমলকে লইয়া যাইবে। তার পর আর কোনও সংবাদ পাঠায় নাই।"

২

বুধবার প্রাতঃকালেই নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকাখানি "ছচালা"; ভিতরে রহিলেন কমল, তাহার জননী শঙ্করী ও আর এক জন প্রতিবেশিনী। ইনি বৃদ্ধার সহিত কাশীবাস করিতে যাইতেছেন। তাহাদের গ্রাম হইতে কমলের শ্বশুরালয় প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূর—সমস্ত পথ নৌকায় যাইতে হয়। নৌকা নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। যোগেন্দ্র নৌকার ছাদের উপর বসিয়া উষার কনকরশ্মি-উদ্ভাসিত নদীতীরবর্ত্তী শ্যামল বনরাজির শোভা দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছে। কখনও বা তাহার মনে হইতেছে, কমলকে তাহার শ্বশুরগৃহে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কখনও বা ভাবিতেছে, যদি তাঁহারা কমলকে প্রত্যাখান করেন? কমল কি তাহার বিধবা দরিদ্রা জননীর অপমান সহ্য করিয়া সেখানে থাকিতে চাহিবে? আবার মনে হইতেছিল, নিজের অধিকারে কেন সে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে? যাহারা একদিন তাহাকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়াছেন, তাঁহারা আজ কোন্ অপরাধে তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিবেন?

মধ্যাহ্নে গঞ্জের ঘাটে গিয়া নৌকা লাগিল। ঘাটের উপর দুইটি মন্দির। দূরে সারি সারি ছোট বড় দোকান। এইখানে আহারাদির ব্যবস্থা হইল। অপরাহ্নে মাঝিরা আবার নৌকা খুলিয়া দিল। তখন

মৃদুমন্দ বায়ু বহিতেছে। নদীবক্ষে অস্তমিত সূর্য্যের ক্ষীণরশ্মি ঝিকমিক করিতেছে। মাঝিরা মনের সুখে সারি-গান গায়িতেছে। যোগেন্দ্র বাহিরে আসিয়া নৌকার ছাদের উপর উপবেশন করিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাতাস থামিয়া গেল। তখন অন্ধকার জমাট বাঁধিতেছিল। আকাশের পশ্চিম-প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র কৃষ্ণমেঘ জমিতেছিল—ক্রমে সেখানি ধীরে ধীরে বিদ্রোহীর দলের মত বাড়িয়া উঠিল। অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল। যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "মাঝি, এখান হইতে কাঞ্চনপুর কত দূর?" কাঞ্চন-পুরে কমলের শ্বশুর-বাড়ী। মাঝি উত্তর করিল, "এখনও বিশ কোশ—মোটে দশ কোশ আসিয়াছি।"

নিমেষের মধ্যে প্রবল ঝড় উঠিল। বাতাস সোঁ সোঁ শব্দে দিগন্ত প্রকম্পিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ক্রমে ঝড় আরও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই ঝড়ে নৌকা তীরবেগে কোথায় ছুটিয়া চলিল। শঙ্করী মর্ম্মভেদিস্বরে বলিয়া উঠিলেন, ঠাকুর! আর যন্ত্রণা দিও না। আজ নদীর গর্ভে টানিয়া লও, সকল অপমান, সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দাও। কমলকে বুকে করিয়া মরিতে পারিলে আজ আমার সুখের সীমা থাকিবে না।" তার পর মনে হইল, "না তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। পরের বাছা যোগেন এই নৌকায় রহিয়াছে—সে কেন মরিবে? আমার এমন সুখের প্রয়োজন নাই। নারায়ণ! রক্ষা কর।"

নৌকা সহসা একটি দম্‌কা বাতাসে জলের দিকে খুব হেলিয়া পড়িল। নৌকার উপর জল উঠিল।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে নৌকা তীরের সন্নিহিত হইল। এক জন দাঁড়ী নৌকার দড়ী লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি গাছের গোড়ায় নৌকা বাঁধিল। দড়ি কড়কড় করিয়া উঠিল—নৌকা তীরে ভিড়িল। কমলকে লইয়া শঙ্করী কিনারায় উঠিয়া একটি বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যোগেন্দ্র ধীরে ধীরে আসিয়া সেখানে উপবেশন করিল। দিগন্তপ্রসারিত মাঠ—নিবিড় অন্ধকার—প্রবল বাতাস—অজস্র বৃষ্টিপাত। এই দুর্য্যোগে চারিটি প্রাণী নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে কথা নাই। —কেহ কাহাকেও ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছে না। বিদ্যুৎস্ফুরণ কেবল অন্ধকার বাড়াইয়া দিতেছিল। কমল বলিল, "মা!"

"কেন মা? এই যে আমি; ভয় করছে?"

"না।"

"তবে কি?"

"তোরঙ্গটা নৌকায় রয়েছে।"

শঙ্করীর মনে হইল, খানকতক কাপড়, গোটাকতক পুতুল ভিন্ন এমন কিছু মূল্যবান দ্রব্য ত তাহাতে নাই! কমল গায়ে-হলুদের দিন শ্বশুরালয় হইতে কতগুলি পুতুল পাইয়াছিল—তার পর একবার জামাতা সখ করিয়া কলিকাতা হইতে একখানি কাপড় তাকে পাঠাইয়াছিলেন। সেইগুলি তোরঙ্গের ভিতর আছে। কাপড়খানি কমল বড় যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল। সেখানি সে পরিত না। অনেক টাকার জিনিস না থাকিলেও তোরঙ্গের জন্য মন চঞ্চল হইয়াছিল। কমলের কথা শুনিয়া যোগেন্দ্র তোরঙ্গটি আনিয়া সেখানে রাখিল। কমল সানন্দে বলিয়া উঠিল, "তুমি নিয়ে এলে যোগেন দাদা?"

ঝড় বৃষ্টি থামিল। নৌকা আবার চলিল। পরদিন বেলা পাঁচটার সময় সকলে কাঞ্চনপুরে পঁহুছিলেন। কমলের শাশুড়ী আসিয়া কমলকে সাদরে গৃহে লইলেন। কমলের জননী সেখানে যান নাই। কমল আপনার ঘরে স্থান পাইয়া যতটা আনন্দিত হইল, জননীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তাহার অধিক দুঃখিত হইল। যোগেন্দ্র সে দিন সেখানে রহিল। পরদিন প্রভাতে কমল আসিয়া যোগেন্দ্রের সহিত দেখা করিল। যোগেন্দ্র বলিল, "কমল! আমি কলিকাতায় গিয়া তোমার স্বামীকে পাঠাইয়া দিব।" কমলের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে যেন সঙ্কোচে মরিয়া গেল। বিদায়ের সময় কমল ধীরে ধীরে বলিল, "যোগেন দাদা, এঁদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা হয়, সে সময় কি আসবে?" যোগেন বলিল, "আসব।"

৩

শঙ্করী কাশীবাস করিতেছেন। তিনি কাশীবাসে কমলের ভাবনা ভুলিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা বিশ্বেশ্বরই বলিতে পারেন। যোগেন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে পূর্ব্বের ন্যায় পড়াশুনায় মন দিতে পারিতেছে না। কেবলই তাহার মনে হইতেছিল—কেন আমি কমলের স্বামীকে পাঠাইয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম? এরূপ বলিবার আমার কি অধিকার আছে? আমি কমলের স্বামী শশাঙ্কবাবুর নামমাত্র

শুনিয়াছি, কখনও তাঁহাকে দেখি নাই, তবে কোন সাহসে এমন আশ্বাস দিলাম? কমলকে দেখিলে বড় দুঃখ হয়। আমি যেমন করিয়া পারি, শশাঙ্ক বাবুর অনুসন্ধান করিব।

অনেক চেষ্টা করিয়াও সে কমলের চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিল না। ত্যাগ করিবার জন্য যতই সে চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই তাহার মন বেশী করিয়া সেই দিকে ঝুঁকিল। এইরূপ অবস্থায় দুই মাস কাটিয়া গেল। যোগেন্দ্র কোনও কারণে বর্ত্তমান বাসা ত্যাগ করিয়া আর একটি নূতন মেসে গিয়া উঠিল। সে সময় আষাঢ় মাস। প্রায় বৃষ্টি হইতেছে। শনিবার অনেকেই বাড়ী গিয়াছেন। দুই তিন জন লোক বাসায় আছেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে হরিহর বাবু ডাকিলেন, "ও শশাঙ্ক বাবু! বেলা পড়ে এল, কখন থিয়েটারে যাবেন?"

"বড় বাদলা, কেমন করে যাই বল? ভাল কথা, তুমি যে নীহারিকা কেমন প্লে করে দেখতে যাবে বলেছিলে, চল না?"

"বাবা! যে বৃষ্টি!"

"না না, আজ চল। নীহারিকার প্লে দেখ্‌লে—আর ফিরে আস্‌তে ইচ্ছা হবে না।"

"তবে কাজ নেই ভাই, শেষ কি তোমার মত থিয়েটারে থেকে যাব, আর তার নাম ইষ্টমন্ত্র হ'য়ে পড়বে।"

শশাঙ্ক থিয়েটারী সুর করিয়া বলিল, "দুর্গের ভিতরে অবস্থান করে অনেকেই যুদ্ধকৌশল ও বীরত্ব দেখিয়ে থাকে, কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করে, ফিরে আসাকেই বীরত্ব বলে।"

শশাঙ্কের নাম শুনিয়া যোগেন্দ্র মন্ত্রাকৃষ্টের ন্যায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধীরে ধীরে বলিল, "আপনারা কি থিয়েটারে যাবেন, বাসায় তা হ'লে আমি একাই থাকব?" শশাঙ্ক খুব আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিল, "না, না, আপনি একা থাক্‌বেন কেন? আপনিও চলুন না।"

শশাঙ্কের মুখে অভিনেত্রীর প্রশংসাবাদ শুনিয়া যোগেন্দ্র স্তম্ভিত হইল। বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে সে শশাঙ্কবাবুকে দেখিতে লাগিল; তাঁহার মুখে বিন্দুমাত্র লজ্জার চিহ্নও দেখিতে পাইল না। অম্লানবদনে শশাঙ্ক পুনরায় বলিল, "টিকিট কিন্‌তে হবে না, আমি আপনাকে পাস দিব—কি বলেন?"

"আজ আমার শরীর তত ভাল নাই।"

শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি বেশভূষা শেষ করিল। জুতা পরিতে পরিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এ বাসায় কতদিন এসেছেন ?"

"দশ বারো দিন—আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সময় পাই না—আপনাকে প্রায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।"

"সে কথা সত্য, অনেক কাজ, বাসায় ফিরতে রাত্রি হয়ে যায়।"

"আপনি শনিবারে বাড়ী যান, বোধ হয় ?"

"না—আমাদের বাড়ী অনেক দূর—শনিবারে যাওয়া চলে না।"

"কোন্ গ্রাম ?"

"কাঞ্চনপুর।"

কাঞ্চনপুর শুনিয়া যোগেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কাঞ্চনপুর চেনেন ?"

"একবার গিয়াছিলাম।"

"বটে, তবে ত আপনি আমাদের দেশ দেখেছেন।" শশাঙ্ক একাকী থিয়েটারে চলিয়া গেল।

৪

যোগেন্দ্র নিজের ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ এই হতভাগ্যের কথা চিন্তা করিল। কমল পত্র লিখিয়া যে কেন উত্তর পায় না, তাহাও সে বুঝিতে পারিল।

ইহার কিছুদিন পরে, অনেক চেষ্টার পর একদিন সুযোগ পাইয়া সে শশাঙ্কের নিকট কমলের কথা উত্থাপন করিল। কিন্তু প্রবল বন্যার মুখে ক্ষুদ্র বাঁধের মত, তাহার কথা কোথায় ভাসিয়া গেল। শশাঙ্ক মৃদুমৃদু হাসিল; তাচ্ছীল্য করিয়া বলিল, "কই, আপনি থিয়েটারে যাবেন বল্লেন, গেলেন না ?"

যোগেন্দ্র কোনও উত্তর না দিয়া নিজের ঘরে গিয়া বই খুলিয়া বসিল। কমলের কথা ভাবিয়া দুঃখে তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল—সে দোয়াত কলম লইয়া পত্র লিখিতে বসিল। আধ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া লিখিল—"কমল! কথা রাখিতে পারিলাম না। ক্ষমা করিও। তোমার স্বামীর সন্ধান করিয়াছি।"

যোগেন্দ্র এই অসমাপ্ত পত্রখানি ডাকে পাঠাইয়া দিল। তাহার পর ভাবিল, এরূপ পত্র লেখা ভাল হইল কি ? শশাঙ্কের প্রতি তাহার

অত্যন্ত ঘৃণা হইল। সেই দিন হইতে সে শশাঙ্কের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিল।

৫

তাহার পর অনেক দিন অতীত হইয়াছে। একদিন প্রভাতে যোগেন্দ্র একটি সংকীর্ণ গলির ভিতর দিয়া ছেলে পড়াইতে যাইতেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি প্রতিদিনের অভ্যাসমত চাকরের কোলে চড়িয়া, খাবারের দোকানের দিকে লইয়া যাইবার জন্য ঠেলিতেছে। দুই একটা বড় বাড়ীর দ্বারে কাকাতুয়া চীৎকার করিতে করিতে দাঁড়ে দুলিতেছে। দরোয়ানগুলা দুলিতে দুলিতে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়িতেছে। উড়ে বামুনগুলা গামছা স্কন্ধে ফেলিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে মেসের দিকে ছুটিয়াছে। যোগেন্দ্র দেখিল, একটি বড় বাড়ীর দ্বারদেশে অনেকগুলি ফুটফুটে বালকবালিকা সমবেত হইয়াছে। কেহ করতালি দিতেছে, কেহ হাসিতেছে,—সেখানে যেন আনন্দের স্রোত বহিতেছে। সে দেখিল, দুই পার্শ্বে দুইটি ঘটের উপর পূর্ণশীর্ষ সিন্দুর-চর্চ্চিত নারিকেল ও দুই ধারে দুইটি কদলীবৃক্ষ সংস্থাপিত। বালকেরা ঠাকুরের নাম লইয়া তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে। কেহ বলিতেছে, কাল ঠাকুর আসবে। কেহ আপত্তি করিয়া বলিতেছে, না, পরশু আসিবে। আগামী পরশু যে জগদ্ধাত্রীপূজা তাহা যোগেনের মনে ছিল না। তাহার বৈশাখ মাসের কথা মনে পড়িল—তখনই যোগেন্দ্র বাসায় ফিরিল। সে যথাসময়ে কাঞ্চনপুরে যাত্রা করিল।

খুব সকালে নৌকা আসিয়া কাঞ্চনপুরের ঘাটে পঁহুছিল। সেদিন জগদ্ধাত্রীপূজা। তখন ঊষা। নদীর জল ছল্ ছল্ করিয়া গ্রামের তটে প্রতিহত হইতেছে। প্রভাতে পল্লীগ্রামখানি যেন লজ্জানম্র নববধূর মত অবগুণ্ঠন দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যোগেন্দ্রের মনে পড়িল সেই দিনের কথা—কি ভয়ানক উদ্বেগ ও আকুলতা লইয়া কাঞ্চনপুরে কমলকে রাখিতে আসিয়াছিল। আজ সে ব্যাকুলতা নাই; কিন্তু আজ অন্য চিন্তায় তাহার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে।

যোগেন্দ্র মাঝির পাওনা চুকাইয়া দিয়া হর্ষ-বিষাদ-জড়িত হৃদয়ে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল।

যোগেন্দ্র প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দেবীকে প্রণাম করিল। কমলের

সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে, কমল তাহাকে বসিবার জন্ত আসন পাতিয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "দেরী দেখিয়া মনে হইল, বুঝি ভুলিয়া গিয়াছ।"

৬

এই সময়ে একটি অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন থিয়েটারের ফেরত শশাঙ্ক নীহারিকার বাড়ীতে গিয়া অত্যন্ত সুরা পান করিল। পরদিন নীহারিকার নেকলেসটি খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। নীহারিকা অম্লান-বদনে শশাঙ্ককে বলিল—"কি দেখ্‌ছ? মরণ আর কি? ভাল চাও ত হার ফেরত দাও।"

"আমি কি তোমার হার নিয়েছি, এ কথা তুমি মনে ভাবতে পার?"

"তুমি নিতে পার, আর আমি ভাব্‌তে পারি না? ভাব্‌লেই বুঝি যত দোষ?

"তবে আমি চোর?"

নীহারিকা বলিল "আমি ত আর চোর বলিনি, তুমি নিজেই গায়ে পড়ে সে কথা বলছ। হার নিয়েছ, ফিরিয়ে দাও।"

"বেশ, আমায় ড়ুদিন সময় দাও—আমি তোমার নেকলেস দিয়ে যাব।" শশাঙ্ক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া নীহারিকার গৃহ ত্যাগ করিল। দুঃখে, ক্ষোভে, ক্রোধে তখন তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছিল।

জগদ্ধাত্রীপূজার ছুটীতে প্রায় সকলেই বাড়ী গিয়াছেন। বাসায় কেহই ছিল না। শশাঙ্ক আসিয়া শয্যা পাতিয়া শুইয়া পড়িল। আজিকার ঘটনা তাহার হৃদয়ে নির্দ্দয় ভাবে আঘাত করিল। মরুভূমে মরীচিকার অনুসরণ করিয়া অবসন্নদেহে সে যেন তপ্ত বালুকায় বসিয়া পড়িল। সে "যোগেন্দ্রবাবু" বলিয়া তুইবার চীৎকার করিয়া ডাকিল। কোনও উত্তর পাইল না। উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া দেখিল, যোগেন্দ্রের গৃহদ্বার রুদ্ধ। আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শয্যার উপর বসিয়া পড়িল। চিন্তা আর তাহার ভাল লাগিল না। অন্যমনস্ক হইয়া হইয়া বাক্স খুলিয়া কমলের লেখা পত্রগুলি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। এখন বুঝিতে পারিল, সেগুলির ভিতর কি সরলতা—কি দীনতা—কি প্রাণস্পর্শী নিবেদন। এই সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া হাঁকিল—"বাবু! চিঠি নিয়ে যান।" শশাঙ্কের প্রাণ অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল আজ কি কমলের চিঠির প্রত্যাশা করা করা যায় না? অনমনস্কভাবে সে নীচে নামিয়া গেল। পত্রখানি তুলিয়া লইল। লেখাটি দেখিয়া সে বিস্মিত

হইল। চিঠির উপর যোগেনবাবুর নাম। শিরোনামে ঠিক কমলের হাতের অক্ষর ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে যোগেনবাবুর স্ত্রী কমলের মত লেখেন! স্ত্রী হইলেই বুঝি কমলের মত হইতে হয়। কমল যেমন মিনতি করিয়া পত্র লেখে, ইনিও বোধ হয় তেমনই করিয়া লিখিয়াছেন। একটু সহানুভূতির জন্য—একটি করুণ আহ্বানের নিমিত্ত তখন তাহার মন ব্যাকুল হইয়াছে। একবার চিঠিখানি খুলিয়া দেখি, তারপর যেমন পত্র তেমনই করিয়া রাখিব। না, না, পরের চিঠি কোনও মতেই খোলা উচিত নয়; কিন্তু আমি ত ডুবিতে বসিয়াছি—আমার আর উচিত অনুচিত কি? আমি পায়ে ধরিয়া যোগেন্দ্র বাবুর নিকট এই নীচ প্রবৃত্তির নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিব। এ চিঠি না পড়িলে আমি মরিয়া যাইব।

পত্র পড়িয়া শশাঙ্ক স্তম্ভিত হইয়া গেল। পত্রে লেখা ছিল—

"তোমার পত্র অনেক দিন পাইয়াছি। আমাকে পত্র দিবার প্রয়োজন ছিল না। স্বামী দেবতা—তিনি যেদিন ভাল বুঝিবেন, সেই দিন আসিবেন। আমার জন্য তুমি কষ্ট করিও না।- কমলা। কাঞ্চনপুর।"

পত্রখানি বুকে করিয়া শশাঙ্ক শয্যায় শুইয়া পড়িল। বিশ্বসংসারের সকল সৌন্দর্য্যে, সকল মধুরতায়, সকল কমনীয়তায় বিভূষিতা হইয়া, পদদলিতা, অপমানিতা, উপেক্ষিতা কমল তাহার নয়নপটে ফুটিয়া উঠিল। এত রূপ, এত মধুরতা, এমন বিনয়নম্রমূর্ত্তি শশাঙ্ক আর কখনও দেখে নাই। একবার, দুইবার করিয়া সে বহুবার কমলের পত্রখানি পড়িল, নানারূপ চিন্তায় সে কেমন হইয়া গেল। কমল যোগেন্দ্রকে লিখিয়াছে, "স্বামী দেবতা, যখন ইচ্ছা হইবে আসিবেন।" আর আমি অসম্পূর্ণ জীবন লইয়া মাতার স্নেহে—স্ত্রীর প্রণয়ে বঞ্চিত! শশাঙ্ক ধীরে ধীরে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। একদৃষ্টে আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। সে ভাবিল, কমলের নিকট গিয়া শাস্তি না লইলে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। সেই রাত্রেই সে কাঞ্চনপুর রওনা হইল।

৭

শশাঙ্ক পথে যাইতে যাইতে কত কি ভাবিতে লাগিল। কতদিন পরে সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে—কত অখ্যাতি, কত দুর্নাম মস্তকে লইয়া সেই নির্জ্জন পল্লীপথে চিরপরিচিত গৃহে অপরিচিতের মত সে আবার ফিরিতেছে।

তখন গোধূলির সন্ধ্যা মেঘহীন আকাশের প্রান্ত হইতে ধীরে ধীরে ধরায় অবতীর্ণ হইতেছিল। গ্রামের বালকবালিকারা পূজাবাড়ীর দিকে ছুটিয়াছে। ধূপধূনার গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। কমল আরতির নৈবেদ্য সাজাইতেছে। শশাঙ্ক চোরের মত গৃহে প্রবেশ করিল। সমবেত প্রতিবেশিগণের মধ্যে অনেকে তাহাকে চিনিতে পারিল; কিন্তু কেহ কিছু বলিল না। আরতির বাজনা যেমন বাজিতেছিল, তেমনই বাজিতে লাগিল।

আরতি শেষ হইল। বাজনা থামিল। একে একে সকলে ভক্তিভরে দেবীকে প্রণাম করিল। শশাঙ্কের মা দেবীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার হারানিধি ঘরে ফিরিয়াছে। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি আসিয়া পুত্রের হাত ধরিলেন, তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। শশাঙ্ক জননীর পদধূলি গ্রহণ করিল। উপেক্ষিতা কমল তাহাকে প্রণাম করিল। শশাঙ্ক লজ্জায় কমলের দিকে চাহিতে পারিল না।

দালানের অপর প্রান্তে স্তম্ভের ঈষৎ অন্তরালে দাঁড়াইয়া যোগেন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই মিলন-উৎসব দেখিতেছিল। সে এতদিন যাহাদের জন্য দেবতার প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছে, আজ সেই কমল তাহার স্বামীর সহিত মিলিত হইতেছে দেখিয়া যোগেন্দ্রের মনে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত সকল অসম্ভব নিমেষের মধ্যে সম্ভব হইল; কিন্তু এত আনন্দেও যেন কি অভাব তাহাকে অভিভূত করিল। আজ যখন দেখিল, আর তাহার সহানুভূতির প্রয়োজন নাই, তখন ধীরে ধীরে একটা গভীর বিষাদের ছায়া তাহার অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। যোগেন্দ্র নিঃশব্দে দালান হইতে নামিয়া আসিল, এবং ধীরে ধীরে রজনীর অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভ্রম-সংশোধন।

গত আষাঢ় মাসের "সাহিত্যে" ২২৩ পৃষ্ঠায় "সিন্ধু" নামক কবিতার চতুর্থ পংক্তির পর

আশৈশব মাতৃভক্ত, কিশোর বয়সে

এই পংক্তিটি ভ্রমক্রমে মুদ্রিত হয় নাই। ২৭ পংক্তির পর

শৈশবের মুগ্ধপ্রাণ আত্মা ছিন্ন করি,

যৌবনে আকুল বক্ষে ছিন্ন আত্মা লয়;

এই দুই পংক্তি ছাপা হয় নাই। পাঠকবর্গ এই ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।— সাহিত্য-সম্পাদক।

দ্বিজেন্দ্রলাল। *

সভ্য মহোদয়গণ,—কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যে দেশকে উদ্দেশ করিয়া "আমার দেশ" গান রচনা করিয়াছিলেন, যে ভূমিকে লক্ষ্য করিয়া "আমার জন্মভূমি" গান করিয়াছিলেন, যে ভাষার উপাসনা-কল্পে "আমার ভাষা" এই গীতের প্রচার করিয়াছিলেন,—সেই দেশ আমাদেরই দেশ, সেই ভূমি আমাদেরই জন্মভূমি, সেই ভাষা আমাদেরই ভাব-জননী মাতৃভাষা। আমা-হেন অকিঞ্চনকে সেই কবির স্মৃতিরক্ষার সভায় সভাপতির আসন দান করিয়া, আপনারা আমার বার্দ্ধক্যের আকিঞ্চন পূর্ণ করিয়াছেন।

দাওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়, এককালে বাঙ্গালার ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নমস্ত ছিলেন। দীনবন্ধুর বন্ধু, বিদ্যাসাগরের সহচর, আমাদের সকলের অশেষশ্রদ্ধাভাজন দাওয়ানজী স্বীয় চরিত্রবলে ও মনীষা-প্রভাবে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের নব্যশিক্ষিত সমাজের এক জন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তিনি পুণ্যশ্লোক রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের আত্মীয় ও কুটুম্ব ছিলেন; রামতনু বাবু দাওয়ানজীর উৎসাহ ও সু-পরামর্শের উপর অনেকটা নির্ভর করিতেন। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, মহারাজ সতীশচন্দ্র ও মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র,—নবদ্বীপের এই তিন মহারাজের অধীনে কার্য্য করিয়া দাওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র যে অসামান্ত সামঞ্জস্য-বুদ্ধির, তেজস্বিতার ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সেই সময়ের বাঙ্গালীমাত্রই জানিতেন। এই দাওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র কবি দ্বিজেন্দ্রলালের জনক। দ্বিজেন্দ্রলাল সাত ভাইয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ; ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রের পরে দাওয়ানজীর এক কন্যা হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্রলাল আমার অতি পরিচিত ও মিত্র ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রের তৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলাল বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত। ইঁহাদের জননী শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য্যের বংশের কন্যা ছিলেন—সতী, সাধ্বী, লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন। কাজেই বলিতে হয়, মাতৃ ও পিতৃ উভয় ধারার প্রভাবেই দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিভাশালী হইয়াছিলেন। একটা ঘটনার কথা আজ মনে পড়িয়া গেল। যে দিন দাওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সেই দিন কৃষ্ণনগরের সে সময়কার প্রসিদ্ধ ডাক্তার কালী লাহিড়ী মহাশয়

* গত ১ই শ্রাবণ কলিকাতার টাউন-হলে দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি-সভায় সভাপতি শ্রীযুত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।

জিজ্ঞাসা করেন,—"দাওয়ানজী, আপনার কিছু মনের কথা বলিবার আছে? কোনও অপূর্ণ সাধ, অপূর্ণ বাসনা ব্যক্ত করিবার আছে কি?" মৃত্যুশীর্ণ মুখে একটু তৃপ্তির হাসি ফুটাইয়া দাওয়ানজী উত্তর করিলেন, "আমার মনে কোনও ক্ষোভ নাই। আমার সাত পুত্রই জীবিত; সর্ব্বকনিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্র বিলাতে গিয়াছে, সেখানে ভাল লেখাপড়া করিতেছে। একমাত্র কন্যা সৎপাত্রে পড়িয়াছে। আমার সকল সাধ মিটিয়াছে। এখন যাঁহার আহ্বানে লোকান্তরে যাইতেছি, তাঁহার দরবারে গিয়া হাজির হইতে পারিলেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়।" এমন জনকের আত্মজ বলিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল আজ বাঙ্গালার কবিকুলশিরোমণি; ভাবসম্পদে তিনি বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষাকেও উন্নত করিয়াছেন।

১২৭০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ, কৃষ্ণনগরে, দাওয়ানবাটীতে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগরের Anglo-Vernacular School হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রশংসার সহিত এফ. এ. ও বি. এ. পাশ করিয়া,১৮৮৪খৃঃ অব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং গবর্মেণ্টের কৃষিবৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি পাইয়া তিনি বিলাতে যান, এবং সিসেষ্টার (Cirencester) কলেজে কৃষিবিদ্যা অর্জ্জন করেন। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি বিলাতী বা ইউরোপীয় সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনা করেন, অভ্যাসগুণে পরে তিনি এক জন সুগায়ক হইয়াছিলেন। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, দ্বিজেন্দ্রলাল এক জন সিদ্ধ কবি ছিলেন। বিলাতে বসিয়া, ইংরেজী ভাষায় তিনি একখানি কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। উহার নাম Lyrics of Ind। ইংলণ্ডের মনস্বী কবি ও লেখক স্যর এড্‌উইন আর্ণল্ড মহোদয়ের নামে এই কবিতা-পুস্তক উৎসর্গ করা হইয়াছিল। স্যর এড্‌উইন দ্বিজেন্দ্রলালকে স্নেহ করিতেন, তাঁহার কাব্যশক্তির প্রশংসা করিতেন। বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যা ও সঙ্গীত-বিদ্যা শিখিয়া, চরিত্র ও মনীষার উন্মেষ ঘটাইয়া যখন দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন স্যর চার্লস্ এলিয়ট বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে দ্বিজেন্দ্রলাল ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টরের চাকরী প্রাপ্ত হন। প্রথমে তিনি সেট্‌লমেণ্ট-বিভাগে কর্ম্ম করেন; পরে আবকারী বিভাগে উন্নীত হন; শেষ অবস্থায় হাকিম হইয়া ফৌজদারী বিচার করেন। অথচ যে বিদ্যা অর্জ্জন করিবার জন্য গবর্মেণ্ট নিজ ব্যয়ে তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন, সে বিদ্যার বিশেষ প্রয়োগ তাঁহাকে

চাকরী-জীবনে করিতে হয় নাই। শুনিয়াছি, তিনি নিজে সখ করিয়া ইংরেজী ভাষায় দুইখানি বহি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই ভারতীয় কৃষিতত্ত্বের একটু পরিচয় পাওয়া যায়। বিহার ও উড়িষ্যা যখন স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয়, তখন দ্বিজেন্দ্রলালকে মুঙ্গেরে বদলী করিয়া দেওয়া হয়। বাঁকুড়া হইতে কলিকাতায় আসিবার পরই তাঁহাতে সন্ন্যাস রোগের লক্ষণ প্রকট হয়; দ্বিজেন্দ্রলাল এক বৎসরের ছুটী লইতে বাধ্য হন। সে ছুটী ফুরাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার শরীর আরও অসুস্থ হয়, চিকিৎসকের পরামর্শমত তিনি পেন্সনের জন্য দরখাস্ত করেন। সে প্রার্থনা গবর্মেণ্ট মঞ্জুর করেন। কিন্তু নিয়তির এমনই বিধান, পেন্সনের টাকা হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে মহাপ্রস্থান করিতে হইয়াছে।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীকে দ্বিজেন্দ্রলাল বিবাহ করেন। আজ দশ বৎসর হইল, একটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া সুরবালা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনের শেষ দশ বৎসর বিপত্নীক অবস্থায় অতিবাহন করিয়াছিলেন; শিশু-পুত্র-কন্যাদের প্রতিপালনভার স্কন্ধে লইয়া তিনি পত্নী-শোক ভুলিয়াছিলেন। এতদিনে সে জ্বালা জুড়াইয়াছে, দেবতার চরণছায়ায় আবার দম্পতীর মিলন ঘটিয়াছে। ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন-কাহিনী। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন আধুনিক উচ্চশিক্ষার মধুময় ফলস্বরূপ। তিনি মেধাবী মনস্বী ছিলেন, সচ্চরিত্র সজ্জন ছিলেন, তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। তিনি চাকরী করিতেন বটে, পরন্তু কখনও মোসাহেবী করিতে পারেন নাই। আমি যতটুকু জানি, তাহাতে ইহা স্পষ্ট বলিতে পারি যে, দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজী সাহিত্য—সভ্যতা—মনুষ্যত্ব, এই তিনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান ছিলেন্। তাঁহার রচিত গদ্যে, পদ্যে, সন্দর্ভে, নাটকে এই শ্রদ্ধার ভাব নানা রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই দ্বিজেন্দ্রলালকে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি বাঙ্গালী জাতিকে ও বঙ্গভূমিকে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, বহুজন্ম সাধনা না করিলে তেমন দান কেহ করিতে পারে না। মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু, ভূদেব, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র,—ইঁহাদের পরেই দ্বিজেন্দ্রলাল। ইঁহাদের ভাব-পরম্পরায় পরিসমাপ্তি যেন দ্বিজেন্দ্রলালেই ঘটিয়াছে। মাইকেলের "জাগ, জননি" উক্তির নানা ভাবে ক্রমবিকাশ হইয়াছে। "বন্দে মাতরম্" গানে উহার পূর্ণ বিকাশ হয়; শেষে দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার

দেশ” ও “আমার জন্মভূমি”, এই দুই গানে উহার পর্য্যবসান ঘটে। দেশাত্ম-বোধের এমন প্রাণ-গোরা ও বুকভরা গান পূর্ব্বে কখনও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হয় নাই। শিশু যেমন জোর করিয়া, আব্দার করিয়া, মায়ের গলা জড়াইয়া ‘আমার মা’ বলিয়া নিজের দখল বজায় রাখে, দ্বিজেন্দ্রলালও তেমনই শিশুজনো-চিত নির্ম্মল, নিরাবিল, সরল ও সহজ ভাষায়,—যেন তাহাতে প্রাণমন সব ঢালিয়া, “আমার দেশ” ও “আমার জন্মভূমি” গান করিয়া গিয়াছেন। মমত্বের এমন অপূর্ব্ব বিকাশ রামপ্রসাদ, দাওয়ান মহাশয় প্রভৃতি মাতৃভক্ত সাধকগণের ভক্তি-সাধনায় হইয়াছে বটে, পরন্তু দেশমাতৃকার পূজায় বাঙ্গালা দেশে এমন আর কখনও হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম, দ্বিজেন্দ্রলালের দানের তুলনা হয় না।

আমি দ্বিজেন্দ্রলালকে ভাল করিয়াই চিনিতাম ও জানিতাম। পূর্ব্বে প্রায়ই কৃষ্ণনগরে যাইয়া দীর্ঘ-অবকাশ যাপন করিতাম। সেই সময়ে বন্ধুবর রাজেন্দ্রলালের মুখে অনেক খবর শুনিতাম ও জানিতাম। দ্বিজেন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, যখন হাসির গানের গায়ক রূপে সমাজে সুপরিচিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখে অনেকবার অনেক গান শুনিয়াছি। তিনি সুগায়ক ছিলেন বলিলে অধিক কিছু বলা হইল না। দ্বিজেন্দ্র তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটা ভাব ফুটাইতে পারিতেন, তাঁহার সুরের যেন একটা স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। সেকালের বড় বড় কীর্ত্তনীয়া যেমন কীর্ত্তনের সুরে রসোদ্গার করিতে পারিতেন, একটা ভাবের অবতারণা ঘটাই-তেন, দ্বিজেন্দ্রলালও তেমনই কণ্ঠস্বরের প্রভাবে গীতটিকে সজীব করিয়া তুলিতে পারিতেন। দ্বিজেন্দ্রের পিতা দাওয়ানজী এক জন প্রসিদ্ধ ও দেশমান্য কলাবৎ ছিলেন। বংশানুক্রম-অনুসারে দ্বিজেন্দ্রলাল জনকের সঙ্গীতপাণ্ডিত্যটুকু লাভ করিতে না পারিলেও কণ্ঠস্বরের সজীবতা-সম্পাদন করিতে পারিতেন। ইহার উপর তিনি স্বয়ং সুকবি ছিলেন, রচনাচাতুর্য্যে সুপটু ছিলেন। তিনি কবিতা লিখিয়া তাহাতে সুর সংযোগ করিতেন না; সুরের মহাপ্রাণ নির্দ্দেশ করিয়া তদনুসারে এক একটি গীত রচনা করিতেন। যে ভাবের অভিব্যঞ্জনার জন্য তিনি মনো-মত বাঙ্গালা সুর পাইতেন না, তাহার বিকাশ হেতু ইংরেজী সুর আমদানী করি-তেন। এমন ভাবে আমদানী করিতেন যে, সে বিলাতী সুর আমাদের কানে বাজিত না। এই “আমার দেশ” গানের সুর খাঁটী বিলাতী, কিন্তু উহাকে এমন বাঙ্গালী ভাব মাখাইয়া ফুটান হইয়াছে যে, এখন হাটে-মাঠে-বাটে উহা গীত হইতেছে—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সবাই ঐ গান করিতেছে। ইহাই দ্বিজে-

শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, সি. আই. ই.

Bijoya Press, Calcutta

শ্রের বিশিষ্টতা ; এই বিশিষ্টতা লইয়া তিনি হাসির গান রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সকল হাসির গানের অন্তর্নিহিত শ্লেষ-বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ-রঙ্গটুকু গানের সুরের মুখে আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠে। উদ্ভট ভাষা যেন উদ্ভট সুরের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া গিয়াছে। কাজেই তাঁহার হাসির গান গাহিলেই শ্রোতার মনে আপনা-আপনি হাসি যেন জাগিয়া উঠে, হাসাইবার জন্য অন্য কোনও চেষ্টা করিতে হয় না। তাঁহার রচিত হাসির গান শুনিয়া হাসিতে হয় বটে, আমরা অনেকেই অনেকবার সে গান শুনিয়া হো-হো হাসিয়াছিও বটে, পরন্তু সেগুলি কি সত্যই হাসির গান? সে যে জাতির চরিত্রের মুকুর! শিথিল-শ্লথ সমাজের প্রতিচ্ছবি! যখন হাসিয়াছি, তখন আমরা কেহ ভাবি নাই, এ মুকুরে আমাদের প্রত্যেকের মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। যখন সে ভাবনা আসিয়াছে, তখন গোপনে চোখের জলে অনেকের বুক ভাসিয়া গিয়াছে—তখন অনেককে অনু-শোচনায় অধীর হইতে হইয়াছে। তাঁহার রচিত হাসির গানের প্রত্যেক গীতটির বিশ্লেষণ করিয়া দেখ-দেখি ;—দেখিতে পাইবে, এক একটি গান যেন চরিত্র-মুকুর। তাহাতে অতিরঞ্জন নাই, উৎকটতা উদ্ভটতা নাই ; কাচখণ্ড সরল ও সম-তল, যেন ঋজু ভাবে সত্যের প্রতিচ্ছায়া দেখাইতেছে! যিনি এ চিত্র দেখাইতে-ছেন, তিনি মুকুরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকেন না, তিনিও সকলের সঙ্গে সমান ভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন। এমন অনুকম্পা, এতটা সমবেদনা আমি আর কোনও স দেশের ব্যঙ্গাত্মক কবিতে দেখিতে পাই নাই! তাই দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান শুনিয়া কেহ কখনও ব্যথা পায় না, কেহ কখনও কাতরমুখে সরিয়া দাঁড়ায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল "ন্যাকামী"র বিরোধী ছিলেন। তাঁহার হাসির গানের প্রভাবে বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে ন্যাকামীর সঙ্কোচ ঘটিয়াছে কি না, বলিতে পারি না ; তবে "ন্যাকামী"র যে পূর্ণ নির্দ্দেশ হইয়াছে, সে পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। জাতি-সৃষ্টি ও জাতি-পুষ্টির ব্যাপারে ইহা একটা বড় কাজ। বাঙ্গালার সমাজ যখন সজীব ছিল, তখন গম্ভীরার গানে, পাঁচালীর ছড়ায়, যাত্রার সং-এ, কবিওয়ালার উতোর-চাপানে এই ন্যাকামীর অনেকটা সঙ্কোচ ঘটান হইত; দাশ-রথি রায় অনেক রকমের ন্যাকামীর উপর চাবুক চালাইয়াছিলেন। ইংরেজী-শিক্ষার আমলে প্রথমে হুতোম, সঙ্গে সঙ্গে দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী", পরে মার্জ্জিত ভাবে কমলাকান্ত ও হেমচন্দ্র, তাহার পরে কঠোর ভাবে ভারত-উদ্ধারে ইন্দ্রনাথ, শেষে মধুর ভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল বিদ্রূপের কশা চালাইয়াছিলেন। ইহার কোনটিই ভাষা হইতে খসিয়া যাইবে না ; তবে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান চির-

দিন আঁকের সামগ্রী হইয়া থাকিবে, মজলিসে ও বৈঠকখানায় উহা গীত হই-বেই। উহার মধ্যে বাঙ্গালার এই সময়কার ইতিহাস-কথা নিবদ্ধ রহিল। আগামিগণ যখন এই সকল গান করিবে, তখন বায়স্কোপে ছায়া-চিত্র-দর্শনের মত বর্ত্তমান সমাজের অনেকগুলি চিত্র তাহারা দেখিতে পাইবে। সাহিত্যের হিসাবে ইহা একটা বড় কীর্ত্তি; এ কীর্ত্তি অক্ষয় হয়ই; এমন কীর্ত্তিমান্ কবি জাতির স্মৃতিপটে অমর হইয়া থাকেনই।

পুরাকালে প্রধানতঃ লোকশিক্ষার জন্যই ভারতের প্রাদেশিক ভাষা সকল ব্যবহৃত হইত। এ দেশে লোকশিক্ষা বলিলেই ধর্ম্মশিক্ষা বুঝায়। সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত যাহাতে সদ্ধর্ম্মের শিক্ষা প্রসারিত হইতে পারে, সকলেই যাহার সাহায্যে অনায়াসে ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত সকল হৃদ্গত করিতে পারে,—তাহারই সৃষ্টি ও পুষ্টির উদ্দেশ্যে বৌদ্ধগণ প্রাদেশিক ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন; বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম-পুস্তক সকল প্রাকৃত ও পালি ভাষায় রচিত হইয়াছে। এই উদার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী হিন্দুগণ প্রাদেশিক ভাষায় বহু ধর্ম্ম-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভারতের অন্যত্র যাহা হইয়াছে, আমাদের বাঙ্গালা দেশেও তাহাই ঘটিয়াছে। বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক কবিগণই আমাদের বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিবিধান করিয়াছেন। পূর্ব্বে খাঁটী কাব্যের হিসাবে কোনও কবিই বঙ্গ-ভাষায় কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া যান নাই। কোনও পুরাণের অনুবাদ, দেবতার লীলা-কীর্ত্তন, ভক্তি ও প্রেমের মহিম-কীর্ত্তন বা দেবতা-বিশেষের পূজা-পদ্ধতির প্রচলন-উদ্দেশ্যেই বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য-গ্রন্থ সকল রচিত হইত। এমন যে "বিদ্যাসুন্দর", তাহাকেও অন্নদামঙ্গলের সহিত জুড়িয়া দিতে হইয়াছে, তবে উহা বাঁচিয়া আছে; অন্নদামঙ্গলের চাট্‌নীর হিসাবে উহার জীবন, স্বতন্ত্রভাবে নহে। রামপ্রসাদের স্বতন্ত্র "বিদ্যাসুন্দর" তাই পরিত্যক্ত—উপেক্ষিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে ধর্ম্মের কথা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত, পুরাণের কাহিনী সকল পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে প্রসারিত। ইংরেজের আমলে, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব-কালে আমরা স্বতন্ত্রভাবে কাব্য শাস্ত্রের আলোচনা করিতে উন্মুখ হইলেও, আমাদের মাইকেল মধুসূদনকে মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা লিখিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল; হেমচন্দ্র "বৃত্রসংহার" লিখিয়া যশস্বী; নবীনচন্দ্র "রৈবতক" "কুরুক্ষেত্র" প্রভৃতি লিখিয়া মহাকবি। যেন মনে হয়, এখনও সেই পুরাণের ও ধর্ম্মের গণ্ডী কাটাইয়া আমরা বাহিরে যাইতে পারি না। ভাবের কথা কহিতে হইলে, উচ্চ আদর্শ ফুটাইতে হইলে, এখনও ভারতীয় কবিকে পুরাণের মধ্য-

সমুদ্র মন্থন করিতে হয়; সদ্ধর্ম্মের উপদেশ দিতে হইলে গীতা ভাগবতাদি সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের আলোড়ন করিতে হয়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ঠিক এই পথে চলেন নাই। তিনি ভারতের আদিম যুগের, গৌরব ও শ্লাঘার কালের কাহিনী অবলম্বনে নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেও,—সীতা ও পাষাণী লিখিয়া খ্যাতিযুক্ত হইলেও,—তাঁহার প্রধান নাটকগুলি ভারতের "নৈশযুগে"র ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ভারতের মুসলমান প্রাধান্যের কাল ধরিয়া তিনি যে কয়খানি নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই কয়খানিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম ঐতিহাসিক নাটক—কৃষ্ণকুমারী মধুসূদনই রচনা করেন। শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক এক সময়ে বাঙ্গালীর কাছে আদর পাইয়াছিল। পরে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি নাটকাকারে পরিণত হইয়া ঐতিহাসিক নাটকের অভাব অনেকটা দূর করে; গিরিশচন্দ্রও এই সময়ে কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-ভাঙ্গা নাটক কয়খানি ছাড়া আর কোনও ঐতিহাসিক নাটকে একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্য থাকিত না—রকম করিয়া একটা নূতন কিছু শিখাইবার প্রকট চেষ্টা থাকিত না। দ্বিজেন্দ্রলাল এই অভাব দূর করিয়াছেন; তিনি ইতিহাসের চিত্র, পুরাণের আকারে, লোক-লোচনের গোচর করিয়াছেন। তাঁহাকে ভারতের মোগল-যুগের পুরাণকার বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার রচিত "রাণা প্রতাপ", "দুর্গাদাস", "মেবার-পতন", "নূরজাহান", "শাহ্-জাহান" প্রভৃতি প্রত্যেক নাটকেই একটা উদ্দেশ্য (Purpose) প্রকট রহিয়াছে। সে উদ্দেশ্য লোক-শিক্ষার বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত; সে উদ্দেশ্য সমাজ-সৃষ্টির পুণ্য-ভূমির ব্রতের সঙ্কল্পস্বরূপ; সে উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব-সাধনার মহৎ আসন-স্বরূপ। এই হেতুই আমি বলিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস-গাথাকে পুরাণে উন্নত করিয়া গিয়াছেন। ভাল করিয়াছেন, কি মন্দ করিয়াছেন, তাহার বিচার আগামিগণ করিবেন; কিন্তু যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রতিভার ও মনীষার পরিচয় আছে, কবি-হৃদয়ের ও কবি-চিত্তের প্রকাশ আছে, মনুষ্যত্বের ও দেবত্বের পরিস্ফূরণ আছে। এই কয়খানি নাটক বাঙ্গালা ভাষার সম্পদ ও কবিত্বের আকর। ইউরোপীয় সাহিত্যের অনেক মধুময় ভাব, অনেক অপরাজেয় আদর্শ, অনেক অভিনব রসবিন্যাস, এই কয়খানি নাটকের সাহায্যে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীকে উপঢৌকন দিয়াছেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছে; হয় ত পরে কখনও মাথা হইতে নামাইবে না।

আমাদের দুঃখ এই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, এ দুঃখের মধ্যে একটু যেন ঈর্ষ্যার ভাব লুকান আছে। যে দেশে শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্ত অল্পজীবনের মধ্যে একটা দেশব্যাপী ভাববিপ্লব ঘটাইয়া গিয়াছেন, সে দেশে পরমায়ুর দীর্ঘতা বা অল্পতা লইয়া বিচার করিলে চলিবে না। দেখিতে হইবে, যিনি চলিয়া গেলেন, তিনি আমাদের জন্য কি রাখিয়া গেলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অল্পবিস্তর পরিচয় আপনাদের অনেকের আছে।—আছে, বলিয়াই এমন শোক-সভার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার আয়োজন হইতেছে। শোক করি তাঁহারই জন্য, যিনি আমার আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ পুরুষ। কবি দেশের ও সমাজের আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ,—কেন না, দেশের ও সমাজের মর্ম্মের, ব্যথার ও সুখের কথা কবি টানিয়া বাহির করেন—মনের মতন ভাষায় তাহার প্রকাশ করেন; এই হেতু কবি ও ভাবুক সমাজের সকলের আত্মীয়, বন্ধু ও সখা। বিশেষতঃ যে কবি "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" রচনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি ত বাঙ্গালীর সহোদর-সহচর-তুল্য। তাঁহার মৃত্যুতে শোক যেন পৌষের কুয়াসার মতন আমাদের মন-বুদ্ধিকে ঢাকিয়া ফেলে। এক একবার মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল যেন বাঙ্গালার বর্ত্তমান যুগের রামপ্রসাদ। তিনি যে অভিনব শ্যামা-সঙ্গীতের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যে "মালসীর" আদর বাড়াইয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে ও সমাজে অমর হইবেই, সুতরাং তাঁহার স্মৃতি, তাঁহার নাম, এ দেশে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। তিনি বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে, চরিত্রে ও মনের বলে, প্রতিভায় ও মনীষায় বাঙ্গালীর মধ্যে এক জন প্রধান ছিলেন; ভাবুকতায় ও কাব্যগাথা-রচনায় তিনি একটা নূতন যুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। যতকাল এই যুগ থাকিবে, ততকাল তাঁহার নাম ও তাঁহার কীর্ত্তি আমাদের আপামরগণ ভুলিতে পারিবে না।

শ্রীরাসবিহারী ঘোষ।

আদরিণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাড়ার নগেন ডাক্তার ও জুনিয়ার উকীল কুঞ্জবিহারী বাবু বিকালে পান চিবাইতে চিবাইতে, চাকের হুঁকা দুলাইতে দুলাইতে জয়রাম মোক্তারের নিকট

আসিয়া বলিলেন—"মুখুর্য্যে মশায়, পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়ী থেকে আমরা নিমন্ত্রণ পেয়েছি, এই সোমবার দিন মেঝ বাবুর মেয়ের বিয়ে। শুনছি নাকি ভারি ধূমধাম হবে। বেনারস থেকে বাই আসছে, কলকাতা থেকে খেমটা আসছে। আপনি নিমন্ত্রণ পেয়েছেন কি ?"

মোক্তার মহাশয় তাঁহার বৈঠকখানার বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া হুঁকা হাতে করিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আগন্তুকগণের এই প্রশ্ন শুনিয়া, হুঁকাটি নামাইয়া ধরিয়া, একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"কি রকম ? আমি নিমন্ত্রণ পাব না কি রকম? জান, আমি আজ বিশ বচ্ছর ধরে তাদের এষ্টেটের বাঁধা মোক্তার? —আমাকে বাদ দিয়ে তারা তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে, এইটে কি সম্ভব মনে কর ?"

জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে ইঁহারা বেশ চিনিতেন—সকলেই চিনে। অতি অল্প কারণে তাঁহার তীব্র-অভিমান উপস্থিত হয়—অথচ হৃদয়খানি স্নেহে, বন্ধুবাৎসল্যে কুসুমের মত কোমল, ইহা যে তাঁহার সঙ্গে কিছুদিনও ব্যবহার করিয়াছে, সেই জানিয়াছে। উকীল বাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না—না—সে কথা নয়—সে কথা নয়। আপনি রাগ করলেন মুখুয্যে মশায় ? আমরা কি সে ভাবে বলেছি ? এ জেলার মধ্যে এমন কে বিষয়ী লোক আছে, যে আপনার কাছে উপকৃত নয়—আপনার খাতির না করে ? আমাদের জিজ্ঞাসা করবার তাৎপর্য্য এই ছিল যে, আপনি সেদিন পীরগঞ্জে যাবেন কি ?"

মুখোপাধ্যায় নরম হইলেন। বলিলেন "ভায়ারা, বস।"—বলিয়া সম্মুখস্থ আর একখানি বেঞ্চি দেখাইয়া দিলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে বলিলেন—"পীরগঞ্জে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে একটু কঠিন বটে। সোম মঙ্গল দুটো দিন কাছারী কামাই হয়। অথচ না গেলে, তাঁরা মনে ভারি দুঃখিত হবে। তোমরা যাচ্ছ ?"

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন -"যাবার ত খুবই ইচ্ছে—কিন্তু অত দূর যাওয়া ত সোজা নয় ! ঘোড়ার গাড়ীর পথ নেই। গোরুর গাড়ী করে যেতে হলে, যেতে দুদিন, আসতে দুদিন। পাল্কী করে যাওয়া, সেও যোগাড় হওয়া মুস্কিল। আমরা দুজনে তাই পরামর্শ করলাম, যাই মুখুয্যে মশায়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যদি যান, নিশ্চয়ই রাজবাড়ী থেকে একটা হাতী টাতী আনিয়ে নেবেন এখন, আমরা দুজনেও তাঁর সঙ্গে সেই হাতীতে দিব্যি আরামে যেতে পারব।"

মোক্তার মহাশয় স্মিতমুখে বলিলেন—"এই কথা ? তার জন্ত আর ভাবনা

কি ভাই?—মহারাজ নরেশচন্দ্র ত আমার আজকের মক্কেল নয়—ওঁর বাপের আমল থেকে আমি ওঁদের মোক্তার। আমি কাল সকালেই রাজবাড়ীতে চিঠি, লিখে পাঠাচ্ছি—সন্ধ্যা নাগাদ হাতী এসে যাবে এখন।"

কুঞ্জবাবু বলিলেন—"দেখলে হে ডাক্তার, আমি ত বলেইছিলাম—অত ভাবছ কেন,-মুখুয্যে মশায়ের কাছে গেলেই একটা উপায় হয়ে যাবে। তা মুখুয্যে মশায়, আপনাকেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। না গেলে ছাড়ছিনে।"

"যাব বৈ কি ভায়া—আমিও যাব। তবে আমার ত বাই শেমটা শোনবার বয়স নেই—তোমরা শুনো। আমি মাথায় এক পগ্‌গ বেঁধে, একটি থেলো হুঁকো হাতে করে, লোকজনের অভ্যর্থনা করব, কে খেলে কে না খেলে দেখব—তদারক করে বেড়াব। আর তোমরা বসে শুনবে—'পেয়ালা মুঝে ভর দে'—কেমন?"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন রবিবার। এ দিন প্রভাতে আহ্নিক পূজাটা মুখুয্যে মহাশয় একটু ঘটা করিয়াই করিতেন। বেলা ৯টার সময় পূজা-সমাপন করিয়া, জলযোগান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। অনেকগুলি মক্কেল উপস্থিত ছিল, তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। হঠাৎ সেই হাতীর কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন কাগজ কলম লইয়া, চশমাটি পরিয়া, "প্রবলপ্রতাপান্বিত শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ শ্রীনরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর আশ্রিতজনপ্রতিপালকেষু" পাঠ লিখিয়া, দুই তিন দিনের জন্য একটি সুশীল ও সুবোধ হস্তী প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। পূর্ব্বেও আবশ্যক হইলে কতবার এইরূপে মহারাজের হস্তী আনাইয়া লইয়াছেন। এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া পত্রখানি লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়া, মোক্তার মহাশয় আবার মক্কেলগণের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বয়স এখন পঞ্চাশৎ পার হইয়াছে। মানুষটি লম্বা ছাদের—রঙটি আর একটু পরিষ্কার হইলেই গৌরবর্ণ বলা যাইতে পারিত। গোঁফগুলি মোটা মোটা—কাঁচায় পাকায় মিশ্রিত। মাথার সম্মুখভাগে টাক আছে। চক্ষু দুইটি বড় বড়, ভাসা ভাসা। তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা যেন হৃদয় ছাপাইয়া, এই চক্ষু দুইটি দিয়া উছলিয়া পড়িতেছে।

ইহাঁর আদিবাস যশোর জেলায়। এখানে যখন প্রথম মোক্তারী করিতে আসেন, তখন এ দিকে রেল খোলে নাই। পদ্মা পার হইয়া, কতক নৌকাপথে, কতক গরুর গাড়ীতে, কতক পদব্রজে আসিতে হইয়াছিল। সঙ্গে কেবলমাত্র

একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ এবং একটি পিতলের ঘটী ছিল। সহায় সম্পত্তি কিছুই ছিল না। মাসিক তেরো সিকায় একটি বাসা ভাড়া লইয়া, নিজ হাতে রাঁধিয়া খাইয়া, মোক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেন। এখন সেই জয়রাম মুখোপাধ্যায় পাকা দালান কোঠা করিয়াছেন, বাগান করিয়াছেন, পুকুর কিনিয়াছেন, অনেকগুলি কোম্পানীর কাগজও কিনিয়াছেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এ জেলায় ইংরাজিওয়ালা মোক্তারের আবির্ভাব হইয়াছে বটে—কিন্তু জয়রাম মুখুয্যেকে তাহারা কেহই হটাইতে পারে নাই। এখনও ইনি এ জেলার প্রধান মোক্তার বলিয়া গণ্য।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদয়খানি অত্যন্ত কোমল ও স্নেহপ্রবণ হইলেও, মেজাজটা কিছু রুক্ষ। যৌবনকালে ইনি রীতিমত বদরাগী ছিলেন—এখন রক্ত অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। সে কালে, হাকিমেরা একটু অবিচার অত্যাচার করিলেই মুখুয্যে মহাশয় রাগিয়া চেঁচাইয়া অনর্থপাত করিয়া তুলিতেন। একদিন এজলাসে এক ডেপুটীর সহিত ইহাঁর বিলক্ষণ বচসা হইয়া যায়। বিকালে বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মঙ্গলা গাই একটি এঁড়ে বাছুর প্রসব করিয়াছে। তখনই আদর করিয়া উক্ত ডেপুটীবাবুর নামে বাছুরটির নামকরণ করিলেন। ডেপুটীবাবু লোকপরম্পরায় ক্রমে এ কথা শুনিয়াছিলেন, এবং বলা বাহুল্য, নিতান্ত প্রীতিলাভ করেন নাই। আর একবার, এক ডেপুটীর সম্মুখে মুখুয্যে মহাশয় আইনের তর্ক করিতেছিলেন, কিন্তু হাকিম কিছুতেই ইহাঁর কথায় সায় দিতেছিলেন না। অবশেষে রাগের মাথায় জয়রাম বলিয়া বসিলেন—"আমার স্ত্রীর যতটুকু আইন-জ্ঞান আছে, হুজুরের তাও নেই দেখছি।" সেদিন, আদালত-অবমাননার জন্য মোক্তার মহাশয়ের পাঁচ টাকা জরিমানা হইয়াছিল। এই আদেশের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্ট অবধি লড়িয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ১৭০০৲ ব্যয় করিয়া এই পাঁচটি টাকা জরিমানার হুকুম রহিত করাইয়াছিলেন।

মুখোপাধ্যায় যেমন অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন - তেমনই তাঁহার ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল। তিনি অকাতরে অন্নদান করিতেন। অত্যাচরিত, উৎপীড়িত গরীব লোকের মোকর্দ্দমা তিনি কত সময় বিনা ফিসে, এমন কি, নিজে অর্থব্যয় পর্য্যন্ত করিয়া, চালাইয়া দিয়াছেন।

প্রতি রবিবার অপরাহ্নকালে পাড়ার যুবক বৃদ্ধগণ মোক্তার মহাশয়ের বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া তাস পাশা প্রভৃতি খেলিয়া থাকেন। অদ্যও সেইরূপ অনেকে আগমন করিয়াছেন—পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারবাবু ও উকীলবাবুও আছেন।

হাতীকে বাঁধিবার জন্ম বাগানে খানিকটা স্থান পরিষ্কৃত করা হইতেছে ; হাতী রাত্রে খাইবে বলিয়া বড় বড় পাতাসুদ্ধ কয়েকটা কলার গাছ ও অন্যান্য বৃক্ষের ডাল কাটাইয়া রাখা হইতেছে—মোক্তার মহাশয় সেই সমস্ত তদারক করিতে-ছেন। মাঝে মাঝে বৈঠকখানায় আসিয়া, কোনও ব্রাহ্মণের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুই চারি টান দিয়া আবার বাহির হইয়া যাইতেছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জয়রাম বৈঠকখানায় বসিয়া পাশা খেলা দেখিতেছিলেন। এমন সময় সেই পত্রবাহক ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"হাতী পাওয়া গেল না।"

কুঞ্জবাবু নিরাশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"অ্যাঁ!—পাওয়া গেল না?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তাই ত? সব মাটী?"

মোক্তার মহাশয় বলিলেন—"কেন রে, হাতী পাওয়া গেল না কেন? চিঠির জবাব এনেছিস?"

ভৃত্য বলিল—"আজ্ঞে না। দেওয়ানজীকে গিয়ে চিঠি দিলাম। তিনি চিঠি নিয়ে মহারাজের কাছে গেলেন। খানিক বাদে ফিরে এসে বল্লেন, বিয়ের নেমন্তন্ন হয়েছে তার জন্ম হাতী কেন? গোরুর গাড়ীতে যেতে বোলো।"

এই কথা শুনিবামাত্র জয়রাম ক্ষোভে, লজ্জায়, রোষে যেন একবারে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; দুই চক্ষু দিয়া যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। মুখমণ্ডলের শিরা-উপশিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। কম্পিত স্বরে, ঘাড় বাঁকাইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন— "হাতী দিলে না! হাতী দিলে না!"

সমবেত ভদ্রলোকগণ ক্রীড়া বন্ধ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিলেন। কেহ কেহ বলিলেন—"তার আর কি করবেন মুখুয্যে মশায়! পরের জিনিস, জোর ত নেই। একখানা ভাল দেখে গোরুর গাড়ী ভাড়া করে নিয়ে, রাত্রি দশটা এগারটার সময় বেরিয়ে পড়ুন, ঠিক সময় পৌঁছে যাবেন। শ্রী ইমামদ্দি শেখ একযোড়া নূতন বলদ কিনে এনেছে—খুব জোরে যায়।"

জয়রাম বক্তার দিকে দৃষ্টিমাত্র না করিয়া বলিলেন—"না। গোরুর গাড়ীতে চড়ে আমি যাব না। যদি হাতী চড়ে যেতে পারি, তবেই যাব, নৈলে এ বিবাহে আমার যাওয়াই হবে না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সহর হইতে দুই তিন ক্রোশের মধ্যে দুই তিন জন জমিদারের হাতী ছিল।

সেই রাত্রেই জয়রাম তত্তৎ স্থানে লোক পাঠাইয়াছিলেন, যদি কেহ হস্তী বিক্রয় করে, তবে কিনিবেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় এক জন ফিরিয়া আসিয়া বলিল —"বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর একটি মেনা-হাতী আছে—এখনও বাচ্ছা—বিক্রী করবে, কিন্তু বিস্তর দাম চায়।"

"কত ?"

"দু' হাজার টাকা।"

"খুব বাচ্চা ?"

"না—সওয়ারি দিতে পারবে।"

"কুছ পরোয়া নেই। তাই কিনব। এখনি তুমি যাও। কাল সকালেই যেন হাতী আসে। লাহিড়ী মহাশয়কে আমার নমস্কার জানিয়ে বোলো, হাতীর সঙ্গে যেন কোনও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী পাঠিয়ে দেন, হাতী দিয়ে টাকা নিয়ে যাবে।"

পরদিন বেলা সাতটার সময় হস্তিনী আসিল। তাহার নাম—আদরিণী। লাহিড়ী মহাশয়ের কর্ম্মচারী রীতিমত ষ্ট্যাম্প-কাগজে রসীদ লিখিয়া দিয়া দুই হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

বাড়ীতে হাতী আসিবামাত্র পাড়ার তাবৎ বালক বালিকা আসিয়া বৈঠকখানার উঠানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। দুই এক জন অশিষ্ট বালক সুর করিয়া বলিতে লাগিল—"হাতী, তোর গোদা পায়ে নাতি।" বাড়ীর বালকেরা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, এবং অপমান করিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

হস্তিনী গিয়া অন্তঃপুরদ্বারের নিকট দাঁড়াইল। মুখুয্যে মহাশয় বিপত্নীক —তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ একটি ঘটীতে জল লইয়া সভয়-পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিলেন। কম্পিত হস্তে তাহার পদচতুষ্টয়ে সেই জল একটু একটু ঢালিয়া দিলেন। মাহুতের ইঙ্গিতানুসারে আদরিণী তখন জানু পাতিয়া বসিল। বড় বধূ তৈল ও সিন্দুরে তাহার ললাট রঞ্জিত করিয়া দিলেন। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। আবার দাঁড়াইয়া উঠিলে, একটা ধামায় ভরিয়া আলোচাল, কলা ও অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে রক্ষিত হইল—শুঁড় দিয়া তুলিয়া তুলিয়া কতক সে খাইল, অধিকাংশই ছিটাইয়া দিল। এইরূপে বরণ সম্পন্ন হইলে, রাজহস্তীর জন্য পরিষ্কৃত সেই স্থানে লইয়া গিয়া তাহাকে বাঁধা হইল। রাজহস্তীর জন্য সংগৃহীত সেই কদলীকাণ্ড ও বৃক্ষশাখা আদরিণী ভোজন করিতে লাগিল।

*   *   *   *

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পীরগঞ্জ হইতে ফিরিবার পরদিন বিকালেই মহারাজ নরেশচন্দ্রের সহিত মুখোপাধ্যায়মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বলা বাহুল্য, হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই গেলেন।

মহারাজের দ্বিতল বৈঠকখানার নিম্নে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের অপর-প্রান্তে প্রবেশের সিংহদ্বার। বৈঠকখানায় বসিয়া সমস্ত প্রাঙ্গণ ও সিংহ-দ্বারের বাহিরেও অনেক দূর অবধি মহারাজের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

রাজসমীপে উপনীত হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মোকদ্দমা ও বিষয়-সংক্রান্ত দুই চারি কথার পর মহা-রাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুখুয্যে মশায়, ও হাতীটি কার?"

মুখুর্য্যে মহাশয় বিনীতভাবে বলিলেন—"আজ্ঞে, হুজুর বাহাদুরেরই হাতী।"

মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন -"আমার হাতী! কৈ, ও হাতী ত কোনও দিন আমি দেখিনি। কোথা থেকে এল?"

"আজ্ঞে, বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে কিনেছি।"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া রাজা বলিলেন—"আপনি কিনেছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তবে বল্লেন আমার হাতী?"

বিনয় কিংবা শ্লেষস্থচক—ঠিক বোঝা গেল না—একটু মৃদু হাস্য করিয়া জয়রাম বলিলেন—"যখন হুজুর বাহাদুরের দ্বারাই প্রতিপালন হচ্ছি—আমিই যখন আপনার—তখন ও হাতী আপনার বৈ আর কার?"

সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া, বৈঠকখানায় বসিয়া, সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর নিকট মুখোপাধ্যায় এই কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষোভ ও লজ্জা আজ তাঁহার মুছিয়া গেল। কয়েক দিন পরে আজ তাঁহার সুনিদ্রা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উল্লিখিত ঘটনার পর সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতীত হইয়াছে—এই পাঁচ বৎসরে মোক্তার মহাশয়ের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

নূতন নিয়মে পাশ করা শিক্ষিত মোক্তারে জেলাকোর্ট ভরিয়া গিয়াছে। শিথিল নিয়মের আইন-ব্যবসায়ীর আর কদর নাই। ক্রমে ক্রমে মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের আয় কমিতে লাগিল। পূর্ব্বে যত উপার্জ্জন করিতেন, এখন তাহার অর্দ্ধেক হয় কি না সন্দেহ। অথচ ব্যয় প্রতিবৎসর বর্দ্ধিতই হইতেছে। তাঁহার তিনটি পুত্র। প্রথম দুইটি মূর্খ—বংশবৃদ্ধি ছাড়া আর কোনও কাযকর্ম্ম করিবার যোগ্য নহে। কনিষ্ঠ পুত্রটি কলিকাতায় পড়িতেছে—সেটি যদি কালক্রমে মানুষ হয়, এইমাত্র ভরসা।

ব্যবসায়ের প্রতি মুখোপাধ্যায়ের আর সে অনুরাগ নাই—বড় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ছোকরা মোক্তারগণ, যাহাদিগকে এক সময় উলঙ্গাবস্থায় পথে খেলা করিতে দেখিয়াছেন, তাহারা এখন শামলা মাথায় দিয়া (মুখোপাধ্যায় মাথায় পাগড়ী বাঁধিতেন, সেকালে মোক্তারগণ শামলা ব্যবহার করিতেন না) তাঁহার প্রতিপক্ষে দাঁড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া ফর্ ফর্ করিয়া ইংরাজিতে হাকিমকে কি বলিতে থাকে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। পার্শ্বস্থিত ইংরেজিজানা জুনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করেন, "উনি কি বলছেন?" জুনিয়ার তর্জ্জমা করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে বুঝাইতে অন্য প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, মুখের জবাব মুখেই রহিয়া যায়—নিষ্ফল রোষে তিনি ফুলিতে থাকেন। তাহা ছাড়া, পূর্ব্বে হাকিমগণ মুখুর্য্যে মহাশয়কে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, এখনকার নব্য হাকিমগণ আর তাহা করেন না। ইঁহাদের যেন বিশ্বাস, যে ইংরাজী জানে না, সে মনুষ্যপদবাচ্যই নহে। এই সকল কারণে মুখোপাধ্যায় স্থির করিয়াছেন, কর্ম্ম হইতে এখন অবসর গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। তিনি যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার সুদ হইতে কোনও রকমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। প্রায় ষাট বৎসর বয়স হইল—চিরকালই কি খাটিবেন? বিশ্রামের সময় কি হয় নাই? বড় ছেলেটি যদি মানুষ হইত—দুই টাকা যদি রোজগার করিতে পারিত—তাহা হইলে এতদিন কোন কালে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবসর লইতেন, বাড়ীতে বসিয়া হরিনাম করিতেন। কিন্তু আর বেশী দিন চলে না। তথাপি আজি কালি করিয়া আরও এক বৎসর কাটিল।

*

এই সময় দায়রায় একটি খুনী মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। সেই মোকদ্দমার আসামী জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে নিজ মোক্তার নিযুক্ত করিল। এক জন নূতন ইংরাজ জজ আসিয়াছেন—তাঁহারই এজলাসে বিচার।

তিন দিন যাবৎ মোকর্দ্দমা চলিল। অবশেষে মোক্তার মহাশয় উঠিয়া "জজসাহেব বাহাদুর ও এসেসার মহোদয়গণ" বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতা-শেষে, এসেসারগণ মুখোপাধ্যায়ের মক্কেলকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিলেন—

আর কেন, একে বিক্রী করে ফেলুন। মাসে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা খরচ বেঁচে যাবে।" কিন্তু বুড়ো মহাশয় উত্তর করিয়া থাকেন—"তার চেয়ে বল না, তোমার এই ছেলেপিলে নাতিপুতিদের খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে—ওদের একে একে বিক্রী করে ফেল।"—এরূপ উক্তির পর আর কথা চলে না।

হাতীটিকে দেখিয়া মুখোপাধ্যায়ের মনে হইল, ইহাকে যদি মধ্যে মধ্যে ভাড়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ত কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতে পারে। তখনই কাগজ কলম লইয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুসাবিদা করিলেন:—

হস্তীভাড়ার বিজ্ঞাপন।

বিবাহের শোভাযাত্রা, দূরদূরান্তে গমনাগমন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর আদরিণী নাম্নী হস্তিনী ভাড়া দেওয়া যাইবে। ভাড়া প্রতিরোজ ৩৲ মাত্র, হস্তিনীর খোরাকী ১৲ এবং মাহুতের খোরাকী ।০ একুনে ৪।০ ধার্য্য হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন ঠিকানায় তত্ত্ব লইবেন।

শ্রীজয়রাম মুখোপাধ্যায় (মোক্তার) চৌধুরীপাড়া।

এই বিজ্ঞাপনটি ছাপাইয়া সহরের প্রত্যেক ল্যাম্পপোষ্টে, পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষকাণ্ডে, এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দেওয়া হইল।

বিজ্ঞাপনের ফলে, মাঝে মাঝে লোকে হস্তী ভাড়া লইতে লাগিল বটে—কিন্তু তাহাতে মাসে ৮৲।১০৲ টাকার বেশী আয় হইল না।

মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্রটি পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার জন্য ডাক্তারখরচ, ঔষধ-পথ্যাদির খরচ, প্রতিদিন ৫৲।৭৲ টাকার কমে নির্ব্বাহ হয় না। মাস খানেক পরে বালকটি কথঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিল।

মেজবধূ, ছোটবধূ, উভয়েই অন্তঃসত্ত্বা। কয়েক মাস পরেই আর দুইটি জীবের অন্নসংস্থান করিতে হইবে।

এ দিকে জ্যেষ্ঠা পৌত্রী কল্যাণী দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে যেরূপ ডাগর হইয়া উঠিতেছে, শীঘ্রই তাহার বিবাহ না দিলে নয়। নানা স্থান হইতে তাহার সম্বন্ধ আসিতেছে বটে—কিন্তু ঘর-বর মনের মত হয় না। যদি ঘর-বর মনের মত হইল, তবে তাহাদের খাঁই শুনিয়া চক্ষুঃস্থির হইয়া যায়। কন্যার পিতা এ সম্বন্ধে একেবারে নির্লিপ্ত। সে নেশাভাঙ করিয়া, তাস পাশা খেলিয়া বেড়াইতেছে। যত দায়, এই ষাট বৎসরের বুড়ারই ঘাড়ে।

অবশেষে এক স্থানে বিবাহ স্থির হইল। পাত্রটি রাজসাহী কলেজে এল্. এ. পড়িতেছে—খাইবার পরিবার সংস্থানও আছে। তাহারা দুই হাজার টাকা চাহে—নিজেদের খরচ পাঁচ শত—আড়াই হাজার টাকা হইলেই বিবাহটি হয়।

কোম্পানীর কাগজের বাণ্ডিল দিন দিন যেরূপ ক্ষীণ হইতেছে—তাহা হইতে আবার আড়াই হাজার বাহির করা বড়ই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। আর, শুধু ত এই একটি নহে—আরও নাতিনীরা রহিয়াছে। তাহাদের বেলায় কি উপায় হইবে?

এই সকল ভাবনা চিন্তার মধ্যে পড়িয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর ক্রমে ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। একদিন সংবাদ আসিল, কনিষ্ঠ পুত্রটি বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছিল, সেও ফেল হইয়াছে।

বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন—"মুখুযো মশায়, হাতীটিকে বিক্রী করে ফেলুন—করে নাতিনীর বিবাহ দিন। কি করবেন, বলুন। অবস্থা বুঝে ত কাজ করতে হয়। আপনি জ্ঞানী লোক, মায়া পরিত্যাগ করুন।"

মুখোপাধ্যায় আর কোনও উত্তর দেন না। মাটীর পানে চাহিয়া ম্লানমুখে বসিয়া কেবল চিন্তা করেন, এবং মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

চৈত্র-সংক্রান্তিতে খামুনহাটে একটি বড় মেলা হয়। সেখানে বিস্তর গোরু বাছুর ঘোড়া হাতী উট বিক্রয়ার্থ আসে। বন্ধুগণ বলিলেন—"হাতীটিকে মেলায় পাঠিয়ে দিন—বিক্রী হয়ে যাবে এখন। দু হাজারে কিনেছিলেন, এখন হাতী বড় হয়েছে—তিন হাজার টাকা অনায়াসে পেতে পারবেন।"

কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"কি করে তোমরা এমন কথা বলছ?"

বন্ধুরা বুঝাইলেন—"আপনি বল্লেন, ও আমার মেয়ের মত। তা, মেয়েকেই কি চিরদিন ঘরে রাখা যায়? মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, মেয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে যায়, তার আর উপায় কি? তবে পোষা জানোয়ার, অনেক দিন ঘরে রয়েছে—মায়া হয়ে গেছে—একটু দেখে শুনে কোনও ভাল লোকের হাতে বিক্রী করলেই হল। যে বেশ আদর যত্নে রাখবে—কোনও কষ্ট দেবে না—এমন লোককে বিক্রী করবেন।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে বলিলেন—"তোমরা সবাই যখন বলছ—তখন তাই হোক। দাও, মেলায় পাঠিয়ে দাও। এক জন ভাল খদ্দের ঠিক কর—তাতে দামে যদি দু-পাঁচশো টাকা কমও হয়, সেও স্বীকার।"

মেলাটি চৈত্র-সংক্রান্তির প্রায় পনেরো দিন পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। তবে শেষের চারি পাঁচ দিনই বেশী জমজমাট। সংক্রান্তির এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যাত্রা স্থির হইয়াছে। মাহুত ত যাইবেই—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্রটিও সঙ্গে যাইবে।

যাত্রার দিন অতি প্রত্যুষে মুখোপাধ্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে হস্তী ভোজন করিতেছে। বাটীর মেয়েরা, বালকবালিকাগণ সজলনেত্রে বাগানে হস্তীর কাছে দাঁড়াইয়া। খড়ম পায়ে দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বদিন দুই টাকার রসগোল্লা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন, ভৃত্য সেই হাঁড়ি হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ডালপালা প্রভৃতি মামুলী খাদ্য শেষ হইলে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বহস্তে মুঠা মুঠা করিয়া সেই রসগোল্লা হস্তিনীকে খাওয়াইলেন। শেষে, তাহার গলার নিম্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—"আদর, যাও মা, বামুনহাটের মেলা দেখে এস"। —প্রাণ ধরিয়া বিদায়বাণী উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। উদ্বেল দুঃখে—এই ছলনাটুকুর আশ্রয় লইলেন।

হাতী চলিয়া গেল। মুখোপাধ্যায় শূন্যমনে বৈঠকখানার ফরাস বিছানার উপর গিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। অনেক বেলা হইলে, অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া বধূরা তাঁহাকে স্নান করাইলেন। স্নানান্তে আহারে বসিলেন বটে, কিন্তু পাতের অন্ন-ব্যঞ্জন অধিকাংশই অভুক্ত পড়িয়া রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কল্যাণীর বিবাহের সমস্ত কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুভকার্য্যের দিন স্থির হইয়াছে। বৈশাখ পড়িলেই উভয় পক্ষের আশীর্ব্বাদ হইবে। হস্তি-বিক্রয়ের টাকাটা আসিলেই গহনা গড়াইতে দেওয়া হয়।

কিন্তু ১লা বৈশাখ সন্ধ্যাবেলা মস্ মস্ করিয়া আদরিণী ঘরে ফিরিয়া আসিল বিক্রয় হয় নাই— উপযুক্ত মূল্য দিবার খরিদ্দার জোটে নাই।

আদরিণীকে ফিরিতে দেখিয়া বাড়ীতে আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। বিক্রয় হয় নাই বলিয়া কাহারও কোনও খেদের চিহ্ন সে সময় দেখা গেল না। যেন হারাধন ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে—সকলের আচরণে এইরূপ মনে হইতে লাগিল।

বাড়ীর লোকে বলিতে লাগিল—"আহা, আদর রোগা হয়ে গেছে। বোধ হয়, এ ক'দিন সেখানে ভাল করে' খেতে পায় নি। ওকে দিন কতক এখন বেশ করে খাওয়াতে হবে।"

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস অপনীত হইলে, পরদিন সকলের মনে হইল—কল্যাণীর বিবাহের এখন কি উপায় হইবে?

প্রতিবেশী বন্ধুগণ আবার বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন। অত বড় মেলায় এমন ভাল হাতীর খরিদ্দার কেন জুটিল না, তাহা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। এক জন বলিলেন—"ঐ যে যাবার সময় মুখুযো মশায় বল্লেন—'আদর, যাও মা, মেলা দেখে এস'—তাই বিক্রী হল না। উনি ত আর আজকালকার মুর্গীখোর ব্রাহ্মণ নন—ওঁর মুখ দিয়ে যে ব্রহ্মবাক্য বেরিয়েছে, সে কথা কি নিষ্ফল হবার যো আছে! কথায় বলে—ব্রহ্মবাক্য বেদ-বাক্য।"

বামুনহাটের মেলা ভাঙ্গিয়া, সেখান হইতে আরও দশ ক্রোশ উত্তরে রসুলগঞ্জে সপ্তাহব্যাপী আর এক মেলা হয়। যে সকল গো-মহিষাদি বামুনহাটে বিক্রয় হয় না—সে সব রসুলগঞ্জে গিয়া জমে। সেইখানেই আদরিণীকে পাঠাইবার পরামর্শ হইল।

আজ আবার আদরিণী মেলায় যাইবে। আজ আর বৃদ্ধ তাহার কাছে গিয়া বিদায়সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। রীতিমত আহারাদির পর আদরিণী বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী আসিয়া বলিল "দাদা মশায়, আদর যাবার সময় কাঁদছিল।"

মুখোপাধ্যায় শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—"কি বল্লি? কাঁদছিল?"

"হাঁ দাদা মশায়। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছিল।" বলিতে বলিতে কল্যাণীর চক্ষু দিয়াও ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ আবার ভূমিতে পড়িয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিলেন—"জানতে পেরেছে। ও যে অন্তর্যামী কি না। এ বাড়ীতে যে আর ফিরে আসবে না, তা জানতে পেরেছে।"

নাতিনী চলিয়া গেলে বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"যাবার সময় আমি যে তোর সঙ্গে দেখাও করলাম না—সে কি তোকে অনাদর করে? না মা, তা নয়। তুই ত অন্তর্যামী—তুই কি আমার মনের কথা বুঝতে পারিস্ নি?—খুকীর বিয়েটা হয়ে যাক। তার পর, তুই যার ঘরে যাবি, তাদের বাড়ী গিয়ে আমি তোকে দেখে আসব। তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে যাব—রসগোল্লা নিয়ে যাব। যতদিন বেঁচে থাকব, তোকে কি ভুলতে পারব?

মাঝে মাঝে গিয়ে তোকে দেখে আসব। তুই মনে কোনও অভিমান করিস্‌নে মা।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন বিকালে একটি চাষীলোক একখানি পত্র আনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে দিল।

পত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মধ্যমপুত্র লিখিয়াছে,—“বাটী হইতে সাত ক্রোশ দূরে আসিয়া কল্য বৈকালে আদরিণী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। সে আর পথ চলিতে পারে না। রাস্তার পার্শ্বে একটা আমবাগানে শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার পেটে বোধ হয় কোনও বেদনা হইয়াছে।—শুঁড়টি উঠাইয়া মাঝে মাঝে কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। মাহুত যথাবিধি সমস্ত রাত্রি তাহার চিকিৎসা করিয়াছে—বোধ হয় আদরিণী আর বাঁচিবে না। যদি মরিয়া যায়, তবে নিকটেই একটু জমী বন্দোবস্ত লইয়া তাহার শবদেহ প্রোথিত করিতে হইবে। সুতরাং কর্ত্তা মহাশয়ের অবিলম্বে আসা প্রয়োজন।”

বাড়ীর মধ্যে গিয়া, উঠানে পাগলের মত পায়চারি করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—“আমায় গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দাও। আমি এখনি বেরুব। আদরের অসুখ—যাতনায় সে ছটফট্‌ করছে। আমাকে না দেখতে পেলে সে সুস্থ হবে না। আমি আর দেরী করতে পারব না।”

তখনই ঘোড়ার গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে লোক ছুটিল। বধূরা অনেক কষ্টে বৃদ্ধকে একটু দুগ্ধমাত্র পান করাইতে সমর্থ হইলেন। রাত্রি দশটার সময় গাড়ী ছাড়িল। জ্যেষ্ঠ পুত্রও সঙ্গে গেলেন। পত্রবাহক সেই চাষীলোকটি কোচবাক্সে বসিল।

পরদিন প্রভাতে গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া, বৃদ্ধ দেখিলেন—সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আদরিণীর সেই নবজলধরবর্ণ বিশাল দেহখানি আম্রবনের ভিতর পতিত রহিয়াছে—তাহা আজ নিশ্চল—নিঃস্পন্দ।

বৃদ্ধ তখন হস্তিনীর শবদেহের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া, তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, “অভিমান করে’ চলে’ গেলি মা? তোকে বিক্রী করতে পাঠিয়েছিলাম বলে—তুই অভিমান করে চলে গেলি?”

* * * *

ইহার পর দুইটি মাস মাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত ছিলেন। স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে, আদরিণী যাঁর ঘরে গিয়াছিল, তিনিও তাঁহারই ঘরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুত সন্দেশ ও রসগোল্লা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই। আশা করি, সে রাজ্যে সন্দেশ ও রসগোল্লা অপেক্ষা লক্ষগুণে মিষ্টতর উৎকৃষ্টতর কোনও কিছুর অক্ষয় স্রোত প্রবাহিত আছে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন।

প্রশস্তি-পাঠ।*

[সম্মুখের পৃষ্ঠা।]

১। ওঁ স্বস্তি

বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান্ করুণৈ-[ক]-পাত্রং

ধর্ম্মোপ্য সৌ

২। বিজয়তে জগদেক-দীপঃ।

যৎ-সেবয়া সকল এব মহানুভাবঃ

সং-

৩। সার-পারমুপগচ্ছতি ভিক্ষু-সঙ্ঘঃ ॥ [১।]

চন্দ্রাণামিহ রোহিতা- [ ] গি(?)-ভুজামংশে

৪। বিশাল-শ্রিয়া

বিখ্যাতো ভুবি পূর্ণ চন্দ্র-সদৃশঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্রোহভবৎ।

আর্চ্চা

৫। নাম্পদ-পীঠিকাসু পঠিতঃ সত্তানিনামশ্রুত-

---

* দ্বিতীয় অনবধানতায় যে সকল অক্ষর তাম্রপটে ক্ষোদিত হয় নাই, এবং উৎকীর্ণ হইলেও যে সকল অক্ষর কাল-প্রভাবে বা অন্য কারণে বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে, তাহা [ ] প্রকার বন্ধনী-মধ্যে প্রদর্শিত হইল; বর্ণাশুদ্ধি ও অতিরিক্ত অক্ষর ( ) এইরূপ বন্ধনীমধ্যে সংশোধিত হইয়াছে।

১। বসন্ত-তিলক। এই শ্লোকের প্রথম চরণে 'এক-পাত্রং' পদের 'ক' অক্ষরটি উৎকীর্ণ হয় নাই।

টঙ্কোৎকীর্ণ-নবপ্রশস্তিষু জয়-স্তম্ভেষু তাম্রেষু চ ॥ [২॥]

৬। বুদ্ধস্য যঃ শ-

শক-জাতক-মঙ্কসংস্থ

ভক্ত্যা বিভর্ত্তি ভগবানমৃতাকরাঙ্ শুঃ।

চন্দ্রস্য তস্য কুল-জাত ইতীব বৌদ্ধ [:]

পুত্রঃ

৭। শ্রুতো জগতি তস্য সুবর্ণচন্দ্রঃ ॥ [৩॥]

[দর্শে] সা মাতা কিল দোহদেন

দিদৃক্ষমাণোদয়িচন্দ্র-বিম্বং।

৮। সুবর্ণ-চন্দ্রেণ হি তোষিতেতি

সুবর্ণচন্দ্রং সমুদাহরন্তি ॥ [৪॥]

পুত্রস্তস্য পবিত্রিতোভয়-কুলঃ কৌলীন-

৯। ভীতাশয়-

ত্রৈলোক্যে বিদিতো দিশামতিশিখি ত্রৈলোক্যচন্দ্রো গুণৈঃ

আধারো হরিকেল-রা-

১০। জ-ককুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াং

যশ্চন্দ্রোপপদে বভূব নৃপতি দ্বীপে দিলীপোপমঃ ॥ [৫ ॥]

জ্যোৎস্নেব চন্দ্রস্য

১১। শচীব জিষ্ণোঃ

---

২ শার্দ্দূলবিক্রীড়িত। এই শ্লোকে প্রথম পাদে 'রোহিতা'-অক্ষর-ত্রয়ের পর একটি অক্ষর উৎকীর্ণ হয় নাই, এবং তাহার পরবর্ত্তী যে অক্ষরটি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা 'বি' বলিয়াই প্রতিভাত হয় এই পাঁচটি অক্ষর 'কূলাঃ' অক্ষর-দ্বয়ের সঙ্গে সমাসাবদ্ধ থাকিয়া 'চন্দ্রাণা' পদের বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। "রোহিতাবনিকূলাঃ" অথবা ঐরূপ কোনও জনপদ-জ্ঞাপক কথা উৎকীর্ণ করিতে পরিত্যক্ত হইয়াছে কি না, সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

৩ বসন্ত-তিলক। এই শ্লোকে তৃতীয় পাদে 'বৌদ্ধ' শব্দের পর বিসর্গ-চিহ্নের অভাব দৃষ্ট হয়। তদভাবেও অর্থ-সংগতি রক্ষিত হইতে পারে।

৪। উপজাতি। এই শ্লোকের 'দর্শে' অক্ষরদ্বয় একটু অস্পষ্ট।

৫ শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

গে(গী)রী হরস্যেব হরেরিব শ্রীঃ ।
তস্য প্রিয়া কাঞ্চন-কান্তি রাসী
চ্ছা (শ্রী) কাঞ্চনেত্যঙ্কিত-

১২ । শাসনস্য ॥ [৬ ॥

স রাজ-যোগেন শুভে মুহূর্ত্তে
মৌহূর্ত্তিকৈঃ সূচিত রাজ-চিহ্ন' ।
অবাপ তস্যাং তনয়

১৩ । নরস্তঃ

শ্রীচন্দ্রমিন্দ (ন্দু) পমমিত্র-তেজাঃ [৭ ॥
একাতপত্রাভরণাং ভুবং যো
বিধায় বৈধের-জনাবিধে

১৪ । যঃ

চকার কারাসু নিবেশিতারি
গণঃ-সুগন্ধীনি দিশাং মুখানি ॥ [৮ ॥
স খলু শ্রীবিক্রমপু

১৫ । র-সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ পরম-সৌগতো
মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎত্রৈলোক্যচন্দ্রদে

১৬ । ব-পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরম-ভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ
শ্রীমান শ্রীচন্দ্রদেবঃ কুশ

১৭ । লী ॥ শ্রীপৌণ্ড্র-ভুক্ত্যন্তঃপাতি-নান্যমণ্ডলে ।
নেহকাষ্ঠি-গ্রামে পাটক-ভূমৌ সমুপগতাশে

১৮ । ষ-রাজপুরুষ-রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য
-মহাব্যূহপতি-মণ্ডলপতি-মহাসান্ধি

১৯ । বিগ্রহিক । মহাসেনাপতি । মহাক্ষপটলিক ।

৬। উপজাতি ; এই শ্লোকের চতুর্থ চরণে 'শ্রী' এবং ছন্দের উপযোগী অক্ষরের অভাবে দোষ ঘটিয়াছে। একটিকে অতিরিক্ত ধরিতে হইবে

৭-৮। উপজাতি

শ্রীচন্দ্রদেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন

[সম্মুখের পৃষ্ঠা]

Mohila Press, Calcutta.
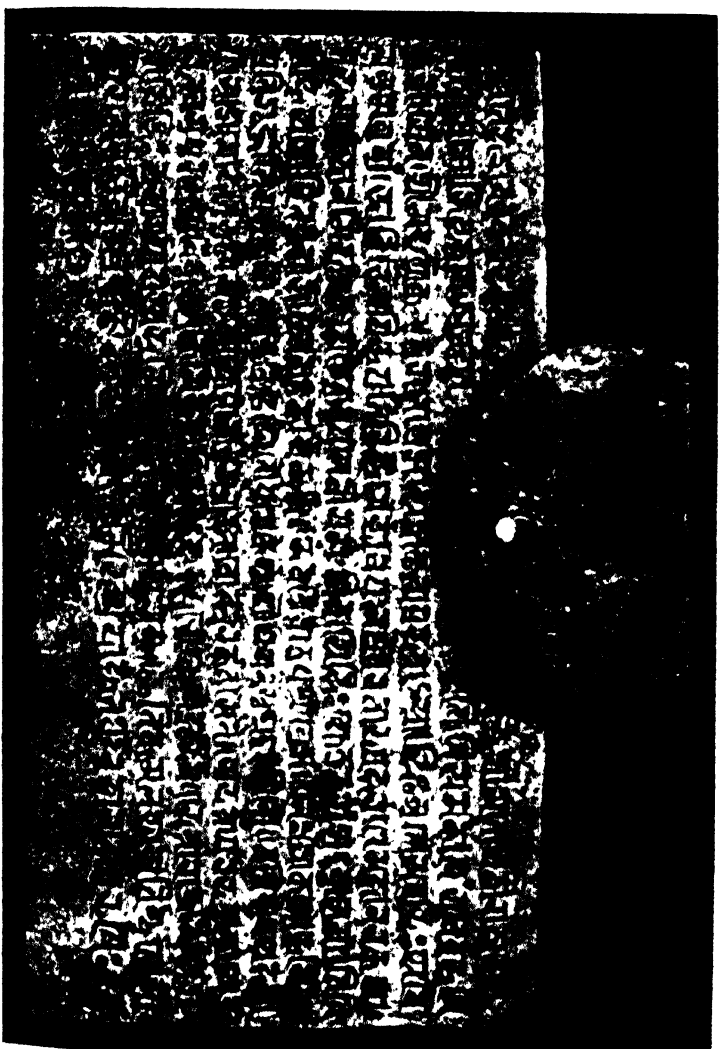
মহাসর্ব্বাধিকৃত। মহাপ্রতীহার। কোট্টপাল। দৌঃ-

২০। সাধ-সাধনিক। চৌরোদ্ধরণিক। নৌবল হস্ত্যশ্ব-গো-

মহিষাজাবিকাদি-ব্যাপৃতক। গৌল্মিক শৌ-

২১। ল্কিক-দাণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষয়পত্যাদি (ত্যাদী)

নন্যাংশ্চ সকল-রাজ-পাদো[প]জীবিনোঽধ্যক্ষ-প্র-[1]

২২। চারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান। চাট-ভ [ট] জাতীয়ান্[2]

ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণোত্তরান যথার্হং মান-

২৩। য়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ। মতমস্তু ভবতাং।

যথোপরি-লিখিতা ভূমিরিয়ং। স্ব-সীমাবচ্ছী (চ্ছি)-

২৪। ন্না। তৃণ-পূতি-গোচর-পর্য্যন্তা। সতলা।

সোদ্দেশা। সাম্র-পনসা। সগুবাক-নালিকেরা সলবণা স-

২৫। জল-স্থলা। সগর্ত্তোষরা সদশাপরাধা। সচৌরোদ্ধরণা

পরিহৃত-সর্ব্বপীড়া অচাট-ভট-প্র-

২৬। বেশা অকিঞ্চিৎপ্রগাহ্যা। সমস্ত-রাজভোগ-

কর-হিরণ্য-প্রত্যায়-সহিতা। শথলা (শাণ্ডিলা) স্য (স)-গো-[3]

২৭। ত্রায় ত্র্যার্ষি-প্রবরায়। মকরন্দগুপ্তস্য প্রপৌত্রায়

বরাহগুপ্ত-পৌত্রায়

সুমঙ্গলগুপ্তস্য পুত্রা-

২৮। য়। শান্তি-বারিক-শ্রীপীতবাসগুপ্তশর্ম্মণে।

বিধিবদুদক-পূর্ব্বকং কৃত্বা

কোটিগোমি (?) দশ (শ)[4]

১। এই স্থলের 'প' অক্ষরটি তাম্র-পট্টে কোদিত দেখা যায় না।

২। এই স্থলের 'ট' অক্ষরটির উৎকীর্ণ নাই।

৩। 'শথলা' কোনও ঋষির নাম বলিয়া বোধ হয় না; এই নিমিত্ত 'শাণ্ডিলা' পাঠ শুদ্ধ হইবে বলিয়া গৃহীত হইল।

৪। এই স্থলে অর্থ-সঙ্গতির জন্য "কোটি-হোমিকতবতে" পাঠ যুক্ত হইল। তাম্রপট্টে

। পশ্চাতের পৃষ্ঠা। ।

২৯। তবত্তে ভগবন্তং বুদ্ধভট্টা [র] কমুদ্দিশ্য[5]
মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ

৩০। পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে[6] আচন্দ্রার্ক ং। ক্ষিতিসমকালং
যাবৎ ভূমি [চ্ছি]

৩১। দ্র-ন্যায়েন। শ্রীমদ্ধর্ম[7] [চ] ক্র-মুদ্রয়া
তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাংস্মাভিঃ অতো ভবদ্ভিঃ সর্বৈ

৩২। রস্মদস্তুনা। ভাবিভিরপি ভূপতিভির্ভূমের্দ্দান-ফল-
গৌরবাদপহরণে মহা-নরক-পা-

৩৩। ত-ভয়াচ্চ দানমিদমনুমোদ্যানুপালনীয়ম[8] প্র
তিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরৈঃ (রৈ) শ্চাজ্ঞা শ্রবণ-বিধে

৩৪। য়ী-ভূয়[9] সমুচিত-প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি ॥
ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ ॥
ভূমিং যঃ

৩৫। প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি [।।]
উভৌ তৌ পুণ্য-কর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গ-গামিনৌ ।
ষষ্টিম্বর্ষ সহস্র

[illegible]

৫ এই স্থানের 'র' অক্ষর [illegible]
৬ এই অক্ষরটি [illegible]
৭ এই স্থানের 'চি' অক্ষরটি [illegible] নাই
৮ [illegible] 'চ' [illegible]
৯ এই স্থানের 'প্র' অক্ষরটি [illegible]
১০ এই স্থানের 'র' টি [illegible] নাই

৩৬ ।　　ণি স্বগর্গে মোদতি ভূমিদঃ ।

[১১]

আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকং (কে) বসেৎ ॥

স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হ-

৩৭ ।　　রেত বসুন্ধরাম ।

[১২]

স বিষ্ঠায়াং ক্রিমিভূর্ত্বা পিতৃভিঃ [সহ পচ্যতে] ॥

[১৩]

বহুভি র্ব [সু] ধা দত্তা রাজভিঃ সগ-

৩৮ ।　　রাদিভিঃ ।

যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম ।

[১৪]

ইতি কমলদা (দ) [লা] স্ব-বিন্দুলোলাং

৩৯ ।　　শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ ।

সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা

ন হি পুরুষৈঃ পর-

[১৫]

৪০ ।　　কীর্ত্তয়ো বি [লো] প্যাঃ ॥

১১　'নরকে' হওয়া উচিত ছিল

১২　এই শব্দ-দ্বয় অস্পষ্ট

১৩　'সগর' শব্দের 'গ' ক্ষোদিত নাই

১৪　'ললাটু'র 'লা' অক্ষর উৎকীর্ণ দেখা যায় না

১৫　'বিলোপন' শব্দের 'লো' ক্ষোদিত হয় নাই

১৬　এই স্থলে • এই চিহ্নটি টীকাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে

মাতা [গর্ভাবস্থায়] (৭) স্পৃহা-বশতঃ উদয়ি-চন্দ্র বিম্ব-দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে, [স্বামী কর্ত্তৃক] সুবর্ণ-নির্ম্মিত চন্দ্র দ্বারা পরিতোষিতা হইয়াছিলেন,—এই নিমিত্ত লোকে [তাঁহার পুত্রকে] সুবর্ণ-চন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিত।

(৫)

[মাতৃ-পিতৃ] উভয়-কুল-পাবন, [সুবর্ণ-চন্দ্রের] পুত্রের অপবাদ-ভীরু (৮) গুণাবলী চতুর্দ্দিকে অতিথিরূপে ভ্রমণ করিত বলিয়া, সেই পুত্র ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র-নামে বিদিত হইয়াছিলেন। হরিকেল-রাজ্যের (৯) রাজচিহ্নসূচক ছত্র যে রাজ্য-লক্ষ্মীর হাস্যরূপে উদ্ভাসিত হইত, সেই রাজলক্ষ্মীর আধার, দিলীপোপম এই পুত্র চন্দ্রদ্বীপে (১০) 'নৃপতি' হইয়াছিলেন।

(৬)

চন্দ্রের কান্তা জ্যোৎস্না, (১১) ইন্দ্রের কান্তা শচী, হরের কান্তা গৌরী, এবং

(৭) দোহদ—"অথ দোহদং ইচ্ছাকাঙ্ক্ষা-স্পৃহেহা-তৃড্‌বাঞ্ছা-লিপ্সা-মনোরথাঃ, কামোঽভিলাষস্তর্ষশ্চ"—ইত্যমরঃ। গর্ভাবস্থার অভিলাষেই 'দোহদ' শব্দের প্রয়োগ, যথা, "প্রজাবতী দোহদ-শংসিনী তে"—রঘু, ১৪।৪৫ কিম্বা—"সঃ কদাচিদ্‌ গর্ভদোহদবশতঃ সোঽবজ্ঞমচিরাৎ সম্পাদয়িতব্য ইতি"—হর্ষ-চরিতে ১ম অঙ্ক।

(৮) "স্যাৎ কৌলীনং লোকবাদে" ইত্যমরঃ। যথা, [রঘু, ১৪।৮৪] "কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ"। ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ—[রঘু, ১৪।৩৬] "কৌলীনমাত্মাশ্রয়মাচচক্ষে তেভ্যঃ পুনশ্চেদমুবাচ বাক্যম্‌।"

(৯) হরিকেল—বঙ্গের প্রাচীন নাম। "বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়া অঙ্গাশ্চম্পোপলক্ষিতাঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র পরে বঙ্গরাজ হইয়াছিলেন বলিয়াই রাজকবি তাঁহার পিতাকে "হরিকেলরাজ-ককুদচ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াং আধারঃ" রূপে বর্ণনা করিয়া থাকিতে পারেন।

(১০) চন্দ্রদ্বীপ—মধ্য-যুগে এই প্রদেশ বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ, খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশ-বিশেষ লইয়াই সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোগল-সাম্রাজ্যে এই চন্দ্রদ্বীপই "বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ" পরগণা নামে অভিহিত হইত। বিশ্বকোষে [সপ্তম ভাগ, ১২৫ পৃঃ] ব্রজসুন্দর মিত্র প্রণীত "চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ" নামক গ্রন্থের প্রমাণে লিখিত হইয়াছে,—"বিক্রমপুর হইতে সমাগত দনুজমর্দ্দনদেবই চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা।" বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

(১১) জিষ্ণু—এই স্থলে ইন্দ্র-সমানার্থক। যথা, "জিষ্ণুর্লেখর্ষভঃ শক্রঃ শতমন্যুর্দিবস্পতিঃ" ইতি ইন্দ্র-পর্য্যায়ে অমরঃ। পুরুষোত্তম, সূর্য্য ও অর্জ্জুন অর্থেও 'জিষ্ণু' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

হরির কান্তা শ্রীর ন্যায়, পূজিত-শাসন এই নৃপতিরও শ্রীকাঞ্চনা-নাম্নী কাঞ্চন-কান্তি কান্তা ছিলেন।

(৭)

ইন্দ্রতেজাঃ নীতিজ্ঞ এই নৃপতি [ত্রৈলোক্যচন্দ্র] (১২) রাজযোগোপলক্ষিত শুভ-মুহূর্ত্তে প্রিয়ার [শ্রীকাঞ্চনার] গর্ভে (১৩) জ্যোতির্বিদ-সূচিত-রাজচিহ্নধারী ইন্দুপম তনয় শ্রীচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৮)

মূর্খ-জনের অবাধ্য (১৪) এই [শ্রীচন্দ্র] রাজাকে একাতপত্র-সুশোভিত করিয়া এবং (১৫) অরিগণকে কারা-নিবদ্ধ করিয়া দিঙ্মণ্ডল যশঃ-সৌরভে আমোদিত করিয়াছিলেন।

শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত (সংস্থাপিত) জয়স্কন্ধাবার হইতে, মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেব পাদানুধ্যাত, পরমসৌগত (বৌদ্ধ), পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ, কুশলময়, সেই শ্রীমান শ্রীচন্দ্রদেব,—শ্রীপৌণ্ড্রভুক্ত্যন্তঃপাতী নান্দ-মণ্ডলে, নেহকাষ্টিগ্রামে পাটক-পরিমিত ভূমিতে,—সমুপগত (সংবিদিত) সমস্ত (১৬) রাজপুরুষদিগকে, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য,

(১২) রাজযোগ—গ্রহ-নক্ষত্রাদির যে অবস্থান-সময়ে জন্ম গ্রহণ করিলে ভূমিষ্ঠ শিশু কালে 'রাজা' হইবে বলিয়া পরিচিত হয়, সেই সময়কে রাজযোগ বলে। শ্রীচন্দ্র যখন 'রাজা' হইবেন, তাহাই এই শ্লোকে ইঙ্গিত হইয়াছে। [illegible] অভিধানে এই শব্দটি এই ভাবে ব্যাখ্যাত,— 'a configuration of planets, asterisms etc. at the birth of a man which indicates that he is destined to be a king.'

(১৩) জ্যোতির্বিদ—শব্দকল্পদ্রুমে জ্যোতির্বিদকে দৈবজ্ঞ-গণকাদি [illegible]

[illegible]

(১৪) অবাধ্য—[illegible] শ্রীচন্দ্র সর্ব্বদা পণ্ডিত-মণ্ডল-পরিবেষ্টিত থাকিতেন, এবং [illegible] ছিলেন।

(১৫) এস্থলে কোন অরির পরিচয় হইতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। [illegible] -রাজাই শ্রীচন্দ্র-কর্ত্তৃক কারা-নিবদ্ধ হইয়া থাকিবেন, এবং বোধ হয় শ্রীচন্দ্র এই ঘটনার পরেই বঙ্গের রাজ-সিংহাসন [illegible] করিয়া বিক্রমপুর-রাজধানী হইতে রাজ-শাসন পরিচালন আরম্ভ করিয়া থাকিবেন।

(১৬) নিম্নলিখিত পদ কয়টি অন্যান্য তাম্রশাসনোক্ত রাজপাদোপজীবি-বিজ্ঞাপক পদগুলি ও প্রদত্ত ভূমির বিশেষণসমূহ "বল্লালসেনদেবের [illegible] তাম্রশাসন" ও "ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব-লিপি" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ের টিকাতে দ্রষ্টব্য। [সাহিত্য, ১৩১৮ সনের অগ্রহায়ণ, ও ১৩১৯ সনের ভাদ্র সংখ্যা]।

(১৭) মহাব্যূহপতি, (১৮) মণ্ডলপতি, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহাক্ষপটলিক (লেখ্য-রক্ষক), (১৯) মহা-সর্ব্বাধিকৃত, মহাপ্রতীহার (দৌবারিকশ্রেষ্ঠ), (২০) কোট্ট-পাল (দুর্গ-রক্ষক), দৌঃসাধ-সাধনিক (দ্বারপাল বা গ্রামপরিদর্শক), চৌরোদ্ধরণিক (দস্যু-তস্করাদির হস্ত হইতে উদ্ধারক পুলিস কর্ম্মচারিবিশেষ), নৌবল-ব্যাপৃতক (নৌ-সেনাধিকৃত পুরুষ) হস্তিব্যাপৃতক (গজাধ্যক্ষ), অশ্ব-ব্যাপৃতক (অশ্বাধ্যক্ষ), গো-ব্যাপৃতক (গবাধ্যক্ষ), মহিষ-ব্যাপৃতক (মহিষাধ্যক্ষ), অজ-ব্যাপৃত (ছাগাধ্যক্ষ), অবিকাদি-ব্যাপৃতক (মেষ প্রভৃতির অধ্যক্ষ), গৌল্মিক ('গুল্ম'-নামক সেনাসমষ্টির অধিনায়ক), (২১) শৌল্কিক (শুল্ক-সংগ্রহকারী), দাণ্ডপাশিক (বধাধিকৃত পুরুষ), দণ্ড-নায়ক (চতুরঙ্গ-বলাধ্যক্ষ) বিষয়পতি (জেলাধিপতি) প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীদিগকে এবং অধ্যক্ষ-প্রচারোক্ত (অধ্যক্ষ-ভুক্তিকাভুক্ত) কিন্তু বর্ত্তমান-শাসনে পৃথক্ ভাবে অনুল্লিখিত অন্যান্য সমস্ত রাজপাদোপজীবীদিগকে, চাট-ভট-জাতীয়-গণকে, ক্ষেত্রকরদিগকে, এবং ব্রাহ্মণোত্তমদিগকে, যথাযোগ্য সম্মানপ্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন, এবং আজ্ঞা করিতেছেন, — নিম্নোল্লিখিত বিষয়ে আপনাদের সকলের অভিমত হউক। যথা, স্বসীমাবচ্ছিন্ন, তৃণপূতিগোচরপর্য্যন্ত, সতল, সোদ্দেশ, আম্র-পনস-গুবাক-নারিকেল-বৃক্ষ-সমেত, (২২) লবণোৎপাদক ভূমি সহ, জল-স্থল-গর্ত্ত-ঊষর-ভূমির সহিত, যাহার (অর্থাৎ যে ভূমি সম্বন্ধে প্রতিগ্রহীতার) দশটি অপরাধ (রাজার) সহ্য হইবে, সচৌরোদ্ধরণ, সর্ব্বপ্রকার উৎপীড়ন-রহিত, চাট-ভট জাতির প্রবেশাধিকার-বিরহিত, যাহা হইতে কোনও প্রকার করাদি

(১৭) 'মহাব্যূহপতি'—শব্দটি বেলাব-লিপিতে ও হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনেও পাওয়া গিয়াছে।

(১৮) 'মণ্ডলপতি' শব্দটি বাংলা-প্রত্ন-তত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের "মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (সাহিত্য, ১৩২০ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

(১৯) 'মহাসর্ব্বাধিকৃত'—শব্দটিও হরিবর্ম্মার ও ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধির সৃষ্টি, বোধ হয়, এই শব্দ হইতেই সাধিত হইয়া থাকিবে।

(২০) 'কোট্টপাল' শব্দটি পাল-নৃপতিগণের তাম্র-শাসনে বহুবার পাওয়া গিয়াছে।

(২১) 'শৌল্কিক' শব্দটি আধুনিক 'Custom officer'এর পদ-বিজ্ঞাপক বলিয়া প্রতিভাত হয়।

(২২) 'সলবণ'—ভূমির এই বিশেষণটি বেলাব-লিপিতেও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উভয় ভূমিই সমুদ্র-তীরবর্ত্তী ছিল, ইহাই কি এই বিশেষণের সার্থকতা?

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতি।

প্রীতি, বিশ্বাস, আশা।

যখন কোনও উৎকৃষ্ট চিন্তা মনে আইসে, কোনও সুন্দর ভাব হৃদয়ে উদিত হয়, তখন আনন্দ হয়। নিজে যে আনন্দ ভোগ করিয়াছে, তাহা অন্যকে দিবার ইচ্ছা হয়। মনুষ্যের এমনই একটা প্রবৃত্তি আছে যে, সে নিজে যে ঐশ্বর্য্য পায়, তাহা সে একক ভোগ করিতে পারে না; তাহা বিতরণ করিতে না পারিলে ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ সফলতা হয় না। মনুষ্য অন্যকে সুখী না করিয়া নিজে সুখী হইতে পারে না। নিজের উত্তম চিন্তা ও উদার ভাব দ্বারা সমাজকে সুখী করিবার চেষ্টা হইতে সাহিত্যের উদ্ভব হয়। সুতরাং সাহিত্যের মূল সমাজ-প্রীতি। যেমন পুণ্যসলিলা ভাগীরথী গিরিশৃঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া, দুই পার্শ্বে বসুন্ধরাকে শস্যশালিনী প্রাণনন্দিনী করিয়া সাগরসঙ্গমে উপনীত হয়, তেমনই সাহিত্যধারা উন্নত হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া, সমাজকে সুচিন্তা ও সুভাব দ্বারা উন্নত, পবিত্র ও আনন্দময় করিয়া, অমরত্বের দিকে প্রধাবিত হয়। সাহিত্য জাতীয়-জীবনের জননী। দেশে যে সকল উচ্চ প্রবৃত্তির লোক জন্ম-গ্রহণ করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের উচ্চচিন্তা ও মহদ্ভাব সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত করেন; সাধারণ লোক, সেই উচ্চচিন্তায়, সেই উচ্চ ভাবে উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া, মহত্তর জীবন লাভ করে। তখন চিন্তাশক্তি ও ভাবশক্তি কার্য্যশক্তিতে পরিণত হয়। তখন গ্রন্থকারের নির্জ্জন কক্ষে লিখিত নীরব ভাষা সমাজে ধ্বনিত হয়, তখন তাহা দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় গুরুতর ঘটনার বড় বড় অক্ষরে অঙ্কিত ও লক্ষিত হয়। তখন প্রতিভা চপলা জাতীয়-জীবন-গগনে চমকিতে থাকে, বজ্রনাদে বসুমতী কাঁপিতে থাকে; তখন সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়। সাহিত্য জাতীয়-হৃদয় উর্ব্বর করে, সুচিন্তার বীজ বপন করে, জাতীয় চরিত্রের গঠন করে; মহৎ ও মঙ্গলজনক বিষয়ের দিকে সমাজে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেওয়া সাহিত্যের অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য।

সাহিত্য যেমন জাতীয় ঘটনা পরিচালিত করে, তেমনই আবার জাতীয় ঘট-নার দ্বারা, সমাজের অবস্থা দ্বারা, সাহিত্য নিজে পরিচালিত হয়। সাহিত্য ও সমাজ, এই উভয়ের মধ্যে নিয়ত ঘাত ও প্রতিঘাত চলিতেছে। যে জাতির

ন্যায়কে রক্ষা করিবার জন্য, অত্যাচারীকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য, রক্তচক্ষু ন্যায়পরায়ণ সাহিত্য দণ্ড হস্তে উত্থিত হইয়াছিল। লর্ড ব্রুম ইংলণ্ডের রাজ্ঞী ক্যারোলাইনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, ইংলণ্ডেশ্বরের প্রকোপে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, যে সুললিত বাক্যপরম্পরায় ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্য। লর্ড আর্স্কাইন একটা পরিনিন্দার অপরাধের মোকদ্দমায় আমেরিকার এক আদিমনিবাসী অসভ্য জাতির স্বাধীনতা-প্রিয়তা সম্বন্ধে এমন একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, লর্ড ব্রুম লিখিয়াছেন যে, তাহা কেবল সাহিত্য নহে, সেই গদ্যের মধুর শব্দ-বিন্যাসে এমন লয় আছে যে, তাহা ভাগ করিয়া পড়িলে অমিত্রাক্ষর কবিতা হইয়া যায়। সুতরাং তাহা উচ্চদরের সাহিত্য। কলিকাতার হাইকোর্টে আমীর খাঁর পক্ষে ব্যারিষ্টার এংগাস যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে সুন্দর ভাব ও ললিত ভাষার এমন সমন্বয় হইয়াছিল যে, তাহাও সাহিত্যের অন্তর্গত।

জগতে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে প্রজাগণের দুরবস্থা সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়। প্রজাদিগের উপর এ দেশে এক সময় নীলকরগণ যে অত্যাচার করিত, সেই অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য, স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় কি চমৎকার সাহিত্যের রচনা করিয়াছিলেন। সে অত্যাচার চলিয়া গিয়াছে, তথাপি "নীলদর্পণে"র মনোহারিত্ব কমিয়া যায় নাই। তাহা স্থায়ী সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

"বঙ্গদেশের কৃষক" সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু যে প্রবন্ধাবলী লিখিয়াছেন, তাহা সাহিত্য। স্বদেশপ্রীতি ও মানবপ্রীতি হইতে তাহার উদ্ভব হইয়াছে। তাহার মূলে ধর্ম্মজ্ঞান বিদ্যমান। তাহা পাঠে রসের সঞ্চার হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায়, মনুষ্যমধ্যে নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন, এবং আপনাদিগের দুঃখ সমাজমধ্যে জানাইতে জানে না। যদি মূকের দুঃখ দেখিয়া তাহার নিবারণের চেষ্টায় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে। • • • যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্ত্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফল হউক।" এইটুকু লেখার মধ্যে বঙ্কিম বাবু বঙ্গীয় কৃষকদিগের জন্য যে এক বিন্দু অশ্রুপাত করিয়াছেন, তাহাতে "সাহিত্য-পরিষদে"র ও "সাহিত্য-সম্মিলনে"র প্রবন্ধরাশি ভাসিয়া যায়; এবং সাহিত্য যে কি, বঙ্গীয় লেখকদিগের যে কি কর্ত্তব্য, তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। ফলতঃ সমাজের সুখ দুঃখ লইয়া এক্ষণে আমাদের সাহিত্য

গঠিত হইবে। প্রকৃত সাহিত্য প্রীতিমূলক দৃঢ় বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, তাহা সঞ্জীবনী আশার সঞ্চার করে। বঙ্গদেশ এখন সেই সাহিত্য চাহে।

ক্রমশঃ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

বংশানুক্রম।

শেষ।

বংশানুক্রম ও সমাজ

বংশানুক্রম যে সকল নিয়মানুসারে পরিচালিত হয়, তন্মধ্যে গুরুতর নিয়ম কয়েকটি সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে, কতিপয় সামাজিক অনুষ্ঠানের উপর ঐ সকল নিয়মের প্রভাব কিরূপ, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব।

কিন্তু প্রথমেই একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বংশানুক্রম শাস্ত্র জীবতত্ত্বের অন্তর্গত, জীবতত্ত্বের, সুতরাং বংশানুক্রমের কোনও নিয়ম জীবের হিসাবে নির্দোষ হইলেই যে সমাজের হিসাবেও নির্দোষ হইবে, তাহা নহে। অপরিণীতার সন্তান জীবের হিসাবে নির্দোষ হইতে পারে; কিন্তু সমাজের হিসাবে সদোষ, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। শ্যালীকে বিবাহ করিলে জীবতত্ত্বে কোনও দোষ দেখিবার বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু সমাজ কখনও তাহাকে অপকারী বিবেচনায় দোষাবহ গণ্য করে, কখনও বা করে না। যাহা হউক, কোনও বিধান জীবতত্ত্বানুসারে নির্দোষ গণ্য হইলেও, সমাজতত্ত্বানুসারে সদোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, ইহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

আমরা এ স্থলে কতিপয় আচার অথবা অনুষ্ঠানের আলোচনা করিব। এ আলোচনায় জীবতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব, উভয়ের তুলনা আবশ্যক। কারণ, সমাজতত্ত্বও এক অংশে জীবতত্ত্বের অধীন।

বিবাহ।

বংশানুক্রমের সহিত সহিত বিবাহ-সংস্কার এক সূত্রে আবদ্ধ, কারণ, বিবাহই সমাজমধ্যে বংশানুক্রমের প্রবর্তক কারণ। যদিও বিবাহ ব্যতীত পরবংশ গঠিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সভ্য-সমাজে নানাবিধ অমঙ্গলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ব্যভিচার ও বলাৎকার, অসংযম ও নৈতিক অবনতির

নিত্য সহচর। উহার ফলে ব্যক্তির দেহের ও মনের অবনতি ঘটে, সমাজও অধঃপতিত হয়। যাহা হউক, বিবাহই যখন বংশানুক্রম-প্রবর্ত্তনের বৈধ কারণ, তখন পরবংশ উন্নত ও যোগ্য দেখিতে ইচ্ছা করিলে বিবেচনামত যোগ্য নরনারীদিগকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা আবশ্যক। (১) যাহারা সুস্থ, গুণবান ও কৃতী, তাঁহারা পরবংশ গঠন করিলে সমাজ যোগ্যতায় উন্নীত হয়, কিন্তু যাহারা অসুস্থ, সমাজদ্রোহী ও অকৃতী, তাহারা পরবংশ গঠন করিলে সমাজ অযোগ্যতাবশতঃ অধঃপতিত হইয়া যায়। সুতরাং যোগ্য ব্যক্তিগণই পরবংশ গঠন করিবেন। কিন্তু অযোগ্যগণও ত সন্তান উৎপাদন করে; তাহা নিবারণ করা অসম্ভব। এরূপ স্থলে দেখিতে হয় যে, অযোগ্যগণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি না পায়। যোগ্য বংশে যে অনুপাতে অপত্য জাত হয়, তাহার অনেক অল্প অনুপাতে অযোগ্য বংশের বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। শুধু বংশ-বৃদ্ধি নহে, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক যে কোনও কারণে অযোগ্যগণ অতিরিক্ত অনুপাতে বংশবৃদ্ধি করিয়া ধনে ও গৌরবে সমাজমধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, সেই কারণেই সমাজের অমঙ্গলজনক অযোগ্যগণের অন্নসংস্থান ও গৌরব রাজা অথবা সমাজের অগ্রণী ব্যক্তিগণ অনেক সময় নানা কারণে বৃদ্ধি করিয়া দেন। ইহাতে তাহাদিগের বংশধরগণের দারপরিগ্রহ কার্য্যে অনেক সুবিধা ঘটে, সুতরাং অযোগ্য অপত্যের সংখ্যা সমাজে বাড়িয়া যায়; তাহার ফলে সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (২) এ দেশে বর্ত্তমান সময়ে বিবাহকার্য্য যেরূপ ভাবে সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ হইতেছে, ইহাতে যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা করিবার অবকাশ নাই। সুতরাং নিশ্চয়ই বহু অযোগ্য কর্তৃক পরবংশ অতিমাত্রায় গঠিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে জাতীয় অধঃপতন অনিবার্য্য। যাহারা দেহে ও মনে অসুস্থ, এবং অকৃতী, তাহাদিগের

(১) The offspring of worthy parents are, on the whole, more highly gifted by nature with faculties that conduce to worthiness than the offspring of less worthy persons. Galton's Essays in Eugenics P. 106.

(২) If any social opinions or class prejudices tamper with the fertility of the better stock, then the national character will take but a few generations to be seriously modified.—Pearson's National Life p 45.

আধিক্য অপেক্ষা সমাজধ্বংসকর ব্যাপার আর কিছুই নাই। (৩) সুতরাং সমাজ-স্থিতির ও সামাজিক উন্নতির প্রথম কথাই,—যোগ্যে যোগ্যে বিবাহ।

এ স্থলে বিবাহ-ক্ষেত্রের কথাও বিবেচনা করিতে হয়। বিবাহ-ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ না থাকিলে যোগ্য অযোগ্য বাছিয়া লইবার সুবিধাই থাকে না; এবং দীর্ঘ-কাল ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকিলে অপত্যে একটা জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং যে সমাজে বিবাহ-ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, তাহাদিগের মধ্যে স্বীয় গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করাও আবশ্যক হইতে পারে; এবং স্ব-সমাজে পাওয়া অসম্ভব হইলে, অন্য সমাজ হইতেও বর-কন্যা গ্রহণ করা আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু ঐ অন্য সমাজ নিতান্ত বি-সম না হয়। কারণ, নিতান্ত বি-সম ধাতু নরনারীদিগের অপত্য (ফিরিঙ্গীদিগের ন্যায়) আরও অধঃপতিত হয়। শুক্রশোণিতগত যে সকল দানার উপর বংশানুক্রম নির্ভর করে, তাহারা চিরা-গত সংস্থান অপেক্ষা নিতান্ত বি-সম সংস্থান সহ্য করিতে পারে না।

শিক্ষা

আর একটি কথা এই আলোচনার সহিত আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি বংশানুক্রমের নিয়ম সকল নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং বীজ-গত লক্ষণই প্রবল হইল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রবল হইল না, তবে আমরা শিক্ষা ও সংসর্গ ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর যত মনোযোগ দিয়া থাকি, বংশ সংশোধনে তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত, নচেৎ সমাজ উন্নত থাকিতে পারে না। শুক্র ও শোণিত (৪) এই দ্বিবিধ বীজ-কোষের উপর বংশানুক্রম নির্ভর করে, তাহাদিগের সংমিশ্রণের পর ঐ যুক্ত-কোষের মধ্য হইতে কিছুই বাহির করিয়া লওয়া যায় না, এবং উহার মধ্যে কিছুই প্রবেশ করাইয়া দেওয়াও যায় না। এ সকল কার্য্য মানবের সাধ্যাতীত। (৫) তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বীজগত লক্ষণকে প্রকাশিত অথবা অপ্রকাশিত করিতে পারে, এইমাত্র। বীজ-মধ্যে যাহা নাই, তাহা দিতে পারে না। সুতরাং শিক্ষা ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপেক্ষা বংশ-সংশোধনে অনেক অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। চরিত্র

(৩) The dearth of brains and dearth of physique are the worst misfortunes that can befall a nation. Ibid p 56.

(৪) স্ত্রী-কোষ এবং পুং-কোষ।—

(৫) We have no experience of any means by which transmission may be made to deviate from its course; nor from the moment

বংশানুক্রমের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে; যোগ্যতাও তাহাই। স্পেন্সার বলেন, "Inherited constitution must ever be the chief factor in determining character অর্থাৎ, স্বভাব, পূর্ব্বপুরুষাগত ধাতুর উপর মুখ্যভাবে নির্ভর করে। বিষ্ণুশর্ম্মা বহুদিন পূর্ব্বে ঐ কথাই বলিয়াছেন,—

ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।
স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ॥

কিন্তু তাই বলিয়া "বেদাধ্যয়নের" আবশ্যকতা নাই, এমন নহে। সকল বিষয়েই অধিকারি-ভেদ আছে; শিক্ষা সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। যাহা হউক, শিক্ষা না হইলে যখন বীজ-গত লক্ষণের উচিত বিকাশ হয় না, তখন বীজ-গত লক্ষণের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষা করিয়া আবশ্যক শিক্ষার বিধান করা বলিয়াই মনে প্রতিভাত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির বংশানুক্রমিক বীজ-গত লক্ষণ বিভিন্ন, সুতরাং তাহাদিগের শিক্ষাও বিভিন্ন প্রকার হওয়া আবশ্যক। যাহারা সমাজের হস্তপদ, অর্থাৎ, যাহারা ভিন্ন সামাজিক কর্ম্ম এবং গুরুতর ও বিস্তৃত কর্ম্ম হইতেই পারে না, যাহারা স্বয়ং ঐ সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করে, তাহাদিগের শিক্ষা কর্ম্মমূলক হইবে, এবং যাহারা সমাজের মস্তিষ্ক-স্বরূপ, যাহাদিগের চিন্তার ফলে সমাজ উত্তরোত্তর উন্নত ও গৌরবান্বিত হয়, তাহাদিগের শিক্ষা জ্ঞানমূলক হওয়া উচিত। কিন্তু এতদুভয়ে বিরোধ ও ব্যবধান থাকা উচিত নহে। এই দুই শ্রেণী পরস্পর পরস্পরের সহায়; জ্ঞান ও কর্ম্ম, উভয় উভয়কে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করে। তাহা হইলেও সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, শিক্ষা ও সংসর্গ অপেক্ষা বংশ-সংশোধনেরই বহুগুণ অধিক প্রযত্ন নিয়োগ আবশ্যক। (৮) শিক্ষার ফল বংশগত নহে, প্রত্যেক পর-পর-বর্ত্তী

---

of fertilization can teaching or hygiene or exhortation pick out the particles of evil in that zygote or put in one particle of good. From seeds in the same pod come sweet peas climbing five feet high, while their own brothers lie prone upon the ground. The stick will not make the dwarf peas climb, though without it the tall can never rise. Bateson.

(৮) Nurture and Education may immensely aid the social machine, but they must be repeated generation by generation they will not in themselves reduce the bad stock.—National Life p. 21.

ব্যক্তিগণকেই নূতন করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। নচেৎ সুফল স্থায়ী হয় না। শিক্ষা ইত্যাদি বীজগত অধঃপতনের সংশোধন করিতেও সমর্থ হয় না। তবে, বীজগত উত্তম লক্ষণকে যথাসাধ্য বিকশিত করিয়া সমাজের বহু উপকার সিদ্ধ করিতে পারে।

ক্রমিক এবং আকস্মিক উন্নতি।

মানব-সমাজের উন্নতি অবনতির পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যেন সমাজ কোনও সময়ে উন্নত হইতেছে, এবং অন্য সময়ে অবনত হইতেছে। কিন্তু উন্নতি অবনতি কিছুই স্থায়ী হইতেছে না। জীব-বিবর্ত্তনেও তাহাই দেখা যায়। ইতর জীবগণের মধ্যেও দেখা যায় যে, কোনও জীব দেহবিধানে উন্নত হইতে হইতে অকস্মাৎ অবনত হইয়া গেল, হয় ত সম্পূর্ণরূপে তাহার ধ্বংসই হইয়া গেল। মানব-সমাজেরও ধ্বংস হইতে পারে। যে সকল মানবসমাজের ধ্বংস হইয়াছে, তাহারা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার উপর জয়ী হইতে পারে নাই। ইতর জীবগণের ধ্বংস হইবারও প্রধান কারণ তাহাই। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থা যখন জীবের উপর, অথবা সমাজের উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তার করে, তখন সে জীব অথবা সমাজ ধ্বংসাভিমুখ। এই অবস্থার উপর জয়ী হইলে রক্ষা, নচেৎ ধ্বংস অনিবার্য। ধ্বংসের সর্ব্বপ্রধান কারণ—জননহীনত। এই দুরবস্থা উৎপন্ন হইলে ব্যক্তিও যেমন, সমাজও তেমনই, আজি হউক, কালি হউক, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেই।

সমাজের উন্নতি, অবনতি ও ধ্বংস, তিনই সাধারণতঃ মৃদুগতি; অর্থাৎ, ক্রমশঃ সিদ্ধ হইয়া থাকে। জীববিবর্ত্তনও ক্রমিক বলিয়া অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করেন। কিন্তু ডি. ভ্রিজ, মর্গান, টমসন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন যে, জীববিবর্ত্তন ক্রমিক নহে, উহা আকস্মিক ব্যাপার। ডি. ভ্রিস্ বলেন, কোনও জীব এক দিকে, অথবা একাধিক দিকে অকস্মাৎ অল্পবিস্তর এরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, যাহা বংশানুক্রমে স্থায়ী হয়। এমন এক জীব অকস্মাৎ অন্য জীবে বিবর্ত্তিত হইয়া যায়। (৭) এই মত এখন পণ্ডিতসমাজে ক্রমে অধিকতর আদৃত

(৭) The current belief assumes that species are slowly changed into new types. In contradistinction to this conception, the theory of mutation assumes that new species and varieties are produced from existing forms by sudden leaps... ..Varieties and species.

হইতেছে। এই অকস্মাৎ-বিবর্ত্তনের মূল বীজ-গত। এই মত স্মরণ রাখিলে সমাজের অনেক বীজ-গত আকস্মিক পরিবর্ত্তন বুঝা কঠিন হয় না। এইরূপ পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইয়া সমাজকে এক রূপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ রূপে বিবর্ত্তিত করে। যে সমাজ সর্ব্বদা বনে বনে ঘুরিয়া পশু শিকার করে, তাহা অত্যল্প কালমধ্যে নির্দ্দিষ্ট গ্রামবাসী ও কৃষিজীবী হইতে পারে। যে সমাজে ব্যবসায়মূলক জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত, তাহাতেও অনতিবিলম্বে এক জাতি অন্য জাতির ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে। যে সমাজে সকল বস্তুই এজমালী, স্ত্রী পর্য্যন্ত এজমালী, তাহাতে অত্যল্পকালমধ্যে ব্যক্তিগত অধিকার প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। যে সমাজ রাজতন্ত্রমূলক, তাহাও অনতিবিলম্বে (রাজার শিরশ্ছেদ করিয়াই হউক, অথবা না করিয়াই হউক,) প্রজাতন্ত্রমূলক হইয়া উঠিতে পারে। এই সকল বীজগত পরিবর্ত্তন প্রায়ই অকস্মাৎ (by sudden leaps) সিদ্ধ হয়, ক্রমশঃ হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অস্থায়ী বাহ্য পরিবর্ত্তন অনেক স্থলেই ক্রমশঃ হয়; কখনও বা অত্যল্পকালেই হইয়া উঠে, যেমন, বিবাহ বিষয়ে জাতিভেদ। যাহা হউক, সামাজিক স্থায়ী ও বংশগত পরিবর্ত্তন সমাজের মূলকে, বীজকে পরিবর্ত্তিত করে, কিন্তু অস্থায়ী পরিবর্ত্তন কেবল বাহ্য। বাহ্য পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ অনুকরণ দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহার সহিত উপকারবোধও কিঞ্চিৎ জড়িত থাকিতে পারে, যেমন, আমরা প্রধানতঃ অনুকরণবশতঃই হেট্ কোট্ পরিধান করি, কিন্তু তাহাতে কখনও যে রেল-পথে ভ্রমণকালে কোনও উপকার হয় না, এমন নহে। পক্ষান্তরে, সামাজিক বীজগত পরিবর্ত্তন জ্ঞানমূলক; উপকারবোধই অগ্রণীদিগকে প্রবর্ত্তিত করে, তাঁহারা বংশানুক্রমে সেই ভাবের অধিকারী অথবা উপযোগী হইলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারেন। তৎপর ইতর সাধারণ সেই অগ্রণী, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের অনুকরণ দ্বারা ঐ পরিবর্ত্তনকে সমাজমধ্যে বিস্তৃত ও স্থায়িত্ব প্রদান করে। বীজগত পরিবর্ত্তন কেহ নষ্ট করিতে পারে না। উহা নষ্ট করিতে হইলে সমাজের ধ্বংস করিতে হয়। কিন্তু বাহ্য পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই অস্থায়ী। কোনও পরিবর্ত্তন বাহ্য ভাবে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে সমাজের বীজগত, ধাতুগত হইতে পারে, এবং কোনও পরিবর্ত্তন কিয়দংশে বীজগত ও অপরাংশে বাহ্য হইতে পারে। (৮) যাহারা বংশানুক্রমে দেহে ও মনে যে পরিবর্ত্তনের উপযোগী, সেই পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্যবিধ

---

(৮) বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন বোধ হয় এই শ্রেণীর।

পরিবর্ত্তন স্থায়ী হয় না; কিন্তু অন্তর্বিধ পরিবর্ত্তন ঐ পরিবর্ত্তনের সহিত অবান্তর ফলরূপে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে।

নিম্নশ্রেণী

এক্ষণে সমাজের ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ শ্রেণীর অবস্থার সহিত বংশানুক্রমের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কোনও সমাজে ধন দ্বারাই সামাজিক উচ্চ নীচ শ্রেণী সূচিত হয়; অন্য সমাজে জাতিভেদ দ্বারা উচ্চ-নীচ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানব সকলেই সমান নহে; মানুষে মানুষে দৈহিক ও মানসিক প্রভেদ চিরন্তন। অতি অসভ্য সময় হইতে বর্ত্তমান সভ্য সময় পর্য্যন্ত, মানুষে মানুষে প্রভেদ চিরদিনই জন্ম-গত, সুতরাং বীজ-গত। অসভ্য-সমাজে যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী, সাহসী, কৌশলী ও প্রতিভাসম্পন্ন, সেই দলপতি হয়, অন্যে তাহার অনুসরণ করে। জন্মগত ভেদ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তাই, যে সময়ের উপযোগী যে সকল লক্ষণ, তাহা অধিক থাকিলে মানুষ সমাজমধ্যে প্রধান ও গৌরবান্বিত হয়, অল্প থাকিলে অপ্রধান হয়। এইরূপে কালক্রমে প্রধান ও অপ্রধান—ইত্যাকার সামাজিক শ্রেণীর বিভাগ স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়। প্রধানগণের গুণ সকল বংশানুগত হওয়ায়, অনুরূপ-গুণ-বিশিষ্ট অপত্য জাত হইয়া সেই প্রাধান্য উহাদিগের বংশেই স্থায়ী রাখে। যে পর্য্যন্ত অধিকতর উপযোগী ব্যক্তি সেই প্রাধান্য ঐ বংশের হস্ত হইতে না লইতে পারে, সে পর্য্যন্ত উহাদিগের প্রাধান্য কেহই অস্বীকার করে না। তৎকালে ও তৎসমাজে যে সকল উপকরণ জয়যুক্ত হয়, প্রধানগণ বিশিষ্ট মাত্রায় তাহার অধিকারী। এইরূপ লক্ষণযুক্ত অপত্য এই সকল পিতৃমাতৃ-সংস্রবে যে পরিমাণ জাত হইবার সম্ভাবনা, অন্য বংশে তাদৃশ সম্ভব নহে। যোগ্য বংশে যোগ্য, ও অনুপযুক্ত বংশে অনুপযুক্ত জাত হইবারই অধিক সম্ভাবনা; কারণ, ইহাই সাধারণ নিয়ম। এ স্থলে যোগ্য বলিতে সাধারণতঃ "উত্তম"ই যে বুঝিতে হইবে, এমন নহে। "উপযোগী" "অথবা "উপযুক্ত"-মাত্র বুঝিতে হইবে। অনেক স্থলে, উত্তম হইলে, কোনও বিশেষ সময়ে বিশেষ সমাজের অনুপযুক্ত হইতে পারে। বংশানুক্রম শাস্ত্রের ও জীবতত্ত্বের যে অংশের নাম Eugenics অর্থাৎ "জাতীয় উৎকর্ষবিধান", সেই শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই এই যে, যাহা উপযোগী, তাহা কিরূপে সর্ব্বস্থলেই "উত্তম" হইতে পারে, তাহারা নিয়ম সকল জ্ঞাত হওয়া। যোগ্যই জয়ী হয়, কিন্তু যোগ্য উত্তম নাও হইতে পারে। চোরের সমাজে যে বড় চোর, সে-ই জয়ী হয়; কিন্তু তাহাকে উত্তম বলা যায় না। যে সাধু, তাহাকেই উত্তম বলা যায়। বংশানুক্রম শাস্ত্রের ও

জাতীয়-উৎকর্ষ-বিধান-তত্ত্বের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি বা সমাজ উত্তম, সে-ই জয়ী হইবে, অন্যে নহে। যোগ্যতমের জয় হয়; কিন্তু সেই যোগ্যতম উত্তম হউক, ইহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু বংশ-সংশোধন ব্যতীত ব্যক্তি অথবা জাতিকে উত্তম করা যায় না। উত্তম পিতা মাতা না হইলে উত্তম অপত্য [সাধারণতঃ] জাত হয় না। এই নিমিত্তই বংশানুক্রম শাস্ত্রের আলোচনা এত প্রয়োজনীয়।

মৃত মহাত্মা গাল্টন্ অনেক অনুসন্ধানের পর অবধারণ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডীয় সমাজে ৩৫ জন যোগ্য পিতা মাতা হইতে ৬ জন যোগ্য অপত্য জাত হইয়া থাকে। কিন্তু ২৫০০ সহস্র যোগ্যতাহীন ব্যক্তি ৩ জন মাত্র যোগ্য অপত্য লাভ করিয়া থাকেন। (৯) এতদ্দেশে এইরূপ সংখ্যা-গণনা করা হয় নাই; তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যোগ্য অপত্যলাভ যোগ্য পিতামাতার ভাগ্যে যে পরিমাণ ঘটে অন্যের ভাগ্যে সে পরিমাণ হয় না। সুতরাং যোগ্যবংশীয় অপত্যগণ জয়যুক্ত হওয়াই সাধারণ নিয়ম। যাহারা অযোগ্য, (১০) তাহারা জয়-যুক্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প। এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইলে বুঝা যাইবে যে, যাহারা চিরাতীত কাল হইতে সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া আছে, তাহারা প্রকৃতই দেহে মনে জয়-যুক্ত হইবার অনুপযোগী। সেই সুদূরবর্ত্তী অসভ্য-সময় হইতে তাহাদিগকে কেহ চাপিয়া নীচে নামাইয়া রাখে নাই। বরং এ কালে চাপিয়া রাখা যদিও বা সম্ভব হয়, সেই বিপৎসঙ্কুল প্রাথমিক অসভ্য-সমাজে যখন যুদ্ধ বিগ্রহ ও আহার্য্যের অভাব সর্ব্বদাই হইত, তখন গুণী অথবা যোগ্য ব্যক্তির প্রধান-পদ-লাভ স্বভাবতঃই একরূপ নিশ্চিত ছিল। তখন হইতেই যাহারা সুদীর্ঘকাল সমাজমধ্যে, [ধনে হউক, কর্ম্মে হউক, কৌশলে হউক, প্রতিভায় হউক,] প্রাধান্য লাভ করিতে অক্ষম হইয়া নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই যোগ্য অথবা উপযুক্ত বলা যায় না। তাহা হইলেও, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, উহাদিগের মধ্যেও অত্যল্পসংখ্যক যোগ্য ব্যক্তি নানাবিধ অবান্তর কারণবশতঃ উন্নত হইতে পারে নাই। ইহারাই গাল্টন্-প্রদর্শিত ২৫০০ সহস্রের মধ্যে ৩টি। ইহাদিগের উন্নত হইবার ব্যবস্থা সমাজমধ্যে প্রতিষ্ঠিত

(৯) While 35 V-class (যোগ্য শ্রেণী) purents suffice to produce 6 sons of the V—class, it takes 2500 R—class (তত যোগ্য নহে) fathers to produce 3 of them— Essays in Engenics p 17-18.

(১০) সামাজিক জগতে যোগ্য অর্থে—ধনী, সফল, কৃতী ইত্যাদি।

থাকিলে সমাজ লাভবান হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কার্য্য অত্যন্ত দুরূহ, সহজসাধ্য নহে। এক দিকে ভাল করিতে গিয়া অন্য দিকে মন্দ উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু, মন্দের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ভালর আরও উৎকর্ষসাধন করিবার জন্য যে বিধিনিষেধের প্রবর্ত্তন আবশ্যক, বুদ্ধিপূর্ব্বক সমাজের অগ্রণীগণ তাহা করিতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়; সুতরাং তাহা সর্ব্বপ্রযত্নেই কর্ত্তব্য। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশকেই কোনও উপায়ে উন্নত করিবার চেষ্টা করিলে, সে উন্নতি স্থায়ী হয় না। বর্ত্তমান নিম্নশ্রেণীগণকে ভবিষ্যতে উন্নত করা সম্ভব হইলে, এবং স্থায়ী ভাবে সম্ভব হইলেও, সেই ভবিষ্যৎ সমাজেও কি নিম্নশ্রেণী থাকিবে না? আমরা বলিয়াছি, যে সময়ে যে সমাজে যে সকল উপকরণ অধিকমাত্রায় থাকিলে উন্নতি হয়, সেই উপকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় একই উপকরণ কার্য্য হয় না। সুতরাং বিভিন্ন ধাতুর ও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বিভিন্ন সময়ে প্রাধান্য লাভ করে। তখন তাহারাই উচ্চশ্রেণী, অন্যে নিম্নশ্রেণী। তার পর,—বর্ত্তমান নিম্ন শ্রেণীতে যে সকল ব্যক্তি যোগ্য আছেন, তাঁহারা সুযোগপ্রাপ্ত হইলে, উন্নত হইতে পারেন; এবং বর্ত্তমান উচ্চ-শ্রেণী হইতেও কতিপয় ব্যক্তি বাহ্য ও আন্তরিক কারণবশতঃ নিম্ন শ্রেণীতে অবনত হইতে পারে। এইরূপে শ্রেণীগুলির মধ্যে ওঠা-নামা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালেই হইতেছে। প্রাচীন কালে জাতিভেদের অধিক কাঠিন্য থাকা সত্ত্বেও, এইরূপ বিভিন্ন জাতির উঠা-পড়া হইত। এইরূপ নিম্নশ্রেণীর অল্পাংশই উঠিতে পারে; তাহাদিগের ঊর্দ্ধগতি সাধারণতঃ দীর্ঘকাল নিবৃত্ত থাকিবার নহে।

উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে একটা একত্ব-বোধ থাকা আবশ্যক। সমাজের বিভিন্ন কার্য্য, যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ন্যায়, পরস্পর-সম্বদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হওয়া আবশ্যক। ইহারা সকলেই অনুভব করিবে,—"আমরা এক উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিতেছি"। সকল শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ অধিক যে সমাজে যত কার্য্য অনুষ্ঠিত ও সম্পন্ন হয়, সে সমাজ তত এক-ভাবাপন্ন হয়। এ নিমিত্ত সকল শ্রেণীর জনগণের সম্মিলিত প্রযত্নসাধ্য কর্ম্ম সমাজে অধিকসংখ্যায় প্রচলিত থাকা আবশ্যক। ইহা হইতেই সামাজিক একতা উৎপন্ন হয়। ভেদ-জ্ঞান ত থাকিবেই; তথাপি সেই ভেদের মধ্যেই একত্ব অনুভূত হইবে। ইহারই নাম সমাজপ্রীতি। দেশপ্রীতি পৃথক পদার্থ। দেশপ্রীতি না থাকিলেও সমাজ চলিতে পারে। যেমন ইহুদীসমাজ। কিন্তু সমাজপ্রীতি না থাকিলে

সমাজপ্রীতি। কোনও সমাজই টিকিতে পারে না। ইহুদী জাতির আর এখন কোনও নির্দ্দিষ্ট দেশ নাই। "এই আমার মাতৃভূমি", এ কথা এখন অনেক ইহুদীই বলিতে পারে না ; তাহারা প্রত্যেক দেশেই বৃত্তি বা কর্ম্ম উপলক্ষে বাস করিতেছে। কিন্তু সেই সকল দেশে ইহাদিগের সামাজিক একতা এত প্রবল যে, এক জন অভাব অনটনে পড়িলে, অথবা বাণিজ্যাদিতে অকৃত-কার্য্য হইলে, অনেকেই তাহাকে সাহায্য করে ও আশ্রয় দেয়। সমাজপ্রীতি এইরূপই হওয়া আবশ্যক। যেমন দেহের এক স্থানে পীড়া হইলে সমস্ত দেহ অসুস্থ হয়, এবং সেই পীড়া অনুভব করে, তেমন-ই সমাজেরও একাংশে আঘাত লাগিলে সর্ব্বত্র দুঃখ অনুভূত হয়, এমন সমবেদনা থাকা চাই। তাহা না হইলেই সে সমাজ বিকল হইল। সমাজ-প্রীতি না থাকিলে সামাজিক উন্নতি অসম্ভব; যদিও বা কিছু উন্নত হউক, সে উন্নতি স্থায়ী হইবে না। যাহারা বংশানুক্রমে সমাজ-প্রিয়, তাহারাই সামাজিক উন্নতিসাধনের উচ্চ অধিকারী। যাঁহারা একটা নকল দেশপ্রীতি লইয়া উন্মত্ত, কিন্তু একেবারেই সমাজপ্রীতিশূন্য, অথবা সমা-জের প্রতি ঘৃণা বা তাচ্ছীল্যের ভাব পোষণ করেন, তাঁহাদিগের প্রযত্নে সামাজিক উন্নতি অসম্ভব। সমাজে বংশানুক্রমে অকৃতিগণের অপেক্ষা সুস্থ, সবল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, শ্রমসহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী—এক কথায় কৃতী ব্যক্তি অধিকসংখ্যায় উদ্ভব এবং তাহাদের জীবিত থাকিয়া অনুরূপ অপত্য উৎপাদন করা, সামাজিক উন্নতির প্রথম ও শেষ কথা। এই ব্যক্তিগণ সমাজের যে পরিমাণ উপকার করেন, অপরে অর্থাৎ অযোগ্যগণ অনুরূপ সন্তান-প্রজনন দ্বারা তদপেক্ষা অধিক অপকার না করে, সে দিকেও অগ্রণীগণের সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকা আবশ্যক ; নচেৎ অনতিবিলম্বেই সমাজ অধঃপতিত হইবে। এই কারণে অনেক প্রাচীন সমাজ অবনত হইয়াছে। এই পরম শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতেই হইবে।

শ্রীশশধর রায়।

সমাপ্ত।

উলা বা বীরনগর।

২

উলা অতি প্রাচীন জনপদ। পূর্ব্বে ভাগীরথী গঙ্গা উলার নীচে দিয়া, খিসুবের পাশ দিয়া প্রবাহিত ছিলেন। তাহা কবিকঙ্কণের লেখা দেখিয়া

বেশ বুঝা যায়। সে হইল তিন শত ছত্রিশ বৎসরের কথা। ইহার শতবর্ষ পূর্ব্বে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মেল-বন্ধন হয়। ফুলিয়া মেলের 'ফুলিয়া' প্রসিদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। সেই ফুলিয়া মেলের বিস্তর স্বভাব ও ভঙ্গ কুলীনের উলায় বসবাস ছিল। কথিত আছে যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় উলায় ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের পাঁচিশ শত ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। আমি বালক, এ সকল এমন করিয়া তখন বুঝিতাম না, তবে আড়াই হাজার, তিন হাজার ব্রাহ্মণ পংক্তিভোজনে আহার করেন, এমন কথা সর্ব্বদাই শুনিতাম।

বামনদাস বাবুর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; উঁহাদিগকে উলার 'বাবুরা' বলা হইত। আর এক ঘর বিশিষ্ট ব্রাহ্মণবংশ ছিলেন, তাঁহারাও মুখুটী বটেন, দেওয়ান মহাশয়েরা। ইঁহারা কন্যার বিবাহে পাত্রের ভাল পাঁচটা গুণের সঙ্গে দৈহিক শৌর্য্য বীর্য্য বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইতেন। সুতরাং ইঁহাদের বংশে রুগ্ন ভগ্ন দুর্ব্বল লোক দেখিতে পাওয়া যাইত না। ইঁহারা পরম ভাগবত বৈষ্ণব ছিলেন। বার মাস বাড়ীতে হরিসঙ্কীর্ত্তন হইত, আর মাঘ মাসে নগর-সঙ্কীর্ত্তন রাত্রিতে বাহির করিতেন। অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে বর্ষৈক পূর্ব্বে উপনীত বালক পর্য্যন্ত, সেই গোষ্ঠীর সকলে একত্র সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। মধ্যে শুভ্র-লোমাবৃত-বিশালবক্ষ "রঞ্জিব মহাশয়" মোহাড়া ধরিয়া দিতেছেন, আর তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া পঞ্চাশ ষাট জন বালক, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, হরিনামের তান তুলিতেছে। সেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, অপূর্ব্ব গীতি—সেই যে বালক-কালে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, সে কি ভুলিবার বিষয়!

একঘর কায়স্থ উলায় খুব নামজাদা ছিলেন। উলার মুস্তোফীরা। তাঁহারা মিত্র—নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া মুস্তোফী উপাধি লাভ করেন। আমি যখন উলায় থাকি, তখন ইঁহাদের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। নাম আছে, আর তখন ইঁহাদের প্রসিদ্ধ 'চণ্ডীমণ্ডপ' আছে। চণ্ডীমণ্ডপ 'বাঙ্গলা' চালের—'খড়ো', কিন্তু সেই এক বিচিত্র কাণ্ড। বাঙ্গলা দোচালা—তিন দিকে প্রাচীর; ভিতর দিকে প্রাচীর-গাত্রে সমস্ত দেবদেবীর লীলা-মূর্ত্তি খোদাই করা। দক্ষিণমুখ চণ্ডীমণ্ডপ, দক্ষিণ দিকে দুচালার জোড়ের কাছে, এবং দক্ষিণ দিকের ছাঁচের কাছে, কাঠের খুঁটী। ময়ূর-পুচ্ছের চন্দ্রক দিয়া ঢাকা। খুঁটীও যেমন, আড়া তীর বাম্‌না সকলই তেমনই—কাঠের, ও ময়ূরপুচ্ছের চাঁদ দিয়া ঢাকা। চালের শলাগুলি বাঁশের, তারের মত সরু ও সুগোল,—এবং যন্ত্রীর ছিদ্র-মধ্য দিয়া টানা। এই সব শলা ছিলেটের ভাল শীতলপাটীর বিতির মত পাতলা সরু বেত দিয়া বাঁধা। চালের ভিতরপীঠ নানা চিত্র

বিচিত্র রঙ্গকরা; লাল রঙগুলি গালার, আর মধ্যে মধ্যে সেই ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রক দিয়া পদ্মের মত নক্সা। চালের উপরপীঠের কোনও বৈচিত্র্য থাকিত না, সাদা সিধা একটা বাঙ্গলা চাল। কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে দাঁড়াইলে, দাঁড়াইয়া উপরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, আর নয়ন মন ফিরাইয়া আনা ভার হইত। আমি বালক সৌন্দর্য্য-প্রিয়—আমার আর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, শেষে আমার রক্ষকেরা আমাকে যৎকিঞ্চিৎ বলপূর্ব্বক লইয়া চলিল—মুস্তৌফী মহাশয়দের সদর বাড়ী দেখিতে গেলাম। বাড়ীর তখন ভাঙ্গা অবস্থা। সুবৃহৎ কাঠের স্তম্ভ সারি সারি, মৃত্তিকা হইতে দোতালার ছাদ পর্য্যন্ত নানা কারুকার্য্য ভগ্নঅঙ্গে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। তাহার উপরে সুপ্রশস্ত কাঠের কার্ণিস্। রঙ্গ নাই, বাহার নাই, জলুস্ নাই, খোদকারী সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইতেছে, কোথাও বা কার্ণিস্ই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

বালককালেই 'সোণেকি শুক্তি, গিধড়কি ঝাড়'র গল্প শুনিয়াছিলাম। এক পাতশাহ অত্যন্ত উদার ছিলেন, নিজ কর্ম্মচারীদের চুরি জানিতে পারিয়াও ধরিতেন না। তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে, তিনি কর্ম্মচারীদের ডাকাইয়া বলিলেন, দেখ, আমার আমলে যা করিবার তাহা করিয়াছ, আমার উত্তরাধিকারীর আমলে আর সোণার শুক্তি বাদ দিও না, আর শৃগালের শীতনিবারণের জন্ম কম্বলের ব্যবস্থা করিও না।

মুস্তৌফীদের সদর বাড়ীর একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া আমার সঙ্গীরা বলিল, এই ঘরে বিস্তর ভাল ভাল ঝাড় লণ্ঠন ছিল, সমস্তই উইয়ে কাটিয়া মাটী করিয়াছে। কেবল পিতলের সাপিগুলা পাওয়া গিয়াছিল। আর এক জন বলিল, 'সোণেকি শুক্তি—গিধড়কি ঝাড়' এ কালেও হয়। আমি বুঝিলাম, ঝাড় লণ্ঠন অপহৃত হইয়াছে।

নবশাখদের মধ্যে কয়েক ঘর গন্ধবণিক ও কাংসবণিক আমাদের দক্ষিণ পাড়াতেই ছিল; তাহারা গৃহস্থ লোক; আর উত্তরপাড়ায় ছিলেন খাঁ বাবুরা; তাঁহারা তিলি। কলিকাতায় বিপুল ব্যবসায় করেন; তাঁহারা এখনও বর্ত্তমান; আমরা গত বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁহাদের আশ্রয়ে ৪॥০ ঘণ্টা সুখে কাটাইয়া আসিয়াছি। সে কথা পরে বলিব।

পিতৃদেবও বৈশাখী-পূর্ণিমায় উলায় গিয়াছিলেন, আমরাও গত বৈশাখী-পূর্ণিমার দিন গিয়াছিলাম—কেন ঐ পূর্ণিমায় কিছু বিশিষ্টতা আছে?

আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় উলায় উলুইচণ্ডীর জাত হয় এবং তিন পাড়ায় বারইয়ারি পূজা হইত, এখন দুই পাড়ায় হয়।

এই কথা বলিলেই দিনের বিশিষ্টতা বুঝান গেল না। অতি বড় দীনদরিদ্র হইতে ধন-কুবেরগণ পর্য্যন্ত সকলেরই বাড়ীতে মহা উৎসব হয়। সকলেই চণ্ডী-মায়ের পূজা দেন বা করেন—সকলেরই বাড়ীতে ভূরি পরিমাণে অতিথি-কুটুম্বের সমাগম হয়।

উলায় থাকাতে পল্লীগ্রামের আতিথ্য জিনিসটা কি, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কাছারীর কাছে আমাদের দোতালা বাসা-বাড়ী ছিল, সেই বাসা হইতেই একটি দরিদ্র প্রতিবাসীর ঘর, দুয়ার, উঠান বেশ দেখিতে পাওয়া যাইত। একটি বাঁশ ঝাড়ের পার্শ্বেই তাহাদের ঘর—একখানি মেটে ঘর, তাহারই দাওয়া, আর বাঁশতলাটুকু যা, উঠানও তাই। ৩।৪ দিন পূর্ব্বে গৃহস্থের পরিবার সেই ঘর দুয়ার বাঁশতলা ঝক্ ঝকে করিয়া নিকাইয়া রাখিত। আর সেই পূর্ণিমার দিনই মেলা হইতে গোটা দুই মাজুরি ও ৩।৪ টা কলিকা ও খানিকটা তামাক কিনিয়া আনিত, আর সেই উঠানের এককোণে বাঁশের গোড়া কাটার আগুণ গর্ত্ত করিয়া রাখিয়া দিত। সেই মাজুরিতে বসিয়া, সেই কলিকায় তামাকু খাইয়া কুটুম্ব-অতিথিরা আনন্দে ভোরপুর হইয়া কতই না গল্প করিত। চণ্ডীমার প্রসাদ নামিলে, এক হাঁড়ী বা দুই হাঁড়ী ভাত চড়াইয়া দিত; ৫টা ৬টার সময় সেই প্রসাদান্ন খাইয়া, চাদর বা গামছাখানা কুণ্ডলী করিয়া মাথায় দিয়া লম্বা শুইয়া পড়িত। বলিহারী বাঙ্গলার দীন-দরিদ্র ও বলিহারী বাঙ্গলার আতিথ্য।

বৈশাখী পূর্ণিমা ৺গন্ধেশ্বরী পূজার দিন। ৺গন্ধেশ্বরী পূজা গন্ধ-বণিকগণ প্রায়ই করিয়া থাকেন। প্রবাদ যে উলার চণ্ডী-গন্ধেশ্বরীই বটেন। শ্রীমন্ত সিংহল যাত্রার সময় যখন উলার পার্শ্ব দিয়া যান, তখন গন্ধেশ্বরী পূজার দিন, নদীতীরস্থ বটমূলে গন্ধেশ্বরী স্থাপন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন; "নদীয়া কাহিনী"তে ত্রিপদীর তিন চরণ উদ্ধৃতও হইয়াছে :—

"বটমূলে ভগবতী, যথায় করেন স্থিতি, উপনীত সেই উলা-ধামে।"

এই কথাগুলি কোথা হইতে আসিল, তাহা আমরা জানিনা। বিশেষ উহা হইতে গন্ধেশ্বরী স্থাপনা বুঝা যায় না, বটমূলে ভগবতী স্থাপিত ছিলেন—ইহাই বুঝা যায়। বিশেষ ধনপতি যে ঐ রূপে চণ্ডীপূজা করিবেন, তাহা কখনই সম্ভব নহে। তিনি তখনও তেমন শক্তি-ভক্ত হন নাই। আর শ্রীমন্তেও সম্ভব নহে।

কেন তাহা বলিতেছি :—যখন শ্রীমন্তের নৌকা ভাগীরথীতে আসিয়া পড়িল তখন কবিকঙ্কণ বলিতেছেন,

"বাহিয়া অজয়নদী, পাইল ইন্দ্রাণী।"

ইহার পর 'গঙ্গার উৎপত্তি কথন' আছে, তাহার শেষে আছে ;—

"শুনি গঙ্গা অবতার, সুখী হৈলা কর্ণধার,
স্নান কৈল সতিল তর্পণে।
আচ্ছাদিয়া ধৌত পাটে, লইল নূতন ঘাটে,
শ্রীকবি কঙ্কণ রসভণে।"

ইহার বহু পূর্ব্বে যখন বহর অজয়েই রহিয়াছে, তখন :—

"বাহেন্দা বাহিল সাধু বেণের নন্দন।
সোনায়ের ঘাটে ডিঙ্গি দিল দরশন।
সুবর্ণের চণ্ডী করিল পূজা দান
প্রণমিয়া সদাগর করিল পয়ান।"

আবার উলায় আসিয়া চণ্ডী বা গন্ধেশ্বরী স্থাপনা করিলেন, তাহা বোধ হয় না। তাহার পর মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের যুক্তি আছে। যখন হাড়ীরা এখনও রাত্রি থাকিতে প্রথম পূজা করে, তখন ঐ চণ্ডী বৌদ্ধের রূপান্তর মাত্র।

উলার বারইয়ারীপূজা—সেই এক বিষম কাণ্ড। পৌত্তলিক পীড়নকারীদিগের শত লাঞ্ছনাতেও এখনও বারইয়ারী জীবিত আছে। বাঙ্গালার যে সকল জনপদে, হাট, গোলা, গঞ্জ বা বাজারের সমৃদ্ধি আছে, সেই সকল স্থানে সহজে মুনাফার উপর 'ঈশ্বর বৃত্তি' আদায় হয় এবং ঈশ্বরীর পূজা সমারোহে হইয়া থাকে। আজিকালি কলিকাতায় বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি, কাজেই কলিকাতার সূতাপটি, লোহাপটি, হাটখোলা, পাথুরিয়াঘাটা প্রভৃতি স্থানে জাঁকজমকে, অথচ দান-ধ্যানে, বারইয়ারী পূজা হইয়া থাকে। গুপ্তিপুর, কাটোয়া, কালনা, শান্তিপুর, মগরা প্রভৃতি পল্লীগ্রামের বহুতর স্থানে ঐরূপ বারইয়ারী হইয়া থাকে।

গঞ্জ-গোলা না থাকিলেও, দেশে দেশে চাঁদা আদায় করিয়া স্থানে স্থানে বিশেষ ধূমধামে বারইয়ারী পূজা হইত। ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান, গুপ্তীপাড়া, উলা প্রভৃতি গ্রামে এইরূপেই বারইয়ারী হইত। এই সকল বারইয়ারীর বাঁধা পাণ্ডা ছিল। ভাল ভাল কুলীনের ছেলে, মোটা মোটা পৈতা কাঁধে, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, প্রায়ই মালকোচা মারা, গ্রামের মধ্যে, বারইয়ারির দুই তিন মাস থাকিতে, চাঁদা আদায় করিত। দুই একজন বর্ষীয়ান আমুদে লোক সঙ্গে লইয়া,

তাহাদিগকে মুরুব্বি বানাইয়া, যেখানে অর্থসম্পন্ন, বিত্তশালী বাঙ্গালী আছে, সেই সেইখানে প্রায় সম্বৎসর ঘুরিত। চাঁদা অবশ্য "রক্ষণ ভক্ষণ" দুইই হইত। এখনকার টেরিকাটা বাবুরা কমিশন লন, তখন ভক্ষণই কমিশন। আমি উলার ভালটুকু বলিয়াছি, এখন মন্দটুকু বলি,—৩।৫ জন ঐরূপ গুণ্ডা পড়িয়া দুপর বেলা গৃহস্থের ঘটি বাটি বারইয়ারীর চাঁদার জন্য উঠাইয়া লইয়া গেল, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। বারইয়ারীর এইরূপ অত্যাচার আমার বাল-বুদ্ধিতেও ভাল লাগিত না। দুইজন দশজনকে এই জন্য কাঁদিতেও দেখিয়াছি।

বিদেশে পাণ্ডাদের চাঁদা আদায়ের নানারূপ বিচিত্র গল্প আছে। কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ কৃপণ বড় মানুষের বাড়ীতে বীরনগরের বীর পাণ্ডারা যাইতে উদ্যত; সকলে নিষেধ করিল, বলিল "উহার মুখ-দর্শন করিলেও পাপ আছে; একে, একচক্ষু নাই—কাণা, তাহাতে বাপের শ্রাদ্ধ, মায়ের শ্রাদ্ধ করে না, অতিথি ব্রাহ্মণকে কিছু দেয় না, উহার নিকট তোমরা যাইও না।" পাণ্ডারা কিন্তু নাছোড়-বন্দা, তাঁহার বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি মনে ক'রে আসিয়াছেন?" উত্তর হইল, "আমরা উলার বারইয়ারী পাণ্ডা, মায়ের পূজার জন্য আপনার নিকট কিছু ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।" আবার উত্তর হইল, "আপনারা কি শুনেন নাই, বাপের শ্রাদ্ধ, মায়ের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কোন বাজে খরচ আমার নাই, আমার কাছে আপনাদের কিছু হবে না।" "না দেন, নাই দিবেন, কিন্তু আপনার বাজে খরচ নাই—এমন মিথ্যে কথাটা বলবার কি প্রয়োজন?" "আমার বাজে খরচ কিসে দেখিলেন?" "আপনার একটি বই চোখ নাই, দুখানি পরকলা দেওয়া চস্‌মা ব্যবহার করিতেছেন কেন?" কৃপণ হাসিয়া ফেলিল, বলিল "আপনারা ধরিয়া ফেলিয়াছেন বটে, আমি আপনাদিগকে ১০টি টাকা দিতেছি, মায়ের পূজা দিবেন।" ব্রাহ্মণগণ টাকা লইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আর একদিন কলিকাতার এক উগ্রস্বভাব বড় মানুষের বাড়ী পাণ্ডারা প্রবেশ করিবার উদ্যোগেই তিনি "এখানে কেন, এখানে কেন, এখানে কিছু হবে না, আবার কি দরয়ান ডাকিতে হইবে না কি?" বলিয়া মহা রাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ ধীরে সুস্থে গিয়া ভিন্ন আসনে বসিলেন, বাবু আরও রাগত হইলেন। পাণ্ডারা বলিলেন, "আমরা ব্রাহ্মণ, আপনি কায়স্থ; আমাদিগের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতেছেন কেন?" উত্তর "ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ—তোমাদের ব্রাহ্মণত্ব কি আছে?" "কেন সকলই আছে, উপবীত হইয়াছে, নিষ্ঠা আছে,

গায়ত্রী জপ করিয়া থাকি, নাই কি?" উত্তর, "ব্রাহ্মণ হইলে সাত্ত্বিক হইতেন, তোমাদের মুখে আগুণ থাকিত।" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "এইজন্য আপনি এত রাগ করিতেছেন? ওটা আপনার ভুল। মুখে আগুণ থাকিলে, হা করিতে হইবে, ফু দিতে হইবে, তবে আগুণ বাহির হইবে,—এইত; আর দেখুন দেখি—আমরা পঞ্চাশ হাত দূরে থাকিতেই, আপনি আমাদের দেখা মাত্রই জ্বলিয়া উঠিয়াছেন; কোনটা বেশী হইল মহাশয়?" কায়স্থ একেবারে নরম হইলেন, কুড়ি টাকা তাঁহাদিগকে দিতে হুকুম দিলেন; আর সাধা-সাধনা করিয়া তাঁহাদিগকে পাকাহার করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ আপনাদের স্বপাক মাছের ঝোল অন্ন এবং বিপাক ক্ষীর সন্দেশ উদর পূরিয়া আহার করিয়া, দক্ষিণা এবং কুড়ি টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন।

লাট হেষ্টিংশের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে উলার পাণ্ডারা দড়ীদড়া লইয়া গিয়া বলে, "মায়ের ইচ্ছা তোমার কাঁধে চাপিয়া আসেন, তাই তোমাকে লইতে আসিয়াছি।" গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বড় চতুর লোক ছিলেন, সেবারকার মায়ের পূজার সমস্ত ভার তিনি গ্রহণ করেন।

এইরূপ উলার বারইয়ারী পূজার গল্প বড় প্রচলিত ছিল, এখনও আছে, কিন্তু আজি এই পর্য্যন্ত।

কদমতলা, চুঁচুড়া। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।
১২ই শ্রাবণ।

স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্রের রোজনামচার এক পৃষ্ঠা।

৯ই জুন; ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।—বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত (যিনি রাজা রামমোহনের সহিত ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন) সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত রামমোহনের জীবন সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলোচনা হইল। তিনি তাঁহার উপকারকের প্রতি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ। * * * কলিকাতায় আগমন করিয়া তিনি ঠনঠনিয়ায় "নবাব বাড়ী" নামে একটি বাটীভাড়া করেন। তথায় ১৮ মাস অবস্থান করেন। পরে তাঁহার অসুবিধা হইতে লাগিল। এই তাঁহার মনঃক্ষোভ হইল। বহুদিন মফঃস্বলে ছিলেন বলিয়া

তিনি পল্লীগ্রামের বায়ু সেবন করিতে অভিলাষ করিলেন। তিনি সার্কুলার রোডে (বাহির সিমলায়) একটী উদ্যানবাটিকা ক্রয় করিলেন,—যে বাটী পরে তৎকালীন মহাত্মাগণের সমাগমস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি জে, বি, র নিকট হইতে ঐ বাটি ৪০০০৲ টাকায় ক্রয় করেন কিন্তু পরে ঐ বাটী ও উদ্যানের অনেক পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করাইয়াছিলেন। উহা প্রথমে একতল বাটী ছিল; তিনি ২২০০ টাকা ব্যয় করিয়া উহাকে দ্বিতল বিশিষ্ট করেন। তিনি ঐ বাটীর সংস্কার কার্য্য কাপ্তেন সিরম নামে এক জন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন কিন্তু তিনি ১২০০ লইয়া পলায়ন করেন। রামমোহন নিজে স্থপতির কার্য্য জানিতেন না এবং প্রথমে উক্ত ব্যক্তিকে এবং পরে রামরতন মুখোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করেন কিন্তু উদ্যানকর্ম্মে তাঁহার স্বভাবজাত রুচি ছিল। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার উদ্যান সংস্কারের জন্য যত্ন করিতে ভালবাসিতেন এবং যখন তাঁহার পুত্র রাধানাথ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন তখন প্রায় সব সময়েই ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই সময়ে তিনি সাহিত্যসেবা আরম্ভ করেন। তিনি অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিতেন, বিশেষতঃ শীতকালে। তিনি কোনও না কোনও বন্ধুর সহিত বহুদূর পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। তিনি কদাচিৎ একাকী ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, প্রায়ই কেহ না কেহ সঙ্গে থাকিতেন। তিনি তাঁহার পরিচিতগণকে শিক্ষা দিবার সুযোগ কখনও হারাইতেন না। গ্রীষ্মকালে তিনি মস্‌লিন্ কাবা এবং শীতকালে সাটীন কাবা ও ইজের পরিধান করিতেন। প্রাতঃকালে একটী টুপী পরিতেন। প্রাতর্ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি এক পেয়ালা চা (শীতকালে কাফি) পান করিতেন। চা-পানের পরে তিনি তাঁহার পাঠগৃহে প্রবেশ করিতেন তথায় তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভালবাসিতেন না। যদি কোনও বন্ধু প্রাতঃকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেন যে তাঁহার কার্য্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিল। তিনি প্রায় বেলা ১০টা পর্য্যন্ত লেখা পড়া করিতেন। কখনও কখনও তিনি পাঠে এত আবিষ্ট থাকিতেন যে সময় চলিয়া যাইত তিনি জানিতে পারিতেন না। প্রায় ১১ টার সময় তিনি ভাত, তরকারী, মৎস্য, ডাল, দুগ্ধ প্রভৃতি দ্বারা মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করিতেন। তিনি মুগের ডাল এবং রোহিত মৎস্য অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। একজন ধীবর প্রায় প্রত্যহ একটী বড় রোহিত মৎস্য দিয়া যাইত এবং ১০৲ মণ হিসাবে মূল্য লইত। আহারান্তে তিনি কদাচিৎ জল

পান করিতেন (কারণ তাঁহার—রোগ ছিল) কিন্তু একটা বাটা হরিতকী খাইতেন। তিনি হরিতকী অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং মাতৃস্তন্যের সহিত উহার তুলনা করিতেন। আহারান্তে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল তিনি বৈঠকখানা বা বারাণ্ডায় পায়চারী করিতেন। তৎপরে তিনি তাঁহার ক্লিওপেট্রা কৌচে (তখনও 'ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট' কৌচ আবিষ্কৃত হয় নাই। একখানি পুস্তক লইয়া শয়ন করিতেন। কখনও কখনও তিনি এই সময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু এই নিদ্রা অতি অল্পক্ষণের জন্য। ও "সজাগ"। * * * বেলা ১টার সময় তিনি লুচি, মৎস্যের তরকারী এবং ফল মূলাদি দ্বারা জলযোগ করিতেন। জলযোগের পর তিনি পুনরায় পাঠগৃহে প্রবেশ করিতেন, এবং তথায় ৪টা অথবা ৫টা পর্য্যন্ত কাজ করিতেন। বৈকালে তাঁহার বন্ধু ও পরিচিতগণ সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এই সময়ে তিনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন। এই সময়ে যাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে এই কয় জনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রজমোহন মজুমদার, রামচন্দ্র পালিত এবং হরচন্দ্র পালিত, কাশীর রাজার উকীল মীর মহম্মদ, মুন্সী মসনাল্লা (যিনি আসামে অনেককাল ছিলেন,) ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, বেলুড়ের রামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র এবং পুলিশ অফিসের দরখাস্তলেখক (Pitition writer)। ইনি ইংরাজীতে দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন এবং ।০ হিসাবে পারিশ্রমিক লইতেন তিনি একপ্রকার সরকারের জানিত লেখক। পুলিস আফিসে তাঁহার একটী স্বতন্ত্র ঘর ছিল। তিনি দরখাস্ত লিখিয়া প্রায় তিনলক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আগমনের দুই বৎসর পরে রামমোহন শুঁড়ী পাড়ায় একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহাই এই নগরীর মধ্যে প্রথম দাতব্য এবং বে সরকারী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে প্রায় দুইশত ছাত্র ছিল। শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল। একজন প্রধান শিক্ষক ও একজন সহকারী দ্বারা এই বিদ্যালয় পরিচালিত হইত। গোলক মিস্ত্রী (জাতিতে নাপিত) ইহার প্রথম হেড্‌মাষ্টার এবং দেবনারায়ণ দত্ত (কায়স্থ) তাঁহার সহকারী ছিলেন। রামমোহন রায় বিদ্যালয়ের সমস্ত খরচ প্রদান করিতেন। প্রধান খরচ বাটীভাড়া ১০৲

প্রধান শিক্ষকের বেতন ১৬৲এবং সহকারী শিক্ষকের বেতন ৮৲মাত্র। পরে তিনি তাঁহার উদ্যান বাটীতে ঐ স্কুলের সহিত সংশ্লিষ্ট একটী ইংরাজী শ্রেণী খুলিয়াছিলেন। এই শ্রেণীতে ঐ স্কুলের খ্যাতনামা ছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদত্ত হইত। ইহা মিষ্টার মারক্রফটের অধীনে ছিল। মারক্রফট্‌কে তিনি ১০০৲ বেতন প্রদান করিতেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, নলিনী মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বর সরকার, রজনী গুপ্ত প্রভৃতি এই ক্লাশে পাঠ গ্রহণ করিতেন। ৺নন্দকুমার বসু এই ক্লাশে পড়িতেন না কিন্তু রামমোহনের নিকট বাটীতে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮—খৃষ্টাব্দে তিনি সিমলায় কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের নিকট একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন এবং সেইখানে একটী বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করেন। মেসার্স গ্যাস এবং স্যাণ্ড্‌ওয়েল ঐ বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ।

শতাধিক বর্ষপূর্ব্বে বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।*

দাসত্ব-প্রথা ও দাস-ব্যবসায়ের কথা উঠিলেই আমাদের মনে মার্কিণ দেশীয় দাসত্ব-প্রথা ও দাস-ব্যবসায়ের কথা মনে হয়। তদ্দেশীয় দাসত্ব-প্রথার নিবারণের জন্ত যে আন্তর্জাতিক সমরানল প্রজ্জলিত ও যে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, তাহারই কথা মনে পড়ে। "পেনাল কোড্‌" বা দণ্ডবিধির কৃপায় আমাদের বালক ও যুবকগণ, এ দেশে যে ঐ জঘন্য ও নৃশংস প্রথা কখনও বর্ত্তমান ছিল তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। তাহারা চারিদিকেই "সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতা"র বিজয়-ডঙ্কার নিনাদ শুনিতে পায়, জাতিভেদের বৈষম্যটুকু সহ্য করিতে পারে না। "নিম্ন জাতির উন্নতির প্রচেষ্টা' 'Depressed classes mission"; "প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের আবেদন" "শ্রমজীবিগণের সমবায়" প্রভৃতির কলরবে, সামাজিক ও জাতীয় ইতিহাসের ধারা পর্য্যবেক্ষণ অনেক পরিমাণে দুরূহ হইয়া পড়ে।

ইতিহাস, সংস্কার-বিরোধী নহে, সংস্কারেরই পক্ষপাতী; বরং তথাকথিত সংস্কারকগণ ইতিহাসের শিক্ষাকে অবহেলা ও পদদলিত করিয়া, সংস্কারকে সংহা-

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-বরিশাল-শাখার অষ্টতম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। সম্পাদক।

য়ের প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে উপস্থিত করিয়া সংস্কারের পথে কণ্টক রোপণ করেন। ঐতিহাসিক ক্রমই সংস্কারের ও উন্নতির ক্রম, ইতিহাসের পথই, ক্রম-বিকাশ ও বিবর্ত্তনের পথ। সংস্কারের অন্য পথ নাই। সমাজের কোনও প্রথাই আকস্মিক বা ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞতা, নিষ্ঠুরতা বা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রবর্ত্তিত বা পরিকল্পিত হয় নাই। প্রত্যেক প্রথাই মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কতকগুলি মূল-সত্য-প্রসূতা কারণ-শৃঙ্খলার ফল। সেই শৃঙ্খলা স্ফুটভাবে দেখাইয়া দেওয়াই ঐতিহাসিকের কার্য্য। অতীতের ধারা নির্ণীত হইলেই, আমরা বর্ত্তমানকে ঠিক ধরিতে পারি ও ভবিষ্যতের গন্তব্য পথ আবিষ্কার করিতে পারি, নচেৎ, গোলক ধাঁধাঁয় পড়িয়া পথ হারাই।

দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। সমাজ-তত্ত্ববিদের "যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা"ও (Survival of the fittest) কিয়ৎ পরিমাণে সেই সবলেরই অত্যাচার। তবে, মানবসমাজে পাশব বা দৈহিক বলই একমাত্র বল নয়; পরন্তু ইহা নিম্নশ্রেণীর বল। ধর্ম্মবল বা আধ্যাত্মিক বলই বল। যাহাকে আজ দুর্ব্বল বলিতেছি, মানব-সমাজ আধ্যাত্মিকতায় তাহাই সবল হয়।

সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সমাজের কোন না কোন স্তরে দাসত্ব-প্রথার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইবে। ভূতত্ত্ববিদেরা যেমন ভূখণ্ডের স্তরে স্তরে ধরা হইতে বিলুপ্ত জীবজন্তুর কঙ্কাল অথবা তরু-লতার প্রস্তরীভূত আকৃতি (Fossils) দর্শন করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সেই সেই জীবজন্তুর ও তরুলতার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেন, ঐতিহাসিকেরাও সেই প্রকার প্রাচীন গ্রন্থ, লিপি, প্রস্তর-ফলক, তাম্রফলক, ইত্যাদি দর্শন করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের সামাজিক রীতি-নীতির অস্তিত্ব ও অভাব প্রতিপন্ন করেন।

আমাদের জাতিভেদ-প্রথার ভিতরেই যে দাসত্ব-প্রথার চিহ্ন বর্ত্তমান, প্রাচীন শাস্ত্রাদির আলোচনা করিলেই তাহা বোধগম্য হইয়া থাকে। নারদ-স্মৃতিতে আমরা পঞ্চদশ প্রকারের দাসের উল্লেখ পাই ;—

দাসঃ পঞ্চদশবিধঃ ;

গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধো দায়াদুপাগতঃ
অন্নকাল ভৃতস্তদ্বৎ আহিতঃ স্বামিনা চ যঃ।
মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাৎ যুদ্ধপ্রাপ্তঃ পণেজিতঃ
তবাহমিত্যুপাগতঃ প্রব্রজ্যাবাসিতঃ কৃতঃ।

তক্তদাসস্ত বিজ্ঞেয় স্তথৈব বড়বা কৃতঃ।
বিক্রেতা চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃপঞ্চদশস্মৃতাঃ।

মহামতি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার তাঁহার "দায়ক্রম-সংগ্রহে" উল্লিখিত স্মৃতির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—

"গৃহজাতো দাস্যামুৎপন্নঃ, দায়াদুপাগতঃ ক্রমাগতঃ অন্নকালভৃতঃ দুর্ভিক্ষপোষিতঃ স্বামিনা-আহিতো বন্ধকীকৃতঃ, মোক্ষিতঃ,—ঋণমোচনেনাত্মনীকৃতদাস্তঃ তবাহামিত্যুপাগতঃ কন্যাপাদাসঃ-সন্ স্বয়ং দাসত্বেন সমর্পণঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ সন্ন্যাসভ্রষ্টঃ কৃতঃ কেন চিন্নিমিত্তেন এতাবৎকালপর্য্যন্তং তাবদ্দাসঃ ইতি কৃতসময়ঃ তক্তদাসঃ দুর্ভিক্ষেঽপি তক্তার্থমঙ্গীকৃতদাস্যঃ. বড়বাকৃতঃ বড়বা দাসী তয়োস্তাদহীকৃতদাস্যঃ।"

দাসত্ব প্রথা যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, সে বিষয় আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্বেতকায় আর্য্যগণ যে কৃষ্ণকায় অনার্য্যদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া অনেক সময় দাসে পরিণত করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় ; শূদ্রের এক আভিধানিক অর্থই দাস।

সম্প্রতি আমাদের শাখা-পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত রাইচরণ গুহ বি, এল্, তাঁহার গৃহে রক্ষিত কয়েকখানি প্রাচীন দলিল পরিষদে উপস্থিত করিয়াছেন। সেই দলীল কয়েকখানি পাঠ করিলে শত কি পাদাধিক শত-বর্ষ পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশের—বিশেষ বাখরগঞ্জের সামাজিক অবস্থার দু' একটি চিত্র দৃষ্টিপথে পতিত হয়। নিম্নোদ্ধৃত দলীলখানি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, দাসত্ব-প্রথা বৈদিককাল হইতে প্রায় পেনালকোডের সময় পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, অথবা প্রচ্ছন্নভাবে জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

আলোচ্য দলীলখানি ১১৯৫ সনের ১৪ই অগ্রহায়ণের লিখিত। দলীলখানি এই :—

ইয়াদি আত্মবিক্রয় পত্রমিদং—

শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ ওলদে গদাধর সিদ্ধান্ত সাকিম চান্দশী পরগণে বাজরোড়া সুচরিতেষু :—শ্রীমতী কুঞ্জমালা ওমর ২৭ সাতাইষ বরিষ রজন্তায় জওজে রাম রুদ্রতে সাকিম পিজলাকাটি পরগণে আজীমপুর অত্র লিখনং আগে আমী মহাকষ্ট পালিত খোরাক পোষাক আজিজ হইয়া মারা জাই এবং আমার কন্যা শ্রীমতী মহামায়া ওমর সাত বরিষ রজস্তান এহার ও অন্ন বস্ত্র দিয়া পরিপোষণ করিতে না পারি এবং কেহ আমার ঘর অন্ন বস্ত্র দিয়া পর বিষ করে এমত না রাহে অতএব আপন রাজিরকবতে সজ্জেন্দ আক্রেমহাল ভবিয়তে সেইচ্ছা পূর্ব্বক আমি ও আমার কন্যা বহার আপনার স্থানে মবলগ ৩ তিন রূপাইয়া পুরোওজন হহমাসী চলন সহী

দস্তখত পাইয়া আত্মবিক্রয় হইলাম আপনে লওয়াজিমা খোরাক পোষাক দিয়া মুদ্দত ৭০ সত্তরি বরিষ দাসী অথ কন্যা দানবিক্রীয়াধিকারী হইয়া করাইতে রহ জদি এই মুদ্দত মৈদ্ধে আচান হইতে চাহি তবে ১০ সোয়ামণ হলদি সিধা দিয়া আচান হইব এই করারে আত্মবিক্রয় হইলাম ইতি সন ১১৯৫ এগার শত পাচানবৈ শাল তেরিখ ১৪ চৌদ্দহ মাহে অগ্রহায়ণ।

ইহা পাঠ করিলে, তৎকালিক ভাষা, লিখন-প্রণালী, দেশের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়।

স্মৃতিকথিত পঞ্চদশ প্রকারের দাসের মধ্যে আত্ম ও সন্তান-বিক্রয় দ্বারা দাসত্ব-অঙ্গীকারের প্রথা প্রতিপন্ন হইতেছে।

কুঞ্জমালা, সধবা কি বিধবা, তাহা প্রকাশ নাই, সম্ভবতঃ বিধবা। যদিও দলীলে স্পষ্টভাবে মৃত লেখা হয় নাই, তথাপি লিখনভঙ্গীতে বিধবা বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। সংসারে তাহাকে অন্ন-বস্ত্র দিয়া রক্ষা করে, কি ভরণ-পোষণ করে এমন কেহ নাই, দারিদ্র্যনিবন্ধন তিনটি টাকা পাইয়া, সপ্তম-বর্ষীয়া কন্যাসহ আত্মবিক্রীত হইল, সত্তর বৎসরের জন্য আত্মবিক্রয়, তখন তাহার বয়স ২৭ সাতাইশ বৎসর, সুতরাং এই আত্মবিক্রয় চিরকালের তরেই, বুঝিতে হইবে। "সোয়ামণ হলদি সিধা" দিয়া মোচন হওয়ার যে ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা যে কখনও কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে এরূপ মনে করা যায় না। আর "সোয়ামণ হলুদের" ব্যবস্থাই বা কেন? হলুদ কি তখন দুর্মূল্য বা দুষ্প্রাপ্য ছিল? না—বর্ণের সাম্যবশতঃ যেমন স্বর্ণের স্থানে অনেক ব্যাপারে হলুদের প্রতিনিধিত্বই পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইত, তজ্জন্যই হলুদের ব্যবস্থা? কুঞ্জমালা ও তাহার কন্যা মহামায়া যে কখনও স্বাধীনতালাভ করিয়াছিল বা পরিণামে তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই।

বলিতে ভুলিয়াছি যে, সন্ধান অপর একখানা দলীল-পাঠে দেখা যায়,—কুঞ্জমালার এক "ভাসুর" রামরামই জীবিত ছিল, এবং এই আত্মবিক্রয়ে তাহার সম্মতি ছিল।

সেই দলীলখানা এই :—

শ্রীদুর্গা :—

শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ—

সাকিন চাকসি সুচরিতেষু—

শ্রীরামদাস দাস সাকিম বটোড়—

পরগণে বাঙ্গরোড়া অস্য লিখনং আগে

শ্রীমতী কুষ্ণমালা জওজে রামকান্ত সাকিন পিপীলাকাটি পরগণে আলিঅলপুর এবং ওহার কন্যা শ্রীমতী মহামায়া এই দুইজন সেইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার স্থানে আত্মবিক্রয় হইল এহার দর দুইজনাকে আমি আনিয়া দিলাম এহার ভাসুর শ্রীরাম রামতে হুজ্জৎ করেন, দুই তঙ্কা আমি নিলাম এহার নাম কওলায় লিখাইয়া দিব যদি না লিখাইয়া দিতে পারি তবে এই তঙ্কা কিছু খেসারত আপনার হতে দাহার দিব ইতি সন ১১৯৫ তেরিখ ১৪ অগ্রহায়ণ।" *

[illegible]

এইটি দলিলের রসীদ, কুষ্ণমালা যে তিনটাকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা হইতেই কি এই দালাল দুই টাকা পাইল। তবে আর এই রসীদের প্রয়োজন কি ছিল? অথচ কুষ্ণমালা এই বহাদের তিনটি টাকার কি ব্যবহার করিল, তাহা বুঝাযাইতেছে না।

এই স্বীকার-পত্রী বা রসীদ-পাঠে ইহাও বুঝা যায় যে, এই প্রকার আত্ম-বিক্রয়, বা দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় তৎকালে সমাজে প্রচলিত ছিল; সমাজে ঘৃণিত হইবার বা রাজদ্বারে কি দণ্ডাদিকরণে দণ্ডের আশঙ্কা থাকিলে এই প্রকার দলীল-সম্পাদন সম্ভবপর হইত না। তবে, দালালি বা আড়কাঠির কৃপায় কোন রমণী কাহারও গৃহে দাস-বৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হইলে, পরে যদি তাহার আত্মীয় কেহ অভিভাবকস্বরূপে সেই রমণীর উদ্ধারের জন্য রাজদ্বারে বা সমাজে প্রার্থী হইত তবে তাহাকে মুক্তি প্রদান করিতে হইত। নচেৎ ক্রেতা ন্যায়ভূষণ মহাশয়, কুষ্ণমালার ভাসুর রাম রামতের সম্মতির জন্য এত ব্যগ্র হইবেন কেন? এবং দালাল রাম রাম দাসই বা কেন "খেসারত দিবা" করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে?

খৃঃ ১৮৩০ অব্দে দণ্ডবিধি বিধিবদ্ধ হয়, দণ্ডবিধির পূর্ব্বে এই প্রথা অব্যাহত-ভাবে প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্যদেশের দাসত্ব ও আলোচ্য কালে এ দেশের দাসত্বপ্রথার বিলক্ষণ পার্থক্য আছে।

A slave is a creature without any right or status whatever, who is, or may become, the property of another as a mere chattel, the owner having absolute power of disposal by sale, gift or otherwise

over the slave without being responsible to any legal authority. In *the east there is a modified kind of slavery*, for children are purchased from their parents or strangers and are brought up as domestic servants, having little or no personal liberty conceded to them and though they are not ordinarily sold, yet they are transferred from one member of a family to another, by way of gift.

Sec. 370l. P. C. 39 and 40 Vict. Ch. 46.

পাশ্চাত্য দেশে দাসের সংজ্ঞা এই :—

দাসের কোন প্রকারের স্বত্ব বা অধিকার নাই, জড়পদার্থ ও পশ্বাদির ন্যায় দাস-স্বামীর সম্পত্তি? স্বামীর ইচ্ছানুসারে দাস দান-বিক্রয় ইত্যাদি দ্বারা হস্তান্তরিত হইতে পারে, এবং স্বামী তাহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন (এক সময়ে দাসকে হত্যা করিলেও স্বামী রাজদ্বারে দণ্ডিত হইত না)।

প্রাচ্যে দাসত্বের আকৃতি অন্য প্রকারের। পিতামাতা কি অপর অপর কোন ব্যক্তি হইতে শিশু ক্রীত হইয়া গৃহকার্য্যে নিয়োজিত হইত, এবং ক্রীত ব্যক্তিদিগের কোন প্রকারের স্বাধীনতা ছিল না। যদিও সচরাচর দাস-দাসী বিক্রয় হইত না, কিন্তু পরিবারস্থ এক ব্যক্তি অপরকে কি আত্মীয়-স্বজনকে দাস-দাসী দান করিতে পারিত। দণ্ডবিধি আইনের ৩৭০ ধারার নিয়ম এই :—

Whoever imports, exports, removes, buys, sells or disposes of any person as a slave or accepts, receives or detains against his will, any person as a slave, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

"যে ব্যক্তি অপর কেহকে দাসস্বরূপে আমদানী রপ্তানি, স্থানান্তর, ক্রয়-বিক্রয় অথবা অন্য প্রকারে হস্তান্তর করে অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহকে দাসস্বরূপে গ্রহণ বা আবদ্ধ করে, তাহার ৭ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কি বিনাশ্রমে কারাবাস এবং অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।"

এই বিধানই অস্মদ্দেশে দাসত্বপ্রথার মূলোৎপাটন জন্য বিহিত হইয়াছিল।

বিশ্বপ্রেমিক টমাস্ ক্লার্কসন ও উইলিয়াম উইলবারফোর্ডের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে দাস-ব্যবসায় নিবারণ জন্য এক সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্রায় বিশ বৎসর পরে উক্ত মহানুভবদিগের আন্দোলনে ও চেষ্টায় ১৮০৭ খৃঃ অব্দে পার্লামেণ্টে দাসব্যবসায় রহিত জন্য আইন বিধিবদ্ধ হয়। যুগপৎ
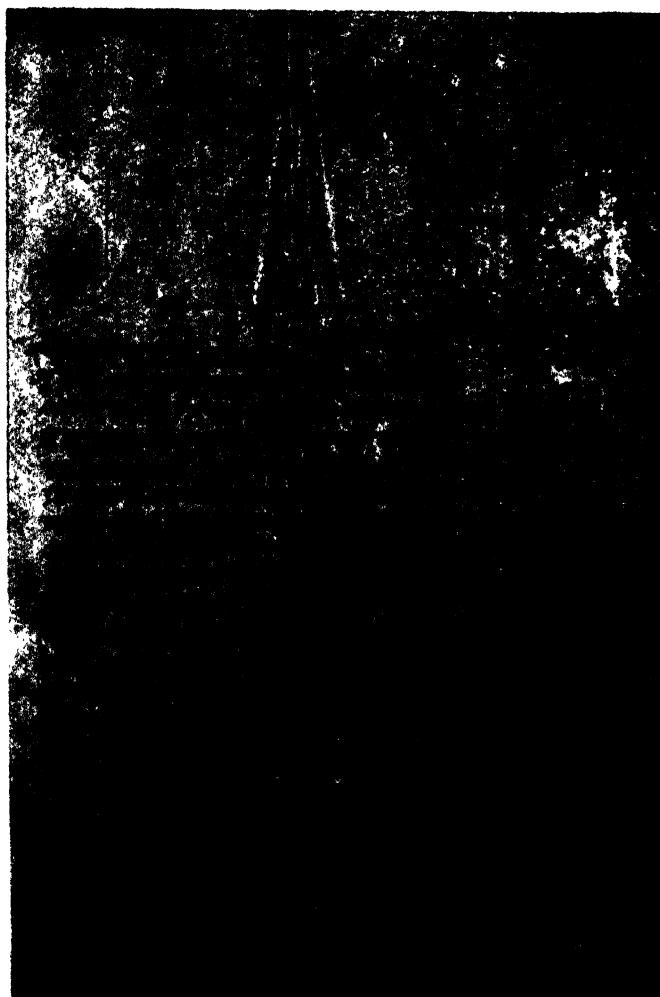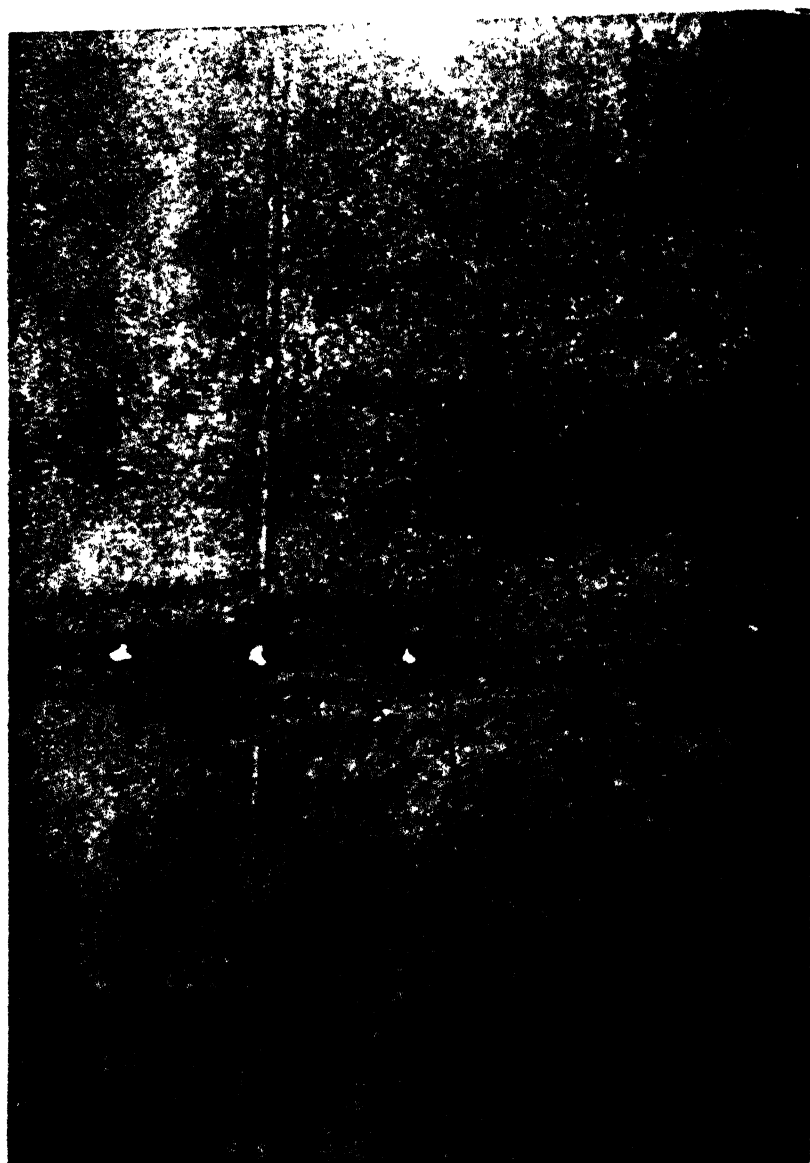
স্বাধীনতার লীলাভূমি ইংলণ্ডেই বিশ বৎসরের বৈধ আন্দোলনে, এই অযন্ত দাস-ব্যবসায় উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে রহিত হইল; আর এই দেশে এবম্বিধ কুপ্রথা নিবারণ জন্য কত বৎসরের আন্দোলন প্রয়োজন, তাহা আপনারা ভাবিয়া দেখিবেন।

তারপর, ক্রীতদাসগণকে স্বাধীনতা-প্রদানের চেষ্টা। কেবল সেইদিন অর্থাৎ ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে "মুক্তি আইন" (Emancipation Act) দ্বারা ব্রিটিস সাম্রাজ্যের দাসগণ স্বাধীনতা লাভ করে, এবং দাস-স্বামীদিগকে ২০,০০০,০০০, পাউণ্ড মুদ্রা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

ইয়ুরোপের ও এসিয়ার কোনও কোনও দেশে, প্রকাশ্য বাজারে, অপরাপর পণ্য-দ্রব্যের ন্যায় দাস-দাসী-ক্রয়বিক্রয় হইত, যৌবন ও রূপলাবণ্যসম্পন্না দাসীগণ ভাগ্যবশতঃ কখন কখন ক্রেতার পত্নীত্বে বা উপপত্নীত্বেও পরিগৃহীতা হইত, ক্রীতদাসীর ভাগ্যে কখন রাজসম্মানও ঘটিয়াছে এবং ক্রীতদাসগণ রাজ-সভায় সম্মান ও খ্যাতি লাভ করিত, ইহার সাক্ষ্য ইতিহাসে দুর্লভ নহে।

আলোচ্য দলীল-সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রথমে অর্থনীতির কথা। আমরা দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি। জীবন-সংগ্রাম কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে। কিন্তু, একশত কি একশত পঁচিশবৎসর পূর্ব্বে তিন টাকা পাইয়া মা ও কন্যা আত্মবিক্রীতা হইল, সোয়ামণ হলদি সিধা দিতে পারিলে সত্তর বৎসরের দাসত্ব বিমোচন হইবে, এ প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

প্রায় ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে এই দলীল লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং ইংরেজ অধিকারে, অবাধ বাণিজ্য ও বৈদেশিক শাসননিবন্ধন অর্থের বহির্ম্মুখিনী গতি সত্বেও ভারতবাসী দরিদ্র হইতেছে কিনা, অর্থনীতিবিদ্ এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

দ্বিতীয় ভাষার কথা :—

ধর্ম্মাধিকরণে ও ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত সাহিত্যে যদিও অদ্যাপি বহু পারসিক ও উর্দ্দু শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে, আজকালকার দলীল পত্রের ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে শব্দ বিবর্জ্জিত।

'ওলদে', 'ওমর', 'জওজে', 'আজিজ', 'রাজিরকবতে', 'আক্রে', 'বহালতবিরতে', 'বহায়', 'সহমানী', 'দস্তবদস্ত', 'লওয়াজিমা', 'মুক্ত', 'সিধা', 'কয়ার'; ইত্যাদি শব্দ অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তবে, হয়ত একখানি সামান্য দলিলে এতা-

ধিক অর্থ্ব ভাবোৎপন্ন শব্দ আজকাল পরিলক্ষিত হইবে না। তখন যে বাঙ্গালা ভাষার কোন ব্যাকরণ সংকলিত বা তাহার শাসন সুপ্রতিষ্ঠ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত।

"এত না আছে" "যদি না লিখাইয়া দিতে না পারি" ইত্যাদি কথা যে ব্যাকরণ শাসনাতীত, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বাঙ্গলা অক্ষরের ক্রমবিকাশের পর্য্যায় এই দুইখানি দলীলে বিশেষভাবে দেখিতে পাইবেন। সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সভ্য, পণ্ডিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত থাকিলে তাঁহার গবেষণার ফল আমরা উপভোগ করিতে পারিতাম, দেবনাগর ও প্রাকৃত অক্ষর হইতে বর্ত্তমান বঙ্গের বর্ণমালার বিবর্দ্ধনও বুঝিতে পারিতাম। একশত কি দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের লিখিত একখানি সামান্য লিপির পাঠোদ্ধার করিতে আমরা এই শাখা পরিষদের সভ্যগণ সমর্থ হই নাই। আমাদের সম্পাদক মহাশয়ের একজন প্রাচীন কর্ম্মচারী, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাসগুপ্ত মহাশয়ের সাহায্যে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছি। একশত বৎসরে বঙ্গাক্ষরেরও বা কত পরিবর্ত্তন!

অা, কু, ক্র, হ, ম্র, শ্রী, ঙ্ক, স্র, ত্ব, ই, দ্র, দে, মং, ন্দ প্রভৃতি লিখন-প্রণালী বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য।

কীটপতঙ্গ ও সাধারণতঃ জল-বাহুল্য গ্রীষ্মপ্রধানদেশের একটি বিশেষ লক্ষণ, কীটপতঙ্গের কৃপায় ও জলবায়ুর গুণে, এই ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন লিপি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ভারতের ইতিহাস ক্রমশঃ যে তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঠিক ইতিহাস বেশী না থাকিলেও, ইতিহাস-সঙ্কলনোপযোগী দ্রব্যসম্ভারের অভাব ছিল না। কত প্রাচীন দলীল, পুঁথি ইত্যাদি যে কীটপতঙ্গ কর্ত্তৃক বিনষ্ট ও বায়ুর আর্দ্রতায় (humidity) ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? যদিও অতি প্রাচীনকাল হইতে কাগজের ব্যবহার এদেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহার স্থায়িত্বে সন্দিহান হইয়া কি প্রাচীনেরা তাম্রফলক, প্রস্তরফলক ও শিলালিপি প্রভৃতির আশ্রয় লইয়াছিলেন? আর সেই "কাগজ" দৃঢ় ও বহুকালস্থায়ী করিবার জন্যই বা কত আয়োজন। কাগজ "তুলোট" করার প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইতেছে, কিন্তু এই তুলোট করার নিয়ম পিতৃপিতামহগণ অবগত ছিলেন বলিয়াই আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের মনস্বিতা ও চিন্তাশীলতার ফল উপভোগ করিতেছি; নচেৎ আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য কলজাত কাগজ ব্যবহৃত হইলেই কীটপতঙ্গের দংশন ও বায়ুর আর্দ্রতা সহ্য করিয়া সে কাগজ কিছুতেই

টিকিতে পারিত না। এই দলীল দুইখানি তুলোট কাগজে লিখিত না হইলেও এই বাখরগঞ্জোৎপন্ন নারকুলি বা পেসি কাগজে লিখিত বলিয়া এতদিনেও নষ্ট হইয়া যায় নাই।

উপসংহারে পরিষদের সভ্য ও অন্যান্য সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের নিকট আমার এই অনুরোধ যে, প্রাচীন দলিল ও কাগজাদি আপনাদের নয়নপথের পথিক হইলে কদাচ যেন উপেক্ষিত না হয়। তাহাদের মধ্যে ভারতের ইতিহাসের উপাদান নানাভাবে বিক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, এবং সেই সমস্ত উপাদান সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইলে, এই ইতিহাস-শূন্যদেশেও ইতিহাসের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত।

তন্ত্র-পরিচয়।

তারাতন্ত্রম্।

তন্ত্র-সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত হইবার যোগ্য। তাহা যথাক্রমে মূল-গ্রন্থ, নিবন্ধ-পুস্তক ও টীকাটিপ্পনী নামে কথিত হইতে পারে। অনেক গ্রন্থ আধুনিক হইলেও, সকল গ্রন্থ আধুনিক নহে। যাহা পুরাতন, তাহা নানা ঐতিহাসিক তথ্যের আধার

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, পুরাতন সংস্কৃত পুঁথীর বিবরণে (১) তন্ত্র-সাহিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—"শিবকেই সকল স্থলে তন্ত্র-গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। তিনি তাঁহার 'প্রিয়তমার' (পার্ব্বতীর) প্রশ্নে অল্পে অল্পে গুপ্ত-সাধন-রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। কচিৎ হরপার্ব্বতীর স্থলে শিবানুচর ভৈরবের ও তাঁহার প্রিয়তমা ভৈরবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।"

সর্ব্বত্রই এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কোনও কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—পার্ব্বতী বলিয়াছেন, শিব শ্রবণ করিয়াছেন। কোনও কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—ভৈরবী বলিয়াছেন, ভৈরব শ্রবণ করিয়াছেন। আবার কোনও কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—

---

(১) Notices of Sanskrita Manuscripts. Second Series, Vol. I.

শিব বলিয়াছেন, আর শ্রবণ করিয়াছেন হয় নারদ, না হয় কার্ত্তিকেয়, না হয় ব্রহ্ম-ভৈরব।

পুরাণের ন্যায় তন্ত্রেরও কতকগুলি "লক্ষণ" সুপরিচিত ছিল। তন্ত্রের বর্ণনীয় বিষয় কি কি ছিল, "লক্ষণে"র সাহায্যে তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এখন আর সম্পূর্ণ-লক্ষণাক্রান্ত তন্ত্র-গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। লক্ষণগুলি বারাহী-তন্ত্রে উল্লিখিত আছে। (২)

মূলগ্রন্থের সংখ্যা চতুঃষষ্টি বলিয়া [সময়াচার-তন্ত্রে] উল্লিখিত। তদ্ভিন্ন আটখানি "যামল", তিনখানি "ডামর" ও অসংখ্য "উপতন্ত্র"ও মূল-গ্রন্থের অন্তর্গত। এখন অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা আছে, তাহাও সমগ্র গ্রন্থ কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়ের অভাব নাই। এখন যে সকল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একটি বিপুল সাহিত্যের একাংশমাত্র।

বেদমন্ত্রের ন্যায় তন্ত্রও এক সময়ে শ্রুতি-রূপেই প্রচলিত ছিল। বেদমন্ত্রের ন্যায় তন্ত্রও উত্তরকালে গ্রন্থনিবদ্ধ হইয়াছিল। এই জনশ্রুতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। কুল্লূকভট্ট ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।"

এখন যে সকল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ভাষা ও রচনা-রীতি সমধিক পুরাকালের পরিচয় প্রদান করিতে পারে না। তন্ত্র-সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃত হইলেও, বহু পুরাকালের ভাষা বলিয়া কথিত হইতে পারে না। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রি মহাশয় লিখিয়াছেন,—"তন্ত্রের ভাষা ব্যাকরণ-দুষ্ট; কোনও কোনও স্থলে বিলক্ষণ উদ্বেগজনক"। কিন্তু রাঘবভট্ট, পদ্মসিংহ প্রভৃতি টীকাকারগণের টীকাটিপ্পনীতে দেখিতে পাওয়া যায়,—তন্ত্রের ভাষা ব্যাকরণ-দুষ্ট ছিল না। উত্তরকালের অল্পশিক্ষিত লিপিকরের অত্যাচারে অনেক ভ্রমপ্রমাদ প্রবেশলাভ করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

ক্রিয়া-কর্ম্মের উপদেশ মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইলে, অনায়াসলভ্য হইতে পারে। কিন্তু জন-সাধারণের বিশ্বাস, তাহাতে গ্রন্থ মাহাত্ম্য-বিচ্যুত হয়। তজ্জন্য মুদ্রিত তন্ত্রগ্রন্থ শ্রদ্ধালাভ করিতে পারে নাই। অধিকাংশ মুদ্রিত গ্রন্থ যে ভাবে মুদ্রিত, তাহাতে তাহা বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া খ্যাতিলাভ

(২) শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ অনুগ্রহ করিয়া বারাহীতন্ত্রের এক পুথী পাঠাইয়া দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

করিতে পারে না। অগত্যা হস্তলিখিত গ্রন্থের সমাদর ক্ষুণ্ণ নাই। কিন্তু উত্তরকালের হস্তলিখিত গ্রন্থের অবস্থাও মুদ্রিত গ্রন্থের অনুরূপ। সুতরাং পুরাতন গ্রন্থ না পাইলে, এবং এক গ্রন্থের একাধিক পুঁথী না পাইলে, তন্ত্র-সাহিত্যের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চেষ্টায় অনেক পুরাতন তন্ত্রগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। তাহা প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালীর ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব রহস্য প্রকাশিত হইতে পারিবে। "গৌড়গ্রন্থমালা"র প্রথম সংখ্যারূপে তারাতন্ত্রের মুদ্রাঙ্কন আরব্ধ হইয়াছে। তাহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থের মূল ও পাঠান্তর অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক সযত্নে সঙ্কলিত হইয়াছে।

তারা মহাবিদ্যা। তারাতন্ত্রে তাঁহারই উপাসনা-পদ্ধতি বিবৃত রহিয়াছে। তাহা অদীক্ষিতের নিকট অবক্তব্য গুহ্যতত্ত্বে পরিপূর্ণ বলিয়া, মূলগ্রন্থ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। অনুসন্ধান-সমিতি চারিখানি পুঁথীর উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থমুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহার শ্লোক-সংখ্যা ১৫০ মাত্র। কিন্তু বারাহী-তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,—তারাতন্ত্র মহাতন্ত্র,—তাহার শ্লোক-সংখ্যা দ্বাদশ সহস্রেরও অধিক ছিল। এখন আর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের সন্ধানলাভের সম্ভাবনা নাই। যে পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, এখন তাহাই অবলম্বনীয়।

প্রথম পটলে ভৈরবীর প্রথম প্রশ্নে জানিতে পারা যায়,—মহেশ্বর তাঁহার প্রিয়তমার নিকটেও সহসা সকল রহস্য ব্যক্ত করেন নাই। একবার মহেশ্বর কেবল প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন,—বুদ্ধ ও বশিষ্ঠও "কুলভৈরব" ছিলেন। বুদ্ধ এবং বশিষ্ঠও তান্ত্রিক সাধক ছিলেন শুনিয়া, পার্ব্বতী কৌতূহলাবিষ্টা হইয়াছিলেন। সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার আশায়, [তারাতন্ত্রের আরম্ভে] পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—বুদ্ধ এবং বশিষ্ঠ যে "কুলভৈরব" ছিলেন, তাহা শুনিয়াছি ; তাঁহারা কোন্ মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাই এখন শুনিতে ইচ্ছা করি। এইরূপে তারাতন্ত্রের আরম্ভ।

সেই গুপ্তমন্ত্রের উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, ভৈরব যথাযোগ্য সাবধানতার সহিত বলিয়াছেন,—"সে মন্ত্র তারার মন্ত্র। তাহা বুদ্ধের বহুপূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল। তাহার সাধনা করিয়া সদাশিব সর্ব্বেশ হইয়াছিলেন ; দুর্ব্বাসা এবং ব্যাস-বাল্মীকি-ভারদ্বাজাদি কবি হইয়াছিলেন ; ভীমসেন এবং অর্জ্জুনাদি রণজয়ী হইয়াছিলেন।"

• তারাতন্ত্রে এই মন্ত্রের সাধনার সকল কথা বিস্তৃতরূপে উল্লিখিত হয় নাই।

হয় ত যে অংশ লুপ্ত হইয়া গয়াছে, তাহাতেই বিস্তৃত উপদেশ সন্নিবিষ্ট ছিল। এখন যাহা আছে, তাহা বুঝিতে হইলে, নানা গ্রন্থের ও গুরূপদেশের শরণাপন্ন হইতে হয়। এই মন্ত্রের সাধনা এখনও প্রচলিত আছে। তারা-সাধনার বহু গ্রন্থের সন্ধান লাভ করা যায়। তাহাতেই মনে হয়, পুরাকালে তারার আরাধনা এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে সর্ব্বলোকপ্রিয় বলিয়া দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ তুল্যভাবেই তারার আরাধনা করিতেন। বৌদ্ধ উপাসক এখন আর এ দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না।

লম্বোদরের পৌত্র, কমলাকরের পুত্র, শঙ্কর নামক আচার্য্য "বাসনাতত্ত্ব-বোধিনী" নাম্নী পুস্তিকার রচনা করিয়া, তারা-পূজার অনেক উপদেশ একত্র সঙ্কলিত করিয়া গিয়াছেন। তাহা "তারারহস্যবৃত্তিকা" নামেই সুপরিচিত। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে ভগবৎপাদশ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও তন্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া উল্লিখিত। "প্রপঞ্চসার" নামক গ্রন্থ তাঁহারই লেখনীপ্রসূত বলিয়া পরিচিত।(৩)

মহাযান-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ তারার আরাধনা করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যেরূপ মূর্ত্তির পূজা করিতেন, এবং হিন্দুগণ যেরূপ মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন, এতদুভয়ের মধ্যে মূল বিষয়েও বিলক্ষণ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ সময় হইতে পার্থক্য প্রচলিত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় করিবার উপায় নাই। অনেক কারণে মনে হয়,—এই পার্থক্য উত্তরকালে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। আজকাল হিন্দুগণ তারার মূর্ত্তি যে ভাবে নির্ম্মাণ করাইয়া আসিতেছেন, সেরূপ প্রাচীন মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। তারার যে সকল প্রাচীন মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়াই কথিত হইতেছে। কিন্তু সকল মূর্ত্তি বৌদ্ধমূর্ত্তি কি না, তাহাতে সংশয়ের অভাব নাই।

তারাতন্ত্রের যে ছয়টিমাত্র পটল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তারার ধ্যান উল্লিখিত নাই। অথচ পরবর্ত্তী গ্রন্থে তারার ধ্যান উল্লিখিত আছে। তাহার সহিত বুদ্ধোপাসিতা তারামূর্ত্তির সামঞ্জস্য নাই। হিন্দু উপাসক সমাজে যে ধ্যান প্রচলিত আছে, তদনুসারে তারা প্রত্যালীঢ়পদা, মুণ্ডমালা-বিভূষিতা, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতা, চতুর্ভুজা, খর্ব্বা, লম্বোদরী। এই ধ্যান রুদ্রযামলে উল্লিখিত আছে; বাসনাতত্ত্ব-বোধিনীতে তদনুরূপ ধ্যেয়-রূপের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু

---

(৩) এই দুর্লভ গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। যিনি মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাঁহার উদ্যোগেই "প্রপঞ্চসারে"র মূল মুদ্রিত হইতেছে।

তাহাতে কয়েকটি অতিরিক্ত বর্ণনাও স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে সর্পালঙ্কারের কথা আছে, অস্থিমালার কথা আছে, ললাট-পট্টিকার কথা আছে।

বুদ্ধোপাসিতা তারামূর্ত্তির মস্তকে অক্ষোভ্য-মূর্ত্তি যোগাসনে উপবিষ্ট। তারা-তন্ত্রেও অক্ষোভ্যের উল্লেখ আছে। রুদ্রযামলোক্ত ধ্যানে মৌলিমধ্যে অক্ষোভ্যেরও ধ্যান করিবার উপদেশ আছে। হিন্দুগণ এখন যে মূর্ত্তির উপাসনা করেন, তাহার মস্তকে অক্ষোভ্যমূর্ত্তি নাই;—তৎপরিবর্ত্তে সর্প বিরাজমান। "মহানীল-তন্ত্রে" অক্ষোভ্য "নাগরূপধর" বলিয়া উল্লিখিত। কোন্ সময় হইতে কি কারণে মূর্ত্তিনির্ম্মাণে এই সকল পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতির একটি জটিল প্রশ্ন।

আরও একটি জটিল প্রশ্ন আছে। তারার উপাসকগণকে বিষ্ণুরও উপাসনা করিতে হইত। এখন যে সকল পুরাতন বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা অনেক সময়ে তারামূর্ত্তির সঙ্গে এক স্থানে আবিষ্কৃত হইলেও, বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলি হিন্দুমূর্ত্তি এবং তারামূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়াই কথিত হইতেছে। যাদুঘরে আসিয়া, মূর্ত্তিগুলিও বিভিন্ন কক্ষে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে। সকল বিষ্ণুমূর্ত্তিই হিন্দুমূর্ত্তি কি না, এবং সকল তারামূর্ত্তিই বৌদ্ধমূর্ত্তি কি না, তাহার তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন এখনও অনুভূত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করায়, আমাদের অনুসন্ধান-চেষ্টা পরপদাঙ্কানুসরণ পুরাতন পথেই প্রধাবিত হইতেছে।

তারা-পূজা কিরূপে প্রচলিত হইয়াছিল, "তারাতন্ত্রে" তাহার উল্লেখ না থাকিলেও, "রুদ্রযামলে" ও "ব্রহ্মযামলে" তাহা উল্লিখিত আছে। সে আখ্যায়িকা কৌতূহলপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। তাহা এইরূপ:—

ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ বহু সহস্র বৎসর যোগসাধন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, পিতার নিকট আসিয়া অন্য মন্ত্র-গ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে মন্ত্রত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। "রুদ্রযামলে" দেখিতে পাওয়া যায়,—ব্রহ্মা আরও বলিয়াছিলেন যে, তারা সংসারার্ণবতারিণী,—শক্তিচক্রপ্রবর্ত্তিকা,—শুদ্ধচীনাচাররতা—অথর্ব্ববেদশাখিনী,—বুদ্ধেশ্বরী। যথা,—

> শুদ্ধচীনাচাররতা শক্তিচক্রপ্রবর্ত্তিকা।
> অনন্তানন্তমহিমা সংসারার্ণবতারিণী।
> বুদ্ধেশ্বরী বুদ্ধিরূপা অথর্ব্ববেদশাখিনী।

তারা বুদ্ধেশ্বরী—তারা অথর্ব্ববেদশাখিনী—এই দুইটি কথা "ব্রহ্মযামলে"

দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উভয় "যামলেই" দেখিতে পাওয়া যায়,—পিতার উপদেশে বশিষ্ঠ পুনরায় যোগমার্গে সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বশিষ্ঠ কোথায় যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে উভয় "যামলে" কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। "রুদ্রযামলে"র মতে, বশিষ্ঠ যোগসাধনের জন্য সমুদ্রতীরে গমন করিয়াছিলেন। যথা,—

> এতচ্ছ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
> জগাম উদধেস্তীরে বশী বেদস্মৃবিৎ শুচিঃ॥

"ব্রহ্মযামলে" সমুদ্রতীরের উল্লেখ নাই; তাহাতে "কামাখ্যা"র নাম উল্লিখিত আছে। যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার অভীষ্ট দেবতা তারাকে অভিশাপ প্রদান করায়, দেবী আবির্ভূতা হইয়া, মহাচীনে গিয়া বুদ্ধদেবের নিকট উপদেশ-গ্রহণের আদেশ দিয়া, অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। মহাচীন হিমালয়ের পার্শ্বদেশে। তথায় গিয়া বশিষ্ঠ দেখিলেন,—

> রণচ্ছদনরাগেণ রূপযৌবনশালিনা
> মদিরামোদচিত্তেন বিলাসোল্লসিতেন চ।
> শৃঙ্গাররসবেশেন কণাঙ্কুচনকর্ণিণা
> ভয়লজ্জাবিহীনেন দেবং ধ্যানপরেণ চ॥
> কামিনীনাং সহস্রেণ পরিবারিতবিগ্রহম্।
> মদিরাপানসংক্রান্ত-মন্দমন্দাবলোকনম্॥

বিস্ময়ে সংশয়ে অভিভূত হইয়া, বশিষ্ঠ দেখিলেন,—ভগবান্ বুদ্ধদেব কামিনী-সহস্র-পরিবৃত,—মদিরাপান-সংক্রান্ত-মন্দমন্দাবলোকন,—পঞ্চমকার-সাধনতৎপর। ক্রমে বুদ্ধদেবের কৃপায়, পঞ্চতত্ত্বের উপাসনায় দীক্ষিত হইয়া, বশিষ্ঠও তারামন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিলেন।

বৌদ্ধাচার ভিন্ন তারামন্ত্রে সিদ্ধিলাভের উপায় নাই, ইহা সর্ব্বতন্ত্রেই স্বীকৃত। সুতরাং তারাপূজার সঙ্গে বৌদ্ধাচার ও বৌদ্ধপ্রভাব মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তারাপূজার কোনও কোনও ক্ষেত্রে হিন্দুগণও তারাকে "প্রজ্ঞাপারমিতা" বলিয়া স্তবস্তুতি করিয়া আসিতেছেন। ইহার মধ্যে বাঙ্গালীর ইতিহাসের যে সকল তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহা এখনও যথাযোগ্যভাবে আলোচিত হয় নাই। সুতরাং, যাঁহারা বাঙ্গালীর ইতিহাস লিখিবেন, তাঁহাদিগকে তন্ত্র-সাহিত্যের আলোচনায় লিপ্ত হইতে হইবে। তাহার প্রধান অন্তরায়—গ্রন্থাভাব। এখনও বহু গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে; কিন্তু এখন আর তাহার অধ্যয়ন-অধ্যা-

পনা পূর্ব্ববৎ প্রচলিত নাই। তাহাতেই বিশুদ্ধ পাঠ নানা প্রকারে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। বহুসংখ্যক হস্তলিখিত পুস্তকের সাহায্যে উপযুক্ত ব্যক্তির চেষ্টায় মূল গ্রন্থাদি প্রকাশিত না হইলে, ঐতিহাসিক আলোচনা পরিচালিত হইতে পারে না। তাহার অভাবে মূর্ত্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালীর গ্রন্থে ও প্রবন্ধে কত কল্পনা জল্পনা প্রশ্রয় লাভ করিতেছে, কখনও কখনও কোনও কোনও লেখকের অনধিকার-চর্চ্চা কত কুতর্কজাল বিস্তৃত করিতেছে! বাঙ্গালীকে বুঝিতে হইলে, তন্ত্র সাহিত্য বুঝিতে হইবে;—বাঙ্গালীর ইতিহাস রচনা করিবার পূর্ব্বে, তন্ত্রসাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলিত করিতে হইবে। তাহা শ্রমসাধ্য,—ব্যয়সাধ্য,—অধ্যবসায়সাধ্য।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

স্মৃতি-পূজা।

আপনাদের কাছে যে প্রস্তাবটি সমর্থন করবার ভার আমার প্রতি অর্পিত হয়েছে, তা আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম যদিও আমার মনে হয় যে ইহা যোগ্যতর হস্তে সমর্পিত হইলে ভাল হইত। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার যে আলাপ পরিচয় ছিল না, তা নয়। সভাসমিতি ও অন্যত্র মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইত—তাঁহার সঙ্গীত তাঁর নিজের কণ্ঠ হতে শুনে অনেক সময় মেতে উঠেছি। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ হয়; সে সময় তাঁকে ভালই দেখেছিলুম—তিনি তখন তাঁহার ভারতবর্ষ-প্রকাশের আয়োজনে উৎসাহিত ছিলেন। সে সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হল—কে মনে করেছিল যে, এই অল্পদিনের মধ্যে নিষ্ঠুর কাল এসে আমাদের কাছ থেকে তাঁকে হরণ করে নিয়ে যাবে? তাঁর সঙ্গে আমার যে পরিচয়, সে এই রকম ভাসা ভাসা,—তাঁকে ঘনিষ্ঠ ভাবে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার জানা ছিল না। তাঁর বাল্য-জীবন প্রৌঢ়-জীবনের বৃত্তান্ত সকল আমি অল্পই জানি—আর যা কিছু জানি, সে সব শোনা কথা; আর আপনারা জানেন যে, শোনা কথা আদালতে গ্রাহ্য নয়। এই সকল কারণে আমি তাঁর জীবন-চিত্র আপনাদের সম্মুখে জলন্তভাবে ধারণ করতে পারব না—তাঁর জীবন-কাহিনীর নব নব ঘটনা ব'লে আপনাদের মনস্তুষ্টিসাধন করতে পারব না। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে—তাঁর জীবনের মূল্য শুধু ব্যক্তিগত নয়। তিনি যে তাঁর পরিবারের কিংবা

বন্ধুবর্গের নিজস্ব সম্পত্তি ছিলেন, তা নয়—তিনি আমাদের জাতীয় সম্পত্তি—তাতে আমাদের সাধারণ সকলেরই অধিকার—আমরা সকলেই সে সম্পত্তি উপভোগ করছি। তিনি আমাদের সাহিত্য-জগতের রাজা ছিলেন, আমরা তাঁর করদ প্রজা। তাঁর প্রতি যে কর্ত্তব্য-ভার, তা আমাদের সকলকেই অল্প বিস্তর বহন করতে হবে। তাই আমি আগ্রহসহকারে এই শোক-সভায় উপস্থিত হয়েছি, এবং উল্লিখিত প্রস্তাবটি এই সভায় উত্থাপন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

সেই মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষা কি উপায়ে হতে পারে—তার প্রকৃষ্ট উপায় কি, তাই আলোচনা করতে আমরা অদ্য এখানে সমবেত হয়েছি। তিনি আমাদের সকলকে যে অমূল্য দান দিয়ে গিয়েছেন, তার জন্য আমরা তাঁর নিকট চিরঋণী—সে ঋণ কখনই আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে পারব না। তাঁর অতুলনীয় হাসির গানে আমরা কত মজলিসে কত আমোদ পেয়েছি—তাঁর 'নন্দলাল', তাঁর Reformed Hindu শুনে অনেকে হয় ত মর্ম্মাহত হয়ে থাকবেন, কেন না, ইংরেজী প্রবচনের কথায় এই টুপিটি তাঁদের মাথায় ঠিক বসে; কিন্তু সে কশাঘাতে কারও গায়ে দাগ পড়ে না—তাহা মধুমাখা হাস্য-রসোদ্দীপক; সে কবিরাজের তিক্তবড়ী—পীড়ার উপশমই তার উদ্দেশ্য। তা ছাড়া তাঁর জাতীয় সঙ্গীত—'আমার জন্মভূমি', 'আমার দেশ' আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের শিরোভূষণ—বাঙ্গালীদের চিরসম্পদ। তাঁর কাছ থেকে আমরা যে এত উপকার পেয়েছি, তার প্রত্যুপকারের জন্য কি আমরা কিছুই করব না? যে জাতি তার বড়লোকদের মর্য্যাদা রক্ষা করতে জানে না, সে জাতি কখনই মহত্ত্ব-শিখরে পৌঁছিতে পারে না।

তাঁর স্মৃতিরক্ষার কি উপায়? তা ঠিক করবার আগে কত টাকা ওঠে, তা জানা আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ের ভুক্তভোগী, আমরা বেশ জানি,—স্মৃতিসভায় যে সকল লম্বা চৌড়া বক্তৃতা হয়, তা প্রায়ই হাওয়ায় উড়ে যায়, কাজে তার ফল কিছুই হয় না। অতএব আমাদের আশা-রশ্মিকে সংযত করা উচিত। ধরে নিতে হবে, আমাদের পুঁজি অল্পই, বড় জোর ১০০০০, তার বেশী প্রত্যাশা করা যায় না। দেখতে হবে, তার মধ্যে কি করা যেতে পারে? একটা কোনও স্থায়ী কাজ; এমন কাজ যা মনে করা যেতে পারে—দ্বিজেন্দ্রলাল উপস্থিত থাকলে তিনি নিজে সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করতেন। যে কার্য্যে তিনি স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন—যা তাঁর জীবনের

ব্রত, তার উন্নতিসাধনে যাতে সহায়তা হয়—বাঙ্গলা সাহিত্য-চর্চ্চার উত্তেজনা, বাঙ্গলা লেখকের পুরস্কার—এই রকম যা হয়, আপনারা স্থির করুন। এইরূপ একটা কোনও বিষয়ে আমাদের চাঁদার টাকা নিয়োগ করা তৈল-চিত্র বা মর্ম্মর-মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের চেয়ে আমার মতে শতগুণে প্রার্থনীয়।

এই বিষয় স্থির করবার জন্যে একটা কমিটী নিযুক্ত হোক্। কিন্তু আগে টাকাটা তোলবার জন্যে আপনারা সকলে সচেষ্ট হোন্। যিনি ধনী, তিনি মুক্তহস্তে আপনার ধনকোষ উন্মোচন করুন—যিনি নির্ধন, তিনিও যথাসাধ্য দান করে' এই ভাণ্ডার পূর্ণ করুন—নিশ্চয় আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এইরূপ কিছু করতে পারলে আমাদের ঋণ অল্পমাত্রায়ও পরিশোধিত হতে পারবে। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল যেখানেই থাকুন, আমাদের এই সাধু চেষ্টা দেখে প্রীত হবেন।

আসলে দেখতে গেলে এই সকল মহাত্মার স্মৃতিরক্ষণে কোনও বাহ্য আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই তাঁরা মৃত্যুঞ্জয় হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা যে সকল কীর্ত্তি রেখে গিয়েছেন, তাই তাঁদের জীবন, তাতেই পরবর্ত্তী লোকদিগের হৃদয়ে তাঁদের স্মৃতি জাগ্রত থাকবে। রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম—এঁদের কি কোনও পাষাণমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়েছে? অথচ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কি এঁদের নাম ধ্বনিত হয় না? আরও বলা যেতে পারে, মহাপুরুষদের সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণই তাঁদের স্মৃতিরক্ষা। দ্বিজেন্দ্রলাল যে চোখে স্বদেশকে দেখতেন, আমরাও যদি সেই চোখে দেখতে পারি—আমার জন্মভূমিকে 'আমার দেশ' জেনে দেশের কার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ করতে পারি—সেই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রকৃষ্ট সাধন।

আমি আরম্ভে বলেছি, দ্বিজুবাবুর জীবনবৃত্ত আমার অপরিজ্ঞাত। কিন্তু উপসংহারে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে' থাকতে পারছিনে। ঘটনাটি এই :—তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি দু একখানি পত্র লিখতে ব্যস্ত ছিলেন—তার মধ্যে আমার ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের নামে একটি পত্র। সেই লেখা সমাপ্ত হবার পরক্ষণেই যেন হঠাৎ তাঁর উপর বজ্রপাত হল—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—সেই তাঁর পীড়ার শেষ প্রকোপ, কাছে ভৃত্যবর্গ ছাড়া আর জনপ্রাণী ছিল না। তাঁর প্রিয়পুত্র মণ্টু—মণ্টু বলে তাকে না কি একবার ডেকেছিলেন, কিন্তু মণ্টু কোথায়! হায়, তিনি তাঁর শেষ দেখা দেখতে পেলেন না। তার পর যারা কাছে ছিল, তারা এসে তাঁর উপর ঘড়া ঘড়া

জল ঢালতে লাগল—জায়গাটা জলে জলময় হয়ে গেল—তাতে তাঁর প্রাণ রক্ষা হল না, শুধু ফল এই হল যে, তিনি যে লেখাগুলি লিখে গিয়েছিলেন, সব নষ্ট হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছিলেন, তার নামটি কেবল পড়বার মত ছিল—ভিতরকার কথাগুলো আর পাওয়া গেল না। এই দুই কবির মধ্যে কিছুকাল মতান্তর মনান্তর ঘটেছিল—এই পত্রই বুঝি বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলনের চেষ্টা—বিগ্রহের পর এই সন্ধিপত্র। কিন্তু তাঁর বাল্যবন্ধুর প্রতি উদ্দিষ্ট এই শেষ কথাগুলি চিরদিনের জন্যে কালসাগরে বিলীন হয়ে গেল, কি আপশোষ!*

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বিজেন্দ্রলাল।

উদার আঁধার মাঝে বিদ্যুতের মত
উঠেছিল ফুটে তব ক্ষিপ্র তীব্র হাসি
ঘনঘোর মেঘে ঘেরা দিগন্ত উদ্ভাসি।
দেখায়েছ বাহিরের উদারতা কত।
গভীর অরণ্য মাঝে ক্রন্দনের মত
উঠেছিল বেজে তব মর্ম—মন্দ্র বাণী
রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্তরে স্তরে বেদনা উচ্ছ্বাসি।
বুঝায়েছ অন্তরের গভীরতা কত।
সে আলো হারিয়ে গেছে এ দৃশ্য ভুবনে,
সে স্বর হারিয়ে গেছে এ স্পৃশ্য পবনে।
যে আলো দিয়েছ তুমি সবাকে বিলিয়ে,
যে স্বরে দিয়েছ তুমি ছায়াময়ী কায়া,
মনের আকাশে কভু যাবে না মিলিয়ে—
রহিবে সেথায় চির তার ধূপছায়া।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

---

* গত ৯ই শ্রাবণ কলিকাতার টাউন-হলে দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতিসভায় পঠিত।

৺নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

Bijoya Press, Calcutta.

৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ইউরোপে ফরাসী বিপ্লব-বাদের যুগ নাশের যুগ। যাহা কিছু পুরাতন, যাহা কিছু আদিম, তাহা নষ্ট করিবার জন্য,—নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিবার জন্যই—যেন ফরাসী বিপ্লববাদের যুগের অবতারণা হইয়াছিল। এই বিপ্লববাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। আধুনিক বিজ্ঞান বা পদার্থ-বিদ্যা বিশ্লেষণের বিদ্যা ; সকল সামগ্রী, প্রাকৃত সকল ঘটনা ছানিয়া ছাকিয়া, ঝাড়িয়া বাছিয়া, কাটিয়া খুলিয়া দেখিবার বিদ্যা। এই পদার্থ-বিদ্যা বা আধুনিক বিজ্ঞান বা সায়ান্সের দৃষ্টিতে পবিত্র বা অপবিত্র নাই ; উচ্চ, নীচ, হেয়, মান্য—কোনও বিচারই নাই। কোথায় কি হইতেছে, কেমন করিয়া কোন ঘটনা ঘটিতেছে, কোন নিয়মে পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি হইতেছে, তাহাই দেখাইয়া এবং বুঝাইয়া দিবার জন্যই যেন আধুনিক 'সায়ান্সে'র উদ্ভব হইয়াছে। ফরাসী বিপ্লব-বাদ বিজ্ঞানের এই বিশ্লেষণ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইউরোপের পুরাতন সমাজ-শরীরকে নষ্ট করিয়াছিল। Encyclopædist বা বিদ্যাবাগীশের দল এই বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রভাবে সামাজিক সকল ব্যাপারে মানুষের শ্রদ্ধা-বুদ্ধি নষ্ট করিয়াছিল। ডিডেরো (Diderot), ভল্টেয়ার, আবে সিয়ে (Abbe Syies) প্রমুখ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী মনীষিগণ বিজ্ঞানের এই কঠোর বিশ্লেষণ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ফরাসী দেশে নাস্তিকতার প্রাধান্য প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই অশ্রদ্ধা বা নাস্তিকতার বেদীর উপরে ফরাসী বিপ্লব-বাদ প্রতিষ্ঠিত।

বঙ্গদেশে, ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠার পরে যে ইংরেজী শিক্ষা ও বিদ্যার প্রচলন হইয়াছিল, তাহা ফরাসী বিপ্লব-বাদের সকল-সিদ্ধান্ত-সমন্বিত বিদ্যা ও শিক্ষা। ইংরেজ বাহুবলে ফরাসী বিপ্লববাদীদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন বটে, বিপ্লব-বাদের অবতার নেপোলিয়নকে ওয়াটারলুর যুদ্ধে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন বটে, পরন্তু ঐ বিপ্লববাদের প্রভাব হইতে ইংলণ্ডের সাহিত্য এবং সমাজকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। ফক্স, গ্রে, উইওহাম হইতে কাউপার, বায়রণ, কোল্‌রিজ, ডি-কুইন্সী, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ পর্য্যন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগের ইংরেজ কবি ও লেখকমাত্রই ফরাসী বিপ্লববাদের সিদ্ধান্ত সকলের দ্বারা যেন বিমূঢ় আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের লিখিত গদ্যে পদ্যে, কাব্যে নাট্যে, সাহিত্যের সকল বিষয়ে ফরাসী

বিপ্লববাদের সিদ্ধান্ত সকল ওতঃপ্রোতভাবে বিদ্যমান। ঐ যুগের ইংরেজও ফরাসী বিপ্লববাদের প্রভাবে উদার ও প্রসন্নচেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে প্রসন্নতার ফলে ইংরেজ-অধিকারের মধ্যে দাস-প্রথা উঠাইয়া দিতে হইয়াছিল; দণ্ডবিধির কঠোরতাকে কোমল করিতে হইয়াছিল; সামাজিক বিধি নিষেধ সকলকে শিথিল করিতে হইয়াছিল। সে প্রসন্নতার ফলে, ইংরেজ পরাজিত কাফ্রি, নিগ্রো, ভারতবাসীদিগের প্রতি উদার ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন। সে প্রসন্নতার ফলে বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, বাঙ্গালীকে ইংরেজী শিখাইয়া ইংরেজের আদর্শে গড়িয়া তুলিয়া সম অধিকারে অধিকারী করিবার সাধ ইংরেজ শাসনকর্ত্তা ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এই প্রসন্নতার বেদীর উপর বাঙ্গালার ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত।

মূলের যাহা গুণ, ফলেরও প্রায়শঃ সেই গুণ হয়। ফরাসী বিপ্লব বাদ নাশের—ধ্বংসের বাদ। ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই নাশের বাদ বাঙ্গালায় আমদানী হইয়া

"ভাঙ্গিল চুরিল উলটি-পালটি,
লুটি নিল যা ছিল সার ও।"

সমাজ ভাঙ্গিল, ধর্ম্ম ভাঙ্গিল, জাতির পারম্পর্য্য নষ্ট করিল, অতীতের পুণ্যস্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল, পবিত্র অপবিত্র বিচার না করিয়া দেশের যাহা কিছু মধুর ছিল; সে সকলকে অবহেলায়—অবজ্ঞায় ছাঁটিয়া ফেলিল। প্রজার দৃষ্টিতে রাজার জাতির আচার ব্যবহার, রীতি পদ্ধতি, অশন বসন আদর্শ বলিয়া মনে হয়, প্রজা রাজার সর্ব্বস্ব অনুকরণ করিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রজা গোড়ায় তাহাই মনে করিয়াছিল; নিজের দেশের ও জাতির সকল মাধুরী পরিহার করিয়া ইউরোপের সভ্যতা-অবলম্বনে অগ্রসর হইল। জাতি যায়, সমাজ যায় দেখিয়া মনীষী ও বহুদর্শী রাজা রামমোহন রায় বেদান্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মে Iconoclasm বা দেশের পুরাতন রীতির নাশ করিবার চেষ্টা ছিল না। তিনি দেশাত্মবোধের বা পেট্রিয়টিজমের বেদীর উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালীকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন—"এই দেখ, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী, তোমার দেশে, তোমার ধর্ম্মে, তোমার শাস্ত্রে যাহা নাই ভাবিয়া বিহ্বলভাবে তুমি যাহা ইউ-

রোপের নিকট ভিক্ষা করিতে যাইতেছ, তাহা তোমারই আছে। সেই একেশ্বরবাদ, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা, সর্ব্বজাতি-সমন্বয়ের ব্যবস্থা তোমারই শাস্ত্রে আছে। তোমার উপনিষদ সকল, মহানির্ব্বাণতন্ত্র, বেদ-বেদান্ত এই ইউরোপকথিত একেশ্বরবাদেরই গ্রন্থনিচয়। খৃষ্টান হইবার পূর্ব্বে জাতি কুল হারাইবার পূর্ব্বে, নিজেদের যাহা আছে, যাহা ছিল, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।” এই ভাবে বাঙ্গালীকে উপদেশ দিয়া তিনি এক দিকে যেমন শাস্ত্র-প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন অন্য দিকে তেমনি ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এ দেশে ইউরোপীয় শিক্ষার বিস্তার যত ঘটিবে, ততই দেশাত্মবোধের ভাব পুষ্ট হইবে। পেটরিয়টিজিমে পরিপুষ্ট হইলে ইংরেজী-শিক্ষিত, ইউরোপ-অনুচিকীর্ষু বিহ্বল বাঙ্গালী পরে নিজ নিকেতনের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেনই রাজা রামমোহন এইটুকু বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরেজী-শিক্ষা-প্রচলনের পক্ষপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দেশাত্মবোধের বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই তিনি ভাঙ্গেন নাই, গড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রে এক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাই তাঁহার আশ্রিত আদি-ব্রাহ্ম-সমাজ বাঙ্গালায় পুরাতন হিন্দু সমাজের সহিত বিবাদ ঘটায় নাই। সে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিতে রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

কিন্তু মূলের গুণ ত ফলে প্রকট হইবেই। যাহা নাশের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত, বাঙ্গালা দেশে তাহার প্রচার হওয়াতে তাহাতে নাশের ফল ফলিল। কেশবচন্দ্র প্রমুখ ইংরেজী-শিক্ষিত, বাইবেল-ভাব-প্রমত্ত বাঙ্গালী প্রধানগণ আদি-ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা আদি-ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডী কাটিয়া, যজ্ঞোপবীত দূরে ফেলিয়া, জাতিবিচারকে অবহেলা করিয়া স্বতন্ত্র হইলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। এইবার Iconoclasm বা নাশ-চিকীর্ষা ব্রাহ্মসমাজের মূলমন্ত্র হইল। সমাজ-রক্ষার জন্য যাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাই অভিনব শিক্ষার প্রভাবে সমাজ নাশের জন্য প্রযুক্ত হইল। মনে হয়, আদিব্রাহ্মসমাজ অক্ষুণ্ণ থাকিলে, কেশবচন্দ্রের ন্যায় অতি-মানুষপ্রকৃতিক বাঙ্গালী রাজা রামমোহনের মন্ত্রে এক-নিষ্ঠ থাকিলে, আজ বাঙ্গালার ইংরেজী-শিক্ষিতমাত্রই হয় ত ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে শ্লাঘা বোধ করিতেন। মনে হয়, শেষ জীবনে কেশবচন্দ্র স্বীয় ভ্রম বুঝিতে

পারিয়াছিলেন, তাই নববিধানের প্রচার করিয়া দেশাত্মবোধের বেদীর উপর ব্রাহ্মধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠাপিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করিলে তিনি পরিণামে কোন পথে যাইতেন, কে বলিতে পারে ?

কেশবচন্দ্রের সহিত যাঁহারা Iconoclast বা নাশচিকীর্ষু হইয়া অভিনব ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্ততম। কেশবচন্দ্রের সঙ্গীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ জাতিভুক্ত ছিলেন, এবং ভাগীরথীর উভয় তীরের উন্নত হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত ছিলেন। ইঁহারা সবাই ব্রাহ্মসমাজের জন্য যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন। ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঁশবেড়িয়ার চট্টোপাধ্যায়-বংশের বংশধর ছিলেন। বাঁশবেড়িয়ার চট্টোপাধ্যায়গণ বর্দ্ধমানের রাজবাটীর দ্বার-পণ্ডিত, ব্যবস্থাদাতা, সমাজ-শাসক ছিলেন। অর্থ সম্পত্তি ইঁহাদের কম ছিল না। সমাজে মান সম্ভ্রম পর্য্যাপ্ত ছিল। নগেন্দ্রনাথ সে সকল উপেক্ষা করিয়া কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মের জন্য, নব-প্রতিষ্ঠিত সমাজের জন্য কঠোর দারিদ্র্যকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, নগেন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত, সুরসিক, সুলেখক এবং সুবক্তা ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া কি কলঙ্কের বোঝা তাঁহাকে মাথায় করিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল, তাহা আজকালকার যুবকগণ অনুমানেও আনিতে পারিবেন না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ কেমন কঠোর-নিগড়-বদ্ধ ছিল, তাহার শাসন কতটা দুর্ব্বহ ছিল, তাহা এখন বুঝান কঠিন। নগেন্দ্রনাথের ন্যায় এক দল মনীষী Iconoclast জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহারা আমরণ সমাজের কঠোর বন্ধন শিথিল করিবার জন্য দুশ্চর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই, আজ বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ একটা শিথিল হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তথা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখিতে হইলে, এই Iconoclasmএর ইতিহাস লিখিতে হইবে। কেমন করিয়া সমাজের গজগিরি গাঁথা পদ্ধতির পোস্তা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহারই ইতিহাস লিখিতে হইবে। সে ইতিহাস রীতিমত লিখিতে হইলে ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনকাহিনী আমূল তাহাতে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। কেন না, নগেন্দ্রনাথ বাঙ্গালার এক জন প্রধান Iconoclast; তিনি গড়েন নাই, কেবল ভাঙ্গিয়া গিয়াছেন।

যে শিক্ষার ফলে নগেন্দ্রনাথের তুল্য নরশ্রেষ্ঠের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল, সে শিক্ষায় Constructive element—বা গড়িয়া তুলিবার ভাব ছিল না;—সে শিক্ষা ফরাসী বিপ্লববাদের সিদ্ধান্তজাত শিক্ষা—সে শিক্ষার ঋষি-মুনি রুসো, ভলটেয়ার, বেণ, বেন্থাম, হক্‌স্‌লী, স্পেন্সার;—সে শিক্ষার কবি বায়রণ, কীট্‌স্‌, শেলী কোল্‌রীজ। ফলে নগেন্দ্রনাথ যাহা গড়িয়াছিলেন, তাহাকে নাশের অস্ত্ররূপেই গড়িয়াছিলেন; তাঁহার অবলম্বিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বাঙ্গালার হিন্দু সমাজকে খণ্ড বিখণ্ডিত করিবার শাণিত তরবারি স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি কেবল হিন্দুসমাজকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন—জাতিভেদ, বর্ণবিচার, প্রতিমা-পূজা, অবরোধ প্রথা, বালিকাবিবাহ, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য—প্রভৃতি সামাজিক ব্যবহার-পদ্ধতি সকলকে তিনি বারংবার পদাঘাতে চূর্ণ করিবার চেষ্টা স্বতঃ পরতঃ করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, হিন্দুসমাজকে ভাঙ্গিতে পারিলেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুষ্টি আপনা-আপনি হইবে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তিনি হিন্দুসমাজপদ্ধতি সকলকে দেখেন নাই, কেন এমন আচার-ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কোন অবস্থায় পড়িয়া বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ এমন ভাবে গঠিত হইয়াছে, কোন কারণপরম্পরায় বাঙ্গালার তথা ভারতের হিন্দুসমাজের এমন দশা ঘটিয়াছে, এ সকল চিন্তা করিবার অবসর তাঁহার ছিল না। ফরাসী বিপ্লববাদের তিন মূল-মন্ত্র, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, এই তিনের কষ্টিপাথরে কষিয়া তিনি যাহাকে মন্দ ভাবিয়াছেন—নিরেস্‌ ঠাওরাইয়াছেন—তাহারই বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিয়াছেন। পুরুষ-শার্দ্দূলের মত নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে নির্ব্বিন্নহৃদয়ে তিনি সমাজের সহিত বিরোধ করিয়াছেন; এ কার্য্যে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই, কখনও আপোষ করিতে চেষ্টা পান নাই।

নগেন্দ্রনাথের মধ্যে যে Constructive element ছিল না, অন্ততঃ তাঁহার যৌবনে ও প্রৌঢ়ে যে সে বুদ্ধি ফুটিয়া উঠে নাই, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। তিনি যখন কোচবিহার বিবাহ-ব্যাপার লইয়া কেশবচন্দ্রের সহিত পৃথক হন, তখনই বুঝিয়াছিলাম যে, ইহারা গড়িতে আসে নাই, কেবলই ভাঙ্গিতে আসিয়াছে। কেশবচন্দ্র কোচবিহার মহারাজের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া ব্রাহ্মসমাজকে একটা ভিত্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—একটা স্থান, একটা আয়তন গড়িয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সে বিবাহে কেবলই নীচ পারিবারিক স্বার্থ নিবদ্ধ ছিল

না। কোচবিহার-রাজ ব্রাহ্ম হইলে, ব্রাহ্মসমাজের একটা আশ্রয় হয়; কেবল Personal Religion বা ব্যক্তিগত ধর্ম্মপদ্ধতি না হইয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা হইলে দেশগত ও সমাজগত ধর্ম্ম হইতে পারে। এই উচ্চাশায় কোচবিহার বিবাহ। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার মর্ম্ম নগেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় ছাড়িয়া, বিরাট হিন্দু সমাজের গণ্ডী কাটিয়া, দেশাত্মবোধের ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া কেশবচন্দ্র যে প্রমাদে পড়িয়াছিলেন, তাহাই সামলাইবার উদ্দেশ্যে তিনি কোচবিহার মহারাজের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তখনকার শাসকসম্প্রদায়গত ইংরেজ প্রধানগণ কেশবচন্দ্রের এ গূঢ় উদ্দেশ্য প্রথমে ধরিতে পারেন নাই, পরে তাঁহারা এটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সেই বোধ-জন্য পরে বিবাহকালে কেশবচন্দ্রের লাঞ্ছনা হইয়াছিল, সেই বোধ-জন্য কেশবচন্দ্রের অন্য কন্যার সহিত অন্য একটি সামন্ত-রাজের বিবাহ তখন হইতে পারে নাই। নগেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহচরগণ এটুকু বুঝেন নাই। তাই কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহারা বিষম বিরোধ উপস্থাপিত করেন। যে সমাজ বাঙ্গালাকে এক করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছিল, ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসরের মধ্যে সেই সমাজ তিন টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। Iconoclasm বা নাশচিকীর্ষার জয় হইল বটে; পরন্তু রাজা রামমোহন যে উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যে উদ্দেশ্যের মর্ম্ম বুঝিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আদি সমাজকে আঁকড়াইয়া—ভুজঙ্গ-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র যে মহৎ উদ্দেশ্যের মর্ম্ম বুঝিয়া পরে কোচবিহার বিবাহে রত হইয়াছিলেন, নব বিধানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। আত্মদ্রোহের ফলে ব্রাহ্মধর্ম্ম বাঙ্গালী বুদ্ধির কাছে দিনে দিনে হেয় হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মসমাজে কাঞ্চন-কৌলীন্য প্রচলিত হইল। ভাবুকমাত্রেরই মন সমাজের প্রতি উদাস হইয়া পড়িল।

মানুষ কেবলই নাশ চাহে না—কেবলই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মানুষের তৃপ্তি হয় না। Iconoclasmএর প্রয়োজন আছে বটে, পরন্তু সে প্রয়োজন জীবনব্যাপী হইতে পারে না। তাই কেশবচন্দ্র এক পক্ষে নববিধানের সৃষ্টি করিলেন। অন্য পক্ষে ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ৺রামকুমার বিদ্যারত্ন সাধন ভজনের পথে যাইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন, করিলেন। ইঁহাদের বার্দ্ধক্যে

heredity বা বংশানুক্রম ফুটিয়া উঠিল—ব্রাহ্মণ আবার ব্রাহ্মণ হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে অন্য রকমের ভাঙ্গন ধরিল। যদি ব্রাহ্মসমাজ গোড়া হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে থাকিতে পারিত, অথবা নববিধানের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিত, তাহা হইলে এ ভাঙ্গন ধরিত না। এখন দেখিতে পাই, চিন্তাশীল ব্রাহ্মমাত্রই হয় বৈষ্ণব, নহে ত তান্ত্রিক গুরুবাদী, নতুবা Spiritualist বা ভূতযোনিতে বিশ্বাসী। যাহা ভাঙ্গিবার, তাহা ত ভাঙ্গিয়াছে, আর ত ভাঙ্গিবার কিছু নাই। ব্রাহ্মসমাজকে এখন নূতন কিছু দিতে হইবে। নূতন না পাইলে মানুষ পুরাতনকে আলিঙ্গন করিবে, পুনরায় অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গলায় যে ভাবে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন হইয়াছে, তাহাতে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী এখন আর খ্রীষ্টান হইতে পারে না। খ্রীষ্টান হইলে জাতিকুল সব মুছিয়া যায়, দেশের অতীত গৌরব-গাথার সহিত সকল সম্বন্ধ নষ্ট হয়—আমার দেশ আমার সমাজ বলিয়া জ্ঞান থাকে না—তাই বাঙ্গালী আর খ্রীষ্টান হয় না। যাহারা খ্রীষ্টান হইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে হিন্দু-খ্রীষ্টান হইতেছে। এমন অবস্থার গতিকেই বাঙ্গালীকে পুরাতনের অনুসন্ধান করিতে হইতেছে। তাই শিক্ষিত বাঙ্গালী এখন ভগবান রামকৃষ্ণের দলভুক্ত, গোস্বামি-বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যশ্রেণীভুক্ত, থিওসফিষ্ট, শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের বিলাতী সংস্করণের বৈষ্ণব—অথবা Spiritualist বা ভূতযোনি-বিশ্বাসী। ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শেষ জীবনে spiritualist হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি গুরুবাদীও হইয়াছিলেন। প্রৌঢ়তার শেষে Iconaclasmএর শ্রান্তি যখন তাঁহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল, তখন হৃদয়ের শূন্যতাকে নাশবাদের ব্যর্থচেষ্টায় তিনি পূর্ণ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি spiritualist হইয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধ সন্ন্যাসী গুরু পাইলে হয় ত গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের বা স্বামী রামানন্দের পন্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন। তাঁহার সে সৌভাগ্যোদয় হয় নাই, ভূতযোনির সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া আত্মার পিপাসা তাঁহাকে তাই মিটাইতে হইয়াছিল। ইহাতে দোষের কিছুই নাই,—নিন্দার অবসর নাই; কেন না, যখন যাহা ঘটিবার, তাহাই ত ঘটিয়াছে, একটা উদ্ভট কিছুত হয় নাই।

কার্ডিন্যাল্ নিউম্যান (Cardinal Newman) নাশবাদীদিগকে ছুটো

ঘোড়ার সহিত তুলনা করিয়াছেন। ভীত-উত্তেজিত ঘোড়া যেমন ছাড়া পাইলে, বাজারের মধ্যে আরোহীর বল্‌গা-শাসন হইতে নিষ্কৃতি পাইলে পা-ছুড়িয়া—লাতাড়্ মারিয়া সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলে, সে চেষ্টায় সে যেমন পরকে মারিয়া নিজেও অবসন্ন ও আহত হয়—হয়ত কদাচিৎ খানায় ডোবায় পড়িয়া প্রাণ হারায়—তেমনই নাশবাদী স্বামী সমাজের সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত করিয়া নিজেও অবসন্ন হয়, একটা নূতন কিছু রচিয়া রাখিয়া যাইতে পারে না। নগেন্দ্রনাথও তেমনই রুদ্র অবতারের ন্যায় সংহারের দৃষ্টিতে বাঙ্গালার সর্ব্বস্ব সনাতন দেখিয়া ও দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। তিনিই সর্ব্বাগ্রে ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে চরিত্রের রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত রামমোহন-চরিত বাঙ্গালা সাহিত্যে চরিতাখ্যান গ্রন্থ সকলের আদর্শস্বরূপ। উহার যেমন ভাষা, যেমন লিখনপদ্ধতি, তেমনই পটুতার সহিত বিষয়-বিন্যাসের ব্যবস্থা। কিন্তু হইলে কি হয়; উহার আগাগোড়া destructive criticism বা ধ্বংসবুদ্ধি-প্রণোদিত সমালোচনায় পূর্ণ। রাজা রামমোহন রায় ভাঙ্গিতে আসেন নাই, গড়িতে আসিয়াছিলেন—ইউরোপের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া বাঙ্গালার হিন্দু সমাজকে এক নূতন আকার দিতে আসিয়াছিলেন। আজ কাল ব্রাহ্ম বলিলে যাহা বুঝি ও যেমন দেখিতে পাই, রাজা রামমোহন তেমন ব্রাহ্ম—তেমন বাঙ্গালী ছিলেন না। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয়, জাতি-প্রীতি-উদ্বুদ্ধ মনীষী বাঙ্গালী হিন্দু জাতিকে সভ্যতার সমসূত্রে ইউরোপের সহিত গাঁথিতে প্রমত্ত। বিধির বিধানে রাজা রামমোহন বিদেশে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, ধর্ম্মের প্রচারে ও সমাজ-সৃষ্টির কার্য্যে তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহন করিতে পারেন নাই। সূত্রাকারে তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যাতা থাকিলে আজ রাজা রামমোহনের স্বতন্ত্র চিত্র বাঙ্গালার লোকলোচনের গোচর হইত। নগেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনের জীবনচরিত লিখিয়াছেন বটে, পরন্তু রাজা রাম-মোহনের চরিত্রের constructive fine side গড়িবার অংশটুকু তেমন ভাল করিয়া ফুটাইতে পারেন নাই। নগেন্দ্রনাথ নিজে ত কখনও কিছু গড়েন নাই; গড়িবার পদ্ধতি তিনি জানিতেন না। তিনি ধ্বংসের ভাবে বিভোর ছিলেন, তাই রাজা রামমোহনকেও তিনি Iconoclast রূপে খাড়া করিয়াছেন। রাজা রামমোহনের মধ্যে যে ধ্বংসের ভাব—রুদ্র প্রকৃতি ছিল না, এমন কথা

বলিতে পারি না; তবে সেটা গৌণ লক্ষণমাত্র,—তাঁহার চরিত্রের ভিত্তি নহে।

নগেন্দ্রনাথের অন্য সকল লেখাও এই নাশবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া লেখা,—কেবল আক্রমণ, কেবল নিষ্ঠুর গোলন্দাজী। তিনি খাঁটী বাঙ্গালা গদ্য রচনা করিতে পারিতেন বটে, তাঁহার ভাষা মিঠে ছিল, তাঁহার লেখার আদর বঙ্কিমচন্দ্রও করিতেন, কিন্তু সে লেখায় destructve element বা ধ্বংসের উপাদান অধিক ছিল। তাই সে লেখা সমাজে টিকে নাই, এখন তাহার সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় নাই। যখন ভাঙ্গিবার প্রয়োজন হইয়াছে, তখন সে রুদ্র মূর্ত্তির ভঙ্গী দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছি বটে, পরন্তু নাশের সঙ্গে সঙ্গে সে চেষ্টার বাহার বিস্মৃতির গহ্বরে ডুবিয়া গিয়াছে। পদ্মার যে স্রোতে গ্রাম পল্লী ভাঙ্গে, সে স্রোত ত দাঁড়ায় না, ছুটিয়া চলিয়া যায়; যতক্ষণ ভাঙ্গন চলে, ততক্ষণ নানাবিধ আবর্ত্তে ভীম-ভৈরব সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া লীলা-বিকাশ করে। তাহার পর সে একটানা স্রোত, সেই একটানা স্রোত ছুটিয়া নাচিয়া চলিয়া যায়। নগেন্দ্রনাথের লেখার ভঙ্গী ভাদ্রের পদ্মার একটানা স্রোতের মতন—সুগভীর, তরঙ্গভঙ্গমুখর, আবর্ত্ত বিবর্ত্তে-উচ্ছ্বসিত, কল্লোল কোলাহলে পূর্ণ, আবেগময় ও আবেশপূর্ণ; কিন্তু তাহা টিকে না, থাকে না,—এক স্থানে দাঁড়াইয়া রহে না, যখন ছিল, তখন সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ছিল না—এখন নাই।

নগেন্দ্রনাথের জীবন-কাহিনী বাঙ্গালার একটা যুগের ইতিহাস-কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইংরেজী শিক্ষার ও সভ্যতার অবলম্বনের মধ্যযুগে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা জানিতে হইলে, নগেন্দ্রনাথের ন্যায় কর্ম্মবীর প্রচারকের জীবন-কাহিনী পাঠ করিলেই জানা যায়। তাহা জানিবার প্রয়োজন আছে, কেন না, বাঙ্গালায় এখন নূতন সৃষ্টির যুগ আসিয়াছে। গড়িবার পূর্ব্বে কেমন করিয়া কি ভাঙ্গা হইয়াছিল, তাহা জানা চাই। নাশের সমাচার পাইলে, সৃষ্টির পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইতে পারে। এই হেতু বলিতেছি যে, নগেন্দ্রনাথের প্রকৃত জীবন-কথার প্রয়োজন আছে। এক পক্ষে নগেন্দ্রনাথের জীবন-কাহিনী, অন্য দিকে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের চরিত রীতিমত পড়িতে পাইলে বাঙ্গালী ভাঙ্গা ও গড়ার মূলতত্ত্ব অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

আর এক কথা। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যে সকল উপাদানে গঠিত হইয়াছিলেন, অধুনা সে সকল উপাদানের অত্যন্তাভাব ঘটিতেছে। সে নির্ভীকতা, সে তেজস্বিতা, সে ত্যাগ, সে দারিদ্র্যের প্রতি উপেক্ষা, সে স্বাব-

লক্ষন ও স্বাধীনতা এখন ত আর দেখা যায় না। যে সকল গুণের প্রভাবে নগেন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজকে ভাঙ্গিতে পারিয়াছিলেন, সেই সকল গুণের প্রাবল্য না ঘটিলে ভাঙ্গা সমাজকে আবার গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইবে না। তাই নগেন্দ্রনাথকে বুঝিবার চেষ্টা বাঙ্গালীমাত্রেরই করা কর্ত্তব্য। বুঝিলে হয় ত সে তেজ, সে দৃঢ়তা, বিলাসে উপেক্ষা, মতের জন্য সর্ব্বত্যাগের ভাব আবার আমাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারে। সনাতন কাল হইতে এ দেশে সন্ন্যাসীই সমাজ ভাঙ্গিয়াছেন, সন্ন্যাসীই সমাজ গড়িয়াছেন। বুদ্ধদেব হইতে শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীর দল সমাজকে লইয়া গড়াপেটা করিয়াছেন। এক হিসাবে নগেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহার সন্ন্যাস দারিদ্র্যের আলিঙ্গনে পরিস্ফুট হইয়াছিল। তেমনই কঠোর সন্ন্যাস আবার চাই, সন্ন্যাসের প্রতি মর্য্যাদাবোধ আবার জাগাইয়া তোলা চাই, তবে সমাজ রক্ষা পাইবে। বিক্ষিপ্ত ও শিথিল সমাজ এখন নগেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পারেন, বিলাসের মোহে সে ত্যাগ ও দারিদ্র্যের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন, কিন্তু এমন দিন আসিতেছে, যখন নগেন্দ্রনাথের মত পুরুষ-শার্দ্দূলের অভাবে আমাদিগকে রোদন করিতে হইবে। যাহাতে সে রোদনটা শীঘ্র শীঘ্র ফুটিয়া উঠে, সেই দুরাশায় এত কথা কহিলাম। দেখা যাউক, লীলাময়ীর লীলা কেমন ভাবে প্রকট হয়।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

বালজাক।

বালজাক ফরাসী ঔপন্যাসিক। কেবল ঔপন্যাসিক বলিলে সম্পূর্ণ হইবে না; বালজাক উপন্যাসের আবরণে ফরাসী সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; সংসার-রঙ্গশালার রঙ্গমঞ্চের যবনিকা উন্মোচন করিয়া জীবন-নাট্যের বহু দুর্ব্বোধ বিষয় বালজাক সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে তিন জন মহারথ উপন্যাস লেখক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম, বালজাক; দ্বিতীয়, ভিক্টর হিউগো; তৃতীয়, এমীল জোলা। তিন জন তিন প্রকারের লেখক। এই তিন জনের লেখার প্রভাবে উপন্যাস সাহিত্যে তিনটি শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। যথা—Realist, Idealist এবং Romanticist। এখন দেখা যাউক, এই তিনটি শব্দের তাৎপর্য্য কি?

Realist—সংসারে যাহা যাহা যেমন ভাবে ঘটিতেছে, ঠিক তেমনই ভাবে যে লেখক তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তিনিই Realist বলিতে পার যে, তাহা হইলে উপন্যাস-

লেখক ত ইতিহাস-লেখকে পরিণত হইলেন। কতকটা তাহাই বটে; পরন্তু ইতিহাস-লেখক ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের নাম ধাম উল্লেখ করিয়া বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। ঔপন্যাসিক কোনও পরিচিত বা জ্ঞাত ব্যক্তি বা বাষ্টির নাম ধামেরও প্রকৃত উল্লেখ করিয়া বিবরণ লেখেন না। তিনি যাহা নিত্য দেখেন, শুনেন ও বুঝেন, তাহাই কতকটা নাটকের আকারে এমন ভাবে ফুটাইয়া তোলেন, যাহা দেখিলে বা পাঠ করিলে মনে হয়, এমন বুঝি কোথায় দেখিয়াছি। এমন কি, উপন্যাস পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে এমন সকল পরিচিত লোকের নাম বা জীবনকথা মনে পড়ে, যে সকল মানুষকে বা সম্প্রদায়ের লোককে অনেকেই দেখিয়াছেন, অনেকেই তাহাদের রীতি পদ্ধতির, আচার ব্যবহারের বিশিষ্টতার কথা জানেন। যাহার উপন্যাস পাঠ করিলে এমন সকল বাস্তব ঘটনার বাস্তব চিত্রের প্রতিচ্ছবি মানস-পটে অঙ্কিত হয়, তাঁহারই উপন্যাস সকলকে Realistic বা বস্তুতান্ত্রিক বলা যায়। এমীল জোলা এই শ্রেণীর প্রধান লেখক। আমাদের রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর বস্তুতান্ত্রিক লেখকশ্রেণীর প্রধান।

Idealist—সংসারে প্রতিদিন যাহা ঘটিতেছে, সেই সকল ঘটনার এমন ভাবে সমাবেশ করিবে, যাহার ফলে একটা নূতন অপূর্ব্ব চিত্র স্বতঃএব ফুটিয়া উঠিবে, এবং এই চিত্র অনেকের রুচিকর ও আদর্শ-অনুসারী হইবে। যিনি এইরূপে উপন্যাসের ঘটনা-বিন্যাস করিতে পারেন, এবং সেই বিন্যাসের ফলে মনোমত একটা অভিনব আদর্শ চিত্রের উদ্ভাবন করিতে পারেন, তাঁহাকেই Idealist বা ভাবুক লেখক বলা হয়। ইঁহার সত্যের অপহ্নব ঘটান না, যাহা ঘটে, যাহা বটে, তাহাই লিপিবদ্ধ করেন; পরন্তু বাস্তবের এমন বিন্যাস করেন, যাহার ফলে এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হয় যে অবস্থাকে পরিস্ফুট করিয়া লেখক লোকলোচনের গোচর করিতে চাহেন। বালজাক এই শ্রেণীর লেখক হইলেও, ভিকটর হিউগো এই শ্রেণীর প্রধান লেখক। ভিকটর হিউগোর উপন্যাস সকল পড়িলে কখনই মনে হয় না যে, একটা কাল্পনিক ঘটনার কথা পড়িতেছি, মনে হয়, এমন ত নিত্যই দেখি, নিত্যই শুনি। পরন্তু এই বস্তুতান্ত্রিক বিবরণের ভিতর দিয়া স্বতঃএব এমন একটা অভিনব ভাবের উদ্ভব হয়, এমন একটা অভিনব চরিত্রের উন্মেষ ঘটে, যাহা জীবনে কখনও না দেখিলেও, কখনও কাহারও মুখে স্বতন্ত্র ভাবে তেমন চরিত্রের বিবরণ না শুনিলেও, যাহাতে অতিপ্রাকৃত কিছু দেখিতে পাই না, অস্বাভাবিক কিছু বুঝিতে পারি না; সরল ও স্বাভাবিক বলিয়া যাহা মনে হইলেও, যাহার দ্বারা মন পবিত্র হয়, জীবন ধন্য হয়, হৃদয় উন্নত হয়। বালজাকের উপন্যাস সকলে এই গুণ থাকিলেও, এ বিষয়ে তিনি ভিকটর হিউগোর নিকট পরাজিত; বুঝি বা ইহার জন্য ভিক্টর হিউগো সভ্যজগতের সাহিত্যে অদ্বিতীয় ও অপরাজেয়।

Romanticist—কল্পনার সাহায্যে, অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশে যে সকল উপন্যাস রচিত হয়, তাহাই এই শ্রেণীভুক্ত। ইহাকেই সংস্কৃতে উপাখ্যান বলে। কিন্তু অধুনা সভ্য ইউরোপের সাহিত্যে এই উপাখ্যানকে কতকটা বাস্তবের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলা হইয়াছে। কাল্পনিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনা সকলকে এমন ভাবে বর্ণনা করিতে

হইবে, যাহাতে পাঠক বুঝিতে না পারে যে, এমন ঘটনার সমাবেশ সংসারে সম্ভবপর নহে। বাস্তবতার আবরণে কল্পনাকে অনেকটা বাস্তবগতিক করিয়া ফেলা হয়। রাইডার হাগার্ড এই শ্রেণীর প্রধান লেখক; মারী করেলীও এই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া দুই তিনখানি উচ্চাঙ্গের উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। বালজাক্ এই শ্রেণীভুক্ত না হইলেও, এই শ্রেণীর লেখকের পদ্ধতির তিনি অনেকটা অনুসরণ করিয়াছেন। বালজাক্ যেন তিন শ্রেণীর সমবায়ে উদ্ভূত। তাঁহাতে বাস্তবতা আছে, ভাবুকতা আছে, কল্পনার লীলাও আছে। তবে তিনি বাস্তবতার বেদীর উপর কল্পনার ও ভাবুকতার লীলা-বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই বিশিষ্টতার জন্য বালজাকের এত আদর।

গত ১০ই জুনের সাহিত্যবিষয়ক "টাইমস্" পত্রে বালজাকের একটি উপাদেয় ও গম্ভীর সমালোচনা বাহির হইয়াছে। পূর্ব্বে একবার এই "সাহিত্য" পত্রে বলিয়া রাখিয়াছি যে, ইউরোপের মনীষা দিনে দিনে দুর্ব্বিরতা লাভ করিতেছে; আর ভিক্টর হিউগো, বালজাক, গেটে, শীলার, লেসিঙ, টেনিসন, ব্রাউনিং, ডিকেন্স, থ্যাকারে প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিতেছেন না; ইউরোপের সাহিত্যে নূতন ভাবের আমদানী হইতেছে না। তাই ইউরোপের বিদ্বজ্জনসমাজ এখন কেবল পরিশীলনায়, সঞ্চিত গুছাইয়া রাখিবার চেষ্টায়, ব্যস্ত আছেন। এখন বিশ্লেষণের যুগ আসিয়াছে। কে কেমন ছিলেন, কে কিসের ব্যাখ্যান করিয়া গিয়াছেন, তাহারই বিশ্লেষণ করিতে সকলেই ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার ফলে বালজাকের সমালোচনা বাহির হইতেছে। বালজাকের তিন জন প্রধান সমালোচক—Taine (টেন) Brunetiere (ব্রুনেতিয়ের) M. Faguet (মসিয়ে ফাগে)। তিন জনই বিশ্লেষণ কার্য্যে বিশেষ পটু, প্রগাঢ় পণ্ডিত ও ভাবুক। তিন জনই বালজাকের সমালোচনায় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী সমাজের বিশ্লেষণ করিয়া সমাজ-তত্ত্বের অনেক নূতন কথা বাহির করিয়াছেন।

বালজাক উপন্যাসে চিত্রকর ছিলেন। তিনি বাক্‌বিন্যাসের বর্ণচ্ছটায় এমন এক একটি চিত্র পাঠকের মানসপটে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যাহা বাস্তবতার বেদীর উপর কল্পনার সপ্তবর্ণের আভা পূর্ণমাত্রায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের চিত্র তিনি সজীব ও চিরস্থায়ী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখায় সর্ব্বত্র চিত্রকরের আকাঙ্ক্ষা দেদীপ্যমান, তাই টাইমস্ লেখক বলিতেছেন—

"It is thus the painter's aspiring and rejoicing consciousness of the great square swarming picture, the picture of France from side to side, from top to bottom, which he proposes to copy—unless we see the collective quantity rather as the vast primary model or sitter that he is unprecedently to portray—it is this that rendering him enviable in proportion to his audacity and his presumption, gives a dignity to everything that makes the consciousness whole.

ফরাসী সমাজের এক দিক হইতে অপর দিক পর্য্যন্ত, উচ্চতম হইতে নিম্নতম স্তর

পর্য্যন্ত আমূল সকলের চিত্রপূর্ণ বিরাট আলেখ্যখানি দেখিয়া চিত্রকরের আকাঙ্ক্ষার ও উল্লাসের সহিত বালজাক্ অনুকম্পাবশে যাহার অনুলিপি লোকলোচনের গোচর করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—যাহার এক একটি চিত্র তিনি নিখুঁৎভাবে অনুকরণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন—তাহাই তাঁহার অহমিকা ও স্পর্দ্ধাকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছে এবং এই চিত্রণের সমবায় তাহাকে পূর্ণাঙ্গ সুন্দর করিয়াছে। চিত্রকর যেমন সুন্দরীর রূপ লিখিবার সময়ে একটি সুন্দরী নারীকে সম্মুখে বসাইয়া তাহার অনুলিপি তুলিয়া রাখেন, বাস্তববাদী লেখক যেমন সমাজের উদ্ভট ও উৎকট অংশকে চিত্রস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে উদ্ভট ও উৎকট চরিত্রের লোক সকলকে ধরিয়া তাহাদের জীবনকাহিনী ও চরিত্রকথা লিখিয়া রাখেন, ঠিক তেমনই বাহ্যভাবে লোকচরিত্রের অঙ্কনে বালজাক্ অনুচিকীর্ষার পরিচয় সম্যকরূপে না দিলেও, সমবায়ে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র পূর্ণাবয়ব—সাকার। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কেবল গালগল্প লিখিলে উপন্যাস লেখা হয় না, কেবল "রূপকথা" বলিলে উপন্যাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। উপন্যাসে সমাজের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হওয়া চাই। যাহা ছিল, তাহা কেমন ছিল, যাহা হইয়াছে, তাহা কেমন হইয়াছে, পূর্ব্বাবস্থার পারম্পর্য্য বর্ত্তমানে বিদ্যমান আছে কি না, ইহাই দেখাইবার জন্য বাস্তব উপন্যাসের প্রবর্ত্তন। বালজাক্ এ পক্ষে পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

অনেকে বলেন যে, বালজাক্ অশ্লীল বা কুৎসিত ভাবের লেখক ছিলেন। তাঁহাতে কৌৎসিত্য যে ছিল না, এমন কথা ত বলিতে পারি না। তবে সে কৌৎসিত্য বাস্তবতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মনুষ্য-জীবন কৌৎসিত্যের সমষ্টিমাত্র, কেন না, মানুষ অনেকটা পশু; বালজাক্ বলেন, মানুষ সাড়ে পনর আনা পশু। মানুষকে ঠিক-মত দেখাইতে হইলে তাহার সাড়ে পনর আনা পশুত্বটুকু ফুটাইয়া দেখাইতেই হইবে। যে আধ আনা মনুষ্যত্ব মানুষে আছে, তাহাই মানুষের দীপ্তি—পশুত্বের অন্ধকারের সংমিশ্রণে। এই মনুষ্যত্বের সংমিশ্রণ তুলিলেই পশুত্ব অতএব ফুটিয়া উঠিবে।

"The vulgarity was at any rate a force that simply got nearer than any other could have done to the whole detail, the whole intimate and evidenced story, of submission and perversion, and as such it could but prove itself immensely human."

যে শুষ্ক অথচ বাস্তব মনুষ্যজীবনকথা লিখিতে বালজাক্ ব্যস্ত ছিলেন, যাহাতে মনুষ্য পশুর বিবৃতি ও আনুষঙ্গিক কথা যেন প্রমাণপ্রয়োগ সহ লিখিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবয়ব-সম্পাদনের জন্য এই কৌৎসিত্য একটা অনুকূল শক্তির মত কাজ করিয়াছিল; সকল খুঁটিনাটি ঘটনাপরম্পরা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং এ কৌৎসিত্য মানবতার গণ্ডীর বাহিরে নহে। যাহা কাম-সন্ধুক্ষণের জন্য প্রযুক্ত, সেই কৌৎসিত্যই দোষের, যাহা মনুষ্য-চরিত্রের গুপ্ত ভিত্তি খুলিয়া দেখায়, যাহার সাহায্যে মানুষকে চিনা জানা বুঝা যায়, তাহা দোষের নহে। ব্যক্তির রোগে যেমন লজ্জা নাই, রোগ-বর্ণনায় যেমন সঙ্কোচ

নাই, তেমনই সমাজের রোগে লজ্জা থাকিবে না, সামাজিক রোগ-বর্ণনায় সঙ্কোচবোধ হইবে না। কিন্তু চিকিৎসক যেমন নির্ব্বিকার ভাবে রোগের বর্ণনা করিয়া থাকেন, ঔপন্যাসিককেও তেমনই নির্ব্বিকার ভাবে সামাজিক রোগের বর্ণনা করিতে হইবে। বালজাক আগাগোড়া নির্ব্বিকার; ভাল মন্দ, কুৎসিত কদর্য্য, সুন্দর মনোহর, পবিত্র পাপপঙ্ক—কোনও কিছুরই প্রতি বালজাকের সমবেদনা ফুটিয়া উঠে নাই। বালজাক চিত্রকরের মতন, ফটোগ্রাফারের মতন, নির্ব্বিকার ভাবে সকলই দেখাইয়াছেন। দেখাইবার সময়ে তিনি যেন বলিয়াছেন, এই দেখ তোমার সভ্যতা, এই দেখ তোমার মনুষ্যত্বের ম্লান। দেখ, দেখিয়া শিক্ষা কর, এবং পার যদি, তবে উন্নত পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর। এইটুকু আছে বলিয়াই বালজাক এখনও টিকিয়া আছেন। যত দিন ইউরোপের সমাজ এই ভাবে থাকিবে, তত দিন বালজাকও অক্ষয় ও অমর হইয়া থাকিবেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

উদ্বোধন। শ্রাবণ।—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে শ্রীযুত স্বামী সারদানন্দ এবার 'মধুর ভাবের' পরিচয় দিয়াছেন। 'মধুর ভাব' সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর উহাতে কি অপূর্ব্ব চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার পূর্ব্বে, স্বামীজী সূচনা-স্বরূপ এই দার্শনিক নিবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি এই উপলক্ষে যেরূপ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, অসাধারণ বিচারবুদ্ধি ও অনন্যসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই প্রবন্ধে যে সকল দার্শনিক তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা কেবল শাস্ত্রানুশীলনের ফল নহে, মনে হয়, সাধকের সাধনাসিদ্ধ অনুভব-লব্ধ সত্যের বিবৃতি। তাহা অধিকারীর উপভোগ্য, অনধিকারীর অবিষয় নহে। প্রবন্ধের ভাষা একটু দুরূহ হইয়াছে। বিবৃতিচ্ছলে লেখক পরম্পরায় অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলে প্রবন্ধটি আমাদের মত অনধিকারী পাঠকের পক্ষে 'প্রাংশুলভ্য ফলে' পরিণত হইয়াছে। অবশ্য, ভাষা সহজ হইলেই সকল তত্ত্ব সকলের অধিগম্য হয় না, 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্' কখনও সফল হয় না, তাহা জানি। কিন্তু শক্তিশালী লেখক ইচ্ছা করিলে, জিজ্ঞাসুকে—শিক্ষার্থীকে তৃপ্ত করিতে পারিতেন না, তাহা ত মনে হয় না; তাঁহার বহু রচনায় সে শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। দর্শন শাস্ত্রের সহিত যাঁহাদের আদৌ পরিচয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে মূল-তত্ত্বের উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে না। 'মধুর ভাবের' স্বরূপবোধ জ্ঞানসাপেক্ষ, তাহার অনুভব সাধনা-সাধ্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত্রে এই মধুর ভাবের যে বিকাশ হইয়াছিল, তাহা ভাবময়,—সাধারণ ভক্তের উপভোগ্য। আলোচ্য নিবন্ধ জ্ঞানীর জন্য। কিন্তু জ্ঞান কি চিরদিন বিদ্বৎ-পরিষদেই বন্দী থাকিবে? শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাধক কি তাঁহার

সাধনা-লব্ধ রত্ন মুক্তহস্তে সমভাবে জ্ঞানী ও মূর্খকে বিতরণ করিবেন না? 'স্বামী বিবেকানন্দের পত্র' উপাদেয়; তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিব,—'আমার মনে হয়, জগতের সব্বাইকে—সব জিনিসকে আশীর্ব্বাদ করি—সব জিনিসকে ভালবাসি—আলিঙ্গন করি। * * , আমার প্রতি তোমাদের কত দয়া, তাই ভেবে আনন্দাশ্রু বর্ষণ কচ্ছি। আমি যেদিন এই পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ করেছি, সেই দিনটাকে ভেবে তাকে ধন্য ধন্য করছি।' পত্রখানি পড়িলে বাঙ্গালী উপকৃত হইবেন। মানবের মন এই ভাবের কিরণে শতদলের মত বিকশিত হইতে পারে। ভারতের ঋষি যে সাধনার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, বিবেকানন্দের দেশবাসীর ভিক্ষাভাণ্ড হস্তে প্রতীচীর রুদ্ধ দ্বারে বিশ্বপ্রেম ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের মনে সেই ভাবের লহরী উঠিয়াছিল। প্রাচীন ভারতের ঋষি—

'ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'

——ইত্যাদি মন্ত্রে যে ভাবের ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহা ইউরোপের ভুলিবার নহে, ভারতের আত্মজ্ঞান সেই 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' ভাবকে কি আর ভুলিবে না, 'অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজাচার্য্যের আপত্তিখণ্ডন'—নবম প্রস্তাব চলিতেছে। 'মধুর ভাব' ও 'পতন' প্রভৃতি গুরুতর প্রবন্ধের পর শ্রীমৎ'—র 'কাশীতে শঙ্কর' মুখরোচক চাটনী বলিয়া মনে হয়।—'উদ্বোধনে' পূর্ব্বে সরূপ 'ভ্রমণ', দর্শন প্রভৃতি সুখপাঠ্য অথচ শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, এখন আর তেমন হয় না কেন? 'সংবাদ ও মন্তব্যে' দেখিতেছি,—'মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ-মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শর্ব্বানন্দ মালয় উপনিবেশের অন্তর্গত কুয়ালা লামপুর নামক স্থানে "বিবেকানন্দ-আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। ঐ স্থানে বহুদিন হইতে "বিবেকানন্দ-পাঠাগার" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবার তথাকার সভ্যগণের উদ্যোগে স্থায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি বিগত ২০শে এপ্রিল তথায় উপস্থিত হন। * * * ২রা মে ঐ স্থান হইতে কিয়দ্দূরবর্ত্তী সেরাম্বান নামক স্থানে যাইয়া, তথাকার বিবেকানন্দ-আশ্রমের প্রস্তাবিত বাটীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, এবং ৩রা ও ৪ঠা মে ঐ স্থানে "ধর্ম্মের আবশ্যকতা" ও "হিন্দুধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৫ই মে নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামী সিঙ্গাপুরে গমন করেন। ১১ই মে কুয়ালা লামপুর বিবেকানন্দ-আশ্রমে হোম পূজা বেদপাঠ প্রভৃতি সহকারে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ফটো প্রতিষ্ঠিত হয় ও প্রায় ১০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। পরদিন সর্ব্বসাধারণের জন্য উৎসব হয়। ঐদিন তথায় ইউরোপীয়, ইউরেশীয়, চীনা ও ভারতবাসী—সর্ব্বপ্রকার জাতির ভদ্রমহোদয়গণের সমাগম হইয়াছিল। এই আশ্রমের কর্তৃপক্ষীয়গণের ইচ্ছা—রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়া উক্ত আশ্রমে থাকিয়া মালয় উপনিবেশে বেদান্ত-প্রচারের চেষ্টা করেন। ইহা একটী বেদান্তের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র, সন্দেহ নাই—চীনেদের মধ্যেও নাকি বেদান্তের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ আছে।' সুসংবাদ, সন্দেহ নাই। অতীত যুগে বাঙ্গালী মালয় দ্বীপপুঞ্জে হিন্দু সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।—'তে হি

সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, [illegible] সংখ্যা

আধুনিক সমাজে সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের স্থান।

বর্ত্তমান কালে বঙ্গ-সাহিত্য ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল আলোচনা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে দেখা যায় যে, চিন্তাশীল ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন সমাজনেতৃগণের মধ্যে অনেকেই বলিতেছেন যে, বাঙ্গালী কিছু অধিকমাত্রায় সুকুমার সাহিত্য ও ললিতকলার চর্চ্চা করিয়াছে; এখন কিছুদিন কাব্য, উপন্যাস, সঙ্গীতের চর্চ্চা বন্ধ রাখিয়া ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ব্যাবহারিক শিল্পের চর্চ্চা করিলেই দেশের ও সমাজের কল্যাণ। সাধারণ বাঙ্গালীসমাজের মধ্যে, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সমাজনেতৃগণের এই কথায় যে অল্পাধিকপরিমাণে সায় দিতেছেন, তাহাও নিঃসন্দেহ। শিল্প ও সাহিত্য এখন ক্রমশঃই একপ্রকার সৌখীন চিত্তবিলাসের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের যে কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা ক্রমশঃই অস্বীকৃত হইতেছে। যে কারণেই হউক, সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যে সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রতিপত্তি যে অনেকপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যিক জীবনে এই যে অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছে, তাহা ধীরভাবে আলোচনার যোগ্য। কেবল আমাদের বাঙ্গালা দেশে নয়, বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে সর্ব্বত্রই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে—জাতীয় জীবনে সুকুমার সাহিত্য ও শিল্পের স্থান আছে কি না, ও যদি থাকে ত সে কোথায়? এটি কেবল বাঙ্গালী-জীবনের বিশেষ সমস্যা নয়, এটি বর্ত্তমান যুগের সমস্যা, বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম যেখানে প্রবলভাবে কাজ করিতেছে, আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল সেই ইউরোপে এই বিশেষ সমস্যাটি বেশ স্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। সেখানে দেখিতে পাই যে, যদিও সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ নিজেদের বৃত্তি সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, যদিও তাঁহারা সমাজনেতা, সমাজ-শিক্ষক ও বর্ত্তমানকালোপযোগী যুগধর্ম্মের পুরোহিত বলিয়াই পরিচিত হইতে চাহেন, তথাপি ইউরোপীয় জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ অঙ্গের শিল্প ও সাহিত্যের প্রসার প্রতিপত্তি খুবই

কম, শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ জাতীয় জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে একরূপ অসমর্থ।

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, অবস্থাটা অস্বাভাবিক। এতদিন ধরিয়া সভ্য মানব-সমাজমাত্রই যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছে, তাহার সহিত ইহার মিল নাই। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সভ্য মানবসমাজমাত্রেই শিল্প ও সাহিত্য প্রাত্যহিক জীবনের নিত্য সহচর ছিল। সামাজিক জীবনের উপর কাব্য চিত্র সঙ্গীতের প্রভাব প্রবলভাবে কাজ করিত। সামাজিক জীবনে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠাকার্য্যে শিল্প ও সাহিত্যই প্রধান সহায় ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন গ্রীস, মধ্যযুগের ইউরোপ এবং বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার পূর্ব্বকালীন ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রীসে, ভাস্কর্য্যশিল্প, নাট্যাভিনয় ও সঙ্গীত আদর্শ পৌরচরিত্র-গঠনের প্রধান উপাদানস্বরূপ বিবেচিত হইত। বর্ত্তমান ইংলণ্ডের এক জন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক ডিকিন্সন সাহেব (G. Lowes Dickinson) তাঁহার প্রণীত Greek View of Life নামক গ্রন্থে গ্রীকদিগের সঙ্গীতচর্চ্চা প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার এই বিশেষত্বটুকু লক্ষ্য করিয়াছেন। গ্রীকরা চরিত্র-গঠনের দিক দিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। বিভিন্ন প্রকার সুর ও Mode অর্থাৎ রাগরাগিণী শ্রোতার মনে কিরূপ বিভিন্ন প্রকার ভাবের উদ্রেক করে ও শ্রোতার চরিত্রের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাঁহারা সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। এমন কি, প্লেটো তাঁহার রিপব্লিক (Republic) গ্রন্থে লিখিতেছেন যে, আদর্শ পৌরচরিত্র গঠন করিতে হইলে পৌরগণকে সুসঙ্গত ও বিধিবদ্ধ সঙ্গীত শুনাইতে হইবে, কারণ, উচ্ছৃঙ্খল সঙ্গীতের দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রেরই সৃষ্টি হয়, এবং রাজ্যমধ্যে অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হয়। ডিকিন্সন সাহেব বলেন যে, আধুনিক ইউরোপীয়ের নিকট প্রাচীন গ্রীক-জীবনের এই দিকটা দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকার মত বোধ হয়, কারণ,বর্ত্তমান কালে ইউরোপীয় জনসাধারণের মধ্যে যে সঙ্গীতের অধিকমাত্রায় প্রচলন, তাহা অধিকাংশ লোকের নিকট শ্রবণেন্দ্রিয়ের একপ্রকার বিলাসমাত্র। ইউরোপের মধ্যযুগে কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রাদির দ্বারাই এক দিকে খ্রীষ্টধর্ম্ম, অন্য দিকে বীরধর্ম্ম বা Chivalry সমাজের মধ্যে

প্রসার লাভ করিয়াছিল। সাধু-মহাপুরুষ-অবতারদিগের লীলাচিত্রশোভিত গির্জাঘর ও মঠ, ধর্ম্মকথা-সংবলিত মিষ্টিরী (Mystery) ও মিরাকল (Miracle) নাট্যাভিনয় সাধুসন্তদিগের চরিত্র, বাইবেল-বর্ণিত ঘটনাবলী ও খ্রীষ্টলীলা-সংবলিত কাব্যসমূহের পাঠ, আবৃত্তি ও কীর্ত্তন, ক্যাথলিক ধর্ম্মপন্থার নানা পর্ব্ব ও উৎসব—এই সকলের দ্বারা ইউরোপের মধ্যযুগে সাধারণ জনসমাজের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম যে জীবনীশক্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী কালের সংস্কৃত খ্রীষ্টধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে নাই। অন্য দিকে সেই যুদ্ধবিগ্রহ-অশান্তির যুগে যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে নানা রোম্যান্স কাব্যের মধ্য দিয়া আর একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এক কথায় তাহার নাম দেওয়া হয় Chivalry বা বীরধর্ম্ম। যুদ্ধে ন্যায়-ধর্ম্ম পালন, সবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলের উদ্ধার, স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ও জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনা —এইরূপ কয়েকটি আদর্শ লইয়া এই রোম্যান্স সাহিত্যের সৃষ্টি। এই সকল আদর্শ কেবল কাব্য ও সঙ্গীতের রাজ্যেই আবদ্ধ ছিল না, সেকালের যোদ্ধসমাজের জীবনেও এই আদর্শগুলি অল্পাধিকপরিমাণে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত শিল্প ও সাহিত্য সামাজিক জীবনে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশে যাত্রা, কথকতা, পাঠ, আবৃত্তি, পাঁচালী, কীর্ত্তন প্রভৃতি নানা উপায়ে সাহিত্যের আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী, মনসার ভাসান প্রভৃতি গ্রন্থের আদর্শই আমাদের সমাজে গার্হস্থ্য ও ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শ স্বরূপ স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে অন্য দিকে চিত্র ভাস্কর্য্য স্থাপত্য প্রভৃতি কলাশিল্পও এই কার্য্যে সহায়তা করিয়া আসিয়াছে। মন্দিরাদির গাত্রে দেবদেবী ও অবতারের লীলাচিত্র ও রামায়ণ মহাভারত পুরাণোক্ত কাহিনী এবং বৌদ্ধবিহারাদিতে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও লীলাচিত্র ভারতসমাজের সর্ব্বোচ্চ আদর্শগুলিকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদা জীবন্ত করিয়া রাখিত। আদর্শ পুত্র, আদর্শ পত্নী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পরিবার, আদর্শ রাজা, আদর্শ ক্ষত্রিয়, আদর্শ বণিক, আদর্শ ভৃত্য, আদর্শগৃহী, আদর্শ ত্যাগী ও ভক্ত;—সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্ত আদর্শ- গুলিই সাহিত্য ও শিল্পের

সাহায্যেই সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ভারতীয় রাজদরবারে "কবি, শিল্পী, পুরাণপাঠক ও সঙ্গীতাচার্য্যদিগের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ দিতেছেন,* তন্মধ্যে অমাত্য-সভাগঠন-প্রসঙ্গে ব্যবস্থা দিতেছেন যে, রাজার অমাত্য-সভায় ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্র অমাত্যের পার্শ্বে এক জন করিয়া সূত বা পুরাণপাঠককে স্থান দিতে হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন সভ্যসমাজমাত্রেই শিল্প ও সাহিত্যের শক্তি ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্রের গঠনে নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছে, এবং সমাজনেতৃগণ এইগুলিকে সমাজ-ব্যবস্থার সুপরিচালন কার্য্যে প্রধান সহায়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান-কালে কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে আধুনিক পাশ্চাত্যসভ্যতা যেখানেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, সেইখানেই ইহাদিগকে আর সেরূপ সহায় মনে করা হয় না। যাঁহারা সমাজের মধ্যে সংসারের নানাবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, যাঁহারা বিশেষভাবে সাহিত্য-রসচর্চ্চায় নিযুক্ত নহেন, এক কথায় সমাজের বার আনা লোকের কাছে সাহিত্য ও শিল্পের এই যে প্রতিপত্তির হ্রাস হইয়াছে, তাহার কারণ কি? এরূপ বলা যায় না যে, সাহিত্য ও শিল্প-সৃষ্টির অভাবই ইহার কারণ। এই মুদ্রাযন্ত্রের যুগে সপ্তাহে সপ্তাহে কত শত শত কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি নানাবিধ সাহিত্য-সম্ভার বহন করিয়া গ্রন্থপ্রকাশকগণ জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতিভাবান্ দৈবশক্তিসম্পন্ন গ্রন্থকার ও শিল্পীর যে অসদ্ভাব আছে, তাহাও বলা যায় না। আমাদের দেশের মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, আধুনিক ইউরোপের গেটে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টেনিসন, শেলী, ব্রাউনিং, বার্ণ্‌জোন্স, রোদাঁ প্রভৃতি সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ যে কোনও যুগের সাহিত্য ও শিল্পদরবারে উচ্চাসন পাইবার যোগ্য।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসঙ্গে যাঁহারা এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার-হীনতার মোটা-মুটি এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, অধিকাংশ বাঙ্গালী ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, অথচ অধিকাংশ বাঙ্গালী গ্রন্থকার ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, এবং কি ভাবে, কি ভাষায় ইংরাজী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

সুতরাং তাঁহাদের এই "ইংরাজী-পন্থী" সাহিত্য সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট হয় একেবারে দুর্ব্বোধ্য, অথবা বোধগম্য হইলেও তেমন প্রাণস্পর্শী হয় না। একথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য নিহিত আছে, কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে। কারণ, শুধু যে বাঙ্গালাদেশেই সাহিত্য ও শিল্প সামাজিক হিসাবে পঙ্গু ও শক্তিহীন হইয়াছে, তাহা নহে, আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যকেও এই ব্যাধি প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছে। সুতরাং ব্যাধির মূল নিরূপণ করিতে হইলে সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র ছাড়িয়া বর্ত্তমান যুগের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর যে বিশেষ ধর্ম্ম, তাহার মধ্যেই ইহার সন্ধান করিতে হইবে।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে যাঁহারা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, এটি বিশেষভাবে ব্যবসাদারীর যুগ। এ পর্য্যন্ত যে সকল নানা বিচিত্র মানব-সম্বন্ধ ব্যাবহারিক জীবনের শুষ্কতা অপহরণ করিয়া নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সামাজিক জীবনে রস সঞ্চার করিত, বর্ত্তমানকালে সেই সকল সম্বন্ধ ক্রমশঃই অস্বীকৃত হইতেছে, এবং আইন আদালত, চুক্তি ও ব্যবসাদারী তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। রাজার সহিত প্রজা, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, প্রভুর সহিত ভৃত্য, বণিকের সহিত গৃহস্থ, স্বজাতীয়ের সহিত স্বজাতীয়, গ্রামবাসীর সহিত গ্রামবাসী, এমন কি, এক পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি এখন আর সেরূপ পরস্পর আত্মীয়-সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া, ক্রমশঃ কেবল চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছেন। বৈষয়িক সম্বন্ধমাত্রই এখন পুরাপূরি বৈষয়িক, তাহার সহিত ধর্ম্ম বা অন্য কোন প্রকার স্বাভাবিক ভাববন্ধনের সংস্রব নাই। কাহারও সম্বন্ধে কাহারও দায়িত্ববোধ নাই, সমাজের ব্যক্তিমাত্রই এখন এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। যে দায়িত্ব আইন আদালতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সে দায়িত্ব ভিন্ন অন্য প্রকার দায়িত্ব এখন আর সেরূপ স্বীকৃত হয় না। এই বাঙ্গালাদেশে প্রাচীন সমাজে দেখা যায় যে, সরকারের বিশেষ বিধিব্যবস্থা ব্যতিরেকেও বৃক্ষজলাশয়দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, পাঠশালা-চতুষ্পাঠী পরিচালন, অন্নসত্র জলসত্র স্থাপন, দরিদ্র আতুরদিগের ভরণপোষণ, এমন কি অকর্ম্ম বা ব্যাধিগ্রস্ত গোপশ্বাদির চিকিৎসা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা প্রভৃতি সমাজ-হিতকর নানা অনুষ্ঠান অতি সুচারুরূপে ও স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন হইত। এখন আইন আদালত সমেত সরকারের সমস্ত

শক্তি নিয়োজিত না হইলে সামাজিক কোনও অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। একটা ছোট কথা দিয়াই ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে সকলেই অল্পাধিকপরিমাণে ভুক্তভোগী যে, এই সভ্যতার যুগে সাধারণ লোকের পক্ষে উপযুক্ত মূল্য দিয়াও আহার্য্যই হউক আর পরিধেয়ই হউক, খাটী বা আসল দ্রব্য পাওয়া ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। অথচ এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ আধুনিক; মিউনিসিপালিটির আইনের কোনই কড়াকড়ি ছিল না, অথচ প্রাচীন সমাজে খাটী দ্রব্যের অভাব ঘটিত না। কারণ সমাজের মধ্যে একটা মোটামুটি রকমের সামাজিক ধর্ম্মবোধ জাগ্রত ছিল—বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেই ধর্ম্মবোধ বা ভাবপ্রবণতা সমানভাবেই কাজ করিত বণিক কখনও নিজকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন, সকলসম্বন্ধমুক্ত স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে ভাবিতে পারিতেন না সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে ধর্ম্মের অবতার ছিলেন, এ কথা কেহই বলিবেন না, কিন্তু সমাজের মধ্যে যে সকল আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সমাজের সেই জীবন্ত জাগ্রত অবস্থায় কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সেই সমাজধর্ম্ম লঙ্ঘন অপেক্ষা পালনই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল আমরা এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে এই সমাজাধীনতাকে দাসত্ব বলিতে শিখিয়াছি ও নানাপ্রকার আন্দোলন ও বিপ্লবের দ্বারা সমাজের নানা বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়া, মজ্জাগত সমাজবোধের যে সংস্কার এখনও ক্ষীণভাবে লোকের মনে জাগিয়া আছে, তাহা নানা যুক্তি ও প্রলোভনের দ্বারা উৎপাটিত করিয়া সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি। সুতরাং বর্ত্তমানকালের সভ্য মানবসমাজ ক্রমশঃ যে আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে সমাজ বলিলে আমরা এ দেশে যাহা বুঝি, সে বস্তুর কোনও স্থান নাই। রাষ্ট্রশক্তিই এখন যথাসম্ভব সমাজধর্ম্মের স্থান অধিকার করিতেছে।

শক্তি রাষ্ট্রেরই হউক বা ব্যক্তিবিশেষেরই হউক, তাহার ধর্ম্মই এই যে, তাহার সহিত ভাবের কোনও সম্বন্ধ নাই। যেখানে কেবল শক্তি দ্বারা কাজ চালান হয়, সেখানে ভাব জাগাইয়া রাখার কোনও আবশ্যকতা অনুভূত হয় না। সকলেই জানেন যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে, ষ্টেট্ অর্থাৎ রাজ-সরকারকে দরিদ্রের ভরণপোষণের ভার লইতে হইয়াছে।

তজ্জন্য সরকারের আইন অনুসারে প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট কর আদায় করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে কোনও গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা-প্রার্থনা করা সেখানে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, দরিদ্রের প্রতি যে স্বাভাবিক করুণা ও সমবেদনার ভাব, তাহা থাকুক আর নাই থাকুক, প্রত্যেক গৃহস্থকে রাজশক্তির তাড়নে এই দরিদ্র-পোষণের জন্য অর্থব্যয় করিতে হয়। ফলে যে পরিমাণে এই দরিদ্রভরণের দায়িত্ব গৃহস্থের স্কন্ধ হইতে অপসারিত হইয়া রাজশক্তির উপর ন্যস্ত হইয়াছে, সেই পরিমাণে গৃহস্থের অন্তঃকরণে দুঃস্থলোকের প্রতি যে স্বাভাবিক করুণার ভাব ছিল, তাহা চর্চ্চার অভাবে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে এইরূপ সামাজিক সর্ব্ববিধ কার্য্যের মধ্যে যে পরিমাণে যন্ত্রশক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যে পরিমাণে কলের নিয়মে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই পরিমাণে সামাজিক জীবনে ভাব বা ধর্ম্মবোধের স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

অথচ এই ভাব লইয়াই শিল্প ও সাহিত্যের কারবার। বাস্তব জগতের মধ্যে অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতিষ্ঠা, কাজের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠা, ইহাই শিল্প ও সাহিত্যের কার্য্য সুতরাং যে সমাজে ভাবের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, সেখানে শিল্প ও সাহিত্যের শক্তি ও প্রসার যে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যে সাহিত্য ও শিল্প সমাজ-ব্যবস্থার অপরিহার্য্য অঙ্গ-স্বরূপ বিবেচিত হইত, এখন তাহা সামাজিক হিসাবে অনাবশ্যক অথবা সৌখীনতা ও বিলাসের সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

তাহা হইলেই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, এই যন্ত্রশক্তির যুগে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার হিসাবে শিল্প ও সাহিত্যের কোনও উপযোগিতা আছে কি না? যদি কলেই সব কাজ সুসম্পন্ন হয়, সে রাজশক্তি-পরিচালিত আইনের কলই হউক, আর বাষ্পশক্তি-পরিচালিত কারখানার কলই হউক,—কলেই যদি সব কাজ সুনিয়মে ও সুব্যবস্থায় সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সমাজের মধ্যে অনিশ্চিত ও অনির্দ্দিষ্টরূপে পরিব্যাপ্ত ভাবপ্রবণতা ও ধর্ম্মবোধের উপর নির্ভর করিয়া থাকার আবশ্যকতা কি? সাহিত্য ও শিল্পকে এখন সমাজের কার্য্য হইতে অবসর দিলে ক্ষতি কি? তাহাতে সমাজেরও ক্ষতি নাই, বরং শিল্প ও সাহিত্য স্বাধীনতা লাভ

করিয়া অভিনবভাবে নানা বিচিত্র সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিবে। শিল্পসাহিত্যের সহিত সমাজের এই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদে শিল্পসাহিত্যের কোনও ক্ষতি আছে কি না, তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে। এখন প্রথমে দেখা যাউক, ইহাতে সমাজের কোনও ক্ষতি আছে কি না। ইতিপূর্ব্বে আধুনিক সমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে যে, রাজশক্তি যে পরিমাণে সামাজিক কার্য্য-পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে, সেই পরিমাণে সমাজের মধ্য হইতে স্বাভাবিক ভাবগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে। এই ভাব-দারিদ্র্য ও ধর্ম্মহীনতা কখনই কোনও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। ভাব লইয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব। ভাবের অসদ্ভাবে মনুষ্যে ও পশুতে প্রভেদ কোথায়? এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন (এবং পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে ইহা শতাধিকবৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে) যে, কি সমাজ-ব্যবস্থায় কি জড় জগতে যন্ত্রশক্তি যতই কার্য্যকুশল ও সুনিয়মিত হউক তাহা কখনই সম্পূর্ণভাবে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধি, সৌন্দর্য্যবোধ বা ভাব প্রবণতার স্থান পূরণ করিতে পারে না। মানুষের স্বার্থপরতা ও ভোগবাসনাকে ধর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া যথেচ্ছভাবে একবার কাজ করিতে দিলে তাহাকে আবার আইনের কল দিয়া বাঁধিয়া ব্যবস্থা রক্ষা করা যে কত কঠিন, পাশ্চাত্য জগতের সমাজনেতৃগণ ও শাসকবৃন্দ তাহা এখন বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। ধনীর সহিত নির্ধনের দ্বন্দ্ব, ক্রেতার সহিত বিক্রেতার দ্বন্দ্ব, ব্যবসায়ীর সহিত ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্ব, দেশের সহিত দেশের দ্বন্দ্ব —পাশ্চাত্য জগতের এই দ্বন্দ্বপ্রতিদ্বন্দ্বের অগ্নি সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া ফেলিতেছে, এবং সমাজব্যবস্থাপকদিগের নিকট সমস্যার পর সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে। এ দিকে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবগ্রন্থি শিথিল হওয়ায় পরিবার ও সমাজের অনেক কার্য্যের ভার এখন ষ্টেটকে লইতে হইয়াছে। বয়ঃস্থ ও অক্ষম আত্মীয় কুটুম্বের, এমন কি, পিতামাতার প্রতি যে স্বাভাবিক ভক্তি, শ্রদ্ধা বা প্রীতির ভাব, তাহা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং রাজ-সরকার হইতে Old Age Pensions Act পাশ করিয়া তাহাদিগের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। শ্রমজীবী মজুরের সহিত কারখানার মালিকের ঠিকাচুক্তির বন্ধন ভিন্ন অন্ত কোনও সম্বন্ধ নাই, সুতরাং বাণিজ্যব্যাপারের সামান্ত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শ্রমজীবী

কাজ না পাইয়া জীবিকাহীন হইয়া পড়ে। শেষে ষ্টেট হইতে ইনসিউর‍্যান্স আইন (Insurance Act) পাশ করিয়া তাহাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হয়; ষ্টেট হইতে Minimum Wages Act পাশ করিয়া ন্যায্য মজুরীর হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হয়। এমন কি, যে দাম্পত্য সম্বন্ধ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তিস্বরূপ, তাহাও শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পাশ্চাত্যজগতের নারীসমাজ এখন পুরুষ হইতে স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক ভোটের অধিকার, এমন কি, মাতৃত্ব ও সন্তানপালন প্রভৃতি গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মের জন্য নির্দ্দিষ্ট মজুরীর দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং সমাজের ছোট বড় যাবতীয় কর্ম্ম ক্রমশঃ ষ্টেটের স্কন্ধে ন্যস্ত হওয়ায়, ব্যবস্থাপকদিগের দায়িত্বভার অসম্ভব রকম বাড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যহ নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে, নূতন নূতন বিপদ ও বিপ্লবের সম্ভাবনা আসিয়া সমাজকে অনবরত শঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে, এবং আইনের পর আইন পাশ করিয়া সেই সকল সমস্যার আপাতরম্য সমাধান করা হইতেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অনেকে এই নূতন নূতন আইন পাশ করাকেই উন্নতির লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লন। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, আইন-যন্ত্রের এই অতিরিক্ত পরিচালন, সমাজশরীরে এই অহরহঃ ঔষধ প্রয়োগ ও অস্ত্রচালনা, সমাজের ব্যাধিরই পরিচয়, উন্নতির নহে। পাশ্চাত্য মনীষীদিগের মধ্যে অনেকেই এ কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, সমাজের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইলে সমাজশরীরে পুনরায় ভাবরসের সঞ্চার করিতে হইবে।

সুতরাং সমাজের দিক দিয়া দেখা গেল যে, শিল্প-সাহিত্যের সহিত সমাজের সম্বন্ধচ্ছেদ সমাজের পক্ষে কখনই কল্যাণকর নহে। এখন দেখা যাউক, এই সম্পর্কচ্ছেদে সাহিত্যের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি আছে কি না। প্রশ্নটি গুরুতর, এবং এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে ইহার সম্যক্ ও বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর নহে। তথাপি মোটামোটি ভাবে বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য ও শিল্পের যে বিশেষ প্রকৃতি, প্রাচীন শিল্প-সাহিত্যের সহিত তুলনায় তাহার আলোচনা করিলে এই লাভ ক্ষতি হিসাবের দিকে কিছু দূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, যে ভাবরস ও সৌন্দর্য্য-বোধ শিল্প-সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ, তাহা এখন সমাজ অর্থাৎ লোক-সমষ্টির জীবন হইতে একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে। সাহিত্য

ও শিল্প এখন তাই সমষ্টিকে ছাড়িয়া, সমাজকে ছাড়িয়া এক একটি স্বতন্ত্র মানবকে অবলম্বন করিয়াছে। কারণ, ভাবপ্রবণতা ও সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম; তাহা যদিও সমাজ হইতে ক্রমশঃ বিতাড়িত হইয়াছে, তথাপি এখনও তাহা অনেক স্বতন্ত্র মানুষের অন্তঃকরণে জাগিয়া আছে। তাই আজকাল, ব্যষ্টিভাবে এক একটি স্বতন্ত্র মানবের মনে যে সকল ভাব ফুটিয়া উঠে, এক একটি স্বতন্ত্র মানবের মনশ্চক্ষে সৌন্দর্য্যের যে যে বিশেষ মূর্ত্তি প্রকটিত হয়, এক একটি স্বতন্ত্র মানবের চরিত্র জীবনের নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিত হয়, সেই বিচিত্র মানব-কাহিনীই আধুনিক শিল্প ও সাহিত্যের উপকরণ। সাহিত্যের ইতিহাসে বর্ত্তমান যুগকে বিশেষভাবে ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ লীরিক (lyric) বা গীতিকাব্য ও ব্যক্তিগত চরিত্রবিশ্লেষণপূর্ণ উপন্যাসের যুগ বলা যাইতে পারে। কাব্য-চিত্র-সঙ্গীত প্রভৃতি কলাশিল্প এখন সমাজের সিংহাসন হইতে স্থানচ্যুত হইয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নিভৃত অন্তরের কোণে আশ্রয় লইয়া চারি দিকের শুষ্কতা ও শ্রীহীনতার মধ্যেও কোনরূপে প্রাণধারণ করিতেছে। কবি, শিল্পী বা কাব্যরসিক কোনরূপে সাংসারিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অবসরকালে একটি কাল্পনিক সৌন্দর্য্য-জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়া কাব্য ও কলাশিল্পের রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান ইংলণ্ডের এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক জি. কে চেষ্টারটন্ (G. K Chesterton) কীট্‌স্ প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের কবিদিগের উল্লেখ করিয়া এক স্থলে বলিয়াছেন—"It was an age of inspired office-boys"—সাহিত্যের ইতিহাসে এটা দিব্যোন্মাদ-গ্রস্ত আফিসের কেরাণীর যুগ অর্থাৎ, কবি ও শিল্পী এখন সমস্ত দিন ধরিয়া আধুনিক আফিসের শুষ্কতার মধ্যে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দিয়া অবসরকালে আপন আপন নির্জ্জন কামরায় বসিয়া কল্পনার সাহায্যে এক দিব্য-সৌন্দর্য্যজগৎ রচনা পূর্ব্বক কাব্য বা শিল্প চর্চ্চা করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় যে বিশেষ ছাঁচের শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাহাকে "ব্যক্তিগত শিল্প-সাহিত্য" এবং প্রাচীন ছাঁচের শিল্প-সাহিত্যকে "সামাজিক শিল্প-সাহিত্য" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন দিক হইতে এই দুই ছাঁচের শিল্প-সাহিত্যের তুলনা করিলে ইহাদিগের বিশেষ প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও একটু স্পষ্ট ধারণা হইতে পারে।

প্রথমে ভাবের দিক দিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে সকল ভাব অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কাব্যচিত্রাদি রচিত হইত, তাহা সমাজের

সাধারণ জন-মণ্ডলীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল। প্রাচীনকালের সামাজিক আদর্শের সহিত এই সকল ভাবের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সে কালে সমাজের ক্ষেত্র হইতে স্বাভাবিক ভাবে যে সকল বড় বড় ভাব ও আদর্শ উদ্ভূত হইত, শিল্প ও সাহিত্য তাহারই সেবায় নিযুক্ত ছিল। লোক-সমষ্টির হৃদয়ে সেই সকল ভাব সহজেই সহানুভূতি লাভ করিত, এবং এই জন্যই তাহাদের প্রেরণাশক্তি ও ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস অপেক্ষা সমধিক প্রবল ছিল। সহজে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিত বলিয়া শিল্পিগণের ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীও অপেক্ষাকৃত সরল, অনাড়ম্বর ও নিঃসঙ্কোচ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে শিল্পী স্বীয় রচনামধ্যে যে সকল ভাবের অবতারণা করেন, তাহা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত না হইয়া পারে না। তাহা সাধারণতঃ ভাবুকহৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরের কথা, নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক সমভাবাপন্ন ভাবুক ও কাব্যরসিক ব্যক্তির চিত্তেই তাহা প্রসারলাভ করিতে পারে। এমন অবস্থায় শিল্প-রচনার মধ্যে স্বভাবতঃই একটা সঙ্কোচের ভাব আসিয়া পড়ে। শিল্পীর মনে এমন সর্ব্বদাই এই সন্দেহ জাগিয়া থাকে যে, হয় ত তাঁহার অন্তরের গভীর ভাবগুলি অধিকাংশ লোকের নিকট সহানুভূতি পাইবে না, সেই জন্য তাঁহাদের রচনায় হয় ভাবপ্রকাশের জটিলতা, না হয় একটা বিদ্রোহের সুর লক্ষ্য করা যায়। সহজ সরল ভঙ্গীতে ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা এখন তাই অধিকাংশ শিল্পীর অনায়ত্ত। প্রাচীন সাহিত্যে গভীর ও নিবিড় ভাবের অভাবই যে সেই সাহিত্যের সরলতার কারণ, তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব মহাজনদিগের পদাবলী, পারস্য দেশের সুফী কাব্য ও সঙ্গীত, প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য, প্রাচীন চীনের প্রাকৃতিক চিত্র, ইউরোপের মধ্যযুগের ম্যাডোনা চিত্রগুলি, আধুনিক শিল্প ও সাহিত্যের অপেক্ষা যে ভাবের গভীরতার হিসাবে ন্যূন, তাহা অবশ্য কেহই বলিবেন না। তথাপি এই সকল প্রাচীন কাব্য চিত্রাদি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজে অধিগম্য ছিল, এবং আপামরসাধারণের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইত। আধুনিক কবি ও শিল্পীদিগের রচনা কিন্তু কখনও অধ্যয়ন-কক্ষ ও আর্টগ্যালারীর বাহিরে জীবনের ক্ষেত্রে নামিতে পারে না। ইহার একটা কারণ এই যে, প্রাচীন কালে ভাব সাধন বলিয়া একটি বস্তু ছিল, এখন তাহার একান্ত অসদ্ভাব। চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, এঞ্জেলিকোর (Fra Angelico) রচনা কেবল ক্ষণিক ভাবের উচ্ছ্বাসমাত্র নহে। তাঁহারা যে কয়টি ভাব অবলম্বন করিয়া শিল্প রচনা করিতেন, তাহা সংখ্যায়

অল্প ও সুনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু সেই কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ভাব তাঁহারা জীবনব্যাপিনী সাধনায় পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেমন এক দিকে শিল্পী, তেমনই অপর দিকে ভাবসাধক। সেই জন্য তাঁহাদের ভাব বস্তু-তন্ত্র ও শক্তিশালী হইত। তাঁহারা নিজেদের সাধনার ধন শিল্পের সাহায্যে সমাজের সাধারণ সম্পত্তি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষপরম্পরাক্রমে একই ভাবের সাধনার দ্বারা যে সঞ্চিত-শক্তির উদ্ভব হয়, তাহাই কেবল বাস্তব সংসারে অতীন্দ্রিয় ভাবপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ। স্থাপত্য-শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ত্তমান ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ স্থাপত্যবিদ্ লেথাবী (W. R. Lethaby) তাঁহার প্রণীত Architecture নামক গ্রন্থে এক স্থলে লিখিতেছেন যে, যে শিল্প কেবল ব্যক্তিবিশেষের কল্পনা-শক্তি হইতে উদ্ভূত না হইয়া সহস্র-শিল্পীর সাধনার ফলস্বরূপ (The Art which is not one man deep, but a thousand men deep) তাহাই মহৎ শিল্প বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। আধুনিক শিল্প-সাহিত্যে যে সকল ভাবের অবতারণা হয়, তাহা সংখ্যায় অসীম ও অনির্দ্দিষ্ট; ব্যক্তিবিশেষের মনে বিভিন্ন বিভিন্ন অবস্থায় যে সকল বিচিত্র ভাবের স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহা যতই সূক্ষ্ম ও অসাধারণ হউক না, সমস্তই এখন শিল্পের বিষয়ীভূত। ভাব এখন সাধনার বস্তু নয়, সেইজন্য প্রত্যহ অভিনব ভাব ও অভিনব মানসিক অবস্থার চিত্রণেই শিল্পী নিযুক্ত — নূতনত্বের সন্ধান, পুরাতন ভাবের সাধনার স্থান অধিকার করিয়াছে। সেই জন্য অনেক স্থলে দেখা যায়, এই সকল সাময়িক ও অস্থায়ি ভাব শিল্পী বা শিল্পামোদীর জীবনে সেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। শিল্প-সাহিত্য এখন মানুষের মনোরাজ্যের প্রচ্ছন্ন কোণসমূহে নূতন নূতন প্রদেশ আবিষ্কার-কার্য্যে নিয়োজিত, এখনও কোথাও ঘরবাড়ী বাঁধিবার কোনও উদ্যম নাই। ফলে আধুনিক শিল্প বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব লাভ করিয়াছে, কিন্তু ভাবের গভীরতা ও বস্তুতন্ত্রতার হিসাবে প্রাচীন-শিল্পের তুলনায় হীন ও শক্তিহীন হইয়া রহিয়াছে।

ভাবের সম্বন্ধে যে কথা, শিল্পের বিষয়নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। প্রাচীন-শিল্পের বক্তব্য বিষয় ও আখ্যানাবলীও সংখ্যায় অল্প ও সুনির্দ্দিষ্ট। পুরুষ-পরম্পরা ধরিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত একই আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন শিল্পী শিল্প রচনা করিতেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে ইহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। এক মহাভারতের আখ্যানবস্তু লইয়া কাশীরামদাস ব্যতীত সঞ্জয়, কবীন্দ্র-পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ,

রামেশ্বর নন্দী প্রভৃতি বহু বাঙ্গালা কবি বঙ্গভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন। সেইরূপ বেহুলার উপাখ্যান লইয়া কাণা হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত, ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস প্রভৃতি কবি, কালকেতু ও শ্রীমন্তের আখ্যান অবলম্বন করিয়া জনার্দ্দন, মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবি, রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা অবলম্বন করিয়া বহুতর বৈষ্ণবকবি ও মহাজন আপন আপন কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইউরোপের মধ্যযুগেও দেখা যায় যে, আর্থার, লন্সেলট, পার্সিভ্যাল, আলেকজন্দার, সার্লমেন প্রভৃতি বীরগণের কাহিনী লইয়াই ইউরোপের বিভিন্নদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বহুতর রোম্যান্স কাব্য গদ্যে-পদ্যে রচিত হইয়াছিল। সে কালের কবি ও শিল্পিগণ আখ্যানবস্তুর মৌলিকতা লইয়া চিন্তা করিতেন না। পুরাতন ও লোকপ্রচলিত আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া কতকগুলি বিশেষ ভাবের উদ্রেক করিয়া দেওয়ার দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। কোনও আখ্যানবস্তু কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল না—সেগুলি সমাজেরই সম্পত্তি। এইরূপ অবস্থায় একটি সুবিধা এই ছিল যে, সমাজে কাব্য বা শিল্পের আখ্যানবস্তু সুপরিচিত থাকায় অতি সহজেই শিল্পীর বক্তব্য জন-সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিত। তদ্ভিন্ন শ্রোতৃবর্গের এক একটি ভাবতন্ত্রীতে পুনঃ পুনঃ আঘাত পড়ায় সমাজে কতকগুলি বিশেষ ভাবের অনুশীলন হইত। যখন ভাবরসাস্বাদ অপেক্ষা কৌতূহলপরিতৃপ্তি ও মানসিক উত্তেজনাই শিল্পচর্চ্চার উদ্দেশ্য হইয়া পড়িল, সেই লঘুচিত্ততার যুগেই শিল্পিগণকে নিত্য নূতন আখ্যানবস্তুরচনার জন্য নানা কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে হইল।

আখ্যান-বস্তু ও ভাব সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, রচনাভঙ্গী ও অলঙ্কারের দিক্ দিয়াও সেই কথা বলা যাইতে পারে। এখানেও দেখা যায় যে, কতকগুলি বিশেষ রচনাভঙ্গী শিল্পিসমাজের সাধারণ সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইত। "বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের" প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থমধ্যে বাঙ্গালী কবির অনুকরণপ্রিয়তার উল্লেখ করিয়া অনেকগুলি দৃষ্টান্ত একত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন তাঁহার গ্রন্থের সেই অংশ এ স্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইতে পারে:—

"কেবল বড় বড় কাব্যে নহে, কাব্যের অংশগুলিতেও সেই অনুকরণবৃত্তির পরিচয় লক্ষিত হয়। একটি উৎকৃষ্ট ভাব পাইয়া কবিকে প্রশংসা করিবার পথ নাই; কোন্ কবি সেই ভাবের আদি প্রণেতা, সে প্রশ্ন সহজে মীমাংসিত হইবার নহে। আমরা প্রতি চণ্ডীকাব্যেই ফুল্লরা ও

খুল্লনার 'বারমাস্যা' পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে পদ্মাবতীর বারমাস্যা, পদকল্পতরুতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা, বিদ্যাসুন্দরগুলিতে বিদ্যার 'বারমাস্যা', সৈয়দ আলওয়াল কবির পদ্মাবতীতে নাগমতীর বারমাস্যা, মুরারি ওঝার নাতি শ্রীধর প্রণীত রাধার বারমাস্যা, সেক জালাল প্রণীত সখীর বারমাস্যা এইরূপ রাশি রাশি বারমাস্যার সঙ্গে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ঘাটে পথে সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। বিদ্যাপতির 'না পুড়িও মোর অঙ্গ না ভাসাও জলে। মরিলে রাখিও বাঁধি তমালের ডালে॥ কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে। পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে॥' এ কবিতাটির ভাব রাধামোহন ঠাকুর—'এ সখি করতহুঁ পর উপকার। ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব মৃত তনু রাখবি হামার॥ কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পাওব, তবহুঁ মনোরথ পূর। দহনক নাশ—'উত্তরকালে এক করিহ সহায়। এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়। তমালের কাঁধে বার ভুজলতা দিয়। নিশ্চয় করিয়া তুমি রাখিব সখিয়া॥' ইত্যাদি পদে এবং এতদ্ব্যতীত নরহরি, কৃষ্ণকমল, কবিশেখর প্রভৃতি বহুকবি স্বরচিত পদে নকল করিয়াছেন।" শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের এই বিশেষত্বটুকুকে বিশেষ ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং ইহাকে বাঙ্গালীসুলভ অনুকরণপ্রিয়তা বা পুচ্ছগ্রাহিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এটি বাঙ্গালা সাহিত্যের বা বাঙ্গালী চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ নহে, ইহা প্রাচীন সামাজিক শিল্পমাত্রেরই লক্ষণ। মধ্যযুগের ইংরাজী, ফরাসী, বা জর্ম্মাণ সাহিত্যেও এই ভাব সাদৃশ্য ও রচনা-সাদৃশ্যের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগেও এই সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সাহিত্যের অবনতির যুগে এই ভাবভঙ্গী ও অলঙ্কার-সাদৃশ্য বিকার প্রাপ্ত হইয়া নির্জ্জীবতা ও নীরসতার সৃষ্টি করে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু সাহিত্যের জীবন্ত অবস্থায় এই সকল পরম্পরাগত ভাব ও উপমা নানা অপ্রত্যক্ষ ভাব ও দৃশ্যের ব্যঞ্জনাদ্বারা, নানাপ্রকার স্মৃতির উদ্রেক করাইয়া দিয়া, জনসাধারণের মনে যে ঘনরসের সৃষ্টি করে, তাহা অপূর্ব্ব। বিশেষ করিয়া চিত্র বা ভাস্কর্য্যশিল্পে এই বাঁধা রচনাপদ্ধতির একটা সুবিধা এই যে, ইহাতে শিল্পিগণের বক্তব্য জনসাধারণের পক্ষে সহজে অধিগম্য হয়। শিল্পব্যাখ্যা ও শিল্পসমালোচক বলিয়া এক শ্রেণী মধ্যস্থের আবশ্যকতা থাকে না। আজকাল

শিল্পের রাজ্যে নানা অভিনব প্রণালী প্রত্যহ অবলম্বিত হইতেছে, তাহাতে একটা এই ফল দাঁড়াইয়াছে যে, বিশেষজ্ঞ শিল্পসমালোচকের ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে শিল্পের বক্তব্য বিষয় সহজে সকলের অধিগম্য হয় না।

এইবার চরিত্রচিত্রণের দিক্ দিয়া এই উভয়বিধ সাহিত্যের তুলনা করা যাইতে পারে। উপন্যাসই আধুনিক সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। আধুনিক উপন্যাসের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে স্বতন্ত্র মানবচরিত্রের বিচিত্র বিকাশ চিত্রিত ও বিশ্লেষিত হয়। প্রাচীন সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ ব্যক্তি-চরিত্র অপেক্ষা আদর্শচরিত্র চিত্রণেই বিশেষ মনোযোগ দিতেন। জনসাধারণের সম্মুখে সামাজিক গার্হস্থ্য ও ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শগুলি স্থাপন করাই এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যে কত প্রভেদ, আধুনিক উপন্যাস পাঠে আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি কিন্তু প্রাচীন কাব্য কথা কাহিনীতে মানুষ কোন্ কোন্ আদর্শও উচ্চ ভাবের সম্মুখে নতমস্তকে একত্র হইয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে, তাহারই বার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত উপায়ে সমাজমধ্যে যে ভ্রাতৃভাব বা সৌভ্রাত্রের উদ্ভব হয়, তাহা নানা সামাজিক বৈষম্য সত্ত্বেও রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, প্রভু, ভৃত্য, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, উচ্চ, নীচ, সকলকেই এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দেয়। চেষ্টারটন্ সাহেব তাঁহার Victorian Age in Literature গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে চসারের ক্যাণ্টারবেরী কাহিনী (Canterbury Tales) এবং থ্যাকারের উপন্যাসের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, চসারের কাব্যে নাইট্, যোদ্ধার, ময়দাওয়াল, কৃষক, ছাত্র, পুরোহিত, মঠের মোহন্ত প্রভৃতি সমাজের বিভিন্নস্তর হইতে যে সকল চরিত্র একত্রিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত বৈষম্য প্রচুর। অপর দিকে থ্যাকারের উপন্যাসের চরিত্রগুলিও বিভিন্ন পর্য্যায়ের লোক। চসারের কাব্যে ধনী নির্ধন, উচ্চনীচ সকলে মিলিয়া পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়িয়া কাহিনী বলিতে বলিতে ক্যাণ্টারবেরীর সেণ্ট টমাসের সমাধি উদ্দেশে তীর্থযাত্রায় চলিয়াছে। তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সকলে মিলিয়া যে আদর্শের ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহার তুলনায় সামাজিক সমস্ত বৈষম্য তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু থ্যাকারের উপন্যাসে ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ একত্র মিলিয়া পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারেন, এরূপ কল্পনা স্বপ্নেও কাহারও মনে উদিত হইবে না। অথচ থ্যাকারের যুগে সাম্যমৈত্রীর জয়ধ্বনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিল।

চেষ্টারটন সাহেব বলেন, তাহার কারণ এই যে, আধুনিক সমাজের মাথার উপরে ধর্ম্ম বা তত্ত্বল্য অন্য কোনও উচ্চ আদর্শ বর্ত্তমান নাই। চসারের সমাজ ও থ্যাকারের সমাজ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, আমাদের দেশের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে চিত্রিত সমাজ সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই বলা যাইতে পারে।

এইবার শিল্প ও সাহিত্য প্রচারের দিকটা দেখা যাউক। আধুনিক সাহিত্য মুদ্রিত গ্রন্থাকারে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়, সুতরাং ইহা অনেক পরিমাণে অধ্যয়নকক্ষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। প্রাচীন সাহিত্য কিন্তু কেবল গ্রন্থমধ্যে আবদ্ধ থাকিত না। অধিকাংশ প্রাচীন কাব্যই গানের জন্য রচিত হইত, এবং গান, আবৃত্তি, কথা প্রভৃতির দ্বারা পণ্ডিত হইতে নিরক্ষর পর্য্যন্ত সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচারিত হইত। সামাজিক জীবনের নানা পর্ব্ব ও উৎসব উপলক্ষে এই সকল কাব্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে গীত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের দেশের মনসার গান, চণ্ডীর গান, শিবের গান প্রভৃতি ও মধ্যযুগের ইউরোপের রোমান্স কাব্যগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আধুনিক সমাজে যে পরিমাণে ভাবরসচর্চ্চা উঠিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, সেই পরিমাণে সামাজিক জীবনে যে সকল আনন্দমিলনের ক্ষেত্র ছিল, তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। বর্ত্তমান যুগের ডেমোক্রেসী Democracy বা প্রজাতন্ত্রের যে আদর্শ, তাহাতে প্রীতি অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্যের ভাবই প্রবল। সুতরাং এই ডেমোক্রেসির আদর্শ অবলম্বন করিয়া কোনও সামাজিক মিলনক্ষেত্র বা সামাজিক শিল্প সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাই সাহিত্য এখন ক্রমশঃ বিশেষভাবে কেবল কলারসাভিজ্ঞ পণ্ডিতসমাজেরই উপভোগ্য হইয়া উঠিতেছে, নিরক্ষর অশিক্ষিত জনসমাজের সহিত তাহার আর৺ কোন সম্পর্ক নাই। সাহিত্য সম্বন্ধে যে কথা, শিল্প সম্বন্ধেও সেই কথা। আধুনিক চিত্র ও মূর্ত্তি প্রভৃতি আর্টগ্যালারীর কাচের আলমারীতে শোভা পাইয়া বিশেষজ্ঞের আনন্দসম্পাদন করিয়া থাকে। প্রাচীন শিল্প ঘটী বাটী সাজ সরঞ্জাম হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দিরাদির প্রাচীরগাত্রে চিত্রিত বা ক্ষোদিত কাহিনী পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই সামাজিক সৌন্দর্য্যবোধ ও ভাবুকতার পরিচয় প্রদান করিত।

অবশেষে শিল্পী ও শিল্প-সৃষ্টির দিক হইতে একবার উভয়বিধ শিল্পের প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করা যাউক। প্রাচীন শিল্পে শিল্পী সামাজিক ভাব বা আদর্শের

ভৃত্য বা সেবকমাত্র। বিষয় ও ভাব নির্ব্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া রচনাভঙ্গী পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই শিল্পীকে প্রচলিত বাঁধা পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইত। কেহ কেহ মনে করেন, এ অবস্থায় শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ সম্ভবপর নহে। কিন্তু বাঁধা পদ্ধতি প্রতিভাবান্ ব্যক্তির পক্ষে বাধাস্বরূপ না হইয়া সহায়রূপেই পরিণত হয়। কারণ, কবিকে নিজের ভাষা, নিজের মালমশলা নিজে সৃষ্টি করিয়া লইবার জন্য বৃথা শক্তিক্ষয় করিতে হয় না। প্রচলিত ছাঁচের মধ্যে রসপ্রতিষ্ঠাই তাঁহার প্রধান কার্য্যের মধ্যে গণ্য হয়। সুতরাং প্রাচীন শিল্পের একটা গুণ এই দেখা যায় যে, তাহা অতি সহজেই শ্রোতা বা দ্রষ্টার অন্তঃকরণে বিশেষ বিশেষ ভাবের উদ্রেক করিতে সমর্থ হয়। অপর দিকে যে সকল শিল্পী প্রতিভা হিসাবে নিকৃষ্ট, তাঁহাদিগকেও একটি সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিতে হইত বলিয়া তাঁহাদের শিল্প-রচনা-চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হইতে পারিত না। বৈষ্ণব পদকর্ত্তৃদিগের মধ্যে সকলেই কিছু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমকক্ষ ছিলেন না—তথাপি এক নির্দ্দিষ্ট পন্থা ও রচনাভঙ্গী অবলম্বন করার দরুণ সকলেরই রচনা বেশ সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আধুনিক শিল্পী যদি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হন, তাহা হইলে তাঁহার শিল্প-রচনা-চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থতায় পরিণত হয়।

আর এক দিকেও প্রাচীন শিল্পীর সুবিধা ছিল। প্রাচীনকালে যে ভাবের আবহাওয়ার মধ্যে জনসমাজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত, তাহা শিল্প-রচনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। শিল্পী সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যেই শিল্পের উপকরণ পাইতেন এখন সামাজিক জীবনে ভাবের হাওয়া বহে না, সুতরাং শিল্পীকে কষ্ট-কল্পনা করিয়া প্রায়ই প্রাচীন সমাজের চিত্রপট কল্পনার সাহায্যে সম্মুখে ধরিয়া শিল্প রচনা করিতে হয়। কারণ, আধুনিক জীবনের শুষ্কতার মধ্যে শিল্পের মালমশলা বড় বেশী পাওয়া যায় না। এই জন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ইংরাজ কবিদিগের মধ্যে প্রাচীন গ্রীস ও মধ্যযুগের আখ্যানাদি ও সেই সেই যুগের জীবনযাত্রা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাব্যরচনার একটা চেষ্টা দেখা যায়। এই সকল কারণে পাশ্চাত্যজগতে ভাবপ্রাণ শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ অনুকূল বেষ্টনীর অভাবে হাঁপাইয়া উঠিয়াছেন। সে দিন বর্ত্তমান ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ইয়েটস্ (W. B. Yeats) কবিবর রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলির ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে কবি ও শিল্পীদিগের বার আনা শক্তি ও উদ্যম বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের সহিত সংগ্রামেই

বাধিত হয়। শিল্পীর সমস্ত শক্তি এখন আর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে নিয়োজিত হইতে পারে না। প্রমাণ-স্বরূপ রস্কিন ও মরিসের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যব্যাখ্যাই স্ব স্ব জীবনের মুখ্য সাধনা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন, বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা শিল্প-সৃষ্টির অনুকূল নহে, অথচ বর্ত্তমান জীবন্ত সমাজের মধ্য হইতে অনুপ্রাণনা না পাইলে কি শিল্পসৃষ্টি হইতে পারে? কষ্টকল্পনা করিয়া প্রাচীন যুগের স্বপ্ন রচনা আর কতদিন করা যায়? তাঁহারা দেখিলেন, আধুনিক সমাজের এই শুষ্কতার মধ্যে পুনরায় ভাবরসের সঞ্চার করিতে না পারিলে শিল্পের উৎস একেবারে শুকাইয়া যাইবে। তাই তাঁহারা আধুনিক সমাজব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদিগের সেই আকাঙ্ক্ষার বাণী এখন পাশ্চাত্যজগতের নানা স্থান হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ভাবুকমাত্রেই এখন প্রাচীন সমাজের মত একটা কোনও ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

এতক্ষণ আমরা আমাদের মূল বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে বেশীর ভাগ পাশ্চাত্য সমাজের কথাই আলোচনা করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, বর্ত্তমান যুগের জীবনযাত্রা-প্রণালীর যে সকল বিশেষ ধর্ম্ম আমাদের সমাজে ক্রমশঃ সংক্রামিত হইতেছে, তাহার পূর্ণপরিণতির চিত্র দেখিতে হইলে পাশ্চাত্য সমাজেই দেখিতে হইবে। আমাদের সমাজে আধুনিক সভ্যতার পূর্ণপরিণত স্বরূপ বেশ স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয় নাই। এখনও আমরা অন্ততঃ সমাজের বারো আনা লোক যাত্রা কীর্ত্তন কথকতায় রস পাই, এখনও আমাদের দেশে পারিবারিক ও সামাজিক সকল প্রকার বন্ধন শিথিল হইলেও ছিন্ন হয় নাই। Old Age Pension এর আইন পাশ করিতে হইবে, কি আশু নারীসমাজকে রাজনৈতিক ভোটযুদ্ধে নামাইয়া দিতে হইবে, এরূপ আশঙ্কা এখনও আমাদের মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের তুলনায় আমাদের সামাজিক বন্ধনগুলি যে অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। এখন আর সেরূপ স্বাভাবিকভাবে মন্দির জলাশয় বৃক্ষ পান্থশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় না, অন্ততঃ ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে ও যে যে সমাজে ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী আদর্শের প্রবল প্রতাপ, সেই সেই সমাজে ও প্রদেশে এই সমাজধর্ম্মপালন একরূপ বন্ধ হইয়াছে। এ অবস্থায় দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য ও সমাজব্যাপারে দেশের ভাব রক্ষার জন্য যে এক

জীন আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা সমাজের পক্ষে ও শিল্প-সাহিত্যের পক্ষে শুভ-লক্ষণ মনে করিতে হইবে। কিছুদিন হইল, চিত্রশিল্পের রাজ্যে এই বাঙ্গালা দেশে এইরূপ একটা ভারতীয়ভাব ফুটাইবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সাহিত্যেও এই চেষ্টার অল্পাধিকপরিমাণে পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কেবল শিল্প ও সাহিত্যের রাজ্যে ভারতীয়ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিলেই চলিবে না। সমাজের চারি দিকে যদি বিদেশী ভাবের, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হাওয়া বহিতে থাকে, শিল্পী ও সাহিত্যিককে যদি প্রাত্যহিক সংসারের কার্য্যে পাশ্চাত্য স্বাতন্ত্র্যের আদর্শই অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে চিত্র বা কাব্যের বিষয় বা রচনাভঙ্গী ভারতীয় হইলেও, ভাবের আন্তরিকতার অভাবে সেই শিল্প একপ্রকার সৌখীনতা বা স্বপ্নবিলাসের মত হইয়া পড়িবে। সেই জন্য এখন দেশীভাবে দেশী ছাদের শিল্পচর্চ্চা করিতে হইলে সমাজের মধ্যেও সেই সকল দেশীভাব রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। আমাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে সময়ে আমাদের এই চৈতন্যোদয় হইয়াছে, সে সময়ে আমাদের পুরাতন সামাজিক জীবনের প্রাণ-শক্তি একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। গার্হস্থ্য পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যে সকল দেশী আদর্শ, তাহা এখনও অনেক পরিমাণে বজায় আছে। এখনও পুরাতন আনন্দ-মিলনের ক্ষেত্রগুলি বর্ত্তমান। যাঁহারা দেশী শিল্প ও দেশী সাহিত্য চান, তাঁহাদিগের এই জীবন্ত সমাজকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। এই ক্ষীণপ্রাণ সমাজ-শরীরে প্রাণ-শক্তির সঞ্চার করিয়া ইহাকে পুনরায় সবল করিতে না পারিলে শিল্পের রাজ্যে ভারতশিল্প ও সাহিত্য সেই Pre-Raphaelite দের শিল্পের মত অতীত যুগের স্বপ্ন লইয়া খেলায় মাতিয়া থাকিবে। তাহা সামাজিক জীবনে, জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।

সমাজের ক্ষেত্র হইতে শিল্প-সাহিত্য যেমন জীবনীরস সংগ্রহ করে, অপর দিকে তেমনই সমাজের পুনরুজ্জীবন কার্য্যেও শিল্প-সাহিত্য সহায়তা করিতে পারে। শিল্পিগণ যদি জীবন্ত সমাজের অনুপ্রাণনায় ধন্য হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এখন কিছুদিন এই সামাজিক জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহাদিগের শিল্প-চেষ্টা পরিচালিত করিতে হইবে। তাঁহারা আদর্শ সমাজের জীবন্ত উজ্জ্বল চিত্র লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করুন ও ভাবরসসৌন্দর্য্যহীন মানবসম্বন্ধলেশশূন্য আধুনিক সমাজের যে বীভৎসতা, তাহাও যথাযথরূপে অঙ্কিত করিয়া দেখান। পাশ্চাত্য জীবনপ্রণালীর যে মোহিনী-শক্তি আমাদের

উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করিতেছে, পাশ্চাত্য সমাজের পূর্ণপরিণত সার্ব্বাঙ্গীন চিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা সংস্কারের অভাব তাহার একটা কারণ। এই কৃত্রিম ঐন্দ্রজালিক মোহ নষ্ট করিয়া দিয়া আমাদের মনশ্চক্ষুর স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইতে হইলে পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সেইরূপ, প্রাচীন সমাজের যে লোভনীয়তা, তাহাও পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবেই আমাদের সম্মুখে সেরূপ প্রতিভাত হইতেছে না। সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ কিছুদিন এই সমাজচিত্রকেই নিজ নিজ রচনার বিষয়ীভূত করিয়া লউন। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুপ্ত সমাজবোধ এইরূপে জাগ্রত করিয়া দিন। যেন আমাদের এই সনাতন সমাজকে কখনও Old Age Pensions Act বা Insurance Act এর দ্বারা বিড়ম্বিত ও অপমানিত হইতে না হয়। যেন পুনরায় আমরা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলে মিলিয়া পুনরায় সাংসারিক জীবনে ভাবের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, বৃহৎ সামাজিক ভাবের মধ্যে আপন আপনব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ডুবাইয়া দিয়া যেন আবার সামাজিক সাহিত্য ও শিল্পের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হই। *

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

বৈদিক যুগের বেশ-ভূষা।

মানসিক ও নৈতিক উন্নতির প্রকৃতি দেখিয়াই মানবের যথার্থ সভ্যতার বিচার হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের গভীরতা, সাহিত্য-রচনায় কৃতিত্ব ও সামাজিক বিধানের পবিত্রতা যে যথার্থ উন্নতির ও মনুষ্যত্ববিকাশের সাক্ষী, তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই, কিন্তু জাতির বাহ্য সম্পদের পরিচয় হইতেও সভ্যতার প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। পরিধেয় বসন-ভূষণের বিবরণে, পরিচ্ছদ ও বেশ-বিন্যাসের পদ্ধতির কথায় প্রাচীনকালের সভ্যতার প্রকৃতি কথঞ্চিৎ অনুমিত হইতে পারে। প্রাচীনকালের যথার্থ ইতিহাসের অর্থ যখন প্রাচীনকালের একটি খাঁটী ছবি তুলিয়া লওয়া, তখন অতীত কালের বেশ-ভূষার বিবরণ পাঠকদিগের প্রীতিপ্রদ হইতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে খুঁজিয়া পাতিয়া সে যুগের বেশ-ভূষার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাই পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

কেশ-বৃদ্ধি ও কেশ-রচনার প্রতি ঋষি ও ঋষি-পত্নীদিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাহাতে মাথায় টাক না পড়ে, এবং চুল খুব ঘন ও বড় হয়, ঋষিরা তাহার জন্য দেবতার কাছে মন্ত্রপাঠ করিতেন (অথর্ব্ব ৬,—১৩৬

৩৭)। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই দীর্ঘ কেশ রাখিবার প্রথা ছিল; কারণ, বশিষ্ঠ-বংশের বিশেষ পরিচয়ে অনেকবার উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঐ বংশের পুরুষেরা মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে চূড়া বাঁধিতেন। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের মত দীর্ঘকেশ ধারণ হয় ত সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল; কেন না, শতপথ-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে (৫,—১, ২, ১৪) যে পুরুষের পক্ষে দীর্ঘ কেশধারণ শোভন নহে, এবং উহাতে স্ত্রীজাতিসুলভ কমনীয়তা ও দুর্ব্বলতা সূচিত হয়।

ঠিক্ যাহাকে শিখা-ধারণ বলে, বৈদিক যুগে তাহা ছিল কি না, সন্দেহ। কেশ দীর্ঘ হইলেও শিখা হয় না; কেন না, শিখা করিতে হইলে চারি দিকের কেশ ছেদন করিতে হয়। শিখা শব্দটি এবং শিখাধারণের পদ্ধতির কথা শতপথ ব্রাহ্মণের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও সাহিত্যে নাই। এই গ্রন্থে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, ঐ শিখা মস্তকের মধ্যভাগে গ্রথিত হইত, এবং কেবল মরণাশৌচ পালন করিবার সময়েই ঐরূপ ভাবে শিখাবন্ধনের প্রথা ছিল। পুরুষের পক্ষে অন্য সময়ে শিখা উন্মুক্ত রাখাই রীতি ছিল। অন্য পক্ষে, স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অশৌচ-পালনের সময়ে এবং বিরহের অবস্থায় নারীরা মুক্তকেশা থাকিতেন। অন্য কোনও অবস্থায় কেশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখা অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইত।

পুরুষের পক্ষে যখন দীর্ঘ-কেশধারণের প্রথা ছিল, তখন অংশতঃ স্ত্রী-লোকের মত কেশ-বিন্যাসের প্রথাও ছিল। চুলের এক প্রকার বিনুনির নাম ছিল "কপর্দ্দ"। ঐ প্রকার বিনুনি-করা চুল বা কপর্দ্দ দেবতাদিগের মধ্যে রুদ্র ও পূষন্ নাকি বশিষ্ঠ ঋষির মত খোঁপা করিয়া পরিতেন। বশিষ্ঠ যে "দক্ষিণতঃ কপর্দ্দ" ধারণ করিতেন, তাহার অনেক উল্লেখ আছে। যে চুলে কোনও রকম বিনুনি থাকিত না, এবং স্বাভাবিকভাবেই লম্বিত হইত, তাহার নাম ছিল "পুলস্তি।" অধিকসংখ্যক লোকেই এই পুলস্তি ধারণ করিত, মনে হয়।

অবিবাহিতা নারীদিগের কেশ-রচনায় একটু নূতনত্ব ছিল। পৃষ্ঠভাগের সমগ্র লম্বিত কেশরাশি চারিটি গুচ্ছে বিভক্ত করিয়া লইয়া চারিটি সূক্ষ্ম বেণীর সংযোগে একটি বড় বেণী বা কপর্দ্দ রচিত হইত; এই কপর্দ্দের নাম ছিল "চতুষ্কপর্দ্দ"। চতুষ্কপর্দ্দ পশ্চাদ্ভাগে দুলিত, এবং উহা কবরী-রূপে গ্রথিত হইত না।

মাথার মাঝখানে সিঁথি করিয়া, কেশের কোনও প্রকার বিনুনি না করিয়া, সমস্ত কেশগুচ্ছ জড়াইয়া নারীরা যে প্রকার খোঁপা বাঁধিতেন, তাহার নাম ছিল "ওপশ"। এই ওপশের উল্লেখ ঋক্ ও অথর্ব্ব বেদে পাওয়া যায়। দেবতাদিগের মধ্যে সিনিবালী এই প্রকারের কেশরচনা করিতেন বলিয়া তাঁহার নামের বিশেষণ হইয়াছিল "স্বৌপশা"। সাধারণ বিনুনি করিয়া যদি খোঁপা বাঁধা না হইত, তাহা হইলে সেই প্রকারের কেশরচনার নাম হইত "পৃথুষ্টুক", এবং "বিষিতষ্টুক"। এই শ্রেণীর কেশরচনা চতুষ্কপর্দ্দ হইতে অল্পমাত্র ভিন্ন। মাথার সিঁথির নাম ছিল "সীমন্" (সীমা); কিন্তু ঠিক "সীমন্ত" নহে।

কেশ-রচনা করিয়া মাথায় ফুল পরিবার প্রথা ছিল, এবং কবরী যাহাতে শিথিল না হয়, তাহার জন্য "কুরীর" নামক এক শ্রেণীর অলঙ্কার পরিহিত হইত। "কুরীর" না জুটিলে "শল্‌লী" বা শজারুর কাঁটা ব্যবহৃত হইত।

ধুতি হউক, শাড়ী হউক, পরিধেয় বসনের সাধারণ নাম ছিল "পরিধান"; তবে যেখানে কৌপীন পরিয়া পরে বহির্ব্বেশ পরিহিত হইত, সেখানে সেই বহির্ব্বেশের নাম হইত "প্রবর" বা "প্রবার"।

যুগপৎ কৌপীন ও বহির্ব্বেশ পরিধান স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল; এবং পরিহিত কৌপীনের নাম ছিল "নীবি"। পরবর্ত্তী সময়ের সংস্কৃত সাহিত্যে দেখিতে পাই যে, "নীবি" অর্থ বস্ত্রের গ্রন্থি বা কোমরের খোঁট। এখন ছত্রিশগড় ও ছোট নাগপুর ভিন্ন অন্য কোথাও নীবি (বৈদিক অর্থে) ব্যবহৃত হয় বলিয়া জানি না।

পরিবার কাপড় যেন সেকালে একালে একই ভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, মনে হয়। কাপড়ের খাসা পাড় থাকিত, এবং ঐ পাড়ের নাম ছিল "তূষ"; দুইদিকের শেষভাগেই ছিলে থাকিত, এবং ঐ ছিলের নাম ছিল "দশা"। "দশা", এবং কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতরূপে "দশি" শব্দ এখনও অনেক স্থানে ব্যবহৃত আছে।

রমণীরা বস্ত্রার্দ্ধে অঙ্গ আবৃত করিলেও, অনেক সময়ে "দ্রাপি" ও "তার্প্য" ব্যবহার করিতেন। "দ্রাপি" অর্থ সেলাই-করা cloak; এবং "তার্প্য" পশমের অঙ্গ-আবরণ বলিয়া মনে হয়।

কাপড় বুনিবার তাঁতের নাম ছিল "বেমন্", "তানার" নাম ছিল তন্তু। "তন্তু", "তন্ত্র" এবং "পড়েন"-এর নাম ছিল "ওতু"। "মাকু"র নাম

ছিল "তসর"; এখন কিন্তু তসর বলিলে এক রকমের মোটা রেসমের কাপড় বুঝায়।

পশমের প্রচুর ব্যবহার ছিল। কোন প্রকার রঙ্ না করা পশমের চাদরের নাম ছিল "পাণ্ডু" (পাণ্ডু-অ); কিন্তু উহা শেলাই করিয়া, ব্যবহার করিলে উহার নাম হইত "শামুলয়"। "শামুলয়" নামক পরিচ্ছদের ধারগুলি মুড়িয়া শেলাই করা হইত, এবং এই মুড়িভাঙ্গা শেলাইএর বৈদিক নাম ছিল "সিচ্"। শামুলয় কথাটি হইতেই "শাল" শব্দের উৎপত্তি কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। শামুলয় বস্ত্রকে যদি ঢিলা পিরানের মত শেলাই করিয়া লওয়া হইত, তবে তাহার নাম হইত "সামূল"। এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত "সামূল"কে woollen shirt বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন।

যাহারা বস্ত্র বুনিত, তাহাদের দুইটি নাম পাওয়া যায়, যথা—"বায়' ও "সিরী"। বায় শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "বয়িত্রী" পদ পাওয়া যায়।

কাপড়ের উপরে ফুল-তোলা কিংবা অন্য রকমের সূচের বাহারের কাজ করা স্ত্রী-পরিচ্ছদের নাম ছিল "পেশস্"। এই Embroidered বস্ত্র স্ত্রীলোকেরা কেবল নাচিবার সময়েই পরিতেন বলিয়া অনুমিত হয় (ঋ ১. ৯২, ৪-৫। দেবী উষা যেন উজ্জ্বল বর্ণের "পেশস্" পরিয়া "নৃত্যন্তী যোষিদিব" শোভা পাইতেছেন, এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। যে সকল স্ত্রী কাপড়ের উপর এইরূপ সূচাকার্য্য করিত, তাহাদিগকে "পেশঃকারী" বলিত। অনেক দিন হইতেই ভদ্ররমণীর নৃত্য উঠিয়া গিয়াছে, এবং যাহারা এ কালে নৃত্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাদের সুখ্যাতি নাই। এই কারণেই পূর্ব্ববঙ্গে "নটী" শব্দ পতিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের "পেশাকার" শব্দও উদাহৃত বৈদিক শব্দের সহিত সম্পর্কিত কি না, বলিতে পারি না।

গরম কাপড়ের জন্য মেষের লোম ("অবি") ও "অজিন" ব্যতীত অন্য কিছু ব্যবহৃত হইত কি না, জানিতে পারা যায় না। "অজিন" প্রথমতঃ অজ বা ছাগের চর্ম্ম অর্থে, এবং পরে হরিণের চর্ম্ম অর্থে ঋগ্বেদ, অথর্ব্ব বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। অনেক পরবর্ত্তী সময়ে ব্যাঘ্রাদির চর্ম্মও অজিন বলিয়া অভিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। গান্ধারের মেষ বেশি "ঊর্ণাবতী" ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে।

আর্য্যদিগের প্রদেশবিশেষে উষ্ণীষের ব্যবহার স্ত্রীপুরুষের উভয়ের মধ্যেই ছিল বলিয়া ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে বিশেষ উল্লেখ আছে। অথর্ব্ব বেদে (১৫, ২, ১৩) ইন্দ্রাণীর মস্তকেও উষ্ণীষ থাকার কথা পাওয়া যায়। অনেক বৈদিক উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, আর্য্যদিগের মধ্যে যাঁহারা পঞ্জাব-সীমান্তে কিংবা আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে বাস করিতেন, তাঁহারাই বিশেষ ভাবে উষ্ণীষ ধারণ করিতেন ; এবং ইঁহারা ব্রাত্য অর্থাৎ হীন বা নিন্দিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ মধ্যদেশের উষ্ণীষ ধারণ না করিবার প্রথা আর্য্যপদ্ধতি বলিয়া, উহা পরবর্ত্তী যুগেও পূর্ব্ব দেশে অনুকৃত হইয়াছিল ; এবং তাহারই ফলে বঙ্গে ও ওড়িশায় কদাচ উষ্ণীষ ব্যবহৃত হয় নাই। যজুর্ব্বেদে দেখিতে পাই যে, রাজারা যখন যজ্ঞ করিতে বসিতেন, তখনই মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করিতেন।

বস্ত্রাদি ময়লা হইলেই সেই ময়লা কাপড় চোপড়কেই "মল" বলিত ; এবং ধোবার নাম ছিল "মলগ"। পরবর্ত্তী সময়ের "রজক" শব্দ ধোবা অর্থে ব্যবহৃত হইত না ; কারণ রজকের কাজ ছিল বস্ত্রাদি রঙ্‌ করা। ধাতুগত অর্থ হইতেও উহাই সূচিত হয়। আমরাই একালে ভুল করিয়া ধোবার সাধু ভাষা রজক করিয়া তুলিয়াছি, নহিলে রজক আমাদের রঙ্‌রেজ।

বৈদিক যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর "উপানহ্‌" বা পাদুকা ব্যবহৃত হইত। কাষ্ঠ-পাদুকা ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর চর্ম্মেও পাদুকা নির্ম্মিত হইত। শূকরের চর্ম্মে উপানহ্‌ প্রস্তুত হইত বলিয়া শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে।

কেশ-সংস্কারাদি কার্য্যের জন্য যাহারা নিযুক্ত হইত, তাহাদের নাম ছিল "বপ্তা"; বপ্‌ অর্থ ঠিক ক্ষৌরী করা। বপ্তা বা নাপিত (নাপিত শব্দটি অত্যন্ত অর্ব্বাচীন) "ক্ষুর" ব্যবহার করিত, এবং ঐ ক্ষুর খুব ভাল লোহায় প্রস্তুত হইত।

সাজ সজ্জা প্রভৃতির সময়ে মুখ দেখিবার জন্য আয়না ব্যবহৃত হইত, এবং আয়নার নাম ছিল "প্রাকাশ"। বৈদিক যুগের পূর্ব্বেও যে ভারতবর্ষে কাচের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহা প্রাগৈতিহাসিক কালের ব্যবহৃত কাচের সামগ্রীর আবিষ্কার হইতে জানা গিয়াছে। এরূপ স্থলে উল্লিখিত ঋগ্বেদীয় "প্রাকাশ"কে কেবলমাত্র glazed metal used for mirror বলিয়া সুপণ্ডিত মেক্‌ডনেল যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে পারি না।

বস্ত্রাদি ব্যতীত যে সকল অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত, তাহার সকলগুলির গড়ন সম্বন্ধে ধারণা হওয়া সুসাধ্য নহে। কোনও কোনও অলঙ্কারের কেবল নামমাত্রই

জানিতে পারা যায়; কোন্ অঙ্গে ব্যবহৃত হইত, তাহাও ভাল করিয়া বুঝা যায় না। যাহা হউক, অলঙ্কার গুলির কথঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি।

নারীরা তাঁহাদের ওপশ বা খোঁপার উপর (সম্ভবতঃ খোঁপার উপরিভাগ ঢাকিয়া) "কুম্ব" নামক স্বর্ণালঙ্কার পরিতেন। উহা কি ঠিক দক্ষিণ দেশে ব্যবহৃত মাথার চাঁদের মত ছিল? "কুরীর" চুলের কাঁটার মত ব্যবহৃত হইলেও অলঙ্কারবিশেষই ছিল।

"কর্ণশোভন" বা ইয়ারিং স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করিতেন; তবে পুরুষের পক্ষে গোলাকৃতি "প্রবর্ত্ত" পরাই নিয়ম ছিল। এই প্রবর্ত্তেরই ক্রমবিকাশে দক্ষিণদেশের কুণ্ডলের সৃষ্টি।

বিবাহের সময় কন্যাকে "ন্যোচনী" নামক অলঙ্কার পরিতে হইত। ন্যোচনী যে মুখের সম্মুখভাগে দুলিত, তাহা কতকটা বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু উহার গড়ন কিরূপ ছিল, তাহা জানা যায় না। ন্যোচনী হইতে প্রাকৃত ভাষায় "ন্যোতনী" হইয়াছিল, মনে হয়। কিন্তু এই বৈদিক ন্যোচনী সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না। ন্যোচনীর ন্যোতনী রূপ হইতে আমাদের "নত্" হইয়াছে কি না, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারিব না; তবে শব্দ-সাদৃশ্যে যাহা মনে হইল, তাহাই বলিলাম। পাঠকেরা এ কথাও স্মরণ রাখিবেন যে, অনেক বৈদিক শব্দ প্রাকৃতের পথ বাহিয়া আসিয়া আমাদের প্রচলিত ভাষায় রহিয়াছে; অথচ সংস্কৃতে ঐ সকল শব্দ অজ্ঞাত।

"মনা" নামক একটি অলঙ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। টীকাকারেরা অর্থ করিয়াছেন যে, ঐ অলঙ্কার-প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত অভিলাষ বা মন হয় বলিয়া অলঙ্কারটির মনা নাম হইয়াছিল। কিন্তু উহা কি অলঙ্কার, কোথায় পরিত, এ সকল কথা কোনও টীকায় নাই।

"খাদি" নামক একটি অলঙ্কারের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে হিরণ্যখাদির অনেক উল্লেখ আছে। এই চক্রাকার খাদি হাতে (মণিবন্ধে) ও পায়ের নিম্ন প্রদেশে পরিহিত হইত; কাজেই খাদি বলয়ও বটে, anklet ও বটে। ঋগ্বেদের খাদি অনেক পরবর্ত্তী সময়ের প্রাকৃতে "খাড়ি" হইয়াছিল, এবং সেই "খাড়ি" হইতেই আমাদের "খাড়ু"র উৎপত্তি বলিয়া অনুমান হয়।

"নিষ্ক" শব্দটি মুদ্রা অর্থে পাওয়া যায়, এবং গলার মালা অর্থেও পাওয়া যায়। এই কারণে অনেকেই অনুমান করিয়া থাকেন যে, স্বর্ণ ও রৌপ্য নিষ্ক মুদ্রারূপেই ব্যবহৃত ছিল, এবং ঐ মুদ্রাই সূতায় গাঁথিয়া গলার মালা করা হইত।

"রুক্ম" নামক স্বর্ণ-অলঙ্কারটি যে প্রকার অর্দ্ধগোলাকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে উহা ঠিক হাঁসুলি ছিল, বলিতে পারা যায়।

ঋগ্বেদে যে "মণি"র উল্লেখ আছে, উহা হীরক বলিয়া স্বদেশ বিদেশের সকল পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই মণিতে যে ছিদ্র করিতে পারা যাইত, এবং অনেক মণি ছিদ্র করিয়া সূতায় গাঁথিয়া হার করিয়া পরিয়া যে বড়মানুষেরা "মণিগ্রীব" হইতেন, তাহা সুস্পষ্ট জানিতে পারা যায়।

আমরা যাহাকে মুক্তা বলি, তাহার বৈদিক নাম "বিমুক্তা"। এই মুক্তা কোথায় সংগৃহীত হইত, বৈদিক উল্লেখ হইতে তাহা ধরিতে পারা যায় না। মণির ব্যবহারের মত মুক্তার ব্যবহারও বড়মানুষদিগের মধ্যেই চলিত ছিল।

শঙ্খ হইতে নানা শ্রেণীর অলঙ্কার প্রস্তুত হইত। সম্ভবতঃ একালে হাতে পরা ভিন্ন উহার অন্য কোনও ব্যবহার প্রচলিত নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দ্বিজেন্দ্র-প্রসঙ্গ।*

সে আজ বহুবর্ষের কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বৃদ্ধপ্রপৌত্রীর বিবাহোপলক্ষে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে আমি কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে সর্ব্বপ্রথম দর্শন করি। যত দূর স্মরণ হয়—সে দিন সে গৃহে নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্র, কবিবর রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র, বিচারপতি আশুতোষ প্রভৃতি বহু সাহিত্য-রসজ্ঞ ব্যক্তি ফরাসের উপরে উপবিষ্ট ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত-স্রোতে সেদিন হাস্য-লহরীর যে বিচিত্র মোহন লীলা-বিভঙ্গ লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা এ জীবনে বিস্মৃত হইতে পারি নাই, বুঝি কখনও পারিবও না। "নন্দলালে"র স্বদেশপ্রীতি হইতে আরম্ভ করিয়া, "কিন্তু"-পরাহত "হ'তে পারতাম" দলের বিচিত্র কাহিনী সকল তিনি অকুণ্ঠ কণ্ঠে গাহিতেছিলেন; আর, ফরাসের উপরে ভারতের শিরোভূষণগুলি সরল হাস্য-বিভায় গৃহতল সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিলেন। কেবলমাত্র কর-স্পর্শ-সুখে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়াই সেদিন দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট

---

* গত জ্যৈষ্ঠ মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার উদ্যোগে এক বিরাট সাধারণ-সভা আহূত হয়। এই বিশেষ অধিবেশনে লেখক কর্তৃক এই চরিত-প্রসঙ্গ পঠিত হইয়াছিল।

হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ইহার অনেক পরে একদিন কবি প্রমথনাথের সঙ্গে কলিকাতার, ঝামাপুকুরে একটি ক্ষুদ্র আলয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত আমি প্রথম সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কবি-সন্দর্শনে ও তাঁহার সহিত সরস আলাপনে সেই অম্লান প্রভাতে আমার যে কত আনন্দই হইয়াছিল, তাহা বলিয়া বুঝানো অসম্ভব। দ্বিজেন্দ্রলাল সেদিন আমাকে—সেই প্রথম—তাঁহার রচিত পুস্তকগুলি উপহার দিলেন। আমি সেই "সাদরোপহার" প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম।

সারল্য ও বন্ধু বাৎসল্য

প্রথম হইতেই দ্বিজেন্দ্রলালের অকৃত্রিম কাপট্যলেশহীন ব্যবহারে আমি বিস্মিত ও আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। Convention বা সামাজিক-লৌকিকতা-শূন্য কবির হৃদয়-ক্ষেত্রে একেবারে অসঙ্কোচেই আমি প্রবেশলাভ করিয়াছিলাম। এ জীবনে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় কত শত গণ্য ও নগণ্য ব্যক্তির সংসর্গে আসিতে হইয়াছে; কিন্তু এমন শিশুসুলভ সারল্য আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

প্রথম পরিচয়ের পর হইতেই উদার-মতি দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ-আত্মীয়তায় পরিণত হইল। বেশ মনে পড়ে—তাঁহার তৎকালে প্রকাশিত "তারাবাই" নাট্য-কাব্যের আমি একটি সমালোচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে সমালোচনাতে প্রচুর পরিমাণে আমার স্পর্দ্ধা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন সন্ধ্যা-কালে আমার নিকটে আসিয়া, সহসা প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আমাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন, এবং আমার প্রদর্শিত ত্রুটীগুলি অম্লানমুখেই স্বীকার করিয়া, অপ্রত্যাশিত প্রীতির সুখ-বেদনায় আমাকে "ভাই, ভাই" বলিয়া কতই না কাঁদাইয়াছিলেন! দ্বিজেন্দ্রলালের বিনয়-বর্জ্জিত ব্যবহারের অন্তরালে তাঁহার যে বিরাট্ হৃদয় ছিল, তাহার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া যাহারা ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারা এ কথা আজ অকপটেই স্বীকার করিবেন যে, অমন শিশুর ন্যায় সরল ও কোমল, আকাশের ন্যায় প্রশান্ত ও উদার, মেঘের ন্যায় গম্ভীর ও অমিয়-বর্ষী হৃদয় এ সংসারে বস্তুতই পরম দুর্লভ সামগ্রী। অপ্রতিহত নির্ভীকতা ও সারল্য-সঞ্জাত, স্বভাব-সুলভ স্পষ্টবাদিতার দরুণ যাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলালকে 'অহঙ্কারী' 'দাম্ভিক' প্রভৃতি আখ্যায় অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই অবগতির উদ্দেশ্যে আমি এই ব্যক্তিগত ঘটনাটির উল্লেখ আবশ্যক বোধ করিলাম। আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত এ সংসারে কেহ কোনও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে

না। দ্বিজেন্দ্রলালেরও আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস চিরদিনই ভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। যে অদম্য প্রতিভার অপার্থিব প্রভায় আজ এই হতভাগ্য বঙ্গভূমি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে, সে দিব্যশক্তির স্পন্দন দ্বিজেন্দ্রলাল আজীবন অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন, এবং অত্যধিক সারল্যবশতঃ অনেক সময়ে তাঁহার সে বিশ্বাস 'দম্ভ' বা 'অহঙ্কারে'র ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে অণুমাত্রও সঙ্কুচিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের মহান্ চরিত্রের এই নিগূঢ় সত্যটুকু সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যে যাঁহারা ধারণা করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই তাঁহাকে 'অসামাজিক' ও 'অহঙ্কারী' প্রভৃতি বলিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন না।

পত্নী-বিয়োগ ও সংযম।

এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সহধর্ম্মিণী একটি বালক ও এক শিশু-কন্যার ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করিয়া সহসা পরলোকে প্রয়াণ করেন। দলে দলে দ্বিজেন্দ্রলালের গুণ-মুগ্ধ কত ব্যক্তি তৎকালে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, তাঁহার শোক-তপ্ত চিত্তে সান্ত্বনা দান করিবার প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু অতুল প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল সান্ত্বনা-দানের ব্যর্থ চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য অনেক সময়ে একান্তই অশোভনভাবে হাস্যালাপ করিতে থাকিতেন, কখনও বা সঙ্গীত-সুধায় সকলকে অভিনন্দিত করিয়া বিদায় দিতেন। এই সময়ে একদা দ্বিপ্রহরে একাকী পাইয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"আপনি এমন করিয়া এ সময়ে কি করিয়া অত হাস্যালাপ করেন, বুঝিতে পারি না।" তদুত্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল সজলকরুণলোচনে আমাকে বলিয়াছিলেন—"সবই পারি, কিন্তু, তার প্রসঙ্গ বা এই সকল নিয়ম-নির্দ্দিষ্ট, মৌখিক সান্ত্বনা-বাক্য আমার সহ্য হয় না। সে যে আমার কি ছিল, তাহা তোমরা কি বুঝিবে!" এই কথা বলিয়া কবিবর পুত্র-কন্যা দু'টির দু' হাত ধরিয়া, গৃহান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার অর্গল-রুদ্ধ করিলেন। আমি একাকী কিছুক্ষণ সেই শূন্য গৃহতলে অপেক্ষা করিয়া, এই মহাজনের অতুল প্রণয়ের অপরিমেয় গভীরতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিলাম। বলা বাহুল্য, পত্নী-হারা দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার লোকান্তরিতা প্রেমময়ী দেবীর সম্বন্ধে কোনও প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত শুনিতে বা বলিতে পারিতেন না। বহু প্রলোভন ও অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন নাই। স্ত্রীর প্রতি তাঁহার প্রেম কি প্রকার নিবিড় ও অচপল ছিল, তাহা 'আলেখ্য' কাব্যের "বিপত্নীক", "মাতৃহারা" "বিধবা" ও "হতভাগ্য" কবিতাগুলি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন,

তাঁহারা কথঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারিবেন। একবার মনে পড়ে,—তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ায় তিনি আমাকে ভয় দেখাইবার ছলে লিখিয়াছিলেন—"আমি তো আবার বিবাহ করিতেছি। বেশ কথা,—না?" আমি তদুত্তরে তাঁহার সে কথা অবিশ্বাস্য বলিয়া, যখন প্রকৃত ঘটনা কি, জানিতে চাহিয়াছিলাম, তখন প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে জানাইয়াছিলেন, —"বিবাহ সম্বন্ধে তোমার ধারণাই ঠিক। কাম-পরিণয় সমাজের দিক্ দিয়ে সমর্থিত হ'লেও হৃদয় তা'তে বাধা দেয়। সমাজকে জীবনে অনেক ঠকিয়েছি; কিন্তু, নিজেকে— হৃদয়কে ঠকিয়ে কেমন করে' বাঁচব ভাই? 'বিয়ে লোকের আর ক'বার হয়' এ তোমার লাখ কথার এক কথা।" দ্বিজেন্দ্রলাল বিবাহ করিলেন না। চিরজীবন অসীম সংযমে তিনি মোটা কাপড় ও সাধাসিধা চালই বজায় রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার জীবন—আদর্শ বিপত্নীক জীবনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গত দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে কেহ তৈল বা সাবান ব্যবহার করিতে দেখে নাই। রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ, নগ্ন গাত্র, নগ্ন পদ বিলাত-ফেরত দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের বাড়ীতে "ভুপ ভুপ" করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—আজও সে দৃশ্য যেন স্পষ্ট চোখেই দেখিতে পাইতেছি তিনি যে শুধু দ্বিতীয়বার বিবাহ না করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে;— বিপত্নীক দ্বিজেন্দ্রলাল আচারে, ব্যবহারে, জ্ঞানে, কর্ম্মে ও চিন্তায় যথার্থ বিধবারই ন্যায় অসীম সংযম—অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতার ১নং নন্দকুমার চৌধুরীর গলিতে কবিবর প্রাসাদসদৃশ সুদৃশ্য এক দ্বিতল হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া সে ভবনের নাম রাখিয়াছিলেন—'সুর-ধাম'। আমি সে নামের সার্থকতা না বুঝিয়া একদিন এই কবিত্বহীন নাম-করণ লইয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিলে, আমার নিকটে আসিয়া, কবিবর জনান্তিকে বলিলেন—"জান না? এ বাড়ী যে তাহার। আমি এখানে তাহারই স্মৃতির অন্তরালে ডুবিয়া থাকিব। তারই নাম ছিল—সুরবালা!" রহস্য উদ্ঘাটিত হইলে আমি এ প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার দরুণ প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম। তখন, কেন জানি না, সীতা-বিরহিত রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা আমার মনে পড়িয়াছিল।

সংসারের নানা কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াও তিনি নিতান্ত নির্লিপ্তের ন্যায়— আলু-থালু ভাবে—সন্ন্যাসীরই মত জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। লোক-নিন্দা-নিরপেক্ষ দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনে কখনও পর-মুখাপেক্ষী হন নাই। ভ্রষ্ট

চরিত্র লোকের মধ্যে গুণের সন্ধান পাইলে তিনি তাহার সহিত অসংকোচে মিশিয়াছেন।—আগুন লইয়াও তাঁহাকে খেলা করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু কখনও হাত পোড়ান নাই। শত বাসনার বিবিধ ও বিচিত্র প্রলোভন অতি সহজেই উপেক্ষা করিয়া,—

প্রলোভন হ'তে দূরে, বিজনে, অরণ্য-কোণে,
যোগী কি বৈরাগী
সংবরিতে আত্ম-মন, কি সাধন-সিদ্ধিতরে
নিত্য রহে জাগি—

তিনি সে সাধনে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিতই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলালকে একদিন "নীতিবাগীশ" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে সাহস করিয়াছিলেন, নিষ্প্রয়োজন হইলেও, আমি তাঁহাদেরই অবগতির জন্য এই কথাটা আলোচনা করা সঙ্গত মনে করিলাম।

স্বদেশ-প্রেম

আর একদিনের একটা ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। তখন কবিবর ৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। রবিবার, প্রাতঃকালে আমরা অনেকে তাঁহার বসিবার ঘরে গল্প-গুজব করিতেছি, সহসা দূর হইতে একটা স্বর আমাদের কাণে ভাসিয়া আসিল। তখন স্বদেশী-আন্দোলনের প্রবল বন্যায় দেশ পরিপ্লাবিত,—ঘরে বাহিরে পথে ঘাটে নগরে প্রান্তরে সর্ব্বত্র নব-জীবনের বিপুল বন্যা অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবহমান। আমরা তড়িৎবেগে সে কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম—কতকগুলি যুবক দল-বদ্ধ হইয়া মাতৃনাম গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন, সঙ্গে শত শত লোক মন্ত্রমোহিত চিত্তে সে সঙ্গীত-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহ-সমক্ষে আসিয়া সেই বিপুল জন-স্রোত সহসা সংক্ষুব্ধ ও গতিহীন হইয়া পড়িল। তখন সেই ভাব-তরঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং সে গানে যোগদান করিলেন, এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তিন চারিবার জলদ-নির্ঘোষে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে গগন প্লাবিত করিয়া দিলেন। সেইদিন তাঁহার রক্তিম মুখ-মণ্ডলে মহাসমারোহের যে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্মণ্ডল দেখিয়াছিলাম, তাহা এ দগ্ধ হৃদয়-পটে চিরজীবন স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়াইয়া মাতৃভক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল যে সঙ্গীত ও যে মন্ত্র বারংবার গাহিয়া উঠিয়াছিলেন, আজ এ হতভাগ্য দেশ সে গান আর শুনিতে পাইবে

না! আজ সে গভীর-গম্ভীর স্বর-তরঙ্গ একেবারেই অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে! স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় আমাকে একদিন কবিবর বলিয়াছিলেন—"এ দেশ আজ যদি পর-প্রসঙ্গ ও বিজাতি-বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রকৃত কল্যাণ-সাধনে তৎপর হয়, তবে এ জগতে এমন কোনও শক্তিই নাই যে, তাহার সে বলদৃপ্ত গতির রোধ করিতে পারে। কিন্তু অবথা এ অশোভন আস্ফালন ও যাহারা আমাদের শিক্ষা-গুরু—যাহাদের কৃপায় ও পুণ্যবলে আমাদের আজ এই যা' কিছু উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহাদের প্রতি আমাদের এ অন্ধ বিদ্বেষ যতদিন সম্যক্ তিরোহিত না হইবে, ততদিন আমাদের উদ্ধারের কোনও উপায়ই আমি দেখি না।" আজ দূরদর্শী রাজ-নীতিক দ্বিজেন্দ্রলালের সেই ভবিষ্যদ্বাণী আমার মানসশ্রবণে এখনও ঝঙ্কৃত হইতেছে। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল "প্রতাপসিংহ" নাটক প্রকাশিত করেন, এবং ভারত-গৌরব দুর্গাদাসের অমূল্য জীবন অবলম্বনে নাটকপ্রণয়নে রত হন। দুর্গাদাসের অনিন্দ্য আদর্শ চরিত যাঁহারা রাজস্থানে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কবিবরের "দুর্গাদাস" পাঠ করিলে বুঝিবেন,—যোগ্য কবির হাতে সে চিত্র কিরূপ বিচিত্র নৈপুণ্য সহকারে প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কি ব্যক্তি-গত জীবনের আচার-ব্যবহারে—কি সাহিত্য-সাধনার অবকাশে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশের ও স্বজাতির প্রকৃত কল্যাণকল্পে যে অনুপম সাহস ও অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এ দেশে যদি কখনও যথার্থ স্বাস্থ্য সঞ্চারিত হয়, তবে সেইদিন দেশবাসী সকলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কৃতজ্ঞহৃদয়ে নেত্র-জলে এই স্বদেশ-প্রাণ কর্ম্মবীরকে অকৃত্রিম প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পূজা করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

একবার পূজাবকাশে আমি গয়ায় গিয়া কয়েকদিন আমার নমস্য ও প্রাণ-প্রিয় সুহৃত্তমের অতিথি হইয়াছিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল তৎকালে গয়ার অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছিলেন। এই সময়ে এই অযোগ্য লেখক সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত একত্র বসবাস করিবার শুভ অবসর পাইয়াছিল। একদিন দুপুরবেলা আহারান্তে বসিয়া আছি; কবিবর বলিলেন—"দেখ, আমার মাথায় একটা গানের কতকগুলো লাইন আসিয়া ভারি জ্বালাতন করিতেছে, তুমি একটু বোসো;—আমি সেগুলো গেঁথে নিয়ে আসি।" অর্দ্ধঘণ্টা বা তাহারও কিছু অধিক কাল একাকী বসিয়া রহিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল দূর হইতে করতালি দিতে দিতে, গায়িতে গায়িতে আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন, এবং আমাকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়া কহিলেন,—"উঃ! কি চমৎকার গানই লিখেছি। শুনবে? শুনবে না কি? আচ্ছা, তবে শোন"—এই বলিয়া গাহিয়া উঠিলেন,—

"বঙ্গ আমার, জননী আমার,
ধাত্রী আমার, আমার দেশ।"

গানটা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, তখন, বলিতে লজ্জা হয়—পাবণ্ড আমি, আমারও চক্ষে জল আসিয়াছিল, আমি নীরবে, নতশিরে একটা অপার্থিব অনুভূতির আবেগে ক্ষণকালের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বন্ধুবর বলিলেন—"কি? কেমন লাগল?" আমি বলিলাম—"ধন্য আপনি!" বাল-স্বভাব দ্বিজেন্দ্রলাল একবার শুধু আমার মুখের দিকে হাসিয়া চাহিলেন, পরে আর কিছু না করিয়া, হাতে তাল দিতে দিতে নাচিয়া নাচিয়া গাহিলেন—

"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা,
কিসের ক্লেশ?
সপ্ত কোটী মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন
আমার দেশ।"

সে রাত্রে যথারীতি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় দ্বিজেন্দ্র-লালের আবাসে আসিয়া এই অগ্নি-গর্ভ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া উৎসাহে, গর্ব্বে, আনন্দে, বিস্ময়ে ও ভক্তির প্রাবল্যে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। শ্রীযুক্ত লোকেন পালিত মহাশয় তৎকালে গয়ার জজ ছিলেন—প্রত্যহই সন্ধ্যার সময়ে বন্ধু-বৎসল পালিত মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহে আসিতেন, এবং সাহিত্যিক বিতর্ক-বিচারে রাত্রি প্রায় একটা দুইটা পর্য্যন্ত যাপন করিতেন। "আমার দেশ" গানটি শুনিয়া লোকেন্দ্রনাথের যে অপূর্ব্ব উৎসাহ দেখিয়াছিলাম তাহা এ জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক "নূরজাহান" মুদ্রিত করিয়া "মেবার-পতনের" রচনায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। মেবারের গৌরব-ভাস্কর যখন ভারতাম্বরে প্রদীপ্ত, মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীর যখন সে প্রচণ্ড-প্রতাপ-তাপে প্রপীড়িত ও ম্রিয়মাণ—রাজপুত-শৌর্য্যের সেই সৌভাগ্য দিনের মেবারের মহিমা ও গর্ব্বের স্মৃতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া কবিবর "মেবার পাহাড়, উড়িছে যাহার রক্ত-পতাকা উচ্চশির" ইত্যাদি যে গানটি লেখেন, এই হতভাগ্য তখন তাঁহারই পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল। সঙ্গীতটি গ্রথিত হইলে আমি

মেবারের পতন বিষয়ে আর একটি যোগ্য গান রচনা করিতে বলিলাম। সেই দিনই সন্ধ্যার সময়ে আর একটি গান লিখিত হইল—

"মেবার পাহাড় শিখরে যাহার
রক্ত নিশান ওড়ে না আর !"

সুর-সংযোগ করিয়া সঙ্গীত দুইটি আমায় গাইয়া শুনাইলেন। আর এ জীবনে সে কণ্ঠ শুনিব না!—হায়, বুঝি তেমন গানও আর রচিত হইবে না।

এই সময়ে কোনও সুবিখ্যাত কবি ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী সরকারী কোনও কার্য্যোপলক্ষে গয়ায় আসিয়া কতিপয় দিবস দ্বিজেন্দ্র-সহবাসী হইয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার ও লোকেন্দ্র পালিত মহোদয়ের অনুরোধক্রমে বন্ধু আমার এই তিনটি গান গাহিয়া শুনাইতেছিলেন, বিমুগ্ধ শ্রোতা আমরা সে অতুল সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দে, বিস্ময়ে ও দেশভক্তিতে সত্য সত্যই অভিষিক্ত হইয়া গিয়াছিলাম। সে নিশায় ক্ষণজন্মা দ্বিজেন্দ্রলালের যে দুর্দ্দম উৎসাহ দেখিয়াছিলাম, এ জীবনে তাহা কি কখনও ভুলিবার! দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রীতির অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনা আমার এ স্মৃতিপটে আজিও সুস্পষ্ট মুদ্রিত রহিয়াছে; বিধাতা যদি দিন দেন, তবে সে সকল কথা পরে বলিব।

কবিবরের "প্রতাপ সিংহ", "দুর্গাদাস" ও "মেবার পতন" যাঁহারা অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিবেন, তাঁহারাই কবির ঐকান্তিক স্বদেশ-প্রেমের পুণ্য প্লাবনে পরিপ্লুত ও প্রবুদ্ধ হইতে পারিবেন, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহার 'আমার দেশ' ও 'আমার জন্মভূমি' বঙ্গ দেশের অবিনশ্বর সম্পত্তি।

ক্রমশঃ।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

পূর্ব্বতন কায়স্থ-সমাজ।

গত বৈশাখের "সাহিত্যে" 'মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে'র সংবাদ প্রকাশ করিয়া সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কায়স্থসমাজের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তির ভ্রম দেখাইয়া মৈত্রেয় মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনুধাবনযোগ্য। মৈত্রেয় মহাশয় যথার্থই লিখিয়া-

ছেন যে, "ইংরেজী শিক্ষার স্পর্শমণিসংস্পর্শে আমাদের পাল-সরকার-দাস-ঘোষ-বসু-মিত্র মহোদয়গণ হঠাৎ সুবর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিলে রচনা-লালিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর পুরাতত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।" "তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন অবস্থা সম্বন্ধে আধুনিক রচনায় যে কথা অবলীলাক্রমে উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন অপবাদ, সমগ্র হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ। ঈশ্বরঘোষের তাম্র-শাসন তাহার কথঞ্চিৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিবে; এবং গৌড়-গৌরব-যুগের যে সকল লিপিপ্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্থানলাভ করিতে পারিবে।" (১) মৈত্রেয় মহাশয়ের উক্তির সমর্থন করিবার জন্যই আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা। এই প্রবন্ধের উপসংহারে দেখাইয়াছি যে, কেবল গৌড়বঙ্গ বলিয়া নহে, মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের ন্যায় এখানকার বহু ঘোষাদি কায়স্থসন্তান ভিন্ন দেশে ও ভিন্নরাজ্যে গিয়া দূর অতীতকালে উচ্চ রাজকীয় পদলাভের সঙ্গে স্ব স্ব প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন এবং গৌরবজনক প্রতিপত্তির নিদর্শন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে গুপ্তসম্রাটগণের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসিলে তাঁহাদের প্রতিনিধি ও রাজকর্ম্ম-চারী কায়স্থগণ পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এ সময়ের কতকগুলি তাম্রশাসন অল্পদিন হইল ফরিদপুর জেলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে প্রমাণ পাইতেছি যে, খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শত বর্ষ পূর্ব্বে ঘোষ, পালিত, সেন, দত্ত, গুপ্ত, কুণ্ড, আদিত্য প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থগণ পূর্ব্ববঙ্গের সকল শাসনবিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিতে-ছিলেন। (২) পূর্ব্ববঙ্গে খড়্গ, পাল ও বর্ম্মবংশের অভ্যুদয়ে তাঁহাদের বংশধর-গণের পূর্ব্বাধিপত্য কতকটা হ্রাস হইলেও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানাগমন-কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতাপ হ্রাস হয় নাই। কায়স্থ শূরবংশের রাজত্বকালে তাঁহারাই এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়ের নানা স্থানে তাঁহারাই কোথাও স্বাধীনভাবে, কোথাও বা অর্দ্ধস্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে-ছিলেন, এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতেও বহু কায়স্থ সময়ে সময়ে আসিয়া

(১) সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ১০২০, বৈশাখ, ৪২—৪০ পৃষ্ঠা।

(২) Journal of the Asiatic society of Bengal 1612. PP 449—502; Inbian Antiquary, vol. XXXIX. P 206.

এখানকার কায়স্থসমাজের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সময়েই গঙ্গাতট-বর্ত্তী সিংহেশ্বর নামক স্থানে কায়স্থ শূরবংশীয় মহারাজ আদিত্যশূরের সভায় পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের বীজিপুরুষ বাৎস্যগোত্রীয় অনাদিবর সিংহ, সৌকালীন গোত্রীয় সোম ঘোষ, মৌদ্গল্য-গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত, বিশ্বামিত্র-গোত্রজ সুদর্শন মিত্র ও কাশ্যপ-গোত্রীয় দেবদত্ত, এই পঞ্চ মহাজন আগমন করেন। ইহারই কছুকাল পরে পালবংশ উত্তররাঢ় অধিকার করেন। দক্ষিণরাঢ়ে শূরবংশের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ইহারই অত্যল্পকাল পরে প্রবলপরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোড়ের গৌড়-মণ্ডল-আক্রমণ। এই সময়েই তাঁহাদের সঙ্গে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় দত্ত-বংশের অপর বীজপুরুষ পুরুষোত্তম দত্ত কাঞ্চীপুর হইতে দক্ষিণরাঢ়ে আগমন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের সুপ্রাচীন কুলপঞ্জীতে বিবৃত হইয়াছে—

"বীজী পুরুষোত্তম দত্ত,　　সদাশিব অনুরক্ত
কাঞ্চীপুর হইতে আইলা গৌড়।"

তাহারই কিছুকাল পরে আর্য্যাবর্ত্তে চেদিপতি কর্ণদেবের অভ্যুদয়। সেই চেদিপতি কর্ণদেবের অভ্যুদয়কালেই গৌতম-গোত্রজ বসুবংশের বীজপুরুষ বীরনাথ দশরথ ও সিন্ধুনাথ এই দুই পুত্র সহ গৌড়দেশে আগমন করেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বসুবংশধরগণ বীরনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দশরথের সন্তান। আমাদের সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থেও লিখিত আছে—

"বীরনাথ বসু　　হইল দুই শিশু
দশরথ সিন্ধু নামে।"

দশরথের পূর্ব্বপুরুষগণ চন্দ্রবংশোদ্ভব চেদি বা হৈহয়বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাই দশরথ বসুর কুলপরিচয় প্রসঙ্গেও আমাদের কুলপঞ্জিকায় পাইতেছি—

"স চৈদ্যকুলাম্বুজঃ সোমসমঃ গৌতম গোত্রভৃৎ।"

পূর্ব্ববঙ্গে বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক চেদিপতি কর্ণদেবের দৌহিত্র মহারাজ শ্যামল বর্ম্মা অবন্তী ও গুর্জ্জরের পরমার, সোলঙ্কী প্রভৃতি অগ্নিকুলের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তৎপুত্র ভোজবর্ম্মার নবাবিষ্কৃত তাম্র-লেখ হইতে আমরা সেই পরিচয় পাইয়াছি। সেই বঙ্গাধিপ শ্যামল বর্ম্মার সময়েই রাজাদেশে গুহবংশীয় ত্রিবিক্রমপুত্র দশরথ গৌড়দেশে আগমন করেন। তাঁহার পরিচয়-প্রসঙ্গেও আমাদের কুলপঞ্জিকায় রহিয়াছে—

"গুহ ত্রিবিক্রমে, তিন পুত্র ক্রমে
শুন সভে সভাজন।
দশরথ জেষ্ঠ, দয়াবন্ত শ্রেষ্ঠ
শুচিরথ সর্ব্বশেষে।
রাজ আজ্ঞা পাইয়া ইষ্ট স্মরণ লইয়া
চলিলেন গৌড়দেশে।

দশরথ গুহ উত্তররাঢ় বা দক্ষিণ রাঢ়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। তিনি অগ্নিকুলের আত্মীয়তা-সূত্রে যাদববংশীয় পূর্ব্বাবলাধিপ শ্যামলবর্ম্মার অধিকারেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া পূজ্য হইয়াছিলেন। তিনি অগ্নিকুলোৎপন্ন ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—

"অয়মগ্নিকুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্।"

আমাদের বঙ্গীয় চারি শ্রেণীর সামাজিক কায়স্থগণের বীজ পুরুষগণ্ আর্য্যাবর্ত্তের বিশুদ্ধ আর্য্যশোণিত লইয়া এ দেশে উপনিবেশী। অনেকেই অবগত আছেন যে, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণ এক পিতামাতার সন্তান। আমি যে বহুসংখ্যক প্রাচীন কুলপঞ্জিকা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে, চারি শ্রেণীর মধ্যেই একগোত্রজ ও একপদ্ধতিযুক্ত আমাদের সামাজিক কায়স্থবর্গ এক পিতার সন্তান। আমি পূর্ব্বে অযোধ্যা হইতে সমাগত যে সৌকালিন-গোত্রজ সোম ঘোষের নাম করিয়াছি, তিনি উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ, এই তিন সৌকালীন ঘোষ-বংশের আদিপুরুষ। এই সোম ঘোষের পরিচয়-প্রসঙ্গে উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে আছে—

"অযোধ্যা হইতে আইল সোম
বিপ্র সাথে করি হোম॥
তস্য সুত অরবিন্দ
সুত মহেশ মকরন্দ।
মকরন্দ সপ্তগ্রামে
পূজিত পিতার নামে।
দক্ষিণে বাড়িল মান
মকান্দ কৈল কন্যাদান।

আমাদের দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতেও পাইতেছি—

"সোম ঘোষবংশ গুণান্বিতঃস মকরন্দ সুজাজন।"

এইরূপ মায়াপুরী বা হরিদ্বার হইতে সমাগত বিশ্বামিত্র-গোত্রজ সুদর্শন

মিত্র উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ, এই তিন শ্রেণীর মিত্রবংশের বীজপুরুষ হইতেছেন। উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে এইরূপ বংশপরিচয় আছে—

সুদর্শন সুতঃ সোম সুৎসুত শম্ভুমিত্রকঃ।
শ্রীকণ্ঠসুৎসুতো জাত সুৎসুত বাসমিত্রকঃ॥
পুরুষোত্তম সুসা পুত্রশ্চত্বার সুসা নন্দনাঃ।
কোচো বাচস্পতিরন্যো বটমিত্রশ্চ মধ্যমঃ।
কনিষ্ঠশ্চ নরপতিশ্চত্বার সোদরা ইমে।
বল্লালপূজিতো ভূত্বা বটো মকুটগণেশ্বরঃ॥
সুদর্শনবংশকোঽপি কালিদাসাখ্যমিত্রক.
গতবান্ দক্ষিণরাঢ়ে তত্রৈব প্রাপ্ত মাপুবান্॥

আমাদের দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতেও পাইতেছি—

শম্ভুমিত্র নাম সুত অনুপাম কালী আদি তিন জন।

এখন উভয় শ্রেণীর প্রাচীন কুলগ্রন্থের সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি—মথুরা হইতে সমাগত মৌদ্গল্য-গোত্রীয় পুরুষোত্তমই উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র, এই চারি শ্রেণীর আদি মৌদ্গল্য দত্তবংশের বীজপুরুষ। শেষোক্ত তিন শ্রেণীতে তাঁহার বংশধরগণ বটগ্রামী দত্ত বলিয়া পরিচিত। এখন উত্তররাঢ়ীয় সমাজে তাঁহার বংশধরগণ 'দাস' উপাধিতে অভিহিত হইলেও, পুরুষোত্তমের কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত 'দত্ত' উপাধি ধারণ করিতেন। তাহা আমরা উত্তররাঢ়ীয় প্রাচীন কুলপঞ্জী হইতে পাইয়াছি—

"মৌদ্গল্যবীজো পুরুষোত্তমাখ্যো তস্মাৎ কবীন্দ্রো কুলকারদত্তঃ
তস্মাৎ দক্ষঃ বিক্রমনামধারী তস্মাচ্চ বিশ্বম্ভর দত্তকারী
তস্মাৎ গদাধরো নৈকবংশকঃ তস্মাজ্জকদাস-দামোদরাখ্যঃ।
তস্মাৎজ্যেষ্ঠো কবিরামদাসঃ সবংতীর্থাদি ভুবিপ্রকাশঃ

উদ্ধৃত প্রমাণ অনুসারে জানিতে পারিতেছি যে, মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম দত্ত হইতে অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষে দামোদর দত্ত 'দাস' উপাধি গ্রহণ করেন। এই 'দাস' উপাধি সম্বন্ধে উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"হরিতে ভকতি বড় মৌদ্গল্য-নন্দন
দাস বলি ডাকে তারে শুন সর্ব্বজন।"

এইরূপে এখানকার চারি শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে বাৎস্য-গোত্রীয় সিংহবংশ, কাশ্যপ দত্তবংশ ও ভরদ্বাজ কর প্রভৃতি বহু সামাজিক কায়স্থবংশই এক পিতার

সন্তান হইতেছেন। প্রাচ্য ভারতের নানা বর্ণধর্ম্মের লীলাস্থল গৌড়মণ্ডল, গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইতে মুসলমান ও ব্রিটীশ শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কখনও একচ্ছত্রাধীন হয় নাই। পুনঃপুনঃ বৈদেশিক আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি নানা খণ্ড বিখণ্ডে বিভক্ত ও সেই সকল খণ্ডিত জনপদ আবার বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী নৃপতিগণের শাসনাধীন হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গাগত কায়স্থগণ বহু পূর্ব্বকাল হইতে এখানকার রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ পুণ্যশ্লোক এক পিতার সন্তান হইলেও একই সময়ে শূর, দেব, পাল, খড়্গ, বর্ম্ম, সেন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম ও মতাবলম্বী নৃপতিগণের সংস্রবে ভিন্ন ভিন্ন আচার ও ধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন নৃপতির অধিকারে বসবাস হেতু তাঁহারা শ্রেণী চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া হইয়া পড়িয়াছেন।

আমাদের কুলপঞ্জী হইতে জানা গিয়াছে,—বসু, ঘোষ, দত্ত, মিত্র প্রভৃতি সামাজিক কায়স্থগণ শ্রীবাস্তব, সূর্য্যধ্বজ, মাথুর, শকসেন, গৌড় প্রভৃতির মূল কায়স্থ-শাখা হইতেই সমুদ্ভূত একণে উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-ভারতে চৈত্রগুপ্ত কায়স্থগণ উক্ত মূল শাখার নামে পরিচিত হইলেও বঙ্গাগত তাঁহাদেরই নায়কগণ স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষের সম্মানবর্দ্ধক এখানকার রাজপ্রদত্ত উপাধি অথবা রাজপ্রদত্ত কুলমর্য্যাদানুসারেই সুপরিচিত। এখানে তাঁহাদের আদি পরিচয় দিবার বিশেষ প্রয়োজন না হওয়ায় কালক্রমে অনেকেই আপন পূর্ব্ব পরিচয় বিস্মৃত হইয়াছেন। তাই পশ্চিমাঞ্চলবাসী হিন্দুস্থানী কায়স্থগণ এতদিন আমাদিগকে পর ভাবিয়া আসিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা দাবী করিবার যথেষ্ট উপকরণ আমাদের সুপ্রাচীন কুলপঞ্জীসমূহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কেবল চৈত্রগুপ্ত কায়স্থ বলিয়া নহে, মহারাষ্ট্রের চান্দ্রসেনীয় কায়স্থবংশধরগণও বহুপূর্ব্বকাল হইতেই এ দেশে আসিয়া এখানকার কায়স্থসমাজে সম্মিলিত হইয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজে কাশ্যপ গোত্রজ 'গুপ্ত' এবং দেবল-গোত্রীয় 'রাজ'-পদবীযুক্ত সামাজিক কায়স্থ বিদ্যমান। কুলগ্রন্থে ইহারা মহারাষ্ট্র-দেশাগত বলিয়া পরিচিত। পশ্চিম ও উত্তর ভারতে এরূপ গোত্র ও উপাধিযুক্ত চিত্রগুপ্ত কায়স্থ নাই। বোম্বাই প্রদেশে চান্দ্রসেনীয় প্রভু কায়স্থগণের মধ্যেই ঠিক ঐরূপ গোত্র ও উপাধি এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। এ অবস্থায় প্রভুকায়স্থগণের সহিত যে দক্ষিণ-

রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণরাঢ়ীয় বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থগণের মধ্যে, সামাজিক দ্বিসপ্ততিঘর কায়স্থের বিভিন্ন গোত্র ও পদ্ধতি এবং তাঁহাদের কুলপরিচায়ক সুপ্রাচীন ঢাকুরগুলির আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইবে যে, চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় বহু ক্ষত্রিয়-পরিবার বঙ্গীয় কায়স্থের সহিত মিশিয়া কায়স্থ বলিয়াই সুপরিচিত হইয়াছেন।

কেবল যে গৌড় বঙ্গেই কায়স্থের উপনিবেশ ঘটিয়াছে, তাহা নহে। অতি পূর্ব্বকালে যে সকল কায়স্থ এখানে উপনিবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যেও কেহ কেহ পরবর্ত্তিকালে রাজকীয় কর্ম্মোপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে গিয়া উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, সম্মানিত ও পরে তাঁহাদের অনন্তরবংশ তত্তৎস্থানের কায়স্থসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের হিন্দুস্থানী কায়স্থমাত্রই জানেন ও স্বীকার করেন যে, তথায় দ্বাদশ শ্রেণীর মূল কায়স্থের মধ্যে যে সকল গৌড় কায়স্থ বিদ্যমান, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের গৌড়মণ্ডল হইতে গিয়া তথায় বাস করিতেছেন। হিন্দুস্থানী কায়স্থের বিশ্বাস যে, গৌড় সেনরাজবংশ এই গৌড় কায়স্থ হইতেছেন; এবং সেন বংশের সময়ে ও তৎপরেও গৌড় কায়স্থগণ উত্তর ও পশ্চিম ভারতে গিয়া তত্তৎ কায়স্থসমাজভুক্ত হইয়াছেন। আমি প্রাচীন শিলালিপি হইতেও পাইয়াছি যে, সেনবংশেরও বহুপূর্ব্বে গৌড় কায়স্থগণ সুদূর মধ্যপ্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশস্থ রতনপুর হইতে আবিষ্কৃত ৮৬৬ সংবতে (৮০৯ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হৈহয়বংশীয় চেদিরাজ জাজল্যদেবের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, চেদিরাজের 'মন্ত্রণা বিষয়ে অগ্রণী ও অসম শাস্ত্রপারদর্শী' এক জন গৌড় কায়স্থ মন্ত্রী ছিলেন। উক্ত চেদিরাজের সভায় নানাশাস্ত্রবিশারদ বহুসংখ্যক শ্রীবাস্তব কায়স্থ বিদ্যমান ছিলেন, তাহাও আমরা উক্ত চেদিপতি ও তৎপুত্র পৃথ্বীদেবের শিলা-প্রশস্তি হইতে পাইয়াছি। (৩) তথায় সেই প্রাচীনকালে গৌড়কায়স্থ ও শ্রীবাস্তব কায়স্থ

---

(১) Crooke's Tribes aud castes of the N. W. P. Vol. U P 192.

(২) Epigraphica India Vol I p 36.

(৩) " " 30 p 42.

আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় যে, বঙ্গের দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীর বসুবংশের বীজপুরুষ দশরথ উক্ত চৈত্র শ্রীবাস্তব বংশ-সম্ভূত ছিলেন।

কেবল উক্ত গৌড় কায়স্থ বলিয়া কেন? পাটনা ও শোণপুর রাজ্য এবং সম্বলপুর জেলা হইতে নবাবিষ্কৃত অনেকগুলি তাম্রশাসন হইতে সন্ধান পাইয়াছি যে, বঙ্গের ঘোষ, নাগ, দত্ত, আদিত্য, অর্ণব প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থগণ খৃষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতাব্দীতে জনমেজয় মহাভবগুপ্ত, যযাতি মহাশিবগুপ্ত এবং তৎপুত্র ভীমরথ প্রভৃতি ত্রিকলিঙ্গাধিপতির সভায় সান্ধিবিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক প্রভৃতি উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহাভবগুপ্তের তাম্রশাসনে "রাঢ়ায় বল্লিকন্দরবিনির্গতায়" ইত্যাদি প্রয়োগ থাকায় সন্ধান পাইতেছি যে, রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণও রাঢ়ীয় কায়স্থের সহিত ঐ সময়ে ত্রিকলিঙ্গবাসী হইয়াছিলেন। অল্প দিন হইল, ঐ সকল তাম্র-শাসন ভারত গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত Epigraphica Indica নামক পত্রিকার ৯ম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রাচীন লেখমালার প্রকাশক মহাশয় তাম্রশাসন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

King Janamejaya and his successors had many Bengali Kayasthas for their Court officers. We get the names of Kailasa Ghosha, father of Vallabha Ghosha, Malla Datta, son of Dhara Datta in the Employment of Janamejaya, the names Charu Datta, Uchhaba Naga and Vallabha Naga under King Jayati and the names Sinha Datta and Mangala Datta under Bhimaratha. None but Bengali Kayasthas bear Datta, Ghosh, Naga &s. as surnames, The Uriya Karana never used such surnames. The words Datta, Ghosha, & as inseperable parts of the names of men were in use in other parts of Northern India, and such names would be borne by persons of any aud every caste, but as these words are surnames here of Kayasthas, there can be no doubt that the Kings had Bengali officers under them when they acquired territories in the forest tract of Sambalpur."

বাস্তবিক, খ্রীষ্টীয় ১০ম হইতে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যে উৎকল, কলিঙ্গ, ও দক্ষিণ কোশল হইতে যত শিলালেখ—ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গাক্ষরের পূর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান, ইহাও বঙ্গীয় কায়স্থ-প্রভাবের অন্যতম নিদর্শন। এইরূপ বঙ্গীয় কায়স্থের সর্ব্বত্র গতিবিধি

ও বসবাসের পরিচয় পাইয়াছি। প্রয়োজন হইলে প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে বঙ্গীয় কায়স্থগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তির যথেষ্ট পরিচয় উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।*

শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু।

অমরতা।

[Maurice Maeterlinck এর ফরাসী হইতে।]

(১)

আমরা এক্ষণে যে নব শতাব্দীতে প্রবেশ করিয়াছি—যে শতাব্দীতে প্রচলিত ধর্ম্মগুলি বিশ্বমানব-সংক্রান্ত বড় বড় প্রশ্নের উত্তর-প্রদানে বিরত—সেই শতাব্দীতে একটি সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের অন্তরে একটা আকুল জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, সেটি—পারলৌকিক জীবনের সমস্যা। মৃত্যুতে কি সব শেষ হইয়া যায়? আমরা মৃত্যুর পরেও কি থাকিব—এ সম্বন্ধে কি কোন প্রকার কল্পনা করা যাইতে পারে? আমরা কোথায় যাইব, আমাদের দশা কি হইবে? যে ক্ষণভঙ্গুর বিভ্রমকে আমরা জীবন বলি, তাহার পর-পারে কোন্ অবস্থা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে? যে মুহূর্ত্তটিতে আমাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়া যায়, সেই সময়ে জড়-শক্তি, না চিৎশক্তি জয় লাভ করে? সেই সময় নিত্য জ্যোতির, না অসীম অন্ধকারের আরম্ভ হয়?

অন্যান্য সমস্ত সত্তার ন্যায়, আমরাও অবিনশ্বর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোনও পদার্থ একেবারে বিলুপ্ত হয়—ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। অনন্তের পার্শ্বে,—একটি 'নাস্তি' রহিয়াছে, অথবা একটি জড়-পরমাণুরও পতন হইতে পারে, বিনাশ হইতে পারে, ইহা কল্পনা করা অসম্ভব। যাহা কিছু আছে, তাহা নিত্যকাল থাকিবে, সকলই আছে, নাই বলিয়া কোন জিনিস নাই। নচেৎ আমাদের বিশ্বাস করিতে হয়—বিশ্ব-সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করিতে বাধ্য হই, সেই ধারণার সহিত আমাদের মস্তিষ্কের তিলমাত্র ঐক্য নাই। এমন কি, এ কথাও বলা যাইতে পারে, আমাদের

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থকাণ্ড (যন্ত্রস্থ) ১ম ভাগে—এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

মস্তিষ্কক্রিয়া বিশ্বের উল্টা দিকে চলিতেছে; কিন্তু তাহা সম্ভব নহে; কেন, না আমাদের মস্তিষ্কের ধারণাগুলি বিশ্বেরই প্রতিবিম্বমাত্র।

যাহা বিনাশ পাইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অন্ততঃ অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আমরা দেখিতে পাই, উহা অবিনশ্বর জড়পদার্থের রূপান্তরমাত্র, প্রকারান্তরমাত্র। কিন্তু এই সকল অবভাসের মূলে বাস্তব সত্য কি আছে, তাহা আমরা জানি না। যে বস্ত্রখণ্ডে আমাদের চোখ্ বাঁধা রহিয়াছে, যাহার চাপে আমরা অন্ধ হইয়া রহিয়াছি, ঐগুলি সেই বস্ত্রখণ্ডের অন্তর্গত বয়ন-সূত্র, আমাদের জীবনের প্রতিবিম্বসমূহ। এই বন্ধনটি খুলিয়া লইলে কি অবশিষ্ট থাকে? তাহার ও দিকে একটা বাস্তব সত্য নিশ্চয়ই আছে; এস আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করি: অথবা ঐ অবভাসগুলিও কি আমাদের নিকট নাস্তির সামিল হইয়া যাইবে?

১।

বিনাশ অসম্ভব, মৃত্যুর পরে সমস্তই থাকিবে, কিছুই ধ্বংস হইবে না;—এই কথায় আমাদের বিশেষ কিছু ঔৎসুক্য হয় না। আমাদের জীবন ইহলোকে বাহ্য ঘটনা সকল উপলব্ধি করে, আমাদের সেই ক্ষুদ্র জীবনটির দশা কি হইবে, মৃত্যুর পরে উহা স্থায়িত্ব লাভ করিবে কি না, ইহাই আমাদের ঔৎসুক্যের বিষয়। উহাকেই আমরা আমাদের চৈতন্য বলি, "আমি" বলি। এই "আমি"র বিনাশের পর, "আমি"র পরিণাম চিন্তা করিয়া, "আমি" সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা হয়, সেই "আমি" আমাদের মনও নহে, আমাদের শরীরও নহে, কেন না, আমরা জানি, এই শরীর মন উভয়ই তরঙ্গের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে, অবিরাম নবীকৃত হইতেছে।

তবে কি ইহা একটি অপরিবর্ত্তনীয় বিন্দুবিশেষ, যাহা চিরপরিণামশীল আকার হইতে পারে না, বস্তু হইতে পারে না, জীবনও হইতে পারে না, প্রত্যুত যাহা আকার ও বস্তুর কার্য্য ও কারণ? বস্তুতঃ উহাকে আমরা ধরিতে ছুঁইতে পারি না, উহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না;—বলিতে পারি না, কোথায় উহা অবস্থিতি করে। উহার চরম সূত্রস্থানে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিলে আমরা কতকগুলি স্মৃতিপরম্পরা, কতকগুলি অস্পষ্ট ও পরিবর্ত্তনশীল ধারণা ভিন্ন আর বড় কিছু উপলব্ধি করিতে পারি না—আর সেই স্মৃতি ও ধারণাগুলি আমাদের জীবনতৃষ্ণার সহিত সংযুক্ত। উহা আমাদের ইন্দ্রিয়চেতনার কতকগুলি অভ্যাস-পরম্পরা,

পারিপার্শ্বিক ঘটনাসমূহের বিরুদ্ধে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কতকগুলি প্রতিক্রিয়া-মাত্র। মোট কথা, এই নীহারিকার মধ্যে যে বিন্দুটি সর্ব্বাপেক্ষা ধ্রুব,—সেটি আমাদের স্মৃতি। আবার এই বৃত্তিটি অনেকটা বাহিরের জিনিস বলিয়া মনে হয়, অন্যান্য বৃত্তির অনেকটা সহকারী বলিয়া মনে হয়, অন্ততঃ উহা আমাদের মস্তিষ্কের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষণভঙ্গুর অংশ;—এমন একটি অংশ, যাহা আমাদের স্বাস্থ্যের একটু ব্যাঘাত ঘটিলেই তখনই অন্তর্হিত হয়। এক জন ইংরাজ কবি ঠিকই বলিয়াছেন:—"উহা নিত্যতার দোহাই দিয়া খুব চীৎকার করে বটে, কিন্তু উহা আমার মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।"

(৩)

তাহাতে কিছু যায়-আসে না, এই "আমি," এমন যে অনিশ্চিত, এমন-যে ধরা ছোঁয়ার বাহির, এমন-যে 'উড়ো-উড়ো', এমন-যে ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তবু আমাদের সত্তার এরূপ কেন্দ্রস্থানীয়, উহার প্রতি আমাদের এরূপ বিষম মনের টান যে, এই ছায়ামূর্ত্তির সম্মুখে, আমাদের জীবনের সমস্ত বাস্তব সত্তা মুছিয়া যায়। সমস্ত অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের শরীর বা শরীরের বস্তু, সমস্ত সুখ ভোগ করিবে, সমস্ত গৌরবের অধিকারী হইবে, অতীব বিরাটভাবে বা সুসূক্ষ্মভাবে রূপান্তর প্রাপ্ত হইবে; ফুল, সুগন্ধ, সৌন্দর্য্য, আলোক, ঈথার, নক্ষত্র—এই সমস্তে পরিণত হইবে—ইহা আমাদের নিকট একান্তই উপেক্ষণীয়। আমাদের জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া ক্রমে বিশ্বজীবনের সহিত মিশ্রিত হইবে, বিশ্বজীবনকে বুঝিতে পারিবে, বিশ্বজীবনের উপর আধিপত্য করিতে পারিবে—ইহাও আমাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষার বিষয়। আমাদের সহজ সংস্কার আমাদিগকে বলে যে, ঐ কথার উপর আমাদের কোন দরদ নাই, উহাতে আমাদের কোন সুখ নাই, উহা আমাদিগকে আমাদের "আপনাতে" পৌঁছাইয়া দেয় না, কতকগুলি ক্ষুদ্র ঘটনার স্মৃতি আমাদের সহগামী না হইলে, এই সকল অকল্পনীয় সুখসমূহের সাক্ষিরূপে না থাকিলে, আমরা "আপনাকে" চিনিতে পারি না। আমার মনের উচ্চতম মুক্ততম সুন্দরতম অংশগুলি পরমানন্দের সম্ভোগে নিত্যকাল সজীব ও ভাস্বর হউক বা না হউক—উহা আমার পক্ষে সমান। আর ত উহারা আমার নহে, আর ত উহাদিগকে আমি চিনি না। যাহাকে আমি "আমি" বলিয়া উপলব্ধি করি, সেই বিন্দুটি কোন্ কেন্দ্রে আছে, তাহা আমি জানি না, আর যদিবা কোনও এক কেন্দ্রে থাকে, সেই কেন্দ্রের সহিত যে স্নায়ু-

জাল ও যে স্মৃতিজাল আবদ্ধ ছিল, মৃত্যু সেই জালের বন্ধন কাটিয়া দিয়াছে। এই বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন এবং আকাশ ও কালের মধ্যে ভাসমান হওয়ায়,—অতীব দূরতম নক্ষত্রের দশা আমার নিকট যেরূপ অপরিচিত, উহাদেরও দশা আমার নিকট তেমনি অপরিচিত।

যে সত্তাটি কোথায় আছে জানি না, এবং যাহা কোথাও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে অবস্থান করে না—সেই রহস্যময় সত্তার মধ্যে যতক্ষণ না ঐ সকল স্মৃতির ক্ষুদ্র অংশগুলিকে ফিরাইয়া আনিতে পারি, ততক্ষণ, যাই ঘটুক না কেন—আমার নিকট উহাদের কোন অস্তিত্বই নাই। আমি যেন একটি দর্পণের ন্যায় জগতের পাশ দিয়া বিচরণ করিতেছি—ঐ জগতের ঘটনাবলী উহার উপর যতটা ছায়া ফেলে, ততটা কায়া ধরে না।

(৪)

তবেই দেখা যাইতেছে, আমাদের অমরত্বের বাসনাটিকে সূত্র-বচনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আকারে পরিণত করিবামাত্র উহা বিনষ্ট হইয়া যায়,—যেহেতু আমাদের উত্তর-জীবনের সমস্ত আশা ভরসাকে এমন একটি অংশের উপর আমরা স্থাপন করিয়া থাকি, যাহা একান্তই গৌণভাবাপন্ন ও যার-পর-নাই ক্ষণস্থায়ী। আমাদের মনে হয়, আমাদের সত্তার যাহা বিশেষ লক্ষণ—সেই সকল দুঃখ, সেই সকল ক্ষুদ্রতা, সেই সকল ত্রুটী প্রভৃতি যদি মৃত্যুর পরেও আমাদের সঙ্গে থাকিয়া না যায়, তাহা হইলে অন্য সত্তার সহিত আমাদের কোন পার্থক্য থাকে না, তাহা হইলে আমাদের সত্তাটি সমস্ত অজ্ঞাত সত্তা সাগরের মধ্যে একটি অজ্ঞান-বিন্দু হইয়া অবস্থিতি করে মাত্র; এবং তখন হইতে পর-পর যাহা কিছু তাহার পরিণতি হয়, তাহার সহিত আমাদের আর কোন সংস্রব থাকে না।

অমরত্বসম্বন্ধে যাহারা এইরূপ ধারণা করিতে বাধ্য হয় তাহা-দিগকে অমরত্বসম্বন্ধে কিরূপ আশ্বাস দেওয়া যাইতে পারে? উপায় কি? —আমাদের সহজ সংস্কারই যে আমাদিগকে এই অমরত্বের আশা দিতেছে। সেই সহজ সংস্কার "ছেলে-মানসি" হইলেও অতি গভীর। ইহ জীবনে আমরা যে কয়েদীর বেড়ী পরিয়াছিলাম, অমরত্ব ঐ বেড়ী-সমেত আমাদিগকে যদি অনন্তকালের পথ দিয়া টানিয়া লইয়া না যায়, ইহজীবনে কিয়ৎবৎসর ধরিয়া যে উদ্ভট চৈতন্য আমরা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, আমাদের তাদাত্ম্যতার অকাট্য চিহ্নস্বরূপ সেই চৈতন্য যদি ঐ অমরত্বের মধ্যে না থাকে,

তবে সে অমরত্ব আমাদের পক্ষে না থাকারই সামিল। অধিকাংশ ধর্ম্মগুলি এই কথা বুঝে; তাহারা জানে, যে সহজ প্রবৃত্তি অমরত্বলাভের ইচ্ছা করে, সেই সহজ প্রবৃত্তিই আবার এই অমরত্বকে বিনষ্ট করে। এই জন্যই, ক্যাথলিক ধর্ম্মসম্প্রদায়, সর্ব্বাদিম আশা ভরসার সূত্রস্থানে ফিরিয়া গিয়া, শুধু যে আমাদের পার্থিব "আমি" সমগ্রভাবে বজায় থাকিবে বলিয়া আমাদিগকে আশ্বাস দেয়, তাহা নহে, আরও এই আশ্বাস দেয় যে, আমরা আমাদের রক্ত-মাংস লইয়া পুনর্ব্বার উত্থান করিব।

ইহাই এই সমস্যার কেন্দ্রস্থল। এই ক্ষুদ্র চৈতন্য, এই বিশেষ আমিত্বের অনুভূতি, যাহা প্রায় শিশুবৎ অপুষ্ট, অন্ততঃ খুব অদ্ভুত সীমাবদ্ধ,—যাহা আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের শৈশবাবস্থামাত্র, সেই চৈতন্যকে বুঝিবার জন্য, উপভোগ করিবার জন্য, সেই চৈতন্য অনন্তকাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে এইরূপ দাবি করার অর্থটি কি ইহা নহে যে, আমরা এমন একটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এমন একটা পদার্থ দেখিতে চাহিতেছি, যাহা দেখিবার জন্য সেই ইন্দ্রিয় গঠিত হয় নাই? আমরা চক্ষুর দ্বারা আলোক উপলব্ধি করিব, চক্ষুর দ্বারা গন্ধ উপভোগ করিব—ইহা কি সেই রকম দাবী নহে? তা ছাড়া, কোন রোগী যদি মনে করে, আপনাকে আবার ঠিক্ চিনিতে হইলে, তাহার স্বাস্থ্যাবস্থাতেও, চিরদিনের জন্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই রোগটি থাকা চাই—ইহা কি কতকটা সেই রকমের কথা নহে? সচরাচর তুলনা যেরূপ হইয়া থাকে, সেই হিসাবে এই তুলনাটিও খুব ঠিক্। মনে কর, এক জন অন্ধ শুধু অন্ধ নহে, তা ছাড়া সে পঙ্গু ও বধির। মনে কর, জন্মাবধি তার এইরূপ অবস্থা; তার পর, এখন সে ত্রিশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। সাদা বস্ত্রের পাড়টির ন্যায় বেচারীর প্রতিবিম্বহীন ফাঁকা জীবনের প্রান্তদেশে তাহার সেই সামান্য অনুভূতিগুলি কি? তাহার স্মৃতি-পটের সুদূর পশ্চাতে, তাহার স্মৃতির মধ্যে আছে শুধু অতি তুচ্ছ তাপশৈত্যের অনুভূতি, শ্রান্তি ও বিশ্রামের অনুভূতি, অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী দৈহিক বেদনার অনুভূতি, ক্ষুধা তৃষ্ণার অনুভূতি। কোন দৈহিক কষ্টের উপশমে সে যে-সুখ অনুভব করিয়াছে—খুব সম্ভব, সমস্ত মানব-সুখ, সমস্ত আশা ভরসা, সমস্ত উচ্চতর কল্পনার স্বপ্ন, সমস্ত স্বর্গের ধারণা, তাহার নিকট সেই অস্পষ্ট পূর্ব্বানুভূত সুখের অনুভূতিতে পরিণত হইবে। অতএব, তাহার এই চৈতন্যের ভাণ্ডারে, তাহার

এই আমিত্বের ভাণ্ডারে, এইটুকুমাত্র সম্বল থাকাই সম্ভব। উহার বুদ্ধিবৃত্তি, বাহির হইতে কখনও কোন আহ্বান পায় নাই বলিয়া, উহা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইবে, আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিতে পারিবে না। তথাপি এই দুর্ভাগ্য ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের বন্ধন, সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরই ন্যায় অমনি তীব্র, অমনি জলন্ত আগ্রহপূর্ণ হইবে। সে মৃত্যুকে ভয় করিবে; নিজে হৃদয়ানুভূতিগুলিকে সঙ্গে না লইয়া, তাহার তমোরাশিকে, তাহার দারিদ্র্য শয্যার স্মৃতিগুলিকে সঙ্গে না লইয়া, তাহার নিস্তব্ধতাকে সঙ্গে না লইয়া, অসীম অনন্তের পথে তাহাকে প্রবেশ করিতে হইবে,—এই কথা মনে করিলে সে নিরাশা-সাগরে নিমগ্ন হইবে। আমরাও ঐরূপ জীবনের গৌরব, আলোক ও প্রেমের বদলে সমাধিস্থানের চির-শৈত্য ও অন্ধকারে প্রবেশ করিতে হইবে মনে করিলে নৈরাশ্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকি

(৫)

মনে কর, কোন এক অলৌকিক ঘটনার প্রভাবে হঠাৎ তাহার চোখ, তাহার কাণ সজীব হইয়া উঠিল; তাহার শয্যার শিয়রের দিকের খোলা জান্‌লা দিয়া, ময়দানে উদ্ভাসিত অরুণ-কিরণ, গাছপালার মধ্যে মুখরিত বিহঙ্গ-সঙ্গীত, তরুপল্লবের মধ্যে অনিলের সরসর-শব্দ, নদীতটে জলের কুলুকুলু ধ্বনি, পাহাড়ের মধ্য হইতে মানব-কণ্ঠের স্বচ্ছ আহ্বান-রব তাহার নিকট প্রকাশিত হইল। আরও মনে কর, ঐ অলৌকিক ঘটনার প্রভাবে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার করিতে সে সমর্থ হইল সে উঠিল, এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের উদ্দেশে সে হাত বাড়াইয়া দিল, সে এই ব্যাপারের সদৃশ অন্য কিছু পূর্ব্বে উপলব্ধি করে নাই, উহার নাম পর্য্যন্ত সে জানে না :— উহা কি? না, আলোক! সে দ্বার খুলিল, এই অত্যুজ্জ্বল আলোক-রাশির মধ্যে তাহার পা টলিতে লাগিল, এই সমস্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে তাহার সমস্ত শরীর যেন দ্রবীভূত হইল। সে এক অনির্ব্বচনীয় জীবনের মধ্যে এক কল্পনাতীত আকাশের মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং এইরূপ হঠাৎ আরোগ্য-লাভের ফলে—এক অভাবনীয় ও দুর্ব্বোধ্য অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিয়া—যাহা একান্ত অসম্ভব নহে—সে তাহার অতীত জীবনের স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে হারাইল।

এই যে "আমি", এই যে কেন্দ্রগত অভ্যন্তর, এই যে আমাদের সমস্ত অনুভূতির আধারভূমি, এই যে বিন্দুটি যাহার অভিমুখে আমাদের জীবনের যাহা কিছু নিজস্ব—সমস্তই ধাবিত হইতেছে—ইহার অবস্থা কিরূপ হইবে? স্মৃতি লুপ্ত

হইলে—সে পূর্ব্ববর্ত্তী মানুষটির কি কোন চিহ্ন খুঁজিয়া পাইবে? একটি অভিনব শক্তি, অভিনব জ্ঞান, হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া, অশ্রুত-পূর্ব্ব কর্ম্মচেষ্টা প্রকাশ করিতে লাগিল;—যে তমোময় জড়-বীজ হইতে এই জ্ঞান সমুত্থিত হইল, তাহার সহিত এই জ্ঞানের সম্বন্ধ কিরূপ ভাবে রক্ষিত হইবে? তাহার অতীতের কোন্ অংশের সহিত যোগ স্থাপন করিয়া তাহার জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবে?

যাই হোক্, স্মৃতি-নিরপেক্ষ আর কোন সহজ-সংস্কার, কোন বুদ্ধিবৃত্তি কিংবা আর কোন কিছু, তাহার মধ্যে থাকিবে কি না—যাহার দ্বারা সে বুঝিতে পারিবে, এই নবোদ্ভাসিত জীবনটা তাহারই জীবন,—তাহার প্রতিবেশীর জীবন নহে—রূপান্তরিত ও দুর্ব্বিজ্ঞেয় হইলেও বস্তুতঃ একই জিনিস, উহার আত্মা অক্ষুণ্ণ—এবং তমোরাশি ও নিস্তব্ধতা হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক ও ঐকতানের মধ্যে উহা আরও কিছুকাল অবস্থিতি করিবে এই উদ্ভব চৈতন্যের বিশৃঙ্খলতা, উহার জোয়ার ভাঁটা কি আমরা কল্পনা করিতে পারি? কল্যকার "আমি"র সহিত আজিকার "আমি" কি রকম করিয়া মিলিত হইবে, এবং এই অহং-বিন্দুটি—এই ব্যক্তিত্বের চেতন-বিন্দুটি যাহা অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি—এইরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ে, এইরূপ বিকার-অবস্থায়, সেই বিন্দুটি কি ভাবে অবস্থিতি করিবে, তাহা কি আমরা জানি?

প্রথমে সেই প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দিবার চেষ্টা করা যাক্—কেন না ইহা আমাদের বর্ত্তমান জীবনের ও প্রত্যক্ষ জীবনের অধিকারভুক্ত; এবং যদি আমরা তাহা না পারি, তাহা হইলে মৃত্যুকালে যে সমস্যা প্রত্যেক মনুষ্যের নিকট স্বতই আসিয়া উপস্থিত হয়, আমরা কি করিয়া সে সমস্যার সমাধানের আশা করিব?

(৬)

এই সচেতন বিন্দুটি—যাহার মধ্যে অমরত্বের সমস্ত সমস্যাটি নিহিত—এই রহস্যময় বিন্দুটি,—মৃত্যুর সম্মুখে আমরা যাহার এতটা মূল্য অবধারণ করি,—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই বিন্দুটিকে আমরা আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে হারাইয়া থাকি, অথচ তাহার জন্য একটুও উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা অনুভব করি না। কেবল প্রতিরাত্রি আমাদের নিদ্রাকালেই যে উহা বিলুপ্ত হয়, তাহা নহে, পরন্তু জাগ্রতাবস্থাতেও অসংখ্য ঘটনার উপর উহার অস্তিত্ব নির্ভর করে। উহাকে একেবারে মুছিয়া ফেলিবার জন্য

একটা আঘাত, একটু অসুস্থতা, কয়েক পাত্র সুরা, একটু আফিম, একটু ধোঁয়াই যথেষ্ট। এমন কি, যখন কোন পদার্থের দ্বারা উহার পরিবর্ত্তনও ঘটে নাই, তখনও উহা সচেতন থাকে না। অমুক অমুক ঘটনা ঘটিয়াছে ইহা জানিবার জন্য, অনেক সময় একটা প্রবল চেষ্টার দ্বারা, আমাদের সেই চেতন-বিন্দুটিকে আবার ধরিতে পারি,—আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসি। একটু চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হইলেই, আমাদের পাশ দিয়া একটা সুখ চলিয়া যায়, আমাদিগকে একটুও স্পর্শ করে না, সেই সুখ আমরা আদৌ অনুভব করি না। আমরা এই মনে করিয়া আশ্বস্ত হই যে, কোন আঘাতের পর, কোন ধাক্কার পর, কোন চিত্তবিক্ষেপের পর, আবার আমরা ঐ চেতন-কেন্দ্রটিকে নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইব, কিন্তু পক্ষান্তরে, আপনাকে এতই দুর্ব্বল বলিয়া আমরা অনুভব করি যে, আমাদের মনে হয় যে, মৃত্যুর ভীষণ আঘাতে ঐ চেতন বিন্দুটি হয় ত চিরকালের মত অন্তর্হিত হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলোচনা।

১। সন্ধ্যাকর নন্দী

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির অন্যতম প্রবর্ত্তয়িতা বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গত চৈত্র মাসের "সাহিত্যে" "রামচরিত"-প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতি সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত বহুদর্শী ব্যক্তির সহিত বিচার করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির শোভা পায় না, তবে ঘটনাক্রমে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজ সম্বন্ধে দুই একটি কথা জানিতে পারিয়া তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" প্রকাশকালে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি, আই, ই, মহাশয় উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন "The author belonged to a very respectable family of Varendra Brahmins who derived their name from their residence in the Varendra country, i. e. North Bengal, the scene of the struggles of Ramapala for empire. The residential village from which Sandhyakara's family derived their congnomen is Nanda, perhaps a contraction of Nandana. The family is still well known." (Memoirs A S B. Introduction, page 1.) মৈত্রেয় মহাশয় বলিতেছেন, "সন্ধ্যাকর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হইলে বহুগৌরবান্বিত ব্রাহ্মণসমাজও গৌরব লাভ করিত। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় বহুদর্শী প্রবীণ পণ্ডিতের সিদ্ধান্তের গবেষণা

পাঠিয়াছি" বলিয়া, তাহাকেই নজিরূপে প্রমাণরূপে খাড়া করিয়া তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইলে "কুম্ভকর্ণে ভকারোঽস্তি" যে শ্রেণীর তর্কপ্রণালী, সেই শ্রেণীর তর্কপ্রণালীর আশ্রয় দান করিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থে ও প্রবন্ধে তাহার ছড়াছড়ি হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত, এবং অনেকের শিক্ষক হইয়াছেন। তাঁহার নিকট আমরা অন্যরূপ বিচারপ্রণালীর আশা করি।

রাখালবাবু অবলীলাক্রমে লিখিয়াছেন,—"কল্পণানামগ্রণীঃ" বলিতে সাধারণতঃ রাজকর্মচারিগণের মধ্যে প্রধান বুঝায়।" কেন বুঝায়, তাহা বুঝাইবার যেন নাই। সন্ধ্যাকরের কাব্যেই "কল্পণ"-শব্দ দেখিয়াছি;—অন্য কোনও গ্রন্থে দেখি নাই। রাখালবাবু যেরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে "অনর্থ" লিখিয়াছেন, তাহাতে সহজেই মনে হইতে পারে, তিনি যেন এরূপ প্রয়োগ অনেক স্থলেই দেখিয়াছেন। দুই একটি দেখাইয়া দিলে প্রীত হইতাম।

আমি দুইটি কথা বিশেষভাবে লিখিয়াছি। (১) সন্ধ্যাকর নন্দী ব্রাহ্মণ ছিলেন, শাস্ত্রী-মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত বাঙ্গালার অধিবাসিগণের নিকট সংশয়শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে না। (২) "সন্ধ্যাকর নন্দীকে কায়স্থ বলিয়া ঠিক করাই সহজ, এবং যুক্তিসঙ্গত।" আমার কথা দুইটির অনুকূলে যাহা বলিবার ছিল, বলিয়াছি। সিদ্ধান্ত যদি ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, আমিই সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিব। আমার মতভেদ ঘটিয়াছে শাস্ত্রী-মহাশয়ের সঙ্গে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তিনি জীবিত আছেন, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রধান পরিচালকের আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন। আমার ভুল হইয়া থাকিলে, তিনি নিজেই তাহার সংশোধন করিয়া দিবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

৩। ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন।

গত পৌষ মাসে শ্রীহট্টজেলার নিধনপুর গ্রামে কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মার যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, বর্তমান বৎসরের আষাঢ় মাসের দুইখানি বাঙ্গালা মাসিকপত্রে তাহার উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে। রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, ঢাকা বিভাগের স্কুল-ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত এচ্. ই. ষ্টেপলটনের নিকট ফটোগ্রাফ পাইয়া "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" সম্পাদকের অনুরোধে উক্ত পত্রিকায় তাম্রশাসন সম্বন্ধে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ ও তৎকর্তৃক উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ বর্তমান বর্ষের আষাঢ় মাসের "বিজয়া" পত্রিকায় এই তাম্রশাসন সম্বন্ধে একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধ ও তৎকর্তৃক উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। তাম্রশাসনখানি চারি সপ্তাহ কাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট ছিল, এবং সেই সময়ে ইহার "পাঠোদ্ধার কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছে।" তাম্রশাসনখানির বর্তমান মালিক কে, তাহা দুই প্রবন্ধের

কোনটিতেই স্পষ্ট কথিত নাই। মালিকের অনুমতি অনুসারে এগুলি ছুইটি লিখিত হইয়াছিল কি না, তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে না। মালিকের অনুমতি ব্যতীত বা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও তাম্রশাসন সম্বন্ধে কোনও কথা প্রকাশিত করা উচিত নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যদি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের Treasur Trove আইন অনুসারে প্রণীত নূতন নিয়মাবলীর মধ্যে ইহা পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে আসাম গবর্মেণ্ট ইহার মালিক, এবং আসাম গবর্মেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ত্তাদিগের অনুমতি ব্যতীত অপর কেহ ইহা প্রকাশ করিতে পারেন না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ও পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ আসাম গবর্মেণ্টের Civil List এর পৃষ্ঠায় উক্ত প্রদেশের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ত্তাদিগের নাম দেখিতে পাইবেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের সহিত কয়েকখানি চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে মুদ্রণের দোষে অক্ষরগুলি স্পষ্ট হয় নাই। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক কর্তৃক উদ্ধৃত পাঠের সহিত অধ্যাপক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক উদ্ধৃত পাঠ মিলাইয়া দেখিলাম যে, স্থানে স্থানে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু মূল তাম্রশাসন বা তাহার প্রতিলিপির অভাবে পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে কোনও কথা বলা অসম্ভব

অধ্যাপক বসাক ও ভট্টাচার্য্য কর্তৃক উদ্ধৃত পাঠ অবলম্বন করিয়া কামরূপ ও বঙ্গের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতেছি। তাম্রশাসনখানি অসম্পূর্ণ, ইহার তৃতীয় ফলকখানি হারাইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহাতে কোনও তারিখ নাই। ইহাতে কথিত আছে যে, ভাস্কর বর্ম্মা কর্ণসুবর্ণ বাসক হইতে তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, এবং ইহাতে তাঁহার ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষের নাম আছে। ইহার এক শ্লোকে কথিত আছে যে, অগ্নিদাহে মূল তাম্রশাসন নষ্ট হইলে নূতন তাম্রশাসন লিখিত হইয়াছিল, বা ইহা কূটশাসন অর্থাৎ কৃত্রিম নহে। নূতন তাম্রশাসনের অক্ষরগুলির অনুসারে ভাস্করের নিম্নলিখিত বংশপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে :—

চক্রভৃৎ

নরক
|
ভগদত্ত
|
বজ্রদত্ত

(তিন সহস্র বৎসর পরে)

পুষ্যবর্ম্মা
|
সমুদ্রবর্ম্মা
(দত্তদেবী)
|
বলবর্ম্মা
(রত্নবতী)
|

অদ্যাবধি কামরূপরাজগণের যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা ভগদত্তের বংশজাত, কিন্তু নূতন তাম্রশাসনে যে কয় পুরুষের নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিই পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। নূতন তাম্রশাসনে যতগুলি নাম আছে, তাহার মধ্যে দুইটি নাম ইতিহাসে সুপরিচিত। গৌহাটিতে আবিষ্কৃত ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে এবং তেজপুর ও সুয়ালকুঁচিতে আবিষ্কৃত রত্নপালের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে ভগদত্তবংশীয় কামরূপরাজগণের আর এক শাখার নিম্নলিখিত বংশ-পরিচয় পাওয়া যায় :—

তেজপুরে আবিষ্কৃত বনমালের তাম্রশাসন ও নওগাঁয়ে আবিষ্কৃত বলবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে ভগদত্তবংশীয় কামরূপ রাজগণের তৃতীয় শাখার নিম্নলিখিত বংশ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে :—

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী রত্নপালদেব নামক এক জন নূতন কামরূপ-রাজের একখানি নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত বংশ-পরিচয় তিনটি ভগদত্তবংশের একই শাখার কি ভিন্ন ভিন্ন তিনটি শাখার, তাহা স্থির করিবার কোনও উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই

কর্ণসুবর্ণ শ্রীযুত বেভারিজ সাহেবের মতে মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটী গ্রাম চীন-দেশীয় পরিব্রাজক হিওয়েন থসাং বা যুয়ন চুয়াং কর্ণসুবর্ণকে বঙ্গদেশের চারিটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম বলিয়া গিয়াছেন এতদ্ব্যতীত কর্ণসুবর্ণ সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক তাঁহার ইংরেজী প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "আমরা গঞ্জামে আবিষ্কৃত কলিঙ্গরাজ মাধববর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে, শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণের রাজা ছিলেন।" We know from the Ganjam copper plate inscription of the Kalinga King Madhava Varman (Gupta era 300, i. e 619 A. D.) that the ruler of Karnasuvarna was Sasanka."—Dacca Review, June, 1913 P. 2. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ বসাকের ন্যায় দেশবিখ্যাত বহুদর্শী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কিরূপে এ কথা বলিলেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। গঞ্জামে আবিষ্কৃত মাধববর্ম্মার তাম্রশাসনে কর্ণসুবর্ণের নাম পর্য্যন্ত নাই।

ভাস্কর বর্ম্মার পিতা সুস্থিত বর্ম্মা ভারতের ইতিহাসে একেবারে অপরিচিত নহেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক বা পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ কেহই সুস্থিতবর্ম্মার পূর্ব্বপরিচয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। মগধরাজ আদিত্যসেনের

পিতামহ মহাসেন গুপ্ত সুস্থিতবর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। সে সুস্থিতবর্ম্মা যে ভাস্কর বর্ম্মার পিতা সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। মহাসেনগুপ্তের পুত্র মাধবগুপ্ত সুস্থিতবর্ম্মার পুত্র ভাস্কর বর্ম্মার ন্যায় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। ইহাই প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আপসড় শিলালিপির যে শ্লোকে মহাসেন-গুপ্তের সহিত সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরের শ্লোকেই কথিত আছে যে, মহাসেনগুপ্তের যশ লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রতটে গীত হইত :—

শ্রীমহাসেনগুপ্তাভূৎ তেভ্যো বীরাগ্রণীঃ সুতঃ
সর্ব্ববীরসমাজেষু লেভে যো ধুরি বীরতাং।
শ্রীমৎসুস্থিতবর্ম্মযুদ্ধবিজয়শ্লাঘাপদাঙ্কং
মুহুর্যস্যাদ্যাপি বিবুদ্ধ কুন্দ কুমুদচ্ছায়ং ভব ত
লৌহিত্যস্য তটেষু শীতলতলেষু ফুল্লনাগদ্রুমচ্ছায়া
সুপ্ত বিবুদ্ধ সিদ্ধমিথুনৈঃ স্ফীতং যশো গীয়তে।

—Fleet's Gupta Inscription, p. 203.

কর্ণসুবর্ণ সম্বন্ধে উক্ত লেখক মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে, তাম্রশাসন দ্বারা প্রদত্ত ভূসম্পত্তি কর্ণসুবর্ণ প্রদেশে অবস্থিত ছিল। যে স্থান হইতে তাম্রশাসন প্রদান করা হইয়াছে প্রদত্ত ভূমিও যে সেই স্থানের নিকটে অবস্থিত হইবে, তাহার কোনই কারণ নাই। পাড়ুয়ার নগরীর গোবিন্দচন্দ্র দেব মুদ্গগিরিসমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে পঞ্চালে ইপলকে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহা মগধ বিষয়ে অবস্থিত ছিল না। হর্ষচরিতে ও যুয়ান চুয়াঙ্গের বিবরণে ভাস্কর বর্ম্মার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নূতন তাম্রশাসন হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম স্থির হইল মাত্র। ভাস্কর বর্ম্মা বোধ হয় হর্ষবর্দ্ধনের সাহায্যার্থ মগধদেশে আসিয়াছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য হর্ষবর্দ্ধন গৌড়াধিপ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, ভাস্কর বর্ম্মা বোধ হয় তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। কামরূপ রাজ-গণের সহিত মগধ ও বঙ্গের গুপ্তরাজগণের পুরুষানুক্রমে বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। মহাসেনগুপ্তের সহিত সুস্থিত বর্ম্মার ও শশাঙ্কের সহিত ভাস্কর বর্ম্মার বিবাদের উল্লেখ দেখিয়া ইহাই মনে হয় শশাঙ্কের অপর নাম বোধ হয় নরেন্দ্রগুপ্ত। সম্ভবতঃ তিনি মগধের গুপ্ত রাজবংশজাত, এবং মহাসেনগুপ্তের নিকট আত্মীয় ছিলেন

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যু তোরে মাগে।

১

ওহে দেব! কেন পুনঃ শান্তি ল'বে কেড়ে?
কেন পূজা পুনরায় আঁধার মন্দিরে?
আবার দেখালে কা'রে? হের, প্রভু, হের—
স্ফটিক ললাট তার, রক্ত ওষ্ঠাধর,
অপরূপ রূপরাশি, কি দিব তুলনা,
হে সুন্দরী! তুমি শুধু তোমারই উপমা।
কেশে বেশে বক্ষোদেশে পুষ্পের আঘ্রাণ,
কণ্ঠে তব মহাবাণী—মহা প্রাণ গান।
বেণু বীণা ফেলে দিয়ে তুলেছ দুন্দুভি,
ঝঞ্ঝাবায়ু বহি' আনে তোমার সুরভি।

নিদাঘ-সন্ধ্যায় আজ ক্ষণে ফিরে চাও,
আমায় কেড়েছ যদি, আরও কেড়ে নাও
তুমি বা হাসিলে শুধু আধেক অধরে—
ঐ হাসিটুকু আলো আমার আঁধারে।

২

হায় নিদ্রা, হায় শান্তি, হায় রে জীবন!
হা আমার মূঢ়, মূক, মলিন যৌবন!
আবার উঠিল ঝড়—আঁধার করিয়া,
সকল বন্ধন বাধা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া,
একবার খুঁজেছিলি আলো আলেয়ায়—
এবার কোথায় যা'বি হৃদি রে আমার!
রে পথিক প্রাণ! কার মুগ্ধ করি গান
নিশির ডাকের মত ডাকে তোর নাম।
উঠিলি আসন ছাড়ি' ফেলিয়া সাধনা—
বক্ষে আঁকড়িয়া ধরি' অসীম বেদনা।

তারে যদি দিবি পূজা, চল্, তবে চল্,
ছিঁড়ে লয়ে হৃদয়ের রক্ত শতদল।
ওরে মূর্খ, নহে প্রিয়া,—মৃত্যু তোরে মাগে,
বংশী সম—মধু-কণ্ঠে—মধু অনুরাগে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়।

উলা বা বীরনগর।

৩

কাগজে ছাপাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—

প্রশ্ন—"এতকাল পরে আবার উলার কথা কেন ?"

উত্তর—"ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁদি!"

সে কালের সমাজের রীতি নীতি ও সে কালের ভদ্রলোকদিগের ধরণ ধারণের কথা উলা উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছি।

উলার পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর,
আর হালিসহরের—ঠেঁদড়া।

উলা পাগলের জন্ত প্রসিদ্ধ।

ষোল পাগল পুলো,
তিন নিয়ে উলো।

উলার বামনদাস বাবু অতি প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ক্রিয়াবান্ ও নিষ্ঠাবান্, এবং বিলক্ষণ গম্ভীর প্রকৃতির। বাড়ীতে বৃত্তিভোগী এক জন কবিরাজ মহাশয় থাকিতেন। মুখ হাত ধুয়ে বামনদাস বাবু বাহিরে বসিলে, এবং তিনি বসিলে, কবিরাজ মহাশয় হাত দেখিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতেন। এক দিন হাত দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এমন কিছু নহে, তবে যৎকিঞ্চিৎ বায়ুর প্রকোপ বটে।" বামনদাস বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ওটুকু ত গ্রামের, আমার কি বলুন।" সুতরাং গ্রামের দুর্নাম গ্রামের লোকই স্বীকার করিতেন।

এক জন পাগলের কথা বলি;—গ্রামের প্রসন্ন বাঁড়ুয্যে কুলীনসন্তান, একটু দুষ্টবুদ্ধিও বটে, একটু ভালমানুষও বটে, পেসা পাগলা, এই উপাধি পাইয়াই পাগল বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার একটা অনুমান-খণ্ডের কথা বলি। প্রসন্ন বাঁড়ুয্যে বলিয়াছিল, "যখন রাণাঘাটের শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী বাবুর পাগল হাতীটার মাথা গরম হইয়াছে, তখন আমাদের বামনদাস বাবু আর রক্ষা পান না।" একবার প্রসন্ন গোরুর গাড়ীতে চড়িয়া শান্তিপুর যাইতেছিল। তখন প্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল শান্তিপুরের ডেপুটী। তিনিও সেই পথে পাল্‌কী করিয়া আসিতে-ছিলেন; ঘোষালে শয়ান প্রসন্নকে দেখিয়া বলিলেন, "কি রে! পাগল, বামুন হয়ে গোরুর গাড়ীতে চড়েছিস্ যে ?" প্রসন্ন উত্তর করিল, "বলি—খাওয়ার চেয়ে চড়া ভাল নয় কি ?"

এই প্রসন্নর একটু গান-শক্তি ছিল, সেই জন্য লোক আরও চিনিত।

উলার সেই সময়ের আর এক জন প্রসিদ্ধ লোক শ্রীমোহন মুখুয্যে। তাঁকে সকলেই 'ছিরে খ্যাপা' বলিত। তিনি এক জন হরবোলা ও ভাঁড়। এখন যেমন কলিকাতায় গোপাল সিং ও গোস্বামী, তখন মফস্বলে ঐ রকম অনেক লোক ছিল। তাহারা নানাপ্রকার পশু পক্ষীর বুলি বলিতে পারিত, এবং কবি, কীর্ত্তন, জজের বিচার প্রভৃতি হাস্যকর পদার্থ অবিকল নকল করিত। শ্রীমোহন হাতীর ডাক পর্য্যন্ত উত্তম ডাকিতে পারিতেন, সেই জন্য তাঁহার নাম ছিল "হাতী পঞ্চানন"! রাণাঘাটে এক জন ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল "বলদ পঞ্চানন"। নিজে বেশ স্থূলকায় ও লম্বা চৌড়া শরীর, তার উপর হাতী ডাকিতে পারিতেন বলিয়া, উলার দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারী পূজার মহিষ-বলিদানের সময়, হাড়ীকাট-সংলগ্ন মহিষের উপর দাঁড়াইয়া ঘোর গম্ভীর চীৎকারে বৃংহিত ধ্বনি করিতেন। মহিষ বেচারা একে হাড়িকাটে আড়ষ্টবদ্ধ, তাহার পর পৃষ্ঠে হস্তী চড়িয়াছে মনে করিয়া, একেবারে নিশ্চল হইত। তখন সহজেই তাহার মুণ্ডচ্ছেদ হইত।

শ্রীমোহন একবার দিনাজপুরের রাজবাটীতে ভাঁড়ামী করিতে যান। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই রাজা রাজড়ার বাটীতে ভাঁড়ের গতিবিধি ও বাৎসরিক বৃত্তি ছিল। দিনাজপুরে অনেক ভাল ভাল হিন্দুস্থানী ভাঁড় উপস্থিত ছিল। তাহারা এ বিষয়ে খুব দক্ষ লোক। অনুকরণ-নাট্যে বিশেষ পটু। সেবারে মহারাজ পর্য্যন্ত শ্রীমোহনের কৌতুক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শুনিলেন, দেখিলেন। তাহাতে হিন্দুস্থানী ভাঁড়েরা মনে মনে একটু চটিল। শ্রীমোহনের সুদীর্ঘ পালা শেষ হইলে পর, শ্রীমোহন মজলিসের এক পার্শ্বে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। হিন্দুস্থানী ভাঁড়েদের এক জন সহিসবেশে মজলিসের রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিল। হাতে এক গাছি মোটা ছড়ী, যেন ঘোড়া পালাইয়াছে, খুঁজিতেছে—"মেরি ঘোড়ী কাঁহা গয়ী রে, মেরি ঘোড়া কাঁহা গয়ী রে।" বলিয়া শ্রীমোহনের কাছে গিয়া, "এহি মেরি ঘোড়ী" বলিয়া শ্রীমোহনের কাঁধে হাত দিল। শ্রীমোহন ঘোড়ার মত চতুষ্পদ হইয়া সেই নকল সহিসের বক্ষে এক উল্টা চাট্ মারিলেন। সে বিষম আঘাতে দশ হাত তফাতে ধরাশায়ী হইল। মহা গোল হইতে লাগিল, মহারাজ মিটাইয়া দিলেন।

শ্রীমোহন আপনিই কবির চোতা ধরিতেন, (অর্থাৎ Promter হইতেন) গান গাহিতেন, ঢোলে কখন কেবল সাথ করিতেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে জুড়ী বাজাইতেন, আবার হঠাৎ মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া দৌড়িয়া এক কোণে গিয়া বাহবা দিতেন। শ্রীমোহন একলাই এক শ। রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ নীলকমল পাল চৌধুরীর কৃষ্ণনগরের জজের কাছে বিচার শ্রীমোহন অভিনয় করিতেন—অবশ্য একাই জজ এবং আসামী ইত্যাদি। সকলে নীলকমল বাবুকে বলিয়া দিয়াছে, "আপনি ত কোনও পাপে নাই, আপনি জজের সকল কথায় সায় দিবেন, আপনার ভয় কি?" জজ অতি বিকট স্বরে রুক্ষ ভাবে বলিলেন, "নীলকমল পাল চৌধুরী, তোম বড়া বদমায়েস্ হ্যায়।" নীলকমল বাবু কাঁপিতে কাঁপিতে অতি-ভয়কণ্ঠে বলিতেছেন, "হাঁ হুজুর, হাঁ, হাম্ বড় বদমায়েস্ হ্যায়।" আসামী খাম্‌কা স্বীকার করে, জজ্ সাহেবের ইচ্ছা নহে; তিনি কাজেই একটু নরম হইয়া বলিলেন—"তোম্ বড়া সাচা।" নীলকমল পূর্ব্ববৎ কাঁপিতে কাঁপিতে ভয়কণ্ঠে হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "হাঁ হুজুর! হাম্ বড়া সাচা।" জজ্ নীলকমল বাবুকে নামাইয়া দিয়া মোকদ্দমার সাক্ষী ডাকিতে বলিলেন।

শ্রীমোহন পশু পক্ষীর স্বর উত্তম অনুকরণ করিতে পারিতেন; ভাল ছায়াবাজী দেখাইতেন; রাত্রিকালে কেবলমাত্র হস্তের সাহায্যে অল্প-ভিজা চাদরের উপর, কত পশু পক্ষী নর নারীর অবয়ব দেখাইতেন। এখন সায়েন্স-বলে আমরা বলীয়ান হইয়া বায়োস্কোপ দেখি—দেখ দেখি, কত উন্নতি ও কিরূপ উন্নতি!

সেই সময়কার উলার আর এক জন 'কেষ্ট বিষ্টু'—রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য বা "মুনকে রঘুনাথ"। এমন প্রসিদ্ধি ছিল যে, তিনি 'জলে স্থলে' সর্ব্ব-প্রকারে এক মণ জিনিস আহার করিতে পারিতেন। তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, দরিদ্র নহেন, কেবল আহার করিবার পারিতোষিক রূপে তাঁহার নানা স্থানে বৃত্তি ছিল, তবু একবার দেনার দায়ে তাঁর কয়েদ হয়। দুই তিন দিন জেলে অনাহারে আছেন।। ৵০ এক আনা খোরাকীতে তাঁর কি হইবে! তৃতীয় দিনে জেলর বিচারপতিকে জানাইল—রঘুনাথকে তলব হইয়া জিজ্ঞাসায় রঘুনাথ বলিলেন, এক আনা পয়সায় তাঁহার খোরাকী হইতে পারে না।" জজ বলিলেন, "কত হইলে হয়?" রঘুনাথ বলিলেন,

"অন্ততঃ এক টাকা চাই।" ডিক্রীদারের নিকট হইতে তাই দেওয়ান হইল। রঘুনাথ রক্ষীদের সঙ্গে গিয়া নিজে বাজার করিয়া আনিলেন—/৫ সের চাউল, /২ সের দাইল, একটা /৫ সের রুই মাছ—ইত্যাদি। স্বহস্তে রন্ধন করিলেন, রুয়ের মুড়াটা আস্তই রাখিয়াছেন, চিরিয়া দেন নাই। আহারের সময় জজ সাহেব দূরে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন। পঞ্চগণ্ডূষ করার পর দাইল দিয়া ২।৪ থাবা ভাত খাইয়া ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া, /৫ সের রুয়ের মুড়িতে কামড় দিয়া কড়মড় করিয়া মুড়ি ভাঙ্গিতে লাগিলেন। জজ সাহেব সেই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া বলিলেন, "হামকো মৎ খাও বেটা, তোমরা মুন্ডই চাহিয়, উস্‌কো খাও।" বলিয়া বগী হাঁকাইয়া কাছারীতে চলিয়া গিয়া বাদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে প্রত্যহ ১৲ করিয়া খোরাকী দিতে পারিবে কি না? সে পারিবে না বলাতে আসামীকে খালাস দিলেন। মুক্ত হইয়া রঘুনাথ উলায় চলিয়া আসিলেন।

এরূপ কত গল্প প্রচলিত ছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজ রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন, "ভট্টাচার্য্য! ঐ কাঁটালটি সেবা করুন।" ভট্টাচার্য্য রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, সমস্ত কাঁটাল খোসা ভূতুড়ি সমেত উদরস্থ করিলেন। অদ্ভুত আহারের জন্য বর্দ্ধমান হইতে তিনি বিশেষ বৃত্তি পান।

আমি যখন রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়াছি, তখন তিনি প্রৌঢ়বয়স্ক। বয়স বাইটের কাছাকাছি। তখন ঐ সকল গল্প গল্পের মতই শোনা যাইত। তখন তিনি সাধারণ জনগণ হইতে কিছু বেশী খাইতেন মাত্র। আমাদের চুঁচুড়ার বাড়ীতে একবার আহার করেন। পিতৃদেব আহার দেখিয়া বলিলেন, "কৈ, আপনার আহারের যে এত গল্প শুনিয়াছি, তার ত কিছুই দেখিলাম না।" উত্তরে ভট্টাচার্য্য বলেন, "গঙ্গাচরণ বাবু, আমি যে আয়ু লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা যদি বসে বসে খেতাম, ত বোধ হয়, ৫০ বৎসর জীবিত থাকিতাম—তখন তা ত বুঝি নাই, এখন একটু বুঝিয়াছি, তাই আর বাড়াবাড়ি করি না।"

রঘুনাথের সে সময়ে ভূষণ ভট্টাচার্য্য বলিয়া একটি পালয়ান পুত্র ছিলেন, আরও পুত্র কন্যা ছিল। ভূষণ বীরপুরুষ, তাই তার কথা বলিয়াছি।

তখন দেশে ব্যায়ামচর্চা ছিল। এখনকার মত ব্যায়াম নহে। কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে ঠিক দুপুর রৌদ্রে যুবকেরা ব্যায়াম করিত। ব্যায়াম ফুরাইল—অমনি ট্রামে উঠিয়া বৌবাজারে চলিয়া গেল ব্যায়াম করে, অথচ এক পোয়া পথ চলিতে পারে না, তখন এমন বিড়ম্বনা ছিল না। তখন যাহারা ব্যায়াম করিত, তাহারা দুই দশ ক্রোশ চলিতে গাড়ী পাল্কী ভাড়া দিত না। উলাতেও বেশ ব্যায়ামচর্চা ছিল। ভূষণ ভট্টাচার্য্য এক জন পালয়ান ছিলেন। পালয়ানীর পরীক্ষা হইত জন্মোৎসবের সকাল বেলা, আমাদের কাছারীর বাড়ীর সম্মুখের মাঠে। মাঠের পূর্ব্বে আমাদের ভাড়াটিয়া দোতালা বাড়ী, সেইখানে আমাদের বাড়ীর মেয়েরা দেখিতেন। উত্তরে মাঠে কাছারীর আটচালা, সেইখানে ভদ্রলোকেরা বসিতেন; পশ্চিম দিকে সদর রাস্তা, এবং তাহার পশ্চিমে অনেকটা খোলা জমী, এই রাস্তায় ও জমীতে লোকে লোকারণ্য। দক্ষিণ দিকে শিবের ভাঙ্গা মন্দির ও মন্দিরের আচ্ছাদনস্বরূপ সুবৃহৎ নিম্ববৃক্ষ, সেই গাছের উপর পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা।

পালয়ানেরা জাঙ্গিয়া আঁটিয়া, এবং সঙ্গের ছেলের দল, গায়ে কাদা মাখিয়া

বলিয়া, মহা গান করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। কতকটা জল ঢালিয়া দেওয়া হইল, ছেলেরা নাচিতে ও লাফাইতে লাগিল। তাহার পর লাঠিখেলা হইল। শেষে কুস্তি।

তখনও ভূষণ প্রভৃতি লম্বা কোঁচা কাপড় পরিয়া দণ্ডায়মান। পিতৃদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এইবার ভূষণ এসো হে।" ভূষণের প্রতিদ্বন্দ্বী বীর বকো মাল। ভূষণ জাঙ্গিয়া পরিয়া, বাহুতে মাটী লাগাইয়া মল্লবেশে উপস্থিত। বকোও সেইরূপ বেশে অন্য দিক দিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিল। সেলাম, কুর্নিস, বাউকসাকসি, বাহ্বাস্ফোট, উরুস্ফোট, কত কি হইতে লাগিল; তাহার পর মাটীতে পড়িয়া কস্তাকস্তি, কেহই অপরকে চীৎ করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না। একবার আমার মনে পড়ে, ভূষণ ভট্টাচার্য্য বকো মালের মাথায় এমন চু মারিল যে, মাথা বাঁ করিয়া উঠিল, বকো বসিয়া পড়িল, মাথায় গামোছা বাঁধিল; একটু ম্রিয়মাণ হইল, আমিও হইলাম। খেলা সেবারে ভাঙ্গিয়া গেল—আমি ম্রিয়মাণই

রহিলাম। কতক্ষণ পরে খবর আসিল, বকো বাজারে গিয়া মদ খাই-তেছে। সকলে হাসিতে লাগিল, আমি কিন্তু ম্রিয়মাণই রহিলাম।

এই সকল মাল, ভাঁড়, খাইয়ে, বা পাগলের কথা বলিলাম, বলিয়া এমন কেহ মনে করিবেন না যে, উলায় সম্রান্ত বা পণ্ডিত লোকের অসদ্ভাব ছিল। উলার বামনদাস বাবু বা শম্ভুনাথ বাবু বড়মানুষ বলিয়া যে 'অবুঝবু গিরিঃহতো' গোছ অকর্ম্মণ্য ছিলেন, তাহা নহে। বিশেষ কর্ম্মঠ এবং চৌকোশ লোক ছিলেন। বৃহৎ পরিবার, ছোট ছোট ছেলে মেয়েই ছিল বিশ ত্রিশটি। বামনদাস স্নানের পূর্ব্বে ইহাদের প্রত্যেকটিকেই একবার কোলে লইতেন, নাম ধরিয়া সোহাগ করিতেন, সম্পর্ক ধরিয়া বিদ্রূপ করিতেন। এখনকার কালে কয় জন বড়লোকে তা পারেন? শম্ভুনাথ বাত্রা মহোৎসবাদির পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, সেই বৃহৎ গুম্ফজোড়া খাড়া হইয়া উঠিত। শান্তিপুরে একবার পাল্কী করিয়া শম্ভুনাথ বাবু যান, সেখানকার এক জন দুষ্ট মেয়ে বলিয়াছিল, "দিদি, দেখে যা, পাল্কীর মধ্যে একজোড়া গোঁপ যাইতেছে।" শান্তিপুরের মেয়েরা এবং উলার পুরুষেরা বড় রসিক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

উলার এক জন রসিক পুরুষের পরিচয় দিতেছি। মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এক জন সভাসদ্ ছিলেন। সকল রূপ বিদ্রূপ চলিতে পারে বলিয়া, মহারাজ মুক্তিরামের সহিত 'বেহাই' সম্বন্ধ পাতাইয়াছিলেন। সর্ব্বদাই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেন। উলায় বহুতর কুলীনের বাস, এই জন্য নানা বিদ্রূপ চলিত। কৃষ্ণচন্দ্রের কবির দলে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাতেই ঠাকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী দল গাহিয়াছিল,

"এরা সব কুলীনের সব কুলীনের ছেলে,
এদের গাল দিব কি বলে?"

এরূপ কথা কুলীনদের বিরুদ্ধে সে সময়ে সর্ব্বদাই চলিত। মহারাজও করিতেন। একদিন কৃষ্ণচন্দ্র একটি গালি স্থির করিয়া, মুক্তিরাম সভায় প্রবেশ করিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ হে! বেহাই, তোমাদের উলায় নাকি বৌ বিক্রয় হয়?" মুক্তিরাম অমনই হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, নিয়ে যাওয়া যায়ই।" সকলেই হাসিয়া উঠিল, মহারাজ নীরব।

একদিন মুক্তিরাম মুখুয্যে ভাল মাগুর মাছ পাইয়া মহারাজকে পাঠাইয়াছেন। মহারাজ সামান্য জিনিসও আহ্লাদ করিয়া লইতেন। মহারাজ মাগুর মাছ পাইয়া বড় সন্তুষ্ট, ততোধিক সন্তুষ্ট একটি গালি দিবার সুযো বাহির করিয়া।

এখন মাস্তরের শেষের র বাদ দিলেই মাস্ত হয়, স্ত্রীকে বুঝায়। তাই মুখুয্যে আসিবামাত্রই মহারাজ বলিলেন, "ওহে বেহাই, ও বেলা কি পাঠাইয়াছিলে, আমি তাহার অন্ত পাই নাই।" মুক্তিরাম বুঝিলেন, ব্যাপার কি! বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের পাগলের দেওয়া জিনিস, উহার আদি অন্ত দুই-ই ছিল না।" রাজা মুখের মত হওয়াতে বলিলেন, "বটে বটে।" 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—এই সকল হাসি মস্করার এই পর্য্যন্ত থাকাই ভাল।

বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে উলা বিশেষ দ্রব্যসম্ভার দিয়াছে, এবং বিশেষ ছাপ পাইয়াছে। সেই দুর্গাপ্রসাদ হইতে এই চন্দ্রশেখর বসু পর্য্যন্ত সকলেই উলার অবলম্বন। যদি বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন দশ জন লেখকের নাম করিতে হয়, তবে গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী-কার দুর্গাপ্রসাদের নাম তাঁহাদের মধ্যে দিতেই হইবে। গ্রন্থখানি নিরেট, অচ্ছিদ্র, ভাবে ভোরপুর, রসে ডগমগ; ইহার ভাষা সরল, সরস, প্রাঞ্জল, ভক্তিরসে পূর্ণ, ভক্তিতরঙ্গিণীতে তরঙ্গিণী। এমন গ্রন্থ আজি কালি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবু একবার ছাপাইয়াছিলেন, সে সংস্করণও বোধ হয় ফুরাইয়াছে; আবার মুদ্রিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

আমরা বালককালে, ৮।১০ বৎসর বয়সে উলায় ছিলাম। তখন হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় গ্রন্থ লিখিতেছেন, আর তাহার পর পাঁচ যুগ—ষাটি বৎসর গিয়াছে, এখনও তাঁহার লেখনীর বিরাম নাই। তাঁহার প্রথম পুস্তক "বাখরগঞ্জের বিবরণ" পিতৃদেবকে পড়িয়া শুনাইতেন, আমার বেশ মনে আছে। বাখরগঞ্জের লোকেরা, 'ধনভাই বলে না, বলে, দনবাই'—এই সকল কথা তখন একমনে শুনিয়াছিলাম। তাহার পর কত বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র হইতে সংকলন করিয়া চন্দ্রশেখর বাবু সাহিত্য-ভাণ্ডারে উপঢৌকন দিলেন, সে সকলই আমাদের শিক্ষা মুকর করিবার আয়োজন। তাঁহাকে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি, উলাও ধন্য হইয়াছে।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

অনেক দিন আগেকার কথা বলিতেছি। তখন সিপাহী-বিদ্রোহ সবে শেষ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সে সময় নাগোয়ার মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট। এখন আর নাগোয়ায় মহকুমা নাই—কাঁথিতে উঠিয়া আসিয়াছে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন নাগোয়ার হাকিম, তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ তখন তমলুকের হাকিম। উভয় স্থানের মধ্যে বিশ ক্রোশ ব্যবধান। পাল্কীতে বা পদব্রজে এ পথ এক দিবসেই সচরাচর লোকে অতিক্রম করিয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে একদা অতি প্রত্যূষে পাল্কীরোহণে তমলুক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তমলুকে আসিতে হইলে একটা নদী পার হইতে হয়। নদীর নাম হলদি। ইহা সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। ইহাকে ক্ষুদ্র নদী বলিতে সাহস হয় না,—বিশেষ আজিকার এই শ্রাবণের দিনে। তবে ইহা নির্ভয়ে বলিতে পারি, কলিকাতার সম্মুখস্থ গঙ্গার চেয়ে হলদি অনেক ছোট। যে ঘাটে খেয়া নৌকায় হলদি পার হইতে হয়, সে ঘাটের নাম নরঘাট, অথবা নরের ঘাট। গ্রামের নামও তাই। কেন এমন নাম হইল, তাহার কোনও ইতিহাস দেখিতে পাই না।

যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র যখন নরঘাটে আসিয়া পহুছিলেন, তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। তীরে খেয়া নৌকাখানি বাঁধা আছে, কিন্তু মাঝি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ত রাগিয়া অস্থির। মাঝির অনুসন্ধানে চাপরাশী ছুটিল। ঘাটের উপরে একখানি কুঁড়ে ঘর ছিল, তাহাতেই মাঝি ঝড় বৃষ্টি বা রৌদ্রের সময় আশ্রয় লইত। সে ঘরে মাঝি নাই। তখন মাঝির বাড়ী কোথায়, তাহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। পাল্কী দেখিয়া গ্রামের দুই চারি জন নিষ্কর্মা লোক আসিয়া জুটিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন মাঝির বাড়ী দেখাইয়া দিতে অনেক পীড়াপীড়ির পর স্বীকৃত হইল। চাপরাশী মহাবেগে তাহার সহিত ধাবিত হইল। কিন্তু তাহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না; মধ্য পথেই মাঝির সহিত সাক্ষাৎ। মাঝির পরিচয় পাইয়াই চাপরাশী তাহাকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং যাহাতে শিক্ষাটা সহজে মন হইতে মুছিয়া না যায়, তাহারও

ব্যবস্থা করিল। মাঝি কাঁপিতে কাঁপিতে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত। হাকিম দুই চারি ধমক দেওয়াতে মাঝি কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হুজুর! আমার ছোট মেয়েটির ওলাউঠা হয়েছে; বদ্যিতে জবাব দিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্তম্ভিত। তাঁহার ক্রোধ মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল। তিনি মাঝিকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার কুটীরের দিকে ধাবিত হইলেন, এবং তাহার কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিদিগকে ডাকাইলেন। গ্রামে যে দুই এক জন চিকিৎসক ছিল, তাহারাও আসিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছোট মেয়েটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মাঝির হাতে দুই একটা টাকা দিলেন। চিকিৎসক প্রভৃতিকে তিনি বলিয়া গেলেন, "আমি ফিরিবার সময় সংবাদ লইব, তোমরা রোগীর কিরূপ যত্ন লইয়াছ।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সহসা এতটা দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল কেন, ঠিক বলিতে পারি না। ইংরাজিতে যাহাকে revulsion of feelings বলে, বঙ্কিমচন্দ্রের সেটা প্রায়ই হইত। তবে ক্রোধের মাত্রা যদি দৈবাত নিখাদে উঠিত, সেটা সহসা নামিয়া সহজ সুর বা রেখাসে মুহূর্ত্তকালমধ্যে নামিত না। এ ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ অনুতাপ হইয়া থাকিবে। অনুতাপের বিশেষ কোনও কারণ দেখা যায় না। তবে এক এক জন এমন কোমলহৃদয় আছেন যে, তাঁহার অপরাধ না করিয়াও আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাহিরে একটা গর্ব্ব, একটা ক্রোধের আবরণ ছিল; কিন্তু ভিতরটা বড় প্রেমময়। যে তাঁহাকে ভাল করিয়া না বুঝিয়াছে, সে তাঁহাকে ক্রোধী, গর্ব্বিত মনে করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন তমলুকে পঁহুছিলেন, তখন অপরাহ্ন। জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট আরও দুই চারি জন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট অপরিচিত। তন্মধ্যে এক জনকে দেখাইয়া পূজ্যপাদ শ্যামাচরণ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বঙ্কিম, বলিতে পার, এই ভদ্রলোকটি কে?"

বঙ্কিমচন্দ্র ভদ্রলোকটির পানে একবার একটু তীক্ষ্ণনয়নে চাহিলেন, ক্ষণকাল কি ভাবিলেন; তার পর উত্তর করিলেন, "বাবু জগদীশনাথ রায়।"

সত্যই ইনি বাবু জগদীশনাথ রায়। ইনি তখন তমলুকে সহকারী পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-রূপে অবস্থান করিতেছিলেন। জগদীশ বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরে

গিয়াছিল। সেই জন্য জাতীয় মুকুরে ফরাসী সমাজের যে প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বালজাক্ তাহারই আলেখ্য অপূর্ব্ব ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। সে আলেখ্যে ধর্ম্ম আছে, অধর্ম্ম আছে, পাপ আছে, পুণ্য আছে—উৎকট উদ্ভট সবই আছে। কিন্তু সে সকলই জাতির অতীত গৌরবের অতীত ইতিহাসের ফ্রেমে আঁটা—ফরাসী ভাষার ও সাহিত্যের বন্ধনী-সংলগ্ন। বালজাক্ পরম্পরার কথা বিস্মৃত হন নাই; বালজাক্ অতীতকে বর্ত্তমানের সম্পর্ক-শূন্য করিয়া দেখান নাই। বালজাকই বলিয়াছেন,—To look back is to look beyond. পশ্চাতে দেখিলেই সম্মুখে দেখিতে হইবে—যে অতীতের চিন্তা করে, তাহাকে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতেই হইবে। বালজাক্ অতীতের আলেখ্য লিখিয়াছেন, ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করিতে ভুলেন নাই। অতএব বালজাক ধর্ম্মহীন নহেন। তিনি যে ফরাসী।

বালজাক্ বলিয়াছেন,—যেমন সূতার সাহায্যে মালা গাঁথা যায়, তেমনই ভাষার সাহায্যে যুগ-যুগের সাহিত্যকে গাঁথিয়া রাখা যায়। ভাষা সূত্র, সাহিত্য ফুল, এ সূত্র ছিন্ন হয় না, এ ফুল শুকায় না। তিনিই বলিয়াছেন যে, ফরাসী বিপ্লব ফরাসী জাতির পারম্পর্য্যের ছেদ নহে—গতির বিরাম নহে, মাঝখানে জোট পড়িয়াছিল, সেই জোট খুলিবার চেষ্টা মাত্র। তিনিই বলিয়া গিয়াছেন,—বিস্মৃতি? আরে ছিঃ ছিঃ! বিস্মৃতি ত জারজের আশ্রয়। আমি বাপের বেটা, জন্মিতে ফরাসী, আমি বিস্মৃতির আশ্রয় লইব কেন? যখন ফরাসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন ভুলিতে ত আমি পারি না, ভুলিব না, বরং অহরহঃ জাহাজী গোরাদের মতন অতীতকে তামাকের গুঁড়ির হিসাবে কেবল চিবাইব; বালক যেমন চকোলেট চাটে, তেমনই করিয়া অতীত অতীতকে চাটিব—ধীরে ধীরে, রসাইয়া রসাইয়া লেহন করিব। কেবলই কি ধর্ম্মতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্তের বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে হয়? লজ্জা, ঘৃণা, ক্রোধ, মানুষের বিষয় লইয়া নাড়া-চাড়া করিলে ক্ষতি কি? ঢাকিলেই পাপ, লুকাইলেই শয়তান দেখা দেয়, যেখানে প্রচ্ছন্নতা, সেইখানেই শয়তানের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে। আমি ভুলিব কেন? যে কবি এমন কথা কহিতে পারেন, তিনি ত সমাজ-ধর্ম্মহীন নহেন। তিনি ভাষার ধর্ম্ম নষ্ট করেন নাই, তিনি জাতির ধাতু ভুলেন নাই।

এমীল জোলা বালজাকের এই উপদেশটুকু অনুসরণ করিতে পারিয়াছিলেন। জোলাও সমাজকে আবরণহীন করিয়া দেখাইয়াছিলেন। উচ্ছৃঙ্খল সম্পর্কচ্যুত বিদ্রোহী হইয়া তিনি এমন কর্ম্ম করেন নাই। সমাজকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া জানিয়া, সভ্যতার আবরণে সে সমাজের সর্ব্বাঙ্গে কেমন ভাবে শয়তান অধিকার বিস্তার করিয়াছে, তাহাই সকলকে বুঝাইবার জন্য জোলা উলঙ্গতার ও বিষ্ঠাগারের আবর্জ্জনা মোচন করিয়াছিলেন। জোলা ভাষার ধর্ম্মের এবং সাহিত্যের ধর্ম্মের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। ইউরোপ দেখিয়াছে যে, বাস্তবতার বিকটতার মধ্যেও ধর্ম্ম আছে। সে ধর্ম্ম crystalised French manhood পাষাণীকৃত ফরাসী মানবতা; সে পাষাণীকরণে অতীতের ইতিহাস স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রহিয়াছে; সহস্র বৎসরের ফরাসী সভ্যতা "[illegible]" ভাব হইয়া

আছে। তাই জোলা বলিয়াছেন,—মানুষের লেখা আর বিধাতার লিপি একই, দুইটার কোনটাই মুছিয়া ফেলা যায় না। বংশের পর বংশ আসিয়াছে, বংশে-বংশে যুগে যুগে কত লেখাই লিখিয়া গিয়াছে, বংশানুক্রমের প্রভাবে সে লেখা অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় যেন গাঁথিয়া বাঁধিয়া বসিয়া আছে। সে প্রকৃতির লেখা মুছা যায় না। জোলা তাই প্রকৃতির—সংস্কারের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার লজ্জা নাই, ক্ষোভ নাই, কেন না, তিনি যেন শয়তানকে আলোর বাজারে টানিয়া আনিতে চাহিয়াছেন। কাজেই বলিতে হয় যে, এমীল জোলা ধর্ম্মের অপচয় ঘটান নাই, তাহা ও সাহিত্যের ধর্ম্মপারম্পর্য্য বিচ্যুত হন নাই।

ভিক্টর হিউগোর পক্ষে একটু কৈফিয়ৎ প্রয়োজন হইবে না। ভিক্টর হিউগো ইউরোপের পুরাণকার। তিনি নভেল বা উপন্যাস লেখেন নাই, অর্থবাদের হিসাবে সমাজের উপাখ্যান রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাস গ্রন্থ সকল কেবল চিত্ত-বিনোদনের জন্য লিখিত নহে, প্রধানতঃ ভাবোন্মেষের জন্য লিখিত। সে ভাবোন্মেষে অতীতের সহিত সম্পর্ক রহিত ঘটায় না, সে ভাবোন্মেষ পাঠককে আত্মহারা করিয়া দেয় না,—অতীতকে মুছিয়া ফেলিয়া বর্ত্তমানে প্রমত্ত করিয়া রাখে না। হিউগো সমাজের সকল স্তরের বর্ণনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, হিউগো উচ্চতা ও হীনতা, পশুত্ব ও পিশাচত্ব অঙ্কিত করিতে শঙ্কিত হন নাই; হিউগো চরিত্রের বিকটতা দেখাইয়াছেন, ঐশ্বরের পৈশাচ ভাবও দেখাইয়াছেন, কিন্তু পুরাণকারের মতন, অর্থবাদের হিসাবে ইতিহাসের সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এমন লেখকের হাতে ধর্ম ও মানবতা পঙ্কজ পদ্মের মতন ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিউগো সমাজের ভাল মুহূর্তে ছবি দেখান নাই, দর্শকের দর্শন-সৌকর্য্যার্থে হিউগোকে কখনই কল্পিত মুকুরের আকার-পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই। হিউগো বলিতেছেন—দেখ সোজা-খাড়া হইয়া নির্ব্বিরোধে বেড়ে দেখ। এ দিকেও দেখ, ঐ দিকেও দেখ। সব দেখিয়া নিজের দিকে দেখ। যদি আমার আলেখ্য-পরম্পরায় তোমার মতন কাহাকেও চিনিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে আমার কথা শুন। নহিলে তোমার লাভ চিত্তবিনোদন, আমার লাভ কিরিওয়ালার ছবি দেখানর মূল্য। ইহা পুরাণকারের কথা—পুরাণকার ঋষির কথা। ইউরোপের সাহিত্যে ইতঃপূর্ব্বে এমন কথা আর কেহ বলে নাই।

মসিয়ে ফাগে (M. Faguet) এই ভাবে তিন জন যুগপ্রবর্ত্তক ফরাসী লেখকের বিশ্লেষণ করিয়া শেষে তিনটি সিদ্ধান্তের কথা কহিয়াছেন :—

(১) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির বেদনবত্তার সহিত জড়িত;—তাহা জাতির সকল স্তরে সঞ্চারিত,—উচ্চতম হইতে নিম্নতম পর্য্যন্ত সকল লোকেই পরিব্যাপ্ত।

(২) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির অতীত পারম্পর্য্যের সহিত সংবদ্ধ—মালা-গ্রথিত পুষ্প শ্রেণীতুল্য।

(৩) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির সমাজধর্ম্মবর্জ্জিত হইতে পারে না; তাহা জাতির ভাবাশ্রিত ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না।

তিনি ইহাও বলেন যে, ধর্মবিপ্লব না ঘটিলে ভাষার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না। এমন কি, ধর্মবিপ্লব সত্ত্বেও এক একটি শব্দে, ভাষার এক একটি বচন ভঙ্গীতে অতীত যুগের বিস্মৃত অনেক ইতিহাস-কথা প্রচ্ছন্ন থাকে। খৃষ্টান ধর্ম প্রায় দেড় হাজার বৎসর ইউরোপে প্রবল থাকিলেও, এখনও ইউরোপের সকল সভ্যপ্রদেশের ভাষায় গ্রীস ও রোমের কঙ্কাল খুঁজিলেই পাওয়া যায়। পারম্পর্য্যের চিহ্ন একেবারে মুছিয়া ফেলিবার নহে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ভাষা কেবল সাহিত্যের উপাদান নহে, উহার সর্ব্বাঙ্গে জাতির পদচিহ্ন অঙ্কিত। ভাষা সমাজের অভিব্যক্তি; এই অভিব্যক্তি বিহঙ্গ-কলরবের ন্যায় ব্যোমপথে মিলাইয়া যায় না, সাহিত্যের মন্দির-গাত্রে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত থাকে। ভাষা সাহিত্যের সৃষ্টি করে, আবার সাহিত্যের আশ্রয়ে ভাষা আত্মরক্ষা করে। মানুষের ভাষা আছে, সে ভাষায় সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, সে সাহিত্য সুরক্ষিত হইয়া থাকে। তাই মানুষ—মানুষ [illegible]। পশুর স্মৃতি নাই, স্মৃতির অক্ষয় মঞ্জুষা নাই; তাই পশুর উন্নতি নাই, স্থিতি নাই, বিকাশ নাই। মানুষের স্মৃতি আছে, স্মৃতি-রক্ষার অক্ষয় মঞ্জুষা সাহিত্য আছে, তাই মানুষ দেবোপম হইয়াছে, পরে আবার হইতেও পারিবে। সাহিত্যের সৃষ্টি ভাষার উপাদানে হইয়া থাকে। সে বস্তু প্রথম স্তরে, বিভীষিকার উপাসনা, [illegible] উহার পর স্তরে স্তরে মানুষ যেমন উন্নত হয়, তদনুসারে মানুষের সাহিত্যও [illegible] হয়। এই অসম্পূর্ণবিন্যস্ত সাহিত্য [illegible] ইতিহাস [illegible]। এই সাহিত্যে যিনি একটা নূতন সুর বসাইয়া দিয়াছেন, [illegible] যিনি দুই চারিখানা ইটও গাঁথিয়া দিয়াছেন, তিনি [illegible]।

নষ্ট-রত্ন।

রাণী সুব্রতা স্থির করিয়াছিলেন, কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণের সুলক্ষণা কন্যার সহিত তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিবেন। অনেক অনুসন্ধানের পর কোনও দরিদ্রের গৃহে তাঁহার মনের মত এক পাত্রী জুটিল। পাত্রীর নাম গৌরী। গৌরী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী,—রূপে গুণে ঠিক গৌরীরই মত। শুভদিনে রাজপুত্রের সহিত গৌরীর মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরদিবস বধূ ঘরে আসিল। রাণী সুব্রতা একছড়া বহুমূল্য মুক্তার মালা দিয়া পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বিবাহ-রাত্রির পররাত্রি—‘কালরাত্রি’। প্রচলিত প্রথা অনুসারে সে রাত্রে রাজপুত্র স্বতন্ত্র কক্ষে শয়ন করিলেন। রাণী সুব্রতা পুত্রবধূর হাত ধরিয়া আপন শয়ন-কক্ষে আসিলেন। পার্শ্বে বধূকে সযত্নে শয়ন করাইয়া রাণী কহিতে লাগিলেন,—“মা, তুমি আজ যে মুক্তার মালা

কণ্ঠে ধারণ করিয়াছ, তাহার ইতিহাস তোমাকে এখন বলিব। একটু মনোযোগপূর্ব্বক শুনিও, এবং মনে রাখিও, বংশ পরম্পরায় সকলকে প্রত্যেকের পুত্রবধূকে এই ইতিহাস শুনাইয়া যাইতে হইবে।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার শ্বশ্রূমাতা এই মালা দিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন,—শুনিয়াছি আমাদের বংশের প্রথম রাজার সময় হইতে এই মালা ছড়াটি নববধূর আশীর্ব্বাদীস্বরূপ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে এই মালার মাঝখানের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উজ্জ্বল মুক্তাটির স্থান একেবারে শূন্য ছিল কেন শূন্য ছিল, তাহা তখন জানিতাম না। আমার বিবাহের পরদিবস স্বতন্ত্র কক্ষে আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল। আমার পিত্রালয় হইতে যে দাসী আসিয়াছিল, একমাত্র সেই আমার নিকট রহিল শয়নের পূর্ব্বে শ্বশ্রূমাতা কহিলেন, "বউ মা! যদি ভয় পাও, তা হ'লে আমার নিকট উঠিয়া আসিও।" তখন এ কথার অর্থ কিছুই বুঝি নাই, পরে বুঝিলাম, কেন তিনি আমাকে সতর্ক করিয়াছিলেন আমি শৈশবাবধি বড় দুঃসাহসী ছিলাম, সুতরাং ভয়ের কথা মনে স্থান পাইল না বিশেষতঃ, সেদিন পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন, সকলকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া মনটা এতই কাতর ছিল যে, অন্য কোনও চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। দাসীর অবিশ্রান্ত নাসিকাধ্বনি শুনিতে শুনিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, জানি না। ঘুমন্ত অবস্থায় মনে হইল, কে যেন আমার গলার মালা ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। চাহিয়া দেখিলাম, এক স্ত্রীমূর্ত্তি মুখখানি চিন্তাক্লিষ্ট, শীর্ণ ও মলিন, নিবিষ্টদৃষ্টিতে আমার মুক্তার মালায় কি যেন অন্বেষণ করিতেছে প্রথমে মনে করিলাম, কোনও পুরমহিলা সমস্ত মত আসিতে পারে নাই—তাই আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখিতে আসিয়াছে, সেই ছায়ামূর্ত্তি অগ্রসর হইয়া আমার শরীরে হস্তস্থাপন করিল, কিন্তু আমি কোনও স্পর্শ অনুভব করিলাম না! তখন বুঝিলাম, সে ছায়ামূর্ত্তি তখন শ্বশ্রূমাতার কথা মনে পড়িল। ব্যাপার কি, জানিবার জন্য কেমন একটা কৌতূহল জন্মিল। কিছুমাত্র ভীত না হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি চান?"

আমার কথা শুনিয়া সেই শীর্ণ ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "এই মালার যে মুক্তাটি হারাইয়াছিল, সেটি পাওয়া গিয়াছে কি না, তাহাই দেখিতে আসিয়াছি।" আমি বিস্মিত হইয়

কহিলাম, "এ মালা সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? আপনি কে?" ছায়ামূর্ত্তি তখন বিষণ্ণভাবে একটু হাসিয়া সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। কহিল, "এ মালা সম্বন্ধে যাহা জানি, তাহাই বলিবার জন্য কত বৎসর ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছি; আজ পর্য্যন্ত যাহাকে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি, সেই ভয়ে পলাইয়াছে; তোমার মত কেহ কথা কহিতে সাহস পায় নাই। আজ তোমার কাছে এই মালার কাহিনী বলিয়া আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তাহা না হইলে আমার মুক্তি নাই। আমি রাণী নর্ম্মা, এই বংশের প্রথম রাজার স্ত্রী। আমিই এই মালা সর্ব্বপ্রথম পাই—সে আজ শতাধিক বৎসরের কথা। এই মালার মাঝখানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে মুক্তাটি ছিল, সেটি আমিই হারাইয়াছিলাম। কি কারণে কেমন করিয়া হারাইলাম, অদ্যাপি কেহ জানে না। তাই এ বংশে নববধূ এ মালা অঙ্গে ধারণ করিলেই আমাকে সে কাহিনী শুনাইতে আসিতে হয়। তোমাকেও সেই কাহিনী শুনাইতে চাই। ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শুনিবে ত?"

আমি তখন উঠিয়া বসিলাম। রাণী নর্ম্মার জন্য করুণায় মন ভরিয়া গেল। কহিলাম, "মা! তুমি আমার পূজ্য, প্রণাম গ্রহণ কর, আমি শপথ করিতেছি, তোমার কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনিব, এবং বংশপরম্পরায় যাহাতে এ কাহিনী শুনিতে পায়, তাহার ব্যবস্থাও করিব। তোমায় আর আসিবার প্রয়োজন হইবে না, তুমি মুক্তি লাভ কর।" তখন সেই বিষণ্ণ ছায়ামূর্ত্তি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, "কল্যাণি! তুমিই এই মালার শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে পারিবে, এই আমার আশীর্ব্বাদ রহিল। এখন আমার জীবনের কাহিনী শোন। বংশপরম্পরাক্রমে যে নববধূ এই মুক্তার মালা কণ্ঠে ধারণ করিবে, শুধু তাহারই এ কাহিনী শুনিবার অধিকার, যেন কর্ণান্তরে না যায়।"

রাণী নর্ম্মা কহিতে লাগিলেন,—আমাদের দেশের রাজেন্দ্রনারায়ণ বহু কষ্টে অর্থসঞ্চয় করিয়া যখন প্রথম জমীদারী ক্রয় করেন, তখন আমার পিতাকে বাল্যবন্ধু বলিয়া এবং সচ্চরিত্র ও সত্যনিষ্ঠ জানিয়া তাঁহাকে তিনি প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। আমি তখন তিন বৎসরের শিশু। পরে মাতার নিকট শুনিয়াছি, জমীদার মহাশয় আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি বিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের সঙ্গে আমি শৈশবাবধি খেলা করিয়া বেড়াইতাম। আর আমাদের খেলায় সদা

ছিল নায়েব-পুত্র রমানাথ। আমার দশ বৎসর বয়সে সহসা জমীদার মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে সপ্তদশবর্ষীয় জমীদার-পুত্রের ভার আমার পিতা মাতার উপর ন্যস্ত হয়। আমাদিগকে তখন আপন গৃহত্যাগ করিয়া, জমীদার-বাটীতে বাস করিতে যাইতে হইল। সেই সূত্রে, একত্র বসবাসে জমীদার-পুত্রের সহিত আমাদিগের ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হয়। পিতা মাতা জমীদার-পুত্রকে যেরূপ সম্মান করিতেন, তেমনই স্নেহও করিতেন; আমার শিশু-হৃদয়ে তিনি চিরদিনই রূপে গুণে আদর্শ-স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়েও যে ক্রমে আমার প্রতি গভীর ভালবাসার সঞ্চার হইতেছিল, আমরা কেহই তাহা ভাবি নাই। আমার দ্বাদশ বৎসর বয়সে, তাঁহার খেলার সঙ্গিনীকে তিনি যখন জীবনের সঙ্গিনী করিয়া লইতে চাহিলেন, তখন পিতা মাতার আনন্দের সীমা রহিল না। আমি এত সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইব, তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। নায়েব-পুত্র রমানাথের সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব হইতেছিল। সমকক্ষ সমপদস্থ কোনও রাজকন্যার সহিত জমীদার-পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। বাস্তবিক আমার মত ভাগ্যবতী জগতে দুর্লভ। কিন্তু জন্মান্তরের দুষ্কৃতির ফলে যাহা ঘটিল, বলিতেছি, শোন।

আমার বিবাহের কয়েক বৎসর পরে, আমার স্বামী যে দিন রাজা উপাধি পাইলেন, সেই দিন ঐ মুক্তার মালাটি লইয়া আসিয়া স্বহস্তে আমার গলায় পরাইয়া দিয়া কহিলেন, "নর্ম্মা! তোমাকে জীবনের সঙ্গিনী পাইয়া যে সম্মান লাভ করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা অধিক কিছুই নয়—তবু আজ লোকসমাজে তুচ্ছ সম্মান লাভ করিয়া তাহারই নিদর্শন-স্বরূপ এই মুক্তার মালা তোমার জন্য আনিয়াছি। মাঝখানে যে উজ্জ্বল ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মুক্তাটি দেখিতেছ, ইহা অতি দুর্লভ, তোমারই মত শুভ্র ও পবিত্র। জহরী বলিয়াছে, 'বস্তুটি পবিত্রতার নিদর্শন, উহাকে অপবিত্রতা স্পর্শ করিতে পারে না।' এই বলিয়া আমাকে বক্ষে লইয়া বারংবার মুখচুম্বন করিলেন। আনন্দে আমার মন প্রাণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিলাম, তোমার মত স্বামী যাহার, তাহাকে কি অপবিত্রতা কখনও স্পর্শ করিতে পারে?

কিন্তু কোথা হইতে মোহ কিরূপে ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া মনের মধ্যে

প্রবেশ করে, তাহা মানব-বুদ্ধির অতীত। স্বামীর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও কেমন করিয়া যে মন অপবিত্রতা আহরণ করিল, আজিও তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

আমাদিগের আশৈশবের খেলার সঙ্গী নায়েব-পুত্র রমানাথ, স্বামীর সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু; চিরকাল একত্র প্রতিপালিত হওয়ায় আমাদের গৃহে তাহার অবারিত গতিবিধি ছিল। স্বামী আমাকে রমণীর শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলিয়া জানিতেন। আমারও আত্মাভিমান ও আত্ম-সম্মানজ্ঞান খুবই প্রবল ছিল। সুতরাং রমানাথের সহিত আলাপে পরিচয়ে কাহারও মনে কোনও দিন দ্বিধামাত্র হয় নাই।

রমানাথ যে আমার বিবাহকাল পর্য্যন্ত আমারই আশায় বসিয়াছিল, এবং আমার বিবাহের পর হিংসাপরবশচিত্তে, স্বামীর সহিত সখ্যের ছলনা করিয়া, আমাদেরই সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিল, তাহার আভাসমাত্র কখনও বুঝিতে পারি নাই।

তাহার স্নেহে—শুধু আমরা কেন,—আমাদের শিশুপুত্র শচীন্দ্রও একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। শচীন্দ্র যেমন শয়নে স্বপনে "কাকা" দেখিত, রমানাথও তেমনই মুহূর্ত্তকাল শচীন্দ্রকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। এই-রূপে সময়ে অসময়ে রমানাথ সতত অন্দর মহলে অবাধে যাতায়াত করিত। রমানাথ না হইলে কিছুই চলে না, সে না থাকিলে শচীন্দ্র ও তাহার জননীর কিছুই ভাল লাগে না। স্বামী তাহা লইয়া সময় সময় কত রহস্য করিতেন, কিন্তু আমরা সকলেই জানিতাম, রমানাথ সর্ব্বত্যাগী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, সুতরাং সে সকল রহস্য কাহারও মনে স্থান পাইত না। তখন পর্য্যন্ত রমানাথকে স্নেহ করিতাম। পুত্র শচীন্দ্রের খাতিরে তাহার সেবা করিয়া আনন্দ পাইতাম। ক্রমে বুঝিলাম, আমার মনের ভাব যেমনই হউক, রমানাথের মন ঠিক নির্ব্বিকার ছিল না। সে সুযোগমত অনেক কথা আমাকে বলিত। আমিও অবোধের ন্যায় সে সকল কথা শুনিতে আপত্তি করিতাম না।

একদিন দ্বিপ্রহরে—কার্য্যোপলক্ষে স্বামী বহির্বাটীতে ছিলেন, পালঙ্কোপরি শচীন্দ্র নিদ্রিত, আমি একখানি আসন বুনিতে ব্যস্ত। রমানাথ নিঃশব্দে আসিয়া নিকটে উপবেশন করিল। অসময়ে, অকারণে আসিবার কারণ প্রথমতঃ বুঝিলাম না, কিন্তু বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না। আমি

অনুভব করিলাম, সে নির্নিমেষনয়নে আমাকেই দেখিতেছে। কিছু বলিলাম না। অজ্ঞাতসারে আমার কর্ণদ্বয়ে যেন অগ্নিসঞ্চার হইল, আমি বুঝিলাম, আমার মুখ ক্রমে আরক্তিম হইয়া উঠিতেছে। ইতিমধ্যে রমানাথ ডাকিল, "নর্ম্মা !"—কি স্পর্দ্ধা ! ইতঃপূর্ব্বে সে কখনও আমার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতে সাহস পায় নাই, তাহার মুখে নিজের নাম শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, কিন্তু কি জানি কেন, বিরক্তিপ্রকাশ না করিয়া নীরবে শুনিলাম। সে কহিল, "নর্ম্মা ! আমার সঙ্গে বিবাহ হইলে কি তুমি কম সুখী হইতে ?" আমি অন্যমনে কহিলাম, "কি জানি !" পরক্ষণে স্বামীর কথা স্মরণ হওয়ায় আমি লজ্জিত হইলাম, ভাবিলাম, "ছি ছি ! করিলাম কি ?" তথাপি সে কথায় মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। মনের ভাব মনেই রহিল। রমানাথ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল,—"আমি সম্পদ ঐশ্বর্য্য তোমাকে দিতে পারিতাম্ না সত্য, কিন্তু এত ভালবাসিতে আর কে পারিবে ?" তখনও তাহার জন্য করুণার উদ্রেক হইল। কেন ? জানি না। শপথ করিয়া কহিতে পারি, স্বামী ব্যতীত অন্য কাহাকেও কোনও দিন ভালবাসি নাই, কিন্তু কেন তখন পুরুষ প্রকৃতির নীচ বাসনার ছল বুঝিলাম না ?

তার পর একদিন স্বামী সহ নিমন্ত্রণে চলিলাম ; শচীন্দ্রের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য রমানাথ রহিল। স্বামীর বারংবার অনুরোধে সেই বহুমূল্য মুক্তার হার পরিলাম—আমাকে সুসজ্জিত দেখিতে স্বামী চিরদিনই ভালবাসিতেন। এখন দেখিতেছ—শীর্ণ, বিবর্ণ, কঙ্কালসার ; সে কালে আমার মত সুন্দরী বিরল ছিল ; অন্ততঃ আমার স্বামী তাহাই বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। আমাকে পলকহীন নয়নে দেখিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইত না। স্বামীর সে গর্ব্ব, সে আনন্দ স্মরণ করিয়া এখনও পুলকে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হইবে ভাবিয়া তিনি আমাকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, শচীন্দ্র অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে, পার্শ্বে বসিয়া রমানাথ।

রমানাথকে নীরবে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, আমি তাহাকে নিষেধ করিয়া বসিতে অনুরোধ করিলাম। ভাবিলাম, তাহাতে আর দোষ কি ? তাহাতেই যে রমানাথকে কত বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হইল, মোহবশতঃ তখন তাহা বুঝিলাম না। আমাকে সে কি মনে করিয়াছিল, জানি না; এখন

সে কথা স্মরণ হইলে লজ্জায় ও ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি। রমানাথ যখন কহিল, "নর্ম্মা! তোমার অনুরোধ উপেক্ষা করিবার সাধ্য আমার নাই; কিন্তু যতক্ষণ তোমার কাছে থাকি, ততক্ষণ কি যাতনা হয়, তুমি বুঝিতে পার কি?"

কেন সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে দূর করিয়া দিলাম না, কেন তাহার স্পর্দ্ধা তখনই দমন করিলাম না? এখন ভাবি—কেন? কেন এমন মোহে ডুবিলাম? কোথায় ছিল আমার আত্মসম্মান, কোথায় ছিল স্বামিগৌরবে গরবিণীর অভিমান? আমি কেমন একটু বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। আমাকে নীরব দেখিয়া রমানাথ আমার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল, আমার হস্তধারণ করিয়া কহিল, "নর্ম্মা! তোমাকে চিরদিনের মত হারাইয়াছি বলিয়া আমার জন্ম একটু স্থানও কি তোমার হৃদয়ে নাই, একটি আশার কথাও কি কহিবে না?" আমি হতভাগিনী তখন মনে মনে ন্যায় অন্যায়ের বিচার করিতেছিলাম, দেখিতে দেখিতে—আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহার এত দুঃসাহস সম্ভব—রমানাথ সহসা আমাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল; সেই মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত শরীর মন বিদ্রোহ করিয়া, আমার যত গর্ব্ব, যত অভিমান ছিল, জাগরিত করিয়া তুলিল, আমি পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায় ছটফট করিয়া তাহার বাহুপাশ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অনেক চেষ্টা করিলাম। রমানাথ আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কেন আপনাকে ছলনা করিতেছ? তুমি যে আমাকেই ভালবাস, তাহাতে সন্দেহ নাই।" আমি বারংবার দৃঢ়স্বরে সে কথার প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও—বলিতে ঘৃণায় অন্তর দগ্ধ হয়—পাষণ্ড উপর্য্যুপরি আমার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। সেই সময় আমি প্রবল বেগে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলাম। যাইবার সময় সে হাসিয়া কহিল, "তুমি এখন যতই বিরক্তি প্রকাশ কর না কেন, ভাবিয়া দেখ, তুমি আমাকে প্রশ্রয় না দিলে আমার এত দুঃসাহস হইত কি? তোমাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে না পারিলেও তোমাদের সুখের ঘর ভাঙ্গিয়াছি, ইহাও আমার সুখ।"

তখন আমার কোনও কথায় মনঃসংযোগ করিবার অবসর ছিল না। কারণ, রমানাথের গ্রাস হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় কেমন করিয়া জানি না আমার কণ্ঠস্থিত মালা ছিন্ন হইয়া মুক্তাগুলি একে একে ভূমিতলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তখন বিক্ষিপ্ত মুক্তাগুলি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত ছিলাম। তখনও বুঝি নাই, কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়া গেল। পরে যখনই

রমানাথের কথাগুলি স্মরণ হইয়াছে, তখনই দারুণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া ভাবিয়াছি, কেন দুধ দিয়া কালসাপ গৃহে পুষিয়াছিলাম? কিন্তু দেখিলাম, অন্যের প্রতি দোষারোপ করা বিড়ম্বনামাত্র—আপনার পবিত্রতা আপনি রক্ষা করিতে জানিলে কে নষ্ট করিতে পারে? সে দিন যদি স্বামীর নিকট অকপটচিত্তে সকল কথা বলিতাম, তন্মুহূর্ত্তেই সকল মলিনতা কাটিয়া যাইত। কিন্তু বুঝি সেইখানে প্রাক্তনের অভিশাপ ছিল,—ভাবিলাম, যাহা ঘটিয়াছে, স্বামী কখনও তাহা জানিতে পারিবেন না, কৌশলে রমানাথকে উচ্ছেদ করিব, কেন বৃথা স্বামীর মনে সন্দেহের বীজ বপন করিব? সেই সূত্রেই যে মনে পাপ পোষণ করিয়া অপবিত্রতায় আত্মসমর্পণ করিলাম সে জ্ঞান তখন ছিল না। আমি তখন মোহ-সাগরে নিমগ্ন।

সে দিন রাগে অভিমানে বুঝিলাম, সত্যই আমার মনে স্বামী ব্যতীত আর কাহারও স্থান নাই। তথাপি—সত্য মিথ্যা দেবতা জানেন—যে উজ্জ্বল মুক্তাটি পবিত্রতার নিদর্শন বলিয়া স্বামী দিয়াছিলেন, সেটি খুঁজিয়া পাইলাম না। অন্যান্য মুক্তাগুলি সংগ্রহ করিয়া সেই রাত্রিতেই গাঁথিয়া রাখিলাম। আশা রহিল, পরদিন দিবসের আলোকে খুঁজিয়া পাইলে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিব। কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, সে মুক্তাটির আর সন্ধান পাইলাম না। তখন ক্রমে মন বিষম ভারগ্রস্ত হইতে লাগিল। দ্বিগুণিত বলে স্বামীকে আশ্রয় করিলাম। কিন্তু কিছুতেই সকল কথা তাঁহাকে বলিবার সাহস পাইলাম না। মনে যতই অনুতাপ হয়, স্বামীকে ততই জড়াইয়া ধরি, কিন্তু কিছুতেই আর আনন্দ—শান্তি পাই না। স্বামীর অগাধ ভালবাসাতেও তখন মন প্রাণ গর্ব্বে স্ফীত হয় না। দিনে দিনে শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল। স্বামীর মনে কোনও রূপ সন্দেহের লেশমাত্র নাই। কারণ, তাঁহার চোখে আমার মত নিষ্পাপ রমণী জগতে আর ছিল না।

এইরূপে কিছু দিন কাটিল। আমি সতত ভীত সন্ত্রস্ত থাকিতাম, পাছে মুক্তার মালা স্বামীর নয়নগোচর হয়। কোনও বিশেষ উৎসব উপলক্ষে স্বামী মালা পরিতে বলিলে আমি নানা আপত্তি উত্থাপন করি। অবশেষে এক দিন স্বামী কোনও যুক্তিই আর মানিলেন না। শচীন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হইয়াছে, বাড়ীতে বহুলোকের সমাগম হইবে, স্বামী জেদ ধরিলেন, সে দিন মালা পরিতেই হইবে। কিছুতেই স্বামীর

অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া মালা পরিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। স্বামী চলিয়া গেলেন; আমি কম্পিতহস্তে মালা খুলিয়া লইলাম, মালা পরিতে পরিতে শূন্য স্থান লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

সারাদিন উৎসবে কাটিল। সে সময়ে মালার কথা স্বামীর অথবা আমার কাহারও স্মরণ ছিল না। উৎসবান্তে অতিথিগণ বিদায় হইলে শয়নকক্ষে নিদ্রিত পুত্রের শিয়রে দাঁড়াইয়া আনন্দে অধীর হইয়া স্বামী আমাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। তখনও মালার কথা আমার স্মরণ নাই। সেই শেষ স্বামীর আদরে গভীর আনন্দ উপভোগ করিলাম। সহসা মুক্তার মালা স্বামীর নয়নগোচর হইল। তিনি কহিলেন, "নন্দা! এ মালা তোমাকে যেমন মানায়, তেমন আর কাহাকেও মানাইতে পারে না।" এই বলিয়া খেলাচ্ছলে আমার বক্ষে বিলম্বিত মালা হস্তে লইলেন, পরক্ষণেই মালা সহ আমাকে ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন, আমার মুখ পানে অটল কঠিন দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "মাঝখানে শূন্য কেন? সে মুক্তা কোথায়?" আমি কি কহিলাম, কিছু স্মরণ নাই। আমার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া গেল—কখন যে চেতনা হারাইলাম, কখন স্বামী চলিয়া গেলেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না।

আমার যখন জ্ঞান হইল, তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, দাসীরা চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করিতেছে, বাড়ীময় কোলাহল পড়িয়াছে। সকল কথা স্মরণ হইল,—অশেষ যন্ত্রণা অনুভব করিলাম। কোথায় রহিল পুত্র কোথায় রহিল ঘর সংসার, শুধু স্বামীর সেই তীব্র দৃষ্টি থাকিয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় আমার মর্ম্ম বিদ্ধ করিতে লাগিল, এবং প্রতিমুহূর্ত্তে বজ্র গম্ভীরস্বরে কাণে বাজিতে লাগিল—"বল সে মুক্তা কোথায়?" দ্বিপ্রহরে স্বামী অন্তঃপুরে আসিলেন না। আমি আশা করিয়াছিলাম, অন্ততঃ আর একবার জিজ্ঞাসা করিতে আসিবেন। মূঢ় আমি তখনও বুঝিতে পারি নাই যে মুক্তা হারাইবার পাপ বাক্যে সংশোধিত হইবার নয়। সকল কথা খুলিয়া বলিব, সত্য কথা বলিলে স্বামীর দয়া হইবে—মনে করিয়া সন্ধ্যার পর স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। স্বামী আসিলেন, কিন্তু যে ভাবে আসিলেন, তাহা অপেক্ষা না আসিলে ভাল ছিল। তাঁহার বক্ষের উপর সংবদ্ধ বাহুযুগল ও কঠিন দৃষ্টি দেখিয়া আমি এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলাম না, কথা সরিল না। আমাকে তদবস্থ দেখিয়া স্বামী কহি-

লেন, "সত্য বল, সে মুক্তাটি কোথায় ?" আমি অনেক চেষ্টার পর শুষ্ক-কণ্ঠে কহিলাম, "হারাইয়া গিয়াছে।" স্বামী কহিলেন, "আমার বিশ্বাস, সেই সঙ্গে তোমার পবিত্রতাও হারাইয়াছ, তাহা না হইলে এ কথা বলিতে আমার নিকট দ্বিধা করিতে না ; আমার সকল গর্ব্ব, সকল আনন্দ, সকল সুখ ও শান্তি, আমার সমস্ত জীবনের গৌরব তোমাতে নিহিত ছিল, তুমি সব নষ্ট করিয়াছ।" স্বামীকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া কহিলাম, "ওগো শোনো, কি করিয়া হারাইলাম, সকল কথা খুলিয়া বলিলে তুমি বুঝিবে, আমি অবিশ্বাসিনী নই, তুমি নিশ্চয় ক্ষমা করিবে।" স্বামী পূর্ব্ববৎ কঠিন স্বরে কহিলেন, "আমি ক্ষমা করিতে পারি—করিব—কিন্তু প্রথম গোপন করিয়া যে অবিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছ, এখন তাহার ক্ষালন হইবে কিসে ? যত দিন মুক্তা পুনরুদ্ধার করিতে না পার, ততদিন তুমি আমার ত্যাজ্যা।"

স্বামী চলিয়া গেলেন। তাঁহার কথাগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া শতবৃশ্চিকের ন্যায় আমাকে দংশন করিতে লাগিল। তাঁহার অন্তরের গভীর বেদনা অনুভব করিয়া হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল। আমি বুঝিলাম, স্বামীর মনে আমার কি স্থান ছিল, তিনি আমাকে কি স্বর্গরাজ্যের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। হায়! হতভাগিনী কিসের জন্য সব হারাইলাম। সেই দিন হইতে নানা স্থানে লোক পাঠাইলাম—যেখানে যত জহরী ছিল, সকলের নিকট অনুসন্ধান করিলাম—দেশ বিদেশে কতই খুঁজিলাম, সেরূপ নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মতি কেহ আনিয়া দিতে পারিল না। অদৃষ্টের এমনই বিড়ম্বনা, কোনও মতি সে শূন্য স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল না। আশায় আশায় বহুদিন কাটিল। ভাবিলাম, জীবন পণ রাখিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বসিয়াছি, যদি দেবতা করুণা করেন, যদি সহসা মুক্তাটি খুঁজিয়া পাই—কিন্তু বুঝিলাম, আপনার কর্ম্মফল খণ্ডন করিবার অধিকার দেবতারও নাই। স্বামী আর আমাকে গ্রহণ করিলেন না ; তাঁহার প্রাসাদে,—প্রকাশ্যে তাঁহার সকল সম্পত্তির অধিকারিণী থাকিয়া, শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হইয়া—আমি নরকবাস করিতে লাগিলাম। দেবতার এই এক অনুগ্রহ দেখিলাম, অধিকদিন সে দুর্ব্বহ জীবন বহন করিতে হইল না। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বামীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলাম। স্বামী আসিলেন ; দেখিলাম, সে স্নেহকান্তি, সে জ্যোতিঃ, সে আনন্দোৎফুল্ল মুখ বিবর্ণ হইয়াছে। আমার

দিকে চাহিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় সজল হইল। আমি কাতরে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কহিলাম, "আশীর্ব্বাদ কর, জন্মজন্মান্তরে যেন তোমাকেই স্বামী পাই।" স্বামী অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "ক্ষমা তোমাকে বহপূর্ব্বে করিয়াছি; তুমি ইহলোকেই প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়াছ—যে দিন প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে, সে দিন আবার আমাকে পাইবে, আমি তোমার অপেক্ষায় থাকিব। কিন্তু মুক্তা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট না হইলে তোমার মুক্তি নাই।"

বুঝিলাম, ত্যাগ করিলেও, আমার প্রতি যে গভীর ভালবাসা স্বামীর অন্তরে ছিল, তাহার এক কণাও লোপ পায় নাই। সেই গৌরব লইয়া মরিয়া ধন্ত হইলাম, কিন্তু মৃত্যুর পর পারেও শান্তি পাইলাম না। বুঝিলাম আত্মপাপ নিজের মুখে প্রকাশ না করিলে প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে না। তাই যে দিনই এ বংশের নববধূ সেই মুক্তার মালা কণ্ঠে ধারণ করে, আমার আত্মকাহিনী শুনাইতে এবং সেই নষ্ট মুক্তাটির সন্ধান করিতে আসিতে হয়। তোমার নিকট সব স্বীকার করিলাম। এখন আশায় থাকিব, মুক্তা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে আবার স্বামী সহ মিলিত হইব। সেই মিলনের তৃষ্ণায় নিশিদিন অস্থির হইয়া ফিরিতেছি—না জানি আরও কতকাল এই ভাবে কাটিবে।"

আমি কহিলাম, "মা! তোমার আশীর্ব্বাদে যেমন করিয়া পারি, মুক্তা সংগ্রহ করিব—তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ পূর্ণ হইয়াছে, এখন স্বামী সহ মিলিত হইয়া ধন্ত হও—এ বংশে তোমার কাহিনী ব্যর্থ না হইয়া কল্যাণের উৎসস্বরূপ হউক।" দেখিতে দেখিতে রাণী নর্ম্মার ছায়ামূর্ত্তি মিলাইয়া গেল—তাঁহার মুখের প্রসন্ন ভাব ও আনন্দের জ্যোতিটুকু দেখিয়া বুঝিলাম, আত্মদোষ স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের শেষ হইয়াছে। সেই দিন হইতে সংকল্প করিয়া, অনেক দিনের চেষ্টায়, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, এই নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মুক্তাটি সংগ্রহ করিয়া সূত্র পূর্ণ করিয়াছি।

নববধূ গৌরী দীপালোকে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মুক্তাটি ভাল করিয়া দেখিয়া, শ্বশ্রূমাতাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "আশীর্ব্বাদ কর মা! এ রত্ন যেন না হারাই।"

শ্রীঅমলা দেবী।

সাগরিকা।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

গৌড়ীয় প্রভাব।

হর্ষবর্দ্ধনের প্রবল সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইবার পর, মুসলমান-শাসন প্রচলিত হইবার আরম্ভকাল পর্য্যন্ত, প্রায় পাঁচশত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছিল। এই পাঁচশত বৎসর আমাদের ইতিহাসের 'মধ্যযুগ'। ইহার প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য এই যুগ গৌরবহীন অধঃপতন-যুগ বলিয়া কথিত হইতেছে। ইহার সকল কথাই যেন অনিবার্য্য অধঃপতনের কথা;—তাহা যেন পতনোন্মুখ জীর্ণ মন্দিরের স্খলন-প্রবণ অন্তঃসার-শূন্যতার কথা! যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থের শেষ অধ্যায় এই যুগের পূর্ব্বেই প্রকৃতপক্ষে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে;—যাঁহারা শিল্পের ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই যুগের পূর্ব্বেই কলাকৌশল-বিকাশের শেষ নিদর্শনের উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। সুতরাং 'মধ্যযুগ' অকীর্ত্তিকর অধঃপতন-যুগ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছে।

অন্য প্রদেশের কথা যেরূপ হউক না কেন, প্রাচ্য-ভারতের পক্ষে 'মধ্যযুগ' নিরবচ্ছিন্ন অধঃপতন-যুগ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। এই যুগই বরং উল্লেখযোগ্য গৌরব-যুগ,—গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের বিজয়-যুগ। গৌড় জনপদ চিরদিনই পরানুকরণ-পরায়ণ—এইরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণা তথ্যানুসন্ধানের অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। একবার এই ধারণা পরিত্যাগ করিয়া, নিরপেক্ষভাবে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারিলে, গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসেও অনেক উল্লেখযোগ্য পূর্ব্বগৌরবের সন্ধানলাভের সম্ভাবনা আছে।

যতদিনের ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারিয়াছে, ততদিনের মধ্যে ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশেই অতি দীর্ঘকালস্থায়ী সাম্রাজ্য-গৌরবের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। সকল প্রদেশেই কখন না কখন প্রবল প্রতাপশালী বিজয়-রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; কিন্তু তাহা অল্প কালের মধ্যেই ধ্বংস-দশায় নিপতিত হইয়াছে। সে সকল সাম্রাজ্য যেন বুদ্বুদের মত সহসা উত্থিত হইয়া,—দেখিতে না দেখিতে,—বুদ্বুদের মত সহসা বিলীন হইয়া গিয়াছে। এ সকল ব্যাপারকে

নিতান্ত অনিবার্য্য মনে করিয়া, জনসমাজ যেন "মনঃস্থির" করিয়াছে, -- বিজ্ঞের মত বুঝিয়াছে এবং বুঝাইয়াছে,—

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।"

পুরাতন সাম্রাজ্যের যাহা কিছু গৌরব, তাহা যেন ব্যক্তিগত গৌরব বলিয়াই অনুভূত হইয়াছে। তাহার সহিত জন-সমাজের সম্পর্ক যেন নিতান্ত অল্প, অথবা একেবারে অপরিজ্ঞাত। তাহার কথা যেন কেবল নরপতির কথা,—রাষ্ট্রপতির কথা,—তাহার কথা যেন চন্দ্রগুপ্তের কথা,—চাণক্যের কথা,—অশোকের কথা,—উপগুপ্তের কথা,—সমুদ্রগুপ্তের কথা,—অথবা হর্ষবর্দ্ধনের কথা। জনসাধারণ যেন নিতান্ত উদাসীনের ন্যায় তাঁহাদের উত্থান পতন দর্শন করিয়া আসিয়াছে।

গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসে, এ সকল বিষয়ে, কিছু কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী বর্ত্তমান ছিল,—বিবিধ বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়াও পুনঃ পুনঃ আত্মরক্ষা করিয়াছিল। তাহার সহিত রাজা-প্রজার সমান সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে যে সকল ঐতিহাসিক যুগ অতীত হইয়া গিয়াছিল, তাহার সকল যুগেই জন-সমাজের হৃদয়ে যে সংস্কার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল, সে সংস্কার লোক চিনিত, সম্প্রদায় চিনিত, —আর্য্য-অনার্য্য চিনিত,—স্বধর্ম্ম চিনিত,—চিনিত না কেবল স্বদেশ। তাই কাহারও আদর্শ হইতে পারে নাই। আদর্শ হইয়াছিল ক্রিয়াকাণ্ডের আড়ম্বর; তাহার অনুসরণেই জনসমাজকে ব্যাপৃত রাখিত।

প্রাচ্য-ভারত বন-সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। প্রাচ্য ভারত শস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। প্রাচ্য-ভারত শৌর্য্য-বীর্য্যেও ভারত-বিখ্যাত ছিল। কিন্তু প্রাচ্য-ভারত তাহার স্বতন্ত্র সত্তা অনুভব করিত বলিয়া বোধ হয় না। স্বচ্ছন্দ বনজাত-শাকান্ন পরিতৃপ্ত প্রাচ্য-ভারতের বহির্দৃষ্টি যেন তাহার অন্তর্দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। অচল অটল হিমাচল কন্দরের যাহার অভেদ্য দুর্গ প্রাচীর, উত্তাল তরঙ্গ-লীলাময় অতলস্পর্শ মহাসাগর যাহার প্রবল পরিখা, সেই বঙ্গভূমি প্রকৃতি প্রদত্ত বিবিধ ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে গরীয়সী হইয়াও, বহুকাল স্বতন্ত্র সত্তা হারাইয়া আর্য্যাবর্ত্তের কণ্ঠলগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যিনি যখন আর্য্যাবর্ত্তে প্রভুত্ব সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইতেন, তখন বঙ্গভূমিও তাঁহাকেই প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইত।

মধ্যযুগের প্রারম্ভে,—মাৎস্য ন্যায়ের উৎপীড়নে,—আপন অসহায় অবস্থার

শোচনীয় পরিণামে পুনঃ পুনঃ নিষ্পিষ্ট হইয়া, আত্মচেষ্টায় আত্মরক্ষার প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করিয়া, প্রাচ্য-ভারত ক্রমে ক্রমে জাগরণ লাভ করিয়াছিল। প্রকৃতিপুঞ্জ "মাৎস্য ন্যায় দূরীকৃত করিবার জন্য" গোপালদেবকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়া, প্রাচ্য-ভারতের স্বাতন্ত্র্য সংস্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যাহারা যুগে যুগে পরপদানত হইত, তাহারা এইরূপে দিগ্বিজয়-সাধনে বহির্গত হইয়াছিল;—যাহারা প্রণাম করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহারা এইরূপে সকল-উত্তরাপথে [আর্য্যাবর্ত্তে] প্রণম্য বলিয়া এক অভিনব সম্মান লাভ করিয়াছিল।

কিয়ৎকালের জন্য গৌড়ীয় বিজয়-বাহিনীর অপ্রতিহত প্রভাব সর্ব্বত্র অজেয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। গৌড় কবির প্রশস্তি-রচনা-কৌশলে সে কথা কত প্রস্তর-ফলকে ও ধাতুপট্টে উৎকীর্ণ হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। গোপালদেবের সকল-দিক্‌বিজয়ী বীরপুত্র ধর্ম্মপালদেবের "করিগণ-চরণ-বিন্যাসভরে" বসুন্ধরা নিপীড়িত হইত, মহাসাগরও সে বিজয়যাত্রার প্রতিরোধ করিতে পারিত না,—তাঁহার "নাশীর" নামক অগ্রগামী সেনাদলের সমাগম-সংবাদে মোহপ্রাপ্ত হইয়া, কান্যকুব্জের অধীশ্বর সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—তাঁহার পুত্র দেবপালদেবের শাসন-ক্ষমতা সকলের নিকটেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তদীয় বীরভ্রাতা বিজয়ী জয়পালের আক্রমণে প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি বশ্যতা স্বীকারে [সন্ধি-বন্ধনে] আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী নরপতি প্রথম বিগ্রহপালদেব "অজাতশত্রু" ছিলেন। তৎপুত্র নারায়ণপালদেবের "ইন্দীবরশ্যাম অসিপত্র যখন রণক্ষেত্রে বিস্ফারিত হইত, তখন [ভয়ার্ত্তমনা] শত্রুগণ তাহাকে পীত-লোহিতবর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়া দর্শন করিত।" তাঁহার ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী ভট্ট-গুরবের প্রবল প্রতাপে শত্রুসেনামণ্ডলী "ভূমিভ্রমান" [যোদ্ধা] বলিয়া অহংকার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এইরূপে যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল, তাহার বাহুবলের অভাব ছিল না। কিন্তু বাহুবল অপেক্ষা জ্ঞান-বল আরও দূরবর্ত্তী দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের এই সকল দিগ্বিজয়-ব্যাপার যেন অন্তর্নিহিত সকল শক্তিকে এক সঙ্গে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার ফলে,—সাহিত্যে "গৌড়ী রীতি," শিল্পে "গৌড়ী রীতি,"—দিগ্‌দিগন্তে গৌড়ীয় প্রভাব বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা, জগদ্দল, তাম্রলিপ্তি এই গৌড়-গৌরবযুগের জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

এই গৌড়ীয় প্রভাবের সহিত পরম্পরাগত পুরাতন প্রভাবের সম্পর্ক ছিল; কিন্তু, সর্ব্বাংশে সামঞ্জস্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। অনেক দিন হইতে বিবিধ বিধানে সমন্বয়-সাধনের জন্য ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে প্রয়োজন অনুভূত হইয়া আসিতেছিল;—কিন্তু তাহার চেষ্টা মধ্যযুগের গৌড়ীয় সাম্রাজ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সফলতা লাভ করিয়াছিল। গৌড়ীয় সাম্রাজ্য রাজা-প্রজার সাম্রাজ্যরূপে প্রকৃতিপুঞ্জের সহায়তায় প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা যেন সকলশ্রেণীর জনমণ্ডলীকে এক স্নেহের ক্রোড়ে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল;—সকল সংকীর্ণতা যেন এক অনির্ব্বচনীয় মহাপ্রাণতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাহার প্রভাবে জনসমাজ এক অভিনব মিলন-ভূমির সন্ধান লাভ করিয়াছিল, এবং হিন্দু-বৌদ্ধ আর্য্য-অনার্য্য এক অভিনব মিলনক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল। অবস্থাভেদ, অধিকারভেদ, বর্ণভেদ প্রচলিত থাকিলেও, ভেদের মধ্যে অভেদের মূলমন্ত্র বিঘোষিত হইয়াছিল,—উচ্চবর্ণের লোকেও নীচবর্ণের লোকের মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিল,—কর্ম্মকাণ্ডের উপর, জ্ঞানকাণ্ডের উপর, ভাবকাণ্ডের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল,—ভাবে বিভোর হইয়া, গৌড়ীয় জনসমাজ এক অভিনব দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিল। সে দৃষ্টি বাহির ছাড়িয়া, ভিতরে প্রবেশ লাভ করিয়া, ভোগের মধ্যে যোগের, কুৎসিতের মধ্যে সুন্দরের, সসীমের মধ্যে অসীমের, জীবের মধ্যে শিবের সন্ধান লাভ করিয়াছিল।

এই প্রভাব গ্রন্থ-লোপের সঙ্গে সহসা বিলুপ্ত হইতে পারে নাই, এই প্রভাব শিল্পকীর্ত্তি-লোপের সঙ্গেও সহসা বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। ইহা জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে এরূপ দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, এখনও বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ প্রতিভা-গৌরবের মধ্যে ইহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিল্পের মধ্যেই গৌড়ীয় প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং শিল্পের মধ্যেই তাহার তথ্যানুসন্ধান-চেষ্টা অধিক ফলপ্রদ হইবার আশা আছে।

গৌড়শিল্প ভাবপ্রবণ। ভাবপ্রবণ বলিয়াই আভাসাত্মক। ব্যক্তের ভিতর দিয়া অব্যক্তের আভাস প্রদান করিবার আকাঙ্ক্ষাই তাহার প্রধান আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল বলিয়া, গৌড়শিল্প-কলা মানবচিত্তকে বাহির হইতে অভ্যন্তরে আকর্ষণ করিয়াছিল;—বিশ্বসৌন্দর্য্যসম্ভারের মহাভাণ্ডাররূপে

প্রতিভাত হইয়াছিল। তাহা যে অধোগতির নিদর্শন নয়, প্রত্যুত এক অভিনব রচনা-রীতির পরিচয়-বিজ্ঞাপক, তাহা এখন কেহ কেহ মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার উৎপত্তিস্থান কোথায়, তদ্বিষয়ে এখনও বাদানুবাদ নিরস্ত হয় নাই।

মগধে এবং উৎকলে মধ্যযুগের শিল্পনিদর্শনের অভাব নাই। তাহা অপেক্ষাকৃত অনায়াসলভ্য বলিয়া, তাহার কথা পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইতেছে। যবদ্বীপের শিল্পনিদর্শনগুলিরও আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে নূতন নূতন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল প্রদেশে যে সকল শিল্পনিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূল প্রভাব-ক্ষেত্র কোথায় ছিল, তাহার আবিষ্কার-সাধনের জন্য কৌতূহলের অভাব না থাকিলেও, যথাযোগ্য চেষ্টার অভাবে, তৎসম্বন্ধে এখনও কোনরূপ নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইতে পারে নাই।

মধ্যযুগের মগধের এবং উৎকলের শিল্পনিদর্শনের সঙ্গে যবদ্বীপের শিল্পনিদর্শনের কোনরূপ রচনা-সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় কি না, সে প্রশ্ন অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও উত্থাপিত হইত না। কারণ, যবদ্বীপের শিল্প-রীতির মধ্যে ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলের শিল্পরীতির প্রচ্ছন্ন প্রভাব দেখিতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া এক সময়ে দুন্দুভি-নিনাদ-মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহা নীরব হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ সাদৃশ্য অপেক্ষা অসাদৃশ্যই দর্শন করিতে-ছেন! তত্ত্বানুসন্ধিৎসা নূতন উদ্যমে পণ্ডিতসমাজকে নূতন পথে তথ্যানুসন্ধানে নিবিষ্ট করিয়াছে। (১)

এতকাল যাহা মগধের এবং উৎকলের শিল্পরীতি বলিয়া কথিত হইতেছিল, তাহার প্রকৃত উদ্ভবস্থান কোথায়, তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তারানাথের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—তাহার উৎপত্তিস্থান বরেন্দ্রভূমি। ধর্ম্মপালদেবের এবং দেবপালদেবের শাসনকালই তাহার উৎপত্তি-কাল। বরেন্দ্রনিবাসী ধীমান্ এবং তৎপুত্র বীতপাল সেই

(১) সুপণ্ডিত ভিন্সেন্ট স্মিথ তাঁহার নবপ্রকাশিত শিল্পের ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—It is difficult, merely from study of the sculptures and without the aid of external evidence, to form a definite opinion whether the art of Boro Budur was derived from the east or the west side of India,—Chapter VII. P. 264.

শিল্পরীতির জন্মদাতা। তাহা ক্রমে ক্রমে মগধে উৎকলে এবং অন্যান্য অনেক জনপদে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতশিল্পের ইতিহাসে [এইরূপে] একটি নূতন অধ্যায় সংযুক্ত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। (২)

কোনও শিল্পরীতিই ব্যক্তিবিশেষের কপোলকল্পিত বলিয়া কথিত হইতে পারে না। তাহা স্থানকাল-পাত্রোচিত ভাব সমবায়ের স্বাভাবিক বিকাশ মাত্র। যাহা ধীমানের এবং বীতপালের শিল্পরীতি বলিয়া কথিত হইতেছে, তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড়ীয় জনসাধারণের সাধনাধারারই পরিণত ফল। গৌড়ীয় জনসমাজে গৌড়বিজয়িগণের নবজীবন-সংস্পর্শে যে ভাব-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, শিল্পের ভিতর দিয়া তাহাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ধীমানের জন্মভূমিতে তাহার যে অসংখ্য নিদর্শন এতদিন অনাদরে পড়িয়াছিল, তাহার কিছু কিছু বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক একত্র সংগৃহীত হইবামাত্র, গৌড়শিল্পকলার প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সমক্ষে গৌড়ীয় প্রভাব,— তাহা যেন মুক্তকণ্ঠে গৌড়-গৌরবযুগের বিজয়-গীতি গান করিতেছে।

শিল্পের প্রভাব বরেন্দ্রভূমির চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না,— রাষ্ট্রীয় বিবিধ প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহা দিগ্দিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই শিল্প বৃহৎ এবং সুন্দর,— রেখাপাতে গঠনের অপূর্ব সমাবেশ কৌশলে অনির্বচনীয় মাংসপেশীর অবকাশে গৌড়ীয় জনসমাজে যে নবোদ্যম পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল,— যে নবোদ্যম দিগ্বিজয়-ব্যপদেশে [illegible] বিবিধ বাহুবীর্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল,— সেই নবোদ্যম শিল্পকলাতেও এক অভিনব রচনা-রীতিতে আত্মপ্রকাশের শক্তি দান করিয়াছিল।

গৌড়-শিল্পকলার অভিব্যক্তির সঙ্গে এক আধ্যাত্মিক কল্পনা-মাধুর্যের পরিচয় জড়িত হইয়া রহিয়াছে। তাহা আকারকে ভাব-নির্মুক্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া, ভাবকে আকার দান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। নারায়ণপালদেবের প্রধান মন্ত্রী ভট্টগুরবের বরেন্দ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠাপিত গরুড়-

(2) The Naga productions of Nagarjuna's time were rivalled by the creations of Dhiman and his son Bitapala, natives of Varendra (Bengal), who lived during the reigns of Devapala and Dharmapala.—A History of Fine Art in India and Ceylon by Vincent. A. Smith, Chapter IX P. 305.

স্তম্ভে যে শ্লোকাবলী উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহার একটি শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"তাঁহার সুকুমার শরীর শোভার ন্যায় লোকলোচনের আনন্দদায়ক,—তাঁহার উচ্চান্তঃ-করণের অনুশীলিত উচ্চতার ন্যায় উচ্চতাযুক্ত,—তাঁহার সুদৃঢ় প্রেমবন্ধনের ন্যায় দৃঢ়সংবদ্ধ—কলিকলুষ-শোধিত—শৈলবৎ সুস্পষ্ট প্রতিভাত—এই স্তম্ভ তাঁহার যশঃ ছবির প্রিয়-সখার [কবিগণের শরণ] শকটের এই মূর্ত্তি আরোপিত হইয়াছে।"

এই শ্লোকেই গৌড়-শিল্পকলার রচনা-গাম্ভীর্য্যের প্রকৃত লক্ষ্য সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহা ভাবকেই আকার দান করিয়াছিল,—জনসাধারণের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার, তাহাদের উচ্চান্তঃকরণের এবং সুদৃঢ় প্রেম-বন্ধনের অনুরূপ শিল্প-কৌশলের বিকাশসাধনের আয়োজন করিয়াছিল। কেবল আকারানুকরণের হিসাবে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে তাহার সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিলে, তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা অনুভূত হইতে পারে না।

বরেন্দ্রভূমির নানাস্থানে এই যুগের শিল্পকীর্ত্তির যে সকল নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সর্ব্বাঙ্গে এইরূপ বিশিষ্ট শিল্পকলা অভিব্যক্ত। তাহাতে ভাবের, ছন্দের, অঙ্গসংস্থানের ত্রুটি লক্ষিত হয় না।—সুন্দরকে আরও সুন্দর করিবার উপযোগী রচনা-পারিপাট্য বিকাশেরও অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সে সকল কথা অল্প কথা, প্রধান কথা—ভাব-সামঞ্জস্য। তাহা শিল্প-কৌশলে সুরক্ষিত, অঙ্গসামঞ্জস্যে দৃঢ়-সংবদ্ধ, ভাবে ভঙ্গে যথাবিন্যস্ত, সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্যে অলংকৃত।

রচনা কখন উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে আরোহণ করিতে গিয়া, এই শিল্পকলাকে অতিমাত্রায় অলৌকিকত্ব দান করিয়া গিয়াছে। এক মুখের পরিবর্ত্তে বহু মুখ,—দুই বাহুর পরিবর্ত্তে বহু বাহু,—এই শিল্পকলাকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং এই অলৌকিকত্ব-লোলুপ সৌন্দর্য্য-বিকাশ-কৌশল আমাদিগের আকার-সর্ব্বস্ব সমালোচনায় শিল্পের অধোগতির নিদর্শন বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে।

ভাবকে আকারানুগত করিবার চেষ্টা না করিয়া, আকারকে ভাবানুগত করিতে গিয়াই, গৌড়শিল্পকলা অলৌকিকত্বের প্রশ্রয় দান করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে ভাবসামঞ্জস্য ক্ষুণ্ণ না হইয়া, পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এখন অতি অল্পসংখ্যক শিল্পরসজ্ঞ সমালোচক ভিন্ন জনসাধারণ আধুনিক শিল্পকলার মাহাত্ম্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। আধুনিক শিল্পীও

সেই অল্পসংখ্যক রসজ্ঞের চিত্তবিনোদনের জন্যই আয়াস স্বীকার করেন। সেকালে এরূপ ছিল না। জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্যই সার্ব্বজনীন ভাষারূপে শিল্পকলা আত্মবিকাশলাভের চেষ্টা করিয়াছিল। তজ্জন্য জনসাধারণের ধ্যানধারণাই শিল্পের ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা যাহা বুঝিত, তাহারা যাহা চাহিত, তাহা 'ভাব';— শিল্পকলা যাহা অভিব্যক্ত করিত, তাহাও 'আকার' নহে, 'ভাব'। গৌড়শিল্পকলা এইরূপ গৌড়বিজয়যুগের জনসাধারণের চিত্তবৃত্তির অনুবর্ত্তন করিতে গিয়াই ভাবপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছিল, ভাবপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই, আকারকে ভাবানুগত করিতে বাধ্য হইয়াছিল; এবং আকারকে ভাবানুগত করিতে গিয়াই অলৌকিকত্বের প্রশ্রয়দান করিয়াছিল।

যাহা ভীষণ হইতে ভীষণ, তাহার মধ্যেও যে শিল্পসৌন্দর্য্যের অভাব নাই, তাহা পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়াছিল। ভাবসামগ্রী পুঞ্জীকৃত করিয়া, সেকালের গৌড়শিল্পী যে মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তি রচনা করিয়াছিল, তাহার সহিত একালের ক্ষীণপ্রাণ বাঙ্গালীর সদ্যরচিত মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তির কত পার্থক্য! সেকালের মহিষমর্দ্দিনী মহিষ-মর্দ্দিনী,—মর্দ্দনের প্রণালীর ভিতর দিয়া তাহার ভাব-সামর্থ্য কেমন পরিস্ফুট,— যেন দেবাসুর-সংগ্রাম-কল্পনা মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া, পাপের পরাজয় এবং পুণ্যের জয় বিঘোষিত করিতেছে। মহিষ-মর্দ্দিনী শূলাগ্রে মহিষাসুরের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিয়াছেন;—দৃঢ়মুষ্টিনিবদ্ধ শূলদণ্ড যেন সবলে শূলাগ্র নিম্নাভিমুখে প্রোথিত করিতেছে! মূল ভাবের অনুগত হইয়া, শ্রীমূর্ত্তি যেরূপ আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, আকারের হিসাবে অলৌকিক হইলেও, তাহা যেন ভাবের হিসাবে স্বাভাবিক অপেক্ষা স্বাভাবিক। সেকালের গৌড়জন যাহাকে ধরিত, তাহাকে কেমন করিয়া ধরিত;—কেমন করিয়া পদবিদলিত করিত,—কেমন করিয়া আত্মপ্রাধান্য সুসংস্থাপিত করিত;—তাহার ভাব-সামগ্রী লইয়াই যেন সেকালের মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তি কল্পিত ও গঠিত হইত। সে ভাব অপরাজিতা মহাশক্তির মহাভাব,—উদ্যমে, অধ্যবসায়ে, অকুতোভয়তায়, অসঙ্কোচে অনন্যসাধারণ। ইহার নিদর্শন যে দেশেই আবিষ্কৃত হউক না কেন, ইহা বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর শিল্পকৌশলসম্ভূত মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তিরই ভাব-সম্পদের পরিচয় প্রদান করিবে। তাহা ভীষণে-মধুরে অপূর্ব্ব-সমাবেশ-কৌশলে—অনন্যসাধারণ বলিয়াই উল্লিখিত হইবার যোগ্য।

মহিষমর্দ্দিনী।

Mohila Press, Calcutta.

এই মূর্ত্তি-কল্পনার ভাব-সম্পৎ বড় বিচিত্র ;—তাহা লৌকিক অলৌকিকের সমাবেশ-কৌশলে অনির্ব্বচনীয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিন্যাস, বেশভূষা-সমাবেশ, প্রহরণ-নির্ব্বাচন, এবং প্রহরণ-ধারণ-কৌশল, সকলই একটি মূল ভাবের অনুগত হইয়া সমগ্র সমর-ব্যাপারের ভাব-সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে, মূল ভাব—

"চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ।"

"চিত্তে কৃপা" লৌকিক ভাব, তাহার উদাহরণের অভাব নাই। "সমরনিষ্ঠুরতা"ও লৌকিক ভাব, তাহারও উদাহরণের অভাব নাই। কিন্তু একাধারে এই উভয় ভাবের একত্র সমাবেশ লৌকিক নহে ;—তাহা অলৌকিক অথবা লৌকিক-অলৌকিকের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। তাহার উদাহরণ বড় দুর্লভ। তাহা ত্রিভুবনে কেবল "তাঁহাতেই" দেখা গিয়াছিল। তাই স্তুতিপরায়ণ দেবগণ গাহিয়াছিলেন ;—

চিত্তে কৃপা সমর-নিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি।

দেবগণ গাহিয়াছিলেন—হে দেবি ! হে বরদে ! [ভুবনত্রয়েঽপি] ত্রিভুবনের মধ্যেও কেবল [ত্বয্যেব] তোমাতেই তাহা [দৃষ্টা] দেখা গিয়াছে।

"চিত্তে কৃপা সমর-নিষ্ঠুরতা চ।"

বুঝিবা জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে,—জয়পরাজয়ের অশান্ত আস্ফালনের অবসানে, স্বয়ং মহিষাসুরও তাহা বুঝিয়াছিল। বুঝিয়াছিল বলিয়াই বুঝি স্বয়ং মহিষাসুরও নির্ভর-নীরব দীননয়নে দেবীর মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল ! তাই সেকালের অসুরমূর্ত্তি, আকারের হিসাবে, অতিপ্রাকৃত ;—অর্দ্ধ মানব অর্দ্ধ পশু হইয়াও, ভাবের হিসাবে স্বাভাবিক। তাহার রচনাভঙ্গীতে দম্ভ কটমটী দেখিতে পাওয়া যায় না ; যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে পরাভূত ঔদ্ধত্যের পরম পরিণাম দীনতার দারিদ্র্যে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। অসি আছে, সে দৃঢ় মুষ্টি আর নাই ; গ্রীবা হইতে মস্তক এখনও বিচ্যুত হইয়া পড়ে নাই ; কিন্তু সে রণহুঙ্কার আর নাই ; দেবী কেশাকর্ষণে দেহভার ধরিয়া না রাখিলে, দেহভার রক্ষা করিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে ! যাহারা পাথর খুঁদিয়া এমন ভাব-সামঞ্জস্যপূর্ণ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিরচনায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহাদের শিল্পকৌশল উচ্ছৃঙ্খল হইলেও প্রাণময়—প্রতিভাময়—গৌরবময় বলিয়াই প্রশংসা লাভের যোগ্য।

সে কালের শিল্পী দুইটি ভাবই যথাযোগ্যভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল ;—এ কালের শিল্পী সে ভাবসম্পৎ হারাইয়া ফেলিয়াছে !

একালের মূর্ত্তিরচনায় অসমর্থ কল্পনায় সাক্ষীভূত শূলরোপণ-রীতির সহিত সেকালের শিল্পকৌশলের কত পার্থক্য, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। একালের শিল্পী মহিষাসুরের বক্ষে তির্য্যক্ ভাবে শূলাগ্র ঈষৎ সঞ্চালিত করাইয়া, ত্বক্ বিদ্ধ হইতে না হইতে, প্রথম রুধির-ধারা দর্শন করিয়াই যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছে! একালের অসুর পরাভূত হয় নাই। সে দৃঢ়মুষ্টিতে অসি ধারণ করিয়া, সগর্ব্বে দেবীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে;—সিংহ তাহার কূর্পরদেশ কবলিত করিয়াও দংষ্ট্রা বিদ্ধ করিতে সাহসী হইতেছে না;—কালসর্পও যথার্থ-বিস্মৃত হইয়া, কেবল অঙ্গশোভা অভিব্যক্ত করিয়াই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছে! ইহার সহিত সেকালের মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তির সামঞ্জস্য কোথায়? সে মহিষমর্দ্দিনীর বাহন পশুরাজ অসুর-নিপাতে অনন্যকর্ম্মা, কালসর্প অসুরের জিহ্বা-দংশনে অভিনিবিষ্ট, দেবী তাহার গ্রীবা চাপিয়া ধরিয়া, কণ্ঠচ্ছেদের আয়োজন করিতেছেন! সকল কল্পনার মধ্যেই পাপের পরাজয় এবং পুণ্যের জয় কেমন সুকৌশলে প্রত্যক্ষবৎ অভিব্যক্ত,—সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থিতি-ভঙ্গীর মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ গতিভঙ্গী কেমন যথাযোগ্যভাবে বিকাশ-প্রাপ্ত;—যেন সত্য সত্যই এক মহাসমর যথাযথভাবে অভিনীত হইতেছে; সে সংগ্রামে মহিষাসুর পরাভূত হইয়া গিয়াছে,—আর এক মুহূর্ত্ত,—এখনই তাহার জীবনলীলা অবসানপ্রাপ্ত হইবে!

যে শক্তি হৃদয়ে সাহস দিয়াছিল, বাহুতে বল সঞ্চার করিয়াছিল, কর্ম্মে দৃঢ়নিষ্ঠা আনিয়াছিল, সেই শক্তিই শিল্পকৌশলকেও এইরূপে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাই গৌড়ীয় প্রভাব। ইহার উদ্ভবস্থান উড়িষ্যা নহে,—মগধ নহে,—বরেন্দ্র। এই যুগের শিল্পকলার জন্মদাতা ধীমানের জন্মভূমিও উড়িষ্যা নহে,—মগধ নহে,—বরেন্দ্র। যে যুগের বাঙ্গালী সকল উত্তরাপথে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী বহন করিয়াছিল, সেই যুগের বাঙ্গালীই গৌড়-শিল্পকলায় প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিল। তাহার কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ এখনও অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে,—ভারতদ্বীপপুঞ্জে—ভারত-সীমার বাহিরে অবস্থিত বহু দূরদেশে,—আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

একদিন যাহা সত্য ছিল, এখন তাহা স্বপ্ন-কাহিনী। সুতরাং একালের আমরা ইহাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করি। কিন্তু বরেন্দ্রভূমির নানাস্থান হইতে সেকালের যে সকল শিল্পনিদর্শন আবি

হৃত হইতেছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে এই গৌড়ীয় প্রভাব দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

ধীমানের জন্মভূমির নানাস্থান হইতে মহিষ-মর্দ্দিনীর যে সকল পুরাতন প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সহিত সেই যুগের অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তির যেরূপ ভাব-সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে আকস্মিক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস হয় না। সেই স্থিতি ভঙ্গীর মধ্যে সেই গতিভঙ্গী,—সেই মর্দ্দন-প্রথার ক্ষমাশূন্য কৃপাশূন্য সীমাশূন্য দৃঢ়নিষ্ঠা যেন বাঙ্গালার মূর্ত্তির সঙ্গে অন্যান্য স্থানের মূর্ত্তিকে একই ভাব-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহাকে আকস্মিক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস হয় না। তাহার মধ্যে যে রচনা-প্রভাব দেদীপ্যমান, তাহাকে গৌড়ীয় প্রভাব বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত হইলে, অন্য কোনও স্থানে তাহার প্রভাব-কেন্দ্র দর্শন করিবার আশা থাকে না। এ মূর্ত্তি বাঙ্গালার মূর্ত্তি—বাঙ্গালীর চিরারাধ্য মূর্ত্তি,—এখনও কেবল বাঙ্গালীর ঘরেই অর্চ্চনা-লাভ করিতেছে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

উপাসনা তত্ত্ব।

এই সংসারে আমি আছি বলিয়াই আর সকল পদার্থ আছে। আমি না থাকিলে, আমার পক্ষে তাহারা থাকে না। আমার দশটি ইন্দ্রিয় আছে, তাই এই দশেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাহা কিছু, সে সকলেরই অনুভূতি আমার আছে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করি, সে সকলই আমা হইতে পৃথক্ ভাবে, স্বতন্ত্ররূপে অনুভব করি। এই অনুভূতিই আমার সৃষ্টি, অন্যের নহে। আমার আমিত্বটাকে দেহগত অনুভূতির সকল ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্রভাবে জানি ও বুঝি বলিয়াই, অনুভূতিগম্য যাহা কিছু, তাহা আমা হইতে যে পৃথক্ এ বোধ আমরণ দেদীপ্যমান থাকে। নয়নযুগলের সাহায্যে আমি যাহা দেখিতে পাই, তাহা আমা হইতে স্বতন্ত্র ভাবেই দেখিতে পাই। আমি ও এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ, এ জ্ঞান আমার থাকেই। শ্রবণযুগলের সাহায্যে আমি যে সকল শব্দ ও ধ্বনি শুনিতে পাই, সে সকলই যে আমি শুনিতেছি, এবং আমার দেহ হইতে পৃথক্ ভাবে শুনিতে পাইতেছি, এ বোধ আমার থাকেই,—

যাবজ্জীবন থাকেই। এমনই ভাবে আমার সকল অনুভূতিগম্য পদার্থই আমা হইতে পৃথক্‌ভাবে অনুভূত হয়।

অহং অস্মি।—Ergo Cogito Sum.

আমি আছি—সুতরাং আমি আছি। অর্থাৎ আমার অস্তিত্বের জ্ঞানটা নিত্যসিদ্ধ; দেহীমাত্রেরই এ জ্ঞান থাকে। আমার আমিত্বের জ্ঞানটা যখন নিত্য, তখন আমা হইতে যাহা পৃথক্—যাহা আমি দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, আঘ্রাণ করি, আস্বাদন করি, অনুভব করি—তাহার অস্তিত্বটাও আমার আমিত্বের অপেক্ষা করে। অর্থাৎ, আমি আছি এবং আমি ভোগী বলিয়াই, আমার ভোগ যাহা কিছু তাহা যতদিন আমি দেহী থাকিব, আমার ইন্দ্রিয় সকল সজীব থাকিবে, ততদিন আমার পক্ষে দেদীপ্যমান থাকিবে। আমার দৃষ্টিশক্তি যতদিন থাকিবে, ততদিন পরিদৃশ্যমান জগৎ আমার পক্ষে সমুদ্ভাসিত থাকিবে। তেমনি অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল যেমন ভাবে সজীব থাকিবে, তেমন ভাবে সেই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ আমার অনুভূতিগম্য থাকিবে। এই অনুভূতিগম্য জগৎকে শাস্ত্র বিসৃষ্টি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমি যেন আমার আমিত্বকে ছুড়িয়া ফেলিয়া—দূরে রাখিয়া—উহার স্বতন্ত্র স্থিতির কল্পনায় যুক্ত হইতেছি। আমি আছি বলিয়াই আমার জগৎ আছে, আমি মরিলে আমার পক্ষে আমার জগৎও মরিবে। তাই কবীর বলিয়াছিলেন,—

"হম্ ডুবে ত জগ ডুবা।"

প্রবল বন্যার স্রোতে আমি যখন ডুবিয়া যাই, তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুভূতিগম্য জগৎও ডুবিয়া যায়। এই আমি—কে? ইহাই কিন্তু বলিতে পারিব না; আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন পণ্ডিতেই বলিতে পারে নাই। আমি আছি, দেখিতেছি, শুনিতেছি, বলিতেছি, বুঝিতেছি—সর্ব্বকর্ম্মই করিতেছি; কিন্তু আমি জানি না, আমি কি ও কে। শ্রুতি বলিতেছেন,—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বিশ্বং ন হি তস্য বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষপ্রধানম্।

এক সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাধার, অখণ্ড এবং নিরাকার অনন্ত পুরুষ-প্রধান নিত্য বিদ্যমান আছেন; তিনি বিদেহ-আত্মা, তাঁহার হস্ত নাই তিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার চরণ নাই তিনি বিশ্ব-চরাচর ভ্রমণ করেন, তাঁহার চক্ষু নাই, তিনি সর্ব্বদর্শী, তাঁহার শ্রবণ নাই তিনি সকল শব্দ শুনিতে পান; তিনি বিশ্বশক্তিকে জানেন,

বিশ্বের কেহই তাঁকে জানে না। এই অনন্ত ও অজ্ঞেয় আত্মা প্রতি দেহে বিরাজ করিতেছেন। শাস্ত্র বলিতেছেন যে, তিনিই আমি, আমিই তিনি। কিন্তু এই সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তটির ধারণা আমাদের নাই। যে কর্ম্মপদ্ধতির সাহায্যে এই ধারণাটা আমাদের মনে দৃঢ় হয়, আমরা আমাদের দেহস্থ আত্মাকে চিনিতে—জানিতে—বুঝিতে পারি—আমি কে তাহার ঠিকমত নির্দ্দেশ করিতে পারি—তাহাই উপাসনা, তাহাই সাধনা, তাহাই তপস্যা ও আরাধনা। আমি ছাড়া—আত্মা ছাড়া অন্য পরমেশ্বর নাই। শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীধৃত বচন-পরম্পরায় এ কথাটি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। যথা কৌর্ম্মে—

মন্যন্তে যে চাত্মানং বিভিন্নং পরমেশ্বরাৎ।
ন তে পশ্যন্তি তং দেবং বৃথা তেষাং পরিশ্রমঃ॥

অর্থাৎ, যাহারা আত্মাকে উপাস্য পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ মনে করে, তাহারা সে দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করে না, তাহাদের সকল পরিশ্রমই পণ্ড হয়। রুদ্র যামলেও উক্ত হইয়াছে—

সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বমন্ত্রময়ীং পরাম্।
আত্মানং চিন্তয়েদ্দেবীং পরমানন্দরূপিণীম্।

অর্থাৎ, সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বমন্ত্রময়ী, পরমানন্দরূপিণী উপাস্যা দেবীকে আত্মার সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করিবে।

"আত্মাভেদেন সঞ্চিন্ত্য যাতি তন্ময়তাং নরঃ।
সোহহমিত্যাত্মনঃ সততং চিন্তনাৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥"
"অহং দেবি ন চান্যোঽস্মি মুক্তোঽহমিতি ভাবয়েৎ॥"
"অহং ব্রহ্মাস্মি বিজ্ঞানাদজ্ঞানবিলয়ো ভবেৎ।
সোহহমিত্যেব সচ্চিন্ত্য বিহরেৎ সর্ব্বদা প্রিয়ে॥"
"যথা ফেনতরঙ্গাদি সমুদ্রাদুত্থিতং পুনঃ।
সমুদ্রে লীয়তে তদ্বজ্জগদাত্মনি লীয়তে॥"

অর্থাৎ, আত্মার সহিত অভেদ করিয়া উপাস্য দেবতাকে চিন্তা করিলে মানুষ তন্ময়তা লাভ করে—সেই আমার উপাস্য দেবতাই আমি, সতত এই ভাবনা করিলে উপাসক তন্ময় হইয়া যায়। আমিই আমার আরাধ্যা দেবী, অন্য কেহ নাই, এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে। আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞান হইলে, অজ্ঞানের বিলোপ হয়। সেই আমি, যে আমি সর্ব্বব্যাপী, এইরূপ চিন্তা করিলে আনন্দে বিরাজ করা যায়। যেমন ফেন তরঙ্গাদি সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া সমুদ্রেই লীন হয়, তেমনই এই আত্মবিসৃষ্ট জগৎ আত্মাতেই বিলীন হয়। এইরূপ

অসংখ্য বচন তন্ত্রে পাওয়া যায়; সকল তন্ত্রের গোড়ায় এই একই ভাব; সকল তন্ত্রই এই একই উপদেশ দিতেছেন ; কেবল পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে বটে। তন্ত্র বলিতেছেন—আমা ছাড়া অন্য উপাস্য নাই, আমি ছাড়া অন্য দেবতা নাই। আমা হইতেই জগতের সৃষ্টি, আমাতেই জগতের সংহৃতি, সুতরাং আমাকেই আমি আরাধনা করিয়া থাকি, আমাকেই আমি চিনিতে—বুঝিতে—জানিতে পারিলে আমার উপাসনা ফলবতী হয়। শিববাক্য আছে—

বিনা চোপাসনাং দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাং।

হে দেবি বিনা উপাসনায় আত্মসাক্ষাৎকাররূপ অপূর্ব্ব ফল মনুষ্যকে আমি দিই না। এই উপাসনা করিতে হয় কেন? শাস্ত্র বলিতেছেন, দুঃখ নিবৃত্তি হেতু উপাসনার প্রয়োজন। কিসের দুঃখ? অতৃপ্তি জন্য যে দুঃখ, তাহাই দূর করিবার জন্য মানুষ অহরহঃ চেষ্টা করিতেছে। কি জানি কি চাই। যাহা চাহি, তাহা পাই না; যাহা পাই তাহাতে দুই দিনেই অতৃপ্তি বা অরুচি বোধ হয়, তাহা আর চাহি না। কাজেই এমন সামগ্রী চাহিতে ইচ্ছা করে, যাহা পাইলে আর কিছু পাইবার থাকে না, আর কিছু চাহিবার সাধ হয় না। ইহা পাইনা বলিয়াই দুঃখ।

"বাধনালক্ষণং দুঃখমিতি"

"প্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখম্।"

সাংখ্যে দুঃখের এই দুইটি বিবৃতি আছে। যাহা বাধা—উন্নতি পথের প্রতিবন্ধক বা অন্তরায়, তাহাই দুঃখ; যাহা আমার দেহগত অনুভূতি শক্তির বিকাশ পথে প্রতিকূল বেদনার বা অনুভাবনার সৃষ্টি করে তাহাই দুঃখ। আমি আছি, আমার দেহ আছে এবং সেই দেহজন্য বিদৃষ্টিস্বরূপ একটা জগৎ আছে। দেহাত্মবুদ্ধ আমি বটি, পরন্তু দেহের অংশ বিশেষে আমার আমিত্ব নিবদ্ধ নহে। আমার দেহের প্রতি অঙ্গ যে আমার, এই মমত্ব বোধ আমাতে নিত্য বিদ্যমান। আমার শরীর, আমার চক্ষু কর্ণ নাসিকা, আমার পাণিপাদ পায়ু, আমার অস্থিচর্ম্ম-মেদমজ্জা—আমাতে যাহা কিছু আছে, সে সকলই আমার, আমি কিন্তু তাহাদের কাহারও বিশিষ্ট ভাবে নহি। অথচ এই দেহ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া আমি আমাকে ভাবিতে পারিলেও সে ভাবনা কখনই স্থায়ী হয় না। সাধারণতঃ সাংসারিক সকল কার্য্যে ও ব্যবহারে, দেহটাকেই আমি আমার আমিত্বের সহিত মিশাইয়া রাখি। এই দেহের সাহায্যে আমি জগৎকে বুঝি ও দেখি। দেহ উপচয়-অপচয়-ধর্ম্মবিশিষ্ট, জগৎ গতিশীল। আমি সাধ মিটাইয়া আমার দেহ-গত অনুভূতি এবং আসক্তি নিচয়ের তৃপ্তি সাধন করিতে পারি না। যেথায়

মতন দেখা হয় না, শুনার মতন শ্রবণ হয় না, উপভোগের মতন উপভোগ হয় না। আজ যাহা অপচিত, কাল তাহা উপচিত; অপচয়ে কতকটা সাধ মিটে, পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপচয় হইয়া আবার তৃষ্ণার সৃষ্টি করে— হৃদয়ের শূন্যতা কখনই দূর হয় না। ইহাই দুঃখ। এই দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যেই উপাসনা ও সাধনার সৃষ্টি। এই দুঃখের পূর্ণ উপশান্তি ঘটে আত্ম-সাক্ষাৎকারে। তন্ত্র বলিতেছেন, কর্ম্ম করিয়া দেখ, হাতে হাতে ফল পাইবে।

কথাটা আরও একটু ফুটাইয়া বলিব। আমার দেহগত সকল ইন্দ্রিয়-শক্তি দেহের সাহায্যে অভিব্যক্ত। ক্ষণে ক্ষণে দেহের উপচয়-অপচয় ঘটিতেছে; ইন্দ্রিয়শক্তির প্রয়োগে অপচয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপচিত ইন্দ্রিয়-শক্তির উপচয়ও ঘটিতেছে। যতদিন আমার দেহ সজীব থাকিবে ততদিন এই উপচয়-অপচয়ের কার্য্য চলিতে থাকিবে। মনে কর, আমি সুস্বাদু ভোজ্য আহার করিতেছি, আহারকালে আমার আস্বাদন শক্তির প্রয়োগে রসনার পরিতৃপ্তি হইতেছে। কিন্তু কতকক্ষণ খাইতে খাইতে সে পরিতৃপ্তির ভাব দূর হয়— আর খাইতে ইচ্ছা যায় না। তেমনি দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রয়োগ করিলে দেখিতে দেখিতে আর দেখা যায় না এই যে ইন্দ্রিয়প্রয়োগ জন্য ক্লান্তি, ইহা দেহজ শক্তির অপচয়ে ঘটিয়া থাকে। এই ক্লান্তি জন্যই তৃপ্তি বোধ হয়। কিন্তু সে তৃপ্তি ক্ষণস্থায়ী। দেহের ব্যয়িত শক্তির উপচয় ঘটিলে আবার দেখিতে, শুনিতে, খাইতে, আঘ্রাণ করিতে সাধ যায়। স্থায়ী তৃপ্তি হয় না বলিয়াই শাস্ত্র বলিতেছেন, উপভোগে তৃপ্তি নাই—দেহের সাহায্যে যে উপভোগ, তাহার ফলস্বরূপ তৃপ্তি ও তুষ্টি দেহ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ক্ষণস্থায়ী হয়। এই ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তি জন্যই দুঃখ; আমি সাধ মিটাইয়া উপভোগ করিতে চাহি, দেহ আমার সে সাধে বাদ সাধে। আমার সাধ মিটে না, তাই আমার দুঃখ চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিতেছেন যে, এই দুঃখ দূর করিতে পারিলে, সুখ মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। সুখ গঙ্গা-প্রবাহের মতন একটানা স্রোত, দুঃখ সেই স্রোতোমুখের গণ্ডশৈলমালা। এই শৈলশ্রেণী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিলে, বা অন্য কোন উপায়ে অতিক্রম করিতে পারিলে, সুখের একটানা স্রোত নিত্য ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

এখন জিজ্ঞাস্য—দুঃখ দূর করি কোন উপায়ে? সুখোদয় হয় কিসে? শাস্ত্র বলিতেছেন—যখন দেহ জন্যই সকল দুঃখ, তখন দেহজয়ী হইতে পারিলে দুঃখ দূর করা চলে, সুখোদয় সম্ভবপর হয়। সাধক বলেন যে, দেহ জয়

করাইত এক বিষম দুঃখ। একটা দুঃখ দূর করিবার জন্ত অন্ত দুঃখের সৃষ্টি করি কেন? প্রবৃত্তিমূলক দেহ, সেই দেহের প্রবৃত্তি ও আসক্তিনিচয়কে দমন করিতে পারিলে, পূর্ণ আয়ত্তে আনিতে পারিলে, দেহজয়ী নিষ্কামকর্ম্মী হইতে পারা যায়। আমি রক্তমাংসের শরীরধারী, নানা উপভোগ-বিমুগ্ধ বিষয়ী জীব, আমি নিষ্কামকর্ম্মী হইব কেমন করিয়া? যত চেষ্টা করিনা কেন, আমার দেহাত্মবুদ্ধি—আমার অহঙ্কার ত দূর হইবার নহে। আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি রসাস্বাদন করিতেছি, আমি ভোগ করিতেছি—এ বোধ ত আমার নিত্য সঙ্গী। যতদিন দেহাত্মবুদ্ধ, মায়াপাশে পরিবেষ্টিত সংসারী গৃহস্থ থাকিব, যতদিন পুত্র কলত্র স্বজন পরিজন লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব, ততদিন এ জ্ঞান ত দূর হইবার নহে। বিশেষ, আমিত একা থাকিতে পারি না; তাই চিঁড়ের বাইশ ফের করিয়া, আত্মীয় স্বজন, সমাজ ও জাতি লইয়া আর দশ জনের সঙ্গে জড়াইয়া আমি সংসারে থাকি। গুটী পোকার গুটীর মতন আমার সংসার, আমার পরিবার আমার চারিদিকে ঘিরিয়া আছে। এ গুটী আমি কাটি কেমন করিয়া? তন্ত্র জীবের মুখে এই কথা শুনিয়া বলিতেছেন—ভয় নাই, এমন উপায় আছে, যাহা তুমি অবলম্বন করিতে পার, যাহা তোমার অনায়াসসাধ্য—তোমার অধিকারযুক্ত। আমি সেই উপায় বলিতে পারি। সদ্‌গুরুর সাহায্যে সেই উপায় অবলম্বন কর, তোমার দুঃখ দূর হইবেই। ইহাই তন্ত্রের প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম ও সাধনা। এই সিদ্ধান্তের উপর তন্ত্রের অধিকার-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। একা তন্ত্র কেন, বৈষ্ণব ভক্তগণ—আচার্য্যগণ গোড়ায় এই প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের ও কর্ম্মের কথা কহিয়াছেন। ইহা বড় মজার সামগ্রী।

শাস্ত্র বলিতেছেন—দেখ, এই বিশ্বসৃষ্টির আর কিছু বুঝ আর নাই বুঝ, এটাত বুঝ যে, আমি ছাড়া আর কিছু নাই। সেই আমি যে কি ও কেমন তাহা জানা যায় না, কেহ জানিতে পারে না। কিন্তু এই আমিত্বটাকে তুমি ধরিতে পার। মানিয়া লও, সেই আমিই ব্রহ্ম—অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত ও অসীম শক্তিময় পুরুষ। সেই আমি দেহেতে আছেন বলিয়া দেহ সজীব—দেহের সাহায্যে সেই "আমি" পরিদৃশ্যমান জগৎকে নানা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগ করিয়া থাকেন। দেহগত "আমি"র এই যে সৃষ্টি-বুভুক্ষা—ভোগ করিবার তৃষ্ণা, ইহাই আমিত্বের অহঙ্কৃতির অবলম্বন স্বরূপ। আমার যদি কোন ইন্দ্রিয়শক্তি না থাকে, দেখিতে শুনিতে বুঝিতে আমি যদি না পারি, তাহা

হইলে আমার কি থাকে? কি জানি কি থাকে! যাহা থাকে, তাহার উপলব্ধি আমাতে সম্ভবপর নহে। সুতরাং তেমন আমিত্বের চিন্তায় কোন প্রয়োজন নাই; সে থাকে থাকুক, না থাকে না থাকুক। কিন্তু "আমি আছি" এই বোধটা প্রবৃত্তি-জন্য; অর্থাৎ, আমাতে প্রবৃত্তি ও আসক্তি আছে বলিয়াই 'আমি আছি' এই জ্ঞানটা আমাতে নিত্য বিদ্যমান আছে। এই প্রবৃত্তি ও আসক্তির একটা পারিভাষিক নাম দিলাম রস। যখন এই রসের সাহায্যে আমার আমিত্বের উপলব্ধি হয়, অন্যথা হয় না, তখন আমি বলিলেই ঐ রস বুঝাইবে। অতএব

রসো বৈ সঃ।

অর্থাৎ, তিনিই—আমিই—রস স্বরূপ। সে রস কি? শ্রীপাদ আচার্য্য বলেন, উৎকট ইচ্ছার বাচকই রস। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে

"রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে"

ইত্যাদি প্রয়োগে 'রস' শব্দটি ইচ্ছা বা অভিলাষ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। মনের অনুকূল আলম্বনজনিত সুখানুভব বিষয়ক উৎকট ইচ্ছাই প্রীতি, অনুরক্তি, রাগ, রস ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। এই রসের সাহায্যে তুমি তোমার আমিত্বের সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন কর, সেই সম্বন্ধ অনুসারে কাজ করিলেই তোমার দুঃখ দূর হইবে। শাণ্ডিল্য বলিতেছেন,—

চেতনাচিতোর্ন তৃতীয়ম্

এই সূত্রে শঙ্করশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের সমন্বয় করা হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বেদ ও তন্ত্র এক। ইহার অর্থ—প্রকৃতি ও ব্রহ্ম এই দুইয়ের অতিরিক্ত তৃতীয় পদার্থ নাই। অর্থাৎ, পুরুষ জ্ঞেয় বটে, কিন্তু ঘটাদির ন্যায় জ্ঞেয় নহেন। পুরুষ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, তিনি যখন জ্ঞেয় হন, তখন আপনিই আপনার বিষয় হন, ঘটাদি সেরূপ নহে, উহারা আপনা হইতে ভিন্ন যে জ্ঞান তাহারই বিষয় হয়। অতএব পুরুষ ঘটাদির ন্যায় আপনা হইতে ভিন্ন জ্ঞানের বিষয়রূপ জ্ঞেয় নহেন। যেমন 'আমি' বলিলে, আমার শক্তি, গুণ প্রভৃতি সমস্তই সেই 'আমির' মধ্যে নিহিত থাকিল, সেইরূপ ব্রহ্ম ও প্রকৃতি নিত্য যুক্তভাবে বিদ্যমান, এই দুই ছাড়া তৃতীয় কিছু নাই। আমিও যাহা, ব্রহ্মও তাহাই। যখন তৃতীয় বস্তু নাই, তখন আমার আমিত্ব এবং ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব এক। ইহাই যদি ঠিক হইল, তাহা হইলে আমাকে—ব্রহ্মকে ধরিতে পারিলে দুঃখ দূর হইতে পারে। দুঃখ ত বাধা মাত্র; যেখানে বাধা নাই, সেখানে

দুঃখ নাই। আমি আমাতে মজিয়া থাকিতে পারিলে, সে উপভোগে বাধা দিবে কে? তন্ত্র বলেন ইহাই উপাসনা। আমাকে খুঁজিব, আমাকে পাইব, আমাকে লইয়া আমি আমার আসক্তিনিচয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিব। ইহাই আরাধনা।

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আমি ও দেহব্যাপী আমি, এই দুই যখন এক—ভিন্ন ও বিরোধী নহে, তখন তন্ত্র বলেন,—

"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।"

ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণ আছে, কলেবরেও সেই গুণ আছে। তাই—

"আদৌ সংজায়তে বীজো ব্রহ্মাণ্ডঃ সহসাঙ্কুরঃ।
তস্য মধ্যে সুমেরুশ্চ কঙ্কালদণ্ডরূপকঃ॥
চরাচরাণাং সর্ব্বেষাং দেবাদীনাং বিশেষতঃ
আলয়ঃ সর্ব্বভূতানাং মেরোরভ্যন্তরেঽপি চ
প্রদীপকলিকাকারঃ জীব অপি সদা স্থিতম্
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ।"

বীজ প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ডরূপ অঙ্কুরে পরিণত হয়, তাহার অভ্যন্তরে কঙ্কাল দণ্ডরূপ সুমেরু প্রকাশিত হয়; সেই মেরুর অভ্যন্তরে চরাচর ভূতের এবং দেবাদির আলয় প্রতিষ্ঠিত আছে, এই প্রাণীর হৃদয়ে দীপ-কলিকার ন্যায় জীব অবস্থিতি করেন। রজ্জুবদ্ধ শ্যেন পক্ষী যেমন অন্যত্র গমন করিলেও আবার রজ্জুর আকর্ষণে প্রত্যাগত হয়, সেই প্রকার গুণবদ্ধ জীব প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বারা আকৃষ্ট হন। এই হেতু যামলে উক্ত হইয়াছে—

"দেবতায়াঃ শরীরঞ্চ বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্
তদ্বীজাত্মক মন্ত্রং জপ্ত্বা ব্রহ্মত্বং ভবেৎ।

যে মনুষ্যশরীর যেমন বীজোৎপন্ন, ধ্যানগম্য ইষ্টদেবের রূপও তেমনি বীজ মন্ত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই বীজ মন্ত্র জপ করিলে আত্মজ্ঞ—ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারে। তন্ত্র আবার বলিতেছেন—

"বর্ণরূপেণ সা দেবী জগদ্ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা।"

সেই বর্ণ ও রূপ কি ও কেমন?

"তত্তৎবর্ণাত্মকমন্ত্রঘটিকীভূত তত্তদ্বর্ণোৎপন্ন-
মুখহস্তপদাদ্যবয়বাবচ্ছিন্নশরীরজ্ঞান বিষয়ার্থাৎ"

যে যে দেবতার যে বীজ মন্ত্র, সেই বীজমন্ত্র ঘটিত সেই সেই বর্ণোৎপন্ন মুখ হস্ত পাদাদি অবয়বসম্পন্ন শরীর জ্ঞান ধ্যানগম্য হয়। মন্ত্র ঘটকীভূত রূপ ধ্যান সাধ্য করা বড়ই কঠিন, তাই পঞ্চ পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, অমূর্ত বিষয়ে

চিত্ত স্থির হয় না, অতএব বীজ ঘটকীভূত সিদ্ধসাধক-সেবিত মূর্ত্তের চিন্তা করিবে। ইহাই তন্ত্র সাধনার গোড়ার কথা। তন্ত্র দেহ ছাড়া বাহিরের কাহাকেও অন্বেষণ করিতে বলে না। এই দেহেই সর্ব্বস্ব নিহিত আছে—বিশ্বচরাচরে যাহা আছে, দেহেই তাহা আছে। দেহেই স্বর্গ ও নরক, দেহেই গোলক, ব্রহ্মলোক, কৈলাস, সুমেরু—কুমেরু; দেহেই ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বিরাজ করিতেছেন, দেহেই আদ্যাশক্তি জগদম্বার নিত্য লীলা হইতেছে। যত জীব, তত শিব; দেহে দেহে শিব বিরাজ করিতেছেন।

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ
তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ।"

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে শিব বলিতেছেন যে, ব্রহ্মা হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সকল জগৎ তন্ময় অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। সকল পদার্থে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। সেই পরমাত্মা পরিতুষ্ট হইলে জগৎ পরিতুষ্ট হয়; তাঁহাকে প্রীত করিলে সমুদয় জগৎকে প্রীত করা হয়; তাঁহার আরাধনা করিলে সকলেরই প্রীতি উৎপাদন করা হয়। আমিই যখন সর্ব্বস্ব, আমার দেহই যখন আমার পক্ষে আমার জগৎ-দ্যোতনার স্বরূপ, তখন আমি প্রীত হইলে, আমি প্রসন্ন হইলে, আমার জগৎ—আমার বিশ্বটি প্রীত হইবে, বিশ্বচরাচর প্রসন্নময় হইবে। শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, পরব্রহ্ম প্রভৃতিকে উপলক্ষ করিয়া আমি যে স্তবস্তুতি করিয়া থাকি, সে আমারই উপাসনা, আমারই স্তুতিবন্দনা। পত্র পুষ্প ফল তোয় দিয়া আমি যে ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া থাকি, সে আমারই অর্চ্চনা। ঢাক-ঢোল বাজাইয়া উৎসবের উল্লাস ফুটাইয়া আমি যে দুর্গোৎসব করিয়া থাকি, তাহাও আমার উৎসব, আমার পূজা, আমার আরাধনা। কেন না তন্ত্র বলিয়াছেন যে, আমি ও আমার ইষ্টদেবতায় কোন পার্থক্য নাই।

গোড়ায় বলিয়াছি যে, দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যেই উপাসনা—সাধনা—আরাধনা। সেই দুঃখটা কিসের? শাস্ত্র বলিতেছেন, প্রবৃত্তির উপভোগ-পথে যে বাধা, তাহাই দুঃখ। অতএব প্রবৃত্তির দমন কর, নিষ্কামকর্ম্মী হও, ফলাকাঙ্ক্ষা করিও না—তোমার দুঃখ থাকিবে না। সাধক বলিলেন, উহা আমি পারিব না, আমাকে অন্য পথ দেখাও। তন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র অন্য পথ দেখাইতেছেন। ভক্তিশাস্ত্র বলিতেছেন যে, তুমি সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর,

তাঁহার প্রসাদভোজী হইয়া থাক, তোমার সুখ হইবে। তোমাকে ছাড়িতে কিছু বলি না, কোন কঠোর করিতে বলি না, তবে তোমার যাহা, তাহা তোমার নহে, শ্রীকৃষ্ণের। তোমার পুত্র কলত্র, তোমার ঘরবাড়ী, তোমার ধনদৌলত, তোমার মণিমাণিক্য, তোমার গাড়িজুড়ি তোমার নহে শ্রীকৃষ্ণের। তুমি খাইবে বটে, কিন্তু তুমি সাধারণ অন্ন খাইও না, দেবতার ভোগ খাইও; তাঁহাকে দেখাইয়া, তাঁহাকে নিবেদন করিয়া, তাঁহাকে অর্পণ করিয়া, প্রসাদরূপে সকলই উপভোগ কর। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য; তোমার দেহগত রিপুসকলের বিনিয়োগ তোমার শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই করিবে। রাগ, রোষ, মান, অভিমান করিতে হয়, তাঁহার উপর করিবে; তিরস্কার তর্জ্জন-গর্জ্জন যাহা কিছু করিতে হয়, তাঁহার সম্মুখে করিবে। তিনি রসময়—রসো বৈ সঃ—তোমার সকল রসের বেগ তিনি ধারণ করিবেন। তিনি যখন হৃদয়বিহারী বংশীধারী, তখন তোমার ভালমন্দ যাহা কিছু আছে সকলই তিনি গ্রহণ করিবেন—গ্রহণ করিয়া থাকেন। অবিচারিত চিত্তে তাঁহাতে সর্ব্বস্ব অর্পণ কর; তিনি তোমার দুঃখ দূর করিবেন। এই সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করিয়া ভারতের বহু বৈষ্ণব, আচার্য্য, বিশেষতঃ বল্লভাচার্য্য, ভক্তিধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্যদেব এই ভক্তি-সিদ্ধান্তের উপর প্রেম ও মধুর রসের উদ্ভাবনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, যখন তিনি রসময়—তাঁহার

"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"

রসলাভ করিয়া আনন্দী হইয়াছে—এই শ্রুতিতে ব্রহ্মানন্দ আবির্ভাবরূপ মুক্তির প্রতি রসের হেতুত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব "রস" বলিতে এ স্থলে শৃঙ্গার রসের স্থায়ীভাব রতিকেই বুঝিতে হইবে। কারণ পূর্ব্বাচার্য্যেরা বলিয়াছেন, ঐ স্থায়িভাব যখন দেবাদিবিষয়ক হয়, তখন উহা রতি নামে প্রসিদ্ধ হয়, এবং যখন কান্তাবিষয়ক হয়, তখন ব্যক্ত অর্থাৎ বিভাবাদি সহযোগে এক প্রকার আনন্দকর আস্বাদের উৎপাদক হইয়া শৃঙ্গার নাম ধারণ করে। রতি বলিতে অনুরাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই তিনি শ্রীভগবানে কান্তাভাব আসক্তি অর্পণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি নায়ক, আমি নায়িকা; তিনি প্রেমময়, আমি তাঁহার প্রেম বিহ্বলা সেবিকা, এই ভাবের উদ্ভাবনার পদ্ধতি শিখাইয়াছেন। যাঁহাকে পিতা, মাতা, গুরু, সখা বলা যায়, তাঁহাকে স্বামী, প্রণয়ী, নায়ক, নাগর, রসময়, সুখময়

স্নেহময়, সুধাময় কেন না বলা যাইবে ? কারণ কান্তাভাব-আসক্তি প্রবল হইলেই আত্মনিবেদন পূর্ণাঙ্গে সাধিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বস্ব সমর্পণ কান্তাভাবেই হয়। ভক্তিসূত্রে

তথা ব্রজগোপিকানাং—

বলিয়া ব্রজবল্লবীদিগের কান্তাভাবের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই ভাবের ঘর দিয়া যাইয়া আমি আমাকে ধরিব, আমাকে চিনিব, আমাকে জানিব। ভক্ত বলিতেছেন, চিনিব—জানিব—বুঝিব বটে, পরন্তু আমিময় হইব না। চিনি হইব না, চিনি খাইব।

তন্ত্র বলিতেছেন যে, ভক্তিশাস্ত্র আমার কথাই বলিতেছেন, আমার সিদ্ধান্তেরই প্রচার করিতেছেন বটে ; পরন্তু আর একটু সোজা পথে চলিলে ভাল হয়।

যৎ যৎ কিঞ্চিৎ কচিৎ বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মকে
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা।

বাহিরে ও ভিতরে, বিশ্বে ও দেহে যে সৎ ও অসৎ বস্তুসকলে যে শক্তি-নিচয় ক্রীড়া করিতেছে সে সকলই তুমি বা আমি। সেই শক্তির উদ্বোধন ঘটাইতে পারিলে, শক্তির সাহায্যে মায়ার আবরণ ছিন্ন হইবেই। সেইটা করিতে পারিলেই সকল গোল ঘুচিয়া যায়। কেন না দেহে সেই আত্মাশক্তি আছেন বলিয়াই দেহ সজীব, দেহের রস সজীব, আসক্তিনিচয় সজীব।

এই শক্তির উদ্বোধনই তন্ত্রের সাধনা। তন্ত্র বলিতেছেন, তোমার মনুষ্য দেহের খবর আমি রাখি, দেহের কোথায় কোন্ শক্তির খেলা হইতেছে, তাহাও আমি জানি। কোন পন্থা অবলম্বন করিলে তোমার আত্মশক্তির উদ্বোধন হইবে, তাহা আমি তোমায় বলিয়া দিতেছি ; তুমি তাহা অবলম্বন কর ; তোমার কল্যাণ হইবে।

তন্ত্রের প্রথম কথা—

জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ।

জপেই সিদ্ধি, জপেই সিদ্ধি, জপেই সিদ্ধি, ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই! ইহা হইতেই নাম কীর্ত্তনের পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। তন্ত্রের দ্বিতীয় কথা—

অহং দেবি ন চান্যোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ইতি ভাবয়েৎ।

আমিই আমার ইষ্টদেবী, আমা ছাড়া অন্য দেবতা নাই। আমার দেবতা স্বর্গে বসিয়া থাকেন না, কাঁদিয়া কাটিয়া ভূত নামানর মতন তাঁহাকে নামাইতে হয়।

না। তিনি হৃদ্‌বিহারী—আমারই মধ্যে আছেন, আমাতেই আছেন। তন্ত্রের তৃতীয় কথা—

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্ম স্ত্রী-পুং-রূপং ধৃতং।

সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মে স্ত্রী বা পুরুষ রূপের আরোপ করা হয়। আমি তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিলে তিনি উমা, শ্যামা, গৌরী; আমি তাঁহাকে পিতা বলিলে তিনি শিব বা বিষ্ণু। আমি তাঁহাকে রাজা বলিলে তিনি শ্রীরামচন্দ্র. আমি তাঁহার কিঙ্কর। আমি তাঁহাকে সখা বলিলে—নায়ক-নাগর স্বামী বলিলে তিনি শ্রীকৃষ্ণ। আমার সাধ মিটাইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাতে রূপের আরোপ করিতে হয়। তন্ত্রের চতুর্থ কথা

"গুরুর্লোকে দুর্লভশ্চ পরং ব্রহ্ম বৈ গুরুঃ।"
"গুরু ব্রহ্ম গুরু বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ।
"সর্ব্বস্বং সকলং ত্যক্ত্বা প্রণমামি পুনঃ পুনঃ।"

গুরুবাদ—গুরুই সর্ব্বস্ব, ইহকাল, পরকাল, ইষ্ট সাধনা, আরাধনা, গুরুই পরম ব্রহ্ম। তন্ত্রের পঞ্চম কথা—

অশুচৌ বা শুচৌ বাপি সকলে নিষ্কলেঽপি সর্ব্বদা,
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা নাত্র কার্য্যা বিচারণা।

শুচি অশুচি নাই, রোগ শোক নাই, স্নান-অস্নান বিচার নাই, পবিত্র অপবিত্র নাই, যখন যেখানে যে অবস্থায় ও যে ভাবে থাকিবে, সেই অবস্থায় ও সেই ভাবে ও স্থানে ইষ্ট মন্ত্র জপ ও ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। এ পক্ষে ত্রুটি যেন না হয়; এ কার্য্যে ত্রুটি হইলেই সর্ব্বনাশ। এই উক্তির সহিত ব্যবহারের সমন্বয় সাধন করিতে যাইয়া তন্ত্র ভৈরবীচক্রে জাতিবিচার উঠাইয়া দিয়াছেন। সাধনায় জাতিবিচার নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই।

তন্ত্রের উপাসনা-তত্ত্বের সমাচার ইহার অধিক আর দিতে পারি না। একেত নিষেধ আছে; দ্বিতীয়তঃ তন্ত্র বলিতেছেন, যাহা হাতে কলমে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে না পার, তাহার আলোচনা করিও না। সুতরাং সাধনকাণ্ডের অন্ত কোন অংশেরই ব্যাখ্যা করিতে পারিলাম না। তবে বোধ হয় এইটুকু স্পষ্ট করিয়াছি যে, তন্ত্র তথাকথিত পৌত্তলিকতা বা Idolatory নহে; এমন কি তন্ত্র Personal God বা জীব হইতে স্বতন্ত্র থাকা পাকা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহেন। তন্ত্র বলেন যে, এক আমিই আছি, এ বিশ্ব সংসারে আর ত কেহ নাই। দেবীসূক্তে এই আমারই কথা ব্যক্ত হইয়াছে; তন্ত্র সেই দেবী

সূক্তের উক্তি মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। আমাতেই স্ত্রীত্ব ও পুংত্ব নিহিত— হরগৌরী মিলিতাঙ্গ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। যখন আমার ইচ্ছা হয় যে একোঽহম্ বহু স্যাম:—তখনই এক বহু হয়, আমার বিসৃষ্টির বিকাশ হয়। আমি এই আমাকেই "তুমি" বলিয়া গ্রহণ করিয়া, আমার ভাবের এবং আসক্তির সাহায্যে আমারই তৃপ্তির জন্য সেই তুমির অর্চনা করিয়া থাকি। এই অর্চনা বা উপাসনার প্রভাবে যখন তুমি ও আমি এক হইয়া যাই, তখনই আমার সিদ্ধি লাভ হয়; তখনই আমার জন্ম সার্থক হয়। সাধকের প্রকৃতি ভেদে, প্রবৃত্তি ভেদে, অধিকার ভেদে সাধনার নানা পদ্ধতি নির্ণীত হইয়াছে। গুরু শিষ্যের পরিচয় পাইয়া পদ্ধতির নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দুঃখ দূর করিবার জন্যই তন্ত্রের সাধনা-পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে যেমন দুঃখ হউক না, সাধক সাধনার সাহায্যে সে দুঃখ দূর করিবেই ইহাতে লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই। তাই মায়ের কাছে তন্ত্রের উপাসক প্রার্থনা করিয়া থাকেন, ধন দেও, পুত্র দেও, ঐশ্বর্য্য দেও, মনোরমা পত্নী দেও, আমার যাহা নাই, যাহার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হইয়াছে, তাহা আমাকে দেও। তুমি দিলে আমার সাধ মিটিবে; তুমি দিলে তোমার দত্ত সামগ্রী মাথায় করিয়া লইয়া আমি তোমার শরণাগত হইব। তখন তোমায় পাইলে আমার আর চাহিবার কিছু থাকিবে না; আমি তোমার কৃপায় নিষ্কাম ও নিরীহ হইব। তন্ত্রের সাধন তন্ত্রের ইহাই মূল উদ্দেশ্য। মূলের মোটা কথা কয়টি, যত সংক্ষেপে আমি পারিয়াছি, ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সে চেষ্টা সার্থক হইল, কি ব্যর্থ হইল, তাহা মনোময়ী মাই জানেন।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

শারদীয়া পূজা।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, তন্ত্র "আমি বা আত্মা" ছাড়া অন্য কোনও ইষ্ট দেবতার কল্পনা করেন নাই। তন্ত্র ভূয়োভূয়ঃ বার বলিয়া দিয়াছেন যে, ইষ্ট-দেবতাকে কখনই স্বীয় আত্মা হইতে স্বতন্ত্র মনে করিবে না। আর এক কথা; তন্ত্র বলেন, মনুষ্যদেহ তথা জীবদেহ বিশ্বের সংক্ষিপ্তসার; যে যে গুণ বিশ্বে আছে, সেই সেই গুণ মনুষ্য-দেহে বিদ্যমান আছে। বিশ্বসৃষ্টি Macrocosm বা বিরাট্; মনুষ্যদেহ Microcosm বা স্বরাট্। শাক্তানন্দতরঙ্গিণী বলিতেছেন,—

ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।
পাতালং ভূধরা লোকা আদিত্যাদিনবগ্রহাঃ।
নাগাশ্চ সর্ব্বদেহিনাঃ পিণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ।
পাদাধস্তলং বিদ্যাত্তদূর্দ্ধে বিতলং তথা।
জানুনোঃ সুতলঞ্চৈব তলঞ্চ সন্ধিষু চ।
তলাতলং গুদ্‌কমধ্যে লিঙ্গমূলে রসাতলম্।
পাতালং কটিসন্ধৌ চ পাদাদৌ লক্ষয়েদ্‌বুধঃ।
ভূর্লোকো নাভিদেশে তু ভুবর্লোকস্তথা হৃদি।
স্বর্লোকঃ কণ্ঠদেশে তু মহর্লোকশ্চ চক্ষুষি
জনঃলোক ভ্রূযুক্তে তপোলোকো ললাটকে
সত্যলোকো মহাযোনৌ ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
ত্রিকোণে চ স্থিতো মেরু ঊর্দ্ধকোণে চ মন্দরঃ
কৈলাসো দক্ষিণে কোণে বামকোণে হিমালয়ঃ।

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে যে গুণ বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই এই দেহে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাতাল, পর্ব্বত, ভূরাদি লোক, আদিত্যাদি নবগ্রহ এবং নাগ, ইহারা সমস্ত প্রাণীরই দেহমধ্যে সংস্থিত আছে। পাদের অধোভাগে অতল, ঊর্দ্ধভাগে বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল, জানুসন্ধিতে তল, গুদ্‌কমধ্যে তলাতল, লিঙ্গমূলে রসাতল এবং কটিসন্ধিতে পাতাল বিদ্যমান আছে। নাভিদেশে ভূর্লোক, হৃদয়ে ভুবর্লোক, কণ্ঠদেশে স্বর্লোক, চক্ষুর্দ্বয়ে মহর্লোক, ঊর্দ্ধভাগে জনলোক, ললাটদেশে তপোলোক, এবং মস্তকে সত্যলোক,—এই প্রকারে দেহমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন বিদ্যমান আছে। এই দেহের ত্রিকোণে মেরু; ঊর্দ্ধ-কোণে মন্দর, দক্ষিণ কোণে কৈলাস, বাম কোণে হিমালয়, এবং তাহার ঊর্দ্ধভাগে বিন্ধ্য ও বিন্দু এই সকল কুলপর্ব্বত অবস্থিত। এই ভাবে তন্ত্র মনুষ্যদেহের মধ্যেই বিশ্বসৃষ্টির সংস্থান দেখাইয়াছেন। তন্ত্রের বর্ণিত কৈলাসের বর্ণনা কোনও বাহিরের কৈলাস পর্ব্বত নহে; উহা কুলপর্ব্বত; অর্থাৎ, দেহগত কৈলাস পর্ব্বতের আনুমানিক বিবরণমাত্র।

এই ত দেহ, এই দেহে আত্মা বিরাজ করিতেছেন। সেই আত্মাই আমাদের ইষ্টদেবতা, তিনিই সর্ব্বময়।

সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বমন্ত্রময়ীং পরাম্।
আত্মানং চিন্তয়েদ্দেবীং পরমানন্দরূপিণীম্।

আত্মাকে সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বমন্ত্রময়ী ও পরমানন্দরূপিণী দেবী মনে করিয়া

আত্মার আরাধনা করিতে তন্ত্র উপদেশ দিতেছেন। তন্ত্র জোর করিয়া বলিতেছেন ;—

আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া॥

আত্মস্থ দেবতা অর্থাৎ আত্মময়ী বা আত্মরূপা ইষ্টদেবতাকে পরিহার করিয়া যে সাধক বাহিরের দেবতার উপাসনা করে, সে হস্তস্থিত কৌস্তভ মণি দূরে ফেলিয়া কাচখণ্ডের আকাঙ্ক্ষায় বৃথা অন্বেষণে জীবন যাপন করে। এ পক্ষে তন্ত্র উপনিষদের বিরোধী নহেন ; অদ্বৈতবাদের অপহ্নব ঘটান নাই। তন্ত্র স্পষ্টই বলিতেছেন ;—

একৈব হি মহামায়া নানাভেদঃ সমাশ্রিতা

এই মহামায়া দেহগত আত্মার শক্তিরূপিণী বা আত্মস্বরূপিণী। মনুষ্যদেহে যোগগম্য ছয়টি চক্র আছে শিবসংহিতায় ও হঠযোগে যে ভাবে এই ষট্‌চক্রের বর্ণনা আছে, তন্ত্রের বর্ণনাও অনেকটা তৎস্বরূপ। কুণ্ডলিনী শক্তির সাহায্যে এই ষট্‌চক্র ভেদ করিতে হয়।

মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো
তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিদ্ধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্

মূল পদ্মে কুণ্ডলিনী যাবৎকাল নিদ্রায়িতা থাকেন, তাবৎ কাল মন্ত্রযন্ত্র অর্চ্চাদির দ্বারা কোনও ফলোদয় হয় না। কুণ্ডলিনী আত্মাশক্তি মহাশক্তি ; তিনি স্বয়মেব নিদ্রিতা থাকিতে পারেন না। সাধকের কর্ম্মফলে, দেহগত ধর্ম্মফলে কুণ্ডলিনী নিদ্রায়িতা থাকেন। এই নিদ্রায়িতা কুণ্ডলিনীকে জাগাইতে হয়—উদ্‌বুদ্ধা করিতে হয়, তবে সাধনা সম্ভবপর হইতে পারে। তিনি কৃপা করিয়া দেখাইলে তবে আত্মদর্শন হয়। আত্মদর্শনই তন্ত্র সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য, উহাই সিদ্ধি, উহাই ঋদ্ধি।

তন্ত্র বলেন, যেমন নয়নের উপরে কোনও সামগ্রী রাখিলে তাহা ঠিক দেখিতে পাওয়া যায় না ; নাসিকার মধ্যে ফুল গুঁজিয়া দিলে তাহার গন্ধ তেমন পাওয়া যায় না ; জিহ্বার উপর কিছু রাখিয়া সত্তঃ সত্তঃ গলাধঃকরণ করিলে, উহার আস্বাদ তেমন পাওয়া যায় না, তেমনই দেহস্থ আত্মাকে বুঝিতে ও জানিতে হইলে দেহ হইতে পৃথক করিয়া তাঁহাকে জানিতে ও বুঝিতে হয়। তুমি যাহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে চাও, তুমি তাহাকে তোমার যুগলনয়নের দৃষ্টিসন্ধির উপরে—তোমা হইতে একটু দূরে ধরিয়া দেখিয়া থাক। দূরাগত বংশীধ্বনি অতিমধুর ; শ্রবণের সাধ মিটাইতে হইলে দূরের বিহঙ্গ কলরব, দূরের সঙ্গীত ধ্বনি শুনিতে

হয়। যে সামগ্রী ভোজন করিবে, তাহাকে গপ গপ গিলিলে জিহ্বার সাধ মিটে না; তাহাকে অনবরত চিবাইতে হয়, দন্তের সাহায্যে রস নিঙাড়িয়া নিঙাড়িয়া জিহ্বার উপর বুলাইতে থাকিলে তবে ভোজ্যসামগ্রীর স্বাদ পাওয়া যায়। পুষ্পপরাগ পবন-সঞ্চাড়িত হইয়া তোমার নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে তবে তোমার সৌরভ-বোধ হয়, নাকের ভিতরে ফুল গুঁজিলে বা আতর লাগাইলে গন্ধ পাওয়া যায় না। অনুভূতির সাহায্যে কিছু উপভোগ করিতে হইলে, তাহাকে দেহ হইতে কিছু দূরে, একটু স্বতন্ত্রভাবে রাখিতেই হইবে। আত্মাকে অনুভূতি বা আসক্তির সাহায্যে বুঝিতে ও জানিতে হইলে, তোমা হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র করিয়া, তোমার দেহ হইতে তাঁহাকে বাহিরে রাখিয়া, তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে। এই হেতু চণ্ডী বলিতেছেন,—

> বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে
> তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥

তুমি মা। আত্মা। এই বিসৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিরূপা, সেই সৃষ্টির রক্ষাব্যাপারে তুমি স্থিতিরূপা, আবার উহার সংহরণ বা সংহার ব্যাপারে তুমিই সংহৃতিরূপা, তাই তোমাকে এই জগতের জগন্ময়ী দেবী বলিয়া লোকে পূজা করিয়া থাকে। বিসৃষ্টি কি? দেবীসূক্তে তাহা বিশদরূপে বুঝান হইয়াছে। দেহের সাহায্যে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্ব দেখি, শুনি ও বুঝি। দেহের মধ্যে, মায়ুকেন্দ্রে সকল পদার্থের অনুভূতি হইলেও, অনুভূত পদার্থগুলিকে দেহ হইতে বাহিরে ফেলিয়া আমরা অনুভব করিয়া থাকি। এই স্বতন্ত্রীকরণকে বিসৃষ্টি বলে। আমার নয়নের মধ্যে তোমার ছবি অঙ্কিত হইলেও সে ছবিকে আমি দেহের বাহিরে প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখিয়া থাকি। এই বাহিরে ফেলার নামই বিসৃষ্টি। ইহা আত্মার একটি শক্তি। আত্মাকে চিনিতে ও জানিতে হইলে এই শক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। এই শক্তিই দ্বৈত-বোধের উপায় স্বরূপ। এই বিসৃষ্টির পথে অনুভূতির—আসক্তিনিচয়ের বিকাশ হয় বলিয়াই, আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া, আমার মনের মতন সাজে সাজাইয়া আত্মার আরাধনা করিতে হয়। তাই শিব বলিতেছেন,—

> আত্মানং চিন্তয়েদ্দেবি শক্তিমাত্মস্বরূপিণীং
> মনসা বচসা চৈব কায়িকেন চ চিন্তয়েৎ।

বিষ্ণুযামলে বিষ্ণু বলিতেছেন,—

> মাতৃবৎ পরমং রূপং তত্র ভাবাদি কল্পয়।
> কালাত্মা ভুবনরূপা ত্বমসি চিদাত্মকা॥

শিব বলিতেছেন,—

স্ত্রীরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং পুংরূপং বা স্মরেৎ প্রিয়ে
স্মরেদ্বা নিষ্কলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপিণম্।

এই ভাবের অনেক বচন প্রায় সকল তন্ত্রেই পাওয়া যায়। যাহা হউক, তন্ত্রের উপাসনা-তত্ত্বের মূল সিদ্ধান্ত কি, তাহা আমরা অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। এইবার তান্ত্রিকী উপাসনার বিশিষ্টতাটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মাণ্ড ও দেহকে তন্ত্র সমগুণসম্পন্ন বলিয়া থাকেন। তন্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, দেহে যেমন আত্মা থাকিয়া দেহের সজীবতা রক্ষা করিতেছেন, ব্রহ্মাণ্ডে তেমনই পরমাত্মা থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডলীলার বিকাশ করিতেছেন। এই আত্মা

'নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ'

বটেন; কিন্তু সেই স্থাণুকে বেড়িয়া এক শক্তি লীলা করিতেছেন। এই শক্তিকে আমরা ধরিতে পারি, কেন না শক্তিই প্রকট। ব্রহ্মাণ্ডে যে শক্তির লীলা, দেহভাণ্ডেও সেই শক্তির খেলা। এই শক্তিই জগন্মাতা—আদ্যাশক্তি। ইঁহাকে উদ্বুদ্ধা করিতে হয়; সেই উদ্বোধনই তন্ত্রের সাধনা-পদ্ধতি। এই শক্তিরই বিকাশ দেহে নানাভাবে হইয়া থাকে; ষড়রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই শক্তির বিকার; একাদশ আসক্তি—গুণমাহাত্ম্যাসক্তি, রূপাসক্তি, পূজাসক্তি, স্মরণাসক্তি, দাস্যাসক্তি, সখ্যাসক্তি, কান্তাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি, আত্মনিবেদনাসক্তি ও পরমবিরহাসক্তি—এই শক্তির বিকাশ মাত্র। তন্ত্র সমাজধর্ম্মের ধার ধারেন না, পাপ পুণ্যের বিচার করেন না। তন্ত্র বলেন, আমার সাধনায় যাহা উপযোগী, তাহাই আমার গ্রাহ্য; অন্য সকলই পরিহার্য্য। তন্ত্র প্রথমে রিপু ও আসক্তির সাহায্যে ইষ্টের প্রতি অনুরাগের উদ্রেক করিয়া থাকেন। শেষে ষট্‌চক্র-ভেদ আদি শক্তির ক্রিয়া করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার সাধন করেন। তন্ত্রের গোড়ায় ভাব, শেষে যোগ। যোগের জন্য যেমন কালাকালবিচার আছে, ভাবের জন্যও তেমনই কালাকালনির্ণয় করিতে হয়। এই কালাকালবিচারসময়ে তন্ত্র বাহ্য প্রকৃতির সহিত—(ব্রহ্মাণ্ডের সহিত দেহভাণ্ডের) অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্যসাধন করিয়া থাকেন। তন্ত্র বলেন, তোমার দেহের যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা আছে, বায়ু কফ পিত্ত শ্লেষ্মার বিকার হেতু অবস্থাবিপর্য্যয় আছে, ব্রহ্মাণ্ডেরও ঠিক তেমনি আছে। ব্রহ্মাণ্ডের আত্মার সহিত দেহের আত্মার সম্মেলন ঘটাইতে হইবে, ব্রহ্মাণ্ডের সহিত দেহকে সমাবস্থাপন্ন—সমসূত্রে সংবদ্ধ করিতে হইবে। যোগপক্ষে দুইটি কাল আছে,—

"স্বাপকালে বামবাহঃ প্রবোধো দক্ষিণাবহঃ।

যখন বাম নাসিকা দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, তখন দেহের স্বাপকাল কহে; যখন দক্ষিণ নাসিকা দিয়া প্রশ্বাস বাহির হয়, তখন প্রবোধকাল বলে। পৃথিবীর উত্তরায়ণ প্রবোধকাল, দক্ষিণায়ন স্বাপকাল। আবার প্রতিদিনে পৃথিবীর স্বাপকাল ও প্রবোধকাল আছে। তন্ত্র বলেন, এই প্রবোধ এবং স্বাপকালের বিচার করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইতে হইবে। এই জাগরিতা কুণ্ডলিনী-শক্তিকে ষট্‌চক্রের মধ্যে বিচরণ করাইলে ইষ্টসিদ্ধি হয়।

"যাতায়াতং ক্রমেণৈব তত্র কুর্য্যান্মনোলয়ম্‌।"

বারে বারে ষট্‌চক্রভেদ করিতে থাকিলে মনের লয় হয়, মনের লয় হইলে আত্ম-বিকাশ স্বয়মেব ঘটিয়া থাকে। তন্ত্র বলিতেছেন,—

ভুজঙ্গরূপিণী দেবী নিত্যা কুণ্ডলিনী পরাম্‌
বিসতন্তুময়ী দেবী সাক্ষাদমৃতরূপিণীম্‌
অবাক্যরূপিণী দিব্যা ধ্যানগম্যা বরাননে
ধ্যাত্বা জপ্ত্বা তু দেবেশি সাধকঃ ব্রহ্মরূপ ভবেৎ
এবং দ্বাদশধা দেবি যঃ ষট্‌চক্রং করোতি সঃ
স মুক্ত সর্ব্বপাপেভ্যঃ মন্ত্রসিদ্ধিন চান্যথা
যদি তত্র মৃত্যুকালে গঙ্গায়াং শ্বপচালয়ে
ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মভূতঃ স্যাৎ কথিতং নান্যথা প্রিয়ে।

সনাতনী কুণ্ডলিনী ভুজঙ্গরূপিণী, পদ্মের নালের ভিতরের সূতা যত সূক্ষ্ম, এই ভুজঙ্গরূপিণী তেমনই সূক্ষ্ম ও অমৃতরূপিণী; ইনি ধ্যানগম্যা, দিব্যরূপা—বাক্যমনের অগোচরা, ইঁহাকে ধ্যান করিলে, জপ করিলে, এবং দ্বাদশ বার ষট্‌চক্রভেদ করাইলে সাধক ব্রহ্মময় হইয়া যায়; সে সাধক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়; তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়। সে জীবন্মুক্ত পুরুষ, সে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিলেও যেমন, শ্বপচালয়ে মরিলেও তেমনই।

ইহাই তন্ত্রের সাধনপদ্ধতির গোড়ার কথা। তন্ত্র-সাধনার ২টি অঙ্গ আছে,—(১) ভাব-সাধনা, (২) শক্তি-আরাধনা। শক্তি-আরাধনার অন্ত-র্গত জপ, যজ্ঞ, ষট্‌চক্রভেদ, শবসাধনা, লতাসিদ্ধি, ভৈরবীচক্র প্রভৃতি। ভাব-সাধনায় পূজা, উপাসনা, ধ্যান, জপ, লীলা, সেবা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। দুর্গোৎসব এই ভাব-সাধনার অন্তর্গত সামাজিক উৎসব। কুণ্ডলিনীকে মা বলিয়া, মাতৃ-ভাবে তাঁহাকে জাগাইয়া, চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ী করিয়া, যে পূজাপদ্ধতি, তাহাই শারদীয়া পূজা। ইহা অকালবোধন; ব্রহ্মাণ্ডের পৃথিবীর যে আয়তনে আমরা

বাস করিতেছি, তাহারই স্বাপকালে দেবনিদ্রার কালে,—এই পূজার বোধন করিতে হইয়াছে বলিয়াই ; শারদীয়া পূজায় অকাল-বোধন করিতে হয়। দেবনিদ্রার কালের পূজা বলিয়াই ইহার নাম নবরাত্রের পূজা। এই অকাল-বোধনের ক্রমটি অতি সুন্দর। প্রথমে ব্রতপক্ষে ব্রতনিয়মাদি করিয়া শক্তিপূজার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হয় ; তাহার পর পিতৃপুরুষদের আহ্বান করিতে হয়। দক্ষিণায়নে পিতৃপুরুষগণ জাগিয়া থাকেন। মাতৃশক্তির উদ্বোধন জন্য পিতৃপুরুষদিগের তর্পণ করিয়া তাঁহাদের সহায়তা লাভ করিতে হয়। মাতৃপূজা আত্মার খেলা ; দেবী আত্মা বংশানুক্রমের প্রভাবে কোন্ ভাবে সঙ্কুচা হইয়া আছেন, তাহা বুঝিতে ও জানিতে হইবে, যাঁহাদের কৃপায় আমি দেহী হইয়াছি, তাঁহাদেরই করুণা প্রার্থনা করিতে হয়। সে করুণা লাভ করিলে, কুণ্ডলিনীকে অকালে জাগাইতেও কোনও বাধা থাকে না। তাই মহালয়ার পরেই দেবীপক্ষ—নবরাত্রের উৎসব আরম্ভ হয়।

মাকে জাগাই ভাব দিয়া। মা আমার হিমালয়-কন্যা। এ হিমালয় নেপালের উত্তরের হিমালয় পর্ব্বত নহে, আমার দেহস্থ বামকোণব্যাপী হিমালয় পর্ব্বত আছে ; তদ্দেশজাতা মনোময়ী কন্যা। দেহের বামকোণে হৃৎপিণ্ড,তাহারই মধ্যে পর্ব্বে পর্ব্বে বিস্তৃত হিমালয় ভাব-গিরি আছে। মাকে দেহস্থ দক্ষিণ-কোণের কৈলাস পর্ব্বত হইতে নামাইয়া হৃদয়ে—হিমালয়ে আনিয়া বসাইতে হইবে। ইহাই হইল দুর্গোৎসবের অকালবোধন। দক্ষিণায়নে—স্বাপকালে মা কৈলাসে শিবসংযুক্তা হইয়া থাকেন। এ সময়ে কৈলাস হইতে মাকে হৃদ্‌গেহে আনয়ন করা বড় কঠিন ব্যাপার। তাই ভাবময়ীকে আগমনী গান শুনাইতে হয় ;—মাকে কন্যারূপে আহ্বান করিতে হয়। পুরাণ তন্ত্রের এই দেহতত্ত্বটুকু লইয়া অতিমনোহর উপাখ্যান সকল রচনা করিয়াছেন। হরগৌরীর এই উপাখ্যান পাঠ করিলে ভাবোদয় হয়; ভাব জন্মিলেই ভাবময়ীকে ফুটাইয়া তোলা যায়। সাধক এই সকল উপাখ্যানের ঐতিহাসিকতার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না ; বাস্তবপক্ষে পুরাণের বহু উপাখ্যানের ঐতিহাসিক ভিত্তিই নাই, উহারা অর্থবাদ, অর্থাৎ বেদের ও তন্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল কাহিনীর আকারে ব্যাখ্যাত—সরলীকৃত, অথবা ভাবোন্মেষের মার্গস্বরূপ। শিবগৌরী-ঘটিত বহু উপাখ্যানই ভাবোন্মেষের উপাখ্যানমাত্র। আগমনী ও রস জমাইবার, ভাব ফুটাইবার উপায়স্বরূপ। বাসন্তী দুর্গোৎসবে এমন আগমনীর হাঙ্গাম নাই ; সে ত অকালবোধন নহে। তখন মাকে কন্যারূপে আবাহন করিতে হয় না। শারদীয়া পূজায় কন্যারূপে

আহ্বান করিবার একটু হেতু আছে। কন্যাকে ডাকিবার কালাকাল নাই, যখন ইচ্ছা তখন মেয়েকে ডাকিতে পার, আর সেই মেয়ে জনকের ডাকে নাচিতে নাচিতে, সোহাগে আদরে গলিয়া ঢলিয়া বাপের কোলে আসিয়া উপবেশন করেন। মেয়ে ঘুমাইলেও তাহাকে ডাকিয়া ঠেলিয়া জাগাইলেও কোনও অপরাধ হয় না। তাই শরৎকালে মা আমার আত্মজা কন্যা। এক হিসাবে মা ও মেয়ে ছুই এক; মাও মা, মেয়েও মা। মার কাছে একটু সঙ্কোচ আছে, একটু বিধিনিষেধের বেড়া আছে, মেয়ের কাছে তাহার কিছুই নাই। জননী জনকের কাছে থাকিলে স্তন্যপ পুত্র ব্যতীত অন্য পুত্রের গমন নিষিদ্ধ আছে। মা বলিয়া ডাকিতেও নিষেধ আছে। মেয়ের পক্ষে এবম্প্রকারের কোনও নিষেধ নাই। তাই অকালবোধনের সময়ে শরৎকালে মা আমার কন্যারূপে পূজিতা থাকেন। তাই শরতের আগমনী কন্যার পিতৃগৃহে আগমন-বিশেষ। কন্যাভাবে আহ্বান করিলে কুলকুণ্ডলিনী কৈলাস ত্যজিয়া হিমালয়ে আগমন করিয়া থাকেন। অকালে ষট্‌চক্রভেদের একটা পদ্ধতিবিশেষকে পুরাণ অতিমধুর অতি মনোহর উপাখ্যানে পরিণত করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মা ব্রহ্ম—

"রসো বৈ সঃ"

তিনি রসস্বরূপ। রস কি? দেহের অন্তর্নিহিতশক্তিই—আসক্তি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি রসস্বরূপ। ইংরেজীতে রসকে Emotions বলা যাইতে পারে। তিনি রসময় কেন? যে হেতু তাঁহাকে রসের সাহায্যেই কেবল চিনিতে ও জানিতে পারি। রস ছাড়া তিনি শান্ত, তাই বাক্য মনের অগোচর, তাই অজ্ঞেয়, অজ্ঞাত, অননুভূত। আমি তাঁহাকে রস ও ভাব দিয়াই বুঝিয়া থাকি। তাই সাধকের হিসাবে তিনি রসময়—ভাবময়। আত্মাকে বাক্য মনের গোচর করিতে হইলেই রসের সাহায্যে করিতে হইবে। তাঁহাকে নিরাকারই রাখ, আর সাকারই কর, তাঁহাকে ধ্যানগম্য, ভাবগম্য করিলেই তাঁহাকে রসমূর্ত্ত করিতেই হইবে। তন্ত্র বলেন যে, রসময়ী কুলকুণ্ডলিনীকে ভাবময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে পূজা করিতে হয়। দুর্গা দশভুজা আমার সেই ভাবময়ী জননী। আমার সাধ মিটাইবার জন্য আমি চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ী করিয়া থাকি। তিনি কেমন, তাঁহার স্বরূপ কি, তাহা তুমিও জান না, আমিও জানি না; তবে তিনি যে আমি, আমি যে তিনি, তাহা অনুমানে অনেকটা বুঝিতে পারি। বেদ, উপনিষদ, আগম, নিগম, আমার এই অনুমানের সমর্থন করিতেছেন।

অতএব আমি আমাকে, আমার ভাবময়ী কুণ্ডলিনীকে, আমার সাধের মতন সাজাইব। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আমার সাধ মিটাইয়া মায়ের বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে। আমি সেই চণ্ডীর আলেখ্য ধরিয়া দশভুজার পূজা করিয়া থাকি। আমার কাছে আমার কোনও লজ্জা নাই; আমার মা আমার—আমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। আমি সেই মায়ের কাছে আমার ভাবমত সকল সাধ ব্যক্ত করিব, উলঙ্গ হইয়া আমার মনের সকল অভিরুচি প্রকাশ করিব। ইহাই দুর্গোৎসব। তন্ত্র বলিতেছেন;—

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বে ভাবে জীবসংস্থিতে।
প্রবৃত্তিমার্গে সংসারী নিবৃত্তিঃ পরমাত্মনি॥

আমি সংসারী, প্রবৃত্তিমার্গই আমার অবলম্বনযোগ্য। সাধ মিটে না বলিয়াই, পিপাসার শান্তি হয় না বলিয়াই, আমি আমার আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। আমার ভাবময়ী দেবী আমার ভাবানুকূলা হইবেনই; আমি তাঁহার সাহায্যে আমার সকল সাধ মিটাইব। সেই সাধ মিটাইবার জন্য তৃপ্তি-তুষ্টি-সাধনের জন্য আমার দুর্গোৎসব। তাই আমি আমার মায়ের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করি—ধন দেও মা, জন দেও মা, রূপ দেও মা, ঐশ্বর্য্য দেও মা, মনোরমা কামিনী দেও মা, পুত্র দেও মা, কন্যা দেও মা-- আমার যাহা কিছু চাই, তাহা দেও, ইহসংসারে আমার যত অভাব, তাহা পূর্ণ কর মা! তুমি কল্পলতিকা, তুমি না দিলে আর কে দিবে? তোমা ছাড়া আর কাহার কাছেই বা প্রার্থনা করিব? তাই ভক্ত গান করিয়াছেন,—

আর কারে ডাকবে শ্যাম, ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে
আমি এমন ছেলে নই মা তোমার,
ডাকবো গো যাকে তাকে

একনিষ্ঠাই ভাবের ও রসের সর্ব্বস্ব। একনিষ্ঠ না হইলে ভাব ফুটে না, রস উথলায় না। একনিষ্ঠ না হইলে সিদ্ধিলাভ হয় না। তাই তন্ত্র শতমুখে এক-নিষ্ঠ-সাধনার গুণগান করিয়াছেন। ভক্ত গান করিয়াছেন,—

"ডাকার মতন ডাক দেখি মন,
কেমন মা তোর রৈতে পারে?"

ডাকার মত ডাকিতে হইবে, প্রাণ মন ঢালিয়া ডাকিতে হইবে, তবে ত মা জাগিবেন। মা আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব, আবার ব্রহ্মাণ্ডের জীবনসর্ব্বস্ব। আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব যখন তিনি, তখন তিনি আমার অতি নিকটে—প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন। বিশ্বের সর্ব্বময়ী যখন তিনি, তখন বিস্মৃতির প্রভাবে আমি

তাঁহাকে দূরে—অতিদূরে ভাবিয়া থাকি। বিশ্বময়ী ও আত্মময়ীকে এক করিতে বড় কষ্টে পড়িতে হয়। তখন একনিষ্ঠার সাহায্যে ডাকার মতন ডাকিলে মা আর থাকিতে পারেন না, জাগিয়া উঠিয়া বসেন। দুর্গোৎসবে বিশ্বময়ী ও আত্মময়ী এক হইয়াছেন। মা আমার দশভুজা—দশদিক্‌প্রসারিণী, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী। [illegible] মা আমার দেহ-ঘটমধ্যস্থা কন্যা উমা—বালিকা কালী। [illegible] জোড়া, ঘর-আলো-করা প্রতিমার দিকে তাকাইয়া দেখ দেখি! দেখিবে, [illegible] আমার বিশ্বময়ী, সর্ব্বাণী, সর্ব্বজননী। আর পূর্ণ ঘটের দিকে তাকাইয়া দেখ দেখি? নারিকেলের মধ্যে যেমন জল থাকে, কি জানি কোথা হইতে সে জল আসে, কেমন করিয়া আসে, কেহ জানে না, তেমনই দেহের মধ্যে রসময় আত্মা—রসময়ী, ভবময়ী, আদ্যাশক্তি চঞ্চল রূপে বিরাজ করিতেছেন। এই দুই জনকে—দুই আত্মাকে এক করিবার উপাসনাই দুর্গোৎসব। একা সাধকের সাধনা নিষ্ফলা হইতে পারে, পরন্তু সমাজসংহতির উপাসনা দুর্গোৎসবের উৎসব ব্যর্থ হইবার নহে। চণ্ডী ইঙ্গিতে বলিয়াছেন, দেবতাগণ যেমন নিজের নিজের শক্তি ও অস্ত্র দিয়া মহাদেবীকে অসুর-ধ্বংসরূপিণী করিয়াছিলেন, তেমনই সমাজদুর্গতি দূর করিবার জন্য, মাতৃশক্তির উদ্বোধনচেষ্টায় তোমরা নিজের নিজের বিশিষ্ট শক্তির প্রয়োগ কর—সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা—তোমাদের চেষ্টা নিষ্ফলা হইবার নহে। মহাকালিকা পুরাণে বারে বারে নানাভাবে এই কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। এই কালিকা পুরাণই দুর্গোৎসব-পূজাপদ্ধতির মূল। কালপ্রভাবে আমরা শ্রীগুরুর কৃপায় বঞ্চিত হইয়াছি, শাস্ত্র বুঝিবার বুদ্ধি হারাইয়াছি, শাস্ত্রের আদেশের প্রতি অবহেলা, অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছি। ফলে মাটীর প্রতিমা মাটীই থাকে, দুর্গোৎসব আর করা হয় না। দুর্গোৎসবের অন্তরালে যে বাঙ্গালার কত ইতিহাস লুকান আছে, কত সমাজতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা এক মুখে বলা যায় না, এক জীবনে শেষ করা যায় না। তন্ত্রের সাধনতত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে দুর্গোৎসব বুঝা কঠিন; দুর্গোৎসব না [illegible] [illegible] [illegible]কে চিনিতে পারিব না। তাই অনন্ত সাগর [illegible] বিন্দুর হইতে সামান্য দুই একটি বস্তুখণ্ড পাঠকগণকে উপঢৌকন দিলাম। একে ত তন্ত্রসাগর পার হইতে কেহ পারেন নাই; তাহার উপর অধুনা তান্ত্রিক পণ্ডিতের অভাব ঘটিয়াছে; আমরা ইংরেজি শিখিয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বুঝিবার সামর্থ্য হারাইয়াছি। ফলে আমরা জানিই বা কি, বলিবই বা কতটুকু? কিন্তু যতটুকু জানি, এবং যাহা জানি, তাহার যতটুকু প্রকাশ করিবার অধিকারী,

সেটুকুও ভাল করিয়া বলিতে চেষ্টা করিলে, মাসিক পত্রে কুলাইবে না; একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিতে হইবে। সে গ্রন্থের এখনও প্রয়োজনাভাব। কেন না, তন্ত্র বলিতেছেন, শুশ্রূষু অধিকারী না পাইলে, তন্ত্রসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে নাই। তন্ত্র ব্যাখ্যা বক্তৃতার বিষয় নহে, হাতে কলমে করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার পদ্ধতি। এই সকল সন্দর্ভের সাহায্যে কখনও যদি জিজ্ঞাসুর সৃষ্টি করিতে পারি, অনুসন্ধিৎসুর দল পুষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে নিজের জীবন সার্থক হইল, মনে করিব।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেকালের কথা।

১

বয়সের দোষে কেমন হইয়াছি, কাল যাহা ঘটিয়াছে, আজই তাহা ভুলিয়া যাইতেছি। কিন্তু সেকালের অনেক কথা বেশ মনে পড়িতেছে। কৈশোর যৌবনের অনেক কথা আধভাঙ্গা ঘুমের স্বপ্নের মত অল্প অল্প মনে হয়। বুকে হাঁটানে হামাগুড়ি দিয়া বেড়ানোর কথা অবশ্য মনে নাই, চারি পাঁচ বৎসর বয়সের প্রত্যেক ঘটনাগুলি নিখুঁত ভাবে মনে পড়িতেছে। পিতামহী যখন সকাল বেলা ফুলের ডালা হাতে করিয়া ফুল তুলিতে যাইতেন, ডাল নোয়াইয়া যখন ফুল তুলিতেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তখন যে কচি হাত বাড়াইয়া সেই নোয়ান ডাল হইতে দুই চারিটি ফুল ছিঁড়িয়া ডালায় ফেলিয়া কৃতার্থ হইতাম, তাহা বেশ মনে আছে। তাহার ফলে সমবয়স্ক প্রতিবেশী বালকদিগের সঙ্গে দশ বার বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যে ফুল তোলার একটা প্রতিযোগিতা ছিল, ডালা ভরিয়া ফুল আনিয়া দেবপূজার সহায়তা করিলাম বলিয়া যে আত্মপ্রসাদ পাইতাম, সেই নিখুঁত সুখটুকু সভ্যতালোকের সঙ্গে সঙ্গে অনেকদিন উপিয়া গিয়াছে। ফুলতোলার প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়িতেছে। সে কালে শুধু বর্ষীয়সীরাই ফুল তুলিতেন না; উত্তর-বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক অতিবৃদ্ধ রামানন্দ পঞ্চানন মহাশয়কেও ফুল তুলিতে দেখিয়াছি। তিনি ডালা হাতে করিয়া সমস্ত গ্রামটি ভ্রমণ করিতেন। বেশ মনে পড়িতেছে, তিনি নিমন্ত্রণে কর্ম্মবাড়ীতে যাইয়া সিধায় যে সন্দেশ পাইতেন, ফুল তুলিবার সময়ে সেইগুলি ডালায় করিয়া আনিতেন ও আমাদিগের মত বালকদিগকে বাঁটিয়া দিতেন। সেই সন্দেশ পাইয়া আমাদিগের কত আনন্দ, কত নৃত্য, দেখে কে? সেই অন্নে

সন্তুষ্ট হইবার কথা মনে করিলে এখনও আনন্দে চক্ষে জল আসে। যে দিন তিনি সন্দেশ আনিতেন না, সে দিনও আমাদিগের কোন মনঃকষ্ট হইত না; আজ নাই, আনিতে পারেন নাই, যেদিন পাইবেন, নিশ্চয় আনিবেন, এই বিশ্বাস আমাদিগের (সে কালের বালকদিগের] ছিল।

শুনিতে পাই, দক্ষিণ-বঙ্গে ও পূর্ব্ব-বঙ্গে ছেলেদের উপরে গুরুমহাশয়ের নিজের প্রভুতা ও জীবিতাবস্থায় অবনত বেত্রের মৃতাবস্থার শুষ্কতা প্রতিমুহূর্ত্তে সপ্রমাণ করিতেন; কিন্তু উত্তর-বঙ্গে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপণ্ডিতবহুল আমাদিগের গ্রামে, বোধ করি, সেরূপ গুরুমহাশয় ছিলেন না। শূদ্র গুরুমহাশয় ব্রাহ্মণ বালককে দেববালক মনে করিয়া তাহার উপরে কখনই হাত উঠাইতেন না; শান্তভাবে মাটীতে, পাতায় ও ক্রমে কাগজে লিখাইতেন, শিশুবোধ পড়াইতেন, খেলার জন্য ছুটী দিতেন, প্রাতে টোপা ভাত (প্রাতরাশ) খাইবার জন্য ছুটী দিতেন। 'টোপা ভাত' কাহাকে বলে, বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এক্ষণে যেমন সকালে পড়া দিয়ে ভাক্তা বাজারের খাবার আনিয়া, অথবা বাড়ীতে চর্ব্বি-মিশান ঘিয়ে লুচী মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া বালকবালিকাকে খাইতে দেওয়া হয়, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। পূর্ব্বে দক্ষিণ-বঙ্গে আখের গুড় বা খেজুর গুড়ের সঙ্গে কিছু কিছু মুড়ি দেওয়া হইত, উত্তর-বঙ্গে মুড়ি না দিয়া বালক-বালিকাকে ভাত রাঁধিয়া দিবার পদ্ধতি ছিল। তরকারি ভাল হইত না, ভাতে-ভাত হইত। আলু, পটোল, কাঁচকলা, ডাল পোস্ত বা মাছ ভাতের সঙ্গে সিদ্ধ করিত, বেগুন পোড়া দিবারও রীতি ছিল। সকাল বেলায় বালকবালিকাকে দিবার জন্য যে ভাত রাঁধা হয়, তাহারই নাম 'টোপা ভাত'। রুপুরী খাঁটী সরিষার খাঁটী তেল ও লবণের যোগে পাড়ার বালক বালিকার সহিত একত্র বসিয়া সেই টোপা ভাতে যে 'তার' পাইয়াছি, আজ পোলাও, খিচুড়ী, পকান্ন, মিষ্টান্নে সে তার পাই না। কালদোষে কিছু কেমন অসাড় হইয়া গিয়াছে। দুর্গা-পূজায় ব্রাহ্মণ বাড়ীতে যে বাল্যভোগ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতেও লুচী পকান্ন দিবার রীতি নাই। অদ্যাপি খিচুড়ী বা ভাতে ভাত দিবার পদ্ধতি আছে। না সে কালে সেই বাল্যভোগের প্রসাদ খাইতে কতই আমোদ পাইয়াছি,—এক কথায় তাহা বুঝাইতে পারি না। আহারের প্রসঙ্গ যখন উঠিয়াছে, তখন এই প্রসঙ্গে আহারের কথায় শেষ করিয়া অন্য কথা পাড়িব।

একদিন মধ্যাহ্নে পাড়ার বালক বালিকার সঙ্গে একটি ঘরে খাইতে বসিয়াছি; সে কালে এ কালের মত কোনও বিষয়েই আড়ম্বর ছিল না। সে কালে গৃহ-

দেবতাকে দিবার জন্ত গৃহিণীরা নিজের প্রস্তুত তিলের লাড়ু, নারিকেলের লাড়ু, সর-ভাজা, ক্ষীরের চাঁচ সর্ব্বদা গৃহে রাখিতেন। সে কালে অধিকাংশ ফলাহারের নিমন্ত্রণে সরুধান্তের পাতলা চিড়া, খৈ, মুড়কি, উৎকৃষ্ট দধি, ক্ষীর ও চিনি দিলেই হইত; তাহার উপরে যিনি দুইচারিখানি লুচি ও দুই একটি সন্দেশ দিতেন। তাঁহার প্রশংসার পার ছিল না। ভোজনেও সেইরূপ পোলাও কালিয়ার ঘটা ছিল না। সিদ্ধ, ভাজা, ডাল ও ব্যঞ্জনের কিছু অবধি ছিল না, তাহার উপরে দধি ও পায়স থাকিত। পাচকের পৃষ্ট অন্ন সেকালে কেহই খাইতেন না; নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, সকল কাজেই স্বয়ং গৃহকর্ত্রীকেই অন্নপূর্ণার কাজ করিতে হইত। এত ঘৃত, এত তৈল, এত মশলা লাগিত না। হাতের গুণে ডাক-তুকের গুণে প্রত্যেক ব্যঞ্জনই অমৃততুল্য সুস্বাদু হইত। সেদিন আমার পূজনীয়া মাতৃদেবী সমস্ত রন্ধন পরিবেশন করিয়াছিলেন। সেই দিনের একটি ব্যঞ্জন আমার মুখে বড় উপাদেয় লাগিয়াছিল, আমি সেই ব্যঞ্জনটি চাহিয়াছিলাম, মাতৃদেবী দিয়াছিলেন। পরে আবার চাহিলে তিনি গরম হইয়া বলিলেন, "যদি ভাল হইয়া থাকে, সকল বালক বালিকাই খাইবে, তোকে দিয়াই ফুরাইয়া ফেলিব, অন্ত ছেলে পুলেকে দিব না, কেমন?" আর তিনি দিলেন না। আমারও অভিমান হইল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আহারের জন্ত কখনও কোনও জিনিস চাহিব না। অদ্যাপি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছি। কিন্তু তখন আমি নির্ব্বোধ বালক, মাতার মহিমা বুঝি না। যখন সেই জগদ্ধাত্রীর কথা মনে হয়, তখনই চোখে জল আসে। এখন কি আর গৃহিণীদিগের মধ্যে সেই উঁচু ভাবের ছবিটুকু দেখিতে পাইব? তখনকার মা যে শুধু আমার বা তোমার মা ছিলেন, তাহা নহে, বিশ্বসংসারের মা ছিলেন; এখনকার মা শুধু তার পেটের ছেলেটির। অন্ত ছেলেরা হাঁ করিয়া দেখিতেছে, এখনকার মা লজ্জার মাথায় বাজ হানিয়া নিজের ছেলের মুখে অনায়াসে মিষ্টান্ন গুঁজিতেছে; হায়! কি ছিল; কি হইল! সোনার বাঙ্গালা ছাই হইয়া গিয়াছে। গৃহলক্ষ্মীদিগেরই যখন এতটা পতন, আমরা স্বার্থপর পুরুষ, আমাদের কথা ছাড়িয়াই দাও।

আমরা পাড়াগাঁয়ে সাদাসিদে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে জন্মিয়াছি। বলা বাহুল্য তাঁহারা নিজের পয়সা দিয়া কখনও সহর হইতে মালদহী আম বা ভুটানী কমলা লেবু পরিবারবর্গের জন্ত কিনিয়া আনিতেন না। মাঝে মাঝে গ্রামের জমীদার আনাইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দুই চারিটি করিয়া দিতেন। অংশানুসারে আমরা তাহার কতটুকু পাইতাম, পাঠক পাঠিকা

ভাবিয়া দেখুন। আমার স্মরণ হয়, একবার আমি অর্দ্ধাংশ কমলা লেবু পাই-য়াছি। আমি খাইব, মনে করিতেছি, একটি ভিক্ষাথিনী দরিদ্রা তাহার একটি ছেলেকে লইয়া উঠানে দাঁড়াইয়াছে। আমার মনে হইল, সেই বালকটি আমার হাতের কমলালেবুর দিকে তাকাইয়া আছে, আমি অমনি সেই লেবুখণ্ড সেই বালকের হাতে দিলাম। নিকটে বৃদ্ধা পিতামহী দাঁড়াইয়াছিলেন; দেখিয়া আনন্দে তাঁহার চক্ষে জল আসিল; তিনি বলিলেন, "দাদা, তোর কখ-নই কষ্ট হইবে না, তুই সুখে কাল কাটাইবি।" বলা বাহুল্য, এইরূপ উৎসাহে বালক নিজের চরিত্র গড়িতে পারে। এ স্থলে আরও একটু বলা ভাল যে, আমি নিজের জীবনচরিত লিখিতে বসি নাই, কোন গুণে আমি নিজের জীবন চরিত লিখিতে যাইব? মাতা পিতামহীর সংসর্গে যে এক আধটুক সাধুভাব পাইয়াছিলাম, তাঁহাদিগের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও চলিয়া গিয়াছে; কখনও যদি বিজলীর মত এক আধবার আসে, স্বার্থপরতা তখনই তাহাকে পিষিয়া দূর করিয়া দেয়। কেবল সে কালের একটি চিত্র সকলের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিতেছি।

আমাদের গুরু মহাশয় সকালে মাত্র শিক্ষা দিতেন, বিকালে আর তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ছিল না। বিকালে আমরা খেলিয়া বেড়াইতাম। আমরা ফুটবল, ব্যাট বল, টেনিস খেলা জানিতাম না। আমরা রাম রাবণের যুদ্ধ ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের খেলা করিতাম, সে যুদ্ধে ব্যূহ রচনা পর্য্যন্ত হইত। তীর ধনুর যুদ্ধ অল্পই ছিল, গদা-যুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধের প্রচলন অধিক ছিল। কতক গুলি ছেলে চক্রাকারে দাঁড়াইত, তাহারই নাম ব্যূহ, বালকদিগের বাধাসত্বেও যে বালক বল করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিত, সে বাহবা পাইত। বিস্তৃত ভূমির শেষ সীমায় একটি পাকাটী পুঁতিয়া রাখা হইত; সেই ভূমির অপর সীমায় দাঁড়াইয়া দুইটি বালক একবারে দৌড় দিয়া যে আগে গিয়া পাকাটীটি ছুঁইবে, খেলায় সেই জিতিবে, অপর হারিবে। এক বালক একটি, সুপারি মুটে ধরিবে, অপর বালক তাহা খুলিয়া লইবে, না পারিলে সে ঠকিবে। এক বালক একটি বাতাবি লেবু পেটের উপরে রাখিয়া দুই উরু তাহার উপরে রাখিয়া দুই হাতে সেই উরু দুইটি খুব আঁকড়াইয়া ধরিবে, অন্য বালক তাহা খুলিয়া লইবে, না পারিলে সে ঠকিবে। সাত হাত মাটী মাপিয়া সমুদ্র করা হইত, যে তাহা ডিঙ্গাইবে, তাহার বাহাদুরী হইবে। বাহুযুদ্ধে জয়ী হইলে তাহারও প্রশংসা ছিল। মাতারা দাঁড়াইয়া জয়ের পুরস্কার ঘোষণা করিতেন।

অন্যের ছেলে নিজের ছেলেকে মারিল বলিয়া সে ছেলের উপর রাগ করিতেন না। আর এক প্রকার খেলা ছিল—দোল ও কালীপূজা। পাকাটীর চৌদোল ও মকরকণ্ঠ তৈয়ারী করিয়া তাহাতে চৌদোল টাঙ্গান হইত; শিব-মৃত্তিকায় শালগ্রাম গঠন করিয়া তাহাতে বসাইয়া ফুল তুলিয়া পূজা হইত ঝুলন হইত, বালীর আবির দেওয়া হইত। একটি কাল কচুর গাছে কচুর 'নাইলে' চারিখানি হাত প'ড়কে দিয়া লাগান হইত, জবা ফুলের পাপড়িতে জিভ্ করিয়া লাগাইয়া কালী প্রস্তুত হইত; ফুলে জলও বালীর নৈবেদ্যে তাহার পূজা হইত; ছোট বড় কচু গাছে পাঁঠা ও মহিষ করিয়া তাহাকে বলি দেওয়া হইত। কত কি খেলার কথা বলিব? বুদ্ধিমান্ বালক আবার নূতন রকমের খেলা আবিষ্কার করিত। আরামের খেলা ছিল—দোলনায় দোলা। ছায়াবহুল গাছের মোটা ডালে অল্প মোটা শক্ত দড়ীতে দুই দিকে বাঁধিয়া এক-খানি তক্তা টাঙ্গান থাকিত; তাহাতে বসিয়া কোনও বালক আস্তে আস্তে দুলিয়াই আরাম পাইত, কোনও বালক আস্তে আস্তে দোলাইয়া দিত। কোনও দুষ্ট যুবক আসিয়া যখন মাথার উপরে তুলিয়া বেগে ছাড়িয়া দিয়া দোলাইত, তখন দোল্নায় উপবিষ্ট বালকের আতঙ্কে প্রাণ উড়িয়া যাইত সে তখন প্রাণপণে দুই হাতে দুইখানি দড়ী শক্ত করিয়া ধরে, এবং প্রাণপণে চীৎকার করে—ছাড়ার পরে সেই বেগে যখন দুই চারিবার বেগে দোলে, তখন আবার বালক খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে, "আবার দোলাও, আবার দোলাও" বলে; কিন্তু মাথার উপরে তোলার সময়ে আবার চীৎকার করিয়া উঠে। বসন্তের শেষে ও গ্রীষ্মের প্রথমে বালকেরা যখন দৌড়াদৌড়ি খেলায় ক্লান্তি বোধ করিত, সেই সময়ে এই দোলনায় দুলিত; অন্য ডালে বসিয়া দোয়েল শিস্ দিত, আকাশে উড়িয়া একবার পঞ্চমে স্বর তুলিয়া বৌ-কথা-কও পাখী আকাশ ভাসাইত, আর অন্য দিকের ছায়ায় প্রবীণের মধ্যে কেহ কেহ পাতা মাদুরে বসিয়া বাঁ হাতে হুঁকা ধরিয়া দাবা খেলার পিলঠিকে ত্যাগ করিব, কি নৌকাকে ত্যাগ করিব, এই চিন্তায় তামাকু খাইবারও অবকাশ পাইতেন না। সকলেই নিজের নিজের কাজে তন্ময়, কাহারও দিকে কেহ চাহিতেছে না, কাহারও কথায় কেহ কাণ দিতেছে না। যদি কখনও দোলনার দড়ী ছিঁড়িয়া ঝুপ করিয়া বালক পড়িয়া যাইত, এবং মুহূর্ত্ত পরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিত, তখন বৃদ্ধেরা দাবা খেলা ছাড়িয়া "সর্ব্বনাশ হইল!" বলিয়া তাড়াতাড়ি নিকটে আসি-তেন; গাছের ডাল হইতে দোয়েল উড়িয়া যাইত; কিন্তু বৌ-কথা-কও পাখী

উড়িয়া উড়িয়া আরও জোরে হাঁকিয়া আকাশে ঢেউ তুলিত, তাহা যারা বুঝাইয়া দিত,—সুবিস্তীর্ণ আকাশে উড়িয়াছি, সঙ্কীর্ণ মর্ত্ত্য লোকের সঙ্গে আবার কিসের সম্বন্ধ ?

পূজা আসিয়াছে। পূজার নামেই বালক বালিকা আনন্দে অধীর। ছুতোর আসিয়া যখন প্রতিমার পীঠ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই দেখিবার জন্য বালক বালিকার ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি, আনন্দে উন্মত্ততা। আজি কুম্ভকার আসিয়া বুঁদি বাঁধিয়াছে, আজ মাটী লইয়াছে, আজ মাখা লাগাইয়াছে, আজ দোমাটী করিয়াছে,—সকল বালক বালিকার মুখে তখন এই সকল কথা শুনা যাইত। গঙ্গাজল নারিকেলের জলে হিঙ্গুল সংযোগে হরিতাল মাড়িয়া যখন রঙ প্রস্তুত করা হইত, প্রতিমা চিত্র করার পরে যখন প্রতিমাকে কাপড় পরান ও তারকষির সাজে সাজান হইত, তখন দলে দলে বালক বালিকা আসিয়া সমস্ত দিন প্রতিমার নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিত। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আহার, নিদ্রা, সমস্তই তাহারা ভুলিয়া যাইত। সমস্ত বছর বালক বালিকা দেশী মোটা সূতার গ্রাম্য তাঁতীর প্রস্তুত মোটা ছোট ছোট কাপড় পরিয়া সময় কাটাইয়াছে; আজ তাহারা ধোয়া নকাসি পেড়ে শান্তিপুরী, ঢাকাই ধুতি, চাদর, শাড়ী পাইবে; সে জন্য তাহাদিগের আনন্দের সীমা নাই। তাহাদিগের মুখে আনন্দের ভাব ফুটিয়া বাহির হইত। সে কালের বালক বালিকা অল্পেই সন্তুষ্ট হইত; এ কালের বালক বালিকার মত উচ্চ মূল্যের ধুতী, উড়ানী, শাড়ীর প্রয়োজন ছিল না। ডসনের জুতা, কমলার উৎকৃষ্ট শার্ট, কোট, মোজা ও সেমিজ, বডীর আবশ্যকতা ছিল না। দশ বার বছরের বালক বালিকা জুতা পরিত না, পৈতার সময়ে জুতা ও বিবাহের সময়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বরকে বনাতি জুতা ও অবস্থাপন্ন বরকে জরির জুতা দিতেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের চটী জুতা ও বিষয়ীরা নাগরা জুতা সকল পথ হাতে করিয়া লইয়া কর্ম্মবাড়ীর পুকুরে পা ধুইয়া পায়ে দিতেন। সেকালে খড়মের চাল বেশী ছিল। সেকালের ছুতোর উৎকৃষ্ট খড়ম প্রস্তুত করিতে পারিত। বাঙ্গালার ভিতরে মুর্শিদাবাদ ও রঙ্গপুরে হাতীর দাঁতে নকাসি করা উৎকৃষ্ট খড়ম প্রস্তুত হইত। এখনও দুই এক জন বৃদ্ধ ছুতোর আছে; তাহারা হাতীর দাঁতের ও মহিষের শৃঙ্গের সকল কাজই জানে; কিন্তু কিনিবার লোক নাই। খড়ম জুতার সহিত প্রতিযোগিতার টিকে নাই। আপাত-চটকদার অস্থায়ী কারপেটের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সতরঞ্চ ও গালিচা, কারপেটের আসনের সহিত প্রতি-

যোগিতা করিয়া কুশাসন ও পিঁড়ি প্রায় অন্তর্দ্ধান করিতে বসিয়াছে। পূজার সময়ে সে কালে—অবশ্য বালিকাকে নয়,—বালকদিগকে এক এক জোড়া নূতন খড়ম কিনিয়া দেওয়া হইত। সেই খড়ম লাল পাকা রঙ্গে রঞ্জিন থাকিত। এখনকার ছুতোর সে পাকা রঙ্গ ভুলিয়া গিয়াছে। সেই রঞ্জিণ খড়ম পাইয়া বালকদিগের কতই নৃত্য! সেকালের বালক বালিকাকে ও গৃহিণীদিগকে পূজার সময়ে যেরূপ ধুতি, চাদর ও শাড়ী দেওয়া হইত, এ কালের চাকর চাকরাণীকে যদি তাহা দেওয়া হয়, তবে তাহারা নাক সিঁটকাইয়া তখনই তাহা মুনিবের মুখের উপর ফেলিয়া দেয়! এখন আর গরীব লোকের ছেলেরাও এক-রঙ্গী ধুতি চাদর পরে না, গরীব লোকের মেয়েরাও চুণারী শাড়ী পড়ে না; গৃহিণীরাও এখন আর বালুচরী বুটাদার চেলীর আদর করে না। যখন পরণ পরিচ্ছদের কথা, বসন ভূষণের কথা উঠিল, তখন এই প্রসঙ্গেই তাহা বলিয়া শেষ করি। তখনকার ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা সকল সময়ে গ্রাম্য তাঁতীর প্রস্তুত মোটা ধুতি চাদর পরিতেন, বিষয়ীরাও তাহাই পরিতেন। কেবল পূজার মত উৎসবে সাদা সিমলাই ধুতি উড়াণী ব্যবহার করিতেন। রাজা জমীদারদিগের মধ্যে সকল সময়েই সিমলাই কাল ফিতা পেড়ে, শান্তিপুরী, বা ঢাকাই নকাসি পেড়ে ধুতি ও সেই সেই স্থানের উড়াণী ব্যবহারের প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা সন্ধ্যাপূজার সময়ে তসর গরদ ও প্রাতে সভায় গরদের জোড় পরিতেন। মেয়েরা সর্ব্বদা গ্রাম্য তাঁতীর প্রস্তুত মোটা চওড়া লাল পেড়ে শাড়ী, উৎসবে ঢাকাই, শান্তিপুরী শাড়ী, নীলাম্বরী, নীলকণ্ঠী বা বালুচরী বুটাদার চেলি পরিতেন। বড়মানুষের মেয়েদিগের ভিতরে বেণারসী চেলি ও উড়ানীও প্রচলন ছিল। দশ বার বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বড়মানুষের বালকেরা সোণার বালা, মধ্যবিত্তের বালকেরা রূপার বালা পড়িত। পূজা পার্ব্বণে প্রায় সকল বালকেরই গলায় সোণার হার, বাহুতে সোণার বাজু থাকিত। দশ বার বৎসর বয়সের পরে সকল বালকেই বালা খুলিয়া ফেলিত; কিন্তু বড়মানুষের গলায় হার ও বাহুতে বাজু আজীবন থাকিত। সকল ভদ্রলোকেরই আঙ্গুলে সোনার আঙটি থাকিত। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা আবার ক'ড়ে আঙ্গুলের পরের আঙ্গুলে একটি রূপার আঙটিও দিতেন। সৌখীন্ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও কোন কোন বিষয়ী সোণার সূতায় গাঁথা ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষের মালা ও সোণার ইষ্টকবচ ধারণ করিয়া হার ও বাজুর সখ মিটাইতেন। গৃহিণীরা কেহই কাকালে সোণার গোট

পরিতেন না, নাভির নীচে সোণা ধারণ করিতে নাই, এই তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল। বড়মানুষের মেয়েরা সোণার, মধ্যবিত্তের মেয়েরা রূপার পৈঁচে, লবঙ্গ-দানা, নারিকেল-ফুল, কঙ্কণ, বাউটী, হাতে ও বাহুতে কবচ দিতেন। সকলেরই বাহুতে সোণার বাজু, গলায় সোণার হার, কাণে সোণার চেড়ি, ঝুম্‌কো, নাকে সোণার নত, মাথায় সোণার সিঁতি শোভা পাইত। শুনিয়াছি, আমাদিগের জন্মিবার পূর্ব্বে গৃহিণীরা বাহুতে তাড় নামক একরূপ গহনা পরিতেন; আমরা তাহার ব্যবহার দেখি নাই।

শীতকালে সধবা মেয়েরা এক একখানি ফরাসী ছিটের দোলাই পাইতেন; সেকালের মেয়েদের কোনও প্রকারের জামা পরিবার রীতি ছিল না। বালক বালিকারা কুর্ত্তা ও ছিটের দোলাই পাইত তাহাতেই তাহাদিগের আনন্দ উছ-লিয়া উঠিত। কিন্তু প্রায়ই তাহাদিগকে কুর্ত্তার পরিবর্ত্তে 'গাঁথি' পরাণ হইত। একখানি কাপড় এমন ভাবে গায়ে জড়াইয়া একটিমাত্র বাঁধ দেওয়া হইত, যাহাতে সেটি জামার মত হইত, এবং সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিত। তাহারই নাম গাঁথি। তখনকার মেয়েরা সকলেই গাঁথি করিতে জানিতেন; এখনকার মেয়েরা নামও জানেন না। পুরুষদিগের মধ্যে আঙ্গারখার ব্যবহার ছিল। আঙ্গারাখা আর কিছুই নয়, চাপকানের নীচের অংশ কাটিয়া ফেলিলেই আঙ্গরাখা হয়। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা কাপড়ের বাঁধ দেওয়া আঙ্গরাখা গায়ে দিতেন; বড়লোকের আঙ্গরখার বোতাম থাকিত। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা কোনরূপ জামা ব্যবহার করিতেন না। তুলা ভরা জামা ও তুলাভরা টুপীরও ব্যবহার ছিল। অবস্থানুসারে কেহ দোহর ও কেহ গামা তাঁতীর প্রস্তুত ভবল ডিহাতি কাপড় গায়ের উপরে জড়াইয়া দিত। মণ্ডড়া চগজি হইলে দোলাই হয়, শুধু মগজি হইলেই দোহর হয়। পুরুষ গায়ে দোলাই দিত না। কাল ও লাল বনাতেরও খুব ব্যবহার ছিল। বড়লোকেরা সময়ে সময়ে উচ্চ মূল্যের কাশ্মীরী শাল ব্যবহার করিতেন; অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরও সময়ে সময়ে শাল ব্যবহারের রীতি ছিল। পায়ে মোজা কাহারও দেখিয়াছি মনে হয় না। সেকালে শীতবস্ত্রের এত আড়ম্বর ছিল না, সেকালের লোক অনেক সময়েই ধুতির কোঁচা গায়ে দিয়া শীত কাটাইত। প্রবাদ আছে, যত কাপড়, তত শীত।

ক্রমশঃ।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

পরিত্যক্তা।

(১)

হরিশপুরের শ্রীদাম চাটুয্যে গ্রাম্য জমীদার গাঙ্গুলীদের ঘরজামাই হইয়া সর্ব্বপ্রথম কোন্ সালের কোন্ তারিখে শ্রীদাম হরিশপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের বিশ্বকোষেও যখন পাওয়া যায় না—তখন আমাদিগকে তাহার আবিষ্কারচেষ্টায় অগত্যা বিরত হইতে হইল।

যাহা হউক, তদবধি তিনি গাঙ্গুলীদের ন'কর্ত্তা জগমোহন গাঙ্গুলীর ঘরজামাইরূপে হরিশপুরে সংস্থাপিত হন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে জগমোহনের পুত্রগণের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় শ্রীদাম অবশেষে শ্বশুরমন্দিরের পশ্চাতে একটা জঙ্গলের ধারে খড়ো বাড়ী করিয়া সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি শ্বশুরের নিকট কিছু কিছু মাসহারা পাইতেন, কিন্তু শ্বশুরের মৃত্যুর পর শ্যালকেরা তাঁহার এই মাসহারা বন্ধ করিয়া দিলেন। কুলীনশ্রেষ্ঠ শ্রীদাম ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, শ্যালকদের ভয় দেখাইলেন, হয় তিনি মামলা করিয়া পাদুকাপ্রহারে মাসহারা আদায় করিবেন, না হয় আর একটা বিবাহ করিয়া শ্যালকত্রয়কে জব্দ করিবেন।—কিন্তু তাঁহার এই ভয়প্রদর্শনে কোনও ফল হইল না। উকীলেরা বলিলেন, মামলা করিয়া হারিতে হইবে, কারণ স্বর্গীয় কর্ত্তার উইলে মাসহারার উল্লেখ নাই; এবং দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহণও ঘটিয়া উঠিল না, যেহেতু, তাঁহার পত্নী বিরাজমোহিনী উগ্রচণ্ডীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জানাইলেন, তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে অহিফেনসেবনে সকল জ্বালা জুড়াইবেন।—সুতরাং না হইল মামলা, না হইল বিবাহ।—শ্রীদাম অনন্যোপায় হইয়া সংসারপ্রতিপালনের জন্য পাঁঠার মাংসের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন।

পাঁঠার ব্যবসায়ে কোন প্রকারে সংসার চলিত। কিছু দিনের মধ্যেই হরিশপুর গ্রামে শ্রীদাম সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। গ্রামের জনসাধারণ তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে 'পাঁঠা-ব্যাচা ঠাকুর' এই উপাধি প্রদান করিল।

গ্রামের কেহ বলিল, "শ্রীদাম, তুমি এত বড় লোকের জামাই, নিজে এক-জন মহাকুলীন, তোমার কি এ ব্যবসা সাজে?

শ্রীদাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ব্যবসা?"

"এই পাঁঠা ব্যাচা।"

শ্রীদাম রাগ করিয়া বলিলেন, "আজ কাল পাঁঠা ব্যাচে না কে? আমি যেন চার পেয়ে পাঁঠা বিক্রয় করি, আর গাঁয়ের 'হমরো চুমরো' মশায়রা যে দো'পেয়ে পাঁঠা হাজার হাজার টাকায় বিক্রী ক'রচেন! যে পাঁঠার যতটা বেশী পাশ, তার দাম তত বেশী! বাবা, দু'হাজার টাকায় দো'পেয়ে পাঁঠা বিক্রী কর্‌লে দোষ হয় না, আর আমি দেড় টাকায় চার পেয়ে পাঁঠা বিক্রী করি ব'লে তোমরা আমাকে দশ কথা শুনোতে এসেছ? কলিতে বিচার নাই।"

যুক্তির সারবত্তা দেখিয়া প্রশ্নকর্ত্তা চম্পট দান করিল।

(২)

পাঁঠার অভিসম্পাতেই হউক, আর কাল পূর্ণ হওয়াতেই হউক, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে শ্রীদাম ঠাকুর পরলোকে প্রস্থান করিলেন।

গ্রামের কেহ কেহ বলিল, "এত দিনে পাঁঠাগুলো বাঁচ্‌লো!"

কেহ কেহ বলিল, "কিন্তু ছেলেটা যে না খেতে পেয়ে মো'ল।"

শ্রীদামের আঠার বৎসর বয়স্ক পুত্র দামোদর পিতার মৃত্যুতে সংসার অন্ধকার দেখিল। কি করিয়া চলিবে স্থির করিতে না পারিয়া তাহার পিতা যে কয়টি পাঁঠা 'জিয়াইয়া' রাখিয়াছিলেন, সে তাহা একে একে কাটিয়া ভক্ষণ করিল। পুঁজি ফুরাইয়া গেল, অথচ উদরে ক্ষুধার অভাব রহিল না।

দামু কি করিয়া সংসার চালাইবে, মাথায় হাত দিয়া তাহাই ভাবিতেছে, এমন সময় হরিশপুরের ডাক্তার নিবারণ চৌধুরী তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

নিবারণ বাবু পূর্ব্বে কলিকাতার কোনও ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার ছিলেন; কম্পাউণ্ডারী করিতে করিতে তাঁহার ডাক্তার হইবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি বুঝিয়াছিলেন, ডাক্তারী ব্যবসায়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কায ঔষধ-মিশ্রণ। এই কার্য্যে যখন তাঁহার বুৎপত্তি জন্মিয়াছে, তখন পরের দাসত্ব করিয়া কি হইবে, স্বাধীন ভাবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য।

অতঃপর নিবারণ হরিশপুরে ডিস্‌পেন্সারী খুলিয়া অত্যন্ত পসারে ডাক্তারী করিতে লাগিলেন; তিনি যেবার হরিশপুরে ডাক্তারী আরম্ভ করেন, সেইবার হরিশপুর ও তাহার সন্নিহিত গ্রামসমূহে ১৭৩ জন লোক বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে সাত শত রোগীর চিকিৎসার ভার নিবারণ ডাক্তার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সব্য-সাচী ছিলেন, এক হস্তে হোমিওপ্যাথি ও অন্য হস্তে এলোপ্যাথী মতে চিকিৎসা করিতেন। হোমিওপ্যাথিতেই তাঁহার অধিক হাতযশ ছিল, নির্দ্দোষ হোমিওপ্যাথির ঔষধ সেবনে রোগী ভুগিত বটে, কিন্তু মরিত কম; কিন্তু এলোপ্যাথিতে তিনি উদরাময়ে চক্ষুরোগের ঔষধ দিতেন, সুতরাং রোগীকে অবিলম্বে চক্ষু মুদিতে হইত।—যে রোগী বাঁচিত, লোকে তাহার দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া বলিত, "নিবারণ ডাক্তারের কি হাতযশ, যেন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী! একদাগ ঔষধ পেটে পড়েছে কি না পড়েছে—অমনই বিকারের রোগী উঠে বসে!—ভাগ্যে নিবারণ ডাক্তারের দাওয়াই খেয়েছে, তাই বাঁচ্‌লো।" কিন্তু যে মরিত লোকে বলিত, "উহার পরমায়ু ফুরাইয়াছে, ডাক্তারের ঔষধে কি ফল হইবে!"

এরূপ যাহার হাতযশ ও পসার, তাহার টাকা জমিতে অধিক সময় লাগে না। নিবারণ ডাক্তার দুই বৎসরের মধ্যেই পাকা ডিস্‌পেন্সারী করিয়া ফেলিলেন। কলিকাতার বাথগেট্ ও স্মিথ ষ্ট্রানিস্ট্রীটের দোকান ছাড়া অন্য স্থান হইতে ঔষধ আনাইতেন না।—গ্রামের অন্য ডিস্‌পেন্সারীতে যে ঔষধের দাম দুই আনা, নিবারণ ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারীতে তাহার মূল্য ছয় আনা। কেহ এই পার্থক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিবারণ সহাস্যে বলিতেন, "আমি ত 'নেটিভ্ ফারম্' থেকে ঔষধ আনাই নে যে, জলের দামে ঔষধ দেব। আমার ঔষধ বিলাতী ফারম্ থেকে আমদানী, অনেক দাম।"

কমলা যখন সদয়া হন, তখন তিনি অনুগৃহীত ভক্তকে নানা উপায়ে ধনবান করেন। নিবারণ ডাক্তার অর্থোপার্জ্জনের ফন্দীতে ওস্তাদ ছিলেন, সময় বুঝিয়া তিনি আর্সেনিক ও কুইনাইনের সংমিশ্রণে 'অমৃতসার' নামক ঔষধ আবিষ্কার করিলেন। জ্বরের ঔষধ, কিন্তু তাহাতে প্রেমজ্বর পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়। এই ঔষধ-সেবনে জ্বরাক্রান্ত অনেক রোগীর আশু উপকার হইল বটে, কিন্তু শেষে তাহারা হাত পা ফুলিয়া মরিতে লাগিল। তথাপি

নিবারণের ঔষধ হুহু করিয়া কাটিতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে ঔষধের এজেন্ট নিযুক্ত হইল। সংবাদপত্রে 'অমৃতসারে'র কলম কলম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতে লাগিল। বড় বড় ডাক্তার পর্য্যন্ত 'অমৃতসারে'র সুখ্যাতি করিয়াছেন, এই মর্ম্মে প্রশংসার ঢাক বাজিতে লাগিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই সকল ডাক্তার বহুদিন পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের হস্তাক্ষর সনাক্ত করিবার জন্য কাহারও মাথা ব্যথা করিল না।

(৩)

এইরূপে দ্রুত ব্যবসায়ের উন্নতি হওয়ায় নিবারণের একতালা ইমারত দোতালা হইল; গবর্মেণ্ট তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করিলেন, এবং তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে হরিশপুরের মধ্যবাঙ্গলা বিদ্যালয়ের সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর তিনি 'টাকরাজ' নামক একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশতৈল আবিষ্কারের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে কন্যাদায়ে তাঁহাকে বিব্রত হইয়া উঠিতে হইল।

নিবারণের কন্যা শৈলবালা কুরূপা নহে, কিন্তু বাতরোগে তাহার একখানি হাত ও একখানি পা পঙ্গু, ইহার উপর সে একটু তোতলা ও কাণে কিছু কম শুনিত। আজকাল ভদ্রলোকের ঘরের এমন মেয়ে অচল—এ কথা না বলিলেও চলে। ভাগ্যবান নিবারণ সুপাত্রের অনুসন্ধানে চারিদিকে চিঠি পত্র লিখিয়াছিলেন, লোকও পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু কন্যার অঙ্গহীনতার কথা শুনিয়া কেহই সে কন্যা ঘরে আনিতে সম্মত হইল না। অর্থের প্রলোভন নিষ্ফল হইল দেখিয়া নিবারণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।—তাঁহার ধারণা ছিল, বিবাহে যৌতুকটাই প্রধান লক্ষ্য, 'কনে' উপলক্ষ্য মাত্র। উপলক্ষ্যের যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটিতে যাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তাহাদের মত 'বেকুব' সংসারে কয় জন আছে? আট টাকা বেতনের কম্পাউণ্ডার নিবারণ চৌধুরী অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে মাসিক পাঁচ-শতাধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়া মনে করিতে লাগিলেন, অর্থবলে কেবল সামাজিক মানসম্ভ্রম নহে, মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত ক্রয় করা যায়।

কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, দেশের অধিকাংশ লোকই বোকা, অর্থবিনিময়ে কেহই স্বীয় পুত্রকে তাঁহার জামাতা করিতে সম্মত নহে; তখন হরিশপুরের সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান যুবক দামোদরের কথা তাঁহার মনে পড়িল।

দামোদর কষ্টে সৃষ্টে তাঁহার স্কুল হইতে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল;

তাহার পর পৈত্রিক অস্থাবর সম্পত্তি পাঁঠাগুলি গলাধঃকরণ করিয়া, কি করিয়া সংসার চালাইবে এই কথা ভাবিতেছিল, এমন সময় নিবারণ তাহাকে স্মরণ করিলেন—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। ভাদ্রমাসের সন্ধ্যা। গ্রামের গর্ত্ত ডোবা পুষ্করিণীগুলি জলে পরিপূর্ণ, তাহার উপর নির্ম্মল শরৎ-চন্দ্রের উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া জলরাশি দ্রবরৌপ্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে। গৃহস্থের গোশালায় সাঁজালের ধোঁয়া উঠিয়া যেন কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিতেছে। মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে কাঁশর ঘণ্টা বাজিতেছে। বাদুড়ের দল বৃক্ষশাখা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃশব্দ পক্ষসঞ্চারে দ্রুতবেগে ফলাহারের সন্ধানে উড়িয়া চলিয়াছে। একটা বকুল-গাছের ঘন পত্রের মধ্যে দুই তিন শত শালিখ পাখী সমবেত হইয়া সন্ধ্যার মিলন-সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে। একটা জলপূর্ণ ডোবার উপর অবস্থিত বাঁশ-বনে আসিয়া কতকগুলি শৃগাল সমস্বরে সন্ধ্যার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। গ্রাম্য ষষ্ঠীগাছের পাশে দিয়া কৃষককুটীরস্থিত মৃৎপ্রদীপের মৃদু আলোকচ্ছটা বর্ষার আতটপূর্ণা তরঙ্গিণীর বক্ষে সুদীর্ঘ আলোকশলাকাবৎ প্রতিফলিত হইতেছে, এবং অদূরবর্ত্তী খেয়াঘাটে বসিয়া এক জন পথিক খেয়া নৌকার প্রতীক্ষায় রামপ্রসাদী সুরে উচ্চকণ্ঠে শঙ্করীর নিকট 'তবিলদারী' প্রার্থনা করিতেছে।

দামোদর ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়া একখানি ময়লা চাদর গলায় জড়াইয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে নিবারণ বাবুর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় প্রবেশপূর্ব্বক ফরাসের এক পাশে বসিল। নিবারণ তখন একটা স্থূলোদর বালিশে ঠেশ দিয়া আলবোলায় তামাক টানিতে টানিতে সেই দিনের 'বেঙ্গলী'খানি দেখিতেছিলেন। তিনি যদিও ইংরাজী ভাষায় ঔষধের নামগুলি ভিন্ন আর কিছুই পড়িতে পারিতেন না, এবং ইংরাজীতে নামটি স্বাক্ষর করিতে মাঘমাসের শীতেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতেন, তথাপি 'বেঙ্গলী'র তিনি গ্রাহক ছিলেন, এবং প্রত্যহই সন্ধ্যাকালে তাহার পাতাগুলি উল্টাইয়া বিদ্যাবত্তা পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন।

ফরাসের উপর হিংক্সের 'পাম্প্রুফ' 'ডবলউইক'-বিশিষ্ট সুবৃহৎ ডোম-ওয়ালা ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। দামোদরের আবির্ভাবমাত্র নিবারণ 'বেঙ্গলী'খানা ফেলিয়া রাখিয়া বালিশের আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সোজা হইয়া বসিলেন, তাহার পর দামোদরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেমন হে দামু,

আছ কেমন? তোমাকে অনেক দিন দেখিনি। তোমার বাবা সর্ব্বদাই এ দিকে আস্‌তেন, খোঁজ খবর নিতেন; তোমরা একালের ছেলে, খবরটা পর্য্যন্ত লও না! তা তোমার শরীর ভাল আছে ত? তোমার মা ভাল আছেন?"

দামোদর নতমস্তকে বলিল, "হ্যাঁ, মা ভাল আছেন। মেসোমহাশয়, আপনি আমাকে ডেকেছেন?"

দামোদর গ্রামসম্পর্কে নিবারণকে মেসোমহাশয় বলিত; বোধ হয় একটু দূর সম্বন্ধও ছিল।

নিবারণ বলিলেন, "তোমার মার সঙ্গে আমি একবার দেখা করবো—অনেক দিন থেকেই মনে করচি। তা আমার সময় কম; যাক্‌, আমার যা বলবার আছে—আমার মুহুরী চক্রবর্ত্তীকে দিয়েই তা ব'লে পাঠাব। তোমাকে ডেকেছি কেন, বলি শোন। শুন্‌ছি, তোমাদের এখন সংসার চলাচলের উপায় নেই, খুব কষ্টে পড়েছ, আর তুমি বেকার বসে আছ। আমার স্কুলে তৃতীয় পণ্ডিতের চাকরী খালি আছে, দশ টাকা মাইনে, এণ্ট্রেন্সপাশ ও এল্‌এ ফেল অনেকগুলি লোক দরখাস্ত করেছে; নর্ম্মালে ত্রৈবার্ষিক পাশকরা কয়েকটি লোকও উমেদার আছে। তুমি যদি সে চাকরী করতে চাও ত কাজটা তোমাকেই দিতে পারি। কি বল?"

দামোদর হাতে স্বর্গ পাইল; দশ টাকা বেতনের চাকরী আপনা হইতে জুটিতেছে! লক্ষ্মী এত দিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। দামোদর তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া আসিল, এবং পরদিন হইতে সে হরিশপুরের মাইনর স্কুলে তৃতীয় পণ্ডিতের 'টুল' অধিকার করিয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে দুগ্ধপোষ্য বালকগণের পৃষ্ঠে ও করতলে বেত্রদণ্ড প্রয়োগ করিতে লাগিল।

কিছু দিনের মধ্যেই দামু পণ্ডিতের এমন সুনাম প্রচারিত হইল যে, গ্রামের ছেলেরা 'বর্গি এলো' ছড়াটা শুনিলেই পিতামহীর অঞ্চলের ভিতর মাথা গুঁজিয়া বর্গির পরিবর্ত্তে দামুপণ্ডিতের অস্তিত্ব কল্পনা করিত।

(৪)

যথাসময়ে মুহুরী চক্রবর্ত্তী দামোদরের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবারণের কন্যার সহিত দামুর বিবাহের ঘটকালী করিয়া গেল। দামুর মা কিছু 'দাবী' করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দাবীদাওয়া করিলে বিবাহ হইবে না এবং দামুর চাকরী থাকিবে না, এইরূপ আভাস পাইয়া তিনি দাবী ছাড়িয়া দিলেন। নিবারণ চৌধুরী অতি অল্পব্যয়ে কন্যাদায়

হইতে উদ্ধার হইলেন, মনে মনে বলিলেন, "স্কুলের সেক্রেটারীর কাজটা হাতে ছিল, তাই বেখরচায় কন্যাদায়ে উদ্ধার হইলাম।—লোকে বলে, আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই। নিবারণ চৌধুরী এমনই বোকা!"

পঙ্গু ও তোত্‌লা, তাহার উপর কালা বৌ লইয়া ঘর করা সহজ নহে, বিশেষতঃ দামোদরের গৃহে অশনবসনের যে সচ্ছলতা। দামোদরের মা 'বৌমা'কে বাড়ী আনিতে সাহস করিলেন না, নিবারণ কন্যা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি ত জানিয়া শুনিয়াই মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন, তাঁহার আক্ষেপের কোনও কারণ ছিল না।

কিছুদিন পরে নিবারণের চৈতন্য হইল। তিনি দেখিলেন, দামু দূরে দূরে থাকে, তাঁহার কন্যার সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করিতে সম্মত নহে। তাঁহার কন্যা পঙ্গু হোক—তোতলা হোক—বধির হউক,—তাহার যে একটি হৃদয় আছে, এবং সে হৃদয় অন্যান্য বালিকার হৃদয়েরই অনুরূপ, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। কন্যাকে অসুখী ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া তিনি দামোদরকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। দামোদরের বন্ধুদের নিকট প্রকাশ করিলেন, দামু যদি তাঁহার কন্যাকে ভালবাসে, তাহার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হয়, ও তাহাকে লইয়া 'ঘর' করে,—তাহা হইলে তিনি দামোদরের উন্নতির ব্যবস্থা করিবেন।

বুদ্ধিমান দামোদর এ প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না। সে স্ত্রীর সহিত ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিল। শৈলবালাকে সে কোন দিন একখানি সাবান, কোন্‌দিন এক কৌটা সচীশোভনা সিন্দূর, কোনও দিন বা এক শিশি তরল আলতা আনিয়া দিয়া প্রণয়টা বেশ ঘনীভূত করিয়া তুলিল। শৈলবালার মুখে আবার হাসি ফুটিল। মা ছেলের দুর্ম্মতি দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। তাঁহার আশা ছিল, ছেলের দু পয়সা উপার্জ্জন বাড়িলে তিনি একটি টুকটুকে বৌ আনিয়া ঘরে তুলিবেন, নূতন বৌ লইয়া সংসার ধর্ম্ম করিবেন; কিন্তু দামু তাঁহার এত আশা বুঝি বিফল করে!—মা এক একদিন দামুকে তাহার স্ত্রীর প্রতি পক্ষপাতের জন্যও মৃদু তিরস্কারও করিতেন, কিন্তু দামু কোনও কথা বলিত না; শেষে একদিন সে জালাতন হইয়া বলিয়া ফেলিল, "তোমার যেমন বুদ্ধি! আমি কি জন্য কি করুছি, তা তুমি কি করে বুঝবে?"

কিছুদিন পরে দামু পুত্রসন্তানের মুখ দেখিল। নিবারণ দেখিলেন, দামুর সংসার বাড়িতেছে; তাহার উন্নতির কোনও উপায় করিতে না পারিলে

ভবিষ্যতে দামুর সংসার তাঁহাকেই বহন করিতে হইবে। তিনি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি দামুকে ঢাকার 'সার্ভে ইস্কুলে' জরিপ শিখিতে পাঠাইলেন। দামোদর অক্লান্ত পরিশ্রমে যথাসময়ে জরিপের পরীক্ষায় পাশ করিল।

এই সময় ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী হইবে বলিয়া গবর্মেণ্ট অনেক জমী কিনিতেছিলেন। গবর্মেণ্টের এক জন কণ্ট্রাক্টর দামুকে বুদ্ধিমান দেখিয়া এবং তাহার পূর্ব্বপরিচয় লইয়া তাঁহার কন্যার সহিত দামুর বিবাহ স্থির করিলেন। দামু তাঁহাকে বলিয়াছিল, তাহার স্ত্রী খঞ্জ, তোতলা, কালা,— সে স্ত্রী লইয়া সংসার চলিবে না। কণ্ট্রাক্টর বাবু সন্ধান লইয়া জানিলেন, দামুর কথা অতিরঞ্জিত নহে। সুতরাং বিবাহে কোনও আপত্তি হইল না। বিবাহের পর শ্বশুর কণ্ট্রাক্টরের চেষ্টাতেই দামু এক জন ল্যাণ্ড-একুইজিসন ডেপুটী কালেক্টরের অধীনে একটি সদরআমিনী পদ লাভ করিল।

কিছুদিনের মধ্যেই দামু দক্ষতাগুণে ডেপুটী কালেক্টরের দক্ষিণ হস্ত হইয়া উঠিল। দামুর প্রতি তাঁহার অখণ্ড বিশ্বাস, বড় বড় 'প্লট' ক্রয় করিতে হইবে, দামু জরীপ করিয়া, দর ঠিক করিয়া দিতে লাগিল; তাহাই মঞ্জুর! দামু প্রজার সহিত বন্দোবস্ত করিত, যে জমীর চারি হাজার টাকা মূল্য, তাহার জন্য ছয় হাজার টাকা আদায় করিয়া দিত। জমীর অধিকারীর প্রাপ্য সাড়ে চারি হাজার, দামুর প্রাপ্য দেড় হাজার।

সুতরাং পঁয়তাল্লিশ টাকা মূল্যের দামু দুই বৎসরের মধ্যে বড়লোক হইয়া উঠিল। প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইল, স্ত্রীকে প্রায় পাঁচ হাজার টাকার অলঙ্কার দিল, এবং ব্যাঙ্কেও আট দশ হাজার টাকা জমাইল। কিন্তু দামুর এ সুখ সৌভাগ্য দর্শন নিবারণ চৌধুরীর ভাগ্যে ঘটিল না, তিনি ধর্ম্মরাজের আহ্বানে ডাক্তারী ছাড়িয়া এক অজ্ঞাত লোকে প্রস্থান করিলেন। হরিশ-পুরের তিন জন ডাক্তারের অবিশ্রান্ত চেষ্টা বিফল হইল।

(৫)

দামু শৈলবালার নামও সহ্য করিতে পারে না। পিতার মৃত্যুর পর তাহার দুর্দ্দশার সীমা রহিল না; চুলে তেল নাই, রুক্ষ মাথা, পরিধানে মলিন ছিন্ন বস্ত্র, হাতেই গাছকয়েক চুড়ী। শৈলবালার দুই ভাই ছিল, পিতার মৃত্যুর পর পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়া পৃথক হইল। পেটেণ্ট ঔষধ

ও তেলের ব্যবসায় এজমালিতেই চলিতে লাগিল। মা স্বতন্ত্র 'হাঁড়ি কাড়িলেন'; তিনি শৈলকে দুবেলা দুটি খাইতে দিতেন, তাই অভাগিনীর অনাহারে মৃত্যু হইল না।

কিন্তু কষ্ট ত আর সহ্য হয় না। শৈলবালা নিজের দুঃখ জানাইয়া স্বামীকে পত্র লিখিল, সে পত্রের প্রত্যেক ছত্র অশ্রুসিক্ত। কিন্তু সে পত্র পাইয়াও দামোদরের দয়া হইল না। সে তখন অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত, বাড়ীতে বন্ধুগণের মেলা; প্রত্যহ চায়ের 'পার্টিতেই' তাহার তিন চারি টাকা খরচ। তাহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা দাসদাসীবৃন্দে মুখরিত, তাহার নবীনা গৃহিণী কনকলতা নানা অলঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া ভুবনমোহন হাস্যে তাহার হৃদয়ে শরতের শুভ্র জ্যোৎস্নারাশি বিকীর্ণ করিতেছে, তাহার সুকুমার স্নেহভাজন পুত্রকন্যা অলঙ্কারে-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া মনের আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। এ সময় সেই পল্লীবাসিনী, পঙ্গু, তোতলা অভাগিনীর কথা কিরূপে তাহার মনে পড়িবে? দূর পল্লীর এক প্রান্তে তাহারই যে পূর্ব্বস্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র নৃত্যলাল মাঘের দারুণ শীতে পিঠে একখান ময়লা নেকড়া জড়াইয়া হিমে পড়িয়া ক্ষুধায় কাঁদিতেছে, আর তাহার মা তাহার অর্দ্ধনগ্ন দেহ বুকের মধ্যে ঢাকিয়া অশ্রুজলে ধরাতল সিক্ত করিয়া বলিতেছে, "ভগবান আর কতদিন আমাকে এমন করিয়া পুড়াইয়া মারিবে! আহা, ছেলেটার কি গতি হবে?" তাহার সেই কাতর আর্ত্তনাদ দামোদরের কর্ণে প্রবেশ করিল না। দুই তিনখানি পত্র লিখিয়াও যখন শৈলবালা স্বামীর নিকট হইতে কোনও উত্তর পাইল না, তখন সে সকল আশা ত্যাগ করিল। সে মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া বলিল, "মা, আমার ছেলেটার কি গতি হবে?"

মা বলিলেন, "পূজার সময় তো বাড়ী আসবে,—দেখা যাক; আমি যে ক'দিন আছি, সে ক'দিন তোদের না খেয়ে মরতে দেব না।"

পূজা আসিল। এবার দামোদর মহাসমারোহে মহামায়াকে গৃহে আনিতেছে। মায়ের শুভাগমনে দামোদর বিলক্ষণ দশ টাকা ব্যয় করিবে, স্থির করিল। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে প্রকাণ্ড চাঁপোয় বাঁধা হইল; কলিকাতা হইতে অনেক টাকা ব্যয়ে সোণালী ডাকের সাজ আসিল। জমিদার গাঙ্গুলীবাড়ীর পূজায় বার ঢাক বাজিত। দামোদর ঢাকের সংখ্যায় গাঙ্গুলীদের পরাজিত করিবার সংকল্প করিয়া যোল ঢাকের বায়না পাঠাইলেন। সকলে

বুঝিল, নূতন বড়লোক দামোদর চাটুয্যে এবার ঢাকের আওয়াজে গ্রামের কাণে তালা লাগাইবে।

দামোদর সপরিবারে ষষ্ঠীর দিন নৌকাযোগে গৃহে উপস্থিত হইল। দামোদর কর্ম্মস্থান হইতে বহু সামগ্রী সহ বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসিগণের মধ্যে মহা আন্দোলন আরম্ভ হইল। ঘাটে, পথে, রমণীসমাজে কেবলই দামোদরের কথা, তাহার সৌভাগ্যের কথা, তাহার দ্বিতীয়া পত্নীর অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য ও তাহাদের গঠনকৌশলের কথা। গ্রাম দামোদরময় হইয়া উঠিল। পল্লীরমণীগণ দলে দলে দামোদরগৃহিণীকে দেখিতে ছুটিল। শৈলবালা ও তাহার জননীর কর্ণে সকল কথাই প্রবেশ করিতে লাগিল। শৈলবালা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিল, "এ সকলই আমার হইতে পারিত, কি পাপে সকলে বঞ্চিত হইলাম!" ভগবানের বিচার দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। শৈলবালার মা জামাতার অকৃতজ্ঞতার পরিচয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; তাঁহার স্বামী যদি তাহার উন্নতির পথ মুক্ত না করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আজ এত ঐশ্বর্য্য, এত গহনা, এত সুখ কোথায় থাকিত? দামোদর যখন তাঁহাদের গ্রামের বিদ্যালয়ে দশ টাকা বেতনে পণ্ডিতি করিত, তখন সে তাঁহাদের আশ্রিত ছিল, অনুগত ছিল; তখন সে শৈলবালার মনোরঞ্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত; কিন্তু এখন দামুর অর্থ হইয়াছে, ঘরবাড়ী হইয়াছে, দশ জনে তাহাকে মানুষ মনে করিতেছে। এখন সে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে অনিচ্ছুক, পরিত্যক্তা পত্নীকে কুশলবার্ত্তা-জিজ্ঞাসাতেও পরাঙ্মুখ। শৈলবালার মা অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। দামু বাড়ী আসিয়া গ্রামের গণ্যমান্য ভদ্রলোকদের সহিত দেখা করিতে গেল, তাহার দুই হাতের আট অঙ্গুলীতে আটটা হীরকখচিত অঙ্গুরীয়, সেই সঙ্গে বাড়ীর শার্টের 'ফলস্ কলারে' যেন মুখ দেখা যায়। শার্টের সোণার বোতামের পালিস ঝক্ মক্ করিতেছে, আর, "ডবল ব্রীজ" প্যাটার্ণের সোণার চেনেরই বা শোভা কত! যাঁহারা পূর্ব্বে দামোদরকে মানুষ বলিয়া মনে করিতেন না, তাঁহারাও দামোদরকে দেখিয়া উঠিয়া চেয়ার ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন। দামোদরের পিতা কুলীন, কিন্তু কাঞ্চন-কৌলীন্যে দামোদর গ্রামের সকল কুলীনকে পরাজিত করিয়াছিল। দামোদর পূজায় বাড়ী আসিয়া সকলের বাড়ী গেল,—গেল না কেবল তাহার প্রথম পক্ষের শ্বশুরবাড়ী। শৈলবালা এতদিন পরেও স্বামীর চরণদর্শন

করিতে পারিল না, এই দুঃখেই তাহার অন্য সকল দুঃখকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। সপ্তমীর সন্ধ্যায় যখন দামোদরের বাড়ীতে ষোলটা পাখাওয়ালা ঢাক একসঙ্গে বাজিয়া গ্রাম তোলপাড় করিয়া তুলিল, তখন সেই বাদ্যধ্বনি শৈলবালার কর্ণে উৎকট বিদ্রুপহাস্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। সে তাহার পাঁচ বৎসরের পুত্রকে কোলে চাপিয়া ধরিয়া চন্দ্রালোকিত গৃহকুট্টিমে বসিয়া নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল।

(৮)

সন্ধ্যারতির ঢাক বাজিয়াছে। গ্রামের বালক যুবক বৃদ্ধগণ পোষাকী বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পূজা-বাড়ীতে মহামায়াকে প্রণাম করিতে যাইতেছে। আনন্দে উৎসাহে সকলেরই মুখ প্রফুল্ল; সপ্তমীর আধখানা চাঁদ সুধাময় হাস্যে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিতেছে; সমস্ত প্রকৃতি যেন মনের আনন্দে হাসিতেছে; রজনীগন্ধা, কদম্ব ও চম্পকের সৌরভরাশি বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে, যেন তাহা শারদ লক্ষ্মীর সুরভিত নিঃশ্বাস। পূজা-বাড়ীতে আলোকমালার কি উজ্জ্বল শোভা! মায়ের সোণালী সাজে তাঁহার সুপ্রশান্ত প্রফুল্ল আননে চণ্ডীমণ্ডপস্থিত শতদীপরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া দর্শকের নয়ন, মন বিমুগ্ধ করিতেছে। পূজামণ্ডপে লোকের ভীড়ে বাহির হইতে কিছুই দেখা যায় না। ধূপধূনার সৌরভে পূজামণ্ডপ পূর্ণ। সকলেই কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া ভক্তিবিহ্বলনেত্রে দশভুজার মাতৃমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছে। পুরোহিত মায়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পঞ্চপ্রদীপ আন্দোলিত করিয়া মায়ের আরতি করিতেছেন, আর ষোলটা ঢাক পাখা দুলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া সমতালে বাজিতেছে। উৎসব-ভবন আনন্দে পূর্ণ।

আরতি শেষ হইল; ঢাকের বাদ্য থামিয়া গেল; দর্শকমণ্ডলী মাতৃচরণে প্রণত হইয়া ধীরে ধীরে পূজামণ্ডপ পরিত্যাগ করিল। ভীড় কমিতে দেখিয়া গৃহলক্ষ্মীরা মাতৃচরণ দর্শনাশায় স্পন্দিতবক্ষে সসঙ্কোচে একে একে দামোদরের পূজামণ্ডপে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। দামোদরের আদরিণী গৃহিণী কনকলতা মণ্ডপের একপ্রান্তে আড়ালে দাঁড়াইয়া পরিচিতা গ্রামবাসিনীগণের অভ্যর্থনা করিল; তাহার কণ্ঠবিলম্বিত কারুকার্য্যখচিত মূল্যবান 'পুষ্পহারে' দীপরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া ঝল্‌মল্ করিতে লাগিল, তাহার মনোহর কর্ণভূষায় যেন বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। ভাগ্যবতীর মনে হইল, আজ তাহার জীবন সার্থক।

ঝাড়লণ্ঠনভূষিত 'টাপোরে'র নীচে জনসমাগম বিরল হইয়া আসিলে, দামোদর তাহার তিনবৎসরবয়স্ক পুত্রের হাত ধরিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সোপান-শ্রেণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আত্মপ্রসাদে তাহার হৃদয় পূর্ণ; সে নির্নিমেষনেত্রে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিয়া মাতৃমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় একটি প্রৌঢ়া রমণী তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রৌঢ়ার সঙ্গে একটি পাঁচ বৎসরের বালক : বালকের পায়ে ছেঁড়া জুতা, গায়ে একটা ময়লা জামা ; সে কৌতূহলবিস্ফারিতনেত্রে ঠাকুর দেখিতে লাগিল।—এই বালক শৈল-বালার গর্ভজাত সন্তান, দামোদরের পুত্র নৃত্যলাল।—সে মামার বাড়ীর পুরা-তন ঝি বামার সঙ্গে ঠাকুর দেখিতে আসিয়াছে। শৈলবালা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই।

বামা দামোদরকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহাকে সম্ভাষণ না করিয়া থাকিতে পারিল না। ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "প্রেণাম হই জামাই বাবু, ভাল আছেন ত? আমাদের ওদিকে যে পায়ের ধুলো দিলেন না! পুরোণো সম্বন্ধ কি একেবারেই ভুলতে হয়? আহা, দিদিমণি আমার দিবে-রাত্তির চোখের জলে ভাসচে। সংসারে কি ভগবানের 'বিচের' নেই? বাবা 'নেত্যলাল', তোমার বাপ্‌কে পেন্নাম কর, ইনি তোমার বাপ ; তা কি করেই বা চিন্‌বে?"

শৈলবালার পুত্র নৃত্য ক্ষণকাল বিস্মিতভাবে তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর পিতার পদতলে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিল।

বামা আসিয়া এখানে এ ভাবে তাহাকে আক্রমণ করিবে, দামোদর তাহা পূর্ব্বে কল্পনাও করে নাই। পুত্রকে তাহার চরণে প্রণত হইতে দেখিয়া সে অপ্রস্তুতভাবে কয়েক পদ সরিয়া দাঁড়াইল এবং "আমি একা মানুষ, বড় ব্যস্ত", এইরূপ দুই একটি কথা বলিয়াই মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে দ্বিতীয় পক্ষের নন্দনের হাত ধরিয়া এক দিকে সরিয়া পড়িল। বাবা একটা কথা পর্য্যন্ত বলিলেন না দেখিয়া বালক নৃত্যলাল মনে বড় বেদনা পাইল, তাহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। বামা তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

দামোদরের পুত্র উমানাথ বলিল, "বাবা, ও ছেলেটা কার ছেলে?"

দামোদর অন্যমনস্কভাবে বলিল, "ও কোন্ ভিখিরীর ছেলে হবে।"

দীর্ঘকালপরে নৃত্যলালের মুখ দেখিয়া দামোদরের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ বাৎসল্য

রসের সঞ্চার হইয়াছিল, যতই কঠিনহৃদয় হউক--সে মানুষ, তাহার মন কেমন করিতে লাগিল। রাত্রে সে কথাপ্রসঙ্গে তাহার দ্বিতীয় পক্ষকে জানাইল, নৃত্যলাল ঠাকুর দেখিতে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়াছে। তাহাকে একবার কোলে লইতে তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল। আহা, ছেলেটার গায়ে একটা ভাল জামা নাই, ছেঁড়া জুতা পায়ে দিয়া সে ঠাকুর দেখিতে আসিয়াছিল।

দামোদরের এই সমবেদনাপূর্ণ কথা শুনিয়া দামোদরের দ্বিতীয় পক্ষ কনকলতা চামুণ্ডামূর্ত্তি ধারণ করিল,—অভিমানভরে বলিল, "কে তাকে জামা জুতা দিতে বারণ করছে? তা নিয়ে এস না কেন, তোমার সেই শৈলবালাকে। আমি যদি এত চোখের বিষ হয়ে থাকি ত দাও না আমাকে বাপের বাড়ী বিদেয় করে'! জানি তোমার ষোল আনা মনের টান সেই তোত্‌লা কালা মাগীর দিকে, কেবল চক্ষুলজ্জায় আমাকে ঘরে রেখেছ বৈ ত নয়! ভাগ্যে বাবাকে শ্বশুর পেয়েছিলে, তাই দু'পয়সা রোজগার করে খাচ্ছ; এখন আমাকে মনে লাগ্‌বে কেন? 'নেমকহারাম' মান্‌ষের স্বভাবই এই রকম।" গৃহিণী অভিমানভরে ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। তাহার অশ্রুধারায় ধরাতল প্লাবিত হইতে লাগিল।—দামোদর জগৎ অন্ধকার দেখিল, পত্নীর অভিমান ভঙ্গ করিতে তাহার সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। দামোদর প্রতিজ্ঞা করিল—সে আর শৈলবালা বা তাহার পুত্রের কথা মুখে আনিবে না। অভিমানভঙ্গে কনকলতা অষ্টমীপূজার আয়োজন করিতে বসিল; সপ্তমীর নিশি প্রভাত হইল।

(৭)

দশমীর দিন অপরাহ্নে দামোদরের পূজা-মণ্ডপে মহামায়ার 'বরণ' আরম্ভ হইয়াছে। ঢাকের বাদ্যে আর সে উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তির আভাস পাওয়া যাইতেছে না, তাহাতে যেন বিষাদের হাহাকার ধ্বনিত হইতেছে। সানাই সুর করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিদায়-গাথা গান করিতেছে; তাহার সুরের প্রতিকম্পনে আসন্ন বিরহের করুণ বেদনা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা পুরাঙ্গনাগণ মাকে বরণ করিতে আসিয়াছেন; সংবৎসরের মত তাঁহাকে বিদায় দান করিতে সকলেরই চক্ষু ছলছল করিতেছে। সর্ব্বাগ্রে বহুমূল্য বারাণসী-শাড়ী-বিমণ্ডিতা, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা কনকলতা বরণডালা মস্তকে লইয়া বরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে তাহারই বরণের

অধিকার; অন্যান্য রমণীগণ অদূরে দাঁড়াইয়া গৃহিণীর বরণ-শেষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় একটি সধবা রমণী ধীরে ধীরে পূজার দালানে উঠিয়া, মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রমণী যেন বিষাদের প্রতিমা, তাহার পরিধানে একখানি মলিন বস্ত্র; আভরণের মধ্যে দুই হাতে দুই গাছি কাচের চুড়ি; তাহার কেশ রুক্ষ, চক্ষু দুটি অশ্রুভারে অবনত।

রমণী দেবীর চরণে লুটাইয়া পড়িল, অশ্রুরুদ্ধনেত্রে মায়ের স্বর্ণ-নথ-শোভিত প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, তুই স্বামীর ঘরে চলিলি, আমার স্বামীর ঘরে আমার স্থান নাই, আমি কোথায় যাব মা? আমাকে তোর চরণে স্থান দে, আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাক্।"

শৈলবালা আর কোনও কথা বলিতে পারিল না; সে মাতৃচরণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

বরণে হঠাৎ বাধা পড়িল; কনকলতা বাস্তসমস্ত হইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, সক্রোধে বলিল, "এ আপদ এখানে কেন মরিতে আসিল!" আকস্মিক বিভ্রাটে ঢাকের বাদ্য থামিয়া গেল; সানাইয়ের কণ্ঠরোধ হইল!—কেবল পশ্চিম গগন হইতে শ্রান্ত তপনের লোহিত রশ্মিজাল বাতায়নপথে মায়ের হরিতাল-রঞ্জিত অতসীবর্ণাভ মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার প্রশান্ত মুখকান্তিকে করুণার উৎসধারায় সিক্ত করিল। মনে হইল, নিরাশ্রয়া অভাগিনী কন্যার দুঃখে মা জগজ্জননীর নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুরাশি উৎসারিত হইতেছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ইংরাজী চিত্র-কলায় প্রাণ।

একটা জাতি যখন বড় হয়, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, বড় হইবার উপযোগী উপাদান অনেক কাল ধরিয়া প্রকৃতি রাণী সেই জাতির প্রত্যেকের গৃহে গৃহে বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। শক্তি বা মহত্ত্ব অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় না। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বহু ভগীরথ তপস্যা করিয়া গঙ্গা আনিয়া জাতির খাদ্যের উৎস ও পিপাসার জল যোগাইয়া থাকেন।—তবেই জাতি বড় হয়। ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার

জগে উদাসীন হইয়া, মাটীর দেহে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিয়া, স্বপ্নময় রাজ্যে শূন্য আকাশে মেঘে মেঘে বিচরণ করিয়া কেহ কখনও বড় হয় নাই, কেহ কাহাকেও বড় ও সুখী করিতে পারে নাই, কেহ কখনও জাতি গড়িতে সমর্থ হয় নাই। অন্যায় কখনও নিষ্ক্রিয় থাকে না, তাহার কুফল একদিন না একদিন, এক স্থানে না হয় অন্য স্থানে ফলিবেই ফলিবে। ব্যক্তিগত অপদার্থতার ফলে মানুষ নিজে ভোগে, পরিবারকে দুঃখসাগরে ভাসায়, জাতিকে চিরদুঃখী করিয়া ভিক্ষুকের বেশে ভবের হাটে ছাড়িয়া দেয়।

ব্যক্তিগত বা জাতিগত ভাবে মানুষের সার্থকতা,—স্বপ্নের অনুধাবন কিংবা সংসারের পঙ্কে জীবন-ত্যাগে মনুষ্যজীবনের সার্থকতা নহে। মানুষ যখন প্রকৃতির অন্তরবাহী শক্তিময় প্রাণের সন্ধান পায়, তখনই মানুষ বড় হইতে থাকে, জাতিকেও বড় করিয়া তোলে। প্রাণ প্রকৃতির সকল বস্তু অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব, আবার স্বপ্ন অপেক্ষা অনধিগম্য, সুদূরস্থিত অসীম অনন্তচারী।

যখন জাতির ভিতরে প্রাণ প্রকাশ পায়, তখন সেই জাতির কোনও কর্ম্মক্ষেত্রই তাহার শক্তির বহির্ভূত থাকিতে পারে না। সকল কর্ম্ম-বিভাগেই শক্তির আবির্ভাব হয়।

আজ ইংরাজ-জীবনের চিত্রের কথা বলিব। ইংরাজের কলা-চর্চ্চা নানা রসে পরিপূর্ণ। এক প্রবন্ধে সকল বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নহে। আজ উদাহরণের সাহায্যে কোমলভাবের একটু আলোচনা করিব।

প্রথম চিত্র।—ইহার বিষয় চিত্রের দিকে চাহিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। মানুষটি চরিত্রের কোনও দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে অন্যায় করিয়াছিল, তাই সরকার তাহাকে কারাবাসে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু তার প্রাণকে আবদ্ধ করিতে পারেন নাই।

বন্দীর হৃদয় পঞ্জর-পিঞ্জরে কাঁদিতেছে। ঐ দেখ, বন্দীর জীবনসঙ্গিনী তাহার হৃদয়-বৃন্তের ফুলটিকে কারাবাতায়নে তুলিয়া ধরিয়াছে, জানালার লোহার গরাদের ফাঁক দিয়া যতটা পারে, পুত্রমিলনসুখ উপভোগ করিবার জন্য বন্দিনী ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে; অভাগিনীর মস্তক দুঃখের ভারে নত হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় চিত্র।—এক দিকে শুক, অন্য দিকে শারী, মধ্যে বেদনায় কারা-পিঞ্জর—হৃদয়বিদারী ব্যবধান।

তৃতীয় চিত্র।—মুক্তির আবেশ। কারাবাসী মুক্তি পাইয়াছে। তাহার সুখদুঃখের সঙ্গিনী শিশুসন্তানকে লইয়া উপস্থিত। হতভাগ্য আনন্দের আবেগে জীবনসঙ্গিনীর স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করিয়া টলিয়া পড়িয়াছে। পত্নী তাহার স্বামীর মুক্তির আদেশপত্রখানিই দ্বাররক্ষীকে দেখাইতেছে। চিত্রবিদ্যের মহত্ত্ব এই চিত্রে শুধু মানব-প্রাণের ভাবপ্রকাশেই আবদ্ধ নয়। একটু লক্ষ্য করিয়া কুকুরটির দিকে চাহিয়া দেখুন, সে কেমন আবেগের সহিত স্বামীস্ত্রীর মিলিত হাত দুখানি লেহন করিতেছে! তাহার আনন্দও ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে কৃতী পুরুষ কি মানবে কি জীবে ভাবের প্রাণময় ধারা মানবতার খাতে প্রবাহিত করিতে পারেন, তিনিই ত যথার্থ কলাবিৎ।

৪র্থ চিত্র।—তার জীবনের প্রথম দুষ্কৃতি। আলোকের অভাব যেমন অন্ধকার, তেমনই ন্যায়, সত্য ও প্রেমের অভাবই দুষ্কৃতি; ইহারই অন্য নাম পাপ, বা কলুষ। দুষ্কৃতি, অন্যায়, বা পাপের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, বা থাকিতে পারে কি না, এই গূঢ় বিষয়ে বিশেষ আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। এই চিত্রে অভিব্যক্ত বালকের মুখের দিকে চাহিয়া দেখুন, অদ্ভুতগু, অসহায় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় শিশু যদি অন্যায় করিয়া থাকে, তবে সে অন্যায়ের জন্য দায়ী কে? দায়ী তার পিতা মাতা, দায়ী তার সমাজ, দায়ী তার সমাজের সাধনা, দায়ী তার দেশ, দায়ী তার দেশের ভগবান্। কোথা হইতে সে এ জগতে আসিল? তার প্রাণে প্রেম দয়া সুবুদ্ধি দুর্বুদ্ধি দেবত্ব ও পশুত্বের সমবায়ে কে এই অদৃষ্ট গড়িল? এই প্রশ্নের উত্তর নাই। যখন এই সমস্যার সমাধান হইবে তখন সমাজ জেল ভাঙ্গিয়া কারাক্ষেত্র রচিয়া ধানের চাষ করিবে। যুগযুগান্তর ধরিয়া কাব্য ও সাহিত্যের চর্চার ফলে যদি সমাজে সে প্রেম ও শক্তির আবির্ভাব না হয়, তাহা হইলে মানব-সাধনা নিষ্ফল। মানবহীন ধরায় কত ফুল ফুটিবে, ঝরিবে, আবার ফুটিবে আবার ঝরিবে, ক্ষিপ্ত স্রোতস্বিনী নীরবে কুল কুল গানে সাগর-সন্ধানে ছুটিয়া চলিবে। অত মানুষ, অত হাইকোর্টের দরকার কি? তাই এই প্রেমময়ী সাধ্বী চিত্রকর তাঁহার হৃদয়ের প্রেমস্রোতের বাঁধ ভাঙ্গিয়া এই চিত্রে ডুবাইয়া দিয়াছেন। বালকের উদাস দৃষ্টিতে মানুষের সকল জ.ম ও সকল সাধনার প্রতি অব্যক্ত ধিক্কারের ভাব কেমন চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৫ম চিত্র।—পিতৃমাতৃহীন। এর ব্যাখ্যা আর কি করিব! আমিও যে উহাদেরই দলভুক্ত। হয় মাসের মাতাপিতৃ মাতৃহারাকে উপুড় [illegible] আবার

চলিয়া গিয়াছিলেন। কথা ফুটিতে না ফুটিতেই পিতাও ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতামাতার নির্ম্মল প্রেম আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই-- তাই মা আমার আজ বিশ্বময়ী, পিতা আমার বিশ্বময়। তাই যার কেউ নাই, তার কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা হয়। যেখানে দুঃখ, যেখানে ক্রন্দন, যেখানে চোখের জল, সেই দিকেই প্রাণ যায়। কি চমৎকার চিত্র! ছেলে দুটির মুখের দিকে চাহিলে হৃদয়ের সব রক্ত যেন চোখ দিয়া বাহির হইতে চায়। এমন করিয়া কাঁদাইতে না জানিলে কি আর জাতি গড়া যায়? ইংরাজ-চিত্রকরের তুলিকার এই শক্তিবলে ইংরাজ আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি।

চোখের জলের স্রোত একবার বহিলে গর্ব্বের বাঁধ, জাতি-দ্বেষের বাঁধ, ধর্ম্মমতের বাঁধ চূর্ণ হইয়া স্রোতে মিশিয়া ডুবিয়া যায়। যে সমাজ দুঃখের কাহিনীতে পরিপূর্ণ, যে সমাজের প্রত্যেক নরনারী ভবের হাটে পিতৃমাতৃ-হীনের মত সকলের দ্বারে ভিখারী, যেখানে ধনী প্রাসাদে বসিয়া কাঁদিতেছে, দরিদ্র ভাঙ্গা কুটীরে বসিয়া কাঁদিতেছে, পুরোহিত মন্দিরে বসিয়া কাঁদিতেছে, অপদার্থ পথভ্রান্ত ছেলে কাঁদিয়া মরিতেছে, শিক্ষিত জ্ঞানের বোঝা মাথায় করিয়া কাঁদিতেছে, নিরক্ষর অজ্ঞানতার তাড়নায় কাঁদিতেছে, পুরুষ নারীর অঞ্চল ধরিয়া কাঁদিতেছে, নারী পুরুষের পীড়নে কাঁদিতেছে; সেখানেই ত চিত্রকরের তুলিকায় শক্তিসঞ্চার আবশ্যক। 'নরম গরম' মধুর-মধুর জীবন আঁকিয়া, তন্দ্রাকে ঘোর নিদ্রায় পরিণত করিলে ধ্বংসের পথই আবিষ্কৃত হয়; যুগযুগান্তরের যে অপদার্থতার জন্য আজ কাঁদিয়া মরিতেছি, সেই মোহান্ধকারকেই আরও ঘনীভূত করিয়া তোলা হয়। চিত্রে প্রাণ ও শক্তি-সঞ্চার আমাদের পক্ষে যেমন আবশ্যক, এমন আর কাহারও নয়। চিত্র-শিল্পের বিজ্ঞানকে নির্ব্বাসিত করিয়া সমাজের নিজস্ব সাধনার দোহাই দিয়া আপনাদের মনগড়া পথে চলিলে চিত্রকাব্যে শক্তিসঞ্চার অসম্ভব। প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানের ভিত্তিতে দেশের সাধনার সাহায্যে চিত্রকাব্যের মন্দির গড়িয়া তুলিতে হইবে। সকল জাতি তাহাই করিয়াছে, আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে। মুক্তির অন্য পথ নাই।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বর্ম্মন্।

সম্পাদকের আত্মকাহিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

আমার প্রকৃত নামটি গোপন করিয়া এই কাহিনী উপলক্ষ্যে যে কোনও একটি ছদ্ম-নাম ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি—ধরুন আমার নাম শ্রীমনতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি একখানি মাসিক পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক—আমার কাগজখানির নামও গোপন করিয়া তৎস্থলে লিখি—"আর্য্যশক্তি"। এই কপটতাটুকু অবলম্বন করিলাম বলিয়া পাঠকবর্গের নিকট করযোড়ে ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি—কারণ অদ্য যে আত্মকাহিনীটি বিবৃত করিতে বসিয়াছি—তাহাতে আমার বুদ্ধিমত্তা, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি গুণাবলীর বিশেষ কোনও পরিচয় নাই—বরঞ্চ তদ্বিপরীত। আমার আসল নামটি শুনিলে আপনারা অনেকেই হয় ত আমাকে চিনিয়া ফেলিবেন; কারণ আমি বঙ্গ-সাহিত্যে এক জন নগণ্য ব্যক্তি নহি, এবং আমার কাগজখানিরও যথেষ্ট নাম হইয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের দুর্ভাগ্য এই যে, নাম যত হয়, টাকা কড়ি তাহার উপযুক্ত কিছুই হয় না। সম্মুখেই পূজা—প্রেসের দেনা শোধ করিতে হইবে, কাগজের দোকানেও অনেক টাকা বাকী, যে ফার্ম্ম আমাদের ছবির ব্লক প্রস্তুত করে, তাহারাও তাগাদায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। অথচ তহবিলের অবস্থা শোচনীয়। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া রঙ্গীন কাগজে এক লম্বা চৌড়া হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া কলিকাতায় অজস্র বিলি করিলাম—এবং মফস্বলেও নানা স্থানে পাঠাইয়া দিলাম। তাহাতে লিখিলাম, এ বৎসর "আর্য্যশক্তি" পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কয়েক সহস্র (ঠিক কয় সহস্র লিখিয়াছিলাম মনে নাই) অধিক ছাপাইয়াও কিছুতেই সঙ্কুলান করিতে পারিতেছি না। দামোদরের বন্যার মত হু হু করিয়া গ্রাহকসংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে—তাহাতে আর অধিকদিন যে নূতন গ্রাহকগণকে সম্পূর্ণ সেট কাগজ দিতে পারিব—এমন ভরসা নাই। অতএব যাঁহারা আর্য্য-শক্তির নূতন গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অবিলম্বে আবেদন করুন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথাটা কিন্তু সত্য নহে। নূতন গ্রাহক মোটেই হইতেছিল না, এবং "আর্য্যশক্তি"র অবিক্রীত সংখ্যাগুলি স্তূপাকার হইয়া বাড়ীতে স্থানাভাব

ঘটাইতেছিল। কিন্তু ঈদৃশ মিথ্যাভাষণে পাপ নাই। মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বলা যাইতে পারে। এরূপ আড়ম্বর করিয়া বিজ্ঞাপন না দিলে আমার কাগজ চলে না—না চলিলে আমার প্রাণ-রক্ষা হয় না; কারণ এই কাগজই আমার একমাত্র জীবিকা—এবং আমি যে একজন সৎকুলীন ব্রাহ্মণ, সে কথাটা অলীক নহে।

সপ্তাহকাল মধ্যে হাণ্ডবিলের ফল পাইতে লাগিলাম। অনেকগুলি নূতন অর্ডার আসিল—কিছু টাকা পাইলাম। দেনা কতক কতক পরিশোধ করিলাম, এবং বাকী টাকা, পূজার অবকাশে দেশভ্রমণে যাইব বলিয়া, রাখিয়া দিলাম।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন স্বদেশী আন্দোলন পূরা দমেই চলিতেছে। বঙ্গ-সাহিত্যের মরা গাঙ্গেও ভাবের বাণ ডাকিয়া উঠিয়াছে—আমিও আর্য্যশক্তিতে উদ্দীপনাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ, কবিতা, গান মাসে মাসে ছাপিয়া যাইতেছি। গোলদীঘী, বিডন-বাগান প্রভৃতি স্থানে প্রতিদিন তুমুল বক্তৃতা চলিতেছে—কয়েকটা সভায় আমিও বক্তৃতা করিয়াছি। অশ্বিনী দত্ত, বিপিন পাল প্রভৃতি জন-নায়কগণ দেশান্তরিত হইয়াছেন—আবার গুজব উঠিয়াছে—সিমলাশৈলে এক নূতন তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে—আরও কয়েক জন বিখ্যাত লোককে ডিপোর্ট করা হইবে।

পূজার সংখ্যা আর্য্যশক্তি বাহির হইয়াছে। কার্ত্তিকের কাপি প্রেসে দিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইব—আপিসে বসিয়া প্রবন্ধনির্ব্বাচন করিতেছিলাম। বেলা যখন নয়টা হইবে, সেই সময় এক জন অপরিচিত যুবক, পঞ্জাবী কামিজের উপর রেশমী চাদর ঝুলাইয়া, ছাতা-হস্তে আমার আপিসে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"আপনারই নাম মনতোষ বাবু?"

"আজ্ঞে হাঁ।"—ভাবিলাম, বোধ হয় নূতন গ্রাহক হইতে আসিয়াছে,—তিনটি টাকা পাওয়া যাইবে।

লোকটি আমায় নমস্কার করিয়া, বিনা আহ্বানেই পাশের বেঞ্চিটিতে উপবেশন করিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—"অনেক দিন থেকে আপনাকে দেখবার জন্যে উৎসুক ছিলাম। আপনি এক জন দেশবিখ্যাত লোক। আজ আমার সুপ্রভাত।"

আমি বিনয়সূচক একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলাম, "আপনার নাম কি?"

"আমি এক জন অখ্যাত অজ্ঞাত লোক। আমার নাম শুনলে ত আপনি

চিনতে পারবেন না। আমি মফস্বলে থাকি। সম্প্রতি একটু কাজে কলিকাতায় এসেছিলাম। আর্য্যশক্তিতে আপনার প্রবন্ধ পড়ে আপনার উপর বড়ই শ্রদ্ধা হয়ে গেছে। তাই ভাবলাম একবার গিয়ে আলাপ করে আসি। আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ।"

দেখিলাম, গ্রাহক হইবার গতিক নয়—একটু ক্ষুণ্ণ হইলাম, তবে তাহার স্তবে তুষ্টও হইলাম। একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিলাম—"আমি অতি সামান্য ব্যক্তি—সামান্য ক্ষমতা।"

সে বলিল—"আপনার মত আর দু চার জন 'সামান্য ব্যক্তি' বাঙ্গালাদেশে থাকলে কি আর ভাবনা ছিল? অন্য লোকে কি মনে করে জানি না, কিন্তু আমার ত বিশ্বাস--এই স্বদেশী আন্দোলনকে আর্য্যশক্তিই জাগিয়ে রেখেছে।"

আমি বলিলাম—"সাধ্যমত দেশের একটু কাজ করতে চেষ্টা করে থাকি।"

বাবুটি বলিল—"আজকাল আর্য্যশক্তিই বোধ হয় বাঙ্গালার প্রধান মাসিকপত্র?"

"আমাদের কিছু বলা শোভা পায় না তবে অনেকেই এখন এ কথা বলছেন বটে। গত সপ্তাহের বঙ্গদূত দেখেছেন?"

"না—কি লিখেছে?"

"আমাদের পূজোর সংখ্যার একটা সমালোচনা করেছে"—বলিয়া দেরাজ হইতে বঙ্গদূতখানি বাহির করিয়া বাবুটির হস্তে দিলাম। তাহাতে ঠিক ঐ কথাই ছিল—আর্য্যশক্তিই এখন বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র। তবে ও কথাটি বঙ্গদূত বলে নাই- আমি নিজেই বলিয়াছিলাম, কারণ, সমালোচনাটি আমারই স্বরচিত।

যুবক পাঠান্তে কাগজখানি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—"বাঃ—বেশ লিখেছে। ঠিকই লিখেছে। আচ্ছা মশায়, কোন্ শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে আর্য্যশক্তির বেশী প্রচার?"

আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম—"দেশের অধিকাংশ গণ্য মান্য পদস্থ লোকেই আমাদের গ্রাহক। এ দিকে বর্ম্মা থেকে আরম্ভ করে ও দিকে পেশোয়ার পর্য্যন্ত—যেখানেই বাঙ্গালী আছে—সেখানেই আর্য্যশক্তির আদর।"

বন্দীর মুক্তি

কথাটা বিলক্ষণ অতিরঞ্জিত করিয়াই বলিলাম। আমরা যে কেবল কাগজ ছাপাইয়াই বিজ্ঞাপন দিই, এমন নহে— সুযোগ পাইলেই মুখে মুখেও বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া থাকি।

লোকটি বলিল—"তা ত হবেই—তা ত হবেই। আমরাও দেখেছি কি না—আর্য্যশক্তিতে এক একটা স্বদেশী প্রবন্ধ বেরিয়েছে—আর কলেজের ছেলেরা মেতে উঠেছে।"

"হ্যাঁ—কলেজের ছেলেদের মধ্যেও আমাদের যথেষ্ট গ্রাহক। আগে তত ছিল না। স্বদেশী প্রবন্ধগুলো যে সময় থেকে বেরুতে আরম্ভ করেছে—সেই সময় থেকে কলেজের ছেলেরা খুব গ্রাহক হচ্চে।"

বাবুটি পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া বলিল—"আচ্ছা মনতোষ বাবু,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?—আর্য্যশক্তির গ্রাহক কত হয়েছে?"

একটু চিন্তার ভান করিয়া বলিলাম—"ঠিক মনে নেই।"

"দশ হাজারের বেশী হবে বোধ হয়?"

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া, যেন মনে মনে কত হিসাব করিতেছি, এরূপ ভাবটা দেখাইয়া বলিলাম—"না—দশ হাজার এখনও উঠেনি।"

বাস্তবিকই উঠে নাই। অর্দ্ধেকও উঠে নাই। সিকি উঠিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু কেন জানি না, বাবুটি ধরিয়া লইল, দশ হাজার পুরিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। বলিল—"উঃ—ন হাজারের উপর গ্রাহক। বোধ হয় বাঙ্গালা আর কোনও মাসিকপত্রের গ্রাহক ন হাজার উঠেনি?"

একটু ঔদাসীন্যের হাসি হাসিয়া বলিলাম—"অর্দ্ধেকও নয়।"

লোকটি তখন ধীরে ধীরে পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিল। একটু কাসিয়া, একটু হাসিয়া, সঙ্কোচের সহিত বলিল—"আমি দুটি স্বদেশী প্রবন্ধ লিখেছি। এ দুটি—আর্য্যশক্তিতে ছাপাবার মত হবে কি?"—বলিয়া কাগজগুলি আমার সম্মুখে রাখিয়া দিল।

আমি মনে মনে হাসিয়া ভাবিলাম—"ভাই বল!—তোমার উদ্দেশ্যটা এতক্ষণে বোঝা গেল। এত আবড়াগেছে না করে প্রথমে সোজাসুজি বল্লেই হত। তোমার এ প্রবন্ধ যদি রাবিশ হয়, তুমি আমায় ক্ষণজন্মা পুরুষ বলেছ বলেই কি আমি এ ছাপব?" প্রবন্ধ দুইটি তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম, শেষে স্বাক্ষর রহিয়াছে—শ্রীরসিকমোহন সেনগুপ্ত।

বলিলাম—"আচ্ছা, রেখে যান, সময় মত পড়ে দেখ্‌ব। যদি ছাপাবার উপযুক্ত হয়, তবে অবশ্যই ছাপা হবে।"

"কার্ত্তিকে বেরুবে কি?—অবশ্য যদি মনোনীত হয়?"

"কার্ত্তিকে?—কার্ত্তিকের কাপি ত একরকম ঠিকই হয়ে গেছে। অগ্রহায়ণের আগে আর—"

লোকটি দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। বলিল—"আচ্ছা, দেখবেন। না হয় অগ্রহায়ণেই দেবেন। আজ আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বাস্তবিকই বড় আনন্দ হল, মনতোষ বাবু। আপনার অনেকক্ষণ সময় নষ্ট করে দিলাম, কিছু মনে করবেন না। এখন তবে আসি—নমস্কার।"

"নমস্কার"—বলিয়া আমি চেয়ার ছাড়িয়া দুই ইঞ্চি পরিমাণ উঠিয়া আবার বসিলাম।

লোকটিও দ্বারের বাহির হইল—তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল, আমার সহকারী সম্পাদক অবিনাশ। পূজা-সংখ্যায় একটা ইংরাজী সমালোচনা লিখিয়া তাহা প্রকাশের জন্য অবিনাশকে একটি দৈনিক সংবাদপত্রের আপিসে পাঠাইয়াছিলাম। প্রবেশমাত্র তাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হল হে?"

অবিনাশ বলিল,—"কাল সকালে বেরুবে। আমি নিজে বসে থেকে কম্পোজ করিয়ে প্রুফ্ দেখে দিয়ে এসেছি। ও লোকটা কেন এসেছিল?"

"রসিক বাবু?"

"ওর নাম কি রসিক বাবু নাকি? আপনাকে তাই বলেছে বুঝি?"

"না, মুখে বলেনি, নিজের লেখা বলে এই ছুটো প্রবন্ধ দিয়ে গেছে—নীচে সই রয়েছে শ্রীরসিকমোহন সেন গুপ্ত।"

অবিনাশ উত্তেজিতস্বরে বলিল—"ওর মাথা! ওর চৌদ্দপুরুষেও কারু নাম রসিকমোহন সেন গুপ্ত নয়।"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তবে ও কে?"

"ডিটেক্‌টিব। ওর নাম ভূপতি রায়।"

ভীত হইয়া বলিলাম—"ডিটেক্‌টিব, বল কি? বোধ হয় ভুল করছ।"

অবিনাশ [illegible]রের সহিত বলিল—"হ্যাঁ, ও ডিটেক্‌টিব। আমি ওকে চিনি। [illegible]শ দিন ওকে আমি লালবাজারে দেখেছি। কি বলে?"

শুনিয়া আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম; একে এই নূতন

তালিকার গুজব—তাহার উপর কতকগুলা অযথা মিথ্যা কথা বলিয়া আর্য্যশক্তির প্রতিপত্তি সম্বন্ধে উহার মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিলাম। ও এখন তাহারও উপর পুলিসোচিত রঙ্গ চড়াইয়া কি ভীষণ রিপোর্টই যে দাখিল করিবে, তাহা ভাবিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

অবিনাশ আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। বেঞ্চিতে বসিয়া বলিল—"কি সব কথাবার্ত্তা হল, আমায় বলুন দেখি।"

যত দূর স্মরণ করিতে পারিলাম—সমস্ত কথা অবিনাশের নিকট ব্যক্ত করিলাম। শুনিয়া সে গালে হাতে বসিয়া রহিল। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল - "কাযটা ভাল হয় নি। যে দিন সময়।" টেবিল হইতে সেই কাগজগুলা উঠাইয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিল।

কিয়ংক্ষণ প্রবন্ধ দুইটি নীরবে পাঠ করিয়া শেষে বলিয়া উঠিল—"দেখেছেন পাজির চালাকি ?"

"কি ?"

"আরে সর্ব্বনাশ !—এর নাম কি প্রবন্ধ ? এ যে একবারে আগুন ! এই ছাপাইলেই হয়েছে আর কি ! সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়ি।"

"বল কি !"

"শুনুন না।"—বলিয়া প্রবন্ধদ্বয়ের কয়েকটা স্থান পড়িয়া আমায় শুনাইল।

আমি বলিলাম—"সর্ব্বনাশ ! বোধ হয় আমাদের ফাঁসাবার মৎলবেই প্রবন্ধ দুটো রেখে গেছে। দাও ছিঁড়ে ফেলি।"—বলিয়া প্রবন্ধ দুইটি আমি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ওয়েষ্টপেপার-বাস্কেটে ফেলিয়া দিলাম।

অবিনাশ বলিল—"এ বেরুলে সদ্য সদ্য আমাদের বিরুদ্ধে ১২৪ ক—আর পাঁচটি বছর করে শ্রীঘর। ওগুলো শুধু ছিঁড়ে ফেল্লে চলবে না। একবারে উনুনে ফেলে দিয়ে আসুন। কি জানি, যদি আমাদের আপিস্ খানাতল্লাসী করায়—ঐ টুকরোগুলো নিয়ে গিয়ে যোড়া দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বিষম প্রমাণস্বরূপ দাঁড় করাবে।"

আমি বলিলাম—"ঠিক বলেছ অবিনাশ ! তাই বোধ হয় সে রাস্কেলের মৎলব।"—বলিয়া ছিন্নাংশগুলি সাবধানে সংগ্রহ করিয়া লইয়া, অন্তঃপুরে গিয়া সেগুলি জলন্ত চুল্লীতে নিক্ষেপ করিলাম।

স্নান করিয়া, পূজা আহ্নিক সারিয়া জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়া দেখি, অবিনাশ বসিয়া মাথা গুঁজিয়া একমনে কি লিখিয়া যাইতেছে।

চারি পাঁচ তক্তা লিখিয়া টেবিলের উপর ছড়াইয়া রাখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হচ্ছে কি ?"

"একটা প্রবন্ধ লিখছি।"

"কি প্রবন্ধ ?"—বলিয়া লেখা কাগজগুলি উঠাইয়া পাঠ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, অবিনাশ ইংরাজ গভর্মেণ্টের অসাধারণ ন্যায়পরতা, অপার সদাশয়তা, আদর্শ প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশির ব্যাখ্যা করিয়া দীর্ঘচ্ছন্দে একটি পরম রমণীয় স্তব রচনা করিয়াছে। যে সকল অপরিণামদর্শী অজ্ঞলোক ঈদৃশ মহানুভব পিতৃমাতৃতুল্য গভর্মেণ্টের বিপক্ষতাচরণ করিতেছে, তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি গালি দিয়াছে। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমি মনে মনে হাসিলাম। বুঝিলাম, সেই ডিটেক্‌টিভের কৌশল বিফল করিবার জন্য এটি অবিনাশের উল্‌টা চাল।—প্রবন্ধ শেষ করিয়া কাগজগুলি গুছাইয়া, কোণ ফুঁড়িয়া সূতা গাঁথিয়া বলিল,—"লিখে দিন—'মনোনীত—কার্ত্তিকের জন্য'—লিখে সই করে দিন।"

আমি তাহাই লিখিয়া সহি করিয়া দিলাম। অবিনাশ আমার বুদ্ধি-বল—অবিনাশ আমার দক্ষিণ হস্ত। প্রবন্ধটি দেরাজের মধ্যে রাখিয়া অবিনাশ বলিল—"বেলা হয়েছে, এখন তবে বাড়ী চল্লাম। স্নানাহার করিগে।"

আমি বলিলাম, "ওহে এক কায করনা। আজ এইখানেই স্নানাহার কর। কি জানি যদি পুলিস টুলিস এসে পড়ে, তুমি থাকলে তবু অনেকটা ভরসা হয়।"

অবিনাশ আমতা আমতা করিয়া বলিল, "আজ ত আমার থাকবার যো নেই, মনতোষ বাবু! বাড়ীতে এক জন কুটুম এসেছেন। আমি না গেলে—"

আমি বলিলাম "আচ্ছা, তা যাও, কিন্তু আজ ওবেলা একটু সকালে সকালে এস।"

"তা আসব" বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

অবিনাশ সেই যে গেল—আর তিনদিন ধরিয়া তাহার টিকিটিও দেখিতে পাইলাম না। এ তিনদিন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কাটাইলাম। পত্রভি পতত্রে বিচলতি পত্রে—মনে হয় ঐ বুঝি পুলিস আসিল। গলির মোড়ে লাল পাগড়ি দেখিলেই কাঁপিয়া উঠি

আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, জেলকে আমার এত ভয় কেন? কেন তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ জেলে ধর্ম্মবিচার নাই, জাতিবিচার নাই। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জলগ্রহণ করি না। জেলে আমি সন্ধ্যা-আহ্নিক করিবার জন্য কুশাসনই বা পাইব কোথায়, একটু গঙ্গাজলই বা পাইব কোথায়? আমি যাহার তাহার হাতে খাই না। এক, বাড়ীর লোক, কিংবা সুপরিচিত ব্যক্তি, যে নিঃসন্দিগ্ধভাবে ব্রাহ্মণ, তাহারই হাতে খাই। জেলে ত সে আব্দারটি আমার খাটিবে না; দ্বিতীয় কারণ—বিধবা হইতে আমার ব্রাহ্মণীর ঘোরতর আপত্তি। দীর্ঘকাল কারাদণ্ড হইলে, আমি জীবিত অবস্থায় জেল হইতে যে বাহির হইব না, ইহা নিশ্চয়। আমার বয়স হইয়াছে, স্বাস্থ্যও তেমন ভাল নহে। জেলের অন্ন খাইয়া আমি কয়দিন বাঁচিব বলুন? আমি মরিয়া গেলে, আমার ব্রাহ্মণীর দশাই বা কি হইবে, আর আমার নাবালক পুত্রকন্যাগণই বা কোথায় দাঁড়াইবে? এই দুইটি বাধার জন্য জেলে যাওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা,—নচেৎ আমার মনে যে একটা অহেতুকী জেলভীতি আছে, তাহা আমি স্বীকার করি না। ইহা হীন ভয় নহে—সুদূরদর্শিত পরিণামদর্শিতা।

যাহা হউক, রাম রাম বলিয়া ত তিন দিন কাটিয়া গেল, কোনও বিপদ ঘটিল না। খানাতল্লাসী হইবার হইলে এতদিন হইত। মনে কতকটা ভরসা পাইলাম।

চতুর্থ দিনে অবিনাশ আসিলে বলিলাম,—"কি হে, কদিন ছিলে কোথা? আসনি যে?"

অবিনাশ বলিল,—"আজ্ঞে বাড়ীতেই ছিলাম। খানাতল্লাসী টল্লাসী কিছু হয় নি ত?"

"না। সেই ভয়ে আসতে না বুঝি?"

"আজ্ঞে, ভয়ে নয়, ভবিষ্যৎ ভেবেই আসিনি। ধরুন, যদি পুলিস আসত, আর আপনাকে আমাকে দুজনকেই ধ'রে নিয়ে যেত, তা হলে আর্য্যশক্তির দশা কি হত, বলুন দেখি? কাগজখানি বন্ধ হ'য়ে যেত, আপনার এত বড় একটা কীর্ত্তি লোপ হ'ত, বঙ্গসাহিত্যের 'সমূহ' ক্ষতি হ'ত।"

পরিণামদর্শিতা বিষয়ে অবিনাশ আমার উপযুক্ত শিষ্য। "আর্য্যশক্তি"র প্রতি অবিনাশের অসাধারণ টান। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে কাগজের প্রতি একটু কম এবং আমার প্রতি তাহার একটু বেশী টান দেখিলেই যেন মনটা খুসী হইত।

অবিনাশ মুখখানা হাঁড়ি করিয়া বলিল,—"আবার ত একটা গুজব শুনে এলেম।"

"আবার কি শুনলে?"

"নূতন তালিকায় সাহিত্যবিভাগ থেকে তিনটে নমিনেশন যাচ্ছে। এক-জন বড় কবি, এক জন বড় মাসিকসম্পাদক, আর এক জন বড় দৈনিক সম্পাদককে ডিপোর্ট করা হবে। শেষের নামটি সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে স্থির হয়ে গেছে, কিন্তু এ দেশে সব চেয়ে বড় কবি কে, এবং সব চেয়ে প্রধান মাসিকপত্র কোন্‌টি, এই নিয়ে কাউন্সিলে মতভেদ উপস্থিত হয়েছে—বাদানুবাদ চলছে।"

আমি বলিলাম—"তাতে আর আমাদের ভয় কি? ধরে ত কেদার মিত্তিরকে ধরবে। ওদের আকারও আমাদের চেয়ে বড়, ছবিও আমাদের চেয়ে বেশী ছাপে, গ্রাহকসংখ্যাও অনেক বেশী—প্রায় আমাদের ডবল। কেদার মিত্তিরের 'ধূমকেতু'র কাছে কি আমাদের 'আর্য্যশক্তি?' আমাদের 'আর্য্যশক্তি'কে কেই বা পোঁছে?"

অবিনাশ গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"সে ত ঠিক কথাই—কিন্তু আমরা যে ঢাক পিটিয়ে বেড়িয়েছি কি না যে, আমাদেরই গ্রাহক সব চেয়ে বেশী,—প্রতিপত্তি সব চেয়ে বেশী; এটা কতকটা আসামীর স্বীকারোক্তি গোছ হয়ে পড়েছে, বুঝছেন না?"

শুনিয়া আমার বুকের ভিতরটা গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। কিন্তু মৌখিক সাহস দেখাইয়া বলিলাম—"বিজ্ঞাপনের কথা ছেড়ে দাও। বিজ্ঞাপনে কে কি না লেখে? এই তুমি যে তোমার কেতাবের বিজ্ঞাপনে ছাপাচ্ছ—বিষবৃক্ষের পর এমন উপন্যাস আর প্রকাশিত হয় নাই,—লোকে ভুলছে? কেউ ত কিনছে না। গবর্মেণ্ট কি আর এমনই নির্ব্বোধ যে, বিজ্ঞাপন দেখে ভুলে যাবে?—কই বাংলা কেদার মিত্তিরকে ছেড়ে চুনোপুঁটি আমাকে ধরবে?"

"শুধু ত বিজ্ঞাপনে নয়, আপনি ভূপতি রায়কেও ত ঐ রকম সব কথা বলেছেন কি না!"

আমি মনের ভাব মনে চাপিয়া বলিলাম,—"হ্যাঃ, ভূপতি রায় ত ভারি একটা লোক—তার কথা অমনি গভর্মেণ্ট শুনলে আর কি! তার রিপোর্টের যদি কোনও তেজ থাকৃত—তা হলে সেই দিনই আমাদের আপিস খানাতল্লাসী হত না?"

অবিনাশ সংশয়ের স্বরে বলিল—"তা বটে।"

কাজকর্ম্ম যাহা ছিল, তাহা করিয়া অবিনাশ বেলা দশটার সময় বাড়ী গেল। অন্যদিন বিকালে তিনটার সময় আসে—এদিন আর আসিল না। তাহার এই অনিয়ম দেখিয়া আমি মনে মনে একটু বিরক্ত হইলাম।

সন্ধ্যাবেলা অবিনাশ আসিয়া বলিল—"না—কোনও ভয়ের কারণ নেই। আপনি নিশ্চিন্ত হোন্।"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, নূতন কিছু শুনলে নাকি?"

অবিনাশ বলিল—"শ্যামবাজারে বেণীমাধব বাবু থাকেন, জানেন ত?" বড় বাবু—পাঁচশো টাকা মাইনে পান। আপনার যদি ডিপোর্টেসনই স্থির হয়ে থাকে, তবে আর কেউ জান্‌তে পারবার আগে তিনি জান্‌তে পারবেন। তাই মনে করলাম—যাই, গিয়ে কৌশলে সংবাদটা নিই।"

"তোমার সঙ্গে আলাপ ছিল?"

"আজ্ঞে না। আলাপ থাকলে ত অসুবিধেই হত। কৌশলে কথা বের করে নেবার মতলবে গিয়েছিলাম কি না। দেখলাম—তিনি কখনও আপনার নামও শোনেননি—আর্য্যশক্তি বলে যে একখানি কাগজ আছে, তাও জানেন না। যদি, আমরা যা ভয় করছি, তাই হত, তা হলে এতদিন এ সম্বন্ধে কত চিঠিপত্র, কত মন্তব্য ওঁর হাত দিয়ে যেত—আপনার নাম, আর্য্যশক্তির নাম বেশ ভালরকমই জানতে পারতেন।"

কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলাম—"কি—কি—কি? বল—বল—বলত?"

অবিনাশ তখন আরম্ভ করিল—"বাবুটির কাছে গিয়ে আমি বল্লাম—'আমাকে মনতোষ বাবু আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।'—তিনি বল্লেন—'কোন্ মনতোষ বাবু?' আমি বল্লাম, 'যাঁর আর্য্যশক্তি।' তিনি বল্লেন—'পেটেণ্ট ওষুধ বুঝি? তা আমার বাপু পেটেণ্ট ওষুদ কমুদে তেমন বিশ্বাস নেই।' আমি বল্লাম—'না, পেটেণ্ট ওষুধ নয়—আর্য্যশক্তি মাসিক পত্রিকা।' তিনি বল্লেন—'মাসিক পত্রিকা?—না, আমারই ভুল হয়েছে। সে ওষুধটার নাম আর্য্যশক্তি নয়—শক্তিচূর্ণ। তা, প্রেমতোষ বাবু কি বলেছেন?' আমি বল্লাম—'প্রেমতোষ বাবু নয়—মনতোষ বাবু। তিনিই আর্য্যশক্তির সম্পাদক। তিনি আপনাকে এই কথা বলে পাঠালেন—আপনি হচ্চেন আপিসের বড় বাবু—যদি আপনাদের আপিসে আর্য্যশক্তির গোটাকতক গ্রাহক করে দেন, তবে বড় উপকার হয়। আর

আপনি নিজেও যদি গ্রাহক হন।' বাবুটি বল্লেন—'আমি একখানা মাসিক-পত্র নিই যে। তার নামটা কি ভাল—হ্যাঁ, ধূমকেতু। তা বাপু, সেইখানাই পড়ে উঠবার সময় পাইনে—আবার নতুন মাসিকপত্র নিয়ে কি ক'রব বল! আর আমার আপিসের বাবুদের সম্বন্ধে আমার বলাটা ভাল দেখায় কি? তার চেয়ে বরং বেলা ছুটোর সময় বাবুরা যখন টিফিনঘরে তামাক খেতে নামে, সেই সময় সেইখানে গিয়ে তুমিই তাদের ধর—কিছু ফল হতে পারে।' আমি বল্লাম—'যে আজ্ঞে—নমস্কার।' বলে চলে এলাম।"

শুনিয়া বুকটা একেবারে হাল্কা হইয়া গেল। তাহার বুদ্ধিকৌশলকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। এত খুসী হইলাম, আজ যদি অবিনাশ অবিবাহিত থাকিত—আমি তাহাকে নিজ জামাতা করিবার প্রস্তাব করিতাম। সে উপায় না থাকায়, রাত্রে খাইবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম—এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পোলাও রাঁধাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিলাম।

বসিয়া বসিয়া দুই জনে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। পশ্চিম-ভ্রমণ সম্বন্ধে তাহার সাহায্যে একটি প্রোগ্রাম স্থির করিলাম। দেখিলাম, তাহারও ইচ্ছাটা—আমার সঙ্গে যায়। বলিলাম—"তুমিও যাবে?"

সে বলিল,—"যাবার ত খুবই ইচ্ছে। কিন্তু অনেক টাকা খরচ যে! হাতে কিছু নেই।"

আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম—"কুছ্ পরোয়া নেই। খরচ আমার; তুমি চল।"

পরদিন বেলাবেলি আমরা যাত্রা করিব, স্থির হইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যাত্রা করিবার সময় ছোট খুকী হাঁচিল। আমি আবার বসিয়া, নিঃশেষিত হুঁকাটি মুখে দিয়া টানিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণী বলিলেন—"ও কিছু নয়—সর্দ্দির হাঁচি।"

আপিসের সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। জিনিসপত্র উঠিয়াছে। আমি আবার যাত্রা করিয়া বাহির হইলাম। সিঁড়ি নামিবার সময় ছাতার বাঁটটা গেল কপাটের আংটায় আটকাইয়া!

আবার ফিরিয়া গিয়া বসিলাম। এক গেলাস জল খাইলাম। দুইটি পান মুখে দিলাম। দিয়া, দুর্গা দুর্গা বলিয়া বাহির হইয়া, গাড়ীতে চড়িলাম আমার পাচক চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বৃহৎ এক ক্যাম্বিশের ব্যাগ হাতে করিয়া কোচ-

যান্তে গিয়া বসিল। সে আমার সঙ্গে যাইবে। অবিনাশ বাড়ী হইতে সোজা ষ্টেশনে গিয়া যুটিবে, পরামর্শ ছিল।

টিকিট পূর্ব্বেই কেনা ছিল। মধ্যম শ্রেণীতে গিয়া আরোহণ করিলাম। অবিনাশ উপরের বঙ্কে উঠিয়া নিদ্রার আয়োজন করিল। আমি নীচের বেঞ্চিতে ম্লানমুখে বসিয়া রহিলাম।

মনটা বড় ভাল ছিল না। এক ত, গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে হইলেই বাঙ্গালীর মন খারাপ হইয়া যায়। তাহার উপর যাত্রাকালে দুই দুই বার বাধা পড়িল। ভাবিতে লাগিলাম—কি অদৃষ্টে আছে, ভগবান জানেন। হয় ত নূতন তালিকায় আমার নাম উঠিয়াছে—সেই বিদেশ হইতেই ছোঁ মারিয়া আমায় তুলিয়া লইয়া যাইবে। বেণীমাধব বাবু হয় ত অবিনাশের সঙ্গে ছলনা করিয়াছেন—আমার ও আমার কাগজ সম্বন্ধে যে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন—তাহা অভিনয়মাত্র। কিংবা হয় ত বড়সাহেব স্বয়ং স্বহস্তে গোপনে এ সকল বিষয় লেখালিখি করিতেছেন—বড় বাবুকে জানিতে দেন নাই। তাহাই যদি না হইবে, তবে খুকীই বা হাঁচিবে কেন—এবং ছাতাই বা আটকাইয়া যাইবে কেন?

ভাবিয়া আর ফল কি? অদৃষ্ট ছাড়া ত পথ নাই—অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে। এই বলিয়া মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু দুশ্চিন্তা কিছুতেই ছাড়িল না।

পরদিন প্রাতে গয়ায় নামিলাম। সেখানে দুই দিন থাকিয়া পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। এলাহাবাদে বেণীঘাটে স্নান করিয়া, অক্ষয়বট দেখিয়া, সহর প্রদক্ষিণ করিয়া, তৃতীয় দিন দ্বিপ্রহরে পঞ্জাব মেলে কাণপুর যাত্রা করিলাম—কাণপুরে দুই দিন থাকিয়া আগ্রায় যাইব। এলাহাবাদে এক জন আমায় আগ্রার তোতারামের হোটেলের কথা বলিয়া দিয়াছিল। ছাড়িবার পূর্ব্বে কলিকাতায় আমার ম্যানেজারকে লিখিয়া দিলাম—জরুরী চিঠিপত্র যেন তোতারামের হোটেলের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেয়,—সেখানে তিন চারি দিন অবস্থান করিব।

কাণপুর দেখিয়া বিকালের মেলে আগ্রা যাত্রা করিলাম। টুণ্ডলায় গাড়ী বদল করিয়া রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আগ্রাফোর্ট ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তোতারামের হোটেল খুঁজিয়া লইতে কোনও কষ্ট হইল না—তাহাদের লোক গাড়ীর সময় ষ্টেশনেই দাঁড়াইয়া থাকে।

তোতারামের দুইটি বাড়ী আছে—একটি একতালা, অপরটি দ্বিতল। একতালা বাড়ীতে দৈনিক এক টাকা করিয়া ভাড়া, প্রতি কামরায় দুই তিন জন যাত্রীর স্থান। দ্বিতল বাড়ীতে একটি করিয়া স্বতন্ত্র কামরা পাওয়া যায়, দৈনিক ভাড়া দুই টাকা করিয়া, উপরেই কল পাইখানা আছে, স্বতন্ত্র ভাবে রন্ধনের স্থান আছে। আমরা সেই দ্বিতল বাড়ীটিতে গিয়াই উঠিলাম।

পরদিন প্রাতে বাহির হইয়া সহর ও জুম্মা মস্‌জিদ্ দেখিলাম। দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর ফোর্ট দেখিবার ইচ্ছা ছিল। শুনিলাম, স্বদেশী হইয়া অবধি বাঙ্গালীকে আর সহজে ফোর্ট দেখিবার পাস দেয় না। তথাপি গাইড্ বলিল, একটা দরখাস্ত লিখিয়া দিন—আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

চেষ্টা করিতে করিতে বেলা চারিটা বাজিয়া গেল—পাস মিলিল না। দিনটা বৃথাই গেল।

পরদিন আহারের পূর্ব্বে তাজ ও এৎমাদুদ্দৌলা এবং অপরাহ্নে সিকান্দ্রা দেখিবার পরামর্শ করা গেল। তৎপরদিন এক্কা করিয়া ফতেপুরশিক্রী যাওয়া যাইবে।

যথাপরামর্শ, বেলা সাতটার পর ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া তাজ দেখিতে বাহির হইলাম।

ফটকের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বাগানের ভিতর কিছু দূরে এক জন বাঙ্গালী বাবু বেড়াইতেছে। আমাদের দেখিয়া লোকটা দাঁড়াইল—আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমরা ধীরে ধীরে তাজমহলের দিকে অগ্রসর হইলাম। সে লোকটিও, যেখানে ছিল, সেখান হইতে বাগানে বাগানেই অগ্রসর হইয়া, তাজের পাদদেশে আমাদের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম, তাহার বয়স অনুমান পঞ্চ-ত্রিংশৎ বর্ষ, দীর্ঘাকার, হস্তপদাদির অস্থিগুলি সুপুষ্ট, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত। চোখে সোণার চশমা, মোটা মোটা গোঁফ, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। তাহাকে দেখিয়াই পুলিসের লোক বলিয়া আমার ধারণা জন্মিল।

কিন্তু সে আমাদের কিছু বলিল না। একটু যেন মনোযোগের সহিতই আমায় দেখিতে লাগিল—অবিনাশের প্রতি দৃক্‌পাত করিল না।

আমরা জুতা খুলিয়া উপরে উঠিলাম। দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। সে লোকটিও প্রায়ই আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিল।

উপরে সকল, নিম্নে আসল সমাধি দর্শন করিয়া, ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগি-

লাম। পশ্চাতের একটা মিনারেটের পাদদেশে পৌঁছিয়া, লোকটিকে আর দেখিতে পাইলাম না। অবিনাশের হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে টানিয়া লইলাম—বলিলাম, "এস, উপরে উঠি।"

বহু পরিশ্রমে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিলাম। তথাকার বিশুদ্ধ মৃদু বায়ু বড় মধুর লাগিতে লাগিল। বসিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম—সে লোকটিকে কোথাও দেখিলাম না।

বায়ুসেবনে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইবার পর অবিনাশকে বলিলাম—"কে হে লোকটা আমাদের পানে কট্‌মট্‌ করে চাইতে লাগল?"

অবিনাশ গম্ভীরভাবে বলিল—"পুলিসের লোক।"

"কি করে জানলে?"

"ওর কপালে, চুলের ঠিক আধ ইঞ্চি নীচে—একটা গোল লাল দাগ দেখেছেন?"

"না—আমি অত লক্ষ্য করিনি।"

"আমি করেছি। পুলিস-ক্যাপের দাগ। ওদের সরকারী টুপীগুলো ভারি টাইট্‌ হয় কি না।"

শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। একটু পরে বলিলাম—"আমাকেই ধরতে এসেছে না কি?"

"হতে পারে—নাও হতে পারে। পুলিসের লোক কি আর পশ্চিমে বেড়াতে আসে না?—তাজমহল দেখে না?"

আমি মনকে বুঝাইবার ছলে বলিলাম—"বেড়াতেই এসেছে বোধ হয়—কি বল অবিনাশ?"

সে গম্ভীরভাবে বলিল—"আশ্চর্য্য কি!"

সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম—লোকটা আবার বাগানে গিয়াছে। অবিনাশের গা টিপিয়া ইসারা করিয়া তাহাকে দেখাইলাম।

লোকটা এক স্থানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাজমহলের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে দৃষ্টি আরও ঊর্দ্ধে তুলিয়া, একে একে মিনারেটের মস্তকগুলি দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে, পকেট হইতে বাইনকুলার দূরবীণ বাহির করিয়া আমাদের প্রতিই লক্ষ্যস্থাপন করিল।

তাহার এই আচরণে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। অবিনাশ বলিল—"গতিক ভাল নয়।"

পতিক যে ভাল হইবে না - যখন খুকী হাঁচিয়াছিল, আমি তখনই জানিতে পারিয়াছিলাম!

"কি করা যায় হে?"—বলিয়া আমি অবিনাশের হাত চাপিয়া ধরিলাম।

"এখানে বসে থাকি আসুন। ও লোকটা চলে গেলে তখন আমরা নামব।"

লোকটা বেশীক্ষণ রহিল না। মিনিট দশ পনেরো ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়া, ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমরা অর্দ্ধঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া নামিলাম। ফটকের বাহির হইয়া গাড়ীর নিকট গিয়া দেখি, কোচম্যান কোচবাক্সে হেলান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে জাগাইয়া, এৎমাদ যাইতে আজ্ঞা দিয়া আমি গাড়ীতে উঠিতেছি—এমন সময় দেখি, নিকটস্থ ছবির দোকান হইতে খানকতক ছবি হাতে করিয়া লোকটা বাহির হইল। গাড়ী ছুটিল। মনে মনে আশা করিতে লাগিলাম, ও বোধ হয় আমাদের দেখিতে পায় নাই।

অবিনাশকে অন্যমনস্ক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি ভাবছ হে?"

সে বলিল—"কপালে দাগ আছে বলেই যে পুলিসের লোক—এমন কিছু স্থিরতা নেই। যারা ইংরাজি কোট প্যাণ্টালুন পরে, মাথায় শক্ত হ্যাট পরে, তাদেরও কপালে ও রকম দাগ হয়ে যায়। সেই কথা আমি ভাবছিলাম।"

"তবে বাইনকুলার কবে আমাদের দেখছিল কেন?"

"আমাদের দেখছিল কি তাজমহলের শোভা দেখছিল, তাই বা কে জানে?"

"হতে পারে।"—বলিয়া আমিও গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলাম।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে এৎমাদে পৌঁছিয়া, দেখিয়া বেড়াইতেছি—এমন সময় পশ্চাতে জুতার শব্দ পাইয়া ফিরিয়া দেখিলাম—সেই মূর্ত্তি। বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। এবার লক্ষ্য করিলাম—অবিনাশ যাহা বলিয়াছে, তাহাই—কপালের উর্দ্ধদেশে একটি পরিষ্কার লাল গোল দাগ রহিয়াছে। অবিনাশের পর্য্যবেক্ষণশক্তিতে চমৎকৃত হইলাম।

সরিয়া সরিয়া লোকটার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেলাম। এৎমাদের গঠন-সৌন্দর্য্য, কারুকার্য্য, কিছুই আর ভাল লাগিল না। অবিনাশকে বলিলাম—"চল হে—বাড়ী যাই।"

"চলুন।"—বলিয়া অবিনাশ আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। যখন ফটক পার

হইতেছি, তখন একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলাম—দেখিলাম, লোকটা এৎ-মাদের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমাদের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে! গা টিপিয়া অবিনাশকে বলিলাম—"কি হে—এবার কিসের গোড়া দেখছ?"

অবিনাশ বলিল—"গতিক ভাল নয়।"

হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া স্নানাদি করিলাম। আহারে বসিলাম ঐ মাত্র। কিছুই খাইতে পারিলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আহারাদির পর অবিনাশকে বলিলাম—"ওহে সিকান্দ্রায় যাওয়া যাবে কি? লোকটা যে রকম পিছু নিয়েছে, সেখানেও যদি যায়?"

অবিনাশ বলিল—"আমাদের পিছু নিয়েছে কি দুটো জায়গায় আমরা ঘটনাক্রমে একত্র হয়ে গেছি, তার ঠিক কি? যে আগ্রা দেখতে আসে, এই সবই ত দেখে।"

"যদি আমরা সিকান্দ্রায় গিয়েও দেখি—সে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে?"

"তা হলে একটু চিন্তার কারণ বটে। সিকান্দ্রা এখান থেকে ছ মাইল দূর—সেখানেও যদি সে ঠিক আমাদের সঙ্গেই পৌঁছে যায়, তা হলে ঘটনাক্রমের থিওরিটা একটু দুর্ব্বল হয়ে পড়ে বৈ কি!"

আমি বলিলাম—"বিশেষ দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।"

যাহা হউক, বেলা আড়াইটার সময় সিকান্দ্রা যাত্রা করিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া কোথাও লোকটিকে দেখিতে পাইলাম না। হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম—শরীর অত্যন্তই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মন হইতে দুশ্চিন্তাটা কিয়ৎপরিমাণ অপসৃত হওয়াতে ক্ষুধাও বেশ চাগিয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তীকে বলিলাম—"এখন রন্ধনাদি আরম্ভ করিলে খাইতে রাত্রি দশটা বাজিয়া যাইবে। তাহার চেয়ে বাজার হইতে লুচি, কচুরী, আচার, রাবড়ী প্রভৃতি কিনিয়া আন, খাইয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়ি।"

আহারাদি শেষ করিয়া, আটটার পূর্ব্বেই শয়ন করিলাম। ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বলিতে লাগিল।

অবিনাশ ত দশ মিনিটের মধ্যেই নাসিকা-গর্জ্জন আরম্ভ করিল। ভাবিলাম—সুখী তাহারা, যাহারা বিখ্যাত নহে—যাহাদের ডিপোর্টেশনের ভয় নাই।

এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলাম—আমার আর নিদ্রা কিছুতেই আসে না। রাত্রি যখন আন্দাজ সাড়ে আটটা—তখন শুনিতে পাইলাম—বাহিরের বারান্দায় দুই জন লোক চাপা গলায় কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। "মনতোষ বাবু" নামটা কাণে যাইবামাত্র—কাণ খাড়া করিয়া রহিলাম।

কথাবার্ত্তা পূর্ব্বমত চলিতে লাগিল—কিন্তু কোনও কথা আর ধরিতে পারিলাম না। নিঃশব্দে উঠিয়া, দ্বারের কাছে গিয়া ছিদ্রপথে বাহিরে চাহিলাম। বারান্দায় বাতি জ্বলিতেছে—দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে—হোটেল-ওয়ালা এবং সে।

ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

হোটেলওয়ালা কথা কহিতে কহিতে আমার বদ্ধ দ্বারের পানে দুইবার অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল।

ঠিক অবিনাশ!—তোমার সেই ঘটনাক্রমের থিওরি এখন কোথায় গেল?

হোটেলওয়ালা বলিল—"এখন বাবুকে উঠাইব কি?"

সে বলিল—"না। কাল ভোরে আমি আসিব। আমার এখন কাজ আছে।"

"হুজুর কোথায় টিকিয়াছেন?"

"পুলিস আপিসের হেডক্লার্ক গদাধর বাবুকে জান?"

"নাম শুনিয়াছি।"

"সেইখানে আছি। দেখ—বাবুকে আমার কোনও কথা যেন বলিও না—খবর্দ্দার। বুঝিলে?"

"না হুজুর—যখন বারণ করিতেছেন, তখন বলিব কেন? আদাব।"

লোকটি চলিয়া গেল।

আমার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া অবিনাশকে উঠাইলাম। তাহাকে সকল কথা বলিলাম।

শুনিয়া সে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

ভয়স্বরে বলিলাম—"ও অবিনাশ!—কিছু বলছ না কেন? এখন উপায় কি?"

অবিনাশ সংক্ষেপে বলিল—"পালাও।—যখন সে পুলিস-হেডক্লার্কের বাড়ীতেই অতিথি—তখন নিশ্চয়ই সে কলকতার ডিটেক্টিব। ভয় কোনও কথা

যাচ্ছে—ওর কুমৎলব আছে—পাছে জান্‌তে পেরে আপনি [illegible] ভোরবেলা এসে বাড়ী ঘেরাও করবে—এই বেলা সরে পড়ুন।"

"কোথা পালাব ?"

"যেখানে হয়। এখানে থাকলে কাল সকালে এসেই ক্যাঁক্ করে ধরবে। হাওয়া গাড়ী করে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। দু দণ্ড রাত্রি থাকতে কনেষ্টবল দিয়ে বাড়ী ঘেরাও করে রাখবে।"

"পালাতে বলছ—পালিয়ে পালিয়ে কতকাল বেড়াব অবিনাশ ?"

"আপনি ত আর খুন করেন নি যে, যখনই ধরবে, তখনই ফাঁসি দেবে ? এখন যদি দু এক বছর গা ঢাকা দিয়ে থাক্‌তে পারেন—তার পর এ সব স্বদেশীর গোলমাল থেমে থুমে গেলে—আর আপনাকে ধরতে চাইবে না।"

বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—আর কোঁচার খুঁটে বারংবার চক্ষু মুছিতে লাগিলাম। এই বয়সে কোথায় পলাইয়া বেড়াইব ? খাইবই বা কি ? অবিনাশকে সেই কথা বলিলাম।

সে বলিল—"আপনি নাম ভাঁড়িয়ে আমায় চিঠি লিখবেন। আমি আর্য্যশক্তির তবিল থেকে আপনাকে টাকা পাঠিয়ে দেব—যেখানে যখন থাকবেন। তবে আপনাকে একটা কৌশল করতে হবে।"

"কি ?"

"আপনি আজ পালান—আমি কালই কলকাতায় চলে যাই। সেখানে গিয়ে আমি লোককে বলব, আপনি দিল্লী গেছেন—দু চার দিন পরে ফিরবেন। সপ্তাহ খানেক পরে, যেখানে আপনি থাকবেন, সেখান থেকে একটা কাল্পনিক প্রেরকের নাম দিয়ে আমায় একখানা টেলিগ্রাম করে দেবেন—যেন আপনার হঠাৎ কলেরায় মৃত্যু হয়েছে।"

কথাটা শুনিয়া আমার গা কাঁটা দিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাতে কি ফল হবে ?"

অবিনাশ গম্ভীরভাবে বলিল—"ফল দু রকমের আশা করছি। প্রথমতঃ—আপনি মরে গেছেন শুন্‌লে, গবর্ণমেণ্ট আপনার নামে ওয়ারেণ্ট বন্ধ করে দেবে—ধরা পড়বার ভয় আর থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ—আপনার মৃত্যু উপলক্ষে সভা টভা করে, প্রবন্ধ লিখে, বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে এইটে প্রচার করে দেব যে, আপনি কিছুই রেখে যেতে পারেন নি—আপনার অনাথা বিধবা আর অসহায় পুত্রকন্যাদের ভরণপোষণের আর কোনই উপায় নেই—আর্য্য-

শক্তির আয়ই একমাত্র সম্বল—আর্য্যশক্তির গ্রাহকসংখ্যা অন্ততঃ দ্বিগুণ না হ'লে তাহাদের উপবাস করতে হবে। এই রকম ফন্দি করে কিছু গ্রাহক বাড়িয়ে নেব।"

আমি বলিলাম,—"আয়নার দেরাজে আমার ফটোগ্রাফ আছে। বাড়ীর ভিতর থেকে চেয়ে নিয়ে, আমার জীবনচরিতের সঙ্গে সে ছবিও একখানা ছেপে দিও!"

অবিনাশের বুদ্ধি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। বলিলাম—"মরার খবর দেবে—বাড়ীর লোক যে কেঁদে কেটে অস্থির হবে?"

"গোপনে তাঁদের বলে দেব এখন। তবে লোক দেখান একটু কান্না-কাটি করতে হবে বৈ কি।"

আমি বলিলাম,—"তা যেন হল। কিন্তু বছর দুই পরে যখন আমি বেরুব—তখন লোকে কি বলবে?"

অবিনাশ বলিল,—"তখন এই সংবাদ প্রচার করা যাবে যে, কয়েকজন দুর্বৃত্তের ষড়যন্ত্রে হঠাৎ আপনি ধৃত হয়ে তিব্বতে কিংবা চীনে—ঐরকম একটা যায়গায় নীত হয়েছিলেন, এখন মুক্তি পেয়ে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। অমুক সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে আপনার এই দুই বৎসরের আত্মচরিত বেরুবে—সে কাহিনী পাঠ করে পাঠক যুগপৎ হর্ষে, ক্রোধে ও বিস্ময়ে ক্ষিপ্ত-প্রায় হয়ে উঠবেন—তা শত উপন্যাসের ঘনীভূত নির্য্যাস—এই সব বলে আরও খুব একচোট গ্রাহক বাড়িয়ে নেওয়া যাবে।"

"তার পর।"

"সে রকম একখানা উপন্যাস আমি ইতিমধ্যে রচনা করে রাখব এখন, তাই আপনার বেনামীতে মাসে মাসে ছাপা যাবে।

"তা হলে, এখন পালাবার উপায় কি?"

"উপায় বলে দিচ্ছি।"—বলিয়া অবিনাশ টাইম্‌-টেবেল বাহির করিল। লণ্ঠনটা উজ্জ্বল করিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ খুঁজিয়া টাইম্‌-টেবেলের পাতা উল্টাইয়া বলিল—"আচ্ছা, ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে পৌনে দশটার সময় একখানা প্যাসেঞ্জার ছাড়বে; সেখানা সিটি ষ্টেশনে দশটা তিন মিনিটে পৌঁছবে, উনিশ মিনিটে ছাড়বে। সিটিতে গিয়া আপনি সেই গাড়ী ধরুন। দুপুরে রাত্রি এগারোটায় পৌঁছবেন। সেখান থেকে বারোটার সময় পশ্চিম যাবার এক্‌ এক্সপ্রেস আছে। তাতে চড়ে সরে পড়ুন।"

"তার পর, কাল সকালবেলা পুলিস এলে তোমায় ত জিজ্ঞাসা করবে! তুমি কি বলবে?"

"বলব—আপনি কলকাতা চলে গেছেন। ওরা বড় বড় ষ্টেশনে আপনাকে ধরবার জন্যে টেলিগ্রাফ করে দেবে এখন। মরুক বেটারা খুঁজে!"

ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম সাড়ে নয়টা। বলিলাম—"আর ত দেরী করলে চলবে না। বেরুন যাক্ তা হলে।"—বলিয়া, আমি একটি ছোট ব্যাগে অত্যাবশ্যক দুই চারিটি জিনিস লইলাম—টাকাকড়ি কোমরে বাঁধিয়া লইলাম। বলিলাম—"তুমি জামা গায়ে দাও। আমায় তুলে দিয়ে আসবে চল।"

অবিনাশ বলিল—"আমাকেও যেতে হবে?"

কাতরস্বরে বলিলাম—"তুমি না সঙ্গে থাকলে আমি যে হাত পায়ে বল পাইনে অবিনাশ!"

অবিনাশ প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহাকে বলিলাম—"অবিনাশ, তুমি আমার ছেলে নও—কিন্তু আমার ছেলেরই মতন। তোমার উপর আমার সংসার—আমার ব্যবসা—সবই তারই রইল। দেখো, আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা যেন কোনও কষ্ট পায় না অবিনাশ!"

অবিনাশ সজলনেত্রে বলিল—"আমাকে আর অত করে বলতে হবে না। আমায় পায়ের ধূলো দিন।"—বলিয়া সে আমার পদযুগল স্পর্শ করিল। আমার চক্ষু দিয়া আবার দর দর ধারায় অশ্রু বহিল।

প্রস্তুত হইয়া দুই জনে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম—"ওহে, আমরা যে বেরুব, হোটেলওয়ালা বেটার সন্দেহ হবে না ত? আমরা পালাচ্ছি ভেবে ও যদি তাকে খবর দেয়?"

অবিনাশ বলিল—"সন্দেহ যাতে না হয়, তার উপায় আমি করছি। ব্যাগটা আমার হাতে দিন"—বলিয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। হোটেলওয়ালাকে ডাকিয়া হিন্দীতে বলিল—"ওহে, ক্ষুধায় যে নাড়ী চোঁ চোঁ করিতেছে। এই ব্যাগটায় ভরিয়া কিছু লুচীটুচী কিনিয়া আনিব ভাবিতেছি—তা এত রাত্রে খাবারের দোকান খোলা পাওয়া যাইবে কি?"

হোটেলওয়ালা বলিল—"হাঁ বাবু—পাইবেন বৈ কি।"

"আচ্ছা, যাই দু জনে গিয়া খাবার কিনিয়া আনি। তোমাদের দরজা কখন বন্ধ হয়?"

"রাত্রি এগারোটার গাড়ীতে কোনও যাত্রী আসে কি না দেখিয়া তবে আমরা দরজা বন্ধ করি।"

"আচ্ছা—তার অনেক আগেই আমরা আসিব। দেখিও বাপু—আমরা ফিরিবার পূর্ব্বে যেন দরজাটি বন্ধ করিয়া দিও না। বিদেশ বিভুঁই—বিঘোরে যেন মারা না যাই।"

"না বাবু - আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। এগারোটার আগে দরজা বন্ধ হইবে না।"

বাহির হইয়া, মোড়ে পৌঁছিয়া, একা ভাড়া করিয়া সিটি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। টিকিট কিনিয়া প্লাটফর্মে ঢুকিতেই গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। অবিনাশ বলিল—"ভয় নেই, ষোল মিনিট থামে।"

মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীটা একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। আমি অগ্রে, অবিনাশ পশ্চাতে সেই দিকে পদচালনা করিলাম। কাছাকাছি গিয়া দেখি, লণ্ঠনের নিম্নে দাঁড়াইয়া, সেই ভীষণ মূর্ত্তি! সে আমাদের দিকে কটমট করিয়া একবার চাহিয়া, নিমেষের মধ্যে আমার কাছে আসিয়া বলিল—"মাফ্ করবেন—আপনিই কি মনতোষ বাবু?"

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজ প্রভাত হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমায় ভাল করিয়াই চিনিয়া লইয়াছে। ভাবিলাম—পাছে পালাই—তাই ট্রেণের সময়েও প্লাটফর্মে পাহারা দিতেছে।

পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম—অবিনাশ অদৃশ্য। হায়, এই নরাধমকে আমি স্ত্রী পুত্র কন্যার ভার অর্পণ করিয়াছিলাম!

আমার ভাব দেখিয়া লোকটা পুনর্ব্বার বলিল—"আপনিই কি মনতোষ বাবু—আগমনীর সম্পাদক?"

আমি তাহার মুখের পানে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম—"হাঁ।"—আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল—দেহ অবশ হইয়া আসিল।

তাহার পর লোকটি কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না। চোখে অন্ধকার দেখিয়া, সংজ্ঞাশূন্য হইলাম।

জ্ঞান হইলে দেখিলাম—ওয়েটিং-রুমের টেবিলের উপর শুইয়া রহিয়াছি, আমার দেহ জলে ভিজিয়া গিয়াছে। এক দিকে অবিনাশ—অপর দিকে সেই লোকটি—দাঁড়াইয়া আমায় পাখা করিতেছে। অদূরে—ঔষধের বাক্স খুলিয়া এক ডাক্তার বসিয়া আছে।

আমি চক্ষু খুলিতেই অবিনাশ বলিল—"কেমন বোধ হচ্ছে মনতোষ বাবু? সেই কালেই আমি বলেছিলাম—আপনার শরীর দুর্ব্বল—আজ-

রাত্রে ট্রেণে উঠে কাজ নেই।—ভাগিস্ আমাদের অনাদি বাবু ছিলেন—আমাদের আর্য্যশক্তির লেখক অনাদি বাবু—আপনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন—উনি ধরে ফেল্লেন—নইলে আপনার ভারি আঘাত লাগত।"

আমার মাথা তখনও পরিষ্কার হয় নাই। ক্ষীণস্বরে বলিলাম—"কোথা অনাদি বাবু?"

"এই যে ইনি"—বলিয়া অবিনাশ তাঁহাকেই দেখাইয়া দিল—যাঁহাকে আমরা ডিটেক্‌টিব বলিয়া সারাদিন ভ্রম করিয়াছিলাম।

এইটুকু বুঝিতে পারিলাম - ভয়ের কোনও কারণ আর নাই। আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।

অনাদি বাবু আমার আর্য্যশক্তির এক জন প্রধান লেখক—ঢাকায় ওকালতী করেন—কিন্তু চাক্ষুষ আলাপের সুযোগ কখনও হয় নাই। ইনিও ছুটীতে পশ্চিম-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কলিকাতায় আমাদের আপিসে গিয়া ম্যানেজারের নিকট শুইয়াছিলেন - আমি অমুক তারিখ হইতে অমুক তারিখ পর্য্যন্ত আগরায় তোতারামের হোটেলে থাকিব। তাজে ও এৎমাদে আমাকে দেখিয়া, আমিই যে মনতোষ বাবু, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে জন্মিয়াছিল; কারণ, আমার উপহৃত একখানি ফোটোগ্রাফ তাঁহার গৃহে আছে। তথাপি সঙ্কোচবশতঃ আমায় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই। পরে তোতারামের হোটেলে গিয়া খাতায় আমার নাম ধাম দেখিয়া তিনি কৃতনিশ্চয় হন। আমি নিদ্রিত ছিলাম বলিয়াই আমায় জাগাইতে নিষেধ করেন। পরদিন হোটেলে আসিয়া আমায় একটু আশ্চর্য্য করিয়া দিবেন, এই উদ্দেশ্যে তাঁহার কথা আমার নিকট প্রকাশ করিতে হোটেলওয়ালাকে বারণ করিয়াছিলেন। পুলিস আপিসের হেডকেরাণী গঙ্গাধর বাবু তাঁহার মাতুল—তাঁহারই বাসায় অবস্থিতি করিতেছেন। ক্যান্টনমেণ্টে এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল—নিমন্ত্রণ খাইয়া সেই ট্রেণেই ফিরিয়াছিলেন। তাঁহার মাতুলের বাসা সিটি ষ্টেশনের সন্নিকটেই।

শেষবার একবার অবিনাশের বুদ্ধির প্রশংসা করি। সে আমায় খুব বাঁচাইয়া দিয়াছে—অনাদি বাবু কোনও কথা জানিতে পারেন নাই।

অনাদি বাবুকে লইয়া বড়ই আনন্দে আগারায় কয়েকদিন যাপন করা গেল। তাঁহার মাতুলের সুপারিশে কোর্ট দেখিবারও পাস পাওয়া গেল। আগ্রা হইতে মথুরা ও বৃন্দাবন, তথা হইতে দিল্লী দর্শন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

নব্য-সাহিত্যিক।

[Henri Lavedanর ফরাসি হইতে।]

দীনেশ—বয়স পঁচিশ। পরেশ—বয়স আটাশ। স্থান—দীনেশের গৃহ। কাল—সন্ধ্যা।
দীনেশ টেবিলের সুমুখে চেয়ারে আসীন।—সুমুখে একতাড়া কাগজ। পাশে একটি ল্যাম্প।

পরেশের প্রবেশ।

পরেশ। ও কি! এখনও ঐ লেখা নিয়েই রয়েছ। সকাল সন্ধ্যে তোমার কি ঐ একই কাজ?

দীনেশ। চব্বিশ ঘণ্টা।

পরেশ। ও একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। শেষটা এলে যাবে।

দীনেশ। সে সম্ভাবনা নেই।

পরেশ। কি রচনা করছ—বল দেখি?

দীনেশ। সেই লেখা, যে লেখা আমার জীবনের একমাত্র কায—মহাব্রত!

পরেশ। যার বিষয় শুধু শুনেই আসছি, কিন্তু দেখতে পাইনে।

দীনেশ। হাঁ তাই।

পরেশ। লেখাটা এগচ্চে ত?

দীনেশ। না।

পরেশ। ওটা ত অনেকদিন তোমার হাতে আছে। আর কতকাল?

দীনেশ। জৈনধর্ম্মের শেষ কথা হচ্ছে—"স্যাৎ"। ছ মাসও হতে পারে, বিশ বছরও হতে পারে।

পরেশ। বল কি?

দীনেশ। যা বলছি, তাই।

পরেশ। কি মুস্কিল! একটু হাত চালিয়ে নেও না কেন! লোকে তোমার লেখার জন্য কত প্রত্যাশা করে রয়েছে। তোমার হাতের যা হোক্ একটা কিছু চায়। তাদের বেশী দিন শুধু আশার উপর রাখা ঠিক নয়।

দীনেশ। প্রতীক্ষা করার অর্থ হচ্ছে অপেক্ষা করে থাকা।

পরেশ। অবশ্য তুমি যে দরের লেখক, তাতে তাদের অপেক্ষা করে থাকাতে কোনও লোকসান নেই। তবুও কি জান, তুমি যে খেলা খেলছ, তাতে বিপদ আছে।
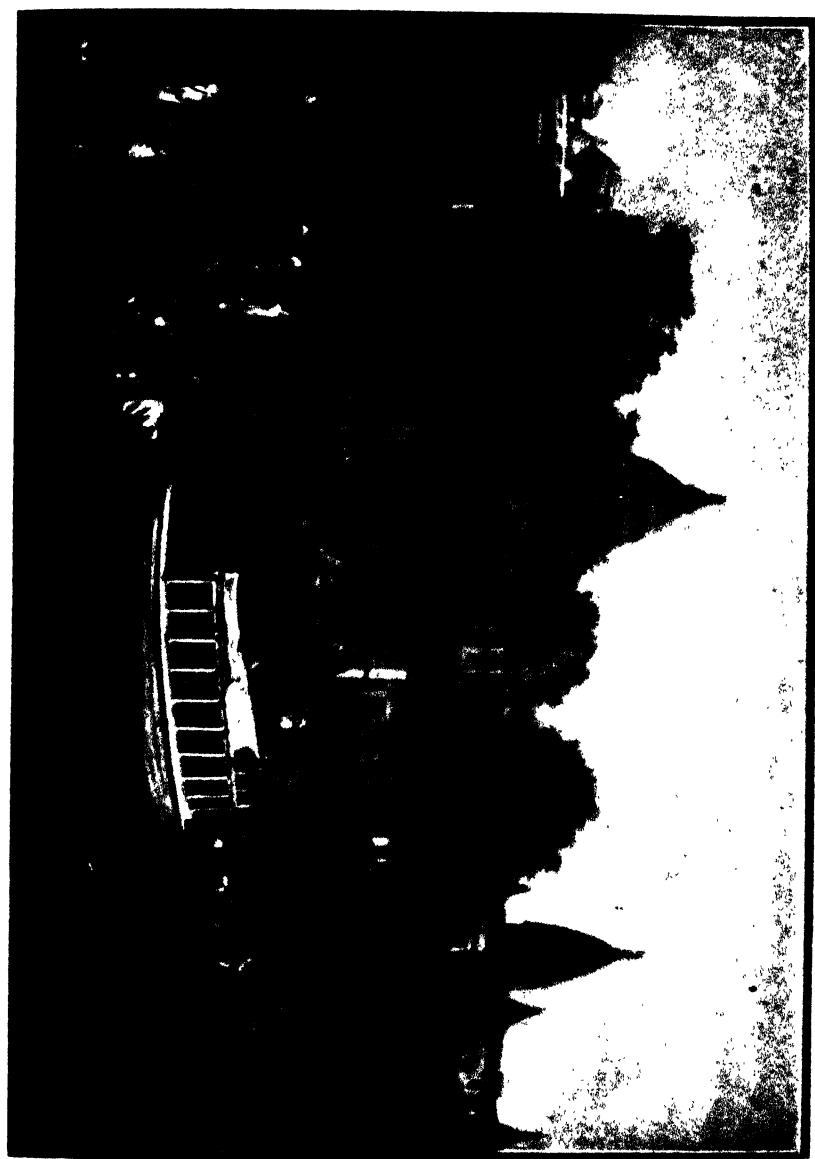
দীনেশ। জুয়ো? ঐ খেলাই ভালবাসি।

পরেশ। অবশ্য তোমার কথা তুমি ভাল বোঝ। বলি, তোমার শেষ লেখাটা কতদিন হল বেরিয়েছে?

দীনেশ। ১৯০৮।

পরেশ। পাঁচ বছর?

দীনেশ। "নবগুচ্ছ।"

পরেশ। হাঁ. আমার মনে পড়ে গেছে। অদ্ভুত লেখা। একদম প্রথম শ্রেণীর। সমগ্র প্রবন্ধটি একটি ছোট ছেলের মুঠোর ভিতর ধরে। দু খানি মাত্র পাতা, আর এক একটি পাতায় বিশটি করে ছত্র।

দীনেশ। সাহিত্যের মূল্য ওজনদর নয়।

পরেশ। তা ত নিশ্চয়ই। ও লেখাটা সাহিত্যসমাজে মহা তোলপাড় ঘটিয়েছিল। সে যাই হোক, তোমার 'নবগুচ্ছ' যে নূতন গোছের হয়েছিল তার আর সন্দেহ নেই।

দীনেশ: আমার বিশ্বাসও তাই। ওতেই "গুঞ্জামালা" পত্রিকার কপাল ফিরে গেল। বাজে গ্রাহকেরা সব কাগজ ছেড়ে দিলে,অবশিষ্ট রয়ে গেল—শুধু সমজদার লোক যারা আর্ট বোঝে।

পরেশ। অর্থাৎ "গুঞ্জামালা" এখন জাত পেয়েছে।

দীনেশ। সে শুধু আমার প্রসাদে। আমার লেখাই বাজে পাঠকদের ঝেঁটিয়ে বার করে দিয়েছে।

পরেশ। এখন যখন স্ব-শ্রেণীর পাঠকের সম্পর্কে এসেছ—তখন তোমার তেড়ে লেখা দরকার।

দীনেশ। ও কথা তোমাদের বলা সহজ। তোমার মত লেখা—গোবদা—ভারি—ঝুলে—পড়া।

পরেশ। বড় বেশী?

দীনেশ। খুব বেশী নয় তবুও বেশ ভারি। আমি তোমার "মৃগাঙ্কলেখার—প্রসূন-কলিকা" পড়েছি।

পরেশ। তার পর।

দীনেশ। হয়েছে এক রকম। অসংখ্য ত্রুটির গুণেই বইখানি অপূর্ব্ব। আসল কথা, জিনিসটে ভিতরে কাঁচা। আমি চাই পাক্‌তে।

পরেশ। পাক্‌তে ত তুমি অনেক দিন হল সুরু করেছ। এই বেলা সাব-

ধান হ'য়ো। নইলে ফলের মত বেশী পাকতে গিয়ে, শেষট পচে না ওঠ।

দীনেশ। সে ভয় আমার নেই।

পরেশ। আচ্ছা ও কথা থাক্। এখন বলো ত কি লিখছো? খাপ্পা হয়ো না। এই যে! টেবিলের উপর একটি প্রকাণ্ড খাতা দেখছি। এই টে?

দীনেশ। হাঁ।

পরেশ। দেখতে পারি?

দীনেশ। যদি ইচ্ছে কর ত—

পরেশ। দেখছি, আমার উপর তোমার বিশ্বাস আছে। (খাতাখানি তুলিয়া লইয়া) এখন বুঝেছি—(আহ্লাদ সহকারে খাতাখানি খুলিয়া) তুমি আমার সঙ্গে তামাসা করছ? এত শুধু সাদা পাতা।

দীনেশ। এই আমার বই, অর্থাৎ যখন লেখা হবে তখন হবে। কবে? ও ত নেহাৎ বাজে প্রশ্ন।

পরেশ। রসিকতা কর্‌ছ—না সত্যসত্যই?

দীনেশ। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। পাতাগুলি সব গুনে গেঁথে রেখেছি। আমার বইয়ে এর চেয়ে এক পাতা বেশীও হবে না—, কমও হবে না। যখন পাতা পাওয়া গেছে তখন ফলের আর দেরি কি?

পরেশ। কতগুলি?

দীনেশ। একশ নিরনব্বই। ছাপার ছশ পাতা হবে।

পরেশ। এদিকে বইয়ের নাম লেখা শেষ হতে না হতে, ওদিকে তোমার শেষ হয়ে আস্‌বে।

দীনেশ। ক্ষতি কি? যদি নামের আধখানাও সুন্দর হয়।

পরেশ। শুনতে পাই তোমার পয়সা আছে।

দীনেশ। ওকে আর পয়সা বলে না।—বাবা কিঞ্চিৎ জলপানি দিয়ে গেছেন।

পরেশ। যা হোক তাঁর দুরদর্শিতা ছিল। তা না হলে তোমাকেও আর পাঁচ জন বাজেমার্কা লেখকের মত ভারি লেখা লিখতে হত।

দীনেশ। প্রাণ গেলেও নয়। ও আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আমি আর্টিষ্ট। চিন্তা ভাষাগত হলেই রসাতলে যায়। প্রকৃত প্রতিভা প্রকৃতিস্থ,

স্ব-স্থ, আপনাতে আপনি ব্যাপৃত। প্রতিভার প্রকাশ করার অর্থ তাকে গোপন করা। নিজের হাতে কিছু পড়ার মানে হচ্চে— পরের হাতে গিয়ে পড়া, সমালোচকদের প্রশ্রয় দেওয়া। যতক্ষণ আমরা পরের বিচারাধীন নই, ততক্ষণই আমরা স্বাধীন।

পরেশ। তার আর সন্দেহ কি? অবশ্য এ ভাবেও জিনিসটে দেখা যেতে পারে। এরি নাম নীরব কবিত্ব।

দীনেশ। কথাও তাই। মুখ? খোলবার দরকার কি? যতক্ষণ আমরা কথা না কই, ততক্ষণই আমরা পরের কাছে গ্রাহ্য।

পরেশ। অন্ততঃ কেউ প্রতিবাদ করে না।

দীনেশ। সমাজকে দেও আশা, শেখাও ধৈর্য্য,—সমাজ আর কিছু চায় না।

পরেশ। ত

দীনেশ। না।

পরেশ। মাপ করো; লোকে তোমার বিষয় কি বলে জান? সকলে দুঃখ করে যে, তুমি পাঁচ বৎসরের ভিতর আর কিছু লিখলে না।

দীনেশ। কি বল্লে—লোকে দুঃখ করে? ও ত সুখের কথা। ও ত আমাদের মনের শোবার মখমলের বিছানা।

পরেশ। শেষে সকলে বল্‌বে, তোমার লেখবার ক্ষমতা চলে গেছে।

দীনেশ। (অবাক হইয়া) আমি? আমি অক্ষম? আমি?—

পরেশ। হাঁ গো হাঁ, তুমি।

দীনেশ। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) যাও।

পরেশ। ইতিমধ্যেই লোকে বল্‌তে আরম্ভ করেছে। যদি সত্যি কথা শুন্‌তে চাও—

দীনেশ। (মহাক্রুদ্ধভাবে) আমি!!

পরেশ। সকলেই বলছে......

দীনেশ। নিজের কাণে শুনেছ—এত বড় সাহস।...হাসির কথা বটে ......আমি দীনেশ বোস, অক্ষ......না...ধৈর্য্য ধরে থাকা কঠিন।

পরেশ। অবশ্য কথাটা খোস খবর নয়। কিন্তু উপায় কি?

দীনেশ। অ্যাঁ! এই কলকাতায়, এই বঙ্গদেশে লোকে বলে কি না,— আমার শেষ হয়ে গেছে—আমার ভিতর আর কিছু নেই—সব খালি—সব ফুরিয়ে গেছে—

পরেশ। না, "ফুরিয়েছে", এ কথা কেউ বলে না। "নবগুচ্ছ" পদার্থটি এতই যৎসামান্য যে ওতেই যে সব ফুরিয়ে—

দীনেশ। (চীৎকার করিয়া) কি রকম? যৎসামান্য? মূর্খ! ভাল করে সেটা পড়েছ?

পরেশ। এক বার পড়েছি—আবার পড়েছি।

দীনেশ। তা হলে তার এক বর্ণও বোঝো নি।

পরেশ। ভাই মাপ করো। আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসি নি। পাঁচ জনে যা বলে, তোমারি ভালর জন্যে, সেই কথাগুলো তোমাকে জানাচ্ছি। শুনে যা খুসী তাই করো।—

দীনেশ। যত বেটা গাধা—গরু—হাতি!

পরেশ। (উত্থান করিয়া) আজ তবে আসি। আমি চেঁচামেচি ভাল বাসিনে। ওতে আমার মাথার ঠিক থাকে না।

দীনেশ। না একটু থাকো। এরা কিনা বলে—আমি খালি হয়ে গেছি! আচ্ছা দেখিয়ে দেব যে—

পরেশ। কি করে?

দীনেশ। আমার হাত থেকে যে কি বেরুবে, তা তাদের স্বপ্নেরও অগোচর।

পরেশ। কি বল্‌তে চাও একটু খুলে বল।

দীনেশ। এই মাস যেতে না যেতেই—

পরেশ। সত্যি? আমাকে ত মিছে আশা দিয়ে ভোলাচ্ছ না?

দীনেশ। আমি এবারে একখানি আস্ত বই তাদের মুখে ঠেসে পুরে গিলিয়ে দেব—এবং সকলে হাঁ হয়ে থাক্‌বে।

পরেশ। বাহবা কি বাহবা! শোভানাল্লা!

দীনেশ। আর এতেই তারা—আবার অনেক দিন ঠাণ্ডা থাক্‌বে।

পরেশ। আঃ! এতদিনে একটা কাজের মত কাজ করেছ। এইবার যত বাজে লোকের বোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে। আর যত পোকায় খাওয়া বাতিল সমালোচকের দল—

দীনেশ। ওই গুলোই ত যত অকম, অকর্ম্মণ্য—ভুয়ো—খোসা।

পরেশ। বাঃ বেশ বলছ, বলে যাও। তোমার মুখে এখন সরস্বতীর আবির্ভাব হয়েছে। এই ত চাই। একখানা পুরো বই লেখা হয়ে গেছে—আর আমায় কাছে লুকিয়ে রেখেছিলে?

দীনেশ। তাই।

পরেশ। শেষ করেছ ত?

দীনেশ। ক থেকে ক্ষ পর্য্যন্ত।

পরেশ। আর এ কথা আমাকে এতদিন বলো নি। বাহাদুরী আছে।

দীনেশ। এখন ত টের পেলে।

পরেশ। ভাল! বইখানি কি?

দীনেশ। দেখাচ্ছি।

পরেশ। বড়?

দীনেশ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) হাঁ।

পরেশ। কত পাতা?

দীনেশ। কুড়ি।

পরেশ। অ্যাঁ—না—ও হরি! বল কি?

দীনেশ। আঃ কি কষ্ট, কি পরিশ্রম! এ হচ্ছে মস্তিষ্ক-চোঁয়ানো একটি ফোটা। এর বেশী আর কিছু বলবার নেই।

পরেশ। হ্যাঁ! তা অবশ্য। তবে এর জন্য পাঁচটি বৎসর মাথা খাটিয়েছ?

দীনেশ। পাঁচের চাইতেও ঢের বেশী। এ হচ্ছে আমার হৃদয়ের রক্ত, আমার বুকের পাঁজর—আমার জীবনের সর্ব্বস্ব। কি?

পরেশ। না কিছু নয়! হে ভগবান্! সে যাক! ব্যাপারটা কি? আমি একটু অভিভূত হয়ে পড়্‌ছি।

দীনেশ। ব্যাপার হচ্ছে,—আমি পরে যে সব বই লিখিব, তার ক্যাটালগ্।

পরেশ। (অবাক হইয়া) অ্যাঁ!

দীনেশ। আমার ক্রমশঃপ্রকাশ্য গ্রন্থাবলীর নামের তালিকা। বুঝতে পেরেছ? বিশ পাতা মাত্র। এই বিশ পাতায় আমার সমস্ত ভবিষ্যতের ইতিহাস রয়েছে। উপন্যাস, পুরাতত্ব, দর্শন, কাব্য, নাটক। আমি যা লিখব, মহাভারত তার অর্দ্ধেকও নয়। এর পর কে বল্‌তে সাহস কর্‌বে যে, আমার প্রতিভা নপুংসক—যে আমার ক্ষমতার শেষ—

পরেশ। না—না—না। লোকে কোন কথাই বল্‌বে না।

দীনেশ। কুড়ি পাতা! এক বার বইয়ের নামগুলি শোনো!—"কলঙ্কী"—কাব্য। "একটি চোখ"—নাটক।

পরেশ। চমৎকার!

দীনেশ। "কথা-কণিকা", "প্রলয়ের অট্টহাস্য"।

পরেশ। আমি এখন থেকেই তা দেখতে পাচ্ছি।

দীনেশ। "বিজ্ঞানের বস্ত্রহরণ", "দীপচত্বারিংশৎ"।

পরেশ। বাঃ বাঃ বাঃ!

দীনেশ। "কন্থা-পন্থা"। "কাঠের পোকা"। "চীনেমাটীর হৃদয়"।

পরেশ। একটু থামো। "কাঠের পোকাটি" আমাকে উৎসর্গ করতে হবে।

দীনেশ। সে আর কি বেশী কথা! আমি এখনই সেটি তোমাকে উৎসর্গ করে দিলুম।—"নখরাজী", "ভগবানের বালিশতা"।

পরেশ। বাহবা কি বাহবা! আর বাকি—কি? এ সব ত হয়েই গেছে! ডিম ত সব তৈরি—এখন বাকি রইল শুধু কাগজের উপর পাড়া।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর।

মা যেমন সন্তানের সুখসম্ভোগ ও পুষ্টিসাধনের জন্য, তাঁহার দুগ্ধ মথিয়া ননীটুকু ছাঁকিয়া তোলেন, প্রকৃতি রাণীও তেমনি করিয়া যুগে যুগে কালপীযুষরাশি মন্থন করিয়া একটী কবি বা একটী কলাবিৎ জনসমাজকে উপহার দিয়া থাকেন; সেই ভাগ্যবান পুরুষ হৃদয়ের কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ প্রেম লইয়া জনসমাজের মধ্য দিয়া শান্তসলিলময় প্রশান্ত নদের মত তর তর বেগে বহিয়া যান; সন্তাপিত নরনারী চারিদিক হইতে আকুল প্রাণে ছুটিয়া আসিয়া সেই প্রেমস্রোতে অবগাহন করে, অঞ্জলী পুরিয়া সুধা পান করিয়া হৃদয় সুশীতল করে।

মানবের যুগযুগান্তরের সাধনা, হাসি কান্না, দীর্ঘনিঃশ্বাস ও চোখের জল কবি বা কলাবিদের হস্তে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমাজে আবির্ভূত হইয়া থাকে। তাঁহার মোহন বাঁশী সমাজ-দেহের হৃদিকন্দর কাঁপাইয়া যখন বাজিয়া উঠে, তখন দিগন্তর হইতে সাগর-অন্বেষণকারী নির্ঝরের মত, অসংখ্য নরনারী হৃদয়ের দুঃখ-পসরা মাথায় বহিয়া প্রাণ ভরা বেগে সেই মধুর রবের দিকে ধাবমান হয়।

জনসমাজের বহু পুণ্যের ফলে যথার্থ কবি, ভাস্কর বা চিত্রবিৎ বহুর এক এবং একের বহুরূপে আসিয়া ধরাতলে দেখা দেন। মানবের ইতিহাস এই সত্যের নিশান উড্ডীন করিয়া রাখিয়াছে। কত যুগ আসিল এবং গত হইল; কত হস্তিনা, কত কার্থেজ, কত রোম ও কত দিল্লী এই মহাকালসাগরে বুদ্বুদের মত জন্মগ্রহণ করিল—আবার নিমেষে মিলাইয়া গেল, কিন্তু যে কয় জন প্রেমিক-প্রাণ মহাপুরুষ এই সাগরের তীরে বসিয়া,—আমাদিগকে ওপারে লইয়া যাইবার জন্য তরী নির্ম্মাণ করিলেন, আমাদের কল্যাণার্থ অর্ঘ্যজবা ভক্তি-ভরে সাগরের জলে ভাসাইয়া দিলেন, সেই মহাপুরুষদের জনসমাজ ভুলিতে পারিল কই?—

কৃতি ভাস্কর তিনিই, যিনি তাঁহার সমাজের সাধনাকে ভাস্কর্য্যের ভিতর দিয়া পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। এক দিকে যেমন জাতির অতীত গৌরব, বর্ত্তমানের সুখ, সুবিধা, আশা ও আনন্দ তাঁহার কার্য্যাবলীর ভিতর দিয়া অন্তঃসলিলরূপে প্রবাহিত হইয়া জাতিকে নব প্রাণে ও প্রেরণায় মাতাইয়া তোলে, তেমনি অপর পক্ষে তাঁহার কার্য্যের নিষ্কল বিচার-বুদ্ধি মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া জাতির অতীত ও বর্ত্তমানের সকল কলঙ্কের কাহিনীকে অনুতাপের অশ্রুজলে বিধৌত করিয়া সমাজকে নিষ্কল করিয়া লয়। এই স্থলেই কবি-ভাস্করের সকল প্রতিভা ও সকল শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ ও দেশের প্রকৃত কল্যাণকল্পে যে প্রতিভা নিত্য-প্রয়োজনীয়, মঁশীয়ের রোদাঁতে তাহা বর্ত্তমান,—তাই তিনি আজ তাঁহার নিজের দেশ ফ্রান্সে সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সকল মানবজাতির বন্ধু বলিয়া আজ সর্ব্বত্র আদৃত ও সম্মানিত। মানবের আনন্দে প্রফুল্লিত হইয়া যিনি সমাজে আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইয়া দেন, কিংবা মানবের দুঃখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া যিনি বিশ্বকে চোখের জলে ভাসাইয়া কর্ম্মী করিয়া তোলেন, সেই ভাগ্যবান পুরুষ পৃথিবীর যে কোনও সমাজেই প্রতিষ্ঠিত থাকুন, পৃথিবীর যে কোণেই বিরাজ করুন না কেন, তিনিই মানবের প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু।

তিনিই সমাজ বা জাতিকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতে পারেন। ইয়োরোপে এই শ্রেণীর মনস্বী, মানবের সমুদয় চিন্তা-ক্ষেত্রেই অবতীর্ণ হইয়া ইয়োরোপকে আজ এই গৌরবময় স্থান প্রদান করিয়াছেন। আমাদের দেশেও এই শ্রেণীর মানুষ যখন যথেষ্ট পরিমাণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন আমরা

বড় ছিলাম।—আজকাল সে রকম বাঁশীর সুর আর শুনিতে পাওয়া যায় না তাই আমরা দীন, ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছি।

আমরা এখন একে একে এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত, বোঁদার সৃষ্ট ভাস্কর্য্যাবলীর চিত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

১ম চিত্র—Age of the Aryans—আর্য্য-যুগ। এই ভাস্কর্য্যে বোঁদা আমাদের পিতামহ আর্য্যদের সরল ও তথাকথিত অবিকশিত মানসিক অবস্থা প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কি যেন মনে করিতে যাইতেছিল কিন্তু মনে পড়িতেছিল না,—তাই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিবিষ্টমনে মাথায় হাত দিয়া সে বিষয় স্মরণে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে যে শিশু-সুলভ সরল সৌন্দর্য্য ও স্বভাবের একটী স্নিগ্ধ মাধুর্য্যের অবতারণা করা হইয়াছে—তাহা যে স্বর্ণযুগে সামবেদ রচিত হইয়াছিল—সে মধুময় যুগেই সম্ভবে। একদিন যাঁহারা এই মহা অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ময় পুরুষকে দর্শন করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে গাহিয়াছিলেন, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং তমসঃ পরস্তাৎ"—সেই জ্যোতির্ময়দের পুত্র হইয়া আমরা আজ আঁধারে ফিরিয়া কাঁদিয়া মরিতেছি কেন?—মনস্বী বোঁদা এই মূর্ত্তির ভিতর দিয়া আজ যেন আমাদিগকে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

২য় চিত্র—"চুম্বন"। এই চিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্রই ভাস্কর্য্যের প্রতিপাদ্য বিষয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। পুরুষ-প্রকৃতির লীলারস-রঙ্গের কাহিনীর গভীরতা সম্বন্ধে এই ভাস্কর্য্য ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর নিকট কি অভিনবত্ব প্রকাশ করিবে? যে দেশের হাওয়ায় গীতগোবিন্দের উৎপত্তি, সেই দেশের মানুষকে পুরুষ-প্রকৃতির অনন্ত প্রেম-লীলার মধুরিমা বুঝাইতে যাওয়া এক প্রকার বিড়ম্বনামাত্র।

বোঁদা তাঁহার এই অমর সৃষ্টিতে মাধুর্য্য রসটী বড় গভীর ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। এ চুম্বন বড় নিগূঢ় রস-সম্ভোগ; দেহ, মন, প্রাণ যখন এক হইয়া যাইতে চায়, যখন নয়নে নয়ন, হৃদয়ে হৃদয়, পরাণে পরাণ মিলিত হয়, এ সেই যোগ, এ সেই চুম্বন।

৩য় চিত্র—সেণ্ট্ জন দি বাপ্টীষ্ট্। এই মূর্ত্তিতে যোগী জন্এর মানব-প্রেম পূর্ণমাত্রায় প্রকাশমান। সেণ্টজন্ খৃষ্টের পূর্ব্বগামী এবং সমসাময়িক। খৃষ্টকে তিনিই দীক্ষিত করেন। কথিত আছে, য়িহুদি সমাজ যখন দুরাচারে ও পাপভারে অবনত, যখন অমানুষিক অত্যাচার, ধর্ম্মের মাঝে অধর্ম্ম সমা-

জকে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া দুর্বিসহ যাতনার আগার করিয়া তুলিয়াছিল, তখন সাধু জন্ বিশুর আগমনবার্ত্তা বহন করিয়া য়িহুদি-সমাজে অবতীর্ণ হন। তিনি অনাচারী মানবকে আশার বাণী শুনাইয়া বেড়াইতেছেন—এই ভাবটি ব্যক্ত করাই সম্ভবতঃ ভাস্করের উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন।—সাধুর মুখে আপনাহারা প্রেমের শান্তভাব কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৪র্থ চিত্র—Thoughts—আত্ম-চিন্তা।—এই নামকরণ ঠিক ভাবটি প্রকাশ করে না, অথচ বাঙ্গালা ভাষায় 'সমাধি' বলিলে যাহা বুঝায়, ভাস্করের উদ্দেশ্য ততটা গভীর কি না বলা কঠিন। আত্ম-চিন্তা একটু গভীর অবস্থা লাভ করিলে যাহা বুঝায়,তাহাই ব্যক্ত করা সম্ভবতঃ ভাস্করের উদ্দেশ্য। বিচিত্র সংসারের বিচিত্র কর্ম্মকোলাহলে কেন্দ্রীভূত মূল-কারণে আত্মনিবেশ করা—যাহাকে আমরা কর্ম্মযোগ বলিয়া জানি, তাহাই বোধ হয় রোঁদা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—এ বিষয়ে তিনি অনেকাংশে সফলও হইয়াছেন। মুখের শান্ত ভাব ও সমাধিস্থ স্থির প্রকৃতি তাহাই ব্যক্ত করিতেছে।

৫ম চিত্র—Hand of God—বিধাতার হাত। মহাকবি ভাস্কর তাঁহার এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিতে গভীর ও অনন্ত অন্তর্দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। বিধাতাকে আমরা চিনিতে পারি আর না পারি, সেই প্রেমপূর্ণ অন্তর্বন্ধন অতিক্রম করিবার সাধ্য আমাদের নাই।—আমাদের দুঃখও যাতনা, সুখ ও প্রীতি, সকলের ভার মাথায় বহিয়া তাঁহার ভুজবন্ধনেই আমাদের মাথা রাখিবার স্থান খুঁজিয়া লইতে হয়। তাঁহার ঐ মঙ্গল ও প্রেমের "হাত দুখানির মাঝখানে যে বুক সে বুকেই" আমাদের চির-আশ্রয়। বেদ ও পুরাণ, বাইবেল ও কোরাণ অনন্তকাল ধরিয়া মানুষের চোখে যে জ্ঞান ও প্রেমের অঞ্জন মাখাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে—সেই জাজ্বল্যমান অন্তর্দৃষ্টি রোঁদা কেমন অপূর্ব্বভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন! ইহাই ত প্রতিভা, ইহাই ত মানবপ্রেম;—মানবকে প্রেমের পথ যে দেখাইয়া দেয়, তাহার মত মানবের সুহৃদ আর কে আছে?

এই হাত যখন মানুষ দেখিতে পায়—নিশিদিন অবিশ্রান্তভাবে সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে চলিয়াও সেই হস্তের অঙ্গুলিনির্দ্দেশের প্রতি মানুষ যখন তাঁর দৃষ্টিকে সজাগ করিয়া রাখে, তখনই ত মানুষ অসাধ্যসাধনে সক্ষম হয়, নিজেকে পরম মঙ্গলে এবং জাতিকে মহাকল্যাণে ভূষিত করিয়া তোলে।

এই মনস্বী ভাস্করের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আমি যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে পাঠককে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। ভাস্করের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে, তাঁহার নাম ধাম গোত্র সম্বন্ধে আলোচনা একটি প্রবন্ধে সম্ভবে না। তাহার প্রয়োজনও নাই। রোঁদার চরিত বাজারে বিক্রয় হইতেছে, যাঁহার ইচ্ছা, কিনিয়া পাঠ করিতে পারেন। যে চিন্তাস্রোত এই ভাস্করের হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই ব্যক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছি। সময়ে প্রতীচ্যের এই প্রাণময় ভাস্কর্য্যের ধারা বঙ্গভাষায় আনয়ন করিব —হৃদয়ে এরূপ আকাঙ্ক্ষা আছে। কর্ম্মক্ষেত্র অতি বিস্তৃত—জীবন অতি সংকীর্ণ। আশার সাফল্য, আশার উদ্ভাবনকর্ত্তা যিনি, তাঁহারই কৃপা-সাপেক্ষ।

ভাস্কর্য্যের বৈজ্ঞানিক রীতি পদ্ধতি (Technicalities) সম্বন্ধে প্রাচ্যে ও ও প্রতীচ্যে রুচি-ভেদ আছে। সেই রুচিভেদ আমাদিগকে প্রকৃত গুণগ্রহণে অন্ধ না করিয়া ফেলে—সে বিষয়ে প্রত্যেক পাঠককেই সাবধান থাকিতে হইবে। আমাদের দেহের আকার, বর্ণগত পার্থক্য ও ভাস্কর্য্যের বাহিরের কার্য্যকরী রীতিপদ্ধতির প্রভেদ একই পদার্থ। মানুষের প্রাণ যেমন একই জিনিস—তেমনই ভাস্কর্য্যেরও অন্তর্নিহিত ভাব-স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় সকল দেশ ও সকল সমাজের শিল্পের মধ্য দিয়াই সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। রোঁদা সাধু জন্‌কে বস্ত্রহীন দেহে প্রদর্শিত করিয়াছেন—আমি হয় ত গৌরকে কৌপীনে সুশোভিত করিয়া লোকচক্ষুর গোচর করিব। জীবে দয়া ও নামে রুচি উভয়েই সমভাবে বর্ত্তমান, বাহিরের বস্ত্র তার কাছে কোন্ ছার। বঙ্গের নব যুগের এই নব সাধনার দিনে কি শিল্প, কি কাব্য, কি ভাস্কর্য্য, এ সকলের বাহিরের কৃত্রিমতার পার্থক্য যাহাতে আমাদের হৃদয়ের গুণগ্রাহিতাকে কুহেলিকাচ্ছন্ন না করিয়া ফেলে- এই জন্যই এ স্থলে দুই একটি কথার অবতারণা করিলাম।

রোঁদার প্রতিভা অনন্তমুখী ; একটি প্রবন্ধে তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। চিত্র ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা বঙ্গে এই সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে, অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে বিরাজমান। কত জন আসিবে, কত জন সে ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া আমাদিগকে অফুরন্ত কাব্যশিল্পে ধনী করিয়া তুলিবে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বর্ম্মন্।

গ্রন্থ-পরিচয়।

বাঙ্গালার বেগম। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণ-ওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵ আনা মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাসে যাঁহাদের লীলালহরী নানা বর্ণে চিত্রিত আছে, যাঁহারা সেই শতাব্দীর রাজনীতিক ব্যাপারের সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত ছিলেন, যাঁহাদের অপূর্ব্ব কাহিনী আজিও লোকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিয়া থাকে, সেই মহীয়সী মহিলাদিগের চরিত্র চিত্রিত করিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নিকট তাঁহার সুখপাঠ্য গ্রন্থ 'বাঙ্গালার বেগম'কে উপস্থাপিত করিয়াছেন। 'বাঙ্গালার বেগম' বলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা বা মুর্শিদাবাদের বেগমবৃন্দকেই বুঝিতে হইবে; কারণ, ব্রজেন্দ্রনাথ মুর্শিদাবাদের বা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার বেগমদিগের বিষয়ই তাঁহার গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার কথা বলিতে হইলে মুর্শিদাবাদের কথাই বলিতে হয়। কারণ "The history of Mursidabad city is the history of Bengal during the eighteenth century". অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের ইতিহাসই অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস। সুতরাং ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থের 'বাঙ্গালার বেগম' নামকরণ অযৌক্তিক হয় নাই। তবে "অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার বেগম" হইলে আরও সুস্পষ্ট হইত; কিন্তু অন্যান্য শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাসে বেগমচরিত্র খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার বেগমদিগের বিবরণ হইলেও, অনায়াসে গ্রন্থের নাম 'বাঙ্গালার বেগম' রাখা যাইতে পারে।

গ্রন্থকার প্রথমে লুৎফউন্নিসার চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। লুৎফউন্নিসা সিরাজউদ্দৌলার প্রিয়তমা বেগম ছিলেন। তিনি ক্রীতদাসীরূপে আলিবর্দ্দীর সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া, পরে সিরাজউদ্দৌলার বেগম হইয়া উঠেন। সিরাজউদ্দৌলার বিবাহিতা পত্নীর নাম ওমদাৎউন্নিসা। ইনি ইরাজ খাঁর কন্যা। কেহ কেহ লুৎফউন্নিসাকে ওমদাৎউন্নিসা বলিতে চাহেন। ওমদাৎ-উন্নিসা যে লুৎফউন্নিসা নহেন, এবং তিনিই যে ইরাজ খাঁর কন্যা, তাহার বিশেষরূপ প্রমাণ আছে। সিরাজের আরও দুই একটি বেগমের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লুৎফউন্নিসা তাঁহার ভালবাসার পাত্রী ছিলেন। লুৎফউন্নিসাও সিরাজের পদে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া-ছিলেন। ইতিহাসে লুৎফউন্নিসার সিরাজের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন তাঁহার হৃদয় কোমলতা ও কারুণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। লুৎফউন্নিসার চরিত্র যদিও পূর্ব্বে কোনও কোনও গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে, ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার আনুপূর্ব্বিক জীবন-চরিত ও অপূর্ব্ব চরিত্র বিশেষরূপে চিত্রিত করিয়া ইতিহাসানুরাগ ও চরিত্রচিত্রণ-ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'আমিনা'। আমিনা সিরাজউদ্দৌলার মাতা ও আলিবর্দ্দী খাঁর কনিষ্ঠা কন্যা। আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহম্মদের কনিষ্ঠ পুত্র জৈনুদ্দীনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ আমিনা-চরিত্রে তাঁহার ঔদার্য্য, কারুণ্য প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিবরণেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় প্রবন্ধ আলিবর্দ্দী-বেগম। এই মহীয়সী মহিলার বিবরণ ইতিহাসের কোনও কোনও স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তিনি যে আলিবর্দ্দী খাঁর

দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন তাঁহারও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কোনও কোনও গ্রন্থে তাঁহার চরিত্রের আলোচনা হইলেও, ব্রজেন্দ্রনাথ, তাহা বিশদভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চতুর্থ প্রবন্ধ—মণি বেগম। মণি বেগম সামান্ত নর্ত্তকী হইতে কিরূপে নবাব মীর-জাফরের বেগম হইয়া সিরাজউদ্দৌলার গুপ্ত ভাণ্ডারের ধনরত্ন লাভ করিয়া অবশেষে কোম্পানীর মাতৃস্বরূপিণী (মাদর-ই-কোম্পানী) হইয়াছিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থে তাহা সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার পঞ্চম প্রবন্ধ 'ঘসিটি'। ঘসিটি বা মেহেরুন্নিসা আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজেস মহম্মদের পত্নী। ঘসিটির সহিত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের অনেক সম্বন্ধ বিজড়িত আছে, তাঁহার উন্মাদয়িত্রী রূপলহরী ও রাজনীতিক কূটবুদ্ধি আলিবর্দ্দী খাঁর সংসারে ও রাজ্যে যে তুফানের সৃষ্টি করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ সে পরিচয়-প্রদানের জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বশেষ প্রবন্ধ 'জিন্নতুন্নিসা'। জিন্নতুন্নিসা মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলী খাঁর কন্যা, সুজাউদ্দীনের পত্নী ও সরফরাজ খাঁর মাতা। ইতিহাসে যতটুকু তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি শেষ জীবন কিরূপে যাপন করিয়াছিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথ তাহার উল্লেখ করিতে পারেন নাই; ইতিহাসে তাহাও জানা যায়। জিন্নতুন্নিসার শেষ জীবন আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসিটির সংসারেই অতিবাহিত হইয়াছিল, তিনি তাঁহার সংসারের কর্ত্রীস্বরূপাই ছিলেন। সরফরাজের শিশুপুত্র আগা বাবাকে অবলম্বন করিয়া তিনি জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিয়াছিলেন। ইতিহাসে তিনি নফিসা বেগম নামেও অভিহিতা হইয়াছেন।

দুই এক স্থলে সামান্য ত্রুটী থাকিলেও, তাঁহার গ্রন্থখানি যে বঙ্গসাহিত্যের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, তাহা বলা যাইতে পারে।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত। ষষ্ঠ সংস্করণ। মূল্য।০ চারি আনা। গ্রন্থখানির ষষ্ঠ সংস্করণ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে যে, পাঠকসমাজে ইহার যথেষ্ট আদর হইয়াছে। এরূপ সমাদৃত হইবার ইহা যোগ্যও বটে। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের উপ-দেশ-সংখ্যা অপরিমিত,—অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। সেই সাগরবিশেষ উপদেশরাশি হইতে বাছা বাছা রত্নগুলি আহরণ করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই গ্রন্থের সঙ্কলন করিয়াছেন। মানসিক ব্যাধিতে জনসমাজ জর্জ্জরিত। এই দুর্দ্দমনীয় ব্যাধির প্রশমনার্থ যত কিছু ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভগবদ্ভক্তগণের উপদেশামৃতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ বলিয়া মনে করি। অতএব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের এই কল্যাণপ্রদ বহুমূল্য উপদেশ-গুলি মানবহৃদয়ের স্বাস্থ্যবিধানে যে সমর্থ হইবে, আমাদের এমন আশা আছে। গ্রন্থখানির আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, সকলে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে নিঃসঙ্কোচে ইহা পাঠ করিতে পারেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এরূপ উপাদেয় সামগ্রীর এমন সুলভ ও সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

মণিমালা। নাটক। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার, বি. এ. প্রণীত। মূল্য ।৶০ দশ আনা। পুস্তকখানির মলাটের 'নাটক' কথাটি লেখা আছে বলিয়াই ইহাকে নাটক বলি-

তেছি; নতুবা গ্রন্থমধ্যে নাটকত্বের গন্ধমাত্রও পাওয়া যায় না। লেখক অবশ্য নাটক গড়িবার জন্ত অনুষ্ঠানের ত্রুটী করেন নাই। কথোপকথনে ইহা রচিত। ইহাতে ছন্দ আছে, সঙ্গীত আছে, স্বগত-উক্তি আছে, 'জলে ঝম্পপ্রদান' আছে, এমন কি, 'চুম্বনে লয়' পর্য্যন্ত আছে। তথাপি ইহা নাটক হয় নাই। নাটকের যাহা প্রাণ—হৃদয়ের ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, যাহার সহায়তায় নাটকীয় কর্ম্ম-স্রোত অঙ্কে অঙ্কে হু হু করিয়া বহিয়া যায়, এবং নাট্য-ক্ষেত্রের কর্ম্মীদিগের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভাবে ফুটিয়া উঠে,—সেই প্রাণ-বস্তুরই এ গ্রন্থে সম্পূর্ণ অভাব। রস-পরিচালন, চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতির সহিত এ নাটকের (?) কোনও সম্পর্ক নাই। ইহার অধিকাংশ গর্ভাঙ্কই অকারণ, অনাবশ্যক। কার্য্য-কারণ বলিয়া জগতে যে একটি নিয়ম আছে, তাহা ইহাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। ইহার পাত্রপাত্রীগুলি যে গর্ভাঙ্কে গর্ভাঙ্কে কেন দেখা দিতেছে, কেন অত আবোল তাবোল বকিতেছে, তাহা কিছুতেই বুঝিবার উপায় নাই। আষাঢ়ে গল্পে যেমন কোনও কৈফিয়ৎ থাকে না, সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে কোনও ছেদ থাকে না, এ নাটকেরও (?) সেই দশা। ইহার নায়িকা মণিমালা কেমন করিয়া কোথা হইতে গোবিন্দের সহিত জুটিল, আবার বালজীই বা কি উপায়ে সিংহলে শাক্তসুর দস্যু হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কান্যকুব্জে আসিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সাজিল,—এ সমস্ত ব্যাপার একেবারে কুহেলিকাচ্ছন্ন—দুর্ব্বোধ্য। গ্রন্থের আগাগোড়া যেন এক ভোজবাজী চলিতেছে। ঘাতপ্রতিঘাতের ছবি আঁকিতে হয় বলিয়াই নাটক-যথাগত প্রত্যেক কথায় বিশেষত উপযোগিতা থাকে। উপযোগিতার অর্থ এই যে, যে ভাবাবেশে যাহার যতটুকু বক্তব্য, সেই ভাবাবেশে তাহাকে ততটুকুই বলাইতে হয়। কিন্তু এ গ্রন্থে সে সমস্ত বিধি কিছু নাই। ইহার কথাবার্ত্তাগুলি অধিকাংশ স্থলেই 'পায়েপড়া' গোছের হইয়াছে। ইহার স্বগত উক্তি সকলও অত্যন্ত সুদীর্ঘ। সেই জন্য ইহার প্রায় সমস্ত চরিত্রই অস্বাভাবিক ও বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের মহারাজ, রাজকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া চীনদেশীয় বৌদ্ধপর্য্যটক থিয়েনসান ও ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলেরই কথা কহিবার ভঙ্গী প্রায় একরূপ। প্রায় সকলেই আমাদের দেশের আধুনিক শিশুকবিদের মত অল্পবিস্তর কবি। তাহাদের কথাবার্ত্তায় 'হিম জোছনায় রজত প্রান্তরে কল-ভাষিণী নির্ঝরিণীর হিরন্ময় স্রোত-রেখায় অনুরাগ,' 'ঘুমন্ত বনচ্ছায়া সঞ্জীবনী' প্রভৃতি উৎকট কবিত্বের বাহার আছে। কেহ যে কবিত্ব-কণ্টক দলিত করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এই গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিবে, এমন আশা আদৌ নাই;—তবে লেখকের পক্ষে একটা আশ্বাসের কথা এই যে, বাঙ্গলায় এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির নজীর আছে, "ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই,—এ যে কেবল গন্ধ।'

সদ্ভাব-কুসুম। ৺রজনীকান্ত সেন প্রণীত। মূল্য ।০ চারি আনা।—শিশুদিগের জন্য বঙ্গভাষায় প্রতিদিনতই রাশি রাশি বহি বাহির হইতেছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই 'অপেয়, অস্পৃশ্য ও অগ্রাহ্য'। বালক-বালিকাদিগের প্রকৃত পাঠোপযোগী গ্রন্থের এ দেশে একান্ত অসদ্ভাব। আলোচ্য গ্রন্থের প্রণেতা স্বর্গীয় কবি সেই অভাবমোচনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু দুইখানি পুস্তক রচিত হইতে না হইতে নিষ্ঠুর কাল তাঁহাকে

আমাদিগের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়া গেল। এই সম্ভাব-কুসুম উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অন্যতম। কবি ইহাতে পদ্যচ্ছলে কতকগুলি নীতি-উপদেশ কবিতায় গাঁথিয়া গিয়াছেন। কবিতাগুলি সরস ও সরল। এ পুস্তক বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলে আমরা সুখী হইব।

ভূদেব-জীবনী (সংক্ষিপ্ত)। শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য।৵০ ছয় আনা। আমরা এ চরিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থের ভাষা ও রচনা-প্রণালী যদিও ভাল নহে, কিন্তু গ্রন্থকারের সংগ্রহ প্রশংসনীয়। ভূদেব-জীবনের বহু ঘটনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভূদেব-চরিত্রের মূল সূত্র যে তাঁহার মৌলিকতা, এ কথা পাঠে চরিত্র বুঝিতে পারি। বাঙ্গালীকে এ গ্রন্থ পড়িতে আমরা অনুরোধ করি। ভক্তিভরে মহাত্মার জীবন-কাহিনীর আলোচনা করিলে বাঙ্গালীর জীবন মহত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারে। ভূদেবের মাহাত্ম্য,—ধর্ম্ম, সমাজ ও লোক-শিক্ষা—এই তিন বিষয়েই আপনাকে প্রচার করিয়াছিল। তিনি জীবন-যাত্রার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীদক্ষিণেশ্বর। শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য।০ চারি আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে দক্ষিণেশ্বরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইয়াছে। দক্ষিণেশ্বর নামের সহিত বাঙ্গালীমাত্রই আজি পরিচিত। নবদ্বীপ যেমন শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলাভূমি,—দক্ষিণেশ্বরেরও অঙ্গে অঙ্গে তেমনই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা-কাহিনী জড়িত হইয়া রহিয়াছে। নবদ্বীপের মত দক্ষিণেশ্বরও আজি হিন্দুর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক সংক্ষেপে রাণী রাসমণির ও শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের বংশপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সুখ্য-পাঠ্য হইয়াছে। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

মোহনভোগ। শ্রীমনোমোহন সেন প্রণীত। ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্সের পুস্তকালয় হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা। মোহন-ভোগের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, এই 'রঙ্গ-চঙ্গে' কেতাবখানি শিশুসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। ইহার ছাপা ও ছবি পরিপাটী। মলাটের ছবিখানি মনোরম। কিন্তু মোহনভোগের ঠোঙ্গা নয়, বিলাতী কেকের 'পেপার-ব্যাগ্'। বাঙ্গালীর রুচি বিকৃত হইয়াছে। দুধপোষা বাঙ্গালী শিশুর অঙ্গে বিজাতীয় বেশের অভিশাপ দেখিয়া দুঃখ হয়,—জাতীয় অধঃপতনের বহর দেখিয়া লজ্জিত ও শঙ্কিত না হইয়া থাকা যায় না।—বঙ্গমানবকগণের বিজাতীয় বেশ উদ্ভট হইলেও সত্য; সমাজে তাহার অস্তিত্ব আছে; তাহাও আমরা অস্বীকার করিব না। কিন্তু শিশুসাহিত্যে সে বেশের আমদানী করিলে, জাতীয় ভাবের সঙ্কোচ ঘটিবে। মোহনভোগের মলাটের শিশুকুল আগেগোড়া-বিলাতী, এই-মাত্র জাহাজ হইতে নামিয়া আসিতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাদের কোটে, প্যাণ্টে, ঘাঘরায় মোহনভোগ মাখাইয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে মোহনভোগই অশুচি হইয়াছে। আমাদের মা বহি কি বন্ধ্যা হইয়াছেন? বাঙ্গালীর পরম শত্রুও ত এমন অপবাদ দিতে পারে না। বাঙ্গালীর পরিচ্ছদে কি সৌন্দর্য্যসৃষ্টি অসম্ভব? ইউরোপের শিল্পীরাও ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে ধুতিতে বসনের লীলা-ভঙ্গীর সমাবেশ করিয়া থাকেন। আমরা আর কত দিন

উত্তটের অনুসরণ করিব? শিশুর সরস মনেই জাতীয়তার বীজ বপন করিতে হয়। শিশুসাহিত্য তাহার সহায় না হইয়া যদি বিদেশী বিলাসের পোষক হয়, তাহা হইলে 'সাপ্‌যংসে বিজয়ায় সঞ্চয়!'—মোহনভোগের রচনা মন্দ নহে। শিশু-হৃদয়ের সহিত গ্রন্থকারের পরিচয় আছে, অনেক রচনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গোষ্ঠযাত্রা, চাঁদ সওদাগর, লবকুশ প্রভৃতি হিন্দু শিশুর সুপথ্য। খোকা বাহাদুর ও লবকুশের চিত্র দুইখানি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু লবকুশের ছবিতে ঘোড়াটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়! অশ্বমেধের অশ্বের পূর্ব্বার্দ্ধমাত্র শাখার অন্তরাল হইতে দৃশ্যমান; পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে বোধ হয়, যেন দোদুল্যমান। চিত্রকর অশ্বটিকে প্রাধান্য দিলে শিশুদিগের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিতেন। রাজা ও রাণীর সুরঞ্জিত ছবি সুন্দর। মোহনভোগ অসংখ্য চিত্রে পূর্ণ; ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই পরিপাটি। তাহার তুলনায় ছয় আনা মূল্য সুলভ বলিয়া মনে হয়। পূজার সময় শিশুরা মোহনভোগ পাইলে তৃপ্তি লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সম্রাট জর্জ্জ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সহৃদয়তা ও সমবেদনা ভারতবাসী কখনও ভুলিতে পারিবে না। সম্রাটের চরিত্র প্রজার জ্ঞাতব্য বটে; কিন্তু সদাশয় পঞ্চম জর্জ্জ যদি সম্রাট না হইতেন, তাহা হইলেও, তাঁহার চরিত্রের আলোচনায়, মনুষ্যত্বের পরিচয়ে, পাঠক লাভবান হইতেন। গ্রন্থকার সংক্ষেপে সম্রাটের চরিতকাহিনী সঙ্কলিত করিয়াছেন।—এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে। অতএব, 'ইংলিশম্যান' প্রভৃতি যাহাই বলুন, দেশে 'ভদ্রলোক ডাকাতের' আতঙ্ক যতই বাড়ুক, আমরা বলিব, বাঙ্গালী রাজভক্ত বটে।—লেখক ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন। যথা 'মহিমাকাহিনী'। অনেক স্থলে লেখক বাঙ্গালা শব্দে ইংরাজী লিখিয়াছেন। যথা,—'এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নৌবিদ্যায় এত দূর পারদর্শী হইলেন যে, তিনি যখন সব লেপ্টেনান্ট পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র উনিশ বৎসর ছিল।' বাঙ্গালা রচনা-রীতির অনুসরণ করিলে লেখক লিখিতেন,—'উনিশ বৎসর বয়সেই তিনি সব লেপ্‌টেনেণ্টের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।' লেখক 'জাঁকজমকের প্রসেসনকে' ভাষায় স্থান দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ পক্ষপাতিতায় ভাষার 'জমক' দূরে থাক 'জাঁকও' লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। শোভা-যাত্রা, মিছিল কি অপরাধ করিল?—ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই সকল ত্রুটীর সংশোধন করিলে আমরা আনন্দিত হইব।—গ্রন্থখানির কাগজ, ছাপা ও মলাট সুন্দর।

দগ্ধ-কচু।—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। কবিবর দেবেন্দ্রনাথের কবিতা বাঙ্গালা দেশে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পদ্যের ন্যায় তাঁহার গদ্যও সুন্দর। তাঁহার 'দগ্ধ-কচু' সুখপাঠ্য নক্সা। সেন কবির নিপুণতায় 'দগ্ধ-কচু'ও মুখরোচক হইয়াছে। বহু দিন হইল, 'ভারতী'র পত্রপাতায় কবিবর এই 'কচুপোড়া' পরিবেশন করিয়াছিলেন। সে স্বাদ কি ভুলিবার? পুরাতনের মোহ কি কেহ ভুলিতে পারে? আজ মনে হইতেছে,—'তে হি নো দিবসা গতাঃ!'—কিন্তু যাক, সাধারণের সহিত সেই পুরাতন

প্রসঙ্গের—আমাদের সেকালের সুখস্মৃতির কোনও সম্বন্ধ নাই। সুতরাং 'ধান ভানিতে শিবের গীত' সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।—লঙ্কা-কচুতে সেন কবি যে রস ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহা চাকভাঙ্গা মধুর মত মধুর। আশা করি, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের তথাকথিত রসিকতা নামক চিটে গুড়ে যাঁহাদের অরুচি জন্মিয়াছে, লঙ্কা-কচু তাঁহাদের ভাল লাগিবে।

হাসন-হোসেন। শ্রীরেবতীমোহন সেন প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ছাপা ও কাগজ মন্দ নহে। লাল রঙের কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ছয় আনা। হজরৎ মহম্মদের দৌহিত্রদ্বয়—হাসন ও হোসেনের ঈশ্বরনিষ্ঠা, শৌর্য্য, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানব-সাধারণের আদর্শ-স্থানীয়। রেবতী বাবু বাঙ্গালা ভাষায় হাসন ও হোসেনের অবদান লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। অবদান সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ সীমায় কখনও আবদ্ধ থাকিতে পারে না। বাঙ্গালা সাহিত্যের শক্তি বাড়িতেছে, ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতেছে। হাসন-হোসেনের ন্যায় গ্রন্থের প্রকাশে এই সত্যই সূচিত হইয়াছে। ইহা সুলক্ষণ। সাহিত্যও কালধর্ম্মের অনুবর্ত্তী। যুগধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া কোনও জাতি, কোনও জাতির সাহিত্য উপচয় লাভ করিতে পারে না।—এই গ্রন্থের ভাষা সহজ, চলনসই। আশা করি, রেবতীবাবুর শ্রম সাফল্য লাভ করিবে।

বিদুর। শ্রীরামকানাই দত্ত প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সচিত্র। মূল্য ছয় আনা। পুস্তকখানি শিশুপাঠ্য বলিয়াই মনে হয়। শিশুদের জন্য কথিত গ্রন্থে বিচার-বিতর্কের অবকাশ নাই, লেখক তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। 'বিদুর' কোথাও প্রবন্ধ, কোথাও উপাখ্যান। নিরবচ্ছিন্ন আখ্যান-পথে বিদুর-চরিত্র বর্ণিত হইলে লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। গ্রন্থের ভাষাও সর্ব্বত্র একরূপ নহে। বহু দুরূহ শব্দের প্রয়োগে ভাষা অনেক স্থলে শ্রুতিকটু ও দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। গ্রন্থখানির প্রসাধন-সাধনে রামকানাই বাবু আদৌ চেষ্টা করেন নাই।—উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা পুরাণের বরণীয় চরিত-মালা দেশ-কালের উপযোগী করিয়া বাঙ্গালার শিশুসমাজে উপহার দিতেছেন, তাঁহাদের চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু এ দেশে প্রত্যেক লেখকই স্বতঃসিদ্ধ। নূতন লেখক যেমন গ্রন্থ লেখেন, অমনই মুদ্রা-যন্ত্রে অর্পণ করেন। তাঁহাদের রচনা দেখিয়া দিবার কোনও ব্যবস্থাই এ দেশে নাই। প্রকাশকগণ ছাপিয়া বেচিয়াই কর্ত্তব্য পালন করেন। প্রকাশের পূর্ব্বে বহিগুলির সংস্কারের ব্যবস্থা করিলে, সাহিত্যে আবর্জ্জনার পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে,—সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিতে পারে।

ধ্রুব। শ্রীসতীশচন্দ্র দাস প্রণীত। সচিত্র। মূল্য চারি আনা। পৌরাণিক কাহিনী হিন্দু বালকবালিকার সম্পদ, তাহা 'বিদুর' উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছি। 'ধ্রুব' চলনসই। এই সকল কাহিনী, বর্ত্তমান কালের উপযোগী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চরিতাখ্যানে পরিণত হউক, ইহাই আমাদের কামনা। সতীশ বাবুর 'ধ্রুবে' বিশেষত্ব নাই। শিশুপাঠ্য সাহিত্যের রচনায় সাফল্যলাভ সহজ সাধনার বস্তু নহে। কিন্তু এ দেশে শিশুর লালন-পালনের ন্যায় তাহাদের পাঠ্যরচনাও কাহাকেও শিখিতে হয় না। শিশু-সাহিত্যকে সরস করিবার শক্তি সকল লেখকের নাই। শক্তি বিচার না করিয়া, অথবা শক্তি অর্জ্জন না করিয়াই যাঁহারা শিশু-সাহিত্যের রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সঙ্কল্প সাধু হইলেও, চেষ্টা সফল হয় না। এই জন্য এই শ্রেণীর গ্রন্থে পৌরাণিক আখ্যানের শুচিতা ও মহত্ত্ব, অথবা বর্ত্তমান যুগের উপযোগী গল্পের মনোজ্ঞতা বা সরসতা, কিছুই থাকে না। তবে 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল'। যে দেশে দুষ্টামী 'সাদাবন্ধুর উপদেশ' শিশুদের সঙ্গী হইতে পারে, সে দেশে কাণা খোঁড়া প্রবৃত্ত প্রার্থনীয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

ভারত-স্থাপত্য।

আমরা আমাদের শিল্প সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ অনেক দিন হইতে আমাদের শিল্প সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। তাহার ফলে, দুইটি বিভিন্ন মতের অভ্যুদয় হইয়াছে। এক মতে,—ভারত-শিল্প ভারত-প্রতিভাপ্রসূত। অন্য মতে,—ভারত-শিল্প সম্পূর্ণরূপে পরানুকরণ-প্রসূত না হইলেও, অনেকাংশে পরপ্রভাব-পরিপুষ্ট।

যাঁহারা দ্বিতীয় মতের পক্ষপাতী, তাঁহারাও কিন্তু ভারত-স্থাপত্যকে অনন্যসাধারণ ও ভারত-প্রতিভাপ্রসূত বলিয়া স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তবে কেহ কেহ এখনও বলিতেছেন,—মুসলমান-শাসন-প্রভাবে ভারত-স্থাপত্যের পুরাতন আদর্শ উত্তরকালে কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

এখনও এতদ্বিষয়ের শেষ কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। এখনও অনেক অনুসন্ধানের ও আলোচনার প্রয়োজন আছে;—অনেক কথা বুঝিবার এবং বুঝাইবারও প্রয়োজন আছে। সুতরাং আলোচনা যত অধিক হইবে, সত্যনির্ণয়ের পথ ততই পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে। সেই আশায়, জ্ঞান-লিপ্সু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখনও তথ্যানুসন্ধানে তন্ময় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের তুলনায়, আমরা যাহা করিতেছি, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। সুতরাং তাঁহারা এ সকল বিষয়ে গ্রন্থরচনা করিলে, আমাদের পক্ষে তাহার যথাযোগ্য সমালোচনা করা কঠিন হইয়া পড়ে;—হয় নিরবচ্ছিন্ন স্তুতিবাদে, না হয় নিরবচ্ছিন্ন নিন্দাবাদে,—আমরা আমাদের বিচারদুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া পড়ি।

অধ্যাপক হাভেল ভারত-স্থাপত্য নাম দিয়া সম্প্রতি একখানি সুন্দর সচিত্র গ্রন্থ (১) প্রকাশিত করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকগণের সাহায্যার্থ কোনও কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালী লেখক তাহার সমালোচনাও প্রকাশিত করিয়াছেন। (২) গ্রন্থখানি সদ্যঃপ্রকাশিত বলিয়া, এখনও সকলের নিকট সুপরিচিত হইতে

---

(১) Indian Architecture: Its Psychological, Structure and History, from the first Mahomedan Invasion to the present day.—By E. B. Havell, (John Murray, London, 1913).

(২) ১৩২০ সালের আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে ও 'ভারতী'তে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'পতন' ও 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক প্রবন্ধ উল্লেখ যোগ্য।

পারে নাই। কেহ কেহ ইহার নামমাত্রই শ্রবণ করিয়াছেন। যে অল্প-সংখ্যক বাঙ্গালী পাঠক চক্ষুঃকর্ণের বিবাদভঞ্জনের সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাও সকলে সমানভাবে সকল কথার বিচার করিয়া, এই অভিনব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার যথাযোগ্য অবসর পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

এই গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে কলিকাতার রাজকীয় শিল্প-বিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"তাঞ্জের বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত সিংহলের চণ্ডীশিব নামক পঞ্চচূড় বা পঞ্চরত্নমন্দির এই প্রথায় রচিত।" (৩) বলা বাহুল্য, সিংহলে এরূপ মন্দির নাই; অধ্যাপক হাভেলও এরূপ কথা লিখেন নাই। চণ্ডীশিব একটি ক্ষুদ্র মন্দির হইলেও, তাহার নাম এখন জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে,—তাহা যবদ্বীপে অবস্থিত। আর এক জন লিখিয়াছেন,—"আগ্রার তাজমহল এতদিন Saracenic artএর চরম উৎকর্ষের দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছিল; হাভেল সাহেব জিজ্ঞাসা করেন,—চারি কোণে চারিটি মিনার আর মধ্যস্থলে গম্বুজ জগতের কুত্রাপি Saracenic art-এর এরূপ দৃষ্টান্ত আর আছে কি?" (৪) এইরূপে, অধ্যাপক হাভেল যাহা বলেন নাই,—বলিতেও পারিতেন না,—সেই সকল কথাও তাঁহার মুখে গুঁজিয়া দেওয়া হইতেছে!

অধ্যাপক হাভেল ভারতবাসী না হইয়াও, যেরূপ সহৃদয়তার সদ্ভাবে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রত্যেক ভারতবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু সমালোচনার প্রথম উদ্যমে এই কৃতজ্ঞতা যে ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি বিজয় লাভ করিতে পারে নাই, যাহা বিজয় লাভ করিয়াছে, তাহা ভাব-প্রবণতা—নিন্দায় প্রশংসায় তুল্যরূপে অসংযত,—তুল্যরূপেই অপথ-প্রযুক্ত। প্রথম ভাবোচ্ছ্বাস এইরূপ হইবারই কথা;—তাহা সুবিজ্ঞানের পরিভাষা হইলেও, ভাব-প্রবণতার পক্ষে স্বাভাবিক।

ভারত-স্থাপত্য যে অনন্যসাধারণ ও ভারত-প্রতিভাপ্রসূত, তাহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু ভারত-স্থাপত্য অনন্যসাধারণ কেন, তাহার আলোচনা এখনও সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তাহা কি সর্ব্বতোভাবে আর্য্য-

---

(৩) ভারতী (আশ্বিন, ১৩২০)

(৪) মানসী (আশ্বিন, ১৩২০)

প্রতিভাপ্রসূত? তাহা হইলে, তাহার পক্ষে অনন্যসাধারণ হইবার সম্ভাবনা অল্প হইয়া পড়ে। কারণ, আর্য্য-পরিবার বহু শাখায় বিভক্ত, বহু দেশে উপনিবিষ্ট, এবং বহু ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইলেও, মূলে একবংশসম্ভূত বলিয়া, সকল দেশের সকল শাখার আর্য্য-পরিবারের পক্ষে স্থাপত্য-ব্যবস্থায় কিয়ৎ-পরিমাণে একভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা অধিক। এরূপ অবস্থায় ভারত-স্থাপত্যের অনন্য-সাধারণত্ব একটি প্রহেলিকা-রূপেই প্রতিভাত হয়। তাহার কারণ কি,—ভারত-স্থাপত্য-বিষয়ক গ্রন্থের পক্ষে তাহা একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। অধ্যাপক হাভেলের গ্রন্থে সে আলোচনা স্থান লাভ করে নাই। অধ্যাপক হাভেলের গ্রন্থে এই আলোচনা স্থান লাভ করিবে, এমন আশা করা যাইতে পারে না। তাঁহার গ্রন্থের নাম ভা র ত- স্থা প ত্য হইলেও,তাহা ভারত-স্থাপত্যবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয় নাই। তাহাতে কেবল এক যুগের ভারত-স্থাপত্যের একদেশমাত্রই আলোচিত হইয়াছে;—তাহাও অতি সংক্ষেপে। ১ম,—মুসলমান-শাসন ভারত-স্থাপত্যের মূল গঠনরীতিকে পরি-বর্ত্তিত করে নাই; ২য়,—ভারতবর্ষের পুরাতন স্থাপত্য-প্রতিভা অনাদরে অব-হেলায় নিরাশ্রয়ের ন্যায় পর্য্যটন করিতে বাধ্য হইলেও, এখনও ভারতবর্ষ হইতে চিরপ্রস্থান করে নাই; ৩য়,— দিল্লীর নব রাজনগরের নির্ম্মাণে তাহাকেই আমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য;—এই তিনটি কথাই বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রধান কথা। সুতরাং এরূপ গ্রন্থে ভারত-স্থাপত্যের ধারাবাহিক বিবরণ-লাভের আশা করা যাইতে পারে না;—সেরূপ প্রয়োজনে ইহা আদৌ লিখিত হয় নাই।

ইহা একটি বিশিষ্ট প্রয়োজনে লিখিত হইয়াছে; এবং সেই প্রয়োজনের পক্ষে যাহা অনুকূল, কেবল সেই সকল কথাই ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। কোন্ প্রণালীতে দিল্লীর নব রাজনগর নির্ম্মিত হইবে, তদ্বিষয়ে বিলাতে মত-ভেদ আছে। আমাদের দেশে, ভারতবাসীর মধ্যে, মতভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, আমাদের বর্ত্তমান স্থাপত্য-রীতি হিন্দু হউক আর বৌদ্ধ হউক, অথবা হিন্দু-বৌদ্ধ-ইস্‌লামীয় হউক, তাহা এখন আমাদের। আমাদের দেশের রাজধানীর রচনাকার্য্যে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য সাধু। উদ্দেশ্য সফল হইলে, আমাদেরই লাভ। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফল হউক, এই প্রার্থনায় সকল ভারতবাসীই সমস্বরে যোগদান করিতে পারেন। তথাপি ইহা অল্প লাভ; কেন না, ইহা কেবল সাময়িক লাভ। এই গ্রন্থে যে সকল নূতন কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত

বলিয়া সভ্য-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলে, আরও অনেক বিষয়ে আমরা লাভবান হইতে পারিব। ভারত-শিল্পের কথা উঠিলে, ভারতবর্ষের বাহিরেই তাহার উদ্ভব-ক্ষেত্রের অনুসন্ধান করিবার প্রথা মর্য্যাদা লাভ করিত। ভারতবর্ষের মধ্যেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে; এবং অনুসন্ধান করিতে জানিলে, ভারতবর্ষের মধ্যেই প্রমাণ-পরম্পরার অভাব ঘটিবে না,—এই কথার প্রচার করিতে গিয়া, অধ্যাপক হাভেল ভারতবর্ষের সম্মুখে এক নূতন আশার আলোক-বর্ত্তিকা সংস্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ নানা কারণেই অভ্যর্থনা-লাভের যোগ্য।

গ্রন্থারম্ভে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকার অবতারণা করিয়া অধ্যাপক হাভেল লিখিয়াছেন,—"ফরগুসনের গ্রন্থ পাশ্চাত্য স্থপতিগণের পুস্তকালয়ে সমাদরের সহিত স্থান প্রাপ্ত হইলেও, ইহা সেই শ্রেণীর গ্রন্থ, যাহা কেহ কখনও পাঠ করেন না।" (৫) ইহা সত্য হইলে, বিস্ময়জনক। তবে সুখের বিষয় এই যে, অধ্যাপক হাভেল তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন নাই। তিনি যত্নপূর্ব্বক ফরগুসনের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং তাহা হইতে অনেক প্রমাণ ও চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

ফরগুসনের সঙ্গে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের নানা বিষয়ে মত-পার্থক্য সংঘটিত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া কথিত হইতে পারে না। তিনি নিজেও সেরূপ সম্ভাবনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন ভারতবর্ষের অনেক স্থাপত্য-নিদর্শন অনাবিষ্কৃত ছিল,—যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও অনেক নিদর্শনের অধিষ্ঠানক্ষেত্র বিলক্ষণ দুর্গম বলিয়াই পরিচিত ছিল। এরূপ অবস্থায়, অল্পসংখ্যক নিদর্শনের সাহায্যে, তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে গ্রন্থ-রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার গ্রন্থ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত বলিয়া, তখনও, এবং এখনও, তাঁহার গ্রন্থই ভারত-স্থাপত্যের প্রধান গ্রন্থ। বিলাতের স্থপতিগণ এখন আর তাহা অধ্যয়ন করেন কি না, জানি না, কিন্তু তিন বৎসর পূর্ব্বেও (১৯১০ খৃষ্টাব্দে)

---

(৫) Fergusson only read into Indian Architecture the values he attached to it from his knowledge of Western archæology, and consequently the only result of his magnificent pioneer work has been to give the subject an honourable place in the Western architect's library among the books which are never read.—Preface.

বিলাতেই তাঁহার গ্রন্থের অভিনব সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে ;—দুর্মূল্য হইলেও, তাহার গ্রাহকের অভাব ঘটে নাই। বিলাতের লোকে সত্য সত্যই তাহা পাঠ করিতে বিরত হইয়া থাকিলেও, সেই দৃষ্টান্তে, আমাদের পক্ষে ফরগুসনের গ্রন্থকে পরিত্যাগ করিবার বা অবজ্ঞা করিবার উপায় নাই ;—অধ্যাপক হাভেলও তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

ভূমিকার আর এক স্থলে অধ্যাপক হাভেল লিখিয়াছেন,—"প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য-নির্ণয়ের জন্য" তিনি "প্রধানতঃ যে দলিলগুলির উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাহা অট্টালিকার নিকটই প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য"। (৬) ইহা নূতন বিচাররীতি নহে ;—ইহাই চিরপরিচিত এবং চিরপুরাতন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক হাভেল যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের কথা নহে, তাহা নূতন কথাও নহে,—তাহা ফরগুসনের অমর-গ্রন্থের সুপরিচিত উক্তির পুনরুক্তিমাত্র। (৭) ফরগুসনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত সিদ্ধান্তে, এবং অধ্যাপক হাভেলের নবপ্রকাশিত গ্রন্থের তদ্বিষয়ক পুনরুক্তিতে এই বিষয়ে মতপার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। উভয়ের দলিল এক ;—কেবল ব্যাখ্যাপদ্ধতি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন।

অট্টালিকাকে প্রধান ও নির্ভরযোগ্য দলিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে, পাথর কুড়াইবার প্রয়োজনকেও স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তাহার

(৬) In working out the principal historical sequences, I have relied chiefly upon the documents which the buildings themselves provide : they are by far the most reliable.—Havell.

(৭) Some men of great eminence and learning, more conversant with books than buildings, have naturally drawn their knowledge and inferences from written authorities, none of which are contemporaneous with the events they relate and all of which have been avowedly altered and falsified in later times. My authorities, on the contrary, have been mainly the imperishable records in the rocks or on sculptures and carvings, which necessarily represented at the time the faith and feelings of those who executed them, and which retain their original impress to this day. In such a country as India, the chisels of her sculptures are, so far as I can judge, immeasurably more to be trusted than the pens of her authors.—
Fergusson.

জন্ত অনুসন্ধান-সমিতি ও মূর্ত্তিভবনও গঠন করিতে হয়। পাথর কুড়াইবার জন্ত পাথর কুড়াইতে কেহই পরামর্শ দান করেন না। পাথরই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য দলিল বলিয়া,—অনন্যোপায় হইয়াই,—পাথর কুড়াইতে হয়। ফরগুসন ইহাকে অবজ্ঞা করেন নাই, অধ্যাপক হাভেলও ইহাকে অবজ্ঞা করেন নাই। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু অধ্যাপক হাভেলের গ্রন্থ-সমালোচক এ বিষয়ে কিছু নূতন কথা শুনাইয়াছেন। যথা ;—

(১) "যদি সাহেবদের ন্যায় মূর্ত্তিসংগ্রহেরই 'বাতিক' আমাদের সম্পূর্ণ 'চাপিয়া' উঠে অথচ মূর্ত্তিপূজার বা মন্দির-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাটা সম্পূর্ণ লোপ পায়, তবে সবই ব্যর্থ।"

(২) "ইহার পর আমরা আর যেন নিজেকে (?) বিশ্বকর্ম্মার পৌরোহিত্যের অধিকারী ভাবিয়া গর্ব্বভরে অনুসন্ধান-সমিতি ও মূর্ত্তিভবন গঠন করিতে না চলি।"

(৩) "ভারতবর্ষের স্থপতিগণের বুকে পা দিয়া দাঁড়াইয়া মূর্ত্তি পরিচয়, স্থাপত্য-পাণ্ডিত্যাভিনয়, এবং যাদুঘরের ভেল্কীবাজি আমাদের আসল কাজ নয়।"

যদি সমালোচক মহাশয়ের মনে সত্য সত্যই মূর্ত্তিপূজার অথবা মন্দির-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জাগিয়া থাকে, তাহা সুসমাচার। কিন্তু যাঁহারা আমাদের বিলুপ্তপ্রায় শিল্পপ্রতিভার পুনরুজ্জীবনসাধনের জন্ত প্রাণপণ করিতেছেন, সেই অধ্যাপক হাভেল প্রমুখ ভারতহিতৈষিগণের মনে মূর্ত্তিপূজার বা মন্দির-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা না জাগিলেও, তাঁহারা কেহই "সবই ব্যর্থ" বলিয়া হাহাকার করিতেছেন না। আবার যাঁহাদের মনে মূর্ত্তিপূজার ও মন্দির-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা চিরদিন সমান জাগরূক আছে বলিয়া, মূর্ত্তিপূজা ও মন্দির-প্রতিষ্ঠা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারিতেছে না, তাঁহারা সেই সাধু ইচ্ছা লইয়াও ভারত-শিল্পের "সবই সফল" করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং ইহার মূলে নিশ্চয়ই আরও কিছু আছে, তাহারই তথ্যানুসন্ধানের সময় আসিয়াছে। এ সময়ে তথ্যানুসন্ধান পরিত্যাগের উপদেশ, আমাদের আলস্য-প্রবণ দুর্ব্বল প্রকৃতির পক্ষে মুখরোচক হইলেও, সুধীসমাজে সদুপদেশ বলিয়া অবনতমস্তকে স্বীকৃত হইবে না। যাঁহারা দেশের দশের সঙ্গে মিলিয়া দেশের প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন,—পাথরের দলিলের অনুসন্ধানের

ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিয়া উপায় নাই। তাহাই নবযুগের নূতন ব্রত। অধ্যাপক হাভেল স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়া থাকিলেও, তাঁহার গ্রন্থ-সমালোচককে সে কথা স্বীকার করাইতে পারেন নাই!

যদি তর্কের জন্য তর্ক করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, 'যাদুঘরে'র সযত্ন-সংগৃহীত পুরাকীর্ত্তির নিদর্শননিচয়কে 'ভেল্কীবাজি' বলিয়া উপহাস করা সহজ ও স্বাভাবিক। তুলনায় সমালোচনা করিয়া, জ্ঞানলাভ করা অভিপ্রেত হইলে, শিক্ষাগারের ন্যায় 'যাদুঘরে'ও সমুচিত সম্ভ্রমের সঙ্গেই প্রবেশ করিতে হইবে। তথায় ঔদ্ধত্যের স্থান নাই, অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ নাই;—তথায় যাহা আছে, তাহা সাধকের সিদ্ধপীঠ। সে সিদ্ধপীঠে ভক্ত-সমাজের প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি, দেবমূর্ত্তিকে অতিক্রম করিয়া, মূর্ত্তি-রচয়িতা শিল্পিগণের পাদপদ্মেই নিয়ত স্তূপীকৃত হইতেছে। আমাদের দেশের লোক অধুনা আত্মবিস্মৃত;—তাই তাহারা ভারতবর্ষের পুরা-পরিচিত 'চিত্রশালা-গৃহে'র নাম রাখিয়াছে 'যাদু-ঘর,—সুতরাং তাহা এখন 'ভেল্কীবাজি'র আধার বলিয়া আমাদের সাহিত্যেও উল্লিখিত হইতেছে। আমাদের 'আসল কাজ' যাহাই হউক, তাহা উপহাস-লোলুপতা হইতে পৃথক্।

আমাদের দেশ বচনবাগীশের দেশ। এ অখ্যাতি অনেক দিনের অখ্যাতি। সৌভাগ্যক্রমে তাহার দিন ক্রমে সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। অল্পদিনের মধ্যে একে একে অনেক অনুসন্ধান-সমিতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। স্বদেশের বিদেশের সদাশয়গণ আমাদের দেশের এই অভিনব আত্মচেষ্টায় উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। এ সময়ে ইহাকে অবজ্ঞা করা,—'বাতিক চাগা' বলিয়া উপহাস করা,—অনুসন্ধান-চেষ্টা পরিত্যাগ করিবার জন্য পরামর্শ দান করা যে সময়োচিত হয় নাই, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

যে পথ তথ্যানুসন্ধানের প্রকৃত পথ বলিয়া সমগ্র সভ্যসমাজে এক-বাক্যে স্বীকৃত ও অবলম্বিত হইয়াছে,—যে পথে পূর্ব্বাচার্য্যগণ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আজ অধ্যাপক হাভেলের পক্ষে ও অন্যান্য শিল্পাচার্য্যগণের পক্ষে ভারতশিল্পের আলোচনা অল্পায়াস-সাধ্য হইয়াছে,—যে পথে এখনও অনেক দূর অগ্রসর হইতে না পারিলে, ভারতশিল্পের মূলপ্রকৃতি যথাযোগ্যভাবে নির্ণীত ও সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারিবে না,—সে পথ পরিত্যাগ করিতে হইলে, ভারত-শিল্পকে আবার নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা কত

কঠিন হইয়া পড়িবে, তাহা বাঙ্গালা দেশে কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার জন্য এখন আর আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

"বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ—তর্কে বহু দূর।"

এখন আর সকল প্রকার সাধনার পক্ষেই এই প্রবাদবাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে না। এখন যে যুগ আসিয়াছে, তাহা বিচারণার যুগ। এখন তথ্যানুসন্ধানের পথ পরিত্যাগ করিতে হইলে, গৃহকোটরে আবদ্ধ হইয়া, কল্পনাকেই সারসত্য বলিয়া অবলম্বন করিতে হইবে;—শিল্পকলার স্বেচ্ছাচারকে ক্রমোন্নতি মনে করিয়া, চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে হইবে। তাহাতে অবশ্যই আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না,—মৃত্তিকা-খননের অকীর্ত্তিকর শ্রমস্বীকারে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে না;—ধ্বংসাবশিষ্ট পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন-সংরক্ষণের জন্য অর্থব্যয়ও করিতে হইবে না। কিন্তু জ্ঞান-সাম্রাজ্যের বিজয়-যাত্রায় অনেক দূর পিছাইয়া পড়িতে হইবে।

যাহার দলিল নাই, সে মর্য্যাদাহীন। আমাদের দলিল—পাথর। এ কথা এখন আর তর্কসঙ্কুল নাই। গ্রীস-রোম অতিক্রম করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এখন মিশরে, ক্রীটে, সিরিয়ায়, সাইবেরিয়ায়,—আমাদের দেশেও আমাদের পূর্ব্বতন প্রভাব-পরিপুষ্ট প্রাচ্য ভূমণ্ডলে,—পাথর কুড়াইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহাকে 'বাতিক চাগা' বলিয়া উপহাস করা সহজ; তাহার অনুসরণ করা কঠিন।

যে সকল বিষয় সত্য সত্যই তর্কসঙ্কুল, সেই সকল বিষয়ে কোনও কথাই দৃঢ়স্বরে ব্যক্ত করা চলে না। যাহার প্রমাণ অল্প বা দুর্ব্বল,—যাহা ব্যাখ্যাকৌশলে উভয়পক্ষেই "প্রমাণ" বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে,—তাহার উপর নির্ভর করিয়া অনুসন্ধান ও আলোচনা চলিতে পারে,—দৃঢ়স্বর অ-চল। কিন্তু সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"ফার্গুসন প্রভৃতি পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ যে সকল ভারতীয় ইমারতগুলিকে (?) আরবা, নহে ত পারস্য বলিয়া আমাদের ধোঁকা দিয়া বোকা বুঝাইয়া গিয়াছেন, সেগুলা যে সম্পূর্ণ—'ক নির্ম্মাণ-কৌশলে কি ভাবভঙ্গীতে —আমাদের, এটা আজ আমরা প্রথম হ্যাভেল সাহেবের নিকট হইতে লাভ করিলাম।" কি লাভ করিলাম, তাহা বুঝাইবার জন্য সমালোচক মহাশয় পুনশ্চ লিখিয়াছেন,—"কি সুন্দর করিয়া হ্যাভেল বুঝাইয়াছেন যে তাজ, আরব্য-উপন্যাসের স্বপ্ন দিয়া গড়া নয়, কিন্তু আমাদের বহু শিল্পীর বহু

সাধনার চরম সার্থকতা; এবং তাহার আদ্যন্ত সমস্তটা 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁম্' এই মহামন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

ফরগুসনের ও অধ্যাপক হাভেলের গ্রন্থে এত দৃঢ়স্বর ব্যক্ত হইতে পারে নাই। কাহাকেও "ধোঁকা দিয়া বোকা বুঝাইয়া" যাওয়া ফরগুসনের মতলবের মধ্যে আসিবার কারণ ছিল না। অধ্যাপক হাভেলও তাঁহার গ্রন্থের কোনও স্থানেই বলেন নাই,—"তাজের আদ্যন্ত সমস্তটা 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁম্' এই মহামন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।" তাজের "আদ্যন্ত সমস্তটা" অনেকটা;—অধ্যাপক হাভেল ততটার আদৌ আলোচনা করেন নাই। তিনি যতটার আলোচনা করিয়াছেন, তাহার প্রধানটা তাজের গম্বুজটা;—সেটার গঠন-কৌশলটা সর্ব্বাংশে আমাদের কোন্‌টার সঙ্গে "সম্পূর্ণ" মিলিয়া যায়, অধ্যাপক হাভেল সমগ্র উত্তর-ভারতটা তন্ন তন্ন করিয়াও তাহা বাহির করিতে পারেন নাই!

অতি পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাহিরের নানা দেশের নানা সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেই সুদীর্ঘ ভারত-সংসর্গে অনেক দেশ প্রকারান্তরে ভারত-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সে সম্পর্ক কি কেবল প্রদানের সম্পর্ক ছিল,—আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিল না? ইহা বড় ধীর ভাবে—বড় নিরপেক্ষ ভাবে—বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। সে ভাবে ইহার বিচার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলেও, অধ্যাপক হাভেল সত্য সত্যই একটি নূতন কথা প্রথম শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"মোগল-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-শিল্পে পারসীক প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মুসলমান-প্রাধান্যের অভ্যুদয়লাভের বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে সমগ্র পশ্চিম এসিয়া-খণ্ডে,এবং আরও বহুদূরে যে বৌদ্ধ-প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাকে অনেকাংশে তাহারই প্রত্যাবর্ত্তন বলিয়া মনে করিতে হইবে।" (৮) ইহা আমাদের আত্মগৌরব চরিতার্থ করিবার পক্ষে যতই উপযোগী হউক না কেন, ইহা সত্য কি না, তাহার অনুসন্ধান-আলোচনার প্রয়োজন তিরোহিত হয় নাই। অধ্যাপক হাভেল বরং তথ্যানুসন্ধানের একটি নূতন পথের সন্ধান প্রদান করিয়া-

---

(৮) The Persian influence which flowed into India with the founding of the Mogul Empire, was largely a return wave of the Buddhist influences which spread from India into Western Asia and far beyond, centuries before the Mahomedan supremacy —p.99

হেন। যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত অধ্যাপক হাভেলের ন্যায় মুক্তকণ্ঠে এ কথার প্রচার করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে তিরস্কার করা যায় না। তিরস্কার, উপহাস, অভিসম্পাত এখনও ন্যায়শাস্ত্রে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে নাই।

অতি অল্পদিন পূর্ব্বে, পাথরের দলিলের উপর নির্ভর করিয়াই, সুপণ্ডিত ভিন্সেন্ট স্মিথ লিখিয়াছেন,—"মুসলমান-শাসন দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া, তাহার প্রভাবে, ভারত-স্থাপত্যরীতি কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।" অধ্যাপক হাভেলের নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। বিচার-নিপুণ অধ্যাপক হাভেল ইহার উল্লেখ করেন নাই। তিনি কেবল নানা ভাবে এই সিদ্ধান্তটি অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া,—মোগল-শাসনকালে "পারসীক প্রভাবে"র অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে না পারিয়া,—"পারসীক প্রভাব"কে ভারতীয় বৌদ্ধ-প্রভাবের প্রত্যাবর্ত্তন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইহার ফলে, মুসলমান-শাসন-সময়ের জগদ্বিখ্যাত কীর্ত্তিস্তম্ভ—তাজমহল—ভাব-সম্পদে হিন্দু-প্রতিভাপ্রসূত, [অথবা নিতান্ত পক্ষে] ভারত-প্রতিভা-প্রসূত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অধ্যাপক হাভেল এ বিষয়ে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ (৯) প্রণয়ন করিয়াছিলেন,—বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার কথা পুনরুক্ত হইয়াছে।

যে যুগে তাজমহল রচিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানের ভাব-সমন্বয়-যুগ। সে যুগে হিন্দু-মুসলমানের রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা এক হইয়া গিয়াছিল,—কথোপকথনের ভাষা এক হইয়া গিয়াছিল,—উৎসব আনন্দ এক হইয়া গিয়াছিল,—ভাবস্রোত একই খাতে সম্মিলিত প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছিল। সে যুগে কি কেবল ভারত-স্থাপত্যেই ভাব-সমন্বয়ের প্রভাব কিছু-মাত্র ব্যাপ্ত হইতে পারে নাই? তাজ দেখিলে স্বতই মনে হয়,—তাজ 'হিন্দু'র নহে, 'মুসলমানে'রও নহে,—তাজ 'হিন্দু-মুসলমানের'। তাহাতে হিন্দু-মুসলমানের রচনা-প্রতিভা বাহুতে বাহু বেষ্টন করিয়া, অনির্ব্বচনীয় প্রীতি-বন্ধনে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছে! পরলোকগত ওকাকুরা লিখিয়াছিলেন,—শিল্পের ভাব-সম্পদে "সমগ্র এসিয়াই এক"। (১০) তাজ তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া কথিত হইতে পারে।

---

(৯) Handbook to Agra and the Taj.

(১০) Art ideals of the East.

যে তাজ দেখিয়াছে, তাহাকেই আত্মহারা হইতে হইয়াছে। তাজ অদ্বিতীয় মর্ম্মর-স্বপ্ন,—যেমন সুন্দর, সেইরূপ অনির্ব্বচনীয়। নিস্তব্ধ নিশীথে,—কৌমুদী-বিধৌত নীল নভোমণ্ডলের সুবিস্তৃত চারু চন্দ্রাতপতলে,—তাজের শুভ্র সুষমা যখন ধীরে ধীরে স্বচ্ছ শিশিরাবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে আপন অমলাবণ্যের আভাস প্রদান করে, তখন তাহা যেমন অনির্ব্বচনীয়,—তাহার দীপ্ত-দিবালোক-পুলকিত প্রসাদ-প্রফুল্ল সুবিমল হাস্যচ্ছটাও সেইরূপ অনির্ব্বচনীয়। ঊষায়, প্রদোষে,—প্রভাত-তপনের প্রথম কিরণপাতে,—সায়াহ্নের স্তিমিত-রশ্মির আরক্তিম অন্তিম অন্তর্ধানে,—তাজের শোভাই তাজের শোভার একমাত্র তুলনা-স্থল। সে শোভা কেবল অট্টালিকার শোভা নয়,—ভারতবর্ষের নীল নভোমণ্ডলের নৈসর্গিক শোভার সঙ্গে তাজতটবাহিনী কলিন্দ-নন্দিনীর নীলসলিলধারার নৈসর্গিক শোভাও, কৃত্রিমের সঙ্গে অকৃত্রিমের অপূর্ব্ব সম্মিলনে, মোহবিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। (১১)

এমন অদ্বিতীয় স্থাপত্য-সুষমার রচনা-গৌরব যদি কেবল ভারতবর্ষেরই প্রাপ্য হয়, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে আত্মগৌরব সংস্থাপনার আমোঘ অস্ত্র হইতে পারে। অধ্যাপক হাভেল বলেন,—স্থাপত্য-বিজ্ঞানের প্রমাণে ভারতবর্ষই এই গৌরবের একমাত্র অধিকারী। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি অনেক আয়াস স্বীকার করিয়াছেন;—তাহা বুঝিতে হইলেও, অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, অধ্যাপক হাভেল বলেন,—"তাজ ইস্লামের নহে, তাজ ভারতবর্ষের"। (১২)

তাঁহার তর্ক-প্রণালীতে নূতনত্ব আছে। তাহা কিয়ৎপরিমাণে কবিত্বময়; সুতরাং তাহাকে সর্ব্বাংশে বৈজ্ঞানিক বিচার-প্রণালী বলিয়া অভ্যর্থনা করিবার উপায় নাই। অভ্যন্তরের বিচিত্র কারুকার্য্য নিরতিশয় শোভাময় হইলেও,

---

(১১) * Beautiful as it is in itself, the Taj would lose half its charm if it stood alone. It is the combination of so many beauties, and the perfect manner in which each is subordinated to the other, that makes up a whole which the world can not match, and which never fails to impress even those who are most indifferent to the effects produced by architectural objects in general.—Fergusson's History. vol. II. P. 313.

(১২) The Tajmahall belongs to India, not to Islam. P. 21

বাহ সেতাই তাজের প্রধান শোভা। তাহা রচনা-সামঞ্জস্যের অপূর্ব্ব পরিণাম। অধ্যাপক হাভেল বলেন,—শাহজাঁহা-দয়িতা মমতাজ-মহলের অনিন্দ্যসুন্দর অঙ্গলাবণ্য প্রতিবিম্বিত করিতে গিয়াই, (১৩) ভাব-প্রবণ ভারতশিল্পী অজ্ঞাতসারে এই অনন্য-সাধারণ স্থাপত্য-সুষমা উদ্ভাবিত করিয়া থাকিবেন। ইহা ইতিহাস নহে ;—কাব্য। ইহা সত্য কি না, তাহা জ্ঞানগম্য নহে, ধ্যানগম্য। কারণ, তাজের ভুবনবিখ্যাত কারুকার্য্যের মধ্যে [শাহজাঁহা-দয়িতার ?] শাড়ীখানি পর্য্যন্ত নাকি দেখিতে পাওয়া যায় ! (১৪) তাজ মর্ম্মরবিরচিত গীতি-কাব্য। কবি না হইলে, তাহার এই শ্রেণীর সকল সৌন্দর্য্য সকলে অনুভব করিবার আশা করিতে পারেন না। বরং যাঁহারা অরসিক, তাঁহারা 'পেশোয়াজে'র পরিবর্ত্তে 'শাড়ী'র কথায় থতমত খাইয়া, কিঞ্চিৎ রসভঙ্গেরই আশঙ্কা উপস্থিত করিতে পারেন !

সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমষ্টিগত সৌন্দর্য্যই অনেক সময়ে সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। সে সৌন্দর্য্য কোনও নির্দ্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করে না। তাজের সৌন্দর্য্য সেরূপ নহে। তাহার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সমানভাবে সৌন্দর্য্যময়,—তাহাদের সমষ্টিগত সৌন্দর্য্য সেই জন্য এত মোহ বিস্তার করিতে পারে। অধ্যাপক হাভেল বলেন,—ইহার সহিত ইস্‌লামের সম্পর্ক নাই। যে যমুনার "নীল সলিলে" তাজের "ধবল সৌধচ্ছবি" প্রতিবিম্বিত হইয়া, "নভ-অঙ্গনে"র অনুকরণ করিতেছে, সে যমুনা যেমন কেবল ভারতবর্ষের, তাহার তটতল-সমুত্থিত এই মর্ম্মর-কীর্ত্তিও সেইরূপ কেবল ভারতবর্ষের। এক হিসাবে ইহা সত্য ;—কেন না, তাজ কেবল ভারতবর্ষেই অবস্থিত। আর এক হিসাবেও ইহা সত্য ; —কেন না, তৎকালে ভারতবর্ষেই সমগ্র এসিয়ার কলা-কুতূহল কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

তাজ এক সময়ে ইতালীয় শিল্পীর অতুল কীর্ত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ভারতবর্ষের রচনা-প্রতিভায় আস্থাস্থাপন করিতে

---

(১৩) If they could not carve her statue, they could satisfy Shah-Jahan's desire for a movement which should be one of the world's wonders by creating an unique architectonic symbol of her loveliness.—P. 29

(১৪) As if to simulate a matchless loom-embroidered *Sari*.—P. 92

শাহেব করিয়াছেন না। এখন ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। অধ্যাপক হাভেল তাজের প্রধান প্রধান কারিগরগণের পরিচয়-প্রদানের জন্য লিখিয়াছেন,—"কান্দাহারের মহম্মদ হানিফ,—মুলতানের মহম্মদ সইদ ও আবুতোরা,—কমের ইস্মাইল খাঁ,—সমরকন্দের মহম্মদ সরিফ,—লাহোরের কাজিম খাঁ,—তাজ নির্ম্মাণের বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাদের সঙ্গে অনেক হিন্দু শিল্পীও মিলিত হইয়াছিলেন। যিনি সকলের কার্য্যপরিদর্শক ও কার্য্যপরিচালক ছিলেন, তাঁহার নাম ওস্তাদ ঈশা। কেহ বলেন,—তিনি আগ্রা-নিবাসী ছিলেন; কেহ বলেন,—তিনি সিরাজ হইতে আসিয়াছিলেন।"

এই সকল প্রমাণে, তাজের নির্ম্মাণ-কার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে মুসলমান-শিল্পীর প্রধান সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা প্রকাশিত হইলেও, অধ্যাপক হাভেল বলেন,—"তাঁহারা ধর্ম্মে মুসলমান হইলেও, ভারতীয় শিল্পপদ্ধতিরই উপাসক ছিলেন।" ইহার অনুকূল লিখিত প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং মনে করিতে হইবে,—রচনার মধ্যেই ইহার প্রমাণ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সেই প্রমাণ উদ্ঘাটিত করিবার জন্য, কয়েকটি গম্বুজের চিত্র অঙ্কিত করিয়া, অধ্যাপক হাভেল লিখিয়াছেন.—"ভারতবর্ষের বাহিরের কোনও স্থানের গম্বুজের সহিত তাজের গম্বুজের সাদৃশ্য নাই। যাহার সহিত সাদৃশ্য আছে, তাহা ইস্লামের নহে,—তাহা ভারতীয় বৌদ্ধ-শিল্পের। বৌদ্ধ-স্তূপের গম্বুজের আদর্শেই তাজের গম্বুজ নির্ম্মিত হইয়াছে।"

এই সিদ্ধান্ত বিচার-সহ কি না,—কিংবা এই সিদ্ধান্ত কত দূর বিচারসহ,—তাহা সহসা স্থিরীকৃত হইতে পারে না। সুধীগণ তাহার যথাযোগ্য আলোচনা করিতে পারিবেন। এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদি-সম্মত হইতে পারিলে, ভারতবর্ষকে এক নূতন গৌরব দান করিতে পারিবে,—ভারত-স্থাপত্যের ইতিহাসও নূতন ভাবে সঙ্কলিত করাইবার প্রয়োজন উপস্থিত করিবে। অধ্যাপক হাভেল এ সম্বন্ধে যতটুকু লিখিয়া নিরস্ত হইয়াছেন, কেবল তাহার উপর নির্ভর করিয়া, আমরা সহর্ষে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেই, সকলে ইহাকে স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন, এমন বোধ হয় না। অন্ততঃ ভারতবর্ষের মুসলমান অধিবাসিগণ ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িবেন। [illegible] তাজেরই প্রয়োজন থাকে। অধ্যাপক হাভেলের প্রয়োজন প্রয়োজন [illegible] তাহা [illegible] প্রণালীতে ভারত-স্থাপত্যের [illegible] আলো-

চনার প্রয়োজন হইতে পৃথক্। তাহা আর কিছু নয়,—দ্বিতীয় নবরাজনগর-নির্মাণে ভারত শিল্পীকে নিযুক্ত করাইবার জন্য রাজপুরুষগণকে প্রবৃত্তি-প্রদান। গ্রন্থশেষে একখানি আবেদনপত্রে তাহা স্পষ্টাক্ষরেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই প্রবৃত্তি প্রদান করিতে চাহিলেই তর্ক উঠিতে পারে,—সত্য সত্যই তর্ক উঠিয়াছেও,—এখন আর ভারত-শিল্পী কোথায়—ভারত-স্থাপত্যের পুরাতন আদর্শই বা কোথায়? সে প্রাণ নাই,—সে আত্মত্যাগ নাই,—সে একনিষ্ঠা নাই,—সে ভক্তিবিশ্বাস নাই,—অথচ সে পুরাতন শিল্পাদর্শ আছে,—এরূপ সম্ভাবনায় সকলে আস্থা-স্থাপন করিতে পারেন না। সুতরাং এই শ্রেণীর তর্ক নিরস্ত করিবার জন্য দেখাইতে হইবে,—অনাদরে অবহেলায় জীবন্মৃত ভারত-শিল্পী, নবযুগের নবীন পরিবর্ত্তন-স্রোতে বিপর্য্যস্ত হইয়াও, ভারতভূমি হইতে এখনও চিরপ্রস্থান করে নাই; তাহাদের হৃদয়ে এখনও ভারতবর্ষের চিরপুরাতন স্থাপত্যের আদর্শ বর্ত্তমান আছে। আরও দেখাইতে হইবে,—সুদীর্ঘ মুসলমান-শাসনে পুরাতন আদর্শের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, পুরাতন আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে নাই;—মুসলমান ভারতবর্ষে আসিয়া কেবল শিখিয়াছে, কিছুই শিখাইতে পারে নাই। গ্রন্থের প্রয়োজন-সাধনের জন্য একটি একটি করিয়া এই সকল কথার অবতারণা করিতে হইত। অধ্যাপক হাভেলও ঠিক তাহাই করিয়াছেন। তর্কগুলি নিরস্ত হইয়াছে কি না, তাহা পৃথক্ কথা। কিন্তু ইহাই যে গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা গ্রন্থ পাঠ করিবামাত্র প্রতিভাত হয়।

এরূপ গ্রন্থ, যতই সুলিখিত হউক না কেন, অজ্ঞাতসারে একদেশ-দর্শী হইয়া পড়ে;—উদ্দেশ্যের অনুকূল সামান্য প্রমাণকে প্রধান প্রমাণ বলিবার প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারে না,—উদ্দেশ্যের প্রতিকূল প্রধান প্রমাণকেও উল্লিখিত বা আলোচিত হইবার যথাযোগ্য অবসর দান করে না। এরূপ গ্রন্থের বিশ্লেষণ-ব্যাপার আয়াসসাধ্য; সতর্ক দৃষ্টিতে তাহার অনুসরণ করিতে না পারিলে, রচনা-লালিত্যে আত্মহারা হইবার আশঙ্কা থাকে;—ইহার অভি-ভুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, সমালোচনা ভাবপ্রবণ হইয়া, সমালোচনার প্রকৃত পারে।উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিতে

সুদীর্ঘ মুসলমান-শাসনসময়ে ভারতবর্ষে একটি অভিনব স্থাপত্য-রীতি ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ 'ইন্দো-সারাসানিক', কেহ বা 'ইন্দো-ইস্লামিক' বলিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছেন। এই নামকরণের বিরুদ্ধে

অনেক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। ইহাকে সর্ব্বাংশে বৈজ্ঞানিক প্রথার নামকরণ বলা যাইতে পারে না। তথাপি মুসলমান-শাসন-সময়ে একটি বিশিষ্ট স্থাপত্য-রীতি যে সত্য সত্যই গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, অট্টালিকার অভ্রান্ত দলিলে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধ্যাপক হাভেল নিজেও তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাহাই কি ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে তাজের রচনা-চেষ্টাকে চরিতার্থতা দান করে নাই? মুসলমান-শাসন-সময়ে মুসলমান সুলতানগণের উৎসাহে ও অর্থব্যয়ে যে ভাবের অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার সহিত পুরাতন ভারত-স্থাপত্য-রীতির অনেক সম্পর্ক থাকিলেও, তাহাকে কি "সর্ব্বাংশে" পুরাতন ভারত-স্থাপত্য-রীতির "সম্পূর্ণ" নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করা যায়?

অধ্যাপক হাভেল গুজরাতকে ও গৌড়কে এই অভিনব স্থাপত্য-কলার প্রধান সৃষ্টিকেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া, প্রকারান্তরে ইহার স্বাতন্ত্র্য বিঘোষিত করিয়াছেন। (১৫)গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সকল অট্টালিকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা মুখ্যতঃ ইষ্টকালয় হইলেও, রচনা-গাম্ভীর্য্যে উল্লেখযোগ্য। এই সকল অট্টালিকার এবং অন্যান্য অট্টালিকার অনেকগুলি সচিত্র বিবরণ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া অধ্যাপক হাভেল বলিয়াছেন,—তাহার মূলে হিন্দুর স্থাপত্য-রীতি, অথবা তাহার মূলে যে স্থাপত্যরীতি, ভারতবর্ষই তাহার উদ্ভব-ক্ষেত্র।

(১৫) মহামনা আকবরের আদেশে আগ্রার কিল্লামধ্যে অনেকগুলি গৌড়ীয় রীতির প্রাসাদও নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিজয় রাজ্যের চতুর্দ্দশ সম্বৎসরে আকবর আগ্রায় আসিয়া তাহাতে বাস করিয়াছিলেন। তাহা আইন-ই-আকবরিতে "বেঙ্গলী মহল" নামে উল্লিখিত আছে; কেহ কেহ বলেন,—এখন যাহা "জাহাঙ্গীরি মহল" নামে পরিচিত তাহারই নাম ছিল "বেঙ্গলী মহল" এই নামকরণ সম্বন্ধে আইন-ই-আকবরিতে (দ্বিতীয়ভাগ ১৮০পৃষ্ঠায়, যাহা লিখিত আছে, তদনুসারে ১৯০৩—৪ খৃষ্টাব্দের "আরকিওলজিকাল সরভে অব ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে,—"The reason for the name Bengali Mahall may he found in the statement made in the Ain to the effect that Akbar's fort in Agra contains more than five hundred stone edifices in the five styles of Bengal and Gujrat." সুতরাং গৌড়কে এবং গুজরাতকে স্থাপত্য রচনার সৃষ্টিকেন্দ্র বলিতে গিয়া, অধ্যাপক হাভেল কোনও নূতন তথ্যের আবিষ্কার সাধন করেন নাই; যাহা ইতিহাসে উল্লিখিত ও সুপরিচিত, তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। তাজের রচনা-রীতিতে গৌড়ীয় রচনারীতির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় কি না, অধ্যাপক হাভেল তাহার আলোচনা করেন নাই।

এই সকল অট্টালিকার গম্বুজগুলি যে ভাবে গঠিত, সে ভাবে বৌদ্ধের আদর্শে তাহাদের গম্বুজ গঠিত হয় নাই। মুসলমান-শাসনের প্রথম আমলের গম্বুজ অপেক্ষা শেষ আমলের গম্বুজ কিছু পৃথক;—রচনা-কৌশলে পৃথক, ভাবভঙ্গীতেও পৃথক। এই পার্থক্য এত সুস্পষ্ট যে, সকলেই তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন। এরূপ পার্থক্যের কারণ কি?

অধ্যাপক হাভেল বলেন,—প্রথম আমলের স্থাপত্যকীর্ত্তি যেন "মহাকাব্য", এবং শেষ আমলের স্থাপত্য-কীর্ত্তি যেন "গীতিকাব্য";—একটি গাম্ভীর্য্যে অচল অটল; অপরটি লাস্য-বিকাশে টলটল-চলচল। তাহাদের মূল গম্বুজের এইরূপ টলটল-চলচল-ভাবই তাহাকে স্বপ্নবিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে।

ইহাতে মূল প্রশ্নের মীমাংসা সাধিত হয় নাই। এক যুগে যাহা "মহাকাব্য" ছিল, তাহা পরবর্ত্তী যুগে "গীতিকাব্যে" পর্য্যবসিত হইল কেন, তাহার কারণ জানিবার জন্য কৌতূহল থাকিয়া গেল। তাহা কি ক্রমবিকাশ-পদ্ধতির চরম চরিতার্থতা,—অথবা বিদেশাগত শিল্পাদর্শের প্রভাব-পরিপুষ্টতা,—অথবা পুরাপরিচিত বৌদ্ধস্তূপের অনুকরণলব্ধ কলা-কমনীয়তা? ইহার মীমাংসার মতভেদ ঘটা বিচিত্র নহে। ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা; সুতরাং মীমাংসা যাহাই হউক না কেন, তাহার অনুকূল প্রমাণ আবশ্যক।

বৌদ্ধযুগে স্তূপের উপরিভাগ কিয়ৎপরিমাণে গম্বুজাকারে গঠিত হইত, ইহা সত্য কথা। তাহা "গম্বুজাকার" হইলেও "গম্বুজ" নহে;—মাটির ঢিবির উপর ইষ্টকের বা প্রস্তরের আচ্ছাদন,—স্বতন্ত্র প্রয়োজনে, স্বতন্ত্র ভাবে উদ্ভাবিত। তাহারও আদর্শ বা রচনাপদ্ধতি মুসলমান-শাসনসময়ে উত্তর-ভারতে কত দূর বর্ত্তমান ছিল, তাহার প্রমাণও অনায়াসলভ্য নহে। উত্তর-ভারতের কোনও স্থানে তাহার আদর্শ বর্ত্তমান থাকিলে, অধ্যাপক হাভেল তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না। তিনি যে দুইটি আদর্শের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার একটি যবদ্বীপে, আর একটি দক্ষিণ-ভারতে অবস্থিত। তাহাও যে পুরাতন বৌদ্ধস্তূপের আদর্শে গঠিত, তাহারও প্রমাণাভাব। তাহার কথা যে উত্তর-ভারতে সুপরিচিত ছিল, এরূপ অনুমান করিবারও কারণ উল্লিখিত হয় নাই।

মুসলমান-শাসনের প্রথম আমলে যাহারা গম্বুজরচনার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা পুরাতন বৌদ্ধ-স্থাপত্যের সহিত সম্যক্‌রূপেই সুপরিচিত থাকিলে,
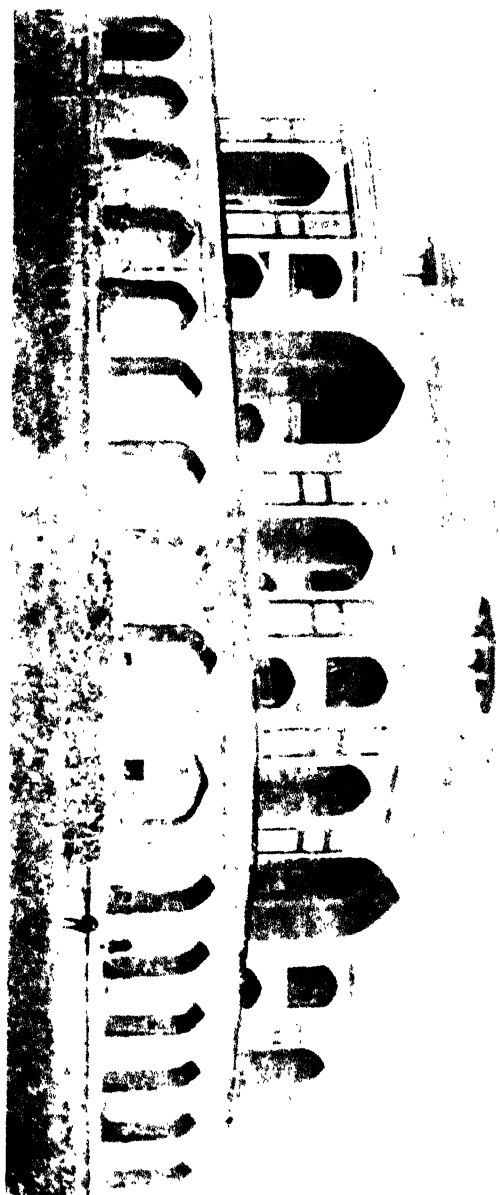
একটি গম্বুজকেও বৌদ্ধস্তূপের কলা-কমনীয়তা দান করিতে পারে নাই কেন, তাহা একটি ব্যাসকূট। অধ্যাপক হাভেল তাহার রহস্যোদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং তাঁহার অনেক কথা,—বুঝিবার জন্ম আয়াস স্বীকার করিলেও,—বিলক্ষণ দুরূহ বলিয়াই বোধ হয়।

মুসলমান-শাসনের প্রথম আমলের অনেক গম্বুজ, সমুচ্চ অট্টালিকার উপরে অবস্থিত হইয়াও, ডুবিয়া রহিয়াছে;—ভাসিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহাতে বৌদ্ধস্তূপের পূর্ব্বাদর্শের অনুকরণচেষ্টা অপেক্ষা একটি নবাগত রচনা-লালসাই অধিক অভিব্যক্ত। জাহাঙ্গীরের আমল পর্য্যন্ত যত গম্বুজ রচিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে, স্বতই মনে হয়,—

"ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।"

প্রথম আমলে যাহারা গম্বুজ গড়িবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা নানারূপ "মক্স" করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যাঁহারা গৌড়ীয় ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকার সহিত সুপরিচিত, তাঁহারা ইহার অনেক নিদর্শন দেখিয়াছেন। প্রথম আমলের গম্বুজকে, [অধ্যাপক হাভেলের ভাষায়] "মহাকাব্য" বলিতে হইলে, ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে,—তখনকার "মহাকাব্য" সগর্ব্বে অঙ্গ ফুলাইয়া আকাশে মাথা তুলিতে সাহস করিত না;—রণপরাভূত কুম্ভকর্ণের মত, বিপুলায়তন অট্টালিকার উপরে, চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকিত! শের শাহের সমাধি-মন্দিরের গম্বুজই প্রথমে মাথা তুলিয়া, চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিল,—প্রথম চেষ্টা বলিয়া, তাহাতেও সফলতা অপেক্ষা আয়াস-স্বীকারের ভাব অধিক অভিব্যক্ত। হুমায়ুঁ বাদশাহের সমাধি-মন্দিরের গম্বুজ তাহা অপেক্ষা অধিক সাহস-পূর্ণ।

মোগল-শাসন ভারতবর্ষে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এই দুইটি গম্বুজ রচিত হইয়া থাকিলেও, ইহা মোগল স্থাপত্যরীতির নিদর্শন বলিয়াই কথিত হইয়া আসিতেছে। তাহার একটু কারণ আছে। বাবরের আত্ম-কাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়,—তিনি প্রতিদিন বহুসংখ্যক স্থপতিকে ভারতবর্ষের নানা নগরে অট্টালিকা-নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। বাবরের শাসন-সময়ের একটি অট্টালিকাও বর্ত্তমান নাই। অথবা বর্ত্তমান থাকিলেও, বাবরের অট্টালিকা বলিয়া কথিত হয় না। তাঁহার মৃতদেহ

কাবুলের নিকটে সমাধি-নিহিত হইয়াছিল। সুতরাং ভারতবর্ষে তাঁহার সমাধি-মন্দিরও রচিত হয় নাই। তাঁহার পুত্র—হুমায়ুঁ—বিপ্লববেষ্টিত হইয়াও, দশ বৎসর ভারত-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, অনেক অট্টালিকা নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। ফেরেস্তার গ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়,—অনেক অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে বিপ্লবে মোগলের ভারতাধিকারের প্রথম প্রয়াস কিয়ৎকালের জন্য বাধা প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছিল, সে বিপ্লবে ভারতবাসী শেরশাহ ও তাঁহার পুত্রই কিয়ৎকালের জন্য বিজয়লাভ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকল কার্য্যেই মোগলের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বি-রূপে ইতিহাসে সুপরিচিত; তাঁহারা স্থাপত্য-শিল্পেও মোগলের কীর্ত্তিকলাপ বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য স্থাপত্য-সমালোচকগণ শের-শাহী স্থাপত্যরীতিকে 'মোগল-রীতির প্রথম উন্মেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন। তৎকালে মোগলের সমরকন্দ নগর প্রাসাদ-শোভায় খ্যাতি-লাভ করিয়াছিল,—তাহাকে পরাভূত করিবার আশায় শেরশাহী স্থাপত্যরীতি পুরাতনে পরিতৃপ্ত না হইয়া, নূতনের পক্ষপাতী হইয়া থাকিবে।

সমরকন্দের গম্বুজগুলির টলটল-ঢলঢল-ভাব এসিয়াখণ্ডের সকল স্থানেই প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। তাহার সহিত "পারসীক প্রভাবে"র সম্পর্ক ছিল। যে যুগে সমরকন্দের মোগলবংশের সহিত ভারতবর্ষের শেরশাহী-বংশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘটিত হইয়াছিল, ঠিক সেই যুগেই ভারতবর্ষেও টলটল-ঢলঢল-ভাবের গম্বুজের প্রথম উন্মেষ লক্ষ্য করিয়া, সুধীগণ শেরশাহী-স্থাপত্যরীতিকে সমরকন্দী-স্থাপত্যরীতি বলিয়া অনুমান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই অনুমান যে ভিত্তিহীন, তাহা দেখাইতে হইলে, সমরকন্দী-গম্বুজের চিত্র প্রকাশিত করিয়া, তাহার সহিত ভারতীয় মোগলরীতির গম্বুজের পার্থক্য দেখাইয়া দিতে হয়। অধ্যাপক হাভেল তাহা করেন নাই। সমরকন্দের ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকাগুলি এখন রাসিয়ান্ পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। তাঁহারা তাহার আলোচনায় ও চিত্রসংগ্রহে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তাঁহাদের অনুসন্ধানফল' প্রকাশিত হইলে, এ বিষয়ের শেষ কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইতে পারে। তখন যদি ভারতবর্ষই তাজের একমাত্র উদ্ভবক্ষেত্র বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, তবেই আমরা "লাভ" করিতে পারিব। এখনই "পাইয়াছি" বলিয়া, অনুসন্ধানচেষ্টা পরিত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই! এখন বরং—আইস—যদি সম্ভব হয়,—অধ্যাপক হাভেলের স্বপ্ন সফল করিবার জন্য, তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

হুমায়ুঁ বাদশাহের সমাধি-মন্দিরের রচনারীতির সঙ্গে তাজের রচনারীতির সাদৃশ্য আছে। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অধ্যাপক হাভেলও তাহা অস্বীকার করেন নাই। তিনি বরং স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়াছেন,—"সাদৃশ্য বড় সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত; তাহাকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করা মূর্খতামাত্র।" (১৬) কিন্তু অধ্যাপক হাভেল বলেন,—"সাদৃশ্য থাকিলেও, তাহা কোনও বিদেশাগত শিল্প-প্রভাবের পরিচয় প্রদান করে না। রচনা-রীতি যে ভারতবর্ষেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল, হুমায়ুঁ বাদশাহের সমাধি-মন্দির তাহারই প্রমাণ-শৃঙ্খলের একটি গ্রন্থিমাত্র; অন্যান্য গ্রন্থিও ভারতবর্ষেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, পারস্যে নহে,—মধ্য-এসিয়ায় নহে।" (১৭) এইখানে ফরগুসনের সঙ্গে মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। অধ্যাপক হাভেল লিখিয়াছেন,—"ফরগুসন এই গ্রন্থি-শৃঙ্খলা ধরিতে না পারিয়াই ভ্রান্ত হইয়াছিলেন।" ইহাই অধ্যাপক হাভেলের নবাবিষ্কৃত ভারত-স্থাপত্য-রহস্য। সত্য হইলে, ভারত-স্থাপত্যের ইতিহাসে ইহা তাঁহাকে অমরত্ব দান করিতে পারিবে।

যে পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থি আবিষ্কৃত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত, ফরগুসনকে ভ্রান্ত বলিয়া পরিতৃপ্ত হইবার উপায় নাই। তিনি বহুকাল পূর্ব্বে সমরকন্দী গম্বুজগঠনের সহিত তাজের গম্বুজ-গঠনের সাদৃশ্যের কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞের পক্ষেই তাহা সম্ভব ছিল। তখন তাজের কারিগরগণের নামধাম অপরিজ্ঞাত ছিল,—তখন বরং এসিয়া অপেক্ষা ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক-আবিষ্কারের লালসাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন জানা গিয়াছে, তাজনির্ম্মাণের সময়ে, গম্বুজ-গঠনে সিদ্ধহস্ত বলিয়া, রুমের ইস্‌মাইল খাঁকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল;—গম্বুজের শীর্ষদেশ-রচনায় সিদ্ধহস্ত বলিয়া,সমরকন্দের মহম্মদ সরিফকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, এবং সমস্ত কার্য্যের পরিচালন-ভার ওস্তাদ ঈশার উপরে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। অধ্যাপক হাভেলের

(১৬) * It would be foolish to make such an attempt. for the connection between the two buildings is obvious.—P 29.

(১৭)* Fergusson's mistake is in not recognising that Humayun's tomb is only one link in the evolution of the Taj, and that the remaining links must be sought for in India, not in Persia or Central Asia.--PP. 29-30.

গ্রন্থেও এই সকল বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। (১৮) তাহাতে কেবল একটি কথাই উল্লিখিত হয় নাই। তাহাও এই সঙ্গে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। (১৯) তাহা এই যে, সর্ব্বকার্য্য-পরিচালক ওস্তাদ ঈশার প্রধান সহায় ছিলেন—তাঁহার পুত্র মহম্মদ সরিফ,—সমরকন্দ হইতে সমাগত,—গম্বুজশীর্ষ-রচনায় সিদ্ধহস্ত বলিয়া আমন্ত্রিত,—সেই মহম্মদ সরিফ! ভারত-স্থাপত্য-রীতির সহিত এই পিতা-পুত্রের কত দূর পরিচয় ছিল, তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

মুসলমান-শাসনের প্রথম আমল হইতে শেষ আমল পর্য্যন্ত পুরাতন বৌদ্ধ-স্থাপত্যের আদর্শ উত্তর-ভারতে সুপরিচিত থাকিলে এবং সেই আদর্শে তাজের গম্বুজ রচিত হইয়া থাকিলে, এই সকল বিদেশী কারিগর ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল কেন, তাহা ধীরভাবে চিন্তনীয়। তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানের ও আলোচনার প্রয়োজন তিরোহিত হয় নাই; সে প্রয়োজন বরং অধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অধ্যাপক হাভেল তাহার পথ-প্রদর্শন করিলেন বলিয়া বন্দনীয়।

যাঁহারা নূতন চিন্তা-প্রবাহের পথ-প্রদর্শন করেন, তাঁহারা মানব-জ্ঞান-বিকাশের সহায়। তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে অনেক দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্বসংস্কারের

---

(১৮) Ismail Khan Rumi, an expert in dome construction, also received 500 rupees. Two specialists for making the piannacle surmounting the dome, whose names were Mahammad Sharif of samarkand and Kazim Khan fo Lahore, were paid respectively 500 rupees and 295 rupees a month.-P. 31

(১৯) The chief designer and draughtsman was Ustad (or Master) Isa, otherwise called Mahammad Isa Effendi, who drew a salary of 1000 rupees a month, and was assisted by his son, Mahammad Sharif. The Agra copy, in the possession of the hereditary custodians of the monument says, that he came from Rum, interpreted to mean Turkey or Constantinople, and that his son came from Samarkaud.-Vincent Smith's History of Fine Art in India and Ceylon. P. 417.

প্রতিকূলে একাকী সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে হয়। এই অসুবিধার মধ্যেও যিনি বীরের ন্যায়, আমাদের হইয়া, আমাদের বিজয়-গৌরব উপার্জ্জন করিয়া দিবার জন্য, জীবন-সন্ধ্যার বিশ্রাম-লোলুপ শেষ সময়টুকু অকাতরে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের সুধীবর্গের অনুকরণীয় হউক। শুভমস্তু।

বিজয়া-দশমী, ১৩২০।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

প্রকৃতি ও পাশ্চাত্য চিত্রকলা-রীতি।

আশ্বিনের "ভারতী" পত্রে চিত্রকলাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার প্রাচীন ভাস্কর্য্য-কলার নিদর্শন-সংগ্রাহকগণকে "কপিল মুনির রোষাগ্নি-সঞ্জাত ভীষণ অভিসম্পাতের" ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন আশ্বিনের "ভারতী" পত্রেই আবার বিজ্ঞবর বীরবল অবনীন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত-নবচিত্রকলার প্রতিকূল সমালোচকগণের "কলাজ্ঞান-নয়-সাধারণ-জ্ঞানের-উপর-প্রতিষ্ঠিত" আপত্তির প্রতিবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে, কাব্যকলার ন্যায় চিত্রকলাও নব জাগরণের অন্যতম নিদান বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। বীরবল যে চিত্রকলা-পদ্ধতির সমর্থন করিবার জন্য বীরদর্পে আগুয়ান হইয়াছেন, সেই চিত্রকলা-পদ্ধতির যাঁহারা বিরোধী, তাঁহারাও জাতীয় চিত্রকলার অভ্যুত্থানের আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের সমালোচনা "কলাজ্ঞান-সম্মত" না হউক, কলা-সম্ভোগ-লালসা-প্রসূত। সুতরাং বীরবল যে "অব্যবসায়ী"র অযথা নিন্দাবাদেরও বিচার করিতে সম্মত হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। এই "অব্যবসায়িগণে"র পক্ষেও কিছু বলিবার আছে। তিনি যদি "সাধারণ জ্ঞানে"র দিক্ দিয়া তাহার বিচার করেন, এবং যত দিন প্রশ্নটার একটা কিনারা না হয়, অন্ততঃ ততদিন তাঁহার চিত্রশিল্পী বন্ধুগণকে "বিদ্রোহী ভাব" অবলম্বন করিতে নিষেধ করেন, তাহা হইলে আরও সুখের বিষয় হয়।

রস্কিনের আলোচনার ফলে ইংরেজদিগের চিত্রকলা-রুচির পরিবর্ত্তন

ঘটিয়াছে ;—ইংরেজেরা এক সময়ে যে সকল চিত্রকলার অনাদর করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা আজ তাঁহাদের জাতীয় চিত্রশালার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। (১) বীরবল বা আর কোনও কলা-বলীয়ান্ যদি সেই ভাবে নব্যবঙ্গের নবচিত্রকলার মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে আমাদেরও কল্যাণ হইতে পারে। যাঁহারা চিত্রশিল্পী, তাঁহাদের নিকটেও "অব্যবসায়িগণ" একটি বিনীত নিবেদন জানাইতে পারেন,—

"কর্ত্তা যানি ন পশ্যতি তানি পশ্যন্ত্যুদাসীনাঃ।"

আমাদের দেশের এই পুরাতন নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া, তাঁহারা যদি "নিজেদের দোষগুলিকেই গুণভ্রমে বুকে আঁকড়িয়া ধরে রাখতে না চান্,"—"অব্যবসায়ী"র নিন্দাবাদের মূলে কিছু সত্য আছে কি না, অবসর-মত তাহারও আলোচনা করেন,—তাহা হইলে ভাল হয়। প্রতিকূল সমালোচকগণের সম্বন্ধে বীরবল বলেন,—

"এ দেশের মতে ইউরোপীয় চিত্রকরেরা প্রকৃতির অনুকরণ করেন, সুতরাং সেই অনুকরণের অনুকরণ করাটাই এ দেশের চিত্রশিল্পীদের কর্তব্য। প্রকৃতি নামক বিরাট পদার্থ এবং তার অংশভূত ইউরোপ নামক ভূভাগ, এ উভয়ের প্রতি আমার যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তাই বলে তার অনুসরণ করাটাই যে পরম পুরুষার্থ, এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিনে। প্রকৃতির বিকৃতি ঘটান কিম্বা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য নয়—কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে আর্টের ধর্ম। পুরুষের মন প্রকৃতি নর্ত্তকীর মুখ দেখবার আয়না নয়। আর্টের ক্রিয়া অনুকরণ নয়, সৃষ্টি। সুতরাং বাহ্যবস্তুর মাপজোকের সঙ্গে, আমাদের মানসজাত বস্তুর মাপজোক যে হুবাহুব মিলে যেতেই হবে, এমন কোন নিয়মে আর্টকে আবদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে, প্রতিভার চরণে শিকল পরানো।"

"প্রকৃতি নামক বিরাট পদার্থ এবং তার অংশভূত ইউরোপ নামক ভূভাগ, এ উভয়ের প্রতি" বীরবলের যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা আছে, ইহা সু-সমাচার বটে। কিন্তু "য়ুরোপ নামক ভূভাগে" এখন চিত্রকলা কি আকার ধারণ করিয়াছে, এবং চিত্র সমালোচকগণ কি সুর ধরিয়াছেন, তাহা কি "বীরবল" একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন? আমরা অব্যবসায়ী, সুতরাং যে

---

(১) "His (Ruskin's) personal and literary influence turned the taste of the age towards what the French call the "Primitives," and assured for them an adequate place in our National Gallery and public and private collections."—Frederic Harrison.

সকল ইংরেজী পত্রিকা কেবল য়ুরোপীয় চিত্রকলার আলোচনা লইয়া ব্যস্ত, সে সকল দেখিবার সৌভাগ্য আমাদিগের ঘটে না। কিন্তু যে সকল পত্রিকা অব্যবসায়ীরাও দেখিয়া থাকেন, তাহাতেও কখনও কখনও ব্যবসায়ীর লিখিত চিত্রকলা-বিষয়ক প্রবন্ধ বাহির হয়। এক জন লেখক গত বৎসর "শিল্প কি বিফল?" নামক প্রস্তাবের গোড়ায় লিখিয়াছেন,—

"এখনকার নানা শ্রেণীর নব্য তন্ত্রের চিত্রকরেরা বলেন,—য়ুরোপের প্রাচীন চিত্রকলা বিফল হইয়াছে। প্রাচীনকালের বড় বড় চিত্রকরেরা সকলেই ভুল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্র বিংশ শতাব্দে কোনও কাজে আসিবে না।"

এই নব্যতন্ত্রের চিত্রকলাও নাকি নিত্যই নূতন আকার ধারণ করিতেছে। বৎসরে বৎসরে, এমন কি মাসে মাসে, কলারীতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে! আজ যিনি শিক্ষা-গুরু বলিয়া অভিনন্দিত, কালই হয় ত তিনি "সেকেলে" বলিয়া পরিত্যক্ত। কিন্তু এক বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর নব্য-তন্ত্রের চিত্রকরগণের মধ্যেও মতের ঐক্য আছে। ইঁহারা সকলেই প্রকৃতির অনুসরণের ঘোর বিরোধী; এবং যাহা মনে লয়, তাহাই আঁকিবার পক্ষপাতী। পূর্ব্বোদ্ধৃত লেখক এই সকল শিল্পীর মধ্যে আট জনের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমি তিনটি উদ্ধৃত করিব।

I

He (the artist) is urged in by his very perception of the beautiful to embody in some sort of way what he has seen floating before his inward eye ... .In so doing, he first of all reaches for himself, and afterwards discloses to others, a higher kind of truth than a realistic perception of fact, or a study of science, can yield."

II

In seeking after truth and endeavour never to be unreal or affected, it must not be forgotten that this endeavour after truth si to be made with materials altogether unreal and different from the object to be imitated. Nothing in a picture is real; indeed the painter's art is the most unreal thing in the whole range of our efforts.

III

We don't want Nature—what we want is the mind and soul of the artist.

এই সকল ইংরেজী বচনের স্বতন্ত্র অনুবাদ না দিয়া, বীরবলের প্রবন্ধ হইতে আরও কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিলেই অনুবাদের কাজ হইবে। যথা,—

"যে ঘোড়া দৌড়বে না, তার anatomy ঠিক জীবন্ত ঘোড়ার মত হবার কোন বৈধ কারণ নেই। পটস্থ ঘোড়া যে তটস্থ, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। চিত্রার্পিত অশ্বের anatomy ঠিক চড়বার কিম্বা হাঁকাবার ঘোড়ার অনুরূপ করাতেই বস্তুজ্ঞানের অভাবের পরিচয় দেওয়া হয়। এই পঞ্চভূতাত্মক পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরে একটি মানস-প্রসূত দৃশ্যজগৎ সৃষ্টি করাই চিত্রকলার উদ্দেশ্য, সুতরাং এ উভয়ের রচনার নিয়মের বৈচিত্র্য থাকা অবশ্যম্ভাবী।"

আর এক জন বাঙ্গালী শিল্পীর (৩) বচন উদ্ধৃত করিলে ইংরেজীর ভাব আরও সুব্যক্ত হইবে,—

"আমরা যখন ভারতের কথা, ভারতের উপাখ্যান চিত্রে লিখিতে বসি, তখন কোনও প্রচলিত সৌন্দর্য্যের আদর্শে তাহা লিখিতে চেষ্টা করি না, মুক্তচক্ষে অন্তরের মধ্যে অবগাহন করিয়া যে ধ্যানস্থির আভাস পাই তাহারই রূপকল্পনা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি।"

এই সকল য়ুরোপীয় এবং বাঙ্গালী মনীষীর মতের তুলনা করিলে দেখা যাইবে,—য়ুরোপভূমিও [কলাজ্ঞতার হিসাবে] বাঙ্গালার ন্যায় রত্নপ্রসবিনী। য়ুরোপের কলাবিৎগণ যে কেবল বাঙ্গালী কলাবিৎগণের মত সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এমন নয়, য়ুরোপের নব্য চিত্রকরগণ (৪) বাঙ্গালার নব্য চিত্রকরগণের মত এমন ছবিও আঁকিতে পারেন, যাহা দেখিলে অনেকেই স্তম্ভিত হয়েন। প্রবীণ ইংরেজ চিত্রকর কলিয়ার (Hon. John Collier) গত মার্চ্চ মাসের "নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী" পত্রে নব্য তন্ত্রের পাশ্চাত্য চিত্রকলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"অনুভূতির পরপারে-গমনপন্থা যাঁহারা প্রথম অবলম্বন করিয়াছিলেন, যাঁহারা এখন প্রাচীন কলাচার্য বলিয়া গণ্য, তাঁহারা পূর্ব্বসংস্কার কিছু কিছু বজায় রাখিয়াছিলেন ;—তাঁহাদের চিত্রগুলি কিয়ৎপরিমাণে সাধারণ চিত্রের অনুরূপ ছিল ;—প্রভেদ এই ছিল যে, তাঁহাদের

---

(২) "A talk for an hour with some symbolist, Cubist or Post-Impressionist will go far to convince one of the futility of all the Art of the past, as far as Europe is concerned at least. They may be forced to concede that there have been great men in the past but they were all on wrong lines' and of 'no use to us of the twentieth century'.—"Robert Fowler R. I. Nineteenth Century and After, 1912, p. 125.

(৩) শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—প্রবাসী ১০১৬, ৪৫৬ পৃঃ।

(৪) Gangin, Van Googh, Malisse, and Pi Casse.

চিত্রগুলি কদাকার ছিল, এবং চিত্রাঙ্কনে অক্ষমতারই পরিচয় দিত। কিন্তু পরবর্ত্তী চিত্রকরেরা শীঘ্রই ইঁহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের নবচিত্রকলা দুঃস্বপ্নদৃষ্ট বিভীষিকাময় শ্বাসরোধকর প্রাণীর আকার ধারণ করিয়া উন্নতির দিকে ধাবিত হইয়াছে। পাগ্‌লা-গারদে অঙ্কিত চিত্র ভিন্ন পৃথিবীর আর কোনও পদার্থের সহিত এই সকল চিত্রের কোনও সাদৃশ্য নাই।" (৫)

কলিয়ার যে কি প্রকার চিত্র দেখিয়া এই তীব্র সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা জানি না। ভরসা ছিল, কোনও বাঙ্গালী চিত্রকর এ পর্য্যন্ত এরূপ চিত্র লিখিতে সমর্থ হয়েন নাই, এবং কখনও হইবেন না। কিন্তু আশ্বিন মাসের "ভারতী" পত্রে কয়েক জন সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীর স্বাক্ষরযুক্ত এমন কয়েকখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা [টীকা টিপ্পনী ব্যতিরেকে] অজ্ঞ অব্যবসায়ীর নিকট নৈশ স্বপ্নের বিভীষিকাবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে।

য়ুরোপের নব্য তন্ত্রের চিত্রকলা এখনও উন্নতির শেষ সীমায় পদার্পণ করে নাই। নূতন "ফিউচারিষ্ট (Futurist) সম্প্রদায়" "পোষ্ট-ইম্‌প্রেসনিষ্ট"দিগকে আসর হইতে অপসারিত করিবামাত্র "কিউবিষ্ট" (Cubist) নামক আর এক সম্প্রদায় অভ্যুদিত হইয়া, "ফিউচারিষ্ট"দিগকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। চিত্রসমালোচকগণ নূতনতম চিত্রকলা সম্বন্ধে 'ইহার ভিতরও কিছু আছে' এই পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। (৬)

১৯১২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বিখ্যাত পৌরাণিক (classical) চিত্রকর টেডেমা (Sir L. Alma-Tadema) পরলোকে গমন করিয়াছেন। এবার

---

(৫) "In its (Post-impressionism) earlier exponents (who have now become old masters and are considered almost classic by their followers) there was some remnant of tradition : that is, their work bore some resemblance to ordinary painting—they were only extremely ugly and ill-drawn. Of course, these were soon left behind, and the movement advanced by a series of nightmares which looked like nothing in the world except the drawings and paintings executed in lunatic asylums, to which indeed they bore a striking resemblance (P. 598)."

(৬) They are again beginning to use the blessed formula that 'there is something in it.'

লণ্ডন নগরে "রয়াল একাডেমী"তে টেডেমার চিত্রনিচয়ের প্রদর্শনী হইয়াছে। দেশ বিদেশের ধনীর গৃহে বা সাধারণ চিত্রশালায় টেডেমার যে সকল চিত্র স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা অনেক কষ্টে ধার করিয়া আনিয়া, তদ্দ্বারা এই প্রদর্শনী সাজান হইয়াছে। এই প্রদর্শনীকে উপলক্ষ করিয়া, নব্য তন্ত্রের শিল্প-সমালোচকগণ যেরূপ কার্পণ্যের সহিত টেডেমার চিত্রকলার সমালোচনা করিয়াছেন, তাহারই প্রতিবাদ করিবার জন্য, মাননীয় জন কলিয়ার উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। নব্য সমালোচকগণের কার্পণ্যের কারণস্বরূপ কলিয়ার লিখিয়াছেন,—

"(টেডেমার চিত্রপ্রদর্শনীতে) এই সকল হতভাগ্য বিক্ষিপ্তচিত্ত সমালোচক হঠাৎ একত্র বহুসংখ্যক স্থিরবুদ্ধির পরিচায়ক, সুন্দর, সুখকর চিত্র দেখিতে পাইলেন। চিত্রগুলি এমনই সেকেলে ধরণে অঙ্কিত যে, ইহাতে মাংসপেশী মাংসপেশীর মতই দেখায়;—কাপড় চোপড় কাপড়-চোপড়ের মতই দেখায়, মার্‌বেল পাথর মার্‌বেল পাথরের মতই দেখায়,—এবং কিছুই কেবল বর্ণলেপের মত দেখায় না! এই সকল চিত্রে লিখিত মনুষ্যগুলি দেখিতে সুখকর,—ছুরি মারত উন্মত্তের সহিত সাদৃশ্যবিহীন এই সকল চিত্রের সকল অংশই এমন ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে কোনও কষ্ট হয় না। সুতরাং হতভাগ্য সমালোচকগণ যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?" (১)

এই সকল বচন-প্রমাণ হইতে দেখা যায়,—বাঙ্গালার নব্য চিত্রকরগণের ও তাঁহাদের অনুকূল সমালোচকগণের মনে চিত্রকলা সম্বন্ধে যে সকল নূতন ভাব ফেনাইয়া উঠিতেছে, তাহা য়ুরোপীয় বুদ্ধির অনধিগম্য নহে; বরং সে দেশে প্রকৃতিদ্রোহী চিত্রকরের ও নব্যচিত্রকলার নবরসে রসিক সমালোচকের সংখ্যা অনেক অধিক। সুতরাং এই সকল চিত্রকরের ও সমালোচকের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, প্রতিকূল সমালোচকগণ বীরবলকে বলিতে পারেন,—"প্রকৃতিনিষ্ঠা ছাড়িয়া, স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হইলেও, নিস্তার নাই; তাহাতেও

(১) "And suddenly these poor harassed creatres have sprung upon them a whole collecticn of sane, beautiful, and wholesome works, painted in such an old-fashioned way that flesh looks like flesh, draperies like draperies, marble like marble, and nothing look like paint; in which human beings are pleasant to look upon and bear no resemblance whatever to criminal lunatics, and in which all details are so painted that there is no difficulty at all in finding out what they are meant for. No wonder the poor critics did not know what to make of these pictures."

য়ুরোপের অনুকরণ-কলঙ্কের দাগ এড়াইবার উপায় নাই; য়ুরোপের বাজে চিত্রকরগণের স্বেচ্ছাচারের অনুকরণ করাটাই যে পরমপুরুষার্থ, এ কথাও ত কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।"

মূল কথা, এ দেশেও যেমন মানুষ ও প্রকৃতি পাশাপাশি আছে, "য়ুরোপ নামক ভূভাগে"ও তেমনই মানুষ ও প্রকৃতি পাশাপাশি আছে। প্রকৃতির ও চিত্রের পরস্পর সম্বন্ধ লইয়া ভারতবর্ষে যেমন দলাদলি হইতে পারে, য়ুরোপে তেমনই দলাদলি হইতে পারে, এবং আছে। তবে প্রভেদ কোনখানে? প্রভেদ এইখানে যে, য়ুরোপের ও ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থার ও বৃক্ষ লতা মনুষ্য পশু পক্ষীর আকারে প্রভেদ আছে। তুমি যদি য়ুরোপীয় সেকেলে চিত্রকর টার্ণারের বা টেডেমার 'পন্থা'র অনুসরণ করিয়া, ভারতের পুণ্যতোয়া ভাগীরথী, অভ্রভেদী হিমাদ্রি, বা চারুচন্দ্রাননা কুললক্ষ্মী ঠিক লিখিতে পার, তবে কোনও ব্যক্তিই উহাতে ইউরোপের গন্ধ পাইবেন না। কিন্তু যে দেশের শিল্পশাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন—

> "লোকেষু লক্ষণং দৃষ্ট্বা হসিতাদিনিরীক্ষণম্।
> তথা তথৈব কর্ত্তব্যমূহ্যং যত্নেন দেশিকৈঃ॥" (৮)

যে দেশের কবি "দর্শিতবিশ্বরূপৈঃ চিত্রভিত্তিভিঃ" পরিশোভিত নগর (কাদম্বরীতে উজ্জয়িনী) বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, যে দেশের অজন্তা গুহার ভিত্তিচিত্রে [গ্রিফিথস্, হেরিংহাম প্রভৃতির মতে] যথার্থই বিশ্বরূপ দর্শিত হইয়াছে, সেই যম-নিয়মের দেশে চিত্র লিখিতে গিয়া তুমি যদি প্রকৃতির দ্রোহাচরণ কর, তাহা হইলে লোকে বলিবে,—"তুমি না জানি কোন্ বিদেশীর অনুকরণ, অনুসরণ করিতেছ।"

বিজ্ঞ বিচারক কখনও এক পক্ষের কথা শুনিয়া একতরফা বিচার করেন না; উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া ন্যায়বিচার করেন। এই জন্য, যাঁহারা চিত্রে প্রকৃতি-নিষ্ঠার পক্ষপাতী, এই শ্রেণীর য়ুরোপীয় সমালোচকগণের অপর পক্ষের উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে কি বক্তব্য আছে, তাহাও বীরবল প্রমুখ লেখকগণের বিচারার্থ উদ্ধৃত করিব। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত ফাউলার ও কলিয়ার, এই দুই জন লেখকই বলেন,—"যে সকল চিত্রকর প্রকৃতির প্রতিকৃতি-অঙ্কনে অসমর্থ,

---

(৮) হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রম্।

তাঁহারাই কেবল চিত্রে প্রকৃতির দ্রোহাচরণকে গুণপণার কার্য্য বলিয়া প্রচার করেন (৯)

প্রকৃতির ও চিত্রকরের সম্বন্ধ কতকটা ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধের মত। ছাত্র লেখাপড়ায় যত কাঁচা, শিক্ষকের সে তত বিরোধী;—চিত্রকরও যত কাঁচা, [চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ আদর্শ] বিশ্বকর্ত্তার লিখিত বিচিত্র প্রকৃতিপটেরও সে তত বিরোধী। এ কথা অব্যবসায়ীর অযথা নিন্দাবাদ নয়, ব্যবসায়ীর দৃঢ়স্বর-ঘোষণা। আর এক জন ব্যবসায়ী, চিত্রকলার ইতিবৃত্তের অধ্যাপক, চিত্রকলা বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও "টেট চিত্রশালা"র (Tate Gallery) অধ্যক্ষ ম্যাকুকল (D. S. maccoll) চিত্রশিক্ষা সম্বন্ধে অল্পদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছেন,—

"ব্লেকের সঙ্গে মতে, মিঃ ফ্রাইএর বিরুদ্ধে, আমিও এই মতের পোষণ করি—যিনি উচ্চ কল্পনার অনুকরণ করিতে উচ্চ আশয়ে চিত্র লিখিতে চাহেন, তাঁহাকে প্রকৃতির অনুকরণ শিক্ষা করিতে হইবে।" (১০)

কিন্তু "প্রকৃতির অনুকরণে"র অর্থ পাশ্চাত্য কলাবিদ্‌গণ "বহিরঙ্গের অনুকরণ" মনে করেন না; বহিরঙ্গের সাহায্যে অন্তরঙ্গের পারিপাট্য-প্রদর্শনই তাঁহাদের অনুকরণের উদ্দেশ্য। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ওয়াটস্ (G. F. Watts) বলিয়াছেন,—

"ফটোগ্রাফের কাচ যে ভাবে কেবল প্রকৃতির অবিকল নকল করিতে পারে, আমি অথবা অন্য কোনও চিত্রকর তাহা যে কখনও পারিব, এরূপ আশা করা যায় না। পক্ষান্তরে, মানুষ

---

(৯) Any departure from Nature's standards may safely be put down to mere inability to deal with them, and the necessity to be content in consequence with the introduction of pictorial standards. (P. 129).

"There is a kind of movement in critical circles now which decries 'representation' in art. If this means anything, it means that objects should be painted to look like something different from what they really are. This theory has obviously a great advantage for bad painters. No bad painters has ever yet succeeded in representing Nature as it really looks. The worse the painter the more certain he is of not representing Nature even if he tries. However, I will not pursue the controversy beyond pointing out that this theory never seems to have occurred to the old masters (P. 604)".

"I hold with Blake against Mr. Fry that a man must learn to copy nature if, to any high purpose, he would copy his imagination. The nineteenth Century and After, Feb. (1912, P. 291)".

চিত্রপটের উপর স্বজাতির আনন্দবিধানের জন্য আত্মা যে প্রতিকৃতি প্রদান করে, কাচফলক তাহা পারে না। সম্পূর্ণ সম্যক ও একই প্রকারের (অর্থাৎ স্বভাবসম্মত) খসড়া চিত্র ভিন্ন আত্মার আলেখ্য-অঙ্কন অসম্ভব; যদি বহিরবয়ব যথাযথ ভাবে দর্শকের সমক্ষে উপস্থাপিত না হয়, তবে এই প্রকার কলাকৌশলের প্রকাশ হাস্যোদ্দীপক ও বিকট হয়।" (১১)

যথেচ্ছভাবে প্রকৃতির বিকৃতিসাধন করিলেই সৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না; জড়প্রকৃতিতে জীবাত্মার সঞ্চারই প্রকৃত সৃষ্টিক্ষমতার পরিচায়ক। জড়প্রকৃতি মায়ার প্রহেলিকা। কিন্তু পরমাত্মাও এই মায়ার আবরণ পরিয়াই সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তা ঈশ্বরের রূপ ধারণ করেন; এবং মায়াময়ী অবিদ্যার আশ্রয়েই জীব-রূপে সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করেন। ক্ষুদ্র মানুষ মায়াময়ী প্রকৃতিকে ছাড়িয়া সৃষ্টি করিবে,—ইহাও কি সম্ভব! দেশভেদে চিত্রে প্রকৃতির অনুসরণের প্রকারভেদ ঘটিয়াছে, এবং তজ্জন্য চিত্রকলারীতিরও পার্থক্য ঘটিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে ম্যাক্‌কল এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিল্পরীতির পার্থক্যের মূলকারণ পরিস্ফুট হইয়াছে,—

"গ্রীসের খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দের শিল্পকলা একান্ত স্বভাবসঙ্গত ও মানুষভাবাপন্ন, সুতরাং ধর্মভাবব্যঞ্জক নয়; সেইরূপ ফরাসী দেশের গথিক যুগের (ত্রয়োদশ শতাব্দের) এমিয়েনের গির্জ্জার খ্রীষ্টপ্রতিমাও ধর্মভাব-বর্জ্জিত। চিত্রে ধর্মভাব দেখিতে হইলে, টিসিয়েনের (মৃত্যু ১৫৭৬) পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের চিত্রে অনুসন্ধান করিতে হইবে। গ্রীসের প্রাচীন পাষাণ-প্রতিমায়, গথিক যুগের প্রথম ভাগের পাষাণ প্রতিমায়, ইজিপ্টের পাষাণ-প্রতিমায় ও এসিয়া খণ্ডের বৌদ্ধ-প্রতিমায় কিছু ঐশ্বরিক ও শাশ্বত ভাব সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সকল প্রতিমার নির্ম্মাণ-রীতি গ্রীসদেশীয় ভাস্করদিগের সুশোভন স্বভাবানুকরণ-রীতি হইতে পৃথক, এবং রোমাণ্টিক শিল্পের অঙ্গবিশেষের সঙ্কোচন বা সম্প্রসারণ দ্বারা ভাবব্যঞ্জন করিবার রীতি হইতেও পৃথক। ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতিতে, ব্যক্তি-সমষ্টির চিত্রে, সাধারণ গার্হস্থ্যজীবনের চিত্রে ও অচেতন পদার্থের চিত্রে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব-লক্ষণ বিশদভাবে প্রদর্শিত হয়, দেব-প্রতিমায় তাহা প্রদর্শিত হয় না। যে সকল দেশ ধর্ম্মের জন্মস্থান, সেখানে এই খুঁটিনাটিবর্জ্জিত স্থূল অনু-

---

"The photographic lens will accomplish the mere copying of Nature better and far more accurately than I or any other artist can ever hope to do. But it is the soul that a man puts upon the canvas for the delight and improvement of his fellowmen that the lens cannot accomplish, and this can not be done without full and proper, and I may say the only, study, f r the expression of that art could only become rediculous and grotesque if the structure were not truthfully placed before the spectator. (The Nineteenth Century, Jan. 1913, P 120)".

করণ-রীতি দেবতার প্রতিমা ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েও অবলম্বিত হইয়াছে; যে চিত্রকর ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিকৃতি চিত্রিত করেন, তাঁহার উপরও ইহা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; এবং যে শিল্পী প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রিত করেন, তাঁহাকেও মেঘ অথবা সমুদ্র লিখিবার সময় এই রীতি-সঙ্কেত অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছে। (১২)

ভারতবর্ষের, চীনের ও জাপানের শিল্প-রীতিতে প্রকৃতি অবজ্ঞাত হয় নাই; স্থূল ভাবে অনুকৃত হইয়াছে; মানবদেহের খুঁটিনাটী পরিত্যক্ত হইয়া পূর্ণতার বিগ্রহ পূর্ণাবয়ব দেবতার প্রতিমায় পরিণত হইয়াছে। দেবমূর্ত্তিগঠনে অভ্যস্ত প্রাচ্য শিল্পী জীব বা জড়পদার্থ লিখিতে বসিয়াও, একই রচনা-রীতির অনুসরণ করিয়াছেন। যিনি ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা অঙ্কিত করিবেন, তাঁহার ভেটারিনরী কলেজে গিয়া মরা ঘোড়া কাটিয়া দেহতত্ত্ব শিখিয়া আসিবার দরকার নাই; মোটামুটি ঘোড়া আঁকিয়া, তাহাতে স্বর্গাধিপতি দেবরাজের বাহনের যে ভাব, তাহা সঞ্চারিত করিতে পারিলেই যথেষ্ট। কিন্তু যিনি সাধারণ সওয়ারের ঘোড়া অঙ্কিত করিবেন, মোগলযুগের চিত্রকরের মানসী ঘোড়া নিজ নামে না চালাইয়া, কিঞ্চিৎ এনাটমী দেখিয়া শুনিয়া, জীবন্ত ঘোড়ার চিত্র অঙ্কিত করাই তাঁহার পক্ষে সঙ্গত নয় কি? যদি স্বভাবের অনুকরণ দোষাহ´ হয়, তবে সৃষ্টিছাড়া চতুষ্পদ আঁকিবারই বা দরকার কি? কাগজের উপর কতক-গুলি কালির ফোঁটা ফেলিয়া, এবং কতকগুলি রেখা টানিয়া, নীচে "ঘোড়দৌড়" লিখিয়া দিলেই ত যাহার বর্ণপরিচয় হইয়াছে, সেও বুঝিতে পারিবে, ব্যাপার

"Just as in Greek art true 'classic' period is too realistic and human to be religious, so in Gothic figures like le beau Christ of Amiens are already outside, and in painting we must go back to 'primitives, behind Titian for examples of what we are in search of. In early Greek and Gothic blocks mosaic non-musive golden grounds, in Egyptian granite, in oriental bronze something of the divine and eternal was communicated, And the drawing of such images differs from the choice realism of classic art, the curiosity and personal emphasis of romantic; it sweeps over the minor point of representation that in portrait, in the drama, in general and still-life are properly sought and enforced. In the native lands of religion this synthetic drawing has extended itself beyond the religious subject, has checked the portrait paints when he deals with the individual, and even the landscape painter, tied to symbols when he seeks the freedom of clouds

কি! ভারতের, চীনের, জাপানের চিত্রকলাকে ও ভাস্কর-কলাকে ইউরোপীয় হিসাবে ঠিক প্রকৃতিনিষ্ঠা (realism) বলা যাইতে পারে না; দেবতা-ধ্যানতৎপর শিল্পীর অনুভূতি-পরতন্ত্রতা বা Impressionism বলা যায়। কিন্তু বাঙ্গালার নব্য চিত্রকরগণের রীতি পাশ্চাত্য Post-impressionism বা অনুভূতির পর-পারতন্ত্রতার অনুকরণমাত্র। কখনও কখনও সম্প্রসারিত অঙ্গুলিতে বা বাহুতে রোম্যান্টিক প্রভাবও ধরা পড়ে।

প্রাচ্য অনুভূতি-পরতন্ত্রতা কি ভারতবর্ষ, কি চীন, কি জাপান, সর্ব্বত্রই এখন মৃত। জাপান পাশ্চাত্য-রীতির আশ্রয়ে ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখনও সকলকাম হয় নাই। পুরাতন ধর্ম্মভাব ফিরিয়া না আসিলে, পুরাতন চিত্রকলা-রীতির পুনরুজ্জীবনের আশা দুরাশা! উন্নত পাশ্চাত্য চিত্রকলা-রীতি অবলম্বন করিয়া, কেহ কোথাও এ যাবৎ দেবতা গড়িতে পারেন নাই। দেবতা-সৃষ্টি কেবল রীতির কর্ম্ম নয়, তাহার সহিত জ্ঞান-ভক্তির সংযোগ চাই। দেবতা ছাড়া আরও ত অনেক জিনিস গড়িবার আছে, তাহা গড়িতেও প্রতিভার প্রয়োজন—কল্পনা ও অন্তর্দৃষ্টিও আবশ্যক। যাঁহার সেই প্রতিভা আছে, তাঁহার সেই প্রতিভাসম্ভাত জীবাত্মাকে কলেবর দিবার নিমিত্ত প্রকৃতির অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। এই প্রকৃতির অনুসরণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিত্রবিজ্ঞান—পাশ্চাত্য রীতিতে নতোন্নত প্রদেশের আলেখ্য-রচনা ও ইঙ্গিতে দূরত্ব-সূচনা বিশেষ কার্য্যকরী। তাই মনে হয়, এ দেশের শিল্প বিদ্যালয় হইতে পাশ্চাত্য চিত্রকলারীতি বড় তাড়াতাড়ি নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে!

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

কমলাকান্তের "এস এস বঁধু এস!"

রজনী গভীর। গ্রাম নিস্তব্ধ। এমন সময়ে কোন এক গৃহস্থের বাটীর সদর দরজা হইতে একটি লোক দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কিছু দূরে আসিয়া বন্দুকের একটি আওয়াজ করিল; সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রামের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুষুপ্ত গ্রামবাসীদিগকে জাগরিত করিয়া চারি দিক হইতে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। ঐ গৃহস্থের বাটীতেও ঐরূপ ঢাক ঢোল বাজিল। মহাষ্টমী রাত্রিতে সন্ধিপূজা আরম্ভ হইল। সেকালে সকলের বাড়ীতে ঘড়ি থাকিত না।

সেই জন্ত এই বাটীর গৃহস্থ বন্দুকের শব্দে অন্যান্ত পূজাবাটীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে সন্ধিপূজার সময় জ্ঞাপন করাইতেন।

রাত্রি তখন ঠিক কত, তাহা আমার মনে নাই; কেন না, বহুকালের কথা। অনুমান দ্বিতীয় প্রহর হইবে;—অষ্টমীর চাঁদ তখনও অস্ত যায় নাই। এই গৃহস্থের বাটীর ভিতর সর্ব্বত্র আলোকময়। যে দিকে চাহিবে, সেই দিকেই আলোকের মালা;—ছোট ছোট প্রদীপের আলো, সন্ধিপূজার আলো। গুটি-কতক বালক ঐ আলোর নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, যেটি নিভিতেছে, তৎক্ষণাৎ সেইটি জ্বালিয়া দিতেছিল। পূজার দালানেও ঐরূপ আলো, দশভূজার সম্মুখ হইতে উঠানে নামিবার সিঁড়ি পর্য্যন্ত ঐরূপ দীপের শ্রেণী। অল্পক্ষণ পরেই ঢাক ঢোল বাজনা বন্ধ হইল, বাটী কতকটা নিস্তব্ধ হইল, কেবলমাত্র দশভূজার সম্মুখে পুরোহিতের ও তন্ত্রধারের মন্ত্রোচ্চারণ শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভিতর-দালানের মধ্যস্থলে সিংহ-পৃষ্ঠে অসুর-মর্দ্দিনী বাড়ী আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, সম্মুখে স্তূপাকার বিল্বপত্র ও নানাপ্রকার ফুল, তন্মধ্যে পদ্মফুলের ভাগই বেশী, তাহার নিকটে পুরোহিত ও তন্ত্রধার বসিয়া পূজা করিতে-ছিলেন। তাঁহাদিগের সন্নিকটে একটী থামে ঠেস দিয়া পৃথগাসনে আর এক ব্যক্তি বসিয়া,—ইনি দেখিতে সাধারণ মনুষ্যের মত নহেন, তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, তিনি যেন সকলের হইতে স্বতন্ত্র। ইনিই বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা, কোনও মহাপুরুষের মন্ত্রশিষ্য, নিষ্কামধর্ম্মাবলম্বী। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দেবী চৌধুরাণী ইঁহাকে উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "যাঁহার কাছে প্রথম নিষ্কামধর্ম্ম শুনিয়াছিলাম, যিনি স্বয়ং নিষ্কামধর্ম্মের ব্রত করিয়াছিলেন ইত্যাদি।" এই মহাপুরুষের বয়ঃক্রম, তখন প্রায় অশীতিবৎসর অতীত হইয়া থাকিবে। দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ, দেহ না ক্ষীণ না স্থূল, অথচ বয়সোপযোগী বলিষ্ঠ, খড়্গের ন্যায় নাসিকা, চক্ষু দুইটির দৃষ্টি অতি তীব্র, মস্তক ও মুখমণ্ডল কেশহীন। সেকালের প্রাচীনদিগের যেমন গলায় তুলসীমালা ও নাসিকায় ফোঁটা থাকিত, ইঁহার সে সকল বালাই কিছু ছিল না। কেবলমাত্র একখানি চাদরে গা ঢাকিয়া স্থিরভাবে সহাস্যমুখে বসিয়াছিলেন। বাড়ীর দালানে কতকগুলি প্রাচীন ভদ্রলোক মাথায় চাদর জড়াইয়া একখানি গালিচায় বসিয়া জপ করিতেছিলেন। প্রতিমার পশ্চিম দিকে, অন্তঃপুরের প্রবেশ-দ্বারের সন্নিকটে কতিপয় সধবা, বিধবা, প্রাচীনা গলায় অঞ্চল দিয়া বসিয়া জপ করিতেছিলেন।

আমি একটি থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। কি দেখিতেছিলাম, ঠিক মনে

নাই। ছেলেগুলি যে আলোর নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পাছে তাহারা আলোতে কাপড় ধরাইয়া ফেলে, বোধ হয়, তাহাই দেখিতেছিলাম। এমত সময়ে আমার পশ্চাতে কে যেন আসিয়া দাঁড়াইল। ফিরিয়া দেখিলাম—বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহাকে দেখিয়া আমি ঈষৎ সরিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়া টানিলেন, অর্থাৎ সরিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে, গোঁফের চুল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, মস্তকের অনেকগুলি কেশ পাকিয়াছে। তখন বঙ্গদর্শনের পূর্ণ-যৌবন, বঙ্গসাহিত্যসমাজে তাঁহার একাধিপত্য। তিনি অনেকক্ষণ স্থিরভাবে প্রতিমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, মুখে কোনও কথা নাই।

আমি তাঁহার কিছু পূর্ব্বে আসিয়া অসুরের মাথায় কৃষ্ণবর্ণের একটি ক্ষুদ্র পদার্থ দেখিয়াছিলাম, কিন্তু উহা যে কি, দূর হইতে তাহা বুঝিতে পারি নাই; পরে জানিয়াছিলাম, উহা বিল্বপত্র। বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "অসুরের মাথায় ওটা কি?" কিছুক্ষণ পরে তিনি উত্তর করিলেন, "উহা গণেশের ইঁদুর।" আমি বলিলাম, "গণেশের ইঁদুর" অসুরের মাথায় কেন? তিনি উত্তর করিলেন, "ক্ষুদ্র জানোয়ারদের অসুরের ঘাড়ে উঠিবার ঠিক এই সময় হইয়াছে,—দেখ ঐ কার্ত্তিকের ময়ূর অসুরকে ঠোকরাইবার জন্য ঘাড় বাঁকাইতেছে—আর ঐ দেখ প্রতিমার চারিধারে যে সোলার পাখীগুলা আছে, উহারা ডানা ঝাড়িতেছে. উহারা উড়িয়া আসিয়া অসুরের ঘাড়ে বসিয়া ঠোক্রাইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "অসুরের অপরাধ?" তিনি বলিলেন, "অপরাধ কিছুই নহে,– যাহারা প্রবল প্রতাপান্বিত, অপরাজেয়, যাহাদের সকলে ভয় করে, তাহাদের মুমূর্ষু অবস্থাতে ক্ষুদ্র প্রাণিগণ তাহাদের উপর যথাসাধ্য অত্যাচার করে।" আমি বলিলাম, "অসুরের ত এখন মুমূর্ষু অবস্থা নহে, ঐ দেখুন, ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া দেবীকে তরওয়াল উঠাইয়া মারিতে উদ্যত।" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "বটে, বটে! বীরপুরুষেরা—তেজস্বী পুরুষেরা শত্রুহস্তে ঐরূপেই মরে, ম'রেও মরে না; কিন্তু অসুরের আর কি আছে, অসুর ত মরেছে, সিংহী ভীষণ দন্ত দ্বারা উহাকে কামড়াইতেছে, আর দেবী একটা ভয়ানক সাপ উহার গায়ে ছাড়িয়াছেন, সে মুহুর্মুহুঃ উহাকে ছোবলাইতেছে, আর তিনি স্বয়ং দক্ষিণের এক হস্তে বর্শা দ্বারা সজোরে উহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিতেছেন, আর বাকী অষ্ট হস্ত প্রসারণ করিয়া উহাকে নানা অস্ত্র দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতেছেন,—অসুর মরেছে, ক্ষুদ্র প্রাণীদের ঘাড়ে চড়িবার এই ত সময়।" কথাগুলি

আমার যত দূর স্মরণ আছে, তাহা আমি আমার নিজের ভাষায় সাজাইয়া বলিলাম।

এই কথোপকথনের পর বঙ্কিমচন্দ্র চলিয়া গেলেন। আমিও তাঁহার বৈঠকখানা ঘরে গিয়া বসিলাম। সেখানে কেহ তামাক খাইতেছিলেন, কেহ বা খোস গল্প করিতেছিলেন, প্রায় সকলেই বঙ্কিমের প্রতিবাসী। কেহ কেহ প্রথম রাত্রের ফলাহারের পর আর বাটী যান নাই, ঐ ঘরেই ছিলেন। আর কেহ কেহ বাদ্যোদ্যম শুনিয়া আসিয়াছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এক জন বিদেশীয়,—ঐ গ্রামের কোনও এক গৃহস্থের জামাতা। এই ব্যক্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে অফিসে চাকুরী করিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান চাকুরী কলিকাতার বড়মানুষদিগের মোসাহেবী। যখন ইঁহার পরিবার পিত্রালয়ে থাকিতেন, তখন ইনি প্রতি শনিবারে ও অন্যান্য ছুটীতে কাঁঠালপাড়ায় আসিতেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের নিকটে সর্ব্বদা থাকিতেন। এই বাবুটির কথা এই স্থানে উল্লেখের কারণ পরে প্রকাশ পাইবে। আর একটি বিদেশী লোক অতি কুণ্ঠিতভাবে বসিয়াছিল। ইহার নাম বলহরি দাস, রাণীহাটী পরগণায় ইহার বাটী, যে স্থানের কীর্ত্তন "রেণিটী"র কীর্ত্তন বলিয়া বিখ্যাত। এই লোকটি ভাল কীর্ত্তন গাইতে শিখিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠাগ্রজের নিকটেই সে থাকিত। অদ্য তাঁহারই আদেশানুসারে উপস্থিত ছিল। কিছুক্ষণ পরে সকল ভ্রাতাই উপস্থিত হইলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও আসিলেন। বিখ্যাত ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট ৺ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র কোনও মজলিসে প্রবেশ করিলে সভাস্থ সকলের গায়ে যেন electricity ছড়াইয়া দেয়, সকলেই উল্লসিত হয়। আমি দেখিয়াছি এই গুণটি যে কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল, তাহা নহে। দীনবন্ধু ও হেমচন্দ্রেরও ছিল; মধুসূদনের কিয়ৎপরিমাণে ছিল বটে, কিন্তু সে অন্যরূপ। যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্র মজলিস সরগরম হইল, যাঁহারা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলেন, তাঁহারা উঠিয়া বসিলেন, হাসির হর্‌রা উঠিল, তামাকের ধোঁয়াতে ঘরের আলো মিট্‌মিট্‌ করিতে লাগিল। অনেকে শুনিয়া চমকিত হইবেন, কেহ কেহ বা বিরক্ত হইবেন, আমরা চার ভ্রাতা একত্র বসিয়া তামাক খাইতাম—অতিরিক্ত তামাক খাইতাম, এমন কি, মুখ হইতে নল নামিত না। শুনিলে আরও হাসিবেন, আমি এ প্রাচীন বয়সে ধূমপান করিয়া জীবিত আছি।

বঙ্কিমচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিবার কিছুক্ষণ পরে ঐ মোসাহেব বাবুটি তাঁহাকে আত্মীয়তাভাবে অনেক কথা শুনাইতে লাগিলেন। কলিকাতার লোকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কে কি বলিয়াছিল, তাহাই শুনাইতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অপরাধ এই যে, তাঁহার বঙ্গদর্শনে "উত্তর চরিতের" সমালোচনা করিতে গিয়া পুরাতন লেখকদলের চাঁইকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন।*

পুরাতন দলের লেখকগণ ও তাঁহাদের ভক্তেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে যেরূপ গালিগালাজ করিয়াছিল, মোসাহেব বাবু তাহা শুনিয়া আসিয়া সেই কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনাইতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু গালি শুনিয়া কোনও উত্তর দিলেন না। কেবলমাত্র তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল—দুই ভ্রূ এক হইল। আর সজোরে ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন। খুব বেশী পরিমাণে ধূম উদ্গীরণ হইতে লাগিল।

এই "উত্তরচরিত"-সমালোচনা সম্বন্ধে আরও একটা কথা এখানে মনে পড়িয়া গেল। বঙ্গদর্শনের এক জন প্রসিদ্ধ লেখক এক দিন ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "পুরাতন দলের চাঁইকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে কেন?" উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "পুরাতন মন্দিরগুলিকে নাড়াচাড়া করা উচিত নয় কি?" লেখক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "নাড়াচাড়া করিতে করিতে ঐ মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িবে, উহার স্থানে নূতন মন্দির উঠিবে।" তাহাতে লেখক কি বলিলেন, তাহা ঠিক মনে নাই। তবে উহার মর্ম্ম এই যে "উহা বড় কঠিন।" বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর ছিল, "দেখা যাউক।" বঙ্কিমচন্দ্র একে "উত্তরচরিতের" সমালোচনায় পুরাতন দলের প্রধানকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহাতে আবার পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িবেন বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছিলেন, এই দুই কারণে পুরাতন দলের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ব হইতেই উহারা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার বিরোধী ছিলেন। যখন "দুর্গেশনন্দিনী" প্রথম প্রকাশিত হয় তখন হইতেই তাঁহারা বিরোধী। "সোমপ্রকাশ" কাগজে দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচনা করিতে গিয়া তাঁহারা বঙ্কিমের ব্যাকরণ দোষ, ভাষা ও উপন্যাসখানি ইংরাজী গল্পের অনুকরণ,এই কয় দোষ ধরিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন! বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাকরণ-শিক্ষা ভালরূপই হইয়াছিল। ভাটপাড়ার বিখ্যাত বৈয়াকরণ ৺শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের নিকট তিনি ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

---

* এই প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রাঙ্কন কালে বিদ্রূপের কথাগুলি তুলিয়া দিয়াছিলেন।

তবে কেন যে লিখিতে বসিলে সকল সময়ে ব্যাকরণ গ্রাহ্য করিতেন না, তাহা বোধ হয় আধুনিক লেখকদিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান সুহৃৎ দীনবন্ধু সোমপ্রকাশের সমালোচনার উত্তর দিয়া কিছু দিনের জন্য পুরাতন লেখকদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইত, আর তাঁহারা ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠিতেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল যে বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক লেখা বন্ধ হয়। কেননা, উহা অসাধু ভাষায় লিখিত, এবং বিদেশীয় ভাবে পরিপূর্ণ, উহা পাঠ করিলে লোকের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল না, তাঁহারা সরিয়া দাঁড়াইলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা দুর্দ্দমনীয় বেগে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিল। ঐ ভাষার নামকরণ হইল বঙ্কিমীভাষা, এবং তাঁহার পুস্তকের "দূষিত বিদেশীয় ভাব" জাতীয় উন্নতির ভিত্তি সংস্থাপন করিল।

যাউক, এবারে মহাষ্টমীর সেই রাত্রের কথা বলি। রাত্রি তখন অধিক হইয়াছিল। আলস্য বোধ হওয়াতে আমি একটা তাকিয়া মাথায় দিয়া শয়ন করিলাম, ঘুমাইয়া পড়িলাম, কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, জানি না। হঠাৎ নিদ্রিতাবস্থায় অতিদূরনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। আমার যে কি সুখানুভব হইল, যাঁহারা নিশীথে অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায় মধুর সঙ্গীত শুনিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল অনুভব করিতে পারিবেন। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, আর পূর্ব্বোল্লিখিত কীর্ত্তনগায়কটি ঐ ঘরে একটি গীত গাহিতেছিল। যেমন মধুর গীত, তেমনই মধুর সুর। আমি স্থিরভাবে রহিলাম, পাছে নড়িলে এ মোহ ঘুচিয়া যায়। অনেকক্ষণ ধরিয়া গায়ক গীতটি গাহিল গীতটি এই :—

"এসো এসো, এসো বঁধু, আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি

অনেক দিবসে, মনের মানসে,
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।

মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।

নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।

বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন-পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥"

অনেকক্ষণ পরে গীত বন্ধ হইল, গায়ক বাহিরে উঠিয়া গেল। আমি তখন উঠিয়া বসিলাম, এ দিক ও দিক চাহিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র বামহস্তে মস্তক রাখিয়া নীরবে বসিয়া আছেন, মুখ হইতে নল অনেকক্ষণ খসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু দৃষ্টি কোথায়?—একখানি ছবির প্রতি। ছবিখানি বিলাতী ছবি, একটি অনুপমা সুন্দরী একছড়া মতির মালা গলায়; আর এক ছড়া মতির মালা একটি ক্ষুদ্র কৌটা হইতে অতি সঙ্কুচিত ভাবে তুলিতেছেন, আর হাসি-হাসি-মুখে বাম দিকে অপাঙ্গে কাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, যেন তাহার অমতে উহা তুলিতেছেন। অলঙ্কারপ্রিয়া সুন্দরীর এক ছড়া মতির মালায় মন উঠে নাই, আবার একছড়া তুলিতেছেন, যে ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, সে ব্যক্তি ঐ পটে অঙ্কিত নাই। ছবিখানি বড় সুন্দর, সকলেই উহার প্রশংসা করিতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কি ঐ ছবির সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন?—তাহা নহে। কে বলিবে তাঁহার মনে তখন কি হইতেছিল। মানবের স্বভাব এই, একাগ্রভাবে চিন্তা করিবার সময় সাধারণতঃ সে অনন্ত মনে একটা পদার্থের প্রতি চাহিয়া থাকে। তাহার দৃষ্টি একস্থানে আবদ্ধ থাকে। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। সম্মুখে ঐ ছবিটি ছিল, সেই জন্য দৃষ্টি উহার প্রতি স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি নিজেই "বঙ্গদর্শনে" লিখিয়া গিয়াছেন—

"যখন এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত—মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টি কুশলী কবির সৃষ্টি দৈব বংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না; সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই—এই গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন পারিব না।"

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন গান শেষ হইলে ছবির প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র গীত শেষ হইলে শয়ন করিয়া কড়ি বরগার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। তিনিও প্রতিভাশালী, তাঁহারও মনে কত কি উদয় হইতেছিল, কে জানে? গায়ক পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিল, আবার গান আরম্ভ

হইল, এবার অন্য গান হইল, "এস তোমায় নয়নে লুকাইয়া রাখো" ইত্যাদি। ভাবিলাম, ইহা অন্য কবির রচিত। এমন সময়ে সঞ্জীবচন্দ্র বলিলেন "এ অন্য কারিগরের হাতের।" তার পরে অনেক বৈষ্ণব কবির, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, বিদ্যাপতির রচিত গীত চলিল। অবশেষে "এস এস, এস বঁধু এস" গাইবার ফরমাস্ হইল, আবার সেই সুরের তরঙ্গ উঠিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, সকলে নীরব নিঃস্পন্দ হইয়া শুনিতে লাগিল—গান শেষ হইল। ইতিমধ্যে কে এক জন আমার নিকটের জানালা খুলিয়া দিল, জানালার মধ্য দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ভোর হইয়াছে, কিন্তু তখনও একটু অন্ধকার আছে, নীলাকাশে নক্ষত্রগণ হীনজ্যোতি হইয়াছে, কেবল পূর্ব্বদিকে একটা তারা বড় দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে—উহা পূর্ব্ব শুকতারা। বঙ্কিম-চন্দ্রের বাটীর সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র মাঠ ছিল, তাহার পূর্ব্বে ও দক্ষিণে আম্র-কানন ছিল, উহার গাছগুলির উপরে অসংখ্য পাখী কলরব করিতেছে, ক্রমে ফরসা হইল, পাখীগুলি আহারান্বেষণে দিগ্ দিগন্তে উড়িয়া গেল, আর বৈঠকখানার বাবুরা আপন আপন কার্য্যে চলিয়া গেলেন। এইরূপে মহাষ্টমীর রাত্রিশেষে বঙ্কিমচন্দ্র "এস এস, বঁধু এস" গানটি প্রথম শুনিলেন। ইহার বহুদিন পরে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রসন্ন গোয়ালিনীকে "বঙ্গদর্শনে" এই গান শুনাইয়াছিল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়

বস্ত্র—কন্থা।

বর্ত্তমান সময়ে কন্থা বা কাঁথা দরিদ্রের শীতনিবারণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্বৃদ্ধ বিলাসীর সহিত ইহার সম্পর্ক দেখা যায় না। মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজের মেয়েমহলে প্রসূতির শিশুপোষণে ইহার কতক ব্যবহার দেখা যায়। বঙ্গের কোন কোন স্থানে ভদ্রলোকের ব্যবহারেও ইহার সামান্য উপযোগ ছিল, এবং অদ্যাপি তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। ইহাতে মেয়েদের শিল্পনৈপুণ্যেরও পরিচয় পাওয়া যাইত, কিন্তু অল্পমূল্য কম্বলের আমদানীতে এই শিল্প ক্রমশঃ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। মধ্যযুগের কবিও জীর্ণপটনিবদ্ধ কন্থাকে

দরিদ্রের উপকরণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। (১) কিন্তু পুরাকালে এই জিনিস ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, এমন কি ইহার সম্পর্কে অনেক দেশ পরিচিত হইত, পাণিনি ব্যাকরণের সূত্র এবং কাশিকাবৃত্তি প্রভৃতির উদাহরণ এই বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। উক্ত ব্যাকরণের অনেকগুলি সূত্রের সহিত কন্থার সম্পর্ক রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি সূত্রের অর্থ এইরূপ "যদি উশীনর দেশীয় কন্থা বুঝায়, তবে কন্থা শব্দ যাহার পরে আছে, এমন তৎপুরুষ সমাস ক্লীবলিঙ্গ হয়। উদাহরণ "সৌশমিকন্থম্" "সংজ্ঞায়াং কন্থোশীনরেষু" পাঃ। ২।৪।২০। এই স্থলে পাণিনীয় ভাষাবৃত্তিকার সৃষ্টিধরাচার্য্য লিখিয়াছেন "সৌশমিকন্থ" শব্দের অর্থ সৌশমি কর্ত্তৃক কল্পিত অর্থাৎ উদ্ভাবিত "কন্থা" শীতত্রাণ বিশেষ (২)

অপর একটি সূত্রে বলা হইয়াছে, কন্থা প্রভৃতি শব্দ যাহার উত্তরপদে রহিয়াছে, দেশবাচক তাদৃশ বৃদ্ধিসংজ্ঞক প্রাতিপদিক হইতে শৈষিক ছ প্রত্যয় হয়। উদাহরণ দাক্ষিকন্থীয়ং ইত্যাদি। "কন্থাপলদ নগরগ্রাম হ্রদোত্তরপদাৎ। —পাঃ। ৪।২।১৪২।

অন্য একটি সূত্র "বর্ণৌ বুক্"। পাঃ। ৪।২।১৪৩। বর্ণু নামক একটী নদী, এই নদীর সমীপবর্ত্তী দেশ বর্ণু নামে অভিহিত হয়। এই বর্ণুদেশের কন্থা বুঝাইলে কন্থা শব্দের পর বুক্ প্রত্যয় হয়। উদাহরণ "তথাহি জাতং হিমবৎমুকান্থম্" (কাশিকা) ব্যাকরণেও যাহার ভূরি নিদর্শন দেখা যায়, যাহার নামে দেশ পরিচিত সে জিনিস শিল্পের উন্নত পদবীতে সমারূঢ় হইয়াছিল, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান কালে যাহা লেপ নামে পরিচিত, প্রাচীনকালে হয় ত তাহাও কন্থা নামেই পরিচিত হইত, সংস্কৃত সাহিত্যে লেপের স্বতন্ত্র নাম দেখা যায় না, অথচ যে দেশে শীতের প্রাচুর্য্য, তুলা সুপরিচিত এবং সুলভ, সে দেশের লোক লেপের ব্যবহার জানিত না, এইরূপ কল্পনাও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান কালে মুর্শিদাবাদের বালাপোষ যেমন নানা দেশে সুপরিচিত, পূর্ব্বকালে সম্ভবতঃ এইরূপ শীতনিবারক যাবতীয় সূচীবিদ্ধ জিনিসই কন্থানামে অভিহিত হইয়া শিল্পের নৈপুণ্য-

(১) ভিক্ষাশনং ভবনমায়তনৈক দেশঃ। শয্যাস্তরঃ পরিজনো নিজদেহভারঃ॥
বাসশ্চ জীর্ণপটখণ্ডনিবদ্ধকন্থা হাহাতথাপিবিষয়ং ন জহাতি চেতঃ।—শান্তিশতক।

(২) শোভনঃ সমঃ শান্তিরস্য, শুশমঃ তস্যাপত্যং সৌশমিঃ তৎকল্পিতা কন্থা, সৌশমিকন্থ শব্দে নোচ্যতে।

বশতঃ নিজের উদ্ভাবক দেশকে সভ্যসমাজে সুপরিচিত করিয়াছিল। মহর্ষি হারীতের একটী বচনেও শীতনিবারণে কন্থার বিশেষ উপযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণের সময়ে কোনও ভোগোপকরণ গ্রহণ করিবে না, কেবল আচ্ছাদনার্থ কৌপীন শীতনিবারণী কন্থা এবং পাদুকা এই কয়টি বস্তুর সংগ্রহ করিবে (৩)।

কুথ।

কুথ নামে প্রসিদ্ধ এক প্রকার আস্তরণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই আস্তরণ হস্তীর পৃষ্ঠে ব্যবহৃত হইত। অমরকোষে ইহা [হস্তীর] আস্তরণ পর্য্যায়েই পঠিত হইয়াছে (৪) "নানার্থধ্বনিমঞ্জরী" নামক অর্ব্বাচীনকোষে "কুথ" করিকম্বল নামে অভিহিত হইয়াছে।(৫) মেদিনীকোষের মতে "কুথ" শব্দের অর্থ বর্ণকম্বল [চিত্রকম্বল] (৬) শিশুপালবধে নারদের পরিহিত বিচিত্র মৃগচর্ম্ম ঐরাবতের আস্তরণ "কুথের" সহিত তুলিত হইয়াছে। (৭) এই সকল প্রমাণানুসারে বুঝা যায় "কুথ" নানাবর্ণে রঞ্জিত কম্বলজাতীয় আস্তরণ, ইহা সাধারণতঃ হস্তীর পৃষ্ঠেই ব্যবহৃত হইত, বর্ত্তমান সময়ে হস্তীর পৃষ্ঠে দৃশ্যমান "ঝুল" নামক আস্তরণে নানাবর্ণের সমাবেশ এবং শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু ইহাতে সর্ব্বত্র কম্বল জাতীয়তা দেখা যায় না। তাহাতে বোধ হয়, আধুনিক শিল্পীগণ কেবল নানাবর্ণের সমাবেশ বিষয়েই প্রাচীনের অনুকরণ করিয়াছে।

এই "কুথ" পূর্ব্বকালে বিশিষ্ট উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইত। সিংহলদেশের "কুথ" জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মহাভারতে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের "রাজসূয়" যজ্ঞে পৃথিবীস্থ ভূপতিবৃন্দ যে সকল উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সিংহলদেশীয় কুথেরও উল্লেখ দেখা যায়।(৮)

(৩) কৌপীনাচ্ছাদনং বাসঃ কন্থাং শীতনিবারিণীম্
পাদুকে চাপি গৃহ্নীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহম্।—হারীত ৬। ৫১

(৪) প্রবেণ্যাস্তরণং বর্ণঃ পরিস্তোমঃ কুথো দ্বয়োঃ [কর্ণীরথং]

(৫) কুথঃ স্যাৎ করিকম্বলঃ

(৬) কুথঃ স্ত্রীপুংসয়োর্বর্ণকম্বলে পুংসি বর্হিষি।

(৭) নিসর্গচিত্রোজ্জ্বলসূক্ষ্মপক্ষ্মণা, লসদ্বিসচ্ছেদসিতাঙ্গসঙ্গিনা।
চকাসতং চারুচমূরুচর্ম্মণা কুথেন নাগেন্দ্রমিবেন্দ্রবাহনম্। ১৮

(৮) শতশশ্চ কুথাংস্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্ — সভাপর্ব। ৫১অ ৩৬।

যদিও অভিধানে হস্তিপৃষ্ঠেই কুথের একচেটিয়া ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি এই জিনিসটাকে প্রয়োজনান্তরে বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যের তথ্য-নির্ণয়ে বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা।

কারণ, কবিশিরোমণি বাণভট্ট আহারসময়ে চন্দ্রাপীড়ের জন্য দ্বিগুণীকৃত কুথাসনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। (১) যদি কোষের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ স্থলের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তবে কবির অভিপ্রায় তিরোহিত হইবে, পক্ষান্তরে অপূর্ব্ব মতের আবির্ভাব হইবে, ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

নানার্থধ্বনিমঞ্জরীতে "কুথা" অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ কুথ শব্দ কন্থা অর্থে পঠিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, কন্থার প্রয়োজন [শীতনিবারণ] কুথের দ্বারাও সম্পাদিত হইত, অল্পার্থে স্ত্রীত্বনিবন্ধন কুথ হইতে কুথার আবির্ভাব হইতে পারে; ইহাতে প্রাকৃতের প্রভাব আছে কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবেই দেখা যাইতেছে,—যে জিনিস হাতীর পৃষ্ঠে শোভা পাইত, তাহাই কালান্তরে বা দেশান্তরে ভোজনাসনে ও শীতনিবারণেও অধিকারলাভ করিয়াছিল।

বর্ত্তমানেও দেখা যায়, শীতকালে যানারূঢ় শ্বেতাঙ্গদিগের চরণাচ্ছাদনে ব্যবহৃত "রাগ্" কৃষ্ণাঙ্গের শীতনিবারণে নিযুক্ত হইয়া থাকে।

পাণ্ডুকম্বল।

পাণ্ডুকম্বল নামক আর এক প্রকার রাজাস্তরণ কম্বলের পরিচয় পাওয়া যায়। পাণ্ডুকম্বলের দ্বারা আবৃত রথ পাণ্ডুকম্বলী নামে অভিহিত হইত, পাণিনি ব্যাকরণে ইহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। "পাণ্ডুকম্বলাদিনি" পাং। ৪।২।১২। এই পাণ্ডুকম্বল শব্দ যে রাজাস্তরণ বর্ণকম্বল অর্থাৎ চিত্রকম্বল অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কাশিকা-বৃত্তি-কার তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "পাণ্ডুকম্বলশব্দো রাজাস্তরণস্য বর্ণকম্বলস্য বাচকঃ।"

পটমণ্ডপ।

পটমণ্ডপ বা বস্ত্রগৃহ, যাহা বর্ত্তমান কালে তাঁবু নামে পরিচিত, তাহা অতিপ্রাচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ, সচরাচর দেখা যায়, যে সকল জিনিস অর্ব্বাচীন, তাহার নাম প্রায় যোগার্থের অনুসরণে প্রস্তুত হইয়া থাকে,

(১) আহারমণ্ডপমগচ্ছৎ। তত্র চ দ্বিগুণীকৃতকুথাসনোপবিষ্টঃ * * * * * * * আহারবিধিমকরোৎ।—[কাদম্বরী।]

এই বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ মশারির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কারণ, প্রাচীন সাহিত্যে মশারির নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত মশকনিবারণে ধূম-প্রয়োগের নিদর্শন ব্যাকরণাদিতে প্রসিদ্ধ। [মশকার্থোঽয়ং ধূমঃ।]

পটমণ্ডপের যদিও বস্ত্র-বেশ্ম বস্ত্রগৃহ প্রভৃতি যৌগিক নাম দেখা যায়, তথাপি ইহার "দূষ্য" নামটি খাঁটী রূঢ় তালিকায় গণ্য হইবে। অমরসিংহ ইহার অর্থনির্ণয়ে বলিয়াছেন—"দূষ্যাস্থং বস্ত্রবেশ্মনি"।

যে কালে "যাযাবর" শ্রেণী গৃহস্থের পরিচয় পাওয়া যায়, (১০) সে কালে পট-মণ্ডপের উদ্ভাবন সহজেই অনুমেয়। কারণ, "যাযাবর"দিগের ইহাই একমাত্র আশ্রয়। অদ্যাপি যাযাবরদিগকে পুত্রকলত্রাদি সহ মণ্ডপেই জীবনযাপন করিতে দেখা যায়। উচ্চ শ্রেণীর লোকের ব্যবহারে নিযুক্ত পটমণ্ডপে বায়ুসঞ্চালনার্থ কাণ্ডপট সন্নিবেশিত হইত। শিশুপালবধে তাহার নিদর্শন দেখা যায়। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে প্রস্থিত কৃষ্ণের সহযাত্রী রাজন্যবর্গ পথিমধ্যে "কাণ্ডপটে"র অবকাশে (ফাঁকে) সঞ্চারী মন্দ বায়ুর দ্বারা শ্রমজনিত স্বেদজল নিবৃত্ত হইলে বস্ত্রগৃহমধ্যে সহজ নিদ্রাদেবীর [illegible] অনুভব করিয়াছিলেন। (১১) মল্লিনাথ "কাণ্ডপটক" শব্দের অর্থনির্ণয় করিয়াছেন—"দূষ্যাদৌ [illegible]বায়ুসঞ্চারার্থঃ পটঃ।" শিশুপালবধেই অন্যত্র (১২) ও রামায়ণ [illegible] (১৩) নিখুঁত পটমণ্ডপের পরিচয় পাওয়া যায়, সুতরাং ইহাও যে বিলাসোপকরণের মধ্যেই পর্যায়ে গণ্য হইত, তাহা বলা যাইতে পারে।

বিতান।

বিতান বা চাঁদোয়ার সহিত আর্য্যজাতির বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিলাসের উপকরণরূপে ও যজ্ঞকার্য্যের অঙ্গরূপে, বিতানের ভূরি ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। যজ্ঞভূমি বিতানে পরিশোভিত হইত। অদ্যাপি পূজোৎসবাদি

(১০) দ্বিবিধো গৃহস্থো যাযাবরঃ শালীনশ্চ — মিতাক্ষরা, আচারাধ্যায়;
১০৮ শ্লোক টীকা [illegible]

(১১) উৎক্ষিপ্তকাণ্ডপটকান্তরলীনমন্দ-
মন্দানিলপ্রশমিতশ্রম[illegible]
দূষ্যা[illegible]
নিদ্রাসুখং বসনসদ্মসু রাজদারাঃ। ৫ স ১১।

(১২) [illegible]কোণরচিতানি নিরন্তরাণি-
বেশ্মানি রশ্মিবিততানি নরাধিপানাম্। ৫। ৫০

(১৩) উচ্ছ্রিতপটমণ্ডপমণ্ডিত [illegible]। ৫। ৬৭

কার্য্যে এই রীতির অনুসরণ দেখা যায়। তান্ত্রিক উপাসনাতেও বিতানের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। কুলার্ণবতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আত্ম স্থান মন্ত্র দ্রব্য ও দেহ, ইহাদের শুদ্ধি না হইলে দেবতার অর্চ্চনা হইতে পারে না।

বিতান ধূপ দীপ পুষ্পমালা প্রভৃতির দ্বারা শোভিত স্থানে পঞ্চবর্ণ চূর্ণের দ্বারা বিচিত্র মণ্ডল অঙ্কনের নাম স্থানশুদ্ধি। (১৪)

বিলাসোপকরণ বিতান ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত। "কাদম্বরী"তে বর্ণিত শূদ্রকনরপতির স্নানভূমিতে সিত বিতানের পরিচয় পাওয়া যায়। (১৫)

বস্ত্রের পরিধানপ্রণালী।

কি ভাবে বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, আর্য্যশাস্ত্রে তাহারও একটা নিয়ম দেখা যায়। কুলবধূদিগের প্রতি উপদেশ করা হইয়াছে, তাঁহারা গুল্ফ পর্য্যন্ত বস্ত্র পরিধান করিবেন, নাভি এবং স্তনদ্বয় সংবৃত করিবেন। (১৬) পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পুরাকালে রমণীদিগের দুইখানি বস্ত্র ও স্বতন্ত্র অবগুণ্ঠনধারণের ব্যবস্থা ছিল। তদনুরূপ আবরণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালী মহিলাগণ একখানা কাপড় পরিধান করিয়া থাকেন। এই একখানা কাপড় পরিধানেও নাভিস্তনাবরণ ও আগুল্ফাচ্ছাদন রূপ প্রাচীন স্মৃতিশাসনের সম্মান রক্ষিত হইতেছে। পুরুষগণের ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্রপরিধানের উপদেশ আছে। (১৭) শরীরের বামভাগে, পৃষ্ঠদেশে ও নাভিতে কক্ষত্রয় নিহিত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। এই নিয়মের অন্যথা হইলে বৈদকার্য্যে অধিকার হয় না। (১৮) প্রাচীনদিগকে এই রীতিতে কাপড় পরিধান করিতে দেখা যাইত। বর্ত্তমান সময়ে এই রীতির অনুসরণ সর্ব্বত্র দেখা যায় না। কেবল জ্ঞাতসারগণ বৈদকর্ম্মের অনুষ্ঠানসময়ে ত্রিকচ্ছ রীতিতে বস্ত্র পরিধান করেন। কাছা খুলিয়া রাখা

---

(১৪) আত্মস্থানমন্ত্রদ্রব্যদেহশুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।
যাবন্ন কুরুতে মন্ত্রী তাবদ্দেবার্চ্চনং কুতঃ॥ (৬ ন ১৬)
বিতানধূপদীপাদিপুষ্পমালোপশোভিতম্
পঞ্চবর্ণরজশ্চিত্রং স্থানশুদ্ধিরিতীরিতা। (১৯)

(১৫) বিততসিতবিতানাম্।

(১৬) "ন নাভিং দর্শয়েৎ কুলবধূরাগুল্ফাভ্যাং বাসঃ পরিদধ্যাৎ, ন স্তনৌ বিবৃতৌ কুর্য্যাৎ।
শঙ্খলিখিত, আহ্নিকতত্ত্ব।

(১৭) বামে পৃষ্ঠে তথা নাভৌ কক্ষত্রয়মুদাহৃতম্।
এভিঃ কক্ষৈঃ পরীধত্তে যো বিপ্রঃ স শুচিঃ স্মৃতঃ।—আহ্নিকতত্ত্বে স্মৃতি।

আসুরী রীতি বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, (১৮) কিন্তু বর্ত্তমানকালে যুবকদলে মুক্তকচ্ছতার ক্রমবিকাশ দেখা যাইতেছে।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

অমরতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৭)

এই সকল জন্ম মৃত্যুর সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের শিশুসুলভ কল্পনাই যে রহিয়া গিয়াছে,—ইহা একটি মৃণা সত্য। প্রায় আর সকল বিষয়েই কল্পনা যুক্তির অগ্রবর্ত্তিনী; কিন্তু এই ক্ষেত্রে যুক্তি আদিম যুগের কল্পনালীলা এখনও ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। যে সকল স্বপ্ন ও বর্ব্বর-কামনা গুহাগহ্বরের মানুষের চিত্তকে ভয় ও আশায় আন্দোলিত করিত, আমাদের কল্পনা এখনও সেই সকল স্বপ্ন ও কামনায় পরিবেষ্টিত। এই কল্পনা কতকগুলা অসম্ভব জিনিস প্রার্থনা করে, কেন না, জিনিসগুলা খুবই ক্ষুদ্র;—এমন কতকগুলি বিশেষ অধিকারে দাবী করে, যে অধিকার পাইলে, ঐকান্তিক বিনাশের দরুন আমরা যে মহা বিষাদের আশঙ্কা করি, ঐ অধিকারগুলি তাহা অপেক্ষাও ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের এই বর্ত্তমান ক্ষুদ্র চৈতন্যের মধ্যে সমস্ত অনন্তকাল অবরুদ্ধ—এ কথা ভাবিলে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ কি কাঁপিয়া উঠে না? এই সমস্ত সিদ্ধান্তে আমাদের যুক্তিহীন খেয়ালেরই পরিচয় পাই। আজ রাত্রির-নিদ্রার পর, এক শত বৎসর পরে,—আজ যেমন আছি, ঠিক্ সেই অবস্থায়,—সেই শরীর লইয়া—আবার জাগিয়া উঠিব—ইহা যদি কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর ভর করিয়া, আমরা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিতে পারি, (এমন কি, পূর্ব্বজন্মের বিস্মৃতির কন্নারটা সত্বেও) তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, আমাদের দৈনিক ক্ষণস্থায়ী নিদ্রার ন্যায় এই শতবর্ষব্যাপী নিদ্রাকে বিশ্বস্তচিত্তে আহ্বান করিবে না? ভয় করা দূরে থাক্, ইহার

---

(১৮) বিকচোৎফুল্লরোমাঞ্চ নয়নাকারম এব চ।

স্তোকঃ স্বার্থে তথা কর্ণে ন শব্দ শিরঃস্বপি।—আদিরসতত্ত্ব

বিকচকলিবিভাসপৃষ্ঠকচ্ছঃ।—রঘুনন্দন।

পরিধানাবচ্ছিন্নকচ্ছা নিবদ্ধা জাহ্নবী মতা।—গোপিবাজকলা।

অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য কি সে কুতূহলী হইয়া উঠিবে না? জীবনটা কোন অলৌকিক উপায়ে দীর্ঘতা লাভ করিল, এই বিশ্বাসে, এই দেব-নিদ্রার বিধাতার উপর শত শত ধন্যবাদ বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে কি অস্থির করিয়া তুলিবে না? তথাপি, এই নিদ্রার পর তাহার কি অবশিষ্ট থাকিবে? জাগরণের পর সে আপনার কোন্‌টুকু ফিরিয়া পাইবে? যে মুহূর্ত্তে সে চক্ষু মুদ্রিত করিল—এবং তার পর যখন সে পূর্ব্বস্মৃতিবিরহিত, অজানা এক নূতন জগতে জাগিয়া উঠিল—এই দুই অবস্থার মধ্যে যোগবন্ধনটি কি? নানাবিধ আশা হৃদয়মধ্যে পোষণ করিয়া এই সুদীর্ঘ যামিনীতে সে যে প্রবেশ করিতে সম্মত হইয়াছিল—সে কিসের করারে?—কোন বন্ধন থাকিবে না, এই করারে। বস্তুতঃ, প্রকৃত মৃত্যু ও এই নিদ্রার মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ,—এক শত বর্ষ বিলম্বে এই নিদ্রার জাগরণ, যে ঘুমাইয়াছিল, তাহার পক্ষে এই জাগরণ, মরণোত্তরভাবী শিশুর মর্শ্মের ন্যায়ই অভাবনীয়।

(৮)

আর এক কথা,—আমাদের সম্বন্ধে নহে—পরন্তু অন্য ইতর জীব জন্তুদের সম্বন্ধে যখন এই প্রশ্নটি উঠে, তখন আমরা কি উত্তর দিব? ইতর জীব জন্তুদের অস্তিত্ব মৃত্যুর পরেও থাকে কি না এ বিষয়ে কি আমরা একটুও চিন্তা করিয়াছি? যে কুকুর এমন বিশ্বাসী, এমন স্নেহশীল, এমন বুদ্ধিমান, সেই কুকুর মরিবামাত্র, তাহার শবকে আমরা একটা ঘৃণিত জঞ্জালমাত্র মনে করিয়া যত শীঘ্র পারি, তাহা দুরীভূত করিবার জন্য ব্যস্ত হই। ঐ কুকুরের জীবনের যে সাত্ত্বিক অংশটুকুকে আমরা ভালবাসিতাম, তাহা আমাদের স্মৃতি ভিন্ন আর কোথাও থাকিবে কি না, কুকুরদের জন্যও কোনও পরলোক আছে কি না—এই প্রশ্নটি সম্ভব বলিয়াও আমরা মনে করি না। যে কুকুর কতকগুলি মর্ম্মস্পর্শী গুণের সমষ্টি, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও নিদ্রার বশীভূত, সেই কুকুর বেচারীর আত্মা অনন্তকাল পর্য্যন্ত নক্ষত্রদিগের সঙ্গে অসীম ব্যোমপ্রাসাদে সুরক্ষিত হইবে,—ইহা মনে করিলেও হাস্যাস্পদ হইতে হয়। তা ছাড়া, যে পাশব আত্মা কেবল কতকগুলি সামান্য দৈহিক অভাব উপাদানে গঠিত, তাহার দেহ নষ্ট হইলে তাহার আর কি অবশিষ্ট থাকে? যে অতলস্পর্শ ব্যবধান খনিজ ও উদ্ভিজ্জের মধ্যে নাই, উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তুর মধ্যে নাই, সেই অতলস্পর্শ ব্যবধান আমাদের ও জীব জন্তুদের মধ্যে আছে—এরূপ কল্পনা করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? অন্যান্য পার্থিব জীব হইতে

আমরা সুদূরে অবস্থিত—আমরা খুবই ভিন্ন,—এই যে আমাদের অভিমান, ইহা কত দূর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা সর্ব্বপ্রথমে বিচার করা আবশ্যক।

(৯)

আমাদের শরীর মৃত্যুর পর ভস্মসাৎ হইবে, ইহা জানিয়াও আমরা বেশ নিশ্চিন্ত থাকি। আমরা কখন আশা করি না যে, আমাদের এই শরীর অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে। বরং আমরা দুঃখিত হই, যদি আমরা জানি যে, আমাদের ইহজীবনের সমস্ত শারীরীক কষ্ট দোষ ও কদর্য্যতা অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমাদের সাথের সাথী হইবে। কেবল আত্মাই আমাদের সঙ্গে যাইবে, ইহাই আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে ;—এই আত্মা—আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিক বৃত্তি,—আরও যদি কিছু বলিতে চাও—সংস্কার ; অব্যক্ত চৈতন্য, ব্যক্ত চৈতন্য—এই সমস্তের সমষ্টি ভিন্ন কি আর কিছু? ইহা ছাড়া অন্য কিছু বলিয়া আমরা কি কল্পনা করিতে পারি? ইহার আমরা কি উত্তর দিব? আমরা জরাগ্রস্ত হইলে যখন আমাদের উক্ত বৃত্তিগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন—দৈহিক শক্তি সামর্থ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে আমরা যেমন হতাশ হই না—ঐ সকল বৃত্তির ক্ষয়েও আমরা সেইরূপ হতাশ হই না। তখনও মৃত্যুর পরে আমরা থাকিব, এইরূপ আমাদের একটা অস্পষ্ট আশা ও ধারণা থাকে। দৈহিক শক্তি সামর্থ্যের উপর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি যে নির্ভর করে, তাহা স্বাভাবিক বলিয়াই আমরা মনে করি। যাঁহাদের আমরা ভালবাসি, তাঁহাদের শরীরের সমস্ত শক্তিই যখন বিনষ্ট হইয়া যায়, তখনও আমরা তাঁহাদিগকে হারাইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করি না—আমরা মনে করিতে পারি না,—তাঁহাদের আমিত্ব,—তাঁহাদের নৈতিক ব্যক্তিত্ব নষ্ট হইয়াছে। মৃত্যুর পরেও তাঁহাদের এই সকল বুদ্ধিবৃত্তি যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুতে আমরা শোক আর ক্রন্দন করি না, তিনি যে আর নাই ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু যদি মৃত্যুকালীন দৈহিক ধ্বংসকে এবং জীবদ্দশায় বুদ্ধিবৃত্তির ধ্বংসকে তেমন গুরুতর বলিয়া মনে না করি, তাহা হইলে আমাদের কোন্ অংশকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য মৃত্যুর নিকট প্রার্থনা করিব, এবং কোন্ অসম্ভাব্য স্বপ্নকে আমরা বাস্তবে পরিণত দেখিবার জন্য দাবী করিব?

(১০)

বাস্তবপক্ষে—অন্ততঃ আপাততঃ—অমরতার প্রশ্নটি সম্বন্ধে এমন কোন

উত্তর আমরা কল্পনা করিতে পারি না, যাহা যুক্তির নিকট গ্রাহ্য হইতে পারে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে? মনে কর, এই প্রদীপটি আমার টেবিলের উপর রহিয়াছে; ইহার মধ্যে কোন প্রকার গুহ্য রহস্য নাই; বাড়ীর মধ্যে এই জিনিসটি সব চেয়ে পুরাতন, সব চেয়ে বিদিত, সব চেয়ে পরিচিত। আমি উহাতে দেখিতেছি একটু তৈল, একটি পলিতা, একটি কাচের আবরণ; এবং ঐ সমস্ত হইতে আলোক বাহির হইতেছে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমি জিজ্ঞাসা করি ঐ আলোক পদার্থটি কি?—জ্বালাইবার সময় উহা কোথা হইতে আসে? নিবাইবার সময় উহা কোথায় চলিয়া যায়, তখনই প্রহেলিকার আরম্ভ হয়। এবং তখন হইতেই, যে জিনিসটা আমি তুলিতেছি, নামাইতেছি, এমন কি, নিজের হাতে গড়িতেও পারি, সেই ক্ষুদ্র জিনিসের চারিপার্শ্বে একটা দুরবগ্রাহ্য প্রহেলিকার উদ্ভব হয়। এই টেবিলে পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যকে জড়ো কর, এক জনও বলিতে পারিবে না—যে লঘু অগ্নিশিখাটিকে আমার ইচ্ছানুসারে জন্মদান করিতে পারি ও ইচ্ছানুসারে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতে পারি—উহা স্বরূপতঃ কি-পদার্থ। উহাদের মধ্যে যদি কেহ সাহসপূর্ব্বক উহার একটি তথা-কথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাহা হইলে ঐ ব্যাখ্যার প্রত্যেক শব্দ অজ্ঞাত পদার্থের অজ্ঞেয়তা আরও বাড়াইয়া তুলিবে, এবং চতুর্দ্দিক হইতে অসীম অন্ধকারের অপূর্ব্ব দৃষ্ট আরও নব নব দ্বার উন্মুক্ত করিবে বৈ আর কিছুই নহে। যাহার সমস্ত উপাদান আমাদের দ্বারা বিরচিত, যাহার উৎপত্তি, যাহার নিকট-বর্ত্তী কারণ ও কার্য্যগুলি একটি চীনে-মাটির পেয়ালার মধ্যে অবস্থিত, সেই সুপরিচিত একটুখানি আলোর স্বরূপ, নিয়তি ও জীবন সম্বন্ধে আমরা যখন সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ, তখন সেই জীবনের অজ্ঞাত অংশের মধ্যে প্রবেশ করিতে আমরা কি প্রকারে আশা করিতে পারি, যে জীবনের অতি সামান্য ক্ষুদ্রতম উপাদানগুলিও, আমাদের বুদ্ধি হইতে কোটী কোটী বৎসর ও কোটী কোটী যোজন দূরে অবস্থিত?

(১১)

যখন হইতে মানুষের আবির্ভাব, তখন হইতে মানুষ, আমরা যে রহস্যের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই রহস্যের পথে একপদও অগ্রসর হয় নাই। এ বিষয়ে আমরা যে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করি,—যে স্তরে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি অবস্থিত, সেই স্তরটিকে উহা কোন দিক্ হইতেই স্পর্শ করে না,—বুদ্ধিবৃত্তি এ স্থলে একেবারেই মক্ক। যে বৃত্তিটি এই প্রশ্ন উত্থাপন করে, এবং যে বাস্তবতা

হইতে আমরা উত্তরের আশা করি—এই দুয়ের মধ্যে এমন কোন সম্বন্ধ নাই, যাহা সম্ভবপর এবং যাহা আমরা কল্পনাতেও ধারণ করিতে পারি। আধুনিক কালের উদ্যমশীল কঠোর গবেষণা এ সম্বন্ধে আমাদিগকে একটুও জ্ঞানালোক প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। সুপণ্ডিত সত্যনিষ্ঠ প্রেততাত্ত্বিক সভাসমিতি (বিশেষতঃ ইংলণ্ডের) এই সম্বন্ধে প্রভূত তথ্যরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার দ্বারা কতকটা এইরূপ সপ্রমাণ হয় যে, কোন আধ্যাত্মিক বা স্নায়বিক জীবের জীবন, ভৌতিক জীবের বা দেহের মৃত্যুর পরেও কিয়ৎকালের নিমিত্ত থাকিয়া যায়। স্বীকার করিলাম, এই সকল তথ্য অসম্বাদিত বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; উহা কয়েক পংক্তিমাত্র, কয়েক ঘণ্টার মাত্র রহস্যের আরম্ভটাকে সরাইয়া দেয়। যদি কোন প্রিয়জনের ছায়ামূর্ত্তি এমন স্পষ্ট আকারে আমার নিকট প্রকাশ পায় যে, উহার সহিত আমি বাক্যালাপ করিতে প্রবৃত্ত হই, এবং ঐ ছায়ামূর্ত্তি যদি আজ রাত্রে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমার ঘরে প্রবেশ করে, যে মুহূর্ত্তে, তাহার আত্মা আমা হইতেই শত যোজন দূরে অবস্থিত, তাহার শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে, যে জগতের প্রথম বর্ণটিও আমরা জানি না, ইহা সেই জগতের একটি অতীব অদ্ভুত ব্যাপার, সন্দেহ নাই; বড় জোর উহা এইমাত্র সপ্রমাণ করে যে, ঐ আত্মা, ঐ অন্তরাত্মা, ঐ প্রাণবায়ু, ঐ স্নায়বশক্তি, আমাদের জড় দেহের ঐ ধারণাতীত সুসূক্ষ্ম অংশটি, আমাদের জড় দেহ হইতে ক্ষণকালের জন্য বিযুক্ত হইয়া, অবস্থিতি করিতে পারে। যেরূপ কোন দীপের অনলশিখা নির্ব্বাপিত হইলেও, মুহূর্ত্তের জন্য, সলিতা হইতে বিযুক্ত হইয়া কখন কখন রাত্রির অন্ধকারে ভাসমান হইয়া থাকে। অবশ্য, এই ব্যাপারটি বিস্ময়জনক, কিন্তু এই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকৃতি যদি এরূপই হয়, তাহা হইলে বরং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ব্যাপার আমাদের ইচ্ছামত ও আমাদের জীবদ্দশাতেই, আরও ঘনঘন কেন সংঘটিত না হয়? যাহাই হউক, উহা এই সমস্যাটির উপর কিছুমাত্র আলোক নিক্ষেপ করে না। এরূপ একটিও প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয় নাই, যাহার নবজীবন সম্বন্ধে, অতি-পার্থিব জীবন সম্বন্ধে ইহজীবন হইতে বিভিন্ন কোন নূতন জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে। প্রত্যুত, জড় শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া তাহার আধ্যাত্মিক জীবন কোথাও আরও বিশুদ্ধ হইবে, না যে সময়ে জড়ের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, সে সময়কার জীবন হইতেও নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অধিকাংশ ছায়ামূর্ত্তিগুলি, একপ্রকার স্বপ্নাটন-সুলভ মূঢ়তা-সহকারে অ-

নগণ্য পূর্ব্বাভ্যাসের যন্ত্রবৎ অনুসরণ করিয়া থাকে। কেহ বা একটা আস্‌বাবের উপর তাঁহার যে টুপিটি রাখিয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সেই টুপিটির অন্বেষণ করিতেছেন, কেহ বা একটা ক্ষুদ্র ঋণের কথা এইমাত্র অবগত হইয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কিন্তু একটু পরেই যখন প্রকৃত মরণোত্তর জীবন আরম্ভ হইবার কথা, সেই সময়েই প্রায় সকলেই আকাশের মধ্যে বিলীন হইয়া চিরকালের মত অন্তর্হিত হয়। আমি স্বীকার করি, উহা মরণোত্তর-জীবনের সত্যতার পক্ষেও যায় না, বিরুদ্ধেও যায় না। এই ক্ষণিক ছায়ামূর্ত্তিগুলি, পারত্রিক জীবনের প্রথম-রশ্মি কি শেষ-রশ্মি, তাহা আমরা জানি না। হয় ত মৃতেরা অন্য উৎকৃষ্টতর উপায়ের অভাবে, এই বন্ধন-সূত্রটির প্রয়োগ করিয়া, আমাদের গোচরীভূত হয়। হয় ত বা, ইহার পরেও উহারা জীবিত থাকিয়া আমাদের চতুষ্পার্শ্বে বিচরণ করে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নসত্ত্বেও আমাদের নিকট আত্ম-পরিচয় দিতে পারে না, অথবা তাহারা যে উপস্থিত আছে, এ কথা আমাদিগকে জানাইতে পারে না। কেন না, উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যে ইন্দ্রিয় আবশ্যক, সে ইন্দ্রিয়টি আমাদের নাই। এই একই কারণে, হাজার চেষ্টা করিলেও, কোনও জন্মান্ধ আলোক বা বর্ণের লেশমাত্র ধারণা করিতে পারে না। সে যাহাই হউক, ইহা নিশ্চিত, ইংরাজেরা যাহাকে "সীমান্ত প্রদেশ" বলেন, সেই সীমান্ত প্রদেশের এই অভিনব বিজ্ঞান এই বিষয়টি বুঝিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন কিন্তু মানব-জ্ঞানের প্রথম উন্মেষের সময় এই সমস্যাটি যে অবস্থায় ছিল, এখনও পর্য্যন্ত ঠিক সেই অবস্থাতেই রহিয়াছে।

(১২)

আমাদের জ্ঞানের পথ রুদ্ধ, আমাদের দুর্জ্জয় অজ্ঞতা,—সুতরাং আমাদের পারলৌকিক গতি কি হইবে, তাহার নির্ব্বাচন করিবার ভার এখন কল্পনার হাতেই পড়িয়াছে। এই সম্বন্ধে যত প্রকার সম্ভাবনা আছে, তন্মধ্যে এমন একটি সম্ভাবনাও দেখিতে পাই না, যাহা আমাদের নিকট বাস্তবিকই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বপ্রথম অনুমানটি—জীবনের ঐকান্তিক ধ্বংস। দ্বিতীয় অনুমান যাহা আমাদের অন্ধ-সংস্কার আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন করিয়া থাকে—সেই অনুমানটি আমাদিগকে এইরূপ আশ্বাস দেয় যে, আমাদের চৈতন্য, আমাদের বর্ত্তমান "আমি"টি, অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্রভাবেই সংরক্ষিত হইবে। এই অনু-

মানটিও আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি। প্রথমটির অপেক্ষা একটু বেশী যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও উহা মূলে এরূপ অকিঞ্চিৎকর ও বালকোচিত, মূঢ়ভাবের কথা যে,—কি মানুষ, কি বৃক্ষলতা, কি জীবজন্তু, উহাদের জন্য, অসীম আকাশ ও অসীম কালের মধ্যে কি উপায়ে যুক্তি-সঙ্গতভাবে স্থান করা যাইতে পারে, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। আমরা আরও এই কথা বলি,—আমাদের যত প্রকার অন্তিম গতির সম্ভাবনা আছে, তন্মধ্যে এই গতিটিই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ; ইহা অপেক্ষা নিছক্ ধ্বংসও শতগুণে বাঞ্ছনীয়।

আর একটি বিকল্পাত্মক অনুমান আছে। হয় আমাদের মৃত্যুর পরে আমরা বিনা-চৈতন্য বাঁচিয়া থাকিব, অথবা আমাদের চৈতন্য এরূপ বর্দ্ধিত ও রূপান্তরিত হইবে যে, আমরা এক্ষণে তাহার কোন ধারণাও করিতে পারি না, আমাদের বর্ত্তমান চৈতন্যই হয় ত উহার ধারণার পক্ষে অন্তরায়। আমাদের চক্ষুর তারা এক্ষণে যে আলোক ও বর্ণ গ্রহণ করে, উহা অন্য প্রকার আলোক ও বর্ণ গ্রহণ করিতে হয় ত অসমর্থ—সে আলোক ও বর্ণ গ্রহণ করিবার জন্য হয় ত এই চক্ষু অন্যরূপে গঠিত হওয়া আবশ্যক।

প্রথম দৃষ্টিতে এই অনুমানটি বিকল্পাত্মক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আসলে ইহা একই—ইহা আবার সেই চৈতন্যের সমস্যার মধ্যেই আমাদিগকে আনিয়া ফেলে। তাহার দৃষ্টান্ত—এ কথা যদি বলি যে, বিনা-চৈতন্যে বাঁচিয়া থাকিবার নামই ধ্বংসপ্রাপ্তি, তাহা হইলে বিনা বিচারে আগে ভাগেই চৈতন্যের সমস্যাটিকে এককোপে ছেদন করা হয়। কিন্তু এই চৈতন্যের সমস্যাটি যারপরনাই দুর্ব্বোধ, এবং ইহার মত ঔৎসুক্যজনক আলোচ্য বিষয়ও আর কিছুই নাই। বিষয়টি যতই দুরূহ হোক না, দর্শনশাস্ত্রমাত্রই এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধে যিনি জিজ্ঞাসু, তিনি নিজেই সেই জ্ঞানের বিষয়। অতএব যে দর্পণটি সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে, তাহার উপর তাঁহার নিজের অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কি পড়িতে পারে? তাহাতে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? তবে কেহ বলিবেন, যদিও তাঁহার নিজের বহুল আবৃত্তি ছাড়া এই প্রতিবিম্ব হইতে আর কিছুই বাহির হইতে পারে না, তথাপি ইহাতে এমন একটি রশ্মি প্রসূপ আছে, যাহা আর সমস্তকে উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ। এখন উপায় কি? চৈতন্যকে অস্বীকার করা ভিন্ন চৈতন্যকে এড়াইবার আর উপায় নাই;—এই পার্থিব-জ্ঞান আমাদের দেহতন্ত্রের একটা ব্যাধিবিশেষ; ইহার প্রতীকারচেষ্টা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই।

এইরূপ চেষ্টা উন্মাদের প্রচণ্ড চেষ্টা বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু এই মায়া-জগতের অপর পারে হয় ত ইহাই সুস্থ চিত্তের নিদর্শন।

(১৩)

কিন্তু এই চৈতন্যকে এড়ান অসম্ভব; আবার ফিরিয়া আসিয়া সেই চৈতন্যের চারি ধারেই—স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই চৈতন্যের চারি ধারেই আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হই। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের এই স্মৃতি-বৃত্তিও যার-পর-নাই ক্ষণস্থায়ী। আমরা এই কথা বলি,—যেহেতু কিছুরই ধ্বংস হয় নাই; অতএব ইহজন্মের পূর্ব্বেও অবশ্য আমরা জীবিত ছিলাম। কিন্তু যেহেতু বর্ত্তমান জীবনের সহিত সেই পূর্ব্ব জীবনের একটা যোগসূত্র নিবদ্ধ করিতে পারি না, অতএব সেই পূর্ব্বজীবন আমাদের নিকট থাকা না থাকা দুই-ই সমান,—এই হেতু পূর্ব্বজন্মের সমস্ত তত্ত্বই আমাদের হইতে বহুদূরে অবস্থিত। আর এক কথা, কি জীবনের পূর্ব্বে কি মৃত্যুর পরে, আমাদের এই স্মৃতিমূলক "আমি"টি যদি কিয়ৎকালের জন্য আবির্ভূত হয়, —এই ক্ষণিক আবির্ভাব এতই কি একটা গুরুতর ব্যাপার যে, কেবল উহা হইতেই আমরা অমরত্বের সমস্যাটির মীমাংসা করিতে পারি। তবে, আমরা এক্ষণে যে আমির আমিত্ব উপভোগ করিতেছি, সেই আমিটি একটি বিশেষ আকারের মধ্যে বদ্ধ; এবং সেই আকারটিও অতীব অসম্পূর্ণ, অতীব ক্ষণভঙ্গুর, অতীব ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু ইহা হইতে কি এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ইহা ছাড়া জ্ঞানের অন্য কোন পন্থা নাই,—জীবন-উপভোগের অন্য কোন উপায় নাই? যাহারা জন্মান্ধ, তাহাদিগকে যদি বলা যায়, কোন বিশেষ উপায়ে তাহারা আলোকের আনন্দ উপভোগ করিতে পারে,—তাহারা ইহা সম্ভব বলিয়াই স্বীকার করিবে না,—ইহা তাহাদের কল্পনার অতীত। আমাদের সম্বন্ধেও ইহা কি এক প্রকার নিশ্চিত নহে যে, ইহলোকে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বোধের মধ্যে স্মৃতিমূলক চৈতন্য অপেক্ষা আরও একটি উচ্চতর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভাব আমাদের আছে,—যাহার দ্বারা আমাদের আমিত্ব আমরা আরও বিপুল ভাবে, আরও নিশ্চিতরূপে উপভোগ করিতে পারি? ইহা কি বলা যাইতে পারে না যে, অঙ্কুরাকারে এই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের একটা অস্পষ্ট বা অপুষ্ট রেখাচিহ্ন আমরা কখন কখন ধরিতে পারি? অন্ততঃ, একটিমাত্র চেতনবিন্দুর মধ্যে আমাদের পার্থিব জীবনের সমস্ত বিবর্ত্তন কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, আমাদের এই পার্থিব জীবনতন্ত্রই সম্ভবতঃ ঐ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে উৎপীড়িত বা একেবারে উন্মূলিত করিয়াছে। আমাদের অহং-

বোধকে কঠোর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিবার পরেও, কোন কোন অস্পষ্ট মুহূর্ত্তে, এমন একটা কিছু কি থাকিয়া যায় না, যাহা সম্পূর্ণ রূপে নিঃস্বার্থ, যাহা অন্যের সুখেই তৃপ্তি লাভ করে? ইহাও কি সম্ভব নহে,— উদ্দেশ্য-হীন, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইতে যে শিল্পকলার আনন্দ আমরা উপভোগ করি, একটি সুন্দর প্রতিমা-দর্শনে,—একটি নির্দ্দোষ কীর্ত্তিস্তম্ভ-দর্শনে আমরা যে প্রশান্ত সন্তোষ অনুভব করি, যাহার দ্বারা আমাদের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না—ইহা কি সম্ভব নহে, এই আনন্দ, এই চিত্ত-পরিতোষ আমাদের আর এক চৈতন্যের পূর্ব্বাভাস—আর এক চৈতন্যের ক্ষীণরশ্মি, যাহা আমাদের এই স্বার্থমূলক চৈতন্যের একটা ফাটাল দিয়া অল্প অল্প প্রকাশ পাইতেছে? আমরা আপাততঃ এইরূপ ভিন্ন প্রকারের চৈতন্য কল্পনা করিতে পারি না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে একেবারে অস্বীকার করিতেও পারি না। এমন কি আমরা ইহাও বিশ্বাস করি,—অন্য প্রকার চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার পক্ষে উহা যে একটা প্রবর্ত্তক হেতু—ইহা প্রতিপাদন করাই অধিকতর সঙ্গত।

আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে এক সঙ্গে আমাদিগকে না দিয়া যদি বৎসরে বৎসরে একাদিক্রমে আমাদিগকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে, এমন কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে আমাদের জীবন সঞ্চরণ করিবে, যাহা আমরা কখন কল্পনাও করিতে পারি না। তা ছাড়া, যে কামবৃত্তি, যৌবনোদয়ের পূর্ব্বে কখনই জাগ্রত হয় না, এবং যে বৃত্তির প্রথম অভ্যুদয়ে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন জগৎ আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়, জীবনের সমস্ত মেরুদণ্ড যেন স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে, সেই কামবৃত্তি আমাদের দৈহিক গঠনের একটা আগন্তুক কারণের উপর নির্ভর করে মাত্র।

যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও মত্ততা বয়স্ক লোকদিগের চিত্তকে বিচলিত করে, সেই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও মত্ততার একটি অভিনব জগতের অস্তিত্ব আমাদের বাল্যদশায় আমরা স্বপ্নেও মনে করিতে পারি না। যদি সেই বাল্যকালে এই সকল মত্ততার জনশ্রুতি দৈবাৎ কখন আমাদের অবোধ ও কুতূহলী কর্ণে আসিয়া পৌঁছে,—আমাদের জ্যেষ্ঠগণ কি প্রকার মত্ততায় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে সমর্থ হই না; এবং আমরা হয় ত তখন আপনাদিগকে এইরূপ আশ্বাস দিই যে, আমাদের ঐ বয়সে আমরা উহাঁদের অপেক্ষা বেশী ধীরতার পরিচয় দিতে সমর্থ হইব; কিন্তু যৌবনারম্ভে

যে দিন কন্দর্পদেব হঠাৎ আমাদের সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হন,—তখন আমাদের সমস্ত ভাব ও অধিকাংশ ধারণাই কেন্দ্রভ্রষ্ট ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে, কোন বিষয় ধারণা করিতে পারি বা না পারি, উহা যে একেবারে কল্পনাতীত,—ইহা প্রতিপাদন করিবার অধিকার আমাদের নাই।

(১৪)

আমরা কুলপরম্পরাক্রমে অদৃষ্টের উপর আত্মসমর্পণ করিয়া প্রবৃত্তির অন্ধ-কারাগারে যে ভাবে বাস করিতেছি,—উহা বিশ্বের রত্নভাণ্ডার হইতে আমা-দিগকে বিমুখ করিয়া রাখিতেছে, এবং বহুকাল বিমুখ করিয়া রাখিবে। আমাদের এখনকার কল্পনাও অতি সহজে এই বন্দী অবস্থার সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া লয়, আপোস করিয়া লয়। এ কথা সত্য, এই কল্পনা আমাদের প্রবৃত্তিসমূহের একান্ত অনুগতা দাসী; প্রবৃত্তিরাই উহাদের পোষণ করে, উহার খাদ্য যোগায়। কিন্তু এই কল্পনার অভ্যন্তরে যে সব সহজ সংস্কার ও ভাবী অবস্থার পূর্ব্বাভাস নিহিত আছে, তাহারা আমাদের এই কল্পনাকে বলে—এই কারাগারের মধ্যে বদ্ধ থাকা তোমার পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত, তথা হইতে বাহির হইয়া আরও বৃহত্তর—আরও অসীমতর গণ্ডি তোমার অনুসন্ধান করা উচিত। ক্রমশঃ কল্পনার অন্তরে এই প্রশ্ন স্বতই জাগিয়া উঠে, হয় ত তাহার সর্ব্বোচ্চ দুঃসাহসী ও স্পর্দ্ধিত স্বপ্নসমূহ হইতে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে বাস্তব জগতের আরম্ভ। ইহার পূর্ব্বে অতটা দুঃসাহসিক হইবার অধিকার সে আর কখন পায় নাই। আকাশ ও কালের মধ্যে, সে যত কিছু প্রকাণ্ড জিনিস গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহা বাস্তব জগতে বিদ্যমান, তাহার তুলনায় উহা কিছুই নহে। জীবনের দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে, বিজ্ঞান যাহা প্রকাশ করিতেছে, তাহা হইতেই আমাদের কল্পনা জানিতে পারিতেছে, বাস্তব জগতের সহিত সে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বাস্তব জগতের একটি পাথরের মধ্যে, একখণ্ড লবণের মধ্যে, এক পাত্র জলের মধ্যে, একটি গাছের মধ্যে, একটি কীটের মধ্যে যে সমস্ত অজ্ঞাত রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা কল্পনাকে নিরত ছাপাইয়া উঠিতেছে, তাহার উজ্জ্বল প্রভায় কল্পনার দৃষ্টি অন্ধীভূত হইতেছে, কল্পনা বিহ্বল হইয়া পড়িতেছে। বিজ্ঞানের এই তথ্যটি হইতে আমাদের অজ্ঞতার বেড়াটি যদি অল্পে অল্পে ভাঙ্গিয়া যায়, অন্ততঃ আমাদের মনের ভাবটি যদি এই বিশ্বাসের অনুরূপ হয়, কল্পনার সাহায্যে

যতটা মনে করিতে পারি, বাস্তব জগৎ তাহা অপেক্ষাও অনন্ত গুণে আশ্চর্য্য, এই কথাই যদি আমাদের বিশ্বাস জন্মে—সেটুকুও মন্দ লাভ নহে। কেন না, তাহা হইলে আমরা এইরূপ উপলব্ধি করিতে পারি যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে কোন সুনিশ্চিত বাস্তব সত্য লাভের আশা করা যাইতে পারে না—ঐ সকল সত্য উহা হইতে আরও দূরে অবস্থিত। মানুষ যদি সত্যের দৃষ্টি লাভ করিতে চাহে, তাহা হইলে সর্ব্বদাই তাহার এইরূপ মনে করা উচিত:—হঠাৎ যদি আমি বিশ্বের সমস্ত বাস্তব সত্যের মধ্যে স্থাপিত হই, তাহা হইলে বিশ্বে একটি পিপীলিকার সহিত আমার তুলনা হইতে পারে। আমরা পিপীলিকার মত পূর্ব্বে সিধা পথগুলিই জানিতাম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্তেরই সহিত পরিচিত ছিলাম, আমাদের বল্মীকের ক্ষুদ্র দিগন্তই আমাদের দৃষ্টির সীমা ছিল, এখন হঠাৎ আমরা যেন অ্যাটলান্টিকের মধ্যবর্ত্তী অসীম তৃণভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। যে পার্থিব কারাগার, অতি-কল্পনার বাস্তব সত্যের সংস্পর্শে আসিতে আমাদিগকে এক্ষণে নিবারণ করিতেছে, সেই কারাগার হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই কল্পনার অতীত জিনিস কল্পনা করিয়া, দৈবাৎ কখন কখন, আমরা সত্যের দুই এক টুকরা লাভ করিয়া থাকি। অতএব যখনই কোন নূতন কল্পনার স্বপ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, আমরা যেন আমাদের চক্ষু হইতে পার্থিব জীবনের বন্ধনটা সরাইয়া ফেলি। এই কথা যেন আমরা মনে করি, এখনও বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের নিকট হইতে যে সকল সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, তন্মধ্যে জীবন-উপভোগের নূতন প্রণালীর সম্ভাবনাটি—আরও উন্নত ভাবে, বিস্তৃত ভাবে জীবন-উপভোগের সম্ভাবনাটি তেমন দুরাশার জিনিস নহে, সম্ভাবনার অতীত জিনিসও নহে, প্রত্যুত আমাদের বর্ত্তমান চৈতন্য আমাদিগকে যাহা প্রদান করে, তাহা অপেক্ষা আরও সুনিশ্চিত, আরও স্থায়ী, আরও সম্পূর্ণ। এই সম্ভাবনাটী যদি আমরা মানিয়া লই, তাহা হইলে আমাদের অমরতা আর অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না,—অন্ততঃ তত্ত্বদৃষ্টিতে অমরতাসমস্যার এক প্রকার সামাধান হইয়া যায়। এখন কেবল আমাদের ভাবিবার বিষয়,—এই অমরতা কি আকারে কি প্রণালীতে প্রকাশ পাইবে; আমাদের অর্জ্জিত জ্ঞান ও নীতির কোন্ কোন্ অংশ আমাদের নিত্যকালের জীবনে, আমাদের সার্ব্বভৌমিক জীবনে প্রবেশলাভ করিবে। এ কাজটি অদ্যকারও নয়, কল্যকারও নহে—ইহা অন্য দিনের • • •।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতি।

প্রীতি, বিশ্বাস ও আশা।

২

সমাজ না থাকিলে সাহিত্যের বিকাশ হয় না। সাহিত্য যে সকল ভাব লইয়া ক্রীড়া করে, যে সকল চারু চিন্তা লইয়া সুন্দর সৌধ নির্ম্মাণ করে, যে সকল রমণীয় ভাব লইয়া সুতান গান গায়িতে থাকে—তাহা, মানুষের সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ, ব্যক্তির সহিত সমাজের যে সম্পর্ক, হৃদয়ে হৃদয়ে যে সুখ দুঃখের সম্বন্ধ, প্রাণে প্রাণে সংস্পর্শে যে উল্লাস বা ব্যথা,—তাহা হইতে সমুত্থিত হয়। সাহিত্য সেই সমাজসম্বন্ধজাত সুখ দুঃখের সুচারু অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তির মূলে যখন বিশাল সমাজপ্রীতি নিহিত থাকে, তখন সেই অভিব্যক্তি কখনও বা পদ্যের মধুর ঝঙ্কারে নিনাদিত হয়, কখনও সমাজের আনন্দের জন্য, শিক্ষার জন্য, এমন মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, যাহাতে নরনারী নিরবধি সুধা পান করিতে থাকে, কখনও বা গদ্যের গম্ভীরনাদিনী বাক্যপরম্পরা নায়গারা জল-প্রপাতের ন্যায়, বর্ষার পদ্মার ন্যায় ছুটিতে থাকে, সমাজকে আলোড়িত করিতে থাকে :

সাহিত্য এক প্রকার সংগ্রাম—উত্তমের সহিত অধমের সংগ্রাম, পুণ্যের সহিত পাপের সংগ্রাম, মূর্ত্ত পাপ-রাবণের হস্ত হইতে পুণ্যরূপিণী জানকীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা, অমঙ্গলের কবল হইতে মঙ্গলকে রক্ষা করিবার প্রয়াস। সংক্ষেপে, সাহিত্য মানব জাতির মঙ্গলগীতি। যাহাতে মনুষ্যের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়, যাহাতে সুচিন্তা ও মহৎ ভাব সমাজের হৃদয়কে উন্নত করিয়া, বিশুদ্ধ করিয়া, মার্জ্জিত করিয়া, মনুষ্যকে পরস্পরের প্রেমে পরস্পরকে ডুবাইয়া দিয়া, মর্ত্ত্যে স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি করিতে পারে—তাহাই সাহিত্যের ধর্ম্ম, সাহিত্যের লক্ষ্য, সাহিত্যের প্রাণ। বাল্মীকির রামায়ণ বল, হোমারের ইলিয়দ বল, কালিদাস, ভবভূতি, সেক্ষপিয়ারের নাটক বল, ডিমস্থীনিস, সিসিরো, বর্ক, এমেটের বক্তৃতা বল, এমার্সন, কার্লাইল, রস্কিনের প্রবন্ধ বল—বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, তাহাদিগের ভিতর মানবপ্রীতি রহিয়াছে ; এই মানবপ্রীতিই এই রচনাগুলিকে জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। ভাবুক পাঠক তাহা পাঠ করিবার সময় দেখিতে পান, যেন জীবন্ত মনুষ্যপ্রেম এই সকল রচনার ভিতর দপ্ দপ্ করিয়া স্পন্দিত হইতেছে।

সকল বিষয়েই প্রয়োজন দেখিয়া আয়োজন করিতে হয়, অভাব বুঝিয়া পূরণ করিতে হয়, রোগের নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়; গন্তব্য স্থান লক্ষ্য করিয়া পথ চলিতে হয়। সাহিত্যেও তাহাই। সমাজের অভাব কি, প্রয়োজন কি, সাহিত্যিকগণ তাহা বুঝিবেন, বুঝাইবেন; তাহা পূরণ করিবার উপায় বলিয়া দিবেন। সমাজের উপস্থিত পীড়া কি, সাহিত্যকে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। সাহিত্য তাহা বলিবেন, ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিবেন, ত্বরিত সমুচিত চিকিৎসা করার জন্য সমাজকে প্রবৃত্তি দিবেন। সমাজের গন্তব্য স্থান কোথায় কোন তীর্থে যাইতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া, তদনুযায়ী পথে চলিবার জন্য সমাজকে সম্মত করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে, তীর্থযাত্রীদিগের সাথী বা পাণ্ডার ন্যায়, সমাজকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।

সুতরাং বঙ্গদেশে এক্ষণে সাহিত্যিকগণকে সমাজের অবস্থা, অভাব, আধি-ব্যাধির পর্য্যালোচন করিতে হইবে; পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চিন্তা করিয়া, তাহার প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে এবং সমাজকে তাহা বুঝাইতে হইবে, নিদ্রিত অবসন্ন সমাজকে জাগাইতে হইবে, আত্মরক্ষার জন্য উৎসাহিত উত্তেজিত করিতে হইবে, আত্মরক্ষার উপায় সাধ্যমত বলিয়া দিতে হইবে।

এক্ষণে বঙ্গদেশে বিশেষ দুঃখ ও অভাব—ম্যালেরিয়া জ্বর, অন্নকষ্ট, জল-কষ্ট; বর্ত্তমান সামাজিক রোগ, বিলাসোন্মাদ, বিবাহে পণ, মামলাব্যসন। ধনীদিগের মধ্যে নিঃস্বার্থদানবিমুখতা, অন্নজলদান-কাতরতা, উপাধিপ্রিয়তা ও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অভাব; শিক্ষিতগণের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মভাবের ও ধর্ম্মকর্ম্মের লোপ ও পণ্ডিত্যাভিমানসর্ব্বস্ব ধর্ম্মচর্চ্চা।—

ইহার মধ্যে উদাহরণস্বরূপ ম্যালেরিয়া বিষয়টি লইলাম। ডিমস্থিনিস, ম্যাসিডনের ফিলিপের উদ্ধত আক্রমণ হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য এথিনিয়ানদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। বর্ক অত্যাচারী হেষ্টিংসকে দমন করিবার জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সিসিরো ক্যাটলাইনের ষড়যন্ত্র বিদীর্ণ করিবার জন্য, রোমকদিগকে উত্তেজিত করণার্থ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ম্যাটসিনি, ইতালীকে সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত ইতালীর মধ্যে চতুর্দ্দিকে তাঁহার রচনাবলী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। আর আমাদের ভীষণ নির্দ্দয় শত্রু ম্যালেরিয়াকে দমন করিবার জন্য, দূরীভূত করিবার জন্য আমাদের সাহিত্যিকগণ স্বদেশকে উত্তেজিত উৎসাহিত করি-বার জন্য চেষ্টা করিবেন না কি? প্রবন্ধমালা লিখিবেন না কি? তাঁহারা

স্বদেশবাসিগণের কি দুরবস্থা হইয়াছে তাহা দেখুন। গৃহে গৃহে মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা, ঘরে ঘরে অকাল মৃত্যুর শোক, সুস্থ নরনারীপূর্ণ কোলাহলময় জনপদ-সমূহ শ্মসানে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে, যেখানে পূর্ব্বে সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি বিরাজ করিত, পণ্যবীথিকায় রাজবর্ত্ম সুশোভিত ছিল—যেস্থান দিবসে ব্যবসায়িগণের গুঞ্জনে মুখরিত হইত, রজনী সমাগমে, যেস্থান পৌরজনের সুখময় গীত বাদ্যে, সেতার তানপুরা মৃদঙ্গ ধ্বনি মিশ্রিত কলকণ্ঠ গীতিতে নিনাদিত হইত—যেস্থানে সখীজনের মধুর সঙ্গীত পল্লীপথে কাঁপিতে কাঁপিতে আকাশে সমুত্থিত হইয়া চারিদিকে পল্লীবাসীগণের উপর সুধাবর্ষণ করিত—অদ্য সেই স্থানে শৃগাল-ব্যাঘ্র-সর্প-সঙ্কুল অরণ্য বিরাজ করিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের ভীষণ গর্জ্জনে শব্দিত হইতেছে। যেখানে ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত, যেখানে শাস্ত্রকলাপ অনুশীলিত হইত; যেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর, মন্দির, ঘণ্টা কাঁসর নিনাদে প্রতিধ্বনিত হইত, আরতির পবিত্র আলোকে আলোকিত হইত, পুরুষগণ ও অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূগণ দেব পূজার জন্য দলে দলে সম্মিলিত হইত—অদ্য সেস্থানে ভগ্নমন্দিরারূঢ় অশ্বত্থ বৃক্ষে পেচকের ঘুৎকার শব্দিত হইতেছে, মন্দিরের অভ্যন্তরে অন্ধকারে চর্ম্মচটকা উড়িতেছে, মূষিক ও সরীসৃপ-গন বাস করিতেছে। আর চতুর্দ্দিকে অরণ্যে বায়ু, যেন অবসাদের ও দুঃখের নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, অসৎকৃত প্রেতাত্মার ন্যায় বিচরণ করিতেছে। আর ভগ্নগৃহসমূহের ইষ্টকস্তূপ হইতে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত গৃহস্থের মৃত্যু যন্ত্রণা ধ্বনি, শোকক্ষিপ্ত স্বজনের আর্ত্তনাদ, যেন আজিও থাকিয়া থাকিয়া নৈশনিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া, আকাশ মার্গে ঘুরিতেছে! যে সকল পল্লীগ্রাম আজিও জনশূন্য হয় নাই, কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ লোকবিরল হইতেছে, পল্লীবাসীগণ ক্রমে ক্রমে তিল তিল করিয়া মরিতেছে তাহাদিগের রোগযন্ত্রণা—তাহা কি বলিব! আমার কখন কখন মনে হয় যে বঙ্গদেশে যত নগর ও গ্রাম ম্যালেরিয়াতে উৎসন্ন যাইতেছে, এই সকল নগর ও গ্রামে, অসংখ্য নগরবাসী ও গ্রামবাসী; সকলে একটী নির্দ্দিষ্ট তারিখে ঠিক দুই প্রহর রজনীতে, সকলে এক সময় সমস্বরে উচ্চ কণ্ঠে যদি ভগবানকে ডাকে, দুই দণ্ড কাল চীৎকার করিয়া, হাত জোড় করিয়া, ঊর্দ্ধ মুখে বলিতে থাকে "ভগবন্ রক্ষা কর, আর সহ্য করিতে পারি না।" "ভগবন্, রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর—" তাহা হইলে আমার বোধ হয়, সেই সম্মিলিত স্বরং সেই গভীর বেদনানিঃসৃত বিরাট প্রার্থনা, সেই আর্ত্তনাদের বজ্র-নির্ঘোষ শুনিয়া, সহানুভূতিতে সমুদয় দেশ কাঁপিয়া উঠিবে, সমুদয় সভ্য জগৎ

শিহরিয়া উঠিবে। কৈলাসে হর'পার্ব্বতীর আসন টলিবে—পার্ব্বতীর হৃদয় দয়ায় দ্রবীভূত হইবে, রোগের মুক্তির জন্য স্বয়ং মহাদেব ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন, এবং বিবিধ বিধানে বঙ্গবাসীকে আত্মরক্ষার জন্য, স্বাস্থ্য লাভের জন্য, উত্তেজিত করিবেন, উপায় বলিয়া দিবেন। তখন চতুর্দ্দিকে ঘোর তপস্যা আরম্ভ হইবে, যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে, হোমের পবিত্র ধূমে দেশ ভরিয়া যাইবে—স্বর্গ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বাস্থ্যের কমণ্ডলু লইয়া বঙ্গদেশে অবতরণ করিবেন।

ওরে সাহিত্যক মন! তোর এমন কৃষি কাজ আসে না এতদিন যদি এই পতিত জমি আবাদ কত্তিস তা হলে সোনা ফল্‌তো। একবার নিঃস্বার্থ সরল প্রেমের, স্বদেশ-প্রীতির বেড়া, কালী নামের বেড়া দিয়ে, সুচিন্তার বীজ ছিটিয়া দেনা। মুক্তকেশীর শক্তবেড়া এর কাছে যম ঘেসে না। সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, যে ধর্ম্মবুদ্ধিতে সংকার্য্যের প্রবৃত্তি দেয়, সমাজসেবায় লোককে নিযুক্ত করে, তাহারই অভাবে দেশে রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। যদি কোন জনপদ রোগযুক্ত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহা দৈহিক রোগযুক্ত হইবার পূর্ব্বে নৈতিক রোগযুক্ত হইয়াছিল। তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে সেই ধ্বংসোন্মুখ সমাজে সাহিত্য তাহার কর্ত্তব্য পালন করে নাই, লোককে ধর্ম্মপথে যাইবার জন্য উদ্বোধিত করে নাই।

বাল্মীকি দশাননবধ উপলক্ষ করিয়া রামায়ণ রচনা করিলেন। কালিদাস তারকাসুরবধ উপলক্ষে কুমারসম্ভব লিখিলেন। হেমচন্দ্র বৃত্রনিধন অবলম্বন করিয়া বৃত্রসংহার প্রণয়ন করিলেন। হে সাহিত্যিক মহারথিগণ! আপনাদিগের মধ্যে কেহ কি ম্যালেরিয়া রাক্ষসবধ অবলম্বন করিয়া এক মহাকাব্য লিখিতে পারেন না। বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠে কাব্যে যেমন ভবিষ্যতের পথ সূচিত হইয়াছে, আপনাদিগের নূতন কাব্যে স্বাস্থ্যোদ্ধারের পথ সূচিত হইবে। মনুষ্যের স্থায়ী ভাব ও প্রবৃত্তির উপর নূতন কাব্য স্থাপিত করুন। মহতী ভাষায় অভিব্যক্ত হইলে, রসাত্মক বাক্যপরম্পরায় বিন্যস্ত হইলে, তাহা জগতে স্থায়ী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আমি এখানে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা বঙ্গদেশের অন্যান্য কষ্ট,অভাব সম্বন্ধে প্রযুজ্য। অগ্নিস্পর্শ করিবামাত্র জল ফুটে না, কিছুকাল ব্যাপিয়া জলে অগ্নি সংযোগ করিতে হয়, তবে জল টগ্‌ বগ্‌ করিয়া ফুটিতে থাকে, বাষ্প উঠিতে থাকে, এবং তাহাতে এমন শক্তি উদ্ভূত হয়, যে তাহা বিষম গুরুভার-

বাহী রেলশকট শ্রেণী পবনবেগে লইয়া যায়। তেমনি, কোনবিষয় চিন্তা করিবা-মাত্র তৎসম্বন্ধে সাহিত্যনামযোগ্য প্রবন্ধ নির্গত হয় না। সেই বিষয়টী ভাবিতে ভাবিতে, মনে আন্দোলন করিতে করিতে, চমৎকারিণী শক্তির উদ্ভব হয়, মস্তিষ্ককক্ষ মনোহারিণী মঙ্গলদায়িনী চিন্তায় ভরিয়া যায় তখন সেই মস্তিষ্ক হইতে, নির্ম্মল নির্ঝরের ন্যায়, সারবান্ সাহিত্য ঝর্ ঝর্ করিয়া নির্গত হয়। কখন বা, জ্বালামুখীর নিস্রবের ন্যায়, ভাবের স্রোত প্রচণ্ড বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়।

হে সাহিত্যিকগণ! সৌখীন বিলাসিনী রচনার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন থাকিবেন না। গবেষণা ভাল, আবশ্যক। জীর্ণ পুঁথি উদ্ধার করিতেছেন—বেশ। কিন্তু বঙ্গবাসীর জীর্ণদেহ উদ্ধার করা তাহাও কি আপনাদের আলোচ্য বিষয় নহে, গুরুতর কার্য্য নহে? পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া বাহির করিতেছেন, করুন, নিরস্ত হইতে বলি না। কিন্তু বর্ত্তমান তত্ত্ব, বর্ত্তমান জীবনমরণাত্মক সমস্যা, তাহাও আলোচনা, সমাধান করুন। সাহিত্য বিজ্ঞানকে টানিয়া আনিবে, তখন দেশে সাহিত্য ও বিজ্ঞান, চৈতন্য ও নিমাইয়ের ন্যায়, শান্তি ও কল্যাণীর ন্যায়, শিবও শক্তির ন্যায়, মিলিত হইয়া স্বদেশবাসিগণকে উদ্ধার করিবে, জীবন দিবে, মুক্তি দিবে।

হে সাহিত্যিকগণ! তোমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ একটা কথা বলিয়া থাকবে যে যে সাহিত্যের কার্য্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা। আমি তাহা স্বীকার করি, সাহিত্যের সৌন্দর্য্যে এত আনন্দ পাইয়াছি, জীবনে বুঝিবা আর কিছুতেই তত আনন্দ পাই নাই. সাহিত্যের সৌন্দর্য্য সমুদয় শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়াছে, হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হইয়াছে। কিন্তু আমার বোধ হয় "সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কবির কার্য্য" এই কথাটার অনেকেই অপব্যবহার করেন ও এই সকল লোকের মতে কার্লাইল এমার্সন, রস্কিন প্রভৃতির রচনা সাহিত্য নহে। কারণ, তাঁহাদিগের রচনার প্রধান উদ্দেশ্য সমাজের হিত-সাধন করা, কিন্তু সৌন্দর্য্য'সৃষ্টির অর্থ কি এমন রচনা যাহাতে রসোদ্ভাবন হয়। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বলেন, যে বাক্যে রসাবির্ভাব হয়, সেই বাক্যকে বা রচনাকে সাহিত্য বা কাব্য বলে। তাঁহাদিগের মতে কতকগুলি রস স্থায়িভাব, কতকগুলি ব্যভিচারিভাব। বঙ্কিমবাবু প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের এই রসবিভাগ লইয়া কথঞ্চিৎ উপহাস করিয়াছেন। আমি তাহার বিষয় কোন মত দিতে চাহি না। তবে আমার বোধ হয়, বঙ্কিমবাবু দুইদিক রাখিতে, চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যের ও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের

গৌণ উদ্দেশ্য চিত্তোৎকর্ষসাধন" তাঁহারমতে সৌন্দর্য্য সৃষ্টিদ্বারা চিত্তরঞ্জন কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য, চিত্তোৎকর্ষসাধন অপ্রধান উদ্দেশ্য। আমার বিশ্বাস, সভ্য জগৎ, কাব্যের উদ্দেশ্য যে ইহার অপেক্ষা বিস্তৃত ও মহৎ, তাহা শীঘ্র জানিবে। কাব্যের প্রশস্ত ও মহৎ ও পূর্ণ উদ্দেশ্য, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি দ্বারা, হৃদয়গ্রাহী রচনা দ্বারা, রসোদ্ভাবন দ্বারা,—(১) চিত্তরঞ্জন করা, (২) চিত্তোৎকর্ষ সম্পাদন করা, (৩) সমাজের মঙ্গল সাধন করা। ইউরোপ ইহার মধ্যেই এই পূর্ণ উদ্দেশ্য গ্রহণ করিয়াছে। ইউরোপের প্রধান উপন্যাস, যথা ভিক্টরহুগো ও তলস্তয়ের উপন্যাসে, সমাজের সমস্যা সকল মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা হই-তেছে। বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার পরিণত বয়সের উপন্যাস আনন্দমঠ, সীতারাম প্রভৃতিতে সমাজের মঙ্গলসাধন উপায় প্রচার করিয়াছেন। বঙ্কিম প্রভৃতি মহাত্মা অতি উচ্চসাহিত্যিকগণ সমাজের সংস্কারের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধাবলী রচনা করিয়াছেন। সাহিত্যের এক নব যুগ আরব্ধ হইয়াছে।

জন ষ্টুয়ার্টমিল Leberty সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, আশা করি কোন সৌন্দর্য্যধ্বজী তাহাকে সাহিত্যের রাজ্য হইতে দূরীভূত করিবেন না। বোধ করি আমাদিগের দেশের প্রবন্ধলেখকগণ ঐ মহামূল্য গ্রন্থকে সাহিত্যের অবমাননা বিবেচনা করিবেন না। যখন দেবীসদৃশী মার্কিন রমনী দাসগণের প্রতি লোমহর্ষণ অত্যাচারে মর্ম্মাহত, স্তম্ভিত হইয়া, ধর্ম্ম প্রবৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া, দেবাবিষ্ট ভাবে, Uncle Tom's Cabin লিখিয়া স্বদেশ-বাসিগণের বিবেক জাগরিত করিলেন, রসাত্মক বাক্যপরম্পরায় কোথাও পাঠক হৃদয় দ্রবীভূত করি-লেন, কোথায়ও বা প্রপীড়িতের উদ্ধার করিবার জন্য রৌদ্ররসে প্রদীপ্ত করিলেন, যেন ঐ উপন্যাসের ভিতর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিকীর্ণ হইতে লাগিল—তখন যে গ্রন্থ রচিত হইল তাহা কি অপূর্ব্ব সাহিত্য নহে? তাহা সাহিত্যের অবমাননা না গৌরব? তাহা পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য। সাহিত্য Uncle Tom's Cabin কে মস্তকে গৌরব কিরীট স্বরূপ ধারণ করিয়াছে। তাহাতে একদিকে ভাবাত্মক রস প্রচুর পরিমাণে আছে, অন্যদিকে ব্যবহারিক মাঙ্গল্যও আছে।

বস্তুতঃ উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে, একটা বিশ্বাস থাকে যে তাহা ভবিষ্যতে সমা-জকে উন্নত করিবে, ক্রমবিকাশের পথে লইয়া যাইবে তাহার ভিতর এমন একটী আশা জাগিয়া থাকে। আশা উন্নতির অগ্রগামিনী সখী। যে উন্নতি আজিও হয় নাই, কিন্তু যাহা হওয়া উচিত, এবং হইবে, আশা তাহাকে অঙ্কিত করে, মানস নেত্রে তাহা বর্ত্তমান ঘটনার মত দেখিতে পাই। সাধারণ লোকে

যাহা অসম্ভব অলীক প্রলাপ বাক্য বিবেচনা করে, প্রতিভাপন্ন সাহিত্যেকের আশা তাহাকে ভবিষ্যতের ধ্রুব সত্য বিবেচনা করে, এবং বাল্মিকীর ন্যায় রাম না হইতে রামায়ণ রচনা করে। উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যক ভবিষ্যবক্তা বা prophet এই জন্য কার্লাইলকে Seer of Chelsea বলে। রস্কিন Seer, তলস্তয় Seer। তাঁহাদিগের কোন কোন রচনা ও প্রস্তাব প্রথমে উপহসিত হইয়াছিল, কিন্তু পরে শনৈঃ শনৈঃ তাহা আদরে গৃহীত সম্মানিত অনুসৃত হইতেছে।

তাই বলি হে সাহিত্যিক। তোমার ঈশ্বরদত্ত শক্তির অপব্যবহার করিও না। সাহিত্যিকগণ সমাজের উপদেষ্টা নেতা ও ত্রাতা। আমি এই প্রবন্ধে সেই সকল প্রতিভাশালী সাহিত্যিকগণকে সম্বোধন করিতেছি যাঁহাকে ইচ্ছা করিলে মূসার ন্যায় আমাদিগকে ফেরোয়ার ব্যাধি ও অভাবের অমঙ্গল রাজ্য হইতে প্রতিশ্রুত স্বাস্থ্য ও সিদ্ধির মঙ্গল রাজ্যে লইয়া যাইতে পারেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল রায়।

অবশেষে।

[১]

সরলা ও তাহার দাদা প্রফুল্ল বড় ব্যস্ত। জিনিসপত্র গোছান হইতেছে। পুরাতন ও নূতন বস্ত্রাদি, ছবি, উপন্যাস, নাটক, ইতিহাস, বড় ও ছোট বাক্স, খেলনা প্রভৃতির 'প্যাকিং' প্রায় এক সপ্তাহ হইতে চলিতেছে। বিরাম নাই। কি রকম করিয়া অল্প আয়তনের মধ্যে সুচারুরূপে, কতগুলি সামগ্রী, স্তরে স্তরে, পাশাপাশি স্থাপিত হইতে পারে, তাহা লইয়া বহু পরামর্শ, বহু তর্ক ও বিতর্ক হইতেছে প্রফুল্লের আইনের বহি অপেক্ষা সরলার কাঁচের ও পাথরের খেলনা অধিক স্থান অধিকার করিল।

উভয়েই পিতৃমাতৃহীন। জনক-জননীর দুইখানি ফটোগ্রাফ কাহার বাক্সে থাকিবে, তাহা স্থির না হওয়াতে সরলা পিতার ফটো লইল, প্রফুল্ল জননীর ফটোখানি রেশমের ফিতায় বাঁধিয়া আল্বমের মধ্যে রাখিল।

পাটনার অনতিদূরে গঙ্গাতটে দ্বিতল গৃহ। সম্মুখে উদ্যান। প্রাচীর-বেষ্টিত প্রায় সাত বিঘা জমী। জাহ্নবীকল্লোলমুখরিত প্রশান্ত তট। পাড়ের নীচে সুন্দর বাঁধা ঘাট। আফিমের কারখানায় বহুদিন চাকরী করিয়া প্রফুল্লের পিতা ক্রমে ঐ সম্পত্তিটুকু অর্জন করিয়াছিলেন। উদ্যান প্রফুল্লের

যাতায় প্রস্তুত। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্যারিষ্টার প্রফুল্লচন্দ্র অনেকটা পড়্‌তি জমী লইয়া একটা 'দলের' সূত্রপাত করিতেছিলেন।

বাটীর পার্শ্বেই মিসেস্ ডমিঙ্গোর অনাদিকাল হইতে বসতি। বড় মিস্ ডমিঙ্গো খুব লম্বা ও চিরকুমারী। ছোট মিস্ ডমিঙ্গো ক্ষুদ্রাকৃতি, এবং তাঁহার শীঘ্রই বিবাহ হইবার খুব সম্ভাবনা। সরলা তাঁহাদের নিকট ইংরাজী সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা ও পিয়ানো শিখিত এবং তাহার পরিবর্ত্তে ছোট মিস্ ডমিঙ্গোকে হিন্দী ও বাঙ্গালা শিখাইত। বিহার অঞ্চলে বাস করিয়া, এবং বিহারী বালিকাগণের সহিত একত্র স্কুলে পড়িয়া, সরলার তের বৎসরের মধ্যেই হিন্দী ভাষায় অসাধারণ দখল জন্মিয়াছিল।

হৃদয়ে চিরাঙ্কিত, জনকজননীর পূর্ব্বস্মৃতি তাঁহাদিগের অসীম স্নেহ, ভ্রাতার অবিশ্রান্ত যত্ন ও আদর, জাহ্নবী-তটবিস্তৃত পবিত্র দৃশ্য ও বিদুষীর সহিত সখ্যতা, সরলার জীবনকে অপূর্ব্বভাবে সংগঠন করিয়াছিল।

সেই বিমল প্রভাম্বিত সুন্দর ক্ষুদ্র মুখখানির শোভা-বর্দ্ধন করিয়া দুইটি চিন্তান্বিত আঁখি সর্ব্বদাই কাহাকে অন্বেষণ করিত।

'দুই বৎসর পূর্ব্বে বাবা এইখানে বসিয়া শেফালিকা বৃক্ষের তলে পূজা করিতেন। তাঁহার আসনে বসিয়া আমি পূজা করিয়াছি। দাদা, এ স্থান কি করিয়া ছাড়িবে?' কিন্তু সরলা আবার বলিল—'না। বোধ হয়, বৌদিদিকে লইয়া তুমি আবার এখানে আসিবে, কেমন দাদা?'

প্রফুল্লের দেশে যাইবার উদ্দেশ্য কেবল বিবাহ নহে। বিহার অঞ্চলে বাঙ্গালীর আর পয়সা জুটা দুর্ঘট। উকীল ও ব্যরিষ্টারের সংখ্যা নাই;—তাহারা সেই দেশীয়।

'সরলা, তোমাকে লুকাইবার দরকার নাই। তোমার সম্ভাবিতা বৌদিদি এখানে বাস করিতে চাহিলেও, অন্নবস্ত্র জুটিবে কিনা সন্দেহ। ইহাই প্রথম সমস্যা। এবং তুমি ভবিষ্যতে যাহার করে সমর্পিতা হইবে, সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ অন্ততঃ পাটনায় পাটের ব্যবসা আরম্ভ না করিলে এখানে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব। ইহাই দ্বিতীয় সমস্যা।'

প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর করিয়া আবার বলিল—'সরলা, আপাততঃ এই স্থান কাহাকেও বিক্রয় করিব না। কেহ যদি ভাড়া না লইতে চাহে, মিস্ ডমিঙ্গোর হাতে থাকিবে। যাঁহাদের চিরন্তন করুণা ও সন্তানবাৎসল্য এই পবিত্র নিবাসকে পবিত্রতর করিয়া আমাদিগের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ

জীবনকে বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাঁহাদিগের স্মরণচিহ্নার্থ ইহা উৎসর্গ করিব।

"উৎসর্গের' কথা শুনিয়া সরলার নয়নে জল আসিল। কিন্তু ভ্রাতার নিকট তাহা লুকাইয়া শেফালিকা বৃক্ষের নীচে গিয়া দাঁড়াইল। অস্তগত সূর্য্যের শেষ ক্ষীণ রক্তিমাভা ধূসর সন্ধ্যার সহিত মিশিয়া দিবসের অস্তিত্ব তখনও প্রতিপন্ন করিতেছিল।

সরলা বৃক্ষের অগ্রভাগে দেখিল—তাহার আদরের কাঠবিড়ালী স্থির, নিঃস্পন্দ, বোধ হয় সন্ধ্যাসমাগমে নিদ্রাগত।

'জেমি! জেমি! জেমি!'

কিন্তু জেমি নিরুত্তর। ক্রমে একটি ছায়া, এবং ছায়া দলিয়া একটি যুবক অগ্রসর হইল।—ছিন্ন বস্ত্র, মলিন টুপি মস্তকে, এবং হস্তে একটি ক্ষুদ্র লৌহশৃঙ্খল।

'কেও, কিষন্?'

কিষন্ কহিল 'হাঁ'। সরলা! আমার একটি অনুরোধ, যাইবার সময় কাঠবিড়ালীটি আমাকে দিয়া দাও।' সরলা নয়নের জল আর রুদ্ধ করিতে পারিল না। কিষন্‌লাল তাহা মুছাইয়া দিল।

'ভাই কিষন্, তুমি বাবাকে ফুল তুলিয়া দিতে, আমার মনে আছে। আমরা গেলে ঐ ফুল প্রত্যহ তুলিও এবং কাঠবিড়ালীটিকে পালন করিও। 'জেমি' তোমাকে চিনে।'

কিষন্ কহিল, 'সরলা, আজ আমার বি, এল্, পাশের খবর বাহির হইয়াছে।' কিষন্ সরলার বাল্যসখা।

সেই নিরানন্দের মধ্যেও সরলার কত আনন্দ। চক্ষের জলের মধ্যে স্নেহভরা হাসি। কিষন্‌লাল অনেক কথা বলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। কি ছাই বলিবে? সে ভাবিল, দেবীর নিকটে কি তুচ্ছ মানুষের কোনও কথা সাজে?

কিষন্-লাল কেবলমাত্র বলিল, 'আচ্ছা, তুমি যাও; কিন্তু ইহাই কি— সরলা—আমাদের শেষ দেখা? না—কখনই না।' মুখ ভারি করিয়া, শ্যামবর্ণ সবল বাহু জাহ্নবীর দিকে প্রসারিত করিয়া কিষন্‌লাল কহিল 'কখনই না।'

তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই সকলের নিকট বিদায় লইয়া ভ্রাতা ভগ্নী চলিয়া

গেল। কিন্তু বিহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমীদার কিষন্‌লালের পুত্র কিষন্‌লাল নদীতটে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল।

[২]

চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মিসেস্ বসু এখন প্রফুল্লের সংসারের অধিকারিণী। সরলা তাহাকে গান শিখাইয়া, চিত্র শিখাইয়া মানুষের মধ্যে একটা মানুষ করিয়া তুলিতেছে। বৌ খুব সৌখীন। অতিশয় হাসে, কারণ, দন্তপংক্তি কুন্দনিন্দিত। মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে ছাড়ে না, এবং সেটা প্রফুল্লের দৈনিক পরিশ্রম হইতে বিশ্রাম লইবার পূর্ব্বে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'কারণ নাই বলিয়াই কাঁদি, আমি কোনও কাজের নয়।' মিসেস্ বসু ভয়ানক হাবা মেয়ে বলিয়া বিখ্যাত, এবং যাহা হাতে আসে, হয় বিলাইয়া দেয়, নয় হারাইয়া ফেলে। পাড়াপড়শী সকলেই তাহা চাহে, এবং বলে, 'এমন বৌ আর হবে না।'

উড়িষ্যার কোনও মহকুমায় প্রফুল্ল 'প্রাকটিস্ জমাইতে গিয়াছেন। সেটা পয়সার ক্ষেত্র। কিন্তু খরচ এত যে, ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। সরলা বলিত, "দাদা, অত খরচ করিও না, ভবিষ্যতে হবে কি?" কিন্তু প্রফুল্ল বলিত, "মান সম্ভ্রম প্রথমে, তাহার পর ভবিষ্যৎ।"

প্রফুল্লের মহাজন হাজারী বাবু। হাজারী বাবু উড়িয়া, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানী, তাহা ঠিক কেহ জানিত না। তবে তিনি জাতিতে কায়স্থ, এবং তাঁহার বহু সম্পত্তি। হাজারীর পিতা দুই লক্ষের অধিক টাকা বস্ত্রব্যবসায়ে সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। হাজারী তাহা তিনগুণ করিয়া তুলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় হাজারী বহুবিধ সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া প্রফুল্লের গৃহাভিমুখে গতিশীল হইত, এবং একবার সরলাকে না দেখিয়া সে ফিরিত না।

হাজারীবাবুর খুব বিশ্বাস ছিল যে, তাহার মুখখানি অতি সুন্দর, এবং কথাবার্ত্তা অতি মধুর, এবং অধিক বাক্যব্যয়ের পূর্ব্বেই সরলা তাহার সকল বুঝিতে পারিবে। কারণ তিনি অবিবাহিত। কিন্তু হাজারি বাবু যে অবিবাহিত সে খবর লইবার কোন দরকার কাহারও নাই, সুতরাং বহুদিন যাতায়াত করিয়াও যখন হাজারীবাবু বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার কৌমার অবস্থা এবং দারপরিগ্রহের ঘোরতর ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া না ব্যক্ত করিলে কোন স্ত্রীলোকের বুঝা অসম্ভব তখন একটা শুভদিন দেখিয়া, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই প্রফুল্লের গৃহে উপস্থিত হইলেন। মিসেস্ বসু হাজারী বাবুকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

হাজারী। 'আপনার জন্য একখানা নূতন পার্শী শাড়ী লইয়া আসিয়াছি। মিষ্টার বসু বোধ হয় পছন্দ করিবেন। যদি অনুমতি হয়, তবে তাঁহার ভগ্নীর জন্যও—

মিসেস বসু। হাজারীবাবু! আপনার স্ত্রী পুত্রাদি ভাল ত!'

হাজারী। কি সর্ব্বনাশ! আপনি এতদিন জানেন না যে, আমি অবিবাহিত? আমার বয়স কেবল পঁচিশ। তবে পঁচিশ বৎসর বয়সে অনেকের গোঁপ পাকিয়া যায়, আমার কিন্তু পাকে নাই, ইহা কেবল—কুন্তলীনের গুণে বোধ হয়!'

মিসেস বসু। নিশ্চয়—কিন্তু আপনি বিবাহ করেন না কেন? আপনার ত অনেক টাকা আছে!'

হাজারী। টাকা আছে, কিন্তু ধর্ম্ম নাই; অর্থাৎ, আমার বলিবার মানে ইহাই যে, কায়স্থ হইলেও আমার পিতা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন বলিয়াই মনঃস্থ করিয়াছিলেন। মনঃস্থ করিয়াছিলেন মাত্র। তাহাতেই তিনি সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া এই স্থানে বাস করিতেন। এখন সমস্যা, বিবাহ করি কাহাকে?

মিসেস বসু। কথাটা শোচনীয় বটে। আচ্ছা, আপনী 'চা' ও 'টোষ্ট' খান, আমি চিন্তা করিয়া দেখি।

হাজারী। (চা খাইতে খাইতে) আপনার চিন্তা যাহাতে গভীর না হইয়া পড়ে, অর্থাৎ তাহার লাঘব করিবার জন্ম—(চা শেষ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস-সহকারে)—দুইটি কথা বলিতে চাহি।

মিসেস বসু। বলুন।

হাজারী। আমার দেহ মন, প্রাণ। এবং বোধ হয় আত্মাও, যাহার হাতে সর্ব্বস্ব যাঁহাকে সঁপিতে চাহি, সে, অনিন্দ্য, অতুল্য, স্বর্গের অপ্সরা এই বাটীতেই বাস করেন,তাহা কি এতদিন বুঝিতে পারেন নাই? এখন কি তিনি এখানেই—

মিসেস বসু। (সভয়ে) কোথায়? কোথায়?

হাজারী। কি আশ্চর্য্য! আপনার ননদিনী। আপনি কি জানেন না? সুদ না লইয়া মিষ্টার বসুকে দশহাজার টাকার উপর ধার দিয়া আসিয়াছি, এবং সে ঋণ কখনও শোধ হইবে না—তাহাও জানি। এ সব কাহার জন্ম? কাহার জন্ম দোকান ছাড়িয়া প্রত্যহ এখানে আসিয়া, অতৃপ্তনয়নে বসিয়া থাকি? একবার তাঁহাকে আসিতে বলুন। কি নিষ্ঠুরা তিনি, আমাকে দেখিয়া

পাশ কাটাইয়া যান, আমি চাহিলে একবার হাসেন না, আমি হাসিলে একবার চাহেন না—

মিসেস বসু। (সজলনয়নে) মার্জ্জনা করুন, আমি বুদ্ধিহীনা বলিয়া বিখ্যাত। আপনার হৃদয়ের এই উদ্বেগ, আপনার এই সকল মহান্ উদ্দেশ্য আমি এতদিন বুঝি নাই—আপনি দাঁড়ান।

মিসেস বসু উঠিয়া সরলার ঘরের দিকে গেল। সরলা বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। সরলার মুখ অতিশয় মলিন।

'দিদি, তুমি একদিন বলিয়াছিলে না? না, তোমার দাদা বলিয়াছিলেন যে, যদি কোনও ব্যবসাদার ভদ্রলোক পাটনায় পাটের ব্যবসায় করেন, তবে তুমি তাহাকে বিবাহ করিবে। আজ সেই সুযোগ উপস্থিত, হাজারী বাবু আমাদের মহাজন।

(বাতায়নের অপর পার্শ্ব হইতে হাজারী বাবু।—'আমি জুতার ব্যবসা পর্য্যন্ত করিতে রাজি আছি।)

সরলা। বৌ, উঁহাকে এখনই এ বাটী হইতে বাহির হইয়া যাইতে বল, যদি ভাল কথায় না যান, তবে বোধ হয় আমাকে এবাটী হইতে যাইতে হইবে।

ক্রোধে সরলার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল।

হাজারী বাবু ব্যবসাদার লোক, কথার ভাবেই অবিলম্বে অবস্থাটা বুঝিতে পারিলেন। গম্ভীরভাবে কহিলেন, 'আচ্ছা, ইহার ফলাফল আগামী পূজার মধ্যেই বুঝিতে পারিবেন।'

মিসেস বসু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। সরোষে হাজারী বাবুর গমনের পর প্রফুল্ল বাটী ফিরিয়া আসিল। প্রফুল্ল বলিল, 'সরলা, করিয়াছ কি? হাজারী বাবু রাগিলে যে একবারে সর্ব্বনাশ,—স্থাবর অস্থাবর সকলই বিকাইয়া যাইবে, আমরা দাঁড়াইব কোথায়?'

'এত দূর?'—বলিয়া সরলা গৃহের মধ্যে গেল—অর্গল বন্ধ করিল—লুটাইয়া কাঁদিল। মিসেস বসু ডাকিল, 'দিদি, আয়, আমি গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা শোধ দিব'। কিন্তু সরলা গ্রাহ্য করিল না।

সে চারি বৎসরের মধ্যে কিষনলাল বিলাতে গিয়াছিল। অতি সম্মানের সহিত ব্যারিষ্টারী পাস্ করিয়াছে। কিন্তু সে খবর সরলা পূর্ব্বে জানিত না। মিস্ ভমিজো (জুনিয়র) বিবাহিতা হইয়া এলাহাবাদে। বৃদ্ধা ভমিজো পরলোকে। কেবল বড় মিস্ ভমিজো সরলাকে খবর দিত।

শেষ পত্র।

"ভগ্নী সরলা! আমি একটি স্কুল খুলিয়াছি। আমার প্রধান ছাত্রীর মধ্যে জমীদার বিষণলালের সাত বৎসরের মেয়ে কমলাকুমারী। বিষণলাল স্বর্গলাভ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র কিষনলালকে মনে পড়ে?—সেই যে অতি শান্ত সুশীল শ্যামবর্ণ সুশ্রী যুবা—যে শীঘ্রই বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবে। তোমার কাঠবিড়ালী কমলার নিকট যত্নে ও স্নেহে লালিত হইতেছে। কমলা তাহার দাদার মত কালো নহে, বড় গৌরবর্ণা, আমাদের মত। ভবিষ্যতে সমগ্র বিহারকে দীপ্ত করিয়া তুলিবে।

তোমার বাটীর শোভা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু স্থানটী অতিশয় নির্জ্জন। তোমরা যাইবার পরে কচিৎ চন্দ্রালোকে একটি ছায়াদেহ সেফালিকা বৃক্ষের গোড়া হইতে নদীতট পর্য্যন্ত দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে বিচরণ করিত। আমরা ভূত বলিয়া ভয় পাইতাম, কিন্তু বোধ হয় কিছুই নয়, মনের ভ্রমমাত্র।

তুমি একবার আসিও, একবার দেখিয়া যাইও।

তোমার বাল্যসাথী,

যারা ডমিঙ্গ (সিনিয়র)।

ইতিমধ্যে সুচতুর হাজারীলাল নানা অনুসন্ধানের পর একটা মতলব আঁটিয়াছিল। সে পনের হাজার টাকা ডিক্রীজারী করাইয়া লইল। অচিরাৎ পাটনার সম্পত্তি ক্রোক হইল। শীঘ্রই নিলামের দিনও ধার্য্য হইল।

মিস ডমিঙ্গো প্রফুল্লকে লিখিলেন, 'প্রফুল্লবাবু, শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, আপনাদের পাটনার বাটী নিলাম হইবে। সরলা আমার পত্রের উত্তর দেয় না, আপনিও চুপ করিয়া আছেন, ইহার অর্থ কি?'

প্রফুল্ল জানিয়াও সরলাকে জানিতে দেয় নাই। টাকা শোধ করা অসম্ভব, কিন্তু সরলার হৃদয়ে আঘাত দেওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। যাহা হইবার তাহা হউক, সরলাকে পরে বলিলে চলিবে। ইহা, মনে করিয়া প্রফুল্ল হাল ছাড়িয়া বসিয়া ছিল।

শরৎঋতু উপস্থিত। গঙ্গাতট হইতে জল অপসৃত হইয়া প্রকাণ্ড বালুকা-সৈকত পড়িয়া গিয়াছে। মিস্ ডমিঙ্গো ছাত্রীদিগকে লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। অদূরে একখানি নৌকা পাল তুলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তীরবেগে ঘাটে আসিয়া লাগিল। মিস্ ডমিঙ্গো কহিলেন, 'কি সুন্দর বজরা! বোধ হয়। জমীদারদিগের। কমলা চীৎকার করিয়া কহিল, 'ঐ যে ভইয়া।'

নৌকারোহী আনন্দে তটে লাফাইয়া অবতীর্ণ হইল। কমলাকে কোলে লইল। মিস্ ডমিঙ্গো কিষণলালের সহিত 'শেক্‌হ্যাণ্ড' করিয়া সগর্ব্বে কহিলেন, 'কমলা এখন ইংরাজীর 'প্রাইমার সিরিজ' শেষ করিয়াছে।' 'কমলা তোর কাঠবিড়ালী কই?'

মিস্ ডমিঙ্গো গৃহ হইতে সূক্ষ্মসুবর্ণশৃঙ্খলাবদ্ধ 'জেমি'কে শীঘ্র লইয়া আসিলেন। 'জেমি' কিষন্‌লালের স্কন্ধ বাহিয়া মস্তকে উঠিল, এবং হ্যাটের এক কোণে লুকাইয়া রহিল।

'কমলা চল্, আমর্‌া ঐ বাটী দেখিয়া আসি।'

মিস্ ডমিঙ্গো। উহা তালাবন্ধ, আদালতে ক্রোক হইয়াছে, কল্য নিলাম হইবার কথা।

কিষনলাল গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'ইহার অর্থ কি? প্রফুল্ল বাবু কোথায়? তিনি কি জানেন না?'

মিস্ ডমিঙ্গো। জানেন বৈ কি। তাঁহারা ময়ূরভঞ্জে। মিসেস্ বসুও সেখানে। সরলা আমার পত্রের উত্তর দেয় না।

কিষন জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, 'সরলার বিবাহ হইয়াছে কি?' কিন্তু মিস্ ডমিঙ্গোর সম্মুখে সেটা অসভ্যতা প্রকাশ করা হয় মাত্র, তাই চুপ করিয়া গেলেন।

মিস ডমিঙ্গো কহিলেন, 'সরলার খবর এখানে কেহ জানে না। আপনার ম্যানেজার জহরমল্ মাড়োয়ারী নিলামের কথা জানে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন।'

কমলাকে নৌকায় তুলিয়া কিষন্‌লাল চলিয়া গেল। কমলা বলিল, 'ভাইয়া, ঐ বাগানে আমি রোজ ফুল কুড়াইতাম, চারি দিন হইল, তালা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহারা কি নিষ্ঠুর!'

কমলার মুখ চুম্বন করিয়া কিষণলাল কহিল, 'ঐ বাটী গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়া যায়, সেও কবুল, কিন্তু আমি বাঁচিয়া থাকিতে অন্য কেহ লইতে পারিবে না।'

তাহার পরদিন আদালতে অনেক লোক। 'বসু-কুটীর নিলাম হইতেছে' তিন হাজারের উপর ডাক উঠিল না। ডিক্রীদার হাজারীবাবু কহিলেন, 'আমার ডাক্ সাড়ে তিন হাজার।' এমন সময় এক জন আগন্তুক উপস্থিত।

'জহরমল্ মাড়োয়ারীর ডাক্ পাঁচ হাজার।' ক্রমে দশ হাজার, পনের হাজার। উভয় পক্ষে রোষারেষি হইয়া ডাক বিশ হাজারে উঠিল।

হাজারীলাল। আপনি কে? এ জমী ও বাটীর দাম দুই হাজারও হইবে না, এত ডাক হাঁক কেন? (আদালতের প্রতি) বো'ধ হয় ইঁহার টাকা দাখিল করিবার পারগতা সম্বন্ধে তদন্ত করিলে ভাল হয়।

জহরমল্ দন্তব্যাদানপূর্ব্বক আদালতের দিকে তাকাইলেন।

আদালত। অনাবশ্যক, বিহার প্রদেশে জহরমল্‌কে সকলেই জানে।

ক্রমে পঞ্চাশ হাজারের পর হাজারী বাবু আর ডাকিলেন না। চমৎকৃত ও ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া মনে করিলেন, সম্মুখে স্বয়ং কাল উপস্থিত। হাজারীর উকীল কানে কানে কহিল, 'বৃথা ডাকা, এ জমীদারী সমস্ত রায় কিষন্‌লালের; আপনার প্রজাস্বত্ব হইলেও তাহারা এখানে তিষ্ঠিতে দিবে না। আপনি কুক্ষণে ইহাতে হাত দিয়াছেন।'

ডিক্রীর টাকা লইয়া হাজারী বাবু চম্পট দিলেন। বাকি পঁয়ত্রিশ হাজার প্রতিবাদী প্রফুল্ল বোসের নামে আদালতে জমা রহিল।

৪

বসুকুটীর অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। নদী-উপকণ্ঠে শ্বেত-প্রস্তরের অসংখ্য সোপান, এবং তারই দুই পার্শ্বে দুইটি চূড়া। ডমিঙ্গো বিদ্যালয়ের বালিকাগণের ক্রীড়ার্থ প্রকাণ্ড রেলিংবেষ্টিত বিস্তৃত 'লন'। দেওঘর হইতে আনীত অসংখ্য গোলাপের চারা, এবং কাতারে কাতারে বহুবর্ণের পুষ্পিত লতা।

ফুলের বাগানের সমগ্র ভার মিস্ ডমিঙ্গোর উপর। বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিবার ভার কমলার ও তাহার সখীগণের। বাটীর অভ্যন্তরে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, কেবল শেফালিকা বৃক্ষের নিম্নে একটি বেদী স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে অন্য কাহারও যাইবার হুকুম নাই।

যে ঘরে সরলা থাকিত, সেই ঘরে খানকতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুমূল্য ইতালীয় চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এ দিকে আর বিলম্ব নাই। ছুটীর মধ্যেই প্রফুল্ল কলিকাতায় আসিবে। এমন সময়ে সরলা কহিল 'দাদা, যাহা শুনিলাম, তাহা কি সত্য?'

প্রফুল্লের মুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল। 'সে বাড়ী নিলাম হইয়া গিয়াছে। কোনও মাড়ওয়ারী কিনিয়াছে—কিন্তু—'

সরলা। আমারও বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জগতের সহিত যে মায়া লইয়া সম্বন্ধ ছিল, তাহা চুকিয়া গিয়াছে। দাদা, ঐখানে দাঁড়াইবার স্থান ছিল। ভক্তি স্নেহ, প্রীতি সকলই ঐখানে ছিল। ঐ শিউলী গাছের তলায় বসিলে বাবাকে মনে পড়িত, এবং তিনি যাঁহার চরণপ্রান্তে লীন হইয়াছেন, সেই বিশ্বপিতাকে মনে পড়িত। তুমি তাহার পথ রুদ্ধ করিয়াছ। আর কোথায় তাঁহাকে অন্বেষণ করিব ?—

গভীরশোকবিজড়িতস্বরে সরলা আবার বলিল 'কোথায় ?' সাত বৎসর পূর্ব্বে প্রফুল্ল বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় তাহার জননী পাগলিনীর ন্যায় নদীতটে দৌড়াইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কৈ, প্রফুল্ল কোথায় ?' সেই স্বরের সহিত ইহার কত সাদৃশ্য ! কঠোর সংসারাবরণ ভেদ করিয়া সরলার স্বর প্রফুল্লের হৃদয়ের নিভৃত স্থানে আঘাত করিল।

'সরলা, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।'

সরলা। দাদা, পাপ নাই, এ সব মায়ার খেলা। ইহারা পথ দেখাইতেছে। সেই পথ, যাহা আমরা এখনও দেখিতে পাই না। অন্ধ, চিরান্ধ আমরা।

প্রফুল্ল সরলার মুখ দেখিয়া ভয় পাইল। প্রায় মাসাবধি সরলার জ্বর হইতেছিল, তাহার সহিত কাশী। ডাক্তারের মতে 'কাশীটা ভাল নয়।'

প্রফুল্ল। সরলা, এখনও নিরাশ হই নাই। তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলি। ঋণ শোধ হইয়াও আমাদের পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আদালতে জমা আছে; অদ্য নোটীশ পাইয়াছি। কথাটি কিন্তু বড় রহস্যময়। ঐ পড়তি জমী ও বাড়ীর দাম নিলামে পঞ্চাশ হাজার টাকা কি করিয়া উঠিল, তাহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আসিতেছে না।

সরলা। দাদা, ঐ টাকা দিয়া বাড়ী ফিরাইয়া লওয়া যায় না।

প্রফুল্ল। চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু পাগলী ! যে অত টাকা দিয়া বাড়ী খরিদ করিয়াছে, সে কম দামে ছাড়িয়া দিবে কেন ?

সরলা। আমরা দশ বৎসরে শোধ করিয়া দিব।

প্রফুল্ল। দেখা যাউক, সুদের লোভে মাড়ওয়ারী তাহা দেয় কি না।

সরলা। কোন্ মাড়ওয়ারী ? বাবার সহিত কি আলাপ ছিল না ? আমি অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র লিখিলে শুনিবে না ?

প্রফুল্ল। না। আমরা পাটনায় যাইব।

সরলা সাদরে প্রফুল্লের হাত ধরিয়া কহিল, 'দাদা, ষ্টীমার করিয়া চল। রাজমহল হইতে ষ্টীমার পাওয়া যায়। এখান হইতে আমরা রেলে যাইব।

চারি বৎসর পূর্ব্বে জিনিসপত্র গুছাইতে যে সময় লাগিয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেক সময়ের মধ্যে সরলা সব গুছাইয়া লইল। সরলা মিসেস্ বসুর হাত ধরিয়া কহিল, 'বৌ, এই আমার শেষ ভ্রমণ।' আমার জীবন রাখিবার সেই স্থান ছাড়া আর অন্য কোথায়ও নাই।

মিসেস্ বসু। দিদি, গঙ্গার হাওয়া লাগিলে তোর কাশী সারিয়া যাইবে।'

প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে।

শারদীয়া নবমী নিশি। অসংখ্য আলোকমালায় শোভিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরী গঙ্গাবক্ষে। অদূরে বসু-কুটীরের মর্ম্মরসোপানাবলীর উপর বসিয়া কতিপয় বন্ধু পিয়োনো লইয়া গান করিতেছিল। মিস্ ডমিঙ্গোর করুণ স্বর গঙ্গাবক্ষ ছাইয়া বহুদূরে প্রতিধ্বনিত, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, ক্রমে মধুর হইতে মধুরতর হইল। কিষণলাল রুমাল লইয়া একবার নয়ন আবৃত করিল।

'জহরমল্, আজ কোনও নূতন ঘটনা ঘটিবে।'

জহরমল নস্য লইয়া কহিল, 'খুব সম্ভব। সংসারই ঘটনাময়, এবং প্রত্যেক ঘটনা নূতন।'

অনতিবিলম্বে একখানি ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

(৫)

আদালত হইতে টাকা লইয়া প্রফুল্ল জহরমল্ মাড়ওয়ারীকে একখানি পত্র লিখিলেন।

'মান্যবরেষু—অতি কষ্টে পড়িয়া এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম, পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এখন দিতে পারি, যদি অবশিষ্ট পনের হাজার টাকা দশ বৎসরের দলীল লইয়া বাকী রাখিতে স্বীকৃত হন, তবে আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব। আমার ভগ্নীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।'

জহরমলের উত্তর।—মান্যবরেষু। আমি যাঁহার জন্য ও যাঁহার টাকা লইয়া এই বাটী খরিদ করিয়াছি, তিনি স্বয়ং টাকা লইতে আজি সন্ধ্যাকালে আপনাদের ষ্টীমারে যাইবেন ও দলিলপত্রাদি যাহা রেজিষ্টারী করিতে হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া আসিবেন। তিনি বিহার প্রদেশের এক জন শ্রেষ্ঠ জমীদার, অতিশয় গণ্য মান্য, এবং কৌন্সিলের মেম্বর।'

বহু চেষ্টার পর প্রফুল্লের নয়নাবরণ উন্মুক্ত হইল। 'তাই ত, কিষণলালই ত

এ সম্পত্তির খরিদ্দার! কিন্তু মিষ্টার লাল ত এখন আর কিষণলাল নহে, আমাদের অনুরোধ রাখিবে কি? কি বল বিনোদ?

মিসেস বসু। আমি তাঁহার মতলব চট্ করিয়া বুঝিয়া লইব। তুমি কোনও কথা কহিও না। আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক চালাকচতুর হইয়াছি।

বাস্তবিক মিসেস বসুর বুদ্ধি অনেক খুলিয়াছিল্, কারণ, মিষ্টার লাল আসিবামাত্র তাঁহার যত্নে ও অভ্যর্থনায় মোহিত হইয়া পড়িলেন।

মিসেস বসু। আমি শুনিয়াছি, আপনি সরলার বাল্যবন্ধু, সুতরাং আমারও বন্ধু। (প্রফুল্লের প্রতি) দিদি কোথায়?

প্রফুল্ল। ঘুমাইয়া। আমি চা আনি।

কিষণলাল। বড় দুঃখ, আপনার বিবাহের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না, আমি তখন বিলাতে!

মিসেস বসু। যদি আপনার বিবাহের সময় আমরা থাকিতে পারি, তবে সে দুঃখ মিটিয়া যাইবে। সে সৌভাগ্যবতী হয় ত মেম, কিংবা হিন্দুস্থানী নিশ্চয়—অর্থাৎ, আমি এখনও ঠিক বলিতে পারি না।

কিষণলাল। এইবার আপনি ঠকিয়াছেন! কারণ, সে স্বপ্ন আমার হৃদয়ে এখনও উদিত হয় নাই।

মিসেস বসু। আমি সংসারের কতকগুলি লোককে দেখিয়া আশ্চর্য্য হই,—যেমন সরলা দিদি। তাহারা বিবাহের নামে চটিয়া যায়। অথচ ঘরসংসার না পাতিয়া মানুষ কি করিয়া থাকিতে পারে?

কিষণলাল। ইহাতে বিলক্ষণ বখেড়া ও যন্ত্রণাও আছে, বোধ হয়, আপনি তাহা ভোগ করেন নাই। প্রফুল্ল চা তৈয়ারি করিয়া আনিল। চা শেষ হইয়া গেলে প্রফুল্ল কহিল 'এবাসিরপুনর্বিক্রয় সম্বন্ধে বোধ হয় আমার ভগ্নী সরলা কিছু কহিতে চাহে, আপনি একবার ঐ ঘরে চলুন।'

কেবিনের একপার্শ্বে কোচের উপর সরলা উপবিষ্টা। সম্মুখে বহুদূর বিস্তৃত জলরাশি সান্ধ্যবায়ু সহিত মিশিয়া কলস্রোতে বহিতেছিল। অসংখ্য তারকা আকাশে। দূরে ঘনীভূত দশমীর বিসর্জ্জন কোলাহল মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনতা ভেদ করিয়া হৃদয়ে পুরাতন স্মৃতি এবং নূতন আশা সঞ্চারিত করিতেছিল। কিষণলাল ধীর পদবিক্ষেপে কম্পিত হৃদয়ে কেবিনের নিকট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"সরলা! তোমার কি রকম কাশী?" সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর! সরলার

মুখ তুলিবার সাহস হইল না। কিষন্‌লাল দেখিল সে আর বালিকা সরলা নহে। সপ্তদশবর্ষীয়া সরলা। দেবমূর্ত্তি। আলুলায়িত কৃষ্ণকেশ গুচ্ছে গুচ্ছে হেলিয়া কোচখানির অর্দ্ধেক আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কি ধীর, কি মধুর, কি শান্তি-মাখা বিষাদময় চক্ষু দুটী!

অনেকক্ষণ পরে সরলা কি ভাবিয়া কম্পিত হস্তে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার নোট কখানি কিষনলালকে দিয়া কহিল 'আপনি কিছু মনে করিবেন না, বাকি টাকার সম্বন্ধে—'

কিষনলাল। সরলা! তুমি বোধ হয় আমাকে চিনিতে পার নাই। তাহার পর কিষনলাল ঈষৎ হাসিয়া, নোট কখানি লইয়া, এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া, জাহ্নবীর জলে নিক্ষেপ করিল।

অবাক হইয়া সরলা কিষনলালের মুখের দিকে চাহিল। কিষনলালের মুখ কোন অভিনব জ্যোতির্দ্দীপ্ত। চারি বৎসরের পূর্ব্বেকার মুখ হইতে এ মুখ সুন্দরতর। বড়ই সুন্দর!

সরলা। কিষন লাল! করিলে কি?

কিষন্। সরলা! তোমার কাশী কি রকম?

সরলা। যেরকম হইলে, পরলোকের পথ উন্মুক্ত হয়। কিন্তু তুমি করিলে কি?

কিষন্। যাহাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার তাহাই করিয়াছি। সরলা, তোমার বাল্যসখাকে ভুলিয়া গিয়াছ।

সরলা। অতি কম্পিত স্বরে কহিল 'না'। সেই 'না'টির মধ্যে কত বেদনা, কত দুঃখ-স্মৃতি, এবং কত স্নেহ!

কিষণলাল নিকটে আসিয়া কহিল, তবে ছার ঐশ্বর্য্যের কথা তোল কেন সরলা?

সরলা অধীর হইয়া বলিল, তুমি কোন্ দেশের দেবতা কিষণ্!

কিষণ। আমি দেবতা নহি ভিখারী, তবে যে দেশের ভিখারী, সেখানে এখনও যাইতে পারি নাই। আমার বলিতে সাহস হয় না।

'সাহস হয় না?'

সরলা সব ভুলিয়া গিয়া কিষণলালের হাত ধরিল 'কিষণ্—তোমার কথা কেমন নূতন বোধ হইতেছে। তুমি—তুমি—কোন কথা কহিতেছ?

কিষণ সরলাকে নিকটে টানিয়া লইয়া কহিল—'হৃদয়ের কথা—আজীবন প্রত্যেকশোণিত-সঞ্চিত, প্রত্যেকস্বপ্নজড়িত, প্রত্যেক দীর্ঘনিশ্বাস-প্রবাহিত, প্রেমের কথা।'

সরলা কাঁদিল। কিষনলালের বক্ষে মুখ লুকাইল। 'কিষন্! আমার জগতে কেহ ছিলনা বলিয়াই জানিতাম।

অনেকক্ষণ পরে কিষণ কহিল—

সরলা তোমার বাটীতে তুমি সকলকে লইয়া যাও, দশমীর নিশি যেন পোহাইয়া না যায়।

সরলা কিষন লালের হস্তযুগল স্বীয় করবদ্ধ করিয়া কি করিবে তাহা বুঝিতে পারিল না। 'কিষন—বোধ হয় আমি বাঁচিব'।—কিষনলাল সাদরে সরলার কেশে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া কহিল 'সে ভার আমার'।

এমত সময় মিসেস বসু—সাড়া দিয়া 'ডেকে' আসিলেন—'দলীল দস্তাবেজ সম্বন্ধে যাহা ওজর আপত্তি থাকে তাহা মিষ্টার বসুর সহিত এই বেলা ঠিক করিয়া লউন। খাবার তৈয়ারী। অবশেষে বোধ হয়--

কিষণলাল। কি অবশেষে?

মিসেস বসু কুন্দনিন্দিত দন্তশোভা চন্দ্রালোকে বিকীর্ণ করিয়া কহিলেন সেই পুরানো গল্প।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মজুমদার।

নোবেল-পুরস্কার।

'পদং হি সর্ব্বত্র গুণৈর্নিধীয়তে।'

গুণ ভক্তির উদ্রেক করে। শত্রু মিত্র উদাসীন, সকলের উপরই গুণ আত্মপ্রাধান্য স্থাপন করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই গুণের পূজা করিয়া থাকেন। আধুনিক জগতে ভাবময় সাহিত্যে কোন কবির স্থান সর্ব্বোচ্চ, বিচারনিপুণ গুণিগণ তাহা বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথের রচিত কাব্যে ভাবাঢ্যতা দেখিয়া এই বৎসর তাঁহাকে জগদ্বিখ্যাত নোবেল-পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। গুণী ব্যক্তির প্রতি এতাদৃশ সমাদার প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা গুণগ্রাহিতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু যে চিরস্মরণীয় দানবীর মহাপুরুষ এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া সমগ্র বিশ্বে অতুলকীর্ত্তি লাভ করিয়া মরিয়াও অমর হইয়া রহিয়াছেন, সেই গুণী পুরুষের জীবন-কাহিনীর কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। তাঁহার গুণকীর্ত্তনই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই অমর-কীর্ত্তি মহাপুরুষের নাম অ্যালফ্রেড্ নোবেল। যুরোপ খণ্ডের সুইডেন প্রদেশে ষ্টক্ হলম্ নগরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা নোবেল জন্ম-গ্রহণ করেন। রুষিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটারস্‌বার্গে তিনি প্রথমতঃ বিদ্যা-শিক্ষা করেন। তাঁহার পিতা যন্ত্রকলাভিজ্ঞ Engineer ছিলেন। কিছুকাল বিদেশে বিদ্যা-উপার্জ্জনের পর, নোবেল যন্ত্রকলা-চর্চ্চায় পিতাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি স্ফোটনদ্রব্যের নির্ম্মাণ-বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অচিরেই রসায়ন শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া নোবেল শীঘ্র-দাহ্য ডাইনা-মাইট দ্রব্যের আবিষ্কার করিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। এই দাহ্য দ্রব্যের আবিষ্কারই তাঁহার বিপুল ধনাগমের মূল কারণ। আর্ডিয়ার, আয়ারসায়ার প্রভৃতি স্থানে স্ফোটন দ্রব্যের বৃহৎ কারখানা খুলিয়া, তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করি-লেন। এই ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায়, তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে, স্যান রেমো নামক স্থানে নোবেল পরলোকে গমন করেন।

নিজের বিদ্যাবুদ্ধিবলে উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ ভাগ মানবসমাজের কল্যাণের জন্য কিরূপে ন্যস্ত হইবে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সার্দ্ধ দুইকোটির কিঞ্চিৎ অধিক টাকা, নোবেল কয়েকজন কৃতবিদ্য "ট্রষ্টী"র হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। এই বিপুল অর্থের সুদ প্রতি বৎসর প্রায় ছয় লক্ষ টাকা। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ব্যবস্থা করিয়া যান যে, ইহা দ্বারা সমভাবে বিভক্ত পাঁচটি পুরস্কারের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সমগ্র জগতে বিজ্ঞান ও সাহিত্যে নিম্নলিখিত ভাবে পাঁচজন কর্ম্মবীর নির্ব্বাচিত করিয়া প্রত্যেককে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হইবে। (১) পদার্থ বিজ্ঞানে, (২) রসায়ন বিজ্ঞানে, (৩) চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, অথবা দেহতত্ত্ব বিজ্ঞানে যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহারাই প্রথম তিনটি পুরস্কারে অধিকারী হইবেন। (৪) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব ময় সাহিত্য গ্রন্থের প্রণেতাই চতুর্থ পুরস্কারের অধিকারী হইবেন। (৫) জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ-স্থাপনকল্পে, রাজ্যের স্থায়ী সৈন্যবিভাগের সম্যক্-নিয়মন বা হ্রাস-বিধান ও তদ্দ্বারা জগতে শান্তিসংস্থাপন কার্য্যে যে ব্যক্তি অত্যধিক আত্ম-নিয়োগ করিবেন, তিনিই পঞ্চম পুরস্কারের অধিকারী হইবেন। এই পঞ্চ কর্ম্মবীরের নির্ব্বাচন-ভারও উপযুক্ত হস্তেই ন্যস্ত আছে। সুইডেনের "বিজ্ঞান-সমিতি"র নির্ব্বাচনে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার প্রদত্ত হয়; সেই

দেশেরই "চিকিৎসা-সমিতি" তৃতীয় পুরস্কারের পাত্র নির্ব্বাচিত করেন; চতুর্থ পুরস্কারের পাত্র-নির্দ্ধারণ সুইডেনের "সাহিত্য-সমিতি"র হস্তে অর্পিত আছে; এবং সুইডেনের প্রতিনিধি-সভা-নির্ব্বাচিত পাঁচ জন যোগ্য ব্যক্তিই পঞ্চম পুরস্কারের পাত্র নির্ব্বাচিত করেন।

পুরস্কারের পাত্র-নির্ব্বাচন ব্যাপারে এই "সমিতি"গুলির কাহারও উপর কোনও পক্ষপাত দেখাইবার কারণ নাই। তাঁহারা বিগত ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে নিরপেক্ষভাবে নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। কেবল যে সুইডেনের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিই এই সমস্ত বিষয়ে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা নহে; করাসী, জার্ম্মাণ, পোল, বেলজিয়ান্ প্রভৃতি য়ুরোপের নানাজাতির ও মার্কিণের গুণীরাও পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। জ্ঞানের সমাদর করিতে গিয়া, এইসকল সমিতি অবিচারের আশ্রয় লইবেন, এরূপ সন্দেহের কোনও কারণই থাকিতে পারে না। পুরস্কার-প্রতিষ্ঠাতা নোবেল-পুরস্কার প্রদান বিষয়ে বর্ণভেদ, জাতিভেদ, কিংবা দেশভেদের বিচার না করিয়া নির্ব্বাচিত উপযুক্ত পাত্রেই পুরস্কার বিতরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পুরস্কার-বিতরণ-সমিতিগুলিও সকল সময়েই নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে সাহিত্যক্ষেত্র কিছু অনুর্ব্বর, এই নিমিত্ত বিচারকগণ সময়ে সময়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়া নাট্যকার ঔপন্যাসিক ও ঐতিহাসিককেও এই চতুর্থ পুরস্কারটি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তবে সাহিত্যজগতে তাঁহারাও যে সর্ব্বজনসম্মত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

কি মহৎ উদ্দেশ্যে দানবীর নোবেল জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে এই পাঁচটি পুরস্কার-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা কর্ত্তব্য। যে কর্ম্মবীর ক্ষোটন দ্রব্য প্রভৃতি নরঘাতী বস্ত্র-জাতের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি কেন বিগ্রহ-নিগ্রহের ও সমগ্র জগতে শান্তি সংস্থাপনের সহায়তাকারী বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য তাঁহার পঞ্চম পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন? বুঝি বা মহাপুরুষের মনে দাহ্য দ্রব্যের আবিষ্কারের জন্য পশ্চাত্তাপ হইয়াছিল। তাহাই বা কেন, যুদ্ধক্ষেত্রে ও পরাজিত শত্রুর রাজ্যে ক্ষোটন দ্রব্য ব্যবহৃত হইলে জগতের প্রভূত অকল্যাণ সাধিত হইতে পারে যুদ্ধলোলুপ জাতির হৃদয়ে এইরূপ ভীতিসঞ্চার করিতে পারে বলিয়া, এই নূতন আবিষ্কার জগতে শান্তি সংস্থাপনের সহায়তাই করিয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, সৎ পাত্রে এই বিপুল

অর্থের বিনিয়োগ-ব্যবস্থার অপর একটি মহৎ উদ্দেশ্য এই হয় যে, সমগ্র জগতের বিশেষজ্ঞগণ যদি এই পুরস্কারের প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে, বিশ্ব-মানবের মধ্যে একতা-সংস্থাপনের সম্ভাবনা অধিক হইতে পারিবে। আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলিকে জগজ্জন-হৃদয়গ্রাহী করিয়া যিনি ভাবময় গ্রন্থের রচনা করিতে পারিবেন; তিনিই চতুর্থ পুরস্কারের অধিকারী হইতে পারিবেন—ইহাই ত নোবেলের উদ্দেশ্য? সমস্ত জগদ্বাসী যদি একই ধর্ম্ম-তত্ত্ব একভাবেই বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ভাবের একতা-নিবন্ধন জগতে শান্তি সংস্থাপনের সম্ভাবনা আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাঁহারা বলিয়া থাকেন, যে, প্রাচ্য প্রতীচ্যে সম্মিলন অসম্ভব, তাঁহাদের সে মত ভ্রান্ত। প্রাচ্য প্রতীচ্যের এক-তানতা সম্ভাবিত মনে করিয়াই বোধ হয়, নোবেল এই পুরস্কারগুলির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়া থাকিবেন। এই একটি সদনুষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য করিয়াই জগতে ভাবের আদান-প্রদান বিশেষ ভাবে সাধিত হইতে পারিবে; প্রাচ্য প্রতীচ্যের শিক্ষা ও সভ্যতার বিনিময় চলিতে পারিবে। মনে হয়, নোবলের এই দান প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সখ্যতা-বন্ধনের সুদৃঢ় গ্রন্থি। তিনি এত অর্থ উদারভাবে পুরস্কারে দান করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, এই পুরস্কার-বিতরণ কার্য্য অবসান প্রাপ্ত হইবে, তাহার আশঙ্কা নাই। কাজেই সমগ্র জগতের এই বন্ধন-গ্রন্থি ছিন্ন হইবারও কোনও সম্ভাবনা নাই।

বহু-গ্রন্থ রচনা করিয়া, বহু বক্তৃতা করিয়া, বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব-সংস্থাপনের চেষ্টা করা অপেক্ষা, এই প্রকার দানক্রিয়া দ্বারা জগতের অধিক উপকার সাধিত হইতে পারে! যে দানে স্বজাতি বিচার নাই, যে দানে পাশ্চত্য জগৎ-প্রিয়তা নাই, যে দানে জাতি বর্ণ বিদ্বেষ নাই, সে দানই মহদ্দান। নোবেল যথার্থই বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্যাতেই মানবের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়; অভিমান সমূলে বিনষ্ট হয়, অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হয়; এবং পরার্থতত্ত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই মহাপ্রাণ দাতার প্রাণে বুঝি উল্লিখিত ভারতীয় শাস্ত্রে নিম্নলিখিত প্রতিগ্রহ-পাত্রের কথা উদিত হইয়াছিল,—

"প্রজ্ঞা-শ্রুতাভ্যাং বৃত্তেন শীলেন চ সমন্বিতঃ।
গামশ্বং বিত্তমন্নং বা তাদৃশে প্রতিপাদয়েৎ॥"

বুদ্ধিবিদ্যাবিশারদগণের জন্যই অর্থ-প্রতিপাদন করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতেও বিদ্বান ব্রাহ্মণগণের বৃত্তিবিধানের জন্য ধন-কুবের বৈশ্যগণ অম্লান-বদনে অর্থব্যয় করিতেন। ক্ষত্রিয় নৃপতিগণও সর্ব্বদা জ্ঞানের সমাদর করি-

তেন। তাই মহাপুরুষগণ মানব-হিতব্রতপর হইয়া, নিশ্চিন্তমনে অলৌকিক কার্য্যসাধনে সমর্থ হইতেন।

দেশে বিদেশে কোটীশ্বর ত কতই আছেন। মহামনা নোবেলের মত সদনুষ্ঠান করিয়া জগতে "শান্তি ও সখ্যতার" স্থাপনের জন্য কয়জন ধনাঢ্য ব্যক্তি অগ্রসর হয়েন? তাঁহারা যদি ক্ষুদ্রচিত্ততা, স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষ প্রভৃতি হীনতা পরিত্যাগ করিয়া মহানুভব উদার-হৃদয় নোবেলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, বিদ্যার গৌরবের জন্য, এইপ্রকার পুরস্কারাদির ব্যবস্থা করিতে থাকেন, তাহা হইলে, বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদগণের বিদ্যা-প্রভায় জগৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তাঁহারা যদি "ত্যাগায় সম্ভৃতার্থ" হয়েন, তাহা হইলে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

জ্ঞান-ক্ষেত্র জগদ্ব্যাপী থাকাই বাঞ্ছনীয়। প্রাচ্য জগৎও যে এক সময়ে জাতিনির্ব্বিশেষে জ্ঞানের সমাদর করিতে জানিত, তাহার প্রমাণের অভাব নাই বরাহমিহিরের বিখ্যাত শ্লোকটিই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ,—

"ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্দ্দৈববিদ্ দ্বিজঃ।

যাহাদিগকে অনেকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহারাও বিদ্যার গৌরবে এক সময় আর্য্য জাতির নিকট ঋষিবৎ পূজ্য ছিলেন। "নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা" প্রভৃতি সুভাষিত সকল এই উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল।

বঙ্গের কৃতীসন্তান রবীন্দ্রনাথকে এই বৎসর পাশ্চাত্য-সাহিত্য-সমাজ এই পুরস্কার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিশেষভাবে উৎফুল্ল হইবার কারণ এই যে, প্রাচ্যজগতে রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম "নোবেল"-পুরস্কার লাভ করিলেন। ইহাতে আমাদের বঙ্গসাহিত্য জগৎ-সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করিল বলিয়া, বঙ্গ-বাসীর জাতীয় গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

হৃদি আকাশে।

প্রাচীন স্মৃতিগুলি মেঘের শুরু ডাকে,
বেদনা-বায়ু-ভরে ঘূপিছে চারি দিকে।

হৃদি-প্রান্তরে।

কোথাও নাহি আলো, কোথাও নাহি তারা,
হৃদি-প্রান্তরে আমি একাকী পথহারা
বায়ু সে শব্দহীন, অন্ধের আঁখিবৎ,
নিঃস্পন্দ অন্ধকার, কোথাও নাহি পথ!

কেবলই মনে হয়, কোথায় আছে যেন,
ঝটিকা ঘুমাইয়া—নিদ্রিত শূর সম।
নিঃশ্বাসে উঠি বায়ু বুঝি বা ঝড় হয়ে'
চেতনা যাবে মোর মেঘ-বজ্রে ভাঙ্গিয়ে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়।

প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণম্।*

"কাব্যং কল্পান্তর-স্থায়ি জায়েত সদলঙ্কৃতি"।

—:•:—

অভিনবগুপ্ত [ধ্বন্যালোকলোচনে] ভট্টনায়কের একটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"শব্দ-প্রাধান্যমাশ্রিত্য তত্র শাস্ত্রং পৃথক্ বিদুঃ।
অর্থ-প্রাধান্যমাশ্রিত্য বদন্ত্যাখ্যান মেতয়ো-
র্দ্বয়োর্গুণত্বে ব্যাপার-প্রাধান্যে কাব্যধীর্ভবেৎ।"

এতদ্দ্বারা শাস্ত্রের এবং আখ্যানের এবং কাব্যের লক্ষণা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রে "শব্দে"র প্রাধান্য,—যে শব্দের যেটি মুখ্যার্থ, তাহাই গ্রহণ করিতে হয়। আখ্যানে "অর্থে"র প্রাধান্য,—শব্দের দ্বারা যাহা গৌণভাবেও সূচিত হইতে পারে, তাহাও গ্রহণীয়। কাব্যে এই দুইটি গৌণ বিষয়;—মুখ্য বিষয় "ব্যাপার"।

ভট্টনায়ক বলেন,—অভিধা, ভাবনা, চর্ব্বণ,—এই তিনটিতে 'কাব্য' হয়। চর্ব্বণের অর্থ 'রসোৎপত্তি'। উদাহরণ,—

"ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ।"

এখানে শোকই [শ্লোক] কাব্য। তাহাতেই "রসোৎপত্তি"। তাহারই নাম "ব্যাপার,"—কাব্যে তাহাই প্রধান স্থান অধিকার করে। অনেক কথা একত্র গাঁথিলে "কাব্য" হয় না; আবার গাঁথিতে জানিলে, অতি অল্প কথাতেও "কাব্য" হইতে পারে। আসল কথা—"ব্যাপার"—"রসোৎপত্তি"।

মহাকবি ভাসের যে কয়খানি দৃশ্যকাব্য পাঠ করিয়াছি;—সমস্তগুলি পাঠ করিবার সুযোগ এখনও হয় নাই। তাহাতে দেখিয়াছি, তাঁহার রচনায় শব্দ বা অর্থ প্রাধান্য লাভ করে নাই,—প্রাধান্য লাভ করিয়াছে "ব্যাপার"। আমাদের আধুনিক কাব্যে ইহার স্থান বড় নীচে নামিয়া পড়িতেছে। সুতরাং মহাকবি ভাসের কাব্যালোচনায় আমরা আবার কাব্যের প্রকৃত

* রাজশাহী—শাখা সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

লক্ষণ ধরিতে পারিলে, আমাদের সাহিত্য লাভবান হইতে পারিবে। "রাজসাহী শাখা সাহিত্য-পরিষৎ" এই আলোচনার সূত্রপাত করিয়া, ধন্যবাদভাজন হইলেন।

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য-শিল্পাদি ললিত-কলার উদ্ধারের জন্য জিজ্ঞাসুর ও অনুসন্ধিৎসুর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে,—তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রযত্নে লুপ্তরত্নের অধিগম-ব্যবস্থা যতই অধিক হইতে থাকিবে,—এবং তাঁহারাও সে বিষয়ে যতই অধিক কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন,—ভারতের পূর্ব্ব-গৌরব-প্রভা ততই আধুনিক লোক-হৃদয়ের পুঞ্জীভূত অজ্ঞান-তিমির-ভেদে সমর্থ হইয়া, অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া, সমস্ত ভূমণ্ডল আলোকিত করিয়া ফেলিবে। ভারত এখনও মৃত হয় নাই, পূর্ব্বাচার্য্য-গণের কাব্যামৃত ও কমনীয়-কলা-কলাপ-সুধা পান করিয়া অমৃত ভারত কখনই মৃত হইতে পারে না,—বহু কারণে কেবল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে—উপযুক্ত শুশ্রূষায় পুনর্ব্বার সংজ্ঞালাভ করিয়া স্বস্থ হইতে পারিবে।

সম্প্রতি সংস্কৃত রূপক-সাহিত্যের প্রাচীন পারদর্শিতার এক অচিন্তিতপূর্ব্ব নিদর্শন সভ্য জগতের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। নিমজ্জন-কুশল ব্যক্তি যেমন গভীর অতলস্পর্শ রত্নাকরের অভ্যন্তর হইতে আভা-সমন্বিত মহামূল্য মুক্তাবলী লইয়া সাগর-বক্ষে ভাসিয়া উঠে,—মহারাজ ত্রিবাঙ্কুরাধিপতির পুস্তকাগারের প্রাচীন গ্রন্থ-রক্ষক পণ্ডিতবর গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ও সেইরূপ প্রাচীন-গ্রন্থ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া এক পুরাতন মহাকবির নাটকাবলী লইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছেন। এই নাটকাবলীর অভিনব আবিষ্কার ভারতবাসিগণের পক্ষে মহাগৌরবের সমাচার। সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায়, বিশেষতঃ সংস্কৃত রূপক-সাহিত্যের প্রাচীনত্ব-পর্য্যালোচনায় এই নবাবিষ্কৃত নাটক-চক্র এখন প্রথম ও প্রধান অবলম্বন হইতে পারিবে। ইহাতে ভারতীয় দৃশ্য কাব্যের চিরবিলুপ্ত প্রথম পরিচ্ছেদটি বহু শতাব্দীর পর আবার আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। এই আবিষ্কারের জন্য শাস্ত্রী মহাশয়, সমগ্র ভারতের কেন, সমগ্র পৃথিবীর, ধন্যবাদভাজন হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন; কাব্যামৃত-রসাস্বাদ-লোলুপ সুধীগণের পক্ষে এই নাটক-চক্র চিত্ত-বিনোদনের উপায় হইবে।

প্রাচীন গ্রন্থ-সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরের নানা স্থান পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়া, গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় পদ্মনাভপুরের উপকণ্ঠে, মণ-লিক্কর

মঠে, প্রাচীন কৈরলী-লিপি-নিবদ্ধ তাল-পত্রাত্মক এক গ্রন্থ-সম্পুটক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই গ্রন্থ-সম্পুটকে নিম্নোল্লিখিত একাদশখানি রূপক ছিল, যথা,—স্বপ্ননাটকম্, প্রতিজ্ঞা-নাটিকা, পঞ্চরাত্রম্, অবিমারকম্, বালচরিতম্, চারুদত্তম্, মধ্যম-ব্যায়োগঃ, দূতকাব্যম্, দূত-ঘটোৎকচম্, কর্ণভারম্ ও ঊরুভঙ্গম্। কিছুদিন পরে, অন্য আর এক যাত্রায়, শাস্ত্রী মহাশয় এই নাটক-গুলির সমানজাতীয় "অভিষেকনাটকম্" ও "প্রতিমা" নামক আরও দুইখানি রূপকগ্রন্থ গোবিন্দ পিষারোটী নামক কোনও এক জ্যোতির্বিদের গৃহে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার প্রশংসনীয় অনুসন্ধান-কৌশলে অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টচর ত্রয়োদশখানি নাটক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে "চারুদত্তম্" ও "প্রতিমা" নাটকদ্বয় ব্যতীত, অবশিষ্ট একাদশখানি নাটক সুচিন্তিত উপোদ্-ঘাত ও লঘুটিপ্পনী সহ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং অনন্ত-শয়ন [ত্রিভান্দ্রাম্]-নগর হইতে রাজকীয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া বিগত বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে।

এই নাটক-চক্রের পরস্পরের আকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য আছে। আকৃতি-গত সাদৃশ্য ব্যতীত বাক্যগত, বাক্যাংশগত ও শব্দগত সাদৃশ্যেরও অভাব নাই। আকৃতিগত সাদৃশ্যের মধ্যে যাহা সর্ব্বপ্রথমে পরিলক্ষিত হয়, তাহা এই যে,—নাটকচক্রের কোনটিরই আদিতে নান্দী-শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। শূদ্রক-কালিদাস-শ্রীহর্ষ-ভবভূতি-বিশাখদত্ত-প্রমুখ মহাকবিগণের রচিত নাটকসমূহে প্রথমতঃ নান্দীশ্লোক, তৎপরে "নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ" এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নবাবিষ্কৃত নাটকসমূহে এই বিষয়ে কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। তাহাতে "নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ" এই প্রকার নির্দ্দেশের পর মঙ্গল-শ্লোক লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বৈলক্ষণ্য এই যে,—অন্যান্য মহাকবিগণ যাহা 'প্রস্তাবনা' নামেই অভিহিত করিয়াছেন, তাহা 'স্থাপনা' নামে কথিত হইয়াছে। উত্তর কালের কবিগণ প্রস্তাবনাতে আত্মনামের ও স্বপ্রণীত নাটক-নামের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আলোচ্য নাটকসমূহের স্থাপনায় কবির বা কাব্যের নাম কীর্ত্তিত হয় নাই। নাটক-গুলির ভরত-বাক্যেও একটি স্বতন্ত্র নিয়ম লক্ষিত হয়; সর্ব্বত্রই "[ম]হীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ" এইরূপ, অথবা ইহার [সমা]নার্থক একটি প্রার্থনা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সর্ব্বশেষে অমুকনামা [নাট]ক "অবসিত" হইল বলিয়া, নাটকের নামনির্দ্দেশপূর্ব্বক • প্রথমনাটি

বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। পরস্পরের এইরূপ রূপসাদৃশ্য দেখিয়া, এই নাটক-চক্র একই কবির কৃতি বলিয়া, সহজেই অনুমিত হইতে পারে। স্থাপনাতে কবি নিজনাম ও কাব্যনাম লিপিবদ্ধ করেন নাই;—কেবল ইহা দেখিয়াই গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় উপোদ্ঘাতে লিখিয়াছেন যে,—প্রস্তাবনায় বা স্থাপনাতে কবির ও কাব্যের নাম-সন্নিবেশের নিয়ম প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেই, এই নাটক-চক্রের উদ্ভবকাল নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। উত্তরকালীন নাটকের সহিত এই নাটক-চক্রের আরও অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তি-কালে আলঙ্কারিকগণ নাটক-রচনা সম্বন্ধে যে যে নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং যে সকল বিধি-নিষেধের ব্যতিক্রম হইলে নাটক-রচয়িতার গৌরবের লাঘব হইত, এই নাটক-চক্রের রচনা-কালে সেই সমস্ত নিয়ম প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে না। উত্তর কালে আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজের "সাহিত্য-দর্পণে" একটি নিয়মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

> "দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
> বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যু রতং তথা॥"

এই সমস্ত ক্রিয়া দৃশ্যকাব্যে সম্পাদ্য নহে। প্রাচীনকালের ভরত-মুনির নাট্যশাস্ত্রেও [১৮শ অধ্যায়ে] আমরা এই নিয়মটির উল্লেখ দেখিতে পাই যথা,—

> "যুদ্ধং রাজ্যভ্রংশো মরণং নগরোপরোধনং চৈব।
> প্রত্যক্ষাণি তু নাঙ্কে প্রবেশকৈঃ সংবিধেয়ানি॥"

কিন্তু নবাবিষ্কৃত নাটক সমূহের কোনও কোনও স্থানে এই নিয়ম সর্ব্বাংশে রক্ষিত হয় নাই। "অভিষেক" নাটকে বালির মৃত্যু দশা এবং "বালচরিত" নাটকে কংসবধ অঙ্কমধ্যে প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতেও অনুমান করা যাইতে পারে যে, আলোচ্য নাটক-চক্রের রচনা-কাল এই সমস্ত বিধিনিষেধ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই ধরিয়া লইতে হইবে। নাটকসমূহের ভাব-ভঙ্গি, রচনা-রীতি ও অন্যান্য কাব্যগুণ-গ্রামের প্রকৃত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, রচয়িতা প্রাচীন ও মহাকবি-শ্রেণীভুক্ত।

মহাকবি ভাস।

কবি কুত্রাপি তাঁহার নামের উল্লেখ করেন নাই। তিনি কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা অনায়াসসাধ্য! কবির নাটকচক্রের মধ্যে "স্বপ্ননাটক"ই

আয়তনে একটু বৃহৎ। এই একখানি নাটকের তিনখানি আদর্শ পুঁথি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার একখানির শেষে, অবসান-বিজ্ঞাপক বচনে গ্রন্থের নাম "স্বপ্নবাসবদত্তম্" বলিয়াই উল্লিখিত রহিয়াছে। গ্রন্থপাঠেও অবগত হওয়া যায় যে,—বৎসরাজ উদয়ন কর্তৃক স্বপ্নে অধিগত বাসবদত্তার কথা এই নাটকের একটি প্রধান কথা। অভিনবগুপ্ত-বামন-প্রমুখ মধ্যযুগের আলঙ্কারিকগণও তাঁহাদের অলঙ্কার-গ্রন্থে "স্বপ্ন-বাসবদত্তাখ্য" এক নাটকের উল্লেখ করিয়া তাহা হইতে স্থানে স্থানে উদাহরণ সঙ্কলিত করিয়া গিয়াছেন। দশম-শতাব্দীর কবি রাজশেখরের "সূক্তিমুক্তাবলী" নামক গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায়,—"স্বপ্নবাসবদত্ত" নাটকের রচয়িতার নাম ভাস। যথা,—

"ভাস-নাটকচক্রেঽপি চ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্ন-বাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ॥"

"কাব্যকলা-বিচার-বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ভাস-রচিত নাটক-চক্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন—অগ্নিদেব "স্বপ্ন-বাসবদত্ত" নাটকখানিকে দগ্ধ করেন নাই।" অন্ততঃ "স্বপ্নবাসবদত্ত"-নাটকের প্রণেতা যে মহাকবি ভাস, তাহা এই শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। রাজশেখরের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে,উত্তরাপথের সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক মহাকবি বাণভট্টও স্বরচিত "শ্রীহর্ষচরিতে"র প্রাস্তাবিক শ্লোকাবলীর মধ্যে একটি শ্লোকে পূর্ব্ব কবি ভাসের ও তাঁহার নাটকসমূহের অসাধারণ ধর্ম্মের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা,—

"সূত্রধার-কৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব॥"

"কেহ যেমন সূত্রধারের [শিল্পীর] কৌশল-নির্ম্মিত, বহুভূমিক [বহুতলবিশিষ্ট], পতাকা-[বৈজয়ন্তী]-সুশোভিত, দেবভবন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যশোলাভ করেন, সেইরূপ মহাকবি ভাসও সূত্রধার-[নট]-মুখে আরব্ধ, বহুভূমিকা-[পাত্র]-সমন্বিত পতাকা-[প্রাসঙ্গিক কথা]-যুক্ত নাটকসমূহের রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।" বাণভট্ট-কথিত অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ভাস-নাটক-চক্রের "সূত্রধার-কৃতারম্ভত্ব" লক্ষণটি সর্ব্বপ্রথম স্বতঃই সকলের নিকট প্রতিভাত হইতে পারিবে;—কারণ, সর্ব্বত্রই

"নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ" এইরূপ বাক্য লইয়াই নাটকের আরম্ভ সূচিত হইয়াছে। ভরত-মুনি-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রে "ভূমিকা" শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ আছে ; যথা—

"অন্যরূপৈ পরগতস্ত প্রবেশঃ স তু ভূমিকা।"

"একই ব্যক্তির বহুরূপ-ধারণ-পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন পাত্র সাজিয়া প্রবেশ করার নাম 'ভূমিকা'। মহাকবি ভাসের নাটকের এইরূপ "বহুভূমিকত্ব" গুণটিও সহজেই প্রতীয়মান হয়। "প্রতিজ্ঞা"-নাটিকায় যৌগন্ধরায়ণ কখনও প্রধান সচিবরূপে, কখনও বা উন্মত্তকবেশে অভিনয় করিতেছেন। "স্বপ্ন-নাটকে"ও যৌগন্ধরায়ণ প্রথমতঃ ব্রাহ্মণরূপে ও শেষ অঙ্কে সচিবরূপে অভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন। এই সকল প্রমাণবলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে,—ভাস নামক মহাকবিই নবাবিষ্কৃত নাটক-চক্রের রচয়িতা। মহাকবি কালিদাসও স্ব-প্রণীত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের প্রস্তাবনায় ভাসপ্রমুখ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রখ্যাত কবিগণের নামোল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

"ভাব ! ভাবৎ প্রথিতযশসাং ভাসসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমান-কবেঃ কালিদাসস্য ক্রিয়ায়াং কথং পরিষদো বহুমানঃ।"

পারিপার্শ্বিক সূত্রধারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"মহাশয় ! 'প্রথিত-কীর্ত্তি ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদি কবিগণের নাটক অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান কবি কালিদাসের রচিত নাটকে এই বিদ্বন্মণ্ডলীর এত সমাদর দেখিতেছি কেন ?" পারিপার্শ্বিকের এই বাক্যের উত্তরে সূত্রধার যে শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে,—ভাস প্রভৃতি কবিগণ কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। সূত্রধারের প্রত্যুক্তিটি এইরূপ—

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে
মূঢ়ঃ পর-প্রত্যয়-নেয়-বুদ্ধিঃ॥"

আত্মকাব্যের প্রশংসাচ্ছলে কালিদাস সূত্রধারমুখে বলিয়াছেন যে,—"কাব্য পুরাতন হইলেই যে সৎ-কাব্য হইবে, তাহা নহে ; আবার কাব্য নূতন হইলেই যে নিন্দার্হ হইবে, তাহাও নহে ;—পুরাতনই হউক, বা

নূতনই হউক, সদসদ্বিবেকিগণ পরীক্ষা করিয়াই অন্যতরের গ্রহণ করেন, কিন্তু মূর্খজনেরা পরের বিশ্বাসেই নিজবুদ্ধি পরিচালিত করিয়া থাকে।” ভাসাদি পূর্ব্বতন কবিগণের রূপক অপেক্ষা তাঁহার রূপক যে অধিক-গুণ-যুক্ত, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছায় কালিদাস এইরূপ লিখিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, কালিদাসও ভাস-কবিকে “প্রথিত-যশা” বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। এত কাল পর্য্যন্ত এই মহাকবির নামমাত্রই পরিচিত ছিল,—তাঁহার নাটকাবলী যে কখনও আবিষ্কৃত হইবে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। মহাকবি ভাসের প্রাচীনতা প্রতিপাদন কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু অবিসংবাদিত-ভাবে তাঁহার অভ্যুদয়কালের নির্ণয় সহজ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। অল্পদিন হইল, স্বদেশে বিদেশে এই বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। কালিদাসের কাল লইয়াই কত মতভেদ রহিয়াছে,—তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভাসের উদ্ভব-কালের নিশ্চিত নির্দ্দেশ যে অতীব দুরূহ ব্যাপার, তাহা বোধ হয়, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। বিচার-সমর্থন-বিধায়ক বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ প্রমাণাবলী সংগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে, সম্পূর্ণভাবে সফল-কাম হইবার প্রত্যাশা করা যায় না। তবে মহাকবি ভাসের ভাষা সংস্কৃত-ভারতীর যৌবনের ভাষা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। (১) সংস্কৃত-ভাষার যৌবনকাল—মহাকবি ভাসের অভ্যুদয়কাল যে কোন্ কাল? -(২) মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা মহাকবি শূদ্রক ও তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য কবিগণের কাব্যে ভাসের প্রভাব কত দূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল?—(৩) ভাসের সময়ে ভারতবর্ষের সামাজিক আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি কিরূপ ছিল?—ক্রমশঃ এই সকল প্রশ্নের সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিব। আপাততঃ ভাসের অনন্য-সাধারণ কাব্যগুণ-সমৃদ্ধির যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া, “প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ” নাটিকার কথা-বস্তুর কিছু বিবরণ প্রদান করিব।

কাব্যগুণ-সমৃদ্ধি।

ভাসের নাটক-চক্রে কাব্যগুণ-সমৃদ্ধি বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার রচনায় ভাবসম্পৎ-প্রাচুর্য্যের ও সরল ভাষায় ভাব-প্রকাশ-শক্তির পরিচয় পাইয়াই বুঝি কালিদাস তাঁহাকে “প্রথিত-যশা” কবিকুলের অন্যতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। এই প্রদীপ্ত-প্রতিভা-সম্পন্ন মহাকবির কল্পনার বিশালতা, উৎপ্রেক্ষাশক্তির আতিশয্য, মানব-

চিত্তবৃত্তির সম্যগ্ জ্ঞান ও তদ্বর্ণনে সামর্থ্য প্রভৃতি গুণাবলী অল্প ছিল না। মানব-চিত্তবৃত্তির চিত্রাঙ্কণ করিয়া 'মানবকে মহত্তর হইতে শিক্ষা প্রদান করাই নাটক-রচনার প্রধান উদ্দেশ্য,—এই বিষয়ে ভাসের লেখনী-ধারণ সার্থক হইয়াছিল। অবস্থাভেদে বর্ণনীয় বস্তুর সূক্ষ্মতা ও বিভিন্নতার প্রতি-পাদনেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রসৈক-দৃষ্টি কবি কুত্রাপি রসানুকূল শব্দ-নির্ব্বাচনে ব্যর্থচেষ্ট হয়েন নাই,—রসের অনুরোধে প্রতিপাদ্য বিষয়কে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত করিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই। ভাসের নাটকে বীর-রসেরই প্রাধান্য অধিক। চরিত্রাঙ্কন গ্রন্থ-রচনা-কালের উপযোগী হইয়া থাকে। সুতরাং কবির রচনা হইতে সমসাময়িক জন-সমাজের চিত্রের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ভাসের সময়ে শৌর্য্য-বীর্য্য-সৌন্দর্য্যে ভারতবাসিগণের মানসিক প্রবৃত্তি কোন্ প্রণালীতে পরিচালিত হইত, রস-বর্ণনা দ্বারা ভাস তাহার অনেক আভাস দিয়া গিয়াছেন। এই নাটক-চক্র-পাঠে রসজ্ঞ ব্যক্তির উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, নাটকগুলিতে অতিপ্রাকৃত সংস্থান বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। বাস্তবপ্রিয়তা বর্ত্তমান যুগের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; কিন্তু ভাসের বাস্তবপ্রিয়তায় বর্ত্তমান যুগের পাঠকও মুগ্ধ হইবেন। দুঃখবাদ বা নির্ব্বেদ যেন এই কবির কাব্যে প্রশ্রয় লাভ করিতে পারে নাই,—মানব-জীবনের ক্রমোন্নতি-কামনাই যেন কবির বীজ-মন্ত্র ছিল।

ভাসের ভাষা সরল ও সুললিত; শব্দবিন্যাসে কোনও কৃত্রিমতা নাই। দণ্ডী স্বপ্রণীত "কাব্যাদর্শ" নামক অলঙ্কারগ্রন্থে দশটি কাব্যগুণের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—

"শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্য্যং সুকুমারতা।
অর্থ-ব্যক্তিরুদারত্বমোজঃকান্তি-সমাধয়ঃ।"

ভাসের রচনা-কৌশল দেখিয়া মনে হয়,—এই গুণগুলি তাঁহার রচনা-রীতিতে স্পষ্টই দেদীপ্যমান। শব্দ-সৌষ্ঠব অর্থগৌরব নষ্ট করে নাই। ভাসের নাটকে আরও একটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। কবি যেন অনায়াসে বা অনায়াসে স্থানে স্থানে সুরস ভণিতি দ্বারা তাঁহার রচনাটি রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভাসের ভারতীতে প্রাণবত্তা আছে। পরবর্ত্তী কবিগণ কৃত্রিম-শব্দ-বিন্যাসে ও দীর্ঘ-সমাস-ব্যবহারে অর্থ-বোধের দুরূহতা বাড়াইয়া-ছেন, এবং আলঙ্কারিকগণের উল্লিখিত ও পর্য্যালোচিত বহুভেদযুক্ত অলঙ্কা-

য়ের ব্যবহার করিয়া বর্ত্তমান কালের পাঠকবর্গের পাঠানুগ্রহ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছেন। সে যাহা হউক, ভাসপ্রণীত নাটকচক্রের পাঠসময়ে অর্থবোধে ও রসগ্রহণে কোনও ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু কালিদাস-ভবভূতি-প্রমুখ পরবর্ত্তী কালের কবিগণের কাব্যে যেমন নৈসর্গিক শোভার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়,—ভাসের নাটকে তাহার অভাব পরিলক্ষিত হয়। স্বভাব-শোভার বর্ণনায় কালিদাসাদির কৃতিত্ব অধিক বলিয়াই মনে হয়।

প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ।

প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ নাটিকার উপাখ্যান-বস্তু কোনও মূলগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে কি না, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে নাটিকার নায়ক বৎসরাজ উদয়ন—নায়িকা অবন্তিরাজ প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তা। ইঁহারা যে ঐতিহাসিক নরনারী, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পালিভাষায় লিখিত প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে,—অবন্তি-পতি প্রদ্যোত, বৎসরাজ উদয়ন ও কোশলাধিপ প্রসেনজিৎ—ইঁহারা বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন। বৌদ্ধদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-গ্রন্থ "ধর্ম্মপদে"র—

"অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদম্।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা॥"

"অপ্রমাদ অমৃতের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর দ্বার; প্রমত্ত ব্যক্তিগণ যে প্রকার মৃত্যুপথে পতিত হয়েন, অপ্রমত্ত ব্যক্তিগণ সেইরূপে মৃত হয়েন না।" ইত্যাদি শ্লোকাবলীর টীকাতে প্রসঙ্গক্রমে প্রমাদের ও অপ্রমাদের উদাহরণ-রূপে টীকাকার "বাসুলদত্তা ও উদেন" [বাসবদত্তা ও উদয়ন]-সংক্রান্ত যে উপাখ্যানটির* (১) বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ ভাগ আলোচ্য নাটিকাতে বর্ণিত কথা-বস্তুর সঙ্গে মিলিয়া যায়। বোধ হয়, প্রাচীন কবি ভাসের সময়ে উদয়ন-বাসবদত্তা-সম্বন্ধীয় কথা জনসমাজে প্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তী কালেও অনেক কবি নিজ নিজ কাব্যের স্থানে স্থানে উদয়ন কর্ত্তৃক বাসবদত্তার অপহরণ-বৃত্তান্তের এবং মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণ কর্ত্তৃক উদয়নের কারামুক্তি-বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "মৃচ্ছ-কটিক" প্রকরণের চতুর্থাঙ্কে একটি শ্লোকাংশ এইরূপ,—

"উজ্জয়ন্যামি সুহৃদঃ পরিমোক্ষণায়
যৌগন্ধরায়ণ ইবোদয়নস্য রাজ্ঞঃ।"

* (১) Buddhist India—Rhys Davids pp. 4—7.

কালিদাসও তাঁহার মেঘদূত কাব্যে অবন্তিদেশবাসিগণকে উদয়ন-কথা-পণ্ডিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা,—

"প্রাপ্যাবন্তীনুদয়ন-কথা-কোবিদ-গ্রামবৃদ্ধান্।"

মেঘদূতে অন্যত্র বর্ণিত আছে,—

"প্রদ্যোতস্য প্রিয়দুহিতরং বৎসরাজোঽত্র জহ্রে
হৈমং তালদ্রুমবনমভূদত্র তস্যৈব রাজ্ঞঃ।
অত্রোদ্ভ্রান্তঃ কিল নলগিরিঃ স্তম্ভমুৎপাট্য দর্পাদ্
ইত্যাগন্তূন্ রময়তি জনো যত্র বন্ধূনভিজ্ঞঃ॥"

"কথিত আছে, এই স্থান হইতেই বৎসরাজ [উদয়ন] প্রদ্যোতের প্রিয়-দুহিতাকে অপহরণ করিয়াছিলেন; এই স্থানেই সেই রাজা [প্রদ্যোতের] সুবর্ণ-নির্ম্মিত তালদ্রুম-বন ছিল; এই স্থানেই নলগিরি নাম [প্রদ্যোতের] হস্তী বন্ধন-স্তম্ভ উৎপাটিত করিয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিল;—ইত্যাদি কথার উল্লেখ করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অভ্যাগত বন্ধুবর্গের চিত্ত-রঞ্জন করিতেন।" বলা বাহুল্য, আলোচ্য নাটিকার তৃতীয়াঙ্কেও আমরা "নলগিরি" নামক হস্তীর উদ্ভ্রান্তির কথা উল্লিখিত দেখিতে পাই।

"প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ" নাটিকা চারি অঙ্কে বিভক্ত। মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণ কৃত দুইটি প্রতিজ্ঞার কথা অবলম্বন করিয়া নাটিকার নাম "প্রতিজ্ঞা-নাটিকা" বা "প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণম্" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকিবে। এই নাটিকাতে বীর রসই প্রধান ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নাটিকায় বিবৃত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কাল-ব্যবধান অত্যল্প। কার্য্য-পরম্পরার শীঘ্র সম্পাদন বিহিত হওয়ায় দর্শকের ও পাঠকের মন মুগ্ধ থাকে।

কথা-বস্তু।

গৌতম-বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতবর্ষে যে কয়টি স্বাধীন রাজ্য ছিল, তন্মধ্যে অবন্তী-রাজ্যই প্রধান। অবন্তিদেশের রাজার নাম প্রদ্যোত। বহুসংখ্যক "সেনা" ছিল বলিয়া, তাঁহার অপর এক নাম "মহাসেন"। রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে। মহারাজ প্রদ্যোতের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। সেই সময়ে বৎস দেশেও উদয়ন নামা অপর এক নরপতি ছিলেন। যমুনা-নদী-তীরস্থ কৌশাম্বীনগরে তাঁহার রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। অশেষ-নৃপগুণ-সম্পন্ন উদয়ন বীণাবাদন-কৌশলে হৃদয়াকর্ষণ করিয়া, মত্তহস্তিগণকেও স্ববশে আনিতে পারিতেন। "ঘোষবতী" নামক বীণাযন্ত্র

তাঁহার বংশপরম্পরাগত। ঋষিবচনোচ্চরিত মন্ত্রবিদ্যার ন্যায়, তাঁহার এই বীণারত্ন সর্ব্বদাই গজ-বশীকরণে সফলতা লাভ করিত। সেই সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য নরপতিগণ অবনতমস্তকে প্রদ্যোতের পরাক্রম স্বীকার করিতেন; কিন্তু বৎসরাজ উদয়ন প্রদ্যোতের প্রতাপ গ্রাহ্য করিতেন না। প্রশস্ত ভারতবংশে তাঁহার জন্ম বলিয়া, উদয়নের উৎসেক;—বংশ-পরম্পরা-প্রাপ্ত গান্ধর্ব্ব-বিদ্যায় তিনি পারদর্শী বলিয়া, তাঁহার দর্প;—বয়সানুরূপ রূপ ছিল বলিয়া, তাঁহার চিত্ত-বিভ্রম; এবং তদীয় ভীমকান্ত রাজগুণে মোহিত পৌরবর্গ তাঁহার অনুরক্ত ছিল বলিয়া, তিনি প্রজাদিগের বিশ্বাসভাজন। এই সকল কারণে পৃথিবীর কোনও রাজার নিকটেই তিনি মস্তক অবনত করিতে অভ্যস্ত হয়েন নাই।

মহারাজ প্রদ্যোতের এক অলৌকিকলাবণ্যবতী কন্যা ছিল; তাঁহার নাম বাসবদত্তা। বিবাহ-যোগ্য কাল উপস্থিত। সম্বন্ধাভিলাষী হইয়া বহু নৃপতি অবন্তি-রাজকুলে দূত প্রেরণ করিতেছিলেন। কিন্তু বৎসরাজ উদয়ন এই সম্বন্ধের আকাঙ্ক্ষা করিয়া একটি প্রাণীকেও প্রদ্যোত-পাদ-প্রান্তে প্রেরণ করেন নাই। এই নিমিত্ত মহারাজ প্রদ্যোত উদয়নের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। তিনি ভাবিতেছিলেন,—

> "মম হয়-খুর-ভগ্নং মার্গরেণুং নরেন্দ্রাঃ
> মুকুট-তট বিলগ্নং ভৃত্য-ভূতা বহন্তু।
> ন চ মম পরিতোষো যন্ন মাং বৎসরাজঃ
> প্রণমতি গুণশালী কুঞ্জর-জ্ঞান-দৃপ্তঃ ॥"

"আমার অশ্বের খুরোৎক্ষিপ্ত পথরেণুকণা সকল নরপালই ভৃত্যভাবে স্বমুকুটে ধারণ করেন; কিন্তু বহুগুণোপেত বৎসরাজ [উদয়ন] হস্তিগ্রহণ-শিক্ষাজ্ঞানে দৃপ্ত হইয়া আমার নিকট প্রণত নহেন, ইহাই আমার অপরিতোষের কারণ।" কন্যা বরের রূপ কামনা করেন; মাতা বিত্ত চাহেন; পিতার অভিলাষ জামাতা বহুশ্রুত হয়েন; এবং বান্ধবগণের দৃষ্টি বরের কুল শ্রেষ্ঠ কি না, সেই দিকে। কেবল বৎসরাজেই এই সমস্ত গুণের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য, প্রদ্যোতের প্রধান চিন্তা—কি প্রকারে ছলপূর্ব্বকও বৎসরাজকে নিজরাজ্যে ধরিয়া আনিয়া কন্যার পাণি প্রদান করিবেন। নাগবনে কপট নীল হস্তীর "উপন্যাস" করিয়া বঞ্চনা-বলে বৎসরাজকে উজ্জয়িনীতে ধরিয়া আনিবার জন্য, প্রদ্যোত তাঁহার

অমাত্য শালঙ্কায়ণকে উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিয়া, বিপুল সৈন্য সামন্ত সঙ্গে দিয়া, তাঁহাকে নাগবনে প্রেরণ করিলেন। প্রদ্যোতের এই নীল-হস্তি-রচনাব্যাপারের কথা চারমুখে অবগত হইয়া, বৎসরাজের প্রধান সচিব মহামনাঃ যৌগন্ধরায়ণ আত্মপ্রভুর রক্ষার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। কারণ, ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া উদয়ন সৈন্যাধ্যক্ষ রুমণ্বান ও অন্যান্য অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বেণুবনে হস্তী ধরিতে গিয়াছিলেন। বেণুবন হইতে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার নাগবনে প্রবেশের কথা ছিল। তথায় প্রবিষ্ট হইলে উদয়নের মহাবিপদের সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত, প্রদ্যোতের ছলনা-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ লোক প্রেরণ করিয়া রাজাকে নাগবনে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইবেন, এইরূপ স্থির করিতেছিলেন, এমন সময় প্রতীহারী আসিয়া মন্ত্রিবরের নিকট নিবেদন করিল যে, নাগবন হইতে মহারাজ উদয়ন অশ্বারোহী হংসককে প্রেরণ করিয়াছেন। হংসকের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তীক্ষ্ণ-ধী-সম্পন্ন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ মনে মনে বড়ই ব্যাকুল হইলেন। ইতিপূর্ব্বে হংসক কখনই প্রভুর সন্নিধান পরিত্যাগ করে নাই; তবে আজ ভর্তৃপাদমূল হইতে হংসক না জানি কি অশুভ বার্ত্তাই বহন করিয়া লইয়া এই স্থানে আসিয়া থাকিবে। হংসকের সহিত সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই যৌগন্ধরায়ণ নিজ মনোভাব বর্ণনা করিতেছেন,—

> যথা নরস্যাকুল-বান্ধবস্য প্রবাসদৈর্ঘেণ গৃহমাগতস্য।
> তথৈব মে সম্প্রতি বুদ্ধি-শঙ্কা কো বার্ত্তা কং প্রিয়মপ্রিয়ং বা॥"

"বান্ধব-কুলকে আকুল করিয়া, দেশান্তর যাইয়া গৃহ প্রত্যাবৃত্ত ব্যক্তির মনে যেরূপ আশঙ্কা হয়, না জানি [গৃহে প্রবেশ করিয়া], কি প্রিয় বা অপ্রিয় কথাই শুনিতে হইবে; সেইরূপ আজ আমারও মনে আশঙ্কা হইতেছে।" উদয়ন গতরাত্রিতেই নাগবনে প্রবেশ করিয়াছেন—হংসকমুখে এইমাত্র শ্রবণ করিয়াই যৌগন্ধরায়ণ হংসককে বলিলেন "আর বলিতে হইবে না,—আমরা ছলিত হইয়াছি; আর প্রত্যাশা নাই; প্রাণ-পরিত্যাগই বাঞ্ছনীয়; নিশ্চিতই প্রভু উদয়ন শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছেন; ভাগ্যবলে প্রদ্যোতের অভিলাষই পূর্ণ হইল।" রুমণ্বান্ প্রভৃতি অশ্বারোহী সৈন্য সকল সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও, কি প্রকারে রাজা শত্রুহস্তে ধরা পড়িলেন, ইহা ভাবিয়াই মন্ত্রিবর অস্থির। এই জন্য তিনি হংসককে সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত

বিবৃত করিতে বলিলেন। হংসক বলিতে লাগিলেন,—"সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্ব হইতেই আমরা দূর হইতে এক বিষম-দর্শন নাগযূথ দেখিতে পাইলাম। এক জন পদাতি আসিয়া রাজপাদমূলে সংবাদ দিল যে, 'নাতিদূরে মল্লিকা ও শালবৃক্ষে প্রচ্ছাদিত-শরীর এক নীলহস্তী দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।' নীল-কুবলয়তনু নামক চক্রবর্ত্তী হস্তীর কথা উদয়ন হস্তিশিক্ষা শাস্ত্রে পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা স্মরণ করিয়া, তিনি সংবাদ-বহনকারী পদাতিকে সুবর্ণশতক পারিতোষিক প্রদান করিয়া, কেবল বীণাযন্ত্রটি ও বিংশতি-মাত্র পদাতি সঙ্গে লইয়া নীলহস্তীটি ধরিয়া আনিবার জন্য বনমধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনুসরণের জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলেও উদয়ন রুমণ্বানকে সঙ্গে লইতে অস্বীকার করিলেন। সহগামী পদাতিগণের মধ্যে আমিও এক জন ছিলাম। বহুদূর অগ্রসর হইয়া, দূর হইতেই আমরা সেই দিব্য বারণটি লক্ষ্য করিতে পারিলাম। রাজা হস্তে বীণাগ্রহণ করিয়াছেন মাত্র, এমন সময় এক মহা 'কণ্টীরব' শ্রুত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখিলাম যে, আমরা শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়াছি। এতক্ষণে মহারাজ উদয়ন বুঝিতে পারিলেন যে, এই ছলনা প্রদ্যোতেরই প্রয়োগ। আত্মপরিক্রমী শত্রুর বিষমারম্ভ এই প্রয়োগের সমীকরণমানসে রাজা সেই অল্পসংখ্যক অনুচর-বর্গকে সমাশ্বস্ত করিয়া, শত্রুসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সূর্য্যের প্রখর কিরণে প্রদ্যোতের সেনামণ্ডলীর সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত মহারাজ উদয়ন উগ্রাতপবেলায় মোহ প্রাপ্ত হইলেন। আমি ব্যতীত অন্যান্য সকলেই পলায়নপর হইলেন। শত্রুসৈন্যেরা অতিনিষ্ঠুরভাবে আমাদের প্রভুকে সেই মোহাবস্থায়ই কর্কশলতা দ্বারা হস্তপদাদিতে বন্ধন করিয়া ফেলিল। শেষ বেলায় মহারাজ চৈতন্যলাভ করিলেন। কত লোকই যে আমাদের মহারাজকে প্রহার করিল, মন্ত্রিবর, তাহার আর কি বর্ণনা করিব? কিন্তু প্রদ্যোতের অমাত্য শালঙ্কায়ণ আত্মপক্ষের যোদ্ধৃপুরুষদিগকে সাহসিকের কার্য্য হইতে বিরত হইতে আদেশ করিয়া, আমাদের প্রভুর পাদপ্রান্তে উপনীত হইয়া তৎকালে দুর্লভ একটি প্রণাম করিলেন। শালঙ্কায়ণের এই সাধু ব্যবহারে যেন প্রভুর শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার কিছু লাঘব হইল। তৎপরে শালঙ্কায়ণ সেই অবস্থায়ই আমাদের মহারাজ উদয়নকে উজ্জয়িনীতে লইয়া গেলেন। এই সুদুঃসহ অনর্থের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণ বড়ই চিন্তান্বিত হইলেন। উদয়নের মাতার নিকটই বা কি প্রকারে

তিনি এই বিপদের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিবেন? প্রতীহারীকে তিনি ডাকাইয়া লইয়া বলিলেন,—

''বিজয়ে! ন খলু ত্বয়াত্রিভবত্যৈ 'গৃহীতঃ স্বামী' ইতি সহসা নিবেদিতব্যম্।
স্নেহ-দুর্ব্বলং মাতৃ-হৃদয়ং রক্ষ্যম্"।

"বিজয়ে! 'স্বামী ধৃত হইয়াছেন' এই সংবাদ তুমি সহসা ভর্তৃমাতার নিকট নিবেদন করিও না,—স্নেহবশতঃ মাতৃহৃদয় অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহার রক্ষা করিতেই হইবে।" যুদ্ধ-বিষয়ক দোষাদির কথা বলিতে বলিতে, শুনিয়া শুনিয়া

''রূঢ়ে শোকে কার্য্যান্তরং নিবেদ্যম্।"

"তাঁহার হৃদয়ে শোকের আবেগ লক্ষ্য করিলেই, এই অপ্রিয় সংবাদের নিবেদন করিতে হইবে"—প্রতিহারীকে এইরূপ আদেশ দিয়া তিনি তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। শালঙ্কায়ণ হংসককে উজ্জয়িনীতে যাইতে নিষেধ করিয়া, বৎসরাজের বন্ধন-সংবাদ লইয়া কৌশাম্বী নগরে যাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। যৌগন্ধরায়ণ হংসককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভু উদয়ন কোনও আদেশ পাঠাইয়াছেন কি না? হংসক বলিলেন, মহারাজ উদয়ন এইমাত্র বলিয়া দিয়াছেন যে,

''দ্রষ্টব্যো যৌগন্ধরায়ণঃ।"

যৌগন্ধরায়ণের সাক্ষাৎকার চাহি। প্রবীণবুদ্ধি নীতিকুশল যৌগন্ধরায়ণ মনে মনে স্থির করিলেন যে, প্রচ্ছন্নবেশে সহকারিগণকে পূর্ব্বেই উজ্জয়িনীতে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং পুরুষান্তরবেশে তথায় যাইয়া প্রভুর মুক্তিসাধনের ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়াই তিনি হংসককে বলিলেন,—

"পুরুষান্তরিতং মাং দ্রক্ষ্যতি স্বামী,—

রিপু-নগরে বা বন্ধনে বা বনে বা
সমুপগত-বিনাশঃ প্রেত্য বা তুল্য নিষ্ঠম্।
জিতমিতি কৃতবুদ্ধিং বঞ্চয়িত্বা নৃপং তং
পুনরভিমত-রাজ্যঃ পার্থিবঃ স্রাপণীয়ম্।"

"মহারাজ উদয়ন যৌগন্ধরায়ণ-রূপে আমার আর দর্শন পাইবেন না। অন্যপুরুষ-রূপেই দেখিতে পাইবেন।—রিপুনগরেই হউক, কারাগারেই হউক, বনেই হউক, অথবা তিনি যদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে প্রেতলোকেই হউক;—সর্ব্বত্রই তিনি আমাকে তুল্যনিষ্ঠ দেখিতে পাইবেন। বিজয়লাভে-দৃপ্ত রাজা [প্রদ্যোতকে]. বঞ্চিত করিয়া পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে প্রতি-

ষ্ঠিত হইলে পর তিনি আমাকে আবার নিজপার্শ্বেই শ্লাঘ্য মন্ত্রিপদে আরূঢ় দেখিতে পাইবেন।" যৌগন্ধরায়ণ সঙ্কটে পড়িয়া কখনই বিষণ্ণ হইতেন না,— বিষমে পড়িয়াও চিন্তাবস্থানে অসমর্থ হইতেন না, বঞ্চিত হইলেও নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত হইতেন না,—প্রতিঘাতেও আত্ম-প্রাণ-পরিত্যাগের সংকল্প করিতেন না। সেই জন্যই, ভর্তৃমাতা পুত্রাপহরণে দুঃখিতা হইয়াও, পুত্র-বয়স্য মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণের উপরই পুত্রোদ্ধারের ভার অর্পিত করিলেন। যৌগন্ধরায়ণও প্রতিজ্ঞা করিলেন,—

"যদি শত্রুবলগ্রস্তো রাহুণা চন্দ্রমা ইব।
মোচয়ামি ন রাজানং নাস্মি যৌগন্ধরায়ণঃ ॥"

"রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় শত্রুসৈনা-গ্রস্ত হইয়াও যদি আমি আমাদের রাজাকে মুক্ত না করিতে পারি, তাহা হইলে আমার নাম যৌগন্ধরায়ণ নহে।" এই প্রতিজ্ঞার পর তিনি "উন্মত্তকে"র বেশে [উজ্জয়িনীতে] স্বামি-সন্নিধানে উপস্থিত হইবেন, এইরূপ সংকল্প করিয়া অন্যান্য সহচর কর্ম্মবীর-গণের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য শান্তিগৃহে চলিয়া গেলেন। কারণ, তিনি জানিতেন,--

"কাষ্ঠাদগ্নির্জায়তে মথ্যমানাদ্
ভূমিস্তোয়ং খন্যমানা দদাতি।
সোৎসাহানাং নাস্ত্যসাধ্যং নরাণাং
মার্গারব্ধাঃ সর্ব্বযত্নাঃ ফলন্তি ॥"

"মথিত হইলেই কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, খনিত হইলেই ভূমি জল প্রদান করে। উৎসাহসম্পন্ন হইলেই মানবের অসাধ্য কিছুই থাকে না। উপায়সহকারে আরব্ধ হইলে সকল চেষ্টাই ফলবতী হয়।"

এ দিকে বাসবদত্তার বিবাহযোগ্য কাল উপস্থিত দেখিয়া, জনক প্রদ্যোত ও জননী অঙ্গারবতী, উভয়েই চিন্তাকুল। সৎপাত্রে কন্যাকে প্রদান করিতে হইবে, অথচ অনুরূপরূপ-গুণবিশিষ্ট বর নির্ব্বাচিত করিতে পারিতেছেন না। সম্প্রতি কোশলরাজ সম্বন্ধ ইচ্ছা করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু,

"দুহিতুঃ প্রদানকালে দুঃখশীলা হি মাতরঃ।"

"কন্যাপ্রদান-কালে মাতাই অধিক দুঃখিতা হয়েন,"—এই জন্য, পরামর্শ করিবার জন্য প্রদ্যোত মহিষীকে ডাকাইয়া বলিলেন,—

"অসমৎসমন্তো মাগধঃ কাশিরাজো
বাঙ্গঃ সৌরাষ্ট্রো মৈথিলঃ শূরসেনঃ।
এতে নানার্থৈ র্লোভয়ন্তো গুণৈর্মাং
কস্তে বৈতেষাং পাত্রতাং যাতি রাজা।"

"মগধ-রাজ, কাশিরাজ, বঙ্গপতি, সুরাষ্ট্রপতি, মিথিলাধিপ ও শূরসেনাধিপ, ইঁহারা, সকলেই আমাদের সম্বন্ধ ইচ্ছা করিয়াছেন। ইঁহারা নানাগুণে আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে কোন নরপতিকে তুমি পাত্র-রূপে ধার্য্য করিতে চাহ।" বর-নির্ব্বাচনের পরামর্শ হইতেছে, এমন সময় মহারাজের নিকট সংবাদ আসিল যে, বৎসরাজ উদয়ন নাগবনে ধৃত হইয়াছেন। এবং অমাত্য শালঙ্কায়ণ তাঁহাকে লইয়া অনতিবিলম্বেই মহারাজ-সমীপে উপস্থিত হইবেন।

ভারত-কুলোপভুক্ত ঘোষবতী নামক বীণারত্নটিকে শালঙ্কায়ণ সর্ব্বাগ্রে রাজ-পদমূলে উপহাররূপে পাঠাইয়া দিলেন। বাসবদত্তা আচার্য্যের নিকট বীণাবাদ্য শিক্ষা করিতেছিলেন, সেই জন্য প্রদ্যোত সমরাবর্জ্জিত এই বীণাটি বাসবদত্তাকে দিবার জন্য দেবীর হস্তে প্রদান করিলেন। প্রদ্যোতের প্রধান সচিব ভরতরোহক আজ্ঞাপিত হইলেন যে, সকলেই যেন আকার ইঙ্গিত বুঝিয়াই বৎসরাজের প্রীতিসাধনে তৎপর থাকে; অতিক্রান্ত যুদ্ধাদির কথা যেন কেহ তাঁহার নিকট না উত্থাপিত করেন; এবং সর্ব্বদা সকলেই যেন উপযুক্ত সৎকার ও স্তব দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন রাখেন। মহারাজ মনে মনে স্থির করিলেন যে, বৎসরাজের হস্তেই কন্যা সমর্পণ করিবেন। মহিষী অঙ্গারবতীরও তাহাই অভিলাষ।

উদয়ন উজ্জয়িনীতে নীত হইয়াছেন শুনিয়া, বিচিত্রকর্ম্মকুশল যৌগন্ধরায়ণ স্থিরভাবে কৌশাম্বীতে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। স্বামি-বিমোক্ষের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া, প্রচ্ছন্নবেশধারী কর্ম্মঠ পুরুষগণকে উজ্জয়িনীতে পাঠাইয়া নিজেও উন্মত্তকের বেশ ধারণ করিয়া সেই স্থানে চলিয়া গেলেন। সেনাসচিব রুমণ্বান বৌদ্ধশ্রমণক সাজিলেন; উদয়নের কর্ম্মসচিব বসন্তক ভিক্ষুক-বেশ ধারণ করিলেন, এবং অন্য একটি কর্ম্মচারী গাত্র-সেবক-রূপে বাসবদত্তার অন্তঃপুরে হস্তিপকের কার্য্য গ্রহণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কার্য্যোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক যৌগন্ধরায়ণ উজ্জয়িনীর নানা স্থানে অন্যান্য পুরুষদিগকেও পাঠাইয়া দিলেন। যৌগ-

ন্ধরায়ণের উপদেশক্রমে বসন্তক প্রভুর কারামুক্তির উপায়-বার্ত্তা লইয়া উদয়ন-সমীপে গিয়াছিলেন। উদয়নের প্রত্যুত্তর লইয়া ফিরিয়া আসিবার সময়, শ্রমণকরূপী রুমণ্বানের ও উন্মত্তক-বেশধারী স্বয়ং যৌগন্ধরায়ণের সহিত পথমধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিন সচিব মিলিত হইয়া নির্জ্জন স্থানে যাইয়া মন্ত্রণা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনতিদূরে এক জন-শূন্য অগ্নিগৃহে যাইয়া, তাঁহারা পরামর্শ করিতে বসিয়া গেলেন। যৌগন্ধরায়ণ বসন্তককে পুনরায় উদয়নসমীপে একটি বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। প্রভুকে বলিতে হইবে যে, তাঁহাকে লইয়া প্রয়াণের যেরূপ ব্যবস্থা স্থিরীকৃত আছে, তাহার প্রয়োগ-কাল আগামী দিবসে; এবং শঙ্খদুন্দুভিপ্রভৃতির শব্দ উৎপাদন করিয়া, প্রদ্যোতের প্রসিদ্ধ গজরাজ নলাগিরির চিত্তোদ্ভ্রান্তি ঘটাইবার জন্য, নিকটস্থ দেবকুলে শঙ্খ দুন্দুভি প্রভৃতি সংস্থাপিত করা হইয়াছে। হস্তীর অগ্নিত্রাস অধিক,—অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া নলাগিরির ত্রাস-সম্পাদনের ব্যবস্থাও বিহিত হইয়াছে। শব্দ-শ্রবণে ও অগ্নি-দর্শনে উন্মত্ত হইয়া, নলাগিরি বন্ধন-মুক্ত হইয়া ছুটিবার উপক্রম করিলে, অবশ্যই মহারাজ প্রদ্যোত হস্তি-বশীকরণ-বিদ্যায় পারদর্শী প্রভু উদয়নের শরণাগত হইবেন। সেই সময়ে তাঁহাকে কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দিলে, তিনি বংশ-পরম্পরা-প্রাপ্ত ঘোষবতী নামক বীণারত্নটি হস্তগত করিয়া, নলাগিরিকে আত্ম-বিদ্যা-কৌশলে বশে আনিতে যাইবার ছলে, সেই হস্তীতেই আরোহণ করিয়া,—

"যেনৈব দ্বিরদ-চ্ছলেন নিয়তস্তেনৈব নির্ব্বাস্যতে।"

প্রদ্যোতের "যে গজ-চ্ছলে তিনি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিলেন, সেই গজচ্ছলেই বিমুক্ত হইবেন।" উদয়নসমীপে এই সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইতে বসন্তক একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। যৌগন্ধরায়ণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর বসন্তক বলিলেন,—"বৎসরাজের নিজদোষেই এক কার্য্য-বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। একদিবস কেবল ধাত্রীকে সঙ্গে লইয়া বাসবদত্তা আবরণ-যুক্ত শিবিকাতে আরোহণ করিয়া কারাগারের নিকটস্থ যক্ষিণী-পীঠে পূজা করিবার জন্য যাইতেছিলেন; উদয়ন বন্ধন-দ্বার হইতে সেই রাজপুত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, অনুরাগরক্ত-চিত্তে তাঁহার প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করিতে-ছিলেন। তদবধি উভয়েই রাগ-লীলার পর, প্রচ্ছন্ন দাম্পত্য উপভোগ করিতে-ছেন। এমন কি, তিনি মন্ত্রি-সমীপে আমাকে ইহাও বিজ্ঞাপিত করিতে

আদেশ দিলেন যে, যে উপায়ে মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ তাঁহার কারামুক্তির ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে মহারাজ প্রদ্যোতের সবিশেষ অপমাননার সম্ভাবনা আছে।" বসন্তকের এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ রুমণ্বানকে ও বসন্তককে বলিলেন,—

"অনেনৈব বেষেণ জয়া গন্তব্যা।"

"আমরা প্রত্যেকে যে বেষ ধারণ করিয়াছি, সেই বেষেই জয়াগন্ত হইব।" তাঁহাদের আর বৎসরাজের দেশে ফিরিয়া যাইবার অভিলাষ রহিল না। কিছুক্ষণ পরে যৌগন্ধরায়ণ ভাবিলেন, স্বামি-বিমোক্ষের জন্য আবদ্ধ কার্য্যের সিদ্ধি দেখিতেই হইবে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন,—

"সুভদ্রামিব গাণ্ডীবী নাগঃ পদ্মলতামিব।
যদি তাং ন হরেদ্ রাজা নাস্মি যৌগন্ধরায়ণঃ ॥
যদি তাং চৈব তং চৈব তাং চৈবায়তলোচনাম্
নাহরামি নৃপং চৈব নাস্মি যৌগন্ধরায়ণঃ ॥"

"অর্জ্জুন যেমন সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন, নাগ যেমন পদ্মলতাকে হরণ করে, সেইরূপ উদয়ন যদি বাসবদত্তাকে অপহরণ না করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার নাম যৌগন্ধরায়ণ নহে। অপিচ,—যদি আমি নিজে ঘোষবতী বীণা, নলাগিরি গজ ও বাসবদত্তাকে লইয়া, আমাদের রাজা উদয়নকে হরণ করিতে না পারি, তাহা হইলেও আমি যৌগন্ধরায়ণ নহি।" এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া, আত্ম-কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্য যৌগন্ধরায়ণ প্রচ্ছন্নবেশেই সহকারিগণকে সঙ্গে লইয়া, পুনরায় নগর-পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

রাজপুত্রীর মনে ইচ্ছা হইল, তিনি হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জলক্রীড়া করিবেন। এই জন্য বাসবদত্তা গাত্রসেবকের নিকট আদেশ পাঠাইলেন যে, শীঘ্র ভদ্রবতী নামক করেণু লইয়া উপস্থিত হইতে হইবে। গাত্রসেবক যৌগন্ধরায়ণের লোক; আত্মপক্ষের কার্য্যোদ্ধারের সহায়তাকল্পে তিনি ইতিপূর্ব্বেই ভদ্রবতী নাম্নী হস্তিনীকে যৌগন্ধরায়ণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। অন্তঃপুর হইতে লোক আসিয়া গাত্রসেবককে ভদ্রবতীকে লইয়া রাজকন্যা-সমীপে উপস্থিত হইতে বলিলে, তিনি সুরাপান-মত্ততার ভাণ করিয়া স্খলিত-কণ্ঠে উত্তর দিলেন যে, রাজবাহক ভদ্রবতীকে শুণ্ডিকিনীর নিকট বিক্রয় করিয়া, সুরা পান করিয়াছেন। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে,

এমন সময় চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপী শব্দ শ্রুত হইল,—"বৎসরাজ উদয়ন রাজপুত্রী বাসবদত্তাকে লইয়া ভদ্রবতীতে আরোহণপূর্ব্বক নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।" অভিলষিত শব্দ শুনিয়া গাত্রসেবকের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না; তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রাজান্তঃপুরের লোকটির নিকট আত্মপরিচয় দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমরা কেহই প্রমত্ত নহি; আমরা চার-পুরুষ; আমাদের মহারাজ উদয়নের কারামুক্তির সহায়তায়, মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণ আমাদিগকে নিজ নিজ কর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদান করিয়া উজ্জয়িনীতে প্রেরণ করিয়া, নিজেও এই নগরেই বাস করিতেছেন।" মন্ত্রিনিযুক্ত সকল চার-পুরুষই এখন নিরোধ-মুক্ত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ইতস্ততঃ যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। আত্মপ্রভুর কল্যাণার্থ কোন্ ভৃত্য অগণিত-তনুপাতভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান না করে। কারণ,

"নবং শরাবং সলিলৈঃ সুপূর্ণং
সুসংস্কৃতং দর্ভকৃতোত্তরীয়ম্।
তত্তস্য মা ভূন্নরকং স গচ্ছেদ্
যো ভর্ত্তৃপিণ্ডস্য কৃতে ন যুধ্যেৎ॥"

"প্রভু-পিণ্ডে প্রতিপালিত হইয়া, [বিনিময়ে] যে ব্যক্তি প্রভুর জন্য যুদ্ধ না করে, সে নরাধম যেন সলিল-পূর্ণ, সুসংস্কৃত, দর্ভকৃত-ভূষণ নব শরাবের অধিকারী না হয়, এবং সে যেন নরক-বাসই ভোগ করে।"

প্রদ্যোত নলাগিরি হস্তীটিকে বৎসরাজের পশ্চাদনুসরণে প্রেরণ করিলে, উদয়ন স্বকৌশলে তাহাকেও হস্তগত করিয়া উজ্জয়িনী নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তৎপরে উজ্জয়িনীতে উভয় পক্ষের যোদ্ধৃ-পুরুষদিগের তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্রদ্যোতের অক্ষৌহিণী সেনা ভেদ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ কত হস্তীর, কত অশ্বের, কত যোদ্ধৃপুরুষের নিধন সাধন করিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু প্রতিপক্ষের একটি হস্তীর দন্ত-মুষলে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যৌগন্ধরায়ণের একটি বাহু ভগ্ন হইলে পর, তিনি ভ্রষ্টায়ুধাবস্থায় শত্রু-হস্তে বন্দী হইলেন। পুরুষকারাভাবে নহে, আয়ুধ-দোষে তিনি আজ অরি-করতলগত হইয়া পড়িলেন। আহতাবস্থায় ফলকাসনে বসাইয়া বদ্ধ-বাহু যৌগন্ধরায়ণকে প্রদ্যোত-রাজকুলে আনা হইল। বৎসরাজের দুঃখরজনী আজ প্রভাত হইয়াছে,—সেই জন্য শত্রুহস্তে ধরা পড়িয়াও যৌগন্ধরায়ণ আজ প্রফুল্লচিত্ত। নিষ্কলত্র ব্যক্তির কান্তার-প্রবেশ সুখকর, পূর্ণ-মনোরথ ব্যক্তির বিনিপাত রমণীয়, সঞ্চিতধর্ম্ম ব্যক্তির মৃত্যু অপশ্চাত্তাপ-

কর,—নিজের বুদ্ধিবলে, নীতিকৌশলে, ও পরাক্রমপ্রয়োগে, শত্রুর যশঃ ও সুহৃদ্‌গণের অযশঃ বিলুপ্ত করিয়া যৌগন্ধরায়ণ নির্ভীকহৃদয়ে বলিতেছেন,—

"পশ্যন্তু মাং নরপতেঃ পুরুষাঃ সমগ্রা
রাজাপচার নিয়মেন বিপদ্যমানম্।
যে প্রার্থয়ন্তি চ মনোভিরমাত্য-শব্দং
তেষাং স্থিরীভবতু নশ্যতু বাভিলাষঃ।"

প্রদ্যোতের "প্রবল-পরাক্রান্ত পুরুষেরা, রাজভক্তিবশতঃ বিপন্ন আমাকে এই [বন্ধন] অবস্থায় দেখুক, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আর, যাহাদের মনোমধ্যে অমাত্য-পদ-লাভের আশঙ্কা বর্ত্তমান আছে, আমাকে দেখিয়া তাঁহাদের সেই আশঙ্কা হয় স্থিরীভূত হউক, নয় ত বিনষ্ট হইয়া যাউক"। তৎপরে যৌগন্ধরায়ণকে আয়ুধাগারে রক্ষিত করা হইল। প্রদ্যোতের প্রধান সচিব ভরতরোহক তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কিছুকাল হস্তি-ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা চলিল। পরে ভরত-রোহক যৌগন্ধরায়ণকে বলিলেন যে, মহারাজ প্রদ্যোত আত্মদুহিতা বাসবদত্তাকে অগ্নি সাক্ষী করিয়া উদয়নের শিষ্যা করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার হস্তে কন্যার সম্প্রদান হয় নাই। সুতরাং অদত্তার অপনয়কে তস্কর-বৃত্তি বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। যৌগন্ধরায়ণ উত্তর করিলেন যে, ভারত-কুলোৎপন্ন মহারাজ উদয়ন দার-নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে বাসবদত্তাকে কখনই উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। এমন সময় প্রদ্যোত কঞ্চুকি-মুখে ভরতরোহককে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি সুবর্ণপাত্র প্রদান পূর্ব্বক যৌগন্ধরায়ণের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তৎপরে মহারাজ প্রদ্যোত চিত্রফলকে বৎসরাজের ও বাসবদত্তার প্রতিকৃতি আঁকাইয়া উজ্জয়িনীতে তাঁহাদের বিবাহ-মঙ্গল সম্পন্ন করাইলেন। শোকাভিভূতা মহিষীও আশ্বস্ত হইলেন।

এইরূপে যৌগন্ধরায়ণের নীতি-নৈপুণ্যে বৎসরাজ উদয়নের কারামুক্তি সাধিত হইল।

ক্রমশঃ—

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

যামগাঁর বরযাত্রী।

১

বেশী দিন নয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রায় উনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে। আমরা তখন চাঁপাতলায় অখিল মিস্ত্রীর গলিতে বাস করিতাম। এক দিকে

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী, অন্য দিকে হরেন্দ্রকৃষ্ণ, একটেরে চাটুজ্যে ও তাহারই পার্শ্বে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস লেখক ৺রজনীকান্ত গুপ্তের বাটী। বন্ধুগণের মধ্যে নন্দী সিনিয়র ও জুনিয়র, কালীকৃষ্ণ ও অবিনাশচন্দ্র বসু। অবিনাশের বোধ হয় মামার বাটী। আমাদের বাসাবাটী ঠিক মাঝখানে। অনতিদূরে একঘর ময়রা বাস করিত। সে লোকটা অতি কোপনস্বভাব, এবং চার্ব্বাকদর্শনের বিরোধী। ঘৃতের দরুণ পাঁচ টাকা মোটে দশবার তাগাদা করিয়া না পাওয়াতে হতভাগা ছোট আদালতে আমাদের নামে নালিশ করিয়াছিল। যাহা হউক, অবশেষে আড়াই টাকায় রফা হইয়া যাওয়াতে কাহাকেও সাক্ষী সবুত দিতে হয় নাই। ধীর শান্তিময় জীবনের মধ্যে এই যে একটু তেজস্কর ঘটনা, তাহার শেষ তরঙ্গ লীন হইবার অব্যবহিত পরেই আর একটি উৎসাহময় ঘটনার সূত্রপাত! তাহা বন্ধুবর——— অমুকের বিবাহ। নামপ্রকাশ করাটা যুক্তিসিদ্ধ নয়। তাহাতে গল্পের মাধুর্য্য অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। একে বর, তাহাতে আবার বন্ধুবর। আমরা সকলেই ভাল কয়খানি পোষাকী ধুতি, সার্ট ও চাদর বাঁকু ধোপার করকমলে কাকুতি মিনতি পূর্ব্বক সপ্তদিনের কড়ারে সমর্পণ করিয়া সম্ভাবিত আনন্দস্বপ্নে মগ্ন হইয়া পড়িলাম।

বরের পিতা অতিশয় ব্যগ্রতাসহকারে রজনীকান্ত বাবুকে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রজনী বাবু কানে কিছু কম শুনিতেন! প্রায় তিন ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহাকে বুঝানো গেল যে, রাস্তা অতি সোজা, পেঁড়ো ষ্টেশন হইতে মোটে তিন ক্রোশ, খুব দ্রুতগামী ঘোড়ার গাড়ী প্রস্তুত থাকিবে। পাঁচটার ট্রেণে গিয়া নয়টার মধ্যে ফিরিবার খুব সম্ভাবনা। নিতান্ত পক্ষে রাত্রি বারটা, কিংবা ভোর। খুব দেরী হইলে তাহার পর দিন বেলা এগারটার লুপ মেলে নিশ্চয় যাওয়া যাইতে পারে। না গেলে উপায় নাই। অনেক কথাবার্ত্তার পর রজনী বাবু স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু তিনি ডাবের জল ছাড়া অন্য কোনও জল ব্যবহার করিবেন না, এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করাতে আমরা তিন কুড়ি ডাব বোরাবন্দী করিয়া রাখিয়া দিলাম।

দলটা বেশ পূর্ণ হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ ব্যাধির প্রতীকারার্থ হরি ডাক্তার তাঁহার মেহগ্নির হোমিওপ্যাথিক বক্স আটচল্লিশ রকম ঔষধে সুসজ্জিত করিয়া লইলেন। তখনকার বঙ্গের উদীয়মান কবির কাব্যমুগ্ধ

এবং স্বয়ং কাব্য-রচনা-নিপুণ ভক্তিমোহন জোয়ার্দার মহাশয় বরযাত্রীর মধ্যে এক জন। তিনি আগ্রহপূর্ণ সহাস্য আননে খণ্ডকাব্যের পুঁটুলি, পেন্সিলও নগদ পাঁচ টাকা সঙ্গে করিয়া যখন আসিলেন, তখন সকলের হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। পাড়ার মধ্যে অনেকগুলি লোক ছিল, পূর্ব্বে জানা যায় নাই; কারণ, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের এক জন বিখ্যাত টীকাকারের প্রপৌত্র খুদিরাম মহলানবিশ মহাশয় সেই দিন আত্ম-প্রতিভা প্রকাশ করিয়া এবং সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। অমনই তাঁহাকে বরযাত্রীর ফর্দ্দসাৎ করা গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে গঙ্গারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় বরের 'টোপর' হস্তে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সকলের বাটী গিয়া যাত্রার শুভক্ষণ ঘোষণা করিলেন। তাঁহার হ্রেষারবের আভাস পাইয়া (কারণ, পূর্ব্বদিনের ঘর দস্তরের পরিশ্রমে তাঁহার স্বরভঙ্গ হইয়াছিল!) অনেকে নাসিকানিনাদ ত্যাগ করিয়া সজাগ হইয়া পড়িল। সকলে নিজের নিজের ব্যাগ ও ট্রাঙ্ক লইয়া প্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। যাওয়ার বেশী দেরী নাই। সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে বর ও বরকর্ত্তার সহিত রজনীকান্ত বাবু ও ডাক্তারকে চড়াইয়া দিয়া আমরা থার্ডক্লাসগুলি বাছিয়া লইলাম। কেবল ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মালাকার ও নাপিত, চাটুর্য্যে মহাশয়দের বাটীর গাড়ীতে পূর্ব্বেই স্থিরভাবে আসীন হইয়া হরিনামে ব্যস্ত ছিলেন। আমাকে দেখিতে পাইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, 'বোধ হয় লাহিড়ী মহাশয় এখনও পৌঁছেন নাই।'

বাস্তবিক তাই ত! নচেৎ একটা 'সীট্' এখনও খালি কেন?

আমরা তিন জন তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত। ব্যাপারটা সোজা নয়। প্রায় দশ বৎসরাবধি তাঁহার 'পিরাণ'-গুলি অব্যবহৃত ভাবে পড়িয়া থাকায়, এবং ইতিমধ্যে এ পক্ষে বিরাট বপু ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে, প্রথমটার মধ্যে শেষটাকে প্রবিষ্ট করানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কেবলমাত্র বাকী ছিল একটা পঞ্জাবী, সেটা সেকালের চঙের। কিন্তু তাহাও তিনটি ঘোর অভাববিশিষ্ট। সম্মুখের বোতাম নাই, পশ্চাতে খানিকটা কীটদষ্ট, এবং একটা আস্তীন তাঁহার গৃহিণী সম্প্রতি কাটিয়া লইয়া খোকার 'পাশ বালিসের ওয়াড়ে' পরিণত করিয়াছিলেন। আমরা যখন গেলাম, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের তিনটি পুত্র ও চারিটি কন্যা সকলে মিলিত হইয়া একটা খাটো পিরাণের

মাথা লাহিড়ী মহাশয়ের মাথা হইতে টানিয়া বাহির করিতেছিল। লাহিড়ী মহাশয়ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। এ দিকে গৃহিণী সচন্দন তুলসী ও দূর্ব্বা লইয়া শুভ যাত্রায় মঙ্গলবাণীকণ্ঠে উৎকণ্ঠায় দণ্ডায়মানা। ভৃত্য তৈয়ারী তামাকু লইয়া দ্বারদেশস্থ। আমাদিগকে দেখিয়া সকলেই কিছু ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। লাহিড়ী মহাশয় মস্তকজড়িত বস্ত্রের অন্তরাল হইতে রুদ্ধস্বরে বলিলেন, 'থাক্, আর কাজ নাই, এত গ্রীষ্মে পিরাণ ব্যবহার করা যুক্তিসিদ্ধ নয়।'

অনেক কষ্টে মস্তক বাহির হইলে পর লাহিড়ী মহাশয় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ও উদ্গারাদি দ্বারা প্রকৃতিস্থ হইয়া আমাকে বলিলেন, 'বাবা! পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, এ রকম একটা ব্যাপারে ছেলে ছোকরা ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে কষ্ট সহ্য করা সাধ্যাতীত; যাহা হউক, যখন কথা দিয়াছি, তখন চারা নাই।'

আমি। এমন কথা বলিবেন না, আপনার ন্যায় গণ্যমান্য কুলীন সভাস্থলে উপস্থিত না থাকিলে বিবাহ যজ্ঞই বৃথা।

লাহিড়ী-গৃহিণী আমার প্রতি সজলনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'বাবা! ওঁকে সাবধানে নিয়ে যেও, কখনও পশ্চিমে যান্ নাই, আর প্রাতঃকালে একটু খাঁটী দুধের যোগাড় করিয়া দিও।' আমি বিনীতভাবে সাহসবাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিলাম, 'অবশ্য। আমি যখন আছি, আপনার কোনও ভাবনা নাই।'

ষ্টেশন পর্য্যন্ত কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই; তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গাড়ী পিছাইয়া পড়াতে তিনি যূথভ্রষ্ট হইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে কোচম্যানকে গাড়ী হাঁকাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার জ্ঞান ছিল যে, শিয়ালদহ হইয়া পাণ্ডুয়া যাইতে হয়। বোধ হয়, ইহা লইয়া নাপিত, মালাকার ও কোচম্যানের মধ্যে বহু বাকবিতণ্ডা হয়। তাহা সত্ত্বেও ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বসংস্কার প্রবল ভাবে সকলকে পরাস্ত করিয়া একটা মহা বিভ্রাটের সূত্রপাত করিয়াছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে পথে কোনও ভদ্রলোক তাঁহার ভ্রম দূর করিয়া সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিয়াছিলেন; তাহাতে অর্দ্ধঘণ্টার বেশী দেরী হয় নাই।

হাবড়া ষ্টেশন হইতে রেলগাড়ী ছাড়িয়া দিলে একটা কেমন অনির্ব্বচনীয় স্বাধীন ও উদার ভাব আসিয়া পড়ে! 'যখনকার কথা বলিতেছি, তখন কলি-

কাতার কোনও বাসিন্দা ভদ্রলোক নিতান্ত বিপন্ন না হইলে সহর হইতে এক পদ অগ্রসর হইতে চাহিতেন না। ক্রমে বঙ্গের আকাশ, বঙ্গের ক্ষেত্র ও অস্তমিত রবিকরের মধ্য দিয়া আমরা আটচল্লিশ জন বরপক্ষীয় পুরুষ সন্ধ্যার পর পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে আসিয়া পড়িলাম।

২

যেমন অগ্রহের সহিত যাত্রা করা গিয়াছিল, পেঁড়ো ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া ততোধিক নৈরাশ্য ভোগ করিতে হইল। মোটে একখানি ঘোড়ার গাড়ী ও তিনখানি গোযান ছাড়া বেশী কোনও আয়োজন তখনও হয় নাই। গোযানের ভারপ্রাপ্ত কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকটি আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'এক ঘণ্টার মধ্যেই আসিবে, কোনও ভাবনা নাই'। তখন প্রায় সাতটা। বিবাহের লগ্ন রাত্রি বারোটার সময়। এক জন চটিয়া বলিল, 'মহাশয়, এ কেমন ভদ্রতা? একে ত আমরা গরুর গাড়ীতে পূর্ব্বে কখনও চড়ি নাই, তার পর যদি বা যোগাড় করিলেন, তখন আপনাদের বুঝা উচিত ছিল যে, আটচল্লিশ জন লোক তিনখানা গাড়ীতে ধরা অসম্ভব।' কন্যা-পক্ষীয় ভদ্রলোকটি বিনীতভাবে কহিলেন, 'সম্প্রতি গরুর মধ্যে একটা মড়ক হওয়াতে, অনেক কষ্টেও গাড়ীর গরু পাওয়া যায় না।' কথাটা শুনিয়া ছেলেপুলেদের মধ্যে একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল, 'গরুর মড়ক হইয়াছিল ত বলদের কি?' অন্য কেহ (সক্রোধে), কন্যাপক্ষীয়গণের মধ্যে ভদ্র ও বিজ্ঞ লোকেরও কি মড়ক হয়েছিল?' আমি সকলকে থামাইয়া কহিলাম, 'দাদা, থাম। বিপন্ন হইলে ক্ষমা করিতে হয়।' মড়কের কথা শুনিয়া ডাক্তার 'ইউকেলিপ্‌টস্' তৈলের শিশি হইতে কিঞ্চিৎ তৈল সকলের রুমালে মাখাইয়া অসাবধানতার বিনাশ করিতে লাগিলেন।

গরুর আশায় পথ চাহিয়া অনেকে বসিয়া রহিলেন। কেবল গুরুবর্গ বরকর্ত্তা ও বরের সহিত রওনা হইয়া গেলেন। একখানি শকটে তৈজসপত্র রক্ষা করিয়া আমরা জন কতক পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিলাম। এমন সময় দেখিলাম, অনতিদূরে গ্রাম্য কদলী বৃক্ষের শীর্ষভাগ সহসা আলোকিত, মাঠঘাট স্নিগ্ধ মধুর রশ্মিজালে প্লাবিত ও আমাদিগের গন্তব্য পথ উজ্জ্বলিত করিয়া চতুর্দ্দশীর বৃহৎ চন্দ্র গগনমণ্ডলে উদীয়মান।

কবিবর জোয়াদ্দার মহাশয় অতিগম্ভীরভাবাবিষ্ট হইয়া সেই চন্দ্রোদয় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের টীকাকার খুদিরাম

মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন।

Mohila Press, Calcutta.

মহলানবিশ মহাশয় জোয়াদ্দারের মুখভঙ্গী পর্য্যালোচন করিতে করিতে ধূমপানে রত হইলেন। ঐতিহাসিক রজনী বাবু মাঠের দিকে একটা পুষ্করিণীর পাড়ে চলিয়া গেলেন। অনেকে গলা ছাড়িয়া গান আরম্ভ করিল। গ্রাম্যপথ সঙ্কীর্ণ হইলেও আমরা অতিশয় জেতৃভাবে উৎসাহিত, কারণ সেই পাঁচ ছয় মাইল হাঁটিয়া যাওয়া কি সামান্য বীরের কর্ম্ম! "প্রশস্ত রাস্তায় ত সকলে হাঁটিয়া যায়, কিন্তু সঙ্কীর্ণ রাস্তায় জুতাসহকারে—বিশেষতঃ চটিজুতা পায় কয়টা লোক মাথা সোজা রাখিয়া হাঁটিতে পারে?" হরি ডাক্তারের এবংবিধ উৎসাহবাণীতে আমরা আনন্দে এবং গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া পথকষ্ট ভুলিতে লাগিলাম। ক্রমে পথের মাঝে, মধ্যে মধ্যে কর্দ্দমে পদতল বসিয়া যাওয়াতে অনেকে মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া জুতা খুলিয়া হস্তে লইলেন। জোয়াদ্দার মহাশয় কহিলেন, 'ইহাতে ব্যালেন্স্ থাকে।' ডাক্তার কহিলেন, 'হাঁ, বিপন্ন হইলে মানবজাতির অসাধারণ আত্মরক্ষার উপায়োদ্ভাবনাশক্তি আপনা আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে। জানোয়ার হইলে জুতা লইয়া কর্দ্দমে বসিয়া পড়িত, কিংবা জুতা পরিত্যাগ করিয়া যাইত। এই জন্য শাস্ত্রকার কহিয়াছেন,—"পথে নারী বিবর্জ্জিতা।" ইহাতে খুদিরাম বাবু অনেকটা আশ্বাসিত হইলেন, কারণ শ্রমাধিক্যবশতঃ তিনি একবার দক্ষিণ হস্তে জুতা এবং বাম হস্তে হুকা এবং তাহাই ওলটপালট করিয়া লইতেছিলেন। তামাক পুড়িয়া যাইবার পরে কেহই তাঁহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় নাই। ইহাতে বন্ধুত্বের কোনও অভাব প্রতিপন্ন হয় নাই; কারণ, সে স্থানটি রাজদ্বার, কিংবা শ্মশান, কোনটার অন্তর্গতই নহে।

প্রান্তর জনহীন হইতে লাগিল। একটা শুভ্র পদার্থে মাঠ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ডাক্তার কহিলেন, 'ওটা গ্রাম্যগোশালার ধূম ও চন্দ্রকরস্নাত সদ্যঃশিশিরের মিক্শ্চার, অতীব স্বাস্থ্যকর।' ইহাতে আমরা নাসিকার বস্ত্র উন্মোচন করিয়া গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলাম। বোধ হইল, শরীর তাজা হইতেছে।

কিয়ৎকাল পরে সেই ধূম্রজালের মধ্য দিয়া একটা অট্টালিকার শীর্ষভাগ দৃষ্ট হইল। কি অপূর্ব্ব আশার সঞ্চার! প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের টীকাকার খুদিরামবাবু বলিলেন, 'কি অপদার্থ জীব আমরা! সামান্য পথশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামের স্থল খুজিতেছি! যাহারা আজীবন এই সংসারের দীর্ঘপথশ্রান্ত, তাহারা মরিয়া কোথায় গিয়া বিশ্রাম পায়?' ডাক্তার

কহিল, 'মরিবার কথা যদি বলিলে ভাই, তবে একটা কাহিনী শুন। অক্রুর দত্তের গলিতে সাতকড়ি নামক এক জন বামুনঠাকুর থাকিত। সে যদিও বেদ উপনিষদাদি পড়ে নাই, কিন্তু যে ব্রাহ্মণমণ্ডলী প্রথম বেদের তরজমা করিয়াছিল, তাহারই মধ্যে সে এক জন ব্রাহ্মণের শ্যালক। গতবৎসর শীতকালে কাশরোগে আক্রান্ত হইয়া সাতকড়ি একটা প্রকাণ্ড মোলায়েম লেপ আশ্রয়পূর্ব্বক তন্ময় হইয়া পড়িল। মরিবার কিছুদিন পূর্ব্বে সে বলিয়াছিল, "ডাক্তার! যদি মরি, তবে যেন এই লেপের মধ্যেই মরি। এ লেপ পরিত্যাগ করিয়া আমার কাশীবাস করিবারও ইচ্ছা নাই।" লেপের মধ্যে শীতকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়া যে কি সুখের, তাহা সাতকড়ির জীবনেই বুঝা যায়।'

ক্ষুদিরাম তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, 'এইরূপে জীব ক্রমে বদ্ধ হইয়া পড়ে। কি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী বিরাট মায়া'!

জোয়াদ্দার মহাশয় কহিলেন, 'যে ভক্ত, তাহার সুখদুঃখ সমান। শরশয্যাও ভীষ্মদেবের নিকট কুরুক্ষেত্রে দুগ্ধফেননিভ কোমল।

ডাক্তার বলিলেন, 'জীবজগতে আবর্ত্তনবাদিগণ কহেন যে, যতপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখ ও আরাম সম্ভব, তাহা কোনও সময়ে সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। কেবল দুঃখভোগেই জ্ঞানের উৎকর্ষ হয় না, সুখভোগও তাহার একটি উপকরণ। উভয়ে মিলিত হইয়া যোগনভোগ কিংবা কর্ম্মভোগের আকার ধারণ করে। এই যে গ্রাম্য কৃষকগণ, তাহারাও এককালে চা খাইয়া সিগারেটের ধূমপান করিয়া কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া নবরসপূর্ণ কথাবার্ত্তা ও কবিতায় গা ঢালিয়া দিয়া জীবনের সার্থকতা ও অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিবে। পূর্ব্বের মেজাজ কড়া করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে, সেবা ও দাসত্ব বর্জ্জন করিয়া আমদের মস্তকে আরোহণ করিবে। আমাদিগকে কহিবে, "তোমরা এতদিন বিনা কষ্টে বিনা ব্যয়ে আরাম করিয়াছ, এখন একবার পথ ছাড়িয়া দাও, নচেৎ মাথা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিব।" সকলেরই এক একটা সময় আছে। তখন আমরা বলিতে বাধ্য হইব, "আচ্ছা দাদা, তোমরা এখন লেপের মধ্যে বস, আমরা নিমতলার ঘাটে কাঁধে বহিয়া লইয়া যাই।" ইহারই নাম সৌজন্য ও সভ্যতা।'

রজনী দাদা ইতিমধ্যে আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ডাক্তারের অনুমোদন করিয়া কহিলেন, 'ইতিহাসও ইহাই প্রতিপন্ন করি-

তেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় দেখ, নিম্নগা নদনদীও পল্লী ছাড়িয়া উর্দ্ধে উঠিতে চাহে। বিপ্লবের মূল সূত্রই ইহা।'

জোয়াদ্দার মহাশয় ইহার কাব্য মনে মনে রচনা করিতে লাগিলেন। খুদিরাম বলিলেন, 'ইহার কি কোনও চারা নাই?'

ডাক্তার ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'এটা বিশ্বের কূট নীতি। অধুনাতন মতাবলীর মধ্যে হোমিওপ্যাথিক মতে আমাদিগের পূর্ব্ব হইতে পথ প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত। অর্থাৎ আমরা বলিব, "বৎস বিদ্রোহিগণ! তোমরা পুত্রসন্তানবৎ, আমাদিগের তিন কাল গিয়া শেষকাল উপস্থিত, এখন তোমরা খট্টাঙ্গে বসিয়া হাত পা ছুড়িতে থাক, আমরা ধর্ম্মশালায় কিংবা অরণ্যে গিয়া রোমন্থন করি"।'

সকলেই স্বীকার করিলেন, 'ধর্ম্মতঃ ইহাই ঠিক, নচেৎ পাণ্ডবগণ স্বর্গারোহণ করিবেন কেন?'

রজনী বাবু বলিলেন, 'ভগবান কাহারও পক্ষপাতী নহেন। বাস্তবিক পক্ষে সকলের আকাঙ্ক্ষাও অতি ক্ষুদ্র। আমার ঘোড়া পূর্ব্বে কেবল ঘাস খাইয়া চাট্ মারিত, ক্রমে পুনঃ পুনঃ যব ও ছোলার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াতে অপূর্ব্ব মধুর ও শান্তস্বভাববিশিষ্ট হইয়া সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে লাগিল।'

৩

ডাক্তার কহিলেন, 'লিবারেল ও কন্‌জার্ভেটিভ্ দলের মধ্যে ঐটুকু তফাৎ। কন্‌জার্ভেটিভ আশ্রয় দিতে স্বীকৃত, কিন্তু প্রশ্রয় দিতে চাহে না।'

ক্রমে আমরা কন্যাপক্ষীয় বাটীর সম্মুখীন। রাত্রি প্রায় দশটা। আমরা বোধ হয় খুব গম্ভীর ভাবে চলিয়া আসিয়াছিলাম, কারণ আমাদিগের পশ্চাৎবর্ত্তী গরুর গাড়ীর আরোহিগণও ষ্টেশন হইতে সেই সময়ে আসিয়া নিরাপদে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার কহিলেন, 'হিংসা করার কারণ নাই,, উভয় পক্ষেরই পথকষ্টে লঘেগো হইবার সম্ভাবনা।' কারণ, গরুর গাড়ীতে বিচালি বিছানা প্রভৃতি ছিল না, অতএব সকলেই পার্শ্ববর্ত্তী বাঁশের খুঁটা ও আড়া ধরিয়া দেহের ঋজুভাব রক্ষা করিয়াছিলেন, কেবল লাহিড়ী মহাশয় স্থিতিস্থাপকতার গুণে দেহের সারাংশ রজনী বাবুর ভাবের বোঝার উপর সংলগ্ন করিয়া নিদ্রাদেবীর কোমল-ক্রোড়ে কালযাপন-সুখে নিমগ্ন ছিলেন।

অতি রমণীয় অতিথিশালা। চতুর্দ্দিকে নারিকেল গাছ, তন্মধ্যে দুই একটা সুপারি। সম্মুখে সুন্দর সারি সারি ফুলের চারাগাছ, ফুল থাকিলে অধিকতর শোভনীয় হইত। লাহিড়ী মহাশয় শকট হইতে অবরোহণ করিয়াই কহিলেন, 'বাবা, তোমাদের খপ্পরে পড়িয়া অদ্য চতুর্দ্দশী তিথি, মূলানক্ষত্র, মার্গশীর্ষমাসে আমার জাতি গিয়াছে।' ডাক্তার ইজিচেয়ারে পদ প্রসারিত করিয়া কহিলেন, 'ইহার কারণ?' লাহিড়ী মহাশয় একখানা জলচৌকিতে উপবিষ্ট হইয়া কাতরভাবে কহিলেন, 'ডাক্তার, কন্যাপক্ষীয়গণ এতাধিক বিবেকহীন যে, বলদের অভাবে দুগ্ধবতী গাভীদ্বয়কে শকটে জুড়িয়া এই তিন ক্রোশ রাস্তা আমাদিগকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে।' রজনীবাবু কিঞ্চিৎ চিন্তাযুক্ত হইয়া কহিলেন, 'ইহা দেশের গৌরবের কথা। এই সংসার-রথ যখন স্ত্রীলোকেই টানিতেছে, তখন গাভী দ্বারা শকট-চালন যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা কেমন করিয়া বলিব? ইহা উন্নতিক্রমে বুঝিতে হইবে।' ইহা লইয়া উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী মনু ও পরাশর প্রভৃতির বচনের আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে আমরা পদ ধৌত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'জলযোগের বিলম্ব কত?'

কন্যাকর্ত্তা সাদরে কহিলেন, 'জলযোগের সকলই প্রস্তুত, তবে বিবাহের লগ্নের অধিক দেরী নাই, এখন যজ্ঞস্থানে আপনারা উপস্থিত হইয়া অনুমতি প্রদান করিলে উভয় কর্ম্মই সম্পন্ন হয়।' 'উভয় কর্ম্মটা' কি, তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কন্যাদানের স্থানেই কি জলখাবারের আয়োজন হইয়াছে?' লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন, 'এটা শাস্ত্রসঙ্গত নয়, বিশেষতঃ স্ত্রী-আচারের সময় অন্তঃপুরে বরকে লইয়া গেলেই তৎক্ষণাৎ কলার আরম্ভ। এই প্রকারে একবার জলযোগ, একবার কলার, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত; এইরূপ নানাবিধ উৎপাত বিঘ্নসঙ্কুল এবং শ্রমসাপেক্ষ। অতএব আমরা অপাততঃ ডাবের জলমাত্র পান করিয়া সভায় যাইতে চাহি।'

লাহিড়ী মহাশয়ের স্ত্রীর অনুনয়-বাক্য স্মরণ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে খাঁটী দুগ্ধ পাওয়া যায় ত?' কন্যাকর্ত্তা কহিলেন, 'এটা গরুরই দেশ, প্রায় বার মন টাট্‌কা ক্ষীর নূতন গুড় দিয়া প্রস্তুত হইতেছে।' ইহাতে আমাদিগের মুখ-গহ্বর জলাকীর্ণ হইয়া উঠিল। লাহিড়ী মহাশয় দুঃখ-আননে কহিলেন, 'যে গরু গাড়ীতে জুড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহার বৎস

সমভিব্যাহারে থাকিলে পথেই দোহন করিয়া লইতাম'। কন্যাকর্ত্তা সলজ্জে কহিলেন, 'পূর্ব্বে সংবাদ পাই নাই, মার্জ্জনা করিবেন, যেরূপ দোহন অগ্রেই করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে আর সাহস হয় নাই।' ডাক্তার চটিয়া কহিলেন, 'কি? বামগাঁর———বাবু কি কন্যার আভরণ পাঁচ হাজার মাত্র দিয়াই দোহনের দোহাই দিতেছেন? এ রকম পাত্র কি দশ হাজার টাকায় মেলে?' আমি বলিলাম, 'যাক্, ও সব কথায় কাজ নাই, এখন সভাস্থ হওয়া যাউক। কুটুম্বের সহিত প্রথম হইতেই বিবাদ অতিশয় অমঙ্গলজনক।'

সভামণ্ডপ অতিযত্নে সুসজ্জিত। সমাগত কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকগণের মধ্যে কন্যাকর্ত্তার শ্যালক দুইটি উল্লেখযোগ্য। শ্যালক নং ১ অম্বুরূপবাবু চিররুগ্ন। অম্লরোগই তাহার প্রধান কারণ। রোগাধিক্যবশতঃ দেহের মধ্যে মুখখানিই সর্ব্বপ্রধান। বড় বড় চক্ষু, নাসিকা ও গোঁফ প্রথম পরিচয়স্থল। সর্ব্বদা জাগ্রত, এবং সাক্ষিস্বরূপ স্থিরভাবে রাজধানীর পাহারাওয়ালার ন্যায় স্বীয় পদপ্রতিষ্ঠিত। বামহস্তের সহিত গোঁফের অতিশয় সখ্যভাব। দুই একবার বাক্যালাপ করিয়াই ডাক্তার তাঁহার 'পেশেণ্টে'র নাড়ীনক্ষত্র বুঝিয়া লইলেন। খুদিরাম মহাশয় শ্যালক নং ২ ভূতনাথের সহিত ভাবে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। ভূতনাথ বাবু তাঁহার স্ত্রীবিয়োগের পর আর বিবাহ করেন নাই। সংসারের প্রতি বৈরাগ্যভাব প্রত্যেক মিনিটে মিনিটে দীর্ঘনিঃশ্বাসে ব্যক্ত। 'দাদা! তেমনটি আর হবে না। কেন যে আসে, কেন যে মরমে ব্যথা দিয়া চলিয়া যায়, তাহার কোনও তথ্য জান?' খুদিরাম বলিলেন 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের টীকায় ইহার সবিশেষ আলোচনা পাইবেন। স্ত্রী-বিয়োগ একটা মহাপ্রলয়ের লক্ষণ। সতীর দেহত্যাগে মহাদেবের উন্মাদ অবস্থা তাহার প্রমাণ।' জোয়াদ্দার মহাশয় কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, 'এটা একটা মহাকাব্য বই আর কিছুই নহে। মরণটাই একটা কাব্য, এবং জীবন-সঙ্গিনীর মরণ সকল কাব্যের শীর্ষস্থানীয়।'

শ্যালক নং ১ প্রকাণ্ড গোঁফ বাম হস্ত দ্বারা অপসৃত করিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন, 'দাম্পত্য জীবন যে কাব্যের অন্তর্গত, তাহা আমি স্বীকার করি; তাহার অভাব যে মহাকাব্য, তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহার কপালে অস্তিত্ব ও অভাব এক সঙ্গে, যেমন আমার মত অম্লরোগীর, তাহার বিধান কি? কি বল ডাক্তার?' ডাক্তার আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, 'আপনার কোনও ভাবনা নাই; যে ঔষধের কথা বলিলাম, তাহাতে আপনি

নবীন বল পাইবেন, নূতন রক্তকণার সঞ্চার হইবে। ইহার একটা কাহিনী আপনাদিগকে বলি। যখন বিহারী ভাদুড়ী মহাশয় বাঁচিয়া, এবং শম্ভু মুখুর্য্যে মহাশয় অসাধারণ জোরের সহিত 'রয়িস ও রাইয়ত' নামক সংবাদ-পত্র এবং 'মুখুর্য্যের ম্যাগাজিন' নামক পত্রিকায় 'কেরাণীজীবনের স্মৃতি' নামক প্রবন্ধ বাহির করিতেছিলেন, তখন মাণিকতলা ষ্ট্রীটে 'হিন্দু ফ্যামিলী এনুইটী ফণ্ডে'র এক জন কেরাণী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে গিয়া ভূমিতলে লুটাইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। লোকটার মাসাবধি নানাবিধ সংবাদ-পত্রে ফ্রাঙ্কোপ্রুসিয়ার যুদ্ধবার্ত্তা পাঠ করিয়া অতি উৎকট শিরঃপীড়া সঞ্চিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বভাবসিদ্ধ ভৎসনাপূর্ব্বক বলিলেন, 'বাঙ্গালীর ছেলের সংবাদপত্র পড়া উচিত নয়, তার পর আবার যুদ্ধের খবর! তোমার আসন্ন দুরবস্থা! ইহার উপায়—কেবল গোলমরিচ দগ্ধ করিয়া তাহার ধূমগ্রহণ।

'ঔষধের গুণে লোকটার মস্তকের অভ্যন্তর পূর্ব্ববৎ শ্লেষ্মাবিহীন হইয়া বলীয়ান হইয়া পড়িল। তাহার পর সে কেবল মাসিকপত্র, এবং তাহারও মধ্যে কেবল মিঠা গল্প স্বল্পপরিমাণে পাঠ করিত। আমার বেশ বিশ্বাস যে, মিঠা গল্প অনেকটা 'সানাটোজোনে'র মত ফলদায়ক। মধ্যে সারপদার্থ না থাকিলেও আমাদিগের অসামান্য দৌর্ব্বল্যের গুণে সারবান হইয়া পড়ে।'

খুকিরাম ইহার অনুমোদনপূর্ব্বক কহিলেন, 'যেমন সংসার। সংসার যে সম্পূর্ণ অসার, তাহা শাস্ত্রে প্রকাশ। অথচ এই অসার সংসারেই মানবের মুক্তি ও উন্নতির পথ। এই যে বিবাহ-লীলা, এটা কি?'

এই প্রকার কথাবার্ত্তায় অবলীলাক্রমে সময় কাটাইয়া ক্রমে আমাদিগের ক্ষুধানল প্রজ্বলিত হইয়া পড়িল। এমত সময় লাহিড়ী মহাশয় আনন্দসহকারে সংবাদ দিলেন,—'পাতা পড়িয়াছে।' এই মহা সুসমাচার সভামণ্ডলীতে প্রচারিত হইবামাত্র জড় ও নির্জ্জীব হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। যাহারা তন্দ্রার বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণবায়ুর সহিত মস্তকের সাহায্যে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারা সহসা সজাগ হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ, যুবা, বালক, বালিকা ও ভৃত্য,—সকলেরই অসামান্য উৎসাহ। বামগ্রামের লুচি ও ক্ষীর বিখ্যাত। বিজ্ঞান, ইতিহাস ও কাব্যসাহিত্যাদির সম্পূর্ণ উল্লেখ-যোগ্য বিষয়।

সেই উনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার খাঁটী ঘৃতে ভাজা লুচি ও বেগুন, এবং

খাঁটী গব্য ক্ষীর! সে অপূর্ব্ব সামগ্রী এখন কোথায়? তোমরা এখন তাহা পরিপাক করিতে পারিবে না।

৪

'একটা কথা বড় সমস্যাপূর্ণ। মানব আবর্ত্তনের পথে ক্রমে বৃক্ষ হইতে নিম্নে অবরোহণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে শয়ন এবং আহারাদির বন্দোবস্ত কেন করিয়াছিল, তাহার কোনও সম্যক উত্তর পাওয়া যায় না।'

ডাক্তারের এবংবিধ জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় খুদিরাম মহলানবিশ মহাশয় বলিলেন, 'একত্র বসিয়া সামাজিক আহার সম্বন্ধে কোনও মৌলিক তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বানরের স্থায় বৃক্ষে বসিয়া দলবদ্ধ মানবের পক্ষে সামাজিক আহার অসম্ভব। আমরা নানাবিধ খাদ্য খাইয়া থাকি। বৃক্ষে বসিয়া তাহার ফলমাত্র বানরগণ আহার করে। আমাদিগের রন্ধনশালা চাহি। আবার ভাবিয়া দেখুন যে, পরিবেশনের সময় এক ডাল হইতে অন্য ডালে খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করা কি কঠিন ব্যাপার!' ডাক্তার বলিলেন, 'পূর্ব্বপক্ষে তাহাই, কিন্তু সভ্যতার বিকাশে আহারের সময় দম্পতী অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়া থাকে, সেটাও একটা কারণ। যাহারা দ্বিতল অট্টালিকায় টেবলে বসিয়া, কাঁটা ও চামচের সাহায্যে বানরগণের অনুকরণ করে, তাহাদিগের সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। আমার বোধ হয়, কোনও আদিমকালে প্রথম বৃক্ষচ্যুত বন্য মানুষের দল নন্দনকানন হইতে বিদায় লইয়া ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়াছিল। সেই সনাতন পরিব্রাজকগণ দগ্ধ এবং সিদ্ধ পক্কান্নের প্রবর্ত্তক। প্রত্যেক জাতিরই আহার-কালের 'মেনু' (খাদ্য-তালিকা) পরীক্ষা করিলে অনেকটা মর্ম্ম বুঝা যায়। যথা :—

১। কদলীপত্র ভূপৃষ্ঠে বিস্তার। তদুপরি উপবেশন, এবং অন্য এক খণ্ডে আহার্য্য-পরিবেষন। ইহা সনাতন পূর্ব্বসংস্কার।

২। শাক সবজী সিদ্ধ এবং লবণাক্ত। দ্বিতীয় যুগের।

৩। ছ্যাঁচড়া, ভাজা প্রভৃতি। তৃতীয় যুগের।

৪। লুচির সহিত তাহাদিগের শুভসংযোগ। বৈদিক যুগের।

৫। মিষ্টান্ন ও ক্ষীর। তৎপরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগের।

সমাজের জটিলতার সহিত আহারের বিচিত্রতা যে নানাপ্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়।'

অম্লরোগগ্রস্ত অনুরূপ' বাবু দণ্ডায়মান হইয়া কাহার কি দরকার তাহা সেনাপতির ন্যায় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। ভূতনাথের পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর হস্তের মুখরোচক খাদ্যাদির কথা এই সময় স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তদীয় চক্ষু অপর্য্যাপ্ত জলভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। শ্যালক নং ১ অনুরূপ বাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'ভূতো! ছি! কচ্চিস্ কি? আমার ত থেকেও সেই দশা। অম্লরোগেই আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে।"

এমন সময় আহারমণ্ডপে মহাকোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল। লাহিড়ী মহাশয় প্রায় বত্রিশ খুরি ক্ষীর সাবাড় করিয়া চীৎকারপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভয়ানক অন্যায়। আমার পার্শ্বেই এক জন রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণ বসিয়া! এ কথা পূর্ব্বে বলা উচিত ছিল। জাতি ত গিয়াছেই, অপিচ যাহা খাইয়াছি, তাহা পরিপাক হওয়া দুষ্কর। কন্যাকর্ত্তার এই অপমানের কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত।'

সকলে স্তম্ভিত! বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ! কন্যাকর্ত্তা গলবস্ত্রে নিবেদন করিলেন, 'সমস্ত জিনিসই রাঢ়ী ব্রাহ্মণের দ্বারা এ দেশে রন্ধন করা হয়, এবং পূর্ব্বাপর নিয়মানুসারে সকলে একত্র বসিয়া আহার করেন।'

লাহিড়ী মহাশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, 'পাক করায় কোনও দোষ নাই। অভাবে আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের একত্র বসিয়া আহার নীতিবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ। প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন এ দোষ মিটিতে পারে না। আপনারা কি বলেন?'

বরযাত্রিগণ তাহাতে সায় দিয়া দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন সময় ডাক্তার গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'আপনারা কেহ উঠিবেন না। আমি ইহার মীমাংসা করিয়া দিতেছি।'

ডাক্তার বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। 'বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের একত্র বসিয়া আহার করার প্রধান বাধা কীটাণুসঞ্চার। সকলের শরীরেই এক এক জাতীয় ব্যাক্‌টীরিয়া কিংবা কীটাণু বর্ত্তমান। ইহাতে নানা রোগের সঞ্চার হয়। ডাক্তার লিষ্টার কর্তৃক নবপ্রবর্ত্তিত প্রণালী অনুসারে আমরা অস্ত্রচিকিৎসা কালেও যন্ত্রগুলিকে নানাবিধ অ্যান্‌টিসেপ্টিক দ্বারা ব্যাক্‌টীরিয়া-শূন্য করিয়া লই। নচেৎ রোগীর দেহ সেপ্টিক্ বিষ দ্বারা

পরিপূর্ণ হইয়া যায়। অধ্যাপক মোক্ষমূলর-কথিত মধ্য-এসিয়ার বিজ্ঞ আর্য্যগণ বর্ণাশ্রমস্থাপনকালে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, আহার ও বিহারাদিকালে একটা কিছু অ্যাণ্টিসেপ্টিক ব্যবধান না থাকিলে প্লেগ প্রভৃতি রোগে আর্য্যাবর্ত্ত পরিপূর্ণ হইয়া পড়িবে। সকলেই বোধ হয় জানেন, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ ও বাম হস্ত কিংবা উরুদেশ হইতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এবং পদতল হইতে শূদ্রের উৎপত্তি। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার শরীরও যে ব্যাকটীরিয়া-পরিপূর্ণ, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের মুখরোগ, ক্ষত্রিয়ের দক্ষিণ হস্ত, বৈশ্যগণের উরু ও শূদ্রের পদরোগ প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণদের মুখের কাছে দাঁড়ানো যেমন অসাধ্য, ক্ষত্রিয়ের দক্ষিণ হস্ত, বৈশ্যের বাম হস্ত এবং শূদ্রের পদাঘাত ততোধিক গুরুতরভাবাপন্ন। এই জন্য পূর্ব্বকালে নিয়ম ছিল যে, ব্রাহ্মণগণ মৌনী হইয়া আহার করিবেন, এবং অন্যান্য জাতিগণ দূরস্থ হইয়া স্বীয় দুর্ব্বল স্থান নানাবিধ উপায়ে আচ্ছাদন করিয়া আহার কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। দক্ষিণ হস্ত আচ্ছাদন করা অসম্ভব বিধায় ক্ষত্রিয়গণ তরবারি ব্যবধান রাখিয়া কার্য্যসমাপ্তি করিতেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ কুশব্যবধান দ্বারা বিজাতীয় ব্যাকটীরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও যখন আচার ব্যবহারের ভেদ লক্ষিত হইতে লাগিল, তখন কুশের বদলে বংশখণ্ডের ব্যবধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ক্রমে চটিজুতা প্রচলিত হওয়াতে বংশখণ্ড অপ্রচলিত হইয়া পড়িল। অশোকের কিংবা মহীপাল নামক রাজার নবাবিষ্কৃত তাম্রলিপিতে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, যাঁহারা চটিজুতা পরিধান করিয়া বল্লালসেনের বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই রাঢ়দেশীয়। যাঁহারা কাষ্ঠপাদুকা-পরিধৃত, তাঁহারা মৌলিক বারেন্দ্র। তাম্রলিপি বলিতেছে, 'কি সুন্দর সভা! সারি সারি কাষ্ঠপাদুকা এবং চর্ম্মপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা এবং কাষ্ঠপাদুকা। কাষ্ঠ চর্ম্মের ব্যবধান, চর্ম্ম কাষ্ঠের ব্যবধান!'

মনে করুন, কত শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে। নদনদী শুষ্ক হইয়াছে। বৃক্ষাদি পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মানবীয় আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনের সহিত পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া ব্যবধান-প্রণালী এখন পদেই বর্ত্তমান। যে ব্যক্তি যেমন পদারূঢ়, তাহার ব্যাকটীরিয়াও তদৈব গণ্যমান্য। অতএব কোনও মীমাংসা সিদ্ধান্ত করিতে হইলে প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য—'মহাশয় কি করেন?'

ডাক্তারের বচন সকলের হৃদয়গ্রাহী হওয়াতে সকলে ঔৎসুক্যসহকারে লাহিড়ী মহাশয়ের পার্শ্বদেশস্থ রাঢ়ীব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়ের নিবাস! মহাশয়ের কি করা হয়?' ইত্যাদি। লোকটি অতিধীরভাবে কহিলেন, 'আমার নাম ——চাটুর্য্যে। বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত সাকনাড়া গ্রামে আমার নিবাস। আমি ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম। এখন পেন্সন-ভোগী।'

পরিচয় পাইয়া লাহিড়ী মহাশয় একেবারে স্তম্ভিত।—'বলেন কি? আপনি —চাটুর্য্যে মহাশয়? অহো কি সৌভাগ্য! আমার পিতাঠাকুর আপনারই অনুকম্পায় সেই প্রসিদ্ধ দাঙ্গার মোকদ্দমায় খালাস পাইয়াছিলেন। নমস্কার! মার্জ্জনা করিবেন। পূর্ব্বে চিনিতে পারি নাই।'

সকলে অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হইয়া মহোল্লাসে উচ্চধ্বনিসহকারে কহিল, 'অতিসুখের কথা। লুচি,—গরম লুচি দ্বিতীয়বার পরিবেশন কর, ক্ষীর আন।' 'উৎকণ্ঠায় ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, ইহা স্বাভাবিক। সিপাহীবিদ্রোহের সময়, কিংবা বর্গীর হাঙ্গামার সময় লোকে দ্বিগুণ আহার করিত।'—ঐতিহাসিক রজনী বাবু এই তথ্য প্রচার করিয়া পুনরায় গণ্ডূষ করিয়া বসিলেন। অনুরূপ বাবু—শ্যালক নং ১ অতি দক্ষতাসহকারে পুনঃপুনঃ ক্ষীর ও লুচি সংগ্রহ করিয়া সকলের আগ্রহ মিটাইতে লাগিলেন। বোধ হয়, এতাধিক পরিমাণে প্রত্যেক লোকের আহার কোনও বিবাহক্রিয়ায় ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে ঘটিয়াছিল কিনা সন্দেহ।

৫

অতিশয় গুরুতর আহার করিলে কেমন একটা নিঃসহায় ভাব আসিয়া পড়ে। একটা কি রকম বিপদের আশঙ্কা হয় উপস্থিত হয়। যেন সংসারে আমাদের কোনও দাবী দাওয়া নাই, বল নাই, উদ্যম নাই, আশা নাই। বোধ হয়, সেই জন্য শাস্ত্রে অতিশয় আহার নিষিদ্ধ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই জন্য আহারের পরে একটু মদিরার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। হঠাৎ একটা লোক গুরুতর আহার করিয়া কাবু হইয়া পড়িলে জড়তার প্রাবল্যবশতঃ নৈতিক জগৎ ম্লান ও শীর্ণ হইয়া যায়।

গভীর রাত্রি তখন। শয়নের বন্দোবস্ত সুচারু হইলেও আমরা অনেকটা সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় শয্যাগত হইলাম। অনেকের শয়ন করিবার শক্তি ছিল না। ক্ষুদিরাম কহিলেন, 'বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু প্রাতঃকালে ট্রেন

অসম্ভব। যে রকম আহার করা হইয়াছে, তাহাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নিদ্রাদেবীর চক্ষুর ত্রিসীমায় পদার্পণের কোনও আশা নাই। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে বিবেকচূড়ামণি কহিয়াছেন,'কোনও পাপক্রিয়া সাধিত হইলে বিবেকের উদয় হয়। পুণ্যকর্ম্মে অহঙ্কারের উদয়। "আমি অমুক পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছি," এটা স্বাভাবিক দর্পের কথা। কিন্তু "এত অধিক আহার করাটা অন্যায় হইয়াছে," এটা দর্পচূর্ণের কথা। বোধ হয় একটা আসন্ন ভীতি এই ঘরে উপস্থিত।" এমত সময়ে জোয়াদ্দার মহাশয় বলিলেন—

'বিশাল বিশ্বে চারি দিক হ'তে
প্রতি কণা মোরে টানিছে—'

কবিবরের মুখ ও তদানুষঙ্গিক জিহ্বা ও গহ্বরাদি শুষ্ক। কথা অতি ক্ষীণ। ডাক্তার নাড়ী টিপিয়া কহিলেন, 'শীঘ্র হোমিওপ্যাথিকের বাক্স আন। ডাক্তার বেলের মতে এটা ড্রাই সিক্কা কলেরার পূর্ব্বলক্ষণ।'

নিমিষের মধ্যে এক ডোজ্ আর্সেনিক জোয়াদ্দার মহাশয়ের গলায় ঢালিয়া দেওয়াতে কবিবর 'কয়ংক্ষণ পরে কহিলেন, 'আমি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছি, কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে—আমি যেন মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছি, যেন এই দেহরূপ অন্ধকারের কারাগার ভাঙ্গিয়া প্রাণপাখী ঊর্দ্ধের উদ্দেশে পক্ষপুট বিস্তার কচ্ছে। কি উদার মুক্ত বায়ু! কত শতাব্দীর, হয় ত কত জন্মের হৃদয়ের বাধার চাপগুলি ভাঙ্গিয়া, চূর্ণ হইয়া, শিহরিয়া, হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া, কম্পিয়া, গগনমণ্ডলে বিকীর্ণ হইতেছে!'

এবংবিধ উচ্ছ্বাস-দর্শনে আমরা চট্ করিয়া অন্য একটি ঘরে যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। ইতিমধ্যে গোল উঠিয়া গেল,—'বরযাত্রিগণের মধ্যে এক জনের কলেরা হইয়াছে।' ক্রমে কন্যাযাত্রিগণ এবং বরযাত্রিগণের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ বস্ত্রের পুঁটুলি ও ব্যাগ প্রভৃতি লইয়া রোমনগরীধ্বংস-কালীন নিষ্কাসিতের ন্যায় গ্রামের মাঠ পার হইয়া ষ্টেশনে চলিয়া গেল। কন্যাকর্ত্তার বাটীর কেহ আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট গৃহের দিকে আসিল না। নীরব, নিস্তব্ধ প্রান্তর। কেবল কবিবর ও জন কতক আমরা বসিয়া। অন্ধকার ভেদ করিয়া এক জন ভৃত্য আসিয়া আমাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'অবস্থা কি রকম?' আমি ইঙ্গিতে অথচ ভয়কাতরস্বরে কহিলাম, 'এখন চতুর্দ্দশপদী চলিতেছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ।' ভৃত্য এবং তৎপ্রমুখ ভৃত্যকুল তাহা শুনিয়া এক দৌড়ে মাঠ পার হইয়া গেল।

জোয়াদ্দার মহাশয় 'আর্সেনিকে'র তৃতীয় ডোজ্ খাইয়া বলিলেন--

"সুদুর্গম দূর দেশ—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ—
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি,
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা'পরে
জরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে'—
চারি দিকে শৈলমালা"—

এমত সময় বাতায়ন-পার্শ্ব হইতে 'মা গো!' নামক ভীতি-শব্দ করিয়া একজন কে দৌড়াইয়া গেল।

খুদিরাম বলিলেন, 'বাগীশ্বর! বোধ হয়, কোনও স্ত্রীলোক দয়াপরবশা হইয়া রোগীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।' পরে তদন্ত করিয়া দেখা গিয়াছিল, ঠিক তাই। তিনি এক জন বৃদ্ধা; নাম শৈলবালা।

ডাক্তার তখন হাস্যসহকারে কহিলেন, 'লাহিড়ী মহাশয়, এখন বেশ করিয়া ঘুমাও। তিনটি গৃহ শয্যাপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ, প্রহরিশূন্য। তামাক সাজিয়া ফেল। শেষ টান দেওয়া যাউক।'

বাস্তবিক জোয়াদ্দার মহাশয়ের অঙ্গভঙ্গী ও 'ট্রান্সেন্ডেন্টেল' ধরণের কবিতার আবৃত্তির গুণে এত সুফল প্রসব করিবে, তাহা পূর্ব্বে লেশমাত্র মনে স্থান পায় নাই। জোয়াদ্দার মহাশয় মুখব্যাদান করিয়া বলিলেন, 'দাদা, কবিতা বুঝিবার শক্তি এখনও বাঙ্গালীর হয় নাই! নচেৎ এই সুন্দর উচ্ছ্বাসটাকে তাহারা মরণ-ডাকের সামিল করিয়া লইল! কি দুর্দ্দশা দেশের! অহো কি পরিতাপ!'

জোয়াদ্দারের সঙ্গে আমিও সন্ধ্যাকালে একটু সিদ্ধি খাইয়াছিলাম। ক্রমে শেলী ও টেনিসনের নূতন কাব্যগুলির সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের কাব্যগুলির সমালোচনায় বসিয়া গেলাম।

ডাক্তার বলিলেন, 'ক্লাসিক্যাল কাব্যের সহিত কমিউনিস্টিক কাব্যের একটু প্রভেদ আছে। সেকালের কবিতার জীবন সেকালেই ছিল, এখন কেবল তাহার বৃহৎ কঙ্কাল দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। একালের কবিতার দেহ খর্ব্ব, কিন্তু ব্যাসিলির মত সজীব, তীব্র ও শক্ত। এমন কি, লাগিয়া গেলে এক মিনিটে বেড় লক্ষাধিক অণু প্রসব করিতে পারে। সেকালে দময়ন্তী বনে গিয়াছিলেন; তাহাতেই সকলে কাঁদিয়া আকুল! একালে লক্ষ

লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে অনাহারে মরিলে চিন্তায় কেবল শোণিতকণা শুষ্ক হইয়া যায়। সেকালে একটা মাছি অন্নে বসিলে একটা মহাকাব্যের বিষয় হইয়া পড়িত; এখন ড্রেন হইতে কুরুক্ষেত্রের সৈন্যের ন্যায় অর্ব্বুদ মক্ষিকা অন্ন-ব্যঞ্জন ছাইয়া ফেলিলেও কৈফিয়ৎ দিবার লোক নাই।'

ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইতে লাগিলাম। যদিও ঠিক নিদ্রা হয় নাই, কিন্তু তাহার অভাব স্বপ্নে মিটিয়াছিল। স্বপ্নটা সুখস্বপ্ন। লুচি ও ক্ষীরের স্বপ্ন। দেখিলাম,—সেই উপাদেয় আহার্য্য প্রত্যেক দৈহিক পরমাণুর জন্য ব্যয়িত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই ঘৃতপক্ব লুচি ও পবিত্র ক্ষীর পাকস্থলীতে অভিনব আকার ধারণ করিল। ক্রমে রক্তকণায় পরিণত হইল। সেই রক্তকণা শিরায় শিরায় সঞ্চালিত হইয়া আনন্দময়ী মাতার স্তন্য দুগ্ধের ন্যায় প্রত্যেক ক্ষুধিত শীর্ণ সন্তানকে বলীয়ান করিয়া তুলিল। প্রত্যেক কণা আনন্দ-নৃত্যে মত্ত! আমি তখন কে? দুর্ভাবনাশূন্য বৃদ্ধ জনকের ন্যায় নিদ্রার দ্বারে। অন্তর্জগতের সেই বিশাল আনন্দকোলাহল বীণাধ্বনির ন্যায় যেন নিভৃত গুহাভ্যন্তরে সঞ্চারিত। মুহূর্তের জন্য আমি জরামরণ-বর্জ্জিত মুক্তাত্মা।

বহরমপুরের মোলায়েম বালাপোষখানা আস্তে ব্যস্তে টানিয়া লইয়া মুড়ি দিয়া পড়িলাম।

বেলা আটটার সময় নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিলাম,—কন্যাপক্ষীয়গণ মহাব্যস্ত! 'সেই রোগীটি কেমন আছেন?' ডাক্তার কহিলেন, 'হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অদ্ভুত ব্যাপার। বিংশ শতাব্দীর অস্ত্রশস্ত্রের কাটাকাটির জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যে এমত শান্তিকর পদার্থ আর নাই। মরিয়া গেলেও কোনও ভয় নাই। নির্ব্বিঘ্নে মরণ সকলের কপালে ঘটা ভবিষ্যতে দুষ্কর হইয়া পড়িবে; অতএব এই বেলা হইতে আপনারা সকলে একটা বাক্স কিনিয়া রাখুন।'

বাস্তবিক, জোয়াদ্দার মহাশয়ের আরোগ্যলাভে উভয় পক্ষের কুটুম্বিতা আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া গিয়াছিল। ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও কেমন যেন একটা মায়া আমাদিগকে সেই বিবাহ-রাত্রির স্মৃতির সহিত আজীবন বদ্ধ করিয়াছিল। ইতি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রহস্য।

মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র কিরূপ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণেই না রঞ্জিত করিয়া জগতের চিত্রশালায় স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন! মেকলের প্রবল লেখনী সে চিত্রে যে কালি লেপিয়া গিয়াছে, তাহা মুছিয়া ফেলা সহজ কথা নয়। পরবর্ত্তী ইংরেজ লেখকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও ক্লাইবের ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের চিত্র হইতে মেকলে-নিক্ষিপ্ত কয়েক ফোঁটা কালি তুলিয়া ফেলিতে পারিতেছেন না। সুতরাং দুর্ব্বল বাঙ্গালীর আর কি ভরসা ছিল! কিন্তু চাহিয়া দেখ, সভ্য জগতে আজ বাঙ্গালীর মুখকান্তি কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! রবীন্দ্রনাথের কাব্য শ্রেষ্ঠ কাব্যের জন্য 'নোবেল' পুরস্কার জিতিয়া আনিয়া, যে সকল জাতির প্রতিভা সভ্য সমাজে শিক্ষা দীক্ষার নব আলোক নিত্য বিতরণ করিতেছে, এক টানে বাঙ্গালীকে সেই জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে উত্তোলিত করিয়াছে। ধন্য বাঙ্গালী!

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এই সম্মান এ দেশের লোকের নিকট একেবারে অভাবনীয় নহে। কেন না, রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে বর্ত্তমান সভ্য জগতের কাব্যকলার মধ্যে অতি উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য, এ কথা, কোনও কোনও বাঙ্গালী মনীষী কিছু দিন হইতে বলিয়া আসিতেছেন। এ দেশের এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিশেষ আদরের বস্তু। এখনকার অধিকাংশ পদ্য-লেখক এবং অনেক গদ্য লেখক রবীন্দ্রনাথের রচনাকে পদ্য-গদ্য-রচনার চরমোৎকর্ষ জ্ঞান করিয়া নিয়ত তাহার অনুকরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালার পাঠক সাধারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্য রসাস্বাদে সমর্থ হইয়াছে কি? আমার মনে হয়, না। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান, কোনও কোনও কবিতা, এবং কোনও কোনও কথা বাঙ্গালীর প্রাণ স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই সকল রচনার জ্যোতিঃ চঞ্চলা তড়িল্লতার মত নিমেষের তরে জীবনের অন্ধকার দূরীকৃত করিয়া আবার যেন নিবিয়া যাইতেছে; স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না। এই জন্য দোষী কে? দোষী রবীন্দ্রনাথের কাব্য, রবীন্দ্রনাথের অনুকরণকারী ভক্ত, এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে উদাসীন বাঙ্গালা গ্রন্থের পাঠক। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের দোষ—তাহা অতীতের বা বর্ত্তমানের দর্শন-ভূয়োদর্শনের, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, রচনা-রীতির ও অলঙ্কার শাস্ত্রের মুখে সোজাসুজি সাধা বলে,

তাহা এক অপূর্ব্ব বস্তু। অনুকরণকারিগণের দোষ—তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের রচনার দোষের ভাগকে নিত্য নব নব ভাবে উদ্‌গিরণ করিয়া উহার গুণের ভাগের সম্মুখে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর ক্রমশঃ উচ্চ—উচ্চতর করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। আর যাঁহারা উদাসীন, তাঁহাদের দোষ—তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলা একটু কষ্টস্বীকার করিয়া সমগ্র ভাবে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া মুরুব্বিয়ানা করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবত্তা স্বীকার করিয়া, তাঁহার কাব্যকে অস্পষ্ট বা অশ্লীল বলিয়া সরাসরি বিচার করিয়া সাহিত্যের এজলাস হইতে সরাইয়া দিতে চাহেন। ইহার উপর রবীন্দ্রনাথের নিজের দোষ যাহা, তাহা তিনি নিজেই অনেক দিন পূর্ব্বে "কবির প্রতি নিবেদন" নামক কবিতায় বলিয়া রাখিয়াছেন। যথা—

"পথ হতে শত কলরবে
'গাও, গাও' বলিতেছে সবে।
ভাবিতে সময় নাই, — গান চাই, গান চাই,
থামিতে চাহিতে প্রাণ সরে!
থামিলে চলিয়া যাবে সবে,
দেখিতে কেমন হয় তবে!"

এই কয়টি পংক্তিতে স্বভাবকবির অপার্থিব সরলতা আশ্চর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সকরুণ সঙ্কোচের ফলে নীরবে ভাবিবার সময় পরের মনস্তুষ্টির জন্য কবি যাহা রচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—

"কত মত পড়িয়া মুখোস
যাচিছ সবার পরিতোষ।
মিছে হাসি আনি মুখে, মিছে জল আঁখি-পাতে,
তবু তারা ধরে কত দোষ।"

কিন্তু কাঁটা দেখিয়াই গোলাপের মঞ্জুলোজ্জ্বল মাধুরী সম্বন্ধে কেহ উদাসীন থাকে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে পাঠক-সাধারণের ঔদাসীন্য একটা মস্ত ভুল। ভুল না করাটা, গৌরবকর, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভুল করিলে তাহা বুঝিয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা ততোধিক গৌরবকর। সুতরাং য়ুরোপীয় সাহিত্যাচার্য্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সাগ্রহে রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে তিন শ্রেণীর সাহিত্যের

সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম, ঋষিদিগের দৃষ্ট মন্ত্রময়ী চতুর্বেদ সংহিতা; দ্বিতীয়, রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস পুরাণ; তৃতীয়, অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির কাব্য। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য বা মন্ত্র স্বভাবকবি ঋষির সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধিমূলক; তৃতীয় শ্রেণীর কাব্য অলঙ্কার-শাস্ত্ররূপ বিজ্ঞানানুসারে কল্পনাবলে সৃষ্ট; ইতিহাস পুরাণে দৃষ্ট মন্ত্র ও সৃষ্ট কাব্য, এই দুই প্রকার রচনার লক্ষণই পাশাপাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য সাহিত্য দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কাব্য তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞান-সম্মত রচনা, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য রচনা-রীতির সুখকর সমন্বয়ের ফল। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র মহাকাব্য-মণিমালায় ভাষা-জননীর মুকুট মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন; হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র জননীর কমনীয় কণ্ঠ খণ্ডকবিতার মুক্তাহারে সাজাইয়াছেন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের যাহা আকারে মহাকাব্য, তাহা খণ্ডকবিতারই সমষ্টি। যতদিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন এই সকল ক্ষণজন্মা পুরুষের কাব্যকলাপ রসজ্ঞের চিত্ত-রঞ্জনে ও শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তির বিকাশ-সাধনে সহায়তা করিবে। রবীন্দ্র-নাথের গীতকাব্য এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। তাহার অধিকাংশই মন্ত্র-সাহিত্য; আধুনিক যুগের ঋষির দৃষ্ট নব মন্ত্র-সংহিতা। অন্য কোনও শ্রেণীর কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার তুলনা করিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। রবীন্দ্রনাথ ঋষি, তাঁহার গীতিকাব্য আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারের মন্ত্র।

প্রাচীন ঋষির দৃষ্ট মন্ত্র অতি মহান্। কালের সুবিস্তীর্ণ ব্যবধান সেই মহিমাকে অলৌকিক ও অপৌরুষেয় করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং প্রাচীন মন্ত্রসাহিত্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের তুলনায় অনেকে শিহরিয়া উঠিতে পারেন। কিন্তু অলৌকিকতা বা অপৌরুষেয়তা সাহিত্যের ইতিহাসের বিচার্য্য বিষয় হইতে পারে না, লৌকিক রচনা হিসাবেই সাহি-ত্যের ইতিহাসে মন্ত্রের স্থান। যে গীত দেখা কথার উপর প্রতিষ্ঠিত, শোনা বা শেখা কথার সম্পর্কবর্জ্জিত, তাহা মন্ত্র; যে গীতে শেখা কথার ও শোনা কথার প্রাধান্য, তাহা কাব্যমাত্র। ঋষি সম্বন্ধে আর একটি ধারণা,—ঋষি সংসারী নহেন, সন্ন্যাসী। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, সন্ন্যাস-প্রথার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই ঋষির অভাব হইয়াছিল। যথা ধর্ম্মসূত্রে আপস্তম্ব

জননী।

চিত্রকর সার জস্থয়া রেণল্ড।

Mohila Press, Calcutta

"তস্মাদৃষয়োঽবরেষু ন জায়ন্তে নিয়মাতিক্রমাৎ। শ্রুতর্ষয়স্তু ভবন্তি কেচিৎ কর্ম্মফলশেষেণ পুনঃসম্ভবে। যথা শ্বেতকেতুঃ।"

"(ব্রহ্মচর্য্যের) নিয়ম প্রতিপালিত হয় না বলিয়া আধুনিক কালের লোকের মধ্যে [অবরেষু] ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হয়েন না। কেহ কেহ পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে সহজে বেদ আয়ত্ত করিয়া (শ্রুতর্ষি হইয়া) থাকেন। যথা শ্বেতকেতু।"

এই শ্বেতকেতু ছান্দোগ্য উপনিষদের "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের প্রথম শ্রোতা, উদ্দালক আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু। উদ্দালক আরুণি বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে এক জন প্রসিদ্ধ "ব্রহ্মবাদী" বলিয়া উল্লিখিত। সুতরাং আপস্তম্বের মতে ব্রাহ্মণ-ভাগের বা উপনিষদের রচনাকালে যাঁহারা বেদমন্ত্রের বা যজ্ঞকর্ম্মের দার্শনিক ব্যাখ্যায় এবং ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাঁহারা ঋষি নহেন, অবর বা আধুনিক কালের লোকের অন্তর্ভূত। যাস্কের নিরুক্তেও প্রকারান্তরে সেই কথা।—যথা, "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ ঋষয়ো বভূবুস্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্ম্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ ————।" অর্থাৎ ঋষিরা ধর্ম্মের সাক্ষাৎদ্রষ্টা ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মসাক্ষাৎকারে অসমর্থ অবর বা আধুনিক কালের লোকদিগকে উপদেশের দ্বারা মন্ত্রনিচয় শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন।" ব্রাহ্মণ-আরণ্যকের বিচার-বিতর্কের সূচনার পূর্ব্বে ঋষির যুগ। ঋষির অবলম্বন যুক্তি তর্ক নহে, দৃষ্টি; ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা। ঋষির চিত্র ঋগ্বেদে নিবদ্ধ আছে। ঋষি বিরাগী নহেন, ঘোর সংসারী; দানস্তুতি গান করিয়া দক্ষিণা সংগ্রহে সুনিপুণ। সুদাসের মত দানশীল ও পরাক্রান্ত যজমানের জন্য বশিষ্ঠের ও বিশ্বামিত্রের ন্যায় বিগ্রহ করিতেও প্রস্তুত। কিন্তু ঋষির গুণ,—তিনি "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্ম"। অবর বা পরবর্ত্তী কালের লোকেরা পড়িয়া বা শুনিয়া যে অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান পাইয়া থাকেন, ঋষি তাহা প্রত্যক্ষ করেন, এবং মন্ত্রগান করিয়া অপরকে প্রত্যক্ষানুভূতির পূর্ব্বাস্বাদ প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যে যাহা মন্ত্র, তাহাতে আমরা অতীন্দ্রিয় জগতের যে আলেখ্যের সন্ধান লাভ করি, তাহার দিকে চাহিলে স্বতঃই মনে হয়, ইহা শোনা বা শেখা কথার প্রতিধ্বনিমাত্র নহে, ইহা দেখা কথা, গানে গাথা। দৃষ্টান্তস্বরূপ জয়দেবের একটি প্রসিদ্ধ গান স্মরণ করিব—

"শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল এ
কলিতললিতবনমাল জয় জয় দেব হরে॥

দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন এ
মুনিজনমানসহংস জয় জয় দেব হরে।" ইত্যাদি

"গীতাঞ্জলি"তে রবীন্দ্রনাথের—

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।
এস গন্ধে বরণে এস গানে।
এস অঙ্গে পুলকময় পরশে
এস চিত্তে সুধাময় হরষে,
এস মুগ্ধ মুদিত দু নয়নে।"

এই দুইটি "মঙ্গলমুজ্জ্বল গীতি" গান, শ্রবণ, বা অধ্যয়ন করিতে করিতে কবি, কাব্য ও গায়ক (পাঠক বা শ্রোতা) এই তিনের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন মনে হয়,—"গীতগোবিন্দ"কার বা "গীতাঞ্জলি"কার যেন আমারই প্রাণের গান লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; যেন এই গীত আমারই রচনা। এই দুইটি গীতিই গীতিকাব্যের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন। কিন্তু দুয়ের প্রভেদও বিস্তর। জয়দেবের গীত পৌরাণিক কথা লইয়া সৃষ্ট; রবীন্দ্রনাথের গীত যেন সাক্ষাৎদৃষ্ট। এ যুগে উপনিষদ, গীতা, দর্শন, বিবিধ বিচিত্র সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রভাবের মধ্যে ঋষি-শ্রেণীর কবির অভ্যুদয় একটা অভাবনীয় ব্যাপার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহাই এই অভাবনীয় ব্যাপারকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার কাব্যরস বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ তাঁহার শিক্ষাকাহিনী আলোচ্য। রবীন্দ্রনাথ "জীবন-স্মৃতি" নামক গদ্যকাব্যে তাঁহার শিক্ষার ও কবিত্বশক্তির ক্রমবিকাশ-কাহিনী বিবৃত করিয়া স্বকীয় কাব্য-গ্রন্থাবলীর উৎকৃষ্ট উপক্রমণিকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পরে, নবভারতের শিক্ষাদীক্ষার প্রধান কেন্দ্র কলিকাতা সহরের একটি সমৃদ্ধ ও সমুন্নত পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। নর্ম্মাল স্কুলে তাঁহার শিক্ষার সূত্রপাত। কিন্তু নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতি, শিক্ষক, বা ছাত্র—কেহই বালক রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তথায় ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের এক ক্লাস নীচে পর্য্যন্ত পড়া হইয়াছিল, এবং বাড়ীতে পাঠ্য ছাড়াইয়া কিছু বেশী পড়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে লাভ হইয়াছিল কি? রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "সে সময়টা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছিল। আমার ত মনে হয় নষ্ট হওয়ায়

চেয়ে বেশি; কারণ কিছু না করিয়া যে সময় নষ্ট হয় তাহার চেয়ে অনেক বেশি লোকসান করি কিছু করিয়া যে সময় নষ্ট করা যায় (৪০ পৃঃ)।" ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের নীচের ক্লাস পর্য্যন্ত রীতিমত পড়া যে একেবারে বৃথা হইতে পারে, এ কথা আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে স্বীকার করা কঠিন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের শিক্ষাকে স্বীয় প্রতিভার বিকাশের দিক দিয়া দেখিয়াছেন। সেই হিসাবে স্কুল কালেজের শিক্ষা যে বিফল, এ কথা বলাই বাহুল্য। নর্ম্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়া বেঙ্গল একাডেমি নামক ফিরিঙ্গি স্কুলে প্রবেশ। এখানকার শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই বিদ্যালয়ে আমার মত ছেলের একটা মস্ত সুবিধা এই ছিল যে, আমরা যে লেখা পড়া করিয়া উন্নতি লাভ করিব সেই অসম্ভব দুরাশা আমাদের সম্বন্ধে কাহারও মনে ছিল না (৪৩ পৃঃ)।" অবশেষে "নানা ছল করিয়া বেঙ্গল একাডেমি হইতে পলাইতে সুরু করিলাম। সেণ্টজেভিয়ার্সে আমাদের ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। সেখানেও কোনো ফল হইল না (৭৬ পৃঃ)।" অগত্যা ঘরে পড়ার ব্যবস্থা। সেও ঠিক পড়া নয়, কথা-শ্রবণ; শকুন্তলা, কুমার-সম্ভব, ম্যাকবেথের বাঙ্গালা ব্যাখ্যা-শ্রবণ। সতর বৎসর বয়সের সময় রবীন্দ্রনাথকে বিলাত লইয়া যাওয়া হইল। ব্রাইটনের পাব্লিক স্কুলে, লণ্ডনে প্রাইভেট শিক্ষকের নিকট, এবং শেষে লণ্ডন ইউনিভার্সিটীতে শিক্ষার উদ্যোগ করা হইল, কিন্তু কোনখানেই উদ্যোগ পর্ব্বের অধিক অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল না। ইউনিভার্সিটী ডিগ্রীর পরিবর্ত্তে রবীন্দ্রনাথ "ভগ্নহৃদয়" পত্তন করিয়া দেশে ফিরিলেন। যদি তিনি সেণ্টজেভিয়ার্সে ফাদার দাঁফোর ক্লাস পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারিতেন, বা লণ্ডন ইউনিভার্সিটীর পাঠ সাঙ্গ করিতে পারিতেন, তবে রবীন্দ্রনাথ মন্ত্র দেখিতে পাইতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু যাঁহারা বলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চাপে তাঁহার প্রতিভা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইত, তাঁহাদের কথা আমার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমার অনুমান হয়, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ মানব-সমাজের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি, ভারতের গেটে হইতে পারিতেন; কিন্তু ঋষিত্ব বিকাশ লাভ করিবার অবসর পাইত বলিয়া বোধ হয় না।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত শিক্ষা—মনোবৃত্তিনিচয়ের সম্প্রসারণ, রবীন্দ্রনাথের আত্মচেষ্টার ফলে অথবা আপনা-আপনি, স্বভাবের শাসনে, সম্পাদিত হইয়া-

ছিল। প্রাচীন কালের ঋষিবালকের ন্যায় উপনয়ন সংস্কারেই এই নবীন ঋষির শিক্ষার সূত্রপাত। যথা—

"নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে এক মনে ঐ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে, সে বয়সে উহার তাৎপর্য্য আমি ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কি বুঝিতাম কি ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন (৫২ পৃঃ)।"

বৈদিক সাহিত্যও যে প্রণালীতে রবীন্দ্রনাথের মনটাকে প্রসারিত করিবার অবসর পাইয়াছিল, লৌকিক সাহিত্যও সেই ভাবেই তাঁহার আত্মশিক্ষার সাহচর্য্য করিয়াছিল। যথা—

"আমার নিতান্ত শিশুকালে মূলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপর একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাঁহার আনন্দাবেশপূর্ণ ছন্দ উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ছেলে বেলায় যখন ইংরেজি আমি প্রায় কিছু জানিতাম না, তখন প্রচুর ছবিওয়ালা একখানি Old Curiosity Shop লইয়া আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম। পনেরো আনা কথাই বুঝি নাই—নিতান্ত আবছায়ার মত মনের মধ্যে কী একটা তৈরি করিয়া সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাতেই ছবিগুলা গাঁথিয়াছিলাম,—পরীক্ষকের হাতে যদি পড়িতাম তবে মস্ত একটা শূন্য পাইতাম সন্দেহ নাই—কিন্তু আমার পক্ষে সে পড়া তত বড় শূন্য হয় নাই।

"এক বার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্টউইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মত এক লাইনের সহিত আর এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভাল জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে।......জয়দেব

সম্পূর্ণ ত বুঝি নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্য্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীত-গোবিন্দ একখানা খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।

আর একটু বড় বয়সে কুমারসম্ভবের—

মন্দাকিনী-নির্ঝরশীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ-
রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ।

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছুই বুঝি নাই—কেবল "মন্দাকিনী-নির্ঝর-শীকর" এবং "কম্পিত-দেবদারু" এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল। সমস্ত শ্লোকটির রস ভোগ করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যখন পণ্ডিত মহাশয় সবটার মানে বুঝাইয়া দিলেন তখন মন খারাপ হইয়া গেল। মৃগ-অন্বেষণ-তৎপর কিরাতের মাথায় যে ময়ূর-পুচ্ছ আছে বাতাস তাহাকেই চিরিয়া চিরিয়া ভাগ করিতেছে এই সূক্ষ্মতায় আমাকে বড়ই পীড়া দিতে লাগিল। যখন সম্পূর্ণ বুঝি নাই তখন বেশ ছিলাম (৫২—৫৪ পৃঃ)।"

পুরাপুরি বুঝিয়া পুস্তক পড়া রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন হয় নাই।—"আমরা ছেলেবেলায় এক ধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম—যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না,—দুই-ই আমাদের মনের উপর কায করিয়া যাইত" (৮০ পৃঃ)। "বাল্যকাল হইতে আমার একটা অভ্যাস ছিল, সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও তাহাতে আমার পড়ার বাধা ঘটিত না। অল্প স্বল্প যাহা বুঝিতাম তাহা লইয়া আপনার মনে একটা কিছু খাড়া করিয়া আমার বেশ এক রকম চলিয়া যাইত। এই অভ্যাসের ভাল মন্দ দুই প্রকার ফলই আমি আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি (১১১ পৃঃ)।" ভাষ্য, টীকা অভিধানের সাহায্যে পুস্তক ভাল করিয়া পড়ার যতই গুণ থাকুক, তাহা মনকে বহির্মুখ করে। রবীন্দ্র-নাথের সেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। "জ্যোতিদাদা" রবীন্দ্রনাথের [illegible]শিক্ষারীতি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "তিনি আমাকে [illegible] একটা বড় রকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাঁহার সংস্রবে আমার [illegible]কার সঙ্কোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল।......যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছুই আমি

লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে সমস্ত ভালমন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে (৯১—৯২ পৃঃ)।" রবীন্দ্রনাথের বই পড়া ঠিক পড়া নহে, আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া পাইবার ছুতা মাত্র। ইহা ছাড়া অন্যরূপ পড়া পড়া দিবার জন্য পড়া, বা পরীক্ষা দিবার জন্য পড়া—তাঁহার আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া পাইবার পথে অন্তরায় হইত, তাই স্কুলের শিক্ষা তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইয়াছিল।

পড়াশুনা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আপন শক্তি-বিকাশের আর এক সহায়,—অত্যন্ত প্রবল সহায়—ছিল কবিতা-রচনা। লেখা পড়া আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই একরূপ তাঁহার কবিতা লেখা সুরু। প্রয়োজন এবং প্রাণের টান এই দুইই তাঁহাকে সেই পথে লইয়া গিয়াছিল। স্কুল ছাড়িয়া রবীন্দ্রনাথ "আত্মসম্মাননাশে"র এই একমাত্র পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন। "তা ছাড়া ভিতরে ভারি একটা দুরন্ত তাগিদ ছিল, তাহাকে থামাইয়া রাখা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না (৯২ পৃঃ)।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগের রচনার অস্পষ্টতা জীবন-স্মৃতিতে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। "জীবন-স্মৃতি"তে "কড়ি ও কোমলে"র প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"বর্ষার দিনে কেবল ঘনঘটা ও বর্ষণ। শরতের দিনে মেঘরৌদ্রের খেলা আছে কিন্তু তাহাই আকাশকে আবৃত করিয়া নাই; এ দিকে ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলিয়া উঠিতেছে। তেমনি আমার কাব্যালোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ নহে। সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে (১২৪ পৃঃ)।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোকে যাহা "মাটিতে ফসল", তাঁহার কাব্যের যাহা প্রাণবস্তু, তাহা "মাটিতে ফসল" হইলেও মাটির ফসল নহে, ছন্দোবদ্ধ কথার কথামাত্র নহে, তাহা দুই মন্ত্রের প্রত্যক্ষ দেবতা। বিশ্বসাহিত্যের প্রথম মন্ত্র-সংহিতা ঋগ্বেদের সূক্তমালা। এই সূক্তমালার দেবতা তথাকথিত ৩৩টি বৈদিক দেবতা। কিন্তু বেদমন্ত্রের দেবতা, পুরাণতন্ত্রের দেবতা, যা

দর্শনের পরমাত্মা পরমপুরুষের মত সাধনার সুদূরবর্ত্তী লক্ষ্য নহে, প্রত্যক্ষ দেবতা। পুরাণ তন্ত্রের দেবতা তোমার আমার কাছে কাব্য বা চিত্রমাত্র, এবং দর্শনের দেবতা বিচারলব্ধ সিদ্ধান্ত বা মতবাদ। কিন্তু বেদমন্ত্রের ইন্দ্র, অগ্নি, মরুৎ, মিত্র সেরূপ চিত্র বা সিদ্ধান্তমাত্র নয়,—ভাষায় স্বচ্ছ—অনেক সময় স্তুতি স্বচ্ছ—আবরণে আবৃত ভূলোক দ্যুলোকে প্রকৃতির মঙ্গলময় লীলা-খেলা। ঋষির সাধনার যাহা চরম লক্ষ্য, পুরুষ-সূক্তের সেই পুরুষ নারায়ণও প্রত্যক্ষ বিষয়, সীমার মধ্যে অসীমের—বহুর মধ্যে একের অনুভব। যথা—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

যাহার একচতুর্থাংশ জীবজগৎ, এবং অপর তিনচতুর্থাংশ অমৃতময় আকাশের অসীমতা, সেই সীমার ও অসীমের মিলনক্ষেত্র নর-নারায়ণই রবীন্দ্রনাথের সকল মন্ত্রের দেবতা। পূর্ব্বোদ্ধৃত "কবির প্রতি নিবেদন" নামক কবিতায় সাহিত্যসমাজরূপ "কোলাহলমরু" হইতে নেত্র সরাইয়া আর এক দিকে চাহিয়া ঋষি গাহিয়াছেন—

"দেখ, হোথা নদী পর্ব্বত,
অবারিত অসীমের পথ।
প্রকৃতি শান্তমুখে ছুটায় গগনবুকে
গ্রহতারাময় তার রথ।"

তার পর উপসংহারে "অসীম বিরাম নিকেতনে"র পানে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া দেখিয়াছেন—

"হোথা মানবের জয় উঠিছে জগৎ-ময়
ওইখানে মিলিয়াছে নর নারায়ণ।"

রবীন্দ্রনাথ "জীবন-স্মৃতি"তে লিখিয়াছেন, "আমার ত মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সেই পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা (২১১ পৃ)।" ইহার অপেক্ষা মহান্ পালার উদ্ভাবন অসম্ভব। মনুষ্যের চিত্তে তিনটি মহা-

রহস্য অবিরত ঘা দিতেছে—আকাশ-রহস্য, কাল-রহস্য, এবং জীবন-মরণ-রহস্য। অসীমতার গাঢ় অন্ধকারময় বেষ্টন সসীম দেশ, সসীম কাল, সসীম জীবনকে দুর্ভেদ্যরহস্যাবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মনুষ্যের ধর্ম্ম, মনুষ্যের সাহিত্য, মনুষ্যের দর্শন, মনুষ্যের বিজ্ঞান, মনুষ্যের শিল্প এই রহস্যোদ্ঘাটনেরই বিভিন্ন প্রকারের চেষ্টামাত্র। কিন্তু এই সভ্যতার যুগে জীবনের দুর্বহতার অধিকাংশ মনুষ্যেরই চিত্তকে এমন কঠিন করিয়া তুলিতেছে যে, বিশ্বব্যাপী রহস্যের ঘা আর তাহাকে স্পন্দিত করিতে পারিতেছে না। যাহাদের চিত্ত এইরূপ নিঃস্পন্দ, তাহারা জীবন্মৃত। আর যাহার চিত্তে রহস্য-বোধ জাগ্রত, রহস্যোদ্ঘাটনের দিকে লক্ষ রাখিয়া যাহার জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত, সে জীবন্মুক্ত। ধর্ম্মপ্রচারক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, ঋষি, শিল্পী, ইঁহারা সকলেই অল্পাধিকপরিমাণে জীবন্মুক্তির পথের সহায়; জীবন্মুক্তির সহায়তাতেই ইঁহাদের জীবনব্রতের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের গীত "গান" বিংশ শতাব্দের ভীষণ জীবনযুদ্ধে আহত পীড়িত সংশয়াচ্ছন্ন নরনারীর জীবন-ব্যাধির অমৃতোপম ঔষধ, জীবন্মুক্তির পথের মঙ্গলোজ্জ্বল আলো।

যে সব মন্ত্র-সংহিতায় রবীন্দ্রনাথের এই গান নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা ঋক্, সাম, অথর্ব্ব, অথবা শুক্ল যজুর্ব্বেদসংহিতার মত কেবল মন্ত্রময়ী নহে, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের মত ব্রাহ্মণভাগ-সমন্বিত। ব্রহ্মসঙ্গীত-শ্রেণীর অধিকাংশ সঙ্গীত ও অনেক গীতি-কবিতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্ট মন্ত্র; এবং বিধি ও অর্থ-বাদপূর্ণ আর আর রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রোক্ত ব্রাহ্মণ। রবীন্দ্রনাথ ধর্ম্ম-সংস্কারক, সমাজসংস্কারক, রাষ্ট্রনীতি-সংস্কারক, শিক্ষানীতি-সংস্কারক, এবং স্বদেশীর এক জন প্রধান পথপ্রদর্শক। সুতরাং তাঁহার রচনায় বিধিনিষেধের বাহুল্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে দিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যের সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে রবীন্দ্রনাথ রচনা-রাজ্যের রাজা, অধিকাংশ মাসিকপত্রের মুক্তহস্ত প্রতিপালক। অতএব "অর্থবাদ" বা সমালোচনা এবং ব্যাখ্যান-শ্রেণীর অনেক গদ্যপদ্য তাঁহার লেখনী হইতে বিনির্গত হইয়াছে। ব্রাহ্মণভাগে আর আর যাহা থাকে—ইতিহাস পুরাণ, নারাশংসী গাথা জীবনচরিত) প্রভৃতি—তাহারও অভাব নাই। রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার রচনার, বা সকল কাব্যের সমালোচনার সময়, সামগ্রী, বা সামর্থ্য আমার নাই। অনেকের মতে, রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রধান দোষ অস্পষ্টতা। কিন্তু যাহা উৎকৃষ্ট, যথা "গান", "নৈবেদ্য", "গীতাঞ্জলি", তাহাও কি

অস্পষ্ট ? রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচিত অনেক কবিতাও যে আমাদের কাছে অস্পষ্ট একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নিবিষ্ট ভাবে অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়, এ অস্পষ্টতা ক্রমশ উজ্জ্বল—উজ্জ্বলতর, হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অস্পষ্টতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ দুইটি কবিতা আলোচনা করিব। আমার ভক্তিভাজন শিক্ষক ৺মোহিতচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "সোণার তরী"র উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি কে ? 'হৃদয়-যমুনা'য় কাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে ? এ সব প্রশ্ন আমরা বৃথা জিজ্ঞাসা করি" প্রথমোক্ত "সোনার তরী" কবিতা লইয়া মহারথগণের মধ্যে একবার একটা দ্বৈরথ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। "সুদূর পশ্চিম ছাড়িয়া গান্ধার"—সিরাজের সেখসাদীর নিকট হইতে হাতিয়ার আনিয়া এই যুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল—আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, নিষ্কাম ধর্ম্ম—ত প্রয়োগ করা হইয়াছেই। পুঁথিগত বিষয় বা দোষানুসন্ধিৎসা ছাড়িয়া রবীন্দ্রনাথের ভাবে ভাবিয়া দেখিলে,—অসীমের সীমায় পহুঁছিবার জন্য যে তাঁহার গভীর সাধন, সেই হিসাবে দেখিলে—মনে হয়, "সোনার তরী"র কবিতার উদ্দেশ্য ভ্রমজনিত বেদনা-প্রকাশ। গোড়াতেই কৃষকের ভ্রমের কথা ; সে কূলে একা, ছোট ক্ষেতে ধান কেটে মনে করেছে, "রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা", অর্থাৎ সীমার গণ্ডির ভিতর থাকিয়া নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কায গুলিকে বড় মনে ক'রে বসে আছে। এমন সময় "তরী বেয়ে" অর্থাৎ একটু আস্তে, "যেন মনে হয় চিনি," কিন্তু ঠিক সনাক্ত করিতে পারিতেছি না,—এই ভাবে মনোমধ্যে অসীমের জ্ঞানের প্রবেশ, এবং অমনি "ভরা পালে" দ্রুত পলায়নের উদ্যোগ। তখন নেয়েকে ডাকিয়া ফিরাইয়া সাহঙ্কারে "এতকাল নদীকূলে যাহা লয়েছিনু ভুলে" তাহা প্রদর্শন। সোনার তরীর নেয়ে সেই সমস্ত লইয়া গেল, অর্থাৎ তাহা লইয়া কৃষকের যে গর্ব্ব তাহা তিরোহিত করিয়া দিল। কিন্তু কৃষক নিজে যখন সেই তরীতে উঠিতে চাহিল, তখন তাহার হৃদয়ে তীব্র বেদনা দিয়া সোনার তরী লইয়া নেয়ে অন্তর্হিত হইল। "সোনার তরী" রবীন্দ্রনাথের সাধন-তরী এবং তাহার নেয়ে অসীমতার অর্দ্ধস্ফুট জ্ঞান। কৃষকের অপরাধ হইয়াছিল, সে "সোনার তরী" দেখিবামাত্রই নেয়ের কাছে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া ছোট ক্ষেতের তুচ্ছ ফসল দেখাইয়া বলিয়াছিল, "যত চাও তত লও তরণী পরে।" এই গর্ব্বোক্তি না করিয়া যদি বলিত আগেই "আমারে লহ করুণা করে", তবে শূন্য নদীর তীরে পড়িয়া থাকিয়া কাঁদিতে

হইত না। রবীন্দ্রনাথ কেবল এই কবিতায়ই যে তাঁহার সাধনাকে সোণার তরীরূপে কল্পনা করিয়াছেন এমন নহে। "সোণার তরী" নামক নিবন্ধের শেষ কবিতা "নিরুদ্দেশ যাত্রায়" ও সেই একই কথা—

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরি ?
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী ?
• • •
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি',
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি',
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগন-কোণে।
কি আছে হোথায়—চলিছে কিসের
অন্বেষণে ?"

"গীতাঞ্জলি"তে সোনার তরীর যাত্রীর যাহা কর্ত্তব্য তাহা স্পষ্টাক্ষরে বিহিত হইয়াছে। যথা—

"ঐ রে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে।
• • •
ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখ্‌লি এনে,
তাই যে তোর বারে বারে
ফিরতে হল, গেলি ভুলে।
ডাকরে আবার মাঝিরে ডাক্,
বোঝা তোমার ভেসে যাক্,
জীবন খানি উজাড় করে
সঁপে দে তার চরণ-মূলে।"

"হৃদয়-যমুনা"য় কবি বিশ্ববাসী সকলকেই আহ্বান করিয়াছেন। প্রথমতঃ হৃদয়কে দুই তীরে সীমাবদ্ধ যমুনারূপে কল্পনা করিয়া তাহার ভাব-রস যাহারা উপভোগ করিতে চাহেন তাহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে। শেষ অংশে কবি কল্পিতহৃদয় যমুনাকে অসীম বিশ্বহৃদয়ে লীন দেখিয়া যাঁহারা "মরণ" বা জীবন্মুক্তি কামনা করে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পড়িয়াছেন—

যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে।

স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর,
নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর
স্থির বিরাজে।

* * *

যাও সব যাও ভুলে,
নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এস কূলে
সকল কাজে।"

এই কবিতায় ভোগীর যমুনার পার্শ্বে যোগীর অতল অকূল সাগরের চিত্রে কবির সৃষ্টি-কৌশল এবং ঋষির দৃষ্টির ফল অতি মধুর ভাবে মিলিত করা হইয়াছে। "মানসীর উপহার" নামক কবিতায় কাব্য-রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়া রাখিয়াছেন—

এ চির জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি' শুধু অসীমের সীমা।
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে, তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে' তুলি মানসী প্রতিমা।"

আবার অসীমের সীমা প্রত্যক্ষ করিয়া গীতাঞ্জলিতে ঋষি গাহিয়াছেন—

"সীমার মাঝে, অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ,
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়-পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।"

অরূপের রূপের সুমধুর লীলা দেখা—ইহাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের রহস্য।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, এ কেমন দেখা? একি শুধু কথার কথা, না আর কিছু? রবীন্দ্রনাথ বিলাসী জমীদার, সদ্গুরুর উপদেশ মতে যথারীতি সাধন ভজন

করেন নাই,—তাঁহার দেখা কথার কথা বই আবার কি? তোমরা যাহাকে সাধন ভজন বল, তাহা করিলেই যে অরূপের রূপ দেখা যায় বা কেহ কখন তাহার আদালতগ্রাহ্য প্রমাণ মাসিকের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করা সম্ভব কি? যে অরূপের রূপ দেখিয়াছে তাহার কথা ভিন্ন সেই দেখার আর কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত কেহ হাজির করিতে পারে নাই। যদি পারিত, তাহা হইলে জগতে ধর্ম্মভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ মোটেই উৎপন্ন হইত না।

"তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম্ম তারে সত্য বলি জানে।"

তোমার মর্ম্ম যদি রবীন্দ্রনাথের কথা সত্য বলিয়া মানিতে না চায় তাহা বল, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু সাধন ভজনের তর্ক উত্থাপন করার সার্থকতা কি? তোমরা যাঁহাকে সাধন বল, রবীন্দ্রনাথ তোমাদিগকে জানাইয়া শুনাইয়া সেই সাধন করেন নাই, সুধু এই অছিলায় তাঁহার বাণীকে মিথ্যা বলিলে পাদ্রিসাহেবসুলভ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ করা হয় মাত্র,—সেটা কাব্যসমালোচনা হয় না। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কোন একটি গান একমনে গাহিয়া বা শুনিয়া যে বলিতে পারে ইহা সুধু কথার কথা, এমন লোক অতি দুর্লভ। যদি এমন লোক থাকে তবে বলিতে হইবে, তাহার হৃদয়-বীণার তারগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

হৃদয়ে সংশয়, বাহিরে বঞ্চনা আমাদের ইহ-পরকাল অন্ধকারময় করিয়া তুলিতেছে। দেশে কলরব উঠিয়াছে, "দেশের লোক না খেয়ে মল, দেশের অন্ন সংস্থান কর, দেশের ধনবৃদ্ধি কর।" কত শত ব্যাঙ্ক কত শত কোম্পানী মাথা তুলিয়া উঠিতেছে, আবার অমনি লিকুইডেসন-লীলা সম্বরণ করিতেছে। দেশের দুঃখদৈন্যের কারণ দারিদ্র্য নয়, যাঁহাদের ধন আছে বা হুজুকে যাঁহাদের ধনার্জ্জনের সুযোগ ঘটিতেছে তাঁহাদের হৃদয়ের দারিদ্র্য। যে ধনে এই দারিদ্র্য ঘুচিবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সেই ধনের অলঙ্কার-ভাণ্ডার। বঙ্গ কবি-

"তোমার রাগিণী জীবন-কুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!
সব বিরোধ ঘুরে যায় যেন
তব মঙ্গলমন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে
তব সঙ্গীত ছন্দে।"

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

ডিক্রি জারী।

১

আড়াই বৎসর দুই আদালতের মামলা চালাইয়া মাধবদত্ত যে দিন হরিহরপুরের বামাচরণ ঘোষের বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইল, সে দিন তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। বুড়া বামাচরণ তাহাকে কি নাকালই না করিয়াছে। মহাজনের দেনা শোধ করিতে না পারিয়া বিপন্ন বামাচরণ তাহার পিতার নিকট হইতে খত লিখিয়া দিয়া হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। সেই টাকা কিনা এখন মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা! যদি তাহার পিতা সেই বিপদের সময় বামাচরণ ঘোষকে টাকা দিয়া সাহায্য না করিতেন, বুড়া কি তখন দেউলিয়া হইয়া যাইত না? সেই উপকারের পুরস্কার কি আড়াই বৎসর ধরিয়া মোকদ্দমা? বুড়া হাড়ে যে এত ভেল্‌কী খেলিতে পারে, তরুণ যুবা মাধবের কল্পনায় পূর্ব্বে তাহা আসে নাই। সে সরলবিশ্বাসে ভাবিয়াছিল, বামাচরণ ঘোষ নিশ্চয়ই যথাসময়ে ন্যায়সঙ্গত দেনা শোধ করিবে। এজন্য পিতার মৃত্যুর পর, তিন বৎসর সে আদৌ টাকার তাগাদা করে নাই। তার পর তামাদির মুখে সে যখন টাকা চাহিল, বুড়া কিনা অম্লানবদনে বলিল, সে কখনও কোন টাকা কর্জ্জ লয় নাই। যদি বা কখনও লইয়া থাকে, বহুদিন পূর্ব্বে তাহার পিতার জীবদ্দশায় তাহা শোধ করিয়া দিয়াছে। সুতরাং উল্লিখিত টাকার কথা সে কিছুই জানে না। আপোষে টাকা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মাধবদত্তকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। বুড়া যে বিলক্ষণ মামলাবাজ মাধব তখন বুঝিতে পারিল। প্রকৃত পাওনা সত্ত্বেও প্রথম আদালতের বিচারে মাধবদত্ত মোকদ্দমা হারিয়া গেল। দশজন গ্রামবাসীর সাক্ষাতে আদালতের প্রাঙ্গণে সে দিন বুড়া তাহার নাবালকত্বের উল্লেখ করিয়া যে মর্ম্মভেদী বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়াছিল, তাহার আঘাতের বেদনা মাধবদত্ত জীবনে কখনও কি বিস্মৃত হইতে পারিবে? অপমানে ঘৃণায় নতমস্তকে রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় সে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সেই দিন সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ডিক্রীজারী দিয়া বুড়ার স্থাবর অস্থাবর মাল ক্রোক করিবে, বুড়ার চোখের জল দেখিবে, তবেই সে বনমালী দত্তের ছেলে। এই তীব্র অপমানের প্রতিশোধ না লওয়া পর্য্যন্ত

তাহার হৃদয়ে শান্তি নাই। এর জন্য সর্ব্বস্ব পণ। কিন্তু দুই বৎসর লড়িয়াও সে শীঘ্র বুড়াকে কাবু করিতে পারিল না। উপরিতন আদালতে সে মোকদ্দমায় জয় লাভ করিল বটে; কিন্তু শীঘ্র ডিক্রী পাইল না। নানা কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া, আইনের বহুবিধ জটিল আপত্তি দায়ের করিয়া বামাচরণ পুনঃ পুনঃ মাধবদত্তকে হয়রাণ করিয়া ফেলিল। শীঘ্র ডিক্রীজারীর অবকাশ না পাইয়া প্রতিশোধ স্পৃহা মাধবকে দিন দিন আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিল। "মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী!"

কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী এবার মাধবের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখে সদলবলে সদরে হাজির হইয়া মাধব জানিতে পারিল, বুড়া বামাচরণ পীড়িত, সুতরাং কূটবুদ্ধি বৃদ্ধ এবার স্বয়ং মোকদ্দমার তদ্বির করিতে আসে নাই। তাহার পুত্রও রুগ্ন পিতাকে ছাড়িয়া আসিতে পারে নাই। মাধবদত্তের আনন্দের সীমা রহিল না। এবার প্রতিবাদী পক্ষ হইতে কোনরূপ আপত্তি না হওয়ায় বিনা বাধায় সে ডিক্রীজারীর আদেশ পাইল। কিন্তু মাধব তখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। বামাচরণভীতি তাহার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল। সে ভাবিল, একেবারে পরোয়ানা সহ পেয়াদাকে সঙ্গে লইয়া সে দেশে ফিরিবে। কি জানি তাহার অসাক্ষাতে বুড়া যদি আবার কোনও কৌশলে ডিক্রীজারীতে বাধা জন্মায়! পথিমধ্যে কিছু দক্ষিণা দিয়া পেয়াদাকে যদি বশ করে!

অতিরিক্ত পারিশ্রমিক এবং রীতিমত দক্ষিণা দিয়া মাধব ডিক্রীজারীর পরোয়াণা বাহির করাইল। এবার বুড়া বামাচরণ কোথায় যাইবে? তাহার টিটকারী ও বিদ্রূপের প্রতিশোধ মাধব এবার লইতে পারিবে না? দশজন গ্রামবাসীর সম্মুখে প্রকাশ্য দিবালোকে সে যখন বুড়ার অস্থাবর সম্পত্তি ঘরের মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিবে, তখন লাঞ্ছনা এবং অপমানে শুক্লকেশ বৃদ্ধের মস্তক ভূমিস্পর্শ করিবে না? আঃ! সে কি আনন্দ! এতদিন পরে কি ভগবান সত্যই মাধবের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন?

উত্তেজনার আতিশয্যে সে রাত্রিতে মাধব ভালরূপ আহার করিতে পারিল না।

২

সমস্ত দিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। দুই দিন পূর্ব্বে প্রবল বারিপাত হইয়াছিল। আজ সকালেও রীতিমত এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

মাধবদত্ত আদালতের পেয়াদা সহ সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাড়ী পঁহুছিল।

মাধবের পিতার চাউল ও আটার বিস্তৃত কারবার ছিল। সে অঞ্চলে বনমালীদত্তের ন্যায় ধনী ব্যবসায়ীর সংখ্যা অধিক ছিল না। নদীর সন্নিকটে মাধবদত্তের আড়ত। গ্রামের মধ্যে তাহাদের বসতবাটী। মাধব পেয়াদাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল। সে তাহাকে কার্য্যোদ্ধারের পূর্ব্বে নয়নের অন্তরাল করিবে না সংকল্প করিয়াছে।

পেয়াদার আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া মাধব তাহাকে বলিয়া রাখিল যে, পর দিবস অতি প্রত্যূষেই যাত্রা করিতে হইবে। হরিহরপুর তিন ক্রোশ দূরে, সুতরাং উষাকালে যাত্রা না করিলে সময়ে তথায় পঁহুছিতে পারা যাইবে না।

ভাবী সাফল্যের উত্তেজনায় মাধবের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আহারাদি সারিয়া দ্বিতলের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। ঘরে বড় গরম, বাতায়ন খুলিয়া দিয়া সে একখানি জমাখরচের খাতা বাহির করিল। ধনী ব্যবসাদারের আদরের দুলাল হইয়াও মাধব গ্রাম্য ইংরাজী স্কুলের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। পরীক্ষায় পাশ করিতে না পারিলেও সে মোটামুটি লেখাপড়া বেশ শিখিয়াছিল। খাতাখানি বাঁধান এবং আয়তনে ক্ষুদ্র। মাধব এক স্থলে লিখিল,—"উদ্যোগপর্ব্ব আজ শেষ হইল। কাল অপমানের প্রতিশোধ লইব। পিতৃঋণ সুদে আসলে এই বার আদায় হইবে!" অদূরে পালঙ্কোপরি তাহার শিশুপুত্র এবং পত্নী নিদ্রিতা। মাধব একবার শয্যার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেওয়ালে ঘড়ী অবিশ্রান্ত টিক্‌টিক্ শব্দে সময়ের নির্দ্দেশ করিয়া চলিয়াছে। মাধব কি ভাবিয়া আবার বাতায়নের পার্শ্বে দাঁড়াইল। ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই গুমট। গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়িতেছে না। গত রাত্রিতে মাধব ভাল করিয়া ঘুমায় নাই। আজ সারা দিন সে গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছে, কিন্তু তথাপি আজ তাহার কিছুমাত্র শ্রান্তি বা অবসাদ বোধ হইতেছে না।

বৃদ্ধ বামাচরণের মূর্ত্তি পুনঃ পুনঃ তাহার মানস চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হইতেছিল। সে যেন তাহার দিকে চাহিয়া বিদ্রূপভরে হাসিতেছে! দশের সম্মুখে তাহার পরাজয়ে বুড়া যে মর্ম্মান্তিক শ্লেষপূর্ণ কথা গুলি দুই বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিল, আজ তাহার প্রত্যেক বর্ণ যেন মাধবের কর্ণে নূতন করিয়া ধ্বনিত হইতেছিল। মাধব কক্ষমধ্যে দ্রুত পাদচারণ করিতে লাগিল।

"দেখিব বুড়ার দর্প এখন কোথায় থাকে, কাল ইহার প্রতিশোধ !"

মৃদু বাতাসের স্পর্শ যেন ক্রমশঃ মাধব অনুভব করিল। জানালার কাছে আসিয়া দেখিল, গাছের পাতা ধীরে ধীরে নড়িতেছে, আকাশে মেঘমালা দ্রুত চলা ফেরা করিতেছিল। বারিবর্ষণ তখনও বন্ধ হয় নাই। সম্ভবতঃ রাত্রিশেষে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে পারে।

মাধব উদ্বিগ্নচিত্তে মেঘমণ্ডিত আকাশে চাহিয়া রহিল। যদি সকালে বর্ষণ না থামে তাহা হইলে ?—নাঃ, আর কত বৃষ্টি হইবে ? যদি বড় জোর ঘণ্টাখানেক হয়। কিন্তু মাধব নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, মুহূর্তে আকাশের এ দুর্যোগচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া ফেলে! এমন কোন মন্ত্র যদি তাহার জানা থাকিত যে, আবৃত্তি মাত্র ঐন্দ্রজালিকের মায়া-দণ্ড স্পৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মেঘমালা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়!

ঘড়িতে রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল। চমকিত ভাবে মাধব বাতায়ন-সন্নিধান পরিত্যাগ করিল। এতরাত্রি হইয়াছে ? আর নয়, এখন শয়ন করা উচিত। এক গ্লাস জল পান করিয়া সে হস্তপদ ভালরূপে প্রক্ষালন করিল। তারপর চিন্তিত হৃদয়ে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু শ্রান্তিহারিণী সুষুপ্তির কোমল স্পর্শ অবিলম্বে মাধবের চিন্তাক্লিষ্ট দেহের চেতনা হরণ করিয়া লইলেন।

৩

সহসা তীব্র আর্তনাদ এবং ভীষণ কোলাহলে মাধবের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার পত্নীও ভীতচিত্তে উঠিয়া বসিলেন। খোলা জানালা দিয়া উষার প্রথম আলোক-রেখা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কোথা হইতে কোলাহলের শব্দ আসিতেছে বুঝিতে না পারিয়া মাধব তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। বাড়ীর ভৃত্যবর্গ এবং অন্যান্য লোকও গোলমাল শুনিয়া তাহার ন্যায় জাগিয়া উঠিয়াছিল। সকলেরই মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। মাধব কোলাহলের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বহির্বাটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল অনেক গুলি নরনারী প্রাণপণ বেগে তাহারই বাড়ীর দিকে আর্তনাদ করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। মাধব হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল।

অগ্রগামী ব্যক্তি মাধবকে দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলিল, "বাঁচাও, দত্ত মশায়! সব গেল, সব গেল!"

তখন সকলে গণ্ডগোল করিয়া উঠিল। মাধব তাহাদের অসংলগ্ন কথা-বার্ত্তা হইতে বুঝিতে পারিল, দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বন্যার প্রবল জলস্রোত গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ঘরবাড়ী জলের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।

কি সর্ব্বনাশ! বাঁধের কাছেই যে মাধবের আড়ত! সে দৌড়িয়া রাজ-পথে উঠিল। বহুকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "যাবেন না। যাবেন না! বানের জল এদিকেও ছুটিয়া আসিতেছে।" মাধব কাহারও নিষেধ শুনিল না। সে দৌড়িয়া চলিল। কিন্তু অধিকদূর যাইতে হইলনা। এক পোয়া পথ অগ্রসর হইবার পর সে দেখিল, অদূরে জলস্রোত বহিতেছে, রাজপথ, গ্রাম ভাসাইয়া তাহার অভিমুখে বন্যার জল ছুটিয়া আসিতেছে। তখন প্রাণপণ বেগে মাধব ফিরিল। পথে আরও কতিপয় পলাতকের সহিত দেখা হইল। মাধবদত্তের অট্টালিকা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান মনে করিয়া অনেকেই তথায় আশ্রয় লইতে আসিয়াছে। মাধব বাড়ীর বারান্দায় উঠিয়া দেখিল, তাহার আড়তের কয়েকটি কর্ম্মচারীও তথায় আসিতেছে। তাহাদের নিকট মাধব যাহা শুনিল, তাহাতে সে বুঝিতে পারিল, এত ক্ষণ আড়ত খানি বন্যার জলে ভাসিয়া না গেলেও দ্রব্যাদি সমস্তই যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সর্ব্বনাশ! মাধবের লক্ষ টাকার মাল যে আড়তে মজুদ ছিল! কিন্তু সে কথা ভাবিয়া কাঁদিবার অবসর কোথায়? মৃত্যু প্রবাহ যে সম্মুখে গর্জ্জিয়া আসিতেছে।

মাধবের অট্টালিকা অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমীর উপর অবস্থিত। রাজপথ হইতে ভূমির উচ্চতা অনূ্যন দুই ফুট। জমী হইতে পোতার উচ্চতা সাড়ে চারি ফুট। তাহার উপর দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত। আত্মীয় স্বজনের সংখ্যা অধিক বলিয়া, আশ্রিত প্রতিপালক মাধবের পিতা খুব বড় বাড়ী তৈয়ার করিয়া গিয়া-ছিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই এত বড় অট্টালিকার নিম্নতল আশ্রয়হীন সর্ব্বস্ব-ভ্রষ্ট গ্রামবাসী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে মাধবের অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বও প্লাবিত হইয়া গেল। ক্রুদ্ধ বন্যার প্রবাহ বৃক্ষ, পর্ণকুটীর উপাড়িয়া ভাসাইয়া লইয়া চলিল। সমবেত পল্লীবাসী আতঙ্কবিমূঢ়চিত্তে দেখিল তাহাদের সর্ব্বস্ব দামোদর গ্রাস করি-তেছে!

মাধবদত্ত তখন এত গুলি প্রাণীর আহারের বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন

অনুভব করিল। তাহার লক্ষ টাকার মাল দামোদর গ্রাস করিয়াছে বটে; কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে বাড়ীতে যে আহার্য্য মজুত আছে তাহাতে কি সে [illegible] সেবা করিতে পারিবে না।

চারিদিকে প্রলয় ও মৃত্যুর ভৈরবী লীলা। ভূতসর্ব্বস্ব নিরাশ্রয় নরনারীর আকুল ক্রন্দন ও দীর্ঘশ্বাস শুনিতে শুনিতে মাধব ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহারও সর্ব্বস্ব ত দামোদর হরণ করিয়াছে! মাধব সীমাহীন জলবিস্তারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি ভাবিতেছিল? নিরাশ্রয় অতিথিদিগের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া সে একতলের ছাদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আজ কি নির্ম্মম! প্রকৃতির বক্ষে কি সহস্র কাতর কণ্ঠের বেদনাপ্লুত শোকগাথা বাজিতেছে? মাধব কি একমনে সেই কথাই চিন্তা করিতেছিল?

সহসা সে নীচে নামিয়া গেল। বন্যাপ্রবাহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া তাহার অট্টালিকার পোতার দুই তিন ইঞ্চ নিম্নে প্রতিহত হইতেছিল। প্রাঙ্গণে জল-প্রবাহ। শুধু একটা দ্বীপের ন্যায় সেই বারিবিস্তারের মধ্যে তাহার গৃহখানি জাগিয়া রহিল।

মাধবের আদেশে কতিপয় প্রকাণ্ড শূন্যগর্ভ আলকাতরা ও তৈলের পিপা ভৃত্যেরা ছাদের উপর আনিয়া রাখিল। মাধব স্বহস্তে নিপুণ শিল্পীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে পিপাগুলির ছিদ্র কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা রুদ্ধ করিল। তারপর, প্রথমে একটি, ক্রমে দুইটি, তিনটি, চারিটী এই ভাবে পিপাগুলি সাজাইয়া রাখিল। আবার ক্রমান্বয়ে, কমিয়া অপর প্রান্তে একটি পিপা রহিল। গত বৈশাখ মাসে পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বাড়ী মেরামত হইয়াছিল। তাহার বাঁশগুলি তখনও খুলিয়া লওয়া হয় নাই। মাধব কতকগুলি বাঁশ আনিবার জন্য ভৃত্যদিগকে বলিল। তারপর বড় বড় পেরেক ও দড়ি সংগ্রহ করিয়া মাধব স্বয়ং কাজ আরম্ভ করিয়া দিল।

ঠক্ ঠক্ ঠক্—অবিশ্রান্ত কার্য্য চলিতেছিল। চারিদিকে শোকার্ত্তের হাহাকার, অট্টালিকার চারি পার্শ্বে প্রলয়-বন্যার স্রোতের গর্জ্জন, তার মধ্যে মাধবের এ কি বিচিত্র খেয়াল! আত্মীয় স্বজন সকলেই বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে গৃহস্বামীর কার্য দেখিতে লাগিল। সাহস করিয়া কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, কি হইতেছে। মাধবের মূর্ত্তি তখন অত্যন্ত গম্ভীর ও কঠোর। সাধারণতঃ, সে রাশভারী লোক বলিয়া কেহ সহসা তাহাকে কোন প্রশ্ন করিতে সাহস পাইত না। এখন তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া কেহই

কোন কথা কহিল না। শুধু নীরবে তাহার কার্য্য-প্রণালী দেখিতে লাগিল।

বেলা বাড়িয়া চলিল, কিন্তু মাধবের কার্য্যের বিরাম নাই। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বোধ যে তাহার আছে, তাহার ভাব দেখিয়া কাহারও তাহা বোধ হইল না। আশ্রিত গ্রামবাসীদিগের আহার হইয়া গেল। বাড়ীর ভিতর হইতে মাধব-গৃহিণী দুই তিনবার লোক পাঠাইলেন; কিন্তু মাধব আপন মনে কাজ করিয়া চলিল।

প্রভুর সহিত পরিশ্রম করিয়া দুই জন চাকরও ক্রমশঃ অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িল। মাধবের সে দিকে দৃষ্টি নাই। গতিক সুবিধাজনক নহে, অথচ মনিবের নিকট হইতে চলিয়া যাওয়াও নিরাপদ নয়। বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। তখন মাধবের পত্নী স্বয়ং বাহিরের ছাদের উপর আসিলেন। পত্নীর আহ্বানে মাধবের চমক ভাঙ্গিল। আকাশের পানে চাহিয়া বলিল, "এত বেলা গিয়াছে। চল যাইতেছি। আর সকলের আহারাদি হইয়াছে ত? যে টুকু বাকি আছে আহারের পর শেষ করিলে চলিবে।"

পত্নী বলিলেন, "তোমার হয়েছে কি? মাথামুণ্ডু ও কি ছাই তৈরি হচ্ছে?"

মাধব গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "ভেলা।" তাহার চক্ষে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখা গেল।

স্ত্রী বলিল, "কি হবে?"

মাধব সংক্ষেপে বলিল, "দরকার আছে। দেখ্‌তে পাবে।"

৫

তখনও শুকতারা আকাশে দীপ্তি পাইতেছিল। উষার আলোক-সম্পাতে তখনও ধরণীর অন্ধকার-অবগুণ্ঠন অপসৃত হয় নাই। এমন সময় মাধবের ডাকাডাকিতে চাকরেরা ত্রস্তভাবে শয্যাত্যাগ করিল। আবার কোন নূতন বিপদ আসিতেছে কি?

না; বন্যার জলস্রোত আর ত বাড়ে নাই। বোধ হয় সারারাত্রিতে দুই এক ইঞ্চ জল কমিয়াছিল; কিন্তু সে বিশাল বারিবিস্তারের হ্রাসবৃদ্ধি সহজে অনুমিত হয় না। মাধবের ডাকাডাকিতে অতিথিবর্গের অনেকেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল; নূতন, অতর্কিত কোন বিপত্তির সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া তাহারা কোলাহল করিয়া উঠিল। মাধব তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া পেয়াদাকে ডাকিয়া তুলিল।

"দুঃখিরাম, হাতমুখ ধুয়ে নাও। একটু পরেই আমার সঙ্গে বের হতে হবে।"

সবিস্ময়ে সে মাধবের পানে চাহিয়া বলিল, "কোথায়, মশায়?" তখন তাহার নিদ্রা-ঘোর সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই।

মাধব বলিল, "তুমি এখানে কি কাজে এসেছ, তা ভুলে গিয়েছ না কি?"

মূঢ়ের ন্যায় পেয়াদা মাধবের পানে চাহিয়া রহিল। কথাটা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। সে যে সরকারী কাজে আসিয়াছে একথা সে বিলক্ষণ অবগত আছে। কিন্তু এই ঘোর দুর্দ্দিনে, বন্যা-প্লাবিত দেশে, ধ্বংস ও মৃত্যুর মাঝখানে কিরূপে যে কার্য্য হইতে পারে মূর্খ পেয়াদা তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারিল না।

মাধব যখন কথাটা তাহাকে খুলিয়া বলিল, তখন দুঃখিরাম মাধবের প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দিহান হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া সে বলিল, "হুজুর মশায়, আপনি কি ক্ষেপেছেন?"

গম্ভীরস্বরে মাধব বলিল, "কেন?"

"কোথায় যাবেন আপনি? এই সমুদ্দুর পার হবেন কি করে? কার বাড়ী যাবেন? বাঞ্ছারাম ঘোষের নাতীর বাড়ী কি এই বানের জলে এখনও আছে? তারা এখনও বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে বলতে পারে? আর এমন বিপদের সময় কি পরোয়ানা নিয়ে কেউ কোন মানুষের বাড়ী যেতে পারে? ছি! বাবু, ওসব কথা এখন ভুলে যান। তার সর্ব্বস্ব হয়ত ভেসে গেছে। পরোয়ানা নিয়ে গেলেও যে কিছু পাবেন—

মাধব গৃহমধ্যে দ্রুতপাদচারণ করিতেছিল। সহসা সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা, সে বিচার পরে হবে। এখন তুমি প্রস্তুত হও। তুমি সরকারী লোক, সরকারের হুকুম মত কাজ করে যাবে। আমি এজন্য তোমায় বিশেষরূপ পুরস্কৃত করিব। কিন্তু পরোয়ানা নিয়ে আজ যেতেই হবে। পৃথিবী রসাতলে যাক্ বা আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ুক কোন বাধা মানিব না। তোমার ভয় নাই, দুঃখিরাম। যে ভেলা বাঁধিয়াছি, বিশজন লোককে বেশ— নিরাপদে নিয়ে যাওয়া যায়। যাও এখন হাতমুখ ধুয়ে নাও।

পত্নী স্বামীর সংকল্প শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

মাধব ভিতরে গেলে তিনি বলিলেন, "এইজন্য বুঝি ভেলা বেঁধেছ? না, না, ওসব কথা এখন ভুলে যাও। এখন কি প্রতিশোধ নেবার সময়!

তোমার এত টাকা দামোদরের গর্ভে গেল, আর দুই তিন হাজার টাকার জন্ত তাহাদের এই ঘোর দুঃসময়ে পরোয়ানা নিয়ে যাচ্ছ, লোকে তোমায় কি বল্‌বে ?"

মাধব বলিল, "লোকের কথা আমি গ্রাহ্য করি না। তুমি আমায় বাধা দিওনা। শুধু টাকার বিষয় নয়। এসব মান ইজ্জত, আত্মমর্য্যাদা নিয়ে কথা। তুমি সব বুঝতে পারবে না।"

পত্নী মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাদের এমন কি দুর্দ্দশা হয়েছে ভেবে দেখ দেখি। তোমার কাছেই শুনেছি তাহাদের মাটীর ঘর। বুড়া জরে ভুগিতেছে। আমার মনে নিচ্ছে হয়ত বাড়ীর লোকজনও বানের জলে ভেসে গেছে। ওগো তোমায় পায় পড়ি তুমি এ সময় পরোয়ানা নিয়ে যেওনা।"

মাধব দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি চলিলাম, কারও বাধা আমি শুন্‌বো না। আমার বংশের মান, আমার কাছে সব চেয়ে বড়।"

মাধব বাহিরে চলিয়া গেল।

তখন বেশ আলো হইয়াছে। মাধবের আদেশ সকলে মেলিয়া কৌশলে পিপার ভেলা নীচে নামাইল। পথে আহার্য্যের বিশেষ প্রয়োজন হইবে জানিয়া মাধব টিনের বড় বড় কৌটা ভরিয়া হালুয়া, চিড়া গুড় লইল। একটা বড় বোতলে কিছু দুগ্ধও সংগ্রহ করিল। তাহার আদেশে ভৃত্য ইতিমধ্যে দুগ্ধ দোহন করিয়া গরম করিয়া রাখিয়াছিল। দুই জন ভৃত্য এবং পেয়াদা সহ মাধব ভেলায় চড়িল। তাহার বিলম্ব সহিল না। স্বয়ং লগি লইয়া ভেলা বাহিতে লাগিল।

৬

এ জলবিস্তারের কি সীমা নাই ? পূর্ব্বে পল্লীর বালকবালিকার কলকণ্ঠে যে স্থান মুখরিত হইয়া উঠিত, পল্লীবধূরা যে পথে প্রভাতে প্রদোষে কুম্ভ ভরিয়া পানীয় জল আহরণ করিতে যাইত, এখন সে সব স্থান গৈরিক জলস্রোতে পরিপ্লাবিত। শস্যশ্যামল প্রান্তর, জলপূর্ণ, গ্রামের চিহ্নমাত্র নাই, শুধু চারি দিকে সীমাহীন জলরাশি আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া তীব্রবেগে ছুটিয়াছে। দূরে দূরে দুই একখানি জলমগ্ন গৃহের শীর্ষ-দেশ দেখা যাইতেছেমাত্র। কোথাও কয়েকটি বৃক্ষ চূড়া খাড়া করিয়া তখনও বন্যার স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

মাধব দেখিল, মৃত গরু মহিষ এবং মনুষ্য জলস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। তখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছিল। মাধব নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল কিন্তু বামাচরণ ঘোষের বাড়ী দেখিতে পাইল না। এই ত হরিহরপুর! ঐ ত সেই বড় ঝাউগাছ! কিন্তু সে বাগান কই?

পেয়াদা বলিল, "তখনই ত বলেছিলুম বাবু, দেখ্‌লেন ত। গ্রামকে গ্রাম ভেসে গিয়েছে। বামাচরণ ঘোষ কি আর বেঁচে আছে?"

মাধব বলিয়া উঠিল, "ঐ যে নারিকেল গাছের সার, ওর পাশেই ঘোষেদের বড় টিনের ঘরের মটকা দেখা যাচ্ছে না? চল্‌ শীঘ্র রামা, লগি গাছা আমার হাতে দে।" মাধব স্বয়ং সবলে লগি চালাইতে লাগিল।

ভেলা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিল। ঘোষেদের চারি পোতায় অনেকগুলি বড় বড় গোলপাতার ছাউনিকরা মাটীর দেওয়ালবিশিষ্ট ঘর ছিল, কিন্তু সে সব ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শুধু দক্ষিণের পোতার বড় টিনের ঘরের পূর্ব্বার্দ্ধ জলের উপর জাগিয়া আছে। নিকটে গিয়া মাধব দেখিতে পাইল, কয়েকটি মনুষ্যমূর্ত্তি সেই মটকার উপর পরস্পর ধরাধরি করিয়া বসিয়া আছে। ভেলা দেখিয়া তাহারা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল।

সম্মুখবর্ত্তী একটা নারিকেলবৃক্ষে ভেলার এক দিক এবং অপর দিক জলমগ্ন টিনের ঘরের একটা বড় খুঁটিতে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া মাধব উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকিল, "খুড়া"।

সে কণ্ঠস্বর শুনিয়া এবং ভেলার উপর পেয়াদার মূর্ত্তি দেখিয়া মটকার উপবিষ্ট বৃদ্ধের আনন্দধ্বনি সহসা থামিয়া গেল। তাহার কৃশ, দুর্ব্বল দেহ থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। একটা কাঠের বাক্স দুই হস্তে প্রাণপণ-বলে কোলের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিয়া বৃদ্ধ যন্ত্রণাসূচক অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া উঠিল।

মাধব পেয়াদার দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখিলে, বুড়ার সব গিয়াছে বটে; কিন্তু বন্ধকী গহনার বাক্সটী ছাড়ে নাই। আমি তখনই বলিয়াছিলাম।"

ক্ষীণকণ্ঠে বুড়া বামাচরণ বলিল, "বাবা, এই কি তোমার শত্রুতা সাধ্‌বার সময়? আজ দুই দিন আমরা অনাহারী। সব ভেসে গেছে বাবা! যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই, তোমার দেনা শোধ করবো। এখন না খেয়ে আমরা মারা যাচ্ছি বাবা।"

মাধব বলিল, "আচ্ছা, এখন মটকা থেকে নেমে এস, তারপর আমি সব বুঝে নেব।"

বামাচরণের পুত্র বলিল, "মাধব বাবু, এ যাত্রা আমাদের ক্ষমা করুন। যদি বেঁচে থাকি আপনার দেনা শোধ করিব। বাবা সবে জ্বর থেকে উঠেছেন,—এমন সময় এই সর্ব্বনাশ। ছোট ছেলেটা পর্য্যন্ত কাল থেকে এক ফোঁটা দুধও খেতে পায়নি। তার গর্ভধারিণী দামোদরের গর্ভে—"

যুবকের কণ্ঠ অশ্রুভারে রুদ্ধ হইয়া গেল। বামাচরণের স্ত্রী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া আদালতের পেয়াদাটার চক্ষু অশ্রু-সিক্ত হইল।

মাধব অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "আমি এত দূর থেকে এত কষ্ট করে এলাম কি শুধুহাতে ফিরে যাবার জন্য? খুড়া, তুমি যদি না নেমে এস, আমরাই উপরে যাচ্ছি।"

মাধবের ইঙ্গিতে ভৃত্যদ্বয় চাল বাহিয়া উপরে উঠিল। মাধব সর্ব্বাগ্রে চলিল।

তাহার আদেশ লঙ্ঘন করিবার শক্তি তখন বৃদ্ধের ছিল না। পরিচারক-যুগল এবং মাধবের সাহায্যে বুড়া ভেলার উপর চড়িয়া বসিল। ক্রমে ক্রমে সকলেই নীচে নামিয়া আসিল।

মাধব বোতল হইতে দুগ্ধ বাহির করিয়া অগ্রে শিশুকে পান করাইল। তার পর বৃদ্ধকেও খানিকটা খাইতে দিল। হালুয়ার টিন খুলিয়া সকলের হাতে কিছু কিছু দিয়া মাধব বলিল, "খুড়া, দামোদর সকলেরই উপর ডিক্রী-জারী করেছেন। আমিও বাদ যাই নাই।"

তারপর পেয়াদার নিকট হইতে পরোয়ানাখানা লইয়া শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আমিও তাই আজ দামোদরের উপর ডিক্রীজারী করিলাম। চল খুড়া আমার বাড়ীতে এখনও যথেষ্ট স্থান আছে। তোমাদের কটা প্রাণীর থাকবার জায়গা কি হবে না?"

বৃদ্ধ দুইহাতে মাধবকে তাহার শীর্ণ বক্ষে চাপিয়া ধরিল। পেয়াদা আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

আলোচনা।

ভাস্কর বর্ম্মার তাম্র-শাসন।

আশ্বিনের "সাহিত্যে" সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ভাস্করবর্ম্মার তাম্র-শাসন" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রাচীন লিপি পাঠে একজন অতিশয় পারদর্শী। "ঢাকা রিভিউ" এবং "বিজয়া" পত্রিকায় প্রকাশিত দুইটি পাঠে যে অল্প অল্প বৈষম্য আছে, তিনি তাহার সমাধান করিবেন, এইটাই প্রত্যাশা ছিল। 'বিজয়া'র প্রকাশিত চিত্র নাকি স্পষ্ট হয় নাই, এই হেতুবাদে, তিনি তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু 'বিজয়া'র প্রকাশিত সেই চিত্রাবলম্বনেই মনীষি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন মহোদয় দুই পাঠের বিভিন্নতায় একটা সামঞ্জস্য বিধানে যত্ন করিয়া এই লেখককে বহু কথা জানাইয়া বাধিত ও উপকৃত করিয়াছেন। ফলতঃ দুই পাঠে পার্থক্য ও অতি কম। অনুস্বার-বিসর্গঘটিত কয়েকটি স্থল ছাড়া তিন চারিটি শব্দে সামান্য প্রভেদ ছিল। রাখালবাবু একটু চেষ্টা করিলেই তাহা ধরিয়া স্বদীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিতেন।

তাম্র-শাসনের আলোচনায় (১) "বর্ত্তমান মালিক কে?" (২) "লেখকের অনুমতিক্রমে প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে কি না?"—এই সকল কথা বোধ হয় এমন প্রয়োজনীয় নহে যে প্রবন্ধে তাহার উল্লেখাভাব সমালোচকের লক্ষ্যের বিষয় হইবার যোগ্য। রাখালবাবুর কথার ভঙ্গিতে বোধ হয়, কেহ এ বিষয়ে ফরিয়াদি হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকিবেন! তাহা হইলে স্পষ্ট করিয়া বলাই উচিত ছিল। ফলকথা, শাসনের পাঠ-প্রকাশে কাহারও আপত্তি আছে, এ কথা অন্ততঃ আমি অবগত ছিলাম না;—থাকিলে, প্রকাশ করিতাম না।

রাখালবাবু "সিভিল লিষ্টে" প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারিগণের নাম দেখিতে আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। এ বিষয়ে এতটুকু না করিলেও হইত। তবে এই সকল কর্ম্মচারীর সঙ্গে "আসামে" প্রাপ্ত তাম্র-শাসনের সম্পর্ক আছে কি না অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শন করিলেই আমরা উপকৃত হইতাম।

অবান্তর ভাবে একটি কথা বলিতে চাই। "ট্রেজার ট্রোভ (Treasure Trove)" আইন খাটাইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ভূগর্ভোত্থিত তাম্রফলকাবলীর অধিকারী হউন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। বরং তাহা হইলে, এই গুলি একত্র সুরক্ষিত থাকিবার সম্ভাবনা, এবং ভবিষ্য প্রত্নতত্ত্বালোচনাকারকগণেরও ইহাতে যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারিবে। কিন্তু প্রাপ্তিমাত্রেই যে ঐ সকল কর্ম্মচারী তাহা কাড়িয়া লইয়া যাইবেন স্থানীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে সমর্থ ব্যক্তি ইহার আলোচনা করিতে পারিবেন না, ইহাতে আমাদের কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে। স্থানীয় ব্যক্তি এমন অনেক

কথা বলিতে পারেন, যাহা ভিন্ন স্থানের লোক বিশেষতঃ ইউরোপীয় কেহ হয়তো স্বপ্নেও মনে না করিতে পারেন।

প্রত্নতত্ব বিভাগের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের প্রবন্ধ 'এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা'তে প্রকাশিত করিলে দেশের কয় জন উহা দেখিতে পাইবেন? ফলকথা, স্থানীয় লোকের নিকটে সংবৎসর কাল রাখিয়া তার পরে ইহা সরকারে লইয়া গেলে, কাহারও কোনও আপত্তির কারণ থাকিবে না। ইতিমধ্যে দেশের লোক কেহ না কেহ অবশ্যই শাসনের আলোচনা করিতে সমর্থ হইবেন। যদি নাই হন, তবে সরকারী কর্ম্মচারিগণ যথাকালে পাঠোদ্ধারাদি করিতে পারিবেন। এইরূপ ব্যবস্থায় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কার্য্যেরও সহায়তা হয়; দেশেও প্রাচীন-লিপি-পাঠাদি কার্য্য-পারদর্শী ব্যক্তিগণের আবির্ভাব হইতে পারে।

রাখালবাবু তাম্র-শাসনের আলোচনা করিতে গিয়া বলেন,—ইহার "তৃতীয় ফলকখানি হারাইয়া গিয়াছে,সুতরাং ইহাতে কোনও তারিখ নাই।" ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তৃতীয় ফলকের পরবর্ত্তী চতুর্থ অর্থাৎ শেষ ফলকখানি আছে। তারিখ থাকিলে সর্ব্বশেষেই থাকে। রাখাল বাবু যে আমাদের প্রবন্ধাদি মনোযোগ সহকারে পড়েন নাই, ইহাই তাহার প্রমাণ। তিনি স্পষ্টই মনে করিয়াছেন,—"তৃতীয় ফলকই বুঝি শেষ ফলক!"

রাখালবাবু ভাস্করবর্ম্মার শাসন ছাড়া অপর নানা শাসনে উল্লিখিত কামরূপরাজগণের বিভিন্ন তালিকা নিতান্ত অবান্তর ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল তালিকাও সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য হয় নাই। রত্নপাল, বনমাল, ও বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে বজ্রদত্তকে ভগদত্তের ভ্রাতা বলা হইয়াছে। রাখালবাবু স্বচ্ছন্দে বজ্রদত্তকে ভগদত্তের পুত্ররূপে সকল তালিকাতেই দেখাইয়াছেন।

আমরা ভাস্করবর্ম্মার পিতার "পূর্ব্ব পরিচয়" সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া রাখালবাবু দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। "ন হি সর্ব্বঃ সর্ব্বং জানাতি।" তজ্জন্য দুঃখের বিষয় কি? অপিচ পরিচয়চ্ছলে তিনি যাহা জানাইয়াছেন, তাহা ভাস্করবর্ম্মার পিতার খুব যে একটা উল্লেখযোগ্য গৌরবের কথা, এমনও নহে। আর ফ্লিট্‌ সাহেবের "গুপ্ত-লিপিমালা" হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও যে একটা অত্যুক্তির পরিচায়ক নহে, তাহাও বলা যায় না। যাহা হউক, "মগধরাজ মহাসেনগুপ্ত সুস্থিতবর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শ্লাঘ্যমনা হইয়াছিলেন;"—ভালই। ইহাতে আমার একটা অনুমান প্রমাণিত হইয়াছে। হর্ষচরিতে ভাস্করের পিতার নাম "সুস্থির বর্ম্মা" বলিয়া উল্লিখিত; কিন্তু ভাস্করবর্ম্মার শাসনে নামটি "সুস্থিত বর্ম্মা"ই আছে। প্রবন্ধে হর্ষচরিতের নাম অশুদ্ধ এবং তাম্রশাসনোক্ত নাম শুদ্ধ, এ কথা অনুমানতঃ বলিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে প্রমাণিত হইল। তজ্জন্য রাখাল বাবুকে ধন্যবাদ করিতেছি।

যে ভূমি কর্ণসুবর্ণ স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কর্ণসুবর্ণেরই অন্তর্গত হইবে, এই "অনুমান" আমি সমীচীন মনে করিয়াছি। তাহার

পরিপোষক আরও কিছু বলিয়াছি। যে স্থানে ইহা পাওয়া গিয়াছে, প্রদত্ত ভূমি যে সেইস্থানেই হইতে পারে না তদ্বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু রাখালবাবু এই সকল যুক্তি তর্কের কাছ দিয়া না গিয়া, কেবল একটি মাত্র উদাহরণ প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন যে,—"যে স্থান হইতে তাম্রশাসন প্রদান করা গিয়াছে, প্রদত্ত ভূমিও সেই স্থানের হইবে, তাহার 'কোনই কারণ নাই', কেন না "গাহড়বালবংশীয় গোবিন্দচন্দ্র দেব মুদ্গগিরি-সমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতে, গঙ্গাস্নান উপলক্ষে, যে ভূমি-দান করিয়াছিলেন, তাহা মগধ-বিষয়ে অবস্থিত ছিল না।" একটি উদাহরণে সাধারণ সূত্র হয় না। বিশেষতঃ দাতা গোবিন্দচন্দ্রের আপন বলিয়াদি বিষয় হইতে ভূমিদান করিবার বিশিষ্ট কারণও থাকিতে পারে। যাহা হউক, মদীয় অনুমানের খণ্ডন করিতে হইলে তৎপরিপোষক কথা গুলিরও প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। রাখালবাবু বলেন,—"ভাস্কর বর্ম্মা বোধ হয় হর্ষবর্দ্ধনের সাহায্যার্থ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন।" এতদ্দ্বারা রাখালবাবু বলিতে চাহেন,—কর্ণসুবর্ণ ভাস্করবর্ম্মার অধিকারভুক্ত ছিল না। কিন্তু ইহার প্রমাণার্থ তিনি কোনও প্রয়াসই করেন নাই। ফলতঃ প্রবন্ধে যে সকল প্রমাণপ্রয়োগ করা গিয়াছে, তাহা তিনি বোধ হয় মনোযোগ সহকারে পড়িবার অবসর পান নাই।

তাম্রশাসন খানির মূল্য কমাইতে গিয়াই যেন তিনি বলিয়াছেন—"হর্ষ-চরিতে ও হুয়ানচুয়াঙ্গের বিবরণে ভাস্করবর্ম্মার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নূতন তাম্রশাসন হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম স্থির হইল 'মাত্র'।" কিন্তু হুয়ানচুয়াঙ্গের হর্ষচরিতের কথাই কি ভাস্করবর্ম্মার পরিচয়ের পক্ষে 'যথেষ্ট'? প্রায় তিন শতাব্দি কালের কামরূপরাজগণের নাম যে এই শাসন হইতে পাওয়া গেল, ইহা কি অল্প কথা? হর্ষচরিত থাকিতেও, শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেবের "আসাম-ইতিহাসে" ভাস্করবর্ম্মার পূর্ব্ব-পুরুষের একটী নামও উল্লিখিত হয় নাই, এবং হুয়ানচুয়াঙ্গের গ্রন্থ ও হর্ষ-চরিত পাঠ করিয়াও ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ লিখিয়াছেন,—"Almost certainly he (ভাস্কর বর্ম্মা) must have been a hinduized Koch aborigine (Early of History p. 1 341) India তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পর স্মিথ সাহেবের এ কথা আর শ্রদ্ধালাভ করিতে পারে কি? রাখাল বাবু যাহাই বলুন, শ্রীযুত গেইট্ সাহেব 'বিজয়া'র প্রবন্ধ পড়িয়া লেখককে জানাইয়াছেন,—"The find is one of extraordinari value" (১) অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

(১) ঢাকা-রিভিউ পত্রে প্রকাশিত অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসন-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, ভিন্সেণ্ট স্মিথ, অধ্যাপক র‍্যাপসন্ প্রভৃতি ইউরোপীয় মনীষিগণও তাঁহাকে এই রূপ মর্ম্মেই পত্র লিখিয়াছেন।—সাহিত্য-সম্পাদক।

সহযোগী সাহিত্য।

—:•:—

"NATIONALISM."

"সজাতিকতা।"

বিলাতের বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার ব্যবহারাচার্য্য (Lord Chanceller) ভাইকাউণ্ট হ্যাল্‌ডেন, আমন্ত্রিত হইয়া ক্যানেডার মণ্ট্রিল নগরে ব্যবহার-শাস্ত্রের ব্যাখ্যান করিতে গিয়াছিলেন। গত আগষ্ট মাসে তাঁহার ব্যাখ্যান আরম্ভ হয়। এই ব্যাখ্যানে তিনি Nationalism বা সজাতিকতার একটা ইতিহাস ও বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা উহারই সংক্ষিপ্তসার এই স্থানে প্রকাশ করিলাম।

Nationalism এই শব্দের অর্থ কি? মার্কিণ যুক্তরাজ্যে (United States) ইউরোপের সকল দেশের সকল রকমের জাতি যাইয়া উপনিবিষ্ট হইতেছে কিন্তু মার্কিণের প্রজা হইবার পরই তাহারা ইয়াঙ্কী (Yankee) বা মার্কিণ জাতীয় মানবে পরিণত হইতেছে। তাহারা নিজেদের ভাষা, ভাব, ধর্ম্ম ও সমাজ-পদ্ধতি স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষা করিলেও তাহারা মার্কিণ বলিয়া পরিচিত হইতেছে। এমন কি জর্ম্মণ, ফরাসী, হিস্পানী, ইতালীয়, রুষ, পোল, আইরিষ প্রভৃতি জাতি সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পল্লীতে স্বতন্ত্র ভাবে থাকিলেও, পরিচয় দিবার সময় তাহারা মার্কিণ বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেছে। ক্যানেডায় এই রূপে ইংরেজ, ফরাসী এবং জর্ম্মণ জাতির সম্মিলন ঘটিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ইংরেজ এবং ওলন্দাজ বুয়র এক হইতেছে। ইংরেজ, ফরাসী এবং জর্ম্মণ জাতির উপনিবেশসকলে এই ভাবে নানা জাতির সমন্বয়ে এক একটা নূতন জাতির সৃষ্টি হইতেছে। ফরাসী মনীষি মণ্টেস্কু জাতির এবং জাতীয়তার যে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাহা এখনও ইউরোপের বিদ্বজ্জন সমাজে মান্য এবং গ্রাহ্য হইয়া আছে, তাহা ইউরোপের সভ্য সমাজে বর্ত্তমান কালে আর টেক্‌সহি হইয়া থাকিতে পারে না। বর্ণ, ধর্ম্ম, ভাষা এবং মূল বীজের ঐক্য বা মমতা থাকিলেই এখন আর এক জাতির সৃষ্টি হয় না। তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের ইয়াঙ্কীদিগকে একজাতীয় বলা চলে না। অথচ তাহারা একজাতি; ইউরোপ মার্কিণকে একজাতি বলিয়া গ্রাহ্য করিতেছেন। কাজেই এখন জাতির এবং জাতীয়তার নূতন বিবৃতির নির্দ্ধারণ করিতে হইবে; বর্ত্তমান কালের জাতিত্বের বিশ্লেষণ করিয়া Nation এবং Nationalismএর নূতন অর্থের নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কিন্তু এই নির্দ্দেশ এবং নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে আর্য্য-জাতির মধ্যে Nation শব্দটা কি ভাবে ফুটিয়া উঠিল তাহা বুঝিতে হইবে।

বৈদিক অথবা নর্স (Norse) যুগে, যখন আর্য্যগণ যাযাবর ছিলেন,

তখন বর্ণ, ধর্ম এবং বীজ-সাম্যে জাতির সৃষ্টি হইত—তখন এক পুরাণ পুরুষের বংশধরগণ এক জাতির বা এক শ্রেণীর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেন। তখন জাতির দেশবিশেষের সীমামধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। তখন ভূমির সহিত জাতির কোন সম্বন্ধ ছিল না। জাতীয়তা Personal ছিল, territiorial ছিল না। এ ভাবটা আর্য্য জাতি সকলের মধ্যে এখনও প্রবল আছে। ভারতের ব্রাহ্মণ যে দেশেই বাস করুক না সে ব্রাহ্মণ থাকিবে এবং তাহার জাতিগত আচার পদ্ধতি, বিধি নিষেধ সকল দেশেই প্রবল থাকিবে। ইংরেজ যেখানেই থাকুক সে ইংরেজ ব্রিটিশ; তাহার জাতিগত অধিকার এবং দায় সে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমান ভাবে বহন করিবে। আর্য্যের এই ব্যক্তিত্ব জাতি ও সমাজ হিসাবে এই বৈশিষ্ট্য উহার পুষ্টির ও বিস্তারের হেতু। এই ব্যক্তিত্ব উহার মেদমজ্জাপ্রকৃতির সহিত যেন গাঁথা। তাই আর্য্যের মধ্যে জাতিত্বের স্ফুরণ প্রথমে গোষ্ঠীতে (Clan) হইয়াছে; বহুগোষ্ঠি সম্মিলিত হইয়া একটা সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়াছে। সঙ্ঘই জাতি বা "নেশন"; যাহা সঙ্ঘাত্মক তাহাই ইংরেজি ভাষায় Nationalism। সংঘের প্রতি আত্মীয় ভাবকেই উদ্দেশ করিয়া এই শব্দের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হইয়াছে।

ইউরোপে Feudalism বা ভৌমিকতা প্রকট হইবার পর আর্য্যগণের জাতিবৈশিষ্ট্য দেশের বা ভূমিবিশেষের সীমায় নিবদ্ধ হইয়াছিল। এক স্থানে কিছুকাল স্থায়ীভাবে বাস করিলেই সেই স্থান বা দেশের প্রতি একটা মমতার ভাব মনে জাগিয়া উঠে। এই মমত্বকেই দেশাত্মবোধ বলা হয়। বৈদিক যুগে আর্য্যগণ ব্রহ্মর্ষি দেশ এবং ব্রহ্মাবর্ত্তকে আমার দেশ বলিয়া চিনিয়াছিলেন। ইউরোপে নর্সগণ নরওয়ে এবং সুইডেনকে স্বদেশ বলিয়া ওডেনের (Oden) লীলাক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। তথাপি ইহাদিগের মধ্যে প্রকৃত দেশাত্মবোধ—Territorial Nationalism অর্থাৎ দেশজ জাতিপ্রীতি বা সঙ্ঘাত্মকতা ফুটিয়া উঠে নাই। যখন এক একটি গোষ্ঠীর এক জন ভূস্বামী নির্দ্দিষ্ট হইল, যখন গোষ্ঠীর প্রত্যেকের গোত্র ঠিক হইল, তখনই "জননী জন্মভূমি" এই জ্ঞানটা আর্য্যগণের মধ্যে প্রকট হইয়াছিল। ইউরোপে Feudalism বা ভৌমিকতা প্রচলন হইবার পর, দেশগত জাতীয়তার বিকার ঘটে। ইউরোপের বর্ত্তমান ব্রিটিশ, ফরাসী, জর্মণ, ইটালীয় এবং রুষ প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি Feeudal clans বা ভৌমিক গোষ্ঠী সকলের সমবায়ে ঘটিয়াছে। এই Feudalism বা ভৌমিকতা আর্য্যগণ শক-হূণ প্রভৃতি জাতির নিকট শিক্ষা করিয়াছিল। রোম ও গ্রীসের প্রাধান্য-কালে উহা ছিল না। হূন আক্রমণের পর রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলে, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রচার হইলে এই Feudalism বা ভৌমিকতা ইউরোপে প্রচলিত হয়। এই ভৌমিকতার পরিপাকের ফলে বর্ত্তমান ইউরোপের সৃষ্টি এবং উৎপত্তি। উহা হইতেই আমরা দেশগত জাতীয়তা শিক্ষা করিয়াছি; উহা হইতেই ব্রিটিশ, ফরাসী, জর্মণ, ইতালীয়, রুষ প্রভৃতি জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছে।

এই খানে একটা কথা বলিয়া রাখিতে হইবে। এই জগতের ইতিহাসে যখন যে জাতি প্রবল ও পরাক্রান্ত হইয়াছে, তখন সেই জাতি স্বীয় বিশিষ্টতার প্রভাবে অন্য সকল দুর্ব্বল ও হীন জাতিকে দীর্ঘ কালের জন্য আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। রোমের প্রাধান্যকালে রোমক ভাব ইউরোপ ও এসিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দুর্ব্বল জাতিসকল অনুচিকীর্ষার বশে, নিজেদের বিশিষ্টতা নষ্ট করিয়া রোমের আদর্শে নিজেদের গড়িয়া তুলিতেছিল। পরে ইস্‌লাম-প্রাধান্য-কালে দক্ষিণ ইউরোপ, উত্তর আফরিকা এবং দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া মোস্‌লেম-ভাবে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইউরোপে, মধ্যযুগে চতুর্থ হেনরী হইতে বোনাপার্টির কাল পর্য্যন্ত ফরাসী জাতির প্রাধান্য থাকাতে, ফরাসী ভাষা ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ভাষা হইয়াছিল; লাটীন কেবল রোমান কাথলিক ধর্ম্মের ভাষা হইয়া সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে নিবদ্ধ ছিল। এখনও ফরাসী ভাষা না জানিলে ইউরোপের সকল দেশে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করা যায় না। যেমন একটা প্রবলচিত্তের মানুষ দুর্ব্বল অন্য জনকে hypnotise বা মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন করিতে পারে, তেমনি একটা প্রবল জাতি অন্য সকল দুর্ব্বল জাতিকে কিছু কালের জন্য hypnotise বা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। অনেক ক্ষেত্রে Nationalism বা সজাতিকতা এবম্প্রকারের hypnotism বা সম্মোহন শক্তির ফলস্বরূপ। এক কালে রোম জগৎকে সম্মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; তাই জগতের অনেকে রোমক নাগরিক (Roman citizen) হইতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত। যখন ইস্‌লাম এই সম্মোহন অস্ত্র ধারণ করিলেন, তখন অৰ্দ্ধেক জগৎ ইস্‌লাম-ভাবাপন্ন হইল; এক চতুর্থাংশ মোস্‌লেম হইয়াছিল। এখন ইউরোপের হস্তে ঐ সম্মোহন অস্ত্র ন্যস্ত হইয়াছে; বিশেষতঃ ব্রিটিশ জাতি উহার সদ্ব্যবহার করিতেছেন, তাই মার্কিণ যুক্তরাজ্যে ইউরোপের নানাজাতির সমবায়ে এক নূতন আঙ্গলো মার্কিণ (Anglo-American) জাতির উদ্ভব হইতেছে। জর্ম্মণ মনীষিগণ এবম্বিধ জাতির সম্মোহনের সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের ভাষায় উহার অভিব্যঞ্জনার নিমিত্ত একটা নূতন শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে।

জাতি-সৃষ্টির পক্ষে দুইটি শক্তি অবশ্য প্রযুজ্য। যে জাতির মধ্যে এই দুইটি শক্তি যত প্রবল, সেই জাতি জগতের মধ্যে তত প্রধান এবং প্রবল। ইংরেজিতে এই দুইটির নাম Cohesion এবং Co-ordination অর্থাৎ আশ্লেষণ এবং অঙ্গাঙ্গীকরণ। জাতির সমষ্টি যত দিন সমষ্টির মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া ডুবিয়া থাকে, ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্য প্রকট করিবার জন্য কোন চেষ্টা না করে, তত দিন ঐ জাতি প্রবল থাকে। ইহাকেই বলে cohesion অর্থাৎ এক অপরে যেন আটার মতন লেপ্‌টিয়া থাকে, যেন কণ্ঠাশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। তাই উহার নাম আশ্লেষণ দিয়াছি। গ্রাণ্ট এলেন বলেন যে, এই cohesivenessই জাতীয় ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মবর্জ্জিত হইলেই জাতি ধূলিমুষ্টির ন্যায় শিথিল হইয়া পড়ে; তখন ফুৎকারে সে জাতি উড়িয়া যায়। এই আশ্লেষণ প্রবল থাকিলে অতিপ্রবল শক্তির সজ্ঘাতে জাতি

নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইতে পারে, পরন্তু কখনই পরাজয় স্বীকার করিয়া গৃহপালিত পশুজীবন অতিবাহন করে না। ইহার পরই co-ordination বা অঙ্গাঙ্গীকরণ। বহু অঙ্গ না থাকিলে সমাজ থাকে না। প্রত্যেক অঙ্গ যদি অপর অঙ্গের সহায়তা না করে, তাহা হইলে সমাজ দেহ নষ্ট হয়। দেহীর সমবায়ে সমাজ। দেহের সকল লক্ষণ সুতরাং সমাজে পরিস্ফুট হইবেই। অতএব দেহের রক্ষার নিয়ম সকল ব্যাপক ভাবে সমাজে প্রয়োগ করিতে হয়। co-ordination দেহরক্ষার, সৃষ্টিবিস্তৃতির প্রধান এবং প্রথম নিয়ম। কাজেই সমাজ-শরীরের রক্ষার পক্ষে অঙ্গাঙ্গীকরণকে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই দুইটা গুণ মার্কিণ যুক্তরাজ্যের অধিবাসীবর্গের মধ্যে খুব প্রবল আছে। উহাদেরই প্রভাবে ইউরোপের সকল জাতির সংমিশ্রণে আমেরিকার উর্ব্বর ভূমিতে নবীন প্রবল জাতির সৃষ্টি হইতেছে। ভূমির প্রভাব, জলবায়ুর প্রভাব, প্রতিবেশ-প্রভাব অপরিহার্য্য। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের ইংরেজ এবং নানা উপনিবেশের ইংরেজ চিরকাল এক থাকিতে পারে না। প্রতিবেশ-প্রভাব উপনিবেশের ইংরেজকে বিকৃত করিবেই। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের জলবায়ুর প্রভাবে উপনিবিষ্ট ইউরোপীয় জাতি সকলকে পরিবর্ত্তিত হইতে হইয়াছে। ইয়াঙ্কী ইংরেজে এবং ব্রিটিশ ইংরেজে এখন অনেক বৈষম্য ঘটিয়াছে। আবার মার্কিণের ঔপনিবেশিক অষ্ট্রেলিয়া এবং ত্রনিউজল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিকের মত নহে। যতই পরিবর্ত্তন হউক বীজপ্রভাব যুগান্তরব্যাপী। সেই প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জাতিত্ব বজায় রাখিতে পারিলে ব্রিটিশ "ন্যাশনালিজম" সনাতন হইতে পারে।

দ্বিজেন্দ্র-প্রসঙ্গ।

২

নৈতিক বল ও সমাজ-সংস্কার।

দেশ-প্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল সমাজ-সংস্কারে একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য-পালনের পরম পক্ষপাতী হইয়াও নিজের জীবনে ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষা করিয়াও তিনি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিধবাবিবাহের পক্ষপাতীই ছিলেন। বিলাত-প্রত্যাগত দ্বিজেন্দ্রলাল বিনাপরাধে, অকারণে হিন্দুসমাজের প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা মানিয়া লইতে প্রস্তুত না হওয়ায়, আমি যত দূর জানি, গোঁড়া হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক তিনি পরিত্যক্ত হন। হিন্দুসমাজ তাঁহাকে ত্যাগ করিলেও তিনি কিন্তু আমরণ হিন্দুসমাজের শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুর শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ই

বিধবা-বিবাহ করিয়াছিলেন। অবস্থা-বিশেষে বিধবাবিবাহ সমাজের দিক্ দিয়া সমর্থনযোগ্য স্বীকার করিতেন; কিন্তু, কি বিধবা কি বিপত্নীক উভয়ের পক্ষেই ব্রহ্মচর্য্য-পালনই সম্পূর্ণ বিহিত বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

আহার-সম্পর্কে জাতিবিচার রক্ষা করা, তিনি সমাজের পক্ষে শুধু যে নিষ্প্রয়োজন তাহা নহে—অবশ্য পরিত্যাজ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিলোপ-সাধন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। জাতি বা বর্ণ-নির্ব্বিচারে বিবাহাদির অনুষ্ঠান তিনি আবশ্যক বা সমাজের পক্ষে হিতকর মনে করেন নাই। কিন্তু, স্পর্শদোষ বা টিকির মাহাত্ম্য তিনি স্বীকার করিতেন না। তিনি স্বীয় পুত্র, মদীয় পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ দিলীপ কুমারের উপনয়ন-সংস্কার করিয়াছিলেন, এবং আমায় এক দিন বলিয়াছিলেন,—"রক্তসংমিশ্রণের আমি আদৌ কোনও আবশ্যক বা উপকারিতা বুঝিতে পারি না।" দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। সুপাত্রের অভাব না ঘটিলেও, অদ্যাপি তিনি তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী মায়া দেবীর বিবাহ দিয়া যান নাই! বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না বটে; কিন্তু দস্তুরমত 'কোর্টসিপ' প্রচলিত হওয়ার বিপক্ষেই তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাকে একদিন কথার ছলে তিনি কহিয়াছিলেন—"প্রাপ্তযৌবন পুত্র-কন্যা অনেক সময়ে বয়সের দোষে নিজেদের ভবিষ্যৎ বুঝিয়া, বিবাহ-ব্যাপারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ নহে; এ সম্বন্ধে পিতামাতার ন্যায় তাহাদের যথার্থ হিতার্থী এসংসারে আর কেহই নাই,—তাহারা নিজেরাও নহে।" নিপুণ তার্কিক দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত যথারীতি এ সম্পর্কেও আমার বিচার-বিতর্ক হইয়াছিল। পণগ্রাহী লোভপরায়ণ পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের প্রসঙ্গ উঠিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—"পণ-গ্রহণ আমি অন্যায় মনে করি না। যে দেশে বাল-বিধবা ব্রহ্মচারিণী দেবীর অভাব নাই, সে দেশে যোগ্য-পণ-দানে অক্ষম দরিদ্র পিতার কুমারী কন্যা কেন যে দু'দশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারিবে না, বুঝা যায় না। পিতার পক্ষে পুত্র ও কন্যা কেহই কম আদরনীয় নহে। কন্যাকে জন্মের শোধ ফাঁকি দিয়া, পুত্রের জন্য সর্ব্বস্ব রক্ষা করা আমি গর্হিত ও অন্যায় মনে করি। কন্যাটির আজীবন ভরণপোষণের ভার যে লইবে সে কেন যে ন্যায়তঃ পণ-গ্রহণ করিবে না বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর। এ দেশে এ প্রথা আজ নূতন নহে, এবং বিলাতেও

Free Love বা অবাধ-প্রণয় প্রচলিত থাকাসত্ত্বেও, সেখানেও এই Dower system পণ-প্রথা যে নাই এমন কথা কেহই বলিবেন না।" সমাজে বয়স্থা কন্যা গৃহে রাখিলে লোকে নিন্দা করে বলিলে, তিনি শুদ্ধ তাঁহার স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গহাস্য করিতেন ও বলিতেন—"লোক-নিন্দা! লোকনিন্দা! আগে সমাজের জন-সাধারণ শিক্ষিত হউক। তারপর তাহাদের নিন্দায় কর্ণপাত করা যাইবে।

আমি মনস্বী দ্বিজেন্দ্রলালের কোন মত এ স্থলে সমর্থন করিতে আসি নাই। তবে, এই টুকুই আমার কথা যে, লোকাপবাদ বা সমাজের ভয়ে তিনি কখনও নিজের Principle বা লক্ষ্য বিস্মৃত হন নাই। জীবনে যাহা জ্ঞান ও বিশ্বাসানুসারে তিনি সত্য, শুভ, ও সুন্দর বলিয়া জানিয়াছেন, স্বীয় সাধ্যানুসারে তাহাই তিনি সম্পন্ন করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠা বা দ্বিধা বোধ করেন নাই।

স্বাবলম্বন ও স্বাধীনতা-প্রীতি।

আমরা অতি সংক্ষেপে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের ক'একটাদিক মাত্র স্পর্শ করিয়া গিয়াছি! এখন তাঁহার পবিত্র জীবনের আর একটি প্রধান বিশেষত্ব (সম্পর্কে আমার বক্তব্য) আপনাদিগকে জানাইব। দ্বিজেন্দ্রলাল কৃতিত্বের সহিত কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম.এ. পাশ করিয়া বিলাত গমন করেন ও সেখানে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সামান্য ডেপুটির কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সমসাময়িক সহযাত্রী ও সতীর্থগণের মধ্যে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষের নাম আজ সকলেই অবগত আছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাদের অপেক্ষা শিক্ষা ও জ্ঞানে কোন অংশে হীন না হইলেও, গভর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করায়, আজীবন দৈব বিড়ম্বনা বশতঃই তিনি সামান্য ডেপুটিই করিয়া গেলেন। আর আজ স্বাধীনজীবি আশুতোষ ও ব্যোমকেশ অতুল ঐশ্বর্য্য ও সম্মানের অধিকারী হইয়া দেশের ও দশের নেতৃপদবাচ্য হইয়া রহিয়াছেন। ডেপুটি-দের মধ্যেও অনেকে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলালের অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ও ঘটিল না। ইহার হেতু অনুসন্ধান করিলে দ্বিজেন্দ্রলালের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা-প্রীতির কথা স্বতই আমার মনে উদয় হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ডেপুটি ছিলেন বটে; কিন্তু

জীবনে তিনি কখনও সেলাম ঠুকিয়া উপরিওয়ালার 'খয়েরখাঁ-গিরি' করেন নাই। গভর্ণমেণ্টের ভার-প্রাপ্ত সর্ব্ববিধ কার্য্য অনুগত দাসের ন্যায় তিনি সবিশেষ যোগ্যতার সহিতই সম্পন্ন করিতেন; কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই শেষ। ইংরাজজাতির বিবিধ-গুণ-মুগ্ধ দ্বিজেন্দ্রলাল অকপটেই ইংরাজের অনেক গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু পদ, সম্মান লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে একদিনও কেহ লালায়িত হইতে দেখে নাই। কত দটিরাম তৈল-মৃক্ষণ-দক্ষতায় রায়বাহাদুরি হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ স্পৃহনীয় পদবীতে আরোহণ করিয়া যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায় উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; কিন্তু তুচ্ছ পদ-মর্য্যাদার জন্য আত্ম-সম্মান বিনষ্ট করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল কখনও প্রস্তুত ছিলেন না,—বরং তদ্রূপ নীচ-বৃত্তিকে নিতান্তই ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। এক দিন উক্তবিধ কোন খেতাবী ডেপুটী দ্বিজেন্দ্রলালের কলিকাতার ভবনে শুভাগমন করিয়া নির্লজ্জের ন্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"বলি Mr. দ্বিজু! তুমি কেমন লোক হে? আমার এই সম্মান-লাভে বিশ্বশুদ্ধ লোক আজ আমায় Congratulate করলে, আর তুমি কি না আপনার লোক হইয়া, আমার একটা খোঁজও নিলে না!" শুনিয়াছি, দ্বিজেন্দ্র-লাল তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে যে সরকার বাহাদুর ব্যঙ্গ করেছেন, সেটা বুঝি বুঝলে না? তা না হলে তোমার মত অশিক্ষিত লোকেরও খেতাব মেলে!" শুনা যায়—অতঃপর উক্ত ডেপুটী আর কখনও দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু সরল, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল কাহারও নিন্দাপ্রশংসা জীবনে কখনও গ্রাহ্য করেন নাই;—পরন্তু যাহা যখন তিনি সত্য মনে করিয়াছেন, কাহারও মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া তাহাই সঙ্গত বলিয়া তিনি অকপটে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীন-চিত্ত দ্বিজেন্দ্র-লালের স্বভাবজ এই সকল ব্যবহার সময়ে সময়ে তাঁহাকে অনেকের নিকটে অত্যন্ত অপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল; এমন কি, আমি জানি—এ ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী শত্রুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল; কিন্তু একদিন তাঁহাকে এ বিষয়ে সতর্ক করিতে গিয়া যে উত্তর শুনিয়াছিলাম, তাহা শুনা অবধি আমি আর তাঁহাকে এ সকল ব্যাপারে কোন কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন—"কি বল তুমি? জীবনে তো কাহারো মুখ চেয়ে চলিনি, আজ এই বৃদ্ধ বয়সে কিসের জন্য কার জন্য কি লাভের আশায় বিবেক ও বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া

লোকের মন-রাখা কথা বল্‌তে যাব? অমন নীচ বলে আমাকে ভাববার তোমার কি কারণ আছে?"

গবর্মেণ্টের চাকুরী করিয়া শপকের প্রাণ লইয়া তিনি জীবনধারণ করিতেন না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার মনীষা, তাঁহার প্রভাব ও শক্তি, তাঁহার অপরিসীম সাহস ও স্বাবলম্বনপ্রিয়তা সমগ্র বঙ্গদেশে এমন কোনও সাহিত্যসেবী নাই, যিনি আজ নত-শিরে স্বীকার করিতে বাধ্য না হইবেন। আমি তাঁহার স্বাধীনতা-প্রীতির এতই ঘটনা জানি যে, এ স্থলে তাহা বলিতে আরম্ভ করিলে শেষ করিয়া উঠা অসম্ভব হইবে।

সাহিত্য-সেবা।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-শক্তি অতি বালককাল হইতেই স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার যখন ১৩।১৪ বৎসর বয়স তখনই তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। শৈশবে তাঁহার সঙ্গীত-প্রীতি ও কবিত্ব-রস-গ্রাহিতা তাঁহাকে স্বতন্ত্র ভাবেই স্বজনগণমধ্যে বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল। বাল্যকালে তাঁহার জনৈক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে কবিতা রচনা করিতে বলিলে, অপরিণতমতি দ্বিজেন্দ্রলাল স্বল্পকাল নীরব রহিয়া, তারকাপুঞ্জের উদ্দেশে একটি ছোট কবিতা মুখে মুখেই রচনা করিয়া আবৃত্তি করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বয়ঃক্রম যখন তের কি চৌদ্দ, তখনকার রচিত কতকগুলি সঙ্গীত তিনি "আর্য্যগাথা" নামক পুস্তকে ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়াই মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। "আর্য্যগাথা" গীতিকাব্য হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে যে উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়াছিল, অদ্যাপি বঙ্গীয় কোনও কবির বাল্য-রচনা তদ্রূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়া আমি অবগত নহি।

"আর্য্যগাথা" প্রকাশের পর কিছুকাল কবিবর অধ্যয়নে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং বিংশ বর্ষ বয়সে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে গমন করেন ও তথায় প্রায় তিন বৎসর কাল যাপন করেন। বিলাতে অবস্থিতিকালেও তাঁহার সাহিত্য-সেবার বিরাম ছিল না। তিনি সেখানে "Lyrics of Ind" নাম দিয়া কতকগুলি ইংরাজি কবিতা প্রকাশিত করেন। এই কবিতাপুস্তকখানি পাঠ করিলে কবির ভাব-ব্যঞ্জনা ও কল্পনা-প্রস্ফুরণে অসামান্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও এ কাব্য তাঁহার বাল্যরচনা "আর্য্যগাথা"র ন্যায় আন্তরিকতাপূর্ণ নহে,

তথাপি বিদেশী ভাষায় বিরচিত তাঁহার এই কাব্যখানিও সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তৎকালে স্বদেশী ও বিদেশী সাময়িক পত্রসমূহ এবং Sir Edwin Arnold প্রমুখ বিখ্যাত সমালোচকগণ এ পুস্তকখানির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিলে তাঁহাকে হিন্দু-সমাজ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দান করেন। কিন্তু বিলাত-প্রবাস তিনি কোন রূপেই দূষণীয় বিবেচনা না করায় সমাজের ব্যবস্থা তিনি মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন না;—ফলে, হিন্দুসমাজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনা তাঁহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক হইয়াছিল। তাঁহার বন্ধু বান্ধব, এমন কি, আত্মীয়-স্বজনগণ পর্য্যন্ত যখন তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন, তখন তেজস্বী দ্বিজেন্দ্রলাল অন্তরের অনিবার্য্য ক্ষোভে ও অপমানে উৎক্ষিপ্ত হইয়া "একঘরে" নামক একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে হিন্দুসমাজের প্রতি অতিপ্রখর বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানি সাহিত্য হিসাবে স্থায়িত্বলাভের যোগ্য না হইলেও, ইহার ভাষা ও ব্যঙ্গভঙ্গী সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ইহার পর কবিবরের "কল্কি অবতার" প্রকাশিত হয়। "কল্কি অবতারে" কবিবরের রচনার অনায়াসগতি ও সরস কৌতুক প্রকৃতই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। "কল্কি অবতারে"র সঙ্গে সঙ্গে কবি "আষাঢ়ে" নামক একটি হাস্য-রস-প্রধান কবিতাগুচ্ছ রচনা করেন। এই কাব্যখানি দ্বিজেন্দ্রলালকে বঙ্গসাহিত্যে এক অভিনব স্বাতন্ত্র্য দান করিতে পারিয়াছিল; এরূপ অনাবিল হাস্য-চটুল ব্যঙ্গ বঙ্গভাষায় বিরল। নির্দ্দোষ সরল রসিকতার প্রাচুর্য্য দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্বে আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে ছিল না বলিলে, বোধ করি, অত্যুক্তি হইবে না। অনেক হাস্যরসিক লেখকের রচনায় হাস্যরসের সঙ্গে অশ্লীলতার অজস্র ও প্রচুর সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়; অনেক রচনা হাস্যের পরিবর্ত্তে বীভৎস রসেরই সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা শুচি-স্নাত অম্লান হাস্যরসের নির্ঝর। তাঁহার "হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী-যাত্রা," "অদল বদল," "ডেপুটীকাহিনী," "নসীরাম পালের বক্তৃতা" প্রভৃতি রচনাগুলি তাহার প্রমাণ।

বহুদিন পূর্ব্বে "ভারতী" পত্রিকায় "আষাঢ়ে" কাব্যখানির এক সুদীর্ঘ সমালোচনাপ্রসঙ্গে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা-সম্পর্কে যে ভবিষ্যবাণী প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে সত্যে পরিণত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গান

লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার "হাসির গান" আজ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সমভাবে সমাদৃত হইতেছে, সুতরাং তৎসম্পর্কে এ স্থলে আমার পক্ষে কিছু বলা না বলা দুই সমান। তাঁহার হাসির গানের বা যাবতীয় হাস্য-রচনারই বিশেষত্ব আছে।

বঙ্গসাহিত্যে হাস্য-রসোদ্রেকে দ্বিজেন্দ্রলাল তুলনারহিত অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অদ্বিতীয়। তাঁহার হাসির গান শুধু যে হাসায়, তাহা নহে,—উহাতে শিক্ষণীয় ও চিন্তনীয় অসংখ্য বিষয় আছে। বিস্তারিত আলোচনার এ স্থান নহে—আমি শুদ্ধ ইঙ্গিতে বলিয়া যাইতেছি।

অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলাল "পাষাণী" নামক নাট্যকাব্য ও "বিরহ" "প্রায়শ্চিত্ত" প্রভৃতি প্রহসন প্রচার করেন। তাঁহার প্রহসনগুলি বাঙ্গলা ভাষায় পরম আদরের সামগ্রী। একমাত্র রসরাজ অমৃতলালের "বিবাহ-বিভ্রাট" ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রলালের "বিরহ" ও "প্রায়শ্চিত্তে"র ন্যায় অশ্লীলতা-বর্জ্জিত, সভ্যজন-পাঠ্য প্রহসন বঙ্গভাষায় আর আছে বলিয়া আমি মনে করি না। ইহার পর দ্বিজেন্দ্রলাল "মন্দ্র" নামক একখানি খণ্ডকাব্য প্রকাশিত করেন। এই কাব্যখানি হাস্য, ও করুণ রসের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ-গুণে ও গাম্ভীর্য্যে রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ সাহিত্যরথিগণের অজস্র প্রশংসা-সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনের নব পর্য্যায়ে "মন্দ্র" কাব্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের মৌলিকতা ও অলৌকিক প্রতিভার যেরূপ অকপট ও অসঙ্কোচ খ্যাতিবাদ করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ অতিশয় নিপুণ ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক। তাঁহার নিকট হইতে এত দূর উচ্চ প্রশংসা বঙ্গসাহিত্যে আর কোনও কবি অদ্যাপি লাভ করিতে পারেন নাই, এ কথা দ্বিধাহীন হইয়াই বলিতে পারা যায়। "মন্দ্রে"র পর "তারাবাই" নামক একখানি নাট্যকাব্য প্রচারিত ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-রচনার প্রতিভা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই কাব্যখানি অমিত্রাক্ষরে গ্রথিত হইলেও, ভাষার হিসাবে মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষরের অনুরূপ নহে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, অভিনব অমিত্রাক্ষর-রীতি প্রচলিত করিতে গিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকটি আদৌ সুশ্রাব্য বা সুমিষ্ট করিতে পারেন নাই। ক্রিয়া পদের প্রসারণে কবিতা শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। "তারাবাই" কাব্যে অমিত্রাক্ষরের আমি ইহাই সর্ব্বপ্রধান ত্রুটী বলিয়া মনে করি। একটু নমুনা দেখিলেই কথাটা বুঝা যাইবে।

"হইয়াছিলাম আমি তাঁহার আশ্রমে অতিথি দ্বাদশ দিন।" বিলম্বিত ক্রিয়াপদটি পূর্ব্বে না বসাইলে ইহা গদ্য না পদ্য নির্ণয় করা নিতান্তই দুষ্কর হইত। সে যাহা হউক, "তারাবাই"এর ভাষা দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্রকাব্য' অপেক্ষা শ্রুতিকটু হইলেও ঘটনা-বিন্যাসে ও আখ্যান-বস্তুর হিসাবে রঙ্গমঞ্চে 'তারাবাই' নাটকই দ্বিজেন্দ্র-লালকে দক্ষ নাট্যকাররূপে পরিচিত করাইয়া দেয়। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার "বিরহ" ও "প্রায়শ্চিত্ত বা বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" ষ্টারে ও ক্লাসিক রঙ্গালয়ে অভিনীত হইলেও, নাট্যকার হিসাবে তারাবাই নাটকই দ্বিজেন্দ্রলালকে সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যসমাজে নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠা দান করে। অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলাল এই অকৃতী সাহিত্য-সেবকের অনুরোধক্রমে কবিতা ছাড়িয়া, গদ্যে নাটকরচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। যথাক্রমে তিনি এই সময় হইতে ছয় কি সাত বৎসরের মধ্যে "প্রতাপ সিংহ", "দুর্গাদাস", "নূরজাহান," "মেবারপতন," সাজাহান", "চন্দ্রগুপ্ত", ও "পরপারে,"—এই সাতখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেন। এই সকল নাটকে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ উদ্দেশ্যে যে সকল অমূল্য আদর্শ ও পন্থার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সম্যক পরিচয় প্রদান করা আমার পক্ষে বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রত্যেক নাটক পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিশ্লে-ষণ করিয়া না দেখাইলে, দ্বিজেন্দ্রলালের যোগ্য সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা একান্তই অসম্ভব হইবে। তাঁহার নাট্যপ্রতিভা এমনই সর্ব্বতোমুখী, বিচিত্র-রস-ময়ী যে, এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, দ্বিজেন্দ্রলাল বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। এক একটি তুলির আঁচড়ে তিনি যে কি অপূর্ব্ব চরিত্রা-ঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, বিশেষ অভিনিবেশের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসাগরে অবগাহন না করিলে তাহা কেহই বুঝিতে পারিবেন না। তাঁহার নাটকের ভাষা বঙ্গ-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন, এবং অভাবনীয়রূপেই ঐশ্বর্য্যশালী। তাঁহার উপমা অনেকটা Shelleyর ন্যায় সংহত, শোভন, যথাযথ ও একাধারে বহু-দিক্‌দর্শী। তাঁহার এক একটি চরিত্রের বিশ্লেষণ ও অন্তর্দৃষ্টির প্রাখর্য্য লক্ষ্য করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বস্তুতঃ অনেক স্থলে এই বিশ্লেষণ-শক্তি অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ।

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অধ্যয়ন-স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। সকালে, বিকালে, রাত্রিকালে—সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে অসংখ্য লোক আসিত, কিন্তু, তাঁহাকে অবসর সময়ের একটুও অপব্যবহার করিতে দেখি নাই। মনে আছে, গয়ায় মনস্বী লোকেন পালিত মহাশয়ের সঙ্গে সাহিত্যিক আলাপ

করিতে করিতে তিনি একবারেই আত্মহারা হইয়া যাইতেন ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতেছে—দ্বিজেন্দ্রলালের সে জ্ঞান নাই। বিচার-বিতর্ক-পাঠ ও আবৃত্তি তুমুলবেগে চলিতেছে। এক রাত্রি মনে পড়ে—প্রায় যখন বারটা বাজে, আমি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের অভাবে একাই আসিয়া শয্যা-গ্রহণ করিয়া গাঢ়নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছিলাম, জানি না ; সহসা নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া দেখি, ঘড়িতে তখন রাত্রি ৩॥ টা বাজিয়া গিয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলাল তখনও সমভাবেই উচ্চকণ্ঠে Byron পড়িতেছেন ও পালিত মহাশয় মাঝে মাঝে তাঁহাকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়া Shelley হইতে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছেন। এই ভাবে সচ্চিন্তা, সদালাপ, ও সৎকর্ম্মেই দ্বিজেন্দ্রলাল এ সংসারে জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে এ দেশের আজ যে অনপনেয় ক্ষতি হইল সে অভাব এ দেশে আর কখনও পূর্ণ হইবে কি না, জানি না।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

গান

১

ফুলে গানে প্রেমে আমি জড়ায়ে জড়ায়ে
দিনু মোর হৃদয় ছড়ায়ে ;
আহা, এ কবিতা সম
হ'তো যদি প্রিয়া মম !
তাহার হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া-গড়িয়া
লইতাম আপন করিয়া !

২

বৃথা গাঁথি বনফুল—তুমি কত দূরে,
না জানি কাহার অন্তঃপুরে !
নিশীথে পাপিয়া-তানে
এ গান কি পশে কাণে ?
এ প্রেম কি জাগে প্রাণে—কোন পূর্ণিমায়
হেরি' জ্যোৎস্না শূন্য আঙ্গিনায় ?

৩

কোন দিন গানগুলি—দিন যদি পায়,—
হাতে শুয়ে মুখপানে চায় !
আগ্রহে—আশায় ভুলি'
চা'বে কি অক্ষরগুলি ?
কাঁদিবে কি ছত্রগুলি বিরহ-ব্যথায়—
হৃদি মোর পাতায় পাতায় ?

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল ।

সাহিত্য ২৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

পরেশের পিসী।

পরাণপুরের পরেশ মণ্ডল নমঃশূদ্র জাতীয় কৃষক। তাহার পিসী করুণা দাসী অপত্যহীনা বিধবা। পরেশের বয়স যখন দেড়বৎসর, তখন তাহার মাতার মৃত্যু হয়। পিসী করুণাময়ী সেই সময় হইতেই পরেশকে লালনপালন করিয়াছেন। অল্পবয়সে বিধবা হইয়া অবধি তিনি পিত্রালয়েই আছেন।

পরেশর পিতা গোবিন্দ মণ্ডল পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই। অল্পদিন হইল পরেশের পিতা এবং বিমাতা উভয়েরই কাল হইয়াছে। পরেশ এখন পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক যুবক। তাহার পিসীর বয়স পঞ্চাশ বৎসরের উপর। তিনি গোবিন্দ মণ্ডলের বড় ভগ্নী।

বাড়ীতে পরেশ, তাহার পিসী এবং একজন রাখাল এই তিনটী মাত্র লোক। ইহাছাড়া একজন কৃষাণ আছে। সে দিনের বেলা কাজকর্ম্ম করিয়া রাত্রে বাড়ী যায়।

পরেশের পিতার অবস্থা বেশ ভাল ছিল। তাঁহার চারিখানি লাঙ্গলের চাষ এবং চল্লিশ পঞ্চাশ বিঘা জমি ছিল। চারিজন কৃষাণ এবং একজন রাখাল ছিল; দশবারটী হালের গরু এবং তিনি চারিটী গাই ছিল। গোবিন্দের বাড়ীতে প্রায় প্রতিদিনই দুই একজন বাহিরের লোকের পাতা পড়িত। পিতার মৃত্যুর পর পরেশের অবস্থা খারাপ হইয়াছে। গোবিন্দের হাতে সঞ্চিত অর্থ যাহা কিছু ছিল, পরেশের বিবাহে তিনি তাহা সমস্তই ব্যয় করিয়াছিলেন। পিতা এবং বিমাতার শ্রাদ্ধে পরেশকে কিছু ঋণ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু ইহাতেও পরেশের সংসারের বিশেষ অবনতি হইত না। গোবিন্দ মণ্ডলের মৃত্যুর আট নয় মাস পরে দুই দিনের মধ্যেই পরেশর গরুগুলি সমস্ত মরিয়া যায়। চর্ম্মের লোভে কোন মুচি পরেশের গরুগুলিকে বিষ দিয়াছিল।

হালের গরু গেলেই কৃষকের সর্ব্বনাশ। মুচির এই পৈশাচিক কার্য্য পরেশকে একবারে বসাইয়া দিল। ইহাতে তাহার প্রায় পাঁচ ছয়শত টাকা ক্ষতি হইল।

পরেশ সরলচিত্ত, সুস্থকায়, পরিশ্রমী এবং আত্মনির্ভরশীল কিন্তু অশিক্ষিত, ছেলেবেলায় তাহার শরীর ভাল থাকিত না বলিয়া সে লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই, নচেৎ গোবিন্দ মণ্ডলের যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাতে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবারই কথা।

পরেশ দেখিল হালের গরু কিনিতেই হইবে এবং তাহাতে টাকার প্রয়োজন। পিসীমার পরামর্শ লইয়া সে তাহার অর্দ্ধেক জমি বেচিয়া ফেলিল এবং ইহাতে যে টাকা পাইল তাহা দিয়া দুইটী ভাল বলদ গরু কিনিল ও সমস্ত দেনাশোধ করিল। সে দুইখানি মাত্র হাল রাখিল। এবং আপনি ও এক কৃষাণ এই দুইজনে উহা চালাইতে লাগিল। বাপ বাঁচিয়া থাকিতে পরেশ কখনও নিজেরহাতে হাল ধরে নাই, কিন্তু এখন সে অবস্থা বুঝিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিল।

পরেশের অবস্থা খাট হইল বটে, কিন্তু কুড়ি পঁচিশ বিঘা জমিতে যে ফসল হইত, রাজার খাজানা এবং রাখাল ও কৃষাণের মাহিয়ানা দিয়া তাহাতেই তাহার বেশ চলিয়া যাইত। কেবল চলিয়া যাইত তাহা নহে। করুণাময়ী সুগৃহিণী, তাঁহার ব্যবস্থায় স্বজাতি অতিথি বা ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক পরেশের বাড়ীতে আসিলেও পূর্ব্বের ন্যায় দুটী অন্ন পাইত।

(২)

পরেশের বিবাহের কথা বলা হইয়াছে। তাহার স্ত্রীর বয়স এখন বিশ একুশ বৎসর। একটী ছেলে হইয়াছে, তাহার বয়স তিন চারি বৎসর হইবে। এই স্ত্রীপুত্র পরেশের শ্বশুর বাড়ীতেই থাকে। গোবিন্দ মণ্ডলের শ্রাদ্ধের পরে তাহারা আর পরেশের বাড়ীতে আসে নাই। শ্বশুরবাড়ীর লোকের সহিত পরেশের সদ্ভাব নাই।

পরেশের শ্বশুর গোবর্দ্ধন মণ্ডল একজন বড় গৃহস্থ। তাহার বাড়ী পরেশের বাড়ী হইতে তিন ক্রোশ দূরে গোয়ালপাড়া গ্রামে। গোবর্দ্ধনের পিতা গৌর মণ্ডল চাষীলোক ছিলেন। গোবর্দ্ধন সামান্য রূপ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, জমিদারের গোমস্তাগিরি করিয়া,' নিজের অবস্থা ফিরাইয়াছেন। এখন তিনি গোয়ালপাড়া গ্রামের মধ্যপত্তনীদার। তাহার খামার জমি একশত বিঘারও বেশী। বাড়ীতে আট দশ জন কৃষাণ এবং দুইজন রাখাল।

গোবর্দ্ধনের চারিপুত্র এবং দুই কন্যা। পরেশের স্ত্রী ছোট।

ছেলেরা সকলেই কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছে। জ্যেষ্ঠ জমিদারের তহশীলদার এবং গ্রামের পঞ্চায়েৎ। মধ্যম হাতুড়ে ডাক্তার। তৃতীয় নামে স্কুলের মাষ্টার, কিন্তু কাজে কলিকাতার কয়েকটী প্রতারক কোম্পানির মপস্বলের এজেণ্ট বা দালাল। চতুর্থ আদুরে গোপাল এবং গোঁয়ারের একশেষ। সে বাড়ীতেই থাকে। গোবর্দ্ধনের প্রথম জামাতা নিকটবর্ত্তী মহকুমার এক মোক্তারের মহুরি। দ্বিতীয় পরেশই নিরক্ষর কৃষক। গোবিন্দ মণ্ডলের অবস্থা ভাল এবং স্বজাতিসমাজে মানসম্ভ্রম ছিল বলিয়াই গোবর্দ্ধন তাহার একমাত্র পুত্র পরেশের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

গোবিন্দ মণ্ডলের মৃত্যুর পর হইতেই গোবর্দ্ধন ও তাহার স্ত্রীর ইচ্ছা যে পরেশ তাহার পৈত্রিকবাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া গোয়ালপাড়ায় বাসকরে। কিন্তু পরেশ তাহাতে কিছুতেই সম্মত নহে। পরেশের গরুগুলি মরিয়া গেলে গোবর্দ্ধন জিদ্ করিয়া বলিয়াছিলেন "আর কাজ নাই। তুমি তোমার পরাণপুরের বাস তুলে এস। দু'একজন প্রজার জমি ছাড়িয়ে নিয়ে পঁচিশ ত্রিশ বিঘা জমি আমিই তোমাকে দেবো। একটা বাড়ীও করে দেবো। পরাণপুরে যা কিছু আছে তা বেচে ফেল।"

পরেশ শ্বশুরের কোন সাহায্য লইত না গোয়ালপাড়ায় যাইতে একবারেই অস্বীকার করিল। সে একদিন হাসিতে হাসিতে তাহার পিসীর কাছে বলিয়াছিল শ্বশুর মশাই আমাকে আমার বাপের ভিটে ছেড়ে যেতে বলেন।" সে জানিত বৃদ্ধা করুণাময়ীর ইহাতে সম্পূর্ণ অমত হইবে। করুণার কথাতে ও অমত প্রকাশ পাইল।

(৩)

পরেশ কিছুতেই গোয়ালপাড়ায় যাইতে চাহিল না দেখিয়া তাহার শ্বশুর শাশুড়ী এবং শ্যালকেরা সকলেই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইল।

পিতার মৃত্যুর পর পরেশ তিন চারিবার মাত্র শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে। ইহাতেই সে বুঝিল যে শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা তাহাকে সমুচিত আদর যত্ন করেন না বরং একটু ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্যের ভাবই প্রকাশ করেন। পরেশ এখন নিজের হাতে হাল চষে ইহা তাহারা সকলেই জানিতেন। তাহার ভায়রাভাই মাখন পরামাণিক মহকুমায় থাকিত এবং শ্বশুরবাড়ী আসিতে হইলে ফর্সা কাপড় চাদর ও ইস্ত্রি করা জামা পরিয়া আসিত। পরেশের কাপড় জামার আড়ম্বর কিছু মাত্র ছিল না। সে দেখিত মাখন এবং

সে একসময়ে শ্বশুর বাড়ীতে আসিলে তাহাদের দুইজনের আদর অভ্যর্থনা দুই প্রকার হইত বসিবার আসন এবং খাইবার বাসনও একরূপ হইত না।

মূর্খ পরেশের চক্ষে ইহা ভাল লাগিত না। সে মনে করিত মাখন এবং তাহার অবস্থার পার্থক্য যতই হউকনা কেন, শ্বশুর বাড়ীতে দুই জামাতার একরূপ আদর হওয়াই উচিত তাহার শ্বশুর শাশুড়ী এবং শিক্ষিত শ্যাল-কেরা ইহা বুঝিতনা।

ভাবিয়া দেখিলে মাখন এবং পরেশে পার্থক্য অল্প নহে। মাখন সামান্য রূপ লেখা পড়া জানে এবং মূর্খ মক্কেলদিগকে বিলক্ষণ ঠকাইতে পারে। সময়ে সময়ে সে যাহার মহুরি সেই মোক্তারকেও ঠকায়। তাহার নাম করিয়া মক্কেলের নিকট হইতে টাকা লইয়া কতক তাহাকে দেয়, কতক নিজে আত্মসাৎ করে। মিথ্যাকথা বলিতে মাখনের সংকোচ নাই বলিলেই চলে, সে অনেকসময়ে মোকদ্দমাকারী লোকদিগকে মিথ্যাকথা শিখাইয়া দেয়। আর তাহার মোক্তারের কাছে মক্কেল আনিবার জন্য সততই মিথ্যা কথা কহে।

পরেশ লেখা পড়া জানেনা সত্য, কিন্তু সে জীবনে কখনও কাহাকেও ঠকায় নাই। মিথ্যাকথা অথবা কপট ব্যবহার তাহার জানা ছিল না।

পরেশের প্রতি শ্বশুর বাড়ীর এইরূপ ব্যবহারে একটীমাত্র লোক প্রাণে বড় ব্যথা পাইত—সে পরেশের স্ত্রী। কিন্তু পিতা মাতা অথবা বড় ভাইদের বিরুদ্ধে সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না। সে দুই একবার শ্বশুরবাড়ী যাইতে চাহিলে তাহার বাপ মা উভয়েই তাহাকে ধমক দিতেন।

পরেশ তাহার স্ত্রীকে লইতে চাহিলে তাহার শ্যালকেরা ঠাট্টার হাসি হাসিয়া কহিত "সেখানে গিয়ে আর কাজ নাই—মধ্যে মধ্যে এখানে এসেই দেখে যেও। সেখানে গিয়েত কেবল গরুর জাব কাটাবে ?"

ইহাতে পরেশের মুখ ম্লান হইয়া যাইত। সে কেবল মৃদুস্বরে কহিত "পিসীমা আর কতদিন সংসার চালাবেন ?"

শিক্ষিত শ্যালকেরা ইহার কোন উত্তর দিত না।

পরেশ শেষে শ্বশুরবাড়ী যাওয়াই ছাড়িয়া দিল।

(৪)

একবৎসর হইল পরেশ শ্বশুরবাড়ী যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বে এমন একটী কাণ্ড হইয়া গিয়াছে যে, তাহাতে পরেশের প্রতি তাহার

শ্বশুর শাশুড়ী এবং শ্যালক দিগের বিদ্বেষ বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। দুর্গোৎ-সব পূজার সময়ে গোবর্দ্ধন মণ্ডল তাহার এক কৃষাণের হাতে পরেশের জন্য একজোড়া কাপড় ও কিছু মিষ্টি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কাপড় যোড়াটী এমন ছিল যে তাহা জামাইকে না দিয়া চাকরকে দিলেই ঠিক হয়। পরেশ এই তত্ত্ব ফিরাইয়া দিয়াছেন, ইহাতেই আগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

কাপড় লইয়া কৃষাণ ফিরিয়া আসিলে পরেশের শ্বশুর এবং শ্যালকগণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, এবং পরেশ ও তাহার পিসীর উদ্দেশে যারপরনাই গালিবর্ষণ করিলেন। সিদ্ধান্ত হইল যে, এ সেই বুড়ী মাগীর নষ্টামি।

গোবর্দ্ধন মণ্ডলের অবমাননা হইয়াছে শুনিয়া গোবর্দ্ধনের বাড়ীর লোক এবং গোয়ালপাড়া গ্রামের লোকও যে শুনিল, সেই রাগে গর্ গর্ করিতে লাগিল।

রাগিল না কেবল একজন কিন্তু কাঁদিল,—সে পরেশে স্ত্রী। তত্ত্বের কাপড় সে দেখিয়াছিল। ইহাও সে জানিত যে অন্যান্য বৎসর পিসীকে কাপড় দেওয়া হয়, এবার তাহা হয় নাই। অথচ এই তত্ত্ব যাইবার পূর্ব্বেই পরেশ তাহার স্ত্রী পুত্রের কাপড়ের সহিত শাশুড়ীর একখানি কাপড় দিয়াছে।

(৫)

ইহার কয়েক দিন পরেই একদিন পরেশ ও তাহার রাখাল মাঠে গিয়াছে, বুড়ী করুণাময়ী একা বাড়ীতে আছেন, এমন সময়ে সহসা পরেশের ছোট শালা বাইশ বৎসর বয়স্ক যুবক বিজয় ও গোয়ালপাড়া গ্রামের একজন প্রজা পরেশের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। বিজয় বুড়ীকে দেখিয়া কহিল "মাওই ভাল আছ?" বুড়ী উত্তর করিলেন "ভগবান যেমন রেখেছেন। বউমাকে কি পাঠাবে না?"

বি। তাত পাঠাব। বলি, মণ্ডল মশাই কোথায়? (স্বগত) চাষাকেও মশাই বল্‌তে হ'ল! বাবা কি দেখে এমন জামাই করেছিলেন।

ক। সে মাঠে গেছে।

বি। মাঠে ত যাবেনই, বলি, পূজার তত্ত্ব ফিরান হ'ল কেন?

ক। সে সেই জানে।

বি। সে জানে আর তুমি জানলা?

ক। কেমন করে জান্‌ব? তোমাদের জামাই, তোমরা তত্ব করেছ, সে ফিরিয়ে দিয়েছে।

বি। তার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে সে আমার বাবাকে অপমান করে?

ক। সে কথা তার সঙ্গে বোঝ গিয়ে।

বি। তার সঙ্গে বুঝে কাজ নেই, তোমার সঙ্গেই বুঝ্‌বো। তোমার হুকুমেই ত সে সব কাজ করে।

ক। আমার সঙ্গে বুঝ্‌বে কি? বাড়ী চড়াও হয়ে মার্‌বে না কি?

বি। মার্‌লে কি হয়? আজ তোমাকে ঠ্যাঙ্গাব বলেই এসেছি। তুমি পরামর্শ না দিলে তোমার ভাইপোর এত সাহস হয় যে আমার বাবার তত্ব ফিরিয়ে দেয়?

ইহার পর আর কথা হইল না। বিজয় এবং তাহার সঙ্গী একজন লোক নির্দ্দয় ভাবে বুড়ীকে আক্রমণ করিল। দুই চারিটা মারিতেই বুড়ী মাটিতে পড়িয়া গেল, এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দনের রব শুনিয়া পাড়ার লোক দুই চারিজন আসিতে আসিতেই বিজয় এবং তাহার সঙ্গীগণ দৌড়াইয়া চলিয়া গেল।

(৬)

পাড়ার একজন লোক যাইয়া তখনই পরেশকে ডাকিয়া আনিল। পিসীর প্রতি এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছে শুনিয়া পরেশ উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিল।

পাড়ার লোকের শুশ্রূষায় করুণাময়ী তখন একটু সুস্থ হইয়াছেন। পরেশকে দেখিয়াই তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন "বাবা, বড় সাধ করে বড় ঘরে তোমার বিয়ে দিয়েছিলাম। গোবিন্দ সেরে গেছে, কিন্তু আমিই তার প্রতিফল ভোগ কর্‌লাম।"

কথা গুলি পরেশের বুকে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল। সে কহিল এখনই আমি পিসীমাকে নিয়ে মহকুমায় যাব। মহকুমায় না যেয়ে আমি জলগ্রহণ কর্‌বো না।

প্রতিবেশীরা সকলেই পরেশকে ভাল বাসিত এবং করুণাময়ীকে ভক্তি করিত। তাহারা সকলেই পরেশকে সাহায্য করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই একখানি ডুলির বন্দোবস্ত হইল। পরেশ পিসীকে লইয়া একজন প্রতিবেশীর সহিত মহকুমায় গেল।

সেই দিনেই মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাচারিতে বিজয় এবং তাহার সঙ্গী অপরিচিত লোকের নামে নালিশ হইল। করুণাময়ী কাঁপিতে কাঁপিতে এজাহার দিলেন। পরেশ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট বিজয়ের নামে সমনের আদেশ দিলেন এবং করুণাময়ীকে সরকারী ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্তারবাবু ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিলেন এবং কহিলেন আঘাত গুরুতর নহে কিন্তু বাদিনীর বয়স এবং অবস্থা বিবেচনায় ইহাকে নিতান্ত সামান্য বলা যায় না।

(৭)

বিজয় সমনে হাজির হইল না। ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট বা গ্রেপ্তারী পরোয়না বাহির করিলেন।

দ্বিতীয় ধার্য্যদিনের পূর্ব্বেই গোবর্দ্ধন মহকুমায় আসিলেন এবং মাখনকে সঙ্গে লইয়া দুই একজন মোক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহারা সকলেই কহিলেন এ মোকদ্দমা মিটিয়ে ফেলাই ভাল। অপরাধ প্রমাণ হইলে ইহাতে আসামীর জেল হইবার কথা।

গোবর্দ্ধন চিন্তিত হইলেন এবং পরেশের মোক্তারের নিকট গেলেন। তিনি কহিলেন শালা ভগ্নীপতির মোকদ্দমা মিটিয়ে যাওয়াই ঠিক, কিন্তু পরেশ ইহা মিটাইতে রাজি হইবে বলিয়া আমার বোধ হয় না।
গোবর্দ্ধন দুই এক জন প্রধান মোক্তারকে অর্থদিয়া বাধ্য করিয়া তাহাদের দিয়া পরশের মোক্তারকে অনুরোধ করাইলেন এবং তিনি চিঠি লিখিয়া পরেশকে মহকুমায় আনাইলেন।

মোকদ্দমা নিষ্পত্তির কথা শুনিয়াই পরেশ জলিয়া উঠিল এবং মোক্তারকে কহিল "আপনি এই কথা বলেন? আমাকে দশ ঘা জুতো মার্‌লে আমি তা' সহ্য কর্ত্তাম, কিন্তু পিসীমাকে মার্! পিসী মা বাবার বড়—আর এখন আমার মা বাবা সবই তিনি। আমার পিসীর মত পিসী কি হয়?—আমি সর্ব্বনাশ হই সেও স্বীকার তবু এ মোকদ্দমার বিচার হ'ক। আপনি মোকদ্দমা না করেন না কর্‌বেন—হাকিমের কাছে কি বিচার হবে না?

পরেশ কাঁদিয়া ফেলিল।

গোবর্দ্ধন তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন এবং হাত ধরিলেন। শ্বশুরের অনুনয় বিনয়ে এবং মোক্তারদিগের বিশেষ অনুরোধে পরেশ শেষে কহিল, "পিসীমাকে না জিজ্ঞাসা করে আমি কিছুই বল্‌তে পার্‌বো না।

গোবর্দ্ধন কহিলেন, তাকে যেয়ে বল মোকদ্দমায় তোমার যে খরচ হয়েছে তা আমি দেব আর বিজয় যেয়ে তাঁর পায়ে ধর্‌বে।

(৮)

বাড়ী ফিরিয়া যাইয়া পরেশ পিসীমাকে সকল কথা কহিল এবং বলিল যে মোকদ্দমা মিটাইবার জন্য মহকুমার অনেক ভদ্রলোক অনুরোধ করিতে-ছেন।

করুণাময়ী কহিলেন, অদৃষ্টে যা' ছিল হয়েছে। তুমি ভদ্রলোকদের কথা রাখ। তাঁদের যেয়ে বল মোকদ্দমা মিটাইতে আমার আপত্তি নাই। খরচ পত্র কিছুই দিতে হবে না; বিজয়েরও এখানে আস্‌বার দরকার নাই। আমি কেবল এই চাই যে, বউমাকে এখানে পাঠিয়ে দেয়।

পিসীমার আজ্ঞা পরেশের শিরোধার্য্য। সে যাইয়া মোক্তারকে পিসীর মত জানাইল।

গোবর্দ্ধন ইহা জানিলেন। তিনি কহিলেন কন্যাকে একবার না জিজ্ঞাসা করে এ কথার আমি উত্তর দিতে পার্‌বো না। বাড়ীর কাহারও তাহাকে সেখানে পাঠা'বার ইচ্ছা নাই।

গোবর্দ্ধনের মোক্তার তাহাকে বুঝাইলেন পরেশের প্রস্তাব খুবই ভাল। ইহাতে তাহার পিসীর প্রশংসা না করে থাকা যায় না। যদি ছেলেকে জেলে পাঠাইতে না চাও, তবে এখনই ইহাতে রাজী হও। মোকদ্দমা হইলে আসা-মীর কয়েদ হওয়া অবধারিত। বুড়ীর পিঠের দাগেই মোকদ্দমা প্রমাণ হবে। হাকিম এ মোকদ্দমা নিজের হাতে রেখেছেন। সাজা কঠিন হবে সন্দেহ নাই।

গোবর্দ্ধনের মুখ শুকাইয়া গেল।

(৯)

গোবর্দ্ধন বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর সম্মুখে কন্যাকে ডাকাইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে শ্বশুরবাড়ী যাইতে চাহে কি না। কন্যা সকলই শুনিয়াছিল। সে কহিল "বাবা, আমি এখনই যাব। আপনারা পাঠা'তে চান না বলেই আমি কিছু বল্‌তে পারি না।

গোঃ। সেখানে যেয়ে ত কেবল রাখালের ভাত রাঁধ্‌বি আর মাঠে ভাত নিয়ে যাবি। তোর কি তোর ছেলের অদৃষ্টে হয় ত একটু দুধও জুটবে না।

কন্যা। সেখানে গিয়া আমি শাক ভাত খেয়ে থাক্‌বো ছেলেকেও তাই খাওয়াবো। আপনাদের এই সুখ ঐশ্বর্য্যে আমার কি হবে?

কন্যার শেষের কথায় পিতা একটু চটিলেন। এবং কহিলেন তোর এমন বুদ্ধি তা জান্‌লে ত আগেই পাঠিয়ে দিতাম্।

কন্যা। উত্তর করিল আমি ত একদিনও এখানে থাক্‌তে চাইনা। আপনারা আপনাদের জামাইয়ের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেছেন তা মনে কর্‌লে আমার জ্ঞান থাকে না। আপনারা ভদ্রলোক কিন্তু আমার স্বামী গরিব বলে তাঁকে যেরূপ ভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন তা'তে আমি চিরদিন কাঁদবো। মাকে জিজ্ঞাসা করুন এখানে আমি কিরূপভাবে দিন কাটাই। আমি বউদের সঙ্গে মিশি না, দিদির কাছে বসি না, মা কোন ভাল জিনিষ দিলে খাই না। ভাল বিছানায় শুই না, এমন কি এক খানা ভাল কাপড় পরি না। এবারকার তত্বে আমাদের বাড়ীতে যে কাপড় দিয়েছেন তা'ত আপনার কৃষাণরাই পরে। আর সেই কাপড় ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে আমার বুড়ী পিস্‌শাশুড়ীকে বাড়ীর উপর পড়ে মার্! তাঁর মত মানুষ কি হয়? তিনি ত আমার সেখানে যাওয়া ভিন্ন আর কিছুই চান নাই। দয়া করে আজই আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিন্। আমি আপনাদের দেওয়া কাপড়-চোপড় একখানিও নেব না আমার শ্বশুরের দেওয়া একখানা কাপড় তুলে রেখেছি তাই পরে শ্বশুরবাড়ী চলে যাব।

গোবর্দ্ধন কন্যার এই তীব্র অনুযোগের কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার গর্ব্বিতা গৃহিণী কন্যাকে তিরস্কারের ভাষায় কহিলেন এতদিন খাইয়ে পরিয়ে এই তার পুরস্কার?

কন্যার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে মাতার মুখ অপেক্ষা না করিয়া কহিল যখন গর্ভে ধরেছ তখন ত খাওয়াবেই। বাপ মার ঋণ কেউ কখনও শোধ করিতে পারে না। আমি ত কতদিন যেতে চেয়েছি, কিন্তু আজ আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর তোমাদের বাড়ীতে থাব না। তোমরা না পাঠাও, আমি হেঁটে চলে যাব।

কন্যার এইরূপ কথা শুনিয়া এবং বিজয়কে জেল হইতে বাঁচাইবার জন্য গোবর্দ্ধন সেই দিনই কন্যাকে পরেশের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। মোকর্দ্দমা মিটিয়া গেল।

(১০)

আজ আট-দশ দিন পরেশের স্ত্রী শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়াছে। ফাল্গুনমাস গত রাত্রে বেশ এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মাঠে "যো" পড়িয়াছে, অর্থাৎ এই বৃষ্টিতে জমি চাষের উপযুক্ত হইয়াছে। আজ সকল চাষাই—তাহাদের যত জমিতে পারে লাঙ্গল দিবে।

পরেশ প্রত্যূষেই লাঙ্গল গরু লইয়া কৃষাণের সহিত মাঠে গিয়াছে। পিসীকে বলিয়া গিয়াছে রাখাল আসিবে মাঠে ভাত পাঠাইয়া দিও। বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে রাখাল বাড়ী আসিল। পরেশের স্ত্রী আসিয়া অবধি একদিনও পিসীকে রাঁধিতে দেয় নাই। সে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। করুণাময়ী কহিল রাখালের সঙ্গে আমি ভাত দিয়ে যাই। জিদ্ করিল আমি যাব। বুড়ি কহিল যে ক'দিন আমি আছি সে ক'দিন তোমাকে মাঠে যেতে হবে না এর পর যেও। বউ কিছুতেই শুনিল না। রাখালের সঙ্গে সঙ্গে মাঠে চলিল। চারি বৎসরের শিশু পুত্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইল। মাকে ছাড়িয়া সে কিছুতেই বাড়ীতে থাকিতে রাজি হইল না। বৃদ্ধা অনেক করিয়া তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু সে কিছুতেই শুনিল না।

পরেশ যে জমিতে চাষ দিতে ছিল তাহার পাশে একটা বড় আম বাগান, নিকটে একটি পুকুর। বাড়ী হইতে জমিতে যাইতে হইলে এই আম বাগান পার হইয়া যাইতে হয়। পরেশের স্ত্রী-পুত্র ও রাখাল চলিয়া গেলে করুণাময়ী বাড়ীতে থাকিতে পারিলেন না। জিনিষ্যের দরজা বন্ধ করিয়া মাঠের দিকে চলিলেন, এবং রাখাল ও বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাহারা দেখিতে না পায় এমন ভাবে সেই আম বাগানের ভিতর একটি গাছের আড়ালে যাইয়া দাঁড়াইলেন।

পরেশ ও তাহার কৃষাণ ক্ষুধার্ত্ত। তাহারা তাড়াতাড়ি পুকুরের জলে হাত পা ধুইয়া খাইতে বসিল। রাখাল বাড়ী হইতেই খাইয়া গিয়াছিল। পরেশের স্ত্রী স্বামী এবং কৃষাণের পাতায় অন্ন দিয়াছে। সে দেখিল পরেশের বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে কাদা লাগিয়া রহিয়াছে। পানীয় জল বাড়ী হইতে আনিয়াছিল, কিন্তু তাহা নষ্ট করা হইবে না। সে পরেশের মাঠের ব্যবহার্য্য একটা মাটীর ভাঁড় লইয়া পুকুর হইতে জল আনিল এবং নিজে অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া আস্তে আস্তে আহারে উপবিষ্ট স্বামীর হাত

খোয়াইয়া দিল। সে যখন অকল দিয়া উহা মুছাইতে লাগিল, তখন আর দাওয়ায় দণ্ডায়মানা করুণাময়ীর চক্ষু দিয়া আনন্দ অশ্রুর প্রবাহ ছুটিল।

চারি বৎসরের বালক পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছে আর বলিতেছে বাবা, আমি খাব, আমি খাব।

পরেশ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল "ও খায় নাই ?" বধূ ঘাড় বাঁকাইয়া জানাইল, হাঁ খাইয়াছে।

পরেশ বলিল তা হলে আর দেব না।

পিসী আর অন্তরালে থাকিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি পরেশের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন "তুই যে ছুটো ভাত, আমি ওকে খাওয়াই।"

শাশুড়ীকে দেখিয়া বধূ সরিয়া গেল।

পরেশের পিসী শিশুর মুখে অন্ন দিতে দিতে পুলকে অধীর হইয়া কহিলেন, "বাবা আজ আমার গায়ের ঘায়ের দাগ মিটে গেল।"

গোবর্দ্ধন গোয়ালপাড়ার বহুপত্নীদার হইলেও তুমি ত এখনও মাঠে যাও, একবার এই দৃশ্য দেখিয়ে এস ! তোমার চারি পুত্র এবং বড় জামাতা মাঠের ধার ধারে না। পুত্রদের একজন তহশিলদার, এবং পঞ্চায়েতরূপে প্রজার প্রতি পীড়ন করে, দ্বিতীয় ঔষধ বলিয়া জল বেচে, তৃতীয় নানাপ্রকারে লোক ঠকায়, চতুর্থ নিরপরাধা দুঃস্থা স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলে। বড় জামাতার গুণও তুমি না জান এমন নহে। তোমার ছোট জামাতা পরাণপুরের এই কৃষক পরেশ বর্ণজ্ঞানবিহীন সত্য, কিন্তু সে কি সত্যসত্যই ইহাদের কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট ? আর তোমার এই কনিষ্ঠা কন্যা— তোমার গর্ব্বস্ফীত গৃহে প্রতিপালিতা হইলেও সে কি "গোবরে পদ্মফুল" নহে ?

উপসংহার।

পরেশের পিসী আর অধিক দিন বাঁচেন নাই। তিনি যেন বধূকে সংসার বুঝাইয়া দিবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

পিসীর মৃত্যুকালে পরেশ তাঁহাকে গঙ্গায় লইয়া গিয়াছিল। তাঁহার শ্রাদ্ধেও গোবিন্দ মণ্ডলের শ্রাদ্ধের সমান ব্যয় করিয়াছিল। গ্রামস্থ স্বজাতি এবং আত্মীয় স্বজন সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

গোবর্দ্ধনের তিন পুত্র এবং মাধব আসিয়া এই শ্রাদ্ধে যোগ দিয়াছিল।

বিজয় তখন কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। করুণাময়ীকে প্রহার করিবার কিছু দিন পরেই তাহার পীড়া হইয়াছে। চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই।

অজ্ঞ লোকের কেমন এক এক ধারণা জানি না। গোয়ালপাড়া এবং পরাণপুরের অনেক লোকেরই বিশ্বাস এই যে পরেশের পিসীকে প্রহার করাই বিজয়ের এই পীড়ার কারণ। তাহারা বলে "বুড়ী না বলিলেও বিজয়ের একবার যাইয়া তাঁহার পায়ে ধরা এবং ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত ছিল।"

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন।

বাঙ্গালার গৌরব—বাঙ্গালীর সম্মান, ন্যায়শাস্ত্রের অঙ্গ। এক নবদ্বীপের অবদাত গুণের মাহাত্ম্যে ভারতের সকল প্রদেশের পণ্ডিত সমাজ, বাঙ্গালাকে—বাঙ্গালীকে শ্রদ্ধার চক্ষে—ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এই ন্যায়শাস্ত্র আজ একমাত্র যাঁহার প্রসাদে উজ্জীবিত রহিয়াছে, যাঁহার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আজও আমরা বাঙ্গালার পাণ্ডিত্য-প্রতিভার গৌরব অনুভব করি, সেই পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পবিত্র জীবনের দুই একটী কথা, অদ্য "সাহিত্যের" পাঠক পাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করিব।

শাস্ত্রানুরাগ

ন্যায়রত্ন মহাশয় একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল অদম্য অধ্যবসায়ে অধ্যাপনা করিতেছেন। এক জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ব্যতীত সম্ভবতঃ দ্বিতীয় আর কেহ এত দীর্ঘকাল পাঠনা-ব্রত অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয় একণে নবতিবর্ষদেশীয় বৃদ্ধ; কিন্তু তাঁহার শাস্ত্রালোচনা ব্যসনের উৎসাহ দেখিলে বিস্মিত হইয়া থাকিতে হয়। শিষ্য শ্রান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাঁহার শ্রান্তি ক্লান্তি নাই। শাস্ত্রমার্গে তিনি যেন—

"রণে পর্য্যটনং যোগো যুদ্ধঃ ষোড়শবৎসরঃ।"

শাস্ত্রের কোনও জটিল সমস্যা উপস্থিত হইলে এই বৃদ্ধ শরীর লইয়াও ন্যায়রত্ন মহাশয় আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া তাহার সুমীমাংসায় প্রবৃত্ত হন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আর এক বিচিত্র ক্ষমতা এই, তিনি এক গ্রন্থ বহুবার

পড়ান, ততবারই তাহা হইতে নূতন মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন। "ভাষা-পরিচ্ছেদ" পড়াইবার সময়েও তিনি নূতন ভাবে চিন্তা করেন, এবং তাঁহার সেই বার্দ্ধিত নূতন চিন্তার ফলে প্রত্যেক বারই গ্রন্থের নূতন কিছু রহস্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে।

কেবল মৌখিক অধ্যাপনা নহে, এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অভিনব তথ্য আবিষ্কার করিয়া ন্যায় শাস্ত্রের নূতন নূতন গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, শঙ্করা-বতার শঙ্করাচার্য্যের মত খণ্ডন করিয়া নির্ভীক ভাবে "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" "মায়াবাদ নিরাস" প্রভৃতি বিচারপূর্ণ পুস্তক লিখিতেছেন, এমন কি, স্বসম্প্রদায়গুরু রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্যের পর্য্যন্ত ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া "ন্যূনতাবাদ" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন।

বর্ত্তমান যুগে সকল শাস্ত্রের মীমাংসা করিবার ক্ষমতা ন্যায়রত্ন মহাশয় ব্যতীত আর দ্বিতীয় কাহারও আছে কি না, জানি না। এ স্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। শ্রীহর্ষ প্রণীত "খণ্ডন খণ্ডখাদ্য" নামক দার্শনিক গ্রন্থ অত্যন্ত দুরূহ এবং বঙ্গদেশে অপ্রচলিত প্রায়। "অবিকল্পবিষয় একঃ স্থাণুঃ পুরুষঃ শ্রুতোঽস্তি যঃ শ্রুতিষু। ঈশ্বরবুদ্ধ্যা ন পরং বন্দেঽমুমথাপি তদধি-গতম্॥" "খণ্ডন খণ্ড খাদ্যের" এই মঙ্গলাচরণাত্মক প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে টীকাকার আনন্দপূর্ণ, স্বকৃত "বিদ্যাসাগরী" নামক প্রসিদ্ধ টীকায় ঈশ্বরসদ্ভাবের প্রামাণ্যবোধক একটী অনুমান-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন (১)। অনেকদিন হইতেই কাশীর পণ্ডিতসমাজে এই অনুমান-বাক্যটী অসংলগ্নরূপে চলিয়া আসিতেছিল; কৃতবিদ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ নানা অধ্যাপকের মধ্যে একজনও ঐ জটিল অনুমান-বাক্যে সাধ্য, হেতুপক্ষের উদ্ধার বা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে অধ্যাপক সম্প্রদায়ে টীকার ঐ স্থলটী অশুদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

একদিন সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ শাস্ত্রী, কথাপ্রসঙ্গে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ঐ অনুমানের কথা বলেন এবং উহা যে অদ্যাপি অধ্যাপক সমাজে অসংলগ্ন পাঠ বলিয়া গণ্য, তাহারও উল্লেখ করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় উক্ত অধ্যাপককে টীকার অনুমান-বাক্যটী লিখিয়া যাইতে বলিলেন। তা'র পর তিনি একদিন পদ্মনাভ শাস্ত্রীকে ডাকাইয়া

(১) "ইয়ং পৃথিবী সকর্তৃকাকর্তৃক বুদ্ধিমদবিভাগেকাকর্তৃক বুদ্ধিমদবিভাগেক ভবিতাবিকরণং বেদ্যত্বাৎ, ঘটবৎ।"

উক্ত অনুমান বাক্যের সুন্দর মর্ম বুঝাইয়া দেন। শাস্ত্রীজী আনন্দে অধীর হইয়া বার বার ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চরণস্পর্শ করিতে লাগিলেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রণীত "অদ্বৈতবাদখণ্ডন পরিশিষ্ট" গ্রন্থের প্রথমে "খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের" টীকায় লিখিত উক্ত অনুমান-বাক্য সংলগ্ন করিবার বিশদ্ বিচার-প্রণালী মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে কাশীর সুপ্রসিদ্ধ প্রধান পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন,—"ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অভিনব আবিষ্কার এই বিচার-শৈলী দেখিয়া মনে হয় যেন তাঁহার গৃহে ঐ স্থান সংলগ্ন করিবার কোনও প্রাচীন পুঁথি ছিল।" মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় এখন "খণ্ডন খণ্ডখাদ্য" পড়াইবার সময়ে ন্যায়রত্নমহাশয়ের কৃত উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থও ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এইরূপ অনন্যসামান্য শাস্ত্রীয় প্রতিভার বিকাশ বাল্যকাল হইতেই লক্ষিত হইয়াছিল। সাতক্ষীরার জমীদার দেবনাথ চৌধুরির বাড়ীতে রামনবমীর উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণপণ্ডিত-নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল। একবার সেই পণ্ডিত-সভায় বালক রাখালদাস, ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত তৎকালিক সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক ৺রামদাস তর্কবাচস্পতির নিকট পূর্ব্বপক্ষ করেন। তখন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাঠাবস্থা, পিতার নিমন্ত্রণে প্রতিনিধি হইয়া সভায় গিয়াছিলেন। তর্ক বাচস্পতি মহাশয় পূর্ব্বপক্ষের সদুত্তর করিতে না পারিয়া একটু বিরক্ত হইয়াই বলেন,—"তুমি ত কেবল পূর্ব্বপক্ষ করিতেই শিখিয়াছ, উত্তর করিতে ত আর পার না।" সপ্রতিভ ন্যায়রত্ন মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আপনারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক, আমার কাছে ত আর পূর্ব্বপক্ষ করিবেন না, যদি করেন ত চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।" একজন অধ্যয়নশীল বালকের পক্ষে এরূপ সাহসের কথা বলা সত্যই বিস্ময়াবহ।

ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রথম অবস্থায় নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ৺গোলোকনাথ ন্যায়রত্নের সহিত অনেক সভাতেই সোৎসাহে বিচার করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক বিচারেই বিজয়যশোমাল্যে ভূষিত হইয়াছেন। গোলোক ন্যায়রত্ন, বালক রাখালদাসের অদ্ভুত বিচার-নৈপুণ্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় নবদ্বীপে যাইয়া অধ্যয়ন করিতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "পাণ্ডিত্যের

আত্মচিন্তার উপর নির্ভর করে, গুরুপদেশ অন্যতম সহায় মাত্র; সুতরাং নবদ্বীপে যাইবার প্রয়োজন দেখি না।"

বাঙ্গালায় অনেক পণ্ডিত জন্মিয়াছেন সত্য, কিন্তু সর্ব্বদেশীয় বিদ্বৎসম্প্রদায়ের নিকট ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় সম্মান, এমন অনাবিল সম্মান লাভ, অল্প পণ্ডিতের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। কাশীর যাবতীয় প্রধান পণ্ডিত, তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন।

দুইবৎসর পূর্ব্বে কাশীনরেশের মাতার সপিণ্ডীকরণোপলক্ষে বারাণসীর প্রধান প্রধান শতাধিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আহূত হইয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রতিগ্রহ না করিলেও মহারাজ বাহাদুর প্রত্যেক কার্য্যেই রাজকীয় শিবিকা প্রেরণ করিয়া সভাক্ষেত্রে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শুভাগমনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে বহুমূল্য মখমলের আসনে ন্যায়রত্ন মহাশয় বসিয়া আছেন; অদূরে বিস্তৃত প্রাঙ্গনে পণ্ডিত মণ্ডলীর শাস্ত্রীয় বিচার হইতেছে। রাজার অপর পার্শ্বে আরও দুই তিন খানি আসন প্রস্তুত রহিয়াছে। এমন সময়ে সেস্থলে মহামহোপাধ্যায় ৺গঙ্গাধর শাস্ত্রী সি, আই, ই, আগমন করিলেন। তিনি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক আসনে না বসিয়া ভূপৃষ্ঠেই উপবিষ্ট হইলেন। একজন বর্ষীয় অধ্যাপককে এই ভাবে মাটিতে বসিতে দেখিয়া নিকটবর্ত্তী রাজকর্ম্মচারিগণ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী-মহাশয়কে আসনে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি রাজার সমক্ষে অম্লানবদনে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "গুরুর সম্মুখে আসনে বসিব কেমন করিয়া?"

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, সমাগত রাজা মহারাজদিগের নিকট 'গৌতম কনাদের মূর্ত্তি' বলিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরিচয় দিতেন। ইদানীন্তন দণ্ডীসম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় অসাধারণ বিদ্বান্ স্বামী মনীষানন্দ, ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কতদূর শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন, তাহা স্বামীজীর ব্যবহার প্রত্যক্ষ না করিলে যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না।

স্বর্গীয় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ন্যায়রত্ন মহাশয়কে স্বপরিবারভুক্ত ব্যক্তির ন্যায় ভালবাসিতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় পাঠ সমাপ্তির পর চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক অধ্যাপনা আরম্ভ করিলে বিদেশীয় ছাত্রগণের ব্যয় ভার, বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে গ্রহণ করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের একজন প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর কাল মাত্র ন্যায়রত্ন মহাশয় এইরূপ

সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছাত্রবৃন্দের প্রতিপালনে ন্যায়রত্ন মহাশয় নিজেই যখন সমর্থ হইলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার প্রদত্ত অর্থ সাহায্য লইতে বিরত হইলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এইরূপ অপ্রতারকতা ও অস্বার্থপরতা অনুভব করিয়া পরগুণমুগ্ধ বিদ্যাসাগর মহাশয়, আজীবন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। নিজের বা পরিজনের পীড়াদি নিবন্ধন ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দীর্ঘকাল কলিকাতা অবস্থান করিতে হইলে বাড়ীভাড়া, চিকিৎসার ব্যয় প্রভৃতি সমস্তই বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পন্ন করিতেন

কেবল অর্থসাহায্য নহে, সময়ে সময়ে সৎপরামর্শ দিয়াও মহাত্মা বিদ্যাসাগর, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ঐকান্তিক হিতৈষণার পরিচয় প্রদান করিতেন নৈয়ায়িকপ্রধান ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজের নৈয়ায়িক পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এ সম্বন্ধে কর্তব্যাকর্তব্যের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"দেখ ন্যায়রত্ন, তোমার ন্যায় একজন প্রতিভাশালী নৈয়ায়িক, সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইলে তাহা কলেজের পক্ষে গৌরবজনক, সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমার পক্ষে ইহা আমি ভাল মনে করি না চাকরী করিলে তুমি তখন তোমার এই অক্ষুন্ন তেজস্বিতার স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে পারিবে না।" ন্যায়রত্ন মহাশয়, এই হিতোপদেশ সাদরে গ্রহণ করিলেন,—তিনি সংস্কৃত কলেজের চাকরী লইতে সম্মত হইলেন না। তখন ৺প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় চাকরী গ্রহণ করিলে সম্ভবতঃ এমন দেশব্যাপিনী পবিত্র কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারিতেন না।

ছাত্রপ্রীতি।

ন্যায়রত্নমহাশয় ছাত্রবৃন্দকে নিজের কন্যা দৌহিত্র অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিয়া থাকেন। এমন ছাত্রপ্রীতি প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ পর্য্যন্ত ছাত্রগণের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিয়া থাকেন। বাড়ীতে কোন ও ভাল সামগ্রী প্রস্তুত হইলে, বিদেশ হইতে কোনও ভাল ফলমূলাদি আসিলে আগে ছাত্রদিগকে দিয়া পরে নিজে আহার করিয়া থাকেন। কোটালিপাড়ানিবাসী পণ্ডিতপ্রধান মদীয় জ্যেষ্ঠতাত ৺দ্বারিকানাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের মুখে

শুনিয়াছি, তিনি যখন ভট্টপল্লীতে থাকিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকটে অধ্যয়ন করেন, সে সময়ে পুঁটিয়ার রাজবাড়ী হইতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এক নিমন্ত্রণ-পত্র আসে। ন্যায়রত্ন মহাশয় জ্যেষ্ঠতাতকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। যথা-সময়ে তাঁহারা পুঁটিয়ায় পঁহুছিলেন। নিমন্ত্রিত অধ্যাপকদিগকে খাদ্য-সামগ্রী এবং বাসস্থান দিবার ব্যবস্থা আছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘৃত তণ্ডুলাদির সহিত এক বৃহৎ রোহিত মৎস্যও প্রেরিত হইয়াছিল। মৎস্য দেখিয়া জ্যেষ্ঠতাত রাজকর্ম্মচারীকে বলিলেন, "মাছটী ফিরাইয়া লইয়া যান, আপনারা বোধ হয় জানেন না যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় মৎস্যমাংসত্যাগী।" ন্যায়রত্ন মহাশয় নিকটেই ছিলেন; তিনি বলিলেন, "না, না, মাছ থাকুক, আমার প্রয়োজন আছে।"

কর্ম্মচারী প্রস্থান করিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় জ্যেষ্ঠতাতকে বলিলেন, "দেখ দ্বারিক, যে গৃহস্থের বাড়ীতে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা-দিগকে বল যে, খানিকটা ঝোলের মাছ এবং মুড়োটা আমাদিগকে দিয়া বাকি মাছ তাহারা লউক, আর তাহাদের নিকট হইতে মাছ রাঁধিবার একটা কড়া চাহিয়া আন।" ছাত্র গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিলেন। "দ্বারিক, তোমরা পূর্ব্ববঙ্গের লোক, মাছ ভালবাস, তাই মাছটী ফিরাইয়া দিলাম না। আজ আমি তোমাকে মাছ রাঁধিয়া খাওয়াইব।"—বলিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই মাছ ও মুড়া দিয়া ঝোল রাঁধিলেন। তা'র পর স্নান করিয়া আসিয়া স্বতন্ত্রভাবে নিজের আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া উভয়ে পরমানন্দে আহারে বসিলেন।

বঙ্গসাহিত্যের প্রতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সবিশেষ শ্রদ্ধা আছে। এখনও তিনি অধ্যাপনান্তে বিশ্রামসময়ে বাঙ্গালা সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্র-সমূহ এবং মন্তব্যপ্রদানার্থ উপহৃত পুস্তকাবলী নিয়মিতভাবে শ্রবণ করিয়া থাকেন। বঙ্গভাষার লেখকদিগের মধ্যে দাশরথি রায়ের রচনার প্রতি তিনি সর্ব্বাধিক পক্ষপাতী। দাশরথি রায়ের অনেক সুন্দর সুন্দর ছড়া ও গান তাঁহার মুখস্থ আছে। পাঁচালী শুনিয়া অনেক সভাতেই ন্যায়রত্ন মহাশয় দাশরথি রায়ের সহিত কোলাকুলি করিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যানুরাগ।

দাশরথি রায়ও ন্যায়রত্ন মহাশয়কে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। একবার চুঁচুড়ার বারোয়ারীতে পাঁচালীর বায়না লইয়া দাশরথি রায় গাহিতে আসিয়া-

বিণ্মূত্রাদিপরিগ্রহেণ চ কদা বাধাপি জাতা ন তে
ক্রোড়ে ক্রীড়নয়া বয়ং বহুবধে মুক্তাম্বুজাস্রতায়॥"

"বালা হ'তে মাগো তুমি পালিতেছ বঙ্গভূমি মাগো ওই কোলে কত মল-মূত্র অবিরত
স্নেহময়ী জননীর প্রায়, ঢালিয়াছি বাধা নাই তোর।
কনক-পিঞ্জরে রাখ, সদা যেন বশে থাক, আজি হ'তে তোর ছেলে স্নেহময়ি তোর কোলে
তব ঋণ শোধা কি না যায়। ধুলা-খেলা করে সমাপন,
দিয়াছ মা অনিবার ফল-মূল-পয়োধর সন্তানেরে ওমা তুমি আজ্ঞা দাও বঙ্গভূমি
হ'লে আমি ক্ষুধায় কাতর, কাশীধামে চলেছি, এখন।

৺হরকুমার শাস্ত্রী কৃত অনুবাদ।

বর্ত্তমান কালের তুচ্ছমতি মনুষ্যসমাজে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় ধৈর্য্য অতি অল্প লোকেরই দেখিয়াছি। ১৩১৩ সালের ৫ই বৈশাখ তাঁহার একমাত্র পুত্র ৺হরকুমার শাস্ত্রীর কাশীলাভ হয়। হরকুমারের ন্যায় নানাগুণ-সম্পন্ন, সুকবি, সুপণ্ডিত পুত্রের বিয়োগেও তিনি হিমালয়ের মত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া আছেন। অম্লানবদনে তিনি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুত্রের গঙ্গালাভের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। হরকুমারের শ্রাদ্ধের পরদিন হইতেই তিনি যথানিয়মে অধ্যাপন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই ভীষণ-শোক-জর্জ্জর দেহ লইয়া তিনি গভীর চিন্তাসাপেক্ষ "ন্যায়প্রকাশ" প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্রের জটিল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শোকসময়ের কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করিলে হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হয়। তিনি বলেন, "পারমার্থিক হিসাবে যাহাই হউক, লৌকিক দৃষ্টিতে দেখিলেও শোক প্রকাশ করা একান্ত অনুচিত। শোকে অধীর হইলে এক ত শত্রু হাসে; দ্বিতীয়তঃ, সুহৃদ্ বন্ধুর হৃদয়ে বেদনা জাগাইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং বিয়োগব্যথা প্রকাশ করিতে নাই। শোক-রাক্ষসকে জয় করাই যথার্থ বীরত্ব।"

দেশ হইতে প্রকৃত পাণ্ডিত্য নির্ব্বাসিত হইতে চলিল বলিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় যারপর নাই খেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে অভিমত। তিনি বলেন,—"আজকাল কেবল পল্লবগ্রাহীর দল পুষ্ট হইতেছে, আর সেকালের মত একটীও গভীর পণ্ডিত দেখিতে পাই না। সকলেই পরীক্ষায় পাশ হইবার জন্য লালায়িত, পাণ্ডিত্য-অর্জ্জনের স্পৃহা কাহারও নাই। ন্যায়শাস্ত্রের আজ কি অধোগতিই হইয়াছে! রামদাস তর্কবাচস্পতি, হলধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীরাম শিরোমণি, মাধব তর্কসিদ্ধান্ত, জয়-নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতিকে দেখিয়াছি, আমাদের সময়েও রামধন তর্ক-

পঞ্চানন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, ভুবন বিদ্যারত্ন, গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি আমরা বন্ধুবান্ধবে মিলিয়া সভাক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় ক্রীড়াকৌতুক করিয়াছি ; কিন্তু এক্ষণে ন্যায়শাস্ত্রের কি দুর্দ্দশা উপস্থিত ! ইদানীন্তন নৈয়ায়িকগণের মধ্যে এক প্রাণীরও সূক্ষ্ম পরিদর্শনের সামর্থ্য নাই, 'কাশীশঙ্করী' ও 'গোরগোকী' পত্রিকা মুখস্থ করাই নৈয়ায়িকত্বের চরম সীমায় দাঁড়াইয়াছে !"

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৫০ বৎসর রাজত্ব কাল পূর্ণ হইলে 'জুবিলী' উৎসব উপলক্ষে গভর্মেণ্ট ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রমুখ দেশের আট জন প্রধান অধ্যাপককে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিভূষণে সর্ব্বপ্রথম ভূষিত করেন। এক্ষণে এক ন্যায়রত্ন ব্যতীত প্রথম মহামহোপাধ্যায়গণের মধ্যে আর কেহই জীবিত নাই। বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ই প্রথম মহামহোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি প্রয়োজন নাই বলিয়া গভর্মেণ্টের নির্দ্দিষ্ট মহামহোপাধ্যায়-উপাধিধারীর প্রাপ্য ১০০৲ শত টাকা বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই।

ত্যাগশীলতা।

বঙ্গের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম প্রমুখ যাঁহার ছাত্র, শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি যাঁহার ছাত্রের ছাত্র [illegible] মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত, বাঙ্গালায় ন্যায়শাস্ত্রের পীঠস্থান নবদ্বীপের সম্মানরক্ষা [illegible] যাঁহার ছাত্রসম্প্রদায় ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত, সাক্ষাৎ গৌতম কণাদের অবতার সেই পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরিচয়-প্রদান মাসিক পত্রের কলেবরে সম্ভবপর নহে। [illegible] কাছে প্রার্থনা, এখনও তিনি কিছুদিন জীবিত থাকুন, বাঙ্গালা [illegible] পাণ্ডিত্যগৌরব কিছুকাল অব্যাহত [illegible] রক্ষা করুক।

[illegible] চট্টোপাধ্যায়।

সেকালের কথা।

১

সেকালে বেশী বয়সের লোকের মাথায় লম্বা চুল থাকিত না ; তাঁহাদিগের কপালের কিয়দংশ কামান হইত। উৎকল ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের মত সেকালের

ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা মাথায় চুল রাখিতেন। কেহ কেহ শিখামাত্র রাখিয়া সমস্ত মুণ্ডন করিতেন। সেকালে তেল মাখিবার পদ্ধতিটা কিছু অতিরিক্ত ছিল। এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা ধরিয়া অনেককেই চাকরে তেল মাখাইয়া দিত। মেয়েরা নারিকেলের তেল মাখিত, মাথাঘষা মাখিয়া মাথা ঘষিয়া ফেলিত। তাহারা আগে খৈল বেসন দিয়া গা রগড়াইয়া পরে আবার দুধের সরে জাফ্রান বাটিয়া তাহা দ্বারা গা ঘষিয়া গা ধুইয়া ফেলিত। সেকালে সাবানের প্রচলন ছিল না। প্রথমে যখন দেশে সাবানের আমদানী হয়, তখন বৃদ্ধেরা রটাইয়াছিলেন,—"গাধার চর্ব্বিতে সাবান প্রস্তুত হয়।" সেই জন্য প্রথম প্রথম কেহই সাবান স্পর্শও করিত না। বিধবারা রুক্ষ স্নান করিতেন; তাঁহাদিগের মাথা ও গা ঘষিবার রীতি ছিল না; তাঁহাদিগের মাথায় লম্বা চুলও থাকিত না। তাঁহাদের অনেকেই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাতঃস্নান করিতেন; বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে সকলেরই প্রাতঃস্নান করার নিয়ম ছিল। তাঁহারা সেই তিন মাসে প্রতিদিন বিষ্ণুর বা অন্য দেবতার সহস্র নাম শ্রবণ ও এক একটি ঘোড়া উৎসর্গ করিতেন। অন্য সময়েও তাঁহাদিগের দ্বাদশীতে একটি ঘোড়া উৎসর্গ ও ব্রাহ্মণভোজন করাইবার নিয়ম ছিল। ব্রাহ্মণের পক্ষে দ্বাদশীতে দুই তিন বাড়ীর নিমন্ত্রণ পাইয়া এক বাড়ীতে যাইয়া প্রায়ই অন্যের বিরক্তি উৎপাদন করিতে হইত। বিধবারাই ছিলেন গৃহকর্ত্রী। প্রত্যেক বাড়ীতে মা, ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসীমা, মাসীমা, কাকীমা, জেঠাইমা, ভগিনী, বা শাশুড়ী, কেহ না কেহ থাকিতেন। সেকালে কর্ত্তা ও গৃহিণী তাঁহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল, বাড়ীর সেই বিধবার ভয়ে কর্ত্তা ও গৃহিণী সর্ব্বদা জড়-সড় থাকিত। একালের মত সেকালের বিধবারা পাচিকার কার্য্য করিতেন না; তাঁহাদিগেরই হুকুমে সেকালের বধূরা দিনরাত খাটিত। সেকালের বিধবারা গরদ বা তসর পরিয়া গায়ে নামাবলী দিয়া, ঠাকুরঘরে আসনে বসিয়া সন্ধ্যা পূজা জপ তপস্যায় দিন কাটাইতেন। তাঁহাদিগের মুখে ও শরীরে কেমন একটা জ্যোতিঃ বাহির হইত, দেখিলে পাষণ্ডেরও মনে ভয় ও ভক্তির উদয় হইত।

সেকালে প্রত্যেক বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ ত লাগিয়াই থাকিত; প্রত্যেক গৃহস্থকেই পিতামাতা, পিতামহ, পিতামহীর শ্রাদ্ধ, মহালয়া বা দীপান্বিতায় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ও নবান্ন করিতে হইত। তাহার উপর আবার বিধবাদিগের নানাবিধ কাম্য কর্ম্ম ছিল।

আমি ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইয়াও তত ব্রত উপবাসের নাম জানি না। আর কি

না অশ্বত্থ-প্রতিষ্ঠা, কাল কি না পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, পরশ্বঃ কি না মঠ-প্রতিষ্ঠা, শিব-স্থাপন, একটা একটা লাগিয়াই আছে। ইহার উপরে বৈশাখ, কার্ত্তিক, মাঘ মাসে পাড়ার কোন এক বাড়ীতে সেই বাড়ীর বিধবার ইচ্ছায় সকালে রামায়ণ, মহাভারত, বা অন্য কোন পুরাণের পারায়ণ, বৈকালে কথকের মুখে তাহার কথা বা পণ্ডিতের মুখে ব্যাখ্যা হইত। পাড়ার সকলে গিয়া তাহা শুনিত। তাহা দ্বারা পুরুষ, মেয়ে, এমন কি, বালক বালিকার পর্য্যন্ত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, নীতি শিখিবার সুবিধা হইত। কোন্ তিথিতে কি খাইতে নাই, কোন বারে কি করিতে নাই, কোন তিথিতে কি করিতে আছে, কোন বারে কি করিতে আছে, তখনকার মেয়েরা পর্য্যন্ত জানিতেন। এখনকার মেয়েরা লেখাপড়া না শিখিয়াও অশৌচের ব্যবস্থা, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জানিতেন। সেকালের মেয়েকে মন্ত্র পড়াইতে যাইয়া পুরোহিত শশব্যস্ত থাকিতেন। সেকালের মেয়েদিগের মুখের শুদ্ধ মন্ত্র ও শুদ্ধ স্তব, কখন শুনিলে একালের শিক্ষিতদিগের উচ্চারিত হ্রস্বদীর্ঘশূন্য একটান উচ্চারণের হাত-পা-ভাঙ্গা সংস্কৃত কবিতা শুনিলে দুঃখিত হইতে হয়। যাহা হউক, আমি দুর্গাপূজা-প্রসঙ্গে সেকালের চিত্র দেখাইব, এই জন্য অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম; একটি কথা, দুর্গাপূজায় বালকবালিকাদিগের উৎসাহের কথা, তাহা বলিতে হইবে।

বালকবালিকারা যে কেবল রাঙ্গা কাপড়, রাঙ্গা জুতা পাইবার জন্যই উৎসাহিত হইত, এবং তাহা পাইয়াই যে কেবল খুসী হইত, বলিতে পারি না। তাহারা বোধনের দিন হইতেই নানা স্থান হইতে তুলিয়া ও কুড়াইয়া রাশি রাশি ফুল আনিত। পূজার সময়ে ও সন্ধ্যা আরতির সময়ে পূজাস্থানের চারিদিকে ঘুরিত, ফিরিত; ধূপটি জ্বালাইয়া দিত; নির্ব্বাণোন্মুখ দীপটির উপরে ফুঁ দিত, বাতাস করিত; একগাছা পঞ্চপ্রদীপ বরণডালার বাতি জ্বালিয়া ও উস্কাইয়া দিত; পুরোহিতের ঘণ্টানাদের সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর, ঘণ্টা, করতাল ও শাঁখ বাজাইত; অনুপনীত বালক ও কুমারী বিদায়ের জন্য জেদ ধরিত; প্রাতে, সন্ধ্যায় আরতির পরে, বলির পরে তাহারা গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিত। চরণামৃতপানের জন্য, ভোগের প্রসাদ খাইবার জন্য তাহাদিগের কাড়াকাড়ি দেখে কে? আবার বিসর্জ্জনের জন্য প্রতিমা বাহির করিবার সময়ে তাহারা কাঁদিয়া আকুল হইত। হইতে পারে- দেখাদেখি এই সকল কাজে তাহাদিগের উৎসাহ, হইতে পারে—কিন্তু কেবলমাত্র তাহা বলিতে পারি না। বলিতে হইলে, পিতা মাতার সেইরূপ আচার আচরণ দেখিয়া তাহাদিগের হৃদয়েও

একটা অস্ফুট ভক্তির সঞ্চার হইত; একটা অস্ফুট ভক্তির ছায়া পড়িত; সেই ভক্তির বীজ হইতে অজ্ঞাতসারে তাহার অঙ্কুর একটু আধটু করিয়া ক্রমে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিত। স্কুল কালেজের শিক্ষায় গড়িতে পারে না, ভাঙ্গিতে পারে। মাতা পিতার আচার আচরণ দেখিয়া শিখিয়া মানুষ গঠিত হয়।

ছোট বেলার কথা মনে পড়িতেছে। একদিন একটী বালক মাতার কোলে শুইয়া মাতার মুখে নানা কথা শুনিতেছিল। বালক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মা, গ্রামের জমীদার বড়লোক, সকলে তাহাকে ভয় করে, মান্য করে; সে কেন আমাদিগকে প্রণাম করে?" মা উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা ব্রাহ্মণ, তিনি শূদ্র, সেই জন্য তিনি তোমাদিগকে প্রণাম করেন; জন্মজন্মান্তরে বহু পুণ্যে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়; অন্যে প্রণাম করিলে, সময়ে বা অন্য সময়ে যদি মনে হয়, আমি বহু পুণ্য করিয়াছি, সেই জন্য ব্রাহ্মণ হইয়াছি, তবে সেই পুণ্য ক্ষয় হয়, আর পর জন্মে ব্রাহ্মণ হইবার আশা থাকে না, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানে তাহা শুনিয়াছ। অন্যে প্রণাম করিলে মনে মনে ভাবিবে, এই প্রণাম আমার নয়, আমাকে করা হয় নাই, এ ব্রাহ্মণ দেবের প্রণাম, নারায়ণের প্রণাম। সাবধান, এই কথা ভুলিও না।" বালক মাতার উপদেশে প্রীত হইয়া আবার প্রশ্ন করিয়াছিল,—"আচ্ছা মা, বেশী পুণ্য ত অল্প লোকে করে, কমপুণ্য বেশী লোক করে, তবে ব্রাহ্মণ বেশী কেন? জমীদার কম কেন?" মাতা হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—"আরে, তাহা নয়; এখনও আমাদিগের দেশে বেশী লোকেই বেশী পুণ্য করে, কম লোকে কম পুণ্য করে। ঈশ্বরের কাছে যা চাইবে, তাই তিনি দিবেন? না চাইলে দিবেন কেন? তুই আমাদিগের নিকট যা পাইবার জন্য জেদ ধরিস্, তাই ত আমরা দিয়া থাকি; যার জন্য তোর জেদ নাই, তা কি আমরা দি? ব্রাহ্মণ হওয়া অপেক্ষা ধনী হওয়া যে কম, তা কি তুই বুঝিস না? ধনীর ধন কাড়িয়া লইলে সে পথের ভিখারী হয়, আর সে ধনী থাকে না; কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য কি কাড়িয়া লওয়া যায়? সেই জন্য এদেশের লোক ধন চায় না, ব্রাহ্মণকুলে জন্মিতে চায়। যাহারা অজ্ঞানী, লোভী, তাহারাই ধন চায়; এ দেশে তাহারা বড়ই কম। আবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ত লোকে বেশী পুণ্য করিত; তাহারা সকলেই ত মুক্তি পায় নাই। তাহারাই আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছে।" অবশ্য তখনকার নিরক্ষর মাতার এই উত্তর ঠিক কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু বালক এই উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল। খেলার সময়ে তাহার মুখে এই কথা অনেকবার অনেক বালকই

শুনিয়াছিল। এই জন্য বলিতেছি,—তখনকার মাতা পিতামহী নিরক্ষর হইলেও তাঁহারা যেমন সহজ কথায় বালকের মনে বিশ্বাসের শিকড় বসাইয়া দিতে পারিতেন, এখনকার শিক্ষিতা মহিলাদের কথা ছাড়িয়া দাও, টোলের অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যও সেরূপ পারেন কি না সন্দেহ। খুঁটী নাটী করিয়া সেকালের সমস্ত নিখুঁত চিত্র দেখান অসম্ভব। ছোট খাট বিষয়গুলি ছাড়িয়া দিয়া বড় বড় বিষয় ধরিয়া দেখাইতে গেলেও একখানি প্রকাণ্ড পুস্তকে শেষ করিতে পারা যাইবে—এরূপ বিশ্বাস হয় না। আজ আর বলিতে চাই না।

সেকালে বিকালে, সন্ধ্যার প্রথম যামে ছেলে মেয়েরা ঠাকুরদাদাকে বা ঠাকুরমাকে ঘিরিয়া বসিত, এবং তাঁহাদিগের মুখে সেকালের কথা বা রূপকথা শুনিত। বালক বালিকারা মাঝে মাঝে 'হুঁ' 'হুঁ' না বলিলে তাঁহারা কথা বলিতেন না। 'হুঁ' 'হুঁ' বলিলে তাঁহারা বুঝিতেন, ইহাদিগের ভাল লাগিয়াছে, বলা আবশ্যক; না বলিলে বুঝিতেন, ভাল লাগে নাই, বলা উচিত নয়। একে একে ঠাকুরমা ঠাকুরদাদারা জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, একালে সেকালের কথা বলেই বা কে? শুনেই বা কে? এ কালের বালক বালিকা যুবক যুবতী সত্যপ্রিয়; কিন্তু মিথ্যা যাহার বনিয়াদ—সেই নাটক নভেল তাহারা ভালবাসে। নিখুঁত সত্য সেকালের কথা ভালবাসিবে কি না, কি করিয়া বলিব? নিজেকে বৃদ্ধ মনে করিয়া আপনা হইতেই সেকালের কথার কতক কতক আওড়াইয়া গেলাম। এখন 'হুঁ'এর অপেক্ষা। যদি কেহ "হুঁ" করে, আবার বলিব, নয় ত এই পর্য্যন্ত। *

বাল্মীকির আশ্রম।

কবিগুরু বাল্মীকির আশ্রম সম্বন্ধে একটি গুরুতর ভ্রম বাঙ্গালা সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে। রামায়ণের আদিকাণ্ডে দেখিতে পাই, গঙ্গার অনতিদূরে তমসানদীর তীরে তাঁহার আশ্রম। "স মুহূর্ত্তং গতে তস্মিন্ দেবলোকং মুনিস্তদা। জগমে তমসাতীরং জাহ্নব্যাস্ত্ববিদূরতঃ॥" দেবর্ষি নারদ দেবলোকে প্রস্থান করিলে মহর্ষি বাল্মীকি মুহূর্ত্তকাল আশ্রমে অবস্থান করিয়া আনার্থ জাহ্নবীর অনতিদূরে তমসাতীরে গমন করিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে,

---

* হুঁ।—সম্পাদক।

এই তমসানদী কোথায়? কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার রামায়ণের পদ্যানুবাদ গ্রন্থে (বালকাণ্ড, দ্বিতীয় সর্গ, ৫ম পৃঃ, পাদটীকায়) লিখিয়াছেন,—"সরযূ ও গোমতী নদীর মধ্যস্থলে তমসা নদী অবস্থিতা। ইংরাজীতে ইহা River Tons বলিয়া খ্যাত (বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত)। এই নদী গঙ্গায় পতিত হইতেছে।" শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার "সরল কৃত্তিবাস" পুস্তকে "পৌরাণিক ভারত-বর্ষে"র যে মানচিত্র দিয়াছেন, তাহাতে দেখিলাম, এই মতই গৃহীত হইয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডের ষট্‌চত্বারিংশ সর্গে দেখিতে পাই, শ্রীরামচন্দ্র বনগমন করিবার সময় প্রথমেই তমসাতটে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। "ততস্তু তমসাতীরং রম্যমাশ্রিত্য রাঘবঃ। সীতামুদ্বীক্ষ্য সৌমিত্রিমিদং বচনমব্রবীৎ॥" বোধ হয়, রামায়ণের এই উক্তির বলেই সরযূ ও গোমতী নদীর মধ্যস্থলে তমসানদী, এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে, সরযূ ও গোমতী নদীর মধ্যস্থলে যে উপনদী গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাই যদি বাল্মীকির আশ্রমসন্নিহিত তমসা হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, কবিগুরুর আশ্রম সকল সময়ে এক স্থানে ছিল না। কারণ, উত্তরকাণ্ডে আছে, লক্ষ্মণ গঙ্গার পরপারে বাল্মীকির আশ্রমসন্নিকটে সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। সরযূ ও গোমতীর মধ্যে যে তমসানদী, তাহার তীরে কবিগুরুর আশ্রম হইলে গঙ্গা পার হইয়া তথায় যাইতে হইত না। তবে কি সীতাপরিহারের সময় বাল্মীকির আশ্রম তমসা-তীর হইতে কাণপুরের নিকটবর্ত্তী (যেখানে জনশ্রুতিমূলক সীতাপরিহারক্ষেত্র-স্থিত দেবালয় বর্ত্তমান রহিয়াছে) গঙ্গাতীরে উঠিয়া গিয়াছিল? কিন্তু সীতা-পরিহার যে তমসাতীরস্থ আশ্রমসন্নিকটে গঙ্গাতীরে হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। কালিদাস রঘুবংশের চতুর্দ্দশ সর্গে লিখিয়াছেন,—"অশূন্যতীরাং মুনিসন্নিবেশৈস্তমোপহন্ত্রীং তমসাং বগাহ্য। তৎসৈকতোৎসঙ্গবলিক্রিয়াভিঃ সম্পৎস্যতে তে মনসঃ প্রসাদঃ॥" মহর্ষি বাল্মীকি সীতাদেবীকে প্রবোধ দিতেছেন,—"মুনিগণের নিবিড়সন্নিবিষ্ট পর্ণশালাসমূহে সমাচ্ছন্ন কলুষনাশিনী তমসানদীতে অবগাহনপূর্ব্বক তাহার পুলিনদেশে অভীষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিয়া তোমার মন সুপ্রসন্ন হইবে।" রঘুবংশের এই শ্লোক যদি প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, অযোধ্যাকাণ্ডে বর্ণিত তমসা এবং কবিগুরুর আশ্রমসন্নিহিত তমসা কখনও এক নদী হইতে পারে না। কাণ-পুরের নিকট সীতাপরিহারক্ষেত্র বলিয়া যে জনশ্রুতি রহিয়াছে, তাহা যদি

কালিদাসের সময়ে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার এরূপ গুরুতর ভ্রম হইত না। মেঘদূতে মহাকবি যে দেশজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এরূপ গুরুতর ভ্রম তাঁহার নিকট আশা করা যায় না। তবে অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চচত্বারিংশ সর্গে ও ষট্‌চত্বারিংশ সর্গে যে যে স্থলে তমসার উল্লেখ আছে, সেখানকার পাঠ প্রকৃত কি না, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আর যদি ঐ পাঠই প্রকৃত হয়, তাহা হইলে দুইটি নদীর নাম তমসা ছিল, এরূপ মনে করা যাইতে পারে।

এখন আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, যে তমসার তীরে কবিগুরুর আশ্রম ছিল, তাহা সরযূ ও গোমতীর মধ্যস্থিত গঙ্গার উপনদী নহে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্রে অথবা অন্য কোনও প্রাচীন-ভারতের মানচিত্রে পাঠক দেখিতে পাইবেন, প্রয়াগের একটু নিম্নে একটি ক্ষুদ্র নদী দক্ষিণ দিক হইতে গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে। এই নদী বিন্ধ্যগিরিমালা হইতে বাহির হইয়া ঈশান কোণে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "ভারত-সাম্রাজ্যে"র পুরাতন মানচিত্রে এই নদীর তমসা নাম লিখিত আছে। যেখানে এই নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহারই নিকটে কবিগুরুর আশ্রম ছিল। গঙ্গাতীরে তমসার সঙ্গমস্থলের নিকট লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে গঙ্গা পার হইয়া যাইতে হইয়াছিল। অদূরে তমসাতীরে বাল্মীকির তপোবন। মুনিবালকগণের মুখে সীতার বিষয় অবগত হইয়া মহর্ষি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন, এবং রামপত্নীকে আশ্রমে লইয়া যাইলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম প্রয়াগ হইতে তমসার সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত গঙ্গাতীর অসংখ্য আশ্রমমণ্ডলে সমাকীর্ণ ছিল।

শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

সেকালের সপ্তগ্রাম।

[তিন শত বৎসরের পূর্ব্বের কথা।]

সপ্তগ্রাম ভারতের একটী দেশবিশ্রুত প্রাচীন নগর। বাঙ্গালার ভৌগোলিক অধিকারের মধ্যে ইহার উল্লেখ থাকিলেও, ইহার ন্যায় প্রাচীন নগর সমগ্র

ভারতে আজকাল খুব কমই আছে। যে সপ্তগ্রামের কথা আমরা বলিতেছি—এখন আর সে সপ্তগ্রাম নাই। আছে কেবল বনজঙ্গলের মধ্যে অতীতের ভগ্নাবশেষের স্মৃতিচিহ্ন। এই স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে হয়, চোখে জল আসে, কালের শক্তিময় হস্ত যে কি না করিতে পারে, তাহার দুঃখময় দৃশ্য স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠে!

কোথায় সপ্তগ্রামের সে ঐশ্বর্যময় দিন! যে দিন কূলপ্লাবিনী তরঙ্গমালিনী সরস্বতীর বক্ষে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির বাণিজ্যদ্রব্য-সম্ভারপূর্ণ পোতশ্রেণী অনবরত যাতায়াত করিত! কোথায় সেই বড় বড় গঞ্জ, হাট, বাজার ও কেল্লা! কোথায় সে জন-সংঘময়ী কোলাহল-সংকুল অবস্থা! কোথায় সে কমলার বিলাস-কানন! কোথায় সে বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রিয় নিকেতন! হায়! সুখ গিয়াছে, ঐশ্বর্য গিয়াছে—আলো গিয়াছে—আছে কেবল দুঃখের স্মৃতি, আর বর্তমানের অন্ধকার

সপ্তগ্রাম সেকালের রাঢ়দেশের সীমার মধ্যে। রাঢ়দেশের নিখুঁত ভৌগোলিক সীমা নির্দ্দেশ সম্ভবপর না হইলেও এটুকু বলিতে পারা যায়, এই রাঢ়দেশের সীমা, বর্তমান বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, হাবড়া, চব্বিশপরগণা ও নদীয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। টলেমি এই সপ্তগ্রামকে "গাঙ্গেরিডিয়া" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মোগল রাজত্বের আকবর শাহের সময়ে—সপ্তগ্রাম একটী বিভিন্ন "সরকার" বা শাসন-কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত। আর এই সপ্তগ্রামের মধ্যে ২৪ পরগণা, নদীয়া ও হুগলীও ছিল।

অনেকে বলেন পর্টুগিজদিগের আগমনের পর হইতে সপ্তগ্রাম আরও উন্নত হইয়া উঠে। কিন্তু ধরিতে গেলে কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক। ১৫৩০ খৃঃ অব্দে পর্টুগিজেরা বঙ্গদেশে বাণিজ্য আরম্ভ করে। ইহার বহুপূর্ব্ব হইতে সপ্তগ্রাম বিখ্যাত বন্দর। আমাদের পুরাতন বাঙ্গলা কাব্য-গ্রন্থে সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্যের অবস্থার কথা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই শোনা যায়। পর্টুগিজেরা সপ্তগ্রামের এই বাণিজ্য-ঐশ্বর্যময় উন্নত অবস্থা দেখিয়া ইহাকে "পোর্ট পিকুইনো" বা (Little haven) বলিত। কিন্তু হায়! সরস্বতীর বুকে চর পড়িতে আরম্ভ হওয়ায় সপ্তগ্রাম ক্রমে ক্রমে ধ্বংস-মুখে অগ্রসর হয়। এই সমস্ত চরের জন্য বড় বড় বাণিজ্যপোত বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না, এবং ইহা হইতেই দারুণ বাণিজ্য-সংকট বা Commercial crisis উৎপন্ন হইয়া সপ্তগ্রামের সৌন্দর্য্য ও প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে থাকে।

১৫৬৫ খ্রীঃ অব্দে সিজার ফ্রেড্রিক নামক এক জন ভ্রমণকারী সপ্তগ্রামে উপস্থিত হন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীর এক স্থানে লিখিত আছে,—(১) "আমি উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গলাদেশে যাত্রা করিলাম। উড়িষ্যা হইতে পোর্ট পিকুইনো (সপ্তগ্রাম) ১৭০ মাইল পথ। সমুদ্রতীর ধরিয়া প্রায় চুয়ান্ন মাইল আসিবার পর আমরা গঙ্গানদীতে প্রবেশ করিলাম। গঙ্গার মোহানা হইতে সপ্তগ্রাম বন্দর একশত মাইল। জোয়ারের মুখে এই পথ অতিক্রম করিতে—১৮ ঘণ্টা সময় লাগে। প্রতিবৎসর এই সপ্তগ্রাম নগরে ৩০।৩৫ খানি বাণিজ্যপোত নঙ্গর করে। চাউল, কাপড়, চিনি, হরীতকী, লঙ্কা প্রভৃতি নানাবিধ বাণিজ্যদ্রব্য এখানকার বন্দর হইতে আমদানী রপ্তানি হয়। সপ্তগ্রাম অতি সুন্দর বাণিজ্যস্থান। ইহা মোগলদের শাসনাধীনে অবস্থিত। পাটনার শাসনকর্ত্তা এই বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা।" *

সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী র‍্যালফ্ ফিচ্ (Ralph fitch) ষোড়শ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম দেখিতে আসেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণপুস্তকের এক স্থানে লিখিয়াছে —"I went from Agra to Satagan in Bengala in the company o[illegible] hundred and four score boats, laden with salt, opioum, hingee (হিঙ্গু), Lead, carpets and diverse other commodities down the River Jemena (যমুনা) the cheif merchants are moors and gentiles." ফিচের এই উক্তি হইতে প্রমাণিত হয়, তাঁহার আগমনসময়েও সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি অবনতির পথে অগ্রসর হয় নাই।

ইহার পর Di Barros নামক আর এক জন ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি—সপ্তগ্রামের অবস্থা ক্রমশঃ অনেকটা হীন হইয়া আসিতেছিল। সরস্বতী নদীতে চর পড়ায় বড় বড় জাহাজ তাহার মধ্যে পূর্ব্বের মত সহজভাবে যাতায়াত করিতে পারিত না। উক্ত ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন,— "Satgaw is a great and noble city, though less frequented

(১) Cæser Fredericks' Travels. (1563—1681.)'

(২) ফ্রেডরিক King of Patena বলিয়াছেন। পাটনা মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে একটী গণিত শাসনকেন্দ্র ছিল। সম্ভবতঃ তিনি সুবেদারকে লক্ষ্য করিয়াই এ কথা লিখিয়াছেন। সেকালের শাসনকর্ত্তা সুবেদারেরা রাজপ্রতিনিধির মত ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত অবস্থায় থাকিতেন। কাজেই তাঁহাকে King বলিয়া অনুমান করা অসম্ভব নহে।

than Chittagong on account of the Port not being so convenient for the entrance and departure of Ships." ইহা হইতে সপ্রমাণ হয়, চট্টগ্রাম এই সময়ে বন্দর—রূপে সপ্তগ্রামের প্রতিযোগিতা করিতেছিল।

১৬৩২ খৃঃ অব্দে মোগলবাহিনী কর্তৃক হুগলী অধিকৃত হয়। কেন হয়, তাহা ইতিহাস—পাঠকের অপরিজ্ঞাত নহে। হুগলী—বিজয়ের পর হইতেই সপ্তগ্রামের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। বাদশাহের আদেশে হুগলীতে সরকারী বন্দর স্থাপিত হয়। সপ্তগ্রামের সরকারী কার্য্যালয়গুলি হুগলীতে স্থানান্তরিত হয়। হুগলী বাণিজ্য—ঐশ্বর্য্য ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে থাকে। তাহা হইলেও উক্ত সময় হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যেও সপ্তগ্রামের বাণিজ্য-সমৃদ্ধির একবারে বিলুপ্তি হয় নাই। ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে Warwick নামক এক জন ডচ্ এড্‌মিরাল সপ্তগ্রামের অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছেন,—"সপ্তগ্রাম এখনও বাণিজ্যপ্রধান বন্দররূপে প্রাচীন গৌরব রক্ষা করিতেছে। এখানে পর্টুগীজ বণিকের দলই বেশী।"

বহুকাল পূর্ব্বে সরস্বতী উড়িষ্যা ও বঙ্গরাজ্যের মধ্য সীমা—নির্দ্দেশক নদী বলিয়া কথিত হইত। পরের ব্যবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা আমরা ঠিক করিতে পারি না। তবে আকবর শাহের আমলে সপ্তগ্রাম "বাল্‌ঘাক্‌খানা" বা বিদ্রোহের আড্ডা বলিয়া বিবেচিত হইত। বোধ হয়, বিহারের ও উড়িষ্যার পাঠান—বিদ্রোহ ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া রাজপক্ষ হইতে সপ্তগ্রামকে এই কলঙ্কিত আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল। মহারাজ মানসিংহ ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে পাঠানদিগকে বঙ্গ ও উড়িষ্যা হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য বাদশাহ কর্তৃক প্রেরিত হন। পথে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় তিনি বর্দ্ধমানের জাহানাবাদে (বর্ত্তমান আরামবাগ) শিবিরসন্নিবেশ করেন। এ সময়েও সপ্তগ্রামের অবস্থা বেশ উন্নত ছিল। মানসিংহের আগমনের তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৯২ খৃঃ অব্দে পাঠানেরা আবার সপ্তগ্রাম বন্দর লুণ্ঠন করে।

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, সপ্তগ্রাম আকবর বাদশাহের "বালঘাকখানা," বা বিদ্রোহস্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। সম্ভবতঃ খৃষ্টের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম মুসলমানাধিকারে আসে। ইহার সর্ব্বপ্রথম শাসনকর্ত্তা ইয়াজউদ্দিন। সপ্তগ্রাম তৎকালীন রাজধানী দিল্লী আগরা হইতে বহুদূরে থাকায়, সুবেদার বা শাসনকর্ত্তৃগণ অনেক সময়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে

চক্রান্ত করিত; কিংবা বিদ্রোহ হইয়া সরকারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। সপ্তগ্রাম তখন বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ বন্দর, উন্নত নগর। এখানে লুটের যেরূপ সুযোগ, এমন আর কোথাও নাই। কাজেই পাঠান বিদ্রোহীরা সপ্তগ্রামের উপর বড়ই অত্যাচার করিত। সপ্তগ্রামের বন্দর একবার লুটিতে পারিলেই বিদ্রোহীদের পাঁচ বৎসরের খোরাকের সংস্থান হইত।

হায় সপ্তগ্রাম! কোথায় তোমার সে সুখৈশ্বর্য্যময় দিন! জগতে ত চির-দিন কিছুই থাকে না। রাজধানী জঙ্গলে পরিণত হয়, জঙ্গল কাটিয়া রাজ-ধানী করা হয়। যে সময়ে সপ্তগ্রামের অধঃপতন সূচিত হয়, সেই সময়ে কলিকাতার উপর ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুকম্পা-দৃষ্টি পড়ে। হাজর কুম্ভীরের নিবাস-ভূমি, বাদায় পরিপূর্ণ, চোরডাকাতের উপদ্রবময়, জঙ্গলপূর্ণ কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর, এই তিন গণ্ডগ্রাম একত্রিত হইয়া সপ্তগ্রামের সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে সবলে আয়ত্ত করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে হুগলীর ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হয়।

কলিকাতার অতি প্রাচীন বৃত্তান্ত যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, শেঠ ও বসাকেরা কলিকাতার আদিম অধিবাসী। বসাক বা "বসুক"গণ এখন আপনাদিগকে "বৈশ্য" বলিয়া পরিচয় দেন, এবং এ সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। যে বসাকেরা গোবিন্দপুরে তাঁহাদের বাণিজ্য-ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া গোবিন্দপুরের অবস্থা উন্নত করিয়াছিলেন, সুতানুটীর হাট বাণিজ্যদ্রব্যে পূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই বসাক বা বসুকগণ সপ্তগ্রামের আদিম অধিবাসী। সপ্তগ্রামে ইঁহারা "বসক" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কলিকাতায় আসিবার পর "বসক" শব্দ "বসাকে" পরিণত হয়। বসুকদিগের জাতীয়—ইতিবৃত্তলেখক মহাশয় বলেন, "আনুমানিক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বসুকেরা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এই সময়ে সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবস্থা। বসুকদিগের সপ্তগ্রাম-ত্যাগের প্রধান কারণই সরস্বতীর শোচনীয় অবস্থা। কেহ কেহ বলেন, গৃহবিবাদে বসুক-দের একদল সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন। তাঁহাদের লিখিত বৃত্তান্ত হইতেই জানিতে পারা যায়, মোগলেরা হুগলীর সম্মুখবাহিনী ভাগীরথীর শাখা অতিশয় গভীর করিয়া দেন। তাহাতে ভাগীরথীর যে জল পূর্ব্বে সপ্তগ্রামের ক্রোড়বাহিনী সরস্বতীর সহিত মিলিত হইত, তাহা রুদ্ধ হইল। এ দিকে আবার বেতাকীর বা বেতড়ের খালে চড়া পড়ায় সরস্বতীর স্রোত ক্রমে বদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। ইহাই সপ্তগ্রামের ধ্বংসের কারণ।

"পাদিশাহ" নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থে ১৬৩২ খৃঃ অব্দে সপ্তগ্রামের সম্যক্ ধ্বংসের কথা উল্লিখিত আছে।

যে সময়ে সপ্তগ্রামের অধঃপতন হয়, তখন পর্ট্তুগিজেরাই বাঙ্গালার প্রধান ব্যবসাদার। ইউরোপখণ্ডে মাল আমদানী রপ্তানীর ব্যাপার তাহাদের একরূপ একচেটিয়া ছিল। বন্দর-পরিবর্ত্তনে হুগলীতে সরকারী কাছারী খাজানাখানা প্রভৃতি সবই উঠিয়া গেল। পর্ট্তুগিজেরাও নিরুপায় হইয়া হুগলীতে গিয়া জুটিলেন। কিন্তু হুগলী নগরের অবস্থা তখন অতিশোচ-নীয়। ইহার চারি দিকে বন-জঙ্গল ও ব্যাঘভয়। পর্ট্তুগিজেরা নানা স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া কতকটা পরিষ্কৃত করিলেন। বঙ্গদেশের তৎকালীন শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া ১৫৪০ খৃঃ অব্দে হুগলীতে একটী ফ্যাক্টরীও স্থাপন করিলেন।

ফ্যাক্টরীর গৃহগুলিও চমৎকার। সবই বাঁশে তৈয়ারী চালাঘর। দুই চারিখানা মেটে বাঙ্গালা, মালগুদাম, এই লইয়াই ফ্যাক্টরী। ক্রমাগত চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ের ফলে তাহারা হুগলীর বাণিজ্য জাঁকাইয়া তুলিল। সরকারী বাণিজ্যের প্রাধান্য কমিল। পর্ট্তুগিজের বাণিজ্যের এই উন্নত অবস্থা দেখিয়া স্থানীয় শাসনকর্ত্তা বড়ই চটিয়া গেলেন। তখনই সুবেদার সাহেবের হুকুমজারি হইল—"পর্ট্তুগিজদিগকে হুগলী হইতে তাড়াইয়া দাও।"

পর্ট্তুগিজগণ স্থানীয় শাসনকর্ত্তার অকারণ কোপ-দৃষ্টে পড়িয়া প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু বহুদিন এদেশে থাকিয়া মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের রীতি প্রকৃতি তাঁহারা ভালরূপই জানিতেন। পর্ট্তুগিজ প্রধানগণ উৎকোচাদি লইয়া সুবেদার সাহেবের দরবারে হাজির হইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। আবার হুগলীতে পর্ট্তুগিজ বাণিজ্যের প্রভাব বাড়িয়া উঠিল। আজকাল যে স্থানকে "ব্যাণ্ডেল" বলে, তাহাই পর্ট্তুগিজদিগের বন্দর ছিল। "ব্যাণ্ডেল" বন্দর শব্দের অপভ্রংশমাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ১৫৯২ খৃঃ অব্দে সপ্তগ্রাম বিদ্রোহী পাঠানগণ কর্ত্তৃক শেষবার লুণ্ঠিত হয়। ইহার পরেই শোভাসিংহ বিদ্রোহী হইয়া সপ্তগ্রামের অবশিষ্ট সৌভাগ্য-চিহ্নের বিলোপসাধন করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও আমরা দেখিতে পাই—চুঁচুড়ার দিনেমার বণিকেরা সপ্তগ্রামকে পরিত্যাগ করেন নাই। অনেক দিনেমার বণিক এই সময়ে সপ্তগ্রামে পল্লীনিকেতন (Country houses) নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান

করিতেছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই চুঁচুড়া হইতে ছয় মাইল পথ দূরবর্ত্তী সপ্তগ্রামে প্রতিদিন পদব্রজে যাতায়াত করিতেন।

অতীতের এই সোনার সপ্তগ্রাম একসময়ে সমগ্র ভারতের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র, লক্ষ্মীর লীলাকানন ছিল। এখন সে সপ্তগ্রাম জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। প্রচণ্ডসলিলস্রোতোময়ী সরস্বতী, পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি বুকে লইয়া, মর্ম্মবেদনায় ক্ষীণস্রোতে প্রবাহিতা। শৃগাল কুকুরেও তাহা পার হইয়া যাইতেছে। যে সরস্বতীর উপর বড় বড় জাহাজ স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিত, তাহাতে এখন বড় নৌকাও চরের ভয়ে চলিতে ভয় করে। কালের কঠোর শাসনে মহাসমুদ্র শুখাইয়া যেন গোষ্পদে পরিণত হইয়াছে। হায় সপ্তগ্রাম!

বর্ত্তমান কালে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান হইয়াছে। কলিকাতার ঐতিহাসিক-সমিতির সদস্যগণ বর্ত্তমান কালের সপ্তগ্রামের ধ্বংসময় অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন। সমিতির বিবরণে অতীতকালের অতিবিস্তৃত, প্রচণ্ডস্রোতঃশালিনী সরস্বতীর বর্ত্তমান অবস্থার সমস্ত কথাই আছে।

[প্রাচীন সপ্তগ্রামের শ্মশানে সেকালের অনেক তথ্য প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পথ অনুসরণ করিয়া এই সপ্তগ্রামের ক্ষেত্রে ভূগর্ভে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিলে বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। কেহ কি এ অঞ্চলে এইরূপ ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের সূচনা করিবেন না?—সাহিত্য সম্পাদক।]

সরস্বতীর পঙ্কিলকূলেই সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষ অতীতের কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। হিন্দু, মোগল, পাঠান ও ইংরাজ—চারিটি রাজ্যের কাহিনীর সহিত জড়িত হইয়া পুরাতন সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষ আজও বর্ত্তমান। ধরিতে গেলে সেই প্রাচীন বন্দরের, নগরের কোনও চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। দুই একটী ধ্বংসপ্রায় মসজেদ ও সমাধিস্তম্ভ এখন মুসলমান রাজত্বকালের ক্ষীণস্মৃতিরূপে বর্ত্তমান। এগুলিও ৩।৪ শত বৎসরের বেশী পুরাতন নহে। বর্ত্তমান গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিম দিকে এখনও এগুলি বর্ত্তমান। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পূর্ব্বে এবং সরস্বতীর দক্ষিণপূর্ব্বকূলে এখনও একটী পুরাতন কেল্লার আয়তাকার মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার ইষ্টকগুলি কালহস্ত-পীড়নে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মাটীর সঙ্গে মিশিয়াছে। এ কেল্লা কোন সময়ের, তাহারও কোনও কাহিনী নাই। অনেকে অনুমান করেন, এই কেল্লার পার্শ্ব-বাহিনী সরস্বতীর তীরে ত্রিবেণী হইতে জাহাজাদি আসিয়া মাল নামাইত।

ইহার কিছু দূরে কয়েকটী পুষ্করিণী আছে—ইহারা এখনও "জাহাঙ্গীরের দীঘি" বলিয়া পরিচিত। সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে যাহা কিছু পাইয়াছি, "সাহিত্যে"র পাঠক-বর্গকে উপহার দিলাম। ভবিষ্যতে ত্রিবেণীর কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

স্বপ্ন-বাসবদত্তম্।

"সুহৃদ্ বুদ্ধিমতাং লোকে নাস্ত্যপ্রাপ্যং হি কিঞ্চন।"

"সাহিত্যের" বিগত সংখ্যায় "প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণম্" শীর্ষক প্রবন্ধের উপোদ্ঘাতরূপে আমরা মহাকবি ভাস-প্রণীত নাটক-চক্রের নবাবিষ্কারের কথা-প্রসঙ্গে, মহাকবির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়াছি, এবং তাঁহার রচনার অনন্যসাধারণ কাব্যগুণ-সমৃদ্ধির উল্লেখপূর্ব্বক তৎপ্রণীত "প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ" নাটিকার কথাবস্তুর বিবরণ প্রদান করিয়াছি। বৎসরাজ উদয়ন কর্ত্তৃক অবন্তিরাজ প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তার অপহরণ-বৃত্তান্ত ও কৌশাম্বীর মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণ কর্ত্তৃক উদয়নের কারামুক্তি-কথা অবলম্বন করিয়াই সেই নাটিকাখানি রচিত হইয়াছিল। বৎসরাজের জীবনের পরবর্ত্তী আর একটি ব্যাপার "স্বপ্ন-বাসবদত্তম্" নাটকের প্রধান কথা। মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণের বুদ্ধি-বলে মগধ-রাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতীর সহিত বাসবদত্তা-প্রণয়-মুগ্ধ উদয়নের পরিণয়সাধন, এবং সেই অভিপ্রেত বিবাহের পর, মহারাজ উদয়নের সঙ্গে মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ ও প্রধানা মহিষী বাসবদত্তার পুনর্মিলনই এই নাটকের প্রধান বিষয়। পঞ্চমাঙ্কে বিবৃত, উদয়ন-কর্ত্তৃক স্বপ্নে অধিগত বাসবদত্তার কথা অবলম্বনে রচিত বলিয়া, কবি এই নাটকখানিকে "স্বপ্ন-বাসবদত্তম্" নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন।

আলোচ্য নাটকের কথাবস্তু কোনও মূলগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে কি না, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পাণিনির "ক্রতূক্থাদি-সূত্রান্তাট্ ঠক্" (৪।২।৬০) এই সূত্রের ভাষ্যে "বাসবদত্তিকঃ"

শব্দটির উল্লেখ করিয়াছেন। "বাসবদত্তা" নামক আখ্যায়িকা যিনি পাঠ করেন বা জানেন ["তদধীতে তদ্বেদ" ৪।২।৫৯—সূত্রের সাহায্যে অর্থ করিতে হইবে]—তিনিই "বাসবদত্তিকঃ"। প্রাচ্য প্রতীচ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর বিচারে, মহাভাষ্যকারের উদ্ভবকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০-১৪০ সংবতের মধ্যেই স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভাস মহাভাষ্যকারের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে পতঞ্জলি ভাসের "স্বপ্নবাসবদত্তম্" ও প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্" নাটকদ্বয়ের আখ্যায়িকাকে লক্ষ্য করিয়াই "বাসবদত্তিকঃ" শব্দটীর উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোনও কবির উল্লিখিত আখ্যায়িকার অনুসরণ করিয়া ভাস বাসবদত্তার উপাখ্যান-সংবলিত নাটক রচনা করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। অথবা পতঞ্জলি ও ভাস উভয়ে একই মূল হইতে বাসবদত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকিতে পারেন। সে যাহা হউক, পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা [১৮৪ পৃষ্ঠায়] বলিয়াছি যে, বৎসরাজ উদয়ন ও বাসবদত্তার পিতা, অবন্তিরাজ প্রদ্যোত, বুদ্ধদেবের সমসাময়িক রাজা ছিলেন। পালিগ্রন্থ ও পুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মগধ-পতি অজাতশত্রু ও বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, এবং তিনি ও তাঁহার পিতা বিম্বিসার রাজগৃহ-নগর হইতেই রাজ্যপরিচালন করিতেন। রাজধানী তখন পর্য্যন্তও পাটলিপুত্র [কুসুমপুর] নগরে সংস্থাপিত হয় নাই। পুরাণে বর্ণিত বংশাবলীতে অজাতশত্রুর পুত্রের নাম নানাভাবে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণের মতে তাঁহার নাম "দর্শক", এবং তিনি বিম্বিসারের পুত্ররূপে উল্লিখিত। কিন্তু মৎস্যপুরাণের মতে অজাতশত্রুর পুত্রের নাম "বংশক"। বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও ভাগবতপুরাণের মতে অজাতশত্রুর পুত্রের নামক "দর্ভক"। "বংশক", "দর্ভক" ও "দর্শক" * একই রাজার নাম বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই দর্শকের পুত্র উদয়ী সর্ব্বপ্রথম পাটলিপুত্র নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া, বায়ুপুরাণে [৯৯ অধ্যায়, ৩১৯ শ্লোকে] উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

> "স বৈ পুর-বরং রাজা পৃথিব্যাং কুসুমাহ্বয়ম্।
> গঙ্গায়া দক্ষিণে কূলে চতুর্থেঽব্দে করিষ্যতি ॥"

অতএব উদয়ীর পিতা দর্শকের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত রাজগৃহ-নগরেই রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। স্বপ্নবাসবদত্ত-নাটকের বর্ণিত মগধরাজ দর্শকের রাজধানীও যে রাজগৃহ নগরেই অবস্থিত ছিল, তাহার প্রমাণ [প্রথমাঙ্কে] দুই-

---

* পঞ্চবিংশৎসমা রাজা দর্শকস্তু ভবিষ্যতি ॥"—৯৯ অধ্যায়।

বার প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং নাটকোক্ত দর্শককেও ঐতিহাসিক রাজা বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, এবং তাঁহার অভ্যুদয়কালও গৌতমবুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের অল্পকাল পরেই নির্দ্দেশ করিতে হয় ;—কারণ, অজাতশত্রুর রাজত্বের শেষভাগেই বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। অজাতশত্রুর মৃত্যুর পর, দর্শকের রাজত্বসময়েও বৎসরাজ উদয়ন বর্ত্তমান ছিলেন। উদয়নের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের উপাখ্যান অবলম্বনে পরবর্ত্তী কালে শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিগণ অনেক নাটকাদির রচনা করিয়াছেন।

আলোচ্য নাটকখানি ছয় অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে শৃঙ্গাররসই প্রধান-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের অঙ্গরূপে অন্যান্য রসেরও গৌণভাবে অবতারণা আছে। নাটকের নায়ক বৎসরাজ উদয়ন, নায়িকা বাসবদত্তা ও উপনায়িকা মগধনাথ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতী।

কথাবস্তু।

আদেশিকগণের আদেশ হইয়াছিল যে, মগধনাথ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতী কৌশাম্বীপতি বৎসরাজ উদয়নের মহিষী হইবেন, এবং এই বিবাহ নিষ্পন্ন হইলে, উদয়ন শত্রুহৃত আত্মরাজ্য পুনরায় নিজ অধিকারে আনিতে সমর্থ হইবেন। বৎসরাজ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের বিশ্বাস ছিল যে,

"ন হি সিদ্ধবাক্যা-
ন্যুৎক্রম্য গচ্ছতি বিধিঃ সুপরীক্ষিতানি।"

"বিধি কখনই সুপরীক্ষিত সিদ্ধবাক্যের উল্লঙ্ঘন করেন না"—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, মন্ত্রিবর বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, কি উপায়ে মহারাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতীর সহিত আত্মপ্রভু উদয়নের বিবাহ সম্পন্ন করাইয়া প্রভুকে নিজরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন, এই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। যৌগন্ধরায়ণের এই প্রকার চিন্তার অন্য কারণ এই যে, বৎসরাজ উদয়ন পূর্ব্বেই অবন্তিরাজ প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তাকে বহুকষ্টে অপহরণ করিয়া আনিয়া বিবাহান্তে তাঁহাকে প্রধানা মহিষীরূপে বরণ করিয়া রাখিয়াছেন। মন্ত্রিবর সঙ্কল্প করিলেন যে, যতদিন পদ্মাবতীর সহিত প্রভুর বিবাহকার্য্য সংঘটিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মহাদেবী বাসবদত্তাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবেন। শীঘ্রই আত্মমনোরথসিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হইল। একদিন মহারাজ উদয়ন মৃগয়ায় বাহির হইবার পর, যৌগন্ধরায়ণ রুমণ্বান প্রমুখ অন্যান্য অমাত্যগণকে নিজের অনুপস্থিতকালে রাজ্যপরিচালনা বিষয়ে যথাকর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদান

করিয়া, স্বয়ং পরিব্রাজকের বেশধারণপূর্ব্বক, বাসবদত্তাকে অবন্তিকা সজ্জিত করাইয়া, তাঁহাকে লোকসমীপে নিজ-সহোদর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে করিতে, আত্মকার্য্যের উদ্ধারের জন্য মগধ দেশের উপকণ্ঠে এক তপোবনপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। পদব্রজে পরিভ্রমণে অনভ্যস্তা বাসবদত্তার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তাহার পর আবার মগধরাজের কয়েক জন ভৃত্য তপোবনপথ হইতে সাধারণ লোকদিগকে তাড়াইয়া দিতেছিল। দেবীর খেদ দূর করিবার জন্য মন্ত্রী সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে বলিতেছিলেন,—

"পূর্ব্বং ত্বয়াপ্যভিমতং গতমেবমাসী চ্ছ্লাঘ্যং গমিষ্যসি পুনর্বিজয়েন ভর্ত্তুঃ।
কাল-ক্রমেণ জগতঃ পরিবর্ত্তমানা চক্রারপঙ্‌ক্তিরিব গচ্ছতি ভাগ্যপঙ্‌ক্তিঃ।"

"হে দেবি! পূর্ব্বে আপনিও এইরূপ নিজের অভিমত প্রাণে পথে গমন করিতেন, স্বামী বিজয়লাভ করিলে পর, পুনর্ব্বার শ্লাঘ্যরূপে গমন করিতে পারিবেন, কালক্রমে পরিবর্ত্তনশীল জগতের ভাগ্যপঙ্‌ক্তিও [রথ] চক্রের অরপঙ্‌ক্তির ন্যায় ঘুরিতে থাকে।" তখন উপস্থিত হইয়া উভয়ে দেখিলেন যে, মহারাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতী আশ্রমস্থ মহাত্মাগণের [illegible] করিবার জন্য রাজধানী রাজগৃহনগর হইতে কঞ্চুকী ও অন্যান্য পরিজনকে সঙ্গে লইয়া তপোবনে আসিয়া, সেই দিবস সেখানে অবস্থান করিতেছেন। তপোবন-তাপসীর সহিত পদ্মাবতীর পরিচারিকার কথোপকথন হইতে [illegible] যৌগন্ধরায়ণ ও বাসবদত্তা জানিতে পারিলেন যে, অবন্তিপতি প্রদ্যোত নিজ পুত্রের জন্য পদ্মাবতীর পাণি কামনা করিয়া, মগধরাজ দর্শকের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছেন। এই সংবাদে বাসবদত্তা বড়ই আতঙ্কিত হইলেন। সে যাহা হউক, "ধর্ম্ম-প্রিয়" পদ্মাবতী আশ্রমবাসী তপস্বিগণকে অভিলষিত বস্তু প্রদান করিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজপুত্রীর অনুগামী কঞ্চুকীও,

"যদ্যস্যাস্তি সমীপ্সিতং বদতু তৎ কস্যাদ্য কিং দীয়তাম্।"

"যাঁহার যাহা অভীপ্সিত, তাহা বলুন। বলুন, কাহাকে কি দিতে হইবে"—এই বলিয়া, নৃপসুতার সদভিপ্রায় আশ্রমে ঘোষণা করিয়া দিলেন। কার্য্যসিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত বুঝিয়া, যৌগন্ধরায়ণ আপনাকে 'অহমর্থী' বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন, এবং বলিলেন যে, তাঁহার এই প্রোষিতভর্ত্তৃকা ভগিনীকে স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত মহারাজপুত্রী ন্যাসরূপে রক্ষা করিলে তিনি অনুগৃহীত হইবেন। কঞ্চুকী কি প্রকারে এইরূপ প্রার্থনার অনুমোদন করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন; কারণ,

"সুখমর্থো ভবেদ্ দাতুং সুখং প্রাণাঃ সুখং তপঃ।
সুখমন্যদ্ ভবেৎ সর্ব্বং দুঃখং ন্যাসস্য রক্ষণম্॥"

"অর্থপ্রদান সুখকর, [পরের জন্য] প্রাণদানও সুখকর, তপস্যা-[ফল]-দানও সুখকর,—অন্য সকলই সুখকর বটে, কিন্তু ন্যাসরক্ষা বড়ই দুঃখকর।" সত্যবাদিনী পদ্মাবতী কঞ্চুকীর নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে ঘোষণানুরূপ কার্য্য করিতে আদেশ দিয়া, আবন্তিকাবেশ-ধারিণী ব্রাহ্মণভগিনী বাসবদত্তাকে ন্যাসরূপে রাখিতে স্বীকার করিলেন। যৌগন্ধরায়ণও প্রারব্ধ কার্য্যের অর্দ্ধাংশ পরিসমাপ্ত হইল ভাবিয়া,আপনাকে অনেকাংশে কৃতার্থ মনে করিলেন। ইহার পর, মধ্যাহ্নে, এক পরিশ্রান্ত ব্রহ্মচারী রাজগৃহ হইতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আত্ম-পরিচয়-প্রদানকালে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি বৎস-ভূমিতে লাবাণক গ্রামে বাস করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তথায় এক নিদারুণ বিপত্তি সংঘটিত হওয়ায়,তাঁহাকে সেই গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই স্থানে চলিয়া আসিতে হইয়াছে। সম্ভ্রমে সকলেই সেই নিদারুণ বিপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করাতে, ব্রহ্মচারী সেই ঘটনার বিবরণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, বৎসরাজ উদয়ন মৃগয়ায় নিষ্ক্রান্ত হইলে পর, তাঁহার মহিষী অবন্তি-রাজপুত্রী বাসবদত্তা গ্রামদাহে দগ্ধ হইয়াছেন। দেবীকে উদ্ধার করিতে যাইয়া মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণও সেই অগ্নিতে পতিত হইয়া মৃত্যুর আশ্রয় লইয়াছেন। তৎপরে মহারাজ মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর এই দুঃসহ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, মন্ত্রী ও মহিষীর বিয়োগজনিত সন্তাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া নিজেও অগ্নিতে প্রাণপরিত্যাগের জন্য উদ্যত হইলেন; কিন্তু রুমণ্বান প্রমুখ অমাত্যগণের প্রযত্নে ও সান্ত্বনাবাক্যে তিনি সেই দুষ্কর সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। অমাত্যগণের পরিচর্য্যায় তিনি সম্প্রতি অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন।" ব্রহ্মচারীর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া পতিগতপ্রাণা বাসবদত্তা বহুকষ্টে ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু, বিদিতবৃত্তান্ত যৌগন্ধরায়ণ,

"তস্মিন্ সর্ব্বমধীনং হি যস্যাধীনো নরাধিপঃ।"

"নরপতি যাঁহার অধীন, তাঁহার নিকট সকলই অধীন" এই ভাবিয়া রুমণ্বান রাজরক্ষার দায়িত্ব কৌশলেই বহন করিতেছেন জানিয়া, সন্তুষ্ট হইলেন; মনোগত ভাব কাহাকেও, এমন কি, বাসবদত্তাকেও জানিতে দিলেন না। ব্রহ্মচারী বিদায় লইলে, যৌগন্ধরায়ণ স্বভগিনীকে পদ্মাবতীর হস্তে রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে, পদ্মাবতীও পরিজনসহ সন্ধ্যার প্রাক্কালেই অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন।

কিছুকাল পরে, একদিন পদ্মাবতী সখী বাসবদত্তা ও অন্যান্য পরিচারিকা-গণকে সঙ্গে করিয়া মাধবীমণ্ডপপার্শ্বে কন্দুকক্রীড়ায় নিরত ছিলেন। উপহাস করিয়া বাসবদত্তা বলিলেন, "রাজপুত্রি! অদ্য তোমার শোভা কিছু অধিকতর বলিয়া মনে হইতেছে। শীঘ্রই তুমি উজ্জয়িনীপতি মহাসেনাপর-নামা প্রদ্যোতের পুত্রবধূ হইবে।" পদ্মাবতীর এক পরিচারিকা উত্তর করিল যে, উজ্জয়িনীরাজ-কুলে তাঁহার সম্বন্ধ হউক, তাহাতে রাজপুত্রীর অভিমত নাই; তিনি বৎসরাজ উদয়নের রূপ গুণের কথা অবগত হইয়া, তাঁহাকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ করিতেছেন। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময়ে অন্তঃপুর হইতে পদ্মাবতীর ধাত্রী আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, কোনও প্রয়োজন-বশতঃ বৎসরাজ উদয়ন মগধে আসিয়াছেন; উদয়নের আভিজাত্য, জ্ঞান, বয়স ও রূপ দেখিয়া মহারাজ দর্শক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পদ্মাবতীকে তাঁহার হস্তেই প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। বাসবদত্তা ভাবিলেন,—এ কি সর্ব্বনাশ! তিনি ঠিক করিতেই পারিলেন না, কিরূপে,—

"এষ পার সর্ব্বম্‌ উদাসীনো বভৌ।"

"সেই ভাবে সন্তপ্ত হইয়া, এখন রাজা উদাসীন হইলেন"। কিন্তু যখন ধাত্রী-মুখে শুনিলেন যে, উদয়ন নিজে সম্বন্ধ প্রার্থনা করেন নাই, মহারাজ দর্শকই স্বেচ্ছায় পদ্মাবতীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখনই স্বামীকে এই বিষয়ে নিরপরাধ মনে করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই, অপর এক পরিচারিকা দ্রুত-পদে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পদ্মাবতীকে অন্তঃপুরে যাইবার জন্য ভর্ত্তৃমাতার আদেশ জানাইল। অদ্যই শুভ নক্ষত্র, অদ্যই বিবাহ-মঙ্গল সম্পাদিত হইবে। এই সংবাদে বাসবদত্তার হৃদয়াকাশ দুঃখান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

অন্তঃপুরের চতুঃশালাতে অ-বিধবাগণ নূতন বরকে মণিভূমিতে স্নান করাইতেছেন। পরিচারিকাগণ সকলেই স্ব-স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত। কেহ পুষ্প-মালা, কেহ বা বরের পরিধেয় আনিতে ব্যস্ত। কিন্তু আজ বাসবদত্তা সেই স্থানে উপস্থিত নাই। ভর্ত্তৃ-মাতার আদেশ যে, পদ্মাবতীর শুভ-বিবাহের মালা গাঁথিবার ভার তাঁহার প্রিয়বয়স্যা আবন্তিকার [বাসবদত্তার] হস্তেই অর্পণ করিতে হইবে। সেই জন্যই একটি পরিচারিকা পুষ্পহস্তে বাসবদত্তার অন্বেষণ করিতে করিতে, প্রমদবনে যাইয়া দেখিতে পাইল—চিন্তা-শূন্য-হৃদয় আবন্তিকা প্রিয়ঙ্গু-বৃক্ষ-তলে শিলা-পট্টকে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। অত

"অজ্জউত্তো বি ণাম পরকেরও সংবুত্তো।"

"আর্য্যপুত্রও পরের হইয়া গেলেন"—এই দুঃখে চিত্তবিনোদন করিবার জন্যই বাসবদত্তা বিবাহামোদ-সঙ্কুল অন্তঃপুর-চতুঃশালায় পদ্মাবতীকে রাখিয়া, নিজে প্রমদ-বনে চলিয়া আসিয়াছেন।

"এদং বি মএ কত্তব্বং আসী। অহো অকরুণা খু ইস্সরা।"

"ইহাও আমাকেই করিতে হইল,—অহো দেবতাগণ নিশ্চয়ই অকরুণ"—এই বলিয়া, তিনি পদ্মাবতীর বিবাহ-মালা গাঁথিয়া দিলেন।

"অজ্জউত্তং পেক্খামি ত্তি এদিণা মণোরহেণ জীবামি মন্দভাআ।"

"বাঁচিয়া থাকিলে আর্য্যপুত্রকে দেখিতে পাইব, এই আশাতেই মন্দভাগ্যা হইয়াও বাঁচিয়া থাকিব"—এইরূপ ভাবিয়া, তিনি প্রাণ-পরিত্যাগ করেন নাই। শয্যা আশ্রয় করিয়া নিদ্রা-সাহায্যে দুঃখ-লাঘবের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পদ্মাবতীর সহিত বৎসরাজের অভিপ্রেত বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। তৎপরে শরৎকালে একদিন পদ্মাবতী পরিজন সহ প্রমদবনে পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছেন, তাঁহার সখী আবন্তিকা [বাসবদত্তা] কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হলা! পিও দে ভত্তা?" "সখি! তোমার স্বামী তোমার প্রিয় ত?।" প্রত্যুত্তরে পদ্মাবতী বলিলেন—

"অয্যে ণ আণামি, অয্যউত্তেণ বিরহিদা উক্কণ্ঠিদা হোমি।"

"আর্য্যে, তা আমি জানি না, কিন্তু আর্য্যপুত্র-বিরহিতা হইলে আমি উৎকণ্ঠিতা হইব।" পদ্মাবতীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে,—উদয়ন উপরতা প্রদ্যোত-দুহিতা বাসবদত্তাকেও তাঁহারই মত ভালবাসিতেন কি না? বাসবদত্তার প্রতি রাজার স্নেহের মাত্রা অল্প হইলে, কখনই রাজ-দুহিতা প্রিয়জন-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উজ্জয়িনী হইতে উদয়নের সহিত পলাইয়া আসিতেন না।—আবন্তিকা এই বলিয়াই মৌনাবলম্বন করিলেন। পদ্মাবতী মনে করিলেন যে, বাসবদত্তার বীণাবাদন-কৌশলের কথা স্মরণ করিয়াই, বোধ হয়, আর্য্যপুত্র তাঁহার বীণাবাদন-শিক্ষার কথা উত্থাপিত হইলে, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, নিরুত্তর হইয়াছিলেন। ইহাতেই পদ্মাবতী বুঝিয়াছিলেন যে, বাসবদত্তাই স্বামীর অধিকতর প্রিয়া ছিলেন। এমন সময়, নর্ম্ম-সচিব বসন্তককে লইয়া, উদয়ন প্রমদবনের শোভা পরিদর্শন করিবার জন্য, সেই দিকেই আসিতেছিলেন। আবন্তিকার পর-পুরুষ-দর্শন পরিহার করিবার জন্যই পদ্মাবতী আর্য্যপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ না

করিয়া পরিজনসহ মাধবীমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। শরৎকালের দুঃসহ রৌদ্র হইতে রক্ষা পাইবার আশায়, বিদূষক বসন্তক বয়স্যকে লইয়া মাধবীমণ্ডপে অবস্থান করিয়া পদ্মাবতীর প্রতীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। প্রমদাগণ প্রমাদ গণিলেন ; কারণ, সেই মণ্ডপে প্রবেশ করিলে, বসন্তক সকলকেই আকুল করিয়া তুলিবেন। পদ্মাবতীর এক পরিচারিকা তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য এক ভ্রমর-লীন লতা ঘুরাইতে লাগিল। মধুকর-সংত্রাসে বিচলিত বিদূষক বয়স্যকে লইয়া সেই মণ্ডপে প্রবেশ না করিয়া, এক শিলাতলে উপবেশন করিয়াই পদ্মাবতীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তথায় বসিয়া বিদূষক বয়স্যকে এক প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে বিষম সঙ্কটে ফেলিলেন,—"বয়স্য!

"কা ভবদো পিআ, তদাণিং তত্তহোদী বাসবদত্তা ইদাণিং পদুমাবদী বা।"

"কে তোমার [অধিকতর] প্রিয়, তখনকার বাসবদত্তা ? না, এখনকার পদ্মাবতী ?" বিদূষক কিংবা উদয়ন জানেন না যে, যাঁহাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন, তাঁহারা উভয়েই মাধবী-মণ্ডপেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাজা প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন ; কারণ, বিদূষক বাচাল। কিন্তু বিদূষক ছাড়িবার পাত্র নহেন, তাই অনন্যগতি হইয়া রাজা বলিলেন,—

"কা গতিঃ, শ্রূয়তাম্।
পদ্মাবতী বহুমতা মম যদ্যপি রূপ-শীল-মাধুর্য্যৈঃ।
বাসবদত্তাবদ্ধং ন তু তাবন্মে মনো হরতি।"

"গতি কি ? শ্রবণ কর ! রূপ, চরিত্র ও মধুরতায় পদ্মাবতী আদরণীয়া হইলেও, বাসবদত্তাবদ্ধ আমার চিত্তটি পদ্মাবতী [অদ্যাপি] হরণ করিতে পারেন নাই।" আর্য্যপুত্রের এই প্রিয়োক্তি শ্রবণ করিয়া আবন্তিকা মনে মনে ভাবিলেন,—

"দিন্নং বেদণং ইমস্স পরিখেদস্স। অহো অঞ্ঞাদবাসো পি এত্থ বহুগুণং সম্পজ্জই।"

"এত খেদের মূল্য [আজ] প্রাপ্ত হওয়া গেল। অহো! এই স্থানের অজ্ঞাতবাসও বহুগুণ-যুক্তই হইল"। বাসবদত্তার গুণাবলি অদ্যাপি রাজার স্মরণ হইতে অপগত হয় নাই—এই ভাবিয়া, পদ্মাবতীও উদয়নের এইরূপ মনোভাব জানিয়াও বিষণ্ণ হয়েন নাই। তৎপরে উদয়নও বয়স্যকে সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদূষক উত্তর করিলেন,—

"কিং মে বিপ্পলবিদেণ, উভও বি তত্তহোদীও মে বহুমদাও।"

"বিপ্রলাপের প্রয়োজন কি ? উভয় দেবীই আমার বহুমতা"। রাজাও ছাড়ি-

বার লোক নহেন; বহু পীড়াপীড়ির পর বসন্তক উত্তর দিতে স্বীকার করিয়া বলিলেন,"বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী, উভয়েই সমানগুণ-সম্পন্না হইলেও, পদ্মাবতীর একটি গুণ অধিক আছে। উত্তম ভোজনসামগ্রী থাকিলে, তিনি বসন্তককে তদ্দ্বারা সম্মানিত করিতে ভুলেন না।" মন পরিহাস-বিক্ষিপ্ত হওয়ায়, রাজা বলিয়া উঠিলেন, "এই সব কথা আমি বাসবদত্তাকে বলিয়া দিব"। বিদূষক বাসবদত্তার অগ্নিদাহে মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া দিলে পর, রাজা বয়স্যকে দুঃখসহকারে অশ্রুসিক্ত-নয়নে বলিতে লাগিলেন, "বয়স্য!—

"দুঃখং ত্যক্তং বদ্ধমূলোঽনুরাগঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা যাতি দুঃখং নবত্বম্।
যাত্রা ত্বেষা যদ্ বিমুচ্যেহ বাষ্পং প্রাপ্তানৃণ্যা যাতি বুদ্ধিঃ প্রসাদম্॥"

দুঃখ পরিত্যক্ত হইয়াছে, (কিন্তু) অনুরাগ বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। স্মরণে দুঃখ নবীভূত হয়। বাষ্প-বিমোচন করিলে পর, বুদ্ধি শোধন প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্ন হয়—ইহাই সংসারের রীতি।" স্বামীর উৎকণ্ঠা দেখিয়া, বাসবদত্তা পদ্মাবতীকে স্বামি-সন্নিধানে সান্ত্বনার জন্য পাঠাইয়া দিয়া, স্বয়ং অন্য পথ দিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। পদ্মাবতী রাজসমীপে উপস্থিত হইলে পর, কাশ-পুষ্প—রেণুপাতই অশ্রুপাতের কারণ, এই বলিয়া রাজা নবোঢ়া নারীর মন রক্ষা করিলেন। পদ্মাবতী কিন্তু সমস্ত ব্যাপারই মাধবীমণ্ডপ হইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। অপরাহ্ণে মগধ-রাজ দর্শক নূতন বরকে সুহৃজ্জন-সমীপে পরিচিত করাইয়া দিবেন, এই স্থির ছিল। এই জন্য বসন্তককে লইয়া উদয়নও অন্তঃপুর হইতে চলিয়া গেলেন।

অন্য একদিন, বাসবদত্তার নিকট পরিচারিকা সংবাদ আনিল যে, পদ্মাবতী শীর্ষবেদনায় অস্বস্থা হইয়াছেন; "সমুদ্র-গৃহে" তাঁহার শয্যা আস্তীর্ণ আছে; বাসবদত্তাকে সেই স্থানে যাইতে হইবে। অপর এক পরিচারিকার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া, বসন্তক উদয়নকে পদ্মাবতীর রোগের কথা বিজ্ঞাপিত করিলেন। প্রদ্যোতদুহিতার শ্লাঘ্য চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়াই, উদয়ন সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতেন; আজ আবার পদ্মাবতীর শীর্ষরোগের কথায় বিষণ্ণতর হইয়া সেই রাত্রিতেই বয়স্যকে সঙ্গে "সমুদ্রগৃহে" শীর্ষ-বেদনাপীড়িতা পদ্মাবতীকে দেখিতে আসিলেন; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত পদ্মাবতী সেই গৃহে যাইয়া শয়ন করেন নাই। উভয়েই সেখানে পদ্মাবতীর জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নিদ্রাবেশ হওয়াতে, বিদূষকের গল্প শুনিতে শুনিতেই উদয়ন সেই শয্যাতেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। নৈশ শৈত্য নিবারণের জন্য

বিদূষকও প্রাবারক আনয়ন করিবার জন্য স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে বাসবদত্তাও পদ্মাবতীকে দেখিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি জানেন না যে, সেই শয্যায় উদয়ন শয়ন করিয়া আছেন। তিনি ভাবিলেন, শয্যার এক পার্শ্বে অসুস্থা পদ্মাবতীই আবৃতশরীরা হইয়া নিদ্রিতা আছেন। সখীর এই পীড়ার সময়ে পার্শ্বে থাকা প্রয়োজন—এই ভাবিয়া বাসবদত্তাও শয্যার এক পার্শ্বেই শুইয়া পড়িলেন। সেই সময়েই উদয়ন স্বপ্নাবস্থায় "হা বাসবদত্তে! হা প্রিয়ে! হা প্রিয়শিষ্যে, আমার কথার প্রত্যুত্তর দাও না কেন?" ইত্যাদি করুণসূচক শব্দাবলী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আর্য্যপুত্রের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া আবন্তিকাবেশধারিণী বাসবদত্তা চমকিতা হইয়া, শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সভয়ে ভাবিতে লাগিলেন যে, যদি আর্য্যপুত্র তাঁহাকে দেখিতে পান, তাহা হইলে,

"মহন্তো খু অঅং—জোঅন্ধরাঅণস্স পড়িণ্ণাভারো মম দংসণেণ বিফলো সংবুত্তো।"

"আমার দর্শনে আর্য্য যৌগন্ধরায়ণের একটি মহান্ প্রতিজ্ঞা-ভার নিষ্ফল হইয়া যাইবে।" শয্যা-প্রান্ত হইতে স্বামীর অবলম্বিত হাত-খানিকে শয্যোপরি তুলিয়া দিয়া, বাসবদত্তা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন, এমন সময়ে উদয়নের নিদ্রাভঙ্গ হইল। কে যেন গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন, এই ভাবিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য অর্দ্ধনিদ্রাবস্থায় তিনি দ্রুতবেগে পশ্চাৎ ধাইবার উপক্রম করিতেছেন, কিন্তু দ্বার-পক্ষে ব্যাহত হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এমন সময়ে বসন্তক প্রাবারক লইয়া আসিয়া দেখেন, রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, এবং তিনি বিষণ্ণবদনে শয্যা-প্রান্তে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। বয়স্যকে দেখিয়া রাজা বলিলেন, "বয়স্য,—

"শয্যায়ামবসুপ্তং মাং বোধয়িত্বা সখে গতা।
দগ্ধেতি ব্রুবতা পূর্ব্বং বঞ্চিতোঽস্মি রুমণ্বতা॥"

"এই শয্যায় নিদ্রিত আমাকে জাগাইয়া [বাসবদত্তা এই স্থান হইতে] চলিয়া গিয়াছেন। দগ্ধপ্রায় হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া রুমণ্বান্ আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।" বিদূষক বলিলেন যে, নিশ্চয়ই তিনি স্বপ্নে বাসবদত্তাকে দেখিয়া এইরূপ ভ্রান্ত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু উদয়ন কখনও এইরূপ স্বপ্নদর্শনের আশাও করেন নাই, তাই তিনি ভাবিলেন,

"যদি তাবদয়ং স্বপ্নো ধন্যমপ্রতিবোধনম্।
অথায়ং বিভ্রমো বা স্যাদ্ বিভ্রমো হ্যস্তু মে চিরম্॥"

যদি ইহা স্বপ্নই হইয়া থাকে, তবে অপ্রতিবোধই শ্রেয়ঃ ছিল। আর, যদি চিত্তবিভ্রম জন্মিয়া থাকে, তবে যেন এইরূপ বিভ্রমই চিরদিন থাকিয়া যায়।" দুই বন্ধুতে এইরূপ দুঃখের কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময়ে মহারাজ দর্শকের নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, উদয়নের অন্যতম সচিব রুমণ্বান্ বিপুল সৈন্য সামন্ত লইয়া আরুণির অভিঘাতের জন্য মগধ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। মহারাজ দর্শকের হস্ত্যশ্ব-রথ-পদাতি চতুরঙ্গ বল উদয়নের সাহায্যেই সন্নদ্ধ। তিনি আরও বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, উদয়নের গুণ-সমৃদ্ধিতে মুগ্ধ পৌরজনেরা সমাশ্বস্ত হইয়াছে; রিপুকুলের উচ্ছেদের জন্য তিনি সমস্ত কার্য্যের বিধান করিয়াছেন, এখন কেবল—

"তীর্ণা চাপি বলৈর্নদী ত্রিপথগা বৎসাশ্চ হ[illegible] হব।"

"সৈন্যকুল গঙ্গা পার হইতে পারিলেই বৎসরাজ্য তাঁহার হস্তগত হইবে।" উদয়নও শত্রুর উৎসাদাভিপ্রায়ে উদ্যত হইলেন, ভাবিতে লাগিলেন—

"উপেত্য নাগেন্দ্র-তুরঙ্গ-তীর্ণে তমারুণিং দারুণ-কর্ম্ম-দক্ষম্।
বিকীর্ণ-বাণোগ্র-তরঙ্গ-ভঙ্গে মহার্ণবাভে যুধি নাশয়ামি।"

হস্তি-হয়-সঙ্কুল, চতুর্দ্দিকে তরঙ্গ-ভঙ্গসদৃশ প্রচণ্ড-বাণ-সমাকীর্ণ মহাসাগর-তুল্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে, একবার সেই ক্রূর-কর্ম্মকুশল আরুণিকে প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার বিনাশসাধন করিব।"

দর্শকের সহায়তায় উদয়নের বৎস-রাজ্য-লাভ হইল সত্য, কিন্তু বাসব-দত্তার চরিত্রকথা স্মরণ করিয়াই তিনি সর্ব্বদা হৃদয়ে সন্তাপানুভব করিতে-ছেন। প্রদ্যোত ও তাঁহার মহিষী অঙ্গারবতী বাসবদত্তার অগ্নিদাহের কথা ও জামাতা উদয়নের সহিত মগধরাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতীর পরিণয়ের কথা অবগত হইয়াও, বৎসরাজের প্রতি বাৎসল্যবশতঃ কঞ্চুকীকে ও বাসব-দত্তার ধাত্রী বসুন্ধরাকে বার্ত্তা-সহ মগধে প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে বাসবদত্তার ঘোষবতী নামক প্রিয় বীণা-যন্ত্রটি কোনও ব্যক্তি নর্ম্মদাতীরে প্রাপ্ত হইয়া উদয়নকে প্রদান করিয়াছিলেন। বীণা-প্রাপ্তিতে তাঁহার চিরনির্ব্বাপিত শোকাগ্নি পুনরুদ্দীপিত হইল। শিল্পীর সাহায্যে বীণাটিকে নূতন-তন্ত্রীযুক্ত ["নব-যোগা"] করাইয়া রাজা চি[illegible]-বিনোদনের উপায় স্থির করিয়াছেন, এমন সময়ে, উজ্জয়িনী হইতে কঞ্চুকী ও ধাত্রীর আগমনসংবাদ উদয়নসমীপে আনীত হইল। উদয়ন পদ্মাবতীকে পার্শ্বে রাখিয়াই উজ্জয়িনী হইতে আগত ব্যক্তিদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, মনে করিলেন। কারণ,

"কলত্র-দর্শনার্হং জনং কলত্র-দর্শনাৎ পরিহরতীতি বহুদোষমুৎপাদয়তি।"

"কলত্র-দর্শনযোগ্য লোকের নিকট কলত্র-দর্শন পরিহার করিলে, বহু-দোষ জন্মিতে পারে।" নবাগত সংবাদ-বহন-কারিণী ধাত্রী বসুন্ধরা না জানি কি নির্দ্দয় বার্ত্তাই লইয়া উজ্জয়িনী হইতে সেই স্থানে আসিয়া থাকিবেন। ইহাই উদয়নের ভাবনা। প্রদ্যোত-দুহিতাকে বল-পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া আনিয়াও, রক্ষা করিতে পারিলেন না, সেই জন্যই তিনি,

"পুত্রঃ পিতুর্জাতরোষ ইবাস্মি ভীতঃ।"

"জাতক্রোধ পিতাকে যেমন পুত্র ভয় করেন।" সেইরূপ ভয়ান্বিত থাকিয়া শ্বশুর-শ্বশ্রূ-প্রেরিত সংবাদ শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া থাকিলেন। উজ্জয়িনীর কঞ্চুকী বলিলেন,—বৎসরাজের শক্র-হৃত রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শুনিয়া মহারাজ মহাসেন অতীব প্রীত হইয়া আপনাকে অভিনন্দন করিবার জন্য আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বাসবদত্তা-বিরহে উদয়নের চিত্ত-সন্তাপ লক্ষ্য করিয়া শ্বশুরকুলের কঞ্চুকী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—

উপরতাপ্যনুপরতা মহাসেন-পুত্রী এবমনুকম্প্যমানার্য্যপুত্রেণ। অথবা,
"কঃ কং শক্তো রক্ষিতুং মৃত্যুকালে রজ্জুচ্ছেদে কে ঘটং ধারয়ন্তি।
এবং লোকস্তুল্যধর্ম্মা বনানাং কালে কালে ছিদ্যতে রুহ্যতে চ।"

"স্বামি-কর্তৃক এইরূপে অনুকম্প্যমানা মহাসেন-পুত্রী [বাসবদত্তা] মরিয়াও অনুপরতা (অমর) হইয়া আছেন। অথবা, মৃত্যুকালে কেহই কাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নয়। রজ্জুচ্ছেদে কে ঘটকে ধরিয়া রাখিতে পারে? লোক সকল বনরাজির সমান-ধর্ম্মা, কেন না, কালে কালে ছিন্ন হইয়া [উভয়েই আবার] অঙ্কুরিত হয়।" তৎপরে ধাত্রী বসুন্ধরা প্রদ্যোত-পত্নী অঙ্গারবতীর বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। অঙ্গারবতী বলিয়া পাঠাইয়াছেন—"আমরা জানি যে, আমাদের কন্যা বাসবদত্তা আর বাঁচিয়া নাই। কিন্তু আমার এবং মহাসেনের নিকট তুমি আমাদের পুত্র গোপালকের ন্যায় সমান স্নেহাস্পদ। সেই জন্যই, আমরা তোমাকে কৌশলে উজ্জয়িনীতে ধরাইয়া আনিয়া, বীণা-বাদন-শিক্ষাচ্ছলেই বাসবদত্তাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। কেবলমাত্র অগ্নিসাক্ষী করিয়া বিবাহমঙ্গল সম্পাদিত হওয়া অবশিষ্ট ছিল; কিন্তু বিবাহ কার্য্য নিবৃত্ত না হইতেই, তুমি চাপল্যবশতঃ কন্যা অপহরণ করিয়া কৌশাম্বীতে ফিরিয়া গিয়াছিলে। তৎপরে আমরা তোমার ও

বাসবদত্তার চিত্রফলকস্থ প্রতিকৃতিরই বিবাহ সম্পন্ন করাইয়াছিলাম। সেই চিত্রদ্বয় তোমার বর্ত্তমান বিরহাবস্থায় চিত্তবিনোদনের প্রধান উপায় হইতে পারিবে মনে করিয়াই, লোক সঙ্গে তাহা প্রেরণ করিলাম। সাপরাধ জামতার প্রতি তাঁহাদের স্নেহ অদ্যাপি অবিকৃত রহিয়াছে—এই ভাবিয়াই উদয়ন ধন্য বোধ করিলেন। এ দিকে কিন্তু চিত্র-ফলক-স্থ প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া পদ্মাবতী প্রহৃষ্টা হইয়াও উদ্বিগ্না হইয়া পড়িলেন। রাজা উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর পদ্মাবতী বলিলেন যে, প্রতি-কৃতি-সদৃশী এক রমণী তাঁহারই অন্তঃপুরে বাস করেন। তিনি আরও বলিলেন যে, কোনও এক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রোষিত-ভর্তৃকা ভগিনীকে তাঁহার হস্তে ন্যাস-রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন। রূপ-সাদৃশ্যের কথায় রাজা প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন যে, সেই রমণী বোধ হয়, বাসবদত্তাই হইবে ; স্বপ্ন-দর্শনও বুঝি সত্যই হইবে ; রুমথান্ বাসবদত্তার অগ্নিদাহে দগ্ধ হওয়ার কথা বলিয়া তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া থাকিবেন। কিন্তু,

"যদি বিপ্রস্য ভগিনী ব্যক্তমন্যা ভবিষ্যতি।
পরস্পর-গতা লোকে দৃশ্যতে রূপ-তুল্যতা॥"

"যদি তিনি কোনও ব্রাহ্মণের ভগিনী হন, তাহা হইলে নিশ্চিতই তিনি অন্য কেহ হইবেন। এই পৃথিবীর লোকমধ্যে পরস্পর-গত রূপ-সাদৃশ্য অনেক আছে।" রাজার রাজ্যলাভ হইয়াছে, সুতরাং প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হই-য়াছে। যৌগন্ধরায়ণ এখন রাজার সহিত পুনর্মিলন ইচ্ছা করিয়া, যথাসময়েই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া তিনি আত্মভগিনীর প্রত্যর্পণ প্রার্থনা করিলেন। আবন্তিকা-বেশধারিণী বাসবদত্তা অন্তঃপুর হইতে আনীতা হইলেন। উজ্জয়িনীর লোকেরাও তথায় উপস্থিত। সকলেই পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন। উদয়ন পূর্ব্বমহিষী বাসবদত্তা ও মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণের সহিত মিলিত হইয়া, নবোঢ়া-পত্নী পদ্মাবতীকে লইয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। রাজা যৌগন্ধরায়ণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন—

"মিথ্যোন্মাদৈশ্চ যুদ্ধৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ মন্ত্রিতৈঃ।
ভবদ্‌যত্নৈঃ খলু বয়ং মজ্জমানাঃ সমুদ্ধৃতাঃ॥"

"আপনার মিথ্যা উন্মাদ, যুদ্ধ, শাস্ত্রানুমোদিত মন্ত্রণা ও যত্নবলেই [দুঃখ] মজ্জন-শীল আমরা সমুদ্ধৃত হইয়াছি।" মন্ত্রীর বুদ্ধি-কৌশলেই এই বিবাহ সম্পন্ন

হওয়াতে, বৎসরাজ পুনরায় নিজরাজ্য স্বাধিকারে আনিতে সমর্থ হইলেন। উজ্জয়িনীতেও এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইল।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

উদ্ভিদে আলোকের প্রভাব।

সূর্য্যদেব জীব ও উদ্ভিদ নির্ব্বিশেষে সকলের প্রাণ-স্বরূপ। সূর্য্য হইতে জগতের অন্ধকার দূর হয়, জগৎবাসী তজ্জন্য উত্তাপ দ্বারা সঞ্জীবিত হইয়া জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়। জীবশরীরে হউক, বা উদ্ভিদের অবয়বে হউক, যেখানে ক্রিয়াশীলতা আছে, সেখানেই আলোক ও উত্তাপের ক্রিয়া আছে; এতদুভয়ের অভাবে কেহ বাঁচিতে পারে না। বাঁচিয়া থাকা অর্থে সুস্থশরীরে বাঁচিয়া থাকা বুঝিতে হইবে। উদ্ভিদ্ যতক্ষণ ভ্রূণরূপে বীজের মধ্যে অবরুদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহার আলোকের বা উত্তাপের কোনও প্রয়োজন হয় না; এ অবস্থায় বীজ নিষ্ক্রিয় থাকে। বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় হইতে আলোক ও উত্তাপের প্রয়োজন। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, আলোকে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, এবং সেই ধারণা-বশে মৃত্তিকা-মধ্যে বীজ রোপিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সে সংশয় এক্ষণে তিরোহিত হইয়াছে। আমরা চাষ আবাদ বা বাগান-বাগিচা যাহা কিছু করি, তাহাতেই প্রকৃতির অনুসরণ করি, প্রকৃতির কার্য্যে সাহায্য করি। কিন্তু উক্ত সহায়তা কার্য্য এত জটিল ও উদ্বেগময় যে, তাহাকে স্বল্প বলিলে ক্ষতি হয় না। প্রকৃতি,—সৃষ্টির মালিক, কিন্তু সেই মালিকই পৃথিবীকে বীজ-দান-বিষয়ে এত মুক্তহস্ত—এত উদার যে, এক একটি গাছেরই বীজের সংখ্যা করিতে পারা যায় না, অভিধানে তত শুভ্ররাশি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক দিকে যেমন অগণ্য বীজের সৃষ্টি, অন্য দিকে অগণ্য বীজের অপচয়! প্রতি লক্ষ বীজে একটিও গাছ জন্মিয়া জীবিত থাকিলে ২।৪ বৎসরের মধ্যে পৃথিবী গভীর অরণ্যে পরিণত হইত, শার্দ্দূল সিংহাদি হিংস্রক পশুতে ধরিত্রী পূর্ণ থাকিত, মানবাদি দুর্ব্বল জীব কত দিন পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে, বিলুপ্ত হই, তাহা কে বলিতে পারে? বীজ পাকিবার সময় বা পরে অনেক বৃক্ষের তলায় দেখে রাশি রাশি বীজ পতিত থাকিতে দেখা যায়। সে

সকল বীজ কতক পশু পক্ষীতে খায়, কতক লোকে আহরণ করে, তথাপি গাছতলায় স্বতঃই কত চারা জন্মে! বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে শাল-বনে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—গাছতলায় রাশি রাশি বীজ পড়িয়া আছে, অতঃপর ২।১ পসলা বৃষ্টি হইবার পরই পতিত বীজরাশি হইতে অঙ্কুরের উদ্গম হয়। অঙ্কুরোদ্গম হইলে মূল মৃত্তিকার অন্বেষণ করে, এবং ভূমি পাইলে তাহাতে মূল প্রবিষ্ট করিয়া স্থায়িভাবে আপনার স্থান করিয়া লয়। যাহারা ভূমিতে মূল সংলগ্ন করিতে পারে না, তাহারাই মরিয়া যায়। এইরূপ অনেক গাছেরই হয়। কারণ, প্রকৃতিদেবী কোন গাছেরই বীজকে মাটীতে পুঁতিয়া দেন না,—দশ হস্তে দশ দিকে ছড়াইয়া দেন। আমাদিগের নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পাছে বীজ কোনরূপে নষ্ট হয়, কিংবা বিক্ষিপ্ত হইয়া দেশদেশান্তরে গিয়া পড়ে, বা রৌদ্রজলে হাজিয়া বা শুকাইয়া যায়—এই ভয়ে আমরা বীজ সংগ্রহ করি ও সাবধানে মাটীতে পুঁতিয়া দিই। মাটীতে পুঁতিয়া দিই বটে, তথাপি মাটীর মধ্যে যাহাতে আলোক ও উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারে, তাহার উপায় রাখিয়া দিই, এবং সে উপায়,—কর্ষণ-কুদ্দলন দ্বারা মাটীকে আলগা করিয়া দেওয়া।

বীজ হইতে অঙ্কুরের উদ্গম হইলে এক দিকে অঙ্কুর ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে চাহে, আর অপর দিকে উদ্ভিদাংশ বা কাণ্ডাংশ আলোকাভিমুখ হয়। কাণ্ড ও মূলের সংযোগস্থলকে ইংরাজি উদ্ভিদশাস্ত্রানুসারে apex কহে। আমরা ইহাকে মূল-গ্রন্থি বা নাভি নামে অভিহিত করিতে পারি। অঙ্কুরোদ্গমের পর কাণ্ডাংশ কিছুতেই অন্ধকারে বা অবরুদ্ধ স্থানে থাকিতে পারে না, ঊর্দ্ধদিকে সে উঠিবেই। কোনও একটি বীজকে উল্টাভাবে অর্থাৎ ঊর্দ্ধাংশ নিম্নে ও নিম্নাংশকে উপরিভাগে রাখিয়া বপন করিলেও, লঘু হইলে, বীজ স্বতঃই উল্টাইয়া গিয়া আপনার সহজ ভাব গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ উপরিভাগ উপরিভাগেই আসিবে। তাল, নারিকেল প্রভৃতি গুরুভার ফল বিপরীতভাবে রোপিত হইলে যদিও উল্টাইতে না পারে, তথাপি অঙ্কুরিত হইলে কাণ্ডাংশ উপরে আসিয়া দেখা দিবেই; ইহাতে যদি সেই নবোদ্গত 'কল্'কে কিছু ঘোর-ফের করিতে হয়; তাহা করিয়াও কলটি মৃত্তিকাভেদ করিয়া দেখা দিবে,—ভূগর্ভাভিমুখ হইবে না। উদ্ভিদের কাণ্ডাংশ উপরে আসিবার উদ্দেশ্য,—আলোক-আহরণ, শ্বাসপ্রশ্বাস-নির্ব্বাহ ইত্যাদি। উত্তাপ বা আলোক কোনও উদ্ভিদেরই খাদ্য নহে, তথাপি খাদ্য অপেক্ষা ইহাদিগের প্রয়োজন অধিক। ভূগর্ভমধ্যে উদ্ভিদের আহার্য্যদ্রব্য নিত্য বিদ্যমান থাকে, সুতরাং খাদ্যের জন্য বায়ুমণ্ডল

বা সূর্য্যের কিরণের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। ভূগর্ভ হইতে মূল দ্বারা উদ্ভিদগণ যে সকল আহারীয় পদার্থ আহরণ করে, তৎসমুদয় পত্রে গিয়া পৌঁছে। পত্রগণ আলোক আহরণ করে। এক্ষণে মৃত্তিকা হইতে আহরিত পদার্থসমূহ আলোকের সংস্পর্শে আসিলে এতদুভয়মধ্যে সম্বন্ধক বা ভৌতিক ক্রিয়ার উদ্ভব হয়,এবং তাহারই ফলে পত্রমধ্যে প্রথমতঃ পত্রহরিত (chlorophyl), এবং পরে অণ্ডলাল (protoplasm) শর্করা প্রভৃতি দেহগঠনের উপাদানসমূহ উৎপন্ন হইতে থাকে। এতদ্দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, পত্রগণই উদ্ভিদের রন্ধনশালা, আলোক,—অগ্নি, আর স্বয়ং প্রকৃতি,—দেবী রাঁধুনী। উদ্ভিদগণ আলোকের কত পক্ষপাতী, তাহার একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইব। অনেকের বাড়ীতে নানাবিধ গাছ-পালা টবে বা গামলায় থাকিতে দেখা যায়। এই সকল গাছ প্রায় গৃহস্থের অঙ্গিনা ছাদ বা বারান্দায় থাকে। টবে সংস্থাপিত কোনও একটি গাছকে বহির্দেশ হইতে গৃহমধ্যে আনিয়া কণকাল,—অধিক কি, একঘণ্টা কাল,—রাখিয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সেই অল্পক্ষণমধ্যে, যে দিকে অধিক আলো, পত্রগুলি সেই দিকে হেলিয়াছে। গৃহের চারি দিকে সমভাবে আলোক থাকিলে উহারা কোন দিকে না হেলিয়া যথাভাবে থাকে, কিন্তু ঠিক দ্বিপ্রহর বা মধ্যাহ্নকাল ভিন্ন কোন সময়েই আবৃত স্থানের চতুর্দ্দিক সমভাবে আলোক পায় না,মোটের উপর স্পষ্টই দেখা যায় যে, যে দিকে আলোক বা অধিক আলোক, সেই দিকেই গাছের পাতাগুলি মুখ ফিরায়, সেই সঙ্গে কোমল ও কচি শাখাগুলিও অনেকাংশে দিক্‌পরিবর্ত্তন করে। দীর্ঘকাল উক্ত অবস্থায় থাকিতে দিলে সমগ্র গাছটি আলোকাভিমুখ হইয়া পড়িবে, এবং তখন মনে হয় যে, অপর দিকটি যেন তাহার পশ্চাদ্ভাগ। এই অবস্থায় ২।৪ দিন থাকিতে দিলে শাখা প্রশাখাগুলি আলোকের দিকে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে ইহা গাছের বৃদ্ধি নহে, আলোকাভিমুখে আসিবার প্রয়াস! এইরূপে এক দিকে যেমন উদ্ভিদটির সদর মফঃস্বলের আবির্ভাব হয়, অন্য দিকে গাছের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পাইতে থাকে। আরও কয়েক দিবসের পর হইতে উদ্ভিদের পত্র ও হরিত-আভ-বিবর্ণ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। এক্ষণে উদ্ভিদ ব্যাধিগ্রস্ত। এতদবস্থায় আবার কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে এক একটি করিয়া পত্রগুলি খসিয়া পড়িতে থাকে, গাছে নানাবিধ কীট আশ্রয় গ্রহণ করে; ইত্যাদি কত কি হয়। উদ্ভিদের আলোকপ্রিয়তা (actinism) পরীক্ষা করিবার জন্য সমগ্র গাছ না আনিয়া কোনও গাছের একটি ডগা আনিয়া গৃহমধ্যে

বা বারান্দায় একটি জলপূর্ণ ফুলদানী কিংবা ঘটী বাটীতে বোঁটাটী ডুবাইয়া রাখিলেও, তাহার পত্রগুলি, ক্রমে সমগ্র ডগাটি, দিক পরিবর্ত্তন করিয়া আলোকাভিমুখ হইবে। ঈষৎ লক্ষ্য করিলে উদ্ভিদের এই আলোক-প্রিয়তা আমরা প্রতিপদে দেখিতে পাই। কোনও বাগান বাগিচায় গেলে দেখিতে পাই, কত গাছ কত দিকে হেলিয়া গিয়াছে। যে দিকে আওতা, সকল গাছই সে দিক হইতে মুখ ফিরায়। অট্টালিকার বা কোনও বৃহৎ বৃক্ষের নিকটে যে গাছ থাকে, সে গাছ অট্টালিকা বা বৃক্ষের বিপরীত দিকে ঝুঁকে; আর অপর দিকে শাখা প্রশাখা বা পত্র থাকে না। অনিবার্য্য কারণে যেগুলি সে দিকে বৃদ্ধি পায়, তাহাদিগের সদর সেই অবরুদ্ধ বা আওতার দিকে না হইয়া দিগন্তরে হইয়া থাকে। ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। কোনও স্থানে কতক গাছের সমষ্টি বা শ্রেণী থাকিলে কিছুদিন পর্য্যন্ত গাছগুলি নিরাপদে বাড়িতে থাকে, কিন্তু যেই পরস্পরে সংলগ্ন হইবার সময় আগত হয়, অমনই তাহাদিগের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়; প্রত্যেকেই চেষ্টা করিতে থাকে,—কিসে পার্শ্ববর্ত্তিগণকে অতিক্রম করিয়া উপরে বা পার্শ্ব দিকে বাহির হইতে পারে। সমকালে রোপিত বৃক্ষ-পুঞ্জমধ্যে কোনও গাছ ছোট থাকে, কোনও গাছ সমধিক বাড়িয়া যায়। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল আলোকের জন্য সংগ্রাম করিয়া যে যে গাছ জয়লাভ করে, তাহারাই বাড়িয়া উঠে; অপরগুলি ইহাদিগের ছায়ায় আরও চাপা পড়িয়া যায়। সংসারে যোগ্যতার জয়, ইহা সর্ব্বত্রই দেখিয়া আসিতেছি। এরূপ স্থলে দুর্ব্বল গাছগুলি মারা পড়ে; বা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; আর তেজাল গাছগুলি সমৃদ্ধিশালী হয়।

যে উদ্ভিদের যেরূপ প্রকৃতি, যেরূপ সহিবার শক্তি, কিংবা যে গাছ যেরূপ স্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট, তাহার জন্য ঠিক সেই মত আলোকের ব্যবস্থা আছে। কোনও উদ্ভিদ প্রচণ্ড রৌদ্রে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া আছে। আবার কোনও উদ্ভিদ সুগভীর কূপ বা ইন্দারার ভিতর ঘোর অন্ধ-কারাছন্ন ক্ষীণ আলোকে সুখে বসবাস করিতেছে। কত জাতীয় শৈবাল জলের মধ্যে চিরজীবন বাস করে, কিন্তু আলোকাভাবে আদৌ ক্লেশ পায় না। আমরা মনে করি, তাহারা আলোক চাহে না, বা আলোকহীন স্থানই তাহাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট; কিন্তু তাহা নহে; আলোক বিহনে উদ্ভিদ বাঁচিতেই পারে না। সমুদ্রের জলগর্ভে দেড় শত ফুট নিম্নেও উদ্ভিদ

জন্মে। এই সকল গভীরজলবাসী উদ্ভিদের জাতিগত নাম, অ্যাল্গা (Algæ)। ইহাদিগের মধ্যেও কয়েকটি জাতি আছে, কিন্তু জাতিনির্ব্বিশেষে সকলে একরূপ গভীরতামধ্যে থাকিতে পারে না। সূর্য্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ আছে, তাহারই কোনও কোনও বর্ণরশ্মি ১৫০ ফুট নিম্নে যায়, আবার কোনও বর্ণের রশ্মি কেবল তদুপরিস্থ অনতিগভীর জলে প্রবেশ করিতে পারে।

সাধারণতঃ সমুদ্রগর্ভের দেড় শত ফুট পর্য্যন্ত অ্যাল্গা-জাতীয় শৈবাল দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কোনও কোনও স্থলে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ সলিলে দেড় শত ফুটের নিম্নেও জন্মিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, দেড় শত ফুট জলের ভিতরে আলোকের গতি আছে, স্বচ্ছ সলিলে আরও কিছু নিম্ন পর্য্যন্ত যায়। সাধারণ হরিত বর্ণের গাছ সকল সূর্য্যরশ্মির আলোকান্তর্গত লাল অংশই গ্রহণ করে, কিন্তু পাটল (Brown) ও লালাভ শৈবালগণ উক্ত রশ্মির সবুজ অংশ গ্রহণ করে; কারণ, তত নিম্নে রশ্মির অপর কোনও বর্ণ প্রবেশ করিতে পারে না। উক্ত রশ্মির বর্ণের বিভিন্নতা হেতু উদ্ভিদগণ তদনুকূল বর্ণের হইয়া থাকে। আলোকের সহিত উদ্ভিদের বর্ণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উত্তাপের যেমন ডিগ্রী বা স্তর আছে, আলোকেরও তাহা আছে; তন্নিবন্ধন যে গাছ যত ডিগ্রী আলোক-সহনে অভ্যস্ত, তাহার বর্ণও তদনুরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু সে বর্ণবিভিন্নতা আমরা তত সহজে বুঝিতে পারি না; কারণ, প্রভেদ এতই কম যে, উপলব্ধি করা সুকঠিন। ছায়াচিত্রে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

তাবৎ সৃষ্ট পদার্থে একটি শক্তি আছে; সে শক্তি কোথাও প্রকাশিত, কোথাও প্রচ্ছন্ন। আলোক দ্বারা সেই প্রচ্ছন্নশক্তি উদ্ভাসিত, বা উদ্দীপিত হয়, এবং তাহার বলে সকল কার্য্য নিয়মিত হইতেছে। উক্ত শক্তি উদ্ভিদে থাকে, কি আলোকে থাকে, ইহা বলা কঠিন; তবে ইহা দেখিতে পাই, এতদুভয়ের সংস্পর্শে তাহার উদ্ভব হয়। উদ্ভিদের ন্যায় জীবেরও আলোক অবশ্য প্রয়োজনীয়। যাহা হউক, আলোক হইতে উদ্ভিদকে বঞ্চিত করিলে, উদ্ভিদজীবনে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, উদ্ভিদের কত অপকার হয়, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। আলোক ব্যতীত উদ্ভিদ-শরীরে পরিপোষণকার্য্য সমাহিত হয় না। উদ্ভিদের বৃদ্ধি যখন

পরিশোধিত পদার্থের উপর নির্ভর করে, তখন আলোকাভাবে বৃদ্ধিও স্থগিত থাকিবে, ইহা সুনিশ্চিত। যে সকল উদ্ভিদে পত্রহরিত নাই, কিংবা গাছের যে সকল অবয়ব পরিশোষণে অশক্ত, তাহাদিগের আলোকের প্রয়োজন হয় না। ছত্রক-জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে পত্রহরিত থাকে না; এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারি যে, তাহাদিগের আলোকের প্রয়োজন হয় না। ইহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নহে যে, ছত্রকগণ আঁধারেই জন্মে। দুগ্ধ বা ব্যঞ্জনাদি বাসি বা ২।৩ দিনের পুরাতন হইলে তাহার উপর একটি শুভ্র পদার্থে মণ্ডিত আবরণ পড়ে। উক্ত শুভ্র পদার্থমণ্ডল অতিশয় নিম্নজাতীয় ক্ষুদ্র উদ্ভিদপুঞ্জ ভিন্ন আর কিছু নহে। এই ক্ষুদ্র উদ্ভিদগণ গভীর অন্ধকারে জন্মে। এ সকল উদ্ভিদে পত্রহরিত থাকে না, সুতরাং তজ্জনিত মালমশলাও তাহাদিগের মধ্যে থাকে না। পত্রহরিত না থাকিলে উদ্ভিদে বর্ণসঞ্চার হয় না। এই জন্য ইহারা বর্ণহীন। শুভ্রতা বর্ণহীনতার নামান্তরমাত্র। বীজ, কন্দ, মূল বা পেঁয়াজ, ইহারা অঙ্কুরিত হইবার জন্য আলোকের অপেক্ষা করে না। এতদ্ব্যতীত উদ্ভিদের অন্তস্ত্বক-পরিবৃত কঙ্কাল, মুকুলান্তর্বর্ত্তী কোষ, কিংবা শিকড়ের শেষাগ্রভাগ—এ সকলও আলোক চাহে না; বিনা আলোকেই ইহারা আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। আলোকের অভাবে উদ্ভিদের পত্রহরিত-ধারক অংশ সকল—পত্র ও উদ্ভিদের কোমলাংশ পরিশোষণকারী হইতে বিরত থাকে। দীর্ঘকাল আলোকের সংস্পর্শ না পাইলে, পত্রহরিতের দানা বা কোষসমূহ শুকাইয়া চুপসিয়া যায়। ফলতঃ তাহারা নিষ্কর্ম্মা হইয়া যায়। কোনও একটি বর্দ্ধমান উদ্ভিদের অংশবিশেষকে খণ্ডিত করিয়া ঘনান্ধকারমধ্যে রাখিলে তাহাতে বিশেষ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর সেই সকল পত্রহরিতের তাবৎ স্থানটি অর্থাৎ পত্র ও কোমলাংশ বিবর্ণতা বা পাণ্ডুতা প্রাপ্ত হয়, এবং সেই সঙ্গে সেই সকল অবয়বও রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে পত্রের আকার অতিশয় ক্ষুদ্র, কিন্তু মূল ও পত্রাদি দ্বারা আহরিত পদার্থের সাহায্যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহাতেই আমরা পত্রসমূহকে বড় দেখিতে পাই। উদ্ভিদের বৃদ্ধি পত্র দ্বারা আহরিত বাষ্পীয় পদার্থের উপর পরোক্ষভাবে সমধিক নির্ভর করে। পত্রাংশে পরিপাকক্রিয়ার কার্য্যশীলতা না থাকিলে মূল দ্বারা আহরিত পদার্থে কোনও ফল হয় না। আলোকের অভাবে নূতন কৈকড়ি অস্বাভাবিক লম্বা হয়; অর্থাৎ, পত্রগ্রন্থিসমূহের পরস্পর

ব্যবধান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়। আওতায় বা ছায়ায় সাধারণ উদ্ভিদগণ—আলোকপ্রিয় উদ্ভিদগণ দীর্ঘ হয়;—কিন্তু উক্ত দীর্ঘতা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু আলোকসম্পর্কিত স্থানে ঈদৃশ দ্রুত বৃদ্ধির গতি রুদ্ধ হয়। গাছ ধীরে ধীরে বাড়ে, কিন্তু সে বৃদ্ধি সারবতী হয়, অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হয়, আবহাওয়াসহ হয়, এবং তাহাতে ফল ও ফুল হয়। ছায়া বা আওতায় উৎপন্ন কোনও উদ্ভিদ দৃঢ় ও রৌদ্র-বাতাসহ হয় না। গৃহস্থালীব্যাপারে প্রায় দেখা যায়—চৈচতলা, অঙ্গিনা, পগার প্রভৃতি কত অজায়গায় শাক সবজী, ডাল কড়াই প্রভৃতির বীজ পতিত হয়, এবং তথায় থাকিয়া অঙ্কুরিত হইয়া চারায় পরিণত হয়। যে চারাগুলি ছায়ায় থাকে, সেগুলি ২।৪ দিনের মধ্যে এত দীর্ঘ হইয়া উঠে যে, খাড়াভাবে দাঁড়াইতে না পারিয়া ভূশায়ী হয়, বর্ণ পাণ্ডু হয়, এবং তাহাদিগের গ্রন্থি ও পত্র দূরে দূরে উদ্গত হয়। আরও ইহা দেখিতে পাই যে, যে সকল উদ্ভিদে কিংবা উদ্ভিদের যে সকল অংশে হরিতবর্ণোৎপাদক পদার্থ বা পত্রহরিত না থাকে, কিংবা যে সকল পুষ্পে বা পুষ্পের অংশে উক্ত পদার্থ স্বভাবতঃ না থাকে, আলোকের অভাবে তাহাদিগের কোনও ক্ষতি হয় না। হরিতবর্ণ-উৎপাদনের জন্য আলোকের যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা উপরে বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এ স্থলে আর একটী কথা বলিবার আছে যে, উদ্ভিদশরীরে আলোক দ্বিভাবে কাজ করে, (১) সম্বন্ধক্রিয়া (chemical action), (২) অনুপ্রাণন; (mechanical effect) দ্বারা। পদার্থে পদার্থে সমাবেশের ফলে যে একটী নূতন পদার্থের উদ্ভব হয়, তাহা একজাতীয়, এবং পদার্থবিশেষ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাহাকে অপর-জাতীয় ক্রিয়ামধ্যে পরিগণিত করিতে পারা যায়।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আলোকের সম্বন্ধকতা নিবন্ধন উদ্ভিদে পত্রহরিত উৎপন্ন হয়, এবং কোষগণ পত্রহরিত-পরিশোষণ করিতে সমর্থ হয়। আলোকবিবর্জ্জিত অংশে পত্রহরিত উৎপন্ন হয় না। পত্রহরিতের অস্তিত্ব হেতু উদ্ভিদগণ স্বভাবতঃ হরিত হয়। ঈদৃশ স্থানের পত্রাদিতে পত্রহরিতোদ্দিষ্ট কোষ বা দানা উৎপন্ন হইলেও তাদৃশ স্বাভাবিক আকারের বা গড়নের হয় না; উপরন্তু সেই সকল কোষ বা দানার মধ্যে পত্রহরিতের পরিবর্ত্তে ইটিওলিন (Etiolin) নামক এক পীতাভ পদার্থ উৎপন্ন হয়। এতদবস্থাপ্রাপ্ত উদ্ভিদ আলোক ও উত্তাপ সংস্পর্শিত হইলে, পীতাভ পদার্থ রূপান্তরিত হইয়া পত্র-

হরিতে পরিণত হয়, এবং উদ্ভিদাবয়ব সহজ অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়; তখন আর সে পাণ্ডুবর্ণ থাকে না; বরং তাহাতে পুনরায় উদ্ভিদের স্বাভাবিক বর্ণের বিকাশ হয়। কতকগুলি উদ্ভিদ, বিশেষতঃ গুল্মজাতীয় Ferns আলোক-হীন বা ক্ষীণ আলোকে থাকিলে ঘন সবুজ বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তাহা সাধারণনিয়মের বহির্ভূত। ঈদৃশ স্থানে থাকিয়া ইহাদিগের মধ্যে যে পত্রহরিতের দানা জন্মে, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে।

ঋতু, দিন ও সময়বিশেষে আলোকের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে, ইহা স্বাভা-বিক। আলোকের ঈদৃশ বিভিন্নতা উদ্ভিদ-শরীরে স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। কয়ে-কটী একজাতীয় উদ্ভিদ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এরূপে রাখিতে হইবে, যেন কোনও গাছে প্রাতে ২।১ ঘণ্টা, কোনও গাছে মধ্যাহ্নে ২।১ ঘণ্টা, কোনও গাছে অপরাহ্নে ২।১ ঘণ্টা রৌদ্র লাগিতে পায়, কিংবা কোনও গাছ সারা দিন রৌদ্র পায়,কোনও গাছ সারাদিন ছায়া পায়। এইরূপ ব্যবস্থাপূর্ব্বক গাছ কয়ে-কটী কয়েকদিন রাখিলে প্রত্যেক গাছেই বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। আলোকের প্রভাবে বা অভাবে কোনও গাছ সবল সুশ্রী, কোনও গাছ শীর্ণ ও বিশ্রী হইয়া যায়, ইত্যাদি অনেক বিশেষত্ব উপলব্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত সূর্য্যরশ্মির মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ থাকায় স্থানবিশেষে রশ্মির বিশেষ বিশেষ বর্ণ উদ্ভিদকে অনুপ্রাণিত করে, তাহার ফলে ফলও বিভিন্ন হইয়া থাকে। আলোকের সম্যক শক্তি রশ্মির অন্তর্গত লালবর্ণের মধ্যে নিবদ্ধ, কিন্তু অপর শক্তি (mechanical action) আশমানী বা ভায়োলেট বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ; এ জন্য শেষোক্ত বর্ণের দ্বারা উদ্ভিদের কোনও উপকার দর্শে না। গাছের অভ্যন্তরাংশে লালা (Protoplasm) রক্ষিত হইবার যে সকল কোষ থাকে, তাহারা আলোকের দ্বিতীয়শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্ধকারের গাছে আলোকের অভাববশতঃ উক্ত শক্তির সমাবেশ হইতে পারে না বলিয়া তাহারা ক ; কিন্তু আলোকে পালিত উদ্ভিদ সে সুযোগ পায় বলিয়া দৃঢ় ও সমর্থ হয়। আলোক ও উত্তাপ পরস্পর সখিরূপে প্রায় সর্ব্বদা একত্র থাকে, সুতরাং আলোকের সহিত প্রায় উত্তাপ থাকে। এ প্রবন্ধে উত্তাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল না— কারণ ইহাতে কেবল আলোকের কথা বলিবার বিষয়।

আলোকে উদ্ভিদগণ ক্রিয়াশীল থাকে, এবং সেই অবস্থাতেই উদ্ভিদগণ বর্দ্ধিত হয়। রাত্রিকালে আলোকের অভাব, সুতরাং সে সময় জীবজগতের

ন্যায় উদ্ভিদ-গতেরও বিরাম ও নিদ্রাকাল। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ যখন জানিলেন যে, আলোকই উদ্ভিদের ক্রিয়াশীলতার মূল, তখনই তাঁহারা জানিলেন যে, রাত্রিকালে উদ্ভিদকে কৃত্রিম উপায়ে আলোক-সান্নিধ্যে রাখিতে পারিলে রাত্রিকালেও উহারা বৃদ্ধি পাইবে। পরীক্ষায়ও তাহা সিদ্ধান্ত হইল। যথা বলা, তথা কাজ। এক্ষণে বিলাতে কোনও কোনও গৃহস্থ কৃষক (farmer) নিজ নিজ ক্ষেত্র মধ্যে রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক আলোকের ঘনঘটা লাগাইয়া দিয়া থাকেন; ফলে ফসল আর ঘুমাইতে পায় না,-দিবারাত্রি আহার ও পরিশোষণ, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি। এতদুপায়ে ছয় মাসের ফসল তিন মাসে হইতেছে; তন্নিবন্ধন অজানা বাবদে কত ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে, কত শীঘ্র টাকা ঘুরিয়া আসিতেছে, ইত্যাদি কত সুবিধা হইয়াছে, প্রয়োজন হইলে পরে বলিব।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

আদমসুমারীতে বাঙ্গালার অবস্থা।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালার আদমসুমারীর রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। কলিকাতা গেজেটে বাঙ্গলা গবর্মেন্ট ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের ভাবিবার ও শিখিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। দেশীয় নেতৃগণের, বিশেষতঃ হিন্দুসমাজপতিগণের তাহা আলোচনার যোগ্য। আমরা এ স্থলে তন্মধ্যে কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইহার ফলে যদি যোগ্য ও সুধী ব্যক্তিরা এই গুরুতর বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

সহর ও পল্লী—ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ পল্লীপ্রধান। ইহার অধিকাংশ লোকই পল্লীতে বাস করে। সেন্সাসে দেখা যাইতেছে, বঙ্গদেশের লোকসংখ্যার মধ্যে হাজার করা ৯৩৬ জন এখনও পল্লীগ্রামবাসী। সুতরাং পল্লীর উন্নতির উপরেই এ দেশের লোকের জীবন মরণ নির্ভর করে। সেই পল্লীর প্রতি আমরা একেবারেই দৃষ্টিহীন, ইহা সুলক্ষণ নহে। পল্লীসমূহ ক্রমেই পরিত্যক্ত ও লোকশূন্য হইতেছে; অস্বাস্থ্যকর ও ম্যালেরিয়ার

লীলাভূমি হইয়া উঠিতেছে। বিশুদ্ধ পানীয় জল সেখানে মেলা দুষ্কর, সেখানে ভাল রাস্তাঘাট নাই, জলনিকাশের পথ নাই। যাঁহারা ধনী ও শিক্ষিত, তাঁহাদের কেহ বা বিলাসিতার জন্য, কেহ বা চাকরীর দায়ে, সহরে চিরস্থায়িরূপে বাস করিতেছেন। ইতর শ্রেণী সাধারণ লোকের মধ্যেও অনেকে জীবিকার জন্য সহরে বা তাহার উপকণ্ঠে যাইয়া মজুর প্রভৃতির কাজ করিতেছে। ফলে সহরের লোকসংখ্যা ক্রমেই অত্যধিকপরিমাণে বাড়িতেছে। দেখা যাইতেছে যে, কলিকাতা, হুগলী, হাবড়া, চব্বিশপরগণা প্রভৃতি বড় বড় সহরে ও তাহার উপকণ্ঠে শতকরা ১৩ জন করিয়া লোক বাড়িয়াছে; আর বঙ্গের মোট লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার গড়ে ৮ জন মাত্র। হাবড়া ও তন্নিকটবর্তী স্থানে প্রতি বর্গ মাইলে ১৮৫০ জন লোক বাস করে। মোট লোকসংখ্যার গড় প্রতিবর্গ মাইলে ৫৫১ জন মাত্র। কলিকাতার উপকণ্ঠে কিরূপ ভাবে লোক বাড়িতেছে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ শুধু এই বলিলেই হইবে যে, এক ভাট-পাড়াতেই গত ৩০ বৎসরে শতকরা ৫০০ জন অর্থাৎ ৫ গুণ লোক বাড়িয়াছে। ভাটপাড়ার ন্যায় ক্ষুদ্র স্থানের লোকসংখ্যা এখন ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক।

পল্লী এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়াই ক্রমে অস্বাস্থ্যকর ও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, এবং আমাদেরও মৃত্যুর বীজ উপ্ত হইতেছে। চেষ্টা করিয়া পল্লীর উন্নতি করিলে যে পল্লী আবার স্বাস্থ্যকর ও লোকপূর্ণ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এই রিপোর্টেই দেখা যাইতেছে। মগরাহাট চব্বিশপরগণার একটি পল্লীগ্রাম; আয়তন ৩০০ তিন শত বর্গ মাইল। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান ম্যালেরিয়ার আকরস্থান বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল—গ্রামবাসী ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া কোন প্রকারে জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিত। সেখানে ভাল পয়ঃপ্রণালী-নির্ম্মাণের দ্বারা জলনিকাশের সুব্যবস্থা হওয়াতে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। মগরাহাট এখন স্বাস্থ্যকর স্থান; ১৯০১—১৯১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাহার লোকসংখ্যা শতকরা ২৯ জন বাড়িয়াছে। পয়ঃ-প্রণালীর ব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই—হইলে আরও সুফল পাওয়া যাইবে, আশা করা যায়। অতঃপর ম্যালেরিয়া-নিবারণে কুইনাইন ও কেরোসিনের অব্যর্থতা সম্বন্ধে রাজপুরুষদের মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইবে, এরূপও বোধ হয় মনে করা যাইতে পারে।

লোকসংখ্যা—১৯১১ অব্দে সমস্ত যুক্তবঙ্গের লোকসংখ্যা ৪,৬৩০৫৬৪২ অর্থাৎ ৪½ কোটীর কিঞ্চিৎ উপরে স্থিরীকৃত হইয়াছে ; অর্থাৎ ১৯০১ অব্দের অপেক্ষা ৩৫,০০০০০ লোক বাড়িয়াছে। বৃদ্ধির হার মোটের উপর শতকরা ৮ জন। গতপূর্ব্ব সেন্সাস-সমূহের সহিত তুলনা করিলে এইরূপ দেখা যায় :—

সমগ্র বঙ্গের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার।

১৮৭২—৮১	১৮৮১—৯১	১৮৯১—১৯০১	১৯০১—১৯১১
১১. ৫	৭. ৩	৫. ১	৮

সুতরাং গত তিন সেন্সাসে বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল ; এইবার একটু বাড়িয়াছে, ইহা আশার কথা বটে। আমি সমগ্র বাঙ্গলার কথাই বলিতেছি। বাঙ্গালী হিন্দুদের সম্বন্ধে এই নিয়ম যে ঠিক খাটে না, তাহা নিম্নেই আমরা দেখিতে পাইব

লোকসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানই অধিকাংশ ;—শতকরা ৯৭.৬ জন। সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৫২ জন মুসলমান, আর হিন্দু ৪৫ জন মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা প্রায় ৩২৫০০০০ (৩২½ লক্ষ) বেশী। সুতরাং হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমেই অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে। নিম্নে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সেন্সাসের সহিত তুলনা করিয়া আমরা যে তালিকা দিলাম, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে :—

বৎসর	হিন্দুর লোকসংখ্যা	মুসলমানের লোকসংখ্যা	হ্রাস-বৃদ্ধি
১৮৭২	১৭১ লক্ষ	১৬৭ লক্ষ	মুসলঃ ৪ লক্ষ কম
১৮৮১	১৭২½ লক্ষ	১৭৯ লক্ষ	মুসলঃ ৬½ লক্ষ বেশী
১৮৯১	১৮০ লক্ষ	১৯৬ লক্ষ	মুসলঃ ১৬ লক্ষ বেশী
১৯০১	১৯৪ লক্ষ	২২০ লক্ষ	মুসলঃ ২৬ লক্ষ বেশী

আর এই ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাসে দেখিতেছি,—

মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুদের অপেক্ষা ৩২½ লক্ষ বেশী হইয়া গিয়াছে! আর হিন্দুর তুলনায় মুসলমানদের বৃদ্ধির হার কত শুনিবেন! বেঙ্গল গবর্মেণ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—

"The figures of relative growth show that during the last decade (1901—1912) the increase among the

Mohemedans has been nearly thrice as great as among the Hindus. অর্থাৎ, গত দশ বৎসরে (১৯০১—১৯১১) হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদের বৃদ্ধির হার ৩ গুণ বেশী হইয়াছে !

সুতরাং বুঝা কঠিন নহে যে, বঙ্গের হিন্দুজাতি ক্রমশই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে—জীবন-যুদ্ধে মুসলমানদিগের দ্বারা তাহারা ক্রমেই পরাস্ত হইয়া পড়িতেছে ! লেপ্টেন্যান্ট কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, তিন বৎসর পূর্ব্বে (১৯০৯) এই আশঙ্কার কথাই কঠোর যুক্তির দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (১) কিন্তু আমরা মোহমুগ্ধ, মুমূর্ষু, বিকল—বোধ হয়, সে কথা আমাদের কর্ণে ভাল করিয়া প্রবেশ করে নাই। উপরন্তু কয়েক জন বুদ্ধিমান্ সদাশয় ব্যক্তি স্বজাতিপ্রেমে অন্ধ হইয়া ইহার প্রতিবাদই করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, নিজের অঙ্গক্ষত লুকাইয়া উপরে ভাল পোষাক পরিয়া লাভ নাই। তীব্র ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ক্ষতের চিকিৎসা না করিলে তাহা মৃত্যুরই কারণ হইয়া উঠে। পৃথিবী হইতে অনেক জাতি লোপ পাইয়াছে—আমরাও হয় ত পাইব। কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চল-ভাবে মরার অপেক্ষা কি জীবনের জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত নয় ? একই দেশে বাস করিয়া মুসলমান ও হিন্দুর জীবনীশক্তির এই প্রভেদ কেন হয়, তাহা বাস্তবিকই অনুসন্ধানের বিষয়। সুধী ও মনস্বিগণের এ বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে।

শিশুমৃত্যু—আর একটি ব্যাপার দেখা যাইতেছে, তাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই চিন্তার বিষয়। রিপোর্টে প্রকাশ যে,শিশুমৃত্যু এত বেশী হইয়াছে যে, তাহা নিতান্ত ভীতিজনক। গড়ে বৎসরে প্রতি ৫ জন শিশুর মধ্যে ১ জন করিয়া মরে। এই শিশু-মৃত্যু হিন্দুর মধ্যে বেশী, কি মুসলমানের মধ্যে বেশী, তাহা ঠিক হয় নাই। গবর্মেণ্টের মন্তব্যে আছে যে, বাল্যবিবাহ, স্বাস্থ্যতত্ত্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, শ্রমজীবিগণের মধ্যে দারিদ্র্য, এইগুলিই শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ। আমাদের মনে হয়, জনসাধারণের দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও পানীয়ের অভাব, এইগুলিই প্রধান কারণ। অবশ্য এই তিনটি পরস্পরের সঙ্গে অল্পবিস্তর সম্বন্ধযুক্ত। ইহা আজকাল সকলেই জানেন যে, বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃতাদি বড়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। গবাদি পশুর হ্রাসই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। আর বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবই

(১) "Dying Race"—by U. N. Mukerjee (1909)

যে শিশুমৃত্যুর একটি প্রধান কারণ, তাহা অনেকেই বলিয়াছেন। কলিকাতা-তেই এই শিশুমৃত্যুর সর্ব্বাপেক্ষা আধিক্য। এখানে যে সকল শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের শতকরা ৩০ জনই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কলিকাতার জনাকীর্ণতা, বিশুদ্ধ আলোক ও বায়ুর অভাব, বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব, সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব এ সকলই শিশু-মৃত্যুর সহায়তা করে।

শিক্ষা।—শিক্ষা-বিষয়ে বাঙ্গালার একটা সুখবর আছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালাদেশই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী। বাঙ্গলা দেশে সমগ্র শিক্ষিত লোকের সংখ্যাই যে কেবল বেশী, তাহা নহে; মোট লোকসংখ্যার তুলনায় শিক্ষিত লোকের অনুপাতও অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বেশী। বাঙ্গলায় শতকরা ৭.৭ জন, মাদ্রাজে ৭.৫ জন ও বোম্বাই প্রদেশে শতকরা ৬.৯ জন লোক শিক্ষিত। অবশ্য, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এই সংখ্যা যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, ইহা বলা বাহুল্য। সমগ্র শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাঙ্গালাদেশে ৩[illegible] লক্ষের বেশী হইবে না;—তার মধ্যে শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২½ লক্ষ।

শিক্ষা-বিষয়ে বাঙ্গালার জেলা-সমূহের মধ্যে কলিকাতা অগ্রবর্ত্তী। এখানে প্রায় প্রতি তিন জনে এক জন শিক্ষিত। অপর দিকে ময়মনসিংহ, রাজসাহী, রঙ্গপুর ও মালদহ এই সকল জেলা শিক্ষা-বিষয়ে সর্ব্বনিম্নস্তরে অবস্থিত। এই সকল জেলাবাসীদের ইহা ভাবিবার কথা। ময়মনসিংহে "আনন্দ মোহন কলেজে" বি. এ. শ্রেণী খুলিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবার সময়ে আমরা মনে করিয়াছিলাম, ময়মনসিংহ এত বেশী শিক্ষিত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার সে বিষয়ে অধিক দূর অগ্রসর হইবার চেষ্টা অতিরিক্ত লোভের পরিচয়মাত্র!

১৯০১ হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে বাঙ্গালাদেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ৬৩২,১১১ অর্থাৎ ৬ লক্ষের কিছু উপর বাড়িয়াছে—তার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯০৩৪২। সমগ্র লোকসংখ্যায় শিক্ষিত লোকের বৃদ্ধির অনুপাত শতকরা ২১.৫ জন; কেবল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শিক্ষিতাদের বৃদ্ধির অনুপাত শতকরা ৫৬ জন। বাঙ্গলা গবর্মেণ্ট বলেন যে, শিক্ষিত লোকের সংখ্যা আরও বেশী দেখা যাইত। কিন্তু ১৯০১ অব্দ অপেক্ষা ১৯১১ অব্দের সেন্সাসে শিক্ষার আদর্শ একটু বেশী উচ্চ ধরা হইয়াছে। ১৯০১

অব্দের সেন্সাসে শুধু কেবল লিখিতে পড়িতে পারাই আদর্শ ছিল। ১৯১১ অব্দে যে সকল লোক অন্ততঃ নিজে পত্র লিখিতে পারে, এবং পত্রের উত্তর পড়িতে পারে, তাহাদের ছাড়া আর কাহাকেও শিক্ষিত বলিয়া গণ্য করা হয় নাই।

শিক্ষাবিষয়ে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা পশ্চাৎপদ, তাহা রিপোর্টে দেখা যাইতেছে। মুসলমানেরা হিন্দুদের অপেক্ষা সংখ্যায় ১২ লক্ষেরও বেশী। কিন্তু এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত লোকের অনুপাত ২. ৫। —অর্থাৎ, প্রতি ২ জন মুসলমানের তুলনায় ৫ জন হিন্দু শিক্ষিত। কিন্তু গত দশ বৎসরে শিক্ষা বিষয়ে কে কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদের মধ্যেই শিক্ষার প্রসার বেশী দ্রুতবেগে হইয়াছে। ১৯০১ অব্দে হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ১০.৩ ও মুসলমানদের শতকরা ৩. ৫ জন শিক্ষিত ছিল। এবার হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ১১. ৮ ও মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৪. ১ জন শিক্ষিত দেখা যাইতেছে। সুতরাং গত দশ বৎসরে হিন্দুদের মধ্যে ৭: ৮ ও মুসলমানদের মধ্যে ৬: ৭ এই অনুপাতে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে। মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে শিক্ষা যে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে, ইহাতে আমরা সুখী। কিন্তু যে শিক্ষা বিষয়ে হিন্দুরা বড়াই করিতেন, তাহাতেও তাঁহারা যে ক্রমে মুসলমানদের অপেক্ষা পেছাইয়া পড়িতেছেন, ইহা আমরা কোনও মতেই আশার কথা বলিতে পারি না।

স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে বাঙ্গালাদেশের ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যাইতেছে। আর এই উন্নতি মুসলমানদের অপেক্ষা হিন্দুদের মধ্যেই বেশী হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে গত দশ বৎসরে সমগ্র লোকসংখ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা ২১. ৪ জন বাড়িয়াছে; —আর কেবল স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ৫৬ জন বাড়িয়াছে। আবার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে তুলনা করিলে এইরূপ দেখা যায়:—

শিক্ষিত লোকসংখ্যার বৃদ্ধি।

	পুরুষ—	স্ত্রী—
মুসলমান	শতকরা ২৯ জন	শতকরা ৩১ জন
হিন্দু	" ১৬ জন	" ৬৪ জন

অর্থাৎ, হিন্দুসমাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ৪ গুণ পরিমাণে বাড়িয়াছে! মা লক্ষ্মীদের জয় হউক!

গত দশ বৎসরে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও শিক্ষার বিস্তৃতি বেশী পরিমাণে হইয়াছে। কৈবর্ত্ত, পোদ, নমঃশূদ্র ও রাজবংশীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ পোদেরা শিক্ষাবিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই।

শিক্ষার উন্নতি আর এক দিক দিয়াও কতকটা বুঝা যাইতে পারে। গত দশ বৎসরে বাঙ্গালাদেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪০০০ বাড়িয়াছে, এবং ছাত্রসংখ্যা ৪০০০০০ অর্থাৎ ৪ লক্ষ বাড়িয়াছে। আবার বালিকা-বিদ্যালয়েও ছাত্রীসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা ৩ গুণ পরিমাণ বাড়িয়াছে

ভাষা—দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালাদেশে শতকরা ৯২ জন লোকের ভাষা বাঙ্গালা। হিন্দী ও উর্দ্দুভাষীর সংখ্যা শতকরা ৪ জন মাত্র। আর ৪ কোটী ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪ কোটী ৫০ লক্ষ লোকই আমাদের ভাষায় কথা কহে।

হিন্দী ও উর্দ্দুভাষীদের সংখ্যা হাওড়া ও চব্বিশপরগণাতেই বেশী, কেন না, এই সব স্থানেই প্রধানতঃ বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে শ্রমজীবীদের আমদানী হইয়া থাকে। সুতরাং খাস বাঙ্গালায় বাঙ্গালাই প্রায় সমস্ত লোকের ভাষা। শ্রীহট্ট ও পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থান বাঙ্গালার সীমা-বহির্ভূত হইয়াছে। তাহা না হইলে বাঙ্গালা-ভাষাভাষীর সংখ্যা আরও বেশী দেখা যাইত। সুতরাং বিস্তৃতিতে পৃথিবীর যে সকল ভাষা শ্রেষ্ঠ, বাঙ্গালাভাষা তাহাদের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিবার যোগ্য।

অতঃপর, যে সকল মুসলমান ভ্রাতারা বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে উর্দ্দুকে জোর করিয়া মাতৃভাষা করিবার চেষ্টায় ছিলেন, তাঁহারা একটু সাবধান হইবেন। স্বাভাবিক ও সার্ব্বজনীন ভাষার বিরুদ্ধে এইরূপ বিপরীত চেষ্টা করিয়া তাঁহারা যে কেবল নিজেদেরই অনিষ্ট করিবেন, তাহা নহে; জাতীয় অনিষ্টেরও বীজ বপন করিবেন।

বৃত্তি—শতকরা ৭৫ জন অর্থাৎ বারো আনা লোকের বৃত্তি কৃষি। অন্যান্য সভ্যদেশে শিল্পবাণিজ্যই অধিকাংশ লোকের জীবিকা। আমাদের দেশে শিল্পবাণিজ্য নানা কারণে ধ্বংসপ্রায় হইয়া যাওয়াতে অধিকাংশ লোককেই কৃষির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহাই আমাদের দেশের দারিদ্র্য

ও দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। যাঁহারা আমাদের দেশে কৃষিকার্য্য আরও বাড়াইবার পরামর্শ দিতেছেন, তাঁহারা হয় আসল কথাটা চাপা দিতে চান, নয় ভিতরের ব্যাপার তলাইয়া দেখেন না। আমরা যদি আমাদের নষ্ট শিল্প বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার না করিতে পারি, তবে আর আমাদের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের কবল হইতে মুক্তিলাভের অন্য কোনও উপায় নাই। (১)

প্রধান প্রধান শিল্প কেবল ৩৫ লক্ষ লোকের অবলম্বন। ইহার মধ্যে প্রায় ⅓ লোক তন্তুশিল্পের উপর নির্ভর করে। পাটের ব্যবসায় অত্যন্ত বাড়িয়াছে, দেখা যাইতেছে; গত দশ বৎসরে ইহার বৃদ্ধির হার শতকরা ১৪০। এই ব্যবসায় প্রায় ৩২৮০০০ লোকের অবলম্বন

প্রায় ৫ লক্ষ লোক রাজকার্য্য করে। স্বাধীন বৃত্তি ও অন্যান্য উচ্চশিল্প প্রায় ১০ লক্ষ লোকের অবলম্বন। গত দশ বৎসরে আইন-ব্যবসায়ে লোকসংখ্যা গড়ে শতকরা ৩০ জন বাড়িয়াছে। এখন বাঙ্গালায় আইনজীবীদের সংখ্যা প্রায় ১০,০০০ দশ হাজার। আশঙ্কার কথা বটে!

মিল, খনি, চা-বাগান প্রভৃতির সংখ্যা ১৯৯৬। আর এই সকলে ৬ লক্ষের বেশী লোক কাজ করে। ইহাদের প্রায় ⅓ পাটের মিলে ও ⅓ চায়ের বাগানে কাজ করে। কলিকাতা, হুগলী, হাবড়া, চব্বিশপরগণা, এই কয়েকটি স্থানই বাঙ্গলার শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। ব্যবসায়ের মধ্যে পিতল ঢালাইয়ের ব্যবসায়, তেলের কল, চাউলের কল, কাঠের কারখানা, ইটের ব্যবসায় প্রভৃতিতে দেশীয়দের আধিপত্য বেশী। অন্য দিকে পাটের কল ইউরোপীয়দের একচেটিয়া। আর চায়ের বাগান, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রভৃতিতেও তাঁহাদেরই আধিপত্য বেশী।

একটি চিন্তার কথা এই যে, এই সকল কল কারখানায় অন্যপ্রদেশের শ্রমজীবীদের সংখ্যাই বেশী হইয়া পড়িতেছে। প্রায় সকল কারখানাতেই বাঙ্গালী শ্রমজীবীদের সংখ্যা কম; পাটের ব্যবসায়ে ত নিতান্ত কম। প্রতি বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ লোক অন্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গালায় আসে—আর কেবল ৫ লক্ষ বাঙ্গালী বৎসরে বাঙ্গালা হইতে অন্য প্রদেশে যায়। এইরূপে বাঙ্গালার কল কারখানাতে শ্রমজীবীদের মধ্যে খাস বাঙ্গালীর সংখ্যা

(১) এই কথা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার এম. এ., বি. এল্‌. মহাশয় তাঁহার "A Dying Race—How Dying" (১৯১১ অব্দে প্রকাশিত) নামক বহু-তথ্যপূর্ণ গ্রন্থে অতিসুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন।

ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, ইহা অত্যন্ত আশঙ্কার কথা। ফলে এই সমস্ত জীবিকাহীন বাঙ্গালী শ্রমজীবীরা হয় শেষ আশ্রয় কৃষিকার্য্যাদি অবলম্বন করিবে, অথবা চুরি, ডাকাতি, ভিক্ষা প্রভৃতি করিয়া খাইবে।

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বৃত্তির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ৩৭ জন ও মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ১৫ জন মাত্র কৃষি ব্যতীত অন্য কার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ফলতঃ দেশের অধিকাংশ কৃষিকার্য্যই মুসলমানদের হাতে। ইহা হিন্দুদের পক্ষে শুভ কি অশুভ, তাহা মনীষিগণ ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

দেশ ও কাল।

ভূত ডাকা, পরে ভূত তাড়ান ওঝার পক্ষে অনেক সময় কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। ভূত বলে, আমার দ্বারা কাজ করাইয়া লইয়া, এখন অনাবশ্যক-বোধে আমাকে তাড়াইতে চাও, তাহা হইবে না। ওঝা বিস্তর মন্ত্রৌষধি-প্রয়োগ করিয়াও যখন নিষ্ফল হন, তখন নিরুপায় হইয়া, ভূত পুষিয়া রাখেন। পরে সেই ওঝার মৃত্যু হইলে তাঁহার পদে যখন কোনও নূতন ওঝা বসিতে চাহেন, তখন ভূত বলে, আগে আমার পূজা কর, তবে পদে বসিতে পাইবে। নূতন ওঝা দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করেন। তাঁহার বিশ্বাস হয়, ঐ ভূতই এই পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বৈজ্ঞানিকের ঠিক এই অবস্থা ঘটিয়াছে। তিনি প্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনের সৌকর্য্যার্থ কয়েকটি জিনিস মানিয়া লইয়া তাঁহার অনুসন্ধান আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষে সেই মানিয়া লওয়া জিনিসগুলি ক্রমশঃ ভূতরূপে আপনাদিগকে জাহির করে। প্রথমে যে বৈজ্ঞানিক একটা জিনিসকে পারিভাষিক—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Conventional—সত্যভাবে মানিয়া আপনার কার্য্য সিদ্ধ করেন, তিনি নিজে হয় ত সতর্ক থাকেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার পোষা ভূতকে দেবতা-ভ্রমে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়া দেন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

দুইটা গতিশীল বস্তুর একটীর বেগ বৃদ্ধি পাইতেছে, অপরটীর বেগ একই ভাবে আছে। আলোচনার সুবিধার জন্য ধরা গেল, বস্তু দুইটীর মধ্যে

যাহার বেগ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার উপর কোনও বলের ক্রিয়া আছে। বল শব্দটি ইংরাজি Force শব্দের তর্জ্জমায় ব্যবহার করিয়াছি। আসল ব্যাপার হইল বর্দ্ধনশীল বেগের সহিত গতি, বলের ক্রিয়া একটা মনগড়া কথামাত্র, উল্লেখের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত। যখন মোটেই গতি হইতেছে না, তখনও বলিয়া থাকি, দুইটি সমান বল বিপরীত দিকে ক্রিয়া করিতেছে। এরূপ বলায় কিছু দোষ হয় না, যদি কি বলা হইতেছে, তাহা ঠিক বুঝা থাকে, কিন্তু অভ্যাস বড় খারাপ জিনিস। তোতলা ব্যক্তিকে ভেঙ্গাইতে ভেঙ্গাইতে অনেক সময় নিজে তোতলা হইয়া পড়িতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপ এই বল জিনিসটাকে প্রশ্রয় দিয়া এমন দাঁড়াইয়া গেল হইয়াছে যে, কোমলমতি বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী বালকগণের উপর উহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। পৃথিবীর অভিমুখে পতনশীল কোনও দ্রব্যের গতির বেগবৃদ্ধি দেখিয়া, তাহারা শুধু মুখে বলে না যে, ঐ দ্রব্যের উপর পৃথিবীর দিকে একটা বলের ক্রিয়া আছে; তাহাদের বিশ্বাস, পৃথিবী ও ঐ দ্রব্যের মধ্যে যেন একটা অদৃশ্য আকর্ষণ-রজ্জু আছে, তদ্দ্বারা পৃথিবী উহাকে টানিতেছে, এবং সেই টানের ফলে উহার বেগ-বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাদের নিকট বল বেগ-বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য একটা মনগড়া কথা নহে; বল সত্য পদার্থ, বেগ-বৃদ্ধি তাহার বহিঃ-প্রকাশমাত্র।

এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তবে ভরসার কথা এই যে, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবংবিধ সংস্কারের অপনয়ন ঘটে। কিন্তু সংস্কারের মধ্যেও ছোট বড় আছে। ছোট সংস্কার দূর করা যত সহজ, বড় সংস্কার দূর করা তত সহজ নহে। ইতর ভূতকে সহজে গ্রামছাড়া করা যায়, কিন্তু নাছোড়বান্দা ব্রহ্মদৈত্যকে গাছ হইতে নামানই শক্ত।

এইরূপ দুইটি ব্রহ্মদৈত্য বৈজ্ঞানিককে আশ্রয় করিয়াছে—তাহাদের নাম, দেশ ও কাল। বিজ্ঞান শাস্ত্রের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা যে ইহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে হইত না, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এখন ইহারা ছাড়িতে চাহিতেছে না। সুকোমলমতি বালকের কথা ত দূরে, অনেক সময় ইহারা পণ্ডিতেরও স্কন্ধে চাপিয়া বসে। পণ্ডিত ব্রহ্মদৈত্য ঘাড়ে করিয়া স্বচ্ছন্দে নৃত্য করেন। আরব্য-উপন্যাসে পড়া যায়, সিন্ধবাদ নামক নাবিক দ্বীপবাসী স্কন্ধারোহী বৃদ্ধকে মারিয়া শুধু যে নিজে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, এমন নহে, ভবিষ্যৎ নাবিকগণের পথও নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। বর্ত্ত-

মান প্রবন্ধে আমি সেরূপ স্পর্দ্ধা রাখি না। ইহা শুধু আমার নিজের স্কন্ধ হইতে দৈতা নামাইবার প্রয়াসমাত্র।

প্রথমতঃ দেশ কথাটা লইয়া আলোচনা করা যাউক। আমাদের যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহার বশে আমরা বলিয়া থাকি, দেশ সীমাহীন, অক্ষয় ও অচল ভাবে অবস্থিত আছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন জড়পদার্থ উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। দেশের এক স্থানে ইহার কিয়দংশ ব্যাপ্ত করিয়া সূর্য্য রহিয়াছে, অন্যত্র চন্দ্র কিয়দংশ অধিকার করিয়া আছে, গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণ আপনার আপনার বিস্তারের জন্য অনন্ত দেশের কোন কোন অংশ নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। পৃথিবীও আপনার স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভূপৃষ্ঠস্থ যাবতীয় বস্তু আপনার আপনার জন্য স্থান করিয়া লইয়াছে। যাহারা গতিশীল, তাহারা নিয়ত স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। যাহাদের বিস্তার পরিবর্ত্তনশীল, তাহারা নিজ নিজ বিস্তারের উপযোগী দেশভাগ অধিকার করিতেছে। দেশ-অধিকারের সময় পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে। যে দুর্ব্বল, সে প্রবলের জন্য স্থান করিয়া দিতেছে, নিজে অন্যত্র সরিয়া যাইতেছে; অন্যত্র স্থান না পাইলে নিজের বিস্তার সঙ্কুচিত করিতেছে। দুর্ব্বল যেখানে প্রবলকে বাধা দিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছে, সেখানে সে নিজে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে। জলে একখণ্ড লৌহ ডুবাইয়া দাও, জল অতি ভালমানুষের মত সরিয়া গিয়া তাহার স্থান করিয়া দিবে। আবার একটি কলসীর তলদেশে ছিদ্র করিয়া উল্টাইয়া ডুবাইয়া দাও, তবে দেখিবে, শক্ত কলসীর স্থান হইতে বিচ্যুত হইবে না, কিন্তু অভ্যন্তরস্থিত নরম বায়ুকে ছিদ্রপথ দিয়া হঠিতে হইবে। নরমের স্থান শক্ত কোথাও করিয়া দেয় না। এ নিয়ম প্রাকৃতিক জগতে যেমন, মনুষ্য-সমাজেও তেমনই।

কূপমণ্ডূকের গল্পে পড়া গিয়াছে যে, সে কূপের অতিরিক্ত বিস্তারের কল্পনাই করিতে পারে নাই। ইহাতে আমাদের মণ্ডূকের প্রতি অশ্রদ্ধা হইবার কারণ নাই। তাহার জ্ঞান তাহার সংস্কার ছাড়াইয়া যাইলে অস্বাভাবিক হইত। আমরাও যে বস্তুবিশেষে সসীমতা বা অসীমতার আরোপ করি, তাহাও আমাদের সংস্কারানুগত। ছেলেবেলায় দেশ সম্বন্ধে যে সংস্কার ছিল, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ছেলেবেলায় মনে হইত, উপরে ওই যে একটা তারকাখচিত আকাশ রহিয়াছে, উহার পরপারে কিছুই নাই। 'কিছুই নাই' জিনিসটা কি, তখন তাহার প্রশ্নই মনে হয় নাই। ক্রমে বুঝিতে

যোগী জন্ ব্যাপ্টিষ্ট।

ভাদ্র—পৌষ।

Mohila Press.
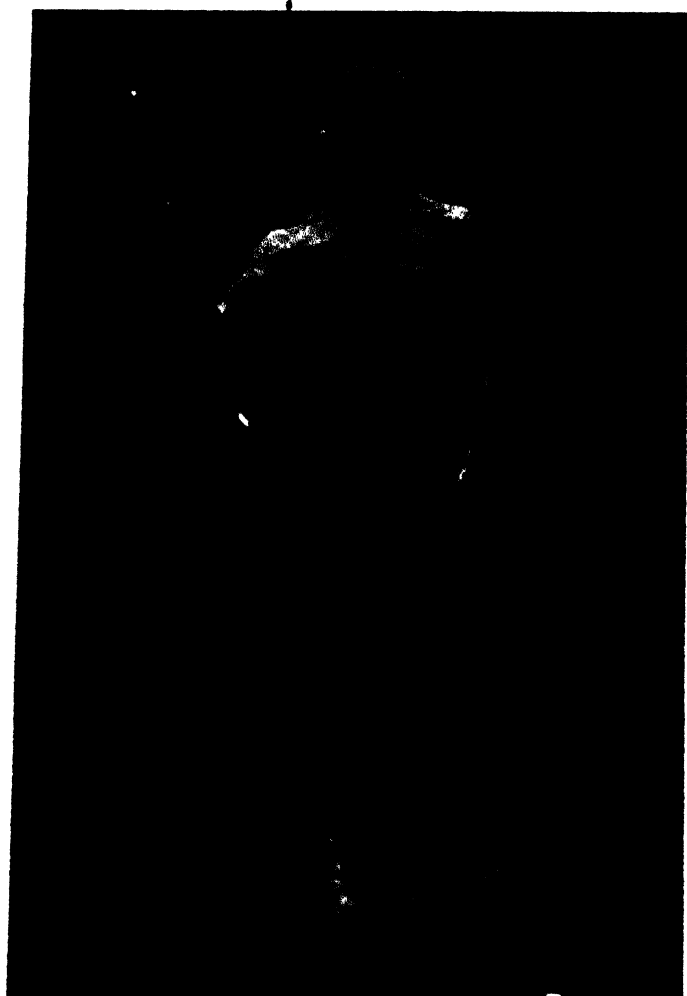
শিখিলাম যে, তারকাখচিত মণ্ডপের ধারণাটা মিথ্যা। এক একটি তারকা শূন্যে অবস্থিত। তাহারা অতি বৃহৎ, এবং আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে—কোটী কোটী মাইল দূরে—রহিয়াছে। এমন অনেক তারকা আছে, যাহাদিগকে সাদা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়; তাহারা আরও দূরে আছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের এখন যেরূপ বড় করিয়া দেখাইবার শক্তি আছে, তাহা অপেক্ষা শক্তি বাড়িলে আরও অধিকসংখ্যক ও অধিক দূরস্থিত তারকা দেখা যাইবে। কোনও তারকায় পৌঁছিতে পারিলে সেখান হইতে আরও অধিকদূরস্থিত তারকা দেখা যাইতে পারে। আবার সেই দূরস্থিত তারকায় পৌঁছিতে পারিলে তাহার অপেক্ষা অধিক-দূরস্থিত তারকা দেখা সম্ভব। ক্রমে এই ভাবে বিচার করিতে থাকিলে দেশ সীমাহীন না বলিয়া পারা যায় না। গোড়ায় দেশের একটা সংস্কার জন্মিয়া গেলে জ্ঞানের প্রসার-বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের অসীমত্বের সংস্কার জন্মিতে বিলম্ব হয় না।

এই যে অসীম একটা দেশের অস্তিত্বের সংস্কার, ইহা এত দূর বদ্ধমূল যে, অন্যরূপ কল্পনা করাই আমাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ সংস্কারের উচ্ছেদসাধন সহজে হইবার নহে। যাহা হউক, উহার মূলে কি আছে, তাহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

দুইটি বর্ত্তুল লওয়া যাউক। তাহারা একই দ্রব্যে প্রস্তুত, এবং তাহাদের ভার, আয়তন, গঠন ও উপরিভাগের মসৃণতা সমান। তাহাদের প্রত্যেককে পর পর একই স্থানে রাখিয়া একই সূর্য্যালোক ফেলিয়া একই ব্যক্তি একই স্থান হইতে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার উপলব্ধির মধ্যে পার্থক্য অনুভূত হইল। তিনি একটিকে দেখিয়া বলিলেন লাল, অপরটিকে দেখিয়া বলিলেন নীল। যাহাকে পরে দেখিয়াছিলেন, তাহাকে আগে দেখিলেন, এবং যাহাকে আগে দেখিয়াছিলেন, তাহাকে পরে দেখিলেন। তথাপি পূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়া লাল বলিয়াছিলেন, এখনও তাহাকে দেখিয়াই লাল বলিলেন, এবং পূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়া নীল বলিয়াছিলেন, এখনও তাহাকে দেখিয়াই নীল বলিলেন। তিনি যে লাল-নীল বলিলেন, সেটা হইল তাঁহার উপলব্ধির পার্থক্য। লালের উপলব্ধি একটা বিশেষ রকমের উপলব্ধি, উহা নীলের উপলব্ধি হইতে পৃথক্। দেখা যায় যে, এই বিশেষ উপলব্ধি বস্তুর সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। ইহা হইতে বৈজ্ঞানিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যাহাদিগকে দেখিয়া লাল নীল এই উপলব্ধির পার্থক্য হয়, সেই বস্তুদ্বয়ের মধ্যেও একটা পার্থক্য আছে;

উহার নাম দেওয়া যাউক বর্ণপার্থক্য। একটির বর্ণ লাল, অপরটির বর্ণ নীল। লালবর্ণের বস্তু দেখিয়া একটা বিশেষ রকমের উপলব্ধি হয়, যাহা নীলবর্ণের বস্তু দেখিয়া হয় না, এবং নীলবর্ণের বস্তু দেখিয়া একটা বিশেষ রকমের উপলব্ধি হয়, যাহা লালবর্ণের বস্তু দেখিয়া হয় না। অথচ তাহাদের মধ্যে হয় ত অপর কোনও পার্থক্য নাই, কাজেই একটা নূতন নাম দিয়া বলিতে হয়, উহাদের মধ্যে বর্ণপার্থক্য আছে।

অপর দুইটি বর্তুল লওয়া যাউক। তাহারা অন্য সকল বিষয়েই সমান, কেবল একটি অপরটি অপেক্ষা আকারে বড়। এক ব্যক্তির চক্ষু বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে এই বর্তুল দুইটি পরীক্ষা করিতে দেওয়া গেল। তিনি হাত বুলাইয়া দেখিয়া বলিলেন, একটি ছোট, অপরটি বড়। তাঁহার ছোট বড় বলাটা হইল তাঁহার উপলব্ধির পার্থক্য। তিনি হাত বুলাইয়া এই পার্থক্য অনুভব করিলেন। চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইলে তিনি দৃষ্টিপাতমাত্র বলিয়া উঠিলেন, "ঠিকই ত বলিয়াছি, এইটি ছোট, ঐটি বড়।" এখন তিনি দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অপর এক ভাবে উপলব্ধি করিলেন; এবং তাঁহার উপলব্ধির মধ্যে পার্থক্য অনুভূত হওয়ায় তিনি বলিলেন, একটি ছোট, অপরটি বড়। দর্শনেন্দ্রিয়ের উপলব্ধি ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপলব্ধি, এই উভয়ের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়া, তিনি উভয়বিধ উপলব্ধির দ্বারা একই পার্থক্য নির্দেশ করিতে পারিলেন। লাল নীলের উপলব্ধির ন্যায় এই ছোট বড়র উপলব্ধিও বস্তুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। সুতরাং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করেন, বস্তুদ্বয়ের মধ্যেও একটা পার্থক্য আছে, তাহার নাম দেওয়া যাউক বিস্তৃতি বা আয়তনের পার্থক্য। যাহার সম্বন্ধে ছোট বলিয়া উপলব্ধি হইল, তাহার বিস্তৃতি বা আয়তন অপেক্ষা, যাহার সম্বন্ধে বড় বলিয়া উপলব্ধি হইল, তাহার বিস্তৃতি বা আয়তন বেশী, বলা যায়।

এই উপলব্ধির মধ্যে আমরা একটু ইতরবিশেষ করিয়া থাকি। যখন বলি, গুরুমহাশয়ের বেত্র অপেক্ষা চোরে ঠাকুরের লাঠী লম্বা, তখন উহাদের আয়তনের পার্থক্য এক ভাবে উপলব্ধি করি। যখন বলি, রামের বাস্তুভিটা অপেক্ষা শ্যামের বাস্তুভিটা বেশী, তখন দুই বাস্তুভিটার বিস্তৃতির পার্থক্য অন্য এক ভাবে উপলব্ধি করি, বেত্র ও লাঠীর বিস্তৃতির পার্থক্য যে ভাবে করি, সে ভাবে নহে। আবার যখন কোন গোয়ালার দুগ্ধ মাপিবার পাত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলি, "তোমার এ গোয়া ঘটীটা কিছু ছোট। আমাদের ঘরের গোয়া

ঘটী ইহার অপেক্ষা বড়", তখন ঐ পাত্রদ্বয়ের বিস্তৃতি-পার্থক্য যে ভাবে উপলব্ধি করি, তাহা পূর্ব্বোক্ত দুই ভাবের উপলব্ধি হইতে পৃথক্। পার্থক্য সত্ত্বেও উহাদের মধ্যে এতটা ঐক্য আছে যে, স্বচ্ছন্দে বলা চলে, বস্তুর একই বিশেষত্বকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিবার প্রণালী হইতে এই পার্থক্যের উৎপত্তি। সেই বিশেষত্ব বস্তুর আয়তন।

এইবার দুইটি বর্ত্তুল লওয়া যাউক। তাহারা সর্ব্বাংশে তুল্য। বর্ত্তুল দুইটিকে পৃথক্‌ভাবে রাখিয়া এক ব্যক্তিকে চক্ষু বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেল। তিনি হস্তপ্রসারণের দ্বারা উভয়কে স্পর্শ করিলেন। কিন্তু দুইটি বর্ত্তুল স্পর্শ করিতে তাঁহাকে দুই ভাবে হস্তপ্রসারণ করিতে হইল। ইহাতে তাঁহার উভয় বর্ত্তুল সম্বন্ধে উপলব্ধির যে পার্থক্য জন্মিল, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, একটি বর্ত্তুল তাঁহার নিকটে আছে, অপরটি দূরে আছে। তিনি যাহা বলিলেন, তাহা শুধু তাঁহার উপলব্ধির পার্থক্যমাত্র। হস্তপ্রসারণের পার্থক্যে তাঁহার এই উপলব্ধি-পার্থক্য জন্মিয়াছে। চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দিলে দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁহার অন্যবিধ উপলব্ধি-পার্থক্য জন্মিবে। তবে এই উভয়বিধ উপলব্ধির নিত্যসম্বন্ধ দেখিয়া আসিতেছেন বলিয়া উভয়ক্ষেত্রেই তিনি একই পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া বলেন,—একটি নিকটে আছে, অপরটি দূরে আছে। এই উপলব্ধি-পার্থক্যকে ভিত্তি করিয়া বৈজ্ঞানিক বলেন, বর্ত্তুল দুইটির মধ্যেও একটা পার্থক্য আছে; তাহার নাম দেওয়া যাউক—অবস্থান পার্থক্য।

এই অবস্থান-পার্থক্যের উপলব্ধি আমরা কয়েকটি বিভিন্ন ভাবে করিয়া থাকি। সেই বিভিন্নতা বুঝাইবার জন্য আমরা বলি, অমুক জিনিসটা আমার সম্মুখে আছে, অমুকটা পশ্চাতে আছে, অমুকটা দক্ষিণে আছে, অমুকটা বামে আছে; অমুকটা ঊর্দ্ধে আছে, অমুকটা নিম্নে আছে, এবং সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, ঊর্দ্ধে ও নিম্নে থাকিয়া অমুক জিনিসটা নিকটে আছে, অমুকটা দূরে আছে। এই যে বিভিন্নতা, ইহার খাতিরে উপলব্ধিগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে না ফেলিয়া, বরং এক শ্রেণীর উপলব্ধির প্রকারভেদ বলাই সঙ্গত। সুতরাং বৈজ্ঞানিক বলেন, অবস্থান-পার্থক্যের প্রকারভেদ হইতে উহাদের উৎপত্তি।

এখন বোধ হয় জড়ের বিস্তার, বিস্তৃতি, বা আয়তন বলিলে, পাঠক গোড়া হইতে দেশব্যাপ্তি বুঝিবেন না; অথবা অবস্থান বলিলে, দেশের অংশবিশেষে

স্থিতি বুঝিবেন না। জড়ের অবস্থান ও আয়তন প্রথমে উপলব্ধিভাবে গ্রহণ করিয়া, পশ্চাৎ জড়ধর্ম্মভাবে উহাদের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। 'লাল নীল' এই উপলব্ধির পার্থক্য হইতে যেমন জড়ে বর্ণপার্থক্যের আরোপ করিয়া তাহাদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়, ইহাও তদ্রূপ। জড়ের বিস্তৃতি বলিলে বুঝিতে হইবে যে, উহার এমন একটা গুণ আছে, যাহার অভাবে, বিস্তৃতির যে একটা বিশেষ রকমের উপলব্ধি হয়, তাহা হইত না। সেইরূপ, জড়ের অবস্থান বলিলে বুঝিতে হইবে, উহার এমন একটা গুণ আছে, যাহার অভাবে অবস্থান-উপলব্ধি ঘটিত না। উপলব্ধি ব্যাপারটা আত্মসম্বন্ধী—ইংরাজীতে যাহাকে বলে subjective বৈজ্ঞানিক বলেন। উহার পশ্চাতে কিছু থাকিয়া ঐ উপলব্ধি ঘটাইতেছে। সেই জিনিসটা বাহ্যবস্তু-সম্বন্ধী—ইংরাজীতে যাহাকে বলে objective এইরূপ objective ভাবে অবস্থান ও বিস্তৃতি জড়ের ধর্ম্ম।

শুধু এইটুকুমাত্র বলিয়াই বৈজ্ঞানিক সন্তুষ্ট নহেন। তিনি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহেন। এ জন্য তাঁহাকে একটা মনগড়া জিনিস খাড়া করিতে হইল। তাহার নাম দিলেন, দেশ। ধরিয়া লইলেন, একটা সীমারহিত দেশ আছে, তাহা সকল সময়েই স্থির; তাহার কোনও অংশ আপনাকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করে না; তাহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ কিছুই নাই; তাহার এইমাত্র গুণ যে, তাহা জড়পদার্থের আধারস্বরূপ; জড়পদার্থ তাহাকে আশ্রয় করিয়া, আপনাকে অবস্থিত ও বিস্তৃত করিয়াছে। অতঃপর বলা চলিল, যে বস্তুর আয়তন যত বেশী, তাহা তত বেশী দেশভাগ ব্যাপ্ত করিয়া আছে, এবং দুইটি জড়ের মধ্যে দূরত্ব যত বেশী, তাহাদের মধ্যে দেশের ব্যবধানও তত বেশী। কিন্তু দেশের ব্যবধান দেশব্যাপ্তি এ সমস্ত পারিভাষিক শব্দমাত্র। কল্পিত একটা দেশের অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া উহাদের ব্যবহারের প্রয়োজন হইয়াছে। জড়ের বিস্তৃতি ও অবস্থান না থাকিলে দেশের কল্পনার প্রয়োজন হইত না। বিস্তৃতি ও অবস্থান আছে বলিয়াই যে দেশের অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য্য, তাহাও নহে। দেশের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও উহাদের সম্বন্ধে আলোচনা হইতে পারিত। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, একটা কল্পিত দেশের অস্তিত্ব স্বীকার করাতে আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। ইহার জন্য মানবের বিজ্ঞানবুদ্ধির ও কল্পনাশক্তির প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু কল্পিত জিনিসটাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

এইবার কাল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। দেশের সংস্কারের ন্যায় কালের সংস্কারও অত্যন্ত বদ্ধমূল। উহার বশে আমি ভাবি, কাল অনাদি ও অনন্ত, এবং জাগতিক ঘটনাবলী তাহাকে অবলম্বন করিয়া, আপনাদিগকে ব্যক্ত করিতেছে। যেন কালসূত্রে তাহারা পুষ্পরূপে গ্রথিত আছে; আমি কালকে স্থিরভাবে দেখিতেছি না, উহাকে প্রবাহরূপে দেখিতেছি; যেন কাল একটা ঘটনাবলীর panorama লইয়া আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহা হইতে দুই প্রকার সিদ্ধান্ত হইতে পারে,—আমি স্থির আছি; কালের একটা স্রোত চলিয়াছে; অথবা, কাল স্থির আছে, আমি তাহার উপর দিয়া সাঁতারিয়া চলিয়াছি। আমি আছি গাড়ীর মধ্যে বসিয়া। এখন গাড়ী স্থির থাকিয়া নদী, বৃক্ষ, পর্ব্বত চলিতে থাকুক, অথবা উহারা স্থির থাকিয়া গাড়ী চলিতে থাকুক, আমার পক্ষে দুইই সমান; উভয় ক্ষেত্রেই আমি বুঝিব যে, নদী বৃক্ষ পর্ব্বত আমার নিকট হইতে সরিয়া যাইতেছে। আমি কালের সমগ্র মূর্ত্তি একেবারে দেখিতে পাইতেছি না। যে মুহূর্ত্তে উহার যে অংশ দেখিতেছি, তাহা সেই মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান। উহার পশ্চাতে যাহা পড়িয়া আছে, তাহা অতীত, এবং উহার সম্মুখে যাহা আছে, যাহার আবরণ এখনও উন্মুক্ত হয় নাই, তাহা ভবিষ্যৎ। পর মুহূর্ত্তেই আমার এই ভুক্ত বর্ত্তমানকে অতীতের কঙ্কালরাশির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ভবিষ্যতের কিয়দংশ গ্রাস করিয়া সেই মুহূর্ত্তের বর্ত্তমান করিয়া লইতেছি, অতীতের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহা তখন স্মৃতির বস্তু; কিন্তু ভবিষ্যতের রহস্য তমসাচ্ছন্ন, সুতরাং উহা কল্পনার সামগ্রী। সময়ে সময়ে বর্ত্তমানের আলোকরশ্মি আপনার তেজঃপ্রভাবে ভবিষ্যতের প্রাচীর ভেদ করে। তখন আমি ভবিষ্যতের ঈষদালোকিত অংশ অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই।

আমি জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতীতের কঙ্কালরাশি উদ্ধার করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি। আমার নিজ জীবনের অতীত কতকটা নিজের স্মৃতির সাহায্যে, কতকটা বা পরের মুখে শুনিয়া, দেখিয়া লই। আমার পিতৃপুরুষগণের চরিত যদি রক্ষিত হইয়া থাকে, তবে তাহা জানিয়া লই। এখন য়ুরোপীয়গণ পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, তাঁহাদের পূর্ব্বে অটোমান-রাজত্বের অভ্যুদয় হইয়াছে, ধ্বংস হইয়াছে। তাহারও পূর্ব্বে, এক দিকে হিন্দু ও অপর দিকে রোমান রাজ্যের উত্থান ও পতন হইয়াছে। আরও পূর্ব্বে, মানুষ সবেমাত্র সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিখিতেছে; এক একটী দল

বাঁধিয়া লুণ্ঠনবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। তাহারও পূর্ব্বে, মানুষ মানুষকে ধরিয়া খাইতেছে, মনুষ্যে ও পশুতে বড় তফাৎ নাই। ভূতত্ত্ববিদ্ বলেন, তাহারও পূর্ব্বে যাও, দেখিবে—জীবজন্তু নাই, পৃথিবী সবেমাত্র জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। তারও পূর্ব্বে, পৃথিবীর হয় ত অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু আর কিছু ছিল। তাহারও পূর্ব্বে, হয় ত কি ছিল, বলিবার উপায় নাই, কিন্তু সেটাও ত কালের প্রারম্ভ নহে? এইরূপে 'তার পূর্ব্বে তার পূর্ব্বে' করিয়া ভাবিয়া যাইলে কালের একটা গোড়া খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই বলিতে হয়, কাল অনাদি। অতীতের সম্বন্ধে যে ভাবে 'তার পূর্ব্বে তার পূর্ব্বে' করিয়া দেখা গেল, ভবিষ্যতের সম্বন্ধে যদি সেই ভাবে 'তার পরে তার পরে' করিয়া দেখা যায়, তবে ভবিষ্যতেরও অন্ত মিলিবে না। কাজেই বলিতে হয়, কাল যেমন অনাদি, তেমনই অনন্ত।

এই যে অনাদি অনন্ত একটা কালের সংস্কার, ইহার উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক।

আমার ঘটিকাযন্ত্র টিক্ টিক্ শব্দ করিয়া চলিয়াছে, অথবা অন্য ভাবে বলা যাউক, ঘটিকাযন্ত্র হইতে টিক্ টিক্ শব্দ হইতেছে, আমি এইরূপ উপলব্ধি করিতেছি। প্রত্যেক 'টিক্' এক একটি পৃথক উপলব্ধি মনে হইতেছে; তাহারা সর্ব্বতোভাবে সমান, অথচ তাহাদিগকে অনায়াসে পৃথক করিতে পারিতেছি; সুতরাং তাহারা সর্ব্বতোভাবে সমান নহে। দুইটি টিকের মধ্যে যে পার্থক্য অনুভূত হইতেছে তাহার নাম দেওয়া যায় পৌর্ব্বাপর্য্যের পার্থক্য। বলা যায়, একটি 'টিকে'র উপলব্ধি পূর্ব্বে হইতেছে, অপরটি পরে হইতেছে। এই পৌর্ব্বাপর্য্যের অনুভূতিটা কি রকম, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি, কিন্তু অপরকে উহা বুঝাইবার সাহায্যে বুঝান চলে না। আমি শুধু এইটুকুমাত্র বলিতে পারি যে, ঘটিকাযন্ত্রের টিক্ টিক্ শব্দোপলব্ধির মধ্যে আমি এই পার্থক্য অনুভব করি। ইহা হইতে অন্যে পারেন, বুঝিয়া লউন। শুধু পৌর্ব্বাপর্য্য কেন, সকল অনুভূতির সম্বন্ধেই এইরূপ। আমি 'লাল' বলিতে যাহা বুঝি, আমার সাধ্য নাই, তাহা অপরকে বুঝাইতে পারি। তবে, যাহাকে দেখিয়া আমার 'লালে'র অনুভূতি হইতেছে, সেই বস্তুটা অপরের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বলিতে পারি, ইহাকে দেখিয়া আমার লালের অনুভূতি হয়। তাহা হইতে, তিনি যাহা বুঝিবার, বুঝিয়া লউন। তিনি হয় ত বুঝিবেন, সেই বস্তু দেখিয়া তাঁহার যে অনুভূতি হইতেছে, আমার অনুভূতিটাও ঠিক সেইরূপ। কিন্তু

এরূপ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও প্রমাণ নাই। তাঁহার অনুভূতির সহিত আমার অনুভূতি মিলাইয়া দেখিবার কোনও উপায় নাই। তাঁহার অনুভূতি তাঁহার নিজস্ব, এবং আমার অনুভূতি আমার নিজস্ব। কিন্তু ইহাতে আমাদের উভয়ের মধ্যে কাজ কর্ম্ম আটকাইবে না। কেন না, অনুভূতি যাহাই হউক, উভয়েই একই বস্তুকে দেখিয়া লাল বলিব।

এই পৌর্ব্বাপর্য্যের অনুভূতি আমার উপলব্ধিগুলি সাজাইবার প্রণালী হইতে, কিংবা অন্য কোনও কারণ হইতে সঞ্জাত, তাহা এ স্থলে জানিবার আবশ্যকতা নাই। আমার কোনও কোনও উপলব্ধির মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্যের অনুভূতি হয়, ইহা সত্য। শুধু পৌর্ব্বাপর্য্য কেন, তাহা ছাড়া অপর একটা অনুভূতি হয়, সেটাকে বলা যাইতে পারে—উহাদের অন্তর। এই অন্তরের পার্থক্যও আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ঘোড়া ছুটিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার খুরের ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতেছে: ঘোড়ার গতি যদি ক্রমশঃ মন্থর হইয়া আইসে, তবে ঐ ঠক্ ঠক্ শব্দগুলির অন্তরের পার্থক্য হইতে থাকিবে। উপলব্ধির স্থায়িত্ব বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাকে একটা পৃথক অনুভূতি না বলিয়া, উপলব্ধির অংশসমূহের মধ্যে পারম্পর্য্য ও অন্তরের অনুভূতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উপরে পৌর্ব্বাপর্য্য, অন্তর ও স্থায়িত্ব নাম দিয়া যাহাদিগের উল্লেখ করিয়াছি, পাঠক গোড়া হইতে তাহাদের সহিত সময়ের সম্পর্ক স্থাপন করিবেন না। আমি তাহাদিগকে শুদ্ধ অনুভূতিভাবে উল্লেখ করিয়াছি। আমার উপলব্ধিসমূহের মধ্যে আমি উহাদিগকে অনুভব করি। বৈজ্ঞানিকের মতে, উপলব্ধির পশ্চাতে একটা বাহ্য ঘটনা আছে, তাহা ঐ উপলব্ধি জন্মাইতেছে; সুতরাং তিনি বলেন, জাগতিক ঘটনাবলীর মধ্যেও পৌর্ব্বাপর্য্য ও অন্তর আছে। আমি যে 'টিক' 'টিক' উপলব্ধি করিতেছি, উহার পশ্চাতে ঘড়ির 'টিক' 'টিক' আছে; তাহাদের মধ্যেও পৌর্ব্বাপর্য্য ও অন্তর আছে; অথবা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলে, এমন কিছু আছে, যাহার দরুণ আমার পৌর্ব্বাপর্য্যের ও অন্তরের অনুভূতি জন্মিতেছে।

এই পৌর্ব্বাপর্য্য ও অন্তরের বৈজ্ঞানিক আলোচনার সৌকর্য্যার্থে একটা অনাদি ও অনন্ত কালের অস্তিত্ব পারিভাষিকভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। এই পারিভাষিক কাল যেন একটি প্রান্তহীন সরল রেখা। উহার একটা দিক্ অতীতের দিক্, এবং তাহার বিপরীত দিক্ ভবিষ্যতের দিক্। জাগ-

তিক ঘটনাবলী উহাকে আশ্রয় করিয়া আপনাদিগকে ব্যক্ত করিতেছে। দুইটি ঘটনার মধ্যে যদি পৌর্ব্বাপর্য্য অনুভূত হয়, তবে বলা যায় যে, পূর্ব্বের ঘটনা পরের ঘটনার সম্পর্কে কালের অতীতের দিকে আছে; এবং পরের ঘটনা পূর্ব্বের ঘটনার সম্পর্কে কালের ভবিষ্যতের দিকে আছে অর্থাৎ, পূর্ব্বের ঘটনার সম্পর্কে পরের, এবং পরের ঘটনার সম্পর্কে পূর্ব্বের ঘটনা, অতীত। দুইটি ঘটনার মধ্যে যে অন্তরের অনুভূতি হয়, তাহার সম্বন্ধে বলা যায়, উহাদের মধ্যে খানিকটা কালের ব্যবধান আছে। এই হিসাবে ঘটনার স্থায়িত্বকে বলা যায়, কালব্যাপ্তি। কিন্তু কালব্যাপ্তি, কালের ব্যবধান প্রভৃতি কথা পারিভাষিকমাত্র। কালের অস্তিত্ব পারিভাষিকভাবে স্বীকার না করিলে, দুইটি ঘটনার মধ্যে কালের ব্যবধান থাকে না। যাহা থাকে, তাহা একটা বিশেষ রকমের অনুভূতি মাত্র, তাহার নাম দিয়াছি, অন্তর।

একটা সংস্কারের জন্ম যত সহজে হয়, তাহার উচ্ছেদ তত সহজে হয় না। যুক্তির দ্বারা হয় ত তাহার প্রায় ধ্বংস করা হইয়াছে, তখনও পদে পদে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তর্কের দ্বারা মীমাংসা হইতেছে যে, আমাদের দেশের জ্ঞান একটা অমূলক সংস্কারমাত্র, কিন্তু তথাপি হয় ত কেহ প্রশ্ন করিবেন, দেশই যদি নাই, তবে কি ব্যাপ্ত করিয়া জড়ের বিস্তার? দুইটি পৃথগবস্থিত জড়ের মধ্যে অবকাশই বা কিসের অবকাশ?" বলা বাহুল্য, প্রশ্নটির মধ্যে সেই গোড়াকার ভ্রান্ত সংস্কার প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—একটা কিছু থাকা চাই, যাহাকে অবলম্বন করিয়া জড়ের অবস্থান ও বিস্তার ঘটিতে পারে, 'কিছু আছে' সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। তাহাকে লয় করিয়া, 'কিছু নাই' এই সত্যের উপলব্ধি যে অত্যন্ত কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই; যুক্তির আগুনে সংস্কারকে নিয়ত দগ্ধ করিতে হইবে, তবে খাঁটী সত্যের মূর্ত্তি প্রকট হইবে। দেশ না থাকিলে দেশের অস্তিত্বের জ্ঞান হওয়া যে অসম্ভব নহে, তাহার প্রমাণ দর্পণের ভিতর দিয়া দেশের জ্ঞান; এখানে দর্পণের পশ্চাতে সেরূপ একটা দেশ নাই, অথচ দর্শনেন্দ্রিয়ের পক্ষে একটা দেশের জ্ঞান ত হয়।

ভাল, আর এক দিক হইতে দেখা যাউক—আমরা জড় জগৎকে যে ভাবে পাইয়াছি, অর্থাৎ, যেরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জড় জগৎ আমাদের উপলব্ধির বিষয়, তাহাতে আমরা বর্ত্তমান পারিভাষিক দেশটাকে

কল্পনা করিতে পারিয়াছি। কিন্তু যদি জড়ধর্ম্ম অন্যরূপ হইত, তাহা হইলে। এবম্প্রকার দেশের কল্পনা করিলে চলিত কি? মনে কর, যদি এরূপ হইত যে, বিশ্বজগৎটা সব জমাট বাঁধা, কোথাও বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই; তাহারই মধ্যে পৃথক পৃথক জড় অবাধে আনাগোনা করিতেছে, লেনা দেনা করিতেছে, এবং সমস্ত জড় যুগপৎ বাড়িতেছে ও যুগপৎ কমিতেছে। অথবা যদি এরূপ হইত যে, জড়জগৎ এখনকার মত সাবকাশ ভাবেই অবস্থিত, কিন্তু উহার একটা বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, তুমি কোন একটা জড় পদার্থের দিকে যতই অগ্রসর হইবে, তোমার ও সেই পদার্থের মধ্যে দূর ততই বাড়িয়া যাইবে, এবং তুমি যত পিছু হটিবে, দূর ততই কমিবে, তাহা হইলে কি দেশের বর্ত্তমান পরিভাষায় কাজ চলিত? কিংবা মনে কর যদি এইরূপই হইত যে, দুইটি পৃথগবস্থিত জড় পদার্থের মধ্যে দূরত্ব লাল রঙ্গের গজবাড়ি দিয়া মাপিলে চারি বাড়ি হয়, আবার নীল রঙ্গের গজবাড়ি দিয়া মাপিলে পাঁচ বাড়ি হয়, আবার সবুজ রঙ্গের গজবাড়ি দিয়া মাপিলে তিন বাড়ি হয়, তাহা হইলেও ত পরিভাষা বদলাইতে হইত। তুমি হয় ত বলিবে, এরূপ হওয়াটা অস্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিকতা কথার অর্থ হয় না। প্রকৃতির যদি ঐরূপ মূর্ত্তি ও ধর্ম্ম হইত, তবে তাহাই স্বাভাবিক হইত। 'স্বাভাবিক' 'অস্বাভাবিকে'র পরীক্ষা ত তোমার আমার কাছে নয়, প্রকৃতির কাছে। প্রকৃতি যাহার উপর ছাপ মারিয়া বলিয়া দিবেন স্বাভাবিক, তোমাকে ও আমাকে তাহাই মানিয়া চলিতে হইত। অতএব দেখা যাইতেছে, দেশাপেক্ষী জড় নহে, জড়াপেক্ষী দেশ। তাহা যদি হইল, তবে জড়কে ছাড়িয়া দেশ থাকিতে পারে না। দেশ একটা স্বয়ং ব্যক্ত সীমাহীন সত্য পদার্থ নহে। উহা জড়ধর্ম্মের ভিত্তির উপর খাড়া করা একটা কল্পিত জিনিস। শুধু একটা পরিভাষামাত্র। যদি কখনও সেই জড়ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, তবে পারিভাষিক দেশও তৎসঙ্গে লোপ পাইবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, জমী লোপ পাইয়াছে, কিন্তু জমা লোপ পায় নাই। জমীদারের সেরেস্তায় ভূয়া জমার খাজনা টানিতে হইতেছে। তথাপি এ কথা বোধ হয় কেহই স্বীকার করিতে চাহিবেন না যে, অগ্রে জমার সৃষ্টি হইয়া পশ্চাৎ জমা অবলম্বন করিয়া জমীর সৃষ্টি হইয়াছে।

আমাদের কালের সংস্কারও জাগতিক ঘটনার বর্ত্তমান ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যবস্থা যদি অন্যরূপ হইত, তবে কালের পরিভাষাও অন্যরূপ

হইত; সংস্কারও তদনুযায়ী হইত। এখনকার ব্যবস্থামতে দিন যত বড় হয়, আমরা সকল কর্ম্মই তত বেশী করিতে পারি, এবং দিন যত ছোট হয়, আমরা সকল কর্ম্মই সেই পরিমাণে কম করিতে পারি। সুতরাং আমাদের কালের বর্ত্তমান পরিভাষায় বেশ বলা চলে, দিবাভাগের স্থায়িত্ব-কালটা বাড়িয়া গিয়াছে, বা কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু মনে কর, যদি এরূপ হইত যে, দিনটা কয়েকটা কাজের পক্ষে কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আর কয়েকটা কাজের পক্ষে বাড়িয়া গিয়াছে, এবং অপর কয়েকটা কাজের পক্ষে সমান আছে, তাহা হইলে কালের বর্ত্তমান পরিভাষায় চলিত কি? কি বলিতাম? দিবাভাগের স্থায়িত্বকাল বাড়িয়াছে, না কমিয়াছে? অথবা, যদি প্রকৃতির বন্দোবস্ত এইরূপই হইত যে, তুমি যত কাজ কর, দিনটা ততই বাড়িতে থাকে, দিন ফুরায় না; আর যেই কাজ বন্ধ কর, অমনই দিন সঙ্কুচিত হইতে থাকে, এবং শেষে ফুরাইয়া যায়; তাহা হইলেও ত পরিভাষা বদলাইতে হইত।

অতএব দেখা যাইতেছে, কালও প্রাকৃতিক ব্যবস্থার অপেক্ষা করে। বর্ত্তমানে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা অনুসারে কালের যে পরিভাষা করায় আমাদের যে সংস্কার জন্মিয়াছে, ব্যবস্থা অন্যরূপ হইলে সে পরিভাষাও চলিত না, সে সংস্কারও জন্মিত না। বাহ্যজগৎই কালের পারিভাষিক সত্তা, তাহা যদি কখনও বিলুপ্ত হয়, তবে অনাবশ্যকভাবে সাক্ষ্য দিবার জন্য পারিভাষিক কাল দাঁড়াইয়া থাকিবে না। কেহ যদি বলেন যে, এই বিশ্বসংসার যখন সম্যক্ লয় হইবে, তখন যে কিছুই থাকিবে না, সেই কিছু না থাকাটাই দেশ ও কাল। উত্তর এই যে, শুধু দেশ ও কাল কেন, আরও পাঁচটা নাম দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু বুঝা চাই যে, তাহারা কিছুই নহে।

এইখানে কোনও পাঠক হয় ত প্রশ্ন করিবেন, "আচ্ছা, বুঝিলাম যে, দেশ ও কাল, ইহাদের পারিভাষিক অস্তিত্ব ছাড়া অন্য অস্তিত্ব নাই; তাহা হইলে, জড়ই কি সত্য সনাতন পদার্থ?" উত্তর এই যে, বিশ্বশতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জড়-পদার্থকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। একটা বাহ্যজগৎ অর্থাৎ ঘটনাবলীর সমষ্টি বৈজ্ঞানিক সত্য বটে; কিন্তু সেই বাহ্য-জগতের ব্যাখ্যাস্বরূপে বৈজ্ঞানিক যখন বলেন,—জড়ের ভিতর দিয়া শক্তির বিকাশ হইতে উহার উৎপত্তি, তখন এই জড় ও শক্তি তাঁহার মনগড়া জিনিস, এবং সে হিসাবে তাহারাও পারিভাষিক। প্রবন্ধকর্ত্তা যদি জিজ্ঞাসা

করেন, "সত্যের একটা বৈজ্ঞানিক বিশেষণ ব্যবহার করিলে কেন?" তাহার উত্তর এই যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। মাঝে মাঝে যে objective হইতে subjectiveএ আসিতে হইয়াছে, সেটা শুধু বক্ষ্যমাণ বিষয়কে সহজবোধ্য করিবার মানসে। বিজ্ঞান শুধু বাহ্যজগৎ লইয়া নাড়া চাড়া করে, সে অন্তর্জ্জগতের খোঁজ রাখে না। অথচ এই বাহ্যজগতের অস্তিত্ব প্রমাণসাপেক্ষ। সুতরাং বিজ্ঞানানুমোদিত সত্য ধ্রুব সত্য নহে। উহা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। যতক্ষণ গণ্ডীর ভিতরে থাকে, ততক্ষণ সত্য; গণ্ডীর বাহিরে গেলে উহা সত্য কি মিথ্যা, তাহার প্রমাণ নাই। সুতরাং এরূপ সত্যের একটা সংকীর্ণতাজ্ঞাপক বিশেষণ দেওয়া কর্ত্তব্য। সমীচীন-বোধে 'বৈজ্ঞানিক' এই বিশেষণটির ব্যবহার করিয়াছি। প্রশ্নকর্ত্তা তথাপি সন্তুষ্ট না হইয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন, "তবে ধ্রুব সত্য কি?" তাঁহার প্রতি আমার নিবেদন যে, তিনি বৈজ্ঞানিকের নিকট এ প্রশ্নের উত্তরের প্রত্যাশা করিবেন না। বৈজ্ঞানিক নিজের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে বড় রাজি নহেন। যদি ধ্রুব সত্য কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা থাকে, তবে অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে।

শ্রীজানকীনাথ গুপ্ত।

—:০:—

চীনভাষা, সাহিত্য ও পুস্তক।

চীনদেশের ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের লিখিত ও কথিত ভাষায় যেমন পার্থক্য আছে, চীনেও তদনুরূপ। এক প্রদেশের কথিতভাষা অন্য প্রদেশের লোক বুঝিতে পারে না। কিন্তু লিখিত ভাষা বিশাল চীন সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেই পড়িতে ও বুঝিতে পারে। উচ্চারণ-ভেদে একটি কথায় দুই তিন প্রকার অর্থ বুঝাইয়া থাকে। প্রাচীন চীন ভাষাকে 'ওয়েন-লী' বলে। কথিত ভাষার মধ্যে মান্দারিণ ভাষাই শ্রেষ্ঠ। আদালতে এই ভাষার প্রচলন। শিক্ষিত-সম্প্রদায়, সরকারী কর্ম্মচারী ও অন্যান্য অনেক লোকেও এই ভাষায় অভিজ্ঞ।

লিখিবার সরঞ্জামগুলিকে চীনেরা অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকে। কালি, তুলি (কলম), কাগজ ও তক্তি, এইগুলিকে পুস্তকাগারের অতি প্রয়োজ-

আমাদের শাস্ত্রপুরাণাদি অধিকাংশই যেমন রূপকচ্ছলে বর্ণিত, বাস্তব বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না, চীনেদের কোনও গ্রন্থেই প্রায় সেরূপ দৃষ্ট হয় না। তাহারা কল্পনা মোটেই ভালবাসে না, তাহারা কাজের লোক। কার্য্যসিদ্ধির উপযোগী খাঁটী কথা থাকিলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে। তজ্জন্য তাহাদের সাহিত্যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। চীনেরা কাব্য ও উপাখ্যান বিলক্ষণ ভালবাসে। চীনদেশের সকল স্থানেরই স্থানীয় বিবরণ সংগৃহীত আছে। আমাদের মধ্যে কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ অভাব পরিদৃষ্ট হয়। আজ কাল আমাদের মধ্যে স্থানীয় বিবরণের অনুসন্ধান ও তাহার ফল পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিতে কেহ কেহ প্রয়াস পাইতেছেন। আবার বিশেষ বলিতে হইবে। চীনেদের সাহিত্য চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে ; যথা, ইতিহাস, কাব্য, দর্শন ও প্রাচীন লেখ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে চীনেদের 'সাহিত্য-সংগ্রহ' নামক একখানি বিরাটকায় গ্রন্থ আছে, ইহা ৫০২০ খণ্ডে বিভক্ত, এবং ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের সারমর্ম্ম সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের একখণ্ড বিলাতের যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

. একরূপ লিপির প্রচলন আছে বলিয়া এই বিপুল সাম্রাজ্যের এক স্থানের বিবরণ পাঠ করিয়া অন্য প্রদেশের অধিবাসী সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। কিন্তু এক স্থানের কথিত ভাষা অপর স্থানের অধিবাসীর অবোধ্য।

শ্রী[illegible]

স্বপ্নপথে।

আমি রোগশয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম। পীড়া কঠিন, দারুণ যন্ত্রণায় শরীর ক্লিষ্ট, বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। আমার পত্নী ছলছল-নয়নে শিয়রে বসিয়াছিলেন। পাশে দাঁড়াইয়া ডাক্তার হাত দেখিতেছিলেন। পুত্রকন্যাগণ পায়ের কাছে দাঁড়াইয়াছিল। আমার মনে হইতেছিল ; আমার কাছে কেহ নাই, যাহারা আছে, তাহারা অনেক দূরে, তাহাদের মুখ অস্পষ্ট দেখাইতেছিল। ডাক্তার মৃদু মৃদু কথা কহিতেছিলেন, আমার মনে হইতেছিল যে, অনেক দূর হইতে কে কথা কহিতেছে। শুনিতে শুনিতে চক্ষু মুদ্রিত হইল, বিকারের প্রকোপে চৈতন্য লুপ্ত হইল।

অকস্মাৎ নিম্নদেশ হইতে সলিলরাশির গভীর গর্জ্জন শ্রুত হইল।

বিপুল জলপ্রবাহ, তাহার মধ্যে বিশাল ঘূর্ণাবর্ত্ত। আবর্ত্তের মুখে ও চারি পার্শ্বে কটাহস্থিত দুগ্ধের মত ফেন ফুটিতেছে, আবর্ত্তের গহ্বর অতলস্পর্শ, ঘোর অন্ধকার। কুম্ভকারের চক্রের মত জল ঘুরিতেছে। আমি শূন্য হইতে সেই আবর্ত্তে পতিত হইতেছি। সহসা আবর্ত্তের মুখে ফেনরাশির উপর পতিত হইলাম। মনে হইল যেন, যেন ঊর্দ্ধমুখে শয্যায় শায়িত আছি। সেই অবস্থায় ঘুরিতে লাগিলাম। জলে মগ্ন হইলাম না, শরীর যে আর্দ্র হইয়াছে, তাহাও মনে হইল না। ঘুরিতে ঘুরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, আবর্ত্তের মধ্যে নামিয়া যাইতে লাগিলাম। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল, কেবল ঊর্দ্ধে আবর্ত্তমুখে স্বর্ণরশ্মি দেখিতে পাইলাম। প্রাচীর তুল্য কৃষ্ণবর্ণ জল, আমি অধোদেশে তাহাতে ঘূর্ণিত হইতেছি। বহুদূর নীচে নামিতে নামিতে আমার সংজ্ঞালুপ্ত হইল।

চৈতন্যোদয় হইলে দেখিলাম, নদীতীরকূলে বালুকার উপর শয়ন করিয়া আছি। বালুকা নয়, শুক্তি ও মুক্তাচূর্ণের মত কোন পদার্থ। শরীরে কোন ক্লেশ বা অবসাদ নাই, সূর্য্যকিরণে অধিক উত্তাপ নাই; গোধূলির লোহিত-পীত বর্ণের ন্যায় সূর্য্যরশ্মি, অতি স্নিগ্ধ মধুর বায়ু বহিতেছে। উঠিয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম, নদীর পুলিনে উপবন, তাহাতে নানাজাতীয় বৃক্ষ গুল্ম রহিয়াছে, সে জাতীয় বৃক্ষলতা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। বিচিত্র পুষ্প ফলে শোভিত, বিবিধ সুগন্ধে সুরভিত কাননে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। বিহগ সকলও নূতন জাতীয়, সুমধুরস্বরে গান করিতেছে। সব নূতন, সব অপূর্ব্ব, সব শান্তিময়।

ক্রমে কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। আর নদীর কোন চিহ্ন নাই, দূরে পর্ব্বতশ্রেণী। বিশাল বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া সুন্দর প্রশস্ত পথ বিসর্পিত হইয়া গিয়াছে। আমি সেই পথে চলিলাম। আর কোনও পথিক নাই, কোনও শব্দ নাই, কেবল বায়ুবিতাড়িত বৃক্ষপত্র পত্ পত্ শব্দ করিতেছে। কিছু দূর যাইতে বৃক্ষশ্রেণী নিঃশেষ হইয়া গেল। সম্মুখে হরিত তৃণাবৃত প্রশস্ত মাঠ, তাহার পর [illegible] পর্ব্বত, আকাশস্পর্শী শিখরসমূহ লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এক স্থানে পর্ব্বত দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ-পথ। আমি তাহাই লক্ষ্য করিয়া চলিলাম।

অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, সেই দীর্ঘ পথে মেঘমালা কুণ্ডলিত হইতেছে। কোথাও শুভ্র, কোথাও কৃষ্ণবর্ণ, কোথাও গাঢ়, কোথাও তরল, কোথাও

বাষ্পের মত পর্ব্বতলগ্ন রহিয়াছে। ধূমায়িত অভ্ররাশি কন্দর হইতে কন্দরে শৈলখণ্ড হইতে শৈলখণ্ডে অলসগতিতে সঞ্চালিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে সেই মেঘপুঞ্জে বিদ্যুৎ বিলসিত হইতেছে। বিদ্যুতের তেমন তীব্রতা বা নয়নান্ধকারী জ্বালা নাই, মেঘ হইতে মেঘান্তরে, দিক হইতে দিগন্তরে স্বর্ণলতার মত ক্ষণপ্রভার গতি। আমি সেই পথে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত দ্রুত গমন করিতে লাগিলাম।

সহসা বিদ্যুৎ রহিত হইল। মেঘ নানাবর্ণ ত্যাগ করিয়া ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিল, পর্ব্বতের প্রবেশপথ অন্ধকার হইল। ক্রমশঃ মেঘের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে মেঘ যেমন লোহিত-বর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ অরুণ রাগ ধারণ করিল। মেঘ কুণ্ডলিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। আচম্বিতে সেই মেঘস্তরের মধ্য দিয়া একটি হস্ত প্রসারিত হইল। বৃহৎ অথচ অত্যন্ত সুগঠিত হস্ত। চম্পক বর্ণের ন্যায় দীর্ঘ অঙ্গুলি, অঙ্গুলির মধ্য দিয়া লোহিতাভা প্রকাশিত হইতেছে। সুগোল মণিবন্ধ, তাহার উপর আর দেখিতে পাওয়া যায় না, মেঘ জড়াইয়া রহিয়াছে। সেই প্রসারিত হস্ত আন্দোলিত হইল, যেন আমাকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে।

আমার মনে হইল, যেন আমার চক্ষে বলপূর্ব্বক কে করতাড়ন করিল। অগ্রে পদক্ষেপ করিবার ক্ষমতা রহিত হইল, আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। হস্তের সেই নিষেধ বুঝিতে পারিয়া আমি ফিরিলাম। তৎক্ষণাৎ হস্ত মেঘমধ্যে অন্তর্হিত হইল। আমি পথের পার্শ্বে বসিলাম।

মনের মধ্যে প্রশ্ন হইল, "এই কি মৃত্যু ?"

স্পষ্টস্বরে উত্তর আসিল, "না, ইহা মৃত্যু নয়।"

আবার মনে মনে প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় আসিয়াছি ?"

আবার উত্তর আসিল, "এই মৃত্যুর পথ। এখন তোমার সময় হয় নাই। ফিরিয়া যাও।"

বসিয়া বসিয়া পথশ্রান্তিতে তন্দ্রা আসিল। আমি তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলাম।

নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, গৃহে পালঙ্কে শয়ন করিয়া আছি। শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাক্তার বলিতেছেন, "আর ভয় নাই। আশঙ্কা উত্তীর্ণ হইয়াছে।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কলিকাতা "কাত্যায়নী-প্রেসে" শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

আমাদের সরলতা ও শিষ্টাচার।

—:•:—

সরলতা এবং শিষ্টাচার সর্ব্বত্র পরস্পর-বিরোধী না হইলেও ইহাদের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। সরলতার অর্থ,—ঋজুতা, অকপটতা, বা উদারতা। শিষ্টাচারের অর্থ, ভদ্রতা—বা সভ্যজনোচিত ব্যবহার। সরলতা মানুষের স্বাভাবিক গুণ, সুতরাং অকৃত্রিম। শিষ্টাচার সমাজশাসিত মনুষ্যের বিধান, সুতরাং কৃত্রিম। শিষ্টাচার শিখিতে হয়, সরলতা শিখিবার বিষয় নহে। পণ্ডিত, মূর্খ, ভদ্র, অভদ্র, ধনী, দরিদ্র প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেরই সরলতা থাকিতে পারে। কিন্তু অশিক্ষিত লোক শিষ্টাচারসম্পন্ন হইতে পারে, ইহা শিক্ষিত লোকেরা স্বীকার করেন না। শিষ্টাচারের সহিত বিনয় এবং নম্রতার সম্পর্ক আছে; কিন্তু সরলতা বিনয়, অবিনয় কাহারও ধার ধারে না। শিষ্টাচার সময়ে সময়ে কপটতারও প্রশ্রয় দেয়, সুতরাং তখন ইহা সরলতার সম্পূর্ণ বিরোধী। অন্য ভাবে বলিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, সরলতা স্বর্গীয়; শিষ্টাচার পার্থিব। সরলতা চাঁদের কিরণ; শিষ্টাচার বাষ্পীয় কিংবা বৈদ্যুতিক আলো। সরলতা খাঁটী দুধ; শিষ্টাচার ময়রার মিঠাই।

এই প্রবন্ধে আমরা আমাদের বাঙ্গালী-সমাজের সরলতা এবং শিষ্টাচার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। কিছুকাল পূর্ব্বে আমরা কি ছিলাম, আর এখন কি হইয়াছি, বা হইতেছি, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

অনেকেই আক্ষেপ করেন যে, আধুনিক শিক্ষা এবং সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু হৃদয়ের সদ্গুণের হ্রাস হইতেছে। এ কথা যে সত্য, ইহা আমরা অনেক প্রকারেই বুঝিতে পারি। বর্ত্তমান বাঙ্গালী-সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের শিষ্টাচার বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু সরলতা কমিয়া আসিতেছে। দুই একটী কথা বলিয়া আমি পূর্ব্বের সরলতার সামান্য আভাস দিব, এবং এখনকার শিষ্টাচারের কিঞ্চিৎ নমুনা দেখাইব।

প্রথম কথা, আমাদের আদর আপ্যায়ন। কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালীর আদর আপ্যায়নে সরলতা ছিল, কিন্তু শিষ্টাচারের বাড়াবাড়ি ছিল না।

এখন কেবল শিষ্টাচারেরই ছড়াছড়ি, কিন্তু সরলতা যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে। এ স্থলে দু এক জন বন্ধুর মুখের কথা উদ্ধৃত করিব।

আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (ইনি এক্ষণে সবজজ আছেন) একদিন আমাকে কহিলেন, "ছেলেবেলায় দাদাশ্বশুর (হাইকোর্টের প্রাচীন ও প্রধান উকীল) অন্নদাবাবুর বাসায় গিয়াছি। সকালবেলা—সাড়ে আটটা বাজিতেই দাদা মহাশয় জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কেদার, এখানে খাবে ত?' আমি হয় ত' বলে'ছি, 'আজ্ঞে না, বাসায় যেয়েই খাব, কলেজে যেতে হবে।' আমার বাসা কলিকাতায়, দাদা মহাশয়ের বাড়ী ভবানীপুরে। বৃদ্ধ দাদাশ্বশুর পুনরায় কহিয়াছেন, 'এখান থেকে খেয়ে গেলে যদি অসুবিধা না হয়, তা হ'লে এখানেই খাও। সকাল সকাল ভাত হবে। আর বাসায় যেতে হ'লে বেশী দেরি ক'রো না।' বন্ধু কহিলেন, 'এখন আর এমন সরল কথা শুনিতে পাই না। আজ কাল আমাদের মুখের আদর যথেষ্ট, কিন্তু অন্তরের সরলতা বা উদারতার একান্ত অভাব। এখন আমরা মুখে বল্‌ব, 'সেও কি কথা, এখানে খেয়ে না খেয়ে কি যাওয়া হয়?' কিন্তু মনের ভাব এই, যে চলে যায়, সেই ভাল।"

ইহা অপেক্ষা আর একটু পুরাতন একটি কথা বলি। কথাটি সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটী কালেক্টর কালনা-নিবাসী স্বর্গীয় বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম। বিমলাবাবুর পিতা জজপণ্ডিত তারাকান্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় অসাধারণ বৈয়াকরণ স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পিতৃব্য-পুত্র। কালনার এই ভট্টাচার্য্য-পরিবারের সহিত বঙ্গের গৌরব প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষরূপ জানাশুনা ছিল। বিমলাবাবু কহিয়াছেন—"ছেলেবেলায় একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় গিয়াছি। দুইএক কথার পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে কিছু খাইতে বলিলেন, এবং একখানি রেকাব হাতে দিয়া একটি হাঁড়ি দেখাইয়া কহিলেন, 'ওতে রসগোল্লা আছে, চারটে রসগোল্লা নে।' আমি আদেশ প্রতিপালন করিয়া তৎক্ষণাৎ চারিটি রসগোল্লা উদরস্থ করিলাম। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করেন, 'আর কটা পারবি, বল্?' আমি বল্লাম, 'আর দুটো।' বিদ্যাসাগর বল্লেন, 'ঠিক করে বল।' আমি বল্লাম, 'আর চারটে পারতে পারি।'

"বিদ্যাসাগর মহাশয় হাঁড়ি থেকে পাঁচটা রসগোল্লা নিয়ে রেকাবে তুলে দিলেন। আমি বল্লুম, 'পাঁচটা আমি পারবো না।' বিদ্যাসাগর বল্লেন, চারটে ত

পারবি, তাই খা, আর একটা পাতে থাক্। পাঁচটাই যদি পারিস ত' বল্, আর একটা দি।' আমি বল্লাম্, 'না, এরই একটা পড়ে থাকবে।' বিদ্যাসাগর কহিলেন, 'পড়ে থাকে নষ্ট হবে না, কেউ খাবে। রেকাবটা একবারে খালি থাক্‌লে বাড়ীর ভিতর থেকে এসে (গৃহিণী) এখনই বল্‌বেন, 'ছেলেটাকে খেতে দিয়েছ, তা দেখ নি?' "

পঁচিশ বৎসরের অধিক হইল, বিমলাবাবু আমাদিগকে এই কথাটী কহিয়া বলিয়াছিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার সময়ের লোক চ'লে গেলে, দেশে এমন আদরের কথা গল্পের বিষয় হ'য়ে দাঁড়াবে।"

সত্য সত্যই এখন ইহা আমাদের সামাজিক ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য। এরূপ ব্যবহার এখনকার শিষ্টাচার-সঙ্গত নহে। আজকাল এরূপ স্থলে গৃহস্বামী বিমলকে দেখিয়াই ফাঁকা চীৎকার করিবেন, "ওরে! বিমল এসেছে, জলখাবার নিয়ে আয়। ঘরে কি ভাল খাবার আছে, দেখ্।" বিমল উত্তর করিবেন, "আজ্ঞে, আমি এই খেয়ে আস্‌ছি, খাবার কিছু আন্‌তে হবে না।" গৃহস্বামী তখন আবার চীৎকার করিবেন, "ওরে, কিছু আন্‌তে হবে না, বিমল বল্‌ছে, সে খেয়ে এসেছে।" সঙ্গে সঙ্গে বিমলকে কহিবেন, "তোমাকে আর আদর করবো কি? তুমি ত ঘরের ছেলে। খিদে পেলে চেয়ে খাবে।" বিমল বলিবেন, "তা ত বটেই।"

পরিচিত লোকের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা, আর অপরিচিত লোক হইলে তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করাই ত শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ; সুতরাং সে ক্ষুধার্ত্ত হইলেও কিছু আসে যায় না।

বস্তুতঃ পূর্ব্বের সরল আদর আপ্যায়ন এখন কেবল 'সেকেলে'র লোকের মধ্যে অথবা পল্লীগ্রামে প্রাচীন ভদ্রের গৃহেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষিত এবং ধনি-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা বিরল হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে শিষ্টাচারেরই আধিক্য লক্ষিত হয়।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত আমার একদিন এ সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। তিনি সম্পূর্ণরূপে আমার মতের পোষকতা করিয়া কহিলেন, "প্রাণের আদর এবং সরল আতিথ্য এখন সমাজের নিম্নস্তরেই পাওয়া যায়। অল্পদিন পূর্ব্বে আমি কয়েক জন বন্ধুর সহিত প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিবার জন্য মালদহ জেলায় এক পল্লীগ্রামে গিয়াছিলাম। অনেক পথ হাঁটিয়া যাইতে হইয়াছিল।

চাকর, পাচক প্রভৃতি পিছাইয়া পড়িয়াছিল। গ্রীষ্মকাল, মধ্যাহ্নসময়ে আমরা গন্তব্য গ্রামের নিকটে একটা মাঠের মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হই, এবং ক্ষুধাতৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়া একটা গাছের তলায় শুইয়া পড়ি। সেখানে একটা জলের কূপ ছিল।

"আমাদিগকে দেখিয়া নিকটস্থ কয়েকটা কৃষক তাহাদের কাজ ফেলিয়া আমাদের নিকটে আসিল, এবং কোনরূপ শিষ্টাচারের অপেক্ষা না করিয়াই, আমরা কোথা হইতে আসিতেছি, কি জন্য আসিয়াছি, আমাদের আহারাদি হইয়াছে কি না, এই সকল প্রশ্ন করিল। আমরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর জানিতে পারিয়াই তাহাদের দুই তিন জন গ্রামের দিকে ছুটিল। অল্পক্ষণ পরেই তাহারা গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিল, এবং কয়েকটা জিনিস আনিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিল। দেখিলাম, খানিকটা আকের গুড়, খানিক পুরাণো তেঁতুল, একটা মাটীর নূতন কলসী, কয়েকখানি নূতন বাসন, এক ভাঁড় দুধ, আর কতকগুলি পাকা কলা। তাহাদের মধ্যে এক জন কহিল, "কূও থেকে জল তুলে পুরাণো তেঁতুল আর গুড় দিয়ে সরবৎ করে খান্, শরীর ঠাণ্ডা হবে!"

অক্ষয়বাবু কহিলেন, 'কৃষকের এই সরল আদর এবং ব্যবহার দেখিয়া সত্য সত্যই আমার চক্ষুতে জল আসিয়াছিল। আমার এক জন বন্ধু একটু অনুচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি কৃষকদের আতিথ্যের মূল্য স্বরূপ তাহাদিগকে একটা টাকা দিতে গিয়াছিলেন। তাহারা সরলভাবে বন্ধুকে কহিল, "আমাদের যাহা ছিল, তাই নিয়ে এসেছি, আমরা ত কোনও জিনিস বেচতে আসি নাই।"

ইহার উপর অক্ষয়বাবু যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শিক্ষিত সমাজের বিশেষ অনুকূল নহে। আমি উহা প্রকাশ করিব না।

আমাদের স্থায় নাম করিবার অযোগ্য এক জন সাহিত্যসেবী বলেন, "আমি একদিন কার্য্য উপলক্ষে কোনও পল্লীগ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানকার এক জন দরিদ্র ভদ্রলোকের সহিত আমার পূর্ব্বে সামান্য পরিচয় ছিল।

"আমি সেখানে গিয়াছি শুনিয়াই তিনি আমার কাছে আসিলেন এবং আমার যদিও তাঁহার আতিথ্য-গ্রহণের ইচ্ছা ছিল না, তথাপি অন্যত্র যাইতে হইলে আমার আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে বলিয়া, তিনি এমন ভাবে আমাকে ধরিয়া বসিলেন যে, আমি কিছুতেই তাঁহার অনু

এড়াইতে পারিলাম না। তাঁহার বাড়ীতে গেলে তিনি এবং তাঁহার পুত্র আমার আহার-সামগ্রী-সংগ্রহের জন্য যে ভাবে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, তাহা হয় ত শিষ্টাচারের অনুমোদিত নহে,* কিন্তু প্রাণের আগ্রহের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। বলিতে কষ্ট হয় যে, চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের মনের মত দ্রব্যাদি (সরু চা'ল, ভাল মাছ এবং মিষ্টি ইত্যাদি) পাইলেন না, কিন্তু যাহা দিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে সরল আদরে মাখানো।

জলযোগে ছিল, "জলের মধ্যে লুচি, মিষ্টির মধ্যে বাতাসা, একটু দুধের সর, একটু নারিকেল কোরা। আহারে মাকারি চা'লের ভাত, একটু গাওয়া ঘি, দু তিনটী ব্যঞ্জন, এক বাটী খাঁটি দুধ, সঙ্গে মিষ্টি সেই বাতাসা।" সাহিত্যিক বলেন, "পল্লীবাসি-প্রদত্ত এই বাতাসায় যে মিষ্টত্ব পাইয়াছিলাম, সহরের বড়বাজারের সন্দেশ, বাগবাজারের রসগোল্লা, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা, বা কৃষ্ণনগরের সরভাজা, সরপুরিয়াতেও অনেক স্থলে সে মিষ্টত্ব পাই নাই।"

দরিদ্র গৃহস্থ আগন্তুককে পাইয়া পুত্রের সহিত যে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন, তাহাতেই বোধ হয়, তাঁহার প্রদত্ত সামান্য সামগ্রী এত মিষ্ট লাগিয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে দেখিয়াছি, পল্লীতে কোনও ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইলে, বা কোনও কারণে দশ বিশ জন লোকের নিমন্ত্রণ থাকিলে, গৃহস্বামী নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের আহার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতেন। একবার দাঁড়াইয়া, একবার [illegible] যাইতেন। এখন শুনিতে পাই, সমাজের শীর্ষস্থান সহরে অনেক স্থলে এই অশিষ্ট ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। যতগুলি লোককে নিমন্ত্রণ করা হইল, এবং তাঁহাদিগকে যে যে জিনিস খাইতে দিতে হইবে, তাহা একটি দক্ষ [illegible] ঠিকা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই চলে, কর্ত্তাকে কিছুমাত্র হাঙ্গাম পোহাইতে হয় না। অল্পদিন পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, দেখিয়াছি।

আমাদের আদর আপ্যায়নে শিষ্টাচার আর কিছু দূর অগ্রসর হইলেই হয় ত আমরা দেখিতে পাইব যে, সামাজিক ব্যাপারে লোক নিমন্ত্রণ

* যে হেতু অচাপল্যই শিষ্টের লক্ষণ যথা,—

"ন পাণি-পাদচপলো ন নেত্রচপলো বুধঃ।
ন চ বাগঙ্গচপল ইতি শিষ্টস্য লক্ষণম্।"

করিয়া বাড়ীতে কোনরূপ আয়োজনই করিতে হইবে না। যে ঠিকাদার খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবেন, ভাড়া লইয়া তিনিই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের বসিবার ও খাইবার স্থানও দিবেন। এক সময়ে তাঁহার প্রতি একাধিক কার্য্যের ভার থাকিলে পৃথক পৃথক ঘরের দরজায় বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকিবে "অমুকের পুত্রের উপনয়ন", বা "অমুকের কন্যার বিবাহ।" আহূত ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রণপত্র দেখাইয়া নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিবেন।

এইবার আমার দ্বিতীয় কথাটা ধরি। দ্বিতীয় কথা,—বিনয়। বিনয় শিষ্টাচারের এক প্রধান অঙ্গ, এবং ইহা সদ্গুণ,সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথমেই বলিয়াছি যে, সরলতা বিনয়ের ধার ধারে না। এ কথা স্বীকার্য্য যে, পূর্ব্বে আমাদের সমাজে সরল এবং স্পষ্টবাদী লোকের সংখ্যা অধিক ছিল। স্পষ্টবাদী হইতে হইলেই সময়ে সময়ে অবিনয়ী এবং কর্কশভাষী হইতে হয়, সুতরাং কিছুকাল পূর্ব্বেও সমাজের অনেক লোক কখনও কখনও কর্কশ বা রূঢ় ভাষা ব্যবহার করিতেন। দুই এক সময়ে তাঁহাদের মুখ দিয়া অশ্লীল ভাষাও বাহির হইত।

অধুনা আমরা এ দোষ পরিহার করিয়াছি সত্য, এখন সমাজে বিনীত লোকের অভাব নাই, অবিনীত লোকের সংখ্যাই অতি অল্প, কিন্তু আমাদের বিনয় যেন বিপরীত দিকে যাইতেছে। আমরা বিনয়ের পূজা করিতে যাইয়া সরলতাকে একবারে বিসর্জ্জন দিয়াছি। কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলি

বিনয়ের সহিত যখন সত্যের সংস্রব থাকে, তখন উহা মধুর, সন্দেহ নাই, কিন্তু বিনয় যখন সত্যের ত্রিসীমা দিয়াও যায় না, তখন উহা কেমন কদর্য্য বলিয়াই বোধ হয়। আমরা এক স্থলে বিনয়ের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছি। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ লেখক চার্লস্ ডিকেন্স্ একদিন স্বর্গীয়া মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার অনুমতি অনুসারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ডিকেন্স্ তাঁহার লিখিত সমস্ত পুস্তকের এক এক খণ্ড মহারাণীকে উপহার দেন। ভিক্টোরিয়া তাঁহার স্বরচিত জর্ন্যাল্ (Journal) নামক এক খণ্ড পুস্তক ডিকেন্স্‌কে উপহার দিয়া তদুপরে লিখিয়া দেন :—To the greatest of English authors from the humblest," অর্থাৎ, "ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থকারকে অতি সামান্য গ্রন্থকর্ত্রী কর্ত্তৃক এই উপহার প্রদত্ত হইল।" এ বিনয়ে মধুরতা আছে; কেন না, লেখক হিসাবে চার্লস্ ডিকেন্স্ রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া অপেক্ষা অনেক বড়।

দুঃখের বিষয় এই যে, আজ কাল বাঙ্গালীর শিষ্টাচারে যে বিনয় দেখিতে পাই, তাহা এ শ্রেণীর নহে। একটী উদাহরণ দিতেছি।

বঙ্গের এক জন খ্যাতিমান্ লোকের বাড়ীতে গিয়াছি। বয়স, বিদ্যা, বৈভব প্রভৃতি সকল বিষয়েই তিনি আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়। বিদায়-গ্রহণকালে তিনি শিষ্টাচারের ভাষায় অনায়াসে কহিলেন, "আমি আপনাদেরই আশ্রিত।" আশ্রিত শব্দের অর্থ তাঁহার জানা নাই, এ কথা বলিতে পারি না, কাজেই এরূপ বিনয়কে কপটতা ভিন্ন আর কি বলিব?

এমন উদাহরণ এত জানা আছে যে, তাহা লিখিতে গেলেই একটী প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপ বিনয়ের আতিশয্যে কত স্থানে কাণ ঝালা-পালা হইয়াছে, বলিতে পারি না।

ফলতঃ এখনকার বিনয়ে কেবল কপটতারই একশেষ, কিন্তু সরলতার লেশমাত্রও নাই। সুতরাং সত্যের মর্য্যাদা কিছুমাত্র রক্ষিত হয় না।

আমাদের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়াই আধুনিকসমাজের অবস্থাভিজ্ঞ, দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত, আমার এক জন শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাকে একাধিক-বার কহিয়াছেন যে, "শিষ্টাচার-সম্ভূত কৃত্রিম বিনয় এবং কাষ্ঠহাসি অপেক্ষা সরলপ্রাণের কুৎসিত ভাষা অথবা গালাগালিও মিষ্ট লাগে।" বন্ধু আরও বলেন,—আমাদের মৌখিক ভদ্রতা যেমন বাড়িয়া যাইতেছে, অন্তঃকরণও তেমনই ফাঁপা হইয়া উঠিতেছে। দেশে সরলতার আদর এতই কমিয়াছে যে, এখন আমরা শিক্ষিত অথচ সরল লোক দেখিলেই বলি, 'লোকটা লেখা-পড়া শিখেও ভারী সাদাসিদে অথবা নেহাৎ সেকেলে'।"

বিনয় সম্বন্ধে এই পর্যন্ত। এইবার দৃষ্টান্ত একটী কথা ধরিয়া আমি আমাদের সামাজিক আচরণে শিষ্টাচার দেখাইব। সে কথাটী বিবাহ। বিবাহ বাঙ্গালীর এক প্রধান সংস্কার, আর বর্ত্তমান সময়ে ইহা সমাজের এক প্রধান সমস্যার বিষয়ও হইয়া উঠিয়াছে। বলিতে কষ্ট এবং লজ্জা হয় যে, এই বিবাহ-ব্যাপারে আমরা এখন যেরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করি, তাহা কপটতার চরম সীমা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের আচরণের কথা ভাবিলে সত্য সত্যই মনে হয় যে, সরলতা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। সমাজের শতকরা নিরনব্বই জন লোকের মুখে শুনিবেন যে, বিবাহে অর্থগ্রহণ অতি গর্হিত কাজ, কিন্তু কাজের বেলায় পুত্রের বিবাহে কিছু গ্রহণ করেন না, এরূপ লোক অতি অল্পই দেখিতে পাই। অথচ শিষ্টাচার ষোল আনা।

যেখানে কিছু না বলিলেও বিলক্ষণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, সেখানে কিছুই বলা হয় না; অথবা কন্যাপক্ষ পীড়াপীড়ি করিলে বলা হয়, "তা দু'গাছি রুলি দেবেন।" কিন্তু যেখানে প্রাপ্তি-বিষয়ে সন্দেহ থাকে, অর্থাৎ কন্যাকর্ত্তার অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নহে, সেখানেই শিষ্টাচার অন্যবিধ। এরূপ স্থলে বরের বাপ কন্যার পিতাকে প্রায়ই এইরূপ ভাবের কথা বলেন যথা:—"আপনার ঘর থেকে মেয়ে আন্‌ব, এত আমার সৌভাগ্যের কথা। পাওনা থোওনা সম্বন্ধে আমার নিজের কিছুই বক্তব্য নাই, আর এ বিষয়ে বেশী কথা হয়, এও আমি ভালবাসি না। তবে ছেলের গর্ভধারিণী বলেন যে, আমাদের পাড়ার অমুকের ছেলে এত পেয়েছে, আমার ছেলের বেলায় ত তার কম হ'তেই পারে না" ইত্যাদি। অথচ "পাওনা থোওনার কথা বল্‌তেই লজ্জা হয়, তবে এখন এটা একটা প্রথা হয়েছে বলেই বল্‌তে হয় — এক একটা ছোট মানুষ করে দিতেই পারেন — তা এই বিবাহের খরচটা আমার ঘর থেকে না দিতে হয়, আর আপনার কন্যার কিছু থাকে — মেয়ে যাতে দশ জনের সামনে বেরুতে পারে তাদৃশীকে দেখবার কথা আর বেশী কি বল্‌ব?—"ইত্যাদি। ইহার পরেই পাটীগণিতের যোগ প্রকরণ!

অর্থাৎ, ভদ্রতার কিছুমাত্র ক্রটী নাই, তবে নিজের বেলায় পাঁচ কড়ায় গণ্ডা, আর পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা হয়, ইহাই কিন্তু সকলেরই অভিপ্রেত। আর সে বিষয়ে আজও বেশ টনটনে। ব্যাপার এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, যদি কোন, সঙ্গতিহীন বরকর্ত্তা পুত্রের বিবাহে উপযুক্ত মূল্য আদায় করিতে না পারেন, বা না করেন, তাহা হইলে তিনি প্রশংসিত না হইয়া বরং নির্ব্বোধ বলিয়া উপহসিত হন। তাই সে সামাজিক শিষ্টাচার!

এইবার বিবাহ সম্বন্ধে একটা ছোট কথায় আধুনিক সমাজের আচরণ দেখাইব। আজ কাল বিবাহের নিমন্ত্রণের পত্রের শেষে প্রায়ই লিখিত হয়, "লৌকিকতা-গ্রহণে অসমর্থ বিধায় ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।" ইহা কিরূপ শিষ্টাচারের ভাষা, জানি না। লৌকিকতা-গ্রহণে কেহই অসমর্থ হইতে পারেন না। অসমর্থ শব্দের অর্থ অশক্ত, বা শক্তিহীন। সুতরাং "গ্রহণে অসমর্থ" বাক্যের অপপ্রয়োগ, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে পত্রে লিখিত হইত, "পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।" এখানে নিকটে যাইয়া নিমন্ত্রণ করা হইল না বলিয়া ক্রটী স্বীকার করা হইত।

কিন্তু লৌকিকতা গ্রহণ না করায় উদারতাই প্রকাশ পায়, ইহাতে ত্রুটী কোথায়? ফলকথা এই যে, ইহা কপটতার ভাষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সত্য কথা বলিতে গেলে যাঁহারা এইরূপ লৌকিকতা-গ্রহণে অসমর্থ, তাঁহারাও উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। বলেন, "ইনি দিয়াছেন, তিনি দিয়াছেন, উহা কি ফিরাইয়া দেওয়া যায়?" কাজেই বলিতে হয়, পত্রের এ উক্তি মনকে চোখঠারা মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে লৌকিকতা-প্রদানেই অনেকে অসমর্থ, কেন না, দেশের অর্দ্ধেক ভদ্রলোক এখন অর্দ্ধাহারে দিন কাটান। অগ্রহায়ণ মাসের শেষেও যখন একটী বড় বেগুনের দাম দু' পয়সা, তখন "লৌকিকতাগ্রহণে অসমর্থ বিধায় ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন"—এরূপ উপহাসের ভাষা ভাল লাগে কি?

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা নিমন্ত্রণের পত্রে প্রথমতঃ শিষ্টাচারের এইরূপ ভণিতা দেখিয়াছিলাম, তখন আমাদের ছেলেবেলার একটী গল্প মনে পড়িয়াছিল। আমাদের গ্রামে রামচাঁদ নামে একটী নীচজাতীয় লোক বাস করিত। তাহার এতই বাক্যাড়ম্বর ছিল যে, লেখাপড়া শিখিলে সে প্রহসন লিখিতে পারিত। রামচাঁদ একদিন হাটে গিয়াছে। কৈলাস ছুতার নামে অন্য গ্রামের একটী পরিচিত লোক তাহার নিকট একটী টাকা ধার চাহিল, এবং কাকুতি-মিনতি করিয়া কহিল, "রামচাঁদ দা, একটী টাকার বড়ই দরকার, থাকে ত দাও, আমি পরের হাটেই দেব।" রামচাঁদ একটী টাকা দিল, কিন্তু পরের হাট কেন, আট দশ হাট চলিয়া গেল, রামচাঁদ কৈলাসের দেখা পাইল না। কৈলাস হাটে না আসে, এমন নহে; কিন্তু রামচাঁদের যে দিকে থাকিবার কথা, সে দিকই মাড়ায় না। সপ্তাহে দুইবার হাট, কাজেই এক মাস কাটিয়া গিয়াছে। সহসা রামচাঁদ একদিন কৈলাসের সাক্ষাৎ পাইল, সেদিন আর কৈলাস পাশ কাটাইয়া যাইতে পারে নাই। কৈলাস রামচাঁদকে দেখিয়াই কোমরের কাপড় হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া কহিল, "রামচাঁদ দা, সেই থেকে কি হাটেই তোমাকে খুঁজি, কিন্তু একদিনও দেখতে পাই না, তাতেই টাকাটা দিতে দেরি হয়ে গেছে, কিছু মনে করো না।" রামচাঁদ কহিল, "মনে আর কি করবো ভাই, তোমাকে টাকাটা দিয়ে অবধি আমিও হাটে আসি, কিন্তু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই, পাছে তোমার সঙ্গে দেখা হয়,—আর তুমি টাকাটা দিয়ে ফেল।

রামচাঁদের স্নেহের ভাষার অনুকরণে বলিতে হয় যে, আমাদের সমাজে এখন লৌকিকতা-প্রদানে সকলেই ব্যগ্র, কিন্তু উহা গ্রহণে কেহই সমর্থ নহেন, তাই পত্রে লিখিয়া পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় ;—পাছে কেহ কিছু দিয়া ফেলেন।

বস্তুতঃ যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, কেবল ইহাই দেখিতে পাই যে, আজকাল বাক্যে এবং ব্যবহারে বাহিরে খুব ভদ্রতা দেখাইতে শিখিয়াছি, বা শিখিতেছি, কিন্তু আমাদের ভিতরের সরলতা বা সহৃদয়তা ক্রমশই চাপা পড়িয়া যাইতেছে। যাহাকে তুমি বলিলে চলে, তাহাকে এখন আমরা আপনি বলি, কিন্তু আসল কাজের বেলায় অক্ষম ভাইকেও দুটী ভাত দিতে নারাজ, ইহাই এখন সামাজিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কথা ঘুরাইয়া বলিতে না পারিলে এ কালের সমাজে বাস করা চলে না, ইহাও এখন অনেকেরই ধারণা। আর বাড়াইব না। যাহা বলিয়াছি, তাহাই বোধ হয় কিঞ্চিৎ তিক্ত হইয়াছে। একটী মিষ্ট কথা বলিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিব।

অল্পদিন হইতে আমাদের এই শিষ্টাচার-প্রপীড়িত সমাজে একটু ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিয়াছে। মাঝে মাঝে শুনিতে পাই যে, দুই এক জন বিবাহিত যুবক পিতার শিষ্টাচারে সর্ব্বস্বান্ত শ্বশুরের সাহায্য করিতেছেন। আর গত অর্দ্ধোদয় যোগের সময়ে বাঙ্গালার বালকদিগের ব্যবহারে যে সহৃদয়তাময় সৌজন্যের সূত্রপাত দেখিয়াছিলাম, এবার দামোদরের বন্যায় তাহার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়াছি। বালকেরা সেবার আপনাদের গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া মহিলাদের স্নানের নিমিত্ত গঙ্গার ঘাটে আবরণ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। এবার তাহারা শিষ্টাচার-বর্জ্জিত হইয়া অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় জল সাঁতরাইয়া যাইয়া বিপন্নের সেবা করিয়াছে। ইহাতেই আশা হয় যে, আবার আমাদের সমাজে মানব-হৃদয়ের অমূল্যনিধি সরলতা ফিরিয়া আসিবে। যে সমাজে সরলতার অবতার পরমহংস দেবের ন্যায় গুরু ও স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় শিষ্য, এবং দয়ার অবতার বিদ্যাসাগরের ন্যায় মহাপ্রাণ কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হয়, সে সমাজ হইতে সরলতা একেবারে ভাসিয়া যাইবে, ইহা মনে হয় না।

শ্রীজ্ঞানেশ্বর কর।
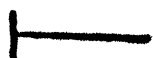
গ্রাম্য দলাদলি।

[নক্সা।]

গোবিন্দপুরে দলাদলির বিষম ঘটা। সেখানকার ব্রাহ্মণেরা ইহার পথ-প্রদর্শক। এই দলাদলির একটু ইতিহাস আছে। সেখানে রাঢ়ী, ব্যারেন্দ্র ও বৈদিক, তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস। তবে রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরাই মাতব্বর; তাঁহাদের মধ্যে জমীদার আছেন, উকীল মোক্তার আছেন, ডাক্তার আছেন, সরকারী চাকুরেও দুই চারি জন আছেন। বারেন্দ্র ও বৈদিকগণ রাঢ়ী মহাশয়দের অনেকটা আশ্রিত; কিন্তু সম্প্রতি তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য বর্দ্ধিত হইতেছে।

স্থানীয় জমীদার শুভকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কন্যাদায়' গোবিন্দ-পুরের ব্রাহ্মণসমাজে দলাদলি-সৃষ্টির প্রধান কারণ। শুভকৃষ্ণবাবু জানিয়া শুনিয়া যে কুলে কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, সেই বংশের 'পিরালী' অপবাদ আছে; অর্থাৎ, জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়ের পূর্ব্বপুরুষ নবাব-সরকারে চাকরী করিবার সময় নবাব বাহাদুরের বাবুর্চ্চিখানার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে নিষিদ্ধ কুক্কুটমাংসের ঘ্রাণ পাইয়াছিলেন; পলাণ্ডু-রঞ্জিত, পরম মুখ-রোচক কুক্কুটমাংসে তাঁহার অভিরুচি না থাকিলে, ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজনের অপরাধে তিনি সমাজে পতিত হন। তাঁহার বংশধরেরা অষ্ট পুরুষের মধ্যে আর পবিত্র হইতে পারিলেন না। এমন বংশে জানিয়া শুনিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলে জাতি যায়, ইহাই ত হিন্দু সমাজের বিধান।

সুতরাং শুভকৃষ্ণবাবু জমীদার হইলেও তাঁহার জাতি গেল। সমাজে তিনি 'একঘরে' হইয়া থাকিলেন। শব্দগত অর্থ ধরিয়া 'একঘরে' বলিলে ঠিক বলা হয় না; কারণ, একঘরে হইয়াও তিনি দলে পুষ্ট রহিলেন, তাঁহার অধিকাংশ আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। গোবিন্দপুরের ঝাড় যে-বাঁশ যেন, রাবণের বংশ! 'একলক্ষ পুত্র তার সওয়া লক্ষ নাতি' না হইলেও বংশে বাতি দিবার লোক শতাধিক।

আত্মীয় স্বজনেরা শুভকৃষ্ণকে ত্যাগ করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার নিকট জ্ঞাতি ও প্রতিবেশী জমীদার নিতাইকৃষ্ণ ভজবলের অর্থাৎ 'অপিরালী' দলের দলপতি হইলেন। তাঁহার প্রকাণ্ড বৈঠকখানার পাশায় আড্ডায় মহা-সমারোহে ঘন ঘন সামাজিক বৈঠক বসিতে লাগিল, এবং তাঁহার মুখা-পেক্ষী অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তানই তাঁহার দলে যোগদান করিলেন। কিছুদিন-

পার্লিটীর নির্বাচনের সময় আজ কাল করদাতাদিগকে 'মিষ্টমুখ' করাইতে না পারিলে কমিশনের দুর্লভ পদ লাভ করিতে পারা যায় না। স্থানীয় মিউ-নিসিপালীটির ৬ নং ওয়ার্ডের কমিশনর ও অনাহারী (যদিও তিনি 'আহার'-গ্রহণে অকুণ্ঠিত) ম্যাজিষ্ট্রেট নিতাইকৃষ্ণ তাহা জানিতেন। জানিতেন বলিয়াই তিনি তাঁহার আজ্ঞাধারিগণকে নিষিদ্ধ পক্ষি-মাংসে এবং হরিশ সাহার অমৃত-কুণ্ডস্থিত খাঁটী স্বদেশী গৌড়-রসে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে অল্পদিনেই তাঁহার দল পরিপুষ্ট হইল। তখন তিনি সদলবলে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক, ভজকৃষ্ণের জাতি মারিবেন।

ভজকৃষ্ণ বিপদ বুঝিয়া নিজের দলের দলপতির শরণ লইলেন। দলপতি মহাশয় শিক্ষিত ব্যক্তি—প্রবীণ, বিচক্ষণ এবং বিলাত-প্রবাসীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। তিনি প্রাণের টানে অকপট ভাবে 'অপিরিলী'গণের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন তাঁহার প্রবল প্রতিপত্তিতে বারেন্দ্র ও বৈদিকব্রাহ্মণেরাও তাঁহার দলে যোগদান করিলেন, ক্রমে তাঁহার দলই প্রবল হইয়া উঠিল।

ইহার ফলে দলাদলি বেশ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এক বাড়ীর মধ্যেই দুই দলের লোক। কাকা ভজকৃষ্ণের দলে, ভাইপো নিতাইকৃষ্ণের দলে বড় ভাই এক দলে, ছোট ভাই অন্য দলে। সুতরাং গৃহ-বিচ্ছেদের একটু সুবিধা হইয়া গেল, এবং কলহের দেবতাও খদিবর নারদ পুলকাবেগে তাঁহার প্রিয়বাহন ঢেঁকির উপর আরোহণ করিয়া সবেগে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তেজস্বীর পক্ষে সকল দ্বার উন্মুক্ত; পরম তেজস্বী রুদ্র-নারায়ণবাবু কলিকাতায় এটর্ণীগিরি করিয়া নানা উপায়ে কয়েক লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি পূজার সময় গোবিন্দপুরে মাতুলালয়ে আসিয়া পিরালী-দলভুক্ত মাতুলের অন্নগ্রহণ করিলেও তাঁহার দুরসম্পর্কীয় শ্বশুর 'অপিরালী'-দলভুক্ত মদনমোহন বাবুর গৃহে যোড়শোপচারে পূজা পাইয়াছিলেন। এ ব্যাপার লইয়া কোনও পক্ষই সামাজিক গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করেন নাই।

ইহাতে একটা অসুবিধা হইল। উভয় দলেরই মিলা কথা কমিয়া আসিল। যাঁহারা পিতৃশ্রাদ্ধে বা কন্যার বিবাহে স্বজাতি কুটুম্ব খাওয়াইয়া দশ টাকা অপব্যয় করিতে অনিচ্ছুক, তুচ্ছ এই অপব্যয়ের বিরুদ্ধ হইলেও

সাহিত্য।

নিন্দার ভয় করেন, তাঁহারা পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধে বা কন্যার বিবাহে কুটুম্ব-গণকে অম্লানবদনে রম্ভা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যাঁহার ভাই বা ভাইপো অন্য দলে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া তিনি কিরূপে অন্য কুটুম্বকে উৎসবে আহ্বান করিবেন? কোনও কার্য্যেই দুই দলের লোক একত্র হইবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। গোবিন্দপুরে ক্রিয়া-কর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া, যাঁহাদের পেশা কেবল 'ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ-গ্রহণ' তাঁহারা প্রমাদ গণিলেন।

বৈদিক সম্প্রদায়ের দলপতি শ্যামাচরণ বাবু ? দেখিলেন, এই সুযোগে সমাজে প্রাধান্য স্থাপন করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে এমন 'সুবর্ণ-সুযোগ' আর উপস্থিত হইবে কি না সন্দেহ। সমাজে প্রতিপত্তি স্থাপনের তাঁহার যথেষ্ট আবশ্যকতা ছিল। তাঁহার পিতা মধুপতি ভট্টাচার্য্যের নাম গোবিন্দপুরের অধিক লোক জানিত না; তাঁহার পূর্ব্বনিবাস কোথায় ছিল, তাহাও সাধারণের অজ্ঞাত। কথিত আছে, তিনি গোবিন্দপুরের পুরোহিত-শ্রেষ্ঠ বামনদাস ভট্টাচার্য্যের ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; একদা তাঁহার পৈত্রিক বাসভবন বৈশ্বানরের কুক্ষিগত হইলে তিনি পত্নীপুত্র সহ গোবিন্দপুরে আসিয়া শ্যালকের ভদ্রাসনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু 'হবির্বিনা হরির্যাতি'—এ প্রবচন তাঁহার পক্ষে খাটিল না, এমন কি, যমরাজও যখন তাঁহার সহিষ্ণুতার নিকট হার মানিল, তখন বামনদাস অগত্যা তাঁহার স্কন্ধে পৌরোহিত্যের ভার কতক কতক নিক্ষেপ করিলেন। মধুপতিও মনসার ভবে লক্ষ্মী-পূজার ব্যাপারে কমলাকে পরিতুষ্ট করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য-সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কলা, মূলা, আতপ চাউল প্রভৃতি যাহা কিছু যজমান-বাড়ী হইতে গামছায় করিয়া বাঁধিয়া আনিতেন, তাহাতেই তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার উপরি-আয়ও ছিল; কোথাও ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইলে আর রক্ষা ছিল না, তিনি এক ঘটী ও গামছা লইয়া পুত্র সহ দুই তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী পল্লীতে পদব্রজে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন। সেখানে লুচি সন্দেশ ক্ষীর দধি প্রভৃতি যত পারিতেন, আকণ্ঠ আহার করিয়া, গামছায় লুচি, ঘটীতে মিষ্টান্ন পক্বান্ন প্রভৃতি, এবং বাটীর সেখানে ক্ষীর বোঝাই করিয়া, বাড়ী ফিরিতেন। সেই লুচি সন্দেশের দৌলতে তিন দিন তাঁহার গৃহে উনান জ্বলিত না। সে সময় যজমান-বাড়ীতে নৈবেদ্যের যে আতপ চাউল পাইতেন, তাহা রৌদ্রে শুক

করিয়া গন্ধকালয়ে বিক্রয় করিতেন। গন্ধক-রমণীরা তাহা জাঁতায় পিষিয়া 'সবেদা' প্রস্তুত করিয়া 'ময়রার দোকানে বিক্রয় করিত। তাহা জিলিপি বা পক্কান্নরূপে, ব্রাহ্মণ-ভোজনে লাগিত!

যদুপতি কষ্টে-সৃষ্টে ছেলেটিকে মানুষ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শুভা-দৃষ্টক্রমে কৃতী বামনদাস ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হইলে শ্যালকের সমস্ত যজমানের পৌরোহিত্য-ভার তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল। ব্রাহ্মণেতর কয়েক ঘর যজমান পাইয়া যদুপতির আর্থিক অসচ্ছলতা দূর হইল। তিনি স্থির করিলেন, তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণকে 'নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি'খানা (তখন 'পুরোহিত-দর্পণ' প্রভৃতি প্রকাশের ফন্দী শাস্ত্রগ্রন্থ-ব্যবসায়িগণের মস্তিষ্কে আবির্ভূত হয় নাই) মুখস্থ করাইয়া পৌরোহিত্যের 'এপ্রেণ্টিস' করাইবেন। কিন্তু গোবিন্দপুরের স্বনাম-ধন্য উকীল ও কায়স্থ-জমীদার রামচরণ মিত্র তাঁহার অভিপ্রায় শুনিয়া বলিলেন, "বুঝেছ খুড়ো, তুমি ত যজমানের চাল কলাতেই সংসার চালিয়ে গেলে, কিন্তু ক্রমে ক্রিয়াকর্ম্মে লোকের যে রকম আস্থা কমছে, তাতে দশ বছর পরে আর চাল কলায় পেট ভরবে না। ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান, ওকে ইংরেজী শিখাও।"

যদুপতি উভয় চক্ষু কপালে তুলিয়া শিখা আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, "ইংরাজী পড়াতে যে বল হে, সেটা মাও ধরবে কে?—ওর কেতাব কেনবার খরচ, ইস্কুলের মাইনে, এ সকল কে দেবে? ইংরেজী পড়ান কি মুখের কথা?"

উকীল জমীদার রামচরণবাবু সহাস্যে বলিলেন, "তার জন্যে আর ভাবনা কি? ওর লেখা পড়ার জন্যে যা কিছু খরচ হবে—তা না হয় আমিই দেব। ব্রাহ্মণের ছেলের জন্যে বছরে দশ বিশ টাকা খরচ করলে, সে টাকা আমার জলে পড়বে না।"

রামচরণবাবু ব্রাহ্মণ-সেবাকে পুণ্যকর্ম্ম ক্রিয়াশালী নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। বিশেষতঃ নন্দকুমারের মত যে প্রতিবেশীদের জন্য কাঠ কাটিতে যাইবে, দুর্জ্জন প্রতিবেশীরা তাহাকেই বনবাসে দিয়া আসিবে, এই নীতি কথার উপরেও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না।

তখনও পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের আইন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পল্লীবিদ্যালয়ের মাষ্টার পণ্ডিতদের অনেকটা স্বাধীনতা ছিল। যদিও একালের মত সেকালেও স্কুলের শিক্ষকগণকে মধ্যে মধ্যে স্কুলের সম্পাদকের খোসামোদ করিতে হইত, এবং সম্পাদক মহাশয়ের ঘরে

সুর মিলাইয়া বলা উঁচু না। বলিলে চাকুরী বজায় রাখা দুষ্কর হইত, তথাপি একালের মত শিক্ষাবিভাগে বড় কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া জেলার স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টার পর্য্যন্ত ছয় লক্ষ ছত্রিশ হাজার মনিব তাঁহাদের অদৃষ্ট লইয়া খেলা করিত না, এবং স্কুলে ছেলেদের কোন-মুখো করিয়া বসাইতে হইবে,—তৎসম্বন্ধে আদেশলাভের জন্য ঊর্দ্ধমুখ চাতকের মত তাঁহাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইত না। আর দশ বৎসরের ছেলেকেও অসংখ্য পুস্তকের চাপে কুব্জ হইতে হইত না। দশ বৎসরের ছেলের জন্য আজ কাল ছয় টাকার পুস্তক লাগিতেছে। কোনও কোনও বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিশু-পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া জমীদারী কিনিতেছেন। তখন কিন্তু সেরূপ ছিলনা; তখন একখানা রয়াল রীডার, লোহারামের ব্যাকরণ, বিদ্যাসাগরের আখ্যানমঞ্জরী, আর তারিণীচরণের ভূগোলেই ছেলেরা কালে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বা প্রফুল্লচন্দ্র রায় হইতে পারিয়াছেন।

রামচরণবাবুর সাহায্যে শ্যামাচরণের লেখাপড়া চলিতে লাগিল। শ্যামাচরণ শৈশবাবধি বড় লাজুক, কাজ নিতান্ত না হইলে নয়—তাহাই সে তাঁহার নিকট গ্রহণ করিত। একখানি পাটীগণিত হইলে অঙ্ক কসিবার সুবিধা হয়,—কিন্তু সে স্কুলের নবীনের পাটীগণিত দেখিয়া অঙ্ক কসিত; খাতা বাঁধিয়া অন্যের অভিধান দেখিয়া বাঙ্গালা ও ইংরাজী কথার অর্থ লিখিত, দেশী মোটা কাগজে '[illegible]' লিখিত। চাদরের নীচে যাহার জামা জুটিত, এরূপ ভাগ্যবান ছাত্র তখন স্কুলে অতি অল্পই ছিল। ছেলেদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ পূজার সময় একজোড়া মোজা পাইত, উৎসবকাল ভিন্ন তাহা তাহারা ব্যবহার করিত না, পাছে ছিঁড়িয়া বা বিবর্ণ হইয়া যায়! ফরাসী ছিটের 'দোলাই'য়ের পরিবর্ত্তে যে পশমী 'র‍্যাপার' গায়ে দিতে পারিত, অন্যান্য ছেলেরা তাহার দিকে বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া থাকিত।—শ্যামাচরণ প্রতিদিন সন্ধ্যার পর একটি ভাঙ্গা লণ্ঠন হাতে লইয়া আধক্রোশ দূরবর্ত্তী রসিকমাষ্টারের বাড়ী গিয়া পড়া 'বলিয়া' লইয়া আসিত। আর একালে শ্যামাচরণের দুই ছেলের দু জন মাষ্টার, এক জন বাঙ্গালা, এক জন ইংরেজী শিখান, দুই ভায়ের দুইখানি পাটীগণিত, আর উভয়ের গায়ে চমৎকার শাল! এক ঘণ্টা কাল মোজা ছাড়িলে তাহাদের সর্দ্দি লাগে! লুচি মোহনভোগ ভিন্ন তাহাদের 'টিফিন' হয় না, এবং শীতের রাত্রে দৈবাৎ খোকাবাবুর শয়নকক্ষে খড়খড়ী বন্ধ করিয়া রাখি

বন্ধ করিতে ভুল হইলে ঠাণ্ডায় তাহাদের মাথা ধরে! শ্যামাচরণ কিন্তু বাল্যকালে খড়ের ঘরের বারান্দায় ময়লা কাঁথা মুড়ি দিয়া মাঘমাসের রাত্রি কাটাইয়াছে, তাহাতে তাহার কখনও 'নিউমোনিয়া' জ্বরের কথা, সর্দ্দি কাশিও হয় নাই।

শ্যামাচরণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই গ্রামের এণ্ট্রেন্স-স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, কিন্তু বৃত্তি পাইল না। তাহার ন্যায় দরিদ্রের পক্ষে অতঃপর বিদ্যাভ্যাস করা একান্ত অসম্ভব, কিন্তু উকীল রামচরণবাবুর অনুগ্রহে তাহার পাঠ বন্ধ হইল না। রামচরণবাবু কাশিমবাজার রাজসংসারের উকীল ছিলেন, তিনি সুপারিশপত্র দিয়া শ্যামাচরণকে বহরমপুরে পাঠাইলেন, এবং স্বয়ং তাহার পাঠ্যপুস্তকগুলি কিনিয়া দিলেন। শ্যামাচরণ প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর কৃপায় বিনাবেতনে বহরমপুর কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিল। বোর্ডিংএও তাহাকে কিছু দিতে হইত না। শ্যামাচরণ ক্রমে এফ্-এ, বি-এ, এবং বি-এল্, পরীক্ষা পাস করিয়া গ্রামে আসিয়া বসিলেন, রামচরণবাবু তখন পর্য্যন্ত তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বিরত হইলেন না। তিনি তাঁহাকে নিজের 'জুনিয়ার' করিয়া লইয়া ওকালতী শিখাইলেন। তাঁহার চেষ্টায় অল্পদিনেই শ্যামাচরণের পসার জমিয়া গেল। শ্যামাচরণ ওকালতী করিতে করিতে একটি চাকরীও জুটাইয়া লইলেন। স্থানীয় বিধবা জমীদার নৃত্যকালী চৌধুরাণীর ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু উকীলেরা গবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে চাকরী করিতে পারেন না, সেই জন্য বাহিরে প্রকাশ থাকিল, তিনি নৃত্যকালী চৌধুরাণীর ষ্টেটের 'লিগাল এড্ভাইসার', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই ম্যানেজার, রীতিমত বেতনভোগী ম্যানেজার।

স্ত্রীলোকের সংসারে ম্যানেজারী করিয়া কিছুদিনের মধ্যে শ্যামাচরণের 'আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ' হইল। শ্যামাচরণ দেওয়ানী আদালতের বন্ধের মধ্যে জমীদারী-পরিদর্শনে যাইতেন। একবার জমীদারী ঘুরিয়া আসিয়াই তিনি দুই শত টাকা মূল্যের এক জোড়া কাশ্মীরী শাল কিনিয়া ফেলিলেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ের কমিটীর মেম্বর ও মিউনিসিপালিটীর 'কমিশনার' হইলেন। অল্পদিনেই শ্যামাচরণ মাতুলের খড়ের ঘর ভাঙ্গিয়া সেখানে প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা বাঁধিয়া বসিলেন। একদিন রামচরণবাবুর এক জন কর্ম্মচারী জমীদার নৃত্যকালী চৌধুরাণীর সেরেস্তায় কয়েক দিন [illegible] '[illegible]' করিয়া

লইবার জন্ত শ্যামাচরণকে ধরিয়া বসিল। শ্যামাচরণ যে রামচরণের অন্নে প্রতিপালিত, তাহার এক জন কর্ম্মচারীর কিঞ্চিৎ উপকার তিনি নিঃস্বার্থভাবেই করিবেন, সকলে এইরূপ আশা করিয়াছিল। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে পূর্ব্ব-কথা ভুলিয়া যায়। রামচরণবাবুর কর্ম্মচারী জমীদারের নজর ৫০৲ টাকা এবং ম্যানেজারের নজর ২৫৲ টাকা দিতে বাধ্য হইল। বিধবার জমীদারীতে ম্যানেজারের উপার্জ্জন এইরূপ।

এই সময় গোবিন্দপুরে সামাজিক দলাদলির 'মরসুম' পড়িয়া গেল। শ্যামাচরণ এক দলের দলপতি হইবার জন্ত চেষ্টাযত্নের ত্রুটী করিলেন না। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। ইতিমধ্যে শ্যামাচরণের অন্নদাতা ও পৃষ্ঠপোষক রামচরণবাবুর হঠাৎ মৃত্যু হইল। শ্যামাচরণ কর্ত্তব্যানুরোধে রামচরণবাবুর পুত্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্ত তাঁহার গৃহে আসিলেন। রামচরণবাবুর পুত্র হরিচরণবাবু বলিলেন, "শ্যামাচরণ! বাবার অনুগ্রহেই তুমি আজ মানুষ। গ্রামে আজ কাল সামাজিক দলাদলি বড়ই প্রবল; শ্রাদ্ধটা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, আমার বাড়ীতে যাহাতে সব দলে মিলিয়া মিশিয়া ফলার করে—তুমি তাহার ব্যবস্থা কর।"

শ্যামাচরণ অত্যন্ত মোলায়েম ভাবে বলিলেন, "তা তো বটেই, তা তো বটেই। আমার যাহা সাধ্য, তা অবশ্যই করিব। তুমি এক কাজ কর। ব্রাহ্মণের সামাজিক দলাদলির মধ্যে তোমার মাথা দিবার দরকার নাই; তুমি 'পিরালী' 'অপিরালী'—সকলকে একধার হইতে নিমন্ত্রণ কর, যাহাদের ইচ্ছা হয়, আসিবে; যাহাদের আপত্তি থাকে, আসিবে না; তুমি এক দলকে বাদ দিয়া অন্ত দলকে বলিয়া কেন দোষের ভাগী হইবে?"

উপদেশটি প্রথম দৃষ্টিতে অত্যন্ত সরল, কিন্তু ইহার মধ্যে যে বৈষয়িকী চা'ল ছিল, কূটবুদ্ধি জমীদার হরিচরণবাবুর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন, "তুমি ত বেশ পরামর্শ দিলে! কিন্তু আমি জানি, দুই দলে একত্র বসিয়া কোথাও খায় না; এ অবস্থায় আমি দুই দলকে একত্র আহারের জন্ত কিরূপে অনুরোধ করিব? আর তাহারা সে অনুরোধ রক্ষা করিবে, এ আশাই বা কিরূপে করি? শেষে কি সমস্ত কাজ পণ্ড করিব?"

শ্যামাচরণ সোৎসাহে বলিলেন, "সে জন্ত তোমার কোনও চিন্তা নাই, আমি সব ঠিক করিয়া লইব, কিন্তু গ্রাম শুদ্ধ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করা চাই। যে কয় ঘর

লইয়া দুপুর রৌদ্রে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গিয়া শ্রাদ্ধের দিন কলার মারিয়া আসিয়াছিলেন, আর এক ঝুড়ি লুচি ঘাড়ে করিয়া বাড়ী আনিয়াছিলেন; আজ তুমি উকীল হইয়া সে কথা ভুলিয়া গিয়াছ। কিন্তু তিনি শাস্ত্র-নিপুণ শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি যাহাতে আপত্তি করেন নাই, তুমি তাহাতে আপত্তি করিতেছ কেন? বিশেষতঃ রামচরণবাবু তোমার পরম হিতৈষী ছিলেন,—তাঁহার অনুগ্রহেই তোমার এতটা উন্নতি; আজ এ ভাবে তাঁহার শ্রাদ্ধ পণ্ড করা কি তোমার উচিত?"

উচিত জবাব শুনিলে অনেকেই চটে। মুখের মত জবাব শুনিয়া শ্যামাচরণও চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কর্ত্তারা কি করিয়াছেন না করিয়াছেন, তাহা আমাদের দেখিবার দরকার নাই। সে এক কাল ছিল, এখন আর এক রকম সময় পড়িয়াছে। এ কালে সকলেই স্ব স্ব সমাজের উন্নতি করিতেছে। আমরাও সমাজের সংস্কার করিব, উন্নতি করিব। আপনি কি জানেন না—সেকালে কোথাও কলারের নিমন্ত্রণ হইলে কুটুম্বকে অপদস্থ করিবার জন্য আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা বাড়ী ছাড়িয়া বাগানে গিয়া গাছের উপর বসিয়া থাকিতেন; সহজে গাছ হইতে নামিতে চাহিতেন না?"

নীলকমল বলিলেন, "হঁ, সে কথা সত্য; [illegible] তুমিও কি হরিচরণবাবুর ব্যাপার পণ্ড করিবার জন্য গাছের ডালে উঠিয়া বসিয়া থাকিবে? কিন্তু হরিচরণ বড় শক্ত ছেলে, সে যদি মুসলমান [illegible] দেখাইয়া তোমাকে গাছ হইতে নামাইবার চেষ্টা না করে, তখন কি করিবে? আমি বলি কি, এ সব 'পাটোয়ারী বুদ্ধি' এখন রাখিয়া দাও। [illegible] সমাজসংস্কার করিতে হয়, কুপ্রথা রহিত করিতে হয়, সদ্ভাবে করিও; রামচরণবাবুর শ্রাদ্ধে তোমরা এ রকম জোট করিয়া শ্রাদ্ধ-পণ্ড করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়, এমন নিমকহারামী করিও না।"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "রামচরণবাবু কোন দিন যদি আমার কোনও উপকার করিয়াই থাকেন, তাহাতে আমার সমাজের কি?—সে জন্য ত আমাদের সামাজিক কুপ্রথার প্রশ্রয় দিতে পারি না। [illegible] না, এ সুযোগ ত্যাগ করা হইবে না। কাল যদি আমরা রামচরণবাবুর শ্রাদ্ধ পণ্ড না করি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর কেহ আমাদিগকে শ্রাদ্ধের দিন নিমন্ত্রণ করিতে সাহস করিবে না। এই উপলক্ষে একটা প্রকাণ্ড কুপ্রথা রহিত হইবে।"

নীলকমল বলিলেন, "শুনিয়াছি, শ্রাদ্ধবাড়ীতে মোটা রকম দক্ষিণার ব্যবস্থা আছে। তোমার পিতা জীবিত থাকিলে তিনি এ সুযোগ ত্যাগ করি

তেন না, কিন্তু তুমি জমীদারের ম্যানেজার হইয়া সমাজের মুকুটমণি হইয়াছ, পিতৃতুল্য চিরহিতৈষী মুরুব্বীর শ্রাদ্ধে সামাজিক কুপ্রথা তুলিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ; সাধু, বেঁচে থাকো বাবা! তোমা হইতে এই হইল যে, ভবিষ্যতে আর কেহ কাহারও উপকার করিবে না। কোনও নিরাশ্রয় দরিদ্রের ছেলেকে স্কুলের বেতন দিয়া, কেতাব কিনিয়া দিয়া সাহায্য করিবে না। মনে করিবে, দুধ কলা দিয়া কালসাপ পুষিয়া ফল কি? বিষদাঁত গজাইলেই 'ছোঁ' মারিবে।—তা তোমারছোবলে বাবু! রামচরণের শ্রাদ্ধ বন্ধ থাকিবে না, মধ্য হইতে কেবল নিজের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিবে!"

শ্যামাচরণ ক্ষাপা হইয়া বলিলেন, "কি! আপনি আমার বাড়ীতে বসিয়া আমার অপমান করিয়া যান! আপনি বুঝি টাকাটা সিকেটে ঘুসের লোভে রামচরণবাবুর শ্রাদ্ধে ফলার করিবেন, ঠিক করিয়াছেন? যদি তাহা করেন, তবে আমার বাড়ীতে আগামী পূজায় দুর্গোৎসবে আপনার নিমন্ত্রণ বন্ধ!"

নীলকমল বলিলেন, "জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস! প্রজাদের গালে চড় মেরে, আর নিরীহ মক্কেল ভুলিয়ে দশ টাকা উপায় কর; বৎসরান্তে একবার মহামায়াকে ভিটেয় তুলে মনে কর, সমাজের কর্ত্তা হয়েছ! যা খুসী করবে! তা তোমার নিমন্ত্রণে খুব বাহাদুরী আছে, তুমি এক বাড়ীর মধ্যে দাদাকে বাদ রেখে ভাইকে পূজায় নিমন্ত্রণ কর! দাও ত খেতে খিচুড়ী প্রসাদ! সে মহাপ্রসাদের নিন্দা করতে চাইনে, থাকুন তিনি মাথায়, কিন্তু আমাকে তাতে বঞ্চিত ক'রে যদি তাদের কর্ত্তা হ'তে পার, ত সেই চেষ্টা, মন্দ কি? রামচরণের বাড়ী নিমন্ত্রণের কথা কি বল্‌চ? আমি তাঁর অন্নে মানুষ, তোমার মত কৃতঘ্ন হইনি যে, তাঁর উপকার ভুলে যাব। ভোজনদক্ষিণার লোভে যারা যায়, তারা যাবে। আর দক্ষিণা লওয়াটা এমন দোষেরই বা কি? শূদ্রবাড়ী ফলার ক'রে চিরকাল আমার বাপ দাদারা ভোজন-দক্ষিণা নিয়ে এসেছেন! তুমিই না হয় দক্ষিণার নাম বদ্‌লে আজ 'ফি' বোল্‌চো। বেটা সতা মুচী যেদিন মাণিকচাঁদের গরুকে বিষ খাইয়ে ফৌজদারীতে পড়ে, সে দিন তুমি তার কাছে পাঁচ টাকা 'ফি' নিয়ে তাকে খালাস করে আননি? মুচী বেটা জলজ্যান্ত তিন সের দুধের গরুটাকে বিষ খাইয়ে মারলে, আর তুমি ব্রাহ্মণ হ'য়ে প্রমাণ ক'রে এলে—সে গো-হত্যা করেনি! এরকম 'ফি'র চেয়ে আমাদের ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণা লক্ষগুণে মানের জিনিস।"

নীলকমল সক্রোধে প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণ-দলপতিগণের নিষেধবাক্য-প্রচারে অনেকেই হতাশ হইলেন। দলপতিরা ভরসা দিলেন, তাঁহাদের একতার ফলে কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহাদের আদেশ শুনিতে বাধ্য হইবেন, শ্রাদ্ধের পরদিন ব্রাহ্মণ-ভোজন হইবে।

কিন্তু রামচরণবাবুর ভ্রাতা হরিচরণ দমিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন, "শ্রাদ্ধের দিন চিরকাল ব্রাহ্মণ-ভোজন হইয়াছে, এবারও তাহাই হইবে। যে রীতি পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিয়াছে, আজ ব্যক্তিবিশেষের 'খেয়ালে' তাহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। জোর করিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া কাহাকেও খাওয়ান যায় না। যাঁহারা না খাইবেন, তাঁহাদের পায়ে মাথা কুটিয়া লাভ কি? কিন্তু এই ব্যাপারে কে বন্ধু, কে শত্রু, চিনিতে পারিলাম। কপট বন্ধুদের চিনিয়া লাভ আছে।"

দলপতিরা আসিয়া হরিচরণকে বলিলেন, "কত চেষ্টা চরিত্র করিলাম, কোনও ফল হইল না। শ্রাদ্ধের পরদিন ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন কর।"

হরিচরণ বলিলেন, "আমি ত বন্ধু বান্ধবকে প্রীতিভোজন দিতে বসি নাই। শ্রাদ্ধের যেরূপ দস্তর, সেই ভাবেই কাজ হইবে। আমি বলিলাম, 'আপনি কাল আমার বাড়ী খাইবেন' আপনি বলিলেন, 'দশদিন পরে খাইব,' আমার সুবিধা অসুবিধা দেখিবেন না। এ সেই গল্পের ইংরাজ উপর ওয়ালার অপেক্ষাও যথেচ্ছাচার। কেরাণী বলিল, 'হুজুর কাল বাপের শ্রাদ্ধ, ছুটী চাই'। হুজুর অম্লানবদনে বলিলেন, 'শ্রাদ্ধ মুলতুবী রাখ, রবিবারে শ্রাদ্ধ করিও'। আপনাদের হুকুমও অনেকটা সেই রকম।"

এক জন দলপতি চটিয়া বলিলেন, "তবে কর শ্রাদ্ধ। এক জন ব্রাহ্মণও কাল তোমার বাড়ী খাইবে না। রামচরণ দাদা আমার পরম বন্ধু ছিলেন, আর তোমরা সে দিনের ছেলে, আমাদের খাতির রাখিতে চাও না।"

হরিচরণ বলিলেন, "আপনারা নিজে খাতির হারাইলে, আমরা আর কি করি? আপনারা চাহেন সমাজের চূড়ায় বসিয়া থাকিতে, অথচ সমাজ-শাসনের শক্তি আপনাদের নাই। সমাজ যে পথে লইয়া যাইবে, পাছে চূড়া হইতে নামিয়া পড়িতে হয়, সেই ভয়ে আপনারা সমাজের সঙ্গে সঙ্গে চলেন। সমাজের দশ জন বুঝিয়াছে—আপনাদের মতের স্বাধীনতা নাই।"

দলপতি বলিলেন, "যাহাতে দশ জন খুসী হয়, তাহাই কর। শ্রাদ্ধের পরদিন ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন কর। ইহাতে অপমান নাই।"

কি কথা বলিতেছ? আমি যে ব্রাহ্মণদের আশা দিয়া রাখিয়াছি, কাল এখানে তাঁহাদের পাতা পড়িবে।"

হরিচরণ বলিলেন, "আমার দুর্ভাগ্য! সকলের পাতা পড়িল না, কিন্তু আমাদের এই দায়ে যাঁহারা দয়া করিয়া আজ পাতা পাড়িয়াছেন, তাঁহাদের ত অপমান করিতে পারি না।—কাল তাঁহাদের বাদ দিতে পারিব না, আবার এতই লোককে দুই দিন খাওয়াই, ভোজন-দক্ষিণা দিই, এরূপ সাধ্যই বা আমার কোথায়?"

দলপতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে বিষম সঙ্কটে ফেলিলে!"

হরিচরণ বলিলেন, "সঙ্কটটা ত আপনাদেরই সৃষ্টি! আপনারা কয়েক জন মুরুব্বী চেষ্টা করিলে আজ সকলেই এখানে খাইতেন, কিন্তু আপনারা কি আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিলেন?—আমি যাহাতে বিব্রত হই, আপনাদের চেষ্টার ফলে তাহাই ঘটিয়াছিল।—আর ব্রাহ্মণ-ফলার হইবে না।"

দলপতিরা স্বস্থানে পরামর্শ করিতে বসিলেন।

সমস্ত লোকেরা বলিল, "পরামর্শই করুন, আর যাহাই করুন, আমাদিগকে একদিন লুচির ফলার দিতেই হইতেছে, নতুবা আপনাদিগকে দলপতিত্ব হইতে খারিজ করিব।"

দলপতিরা বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। শেষে ভগবান অকূলে কূল দিলেন।

শ্যামাচরণ যে জমীদারের ম্যানেজার, সেই জমীদারের সদর-আমীনের কন্যার বিবাহ উপস্থিত।

আমিনী করিয়া রামকান্ত চৌধুরী কোনও রকমে সংসার প্রতিপালন করে। তাহার অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহটি দিয়া, কোনও রকমে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইবে, ইহাই তাহার ইচ্ছা ছিল; আজ কাল ভাল ঘরে কন্যার বিবাহ দেওয়াই কঠিন, বহুব্যয়সাধ্য; তাহার উপর দুই চারি শত লোককে লুচির ফলার দিয়া পরিতুষ্ট করা, রামকান্ত কেন, অনেকেরই অসাধ্য।

কিন্তু ম্যানেজার শ্যামাচরণ অন্যান্য দলপতির পরামর্শে পরোয়ানা জারি করিলেন,—"যেহেতু গ্রামস্থ ব্রাহ্মণদের বড়ই আগ্রহ হইয়াছে—তোমার বাড়ীতে তাঁহাদের পাতা পড়ে, অতএব তোমাকে আদেশ করা যাইতেছে, তুমি তোমার কন্যার বিবাহে গ্রামস্থ সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে।

ইহাতে যে ব্যয় হইবে, তাহার কিয়দংশ জমীদারীর প্রজার নিকট ভিক্ষা আদায় করিয়া দেওয়া যাইবে।"

রামকান্ত অতিবিস্তীর্ণ ফলারের আয়োজন করিল। গ্রামস্থ সকল ব্রাহ্মণ ফলারে নিমন্ত্রণলাভ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন ও দলপতিদের মুন্সীয়ানার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শ্যামাচরণ উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "কেমন? ফলার পাইলে ত?"

যাহারা রামচরণবাবুর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয় নাই, তাহারা বলিল, "আমরা একদিন ফলার পাইলাম, আর উহারা দুই দিন খাইবে?—তাহা হইবে না। নিমন্ত্রণে উহাদের বাদ দাও।"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তোমরা যদি না খাও তবে এ ফলারও হাতছাড়া হইবে, তখন আমি আর ফলারের জন্য দায়ী হইব না।"

দলের লোকেরা বলিল, "যাহারা শ্রাদ্ধে ফলার করিয়াছে—তাহারা আসিয়া দোষ স্বীকার করুক! তবে তাহাদের লইয়া খাইব।"

যাঁহারা শ্রাদ্ধে খাইয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "আমরা কোনও দোষ করি নাই, দোষ স্বীকার কেন করিব? নিমন্ত্রণ হইয়াছে—খাইতে যাইব। যাঁহারা না যান, তাঁহারা উঠিয়া যাইবেন।"

দলপতি শ্যামাচরণ বলিলেন, "হটাইয়া দাও, উহারা নাকে খত দিয়াছে; লোকে জানিলেই হইল।"

'নাকে খতে'র কথা মধ্যাহ্নকালে সমস্ত পল্লীতে রাষ্ট্র হইল।

প্যারীলাল সতীশ চক্রবর্তীকে বলিল, "শ্রাদ্ধের বাড়ী খেয়ে নাক খত দিয়ে আজ বিয়ের বাড়ী খেতে যাচ্ছ! পেটটা কিছুতেই ভরে না?"

সতীশ বলিল, "নাকে খত কেন দেব? যখন আমার মা মরেন, তখন কেহ দেখে নাই; আমিও আমার স্ত্রী তাঁহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়াছিলাম; আমার স্ত্রী মরিলে, আমি ও আমার ছোট ভাই, এই দুই জন মাত্র মিলিয়া তাঁহার সৎকার করি। বিপদের সময় যাহারা দেখে না, ফলারের সময় তাহারা জাতি মারিতে আসে? লজ্জা করে না?"

সুতরাং বলা বাহুল্য, সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রামকান্তের কন্যার বিবাহে ফলার করিতে চলিলেন। দলপতিগণের আর উৎসাহের সীমা নাই। বিবাহের মজলিসে গিয়া কেহ, কেহ ঘন ঘন তামাক টানিতেছেন, কেহ সোৎসাহে

বলিতেছেন, "ধন্য রামকান্ত, বেটা আমীরী ক'রে আজ জমীদার রামচরণ বাবুর শ্রাদ্ধের উপর 'টেক্কা' দিলে!"

রামকান্তের শ্যালক সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, "এটা রামকান্তের মেয়ের বিবাহ, কি রামকান্তের নিজের শ্রাদ্ধ, তা ঠিক বুঝতে পারচি নে! 'মোর বুদ্ধি, তোর কড়ি, ফলারে করি আয়!' ঠিক তাই হয়েছে,—আপনাদের বুদ্ধিতে ফলার জুগিয়ে বেচারা সর্ব্বস্বান্ত না হয়!"

ফলারের পাতা পড়িয়াছে। কড়ার উপর ঘি কল্-কল্ করিতেছে; শুভ্র লুচিগুলি কাঁচবাকে তাহার উপর ভাসিতেছে। যেমন ব্রাহ্মণগণ ভোজনে বসিবেন, অমনই তাহা 'খোলা' হইতে তুলিয়া তুলিয়া তাঁহাদের পরিবেশন করা হইবে। কিন্তু 'গরম লুচি' ভগবান তাঁহাদের ভাগ্যে লেখেন নাই। একজন বৈদিক-শ্রেষ্ঠ প্রস্তাব করিলেন, "ওখানে যাহারা খাইয়াছে, তাহারা লুকাইয়া রামচরণবাবুর কাছে পাপ স্বীকার করিলে চলিবে না; আজ এই দলের সম্মুখে তাহাদিগকে 'নাকে খত' দিতে হইবে।"

অন্য দল চটিয়া বলিল, 'নাকে খত'! এত বড় স্পর্দ্ধার কথা মুখে আনো? নীলকমল! দেখ ত উহার কাণ্ড।"

বিবাহের বাড়ী দুই দলে দাঙ্গাবাজি হইবার উপক্রম; পুলিস-ইনস্পেক্টার শান্তিরামবাবু তিন জন কনেষ্টবলকে থানা হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

কিন্তু কনেষ্টবল আসিবার পূর্ব্বেই বিবাদ থামিয়া গেল। লুচি জল হইয়া যাইতেছে শুনিয়া উভয় পক্ষ শান্তভাবাপন্ন হইলেন, এবং বিভিন্ন দল স্বতন্ত্র কক্ষে ভোজন করিতে বসিলেন। তখন রাত্রি প্রভাত-প্রায়।

আহারান্তে আচমনপূর্ব্বক উদরে করতল ঘর্ষণ করিতে করিতে ভোক্তৃগণ সমস্বরে বলিলেন, "জয়, লুচির জয়!"—সেদিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত দলপতিদের সুনিদ্রা হইয়াছিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

দেশব্রত হরিশ্চন্দ্র।

কিছুকাল হইল, আমরা বিগত যুগের শিক্ষিত বঙ্গসমাজের অন্যতম নেতা, সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও সুলেখক, 'ইণ্ডিয়ান্ মীরারে'র সম্পাদক স্বর্গীয় কিশোরী-

চাঁদ মিত্রের জীবনচরিতের উপকরণাদি সংগ্রহ করিতেছি। সম্প্রতি এই মহাত্মার কয়েক বৎসরের 'ডায়েরী' আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এই রোজনামচা হইতে তৎকালীন সমাজের একটী অবিকল ছায়াচিত্র পাওয়া যায়, এবং তৎকালীন প্রসিদ্ধ দেশনায়কগণের জীবনের অনেক কথা অবগত হইতে পারা যায়। একদিন প্রসঙ্গক্রমে পরমশ্রদ্ধাস্পদ 'সাহিত্য' সম্পাদক মহাশয় আমাকে এই রোজনামচা অবলম্বন করিয়া কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিতে আদেশ করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদক দেশব্রত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিশোরীচাঁদের অন্যতম অকৃত্রিম ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কিশোরীচাঁদের রোজনামচায় হরিশ্চন্দ্রের কথা বহু স্থানে লিপিবদ্ধ আছে। হরিশ্চন্দ্রের শেষ পীড়ার কথা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে দিবসের রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করিয়া, তাঁহার অসাধারণ চরিত্রগুণ সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ কয়েকটী কথা লিখিয়াছেন। এই মন্তব্যগুলি পরে বিশদাকারে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন দিবসের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রিকায় হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুবিষয়ক প্রবন্ধে প্রকাশিত করেন। নিম্নে সেই প্রবন্ধটীর অবিকল অনুবাদ প্রদত্ত হইল। সংবাদপত্রের স্তম্ভে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা অনেক সময়েই মাসিক-পত্রে প্রকাশ করা শোভন নহে। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণগুলির পর্যালোচনা করিলে এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম, দোষ হয়, অসঙ্গত বোধ হইবে না :—

(১) অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক পূর্ব্বের দেশীয় সংবাদপত্রাদি এতদ্দেশের শ্রেষ্ঠতম পুস্তকালয়েও দুষ্প্রাপ্য। আমাদিগের দেশে রোজনামচা রক্ষা করিবার প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না।

(২) যে অসাধারণ বাঙ্গালী ছয় বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে নূতন ভাবের ও নূতন শক্তির সঞ্চার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাঁহার উল্লেখযোগ্য জীবনচরিতের অভাব এখনও বাঙ্গালীর কলঙ্কস্বরূপ। যদি ভবিষ্যতে কেহ এই কলঙ্কমোচনে অগ্রসর হয়েন, এবং তিনি যদি এই প্রবন্ধ হইতে কোনও প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে, এই প্রবন্ধের অনুবাদ-প্রকাশ বিফল হইবে না।

---

* যদি 'সাহিত্যের' কোনও পাঠক স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনের কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা অবগত থাকেন, তাহা হইলে ১০, শ্যামবাজার স্ট্রীটে অনুবাদককে জানাইলে তিনি অনুগৃহীত হইবেন।

(৩) এই প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রের নূতন উপকরণাদি না থাকিলেও, তাঁহার সমসাময়িক অন্যতম দেশ-নায়ক ও সহচরের মানসপটে তাঁহার জীবন ও চরিত্র কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা আধুনিক পাঠকের পক্ষে কৌতূহলপ্রদ হওয়া সম্ভব।—অনুবাদক।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু,—যে শোকাবহ ঘটনা বিগত শুক্রবার ১৪ই জুন দিবসে সংঘটিত হইয়াছে,—তাঁহার দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক যথার্থই একটি জাতীয় শোকের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের মনে তাঁহার নাম দেশপ্রাণতার সহিত বিজড়িত, এবং অধিকাংশ ব্যক্তিরই মনে জন-সাধারণের, এবং তাঁহাদিগের স্বাভাবিক নেতা জমীদারগণের, উন্নতি-কল্পে আত্মোৎসর্গের সহিত সংশ্লিষ্ট।

হরিশ্চন্দ্রের নামে, আমাদিগের মনে কোনও ভারতীয় ঋষির কথা উদিত হয় না। যিনি রামমোহন রায়ের ন্যায় দেশে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নব-জীবনের প্রতিষ্ঠা-কল্পে প্রযত্ন করিয়াছিলেন; মনে হয়, সেই সর্ব্বপ্রকার অন্যায় ও অত্যাচারের পরম শত্রুর বিষয়, নীলকরগণের নিষ্ঠুর অত্যাচার, অনধিকার-চর্চ্চার অসংযত উপদ্রব, এবং রাজকর্ম্মচারিগণের অন্যায় ও অবৈধ কার্য্য-প্রণালী যাঁহার তীব্রসমালোচনার লক্ষ্য ছিল, ক্ষমতার অপব্যবহার ও শক্তির অপচারে বিধিসঙ্গত বাধা প্রদানের সহিত তাঁহার নাম অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। যখন সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার বিয়োগে কাতর, এবং তাঁহার যশোগানে মুখরিত, সেই সময়ে বর্ত্তমান লেখকের পক্ষে, যথাযথ-ভাবে তাঁহার চরিত্রবিশ্লেষণ ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার জীবন-কথার বর্ণন সময়োপযোগী হইবে না। সুতরাং কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত না করিয়া, কিছুমাত্র গোপন না করিয়া, অতি অল্প কথায় তাঁহার কঠোর অথচ কোমল চরিত্রের পরিচয় প্রদানে প্রয়াস পাইব। বর্ত্তমান লেখক এই রচনায় বিষয়ীভূত মহাত্মার সহিত সাধারণ এবং ব্যক্তিগতভাবে, সাহিত্যক্ষেত্রে ও রাজনীতিক্ষেত্রে মিলিত ছিলেন। তাঁহার বহু পরিচিত বন্ধুবর্গ অপেক্ষা তিনি তাঁহাকে সুস্পষ্টতরভাবে ও সমভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার

মনের সর্ব্বাপেক্ষা অনমনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—যে অবস্থা তাঁহার স্বাভাবিক হইলেও বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর নহে। যদ্দ্বারা মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবনের সুন্দর অন্তর্দৃষ্টিলাভের সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লেখক তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সেই সকল অবস্থা অবলোকন করিয়াছেন। লেখক এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তাঁহার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিতেছেন না, কেবল মাত্র এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কারণ প্রদর্শন ও আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীতে কোনও প্রতিভাবান্ বা শিক্ষিত হিন্দুর জীবনের ঘটনা অসাধারণ বা বৈচিত্র্যময় হওয়া অসম্ভব। সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক উন্নতির পথ রুদ্ধ থাকায়, তাঁহাকে সওদাগর কলিকাতার কোনও অফিসে কেরাণী রূপে অথবা অত্যন্ত সৌভাগ্য থাকিলে, কোনও পরগণার বা সবডিভিসনের তালুকদার বা সবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে, কোন ক্রমে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। দেশের সকল প্রকার উচ্চ পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া, তাঁহারা কেরাণীর ডেস্ক ও ক্ষুদ্র কাছারিতে উচ্চশ্রেণীর শক্তিকে কোনও বিস্তৃত প্রদেশ শাসনের ক্ষমতায় বিকশিত করিতে পারেন না। যে প্রতিভা মহাত্মা আকবরের সৈন্যদলকে বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রদান করিয়াছিল, এবং সাম্রাজ্যের কোষাগার সমৃদ্ধশালী করিয়াছিল; অথবা যে লেখনী চালাইয়া, [illegible] স্মরণ হওয়া অসম্ভব। [illegible] অথবা আবুল ফজল [illegible] অপচিত হয় এবং সমস্ত প্রতিভা নিস্তেজ হয়, [illegible] তিনি সামান্য কেরাণীর ন্যায় জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সরকারী মিলিটারী-অডিটর রূপে জীবনের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুরে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোনও কুলীন ব্রাহ্মণের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পিতামাতা হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ ছিল; কিন্তু অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ন্যায় তাঁহাদিগের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। হরিশ্চন্দ্রের সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাঁহারা তাঁহাকে বহুবিষয়ে পারদর্শী ও ধর্ম্মশীলতার জন্য বিখ্যাত স্বর্গীয় রেভারেণ্ড মিঃ পিকার্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ইউনিয়ন স্কুল নামক

মিশনরী (অথবা স্বাধীনভাবে পরিচালিত) বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। এইখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। তিনি আট বৎসর কাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তিনি শিক্ষকবৃন্দের উচ্চ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও তত্ত্বাবধায়ক মিঃ পিকার্ডের সস্নেহ ব্যবহারে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মিষ্টার পিকার্ডের সেই সতত স্নেহশীল ও সদয় ব্যবহার তাঁহার হৃদয়ে যে গভীর কৃতজ্ঞতার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিলীন হয় নাই। একদিন আমাদিগের বাটীতে কলিকাতা বারের মিষ্টার সি. পিকার্ডের সহিত হরিশ্চন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার কোনও প্রশ্নের উত্তরে মিঃ পিকার্ড বলেন, তিনি রেভারেণ্ড মিষ্টার পিকার্ডের পুত্র। ইহা শুনিয়া হরিশ্চন্দ্রের অশ্রুবারি উথলিয়া উঠিয়াছিল। তথাপি এমন লোকও আছেন, যাঁহারা দেশবাসীর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা নামক কোনও বৃত্তির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।

বাল্যে হরিশ্চন্দ্রের যে প্রতিভা লক্ষিত হইয়াছিল, যৌবনে তাহা আশাতীতরূপে বিকশিত হইয়াছিল। তিনি পাঠে ক্রমশঃই উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন, এবং শীঘ্রই মফঃস্বলস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর পাঠ্যসমূহে অসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, এবং পর বৎসর হিন্দু কালেজের উচ্চবৃত্তির জন্য (Senior Scholarship) পরীক্ষা প্রদান করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি হঠাৎ অকৃতকার্য্য হয়েন [illegible] এবং [illegible] শিক্ষালাভে বঞ্চিত অন্য কোনও এরূপ কালেজের উচ্চশিক্ষালাভের অন্তরায় হওয়াতে, তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হয়। প্রথমে তিনি তৎকালীন নীলামওয়ালা টলা এণ্ড কোম্পানীর আফিসে মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মিলিটারী অডিটর-জেনারেলের আফিসে একটী কেরাণীর পদ শূন্য হওয়ায়, উহার জন্য তিনি আবেদন করেন। ঐ পদের মাসিক বেতন ২৫৲ টাকা মাত্র, কিন্তু প্রার্থী অনেক ছিলেন। তাঁহাদিগের পরীক্ষাগ্রহণ করা হইল; কারণ, তখন এই পরীক্ষাগ্রহণের বাতুলতা (Mania) আরম্ভ হইয়াছে। মিষ্টার জর্জ কেলনার পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষার বিষয় ছিল একটী প্রবন্ধরচনা এবং পাটীগণিত। সমস্ত

কাগজ দেখিয়া মিষ্টার কেল্‌নার হরিশ্চন্দ্রের উত্তরপত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রকাশ করিলেন। এইরূপে তিনি কেরাণীজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই কেরাণীজীবনের প্রভাব, যাহা সচরাচর প্রতিভা নির্ব্বাপিত-প্রায় করে, হরিশ্চন্দ্রের মানসিক গঠনের উপর তাদৃশ অমুৎসাহজনক অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই। উহা তাঁহার সুন্দর বলিষ্ঠ প্রতিভা নির্ব্বাপিত করে নাই, করিতে পারে নাই। কিন্তু কিছু খর্ব্ব করিয়াছিল। তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ শীঘ্রই তাঁহার কর্ম্মনিপুণতা স্বীকার করিলেন, এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা হরিশ্চন্দ্রকে জ্ঞানার্জ্জনে উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত উচ্চজ্ঞান অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি বহুবিধ পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন। এইরূপ এক জন কর্ম্মচারী আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, হরিশ্চন্দ্র প্রায়ই নিজের সংগ্রহ হইতে ও কলিকাতা পব্‌লিক লাইব্রেরী হইতে পুস্তক আনাইয়া তাঁহাকে পড়িতে দিতেন। অধিকাংশ হিন্দু যুবক, যাঁহারা বিদ্যালয়-পরিত্যাগের সহিত পুস্তকাদির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা তিনি কত বিপরীত-ভাবাপন্ন ও কত শ্রেষ্ঠ ছিলেন! যাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, শৈশবে মানুষের শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং মৃত্যুতে শেষ হয়, তিনি তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন, এবং এতদ্দেশবাসীর পর্য্যবেক্ষকগণের নিকট হইতে 'এতদ্দেশে প্রতিভাশালী বালক আছে, কিন্তু প্রতিভাশালী মনুষ্য নাই' এই যে অভিযোগ প্রায়ই শুনা যায়, সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াও হরিশ্চন্দ্রের এই অসাধারণ শিক্ষানুরাগ সেই অভিযোগের প্রকৃত প্রতিবাদ। তাঁহার পাণ্ডিত্য তত গভীর ছিল না, কিন্তু তিনি ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক বহুসংখ্যক পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনের চিন্তাশীল ভাব, অসাধারণ তর্কশক্তি, অপূর্ব্ব মেধা, যাহা পড়িতেন,—তাহা নিজস্ব করিবার বিস্ময়কর ক্ষমতা, এবং রাজনীতিতে অনুরাগের ফলে তিনি অল্পবয়সেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শীঘ্রই তিনি লেখনী ধারণ করিলেন, এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এক বন্ধুর সহিত পরিচালিত একটী সাময়িকপত্রে তাঁহার অধ্যবসায়ের ফল ও সাহিত্যিক প্রতিভা প্রকাশিত হইল। "বেঙ্গল রেকর্ডারে" * তাঁহার প্রথম রচনাশক্তি বিকাশ

* "বেঙ্গলী" পত্রিকার প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক দেশপ্রাণ মহাত্মা গিরিশচন্দ্র ঘোষ

প্রাপ্ত হয়। কিন্তু "হিন্দুপেট্রিয়ট" প্রতিষ্ঠার * পূর্ব্বে সাহিত্যজগতে তিনি যশঃ অর্জ্জন করেন নাই। তাঁহার সম্পাদকত্বে "হিন্দুপেট্রিয়ট" শীঘ্রই অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। ইহা দেশবাসীর মুখপত্রস্বরূপ হইল, এবং সাধারণ বিষয়ে লোক-মত অবগত হইবার জন্য উৎসুক গবর্মেণ্টের নিকট রাজভক্তি-জ্ঞাপনের উপায়স্বরূপ হইল।

কিন্তু হিন্দুপেট্রিয়ট দেশবাসিকর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রথম ইংরাজী সংবাদপত্র নহে। সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র Reformer (সংস্কারক) প্রসন্নকুমার ঠাকুর কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, এবং তিনিই উহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তাহার পর রেভারেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার Enpuirer (জিজ্ঞাসু) প্রকাশিত করেন। কিন্তু তাঁহার সংশয় দূর হইবামাত্র ঐ কাগজ বন্ধ হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে জ্ঞানালোকবিস্তারকল্পে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য অধুনালুপ্ত পত্রিকার মধ্যে 'জ্ঞানান্বেষণই' শ্রেষ্ঠ। ইহা সাপ্তাহিক এবং দ্বিভাষী পত্রিকা ছিল, এবং স্বর্গীয় রসিককৃষ্ণ মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। 'জ্ঞানান্বেষণের' পরে 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' নামক আর একটী দ্বিভাষী সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হয়। ইহা বাবু রামগোপাল ঘোষ ও বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত, এবং ইহার জীবনকালে নিপুণতা ও দক্ষতার সহিত সমাজসংস্করণের জন্য যুঝিয়াছিল। কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার'ও দেশের অনেক উপকারসাধন করিয়াছিল। বৈভাষিকতা 'জ্ঞানান্বেষণ' 'বেঙ্গলস্পেক্টেটরের' স্বল্পায়ুর কারণ। হরিশ্চন্দ্র এই ভ্রান্ত পথ পরিহার করিয়াছিলেন। 'হিন্দুপেট্রিয়ট' সর্ব্বদাই স্বাধীনভাবে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছে, এবং অত্যাচারীর বিপক্ষে অত্যাচারিতের পক্ষে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছে। ইহার সাধারণ ও রাজনৈতিক বিষয়সমূহের আলোচনায় অসাধারণ দক্ষতা ও বিচারশক্তি প্রকটিত হইত। মার্ক্ইস্ অব্ ড্যালহৌসির সর্ব্বগ্রাসিনী নীতি ও অন্যান্য অবৈধ আচরণের নির্ভীক প্রতিবাদ হরিশ্চন্দ্রকে সম্পাদকশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহার পর সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। বিদ্রোহিগণের নৃশংস অত্যাচারে ইংরাজগণের

কর্ত্তৃক 'বেঙ্গল রেকর্ডার' ও 'হিন্দুপেট্রিয়ট' উভয় সংবাদপত্রই প্রতিষ্ঠিত হয়। বংপ্রকাশিত Life of Grish Chunder Ghose নামক পুস্তকে এই পত্রিকাদ্বয়ের ইতিহাস আছে। ৯০ নং কাশিয়াবাগান ষ্ট্রীট প্রকাশকের নিকট পাওয়া।—অনুবাদক।

ক্রোধাদি প্রবল রিপুগণকে উত্তেজিত, এবং তাঁহাদিগের বিচারশক্তি খর্ব্ব করিল। তাঁহারা জ্ঞানশূন্য হইয়া অবিলম্বে প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে 'পেট্রিয়ট' এই সকল উন্মত্ত ব্যক্তিগণের ও ভীত জনসাধারণের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠাকল্পে দণ্ডায়মান হইয়া দেশের অমূল্য উপকারসাধন করিয়াছিল। যখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব্ব সঙ্কটকাল উপস্থিত, এবং বে-সরকারী ইউরোপীয়গণ লর্ড ক্যানিংয়ের পদচ্যুতির প্রার্থনা এবং দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার শাসনকার্য্যে বাধা প্রদান করিতেছিলেন, তখন পেট্রিয়ট এই উন্মত্ত ও অজ্ঞান আন্দোলনকারিগণকে তীব্র ভাষায় ভৎসনা করিয়াছিলেন। দেশবাসিগণকে গবর্মেণ্টের পক্ষে সমবেত হইবার নিমিত্ত আহ্বান এবং ভারতবর্ষের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

নীলকর আন্দোলনে এই স্বদেশহিতৈষী (Patriot) যে কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দেশবাসিগণের কৃতজ্ঞতার অকৃত্রিম কারণ। আমাদিগের সহযোগী দুর্ব্বল প্রজাগণের একজন তর্কনিপুণ, উপযুক্ত ও নির্ভীক পক্ষসমর্থক হইয়াছিলেন। তাঁহার অকাট্য যুক্তি ও অসংখ্য দৃষ্টান্তসংবলিত আক্রমণের প্রতিবাদ নীলকরগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

হিন্দুপেট্রিয়টে নীলকরগণের অত্যাচারের মর্ম্মস্পর্শী ও অবিশ্রান্ত প্রতিবাদ করিয়া যে উচ্চস্বর উত্থিত হইত, তাহাতেই এই অসাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রের প্রধানতম শক্তিগুলির স্বরূপ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সে সব আন্তরিক দেশপ্রেমিকের কর্তব্য। আমরা পূর্ব্বেই হরিশ্চন্দ্রকে অসাধারণ বাঙ্গালী বলিয়া অভিহিত করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য অতি গভীর ছিল না। হয় ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের নিম্নতম শ্রেণীর চতুর ছাত্রগণের ন্যায় সুন্দররূপে সেক্সপিয়র বা মিল্টন আবৃত্তি করিতে পারিতেন না; কিন্তু তিনি প্রকৃত, অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ মানসিক বলের অধিকারী ছিলেন। তিনি কিরূপ হীন অবস্থায় জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহা অকৃত্রিম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দারিদ্র্য তাঁহাকে খর্ব্ব করিতে পারে নাই। কখন শক্তিপ্রয়োগের উপযুক্ত কাল, তাহা তিনি জানিতেন, এবং দেশে রাজনীতিক নবজীবনের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি আপনাকে উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন।

তাঁহার মধ্যে যাহা কিছু মহৎ ছিল, যাহা কিছু অকিঞ্চিৎকর ছিল, সমস্তই তিনি একই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত নিয়ত নিয়োজিত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। সেই সংকল্পসিদ্ধির জন্য যে সকল অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয়, তাহাই তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতেন। সেই সংকল্পসিদ্ধিই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা সেই সংকল্পসিদ্ধির পক্ষে বাধাপ্রদান করিতেন, তাঁহারাই তাঁহার শত্রু ছিলেন। যদিও তিনি সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার বিষয়ে একবারে উদাসীন ছিলেন না, তথাপি (আমাদিগের বোধ হয়, তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন। রাজনীতিক অবস্থার উন্নতির অসাধারণ কার্য্যকরী শক্তিতে আস্থাবান ছিলেন। এই জন্য তিনি তাঁহার দেশবাসিগণের রাজনীতিক নবজীবনসঞ্চারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা প্রকাশ্যভাবে এই ভাব প্রকাশ করিতেন। আমাদিগের স্মরণ হয়, একদা আমাদের ভবনে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবৃত্ত রেভারেণ্ড ডাক্তার ডফের সাক্ষাতে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস যে, কেবলমাত্র রাজনীতিক উন্নতির দ্বারা আমাদিগের দেশে নবজীবন-সঞ্চাররূপ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। আমরা অস্বীকার করি না যে, ন্যায়সঙ্গত রাজনীতিক অধিকারলাভ দেশকে সঞ্জীবিত করিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় (যথা, যে সকল রাজনীতিক ক্ষমতার অভাবে দেশ শক্তিহীন, সেই সকল অভাব মোচন কর, দেশবাসিগণকে রাজনীতিক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ প্রদান কর; মহারাণীর ঘোষণা-পত্রের সাধু সংকল্প পূর্ণ কর)। কিন্তু রাজনীতিক উন্নতির সহিত সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ না হইলে যথার্থ ভারতপ্রেমিকের আশা পূর্ণ হইতে পারে না।

আমরা এই পত্রিকার স্তম্ভে 'হিন্দুপেট্রিয়টে'র স্বর্গীয় সম্পাদককে প্রায়ই খাঁটি স্বদেশহিতৈষী বলিয়া অভিহিত করা কর্ত্তব্যবোধ করিয়াছি; কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমরা তাঁহার স্বদেশ প্রেমিকতার অকৃত্রিমতা বা আগ্রহে সন্দিহান হই নাই।

আমাদের আরও বিশ্বাস যে, তিনি আশা-পূর্ণ স্বদেশ-হিতৈষী ছিলেন, এবং আমাদিগের ন্যায় এবং আমাদিগের অধিকাংশ বন্ধুবর্গের ন্যায় অন্ধকারময় বর্ত্তমান এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দেখিয়া ব্যথিত হয়েন নাই। তিনি সর্ব্বদাই প্রত্যেক অবস্থার আশা-পূর্ণ অংশটী দেখিতেন,

এবং যে সমাজে তিনি বাস করিতেন, গতায়াত করিতেন, এবং যে সমাজে তাঁহার অস্তিত্ব ছিল, তাহার ভীষণ ক্ষতপূর্ণ অঙ্গটী দেখিতে পাইতেন না। তাঁহার দেশবাসিগণের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন-সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে তাঁহার যে চরম মত ছিল, তাহার কারণ তাঁহার এই মনের ভাব। আমরা অবশ্য অতি দুঃখের সহিতই এই সকল কথা বলিতেছি, ক্রোধবশতঃ নহে; কারণ, আমরা বিশ্বাস করি যে, যথার্থ চিকিৎসকের ন্যায় ক্ষত আরোগ্যের পূর্ব্বে ক্ষতের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত শলাকা প্রবেশিত করা যথার্থ সংস্কারকের কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি সংস্কারক রূপে হরিশচন্দ্রের কোনও দোষ বা ত্রুটী লক্ষিত হইয়া থাকে, তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রগুণে, তাঁহার সারল্যে, তাঁহার আন্তরিকতায়, তাঁহার প্রকৃতিগত উচ্চ হৃদয়ে তাহা যথেষ্টরূপে সংশোধিত করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ উচ্চমনা ছিলেন সেইরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি যথার্থ আতিথিসেবাপরায়ণ ছিলেন। যে সকল বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তি তাঁহার আতিথেয়তার প্রতিদান দিতে পারিতেন, তিনি তাঁহাদেরই সেবা করিতেন, এমন নহে; পরন্তু যাঁহারা প্রতিদান দিতে পারিতেন না, তাঁহাদিগেরই অধিকতর সেবা করিতেন। এই বিষয়ে তিনি ঈশার উপদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভবানীপুরস্থ ভবন পরামর্শ ও সাহায্যপ্রার্থিগণের সমাগমস্থল ছিল, এবং তিনি স্বকীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে অকাতরে পরামর্শ ও সাহায্য উভয়ই প্রদান করিতেন। ইহাই তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কারণ, অন্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় যিনি নিঃস্বার্থভাবে দেশবাসীর দুঃখমোচন ও সুখবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রযত্ন করেন, তিনিই যথার্থ স্বদেশপ্রেমিক। আত্মত্যাগে স্পৃহা না থাকিলে স্বদেশপ্রেমিকতা থাকিতে পারে না। যে অসাধারণ হিন্দু সম্প্রতি পরলোকে গমন করিলেন, তাঁহার জীবনই ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদিগের আন্তরিক বিশ্বাস এই যে, সেই বহুশিক্ষাপ্রদ জীবনের শিক্ষা আমাদিগের দেশবাসীর হৃদয়ে বিফল হইবে না। আমাদিগের আরও আশা এই যে, বহুসংখ্যক শিক্ষিত দেশবাসী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন, এবং তাঁহারা দ্বিগুণ শক্তি ও উৎসাহের অধিকারী হইয়া দেশে নবজীবনসঞ্চার করিতে সক্ষম হইবেন।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

একচক্ষু।

১

সন্তোষ অভাবের মুখাপেক্ষী নহে। তাই দীনতার নাগপাশে বদ্ধ হইয়াও নানা অভাবের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াও একচক্ষু মাণিক হৃষ্ট, তুষ্ট ও মনে সন্তুষ্ট। কোনও 'হাই'-স্কুলে না পড়িলেও সে প্রকৃতির স্কুলে কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছিল। তজ্জন্য সে চিরদিন সত্য, সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতের পিপাসু। তাহার অবয়বে বা আয়ে লক্ষ্মীর কৃপা-কটাক্ষ লক্ষিত না হইলেও, মস্তিষ্কে বিদ্যালয়ের বাগ্দেবীর কৃপা প্রকটিত না হইলেও, ভগবান্ তাহার মনটা ভাল করিয়াই গড়িয়াছিলেন; জগতের ভাল মন্দ দুই দিক দেখিবার জন্য দুই চক্ষু না দিলেও, তাহার ভাল দিকের চক্ষুটা কাণা করেন নাই।

বয়োবৃদ্ধি নিজের হাতে নয়। তবু প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া উপার্জ্জনক্ষম না হইলে গঞ্জনা ভোগ করিতে হয়। মাণিকের পক্ষে এ বিধানের ব্যতিক্রম হইবার কারণ ছিল না। অনেক লাঞ্ছনার পর সে চাকরীর চেষ্টায় বিরত হইয়া ব্যবসায়ে মন দিল। কিছুদিন রেড়ীর চাষে অদৃষ্টপরীক্ষার পর সে স্থির করিল, শূকরের ব্যবসায়ে ১০০৲ টাকা মূলধন লইয়া বসিলে পাঁচ বৎসরে ৭১১২।৶৭ পাই লাভ সুনিশ্চিত! কিন্তু কেবল কল্পনার উর্ণা বয়ন করিয়া কে কবে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়াছে? অতএব মাণিকের এবারও হার হইল।

ভগবান্ কাহাকেও একেবারে কাঙ্গাল করেন না। মাণিকের সকল সম্পদ তাহার কণ্ঠে। ঐ সম্পত্তির সাহায্যে সে প্রায়ই কোন না কোন 'পার্টি'তে বা 'পিকনিকে' আমন্ত্রিত হইত। ক্রমে মদনগঞ্জের সঙ্গীত-রসিক জমীদার রায় বাহাদুর শ্রীল শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চৌধুরীর সহিত তাহার পরিচয় হইল। সেই হইতে তাহাকে মন্তোদর-পূরণের জন্য বিচলিত হইতে হইত না। এখন সে নিশ্চিন্তমনে 'দ্বিগুণ খায়, দেড়গুণ ঘুমায়।' চরকের মতে অতিনিদ্রায় মেদ-বৃদ্ধি অনিবার্য্য। তদুপরি নিত্য চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়াদি ভোজন ও অলস-ভাবে জীবনযাপন! অগৌণে মাণিকের উদর-দেশ তাহার তানপুরার আকার ধারণ করিল।

২

রায় বাহাদুর রমণীরঞ্জন কার্য্যবশতঃ কিছুদিন হইল মদনগঞ্জের সব

ডিভিসন্যাল অফিসার হল সাহেবের বিষনয়নে পড়িয়াছেন। দুর্লোকের চক্রান্তেই হউক, অথবা যথারীতি মন যোগাইবার ত্রুটীতেই হউক, শ্রীযুতকে অনেক দুর্বিপাক খাইতে হইতেছিল। কেহ কেহ বলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কেবল বাক্যের ফুলঝুরিতে কল্পনার অগ্নিময়ী লীলা দেখাইয়া 'বয়কট' ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া আইনের সীমা কিছু অতিক্রম করিয়াছিলেন। সেই হইতেই সকল অনর্থের সৃষ্টি। তজ্জন্য উক্ত 'স্বদেশী' পুত্রকে বর্জ্জন করিবার অঙ্গীকার করিয়াও রায় বাহাদুর নানারূপ লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। হল সাহেব মফঃস্বলে থাকিতে দেশে না থাকাই বিজ্ঞ ব্যবহারাজীবগণের পরামর্শসিদ্ধ হওয়ায়, তিনি অবিলম্বে সস্ত্রীক ও স-গভর্ণেস দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন। জমীদারীর ভার নবনিযুক্ত ইউরোপীয়ান ম্যানেজারের হাতে রহিল। ইহাও কম সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় নহে। পাছে জমীদারী লইয়া বিব্রত হইতে হয়, তজ্জন্য বিপদের কাণ্ডারী 'উপযুক্ত' ম্যানেজার বাহাল করা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু বিলাতী গভর্ণেস?—সে তো বড়লোকের পোষাকী সখ। যেমন খেতাব চাই, 'মোটর' চাই, 'অনারেবল' হওয়া চাই, তেমনি একটি পক্ষবতী গভর্ণেসও চাই।

৩

বেশ যায়। দার্জ্জিলিঙ্গের প্রভাত-শোভা বড় সুন্দর, বড় রমণীয়। ভিন্ন ভিন্ন শৃঙ্গে শৃঙ্গে ও সানুদেশে শ্যামশোভা উদ্ভাসিত। পশ্চাতে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুঙ্গ শৃঙ্গে তুষারপুঞ্জ মরীচিমালীর কনককিরণসম্পাতে উদ্ভাসিত। চারিদিকে হেমচ্ছটা বিকীর্ণ। নবযৌবনপুষ্পিত প্রকৃতির রাজ্যময় উচ্ছ্বাসে হিমানী জড়তা দূরীভূত হইয়াছে। সেই সঙ্গে মানুষের মনও আনন্দময়, সজীবময় হইয়াছে। জগৎ নবোন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছে।

অনঙ্গ কাহার প্রতি কখন ফুলশর নিক্ষেপ করেন, কে জানে? মাণিক একে 'নেটিভ', তায় একচক্ষু, কুৎসিত, 'নর্ভন'। দুই-চক্ষুষ্মতী 'গভর্ণেসের কৃপাই বল, আর অনুগ্রহই বল, উহা লাভ করিবার কোনও গুণই তাহার ছিল না, সে আশাও ছিল না। তবু মনের ক্ষেত্রে মাণিকের চিত্ত নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে প্রফুল্ল যুবতী গভর্ণেসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। এক দুষ্টে সন্দর্শন, অদর্শনে উৎকণ্ঠিতচিত্তে ধ্যান। এ ভালবাসা 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে'। যাহা হউক, ক্রমে মাণিকের নিদ্রা গেল, ক্ষুধা গেল; অতএব দেহেরও হ্রাস হইল। শরীরের রোগ ভগবান্ সারান।

সতর্ণের মিস্ মেরীকে গৌরাঙ্গী বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তবে তিনি পাণ্ডুবর্ণা বলিয়া প্রতিভাত হইবার জন্ত প্রত্যহ 'টয়লেটে' যে প্রাণান্ত শ্রম করিতেন না, এ কথাও বলা যায় না। মিস্ মেরী খাঁটী 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্' কি না, সে মীমাংসার ভার পাঠক-পাঠিকাগণের উপরই রহিল। রায় বাহাদুরের বিলাসবাগানে অনেক কুসুম ছিল। তাহাদের প্রায় সকলগুলিই পলাশ, কচিৎ দুই একটি যূথী বা শেফালিকা। মিস্ মেরী কাঠমল্লিকা অঙ্গসৌষ্ঠবে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির অপূর্ব্ব 'মডেল'।

ভালবাসি, অথচ যাহাকে ভালবাসি, সে তাহা জানিতে পাইবে না, ইহা কাব্য-জগতে সম্ভবপর হইলেও, বাস্তব-জগতে অসম্ভব। মাণিক যে তাহার ১৫৲ টাকা মাসহারা হইতে মধ্যে মধ্যে ভাল ভাল ফুলের তোড়া কিনিয়া আনিয়া চুপে চুপে মেম-সাহেবের টেবিলের উপর রাখিয়া যাইত, মিস্ মেরী ইহা লক্ষ্য না করিয়াছিলেন, এমন নয়। ইহা ছাড়া মাণিকের একচক্ষু যে সঙ্গোপনে তাঁহারই মুখমণ্ডলকে কেন্দ্র করিয়া প্রায়শঃই স্থির হইয়া থাকিত, ইহাও তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেন, মাণিক হতবুদ্ধি, অথবা প্রকৃতই চন্দ্রাহত মিস্ মেরী একদিন খুসী হইয়া বেচারীকে একটা দু-আনী বক্‌সিস্ স্বরূপ ডেস্কের উপর ফেলিয়া দিলেন। অভাগা তাহার উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ে রুদ্ধ করিয়া দুআনীটা টেবিলের উপর রাখিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

মাণিক প্রেমের বাণ টানিয়া ধরিতে চেষ্টা না করিত, এমন নয়। তবে সভাস্থলে 'বিবাহে পণ লইব না' বলিয়া প্রতিশ্রুত হওয়া যেরূপ, 'ভালবাসিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করাও সেইরূপ। দুইয়ের কোনটীই কার্য্যকরী হয় না। অতএব মাণিকের মনে সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধি সনাতন প্রথানুসারে মাথার সাথনা খাঁটিয়া অনেকগুলা তর্কবিতর্ক—সওয়াল জবাব করিল। এ প্রেমে কেবল নৈরাশ্য, অবমাননার স্মৃতি ও বিপদের ব্যাহ। তবু অভাগার একচক্ষু সমগ্র বনের মধ্যে শুধু ঐ রমণীমূর্ত্তিটিই খুঁজিয়া বেড়াইত।

অপরাহ্নকাল বাহ্যকামিগণ যুগলে যুগলে বাহুদেবনে বাহির হইয়াছেন। প্রকৃতির শোভা ও রমণীর সৌন্দর্য্য পর্য্যটকের নয়নে বিচিত্র গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু মাণিক তাহার কিছুই লক্ষ্য না করিয়া মিস্ মেরীর অনুসরণ করিতেছিল। কখনও একটি সচকিত দৃষ্টি বা অর্দ্ধস্ফুট দীর্ঘশ্বাস

তাহার অনির্ব্বাপিত প্রণয়-বহ্নি ব্যক্ত করিতেছিল। কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই, হৃদয়-দুর্গ-অধিকারের কামনা নাই; মাণিক শুধু ভালবাসিয়াই সুখী।

কয়েক দিন হইল, সে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে, তাহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী মধ্যে মধ্যে এক শ্বেতাঙ্গের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করেন। মিলনক্ষেত্র ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের সন্নিহিত। মিশিবার রকম দেখিয়া ইঁহাদিগকে ভ্রাতা ভগ্নী বা নিকট আত্মীয় বলিয়া বোধ হয় না; প্রেমিক প্রেমিকাও মনে হয় না। হয় ত ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার হিসাবে আদৌ দূষণীয় নয়। তবু মাণিকের ইহা ভাল লাগিত না।

আজ মিস্ মেরী একাকিনী বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছেন। রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্যা পীড়িতা; তাই পত্তর্ণেস তাঁহার সঙ্গে নাই। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের উচ্ছ্বসিত বারিরাশি নিম্নদেশস্থ শিলাখণ্ডসমূহে পড়িয়া 'মুরছিয়া' পড়িতেছে, এবং মুঠি মুঠি মুক্তারেণু বর্ষণ করিতেছে। মিস্ মেরী একাকিনী। আজ শ্বেতাঙ্গ সঙ্গীর সহিত মিলনের সুযোগ না ঘটায় তিনি ক্ষুণ্ণহৃদয়ে ফিরিতেছেন। এই ভাবে বিষণ্ণহৃদয়ে তিনি যখন ধীরে ধীরে কাকজোরার পোলের কাছে আসিয়াছেন, তখন একখানা 'রিক্শ' তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া সবেগে চলিয়া গেল। মেম সাহেব পড়িয়া গিয়াছেন দেখিয়া 'রিক্শ'ওয়ালা প্রাণের দায়ে ছুটিয়া পলাইল। মিস্ মেরী অজ্ঞান। পার্শ্বে মাণিক।

বেচারী প্রাণপণে রমণীর চৈতন্যসম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। আপনার বস্ত্রাংশ ছিন্ন করিয়া উহা কাকজোরায় সিক্ত করিয়া মেরীর চোখে মুখে ও মাথায় জল ছিটাইতে লাগিল। মিস্ মেরী একবার চাহিলেন, আবার চক্ষু মুদিলেন। মাণিক প্রমাদ গণিল। অবশেষে মিস্ সংজ্ঞালাভ করিলেন; কিন্তু সম্মুখে মাণিককে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত কহিলেন, "তুমি এখানে কেন আছে?"

মাণিক। আপনার সেবার জন্য আছি।

মিস। যাও, চলিয়া যাও; বজ্জাৎ।

মাণিক ভাবিল, ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুসারে হয় ত যথেষ্ট। কিন্তু কৃতজ্ঞতার আরও কিছু নিদর্শন মাণিকের ভাগ্যে অবশিষ্ট ছিল। মিস মেরী 'রিক্শ'র ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া গেলে মাণিক পোলের নীচে তাঁহার 'পার্স' ও একখানি চিঠি কুড়াইয়া পায়। সেখানিতে কি আছে, জানিবার জন্য তাহার

কৌতূহল হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া চিঠি ও খাম উভয়ই ফিরাইয়া দিবে ভাবিতে ভাবিতে সে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় ক্ষীণকণ্ঠে পশ্চাদ্দেশ ডাকিলেন, "বাবু! বাবু!" তখনও মিসের দুর্বলতা আছে, এবং ব্যথা বাড়িতেছে ভাবিয়া, মাণিক তাঁহার দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল, "আমার হাতের উপর ভর দিয়া চলুন।" ঘৃণায় মিস্ মেরী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "রিক্শ বোলাও।" তাহার করস্পর্শে মেম সাহেবের পাউডার-ধবল চক্ষু মলিন হইতে পারে, ইহা জানা ছিল না বলিয়া, সে মনে মনে আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিতে দিতে দূর হইতে একখান 'রিক্শ' ডাকিয়া আনিল। মিস্ মেরী গৃহে ফিরিলেন।

৫

কৌতূহলাবিষ্ট মাণিক অবসরসময়ে মিসের চিঠি পড়িতে চেষ্টা করিল। একে তাহার ইংরেজী ভাল জানা ছিল না, তাহাতে অপর সাহেবী হাঁদের লেখা। ভাল বুঝিতে না পারিয়া সে উহা রায় বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী ত্রিলোচন বাবুর কাছে লইয়া গেল। ত্রিলোচন বাবু পত্র পড়িয়া অবাক্! তার পর মাণিকের কাণে কাণে কি বলিয়া তিনি রায় বাহাদুরের নিকট গেলেন।

এ দিকে মাণিক মেমসাহেবকে 'খাম' ফিরাইয়া দিতেই তাঁহার মুখ একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিঠি?" মাণিক কহিল, "চিঠি তো আমার কাছে নাই।"

মিস্। ড্যাম ইউ।

কৃতজ্ঞতার অজস্র উপঢৌকন লাভ করিয়া বাধিত হইয়া মাণিক বলিল, "মেমসাহেব, আমি আপনার চিঠি সন্ধান করিয়া দিব।"

মিস্। ভেরিগুড।

মাণিক চলিয়া গেল। এতদিন তাহার নিকট যাহা শুধু মধুময়, সৌরভময়, সঙ্গীতময়, পারিজাতজ্যোৎস্নামণ্ডিত স্বপ্ন মনে হইতেছিল, আজ তাহা করস্পর্শে শিশিরবিন্দুবৎ শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে; অনাবৃত বাষ্পের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছে। হায় অদৃষ্ট!

যাহা হউক, তার পর রায় বাহাদুর তাঁহার ফ্লানেলজড়িত পা দুখানি কষ্টে টেনিয়া লইয়া, ছড়ির উপর ভর দিয়া মিস্ মেরীর কক্ষে উপস্থিত হইলেন, এবং ধীরে ধীরে কহিলেন, "তে—তে—তেমন চোট লাগিনি তো?

আজ আবার রিউম্যাটিজম বাড়িয়াছে। তবু আপনার অবস্থা জানিতে আসিলাম।"

মিস্ ভাবিলেন, তবে এ দীর্ঘকর্ণ কিছু জানিতে পারে নাই! প্রভুকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় দিবার জন্য মিস্ কহিলেন, "নো,—থ্যাঙ্কস্। বিশেষ কোনও আঘাত লাগেনি। আপনি বোধ হয় আমাকে এখন একটু একলা বিশ্রাম করিতে দিবেন।"

আজ আর রায় বাহাদুর আহত সারমেয়ের ন্যায় সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। তিনি রুষ্টস্বরে কহিলেন, "বিশ্রাম?—চিরবিশ্রাম তোমার উপযুক্ত পুরস্কার। যাক্,—মিস্ মেরী, তুমি এখনই আমার বাড়ী হইতে দূর হও; তোমার নিজের জিনিসপত্র কিছুই নাই একটা ট্রঙ্ক সঙ্গে এনেছিলে; তা পোর্টার ষ্টেশনে দিয়া আসিবে। উঃ! কি ভয়ানক! তুমি এমন ঘৃণিত 'স্পাই'!"

ক্রোধে রায় বাহাদুরের কথাগুলি আরও জড়াইয়া যাইতে লাগিল। মিস্ মেরী কোনও উত্তর না দিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। অপমানে তাঁহার কাণ দুটি যে লাল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা শ্রীমতীর ঈষৎরুক্ষ অলকের ভিতর হইতেও সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

রমণীরঞ্জন আপনার কক্ষে ফিরিয়া গিয়া বহুদিনের উপেক্ষিত ভগবান্‌কে স্মরণ করিলেন। ইহার পর মাণিক আসিল। তাহাকে দেখিয়াই রায় বাহাদুর বলিলেন, "আপনি আমায় বিষম বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আজ হইতে আপনাকে মাসিক ৩৲ টাকা বেতন দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া আপনি ২০০৲ দুই শত টাকা পারিতোষিক পাইবেন। (প্রাইভেট সেক্রেটারীর প্রতি) দেখিলেন, আপনি ত্রিলোচন ও আমি দ্বিলোচন হইয়াও যাহা দেখিতে না পাইয়াছি, একচক্ষু মাণিক বাবু তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন!"

ত্রি। মাণিক বাবু বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ইনি আমাদের চক্ষুদান করিয়াছেন।

মাণিক সবিনয়ে জানাইল, "চক্ষুদানের কর্ত্তা ভগবান্। আমরা নিমিত্ত-মাত্র। আমি বেতনবৃদ্ধি বা পারিতোষিক, কিছুই লইব না। আপনারা আমার অপরাধ লইবেন না।"

এমন সময় এক জন দরোয়ান খবর দিল, মেমসাহেব চলিয়া গিয়াছেন।

পরদিন হইতে মাণিককে কেহ রায় বাহাদুরের বাড়ীতে দেখিতে পাইল

না। দুই এক জন কহিল, তাহারা অভাগাকে মৃতের কবরের পার্শ্বচারী প্রেতের মত কাকজোয়ার পোলের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে। ত্রিলোচন বাবু কহিলেন, "মাণিক বাবুর প্রকৃতিটা যেন কেমন একরকম! তাঁহার জীবনটাও হেঁয়ালির মত! তিনি ছায়ার মত আসিয়া সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।"

শ্রীসত্যরঞ্জন রায়।

সামাজিক সমস্যা।

বর্ত্তমান যুগে নানা দেশে নানা ভাবে সামাজিক সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে এই সমস্যা বিভিন্ন মূর্ত্তি ধরিতেছে। মানব ব্যষ্টিভাবে যেমন প্রতিবেশপ্রভাবে প্রভাবিত, তেমনই সমষ্টিভাবে তাহা অপেক্ষা অধিকমাত্রায় পারিপার্শ্বিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়। কারণ, ভূমার উপরই প্রকৃতি দেবী অধিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এখানে বলা আবশ্যক, সঙ্ঘ ও সমাজ এক নহে। সমাজস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে এক অলক্ষিত সম্বন্ধ আছে, জনসঙ্ঘের মধ্যে সে গূঢ় সম্বন্ধের অস্তিত্ব সকল সময়ে থাকে না। রেলগাড়ীতে বা ষ্টীমারে যাত্রাকালে বহু লোক এক স্থানে সমবেত হয়, সেই জনসমূহকে জনতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা মানবসমাজ নহে। সেই সমবেত বহুলোকের মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় না। বহুদূর একত্র যাইতে হইলে লোক পরস্পর পরস্পরের সহিত কিয়ৎপরিমাণে ঘনিষ্ঠতা করে সত্য, কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতা বাহ্যভাবে সামাজিক সম্বন্ধের অনুরূপ হইলেও, বস্তুতঃ উহা সামাজিক সম্বন্ধ নহে। উহাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও ব্যষ্টির ব্যষ্টিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না; ব্যষ্টি ব্যষ্টিই থাকিয়া যায়; ব্যষ্টিকে সমষ্টির যূপকাষ্ঠে সম্পূর্ণরূপে আত্মবলি দিতে হয় না। দেহস্থিত কোষ (cell) ও সমাজস্থিত ব্যক্তির (individual) একই অবস্থাপন্ন। দেহস্থিত একটি কোষ বা গ্রন্থিকে কাটিয়া লইলে উহার প্রয়োজনীয়তা থাকে না, স্বাতন্ত্র্য হিসাবে কেহ উহার গুরুত্ব বা লঘুত্বের বিচার করে না। দেহে থাকিয়া দেহের অন্যান্য উপাদানের ও উপকরণের সহিত সমতানতা রক্ষা করিয়া ইহা কি প্রকারে আপনার কার্য্য করে, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ লোক তাহারই বিচার করিয়া থাকে। সমষ্টি হিসাবে উহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কি ভাবে ও কি

পরিমাণে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, তাহা বুঝিয়া দেখিবার জন্যই দেহস্থ কোষের ও গ্রন্থির ব্যষ্টিভাবে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা জন্মে। ঐক্যতান বাদনে একটি দোহার কাঠি কিরূপ বাজিতেছে, এবং একটি ক্লারিয়নেট কিরূপ বাজিতেছে, তাহা কেহ লক্ষ্য করে না, কিন্তু সমস্ত বাদ্যযন্ত্র সম্মিলিত হইয়া যে ধ্বনি উৎপন্ন করে, তাহা শুনিয়াই লোক ঐক্যতান বাদনের বিচার করিয়া থাকে। ঐ ঈপ্সিত বাদিত্র-ধ্বনি উৎপন্ন করিবার জন্যই বিবিধ বাদিত্রের প্রয়োজন কিন্তু কোনও বাদ্যকর যদি আপনার ইচ্ছামত সুর বাঁধিয়া আপনার ইচ্ছামত তালে ও পর্দায় বাজনা বাজাইতে থাকে, তাহা হইলে, সে ধ্বনি সঙ্গীতের সৃষ্টি না করিয়া কর্ণপটহবিদারী এক বিকট আরাবের সৃষ্টি করে। ঐক্যতান বাদন করিতে হইলে প্রত্যেক যন্ত্রীকে তাহার যন্ত্রের সুর পর্দা প্রভৃতি সেই অভীপ্সিত ধ্বনিরই অনুরূপ করিয়া লইতে হয়। জীবদেহস্থ এক একটি কোষ বা গ্রন্থি ও ঐক্যতান বাদনের এক একটি যন্ত্রের ধ্বনি যেরূপ আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া সমষ্টিরই পোষণ করিয়া থাকে, সমাজস্থ ব্যক্তিগণকেও সেইরূপ আপনাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য দূর করিয়া সমাজের অঙ্গেই অঙ্গ মিশাইয়া থাকিতে হয়। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে মানবের যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা প্রকাশের অবকাশ নাই, এ কথা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। যে সকল ক্ষেত্রে উহা আবশ্যক, সে সকল ক্ষেত্রের বিষয় বর্ত্তমান সন্দর্ভের আলোচ্য নহে। সমাজের সহিত সামাজিকের যে প্রগাঢ় সম্বন্ধ, তাহারই কথা আমি স্থূলতঃ বলিতেছি।

কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইলেই সমাজ গঠিত হয় না। সমাজ ও দল এক নহে। মীন জলমধ্যে দলে দলে বিচরণ করে, কিন্তু তাই বলিয়া মীনকে সামাজিক জীব বলা যায় না। প্রাচীন ঋষিগণ মীনকে "সঙ্ঘচারী" বলিয়াছেন, মানবকে বলেন নাই। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সেই জটিল বিষয়ের আলোচনা করিব না। এ বিষয়ে মনস্বীদিগের মধ্যেই বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়। সে সম্বন্ধ অলক্ষ্য হইলেও দৃঢ়। শ্রমবিভাগ প্রভৃতি তাহার বাহ্য বিকাশ। তবে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, পরস্পর সাহায্য ও সহায়তার উপরই সেই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। সমাজের ভিতর দিয়া সমাজস্থ ব্যক্তিদিগের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। হটেণ্টট, বা সামোয়েডস্ সমাজে অকস্মাৎ হার্কার্ট স্পেন্সারের বা লর্ড কেল্‌ভিনের উদ্ভব সম্ভব নহে,— কসাক সমাজে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়

না। যে সমাজ যেরূপ—সে সমাজে সেইরূপ ব্যক্তিই জন্মিয়া থাকে। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্মিতে পারে, কিন্তু প্রহ্লাদ যে সমাজে জন্মিয়াছিলেন, তাহা দৈত্যসমাজ নহে। প্রহ্লাদ যে সমাজে জন্মিয়াছিলেন, সে সমাজে হরিভক্ত ছিল। সমাজে হরিভক্ত না থাকিলে হিরণ্যকশিপু হরিদ্বেষী হইতে পারিতেন না। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার উপর দ্বেষ সম্ভবে না।

অনেক সময় দেখা যায় যে, এক একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির প্রভাবে সমাজে নূতন ভাবের সঞ্চার হয়, সমাজের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইঁহারা নূতন ভাবের ভাবুক, নূতন মতের প্রতিষ্ঠাতা, সমাজের সংস্কারক বলিয়াই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া অনেকে সপ্রমাণ করিতে চাহেন যে, সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যে সমাজের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া ব্যক্তিগত ভাবকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন করিয়া থাকিতে হইবে, এ কথা সত্য নহে। যাঁহারা প্রতিভাশালী তাঁহারাও যদি পুত্তলিকার ন্যায় আপনাদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন করিয়া জনপ্রবাহের স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া চলেন, তাহা হইলে সমাজের উন্নতি রুদ্ধ হইয়া যায়, সমাজের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। এই হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্ব্বক অনেকে সামাজিক সত্ত্ব অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গুরুত্বস্থাপনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। আমার মনে হয়, আপাতদৃষ্টিতে এই মতাবলম্বিগণের যুক্তি যেরূপ প্রবল বলিয়া অনুমিত হয়, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ যুক্তি সেরূপ প্রবল বলিয়া প্রতিভাত হয় না। মানবসমাজ মাত্রই বিবর্ত্তধর্ম্মী। স্থূলত্ব হইতে সূক্ষ্মতার দিকে, সরলতা হইতে জটিলতার দিকে লঘুত্ব হইতে গুরুত্বের দিকে ইহার গতি। কালের প্রভাবে প্রতিবেশ [illegible] ঘটনায়, সামাজিকদিগের প্রকৃতি বশে ইহার গতি নিয়মিত ও ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে। মানবেরও যেমন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য ও স্থবিরতা, মূলতঃ এই ছয়টি দশা আছে, মানবসমাজেরও মূলতঃ এইরূপ ছয়টি দশা আছে। মানবই মানবসমাজের উপাদান, সেই জন্য মানবসমাজ—মানবধর্ম্মী। জৈব উপাদান (protoplasm) দিয়াই যেমন মানবদেহ গঠিত, ব্যষ্টি মানব লইয়াই সেইরূপ মানবসমাজ গঠিত। সমাজ, শরীরী। সেই জন্য বিখ্যাত চিন্তাশীল দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ইহাকে organism বলিয়াছেন। আর্য্য ঋষিগণ সমাজকে বিরাট পুরুষ বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ এই বিরাট পুরুষের মস্তক, ক্ষত্রিয় ইহার বাহু

ও হৃদয়, বৈশ্য ইহার উদর, আর শূদ্র ইহার চরণযুগল। শ্রমবিভাগ (Division of labour) ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়াই সমাজ বিকাশ লাভ করে। জীবদেহে অনেকগুলি যন্ত্র থাকে। এক একটি যন্ত্র দ্বারা এক এক প্রকারের কার্য্য সম্পাদিত হয়। মস্তিষ্ক চিন্তার কার্য্য, শ্বাসযন্ত্র নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা শোণিতশুদ্ধির কার্য্য, উদর পরিপাককার্য্য, চরণ গমনকার্য্য নির্ব্বাহিত করিয়া থাকে। একই জৈব উপাদান ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে। সমাজেও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। শ্রেণীভেদে মানবের কার্য্যভেদ হইয়া থাকে। সকল মানবসমাজেই চাতুর্ব্বর্ণ্য বিরাজমান। তবে বর্ণাশ্রমী হিন্দুসমাজে বর্ণবিভাগ যেরূপ অপরিবর্ত্তনীয় ও পুরুষ-পরম্পরা-স্থায়ী, অন্য কোনও সমাজের সেরূপ নহে। উভয়বিধ বর্ণবিভাগের উৎকর্ষাপকর্ষ বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে।

যেমন দেহমাত্রেই যন্ত্র আছে, তেমনই সমাজমাত্রেই সামাজিকের শ্রেণী আছে। অ্যামিবা প্রভৃতি এককোষ জীবের দেহ একটিমাত্র যন্ত্র-সম্বল,—তেমনই প্রথমোন্মেষিত সমাজেও একটিমাত্র শ্রেণী। উহা পরিবার নামে অভিহিত। অ্যামিবার দেহে যেমন একটি কেন্দ্রবিন্দু আছে, সর্ব্বনিম্নতম পর্য্যায়ের সমাজে তেমনই এক জন কর্ত্তা আছে। তাহাকে ধরিলে সে সমাজেও দুইটি শ্রেণী হয়। এক শ্রেণীতে কর্ত্তা স্বয়ং, অন্য শ্রেণীতে পরিবার বর্গ। কিন্তু মানবসমাজ এইরূপ কখনই কেবল পারিবারিক অবস্থায় স্থায়ী থাকে না। বহু পরিবার মিলিত হইয়া প্রকৃত সমাজের পত্তন করে। এইরূপ সমাজে ক্রমশঃ শ্রেণীবিভাগ অভিব্যক্ত হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে, আদিম সমাজে মানুষ ক্ষত্রিয়বৃত্ত থাকে। তাহারা মৃগয়া দ্বারা জীবিকা-সংগ্রহ ও আততায়ীর সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা করে। তাহার পর যখন তাহারা যাযাবর ভাব ত্যাগ করিয়া এক স্থানে বসতি করিতে থাকে,—যখন কৃষিকৌশল উদ্ভাবিত হয়, তখন সমাজে বৈশ্যবৃত্ত লোক আবির্ভূত হয়। এক শ্রেণী আততায়ীর হস্ত হইতে সমাজকে রক্ষা করে,—সমাজের শান্তিরক্ষাকল্পে বিধিবিধান সৃষ্ট এবং অন্য সম্প্রদায় কৃষিকার্য্য দ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে এই অবস্থায় মানবজাতির চরিত্রে স্বার্থ-পরতা প্রবল থাকে; স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই তাহারা কার্য্য করে। ক্রমে চাষীরা সম্মিলিত, সাধারণের কোনও সুগম স্থানে কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় করিতে

যায়। এই প্রকারে হাট, বাজার ও সহরের পত্তন হয়। প্রাথমিক অবস্থায় লোক পণ্যের সহিত পণ্যেরই বিনিময় করে। ক্রমে ধাতুর বিনিময়ে পণ্য-প্রদান-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাতে সকলের সুবিধা হয় বলিয়া লোকের মনে সঞ্চয়ের জন্য আগ্রহাতিশয্য জন্মে। চাষীদিগের পক্ষে কার্য্যের ক্ষতি করিয়া হাটে আসিয়া পণ্য বিক্রয় করা সুবিধাজনক নহে সুতরাং সেই সময়ে এক শ্রেণীর লোক চাষীদিগের নিকট হইতে পণ্য কিনিয়া হাটে তাহা বিক্রয় করিতে থাকে। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ অধিক লাভ পায় এই শ্রেণীই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। সভ্যতা বিকাশের প্রথম অবস্থাতেই মানবের মনে ধর্ম্মভাবের উন্মেষ হয়। প্রথমতঃ মানুষ নিজের ধর্ম্ম কার্য্য নিজেই করে। পরে যখন তাহারা লাভজনক ব্যবসায়ে পূর্ণমাত্রায় আত্ম-নিয়োগ করে, তখন আর তাহারা নিজের ধর্ম্ম কার্য্য নিজে করিবার অবকাশ পায় না। সুতরাং তখন তাহারা সম্প্রদায়বিশেষের উপর ধর্ম্মকার্য্য নিষ্পন্ন করিবার ভার দেয়। ইহাই পুরোহিত জাতির আবির্ভাবের নিদান কথা।

পাশ্চাত্য মতে বিবিধ শ্রেণী বিভাগের কথা এ স্থলে অত্যন্ত স্থূলভাবেই উক্ত হইল। এ দেশের প্রাচীন মতে, মানব প্রথম হইতেই সামাজিক জীব। সৃষ্টি-কর্ত্তা একেবারেই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়া মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে উক্ত আছে,

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।

—ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৯ম সূক্ত, ১২ ঋক।

"বিরাট পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ঊরু এবং বৈশ্য। পদদ্বয় হইতে শূদ্র আবির্ভূত। যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতায় ও অথর্ব্ব বেদে এই মন্ত্র আছে। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে, বৈদিক সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল না, তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে। হিন্দুরা এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে তাঁহাদের সমাজের সুদৃঢ় ভিত্তি বলিয়া মনে করি-তেন। সেই জন্য যে দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নাই, সে দেশ ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়াই বিজ্ঞাত ভগবান বিষ্ণু লিখিয়াছেন,—

চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরঃ।

—বিষ্ণুসংহিতা, ৮৪। ৪।

ম্লেচ্ছসমাজে হিন্দুসমাজের ন্যায় বর্ণাশ্রমব্যবস্থা না থাকিলেও শ্রেণী-বিভাগ যে ছিল, এবং আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, শ্রেণীবিভাগকে আশ্রয় করিয়াই সমাজ বিকাশলাভ করিয়া থাকে, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তির্য্যক জীবের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে সকল জীব সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, যাহারা মীনের ন্যায় কেবল সঙ্ঘচারী নহে,—তাহাদের মধ্যেও অল্পাধিক শ্রেণীবিভাগ বর্ত্তমান। মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি তাহার উদাহরণ।

সমাজ থাকিলেই কোনও না কোনও ভাবে শ্রেণীবিভাগ থাকিবে, ইহা নিশ্চিত। যে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একতানতা অক্ষুণ্ণ না থাকে, সে সমাজের পরিণাম শুভাবহ নহে। যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ঠিক একই সূত্রে আবদ্ধ থাকে,—সে সমাজ অচল অটল,—তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের স্বার্থবাদ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করিয়া সামাজিক বলকে অতিমাত্র ক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। অর্থলিপ্সা ও ক্ষমতা-প্রিয়তা লইয়াই শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিবাদ বাধিয়া থাকে। য়ুরোপে এই সমস্যা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য তথায় ধনীর সহিত শ্রমজীবীর বিবাদ, অভিজাতের সহিত অন্যান্যের বিবাদ, স্ত্রীজাতির সহিত পুংজাতির বিবাদ সামাজিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে সমূলে বিনষ্ট করিবার আশঙ্কা জন্মাইয়া দিতেছে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ অতি সুন্দরভাবে এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেক জাতির জন্য এক একটি স্বতন্ত্র বৃত্তিও নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সমাজে যতই বর্ণসঙ্কর জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সামাজিক বিকাশের সহিত যত বিভিন্ন জাতি আবির্ভূত হইতে লাগিল,—ততই তাহাদের জন্য বিভিন্ন বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। যাহাতে কাহারও বৃত্তি বন্ধ না হয়,—যাহাতে একের বৃত্তিতে অন্যে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, তাহার জন্য বিধিব্যবস্থাও প্রণীত হইল। নাপিত, মালাকার প্রভৃতির বৃত্তি কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতির বৃত্তি অপেক্ষা সহজে বন্ধ হইতে পারে। সেই জন্য ব্যবস্থা হইল অশৌচে, শুভাশুভ শুভকর্ম্মে, দশবিধ সংস্কারে নাপিত, মালাকার প্রভৃতির একান্ত প্রয়োজন। অনেক কার্য্যে 'ডোমের সাজ'ও আবশ্যক। যাহাতে কোনও শ্রেণীর মধ্যে জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা অনুভূত না হয়, যাহাতে সমাজের কোনও অঙ্গই বিকৃত না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই সমস্ত বিধি ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছিল। সেই জন্য

শত সহস্র বিপ্লবের ঝ্যাতাতাড়নে ইহা এতকাল অবিচলিত রহিয়াছে। সেই জন্য চার্কাকের নাস্তিক্যবাদ, শাক্যসিংহের সাম্যবাদ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমী জাতির সনাতন ভিত্তিকে টলাইতে পারে নাই। যাঁহারা সমাজের শীর্ষ-স্থানীয়, সেই ব্রাহ্মণ জাতির ত্যাগই ধর্ম, দারিদ্র্যই সম্মান ও গৌরব-লাভের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল অসন্তুষ্টাঃ দ্বিজাঃ নষ্টাঃ—ইহা বর্ণাশ্রমী হিন্দুরই কথা। আমার মনে হয়,—পাছে সমাজে জীবন-সংগ্রাম তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে, সেই ভয়েই আর্য্য-ঋষিগণ শ্রমত্রয়ে বহুপণ্য-উৎপাদক কল কারখানার (Labour-Saving machines) সৃষ্টি করেন নাই। যাহাতে সমাজে সকল স্তরে অর্থ সুচারুরূপে বণ্টিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এ দেশে উটজ-শিল্পেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ইহার ফলও যে সুন্দর হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যত দিন সমাজে এই ব্যবস্থা ছিল, ততদিন ভারতে জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা অনুভূত হয় নাই, সোসালিজমও আত্মপ্রকাশ করে নাই।

পক্ষান্তরে য়ুরোপের সামাজিক অবস্থার কথা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। দেখিবেন একদিকে দারুণ দারিদ্র্য—অন্যদিকে বিপুল বিলাস। একদিকে নরকের পৈশাচিক দৃশ্য, অন্যদিকে অমরাবতীর শোভা! তথায় ধনীর স্বার্থ চক্রে দরিদ্রগণ যেরূপ নিপীড়িত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষ কাল পর্য্যন্ত খনির ও কলের মজুরদিগের সহিত স্বার্থসর্ব্বস্ব ধনী সম্প্রদায় যে ব্যবহার করিত, তাহা বর্ণনারও অতীত। ভারতবাসী তাহার কল্পনাও করিতে পারে না। এখন শ্রমজীবিগণ দলবদ্ধ হইয়া আপনাদের স্বার্থ বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে,—কিন্তু তথাপি তাহাদের স্বার্থ যে ধনী দিগের পদতলে দলিত হইতেছে না একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। সত্য বটে পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় ও বিলাস অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং জমার কম খরচ বেশী হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য বিক্ষোভ ও ধর্ম্মঘট, সেই জন্য সোসালিজমের উৎকট সাম্যবাদের আবির্ভাব। আবার সাফ্রেজেট হাঙ্গামে যে অস্বাভাবিকতা লক্ষিত, তাহা যে স্বাভাবিক কারণ-সম্ভূত, তাহা অনেকেই তলাইয়া দেখেন না। এদেশের জনসাধারণের ধারণা অন্যরূপ। তাহারা মনে করেন, ঐ দেশের ললনাগণ কোমলভাব পরিহার করিয়া পুরুষপ্রকৃতি

হইয়া পড়িতেছেন,—সেই জন্ত তাঁহারা পুরুষের সহিত সকল বিষয়ে তুল্যাধিকারের দাবী করিতেছেন। তথাকার নারীগণ যে অবস্থাবশে কতকটা পুরুষভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু তাঁহারা স্বেচ্ছায় আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ কোমল ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। অবস্থার তাড়নে তাঁহারা ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, য়ুরোপে বিশেষতঃ প্রতীচ্য য়ুরোপে রমণীর সংখ্যাই অধিক। তথায় সকল পুরুষ বিবাহ করিলেও অনেক রমণীকে অবিবাহিতা থাকিতে হয়। তাহার উপর অনেক পুরুষ জীবনসংগ্রামের তীব্রতাবশতঃ বিবাহ করেন না। সুতরাং তথায় লক্ষ লক্ষ রমণীকে আমরণ কুমারী থাকিতে হয়। য়ুরোপে একান্নবর্ত্তী পরিবার নাই। অবিবাহিতা রমণীগণ বয়ঃস্থা হইলে তাঁহাদিগকে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে হয়। জীবিকার জন্ত অধিকাংশ রমণীই উৎকট পরিশ্রম করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা পুরুষের ন্যায় পরিশ্রম করিলেও পুরুষের ন্যায় পারিশ্রমিক পান না। মেয়ে কুলী, মেয়ে শিক্ষক, মেয়ে কেরাণী প্রভৃতি তাঁহাদের তুল্য কর্ম্মী পুরুষ অপেক্ষা অনেক অল্প বেতন পাইয়া থাকেন। পুরুষ যেখানে এক টাকা পান মেয়ে সেখানে দশ আনার অধিক পান না। কিন্তু মেয়েদের আয় অল্প হইলেও ব্যয় অল্প নহে। ঘর ভাড়া, কয়লা, খাদ্য, পোষাক প্রভৃতি বাবদ মেয়ে পুরুষের খরচ সমান। মেয়েরা স্বতঃই মনে করেন যে, পুরুষরা বিধিপ্রণেতা বলিয়া এই পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। সেই জন্ত রমণীরা সামাজিক ও রাজনীতিক ব্যাপারে পুরুষের সমান অধিকার পাইবার জন্ত ব্যস্ত ও সচেষ্ট। ফলে য়ুরোপে জীবনসংগ্রামের তীব্রতায় ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রকটিত হইয়া সমাজের একতানতা নষ্ট করিয়া দিতেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে সংবদ্ধ হইতেছে। য়ুরোপে এই সামাজিক বিক্ষোভের পরিণাম কোথায়, তাহার অনুমান করা কঠিন।

আমাদের সমাজে এখনও ঠিক এইরূপ সামাজিক বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে নাই। কিন্তু য়ুরোপীয় আলোকসম্পাতে ও য়ুরোপীয় অবস্থার সংযোগফলে আমাদের দেশেও জীবন-সংগ্রাম দিন দিন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। তাহার ফলে সমাজে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা উচ্ছিন্ন হইতেছে, পাতিব্রত্যের ও সতীত্বের আদর হ্রাস পাইয়া ধনের আদর

বাড়িতেছে, সকল সম্প্রদায়ই আভিজাত্যের দাবী উপস্থিত করিয়া সমাজের উচ্চস্তরে আরূঢ় হইতে চেষ্টা পাইতেছে। ফলে সমাজের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একতানতা যুগযুগান্তর ধরিয়া বর্ত্তমান ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে। প্রতীচ্য সাম্যবাদ যে একটু বিকৃত হইয়া ইহার উত্তেজক কারণ-রূপে কার্য্য করিতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহা ভিন্ন ইহার অন্য কারণ যে নাই, তাহা নহে। আমাদের সনাতন সামাজিক ব্যবস্থা বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা সমাজের নিয়ন্তা, তাঁহারা শিক্ষা-বল ও চরিত্রবল হারাইয়া সমাজের নিম্নতর স্তরের সহিত সমতা প্রাপ্ত হইতেছেন,— সম্প্রদায়বিশেষের বৃত্তি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সামাজিকগণ ব্যষ্টিভাবে তাহা রক্ষা করিবার জন্য কোনও চেষ্টাই করিতেছেন না। সেই জন্যই এত গোল ঘটিতেছে। এই গোলের শেষ ফল কি, তাহা কে বলিতে পারে?

অনেকে মনে করেন যে, যখন একটা সমস্যা উঠিয়াছে, তখন তাহার সমাধান হইবেই। সকল ক্ষেত্রে এরূপ আশা করা সঙ্গত নহে। যদি লোক স্বাধীনভাবে এইরূপ সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত হইত, তাহা হইলে সে আশা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপীয় সমাজের আদর্শ আমাদের কর্ম্মীদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিতেছে। দূর হইতে পাশ্চাত্য সমাজের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া তাঁহারা সেই সমাজকেই তাঁহাদের আদর্শ করিতে উৎসুক হইয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে হিন্দুসমাজ-গঠন কখনই সম্ভবপর হইবে না। কারণ, উভয় সমাজের উপাদান এক নহে, তদ্ভিন্ন পাশ্চাত্য জাতির মনোবৃত্তি, ভাব, সংস্কার, জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ-পদ্ধতি, হিন্দুর চরিত্র, মনোবৃত্তি, ভাব প্রভৃতি হইতে অত্যন্ত স্বতন্ত্র। বহু যুগযুগান্ত ধরিয়া প্রতিবেশ-অবস্থার নিয়ন্ত্রণফলে এই স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ ও পুষ্টি হইয়াছে। তাহা সহজে লুপ্ত হইবার নহে। বিশেষতঃ সকল প্রতিবেশ-অবস্থার পরিবর্ত্তন-সাধন মানব-সামর্থ্যের আয়ত্ত নহে। সুতরাং উভয় সমাজের ঔপাদানিক পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। যেখানে ব্যষ্টি স্বতন্ত্র, সেখানে সমষ্টির একত্ব-ভাব-সাধন অসম্ভব। বিভিন্ন উপাদান লইয়া তুল্যপদার্থ সৃষ্ট করা যায় না। ইহা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক স্বীকৃত। আমি আপাততঃ সেই জটিল তর্কে না নামিয়া একটি উদাহরণ দ্বারা এই কথাটি পরিস্ফুট করিতে চাহি। সকলেই দেখিয়াছেন যে, পশ্চিমের খুব সুন্দর, মজবুত, ইষ্টক দ্বারা চুণ সুরকী ব্যতিরেকেও উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মিত করা যায়। উহা সাজাইলে প্রাচীরে তাহা দৃঢ় না হউক, অনেকটা

দৃঢ় হইতে পারে। কিন্তু আগাগোড়া ত্রিকোণ অসম ইষ্টক সাজাইতে হইলে, তত উচ্চ করা চলে না—তাহা বেধ-বহুল ও ঢালোয় করিয়া সাজাইতে হইলে স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। উহা প্রাচীরের আকারেই সাজান যায় না; উহা সাজাইতে হইলে পিরামিডের আকারে সাজাইতে হয়। আবার দেখুন, শর্করা মিছরীর যেরূপ দানা বাঁধে, মধুর সেরূপ দানা বাঁধে না। ইক্ষু-চিনির যেরূপ দানা, বিট-চিনির দানা সেরূপ নহে। সোহাগার দানায় আর লবণের দানায় পার্থক্য বর্ত্তমান। সুতরাং উপাদান-ভেদে উহার সমবায়-প্রণালী ভিন্ন হইবেই হইবে। যাহা অনুযায়ী সমষ্টি হইবে। অসম্পূর্ণ ইষ্টক লইয়া পলাসীদের সুগোল সুন্দর ইষ্টকের ন্যায় সাজাইতে চেষ্টা করিলে উহা ভাঙ্গিয়া যাইবে ও স্তূপে পরিণত হইবে। গোলায় প্রাচীর প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাইলে পণ্ডশ্রম হইবে। সেইরূপ, য়ুরোপীয় আদর্শে দেশীয় সমাজ গড়িতে চেষ্টা করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। দেশীয় সমাজের বিক্ষোভ নিবারণ করিতে হইলে দেশীয় পদ্ধতির অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। নতুবা সামাজিক বিক্ষোভ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ফেরেস্তা-বর্ণিত হিন্দুজাতির ইতিহাস।

মহাভারত হিন্দুজাতির বিখ্যাত ইতিহাস। আকবর বাদশাহের আদেশে শেখ মোবারকের পুত্র শেখ আবুল ফজল মূল সংস্কৃত হইতে পারস্য ভাষায় উহার অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থে এক লক্ষ শ্লোক আছে। ঋষি ও দার্শনিকেরা আপনাদের বিশ্বাসানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছেন। এক মহাভারতেই অষ্টাদশ প্রকার সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

হিন্দুরা সময়কে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগে বিভক্ত করেন। এই চারি যুগ অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান কলি যুগের অবসানে আবার সত্য যুগ আসিবে। পৃথিবী চিরস্থায়িনী; উহার আদিও নাই, অন্তও নাই। কোনও কোনও ব্রাহ্মণ বলেন, পৃথিবীর নাশ হইবে, এবং বিচারের দিন আসিবে।

সত্য-যুগ ১৭,২৮০০০ বৎসর স্থায়ী হয়। তখন ধর্ম্ম ও সত্য প্রাধান্য লাভ করে, মনুষ্যের পরমায়ু লক্ষ বর্ষ হয়।

ত্রেতা যুগের পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বৎসর। মনুষ্য জাতির বার আনা লোক ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে। মানুষ দশ হাজার বৎসর বাঁচে।

দ্বাপর যুগের পরিমাণ ৮,৬৪০০০ বৎসর। এই যুগের অর্দ্ধলোক দুর্বৃত্ত হয়, তখন মানুষের আয়ু হাজার বৎসর হয়।

কলি যুগের পরিমাণ ৪,৩২,০০০ বৎসর। এই যুগের বার আনা লোক পাপী। চারি আনা লোক কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে। মনুষ্যের আয়ু শত বৎসরমাত্র হয়। হিন্দুদের গণনানুসারে ১০১৫ হিজিরায় কলি-যুগের ৪৬৮৪ বৎসর অতীত হইয়াছে।

ঈশ্বর প্রথমে চারি ভূতের সৃষ্টি করেন। ইহা ছাড়া ইথারও (ব্যোম) একটী পদার্থ। ইহার পর ঈশ্বর ব্রহ্মা নামক মনুষ্যের সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর তাঁহাকে যাবতীয় চেতন পদার্থের সৃষ্টির ক্ষমতা দেন। হিন্দুদের বিশ্বাস, ইথার (ব্যোম) জড় পদার্থ নহে। বায়ু পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিতেছে। গ্রহগুলি দেবতা; তাঁহারা পৃথিবীতে মনুষ্যাকারে আবির্ভূত হয়, এবং পৃথিবীতে শুভকার্য্য করিলে স্বর্গে গিয়া পুরস্কার লাভ করে। ব্রহ্মা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা-নুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি প্রকারে বিভক্ত মনুষ্য-সংঘের সৃষ্টি করেন। ব্রাহ্মণের প্রতি বেদাধ্যয়নের ও মনুষ্য জাতির শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি মনুষ্য জাতির শাসনের এবং বৈশ্য জাতির প্রতি কৃষিকর্ষণ ও যাবতীয় শিল্প কর্ম্মের ভার অর্পিত হয়। শূদ্রগণ উপরি-উক্ত জাতিত্রয়ের পরিচর্য্যা করিবে। মনুষ্যগণের জন্য ব্রহ্মা তাহার পর বেদের সৃষ্টি করেন। বেদ পরমার্থতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ; উহা লক্ষ শ্লোকে নিবদ্ধ। প্রত্যেক শ্লোকের চারি চরণ, প্রত্যেক চরণ ছত্রিশের অনধিক ও একুশের অনল্প অক্ষরে নিবদ্ধ। ব্রহ্মা সত্যযুগে এক শত বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। সত্যযুগের প্রত্যেক বৎসর ৩৬০ দিনে হইত। সত্যযুগের দিন এই যুগের চারি হাজার দিনের সমান ছিল। রাত্রির পরিমাণও তদ্রূপ ছিল। ব্রাহ্মণেরা সকলেই স্বীকার করেন, একই ব্রহ্মা ১০০১ বার আবির্ভূত হইয়াছেন। বর্ত্তমান ব্রহ্মার পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়াছে।

দ্বাপর যুগের শেষে হস্তিনাপুরে ভরত নামক ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন। ভরতের অধস্তন সপ্তম পুরুষ পরে কুরু নামক রাজার নামানুসারে থানেশ্বরের ময়দান কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়। কুরুবংশীয়েরা কুরু-নামে অভিহিত হন। কুরুর ছয় পুরুষ পরে, বিচিত্রবীর্য্য-তেজ রাজা আবি

ভূ'ত হন। বিচিত্র-বীর্য্যের দুই পুত্র জন্মে,—ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ প্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজা হইতে পারেন নাই; পাণ্ডু রাজা হইলেন। পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র জন্মে। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব। যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মরাজও বলিত। যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন কুন্তী নাম্নী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নকুল ও সহদেবের মাতার নাম মাদ্রী। ধৃতরাষ্ট্রের ১০১ পুত্র জন্মে। উহার মধ্যে ১০০টী গান্ধার-রাজকন্যার গর্ভজাত। এই পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম দুর্য্যোধন। ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানদিগকে কুরু ও পাণ্ডুর সন্তানদিগকে পাণ্ডু বলা হইত। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধতা সত্ত্বেও রাজ্য গ্রহণ করিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধন রাজপ্রতিনিধি হইলেন। দুর্য্যোধন, পাণ্ডু-(পাণ্ডব)-দিগকে অত্যন্ত হিংসা করিতে লাগিলেন, এবং যাহাতে তাহারা বিনষ্ট হয়, তাহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ইহা জানিতেন। তিনি পারিবারিক অসদ্ভাবের দূরীকরণমানসে ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে নগরের বহির্ভাগে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে বলিলেন। দুর্য্যোধন শিল্পীদিগের দ্বারা শণ, আলকাতরা প্রভৃতি দিয়া একটী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। অভিপ্রায় ছিল—রাত্রিকালে আগুন লাগাইয়া পাণ্ডুদিগকে পোড়াইবেন। পাণ্ডুগণ পূর্ব্বেই তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেই গৃহে অগ্নি দিয়া মাতার সহিত হস্তিনাপুর ত্যাগ করিলেন। ঐ বাসগৃহে ভীল নামক স্ত্রীলোক ও তাহার পাঁচ পুত্র দগ্ধ হয়। ইহারা গৃহে অগ্নি দিবার জন্য উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিল। পরদিন ইহাদের অস্থি দেখিয়া কুরুগণ মনে করিল, পাণ্ডুরা মাতার সহিত পুড়িয়া মরিয়াছে। পাণ্ডুগণ হস্তিনাপুর ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান পরিভ্রমণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহারা অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভারতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই সময়ে তাঁহারা কাম্পীল্যনগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কাম্পীল্যের রাজার কন্যা দ্রৌপদীকে পর্য্যায়ক্রমে বিবাহ করিলেন। এই নিয়ম হইল, তাঁহারা এক এক জন দুই দিন দ্রৌপদীর সঙ্গে বাস করিবেন। কোনও কোনও হিন্দু উক্ত ঘটনা অস্বীকার করে; তাহাদের কথা সত্য হইতেও পারে। পাণ্ডুরা জীবিত আছেন শুনিয়া দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে আহ্বান করিলেন, এবং তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি ইন্দ্রপ্রস্থ ও রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেন। পাণ্ডুদের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল। পাণ্ডুদের উন্নতি দেখিয়া কুরুগণের হিংসা হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির দেবগণের

প্রীত্যর্থ একটি উৎসব করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সেই উৎসবে পৃথিবীর সমুদায় রাজাকে উপস্থিত হইয়া কর প্রদান করিতে হয়। রাজগণের জয়ের জন্য যুধিষ্ঠিরের চারি ভ্রাতা পৃথিবীর চারি দিকে প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বস্থান জয় করিলেন। রুম, হাবাশ, আজাম, আরব ও তুর্কিস্থানের রাজগণ কর দিতে উৎসবস্থলে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবের উন্নতি দেখিয়া হিংসায় দুর্য্যোধনের অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। তিনি তাঁহাদের সমূলে উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করিলেন। সেকালে দ্যূতক্রীড়ার বিশেষ প্রচলন ছিল। পাণ্ডবগণ দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন। পাণ্ডবরা দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইলেন।

দুর্য্যোধন আরও একবার খেলিতে ইচ্ছা করিলেন। সে বারে এই পণ নির্দ্ধারিত হইল, পাণ্ডবরা যদি জয়লাভ করেন, তাহা হইলে সমুদায় রাজ্য ফিরিয়া পাইবেন, হারিলে তাঁহাদিগকে রাজ্য ত্যাগ করিয়া বার বৎসরের জন্য বনে যাইতে হইবে। বার বৎসর পরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। যদি তখন তাঁহাদিগের স্বরূপ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে আবার বার বৎসর বনবাস করিতে হইবে। সে বারেও পাণ্ডুদের পরাজয় হইল। পাণ্ডুগণ বার বৎসর বনে বাস করিয়া এক বৎসর ওয়ার নামক স্থানে অজ্ঞাতবাস করিলেন। দুর্য্যোধন সমুদায় পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়াও পাণ্ডবগণের সন্ধান পাইলেন না। পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাস হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বাসুদেব-পুত্র কৃষ্ণকে দূত করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। দুর্য্যোধন রাজ্য দিতে অসম্মত হইলেন। কতিপয় রাজা পাণ্ডুদের পক্ষাবলম্বন করিলেন। পাণ্ডবরা কলিযুগের প্রথমে থানেশ্বরের নিকট কুরুসৈন্য আক্রমণ করিলেন। দুর্য্যোধন পরাজিত ও নিহত হইলেন। কুরুদিগের এগার যূথ (অক্ষৌহিণী) ও পাণ্ডুদের সাত যূথ সৈন্য ছিল। প্রত্যেক যূথে ১১,৮৭০ গজ, ২১৮৭০ রথ, ৬৫,৬১০ অশ্বারোহী ও ১০৯৩৫০ পদাতিক ছিল। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই যুদ্ধে কেবল বার জন মাত্র জীবিত ছিল। এই বার জনের মধ্যে কুরুপক্ষে চারি জন—১ম কৃপাচার্য্য, এই ব্রাহ্মণ সাহস ও শিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিলেন; ইনি অস্ত্রাচার্য্য ছিলেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি অশ্বত্থামা, ইনি দার্শনিক দ্রোণের পুত্র ছিলেন; দ্রোণ যুদ্ধে মারা যান তৃতীয় ব্যক্তি যদুবংশীয় কৃতবর্ম্মা। চতুর্থ ব্যক্তি সঞ্জয়—ইনি ধৃতরাষ্ট্রের সংবাদবাহকতা ও যুদ্ধকালে সারথ্য করিতেন। পাণ্ডুদের পক্ষে আট জন জীবিত ছিলেন, পাঁচ পাণ্ডুভ্রাতা,

সাত্তিক (সাত্যকি) যদু, যুযুচ (যুযুৎসু), ইনি দুর্য্যোধনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। আমরা মহাভারত হইতে কৃষ্ণের বর্ণনা করিতেছি।

মথুরা নগর কৃষ্ণের জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। হিন্দুজাতির সকলে কৃষ্ণকে সমান সম্মান দেয় না; কেহ কেহ কৃষ্ণকে ধর্ম্মোপদেশক, কেহ বা তাঁহাকে দেবতা মনে করেন। থানেশ্বরের যুদ্ধের পূর্ব্বে মথুরার রাজা কংস দৈবজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিবে। কংস কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ নন্দ ঘোষের বাটীতে এগার বৎসর লুকাইয়া থাকিলেন। সুবিধাক্রমে কৃষ্ণ কংসের বিনাশসাধন করিয়া, কংসের পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক নিজেই রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণ আপনার প্রতি দেবতার সম্মান অর্পণ করিতে প্রজাগণকে আদেশ করেন, এবং নিজের মতাবলম্বী যত লোক প্রাপ্ত হন কৃষ্ণ মথুরায় বত্রিশ বৎসর আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করেন। কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে। নিকটবর্ত্তী রাজগণ কৃষ্ণের ক্ষমতায় ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। এই সকল রাজার মধ্যে বেহারের রাজা জরাসন্ধ বিপুল সৈন্য লইয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। পশ্চিম দিকে ম্লেচ্ছরাজ কালযবন কৃষ্ণের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিলেন। কালযবন হিন্দু ছিলেন না। বোধ হয়, কালযবন আরবজাতীয় লোক ছিলেন। কৃষ্ণ রাজগণের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে না পারিয়া দ্বারকায় যাইতে বাধ্য হইলেন। দ্বারকা বর্ত্তমান নগর আহমদাবাদ হইতে এক শত ক্রোশ দূরে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। সেখানে আটাত্তর বৎসর রাজগণের সেনা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ থাকেন। ইহার মধ্যে নগর হইতে বাহির হইতে পারেন নাই। এই অবস্থায় ১২৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন যে, কৃষ্ণ এখনও লুকাইয়া আছেন। এখন মূল প্রস্তাবে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্য্যোধনের মৃত্যুর পর পঞ্চ পাণ্ডব, ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করেন। এই সময়ে পাণ্ডু-বংশের অন্ত হইল।

রাজা কুরু হইতে পাণ্ডুর মৃত্যু পর্য্যন্ত	৭ বৎসর
দুর্য্যোধন কুরুর রাজ্যকাল	১৩ "
যুধিষ্ঠির, যিনি সচরাচর ধর্ম্মরাজ বলিয়া অভিহিত	৩৬ "
মোট	৫৬ বৎসর।

এই বংশে রাজত্ব করেন। পাণ্ডুদের রাজ্যত্যাগের কতিপয় বৎসর পরে অর্জুন পাণ্ডুর পৌত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আপনার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলেন। ব্যাস নামক ব্যক্তি সেই ভার গ্রহণ করিলেন। ব্যাস মহাভারত রচনা করিলেন। মহাভারতের অর্থ—মহাযুদ্ধ। কিন্তু মহাভারত শব্দের অর্থ, ভরত-রাজার বংশের ইতিহাস। ভরত হইতে পাণ্ডু ও কুরুগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্যাস চারি বেদের টীকা করেন। সেই চারি বেদের নাম—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের মধ্যে ২৪০০০ শ্লোকে পাণ্ডবের যুদ্ধবর্ণনা আছে। তাতার ও চৈনিকদের ন্যায় হিন্দুরা নোয়ার সময়ে জলপ্লাবনের কাহিনী অস্বীকার করে।

কতিপয় হিন্দুর মত এই যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি স্মরণাতীত কাল হইতে আছে। কিন্তু রাজপুতেরা কলিযুগের প্রারম্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। অন্যান্য জাতির সম্বন্ধেও ঐরূপ বর্ণিত হয়। বিক্রমাদিত্যের পর হইতে রাজপুতদের প্রাদুর্ভাব হয়। বিক্রমাদিত্য হইতে হিন্দুদের অব্দ গণিত হইয়া থাকে। দাসীগর্ভে রাজাদের যে সকল সন্তান জন্মিত, তাহাদিগকে রাজপুত বলিত। রাজা সূর্য্যের পুত্রগণের প্রথমে রাজপুত নাম হয়। জলপ্লাবনের পর নোয়া হইতে ভারতবাসীদের উৎপত্তি হয়। নোয়ার তিন পুত্র। সেম, হাম ও জাফেৎ প্রথমে স্বীয় সন্তানগণের জন্য কৃষিকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন।

প্রথম রাজার নাম কৃষ্ণ। ইনি মথুরার বসুদেব-পুত্র কৃষ্ণ নন। বেহারের প্রজাগণের সম্মতি-অনুসারে কৃষ্ণ রাজা হন। এই রাজা অযোধ্যানগর নির্ম্মাণ করেন। ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রী বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। কৃষ্ণের আকার এত বৃহৎ ছিল যে, কোনও অশ্ব তাঁহাকে বহন করিতে পারিত না; তজ্জন্য তিনি একটা হস্তীকে পোষ মানাইতে আজ্ঞা দেন। মন্ত্রী লাঙ্গলের উদ্ভাবন করেন। বর্ণমালাও ব্রাহ্মণের উদ্ভাবিত। কৃষ্ণ চারি শত বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। কৃষ্ণ পারস্য-রাজ তাহমর্সাপের সমসাময়িক। কৃষ্ণের সাঁইত্রিশ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র মাহারাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ শিল্প ও সাহিত্যে উৎসাহ দান করেন। মহারাজের রাজত্বকালে দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও দেশবাসিগণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। মহারাজ ভারতের লোককে নানা জাতিতে বিভক্ত করেন। ব্রাহ্মণদের উপর শাস্ত্রানুশীলন ও রাজকার্য্যের ভার, কোনও জাতির উপর শিল্প, কোনও জাতির উপর কৃষিকার্য্যের ভার অর্পিত হয়। প্রধান ব্যক্তির নামানুসারে রাঠোর, চোহান,

পাউয়ার ও বৈস্ প্রভৃতি জাতির বাস হইয়াছে। মহারাজ পারস্তপতির সঙ্গে সর্বদা সদ্ভাব রক্ষা করিতেন। মহারাজের পৌত্র ভুবন সেন পারস্ত-পতি ফরিদুনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফরিদুন নিজ পুত্র কুরশস্পকে এক দল সেনা সহ পঞ্জাবে প্রেরণ করেন। কুরশস্পকে বলিয়া দেওয়া হইল, যাহাতে মহারাজ আপনার পৌত্রকে পঞ্জাবের কোনও অংশ প্রদান করেন, তাহার জন্ত যত্ন করিবে। এই সেনাদলের সহ মহারাজের দশ বৎসর যুদ্ধ হয়, অবশেষে মহারাজ ভুবন সেনকে পঞ্জাবের কিয়দংশ প্রদান করেন। ইঁহার রাজত্বের শেষভাগে, সিরোলা ও কর্ণাটকের জমীদারেরা ইঁহার সেনাপতি শিবরায়কে দাক্ষিণাপথ হইতে তাড়াইয়া দেন। মহারাজ আপনার পুত্রের সহিত এক দল প্রবল সেনা বিদ্রোহীদের শাসনার্থ প্রেরণ করেন। রাজপুত্র পরাজিত ও নিহত হইলেন। শিবরায় মহারাজের সভায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মহারাজ পুত্রনাশের অপেক্ষা পরাজয়ে অধিক দুঃখিত হইয়াছিলেন। আগৌন, মালাকা, পেগু ও মালাবারের রাজগণ ইহার পূর্বে বিদ্রোহী হইতে সাহসী হন নাই। সেই সময়ে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে শত্রুগণ কর্তৃক তাঁহার সাম্রাজ্য আক্রান্ত হয়। মহারাজ মালববাসী মহা-চাঁদকে সেনাপতি করিয়া পঞ্জাব-রক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। মহাচাঁদ পারসীকদের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে পঞ্জাব ছাড়িয়া দিলেন, এবং কতিপয় হস্তী প্রদান করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন। কোনও কোনও গ্রন্থকার বলেন যে, কুরশস্পের বংশীয় রুস্তম পর্যান্ত পারসীক রাজগণ পঞ্জাবের সহিত কাবুল, তক্কর, সিন্ধু ও মেষক্ষেত্র ভোগ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর মালচাঁদ [ইঁহার নামানুসারে মালবের নাম হইয়াছে।] সসৈন্য দক্ষিণাপথে গিয়া পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মালচাঁদ এই সময়ে গোয়ালিয়রের দুর্গ নির্মাণ করেন। মালচাঁদ হিন্দুস্থানে সঙ্গীতবিজ্ঞানের প্রবর্তন করেন। তিনি তৈলঙ্গ-অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন কালে এই বিজ্ঞান সঙ্গে করিয়া আনেন। মালচাঁদ অনেক দিন গোয়ালিয়রে বাস করেন। এই সময় হইতে ধ্রুপদী-সঙ্গীত উত্তর-ভারতে বিস্তৃত হয়। মহারাজ সাত শত বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কেতুরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কেতুরায় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করিলেন। নিজে সসৈন্য কাশী দিয়া গড়োয়ানা ভেদ করিয়া লিউরাল দ্বীপে

পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। গমনপথে যে যে রাজ্য পড়িয়াছিল, তৎসমুদায়ের রাজগণ কর প্রদান করিল। ফিরিবার সময় সেই সকল রাজা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। কেশুরায় সাহায্যপ্রার্থনায় পারস্য-পতির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। মনুচেহর সুরীমনের পুত্র সামকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। কেশুরায় স্বীয় সেনার সহ জলন্ধরে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া দক্ষিণাপথে গমন করিলেন। দক্ষিণের রাজগণ পারসীক সেনার আগমনে ভীত হইয়া কেশুরায়ের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কেশুরায় পারসীক সেনাপতির সহ পঞ্জাব পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কেশুরায় অযোধ্যায় আসিয়া দুই শত কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুনির রায় রাজা হইলেন। মুনির রায় প্রজাগণের সুখস্বচ্ছন্দের জন্য অনেক যত্ন করেন। মুনির রায় পারস্যরাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মনুচেহরের মৃত্যুর পর তুরাণরাজ অফ্রাসিয়াব-তুর্ক সে সময়ে পারস্য আক্রমণ করেন। মুনির রায় সেই সময়ে পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া তথাকার শাসনকর্তা জালকে দূরীভূত করেন। জাল সামের পুত্র। জালের নামানুসারে জালন্ধরের নাম হইয়াছে। মুনির রায় উপঢৌকনসহ অফ্রাসিয়াবের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। তদবধি কৈকোবাদের সময় পর্য্যন্ত পঞ্জাব ভারতীয় রাজগণের অধীন ছিল। কৈকোবাদ জালের পুত্র রুস্তমকে মুনির রায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। মুনির রায় পারসীক সৈন্য কর্তৃক তাড়িত হইয়া ঝাড়খণ্ড ও গোণ্ডোয়ানার পাহাড় অঞ্চলে গিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করেন।

রুস্তম হিন্দুস্থান জয় করিয়া সুরযকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বদেশে গমন করিলেন। বঙ্গসাগর হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ সুরযের প্রভুত্ব স্বীকার করিল। এইরূপ বর্ণিত আছে, এক ব্রাহ্মণের প্রবর্তনায় সুরয প্রথমে দেব-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি হিন্দুরা পৌত্তলিক হইয়াছে; তাহার পূর্ব্বে পারসীকদের ন্যায় তাহারা সূর্য্য ও নক্ষত্রের পূজা করিত। সুরয পারস্যরাজ কৈকোবাদের করদ ছিলেন।

সুরযের পঁয়ত্রিশ পুত্রের মধ্যে বাহরাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাহরাজের নামানুসারে বেরাইচের নাম হইয়াছে। বাহরাজ সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। বাহরাজের পিতা বারাণসীর মূল পত্তন করেন, তাঁহার সময় নগর নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন, বাহরাজই

আপনার ভ্রাতৃগণের রাজপুত নামকরণ করেন। বাহরাজ-মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত উৎকৃষ্ট নিয়মাবলী রহিত করেন। শিবালিক-নিবাসী কেদার ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। বাহ্‌রাজ ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন।

কেদার রাজা অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি বাহ্‌রাজ-শাসিত অবনতিপ্রাপ্ত রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। তিনি পারস্য-রাজ কৈকাবুস ও কৈখসরুর সমসাময়িক। কেদার তাঁহাদের করদ ছিলেন। কেদার কালিঞ্জর দুর্গ নির্মাণ করেন। কুচ-রাজা শঙ্কল বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বঙ্গ ও বিহার অধিকারপূর্ব্বক কেদারকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন। কেদার ঊনত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন।

শঙ্কল রাজা হইয়া লখ্‌নৌতি নগরের পত্তন করেন। লখ্‌নৌতি গৌড় নামে প্রসিদ্ধ। লখ্‌নৌতি দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। মোগল-রাজত্বকালে এই নগর নষ্ট হইলে, তাণ্ডা টাঁড়া বঙ্গের রাজধানী হইয়াছে।

শঙ্কল রাজার চারি হাজার হস্তী, এক লক্ষ অশ্ব ও চারি লক্ষ পদাতিক সেনা ছিল। তিনি আফ্রিসায়াবের অধীনতা স্বীকার করিলেন না। আফ্রিসায়াব পিরান বৈশার সেনাপতিত্বে পঞ্চাশ হাজার তুর্ক অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন। শঙ্কল রাজা কুচ পর্ব্বতের নিকট তাঁহার অগ্রগমনে বাধা দিলেন। দুই দিন এক রাত্রি ঘোর যুদ্ধ হইল। তের হাজার তুর্ক ও পঞ্চাশ হাজার হিন্দু নিহত হইল। তৃতীয় দিবসে তুর্কগণ পাহাড় অঞ্চলে গিয়া শিবির স্থাপন করেন। সেনাপতি আফ্রিসায়াবের নিকট যুদ্ধের অবস্থা লিখিয়া পাঠাইলেন।

এই সময়ে আফ্রিসায়াব খাতা ও খুটানের মধ্যবর্ত্তী কুঙ্গকলিজ নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ স্থান খামবালিখ্ হইতে এক মাসের পথ দূরবর্ত্তী ছিল। সেনাপতির পত্র পাইয়া তিনি লক্ষ অশ্বারোহী সেনা সহ তাঁহার সাহায্যার্থ যাত্রা করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, সেনাপতি অসংখ্য সেনা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছেন। আফ্রিসায়াব অবিলম্বে হিন্দুসেনা আক্রমণ করিলেন, এবং তাহাদিগকে তাড়াইয়া সেনাপতির উদ্ধার সাধন করিলেন। আফ্রিসায়াব লখ্‌নৌতি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া শঙ্কল রাজাকে আক্রমণ করিলেন। শঙ্কল ত্রিহুতের পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। সেখান হইতে

ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আফ্রিসায়ের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। আফ্রিসায়াব তাঁহাকে গলায় অস্ত্র বাঁধিয়া স্ব-সমীপে উপস্থিত হইতে বলিলেন। শঙ্কুল বিজেতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আফ্রিসায়াব শঙ্কুলের পুত্রকে লখ্‌নৌতীর রাজা করিয়া শঙ্কুলকে সঙ্গে লইয়া তুরাণে গেলেন। শঙ্কুল তুরাণে অনেক দিন ছিলেন। পরে রুস্তমের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। শঙ্কুল চৌষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন।

আফ্রিসায়াব তুরাণে প্রত্যাগমনকালে শঙ্কুলের পুত্র রোহৎকে ভারতের রাজা করিয়া যান। শঙ্কুলের রাজ্য পাটি হইতে মালব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রোহৎ রাজ্যের আয় চারি ভাগ করিয়া এক ভাগ দান করিতেন, এক ভাগ তুরাণে পিতার নিকট পাঠাইতেন, এক ভাগ আফ্রিসায়াবের নিকট পাঠাইতেন, চতুর্থ ভাগ দ্বারা রাজ্য রক্ষা করিতেন। এই সময়ে গোয়ালিয়রের রাজা তাঁহার হস্ত হইতে গোয়ালিয়র দুর্গ কাড়িয়া লন। রোহৎ রোহৎস-গড় নির্ম্মাণ করেন। এই দুর্গটী একটী সুন্দর মন্দির দ্বারা অলঙ্কৃত করেন। রোহৎ গোয়ালিয়র দুর্গ পুনরধিকারে অসমর্থ হন। কনোজে রোহতের রাজধানী ছিল। রোহৎ আশী বৎসর রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন।

রোহতের কোন পুত্র না থাকায়, মালবদেশের কচ্ছবহ জাতীয় মহারাজ নামক ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ নেহারওয়ালা নগর আক্রমণ করেন, এবং তৎপ্রদেশের গোপ জাতীয় জমীদারদিগকে বশীভূত করেন। মহারাজ সমুদ্রতীরে একটি নগরের পত্তন করেন, এবং নানা আকারের অনেক জাহাজ নির্ম্মাণ করেন। মহারাজ ২য় পারস্যরাজ গুস্তা-স্পের সমসাময়িক। তিনি পারস্যরাজকে কর দান করিতেন।

মহারাজের মৃত্যুর পর কেদার রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে রুস্তম হত হওয়ায়, কেদার তাঁহার উত্তরাধিকারীদের হস্ত হইতে পঞ্জাব কাড়িয়া লন। কেদার বেহার নগরে কিয়ৎকাল বাস করিয়া কামুর দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এখানে তিনি বুলবাম্-জাতীয় দুর্গা নামক ব্যক্তিকে স্থাপন করেন। দুর্গা ঠাকুর ও পঞ্জাবের পুরাতন জমীদার চৌবিয়াদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া কাবুল ও কান্দাহারের মধ্যবর্ত্তী পাহাড়ীয়াদিগকে সঙ্গে লইয়া কেদার রাজকে আক্রমণ করেন। কেদার রাজ পঞ্জাব হইতে পলায়ন করেন। আমি অনুমান করি, এই সকল পার্ব্বত্য জাতিকে আমরা আফগান বলিয়া থাকি। কেদার রায় ৪৩ বৎসর রাজত্ব করেন।

কেদার রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় সেনাপতি জয়চাঁদ রাজা হন। জয়চাঁদের রাজত্বকালে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে বহুলোকের প্রাণ যায়। জয়চাঁদ প্রজাদের উদ্ধারের কোনও উপায় না করিয়া বারাণসী নগরে আনন্দে কালক্ষেপ করেন। জয়চাঁদ চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। জয়চাঁদ বাহমন ও দারাবের সমসাময়িক। জয়চাঁদ শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করিলে তৎপত্নী পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করেন। কিন্তু শিশুর পিতৃব্য দেহলু অমাত্যগণের সাহায্যে নিজে রাজা হন। দেহলু সাহস ও বদান্যতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি দিল্লী নগরী নির্ম্মাণ করেন। চারি বৎসর রাজত্বের পর, কুমায়ুনের রাজা ফুর কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দী হইয়া রোটাস্ দুর্গে প্রেরিত হন। ফুর বঙ্গদেশ দিয়া সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত অধিকার করেন। তিনি পারস্যপতিকে কর দিতে স্বীকার করেন নাই। ব্রাহ্মণ ঐতিহাসিক ও অন্যান্য জাতীয় ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিতে সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত সসৈন্য গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে ফুর প্রাণত্যাগ করেন। ফুর ৮০ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ে কুতব-স্থাপনকর্ত্তা কুলচাঁদ, মিরঠ-স্থাপনকর্ত্তা মেরুচাঁদ ও বিজয়নগর স্থাপনকর্ত্তা বিজয়চাঁদ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন।

এরূপ বর্ণিত আছে, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে বিজয়নগরের স্থাপনকর্ত্তা বিজয় আপনার পুত্রকে বিবিধ উপঢৌকন সহ আলেকজাণ্ডারের নিকট প্রেরণ করেন। সংসারচন্দের নিকট হইতে ফুরের পৌত্র জুনা রাজ্য গ্রহণ করেন। এই সংসারচন্দ্র ফুরের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পারস্য-রাজ গুদর্জের নিকট কর প্রেরণ করেন। জুনা কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন এবং গঙ্গা ও যমুনার তীরে অনেক নগর স্থাপন করেন। জুনা আর্দ্দশীর বেবীগানের সমসাময়িক। আর্দ্দশীর ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। জুনা তাঁহাকে হস্তী ও স্বর্ণ দ্বারা তুষ্ট করিলে, তিনি পারস্যে প্রতিগমন করেন। জুনা নব্বই বৎসর রাজত্ব করেন।

জুনার ৩২ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কল্যাণচাঁদ রাজা হন। তিনি অত্যন্ত নির্দ্দয় ছিলেন। বিনা কারণে অনেক প্রজার প্রাণ বধ করেন। প্রজাগণ কনোজ ত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করে, কনোজ নির্জ্জন হইয়া যায়। কল্যাণচাঁদের পর রামদেব ব্যতীত অন্য কোন গণনীয় রাজা কনোজে রাজত্ব করেন নাই। এখন আমরা মালবদেশ ও বিক্রমাদিত্য রাজার বিষয় বর্ণনা করিব

তৎসময়ে বিক্রমজিতের ন্যায় প্রসিদ্ধ রাজা কোন দেশে ছিল না। বিক্রমজিতের উপাখ্যান দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। বিক্রমজিৎ বাল্যকালে সন্ন্যাসীর ন্যায় কালযাপন করিতেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসন গ্রহণ করিয়া গুজরাট মালব প্রভৃতি অধিকার করেন। হিন্দুরা বলেন যে, তিনি যোগাবিষ্ট হইয়া ভবিষ্যৎ ঘটনা জানিতে পারিতেন। তিনি জাঁকজমক পরিত্যাগ করেন, সাধারণ লোকের ন্যায় কালযাপন করিতেন, মৃৎপাত্রে জল পান করিতেন এবং সামান্য মাদুরে শয়ন করিতেন। উজ্জিন এই সময়ে লোকপূর্ণ হয়, মহাকালী নামক দেবমূর্ত্তি তথায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিক্রমজিৎ ধার নগরের দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। বিক্রমজিৎ হইতে যে অব্দ গণিত হয়, তাহার ১৬৬৩ তে ১০১৫ হিজিরা হয়। বিক্রমজিৎ আর্দ্দশীরের সমসাময়িক। কেহ কেহ বলেন, তিনি সাহপুরের সমসাময়িক। বিক্রমজিৎ দক্ষিণাপথের রাজা শালিবাহন কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। বিক্রমজিতের মৃত্যুর পর মালব অনেকদিন অরাজক ছিল। পরিশেষে ধার নগরের রাজা ভোজ-প্রমর প্রবল হইয়া উঠেন। ভোজ, কুর্ম, বিজয়গড় ও চান্দেরী প্রভৃতি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। বৎসরে দুইবার তিনি চল্লিশ দিন ব্যাপী উৎসব করিতেন। তাহাতে উত্তর-ভারতের সমুদায় স্থান হইতে গায়কগণ ও নর্ত্তকগণ সমবেত হইত। তিনি তাহাদিগকে খাট, বস্ত্র ও অর্থ দান করিতেন। এই সময়ে বসুদেব নামক ব্যক্তি কনোজ অধিকার করেন। ইঁহার রাজত্বকালে পারস্যরাজ বেরামগোর ছদ্মবেশে কনোজ-রাজসভায় আগমন করেন। এই সময়ে একটী বন্যহস্তী কনোজে অত্যন্ত উৎপাত করিত, কেহ তাহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই; এমন কি, রাজা বসুদেবও কয়েকবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। বৈরামগোর যখন কনোজে উপনীত হন, তখন একদিন সেই হস্তী কনোজ নগরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া নাগরিকদের ভয় উৎপাদন করে। বৈরামগোর গর্ব্বিত হইয়া একেবারেই হস্তীর প্রাণবধ করেন। সেই সময়ে বসুদেবের যে দূত পারস্যে কর লইয়া গিয়াছিল, সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। সে পারস্যপতিকে চিনিতে পারিয়া বসুদেবের নিকট হস্তিনিহন্তার পরিচয় প্রদান করিল। বসুদেব বৈরামগোরকে কন্যা প্রদান করিলেন এবং উপযুক্ত সঙ্গী দিয়া পারস্যে প্রেরণ করিলেন। সত্তর বৎসর রাজত্বের পর বসুদেবের মৃত্যু হয়। বসুদেবের সময় কাল্পীর দুর্গ নির্ম্মিত হয়। বসুদেবের ৩১ পুত্র রাজ্যের জন্য দুই বৎসর বিবাদ করে।

অবশেষে সেনাপতি রায়দেব রাঠোর রাজা হন। রায়দেব বিদ্রোহী রাজা ও রাজকর্ম্মচারীদিগকে বশীভূত করিয়া সসৈন্যে সাড়োবারের দিকে যাত্রা করেন, এবং তথা হইতে কচবাহদিগকে তাড়াইয়া দিয়া রাঠোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বারবার হইতে কনোজে আসিয়া বঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করেন, তাহার রাজধানী অধিকার করিয়া প্রচুর ধন প্রাপ্ত হন। রায়দেব তিন বৎসর পরে কনোজে প্রত্যাগমন করেন।

এই ঘটনার চারি বৎসর পরে রায়দেব মালব অধিকার করিয়া তথায় অনেক নগর স্থাপন করেন। এই সকল নগরের মধ্যে নরবর একটী। রায়দেব বিজয়নগরের রাজা শিবদেবের নিকট তাঁহার দুহিতার পাণিগ্রহণার্থ দূত প্রেরণ করিলেন। শিবদেব রায়দেবের প্রভাবে ভীত হইয়া দূতের সহ স্বীয় কন্যাকে প্রেরণ করিলেন। দুই বৎসর পরে রায়দেব শিবালিকের রাজাকে আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে কুমায়ুনের রাজা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। কুমায়ুনের রাজবংশ অতি প্রাচীন। এই রাজবংশ প্রায় দুই হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। রায়দেবের সহ কুমায়ুনরাজের উন্মাস্তব নদী তীরে ভয়ানক যুদ্ধ হইল, যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহুসেনা হতাহত হইল। কুমায়ুন-রাজ পরাজিত হইয়া সমুদয় হস্তী ও অর্থ ত্যাগ করিয়া পাহাড় অঞ্চলে পলায়ন করিলেন। কুমায়ুন-রাজ রায়দেবকে নিজের কন্যা দান করিলেন। রায়দেব কুমায়ুন-রাজকে তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর রায়দেব নগরকোটে উপস্থিত হইয়া সেই নগর লুণ্ঠন করিলেন। শিবকোট পিণ্ডাতে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য দুর্গাদেবীর সম্মানার্থ তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন। দুর্গাদেবীর মন্দির নগরকোটের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত ছিল। রায়দেব সেখানকার রাজাকে নিজের সমীপে উপস্থিত হইতে আহ্বান করিলেন। কুমায়ুন-রাজ দুর্গাদেবীর মন্দিরে রায়দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। রাজা মন্দিরে রায়দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রায়দেবের পুত্রকে নিজের কন্যাদান করিলেন। অতঃপর রায়দেব জম্মুর রাজাকে পরাজিত করিলেন। রাজা করদানে স্বীকৃত হইয়া রায়দেবের অন্য পুত্রকে কন্যাদান করিলেন। রায়দেব বেহাত নদী-তীরে উপনীত হইলেন। এই নদী কাশ্মীরের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া পঞ্জাব দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। রায়দেব বহুদেশ দিয়া শিবালিক পর্ব্বতের শেষভাগে উপস্থিত হইলেন।

রামদেব পাঁচ মাসের মধ্যে পাঁচ শতের অধিক রাজাকে বশীভূত করিয়া রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তিনি সমুদায় সেনাকে পুরস্কৃত করিলেন, এবং একটী উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

রামদেব প্রায় চুয়ান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রামদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা রাজ্যলাভার্থ পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। রামদেবের সেনাপতি ও শিশোদীয়-জাতীয় প্রতাপচাঁদ সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক রামদেবের পুত্রগণের বিনাশসাধন করিলেন। প্রতাপচাঁদ পারস্য-রাজকে কর দিতে অস্বীকৃত হইলেন। নৌসেরাঁর পুত্র [illegible] পারস্যে গমন করিল। পারস্য সেনা মুলতান ও পাঞ্জাব আক্রমণ করিল। প্রতাপচাঁদ পারস্যপতিকে করদানে স্বীকৃত হইলেন। প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিগণ সাম্রাজ্যের এক এক প্রদেশ অধিকার করিল। প্রতাপচাঁদের বংশধরগণ কনোজ হইতে পলাইয়া, কমলমীরের পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র প্রদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই প্রদেশ চিতোর ও মালপুরের নিকটবর্ত্তী। প্রতাপের বংশধরগণ এখন তৎপ্রদেশে রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহাদের উপাধি রাণা।

প্রতাপের অন্যতম সেনাপতিদের মধ্যে আনন্দদেব রাজপুত প্রসিদ্ধ। তিনি বৈশ্য জাতীয় ছিলেন। আনন্দ পাল মালবে বিস্তর সেনা সংগ্রহ করিয়া নেহারওয়ালা ও মাহারাট্টা জয় করিলেন। তিনি বিবারে রামগিরি ও মাণ্ডুর দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। মাণ্ডুর দুর্গও তাঁহার নির্ম্মিত। আনন্দ রায়, পারস্যরাজ খুস্রু পার্ভেজের সমসাময়িক। আনন্দ রায় ৩৬ বৎসর রাজত্বের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই সময়ে মালদেব নামক হিন্দু দোয়াবে সেনা সংগ্রহ করিয়া দিল্লী ও কনোজ অধিকার করিলেন। মালদেব কনোজে বাস করিতেন। তখন কনোজের পূর্ণ উন্নতি হইয়াছিল। তথায় তাম্বুল বিক্রয়ের ত্রিশ হাজার দোকান ছিল। তথায় ষাট হাজার নর্ত্তক ও গায়ক বাস করিত। মালদেব ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন। মালদেবের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। মুসলমানদের আক্রমণকালে ভারতবর্ষে এক জন সার্ব্বভৌম রাজা ছিল না। সুলতান মাহমুদ গজনবির সময়ে হিন্দুস্থানে নিম্নলিখিত কয় ক্ষুদ্র রাজা ছিল।

১ কনোজ, ২ মিরাট, ৩ মহাবন, ৪ লাহোর, ৫ কুমার রাজ, ৬ হরদত্ত-

রাজ, ৭ কুশচন্দ্র রায়, ৮ জৈপাল ইট পালের পুত্র, ৯ মালব, ১০ গুজরাট, ১১ আজমীর, ১২ গোয়ালিয়র প্রভৃতি।

মন্তব্য—কোথা হইতে ফেরেস্তা আপনার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। মহাভারত সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ। হিন্দুশাস্ত্রগুলি তিনি ভাল পণ্ডিতের নিকট শুনেন নাই। ভারতবর্ষ চিরকাল পারস্য-রাজের অধীন ছিল, তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস ছিল। পূর্ব্বকার ভারতবর্ষ ও পারস্যের সীমা পরস্পর সন্নিহিত ছিল। ইহা সম্ভব হইতে পারে, পারসীকেরা মধ্যে মধ্যে ভারতের সুদূর পশ্চিম সীমায় লুটপাট করিত। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা হিন্দু নামগুলি বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। ফেরেস্তা-বর্ণিত হিন্দুজাতির ইতিহাস কতদূর প্রামাণিক, তাহা পাঠকেরা বিচার করিয়া দেখিবেন। ফেরেস্তার প্রকৃত নাম মহম্মদ কাশিম হিন্দু শাহ। ফেরেস্তা শব্দের অর্থ দেবদূত।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

জৈনশাস্ত্র।

সমস্ত জৈন শাস্ত্র বিষয় হিসাবে চারি ভাগে বিভক্ত। এই ভাগের শাস্ত্রীয় নাম অনুযোগ কথন। জৈনেরা বলেন, এই সব অনুযোগই তীর্থঙ্করগণের উপদেশবাণী। জৈনগণ এই অনুযোগসমূহকে বিশেষ ভাবে মানিয়া থাকেন. অনুযোগচতুষ্টয় (১) দ্রব্যানুযোগ, (২) গণিতানুযোগ; (৩) চরণকরণানুযোগ; (৪) ধর্ম্মকথানুযোগ।

(১) দ্রব্যানুযোগ—দ্রব্যের ব্যাখ্যা। দ্রব্যের ছয় ভেদ। জৈন শাস্ত্র ইহাকে 'ষড় দ্রব্য' নাম দিয়াছে। ষড় দ্রব্য—জীবাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, এবং কাল।

জীবাস্তিকায়ের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

যঃ কর্ত্তা কর্ম্মভেদানাং ভোক্তা কর্ম্মফলস্য চ।
সংসর্ত্তা পরিনির্ব্বাতা স হ্যাত্মা নান্যলক্ষণঃ॥

কর্ম্মের কর্ত্তা, কর্ম্মের ফলভোগকারী, কর্ম্ম অনুসারে শুভাশুভগতি-বেত্তা, এবং সম্যক্ জ্ঞানপ্রভাবে কর্ম্মের নাশে সক্ষম যে আত্মা, তাহাই জীব। এই জীবকেই জীবাস্তিকায় বলা হইয়াছে।

ধর্ম্মাস্তিকায়—ইহা অরূপ পদার্থ। জীব এবং পুদ্গল এতদুভয়কে গতির সাহায্য করে। জীব ও পুদ্গলের চলিবার সামর্থ্য আছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মাস্তিকায়ের সহায়তা ব্যতীত তাহাদের গতি ফলীভূত হয় না,—যে প্রকার মৎস্যের চলিবার শক্তি আছে, কিন্তু জল ব্যতীত উহা কার্য্যকরী হয় না। মৎস্যের গতির পক্ষে জলের যেরূপ সহায়তার দরকার, জীব এবং পুদ্গলের গতির জন্য ধর্ম্মাস্তিকায়েরও ঠিক্ তেমনি সহায়তার দরকার। ধর্ম্মাস্তিকায়ের তিন ভেদ—স্কন্ধ, দেশ এবং প্রদেশ।

স্কন্ধ এক প্রকার সমূহাত্মক পদার্থ। দেশ স্কন্ধের ভাগের নাম। দেশ ভাগের আবার বিভাগকে প্রদেশ বলে।

অধর্ম্মাস্তিকায়—ইহা অরূপ পদার্থ। ইহার কার্য্য জীব এবং পুদ্গলকে স্থির হইবার সহায়তা করা। জল যেমন মৎস্যকে স্থির হইবার সহায়তা করে, বৃক্ষ যেমন পথিককে ছায়া দানে বিশ্রামের সহায়তা করে, অধর্ম্মাস্তিকায়ও তেমনি জীব এবং পুদ্গলকে স্থির হইবার সহায়তা করে। যদি এই পদার্থ না থাকিত, তবে জীব এবং পুদ্গল মুহূর্ত্তের জন্যও স্থিরতা লাভ করিতে সমর্থ হইত না। ধর্ম্মাস্তিকায় এবং অধর্ম্মাস্তিকায় পদার্থদ্বয় দ্বারা জৈনশাস্ত্র লোক এবং অলোকসম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত যুক্তির অবতারণা করে। যে সময় হইতে ধর্ম্মাস্তিকায় ও অধর্ম্মাস্তিকায়, সেই সময় হইতেই লোকের অস্তিত্ব, তৎপূর্ব্বে কেবল অলোকের বিদ্যমানতা। অলোকে আকাশ ব্যতীত কোন অতিরিক্ত পদার্থ নাই, এই জন্য লোকের অন্ত আছে। (১) কেননা পূর্ব্বোক্ত উভয় পদার্থের কোন পদার্থই লোকের পূর্ব্বে ছিলনা। এই না থাকায় গতিকে অলোকেরও কোন গতি ছিলনা। সুতরাং লোকের অন্তে জীব স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। জৈনশাস্ত্র বলে যদি এইরূপ না হইত, তবে কর্ম্মমুক্ত জীব ঊর্দ্ধগতি হইয়াও বিশ্রাম লাভ করিতে পারিত না এবং বরাবর ঊর্দ্ধেই চলিতে থাকিত। এই কারণে লোকের স্থান সিদ্ধশিলা বলিয়া কোন স্থানের অস্তিত্বই প্রমাণিত হইতে পারেনা।

অধর্ম্মাস্তিকায়েরও তিন ভেদ—স্কন্ধ, দেশ ও প্রদেশ।

আকাশাস্তিকায়ও অরূপ পদার্থ, ইহা জীব এবং পুদ্গলকে স্থান দান

---

১) যাবন্মাত্রং নভঃক্ষেত্রং তাবন্মাত্রং শিবাস্পদম্
লোকান্তে স্থিরতে জন্তোর্যোগ্যতা ন শিরতি। ইত্যাদি
লোক প্রকাশ, ৫৭ পৃঃ।

আছে। ইহারা উপদেশ ছলে সংসারী শ্রাবকদের নিকট জৈন মুনিগণ কর্তৃক কথিত। বৌদ্ধ শাস্ত্রে যেমনি 'জাতক' জৈন শাস্ত্রেও তেমনি 'কথা'। কথার অনেক গ্রন্থ আছে, প্রাকৃতেই বেশী, সংস্কৃতে অপেক্ষাকৃত কম। এই বিষয়ে চারিত্রজাতা, ধর্মকথা, বসুদেবহিন্ডী, ত্রিষষ্টিশালা কাপুরুষ চরিত্র, আরাধনা কথাকোষ, ধর্মপরীক্ষা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

শাস্ত্রোৎপত্তির সম্বন্ধে শ্বেতাম্বরীয় এবং দিগম্বরীয়দের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্বেতাম্বরীয়েরা বলেন এই শাস্ত্র সমূহ জৈন সাধু এবং তীর্থংকরগণ কর্তৃক রচিত। দিগম্বরীয়েরা বলেন কেবল মাত্র চতুর্বিংশতি তীর্থংকর মহাবীর স্বামীই এই শাস্ত্রসমূহের প্রণেতা।

অতি অল্প জৈন গ্রন্থই ছাপা হইয়াছে। রাশি রাশি হস্তলিখিত গ্রন্থ এখনও রহিয়াছে। আরাতে একটি জৈন লাইব্রেরী আছে, সেখানে অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি আছে। অধিকাংশই কীটদষ্ট এবং অস্পষ্ট। জৈনপ্রধান অনেক স্থানে এইরূপ পুঁথি আছে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

স্নেহলতা।

স্বয়ংবরে বরিয়াছ তুমি বৈশ্বানরে,
দেবতার আলিঙ্গন করি' অঙ্গীকার
তব স্পর্শে উচ্ছ্বসিত জীবন্ত বিস্তার
আত্মার জ্বলিছে আজ দেশ আলো ক'রে'
অপূর্ব হোমাগ্নি জ্বালি' বিবাহ-বাসরে,
দিয়াছ আহুতি তাহে দেহ মল্লিকার
"অনন্ত মরণ মাঝে জীবন-বিকার"—
এ সত্য কোথায় পেলে তব খেলা ঘরে?
এ জগতে প্রাণ চায় স্বচ্ছন্দ বিকাশ;
ফুলের ফুটিতে চাই উদার আকাশ।
দাস মোরা চিরবন্দী শাস্ত্র-কারাগারে,
উন্মুক্ত আকাশ হেরি' শুধু ভয় পাই
জেনেছ যে সত্য-বহ্নি শিখার আকারে,
এ মৃত সমাজ তাহে পুড়ে হো'ক ছাই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

জনপ্রিয় শরৎকুমার।

১লা ফাল্গুন শুক্রবার কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ-বণিক্ ও প্রকাশক শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। শরৎবাবু কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অপরাহ্ণে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময়ে মহাকাল তাঁহাকে হরণ করিলেন। তিনি পুণ্যশ্লোক রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র। পিতার অনেক সদ্‌গুণ পুত্রে বর্ত্তিয়াছিল বিশ্রাম ও আলস্য কাহাকে বলে, শরৎবাবু তাহা জানিতেন না। কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা আত্মীয়বিয়োগ বেদনা অনুভব করিয়াছি।—ভগবান তাঁহাকে শান্তি ও শোকার্ত্ত পরিবারে সান্ত্বনা দান করুন। শরৎবাবুর বদান্যতার ফলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপনার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। শরৎকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, কালে তাহা মহামহীরুহে পরিণত হইয়া, শরৎবাবুর স্মৃতি বাঙ্গালীর মানস পটে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।
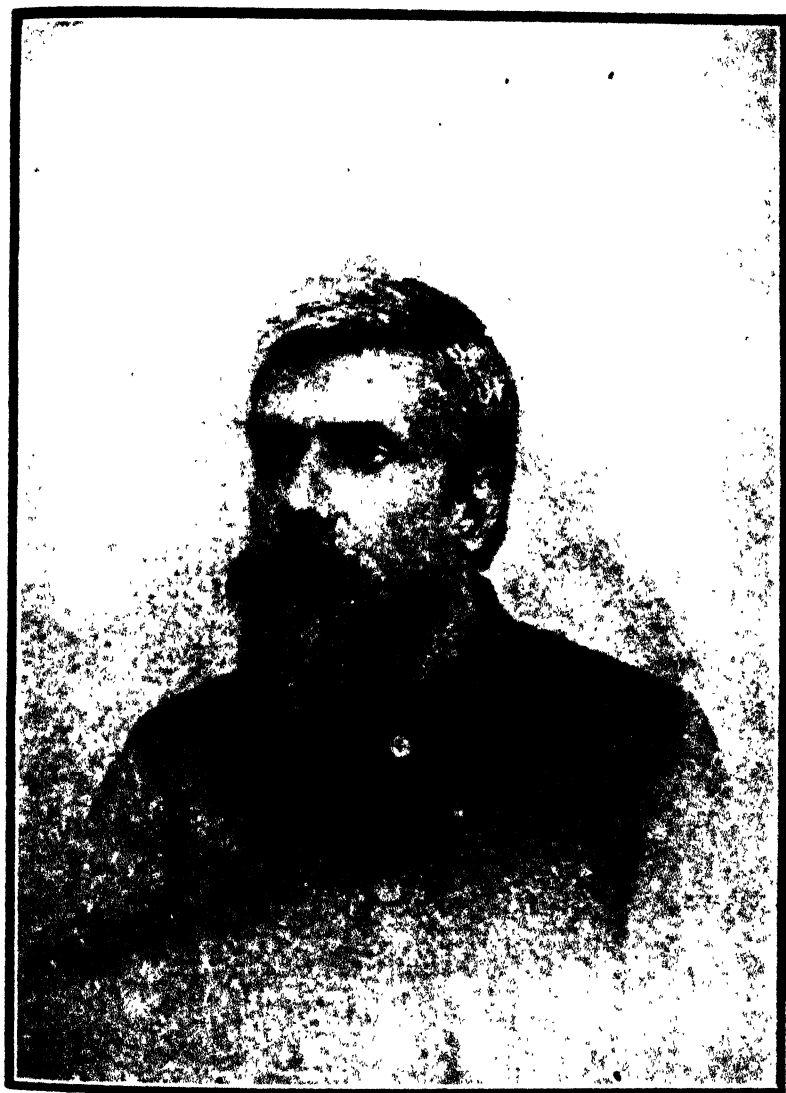
স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী

চিত্র শিল্পে বিজ্ঞান।

শিল্প জাগতিক উন্নতি ও সুখ সৌকর্য্যের প্রধান সাধন; সাহিত্য তাহার প্রাণ; পক্ষান্তরে, সাহিত্যে শিল্পের অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত। সুতরাং শিল্প লইয়াই জগতের সাহিত্য, সাহিত্য লইয়াই বিশ্বের শিল্প, উভয়েই যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মানব যখন সেই সুদূর অতীত যুগে তাঁহাদের সর্ব্ববিধ নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান-কল্পে পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইতেছিলেন, অহরহঃ অভাবের ভীষণ তাড়নায় বিচলিত হইয়া বিধিপ্রদত্ত চিন্তাশক্তিসহ কালের অনির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতেছিলেন, তখনই তাঁহাদের অনাবিল হৃদয়ে প্রথমেই সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত দৈবশক্তির যে অভিনব প্রথমস্ফুরণ উদ্ভূত হইয়াছিল, আর্য্য ভাষায় তাহারই নাম 'উদ্ভাবনা'। তাহার পর সেই উদ্ভাবনা শক্তির সহায়তায় মানব ক্রমে যখন তাঁহাদের নিত্য নব নব অভাব সমূহ মোচন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সাধনা পথে যাহা প্রাপ্ত হইলেন, তাহার নাম রাখিলেন, "বিজ্ঞান"। অনন্তর সেই বিজ্ঞান-পরিচালিত কর্ম্মের নামান্তর 'শিল্প' বলিয়া তাঁহারা জগতে প্রচার করিলেন।

বাস্তবিক, বিজ্ঞানই সমগ্র শিল্পের প্রধান সাধন, জীবাত্মা-পরমাত্মার ন্যায় একত্র জড়িত—প্রকৃতি পুরুষের ন্যায় যেন নিত্য অবিভাজ্য। ফলতঃ একের অভাবে অন্যের সার্থকতা কোন রূপেই উপলব্ধ হয় না। সেই কারণ মানবের প্রত্যেক ইচ্ছা ও ক্রিয়া, যথাক্রমে বিজ্ঞান ও শিল্প নামেই অভিহিত! আর্য্য পিতামহগণ এই বিস্তৃত শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্রকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, পরে সূক্ষ্ম চতুঃষষ্টি বিভাগে তাঁহাদের সমুদায় শিল্প ও বিজ্ঞানবিধির প্রচার করিয়া গিয়াছেন। চিত্রশিল্প সেই সকলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুকুমার কলা। এক কথায় বিশ্বের সকল ভাবই চিত্রের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যাহা প্রত্যক্ষ, তাহা যেমন সুস্পষ্ট ভাবে চিত্রে প্রতিভাত হয়, যাহা কিছু জগতের অপ্রত্যক্ষ বিষয়, তাহাও সেইরূপ ভাবে চিত্রে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়।

ইহাকেই চিত্রের সমুন্নত ভাব বলে। যিনি চিত্রের সেই অভিনবভাবে অভিজ্ঞ, তাঁহার নিকট চিত্রশিল্প যে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু নিতান্তই যাহা সাধারণের সহজ বোধ্যরূপে চিত্রে অভিব্যক্ত হইতে দেখা যায় না, তাহা সেই চিত্রেরই বিভিন্নরূপ, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ভাষার 'অক্ষর চিত্রে' তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। 'অক্ষর' ভাষার সাঙ্কেতিক চিত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং চিত্র শিল্পের সহায়তায় যে বিশ্বের সকল ভাবই সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব ভাব ও ভাষার মধ্যে যাহার প্রতিষ্ঠিত শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহার মূল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও যে নিতান্ত সামান্য নহে, একথা বলাই বাহুল্য। [পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কোনও শিল্পের উপায় বা তাহার 'পন্থার' নির্দ্দেশকেই তাহার 'বিজ্ঞান' বলে। চিত্র শিল্পের অভ্যাস ও তাহার ভাব-পরিস্ফুরণ-কল্পে যে সকল উপায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই ইহার বিজ্ঞান। তাহা যেমন উন্নত, তেমনিই বিবিধ বিভাগে প্রসারিত। বোধ হয় জগতে এমন কোনও বিষয় নাই, যাহা উন্নত চিত্র-বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত নহে। আমাদের রসায়ন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, গণিত, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, শারীরবিজ্ঞান, আনন বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি, মূল কথায় বিজ্ঞানমূলক সকল শাস্ত্রই ইহাতে বিশেষভাবে আবশ্যক। চিত্রশিল্পের সামান্য আলিম্পন বা রেখাঙ্কন হইতে সমুন্নত-চিত্রকলা বর্ণচিত্রণ পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়।

রেখাচিত্রণকালে রেখাগণিত বা জ্যামিতি যেমন প্রথম হইতেই প্রয়োজনীয়, উহার উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জ্যামিতির ও উচ্চতর বিষয় 'পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান' বা (perspective) পার্সপেকটিভেরও তেমনই প্রয়োজন হইয়া থাকে। যে কোনও ভাষার শিক্ষাকল্পে যেমন সেই ভাষার ব্যাকরণ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা আবশ্যক, ব্যাকরণ ব্যতীত সেই ভাষায় বিশুদ্ধভাবে লিখিতে বা বাক্য রচনা করিতে পারা যায় না, তেমনই চিত্রশিল্পের বা চিত্ররূপ ভাষার ব্যাকরণ স্বরূপ এই পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা না থাকিলে, উহার একটি রেখাপাতও বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। 'চিত্র' বিদ্যা এক হিসাবে যেমন উৎকৃষ্ট শিল্প, সাধারণভাবে তেমনই সার্ব্বজনীন ভাষাও বটে। পণ্ডিত-সমাজ বলিয়া থাকেন, সকল ভাষাই ভাষান্তরিত করিয়া বা অনুবাদ করিয়া ভিন্ন ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিতে হয়; কিন্তু চিত্রশিল্পরূপ ভাষার আদৌ অনুবাদের প্রয়োজন হয়

না। 'অশ্ব' বলিলে আমরা সকলেই যে চতুষ্পদবিশিষ্ট জীবকে বুঝিয়া থাকি, একজন ইংরাজ সেই অশ্ব শব্দ শুনিয়া তাহা বুঝিতে পারিবেন না; তাঁহাকে বুঝাইতে হইলে, তাঁহাদের ভাষায় (Horse) শব্দে তাহা অনুবাদ করিয়া দিতে হয়। কিন্তু কয়েকটি রেখাপাতে একটি অশ্বের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিলে, আমরা যেমন তাহা অশ্ব বলিয়া বুঝিব, ইংরেজ ও তাঁহার ভাষায় 'হর্স' বুঝিবেন; আবার একজন কাফরী বা আদিম আমেরিকা-বাসীও তাঁহাদের স্ব স্ব ভাষায় অশ্বকে যাহা বলে, তাহাই বুঝিবে। য়ুরোপের জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন,—"Drawing is a simple kind of short hand which requires no translation." সুতরাং চিত্রশিল্পকে কেবল ভাষা নহে, বিশ্বের ভাষা বা সাধারণের ভাষাই বলিতে হয়। কোনও সংকীর্ণ প্রাদেশিক ভাষায় ইহার সহিত তুলনা হইতে পারে না। এ ভাষারও ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিধি—সমস্তই আছে; তাহা শিক্ষার্থীর ও অনুরাগীর রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন হয়। অতএব ইহা নিতান্ত নিরক্ষরের বিষয় নহে! আমাদের দেশের কবির গান, তর্জ্জার গান যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, কবিওয়ালাদের বা তরজাওয়ালাদের ছন্দঃ ব্যাকরণ ও অলঙ্কারাদি ভাষা বিজ্ঞানে বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও কেবল অভ্যাসবশে, তাহারা যেরূপ পদযোজনা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা বস্তুতই অত্যন্ত বিস্ময়প্রদ! কোনও কোনও স্থলে তাঁহারা উচ্চ কবিত্বেরও পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সকল স্থলেই বা সকলেই উচ্চ অঙ্গের কবিজনসুলভ ভাব ভাষা ও বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। সাধারণ শ্রোতা অবশ্যই তাহা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট তাহা অবিদিত থাকে না। তাহার প্রধান কারণ, উচ্চ শ্রেণীর রচয়িতাদিগের অনেকেই ভাষা বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ! চিত্রশিল্পেও সেইরূপ অনেকে চিত্র রচনা করিয়া সাধারণের মনস্তুষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু তাহার বিশুদ্ধির অভিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সেই জন্য এদেশীয় চিত্রকর জাতি বা পটুয়াগণের চিত্রের কোনও কালেই বিশেষ আদর নাই। কিন্তু শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষিত চিত্রকর মাত্রই যে পটুয়াদিগের অপেক্ষা উন্নত বা চিত্র বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ, একথাও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায় না। বরং অনেককে সভ্য শ্রেণীর পটুয়া বলাই অধিকতর সঙ্গত। এক পক্ষে পটুয়াগণ বংশপরম্পরায় অনুশীলনের ফলে যে শিক্ষা ও জ্ঞান স্বাভাবিক ভাবে অর্জন করিয়া থাকে, শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পক্ষে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।

বাঙ্গলা দেশের বহু গৃহে প্রতিমা পূজা হইয়া থাকে ; সেই উপলক্ষে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে, গ্রামের নিরক্ষর দরিদ্র পটুয়া গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া প্রতিমা চিত্রিত করিতেছে, রাত্রিকালেও বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে তৈল প্রদীপটি ধরিয়া আছে, তাহারই নিম্নে কনিষ্ঠার অথবা মণিবন্ধে মৃণ্ময় বর্ণপাত্র বা ডাওটি সূত্র সহযোগে আবদ্ধ, একপদ কাষ্ঠের চৌকিতে অন্যপদ প্রতিমার উপরেই সন্তর্পণে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে তুলিকা ধারণ করিয়া প্রতিমায় বর্ণ বিলেপন করিতেছে ; যাহা একবার লেপন করিতেছে, তাহা আর সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিতেছে না ; তাহার না আছে কম্পাস, না আছে রবার ; তাহার নিপুণ হস্তে একবারে যাহা বাহির হইতেছে, তাহাই রহিয়া যাইতেছে ; অথচ তাহার কর্ম্মান্তে সে চিত্রণ নিতান্ত মন্দও দেখায় না। ইহা বংশানুক্রম ও তাহাদের আজন্ম অভ্যাসের ফল। ইহা প্রাচ্য চিত্রশিল্প-প্রণালীর অতি ক্ষীণ ও হীন শেষ আদর্শ! বর্ত্তমান সময়ে শিল্পবিদ্যালয়ের কোনও শিল্পীই এমন সহজভাবে চিত্রণ কার্য্য করিতে পারিবেন না ; কিন্তু তাঁহা-দের মধ্যে যাঁহারা চিত্রের উন্নত বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হইয়া চিত্রকলা শিক্ষা করিয়া-ছেন, তাঁহারা চিত্রে যে সকল বিষয় প্রতিভাত করিতে পারিবেন, পটুয়াগণ প্রাণান্ত-পরিশ্রমেও তাহা কখনই সম্পন্ন করিতে পারিবে না। সে সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাহাদের যে আদৌ নাই ; সে শিক্ষা তাহারা যে আদৌ প্রাপ্ত হয় নাই, অথবা বংশানুক্রমে তাহারা তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

বলিতেছিলাম, পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান বা চিত্রবিদ্যার ব্যাকরণের জ্ঞান ব্যতীত চিত্রের একটি রেখাপাতও পরিশুদ্ধ হইতে পারে না, এবং শিল্পীর দৃষ্টিশক্তি আশানুরূপ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। চিত্র-বিদ্যান্তর্গত পরি-প্রেক্ষিত নামক এই পারিভাষিক শব্দটি আমাদের বাঙ্গলায় বা ভারতে নূতন নহে ; বহু প্রাচীনকাল হইতে 'মানসার' প্রভৃতি প্রাচীন শিল্পগ্রন্থেও তাহার উল্লেখ আছে। ইহার ব্যুৎপত্ত্যর্থ ধরিলে জানিতে পারা যায়,—(পরি + প্র + ঈক্ষ = দর্শন করা + ক্ত), বস্তুসকল বাস্তবিক সত্ত্বাকারে যেরূপ প্রতীয়মান হয়, আলেখ্যে তদনুরূপ ভাববোধক চিত্র বিন্যাসের নিয়ামক বিজ্ঞান, বা বিদ্যা। ইহার দ্বারা সকল দ্রব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিবার ক্ষমতা জন্মে। এবং দ্রব্য সম্মুখে, পার্শ্বে, নিকটে বা দূরে থাকিলে কিরূপ দেখায়, শিল্পী না হইলেও, সামান্য মনোযোগ দিয়া দেখিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রেলওয়ে ষ্টেশনের উপর দাঁড়াইয়া রেলপথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে

দেখিতে পাওয়া যায়, রেল লাইন যতই দূরবর্ত্তী হইতেছে, ততই যেন সূক্ষ্ম মুখ হইয়া মিলিয়া যাইতেছে; রেলগাড়িটি যখন ষ্টেশনে উপস্থিত হয়, তখন তাহা কত বড় দেখায়, কিন্তু ষ্টেশন ছাড়িয়া যতই দূরে যাইতে থাকে, ক্রমে ততই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর বলিয়া মনে হয়। দর্শকের নিকটে, দূরে মধ্য পথে কিংবা বহুদূরে থাকিলে কোন্ বস্তু কত বৃহৎ বা কত ক্ষুদ্র পরিলক্ষিত হয়, চিত্রে তাহাই যথাবিধি প্রতিভাত করিবার প্রয়োজন হয়, এবং একমাত্র পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানই সে কার্য্যে শিল্পীর সহায়তা করে। যে শিল্পী চিত্রের প্রথম রেখা অঙ্কনে পরিপ্রেক্ষিত বিধানে তাহার নির্দ্দেশ করিতে না পারেন, তিনি সহস্র চেষ্টা করিয়াও বিবিধ বর্ণ সম্পাতে সেই প্রকৃতানুরূপ ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন না, কারণ, তাহার পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান-লব্ধ সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টির সম্পূর্ণ অভাব, সে ভাব উক্ত বিজ্ঞানের সম্যক্ আলোচনা ব্যতীত আয়ত্ত হইবার উপায় নাই। তাহা শিক্ষা করিতে হইলে রেখাগণিত বা জ্যামিতি ও দৃষ্টি-বিজ্ঞান (Optics) সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। সাধারণ চিত্রকর বা পটুয়া জাতিরা নিত্য অভ্যাসের ফলে রেখাপাতের দৃঢ়তা বা বর্ণবিন্যাসে যথেষ্ট নিপুণতা লাভ করিতে পারে; কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান শিক্ষার অভাবে সকল বস্তুর সমকালীন অবস্থাবোধক ভাব চিত্রে প্রকাশ করিতে পারে না। উন্নত প্রতীচ্য খণ্ডে তাহার যথেষ্ট আলোচনা আছে, সে দেশের শিল্পীরা প্রায় সকলেই তাহাতে অভিজ্ঞ। তাঁহাদের কোনও চিত্র দেখিলে বোধ হয়, তাহা যেন ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্রের ন্যায় প্রত্যক্ষ চিত্র। আমাদের কেহ কেহ অতি বিজ্ঞের ন্যায় বলিয়া থাকেন, অমন প্রাচ্য শিল্পের মধ্যে প্রতীচ্যভাবের সেই বিসদৃশ ছায়া মিলাইবার প্রয়োজন কি? সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত শিল্পানভিজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তিগণের অনেকেও হয় ত তাহার সমর্থন করিয়াও থাকেন; কিন্তু তাঁহারা জানেন না, পূর্ব্বে আমাদের কি ছিল, আর এখনই বা কি আছে। ভারতের এমন দিন গিয়াছে, যখন জগতের সকল সভ্য জাতিই তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারিলে ধন্য অনুভব করিয়া আপনাদিগকে ধন্য বোধ করিত। সে কালে ভারতের চিত্রশিল্প বিজ্ঞান-বিহীন ছিল না। সর্ব্বদেশে সর্ব্বসময়েই সকল কার্য্যের মধ্যেই দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক, উন্নত, অন্য, সাধারণ। এক স্বেচ্ছায় চিত্ত বিনোদনে, অন্য কেবল উদরান্ন-সংগ্রহের অভিলাষে কার্য্য করিয়া থাকে। যাহারা কেবল অর্থলালসায় চিত্রাদি যে কোনও শিল্পের অনুশীলনে জীবন অতিবাহিত করে, তাহারাই সাধারণ শ্রেণীর লোক;

তাহারা কোনরূপে ক্রেতার মনস্তুষ্টি করিতে পারিলেই কৃতার্থমনা হয়। আর যাঁহারা ভাবের বশে আত্মতৃপ্তির অভিলাষে প্রাণপণে শিল্প সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই উন্নত শ্রেণীর শিল্পী; তাঁহারা যে কোনও শিল্পে তাঁহাদের অসাধারণ চিন্তাশক্তির যে বিকাশ করিয়া যান, তাহা প্রকৃতই অনির্ব্বচনীয়। প্রাচীন-কালে ভারতের অন্যান্য শিল্পের ন্যায় চিত্রকলাতেও এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল, তাহা অবশ্যই সুধীমণ্ডলীর অবিদিত নাই। সামান্য গৃহস্থ হইতে রাজন্য-বর্গ পর্য্যন্ত সকলের গৃহেই সে কালে চিত্রকলার যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। ভারতের ঋষি ও কবিকুল আলোকচিত্রের ন্যায় তাঁহাদের কাব্য-মকুরে সে সকল সুস্পষ্ট-ভাবে সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস, তাঁহার শকুন্তলার রাজা দুষ্মন্তের মুখে বলিয়াছেন :—

> "কার্য্যা সৈকতলীন হংসমিথুনা স্রোতোবহামালিনী।
> পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণচমরা গৌরী গুরোঃ পাবনাঃ॥
> শাখালম্বিত বল্কলস্য চ তরোর্নির্ম্মাতু মিচ্ছাম্যধঃ।
> শৃঙ্গে কৃষ্ণ মৃগস্য বাম নয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্॥"

অর্থাৎ স্রোতস্বতীমালিনী গৌরী গুরু হিমালয়ের গিরি-অঙ্কে ধীরে ধীরে প্রবাহিত, তাহারই বালুকাময় সৈকত-প্রদেশে ক্রীড়াপরায়ণ হংসমিথুন সকল লীন হইয়া রহিয়াছে, বৃক্ষ শাখায় বল্কল বিলম্বিত তাহারই নিম্নে একটি কৃষ্ণসার দাঁড়াইয়া, একটি মৃগী নিজ বাম নয়ন সেই কৃষ্ণসারের শৃঙ্গে কণ্ডূয়ণ করিতেছে। এইরূপ দৃশ্য চিত্রের পশ্চাৎ দিকে বা তলপৃষ্ঠে (Back ground) অঙ্কিত করিতে হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, চিত্রের সম্মুখ অংশে শকুন্তলাদির প্রতিমূর্ত্তি, তাহার পশ্চাতে অতি সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী, তাহা আবার বহুদূর বিস্তৃত রহিয়াছে। দূরত্ব হেতু মালিনীর সেই সৈকত পর্য্যন্ত সকল বস্তুই ক্রমে যেন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া যাইতেছে, সেই কারণ হংস মিথুনাদি অস্পষ্ট ভাবে সেই সৈকতসহ লীন হইয়া যাইতেছে। এই লীন বা ভ্যানিশিং (Vanishing) ভাব, পরিপ্রেক্ষিত-বিজ্ঞান-জ্ঞানেরই পরিচায়ক। সাধারণ শিল্পী এ সকল উচ্চ-বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে সে কালে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ না থাকিলেও, উচ্চশ্রেণীর সৌখীন শিল্পীরা তাহা ভাল রূপেই জানিতেন, পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক ও অন্যান্য কাব্যাদির মধ্যে স্থানে স্থানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্ন শ্রেণীর উপ-

প্রবীণ চিত্রকরেরা সর্ব্বকালেই তাহাদের সাধারণ চিত্রের মধ্যেও সেই সকল উচ্চ অঙ্গের চিত্রাদির অনুকরণ পূর্ব্বক পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানের কতক কতক ভাব বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এইরূপে যে কোনও শিল্পী বৈজ্ঞানিক ভাবে শিক্ষিত না হইলেও, আজীবন অভ্যাস ও বহুদর্শিতার ফলে চিত্রের মধ্যে পরিপ্রেক্ষেতিক নীতি কিছু না কিছু নিশ্চয়ই প্রকাশ করিয়া থাকেন। যিনি মুখে বলেন, আমি পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান মানি না, তাঁহারও চিত্রে উক্ত বিজ্ঞানের অলক্ষ্য প্রভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে চিত্ররূপে যে কোনও বস্তুর সত্তাকালীন ভাবের বিকাশ করে একটি মাত্র রেখার অঙ্কনও পরিপ্রেক্ষিত নীতির সহায়তা ব্যতীত সম্ভবপর নহে।

অনন্তর চিত্রের ছায়ালোক সমাবেশের কথা। ইহাও আলোক ও ছায়া-তত্ত্বের উচ্চ বিজ্ঞানসম্মত নীতি। এই ছায়ালোকের সাহায্যেই চিত্রের সমতল আধারের উপর সকল বস্তুর উন্নত অনুন্নত ভাব অনুকৃত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য সুধীগণ বলেন—"Light & shade is the form of painting." চিত্রকরণের উপযোগী কাগজ বা বস্ত্র খণ্ড স্বভাবতঃই সমতল, তাহার মধ্যে কোনও অংশ উন্নত বা অনুন্নত নাই, কেবল ছায়াপাতের সাহায্যেই উহাতে উচু নীচু ভাব ফুটিয়া উঠে। যে কোনও একখানি সুন্দর চিত্র দূর হইতে দেখিলে তাহাতে চিত্রিত সকল বস্তুই স্পষ্ট বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইবে, তাহাতে উচু নীচু, নিকট দূর, সকল ভাবই দেখা যাইবে, কিন্তু চিত্রের নিকটে যাইয়া তাহার উপর হস্ততালু বিলেপন করিলে চিত্রাধারের ক্ষেত্র সমতল ব্যতীত অসমান বোধ হইবে না। সে চিত্র-ক্ষেত্র চিত্র অঙ্কিত হইবার পূর্ব্বেও যেমন সমতল ছিল, এখনও তেমনই সমতল আছে, কিন্তু আবার দূর হইতে দেখিলে সেই উচ্চ অনুচ্চভাব বোধগম্য হইবে। ছায়ালোকই তাহার কারণ। যে শিল্পী আলোক ও ছায়ার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অভিজ্ঞ তাঁহারই চিত্র অধিকতর স্বাভাবিক হয়। পরিপ্রেক্ষিতের সহিত ছায়া-বিজ্ঞানও জড়িত, যিনি তাহাতে অনভিজ্ঞ, তিনি ছায়াতত্ত্বও ভাল বুঝিতে পারিবেন না। যাহা হউক, এই আলোক ও ছায়াই চিত্রের উচ্চ অনুচ্চভাবের বোধক। কেবল চিত্র বলিয়া নহে, সমগ্র বিশ্বই আলোক ও ছায়ার সম্পাতে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, যাহা কিছু ভালমন্দ বলিয়া অনুভব করিতেছি, সে সমস্তই আমাদের চিরবরেণ্য সবিতা দেবতার

কৃপায় তাঁহারই শুভ্রজ্যোতিঃ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ আলোক স্বয়ং প্রকাশমান নহেন, ছায়া তাহার অংশ সম্ভূতা; ছায়াই আলোকের শক্তি, ছায়া ব্যতীত আলোক সম্পাতের অস্তিত্ব বোধ কখনও সম্ভবপর হইত কিনা কে জানে! দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে আলোক, সেইখানেই তাহার ছায়া; আলোক না থাকিলে যেমন তাহার ছায়া থাকে না, তেমনি ছায়া না থাকিলে, বোধ হয় আলোকের অস্তিত্ব থাকিত না। জীব ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথের যে অত্যুজ্জ্বল শুভ্র আলোক জ্যোতিঃ নয়নেন্দ্রিয়ে প্রথমে ধারণা করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করে, যাহার সাহায্যে জীবের অন্যান্য অঙ্গও পরিপুষ্ট হয় তাহাই আলোক, কিন্তু ছায়া, তাহার পার্শ্বে পার্শ্বেই চিরদিন সমভাবে বিদ্যমান। তবে, যখন যেমন আলোক, তাহার ছায়াও তদনুরূপ। উজ্জ্বল আলোকের পার্শ্বে গভীর ছায়া, অল্প আলোকের পার্শ্বে ক্ষীণ অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই আলোকের নিত্যধর্ম্ম। সুতরাং সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপিণী ছায়াই আলোকের সহিত দম্পতীযুগলের ন্যায় নিত্য অবিভাজ্যভাবে অবস্থিতা হইয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল সামগ্রীরই অস্তিত্ব সপ্রকাশ করিয়া থাকে। চিত্রের মধ্যেও সেই আলোক ও ছায়ার যথাযথ বিন্যাসেই চিত্রক্ষেত্রস্থিত সকল বস্তুর প্রকৃত অবস্থা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অবস্থা স্থান ও কাল ভেদে ছায়ালোকের বহু তারতম্য হইয়া থাকে, তাহার অনুকরণ করিয়াই শিল্পী চিত্রের নানাভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হন।

চিত্রবিদ্যান্তর্গত সর্ব্বরূপ প্রকাশক এই ছায়াতত্ত্ব শিবানুকল্পিত সঙ্গীত বিজ্ঞানেও প্রযুক্ত হইতে পারে; সংগীতের সপ্তস্বর ও তিন গ্রামে যেমন ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর বিকাশ হইয়া থাকে, চিত্রের মধ্যেও আলোক-ছায়ার সপ্ত বিভাগে ঠিক সেইরূপ সকল ভাবই প্রকাশিত হয়। সঙ্গীতের ন্যায় চিত্রকলার মধ্যে তাহার রাগ আছে, রাগিণী আছে, তাল লয় মান সকলই আছে; আর্য্যঋষিগণ তাহা বিলক্ষণ জানিতেন; আমাদের দুরদৃষ্ট, আমরা সেই পৈতৃক সম্পদে বঞ্চিত হইয়া ভিখারীর ন্যায় অন্য প্রদত্ত মুষ্টি ভিক্ষার প্রতি চাহিয়া আছি। সে যাহা হউক, সঙ্গীতের অতি সূক্ষ্ম রাগ রাগিণীর নির্দ্দেশও আর্য্য প্রতিভাসম্ভূত। এই বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশ জগতের অন্য কোনও সঙ্গীতে নাই, অথবা অন্য সকল সঙ্গীতই তাহার অতি হীন অনুকরণমাত্র। বোধ হয়, সকলেই জানেন, ভারতীয় সঙ্গীত কলাবিদ, যখন তখন যে কোন রাগ রাগিণীর আলাপ করেন না, অপিচ নব শিক্ষার্থীকে তাহার অকাল আলাপে পুনঃ পুনঃ নিষেধ

করিয়া থাকেন। প্রাতে ভৈরবাদি রাগ ও তদনুগত রাগিণীগুলির আলাপের সময়, সন্ধ্যায় তাহার আলাপন নিষিদ্ধ; আবার শ্রী পূরবী আদি কোন ক্রমেই উষার আলাপ্য রাগ বা রাগিণী নহে। কেন এই কঠোর নিষেধ, তাহা অধুনা অনেক সঙ্গীতজ্ঞ বোধ হয় অবগত নহেন। সুধীমণ্ডলীর অবগতির জন্য আমি আমার জীবনের একটি দিনের ঘটনা এ স্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে অনেক দিনের কথা। আমি এক সময় হিমালয়ের কোনও নিভৃত প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে এক মহাত্মার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একজন সাধু তাঁহার শিষ্যকে সঙ্গীতের শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, শিষ্য বহু পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াও গুরুর কণ্ঠ-নিঃসৃত স্বরের ঠিক অনুকরণ করিতে পারিতেছে না। গুরু তখন শিষ্যের গ্রীবা ও পশ্চাতের নিম্ন কপালাস্থির উপর কোনও কোনও শিরা টিপিয়া ধরিলেন, এবং শিষ্যকে স্বর উচ্চারণ করিতে উপদেশ দিলেন। তখন স্বাভাবিকভাবে তাহার অভিলষিত স্বরের বিকাশ হইতে লাগিল। আমি কৌতূহলপরবশ হইয়া তথায় কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া তাঁহাদের শিক্ষা প্রণালী পরিদর্শন করিলাম। দেখিলাম, যেমন হারমোনিয়াম যন্ত্রে চাবি টিপিলে পর পর সকল সুর বাহির হয়, গুরুজী সেইরূপ শিষ্যের গ্রীবার উপরিস্থিত নির্দ্দিষ্ট স্থান টিপিয়া ধরিলেন এবং শিষ্য গলায় আওয়াজ দিবামাত্র অভিলষিত স্বর বাহির হইতেছে। এমন অদ্ভুত ক্রিয়া আমি আর কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই। অদৃষ্টক্রমে সেই মহাপুরুষের সাক্ষাতে তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। বুঝিলাম যে, সময়ে বা অসময়ে সকল স্বরই এই ভাবে বাহির করা যাইতে পারে। আমি যতক্ষণ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত ছিলাম, তাহার মধ্যে সুর সম্বন্ধে আলোচনায় আরও অবগত হইলাম, আমাদের কণ্ঠে সময়ানুসারে কতকগুলি সুর স্বাভাবিকভাবে বাহির হয়, তাহারই যথাযথ সমাবেশ করিয়া ঋষিগণ এক একটি রাগ বা তদনুগত রাগিণীর আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই রাগ বা রাগিণী কালবোধক।

চিত্রের মধ্যেও সেইরূপ কালবোধক উন্নত প্রাকৃতিক ভাব আছে, তাহাই উৎকৃষ্ট নিসর্গ চিত্রের রাগ বা রাগিণী প্রভৃতি শব্দের ক্রমমেল (the Harmony of the sounds) দ্বারা শব্দতরঙ্গ উত্থিত হইলে যে কালবোধক রাগিণীর বিকাশ করিয়া দেয়, ছায়ালোকের ক্রমমেল (the Harmony of the light & shade) দ্বারা সেইরূপ আলোকের রশ্মিতরঙ্গের মধ্যেও তাহার কাল অথবা রাগাদির ভাব নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। যে শিল্পী সেই

আলোক ও ছায়াতত্ত্বে অভিজ্ঞ হইয়া তাঁহার কল্পিত চিত্রের মধ্যে তাহার বিকাশ করিতে পারেন তিনি উক্ত শ্রেণীর চিত্রকর বা শিল্পীরূপে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন।

আমরা নিত্য ঘড়ি ধরিয়া বসিয়া থাকি অথচ "এখন বেলা কত?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে ঠিক তাহার উত্তর দিতে পারি না, তখনই ঘড়ি দেখিতে হয়। যদি নিকটে ঘড়ি না থাকে, তবে বাহিরের আকাশ ও আলোক রশ্মি দেখি, অনেক সময় কতকটা আনুমানিক সময় বলিতেও সমর্থ হই, কিন্তু প্রায় নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। অথচ সাধারণ কৃষক, ঘরামি বা রাজমিস্ত্রী প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা প্রায় ঠিক সময় বলিয়া দিতে পারে। যখন তাহাদের কর্ম্মের পর ছুটী হয়, তখন কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না যে, এখন কত বেলা। তাহারা "তারা" বা গ্রহের "মউকা" হইতে অমনি নামিল আপনি ঘড়ি খুলিয়া দেখুন, প্রায় ঠিক সময়, হয়ত দুই চার মিনিটের এদিক ওদিক হইবে মাত্র। আমাদের ন্যায় তাহাদের ঘরে বাহিরে ঘড়ি নাই তথাপি সময় নির্দ্দেশ করিবার পক্ষে তাহাদের যথেষ্ট উপায় আছে। তাহারা আমাদের অপেক্ষা প্রকৃতির অধিক অনুগত, সেই কারণ প্রকৃতি দেখিয়াই বা প্রকৃতির নয়নস্বরূপ আলোকের দীপ্তি দেখিয়াই তাহারা যখন তখন সময় নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু তাহারা প্রকৃতি-পাত্রে কি কেবল আলোক দেখে না তাহার ছায়া দেখে, অথবা আলোক ছায়া উভয়ই দেখে? সুবিজ্ঞ শিল্পিগণ বলেন, তাহারা আলোক ও ছায়া দুইই দেখে। আলোকের তেজ, গতি ও বর্ণ, ছায়ার রূপ, গঠন ও গাম্ভীর্য্য সমস্তই তাহারা দেখে কিন্তু সঙ্গীতস্বরে স্বাভাবিক বুদ্ধ পক্ষীর ন্যায় তাহারা ঠিক বলিতে পারে না যে, তাহারা কি দেখে? যাহা হউক সঙ্গীতের সকল রাগ-রাগিণীর মূলীভূত সপ্তস্বর ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদের ন্যায় চিত্রেরও সপ্তবিধ ছায়ালোক বিধান আছে। উজ্জ্বলালোক (High light), আলোক (light), মধ্যমালোক (middle tint), দ্বিতীয় মধ্যমালোক (2nd middle tint), ছায়ালোক (Shade tint), ঘনচ্ছায়ালোক (deepshade tint), ও প্রতিবিম্বিতালোক (Reflect tint), আলোক ও ছায়ার এই সপ্তবিভাগেই চিত্রের সকল ভাব সকল কাল নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত আলোকাত্মক সপ্তবর্ণও ছায়ালোকের সম্পূর্ণ সহায়তা করে ইহার সাহায্যেই প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন ও নিশা, ইহার সাহায্যেই শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুকের সমস্ত

প্রতীতি হয়। সাধারণ শিল্পী বৈজ্ঞানিক ভাবে শিক্ষার অভাবে আলোক ও ছায়াতত্ত্বের এই সূক্ষ্ম রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইলেও সুনিপুণ বিজ্ঞানবিদ শিল্পীরা তাঁহাদের নিপুণ হস্তে সে সকল ভাব চিত্রের মধ্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন। সে চিত্র দেখিলে চিত্রের কাল অর্থাৎ তাহাতে প্রকৃতির কোন সময় অনুকৃত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। দর্শক তাহাতে মুগ্ধ হইয়া সেই কালেরই অনুকরণ করিতে থাকে। ছায়ালোকের সূক্ষ্মতর এই সকল গভীর তত্ত্ব এত সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। তবে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাতেই চিত্রান্তর্গত বিজ্ঞান-তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এই ছায়া-তত্ত্ব প্রতীচ্যের জ্ঞান ও গবেষণার ফল নহে। গত শতাব্দির বিখ্যাত শিল্প সমালোচক মিঃ এল্. কিও পাশ্চাত্য চিত্র শিল্পের সমালোচনা ব্যপদেশে একস্থলে বলিয়াছেন।

"Leonardo davinci was the first artist who treated the subject "chirosceoro Scientificaly".

অর্থাৎ লিওনার্ডো ডা ভিন্সিই এই ছায়ালোক তত্ত্ব প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার পর বহু শিল্পী ক্রমে অবিরত পরিশ্রম, অভ্যাস ও পরীক্ষা করিয়া তাহার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। সুতরাং সার্দ্ধ চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও য়ুরোপে ছায়াতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল না, কিন্তু ভারতে চিরদিনই তাহা প্রচলিত ছিল। অতি প্রাচীন শিল্প গ্রন্থ মানসারাদির মধ্যে যেমন তাহার বহু পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, মহাকবি কালিদাস আদির প্রণীত কাব্য সমূহ মধ্যে অনেক স্থলে তাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ শকুন্তলার ৬ষ্ঠ অঙ্কে রাজা দুষ্মন্ত কেমন আবেগভরে তদ্গত প্রাণে বলিতেছেন :—

অস্যাস্তুঙ্গমিব স্তনদ্বয়মিদং নিম্নেব নাভিঃস্থিতা
দৃশ্যন্তে বিষমোন্নতাশ্চবলয়ো ভিত্তৌ সমায়ামপি।
অঙ্গেচ প্রতিভাতি মার্দব মিদং স্নিগ্ধ প্রভাবচ্চিরং।
প্রেম্ণামন্মুখমীক্ষত ইব স্মেরাচ বক্তীবমাম্।

অর্থাৎ এই চিত্রফলক বা ইহার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ সমতল হইলেও ইহাতে অঙ্কিত স্তনযুগল যেন উন্নতের ন্যায় বোধ হইতেছে, নাভিগহ্বর নিম্ন বা গভীর বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, হস্তের বলয়গুলিও যেন স্বাভাবিক, হাত হইতে যেন স্পষ্ট

পৃথক হইয়া রহিয়াছে তৈলাক্ত বর্ণ বিশেষের চিত্রণ দ্বারা দেহের স্নিগ্ধোজ্জ্বল লাবণ্যও যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আহা প্রণয়াবেশে প্রিয়া যেন আমার মুখের দিকে বঙ্কিম বা আড়নয়নে চাহিয়া আমায় যেন কি বলিবার নিমিত্তই ইহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, সে ভাব মুখে আসিয়াছে কেবল কথায় পটিতেছে না। তাই বুঝি প্রিয়ার মুখমণ্ডল মৃদু হাস্য বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে।

চিত্রগতা শকুন্তলার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এই যে উন্নত অনুন্নত ভাব যাহা সমতল চিত্র ক্ষেত্রের মধ্যে অতি সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা সেই ছায়া তত্ত্বেরই বৈজ্ঞানিক সমাবেশ মাত্র। যদি চিত্রশিল্পের এই বিজ্ঞানতত্ত্ব সেকালে পরিজ্ঞাত না থাকিত তাহা হইলে শকুন্তলায় এমন স্পষ্টভাবে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাইতাম না, বা তখন তাহা সম্ভবপরও হইত না; চিত্রবিজ্ঞানের এ প্রত্যক্ষভাব কবির হৃদয় কখন স্পর্শ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ।

চিত্রশিল্পের কার্য্য করিবার জন্য অথবা চিত্র দেখিবার জন্য উত্তরের আলোক (North light) প্রশস্ত। পাশ্চাত্য প্রদেশের সকলেই একথা জানেন, কারণ ইহা তাহাদের দেশে একটি উন্নত বিজ্ঞান-সম্মত বিধি। বিশেষ তৈলচিত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার উপযোগিতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হইয়াছে। আমাদের দেশের শিল্পিগুরুগণ যে এ তত্ত্ব জানিতেন না বা বুঝিতেন না তাহা নহে, বরং তৈল চিত্র প্রণালীর ন্যায় এই উত্তর আলোক তত্ত্বও তাঁহাদের দ্বারাই আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারও যথেষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা চিত্রশিল্পে বিজ্ঞানের নামে শিহরিয়া উঠেন, তর্কপরদিগের সন্দেহ নিবারণার্থ অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য দেবের সেই অতি প্রাচীন নীতি শাস্ত্রের একটি কথা এ স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি সেই সুদূর অতীত যুগে তাঁহার নীতি শাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্ববিধ গৃহাদির নির্ম্মাণ বিষয়ে যে স্থলে উপদেশ দিয়াছেন, সেই স্থলে অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ের ২২৮ সংখ্যক শ্লোকে বলিয়াছেন, "শিল্পশালাং কুর্য্যাদুত্তরগৃহাৎ।" টীকাকার বলিয়াছেন "শিল্পশালাং শিল্প গৃহং উদক্ উত্তরাভিমুখং কুর্য্যাৎ" অর্থাৎ শিল্পগৃহ উত্তরাস্যভাবে নির্ম্মাণ করিবে। অধুনা পাশ্চাত্য শিল্পী মাত্রেই এই উত্তরাস্য গৃহ বা ষ্টুডিও নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কার্য্য করেন ও চিত্রাদি সজ্জিত করেন। ইহার নির্ম্মাণপ্রণালী ও বাতায়ন হইতে কি পরিমাণ আলো গ্রহণ করিতে হইবে তাহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব চিত্র শিল্পীর বিশেষ প্রয়োজনীয়।

তাহার পর শকুন্তলার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রের ভাব দেহের লাবণ্য, মুখের আনন্দ

বিজড়িত অব্যক্তভাব সমূহ, শারীর স্থান বিজ্ঞান (Anatomy)আনন বিজ্ঞান (Physiognomy), ও অঙ্গের পরিমাণ বিজ্ঞান (Science of Human proportions) প্রভৃতি বিবিধ তত্ত্বের অন্তর্ভূক্ত। যে সকল তত্ত্ব সম্যক অবগত না হইলে চিত্রগত মূর্ত্তির পরিমাণ সৌষ্ঠব, আস্যরেখায় তাহার মনোগত অব্যক্তভাব ফুটাইবার উপায় নাই। মদীয় অন্যতম শিক্ষক মিঃ আর্চার (Mr. Archor R. S. A) সাহেব বলেন "There are four things to make it perfect. চতুর্ব্বিধ উপায়ে ইহাকে সুসম্পন্ন করিতে পারা যায়। (Air) আস্য রেখা,—(Attitude of posture) ভঙ্গিমা,—(dress) পরিচ্ছদ ও (colours) বর্ণাবলী। এই চতুর্ব্বিধ উপায়ই বিজ্ঞানমূলক। পূর্ব্বে যে শারীর স্থানাদির বিষয় বলিয়াছি তাহাও এই বিধিচতুষ্টয়ের অন্তর্গত।

মানবের আস্য বা মুখমণ্ডলের মধ্যে নাসিকা ও চক্ষুর পার্শ্বে গণ্ডে ও ললাটের মধ্যে যে সকল রেখা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের পরস্পর আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা ভয়, দুঃখ, হাসি ও আনন্দ আদি আন্তরিক ভাব নিচয় প্রকটিত হইয়া থাকে, তাহারই নাম আস্যরেখা (airs); শিল্পীকে প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণের মধ্যে মানবের সমুদায় অন্তরের ভাব এই আস্যরেখার সাহায্যে প্রকাশ করিতে হয়। যিনি চিত্র মধ্যে এই সকল ভাব যত অধিক ফুটাইতে পারেন তিনি ততই উচ্চশ্রেণীর চিত্রশিল্পী। পূর্ব্বোদ্ধৃত শকুন্তলার প্রতিমূর্ত্তিতে সেই সকলভাব প্রকটিত হইয়াছিল; কবি, তাহা বলিয়াছেন। সেই সকল ভাবকেই 'এক্সপ্রেসন' (Expression) বলে। চিত্রকলার অন্তর্গত এই ভাব বিকাশক বিধি অভ্যাস করিতে হইলে, শিল্পীকে, আনন বিজ্ঞান (physiognomy) অভ্যাস করিতে হয়। তাহা প্রকাশ করে কেবল উদ্ভাবন বা পরিকল্পনার বোঝা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, কেবল সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও তাহার যথাযথ বিকাশ কার্য্যে সহায়তা করিবে না; শারীর স্থান বিদ্যার (Anatomy) অন্তর্গত অস্থি ও পেশী সমূহের সঞ্চালন জ্ঞানের প্রয়োজন হইবে, তাহারই সাহায্যে উদ্ভাবনাগত ভাবরাশি চিত্রে প্রকৃতির অনুরূপ প্রকাশিত হইবে। অন্তরের যে ভাবটি মনে প্রকাশ পায়, তখন মুখের একস্থানে যে ফুটিয়া উঠে তাহা নহে, অর্থাৎ মুখমণ্ডলের সর্ব্বাবয়বে অল্পবিস্তর তাহার আভাস পরিলক্ষিত হইতে দেখা যায়। মানব হাসিলে কেবল যে তাহার দন্তই বাহির হইয়া পড়ে সূক্ষ্মদর্শীরা সে কথা বলেন না; তাঁহারা অধর, ওষ্ঠ, চক্ষু, নাসিকা, গণ্ড এমন কি কর্ণ ও কেশমূল পর্য্যন্ত সে হাসির ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং অনুবর্ত্তী

শিল্পী প্রতিমূর্তি চিত্রণ কালে ওষ্ঠের পার্শ্বে হয়ত একটু হাসির ভাব দেখাইয়াছেন, কিন্তু নয়ন-প্রান্তে এক ম্লান ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে, অথবা নয়ন প্রফুল্লতাব্যঞ্জক কিন্তু কপোল কালিমাময় ও বিশুষ্ক, চিত্রে এই অস্বাভাবিক ভাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, চিত্রকর আর্য্য রেখা দর্শনে প্রকৃত অন্ধ, আনন বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অর্থাৎ মুখমণ্ডলের পেশী সমূহের কোন্ কোন্ গুলির কোন্‌দিকে কিরূপ সঞ্চালনে কি ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অপারদর্শী। সুশিল্পী হইতে হইলে এ সকল বিষয়েও রীতিমত শিক্ষা ও সর্ব্বদা তাহার আলোচনা রাখিতে হইবে।

মানবের মুখমণ্ডলে ভ্রূযুগ হইতে ক্রমে নিম্নে নাসিকা, গণ্ড, ওষ্ঠদ্বয় ও চিবুক পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যস্থ পেশীগুলিই মনোভাব প্রকাশে সুপারগ। ইহাদের মধ্যে আবার নয়নের অন্তর্গত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পেশী কয়েকটির মনোভাব প্রকাশ করিবার শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ও অনন্ত, এমন কি মুখের ভাষাও ইহার নিকট যেন সঙ্কুচিত; প্রকৃত পক্ষে মানব যখন কথা বলিতে অসমর্থ যখন বাক্ শক্তির আদৌ বিকাশ হয় না, সেই শৈশব সময়ে অথবা যৌবনের চাঞ্চল্য-বিজড়িত প্রগাঢ় দাম্পত্য প্রেমের প্রথম প্রেম-বিনিময়ে যখন অফুরন্ত ভাষার তরঙ্গ মর্ম্মকূল হইয়া অন্তরেই লয় হইবার উপক্রম হয়, চিত্তের সেই অদম্য আবেগ যখন ভাষায় ফুটাইতে শত চেষ্টা করিলেও একটি অক্ষরেও সে ভাবের অভিব্যক্তি হয় না, কিম্বা যখন মুমূর্ষু বৃদ্ধ জীবনের শেষ শয্যায় শায়িত হইয়া, বাকশক্তিবিরহিত অবস্থায় পুত্র পৌত্রাদি আত্মীয় স্বজনের শত শত প্রশ্নের একটিরও উত্তর দিতে অক্ষম, হস্তপদাদি পর্য্যন্ত পরিচালনে যখন অপারগ, সমস্তই অসাড় ও নিস্পন্দপ্রায়, তখন মানবের সেই ক্ষুদ্র অক্ষি, নয়ন-প্রান্তে নীরব ভাষায় কত কথাই যে প্রকাশ পায়, কত অজস্র ভাবের তরঙ্গ যে তাহাতে উঠিতে থাকে, তাহা যে দেখিয়াছে, সেই তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। সে ভাব ভাষায় বুঝান কঠিন! শিল্পীকে নয়নের সেই নীরব ভাষায় অভিব্যক্ত সংস্কারে শিক্ষা করিতে হয়, পূর্ব্বোক্ত পেশীগুলির আকুঞ্চন বিকুঞ্চনে বা তাহার কিরূপে পরিবর্ত্তন হইলে কি ভাব প্রকাশ হইতে পারে, তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, তাহারই সাহায্যে প্রস্ফুটিত আর্য রেখা (airs) মুখমণ্ডলের বিশেষ নয়ন-প্রান্তস্থিত রেখাকরে শিল্পীকে পরিচিত হইতে হয়, সুতরাং দেখা যাইতেছে, চিত্র শিল্পে শারীরাদি বিজ্ঞানের প্রয়োজন নিতান্ত সামান্য নহে!

প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণে পরিমাণ বিজ্ঞানের বিষয় যাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও কতকটা শারীর বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলিতে হইবে। সে সকলেরও বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে, তবে অতি সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। সৃষ্টি হইতে একাল পর্য্যন্ত আর্য্য অনার্য্য সকল শ্রেণীর মূর্ত্তি শিল্পীরা অথবা দেবমূর্ত্তির পরিমাণ কল্পনায় যথেষ্ট আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। জগতের সকল সভ্যতার আদিগুরু, পূজ্যপাদ আচার্য্যগণের চিন্তা ও গবেষণা হইতেই পবিত্র গঙ্গোত্তরীর পূত বারিধারার ন্যায় এই সকল জ্ঞান বিজ্ঞান প্রথম উদ্ভূত ও প্রবাহিত হইলেও অধুনা প্রতীচ্যবাসীরা তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন; অপিচ প্রাচ্য কলাসম্ভূত কতিপয় অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর চারুশিল্প যাহা পরবর্ত্তী সময়ে ভারতের ভাগ্য-বিপর্য্যয়কালে অধিকাংশ হীন শিল্পীর দ্বারাই গঠিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়াই আমাদের শারীরস্থান বিদ্যাও তদানুষঙ্গিক পরিমাণাদি বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞতার নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আবার পূর্ব্বাপর বিচার-পরিশূন্য কত শিল্পীর দল অভ্রান্তভাবে সেই সকল আদর্শের হীন অনুকরণ করিয়া তাহাদের উক্তির সমর্থন কার্য্যে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। এই সকল শিল্পী যদি সামান্য মাত্রও শিক্ষা ও পরিশ্রম সহকারে পূর্ব্বাচার্য্যগণের লিখিত শিল্প গ্রন্থাদির সামান্য মাত্রও আলোচনা রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে এ দুর্নাম আমাদের আজ শ্রবণ করিতে হইত না, পরন্তু সমুন্নত গ্রীসীয় পরিমাণেও যে দোষ আছে প্রত্যুত্তরে তাহা দর্শাইতে পারিতাম। বাস্তবিক তাহারা যে রীতিতে মানব মূর্ত্তির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্য পরিমাণ হইতেই তাঁহাদের এই পরিমাণ জ্ঞান সংগৃহীত হইলেও স্থূলভাবে আলোচনা করিবার ফলে এক স্থান বিশেষে সামান্য লক্ষ্য হীনতা দোষে তাহাদের প্রচলিত পরিমাণ নীতির মধ্যে এক বিষম দোষ করিয়া বসিয়াছেন। সেই কারণ তাঁহাদের প্রসিদ্ধ হারকিউলিসপ্রতিম বীর পুরুষের দেহযষ্টি পরিমাণ-বদ্ধ করিতে যাইয়া একটি সুপুষ্ট শরীরের উপর একটি বিসদৃশ ক্ষুদ্র শির বা মস্তক নিক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছেন, সামান্য মনোযোগ দিয়া দেখিলে তাহা আর কাহারও অবিদিত থাকিবে না। কিন্তু কেন এমন হইল? এত দিনে বোধ হয় তাহার কারণ চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। আর্য্যের একখানি প্রধান শিল্প গ্রন্থ, যাহার উল্লেখ আমি ইতিপূর্ব্বে আরও দুই এক স্থলে করিতে বাধ্য হইয়াছি, সেই বিরাট গ্রন্থ "মানসার" যাহার কিয়দংশ

প্রতীচ্যে "মেন্‌সুরেশন" (Mensuration) বা ক্ষেত্রতত্ত্ব নামে পরিচয় দিতেছে, তাহাতে "উক্তাবাংপাদ,পর্য্যন্ত তালত্রয় শতাংশকং" ইত্যাদি দেহ পরিমাণের যে বিস্তৃত বিধি লিপিবদ্ধ আছে তাহা দেখিলে সকলের সকল গোলই মিটিয়া যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে "শিল্প ও সাহিত্য" "মানবমূর্ত্তি অঙ্কন" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি অনেকটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। যাহা হউক, সুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কনে দেহের পরিমাণ বিজ্ঞানেরও যে বিশেষ আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রবন্ধটি সংক্ষেপে লিখিবার ইচ্ছা থাকিলেও ক্রমে দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে, এ নীরস প্রবন্ধে সাধারণের ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া খুবই স্বাভাবিক, অতএব আর একটি মাত্র কথা বলিয়াই ইহা শেষ করিব।

চিত্রশিল্পে পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞান সমূহের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আবশ্যক হয়, যাহার সহায়তা ব্যতীত রঞ্জন শিল্পের অস্তিত্বও সম্ভবপর হইত না। সেই রঞ্জন বা বর্ণের বিজ্ঞান অথবা বর্ণাদির রসায়ন জ্ঞান সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। চিত্রশিল্পীর তাহাও শিক্ষা করিতে হয়। বিবিধ বর্ণ প্রস্তুত করণ, তাহার মিশ্রণ ও বিলেপনাদি সমস্তই উক্ত বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত। এক সময় ভারতের প্রস্তুত বর্ণ লইয়াই সকল দেশের শিল্পীরা চিত্র রচনা করিতেন, কালে তাহার লোপ হইয়াছে, এখন বিভিন্ন দেশ হইতে যে সকল বর্ণ আমদানি হয় তাহাতেই এ দেশীয় শিল্পীদেরও তাঁহাদের চিত্র কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। পূর্ব্বে যে সকল উপাদান হইতে বর্ণ প্রস্তুত হইত, যে সকল উপাদান, এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলেও তাহার প্রস্তুত প্রণালী আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, অথবা নানা কারণে আমাদের ভুলিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে। আবার কতদিন যে তাহা আমাদের পুনরায়ত্ত হইবে কে জানে? যাহা হউক সেই বর্ণগুলি নানা উপাদান মূলক। কতকগুলি উদ্ভিজ্জ,—তাহা বৃক্ষ লতাদির পত্র, পুষ্প ও কাষ্ঠাদি হইতে জাত; কতকগুলি আকরিক—তাহা মৃত্তিকা, প্রস্তর ও শঙ্কাদি হইতে উৎপন্ন হয়; কতকগুলি ধাতব, অর্থাৎ তাম্র দস্তা ইত্যাদি ধাতু হইতে তাহার প্রস্তুত হইয়া থাকে; আর কতকগুলি জৈব,—সে গুলি কোন কোন প্রাণীর অস্থি কঙ্কাল ও রক্তাদি হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। একণে এই সকল বর্ণের মিশ্রণ ব্যাপদেশে কোন বর্ণ কাহার সহিত মিশ্রণ-দোষে চিত্র অনতিকাল মধ্যে বিবর্ণ ও ম্লান হইয়া যাইবে, চিত্রশিল্পীর তাহা অবশ্য শিক্ষা করা আবশ্যক, নচুবা এই বিজ্ঞান

জ্ঞানের অভাবে অধিকাংশ চিত্রই দুই পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিকৃত ও বিনষ্ট হইয়া যায়।

'চিত্রশিল্পে বিজ্ঞান' এই বিষয়ে ধীরভাবে আলোচনা করিতে হইলে বহু বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনার প্রয়োজন হয়, তাহা একণে সম্ভবপর নহে। তবে এই প্রসঙ্গে 'প্রাচ্য চিত্রকলা' স্থানে স্থানে এই শব্দের উল্লেখ করিয়াছি ; সেই সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া ইহা শেষ করিব।

'প্রাচ্য চিত্রকলা' এই বিকৃত শব্দের পরিবর্ত্তে আমাদের 'আর্য্য বা ভরতীয় চিত্রকলা' এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করা বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। কারণ, প্রাচ্য বা প্রতীচ্য সকলের আদিতে এই ভারতে চিত্রকলার আবিষ্কার হইয়াছে, এবং তাহাই সমুন্নত বিজ্ঞানসিদ্ধ শিল্প বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। ভারতের এ শোচনীয় দুর্দ্দিনে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। পুনরায় তাহার উদ্ধার করিতে হইলে, রীতিমত সেই সকল বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হইবে। ভারতের ইতিহাস, কাব্য ও পুরাতত্ত্বাদির অনুসন্ধান সহ প্রকৃত ভারতীয় চিত্রকলা-শিক্ষা ও তাহার সংস্কার করিতে হইবে। ভারতের বিমল ও উন্নত পদ্ধতির মধ্যে প্রাচ্যের সকল চিত্র-প্রণালীর সংমিশ্রণ বা সাধারণ ভাষায় তাহার "ঘণ্ট"-রূপে 'পারসীক', চৈনিক, মোগলিক আদি প্রাচ্যেরই বিভিন্ন অনুন্নত চিত্রপদ্ধতির সম্মিলন কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে ; কারণ, তাহাতে সর্ব্ববিধ বৈজ্ঞানিক বিধির সমাবেশ নাই, তাহা তত্তৎপ্রদেশের চিত্রজীবী সাধারণ ব্যক্তিরই কর রচিত। ভারতের ঋষি ও রাজন্যবর্গের ন্যায় সে সকল প্রদেশের কোনও উন্নত সমাজের মধ্যে চিত্রকলা-শিক্ষার প্রচলন বা আদর বিধিবদ্ধ ছিল না। যাঁহারা ভারতীয় চিত্রকলার উন্নতির পক্ষপাতী, তাঁহাদের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন, যত দিন না শিক্ষিত ও মেধাবী ব্যক্তিগণ এই বিজ্ঞানমূলক চিত্র-বিদ্যার অনুশীলন করিবেন, ততদিন প্রকৃত ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুদ্ধার হইবে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিজ্ঞানই শিল্পের প্রাণবায়ু, যে কোনও শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে, তাহার মূলীভূত বিজ্ঞানের উন্নতি করা প্রথম প্রয়োজন। তাহার বিজ্ঞান আয়ত্ত হইলে তাহারই উপর শিল্পের কলা-চাতুর্য্য ও পরিকল্পনা-সিদ্ধ উন্নত ভাবাবলী প্রতিষ্ঠিত হইবে। অন্যথা কেবল প্রাণপণ পরিশ্রম করিলে চিত্রের সেই অব্যক্তভাবসমূহ কখনই ফুটিয়া উঠিবে না। সুতরাং যথার্থ ভারতীয় চিত্র-শিল্পের উদ্ধার ও উন্নতি কখনই সম্ভবপর হইবে না। এই স্থলে এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, চিত্রকলা-পদ্ধতি ভাব ও রুচিভেদে প্রাচ্য ও

প্রতীচ্যের মধ্যে বহু পার্থক্য সম্ভবপর বা সঙ্গত, কিন্তু তাহার বিজ্ঞানের মধ্যে সেরূপ কোনও বিভেদ নাই, অথবা তাহা কখনও সম্ভবপরও নহে। ইহা প্রত্যেক শিল্পানুরাগীর আলোচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। (১)

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

উদ্ভিদ-শিশুর পরিপুষ্টি।

—:•:—

প্রাণিজগতে দেখা যায়, সন্তান যত দিন মাতৃজঠরমধ্যে অবস্থান করে, তত দিন সে মাতার দেহ হইতে শরীরপোষণোপযোগী তাবৎ সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জগতেও সে নিয়ম বিশেষভাবে বর্ত্তমান। ভ্রূণরূপে যত দিন ভাবী উদ্ভিদ বীজমধ্যে অবস্থান করে, তত দিন সে বীজের শাঁস দ্বারা পরিপোষিত হইয়া থাকে, এবং অঙ্কুরিত হইবার পরেও অল্প দিনকাল তাহাতেই জীবনধারণ করে। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে প্রাণিজগতের শিশুগণ জননীর স্তন্যপান করিয়া জীবনধারণ করে, এবং বয়োবৃদ্ধিসহকারে বাহিরের দ্রব্য পানাহার করিতে এবং খাদ্যাদি আহরণ করিতে শিখে। বীজভেদ করিয়া উদ্গত হইবার পর শিশুচারা সেইরূপ বীজের দল বা শাঁসের সাহায্যে জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়। এক দিকে, চারার কলেবরবৃদ্ধি হেতু সঞ্চিত বীজের দল যত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, অন্য দিকে শিশু চারার নূতন শিকড় ও পত্র উদ্গত হইয়া বহির্দ্দেশ—ভূমি ও বায়ুমণ্ডল হইতে তত আহারীয় সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

এ স্থলে বলিয়া রাখি, বীজ বা দানামাত্রই সফল নহে। অনেক দানা বীজের আকার ধারণ করে সত্য, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে এরূপ অনেক দানা থাকা সম্ভব, যাহাদিগের মধ্যে দল নাই, কিংবা দল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ বীজ আদৌ অঙ্কুরিত হয় না, গ্রাম্য ভাষায় ইহাদিগকে 'কোকলা' বীজ বলে। তবেই হইল যে, যে দানার মধ্যে দল আছে তাহাই বীজ,—অনেকে তাহাকে তাজা বীজ কহিয়া থাকেন। যাহা হউক, দলের মধ্যে উদ্ভিদের দেহধারণের উপযোগী যে সকল পদার্থ ঘনীভূত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, শিশু চারার মধ্যে তাহা

(১) গত সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

কি উপায়ে প্রবিষ্ট হয়, বা কি প্রণালীতে তাহার পরিবৃদ্ধির সহায়তা করে, এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

আমরা যে প্রতিদিন চাউল গোধূম দ্বিদল (ডাল) ভোজন করি, তৎসমুদায়ই দল, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কোনটী পূর্ণদল বা একদল, যথা চাউল বা গোধূম; কোনটী দ্বিচক্ত দল, যথা মুগ, অড়হর, বুট প্রভৃতির ডাল; কিন্তু সকলগুলিই দল। উক্ত দল একটী আবরণ-মধ্যে থাকে; তাহাকে আমরা খোসা বলিয়া থাকি। ধান্য হইতে খোসা স্বতন্ত্রীকৃত হইলে তণ্ডুল উৎপন্ন হয়, তখন আর তাহাকে তণ্ডুল বা চাউল না বলিলে ভুল হয়। সেইরূপ দাল কলাই ভাঙ্গিয় দ্বিদলকে আমরা ডালে পরিণত করি; অতঃপর তাহাদিগকে আমরা ডাল বলি; অনেকে কিন্তু 'দাইল' বলেন। যাহা হউক, ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি পূর্ণ ও কতকগুলি দ্বিচক্ত; কেন, তাহা স্বতন্ত্র প্রস্তাবের বিষয়, সুতরাং এ স্থলে তাহার আলোচনা করিব না।

বীজের যে একটী আবরণ বা খোসা আছে, তাহার মধ্যে দলের স্থান। উক্ত দলের কোনটীকে চূর্ণ করিলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার আবির্ভাব হয়; চাউলের গুঁড়া, দালের গুঁড়া, ব্যাসম, ছাতু, আটা, ময়দা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এতদ্দ্বারা আর বুঝিতে বাকী থাকে না যে, অসংখ্য কণিকার সমবায়ে দলের উৎপত্তি। প্রত্যেক কণিকা এক একটি কোষ। আবার প্রত্যেক কোষই উদ্ভিদের সংক্ষিপ্তসারস্বরূপ; কারণ, সেই কোষ উদ্ভিদশরীর-সুলভ—শ্বেতসার (Starch), শর্করা (Sugar), অণ্ডলাল (albumen), উদ্ভিজ্জ-বসা (vegetable fat) প্রভৃতিতে পূর্ণ। উক্ত পদার্থনিচয় বীজ বা দলমধ্যে অবস্থানকালে সঙ্কুচিত বা ঘন অবস্থায় থাকে। বারিসংস্পৃষ্ট হইলে বীজের মধ্যে যতই জল প্রবিষ্ট হইতে থাকে, তদন্তঃস্থিত কোষনিচয় তত বিগলিত হইয়া জলের সহিত একীভূত হয়। এক্ষণে কোষান্তর্গত ঘনীভূত পদার্থগুলি সম-দুগ্ধাবস্থাপন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নবজাত শিশু-উদ্ভিদকে পালন করিতে থাকে।

বীজমধ্যে জল প্রবিষ্ট হইবার জন্য বীজগাত্রে দুইটী ফটক বা গেট আছে। কোনও একটী বীজ লইয়া পরীক্ষা করিলে সহজেই দেখা যায়, তাহার কোনও এক স্থানে একটী অস্বাভাবিক বন্ধুর দাগ আছে। উক্ত দাগটী অঙ্কুরণের স্থান। ইহার উত্তর পার্শ্বে অতি সূক্ষ্ম এক একটী ছিদ্র আছে। উক্ত ছিদ্রদ্বয়কে এ স্থলে ফটক বা প্রণালী নামে অভিহিত করিলাম। সেই বিশেষ স্থানটীকে উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিলে সহজে আর বীজের মধ্যে রস প্রবেশ করিতে

পারে না। তথাপি যে প্রবেশ করে, তাহার অন্ত কারণ আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া রাখা ভাল। মাটীর কলসীর মুখটাকে উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া জলমধ্যে নিমজ্জিত রাখিলে তাহার মধ্যে অবশ্যই জল প্রবেশ করিবে; কারণ, কলসীর গাত্র সচ্ছিদ্র বা Porous, বীজের গাত্রও সেইরূপ সচ্ছিদ্র; সুতরাং তাহার গাত্রস্থ কূপ (Pores) দ্বারা ভিতরে জল প্রবেশ করে। ইহাকে জলের চৌর্য্য-প্রবেশ (Percolation) কিংবা বীজের চৌর্য্য-আহরণ (absorption) বলিলে ক্ষতি হয় না। এতদনুসারে বীজের মধ্যে রস-প্রবেশের বিলক্ষণ বিলম্ব হয়।

উক্ত ছিদ্রের ভিতর দিয়া বাহিরের রস বীজের মধ্যে প্রবেশ করে; ফলতঃ বীজ ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠে। বীজের নিজস্ব গুরুত্বের একচতুর্থাংশ হইতে এক-একচতুর্থাংশ অর্থাৎ সওয়া অংশ বা পঞ্চচতুর্থাংশ রস বীজমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই দলস্থিত শর্করা, আঠা (gum) প্রভৃতি সঞ্চিত পদার্থ বিগলিত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু বীজাভ্যন্তর্গত তৈলসদৃশ পদার্থ সহজে বিগলিত হয় না; সুতরাং তাহা ভৌতিকতা-নিবন্ধন রূপান্তরপ্রাপ্ত না হইলে উদ্ভিদের কোনও উপকারে আইসে না। অঙ্কুরোদ্গমকালে বীজাভ্যন্তরবর্তী পদার্থনিচয় নবুদ্ধ বা প্রাথমিক দশা লাভ করিয়া ভ্রূণের বৃদ্ধির সহায়তা করে।

বীজের মধ্যে অপরাপর পদার্থের ন্যায় তৈলসদৃশ পদার্থ থাকিতে দেখা যায়। তিসি, সর্ষপ, রাই, মাঠকড়াই, সূর্য্যমুখী-বীজ, মূলা-বীজ প্রভৃতি বহু শস্যই তৈলপ্রধান; সাংসারিক কার্য্যে ইহাদিগের তৈল নিয়োজিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বহু ফল পাকুড়—নারিকেল, বাদাম, তরিতরকারীর বীজ,—কুমড়া, শশা, নানাবিধ কপি-বীজ—প্রভৃতির মধ্যেও তৈল আছে। অঙ্কুরোদ্গমকালে উক্ত তৈল সাক্ষাদ্ভাবে শিশু উদ্ভিদের বা কোনও উদ্ভিদের কোনও কাজে আইসে না, এবং সহজে বিগলিত হয় না; তবে সে তৈল যে উদ্ভিদের কোনও ব্যবহারে আইসে না, তাহাও নহে। বীজ, রসের সংস্পৃষ্ট হইলে অপরাপর পদার্থের পরিবর্তনের সহিত তৈলেরও পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ভৌতিকতা-নিবন্ধন তৈলের রূপান্তর ঘটিলে, তবেই তাহা উদ্ভিদের আহার্য্য হয়। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যাক্স্ (Sachs) সাহেবের পরীক্ষা ফলে জানা যায় যে, তাঁহার পরীক্ষাকালে সুপরিপক্ব স্কোয়াস (Squash) নামক লতাজীর বীজে ৫০ ভাগ তৈল ও ৪০ ভাগ বসাজাতীয় পদার্থ বিদ্যমান ছিল; শ্বেতসার, শর্করা, বা আঠাজাতীয় কোনও পদার্থই ছিল না। কিন্তু অঙ্কুরোদ্গমকালে উক্ত স্কোয়াস-বীজের অন্তর্গত সেই তৈল ও বসাজাতীয় পদার্থ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া শ্বেতসার, শর্করা প্রভৃতি

সহজ উদ্ভিজ্জ পদার্থে পরিণত হয়। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, বীজান্তর্গত তৈল ও বসাকে উদ্ভিদখাদ্যে পরিণত হইতে হইলে, প্রথমতঃ শ্বেতসার প্রভৃতির ন্যায় অপেক্ষাকৃত সহজ পদার্থে পরিণত হইতে হইবে; অতঃপর সেই পরিবর্তিত-অবস্থাপ্রাপ্ত শ্বেতসারাদি প্রাথমিক পদার্থে পরিণত হইলে, উদ্ভিদের ব্যবহার্য্য হইবে। বীজের অবয়বে যে কিছু পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহা তদন্তর্বর্ত্তী ভ্রূণকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এবং পরে অর্থাৎ অঙ্কুরোদ্গমের কাল হইতে শিশু-উদ্ভিদ যাবৎ না সক্ষম ও স্বাধীন হয়, তাবৎকাল উহার দেহগঠনের ও আহার্য্য-সংস্থানের জন্য ব্যবহৃত হয়। সংক্ষেপতঃ উদ্ভিদ বা ফলের মধ্যে যাহা কিছু বিদ্যমান, তাহা পরবর্ত্তী উদ্ভিদের জন্য। অঙ্কুরের উদ্গম হইলেই যে উদ্ভিদ আপন আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা নহে। বীজের তাবৎ পদার্থকে ব্যবহারে আনিয়া, শিশু-উদ্ভিদ আপনার অবয়ব গড়িয়া লয়। এইরূপে মূল, কাণ্ড ও পত্রসমন্বিত হইবার পরে উদ্ভিদ ভূগর্ভ হইতে রস ও বায়ুমণ্ডল হইতে বাষ্পীয় পদার্থ আহরণ করিতে সক্ষম হয়। উদ্ভিদে বা তাহার ফল ফুল বা বীজে যে তৈলজাতীয় পদার্থ উদ্ভূত হয়, তাহা অপরাপর পদার্থ হইতে ভৌতিক ক্রিয়াবশে উৎপন্ন হইয়া থাকে,—মৃত্তিকা বা বাতাস হইতে হয় না। তাহা ব্যতীত তৈল উদ্ভিদের খাদ্য নহে। প্রায় সকল বীজেই তৈলের একটা ভাগ থাকে,—অল্প বা অধিক ইহাই প্রভেদ। সর্ষপ, তিসি, তিল, মূলাবীজ প্রভৃতি তৈলপ্রধান শস্য, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহাদিগের মধ্যে পঞ্চাশ ভাগেরও অধিক তৈল থাকিতে দেখা যায়। আলু, আরোরুট, শঠী প্রভৃতি কন্দে শ্বেত-সারের প্রাধান্য। ইক্ষু, খর্জ্জুর, বীট প্রভৃতি শর্করা-প্রধান উদ্ভিদ। উদ্ভিদ বা তাহার ফলফুলের মধ্যে যে কোনও পদার্থ থাকিতে দেখা যায়, তৎসমুদায়ই উদ্ভিদের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাদিগের উপকরণ—মাটী, জল, বায়ু ও রৌদ্র। মানুষে কোনও একটী জিনিস প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা করিলে কতদিন হইতে কত উপায়ে, কত অর্থব্যয়ে উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকে, কিন্তু বিশ্বমাতা উদ্ভিদদিগকে দুইটী জিনিস দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন; সেই দুইটী জিনিস, পূর্ব্বেও বলিয়াছি—ভূমি ও আকাশ। সেই ভূমি ও আকাশ, সেই জল বায়ু, সেই সূর্য্যালোক লইয়া কোনও উদ্ভিদ শর্করা, কোনও উদ্ভিদ তৈল, কোনও উদ্ভিদ বর্ণ, আবার কোনও উদ্ভিদ সুখাদ্য, কোনও উদ্ভিদ বিষ প্রদান করিয়া জগতের মহা-কল্যাণসাধনে দিবারাত্রি কত না পরিশ্রম করিতেছে! একই মাটীতে জন্মিয়া ও একই আকাশের নিম্নে থাকিয়া কোনও উদ্ভিদ লাল, কোনটী হরিদ্রা, কোনটী

তাম্রবর্ণ ধারণ করিতেছে। এ স্থলে সংক্ষেপে আর একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বীজের অবয়বে যে সকল পদার্থ সন্নিবিষ্ট থাকে, তৎসমুদায়ের রূপান্তরের মূল কি? প্রবনীয় পদার্থের পচনকালে ভৌতিক সত্তাপ্রাপ্ত বীজের অভ্যন্তরস্থিত ভ্রূণের নাভি বা গ্রন্থির মধ্যে একটী পদার্থের উদ্ভব হয়, ইংরাজীতে উহা ডায়েষ্টেস্ (Daistase) নামে অভিহিত। আমরা তাহাকে পাচক-চূর্ণ বলিব। কোনও অঙ্কুরিত বীজকে 'কল্' হইতে স্বতন্ত্র করিবার পর সুরাসার (alchohol) সহযোগে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা শোধন করিলে একপ্রকার সূক্ষ্ম শুভ্রবর্ণ চূর্ণ পাওয়া যায়। উক্ত চূর্ণই Diatase বা পাচকচূর্ণ। উহার মধ্যে শতকরা প্রায় ১০০৪ ভাগ যবক্ষারজান থাকে। বীজের মধ্যে যথাসময়ে উহা প্রাদুর্ভূত হইয়া বীজের অন্তরতম স্থানে সূক্ষ্ম ভ্রূণ বা অঙ্কুর-মূলে বা মূল গ্রন্থিতে থাকিয়া বীজস্থিত পদার্থনিচয়কে রূপান্তরিত করিয়া দেয়। অতঃপর সেই রূপান্তরিত সূক্ষ্ম পদার্থ শিশু-উদ্ভিদের শরীরে অগ্রসর হইতে পারে। ইহা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। এক দিকে উক্ত সূক্ষ্ম কণিকাগণ দ্বাররক্ষিরূপে অঙ্কুরমূলে বা নাভিস্থলে থাকিয়া বীজের দলগত কিংবা আহরিত কোনও পদার্থকে ঊর্দ্ধাভিমুখে অগ্রসর হইতে দেয় না; অন্য দিকে পাচকরূপে বীজের কাঁচা (raw) জিনিসকে পাক করিয়া অঙ্কুরকে প্রদান করে। এক দিকে প্রত্যাখ্যান, অন্য দিকে আহ্বান—মধুর ব্যাপার! আবার সেই পাচকগণের শক্তির কথা শুনিলে অবাক হইতে হয়। সেই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কণিকাগণ নিজ নিজ গুরুত্ব অপেক্ষা ২০০০ (দুই সহস্র) গুণ শ্বেতসারকে অনায়াসে পরিপাক করিতে পারে! এই ডায়েষ্টেস্‌গণই বীজের দলগত ঘন (Solid) পদার্থনিচয়কেও শর্করাদি পাচ্যপদার্থে পরিণত করিয়া দেয়।

শ্বেতসারের শর্করায় পরিণত হইবার জন্য উত্তাপের প্রয়োজন। রসসিক্ত বীজে অম্লজান প্রবেশ লাভ করিলে বীজমধ্যে উত্তাপের সঞ্চার হয়। উত্তাপ সঞ্চারিত হইবার পর ভৌতিক ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার সমাবেশ হয়। বীজমধ্যে এত ব্যাপার সংঘটিত হইলে, তবেই উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য আহরণোপযোগী হয়, ফলে উদ্ভিদ সুচারুরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি।

—:—

বিখ্যাত মৈথিল কবি বিদ্যাপতি বঙ্গবিহারের প্রত্যেক গৃহে সুপরিচিত। বিদ্যাপতির নাম বা কবিতার বিষয় না শুনিয়াছেন, এমন বাঙ্গালী বা বেহারী, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ হইলেও, বাঙ্গালীরাও তাঁহাকে নিজেদের বলিয়া দাবী করিতে ছাড়েন না। তাঁহার কবিতাবলী বঙ্গদেশে এত সুদীর্ঘ কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, বহুকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা, এমন কি, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তৎকালে বঙ্গদেশীয় ভাষার সহিত মৈথিলী ভাষার অধিক পার্থক্য ছিল না। সেই সময়ে বহু বাঙ্গালী বিদ্যার্থী বিবিধশাস্ত্রজ্ঞ বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্র-পারদর্শী বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকেতন মিথিলাদেশে গমনাগমন করিতেন। বিদ্যাপতির সুললিত পদাবলীর মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া উক্ত বিদ্যার্থিগণ অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞানের সহিত বিদ্যাপতির কবিতাবলীও মিথিলা হইতে আনিয়া বঙ্গদেশে প্রচারিত করেন। পরবর্ত্তী কালে বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিরসপ্রধান ধর্ম্মের প্রাবল্য হইলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমরসাত্মক বিদ্যাপতির পদাবলীও বঙ্গদেশে সমধিক প্রচারিত হয়। কালবশে বিদ্যাপতির বঙ্গদেশ-প্রচলিত কবিতাগুলির ভাষাও ক্রমশ রূপান্তরিত হইয়া অনেকটা বঙ্গভাষার আকার ধারণ করে। বঙ্গদেশ-প্রচলিত বিদ্যাপতির কবিতাবলী ক্রমশঃ কিরূপ বঙ্গভাষাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা প্রদর্শিত করিবার জন্য নিম্নে কতিপয় বিদ্যাপতির পদাবলী উদ্ধৃত হইল :—

শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি ॥
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি।
এ কাজ করিলি কি ?
বেলা-অবসান-কালে
গিয়াছিলি নাকি জলে।
তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া
ধরিলি সখীর গলে।

দেখায়া বদন-চাঁদে
তারে ফেলিয়া বিষম ফাঁদে
তুহু ভরিতে আওলি, লখিতে নারিল
ওই ওই করি কাঁদে।
তারে হৃদয় দরশি খোরি।
মন ভরিলি চোরি ॥
বিদ্যাপতি কহ শুনহি সুন্দরি।
কানু জিয়াবে কি করি ॥

যেখানে যতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখহ মোর নাম দুই চারি॥
মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরিণাম॥
বিরহগণ গণইতে লিহে মোর নাম।
পিয়া মোর বিরহদ বিহি ভেল বাম॥
নিচয় মরিব আমি সে কানু উদ্দেশে।
অবসর জানি কিছু কহিও সন্দেশে।
ফিরে একবার পাঠাইবে মোর নাম।
অরুণ দুলহ করে দিহে জল দান॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥

ললিতা প্রাণের সহি মন্ত্র দিয়ো কানে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালের ডালে॥
সেই ত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহু সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পাওব হাম পিয়া দরশনে॥
পুনঃ যদি চাঁদমুখ দেখিতে না পায়।
বিরহ অনল যাহে তনু তেয়াগিব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।
তোমরা যতেক সখী থেকো মনু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মর অঙ্গে।
সখি যে সে সব কহিতে লাজ।
সে কহে রসিক রাজ॥

* * * *
* * *

এইরূপ বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত অনেক কবিতা বঙ্গদেশে পাওয়া যায়, যাহার ভাষা অনেকটা বাঙ্গালার ন্যায়, এবং বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদাবলীর, বিশেষতঃ মিথিলায় ও বেহারে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা হইতে অনেকটা বিভিন্ন। বাহুল্যভয়ে অধিক উদ্ধৃত করিলাম না। এই সমস্ত পদাবলীর মধ্যে সমস্তগুলি বেহার অঞ্চলে সংগৃহীতপদাবলীর মধ্যে পাওয়া যায় না। এই কারণে অনুমান হয় যে, অনেক বঙ্গদেশীয় কবিও স্বীয় কবিতা বিদ্যাপতির নামে চালাইয়া গিয়াছেন। এই প্রকার বঙ্গ ভাষায় রচিত বিদ্যা-পতির ভণিতা যুক্ত ও বিদ্যাপতিরচিত বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত কবিতাবলীর ভাষার সহিত বঙ্গভাষার সাদৃশ্যদর্শনে বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতিকে বঙ্গদেশীয় কবি বলিয়া অনুমান করেন। এই অনুমান ক্রমে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়।

৺ রামগতি ন্যায়রত্ন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি বীরভূমের নিকট কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শিব সিংহ বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বা বীরভূম জেলার মধ্যে কোনও স্থানের পরাক্রান্ত জমীদার ছিলেন, এবং বিদ্যাপতি এই জমীদারের আশ্রয়ে থাকিয়া কবিতাদি রচনা করেন।

এক জন লিখিয়াছেন যে, শিব সিংহ লক্ষ্মীনারায়ণের শাসনকালে বঙ্গদেশে বিদ্যাপতি বঙ্গভাষায় বহু কবিতা রচনা করেন। অপর এক জন লিখিয়াছেন যে, যশোহর জিলার অন্তর্গত কৃত্তি গ্রামনিবাসী ভবানন্দ রায়ের বিদ্যাপতি নামক এক পুত্র ছিল। ইহার প্রকৃত নাম বসন্ত রায় ছিল, ইনি কবিতাতেই নিজেকে বিদ্যাপতি নামে পরিচিত করিতেন। ইহা তাঁহার উপাধি ছিল।(১) কেহ কেহ এমন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি-নামধেয় কোনও ব্যক্তি ছিল না, রায়গুণাকর, কবিকঙ্কণ প্রভৃতির ন্যায় বিদ্যাপতি একটি উপাধি, এবং একাধিক ব্যক্তি এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। (২)

প্রথমতঃ ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমাণিত করেন যে, বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিব সিংহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন, এবং বিসফি গ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। এই বিসফি গ্রাম শিব সিংহ বিদ্যাপতিকে দান করেন। (৩) রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রভৃতিও রাজকৃষ্ণ বাবুর সমর্থন করেন।

তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ মনীষী গ্রীয়ারসন বিদ্যাপতির অনেক পদাবলী মিথিলা হইতে সংগৃহীত করিয়া প্রকাশিত করেন। মিথিলার রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে যে তাম্রশাসন দ্বারা বিসফি গ্রাম দান করেন, গ্রীয়ারসন্ তাহা সমস্ত প্রকাশিত করেন।(৪) তিনি পঞ্জী হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাপতির সাময়িক মিথিলার রাজবংশের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত করেন।(৫) এইরূপে বিদ্যাপতি-সংক্রান্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপে বিদ্যাপতি সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হইলেও, কেহ কেহ বিদ্যাপতির বাঙ্গালীত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টায় বিরত হন নাই।(৬)

বিদ্যাপতি বিসফি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত বিসফি গ্রাম এখনও দ্বারভাঙ্গা জেলায় বর্তমান। কিন্তু চারি পুরুষ হইতে তাঁহার বংশধরগণ উক্ত

১। সোমপ্রকাশ ১০ই পৌষ সন ১২৭২ সাল।

২। "I would suggest the possibility of there having beeg more than one Bidyapati and that the word is not a proper name but a title like Ray Gunakar or Kabikankan".—John Beams.

৩। বঙ্গদর্শন; ৪র্থ ভাগ, জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৫ সাল।

৪। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for 1893 p. 143.

৫। Indian Antiquary, 1885. Vol. XIX. p. 196.

৬। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "বঙ্গসাহিত্য"; ৩১—৩৩ পৃষ্ঠা।

বিস্ফি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত সৌরাঠ নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। বিস্ফিগ্রাম দ্বারভাঙ্গার মধুবনী সবডিভিজনের অন্তর্গত বেণীপট্টি থানার অধীন জরৈল্ পরগণাতে কমলা নদীর তীরে অবস্থিত। (১) এই গ্রামের একটি উচ্চ স্থানকে লোকে বিদ্যাপতির ভিটা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই গ্রামে অদ্যাবধি বিদ্যাপতির কুলদেবী বিশেশ্বরীর মন্দির ও তাঁহার পাঠশালার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। বিদ্যাপতির ভিটার উপর একটি সুড়ঙ্গ আছে; তাহার অনেকটা বুজিয়া আসিয়াছে। এই সুড়ঙ্গের মধ্যে বসিয়া তিনি ভগবৎ-আরাধনায় মগ্ন থাকিতেন।

বিদ্যাপতির ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ বিষ্ণুঠাকুর প্রথম বিস্ফি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি সম্ভবতঃ রাজা নান্যদেবের সময় বিদ্যমান ছিলেন। বিষ্ণু ঠাকুরের পৌত্র কর্ম্মাদিত্য মিথিলার রাজমন্ত্রী ছিলেন। পঞ্জীতে ইঁহার নাম এইরূপ লিখিত আছে:—"গড় বিস্ফি নিবাসী কর্ম্মাদিত্য ত্রিপাঠী।" মিথিলার তিলকেশ্বর নামক শিবমন্দিরে যে কীর্ত্তিশিলা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কর্ম্মাদিত্যের নাম উৎকীর্ণ আছে। (২) ইঁহার পুত্র দেবাদিত্য (মতান্তরে শিবাদিত্য) সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। ইঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত বীরেশ্বর ঠাকুর। ইনি "বীরেশ্বরপদ্ধতি", "ছান্দোগ-দশকর্ম্মপদ্ধতি" প্রভৃতি স্মৃতি-গ্রন্থের প্রণয়ন করেন। মৈথিল শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি ইঁহার গ্রন্থানুসারে দশকর্ম্মাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইঁহার ভ্রাতা ধীরেশ্বর ঠাকুরও এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। (৩) বীরেশ্বরের পুত্র প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত চণ্ডেশ্বর রাজা হরিসিংহ দেবের মন্ত্রী ছিলেন। ধীরেশ্বরের পুত্র জয়দেব ঠাকুর বিদ্যাপতির পিতামহ ছিলেন। ইনি এক জন পরম যোগী ছিলেন। ইঁহার পুত্র গণপতি ঠাকুর বিদ্যাপতির পিতা ছিলেন। ইনি কামেশ্বর ঠাকুরের বংশীয় রাজা গণেশ্বর ঠাকুরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, ইনি পুত্র লাভার্থ কপিলেশ্বর মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া বিদ্যাপতিকে পুত্ররূপে লাভ করেন। মিথিলায় অদ্যাপি কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দির বর্ত্তমান আছে।(৪) ইনি "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" নামক এক গ্রন্থের রচনা করেন। ইঁহার মাতার নাম হাঁসিনী দেবী।

---

(১) ব্রজনন্দন সহায় প্রণীত "মৈথিলী-কোকিল বিদ্যাপতি"র ভূমিকা।

(২) এই শিলালিপি ২১৩ ল সং অর্থাৎ ১০২০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়; যথা:—"আকনেত্র-শশাঙ্কপক্ষেঽঙ্কিতে শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতেঃ"।

বিদ্যাপতি কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ জানিতে পারা গিয়াছে। সেই সমস্ত ঘটনার তারিখের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে বিদ্যাপতির জন্ম ও মৃত্যুর কাল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু সকল স্থলেই বিদ্যাপতির জন্ম-মৃত্যুর সময়নির্ণয় সন্তোষজনক হয় নাই। যেহেতু এইরূপ বিদ্যাপতির কালনির্ণয়ে কোনও স্থলে অতি অপরিণত বয়সে অসাধারণ কবিত্ব ও অতি বৃদ্ধ বয়সে অতি শ্রমসাধ্য কার্য্যাদি তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছে। এবং ইহার সমর্থন জন্য অনেককে কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

বিদ্যাপতির কালনির্ণয়ের সহায়ক নিম্নলিখিত ঘটনা কয়টী জানিতে পারা যায়।

১। বিদ্যাপতি রাজা গণেশ্বরের রাজসভায় পিতার সহিত যাতায়াত করিতেন। এই সময় তিনি বালক ছিলেন। গণেশ্বর ২৫২ ল সং বা ১৩৫৯ খৃঃ নিহত হন (১)

২। এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরিতে একখানি হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তকটি বিদ্যাপতির আদেশে মিথিলার রাজধানী গজরথপুরে ২৯১ ল সংএ অর্থাৎ ১৩৯৮ খৃঃ লিখিত হয়।

৩। রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে ২৯৩ ল সংএ, ১৩২৯ শকে, ১৪৫৫ সংবতে বিসফী গ্রাম দান করেন, ইহা উক্ত রাজার প্রদত্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায়।

---

(৩) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বীরেশ্বর রাজা কামেশ্বর ঠাকুরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু বীরেশ্বরের পুত্র চণ্ডেশ্বর রাজা হরিসিংহ দেবের মন্ত্রী ছিলেন, ইহা আমরা চণ্ডেশ্বর গ্রন্থ হইতে জানিতে পারিতেছি। অতএব, চণ্ডেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী বীরেশ্বর হরিসিংহ দেবের পরবর্ত্তী রাজা কামেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন, ইহা অসম্ভব না, হইলেও সামঞ্জস্যহীন বোধ হইতেছে।

"মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতির" রচয়িতা শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বীরেশ্বর রাজদেব বংশীয় রাজা শক্রসিংহ ও হরিসিংহ দেবের মন্ত্রী ছিলেন। ইহা সঙ্গত হইতে পারে বটে, কিন্তু আবার উক্ত মহোদয় লিখিয়াছেন যে, বীরেশ্বরের ভ্রাতা ধীরেশ্বর রাজা কামেশ্বর ঠাকুরের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু উপরে উক্ত কারণে ইহাও সামঞ্জস্যহীন বোধ হইতেছে।

(৪) দ্বারভাঙ্গা জেলার জরৈল পরগণার অন্তর্গত হসূলপুর গ্রামে এই মন্দির অবস্থিত। এখানে প্রত্যেক বৎসর ফাল্গুন মাসে এক মেলা হয়।

৪। বিদ্যাপতি নিম্নলিখিত কামেশ্বর-ঠাকুরবংশীয় মিথিলার রাজাদের সভায় উপস্থিত ছিলেন :—

রাজা কীর্ত্তি সিংহ
,, দেব সিংহ
,, শিব সিংহ
রাণী হরপ্রিয়া দেবী
রাজা পদ্ম সিংহ
রাণী বিশ্বাস দেবী
রাজা নর সিংহ।
রাজা ধীর সিংহ
,, ভৈরব সিংহ

৫। রাজা ধীরসিংহ ৩২১ ল সংএ বর্ত্তমান ছিলেন, এবং ইঁহার পরবর্ত্তী রাজা ভৈরবসিংহের সময়ে বিদ্যাপতি পরলোকে গমন করেন (২)

৬। রাজা শিব সিংহ ২৯৩ ল সংএ রাজা হন, এবং উহার ৩।৪ বৎসর পরেই অর্থাৎ ২৯৭ ল সং এর মধ্যে দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া নিরুদ্দিষ্ট হন। বিদ্যাপতির কবিতা-পাঠে বোধ হয় যে তিনি শিবসিংহের নিরুদ্দেশ হইবার পর ৩২ বৎসর জীবিত ছিলেন। যথা :—

সপন দেখল হাম শিবসিংহ ভূপ।
বতিস বরস পর সামর রূপ।
বহুত দেখল গুরুজন প্রাচীন।
আব ভেলহু হম আয়ু বিহীন।(৩)

---

(১) বিদ্যাপতি-প্রণীত কীর্ত্তিলতা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, রাজা গণেশ্বর আসলান নামক এক জন মুসলমান কর্তৃক ২৫২ ল সংএ নিহত হন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত "বিদ্যাপতি" ঠাকুরের পদাবলীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(২) দ্বারভাঙ্গার মহারাজের লাইব্রেরিতে "সেতুদর্পণী" নামক একখণ্ড হস্তলিখিত পুরাতন তাল পত্রের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে :—"পরমভট্টারক ইত্যাদি মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবীয়ৈকবিংশত্যধিক শতত্রয়তমাব্দে কার্ত্তিকাবদাতাযাং গুরৌ সমস্ত প্রক্রিয়া বিরাজমান রিপুরাজ কংসনারায়ণ শিবভক্তিপরায়ণ মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীমদ্ধীরসিংহ সমুদ্যমানানাং তীরভুক্তৌ ০ ০ শ্রীরত্নেশ চরেণ ০ ০ লিখিতমদঃ পুস্তকমিতি।"

(৩) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত "বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী।"

রাজা গণেশ্বরের মৃত্যুকালে যদি বিদ্যাপতির বয়স ৮ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে বিদ্যাপতি ২৪৪ ল সং এ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ বলা যাইতে পারে। রাজা শিবসিংহ ২৯৭ ল সংএ নিরুদ্দিষ্ট হন। অতএব ২৯৭+৩২= ৩২৯ বা ৩৩০ ল সংএ বিদ্যাপতির মৃত্যু হইয়াছিল। ধীরসিংহ ৩২১ ল সংএ বর্ত্তমান ছিলেন।

তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা তদীয় ভ্রাতা ভৈরবসিংহের ৯ বৎসর পরে ৩৩০ ল সংএ রাজত্ব করা খুব স্বাভাবিক। ২৪৪ ল সংএ বিদ্যাপতির জন্মকাল ধরিলে ৪৯ বৎসর তিনি স্বীয় কবিত্বের পুরস্কারস্বরূপ রাজা শিবসিংহের নিকট হইতে বিসফি গ্রাম দান পাইয়াছিলেন। এই ঘটনা ও ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দিল্লীশ্বরের নিকট স্বীয় কবিত্বগুণে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া শিবসিংহকে মুক্ত করিয়া আনা, এই ঘটনা খুব স্বাভাবিক হইয়া পড়ে, এবং এই ঘটনাগুলি বিদ্যাপতির পরিণত বয়সে সংঘটিত হইবার স্বাভাবিকতা দেখাইবার জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, বিদ্যাপতি ২৪৪ ল সং বা ১৩৫১ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৮৬ বৎসর বয়সে ৩৩০ ল সংএ বা ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির যে অনুমানিক জন্মকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১) তাহা হইতেও আমার নির্দ্দিষ্ট কালের অধিক পার্থক্য হইতেছে না।

সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের খুল্লতাত হরি মিশ্রের নিকট বিদ্যাপতি বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন পক্ষধর মিশ্র ইঁহার সহপাঠী ছিলেন। পক্ষধর মিশ্র ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে।

বিদ্যাপতির এক অতিথিশালা ছিল। অতিথিদিগের ভোজন শেষ হইলে তিনি স্বয়ং যাইয়া তাহাদিগের সহিত আলাপ করিতেন। এক দিবস এই উদ্দেশ্যে বিদ্যাপতি অতিথিশালায় গেলে, সমস্ত অতিথি দণ্ডায়মান হইলেন, কেবল একজন

---

(১) "২৯১ ল সং এ তিনি (শিবসিংহ) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রবাদ আছে, শিবসিংহের তৎকালে বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। ৩।৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি যবনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। জনশ্রুতি আছে যে, তিনি যুদ্ধের পর নিরুদ্দেশ হইয়া যান, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়, এই অনুমানই সঙ্গত। শিবসিংহের জন্ম যদি ল সং ২৪৩এ মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ২৪১ ল সংএ বিদ্যাপতির জন্ম, অনুমান করা যাইতে পারে।"

"বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী"; ভূমিকা।

কৃশকায় অতিথি চিন্তামগ্ন হইয়া এক কোণে বসিয়া রহিলেন। বিদ্যাপতি বলিলেন:—"প্রাঘুণো ঘূর্ণবৎ কোণে সূক্ষ্মত্বান্নোপলক্ষিতঃ।" অর্থাৎ, গৃহকোণে অবস্থিত সূক্ষ্মকীটবৎ অতিথি সূক্ষ্মতাবশতঃ লক্ষিত হইলেন না। উপবিষ্ট পুরুষ তৎক্ষণাৎ শ্লোকের অপরার্দ্ধ দ্বারা উত্তর দিলেন:—"নহি স্থূলধিয়াং পুংসাং সূক্ষ্মে দৃষ্টিঃ প্রজায়তে।" অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির সূক্ষ্ম দৃষ্টিগোচর হয় না। তৎপরে বিদ্যাপতি পক্ষধর মিশ্রের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আদর করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

বিদ্যাপতি বাল্যকাল হইতেই পিতার সহিত মিথিলা রাজসভায় যাতায়াত করিতেন। আমরা প্রথমে তাঁহাকে রাজা কীর্ত্তিসিংহের সভাসদরূপে দেখিতে পাই। তিনি কীর্ত্তিসিংহের পৈত্রিক রাজ্যলাভ জন্য দিল্লী গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন ও রাজ্যলাভ বিষয় বর্ণনা করিয়া কীর্ত্তিলতা নামক গ্রন্থের রচনা করেন। তিনি রাজা দেবসিংহের সভাতেও বর্ত্তমান ছিলেন। দেবসিংহের পুত্র শিবসিংহ তাঁহার সমবয়স্ক ছিলেন।

উভয়ে উভয়ের গুণের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যাপতি শিবসিংহের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, শিবসিংহ দিল্লীতে কর প্রেরণ বন্ধ করেন, এবং তজ্জন্য দিল্লীশ্বর তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া যান। বিদ্যাপতি প্রিয় সুহৃদের বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া তাঁহার উদ্ধার জন্য দিল্লীযাত্রা করেন, এবং স্বীয় কবিত্বগুণে দিল্লীশ্বরকে মুগ্ধ করিয়া শিবসিংহকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আইসেন।

বিদ্যাপতির কবিতাবলীতে শিবসিংহ ও লছিমা দেবীর নামোল্লেখ যতবার দেখিতে পাওয়া যায়, ততবার আর কোনও রাজা বা রাণীরই নাম পাওয়া যায় না। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শিবসিংহ ও লছিমা দেবীর সময়েই তাঁহার কবিত্বশক্তি সবিশেষ বিকশিত হইয়াছিল। অধিকাংশ পদাবলী এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার কবিত্বের যশোজ্যোতি এতদূর বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল যে, শিবসিংহ তাঁহাকে "নব জয়দেব" উপাধি দান করিয়াছিলেন। শিবসিংহ রাজ্যারোহণ করিয়াই কবিত্ব ও সৌহার্দ্দ্যের পুরস্কারস্বরূপ বিদ্যাপতিকে "বিসপি" গ্রাম দান করেন। এই গ্রাম এত সুবিস্তৃত ছিল যে, এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ মিথিলায় প্রচলিত আছে:—

অধিক সৈ বর বিসপি বসে।
কেও বিসপি পড়লে হসে।

অদ্যাবধি বিদ্যাপতির বংশধরেরা এই গ্রাম ভোগ করিয়া আসিতেছেন।(১)

রাজা শিবসিংহ দিল্লীশ্বর কর্তৃক তৃতীয়বার আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে স্বীয় পুরমহিলাদিগকে বিদ্যাপতির সহিত নেপালের নিকটবর্ত্তী রাজবনৌলী নামক স্থানে পাঠাইয়া দেন। বিদ্যাপতি এইখানে দ্রোণবংশীয় রাজা পুরাদিত্যের সভায় কিছুকাল অবস্থান করেন। তিনি রাজাপুরাদিত্যের আদেশে ২৯৯ ল সংএ "লিখনাবলী" নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই স্থানে তিনি সমস্ত ভাগবত গ্রন্থ স্বহস্তে লিখিয়া ৩০৯ ল সংএ সমাপ্ত করেন।(২) বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত ভাগবত গ্রন্থ অদ্যাবধি তরৌণী গ্রামে বর্ত্তমান আছে। কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় মিথিলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাণী লখিমা দেবী, রাজা পদ্মসিংহ, রাণী বিশ্বাস দেবী, রাজা নরসিংহ, ধীরসিংহ ও ভৈরব সিংহের সভা সুশোভিত করেন।

মৈথিলী ভাষায় রচিত পদাবলী ব্যতীত বিদ্যাপতি কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থের রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলি প্রায়ই অপ্রাপ্য বা বিরলপ্রাপ্য। কোনও কোনও গ্রন্থের কতক অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে কোনও কোনও গ্রন্থের অংশবিশেষ ব্যতীত অধিক দেখিবার সৌভাগ্য বর্ত্তমান লেখকের হয় নাই। তবে এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থলে প্রদত্ত হইল।

১। কীর্ত্তিলতা—এই গ্রন্থ রাজা কীর্ত্তিসিংহের সময়ে রচিত হয়, ইহাতে রাজা কীর্ত্তিসিংহের পৈতৃক রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য দিল্লী গমন ও পৈতৃক রাজ্যলাভ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থ নেপাল মহারাজের লাইব্রেরীতে দেখিতে পান, এবং সেখান হইতে নকল করিয়া আনেন। শ্রীনগরের ৮ রাজা কমলানন্দ সিংহ মহাশয় ইহার ৫টি শ্লোক "সরস্বতী" পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থের ভাষা

---

(১) এক্ষণে এই গ্রামের জন্য তাঁহারা বৃটিশ গভর্মেণ্টকে কর দিয়া থাকেন।

(২) "মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি" প্রণেতা শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় মহাশয় লিখিয়াছেন, এই ভাগবত গ্রন্থ ৩৪৯ ল সংএ লিখিত হইয়াছিল। এত সুদীর্ঘকাল বিদ্যাপতির জীবিত থাকা, এবং জীবিত থাকিলেও এত বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্য অতি অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। পক্ষান্তরে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি ৩০৯ ল সং এ ভাগবত গ্রন্থ লিখিয়া শেষ করেন।

বিশুদ্ধ সংস্কৃত নয়। ইহা কতক সংস্কৃত ও কতক প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। বিদ্যাপতি এই ভাষাকে 'অবহট্ট' ভাষা বলিয়াছেন।

২। পুরুষপরীক্ষা—এই গ্রন্থ রাজা শিবসিংহের আদেশে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। ইহাতে কথাচ্ছলে ধর্ম্ম এবং রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ৪৮টি উপাখ্যান আছে। পুরুষ-নামধারী সকলেই যে পুরুষ নহে, প্রকৃত পুরুষ-পরীক্ষা কি, উপাখ্যানচ্ছলে ইহাতে তাহাও বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে শৃঙ্গার রসও আছে। এই গ্রন্থের ৩য় শ্লোকে কবি লিখিয়াছেন :—

শিশূনাং সিদ্ধার্থং নয়পরিচিতে নূতনধিয়াং
মুদে পৌরস্ত্রীণাং মনসিজকলাকৌতুকজুষাম্।
নিদেশান্নিঃশঙ্কং সপদি শিবসিংহক্ষিতিপতেঃ
কথানাং প্রস্তাবং বিরচয়তি বিদ্যাপতিকবিঃ ।৩।

অর্থাৎ :—অপরিণতবুদ্ধি শিশুদিগের নৈতিক শিক্ষার জন্য ও পৌর-স্ত্রীদিগের জন্য রাজা শিবসিংহের আদেশে কবি বিদ্যাপতি নিঃশঙ্কচিত্তে এই সমস্ত গল্প রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বঙ্গভাষার অধ্যাপক ৺হরপ্রসাদ রায় মহাশয় ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। এই বঙ্গানুবাদ উক্ত কলেজে পড়ান হইত।

৩। লিখনাবলী—বিদ্যাপতি যখন দ্রোণবংশীয় রাজা পুরাদিত্যের রাজ-সভায় রাজবনৌলি গ্রামে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে ২৯৯ ল সংএ উক্ত রাজার আদেশে এই গ্রন্থের রচনা করেন। ইহাতে তৎকালপ্রচলিত পত্রলিখন-প্রণালী লিখিত আছে।

৪। শৈবসর্ব্বস্বসার—রাণী বিশ্বাস দেবীর আজ্ঞায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। ইহাতে রাণী লখিমা দেবী ব্যতীত ভবসিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বাস দেবী পর্য্যন্ত মিথিলা-রাজবংশের দানশীলতা দেবভক্তি ও বীরত্বাদি যশোবর্ণন করা হইয়াছে। ইহাতে রাজকুলদেবতা মহাদেবের পূজা অর্চ্চনার পদ্ধতিও লিখিত আছে।

৫। গঙ্গাবাক্যাবলী—এই গ্রন্থও রাণী বিশ্বাস দেবীর আদেশে লিখিত। এই গ্রন্থের শেষে এইরূপ লিখিত আছে :—

বিমৃশ্য নিবন্ধান্ সম্যক্ শ্রীবিদ্যাপতিসূরিণা।
গঙ্গাবাক্যাবলী দেব্যাঃ প্রমাণৈর্বিমলীকৃতা।

৬। বিভাগসার।—এই গ্রন্থ রাজা নরসিংহের সময়ে রচিত। ইহা দায়াধিকারসম্বন্ধীয় স্মৃতিগ্রন্থ। ইহাতে লিখিত আছে:—

রাজ্যো ভবেশাদ্ধরি সিংহ আসীৎ।
তৎসূনুনা দর্পনারায়ণেন।
রাজ্ঞা নিযুক্তোঽত্র বিভাগসারং।
বিচার্য্য বিদ্যাপতি রাতনোতি।

৭। গয়াপত্তন।—এই গ্রন্থ রাজা নরসিংহের পত্নী ধীরমতি দেবীর আদেশে রচিত হয়।

৮। দানবাক্যাবলী।—এই গ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত রাজ্ঞী ধীরমতি দেবীর আদেশে রচিত হয়।

৯। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী।—এই গ্রন্থ রাজা ভৈরব সিংহের আদেশে রচিত হয়। (১) ইহা গদ্যে ও পদ্যে রচিত। ইহাতে দুর্গাপূজা-প্রণালী বিবৃত আছে। অদ্যাপি অনেক স্থলে এই গ্রন্থানুসারে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ বঙ্গদেশীয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

চৈতন্যদেবের অনুচর অদ্বৈত প্রভু তীর্থভ্রমণকালে মিথিলায় বিদ্যাপতির সাক্ষাৎলাভ করেন। পদকল্পতরুগ্রন্থের দুইটি কবিতা পাঠে জানা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবং উভয়ে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ এই ঘটনাকে কবি-কল্পনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার বিশেষ কোনও কারণ দেখা যায় না। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বীরভূমির অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই তিনি বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন। উভয়েই কবি ও কৃষ্ণপ্রেমানুরাগী ছিলেন; এমন অবস্থায় যে উভয়ে পরস্পরের গুণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ করিবেন, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

বিদ্যাপতির পুত্রের নাম হরপতি ঠাকুর ও পুত্রবধূর নাম চন্দ্রকলা। ইনি বিদুষী রমণী ছিলেন। ইঁহার রচিত কয়েকটি পদ লোচন নামক কবির সঙ্কলিত "রাগতরঙ্গিণী" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। (১) বিদ্যাপতির পত্নীর নাম মন্দাকিনী ও কন্যার নাম দুল্লি বা দুল্লহি ছিল, তাঁহার কোনও কোনও কবিতা হইতে জানিতে পারা যায়। প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় কবি চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির

১। এতৎ সম্বন্ধে কেহ কেহ মতান্তর প্রকাশ করিয়াছেন।

সাক্ষাৎ হয়, ইহা আমরা পদকল্পতরুর কয়টি কবিতা হইতে জানিতে পারি। চৈতন্যদেবের সহচর অদ্বৈত প্রভু তীর্থভ্রমণকালে বিদ্যাপতিকে মিথিলায় দেখিতে পান।

বিদ্যাপতি আনুমানিক ৩০০ ল সং এ অর্থাৎ ১৪০৭ খৃঃ ৮৬ বৎসর বয়সে রাজা ভৈরব সিংহের রাজত্বসময়ে কার্ত্তিক শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে গঙ্গাতীরে পরলোক গমন করেন।(১) কথিত আছে যে, বিদ্যাপতির চিতাভূমি ভেদ করিয়া এক শিবলিঙ্গের আবির্ভাব হয়। B. N. Ry. ষ্টেশন [illegible] নিকটবর্ত্তী সনকলীপুরের একটি শিবমন্দিরকে বিদ্যাপতির চিতাবিহীত শিবলিঙ্গের উপর নির্ম্মিত মন্দির বলিয়া স্থানীয় লোকেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।(২)

বিদ্যাপতি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেও তাঁহার মৈথিলী ভাষায় রচিত কবিতাবলীর জন্যই তিনি সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কবিতাবলীর কোনও প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থ মিথিলায় পাওয়া যায় না। স্বদেশে বিদ্যাপতির কবিতাবলী এতকাল লোকের মুখে মুখে আবৃত্তি দ্বারা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বরং বঙ্গদেশীয় পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র প্রভৃতি বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রভৃতিতে বিদ্যাপতির অনেক পদাবলী সংগৃহীত আছে। বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির পদাবলী যেরূপ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, লিখিত না থাকায় মিথিলাতেও বিদ্যাপতির পদাবলী যে সেইরূপ অবিকৃত হয় নাই, এমনও বলা যায় না। লোকমুখে সেখানেও পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা। দেখা গিয়াছে যে, একই কবিতা দুই জন মিথিলা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, অথচ উভয়ের মধ্যে মিল নাই।

১। বিদ্যাপতির আয়ু অবসান।
কার্ত্তিক ধবল ত্রয়োদশী জান।

২। বিদ্যাপতির মৃত্যু সম্বন্ধে এক অলৌকিক ঘটনার কথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, স্বীয় অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া বিদ্যাপতি শিবিকারোহণে গঙ্গাতীরাভিমুখে যাত্রা করেন। যখন গঙ্গাতীর পঁহুছিতে দুই ক্রোশ অবশিষ্ট তখন তিনি বলিলেন যে, আমি মাতা ভাগীরথীর ক্রোড়লাভ জন্য এতদূর আসিলাম, তিনি কি সন্তানকে ক্রোড়ে লইবার জন্য এইটুকু পথ আসিবেন না। এই বলিয়া তিনি সেখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালের মধ্যেই গঙ্গা ত্রিধারা হইয়া উক্ত স্থানে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। বিদ্যাপতি গঙ্গার স্তব করিতে করিতে উক্ত স্থানে দেহ ত্যাগ করিলেন।

বর্ত্তমান কালে গ্রিয়ারসন সাহেব প্রথমে মিথিলা হইতে বিদ্যাপতির অনেক পদাবলী সংগ্রহ করিয়া ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। তৎপরে হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বিদ্যাপতির পদাবলীর সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন।

পরলোকগত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় বিদ্যাপতির বঙ্গদেশ-প্রচলিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন। সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির পদাবলীর এক সুবিস্তৃত সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। বেহারের আরার উকীল শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় মহাশয় নাগরী-প্রচারিণী সভা হইতে মিথিলার অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও বিদ্যাপতির জীবনচরিত সহ 'মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি' নামে বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

চারি পুরুষ হইতে বিদ্যাপতির বংশধরগণ বিস্ফি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত সৌরাঠ নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। বিদ্যাপতির ১২শ-১৩শ পুরুষ অধস্তন বংশধরগণ বর্ত্তমান সময়ে উক্ত গ্রামে বাস করিতেছেন।

শ্রীপ্রমথনাথ মিশ্র।

শঙ্খ। *

শঙ্খ! একখণ্ড অস্থিমাত্র; কুটিলকণ্ঠ, শূন্যগর্ভ, দীর্ঘদেহ এক খণ্ড অস্থি-মাত্র! কাহার অস্থি? যে অনন্তের তলে বেড়ায়, অসীম অম্বুনিধির কূলে গড়ায়, যে জীব সাধারণ স্পর্শ করিতে পারে না, বুঝি বা সমুদ্রের অনবরত হাহাকারে যাহার শ্রবণ বধির, জিহ্বা স্থবির হইয়াছে, এমন নাতিবৃহৎ শম্বুকের অস্থি। এই অস্থি তাহার ইহকালের সর্ব্বস্ব। ঐ কঠিন কণ্ঠ-আবরণের ভিতরে সে তাহার ইহকালের অতি কোমল জীবদেহ লুকাইয়া রাখে। ঐ আবরণের উপর স্তরে স্তরে নীলাম্বুর ঊর্ম্মিরাশি আসিয়া অব্যা-

---

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ।

হত পরম্পরায়, কেবল আছাড়ি-বিছাড়ি খেলা করিতেছে; ঐ আবরণের উপরে তিক্তাস্বাদ সাগরজল আসিয়া আশ্রয় লইতেছে, উহাকে ক্ষয় করিবার জন্ত কতই চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু বিধাতার দান, তাই অমন কুটিল আবরণ সাগরের অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে চূর্ণ হয় না; বরং কঠিনীকৃত চূর্ণকের আকারে উহা নিত্য বিদ্যমান থাকে। এই অস্থি যতদিন সজীব, ততদিন নীরব; যে দিন উহার কুক্ষিগত জীবন অনন্ত জীবনে মিশিয়া যায়, সেই দিন হইতে উহা শব্দের—ধ্বনির—আরাবের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া থাকে। একবার উহার মুখে মুখ মিলাইয়া ফুৎকার দিলে আজীবন-সঞ্চিত অনন্তের ধ্বনির—প্রতিধ্বনি উহা শুনাইয়া দেয়। চিরজীবন যে হাহাকারের মধ্যে থাকিয়া, যে অব্যাহত বিকট তৈরবধ্বনির লীলার মধ্যে থাকিয়া, উহা নীরবে যে মঙ্গল ও অমঙ্গল শব্দের সংক্ষার নীর অস্থির স্তরে স্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছে, যেন তাহাই নরনারীর অধরোষ্ঠের সম্মিলনে আবার ফুটাইয়া তোলে। ইহাই শঙ্খ, যাহা ধরিয়া জীবনের সুখসোহাগের প্রতিধ্বনি করে, যাহা সাগরের গম্ভীরতার পরিচয় তোমাকে দিয়া দেয়, যাহা ইহকাল ও পরকালের মধ্যে শব্দের—নাদের যষ্টিস্বরূপ, তাহাই শঙ্খ।

কবি শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার বড়াল এই শঙ্খ বাজাইয়াছেন;—আবেগ ও আবেশ মিলাইয়া, সাধ ও সোহাগ জড়াইয়া স্মৃতি ও বিস্মৃতির মিলন ঘটাইয়া, কি জানি কোন্ অজানা দেশের বার্ত্তা শুনাইবার দুরাকাঙ্ক্ষায় বড়াল কবি এই শঙ্খ বাজাইয়াছেন। তোমাদের শ্রবণে স রব—তাদের সে মঙ্গলের নির্ঘোষ পঁহুছিয়াছে কি? একদিন এই শঙ্খ বাজাইয়া স্বর্গের ভগীরথ পতিতপাবনী দুকূলপ্লাবিনী মন্দাকিনীকে ধরাধামে নামাইয়াছিলেন। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত সরলা গঙ্গার কুল্ কুল্ ধ্বনিতে ভারতভূমি নিনাদিত হইয়া আছে। একদিন এই শঙ্খ বাজাইয়া পরশুরাম নিঃক্ষত্র-পৃথিবীর চেষ্টা করিয়াছিলেন;—ধরাধাম একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিল। একদিন এই শঙ্খ বাজাইয়া বিশ্বামিত্র ঋষি মা জানকীকে মিথিলা হইতে অযোধ্যায় আনয়ন করিয়াছিলেন। হরধনুর মড় মড় ঘোর রবের প্রতিধ্বনি নিস্তব্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই শঙ্খের কল্যাণ-ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। আর একদিন ভারত-জীবন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ধর্মক্ষেত্রে—কুরুক্ষেত্রে এই শঙ্খ বাজাইয়া গীতার অশরীরী শ্রুতির গর্জ্জন মুখর করিয়াছিলেন;—তিন প্রাণ,—কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—তারা, উদারা, মুদারা—পরিস্ফুট করিয়াছিলেন। আর

সর্ব্বশেষে সংযুক্তার বিবাহ-বাসরে এই শঙ্খ একবার মঙ্গলধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল। মনে পড়ে কি সে সব শব্দ? সে আহ্বান, সে উদার ও উন্নত আকিঞ্চন,—ধ্বনি মনে পড়ে কি? শুন শুন! ভারত-সাগরের প্রত্যেক তরঙ্গের অভিঘাতে সফেন কোটীবুদ্বুদ-খণ্ডিত জলবিস্তারে—বেলাভূমির উপর ব্যর্থ আঘাত-পারম্পর্য্যে বুঝি বা এই সকল শব্দ লুকান আছে;—যুগযুগান্তরের, কল্পকল্পান্তরের এই শব্দস্মৃতি যেন জড়ান মাখান আছে। কবি সেই অনন্ত সমুদ্রের অফুরন্ত শব্দভাণ্ডারের তটভূমি হইতে অক্ষয় শঙ্খ আহরণ করিয়া, আজ সোহাগ-ফুৎকারে উহাকে শব্দময় করিয়া তুলিয়াছেন।

ইহাই শঙ্খ-কবিতা, আমাদের মঞ্জুষা, ধ্বনির পরম্পরা। শুনিয়াছি, শব্দই ব্রহ্ম; এই শব্দ তিনবার ধ্বনিত হইয়া ত্রয়ীর সৃষ্টি করিয়াছে। এই শব্দই ব্রহ্মার ওঙ্কার, পিনাকপাণির হুঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব। এই শব্দই সুখ-দুঃখ-অসুখের অভিব্যঞ্জনা। এই শব্দই পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ ও সম্ভোগের পরিচায়ক। ইহাই বিরহের হাহাকার, মৃত্যুর গদ্গদ্ ভাষা, চিতার চট্‌পটা। ইহাই জীবন ও মরণ, বিরহ ও মিলন,—ইহাই সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বময়। কেমন করিয়া বুঝাইব—ইহা কি ও কেমন? শব্দের ত তুলনা নাই। যে শঙ্খ সূতিকাগারের দুয়ারে বাজে, যে শঙ্খ বিবাহের ছাদ্‌নাতলায় বাজে, যে শঙ্খ মহাপ্রয়াণের দিনে বাজে, সে ত সবই একই শঙ্খ, একই ধ্বনি, একই নাদ। কিন্তু শ্রবণে পৃথক শুনায় কেন? ঐ এক সুরে বাঁধা শঙ্খ কখনও হাসে, কখনও কাঁদে কেন? কি জানি কেন! কবি বুঝি এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারেন। অক্ষয় কবি উত্তর করেন নাই, শুধু দেখাইয়াছেন;—

'আসে যায়—কেহ নাহি চায়, সবাই খুঁজিছে মুক্তামণি;
কে শুনিবে হৃদয়ে আমার বাজিছে কি অনন্তের ধ্বনি।'

ঐ ত গোল! এ জগতে কেহ কাণ পাতিয়া শুনে না, সবাই চাহে, সবাই আকাঙ্ক্ষায় প্রমত্ত থাকে, লইতেই ব্যস্ত হয়, শুনিতে চাহি না। চিকিৎসক যন্ত্রসাহায্যে হৃদয়ের গুরু-গুরু ধ্বনি শুনেন না, রোগ আছে কি না, তাহাই নির্ণয় করেন। প্রণয়িনীও সে শব্দ শুনে না, কেবল প্রেম আছে কি না, তাহারই অন্বেষণ করে। শিশুপুত্র বুকে মাথা দিয়া সে শব্দ শুনে, কিন্তু বুঝিতে পারে না, তাই বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে, জনকের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। সেই 'অনন্তের ধ্বনি' যে শরীরী হইয়া রক্তমাংসের অবয়ববিশিষ্ট

হইয়া পুত্ররূপে বুকে শুইয়া আছে, শিশুকে এ বারতা ত কেহ দেয় না। বঙ্গাল কবি সে খবর একটু দিয়াছেন।

'কিংবা আজীবন এই হৃদয়-শয্যাতে
যে আকুল স্নেহ—
বহু শয়নেও যত ঘুরিত সে অবিরত,
ঘুরে' ঘুরে' এত পরে ধরেছে ও দেহ।'

• • •

'অনাদি-অনন্তরূপা মহাকাল মায়া,
আয়, বুকে আয়।
আয় সতী চিতি-মূর্তি, আয় শিবরূপা-স্ফূর্তি,
কি বল করিব তোরে—স্নেহ না কুলায়।'

স্নেহে কুলায় না বলিয়াই এত আকুলি-বিকুলি, এমন যা হতাশ, স্নেহে কুলায় না বলিয়া তাহা ফুরায় না, কথা বলি বলি করিয়া বলা হয় না। তাই কবির সমাধান গ্রহণ করিতে হয়। কবি অক্ষয়, অক্ষয় শব্দে ধ্বনি করিয়া বলিতেছেন;—

'ওই প্রেমে প্রেমানন্দে, ওই স্পর্শে, ওই গন্ধে
আবার জাগুক মনে—আমি যে মহান্,
একেশ্বর, অদ্বিতীয় অখণ্ড-প্রধান।'

ইহাই শব্দের ধ্বনি। ইহাই শব্দ ব্রহ্ম—আত্মবাদ। শব্দ না হইলে এমন ধ্বনি ফুটিয়া উঠে না। তাই প্রথমেই শব্দের পরিচয় দিতে হইয়াছে। এমন শব্দের মর্ম যে ব্রহ্মময়, তাহাও বলিতে হইয়াছে। নহিলে এমন সমাচার শুনিতে পাই? ইহাই অনন্ত ধ্বনির প্রতিধ্বনি, ইহাই বংশীরব। কথাটা আরও একটু খুলিয়া বলিব। কবিই বলিয়াছেন;—

'পিছে মৃত্যু, পাশে তুমি, মধ্যে আমি আমি-ভূমি,
স্থল-জল বিভাগ-বাধো।
আগে দেহ—আগে সুখ, আগে স্মৃতি—তুমি সুখ,
আগে মৃত্যু—চাহি অমরতা।'

ইহাই জীবনের জিজ্ঞাসা; ইহাই শাস্ত্র, ইহাই বেদ ও বেদান্ত। আমি আছি যখন, তখন তুমি আছই; কেন না, আমার আমিত্বের উপলব্ধি যখন হইয়াছে, তখন তোমার তুমিত্বের অধ্যাস থাকিতে হইয়াছে-ই। আমি তাই তোমাকে আমার করিতে চাহি, বা আমাকে তোমার করিতে চাহি। এই তোমার-

আমার মিলনচেষ্টা এবং বিরহ-অনুভূতি লইয়াই সংসারের সুখ দুঃখ। কিন্তু এই সুখ-দুঃখে দেহই বিষম অন্তরায়। দেহ আছে বলিয়াই ক্ষুধা আছে, দেহ আছে বলিয়াই সে ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই। ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই বলিয়াই তুষ্টি তৃপ্তি নাই। এই অতৃপ্তির জ্বালা—বিষম জ্বালা; তাই খুঁজি সুধা। সেই সুধার আধার যাহাতে যদি থাকে ত, আমরা লাভ করিতে পারি। চাই অব্যাহত সুখ, অনন্ত তৃপ্তি। দেহের সাহায্যে কেবল এই সুখ ও তৃপ্তির অনুভূতি হইয়াছে। এই দেহজন্যই তোমার-আমার বিভেদ-বিচার, এই দেহ জন্যই তুমি—তুমি, আমি—আমি। তাই অমরতার জন্য এত প্রয়াস। তোমার অমরতা এবং আমার অমরতা—উভয়ের অক্ষয়তার জন্য এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এই তত্ত্বকথাটি কবি অতি সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। যখন মনে হইবে, আমিই একেশ্বর অদ্বিতীয় অনন্তপ্রধান, তখনই আমার আত্মার টুকরাগুলি—সন্তানসন্ততিগুলিকে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডে অণুপরমাণুর মত ঘুরিতে বলিয়াই মনে হইবে। এক এবং অদ্বিতীয় আমি বহু হইবার সাধ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে এক আমি বহু হইলাম; সেইজন্যই বলিতে হয়, আমার ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডে যে অণু-পরমাণুগুলি ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহারাই সাকার হইয়া আমারই আত্মজ-আত্মজা-রূপে প্রকট হইয়াছে। অক্ষয় কবি বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি গূঢ় তত্ত্ব অতি মধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ইউরোপের ফিলজফি এই সিদ্ধান্তের—এই আত্মতত্ত্বের তেমন সমাচার রাখেন না। ইউরোপের কবিও মহাবাক্যের এমন প্রতিধ্বনি করিতে পারেন না। এই তুমি ও আমির খেলা, এই আমি ও তুমির সম্বন্ধ-বিচার লইয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব, উহাই জীবননাট্যের প্রথম শঙ্খধ্বনি, উহাই আদি, উহাই অন্ত। বুঝিবে কি? যদি বুঝিতে চাও ত বড়াল কবিকে বুঝিয়া লও। উঁহার শঙ্খধ্বনির তত্ত্বটা জানিয়া লও। প্রভাতে কবি গাহিয়াছেন,—

'বুঝিতে পারি না আমি এ খেলা কেমন।
চিরদিন ধরি ধরি,
খুঁজিয়া—খুঁজিয়া মরি,
সেই এই-এই ক'রে যাবে কি জীবন?'

ইহা তোমারই গান, ভৈরবীর উদাস তান। একবার মধ্যাহ্নের গৌড়-সারঙ্গ সুরটা শুন। কবি বলিতেছেন,—

'ধরা একাকী পড়ে, যেন কি স্বপন-ভরে।
মুদে আসে আঁখিপাতা যেন কি আরামে।

অন্তমনে চাহি' চাহি'— কত ভাবি, কত গাহি।
পড়িছে গভীর শ্বাস —গানের বিরামে।
বনে বনে পড়ে পাতা, মনে পড়ে কত গাথা—
ছায়া-ঘেরা কত ব্যথা সহি বরাবরে।'

মধ্যাহ্নের এই গানের পর কবি 'আকুল হৃদয়ে কাঁদে কোথা তুমি—তুমি'। সকালে বুঝি না, মধ্যাহ্নে ছায়া-ছায়া কত ব্যথা—বুঝি বা ধরি-ধরি করিয়া ধরিতে পারি না; শেষে সায়াহ্নে তোমার খবর—তাহার খবর যেন একটু বুঝিতে পারি, যেন একটু ধরিতে পারি, তখন উদাস প্রাণে কোথায় তুমি বলিয়া কাঁদিতে হয়। কাঁদিয়াও নিবৃত্তি হয় না, তাই বলিতে হয়—

'ছায়া-ছায়া হয়ে কেন বেড়াইছ ভাসি?
ভাঙিয়া স্বপন-কারা সমুখে আসিয়া দাঁড়া—
নয়ন পলক-হারা, মুখে ভরা হাসি।
নাহি কথা, নাহি ব্যথা — কি গভীর নীরবতা।
শূন্য হৃদয়ে পড়ে উছ্‌সি—উছ্‌সি।'

কবির এইটুকু বলিয়া যেন সাধ মিটিল না; —যেন সবটা বলার মতন বলা হইল না। তাই ডাক দিয়া কবি বলিতেছেন,—

'দাঁড়াও, অন্তের আত্মা! পরলোক-বেলাভূমে
বাড়ায়ে দক্ষিণ কর মৃত্যুর শিথিল ধূমে।

• • •

দেখেছি তোমার চোখে জীবের মরণ নাই,
বুঝেছি এ মরুভূমে মম ব্রহ্মানন্দ তাই।'

ইহাই শব্দের ঝিলমিলি, শব্দের তত্ত্বকথা, উহার অনাহত ধ্বনি। এইটুকু বুঝাইব কেমন করিয়া? বলিয়াছি ত, ইহাই বেদ-বেদান্ত, ইহাই তন্ত্রতত্ত্ব, ইহাই মানবতার আধার, পুরুষকারের বেদী।

কবি কে? যিনি মনের কথা খুলিয়া বলেন; —যাহা বলি-বলি বলা হয় না—যাহা বলি-বলি বলিতে পারি না,—কবি তাহাই স্পষ্ট বলিয়া দেন। কেবল বলিয়াই ক্ষান্ত হন না; কবি এমন করিয়া কথাগুলি বলিয়া দেন, যাহার প্রভাবে অনেক নূতন কথা, কত অ-জানা দেশের অপরিজ্ঞাত কথা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। সে সব কথা বলা যায় না, পরন্তু বুঝা যায়;— বুঝি বা তেমন করিয়া বুঝাও যায় না, তবে কেমন-যেন কি-রকম ভাবে

সে সব কথা আপনা হইতেই মনে জাগিয়া উঠে। তাই বলিতে হয় যে, সে সব বিষয়ের ভাষা নাই; অভিব্যঞ্জনার কোনও উপায় নাই। ভাগ্যে থাকে, বুঝিতে পারিবে; ভাগ্যে না থাকে ত এ জীবনে আর সে বিষয়ের বোধ ও বোধ-লক্ষণা কোনও কিছুরই উপলব্ধি হইবে না। কাজেই বলিতে হয়, কবি বুঝান না—দেখান; কদাচিৎ দেখাইতেও পারেন না—কেবল ভাবান। কবি বলিতেছেন;—

'দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই,
বুঝেছি এ মরভূমে মত্ত মরমাবন্ধ তাই।'

বুঝাও দেখি, ইহার মর্ম! রসতত্ত্ব নিঙ্গাড়িয়া নিঙ্গাড়িয়া বহু বিষয়ের অবতারণা করিতে পার; পরন্তু যে রসিক নহে, তাহাকে ইহার মাধুরী কখনই বুঝাইতে পারিবে না। আমি ও তুমি—ইহারা দুই জন কাহারা? আমি? পৃথিবীবাসী শতকোটী নরনারী বলে 'আমি'—কে আমি? বলিবে আত্মা? সে আবার কি সামগ্রী? সে আবার কেমন পদার্থ? সবাই আমি—আমি বলে, সবাই আমাকে লইয়া ব্যস্ত; পরন্তু কেহই 'আমি' পদার্থটাকে চিনে না, জানে না। উহা জ্ঞাত হইয়াও অজ্ঞাত, করতলগত হইয়াও আকাশের চাঁদ, হৃদয়ের সামগ্রী হইয়াও স্বপ্নের নিধি। এ যে সব আমি! —আমি-ময়, আমি মাখা, আমিতে ঢাকা! আমার পরিচয় আমি দিব কাহাকে? আমার পরিচয় শুনিবার লোক নাই বটে, পরন্তু সে পরিচয় দিবার সাধ আমাতে আজন্ম—অনাদি কাল হইতে গাঁথা আছে। আমি সেই পরিচয় দিতে চাহি বলিয়াই, সে পরিচয় দিতে না পারিলে আমার শান্তি, তুষ্টি, তৃপ্তি, কান্তি হয় না বলিয়াই,—আমি 'তোমাকে' খুঁজিয়া বেড়াই। কে তুমি? এ প্রশ্নের উত্তর করাও বড় কঠিন। আমি আছি বলিয়াই তুমি আছ, পরন্তু আমি যেমন অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত তুমিও তেমনি অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত, তোমায়, যখন নির্নিমেষনয়নে দেখিতে থাকি, তখন তোমাতে আমি আমাকে দেখি কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু সে দেখায় যে মাধুরী ফুটিয়া উঠে, আমি তাহাকে প্রেম বলি, রস বলি, মধুরতা বলি। কেন বলি? বড় সাধ—তোমাকে আমি আমার করিয়া লইব; বড় আশা—আমি তোমার হইয়া থাকিব। কেন এমন সাধ হয়? পরকে আপনার করিবার, আপনাকে বিনামূল্যে বিকাইয়া দিবার, প্রাণ লইয়া এই রসের হাট—সংসারে কিনি করিবার কেন

এমন সাধ হয়?" হয় বলিয়াই হয়—হইতে হয় বলিয়াই হয়—'স্বভাব এই যে তোমা বৈ আর জানি না,' তাই হয়—নিয়তির এমনই বিধান, তাই হয়! কেন হয়, কে বলিতে পারে! স্বয়ং সদাশিব এইখানে মূক। কাজেই বলিতে হয়, ধন্য ব্রহ্মানন্দ ভাই। কিন্তু এই ব্রহ্মানন্দ বুঝিতে হইলে যে প্রীতির প্রয়োজন, সে প্রীতি যে অতি অসহায়, কবি অক্ষয় তাহা খুলিয়া লিখিয়াছেন। অহঙ্কারের বেত্রাঘাতে প্রীতির যে দুর্দশা হয়, তাহা কবি অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন। সেই অহঙ্কার-বিবশা প্রীতির অভিব্যঞ্জনা কবি করিতে ছাড়েন নাই। আবার শাস্ত্র এইখানে আসিয়া কবিকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। চণ্ডী অতুল্য ভাবে বলিয়া রাখিয়াছেন যে, প্রীতি ও শ্রীজগন্ময়ী জননী মা অন্নপূর্ণা! এক কথায় জীবনতত্ত্ব ভগবানের কথা মলয়সমীরে—সুখ-শিহরণে পরিণত হইল। সাধকে এবং কবিতে এইটুকু পার্থক্য। কবি সদাই মুগ্ধমত্ত, স্বীয় কল্পনাগত সৌরভে আকুল; সাধক সে কস্তুরীটুকু খুঁজিয়া বাহির করিয়া লন। আশীর্বাদ করি, অক্ষয় কবি, অক্ষয় সাধক হউন।

'এ জীবনে পূরিত সকল,
সে যদি গো আসিত কেবল।
গানে বাকি সুর দিতে, ফুলে বাকি ফুলে দিতে;
কত বাকি হইতে সফল—
সে যদি গো আসিত কেবল।'

বটেই ত! সে যদি গো আসিত কেবল! ঐ দুঃখেই ত জীবনে মরণ ঘটিয়াছে,—ক্ষণে ক্ষণে মরিতেছি, ক্ষণে ক্ষণে মরণে জীবনলাভ করিতেছি। সে যদি গো আসিত কেবল!—শততাপ নিদাঘের সুধা-মাখান নিধি আমার, জীবনমরীচিকায় মেঘ-সুধা আমার, সে যে আসে—আসে করিয়া আসে না,—ধরা দেয়—দেয়—দেয় না। শ্মশান-ক্ষেত্রে গঙ্গার তীরে চিতা-চুল্লী জ্বালিয়া যখন বসিয়া থাকে, গঙ্গার কোটিবীচিভঙ্গবিতানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্মির উপর দিয়া যে সময়ে বাতাস বহিয়া যায়, তখন মনে হয়, তাঁহার অঞ্চলখানি বুঝি কপোলের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। যায় বটে, কিন্তু আর আসে না। চমক ভাঙ্গে বটে, কিন্তু সাধ মিটে না। পরিণয়-বাসরে ফুল-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া যখন বসিয়া থাকে, তখন পার্শ্বে জ্যোৎস্নাকরবিকশিতা বালিকার আধবাধ প্রলাপের সঙ্গে মনে হয়, সে বুঝি গো আসিয়া বসিল!

পরক্ষণেই সব অন্ধকার—স্তব্ধ, শান্ত, সংযত, স্থবির! চমক ভাঙে বটে, কিন্তু সাধ যে মিটে না। এমনই জীবনের সকল ব্যাপারে, পদে পদে, উঠিতে—বসিতে, খাইতে—শুইতে কেবল ঠকিতে থাকি; কোটী জন্মেও ট্যাণ্টাল-সের তৃষার উপশান্তি ঘটে না।

'বহিতেছে সেই বায়—
চমকিয়া পায় পায়
ফুলের সুবাস মত কেহ নাহি আসে!'

তাই বুক ফাটাইয়া—গগন পবন স্তব্ধ করিয়া বলিতে হয়—দুই বাহু তুলিয়া, ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া ফুকারিয়া বলিতে হয়,—'কোথা এ দুঃখের শেষ—কোথা ভগবান!'

ইহাই শঙ্খ! মড়া হাড়ের শুষ্ক নীরস পঞ্জর ভেদ করিয়া ইহাই শঙ্খধ্বনি! জন্ম-জন্ম এমনই ভাবে কত শঙ্খ বাজাইলাম—কত কাঁদিলাম, কত হাসিলাম। সাগরকূলে ঐ মৃত অস্থিখণ্ডের শব্দ-মহিমা আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিলাম না। কাহাকে ডাকে? কাহার আহ্বান এমন শুষ্ক স্বর করে?

'এস চণ্ডীদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্ত, জয়দেব-ধ্বনি;
প্রতাপ-কেদার-বাহু, গণেশ-প্রকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী!'

এস—এস! বাঙ্গালার অনন্ত অতীতের শঙ্খবাদকগণ, তোমরা সবাই এক-বার এস। বলিতে পার কি, এখনও কেন শঙ্খ বাজাই! বলিতে পার কি, এখনও কেন গৃহলক্ষ্মীদের হাতে ঐ শঙ্খ দিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করি! কেন তাহাদের দেহ-কঙ্কালের একটানা শব্দে প্রমত্ত হই? কেন শ্মশানের হাড় লইয়া এখনও সংসার-লীলাকে মুখর করি?

অলৌকিকী বাণী এ জিজ্ঞাসার উত্তর করিবে। বঙ্গীয় কবি সে উত্তরের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাই 'শঙ্খ' পড়িয়া আমি ধন্য হইয়াছি। বিস্মৃতির অন্তস্তল এক ঝঙ্কারে উড়িয়াছে। দেখ—দেখ, ভাগ্যে থাকে যদি তবে একটা কুড়িকও খুঁজিয়া পাইবে। অ রত্নোত্তীর্ণ দেবদূত এই বিষয় সাহায্যে

আবার ধূ-ধূ জলিয়া উঠিবে। ঐ শুন—শ্রবণময় হইয়া শুন, কবি শঙ্খধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

'এই যাত্রা মোর ক্লেশ   এইখানে হোক্ শেষ,
তুমি যেন আর—
একটী একটী করি',   ভার-তুলাদণ্ড ধরি'
ক'রো না বিচার!'

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা।

রামপালের মৃত্যুকাল।

গত ১৩১৯ সালের ৯ম সংখ্যক 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 'গৌড়-রাজমালা—উপক্রমণিকা" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, দেখিলাম। এই প্রবন্ধে 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, বলিয়া যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ঐতিহাসিকের চক্ষে অতীব মূল্যবান; যে হেতু উহাতে রামপালের মৃত্যুকাল কথিত আছে। যে দেশের ইতিহাস নাই, সে দেশের প্রসিদ্ধ রাজবংশীয় কোনও রাজার মৃত্যুকাল যদি কোনও প্রাচীন লিপি হইতে পাওয়া যায়, তাহা অল্প লাভ বলিয়া মনে করা যায় না। মৃত্যুকাল নির্ণীত হইলে, তাঁহার রাজ্যাবসানকালের নিমিত্ত ও পরবর্ত্তী রাজার রাজ্যারম্ভকালের নিমিত্ত অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না, অপরন্তু সমসাময়িক অন্যান্য রাজাদের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর কালনির্ণয়ের সুবিধা ঘটিয়া উঠে। দুঃখের বিষয়, অক্ষয় বাবু যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে রামপালের মৃত্যুকালবাচক অংশে পাঠের বিকৃতি থাকায়, তদীয় মৃত্যুকাল তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অক্ষয় বাবুর উদ্ধৃত উক্ত মৃত্যুকালবাচক শ্লোকাংশ এইরূপ—

"শাকে যুগবেদেন্দুরন্ধ্‌গতে"

৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল (I. C. S.) ১৮৯৪ অব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে, একটি প্রবন্ধমধ্যে, মালদহের একটি মসজিদ হইতে, তাহার উদ্ধৃত, প্রাচীন পুঁথির যে শ্লোক উদ্ধৃত করেন, তাহাতে রামপালের মৃত্যুকালবাচক শ্লোকাংশ এইরূপ—

"শাকে যুগবেদেন্দুরন্ধ্‌গতে"—P 46.

একে ত উক্ত পাঠ হইতে কোনও কাল নির্ণয় হয় না, তাহাতে আবার ঐ উদ্ধৃত প্রাচীন পুঁথিতে পাশিতায় "৯৫ শাকে" রামপালের মৃত্যুকাল, উদ্ধৃত শ্লোকাংশের অর্থরূপে লিখিত থাকায়, বটব্যাল মহাশয় কালনির্ণয় করিতে গিয়া বিষম গোলযোগে পড়েন। আমি উহাতে ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়াছে দেখিয়া, ছন্দের উপাদানের সহিত, প্রকৃত পাঠের উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছি, প্রকৃত পাঠ আমার মনে প্রতিভাত হওয়ায়, আমি যেমন আনন্দিত হই, বটব্যাল মহাশয়, তৎকালে সশরীরে বর্তমান না থাকায়, তাঁহাকে প্রকৃত পাঠ জানাইতে পারিব না বলিয়া, তেমনই দুঃখিত

হই। তৎকালে আমি "গোবিন্দচন্দ্রগীত" মদ্রুত প্রাচীন পুথি হইতে সম্পাদন করিতে-ছিলাম। তাহারই টীকার প্রসঙ্গক্রমে উক্ত শ্লোকটির কালবাচক অংশে সংশোধিত করিয়া ও সমগ্র শ্লোকটি ধৃত করিয়া রামপালের মৃত্যুকাল নির্ণয় করি। (গোবিন্দচন্দ্র গীত, ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তদনন্তর এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে প্রকাশের জন্য, ঐ বিষয়ের একক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাই। এক্ষণে বুঝিতেছি যে, "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির যত্নে যে 'গৌড়বিবরণ' প্রকা-শিত হইতেছে, তাহার কর্তাগণ, মৎকৃত পাঠোদ্ধার ও কালনির্ণয়ের বিষয় অবগত নহেন। 'সাহিত্যে' এ বিষয় লিখিলে, তাঁহারা জ্ঞাত হইয়া 'গৌড়বিবরণে' সংশোধিত শ্লোকটি নিবেশিত করিতে পারিবেন বলিয়া, মৎশোধিত কালবাচক অংশের সহিত সমগ্র শ্লোকাদি 'গোবিন্দচন্দ্রগীত' হইতে ধৃত করিতেছি—

> শাকে যুগ্মকরেণুরন্ধ্রগণিতে কন্যাং গতে ভাস্করে
> কৃষ্ণে বাক্‌পতিবাসরে যমতিথৌ যামদ্বয়ে বাসরে।
> জাহ্নব্যাং জলমধ্যতঃ স্বনশনৈ র্ধ্যাত্বা পদং চক্রিণো
> হা পালান্বয়মৌলিমণ্ডনমণিঃ শ্রীরামপালো মৃতঃ॥

যুগ্ম করেণু—৮৮। রন্ধ্র—(শরীরের নবদ্বার)—৯। অঙ্কের বামাগতিক্রমে ৯৮৮ লব্ধ হইতেছে। উদ্ধৃত পুঁথির লেখক ভ্রমক্রমে করেণুকে 'রেণু' ও গণিতকে 'গতে' লিখিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শগ্রন্থে বিকৃতাক্ষর করেণু এই পাঠ ছিল। তিনি করেণুকে—কর অর্থাৎ ২ বুঝিয়া, যুগ্ম করেণু—২২ এবং রন্ধ্র—৯ উহার বামে বসাইয়া ৯২২ করিয়াছিলেন।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার।

ভাদ্র মাসের সাহিত্যে "শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন"এর পাঠোদ্ধার ও ছায়াচিত্র দেখিলাম। এই শাসনের দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে,—

> "চন্দ্রাণামিহ রোহিতা [ ] মি (?) ভুমাণ্ডলে বিশালশ্রিয়া-
> ভিব্যাক্তো ভুবি পূর্ণচন্দ্রসদৃশঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্রোঽভবৎ।

পাঠোদ্ধারকর্তা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলেন,—'এই শ্লোকে প্রথম পাদে 'রোহিতা' অক্ষরত্রয়ের পর একটি অক্ষর উৎকীর্ণ হয় নাই, এবং তাহার পরবর্তী যে অক্ষরটি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা 'মি' বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এই পাঁচটি অক্ষর 'ভুমা' অক্ষরদ্বয়ের সহিত সমাসবদ্ধ থাকিয়া 'চন্দ্রাণাং' শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'রোহিতাবনিভুজাং' অথবা এইরূপ কোনও অর্থসংযোগের কথা উৎকীর্ণকের দ্বারা সূচিত হইয়াছে কি না, সুধীগণ তাহা বিবে-চনা করিয়া দেখিবেন।"

বসাক মহাশয় 'রোহিতা'র পর একটি অক্ষর উৎকীর্ণ হয় নাই মনে করিয়া, সেই স্থানে [ ] এইরূপ চিহ্ন দিয়াছেন। যদিও আমি সুধী নহি, তথাপি বিবেচনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমি বলি, তাম্রফলকে 'রোহিতা'র পরেরও অক্ষরটি উৎকীর্ণ হইয়াছে। যে অক্ষরটির পর বসাক মহাশয় (?) এই চিহ্ন দিয়াছেন, তাহাই সেই অক্ষর। এই অক্ষর, যাহাকে বসাক মহাশয় 'বি' মনে করিয়াছেন, তাহা গি। এই গি র পরের অক্ষরটি শিল্পীর প্রমাদে উৎকীর্ণ হয় নাই। সে অক্ষরটি হইবে,—রি। অতএব প্রথম চরণের শোধিত পাঠ এইরূপ হইতেছে—

চন্দ্রাণামিহরোহিতাগিরিভুজাং বংশে বিশালশ্রিয়াং

এই 'রোহিতাগিরি' শোণনদতটে বর্তমান রহিয়াছে। একালে লোকে ইহাকে রোহিতস্-গড়, রোতাস্‌গড় ও রোহিত বলে। 'রোহিতাগিরি'র ব্যুৎপত্তি ও সংস্থানের প্রমাণাদি আমার 'গৌড়ে সুবর্ণবণিক্' পুস্তকে দৃষ্ট হইবে।

তাম্রফলকের এই শ্লোকটি হইতে বসাক মহাশয় সুবর্ণচন্দ্রকে চন্দ্রকুলজাত মনে করিয়াছেন,—

"বুদ্ধস্য যঃ শশকজাতকমঙ্কসংস্থং
ভক্ত্যা বিভর্ত্তি ভগবানমৃতাকরাংশুঃ।
চন্দ্রস্য তস্য কুলজাত ইতীব বৌদ্ধঃ
পুত্রঃ প্রজো ভর্ত্তি তস্য সুবর্ণচন্দ্রঃ॥"

শ্লোকের ভাবার্থ এইরূপ,—চন্দ্র, শশকশিশুরূপ বুদ্ধকে অঙ্কে ধারণ করিয়া বৌদ্ধ সাজিয়াছেন, সুবর্ণচন্দ্রও চন্দ্রত্ব ও বৌদ্ধত্ব হেতু, যেন চন্দ্রের (তজ্জ চন্দ্রের কুলে জাত ইব) কুলে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়।

এই শ্লোক হইতে সুবর্ণচন্দ্রকে চন্দ্রের কুলজাত বলিয়া সপ্রমাণ করা যায় কি না, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিবেচনা করিবেন। তিনি যদি চন্দ্রবংশীয় হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতা পূর্ণচন্দ্রের চন্দ্রবংশে উৎপত্তির কথা অগ্রেই কথিত হইত। আমি চন্দ্ররাজগণকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া মনে করি। আমাদের কনকশ্রেণীয়ের (তখন সুবর্ণবণিক্ উপাধি হয় নাই) জাতীয় রাজা (প্রথম) শ্রীচন্দ্র, রোহিতাগিরিতে রাজত্ব করিতেন। এই তাম্রশাসনোক্ত রাজগণকে, তাঁহারই বংশধর বলিয়া মনে হয়। প্রথম শ্রীচন্দ্রের বংশধর এবং আমাদের বল্লভিচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ, সম্ভবতঃ পরাজিত হইয়া গৌড়মণ্ডলের দিকে অগ্রসর হইলে, তাম্রশাসনোক্ত চন্দ্ররাজদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ, রোহিতাগিরিতে রাজত্ব করেন, এবং উত্তরকালে তাঁহারাও বঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইলে, তাম্রশাসনোক্ত ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপে রাজা হইয়াছিলেন।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

এই বেলা।

এখন ত প্রেম জাগে, নয়নে যে রূপ লাগে,
পরাণ শিহরি' উঠে গানে।
কোমল মলয় বায় কি সুধা ঢালিয়া যায়,
খনো বলিয়া কুহু-তানে।
এখন ত ফুলবাসে মরণ-স্বপন ভাসে,
বিহ্বল চাহিলে চাঁদ পানে।
এই বেলা,—এই বেলা, না ফুরাতে এই বেলা —
মাধুরীর মেলা না ফুরাতে,
এস মোর স্মৃতিময়, এস মোর প্রীতিময়,
এস, এস, শেষ মধুরাতে।
বাসর সাজায়ে আজি আশা-পথ চেয়ে আছি,
গাঁথিয়াছি বাসনার মালা,
চিরবিরহের ব্যথা মরমে রয়েছে গাঁথা,
পিপাসায় প্রাণে জ্বলে জ্বালা।
সমুখে যমুনা-জল, টল-মল চল-চল,
কূলে কূলে ফুটে কলবাণী।
লহর সোহাগে সাধে চাঁদে চাঁদে মালা গাঁথে,
আঁচল বিছায় ছায়া-রাণী।
স্বপনের মত নীরে, এস এ যমুনা-তীরে,
বাহিয়া ফুলের ডিঙাখানি।
লহরীর মুখে মুখে যমুনার বুকে বুকে
সোনার হাসির রেখা টানি'।
চাঁদ চমকিয়া চায়, বিহগ মঙ্গল গায়,
ফুলে ফুলে জলে মধুকণা,
বঁধু যে আসিবে বলে' আকুল নয়ন-জলে
দিয়াছি গো শুভ আলিপনা।
মিলন-বাসর-বেশে, সমুখে দাঁড়াও হেসে
একবার মুখ পানে চাও!

নাহি মোহে দেখাদেখি, মন বলে দেখি—দেখি,
ও গো বঁধু, জীবন জুড়াও।
আমার পরাণ মাঝে যা কিছু মধুর আছে,
যাহা কিছু দেবতার দান,—
রাঙা পায় লুটাইয়া, চরণে অঞ্জলি দিয়া,
শেষে দিব ব্যথা-ভরা প্রাণ।
ঢালিয়া অমিয়া-রাশি, তখন বাজা'ও বাঁশী—
ঢল-ঢল প্রেমমাখা মুখে,
তোমার বাঁশীর রবে, মরণ মিলন হবে,
জ্বালা মোর মালা হবে বুকে।
ওই চাঁদ পড়ে ঢলে, নদী স্থির বনতলে,
শেষগান ওই গায় পিক।
মধু-নিশি-অভিসারে, কামনা-যমুনাপারে
এই বেলা এস, প্রাণাধিক।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

অনুপমার প্রেম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিরহ।

একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে অনুপমা নবেল পড়িয়া পড়িয়া মাথাটা একেবারে বিগড়াইয়া ফেলিয়াছে। সে মনে করিল, মনুষ্য-হৃদয়ে যত প্রেম, যত মাধুরী, যত শোভা, যত সৌন্দর্য্য, যত তৃষা আছে, সব খুঁটিয়া বাছিয়া একত্রিত করিয়া নিজের মস্তিষ্কের ভিতর জমা করিয়া ফেলিয়াছে; মনুষ্য স্বভাব মনুষ্য-চরিত্র তাহার নখদর্পণ হইয়াছে। জগতে শিখিবার পদার্থ আর তাহার কিছুই নাই; সব জানিয়া ফেলিয়াছে, সব শিখিয়া ফেলিয়াছে। সতীত্বের জ্যোতিঃ সে যেমন দেখিতে পায়, প্রণয়ের মহিমা সে যেমন বুঝিতে পারে, জগতে আর যে কেহ তেমন সমজদার আছে, অনুপমা তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। অনু ভাবিল, সে একটি মাধবী লতা, সম্প্রতি মুঞ্জরিয়া উঠিতেছে;—এ অবস্থায় আশু সহকার-শাখা-বেষ্টিতা না হইলে, কোটি কোটি কুঁড়িগুলি কিছুতেই পূর্ণবিকশিত হইতে পারিবে না। তাহাই খুঁজিয়া পাতিয়া একটি নবীনকান্তি সহকার মনোনীত করিয়া লইল, এবং দুই চারি দিবসেই তাহাকে মন প্রাণ জীবন যৌবন সব দিয়া ফেলিল মনে মনে মন দিবার বা নিবার সকলেরই সমান অধিকার, কিন্তু জড়াইয়া ধরিবার পূর্ব্বে সহকারটার মতামতেরও ঈষৎ প্রয়োজন হয়। এইখানেই মাধবী লতা কিছু বিপদে পড়িয়া গেল। নবীন নীরদকান্তকে সে কেমন করিয়া জানাইবে যে, সে তাহার মাধবী লতা—ফুটনোন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাকে আশ্রয় না দিলে এখনই কুঁড়ি ফুল লইয়া মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া প্রাণত্যাগ করিবে।

কিন্তু সহকার এত জানিতে পারিল না। না জানুক, অনুপমার প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অমৃতে গরল, সুখে দুঃখ, প্রণয়ে বিচ্ছেদ চির-প্রসিদ্ধ। দুই চারি দিবসে অনুপমা বিরহ-ব্যথায় জর্জ্জরিততনু হইয়া মনে মনে বলিল, "স্বামিন্, তুমি আমাকে লও, না লও, ফিরিয়া চাহ, বা না চাহ, আমি তোমার চিরদাসী। প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার। কিন্তু তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না। এ জন্মে না পাই, আর জন্মে নিশ্চয়ই পাইব;—

তখন দেখিবে, সতী সাধ্বীর ক্ষুদ্র বাহুতে কত বল!" অনুপমা বড়লোকের মেয়ে, বাটীসংলগ্ন উদ্যানও আছে, মনোরম সরোবর আছে;—সেথা চাঁদও উঠে, পদ্মও ফুটে, কোকিলও গান গায়, মধুপও ঝঙ্কার করে; এইখানে সে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিরহ-ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। এলোচুল করিয়া, অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া, গাত্রে ধূলি মাখিয়া প্রেমের যোগিনী সাজিয়া, সরসীর জলে কখনও মুখ দেখিতে লাগিল; কখনও নয়ন-জলে বক্ষ ভাসাইয়া গোলাপ পুষ্প চুম্বন করিতে লাগিল; কখনও অঞ্চল পাতিয়া তরুতলে শয়ন করিয়া হা হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল;—আহারে রুচি নাই, শয়নে ইচ্ছা নাই, সাজ সজ্জায় বিষম বিরাগ, গল্প গুজবে রীতিমত বিরক্তি—অনুপমা দিন দিন শুকাইতে লাগিল; দেখিয়া শুনিয়া অনুর জননী মনে মনে প্রমাদ গণিলেন,—"এক বই মেয়ে নয়, তার আবার এ কি হ'ল?" জিজ্ঞাসা করিলে সে কি যে বলে, কেহ বুঝিতে পারে না; ঠোঁটের কথা ঠোঁটেই মিলাইয়া যায়। অনুর জননী এক দিবস জগবন্ধু বাবুকে বলিলেন, "ওগো, একবার কি চেয়ে দেখবে না? তোমার একটি বই মেয়ে নয়, সে যে বিনি চিকিৎসায় মরে যায়।" জগবন্ধু বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি হ'ল ওর?"

"তা জানিনে।" ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "অসুখ বিসুখ কিছু নাই।"

"তবে এমন হ'য়ে যায় কেন?" জগবন্ধু বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তা' কেমন করে জানব?"

"তবে মেয়ে আমার মরে যাক?"

"এ ত বড় মুস্কিলের কথা; জ্বর নেই, বালাই নেই—শুধু শুধু যদি মরে যায় ত আমি কি ধরে রাখব?" গৃহিণী শুষ্কমুখে বড় বধূমাতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "বৌমা, অনু আমার এমন ক'রে বেড়ায় কেন?"

"কেমন ক'রে জানব, মা?"

"তোমাদের কাছে কি কিছু বলে না?"

"কিছু না।" গৃহিণী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন; "তবে কি হবে? না খেয়ে না শুয়ে এমন ক'রে সমস্ত দিন বাগানে ঘুরে বেড়ালে ক'দিন আর বাঁচবে? তোরা বাছা যা হ'ক একটা বিহিত ক'রে দে—না হ'লে বাগানের পুকুরে একদিন ডুবে মরব।" বড়বৌ কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "দেখে শুনে একটা বিয়ে দাও; সংসারের ভার পড়লে আপনি সব সেরে যাবে।"

"বেশ কথা, তবে আজই এ কথা আমি কর্ত্তাকে জানাব।"

কর্ত্তা এ কথা শুনিয়া অল্প হাসিয়া বলিলেন, "কলিকাল! দাও—বিয়ে দিয়েই দেখ, যদি ভাল হয়।" পরদিন ঘটক আসিল। অনুপমা বড়লোকের মেয়ে, তাহাতে রূপবতী, পাত্রের জন্য ভাবিতে হইল না। এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘটক ঠাকুর পাত্র স্থির করিয়া জগবন্ধু বাবুকে সংবাদ দিলেন। কর্ত্তা এ কথা গৃহিণীকে জানাইলেন; গৃহিণী বড়বৌকে জানাইলেন; ক্রমে অনুপমাও শুনিল।

দুই এক দিবস পরে একদিন দ্বিপ্রহরের সময় সকলে মিলিয়া অনুপমার বিবাহের গল্প করিতেছিল, এমন সময় সে এলোচুলে, আলু-থালু-বসনে একটা শুষ্ক গোলাপ ফুল হাতে করিয়া ছবিটির মত আসিয়া দাঁড়াইল। অনুর জননী কন্যাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "মা যেন আমার যোগিনী সেজেছেন!" বড়বৌ ঠাকরুণও একটু হাসিয়া বলিল, "বিয়ে হলে কোথায় সব চলে যাবে। দুটো একটা ছেলে মেয়ে হলে ত কথাই নেই।" অনুপমা চিত্রার্পিতার ন্যায় সকল কথা শুনিতে লাগিল। বৌ আবার বলিল, "মা, ঠাকুরঝির বিয়ের কবে দিন ঠিক হল?"

"দিন এখনো কিছু ঠিক করা হয়নি।"

"ঠাকুরজামাই কি পড়েন?"

"এইবার বি. এ. দেবেন।"

"তবে ত বেশ ভাল বর।" তাহার পর একটু হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিল, "দেখতে কিন্তু খুব ভাল না হলে ঠাকুরঝির আমার পছন্দ হবে না।"

"কেন পছন্দ হবে না? জামাই আমার বেশ দেখতে।" এইবার অনুপমা একটু গ্রীবা বক্র করিল; ঈষৎ হেলিয়া পদনখ দিয়া মৃত্তিকা খনন করিবার মত করিয়া নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "বিবাহ আমি করিব না।" জননী ভাল শুনিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা?" বড়বৌ অনুপমার কথা শুনিতে পাইয়াছিল। খুব জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি বলছে,—ও কখন বিয়ে করবে না।"

"বিয়ে করবে না?"

"না।"

"না করুকগে!" অনুর জননী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। গৃহিণী চলিয়া যাইলে বড়বধূ বলিল, "তুই বিয়ে করবি নে?"

অনুপমা পূর্ব্ববৎ গম্ভীরমুখে বলিল, "কিছুতেই না।"

"কেন?"

"যাহাকে তাহাকে গছাইয়া দেওয়ার নামই বিবাহ নয়। মনের মিল না হইলে বিবাহ করাই ভুল।" বড়বৌ বিস্মিত হইয়া অনুর মুখপানে চাহিয়া বলিল, "গছিয়ে দেওয়া আবার কি লো? গছিয়ে দেবে না ত কি মেয়েমানুষে দেখে শুনে পছন্দ করে' বিয়ে করবে?"

"নিশ্চয়।"

"তবে তোর মতে আমার বিয়েটাও ভুল হয়ে গেছে? বিয়ের আগে ত তোর দাদার নাম পর্য্যন্ত আমি শুনি নি।"

"সবাই কি তোমার মত?"

বউ আর একবার হাসিয়া উঠিল,—"তোর কি তবে মনের মানুষ কেউ জুটেছে নাকি?" অনুপমা বধূঠাকুরাণীর সহাস্য বিদ্রূপে মুখখানি পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ গম্ভীর করিয়া বলিল, "বউ, ঠাট্টা করিতেছ নাকি? এখন কি বিদ্রূপের সময়?"

"কেন লো—হয়েছে কি?"

"হয়েছে কি? তবে শোন—" অনুপমার মনে হইল, তাহার সমুখে তাহার স্বামীকে বধ করা হইতেছে—সহসা কতলুখাঁর দুর্গে বধক-সমুখে বিমলা ও বীরেন্দ্রসিংহের দৃশ্য তাহার মনে জাগিয়া উঠিল; অনুপমা ভাবিল, তাহারা যাহা পারে, সে কি তাহা পারে না? সতী স্ত্রী জগতে কাহাকে ভয় করে? দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু অনৈসর্গিক প্রভায় ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে অঞ্চলখানা কোমরে জড়াইয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ফেলিল। ব্যাপার দেখিয়া বড়বধূ তিন হাত পিছাইয়া গেল। নিমেষে অনুপমা পার্শ্ববর্ত্তী খাটের খুরো বেশ করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"প্রভু, স্বামী, প্রাণনাথ, জগৎ-সমীপে আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, তুমিই আমার প্রাণনাথ! প্রভু, তুমি আমার, আমি তোমার! ইহা খাটের খুরো নহে, ইহা তোমার পদযুগল—আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, এখনও তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিতেছি—এ জগতে তুমি ছাড়া অন্য কেহ আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না; কাহার সাধ্য, প্রাণ থাকিতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে! মা গো, জগজ্জননী—"

বড়বধূ চীৎকার করিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল ;—"ও গো দেখসে —ঠাকুরঝি কেমন ধারা কচ্চে।" দেখিতে দেখিতে গৃহিণী ছুটিয়া আসিলেন। বউ ঠাকুরুণের চীৎকার বাহির পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। "কি হয়েছে—বোলো কি ?" কর্ত্তা ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রবাবু ছুটিয়া আসিলেন। কর্ত্তা-গিন্নীতে, পুত্র-পুত্রবধূতে, দাস-দাসীতে মুহূর্ত্তে ঘরে ভিড় হইয়া গেল। অনুপমা মূর্চ্ছিতা হইয়া খাটের কাছে পড়িয়া আছে! গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন, "অনুর আমার কি হ'লো ?" 'ডাক্তার ডাক!' 'জল আন্!' 'বাতাস কর্!' ইত্যাদি চীৎকারে পাড়ার অর্দ্ধেক প্রতিবাসী বাড়ীতে জমিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অনুপমা ধীরে ধীরে বলিল, "আমি কোথায় ?" তাহার জননী মুখের নিকট মুখ আনিয়া সস্নেহে বলিলেন, "কেন মা, তুমি যে আমার কোলে শুয়ে আছ।" অনুপমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদু মৃদু কহিল, "ওঃ! তোমার কোলে! ভাবিতেছিলাম, আমি আর কোথাও কোনও অপ্সরালোকে তাঁহার সহিত ভাসিয়া যাইতেছি।" দরবিগলিত অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। জননী তাহা মুছাইয়া কাতর হইয়া বলিলেন, "কেন কাঁদছ মা ? কার কথা বলছ ?" অনুপমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মৌন হইয়া রহিল। বড়বধূ চন্দ্রবাবুকে একপাশে ডাকিয়া বলিল, "সবাইকে যেতে বল ; আর কোনও ভয় নেই ; ঠাকুরঝি ভাল হয়েছে।" ক্রমশঃ সকলে প্রস্থান করিলে রাত্রে বড় বৌ অনুপমার কাছে বসিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, কার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তুই সুখী হোস ?" অনুপমা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিল, "সুখ দুঃখ আমার কিছুই নেই ;—সেই আমার স্বামী—"

"তা' ত বুঝি—কিন্তু কে সে ?"

"সুরেশ! সুরেশই আমার—"

"সুরেশ ? রাখাল মজুমদারের ছেলে ?"

"হাঁ সে-ই।"

রাত্রে গৃহিণী এ কথা শুনিলেন ; পরদিন অমনই মজুমদারদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথার পর সুরেশের জননীকে বলিলেন, "তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দাও।" সুরেশের জননী হাসিয়া বলিলেন, "মন্দ কি!"

"ভাল মন্দর কথা নয়, দিতেই হবে।"

"তবে সুরেশকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে আসি। সে বাড়ীতেই আছে ;

তার মত হ'লে কর্ত্তার অমত হবে না।" সুরেশ বাড়ীতে থাকিয়া তখন বি. এ. পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিল—এক মুহূর্ত্ত তাহার এক বৎসর। তাহার মা বিবাহের কথা বলিলে সে কানেই তুলিল না। গৃহিণী আবার বলিলেন, "সুরে, তোকে বিয়ে কর্‌তে হবে।" সুরেশ মুখ তুলিয়া বলিল, "তা' ত হবেই, কিন্তু এখন কেন? পড়ার সময় ও সব কথা ভাল লাগে না।" গৃহিণী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না না—, পড়ার সময় কেন! একজামিন হ'য়ে গেলে বিয়ে হবে।"

"কোথায়?"

এই গাঁয়ে জগবন্ধু বাবুর মেয়ের সঙ্গে।"

"কি? চন্দ্রর বোনের সঙ্গে? যেটাকে খুকী বলে' ডাক্‌ত?"

"খুকী বোলে ডাক্‌বে কেন,—তার নাম অনুপমা।" সুরেশ অল্প হাসিয়া বলিল, "হাঁ—অনুপমা! তা—দূর দূর—সেটা ভারি কুৎসিত।"

"কুচ্ছিত হবে কেন? সে বেশ দেখ্‌তে।"

"তা' হোক বেশ দেখ্‌তে; এক যায়গায় শ্বশুর বাড়ী, বাপের বাড়ী আমার ভাল লাগে না।"

"কেন, তাতে আর দোষ কি?"

"দোষের কথায় কাজ নেই, তুমি এখন যাও মা, আমি একটু পড়ি; কিছুই এখনো হয় নি।" সুরেশের জননী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "সুরে ত এক গাঁয়ে কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না।"

"কেন?"

"তা ত জানি নে।" অনুর জননী মজুমদার-গৃহিণীর হাত ধরিয়া কাতরভাবে বলিলেন, "তা হবে না, ভাই। এ বিয়ে তোমাকে দিতেই হবে।"

"ছেলের অমত, আমি কি করব বল?"

"না হ'লে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।"

"তবে আজ থাক; কাল আর একবার বুঝিয়ে দেখ্‌ব—যদি মত কর্‌তে পারি।"

অনুর জননী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া জগবন্ধু বাবুকে বলিলেন, "ওদের সুরেশের সঙ্গে যাতে আমার মেয়ের বিয়ে হয়, তা কর।"

"কেন বল দেখি? রায়গ্রামে ত এক রকম সব ঠিক হয়েছে; সে সম্বন্ধ আবার ভেঙে কি হবে?"

"কারণ আছে।"

"কি কারণ?"

"কারণ কিছুই নয়; কিন্তু সুরেশের মত অমন রূপে-গুণে ছেলে কি পাওয়া যাবে? আরও—আমার একটি মেয়ে, তার দূরে বিয়ে দেব না। সুরেশের সঙ্গে হ'লে যখন খুসী দেখ্‌তে পাব।"

"আচ্ছা—চেষ্টা করব।"

"চেষ্টা নয়—নিশ্চয় দিতে হবে।" কর্ত্তা মথ নাড়ার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

"তাই হবে গো!"

সন্ধ্যার পর কর্ত্তা মজুমদার-বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "বিয়ে হবে না।"

"সে কি কথা!"

"কি করব, বল? ওরা না দিলে ত আমি জোর কোরে ওদের বাড়ীতে মেয়ে ফেলে দিয়ে আসতে পারিনে!" "দেবে না কেন?"

"এক গাঁয়ে বিয়ে হয়—ওদের মত নয়।" গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "আমার কপালের দোষ!" পরদিন তিনি পুনরায় সুরেশের জননীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "দিদি, বিয়ে দে।"

"আমার ত ইচ্ছা আছে, কিন্তু ছেলের মত হয় কৈ?"

"আমি লুকিয়ে সুরেশকে আরো পাঁচ হাজার টাকা দেব।"

টাকার লোভ বড় লোভ। সুরেশের জননী এ কথা সুরেশের পিতাকে জানাইলেন। কর্ত্তা সুরেশকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুরেশ, তোমাকে এ বিবাহ করিতেই হইবে।"

"কেন?"

"কেন আবার কি? এ বিবাহে তোমার গর্ভধারিণীর মত, আমারও মত; সঙ্গে সঙ্গে একটু কারণও হইয়া পড়িয়াছে।" সুরেশ নতমুখে বলিল, "এখন পড়াশুনার সময়—পরীক্ষার ক্ষতি হইবে।"

"তাহা আমি জানি বাপু, পড়া শুনার ক্ষতি করিতে তোমাকে বলিতেছি না। পরীক্ষা শেষ হইলে বিবাহ করিও।"

"যে আজ্ঞা।"

অনুর জননীর আনন্দের সীমা নেই; এ কথা তিনি কর্ত্তাকে বলিলেন,

দাসদাসী সকলকেই মনের আনন্দে এ কথা জানাইয়া দিলেন। বড়বৌ অনুপমাকে ডাকিয়া বলিল, "ওলো! বর যে ধরা দিয়েছে।"

অনু সলজ্জে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তাহা আমি জানিতাম।"

"কেমন করিয়া জানলি? চিঠিপত্র চল্‌ত নাকি?"

"প্রেম অন্তর্য্যামী! আমাদের চিঠিপত্র অন্তরে অন্তরেই চলিত।"

"ধন্যি মেয়ে তুই!"

অনুপমা চলিয়া যাইলে বড়বধূ ঠাকুরাণী মৃদু মৃদু বলিল, "পাকামি শুন্‌লে গা জালা করে! আমি তিন ছেলের মা—উনি আজ আমাকে প্রেম শেখাতে এলেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভালবাসার ফল।

দুর্দ্দান্ত বসু বিস্তর অর্থ রাখিয়া পরলোকে গমন করিলে তাঁহার বিংশতি-বর্ষীয় একমাত্র পুত্র ললিতমোহন শ্রাদ্ধশান্তি সমাপ্ত করিয়া একদিন স্কুলে যাইয়া মাষ্টারকে বলিল, "মাষ্টার মহাশয়, আমার নামটা কাটিয়া দিন।"

"কেন বাপু?"

"বিদ্যা পড়িয়া শুনিয়া কি হইবে? যে জন্য পড়াশুনা, তাহা আমার বিস্তর আছে। বাবা আমার জন্য অনেক পড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন।"

মাষ্টার চক্ষু টিপিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, "তবে আর ভাবনা কি? এইবার চরিয়া খাওগে।" এইখানেই ললিতমোহনের বিদ্যাভ্যাসে ইতি হইল।

ললিতমোহনের কাঁচা বয়স, তাহাতে বিস্তর অর্থ, কাজেই স্কুল ছাড়িবামাত্র বিস্তর বন্ধুও জুটিয়া গেল। ক্রমে তামাক, সিদ্ধি, গাঁজা, মদ, গায়ক গায়িকা, ইত্যাদি একটির পর একটি করিয়া ললিতমোহনের বৈঠকখানাও পূর্ণ করিল। এ দিকে পিতৃসঞ্চিত অর্থরাশিও জলবৎ চেউ খেলিয়া তরতর করিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। তাহার জননী কাঁদিয়া কাটিয়া অনেক বুঝাইলেন, অনেক বলিলেন, কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। এক দিন সে ঘূর্ণিতলোচনে মাতৃসন্নিধানে আসিয়া বলিল, "মা, এখনি আমাকে পঞ্চাশ টাকা দাও"। "একটি পয়সাও আমার নেই।" ললিতমোহন দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া একটা কুড়ুল লইয়া জননীর বাক্সটা চিরিয়া ফেলিয়া

পঞ্চাশ টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। তিনি দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না।

পরদিন পুত্রের হস্তে লোহার সিন্দুকের চাবি দিয়া বলিলেন, "বাবা, এই লোহার সিন্দুকের চাবি নাও; তোমার বাপের টাকা যেমন ইচ্ছা খরচ কোরো, আমি আর বাধা দিতে আসব না। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমি গেলে তোমার চোখ ফোটে।"

ললিত বিস্মিত হইয়া বলিল, "কোথায় যাবে?"

"তা জানিনে। আত্মঘাতী হ'লে কোথায় যেতে হয়, তা' কেউ জানে না; তবে শুনেছি, সদ্গতি হয় না। তা' কি করব, বল,—আমার যেমন কপাল!"

"আত্মঘাতী হবে?"

"না হ'লে আর উপায় কি? তোমাকে পেটে ধ'রে আমার সব সুখই হ'ল! এখন নিত্যি নিত্যি তোমার লাথি ঝাঁটা খাওয়ার চেয়ে যমদূতের আগুন-কুণ্ড ভাল।"

ললিতমোহন জননীকে চিনিত; সে বিলক্ষণ জানিত যে, তাহার জননী মিথ্যা ভয় দেখাইবার লোক নহেন; তখন কাঁদিয়া ভূমে লুটাইয়া পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা, তুমি আমাকে মাপ কর, এমন কাজ আর কখনও করব না। তুমি থাক, তুমি যেও না।"

জননী রুক্ষভাবে বলিলেন, "তাও কি হয়? তোমার বন্ধুবান্ধব—তার সব যাবে কোথায়?"

"আমি কাউকে চাইনে। আমি টাকাকড়ি বন্ধুবান্ধব কিছুই চাইনে—শুধু তুমি থাক।"

"তোমার কথার বিশ্বাস কি?"

"কেন মা, আমি তোমার মন্দ সন্তান, তা' বলে অবিশ্বাসের কাজ কি কখনও করেছি? তুমি এখন থেকে ইচ্ছা-সুখে যা দেবে, তা'র অধিক এক পয়সাও চাব না।"

"ইচ্ছা-সুখে তোমাকে এক পয়সাও দিতে ইচ্ছা হয় না—কেন না, এই এক বৎসর দেড় বৎসরের মধ্যে তুমি যত টাকা উড়িয়েছ, তার অর্দ্ধেকও কখনও তোমার জীবনে উপার্জ্জন করতে পারবে না।"

"তুমি আমাকে কিছুই দিও না।"

জননী কোমল হইলেন; "না—অতটা তোমার সবে না; আমিও তা ইচ্ছে করিনে। মাসে এক শ' টাকা পেলে তোমার চল্‌বে কি?"

"স্বচ্ছন্দে।"

"তবে তাই হোক।"

দুই এক দিনের মধ্যেই তাহার বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল। ললিতমোহন দুই এক জনের বাটীতে ডাকিতে গেল; কেহ বলিল, 'কাল যাব'। কেহ বলিল, 'আজ কাজ আছে'। ফলতঃ কেহই আর আসিল না। এখন সে সম্পূর্ণ একা। একা মদ খায়, একা ঘুরিয়া বেড়ায়। একবার মনে করিল, আর মদ খাইবে না; কিন্তু সময় কিরূপে কাটিবে? কাজেই মদ ছাড়া হইল না। একটা পথে সে প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইত; এ পথটা জগবন্ধু বাবুর বাগানের পার্শ্ব দিয়া—অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন বলিয়া মদ খাইয়া এইখানে বেড়াইবার অধিক সুবিধা হইত। মাতাল বলিয়া তাহার গ্রামময় অখ্যাতি; কাহারও বাটীতে যাওয়া তাহার ভাল দেখায় না—কাজেই মদ খাইয়া নিজের সঙ্গে নিজে বেড়াইয়া বেড়াইত। আজকাল তাহার আর এক জন সঙ্গী জুটিয়াছে;—সে, অনুপমা! আসিতে যাইতে সে প্রায়ই দেখে, তাহারই মত অনুপমাও বাগানের ভিতর ঘুরিয়া বেড়ায়। অনুপমাকে সে বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছে—কিন্তু আজকাল তাহাকে যেন একটু নূতনতর দেখিতে পায়। জগবন্ধু বাবুর বাগানের প্রাচীরের এক অংশ ভগ্ন ছিল, সেইখানে একটা গাছের পাশে দাঁড়াইয়া দেখে, অনুপমা উদ্যানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও বা বৃক্ষতলে বসিয়া মালা গাঁথিতেছে, কখনও বা ফুল তুলিতেছে, এক এক সময় বা সরসীর জলে পদদ্বয় ডুবাইয়া বালিকাসুলভ ক্রীড়া করিতেছে। দেখিতে তাহাকে বেশ লাগে; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চুলগুলি, অযত্নরক্ষিত দেহলতা, আলুথালু বসন ভূষণ ও সকলের উপর মুখখানি তাহার মনের চোখে একটি পদ্মফুলের মত বোধ হইত। মাঝে মাঝে তাহার মনে হয়, জগতে সে অনুপমাকে দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে! রাত্রি হইলে বাটীতে গিয়া শয়ন করে, যতক্ষণ নিদ্রা না হয়, ততক্ষণ অনুপমার মুখই মনে পড়ে, স্বপ্নেও কখনও কখনও তাহার অনিন্দ্যসুন্দর বদনমণ্ডল হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। এমনই করিয়া কত দিন যায়; জগবন্ধু বাবুর উদ্যানের সেই ভগ্ন অংশটিতে বৈকাল হইতে বসিয়া থাকা আজকাল তাহার নিত্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বালক নহে; অল্পদিনেই বুঝিতে

পারিল যে, অনুপমাকে বাস্তবিকই অতিশয় অধিক রকম ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এরূপ ভালবাসায় লাভ নাই—সে জানিত, সে মাতাল; সে অপদার্থ, মূর্খ; সে সকলের ঘৃণিত জীব—অনুপমার কিছুতেই যোগ্য পাত্র নহে—শত চেষ্টাতেও তাহাকে পাইতে পারা সম্ভব নয়, তবে আর এমন করিয়া মন খারাপ করিয়া লাভ কি? কাল হইতে আর আসিবে না। কিন্তু থাকিতে পারিত না—সূর্য্য অস্তগত হইলেই সে মদটুকু খাইয়া সেই ভাঙ্গা পাঁচিলটির উপর আসিয়া বসিত। তবে ভিতরে একটা কথা আছে। —কাহাকেও ভালবাসিলে মনে হয়, সেও বুঝি আমাকে ভালবাসে; আমাকে কেন বাসিবে না? অবশ্য, এ কথা প্রতিপন্ন করা যায় না।

• • • • • •

একদিন ললিতমোহন প্রাচীরে উঠিয়াছে এমন সময় চন্দ্রবাবুর চোখে পড়িল

চন্দ্রবাবু দারবানকে হাঁকিয়া বলিলেন, "• • কো পাকড়ো।" দারবান প্রথমে বুঝিতে পারিল না, কাহাকে ধরিতে হইবে; পরে যখন বুঝিল, ললিত বাবুকে, তখন সেলাম করিয়া তিন হাত পিছাইয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রবাবু পুনর্ব্বার চীৎকার করিয়া বলিলেন "• কো পাকাড়কে থানামে দেও।"

দারবান আধা বাঙ্গলা আধা হিন্দীতে বলিল, "হামি নেহি পারবে বাবু।" ললিতমোহন হৃষ্টচিত্তে ধীরে ধীরে প্রাচীর টপকাইয়া প্রস্থান করিল। সে চলিয়া যাইলে চন্দ্রবাবু বলিলেন—"কাহে নেহি পাকড়া?" দারবান চুপ করিয়া রহিল। এক জন মালী ললিতকে বিলক্ষণ চিনিত, সে বলিল, "ও বেটা জোয়ানের সাধ্য কি, ললিত বাবুকে ধরে? ওর মত চারটে দরওয়ানের মাথা ওর এক ঘুসিতে ভেঙ্গে যায়।" দারবানও তাহা অস্বীকার করিল না—বলিল, "বাবু নোকরি করনে আয়া, না জান দেনে আয়া?"

চন্দ্রবাবু কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি ললিতের উপর পূর্ব্ব হইতেই বিলক্ষণ চটা ছিলেন; এখন সময় পাইয়া, সাক্ষী জুটাইয়া, অনধিকার প্রবেশ এবং আরও কত কি অপরাধে আদালতে নালিশ করিলেন। জগবন্ধু বাবু ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই এ মকদ্দমা করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু চন্দ্রনাথ কিছুতেই শুনিলেন না। বিশেষ মন্মপীড়িতা অনুপমা জিদ ধরিয়া বলিল যে, পাপীকে শাস্তি না দিলে তাহার মন কিছুতেই সুস্থির হইবে না।

ইনস্পেক্টর বাটীতে আসিয়া অনুপমার এজাহার লইল; অনুপমা সবই ঠিক ঠাক বলিল। শেষে এমন দাঁড়াইল যে, ললিতের জননী বিস্তর অর্থ-ব্যয় করিয়াও পুত্রকে কিছুতেই বাঁচাইতে পারিলেন না। তিন বৎসর ললিত-মোহনের সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়া গেল।

* * * * * *

বি. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। সুরেশচন্দ্র মজুমদার একেবারে প্রথম হইয়াছেন। গ্রামময় সুখ্যাতির একটা হৈ হৈ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে। অনুপমার জননীর আনন্দের সীমা নাই। আনন্দে সুরেশের জননীকে গিয়া বলিলেন—"নিজের কথা নিজে বল্‌তে নেই, কিন্তু দেখ দেখি একবার আমার মেয়ের পয়!"

সুরেশের মাতা সহাস্যে বলিলেন, 'তা' ত দেখছি।"

"একবার বিয়ে হোক, তার পর দেখিস—তোর ছেলে রাজা হবে,—অনু যখন জন্মায়, তখন এক জন গণৎকার এসে গুণে বলেছিল যে, এ মেয়ে রাণী হবে। অত সুখে কেউ কখনও থাকেনি, থাকবে না; যত সুখ তোমার মেয়ের হবে।"

"কে বলেছিল?"

"এক জন সন্ন্যাসী।"

"কিন্তু তুমি তোমার জামাইকে একখানা বাড়ী দিয়ে দিও।"

"তা আর দোব না? চন্দ্রকে আমি পেটের ছেলে বলেই জানি, কি তবু অন্যরও ত বয়সে কর্ত্তার অর্দ্ধেক বিষয় পাওয়া উচিত, আমি বেঁচে থাক্‌লে তা' পাবেও।"

"তাই হোক—ওরা রাজা রাণী হয়ে সুখে থাক—আমরা যেন দেখে মরি।"

দুই দিন পরে রাখাল মজুমদার পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই বৈশাখে তোমার বিবাহের দিনস্থির করিলাম।"

"এখন বিবাহ হয়, আমার একেবারে ইচ্ছা নয়।"

"কেন?"

"আমি Guilchrist Scholership পাইয়াছি, তাহাতে আমি ইচ্ছা করিলে বিলাতে গিয়া পড়িতে পারি।"

"তুমি বিলাত যাইবে?"

"ইচ্ছা আছে।"

"পড়িয়া পড়িয়া তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। অমন কথা আর মুখে আনিও না।"

"বিনা পয়সায় যখন এ সুবিধা পাইয়াছি, তখন দোষ কি?" রাখাল বাবু এ কথায় একেবারে অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিলেন; "নাস্তিক বেটা! দোষ কি? পরের পয়সায় যদি বিষ পাওয়া যায় ত কি খেতে হবে?"

"সে কথায় এ কথায় অনেক প্রভেদ।"

"প্রভেদ আর কোথায়? এক দিকে জাতি খোওয়ান, ম্লেচ্ছ হওয়া, আর অপর দিকে বিষ-ভোজন, ঠিক এক নয় কি? চুল চুল মিলিয়া গেল না কি?"

সুরেশ আর কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া নিরুত্তরে প্রস্থান করিল। সে চলিয়া যাইলে রাখাল বাবু আপনা-আপনি হাসিয়া বলিলেন, "বেটা, পাঠা দুই ইংরিজি প'ড়ে আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে আসে! কেমন কথাটা বল্‌লাম,—'পরের পয়সায় বিষ পেলে কি খেতে হবে?' বাছাধন আর দ্বিতীয় কথাটি বল্‌তে পারলে না। এ অকাট্য যুক্তি কি ও কাটতে পারে!"

বিবাহের সমস্ত পাকা রকম স্থির হইয়া যাইলে বড়বধূ একদিন অনুপমাকে বলিলেন, "কি লো! বরের সুখ্যাতি যে গ্রামে ধরে না!"

অনুপমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "যার সতী সাধ্বী স্ত্রী, জগতে তার সকল সুখের পথই উন্মুক্ত থাকে।"

"তবু ত এখনো বিয়ে হয়নি লো!"

"বিবাহ আমাদিগের অনেক দিন হইয়াছে; জগৎ জানে না বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে বহুদিন আমাদিগের পূর্ণ মিলন হইয়া গিয়াছে।"

বড় বধূ অল্প হাসিল; ওষ্ঠ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া একটু থামিয়া বলিল, "এ কথা আর কোথাও বলিস্‌নে; আমরা বুড়ো মাগী, আমাদেরো,—বলা দূরে থাক—এমন যারা শুন্‌লেও লজ্জা করে; সব কথায় তুই যেন থিয়াটারে Act (আক্ট্) করে থাকিস। —এমন করলে লোকে পাগল বল্‌বে যে।"

"আমি প্রেমে পাগল!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

আজ ৫ই বৈশাখ। অনুপমার বিবাহ-উৎসবে আজ গ্রামটা তোলপাড় হইতেছে। জগবন্ধু বাবুর বাটীতে আজ ভিড় ধরে না; কত লোক খাইতেছে, কত লোক হাঁকাহাঁকি করিতেছে। কত খাওয়ান দাওয়ানের ঘটা, কত বাজনা বাদ্যের ধুম। যত সন্ধ্যা হইয়া আসিতে লাগিল, ধুমধাম তত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সন্ধ্যা লগ্নেই বিবাহ; এখনই বর আসিবে—সকলেই উৎসাহে আগ্রহে উন্মুখ হইয়া আছে।—কিন্তু বর কোথায়? রাখাল বাবুর বাটীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই কলরব বাধিয়া উঠিয়াছে—'সুরেশ গেল কোথায়?' 'এখানে খোঁজ', 'ওখানে খোঁজ', 'এ দিকে দেখ', 'ও দিকে দেখ।' কিন্তু কেহই সুরেশকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছে না। কুসংবাদ পঁহুছিতে বিলম্ব হয় না, বজ্রাগ্নির মত এ কথা জগবন্ধু বাবুর বাটীতে উড়িয়া আসিয়া পড়িল। বাড়ী শুদ্ধ সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল; 'সে কি কথা।'"

আটটার সময় বিবাহের লগ্ন, কিন্তু সময়টা বাড়িয়া চলিল; কোথাও বরের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। জগবন্ধু বাবু মাথা চাপড়াইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গৃহিণী কাঁদিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট পড়িলেন, "কি হবে গো?" কর্ত্তার তখন অর্দ্ধক্ষিপ্তাবস্থা। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হবে আমার শ্রাদ্ধ—আর কি হবে? এই হতভাগা মেয়ের জন্য বুড় বয়সে আমার মান গেল, যশ গেল, জাতি গেল; এখন একঘ'রে হ'য়ে থাকতে হবে। কেন মরতে বুড়ো বয়সে তোমাকে আবার বিয়ে করেছিলাম, তোমারই জন্য আজ এই অপমান! শাস্ত্রেই আছে,—'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী'। তোমার কথা শুনে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি। যাও, তোমার মেয়ে নিয়ে আমার সাম্‌নে থেকে দূর হ'য়ে যাও।—"

আহা! গৃহিণীর দুঃখের কথা বলিয়া আর কাজ নাই। এ দিকে এই—আর ও দিকে আর এক বিপদ। অনুপমা ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছে।

এ দিকে রাত্রি বাড়িয়া চলিয়াছে; নয়টা, এগারোটা, বারটা করিয়া ক্রমশঃ একটা, দুইটা বাজিয়া গেল, কিন্তু কোথাও সুরেশের সন্ধান হইল না। সুরেশকে পাওয়া যাক আর না যাক, অনুপমার বিবাহ কিন্তু দিতেই হইবে! কেন না, আজ রাত্রে বিবাহ না হইলে জগবন্ধু বাবুর জাতি যাইবে।

রাত্রি আন্দাজ তিনটার সময় পঞ্চাশবর্ষীয় কাশরোগী রামদুলাল দত্তকে পাড়ার পাঁচ জন জগবন্ধুবাবুর হিতৈষী বন্ধু, বরবেশে খাড়া করিয়া লইয়া আসিল।

অনুপমা যখন শুনিল, এমনই করিয়া তাহার মাথা খাইবার উদ্যোগ হইতেছে, তখন মূর্চ্ছা ছাড়িয়া দিয়া জননীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল,—"ওমা! আমার রক্ষা কর, এমন ক'রে আমার গলায় ছুরি দিও না। এ বিয়ে দিলে আমি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হব।" মা কাঁদিয়া বলিলেন, "আমি কি করব, মা?" মুখে যাহাই বলুন না, কন্যার দুঃখে ও আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছিল, তাই কাঁদিয়া কাটিয়া আবার স্বামীর কাছে আসিলেন, "ওগো, একবার শেষটা ভেবে দেখ, এ বিয়ে দিলে মেয়ে আমার বিষ খাবে।" কর্ত্তা কোনও কথা না কহিয়া একেবারে অনুপমার নিকটে আসিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"ওঠ; তৈরি হয়ে নাও।"

"কোথায় যাব, বাবা?"

"এখনই সম্প্রদান করব।"

অনুপমা কাঁদিয়া ফেলিল—"বাবা আমাকে মেরে ফেল—আমি বিষ খাব।" "যা ইচ্ছে হয়, কাল খেয়ো না,—আজ বিয়ে দিয়ে আমার জাত বাঁচাই, তার পর যেমন খুসী কোরো, বিষ খেও জলে ডুবে মরো, আমি একবারও বারণ করব না।" কি নিদারুণ কথা! এইবার যথার্থই অনুপমার ভিতর পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। "বাবা! আমায় রক্ষা কর।" কত কাতরোক্তি, কত ক্রন্দন, কিন্তু কোনও কথাই খাটিল না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জগবন্ধু বাবু সেই রাত্রেই বৃদ্ধ রামদুলাল দত্তের হস্তে অনুপমাকে সম্প্রদান করিলেন।

বহুকাল বিপত্নীক বৃদ্ধ রামদুলালের আপনার বলিতে সংসারে আর কেহ নাই। দুইখানি পুরাতন ইষ্টকনির্ম্মিত ঘর, একটু শাক সব্জীর বাগান—ইহাই দত্তজার সাংসারিক সম্পত্তি। বহু ক্লেশে তাঁহার দিন গুজরান হয়। বিবাহ করিয়া পরদিন অনুপমাকে বাড়ী আনিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অনেক খাদ্যদ্রব্য আসিল; অনেক দাস দাসী আসিল—কোনও ক্লেশ নাই—ছয় সাত দিবস তাঁহার পরমসুখে অতিবাহিত হইল। বড়লোক শ্বশুর—আর তাঁহার কোনও ভাবনা নাই; বিবাহ করিয়া কপাল ফিরিয়াছে। কিন্তু অনুপমার স্বতন্ত্র কথা; আর দিন দুই থাকিয়া সে যখন পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া দাস দাসীরাও গোপনে চক্ষু মুছিল।

বাড়ী গিয়া প্রাণত্যাগ করিব, এ পরামর্শ অনুপমা শ্বশুর-ভবন হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। এইবার তাহার যথার্থ মরিবার বাসনা হইয়াছে। অনেক রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে সে নিঃশব্দে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া বাগানের পুষ্করিণীর সোপানে আসিয়া বসিল। আজ তাহাকে মরিতে হইবে; মুখের মরা নয়, কাজের মরা মরিতে হইবে। অনুপমার মনে পড়িল, আর একদিন সে এইখানে মরিতে গিয়াছিল, সেও অধিক দিন নয়, কিন্তু তখন মরিতে পারে নাই; কেন না, এক জন ধরিয়া ফেলিয়াছিল। আজ সে কোথায়? জেলখানায় কয়েদ খাটিতেছে। কোন্ অপরাধে? শুধু বলিতে আসিয়াছিল যে, সে তাহাকে ভালবাসে। কে জেলে দিল! চন্দ্রবাবু। কেন? তাহাকে দেখিতে পারিত না বলিয়া, সে মাতাল বলিয়া, সে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া। কিন্তু অনুপমা কি বাঁচাইতে পারিত না? পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই; বরং জেলে দিতে সহায়তাই করিয়াছে। আজ তাহার মনে হইল, ললিত কি যথার্থই ভালবাসিত? হয় ত বাসিত, হয় ত বাসিত না; না বাসুক কিন্তু তাহাকে দণ্ডিত করিয়া তাহার কি ইষ্ট-সিদ্ধ হইয়াছে? জেলে পাথর ভাঙ্গিতেছে, ঘানি টানিতেছে, আরও কত কি নীচ কর্ম্ম করিতে হইতেছে; ইহাতে হয় ত চন্দ্রবাবুর লাভ হইয়াছে, কিন্তু তাহার কি? সে দণ্ডিত না হইলে কি তাঁহাকে পাইতে পারিত? যিনি এখন মনের আনন্দে নিজের উন্নতির জন্য জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাইতেছেন? অনুপমা সেইখানে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল; তাহার পর জলে নামিল। এক হাঁটু, এক বুক, এক গলা করিয়া ক্রমশঃ ডুবন-জলে আসিয়া পড়িল। আধ মিনিট কাল জলতলে থাকিয়া থাকিয়া, অনেক জল খাইয়া সে আবার উপরে ভাসিয়া উঠিল; আবার ডুব দিল, আবার ভাসিয়া উঠিল। সে সাঁতার দিতে জানিত, তাই সমস্ত পুষ্করিণীটা তন্ন তন্ন করিয়াও কোথাও ডুবন জল মিলিল না। অনেকবার ডুব দিল, অনেক জলও খাইল, কিন্তু একেবারে ডুবিয়া যাইতে কিছুতেই পারিল না। সে দেখিল, মরিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও ডুব দিয়া নিশ্বাস আটকাইয়া আসিবার উপক্রম হইলেই নিশ্বাস লইতে উপরে ভাসিয়া উঠিতে হয়! এইরূপে সমস্ত পুষ্করিণীটা সাঁতার কাটিয়া প্রায় নিশাশেষে যখন সে তাহার শ্রান্ত অবসন্ন নির্জীব দেহখানা কোনরূপে টানিয়া আনিয়া সোপানের উপর ফেলিল, দেখিল, যে কোনও অবস্থায় যে কোনও কারণেই হউক, এমন করিয়া একটু একটু করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করা বড় সহজ কথা নহে। পূর্ব্বে সে

বিরহ-ব্যথায় জর্জ্জরিততনু হইয়া দিনে শত বার করিয়া মরিতে যাইত, তখন ভাবিত, প্রাণটা রাখা না রাখা নায়ক নায়িকার একেবারে মুঠার ভিতরে, কিন্তু আজ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া প্রাণটার সহিত ধস্তাধস্তি করিয়াও সেটাকে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে পারিল না। আজ সে বিলক্ষণ বুঝিল, তাহাকে জন্মের মত বিদায় দেওয়া—তাহার একাদশবর্ষীয় বিরহব্যথায় কুলাইয়া উঠে না।

ভোর বেলায় যখন সে বাটী আসিল, তখন তাহার সমস্ত শরীর শীতে কাঁপিতেছে; মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনু, এত ভোরেই নেয়ে এলি মা ?" অনু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ।"

এ দিকে দত্ত মহাশয়, একরূপ চিরস্থায়ি-রূপে শ্বশুর-ভবনে আশ্রয় লইয়াছেন। প্রথম প্রথম জামাই-আদর তাঁহার কতকটা মিলিত, কিন্তু ক্রমশঃ তাহাও কম পড়িয়া আসিল। বাড়ী শুদ্ধ কেহই প্রায় তাঁহাকে দেখিতে পারে না; চন্দ্রনাথবাবু প্রতিকথায় তাঁহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ অপদস্থ লাঞ্ছিত করেন; তাহার একটু কারণও হইয়াছিল; একে ত চন্দ্রবাবুর হিংসাপরবশ অন্তঃকরণ, তাহাতে আবার অকর্ম্মণ্য জামাতা বলিয়া জগবন্ধু বাবু কিছু বিষয় আশয় দিয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন। অনুপমা কখনও আসে না; শাশুড়ী ঠাকুরাণীও কখনও সে বিষয়ে তত্ত্ব লন না; তথাপি রামদুলালের মনের আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। মর আত্মীয়তার তিনি বড় একটা ধার ধারিতেন না; যাহা পাইতেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন তাহার উপর দু'বেলা পরিতোষজনক আহার ঘটিতেছে। বৃদ্ধাবস্থায় দত্ত মহাশয় ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লইতেন। কিন্তু তাঁহার সুখভোগ করিবার অধিক দিনও আর বাকি ছিল না। একে জীর্ণ শীর্ণ শরীর, তাহার উপর পুরাতন সখা কাশরোগ অনেকদিন হইতে তাঁহার শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছে। প্রতি বৎসরই শীতকালে তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিত। এবারও শীতকালে বিষম টানাটানি করিতে লাগিল। জগবন্ধু বাবু দেখিলেন, যক্ষা রামদুলালের অস্থি-মজ্জার প্রতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাড়াগাঁয় সুচিকিৎসা হইবে না জানিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে কিছুদিন সুচিকিৎসার পর সতী সাধ্বী অনুপমার কল্যাণে দুটি বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে সদানন্দ রামদুলাল সংসার ত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তথাপি অনুপমা একটু কাঁদিল। স্বামী মরিলে বাঙালীর মেয়েকে কাঁদিতে হয়, তাহাই কাঁদিল। তাহার পর বহিস্তু সাদা থান পরিয়া সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল। জননী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "অনু, তোর এ বেশ ত আমি চোখে দেখতে পারি না। অন্ততঃ হাতে একজোড়া বালাও রাখ।"

"তা' হয় না; বিধবার অলঙ্কার পরিতে নেই।"

"কিন্তু তুই কচি মেয়ে।"

"তা হউক, বাঙালীর মেয়ে বিধবা হইলে কচি বুড়ো সমস্ত এক হইয়া যায়।" জননী আর কি বলিবেন? শুধু কাঁদিতে লাগিলেন। অনুপমার বৈধব্যে লোকে নূতন করিয়া শোক করিল না। দুই এক বৎসরেই সে যে বিধবা হইবে, তাহা সকলেই জানিত। কেহ বলিল, মড়ার সঙ্গে বিয়ে দিলে কি আর সধবা থাকে? কর্তাও এ কথা জানিতেন, গৃহিণীও বুঝিতেন; তাহাই শোকটা নূতন করিয়া আর হইল না। যাহা হইবার তাহা বিবাহরাত্রেই হইয়া গিয়াছে। স্বামীকে ভালবাসিল না, জানিল না, চিনিল না, তথাপি অনুপমা কঠোর বৈধব্য ব্রত পালন করিতে লাগিল। রাত্রে জলস্পর্শ করে না, দিনে একমুঠা হবিষ্য সিদ্ধ করিয়া লয়, একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করে; আজ পূর্ণিমা; কাল অমাবস্যা; পরশু শিবরাত্রি; এমন করিয়া মাসের পনর দিন সে কিছুই খায় না। কেহ কোনও কথা বলিলে বলে, "আমার ইহকাল গিয়াছে, এখন পরকালের কাজ করিতে দাও।" এত কিন্তু সহিবে কেন? উপবাসে অনিয়মে অনুপমা শুকাইয়া অর্দ্ধেক হইয়া গেল। দেখিয়া দেখিয়া গৃহিণী ভাবিলেন, এইবার সে মরিয়া যাইবে। কর্তাও ভাবিলেন, তাহা বড় বিচিত্র নহে। তাই একদিন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "অনুর আবার বিয়ে দিই।" গৃহিণী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা কি হয়? ধর্ম যাবে যে।"

"অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, দুইবার বিবাহ দিলেই ধর্ম যায় না। বিবাহের সঙ্গে ধর্মের সঙ্গে এ বিষয়ে কোনও সম্বন্ধ নাই, বরং নিজের কন্যাকে এমন করিয়া খুন করিলেই ধর্মহানির সম্ভাবনা।" "তবে দাও।" অনুপমা কিন্তু এ কথা শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "তাহা হয় না।" কর্তা তখন নিজে অনুকে ডাকিয়া বলিলেন, "খুব হয়, মা।"

"তাহা হইলে আমার ইহকাল পরকাল—দুই কালই গেল।"

"কিছুই যায় নাই, কিছুই যাইবে না—বরং না হইলেই যাইবার সম্ভাবনা। মনে কর, তুমি যদি গুণবান পতি লাভ কর, তাহা হইলে দুই কালেরই কাজ করিতে পারিবে।"

"একা কি হয় না?"

"না, মা, হয় না; অন্ততঃ বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ের দ্বারা হয় না। ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিই। সামান্য কোনও একটা কর্ম্ম করিতে হইলেই তাহাদিগকে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, স্বামী ভিন্ন তেমন সাহায্য আর কে করিতে পারে, বল? আরও কি দোষে তোমার এত শাস্তি?" অনুপমা আনতমুখে বলিল, "আমার পূর্ব্ব জন্মের ফল!" গোঁড়া হিন্দু জগবন্ধু বাবুর কর্ণে এ কথাটি খট্ করিয়া লাগিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "তাই যদি হয়, তবুও তোমার এক জন অভিভাবকের প্রয়োজন; আমাদের অবর্ত্তমানে কে তোমাকে দেখিবে?" "দাদা দেখিবেন।"

"ঈশ্বর না করুন, কিন্তু সে যদি না দেখে? সে তোমার মায়ের পেটের ভাই নয়; বিশেষ, আমি যত দূর জানি, তাহার মনও ভাল নয়।" অনুপমা মনে মনে বলিল, "তখন বিষ খাব।" "আরও একটা কথা আছে অনু; পিতা হইলেও সে কথা আমার বলা উচিত,—মানুষের মন সব সময়ে যে ঠিক এক রকমই থাকিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না; বিশেষ, যৌবনকালে প্রবৃত্তিগুলি সর্ব্বদা বশ রাখিতে মুনি ঋষিরাও সমর্থ হন না।" কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া অনুপমা কহিল, "জাত যাবে যে।"

"না মা, জাত যাবে না—এখন আমার সময় হয়ে আস্‌ছে—চোখও ফুটেছে।" অনুপমা ঘাড় নাড়িল। মনে মনে বলিল, "তখন জাতি গেল, আর এখন যাবে না। যখন চক্ষুঃকর্ণ বন্ধ করিয়া তোমরা আমাকে বলিদান দিলে, তখন এ কথা ভাবিলে না কেন? আজ আমারও চক্ষু ফুটেছে—আমিও ভালরূপ প্রতিশোধ দিব।"

কোনরূপে তাহাকে টলাইতে না পারিয়া জগবন্ধু বাবু বলিলেন, "তবে মা, তাই ভাল; তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি বিবাহ দিতে চাহি না। তোমার খাইবার পরিবার ক্লেশ না হয়, তা আমি করিয়া যাইব। তাহার পর যদি মন রাখিয়া যাহাতে সুখী হইতে পার, করিও।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ বাবুর সংসার।

তিন বৎসর পরে খালাস হইয়াও ললিতমোহন বাড়ী ফিরিল না। কেহ কহিল, লজ্জায় আসিতেছে না; কেহ বলিল, সে গ্রামে কি আর মুখ দেখাইতে পারে? ললিতমোহন নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দুই বৎসর পরে সহসা একদিন বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার জননী আনন্দে পুত্রের শির-শ্চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বাবা, এবার বিবাহ করিয়া সংসারী হও, যাহা কপালে ছিল, তাহা ত ঘটিয়া গিয়াছে; এখন সে জন্য আর মনে দুঃখ করিও না।" ললিতও যাহা হয় একটা করিবে, স্থির করিল।

পাঁচ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া, ললিত গ্রামে অনেক পরিবর্তন দেখিল; বিশেষ দেখিল জগবন্ধু বাবুর বাটীতে। কর্ত্তা গিন্নী কেহ জীবিত নাই, চন্দ্রনাথ বাবু এখন সংসারের কর্ত্তা; অনুপমা বিধবা হইয়া এইখানেই আছে; কারণ, তাহার অন্যত্র স্থান নাই। পূর্ব্বেই জননীর মৃত্যু হইয়াছিল, পরে পিতার মৃত্যুর পর অনুপমা ভাবিয়াছিল, পিতা যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়া কোনও তীর্থস্থানে থাকিবে, এবং সেই টাকায় পুণ্যার্থ নিয়ম ব্রত করিয়া অবশিষ্ট জীবনটা কাটাইয়া দিবে। কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তি হইলে উইল দেখিয়া সে একবারে মর্ম্মাহত হইল; পিতা কেবল তাহার নামে পাঁচ শত টাকা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বড়লোক; এই সামান্য টাকা তাঁহাদিগের নিকট টাকাই নহে। বাস্তবিক, এই অর্থে কাহারও চিরজীবন গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। গ্রামের অনেকেই কানাঘুষা করিল, এ উইল জগবন্ধু বাবুর নহে, ভিতরে কিছু কারসাজি আছে। কিন্তু সে কথায় ফল কি? নিরুপায় হইয়া অনুপমা চন্দ্র বাবুর বাটীতেই রহিল।

লোকে বলে, পিতার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত সংমাকে চিনিতে পারা যায় না; সংভাইকেও সেইরূপ পিতার জীবিতকাল পর্য্যন্ত চিনিতে পারা কঠিন। এতদিন পরে অনুপমা জানিতে পারিল, তাহার দাদা চন্দ্রনাথ বাবু কি চরিত্রের মনুষ্য। যত প্রকার অধম শ্রেণীর মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহাদের সর্ব্বনিকৃষ্ট। হৃদয়ে একতিল দয়া মায়া নাই—চক্ষে একবিন্দু চামড়া পর্য্যন্ত নাই। অনুপমার এই নিরাশ্রয় অবস্থায় তিনি তাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রতি কথায়,

এমন কি, উঠিতে বসিতে তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত, অপমানিত করিতেন। অনেক দিন হইতে তিনি অনুপমাকে দেখিতে পারেন না, কিন্তু আজকাল এত অধিক না দেখিতে পারিবার কারণ তিনিই ভাল জানেন। বড়বধূ পূর্ব্বে তাহাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু এখন তিনিও দেখিতে পারেন না। যখন অনু বড়লোকের মেয়ে ছিল, যখন তাহার বাপ মা বাঁচিয়া ছিল, যখন তাহার একটা কথায় পাঁচ জন ছুটিয়া আসিত, তখন তিনিও ভালবাসিতেন। এখন সে দুঃখিনী, আপনার বলিতে কেহ নাই, টাকা কড়ি নাই, পরের অন্ন না খাইলে দিন কাটে না, তাহাকে কে এখন ভালবাসিবে? কে এখন যত্ন করিবে? বড় বধূর তিন চারিটি ছেলে মেয়ের ভার অনুর উপর; তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয়, স্নান করাইতে হয়, পরাইতে হয়, কাছে করিয়া শুইতে হয়, তথাপি কোনও বিষয়ে একটু ত্রুটী হইলেই অমনি বড়বধূঠাকুরাণী রাগ করিয়া রীতিমত পাঁচটা কথা শুনাইয়া দেন। ইহা ভিন্ন অনুপমাকে নিত্য দু'বেলা চন্দ্রবাবুর জন্য দুই চারিটা ভাল তরকারী রাঁধিতে হয়, পাচক ব্রাহ্মণ তেমন প্রস্তুত করিতে পারে না। আর না হইলে চন্দ্রবাবুরও কিছু খাওয়া হয় না। একাদশীই হউক, দ্বাদশীই হউক, আর উপবাসই হউক, সে রান্না তাহাকে রাঁধিতেই হইবে। বিধবা হইয়া অনুপমা প্রাতঃকালে স্নান করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিত; এখন তাহাকে সে সময়টুকুও দেওয়া হয় না। একটু বিলম্ব হইলেই বড়বধূঠাকুরাণী বলিয়া উঠেন, "ঠাকুরঝি, একটু হাত চালিয়ে নাও; ছেলেরা কাঁদছে—এখন পর্য্যন্ত কিছু খেতে পায়নি।" অনুপমা যা' তা' করিয়া উঠিয়া আসে; একটি কথাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। একাদশীর দীর্ঘ উপবাস করিয়াও তাহাকে রাত্রে রন্ধন করিতে যাইতে হয়; তৃষ্ণায় বুক ফাটিতে থাকে, অগ্নির উত্তাপে মাথা টিপ্ টিপ্ করিতে থাকে, গা ঝিম্ ঝিম্ করে, তবু কথা কহে না। অবস্থার পরিবর্ত্তনে সহ্য করিবার ক্ষমতাও হয়; কেন না, জগদীশ্বর তাহা শিখাইয়া দেন—না হইলে অনুপমা এতদিন মরিয়া যাইত।

এ সংসারে তাহা অপেক্ষা দাস দাসীরাও শ্রেষ্ঠ; জোর করিয়া তাহাদের দুটো বলিলে তাহারাও দুটো জোরের কথা বলিতে পারে; অন্ততঃ "আমার মাহিনাপত্র চুকাইয়া দিন, বাড়ী যাই"—এ কথাও বলিতে পারে; কিন্তু অনু তাহাও বলিতে পারে না; সে বিনামূল্যে ক্রীতদাসী; মারো, কাটো, তাহাকে এখানে থাকিতেই হইবে। আর কোথাও যাইবার যো নাই; সে বিধবা, সে বড়লোকের কন্যা! অনুপমার অবস্থা বুঝাইতে পারা যায় না; বুঝিতে হয়;

বাঙ্গালীর ঘরে পরান্নপ্রত্যাশিনী বিধবাই কেবল তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিবেন, অন্তে না বুঝিতেই পারে।

আজ দ্বাদশী। সকাল সকাল স্নান করিয়া অনুপমা পূজা করিতে বসিল। তখনও দশমিনিট হয় নাই; বড়বধূ ঘরের বাহির হইতেই একটু বড় গলায় বলিলেন, "ঠাকুরঝি, তোমার কি আজ সমস্ত দিনে হবে না? এমন করলে চলবে না বাপু।" অনুপমা শিবের মাথায় জল দিতেছিল, কথা কহিল না,—বড়বধূ দশ মিনিট পরে পুনর্ব্বার ঘুরিয়া আসিয়া সেইখান হইতেই চীৎকার করিলেন, "অত পুণ্য ছালায় আঁটবে না গো, অত পুণ্যি কোরো না—আর অত পুণ্য-ধর্ম্মেই যদি হয়ে থাকে ত বনে জঙ্গলে গিয়ে করগে, সংসারে থেকে অত বাড়াবাড়ি সইতে পারা যায় না।" তথাপি অনুপমা কথা কহিল না।

বড়বউ দ্বিগুণ চেঁচাইয়া উঠিলেন, "বলি—কেউ খাবে দাবে—না, না?" অনুপমা হস্তস্থিত বিল্বপত্র নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "আমার অসুখ হয়েছে, আজ আমি কিছু পারব না।"

"পারবে না? তবে সবাই উপোস করুক?"

"কেন, আমি ছাড়া কি লোক নেই? ঠাকুরের কি হ'ল?"

"তার জ্বর হয়েছে—আর উনি কি ঠাকুরের রান্না খেতে পারেন?"

"না পারেন—তুমি রেঁধে খাওগে।"

"আমি রাঁধব? মাথার যন্ত্রণায় প্রাণ যায়, একটা কবিরাজ ২৪ ঘণ্টা আমার পিছনে লেগে আছে—আর আমি আগুনের তাতে যাব?"

অনুপমা জ্বলিয়া উঠিল; বলিল, "তবে সবাইকে উপোস করতে বলগে।"

"তাই যাই—তোমার দাদাকে এ কথা জানাইগে। আর তোমার অসুখ হবে কেন? এই নেয়ে ধুয়ে এলে, এখনি শিবপূজা করবে, আর বড় ভাইকে একটু রেঁধে খাওয়াতে পার না?"

"না পারিনে। বড়বউ, আমি তোমাদের কেনা দাসী নই যে, যা মুখে আসবে, তাই বলবে; আমি এ সব কথা দাদাকে জানাব।"

"বড়বউ মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "তাই জানাওগে—তোমার বাবা এসে আমার মাথাটা কেটে নিয়ে যাক!"

অনুপমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "তা জানি। বাবা ভাল লোক হ'লে আর তোমার এত সাহস!"

"কেন, তিনি করেছেন কি?" খেতে দিচ্ছেন, পরতে দিচ্ছেন—আবার

কি কর্‌বেন? সত্যি সত্যি ত আর আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমাকে মাথায় ক'রে রাখ্‌তে পারেন না—এ জন্য আর মিছে রাগ করলে চল্‌বে কেন?"

সমস্ত বস্তুরই সীমা আছে। অনুপমার সহিষ্ণুতারও সীমা আছে। সে এত দিন যাহা বলে নাই, আজ তাহা বলিয়া ফেলিল; বলিল, "দাদা আমাকে খাওয়াবেন পরাবেন কি—যে বাপের টাকায় তিনি খান—আমিও সেই বাপের টাকায় খাই।" বড়বউও ক্রুদ্ধ হইল,—তাই যদি হ'ত, তা হ'লে বাবা আর তোমাকে পথের কাঙ্গাল ক'রে রেখে যেত না।"

"পথের কাঙ্গাল ক'রে তিনি যান নি, তোমরাই করেছ। গ্রামশুদ্ধ সবাই জানে, তিনি আমাকে নিঃসম্বল রেখে যান নি। সে টাকা দাদা চুরী না করলে আজ আমাকে তোমার মুখনাড়া খেতে হোতো না।" বড়বধূর মুখ প্রথমে শুকাইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণ তেজে জলিয়া উঠিল, —"গ্রাম শুদ্ধ সবাই জানে—উনি চোর? তবে এ কথা ওঁকে জানাব?"

"জানিও—আরও বোলো যে, পাপের ফল ওঁকে পেতেই হবে।"

সে দিন এমনই গেল অবশ্য এ কথা চন্দ্রনাথ বাবু শুনিতে পাইলেন; কিন্তু কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না।

চন্দ্রনাথ বাবুর সংসারে ভোলা বলিয়া এক জন ছোঁড়া মত ভৃত্য ছিল। পাঁচ ছয় দিন পরে চন্দ্রবাবু এক দিন তাহাকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আনিয়া বেদম প্রহার করিতে লাগিলেন। চীৎকার-শব্দে অন্যান্য দাস দাসীরা ছুটিয়া আসিল—তখনও অসম্ভব মার চলিতেছে। অনুপমা ঘরের ভিতর পূজা করিতেছিল, পূজা ফেলিয়া সেও ছুটিয়া আসিল। ভোলার নাক মুখ দিয়া তখন রক্ত ছুটিতেছিল। অনুপমা চীৎকার করিয়া উঠিল, "দাদা, কর কি—মরে গেল যে!" চন্দ্রবাবু চিৎকাইয়া উঠিলেন, "আজ বেটাকে একেবারে মেরে ফেল্‌ব। তোকেও সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলতাম, কিন্তু শুধু মেয়েমানুষ ব'লে তুই বেঁচে গেলি। আমার সংসারে এত পাপ আমি বরদাস্ত করবো না। বাবা তোকে পাঁচ শ' টাকা দিয়ে গেছেন—তাই নিয়ে তুই আজই আমার বাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যা।" অনুপমা, কিছুই বুঝিতে পারিল না। শুধু বলিল, "সে কি!"

"কিছুই নয়। আজ টাকা নাও, নিয়ে ভোলার সঙ্গে দূর হ'য়ে যাও।—বাইরে গিয়ে যা খুসী করগে।"

অনুপমা সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। দাস দাসীরা সকলেই

এ কথা শুনিল ; কেহ মুখে কাপড় দিয়া হাসিল ; কেহ হাসি চাপিয়া ভালমানুষের মত সরিয়া গেল ; কেহ বা ছুটিয়া অনুপমাকে তুলিতে আসিল। চন্দ্রনাথ বাবু মৃতপ্রায় ভোলার মুখে আর একটা পদাঘাত করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শেষ দিন।

আজ অনুপমার শেষ দিন। এ সংসারে আর সে থাকিবে না। জ্ঞান হইয়া অবধি সে সুখ পায় নাই। ছেলেবেলায় ভালবাসিয়াছিল বলিয়া নিজের শান্তি নিজে পুড়াইয়াছিল ; অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিয়াছিল বলিয়া বিধাতা তাহাকে একতিলও সুখ দেন নাই। যাহাকে ভালবাসিত—মনে করিত, তাহাকে পাইল না ; যে ভালবাসিতে আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়াইয়া দিল। পিতা নাই, মাতা নাই, দাঁড়াইবার স্থল নাই, স্ত্রীলোকের একমাত্র অবলম্বন সতীত্বের গৌরব, তাহাও ঈশ্বর কাড়িয়া লইতে বসিয়াছেন। তাই আর সে এ সংসারে থাকিবে না। বড় অভিমানে তাহার হৃদয় কাটিয়া কাটিয়া উঠিতেছে। নিস্তব্ধ নিদ্রিত কৌমুদী-রজনীতে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া, আবার,—বার বার তিনবার—পুষ্করিণীর সেই পুরাতন সোপানে আসিয়া উপবেশন করিল। এবার অনুপমা চালাক হইয়াছে ; আর বার সন্তরণশিক্ষাটা তাহাকে মরিতে দেয় নাই, এবার তাহা বিফল করিবার জন্য কাঁকে কলসী লইয়া আসিয়াছে। এবার পুষ্করিণীর কোথায় ডুবন-জল আছে, তাহা বাহির করিয়া লইবে—এবার নিশ্চয় ডুবিয়া মরিবে। মরিবার পূর্ব্বে পৃথিবী বড় সুন্দর দেখায়। ঘর-বাড়ী, আকাশ, মেঘ, চন্দ্র, তারা, জল, ফল, ফুল, লতা, পাতা, বৃক্ষ, সব সুন্দর হইয়া উঠে ; যে দিকে চাও, সেই দিকই মনোরম বোধ হয়। সব যেন অঙ্গুলি তুলিয়া বলিতে থাকে, "মরিও না, দেখ, আমরা কত সুখে আছি—তুমিও সহ্য করিয়া থাক, একদিন সুখী হইবে ; না হয় আমাদের কাছে এস, আমরা তোমাকে সুখী করিব ; অনর্থক বিধাতৃ-দত্ত আত্মাকে নরকে নিক্ষেপ করিও না।" মরিতে আসিয়াও মানুষ তাই অনেক সময়ে ফিরিয়া যায়। আবার যখন ফিরিয়া দেখে, জগতে তাহার এক তিলও সুখ নাই, অসীম সংসারে দাঁড়াইবার এক বিন্দু স্থান নাই, আপনার বলিতে একজন নাই, তখন আবার মরিতে চাহে, কিন্তু পরক্ষণেই কে যেন ভিতর হইতে বলিতে থাকে, "ছি ছি ! ফিরিয়া যাও—এমন কাজ করিও

না। মরিলেই কি সকল দুঃখের অবসান হইবে? কেমন করিয়া জানিলে, ইহা অপেক্ষা আরও গভীর দুঃখে পতিত হইবে না?" মানুষ অমনই সঙ্কুচিত হইয়া পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়ায়। অনুপমার কি এ সব কথা মনে হইতেছিল না? কিন্তু অনুপমা তবুও মরিবে, কিছুতেই আর বাঁচিবে না।

পিতার কথা মনে হইল, মাতার কথা মনে হইল, সঙ্গে সঙ্গে আর এক জনের কথা মনে হইল! যাহার কথা মনে হইল, সে ললিত। যাহারা তাহাকে ভালবাসিত, তাহারা সকলেই একে একে চলিয়া গিয়াছে, শুধু এক জন এখনও জীবিত আছে। সে ভালবাসিয়াছিল, ভালবাসা পাইতে আসিয়াছিল, হৃদয়ের দেবী বলিয়া পূজা দিতে আসিয়াছিল, অনুপমা সে পূজা গ্রহণ করে নাই; বরং অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। শুধু কি তাই? জেলে পর্য্যন্ত দিয়াছিল; ললিত সেখানে কত ক্লেশ পাইয়াছিল, হয় ত অনুপমাকে কত অভিসম্পাত করিয়াছিল। তাহার মনে হইল, নিশ্চিত সেই পাপেই এত ক্লেশ, এত যন্ত্রণা! সে ফিরিয়া আসিয়াছে। ভাল হইয়াছে, মদ ছাড়িয়াছে, দশের উপকার করিয়া আবার যশ কিনিতেছে। * * * সে কি আজও তাহাকে মনে করে? হয় ত করে না, হয় ত বা করে—কিন্তু তাহাতে কি? তাহার যে কলঙ্ক রটিয়াছে। তিনি কি তাহা শুনিয়াছেন? যখন গ্রামময় রটিবে যে, আমি কলঙ্কিনী হইয়া ডুবিয়া মরিয়াছি, কাল যখন আমার দেহ জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে, ছি ছি! কত ঘৃণায় তাঁহার ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে!

অনুপমা অঞ্চল দিয়া গলদেশে কলসী বাঁধিল। এমন সময় কে এক জন পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, "অনুপমা!" অনুপমা চমকাইয়া ফিরিয়া দেখিল, এক জন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আগন্তুক আবার ডাকিল। অনুপমার মনে হইল, এ স্বর আর কোথাও শুনিয়াছে, কিন্তু স্মরণ করিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

"অনুপমা, আত্মহত্যা করিও না।"

অনুপমা কোনও কালেই ব্রীড়ানতা লজ্জাবতী লতা নহে; সে সাহস করিয়া বলিল, "আমি আত্মহত্যা করিব, আপনি কি করিয়া জানিলেন?"

"তবে গলায় কলসী বাঁধিয়াছ কেন?" অনুপমা মৌন হইয়া রহিল।

আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আত্মঘাতী হইলে কি হয় জান?"

"কি?"

"অনন্ত নরক।" অনুপমা শিহরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে কলসী তুলিয়া রাখিয়া বলিল, "এ সংসারে আমার স্থান নাই।"

"ভুলিয়া গিয়াছ। আমি মনে করিয়া দিতেছি। প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই স্থানে এক জন তোমাকে চিরজীবনের জন্য স্থান দিতে চাহিয়াছিল,—স্মরণ হয়?" অনুপমা লজ্জায় রক্তমুখী হইয়া বলিল, "হয়।"

— "এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।"

"আমার কলঙ্ক রটিয়াছে—আমার বাঁচা হয় না।"

"মরিলেই কি কলঙ্ক যায়?"

"যাক না যাক, আমি তাহা শুনিতে যাইব না।"

"ভুল বুঝিয়াছ, অনুপমা। মরিলে এ কলঙ্ক চিরকাল ছায়ার মত তোমার নামের পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইবে। বাঁচিয়া দেখ, এ মিথ্যা কলঙ্ক কখনও চিরস্থায়ী হইবে না।"

"কিন্তু কোথায় যাইয়া বাঁচিয়া থাকিব?"

"আমার সঙ্গে চল।"

অনুপমার একবার মনে হইল, তাহাই করিবে। চরণে লুটাইয়া পড়িবে, বলিবে, "আমাকে ক্ষমা কর।" বলিবে, "তোমার অনেক অর্থ, আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও—আমি দূরে গিয়া কোথাও লুকাইয়া থাকি।" পরে অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আমি যাইব না।" কথা শেষ হইতে না হইতেই অনুপমা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

• • • •

অনুপমা জ্ঞান হইলে দেখিল, সুসজ্জিত দুগ্ধ পালঙ্কের উপর সে শয়ন করিয়া আছে। পার্শ্বে ললিতমোহন। অনুপমা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কাতর-স্বরে বলিল, "কেন আমাকে বাঁচাইলে?"

• • • •

কিছু দিন পরে জননীর মত লইয়া ললিতমোহন অনুপমাকে বিবাহ করিলেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

—